বিষয়-সূচী

[আষাঢ় ১৩৩৬—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬]

ষাণ্মাষিক সূচী

ষাণ্মাষিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

চিত্র-সূচী

। কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ—শিল্পীগণের নামানুক্রমে।

বুদ্ধদেব

তুরফানের কোনো বিহারের প্রাচীর-গাত্রে এই চিত্র অঙ্কিত।

[মধ্য এশিয়ায় হিন্দু-সাহিত্য

তৃতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৬ | প্রথম সংখ্যা

বেদনার মূল্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার গভীর শোকে সান্ত্বনা দিতে পারি এমন কোনো কথাই আমি জানি না। তোমার দুঃখ যে কতখানি তাহা আমি বুঝি, কারণ আমার জীবনে প্রিয়বিচ্ছেদবেদনা আমি বারবার অনুভব করিয়াছি। ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের হাতে নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, যথার্থ বড় দুঃখ আপন মহত্ত্বের দ্বারাই বেদনার মধ্যেই গভীর ভাবে আপন মুক্তি আপনি সংগ্রহ করে। কারণ, সে নিজের চারিদিকে একটি বৈরাগ্যকে নিবিড় করিয়া তুলে; আমাদের সকল বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়; সেই বৈরাগ্যের আলোকে আমরা যে সত্যের পরিচয় পাই তাহাতে একটি আনন্দের স্বাদ আছে। জীবনে যাহাকে আমরা মর্ত্ত্যলোকের বৈচিত্র্যের মধ্যে পাইয়াছি মৃত্যুতে তাহাকে আমরা অমৃতলোকের ধ্রুবত্বের মধ্যে পাই। সেই পাওয়ায় আমাদের মর্ত্ত্য দেহ-মনের কান্না মেটে না বটে, কিন্তু অশ্রুতরঙ্গের তলে তলে আমাদের অন্তরাত্মায় একটি শান্তির ধারা বহিতে থাকে। মৃত্যু একদিক হইতে তোমার যাহা হরণ করিয়াছে আর একদিক হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিক্ এই আমি কামনা করি, তোমার শোকের দুঃখ নিরর্থক না হউক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ই ভাদ্র ১৩৩০ সালে
লিখিত একখানি পত্র

দ্বন্দ্ব

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের গৃহ এক জায়গায়, বিদ্যালয় আর-এক জায়গায়; প্রয়োজনের খাতিরে গৃহের সঙ্গে শিক্ষার এই বিচ্ছেদ আমাদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে, সুতরাং এই বিধানকে কোনোমতেই আমরা চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারিনে। আমাদের বল্‌তেই হবে যে, শিশুশিক্ষার সমস্যা মানুষের মধ্যে ঠিকমত সমাধান করা হয় নি, তাই স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হয়েচে। পাখীর ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষিমাতার কাছেই তার প্রথম শিক্ষা পায়—সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়—সেই কান্নার মধ্যেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েচে।

শুধু শিক্ষা নয়। কর্ম্মের সঙ্গে গৃহের এই বিচ্ছেদ আরো প্রবল। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কর্ম্মীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কর্ম্মের যোগ নেই। এতে মানুষের দারুণ পীড়া। মাটি থেকে গাছকে উপ্‌ড়ে নিলে তার যে দশা হয় এতে মানুষের সেই দশা হচ্চে। সে শুকিয়ে যাচ্চে, বিকৃত হচ্চে, তার মানসিক শক্তির সঙ্কীর্ণতা এবং জড়তা ঘটচে। সে আগাগোড়া কেবল তার আপিসের ফরমাসের জিনিষ হ'য়ে উঠ্‌চে, তার নিজের স্বাভাবিক জীবন ব'লে কিছুই আর বাকি থাকচে না। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা অধিকাংশ মানুষকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে ছিন্ন ক'রে আন্‌চে।

স্বস্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে অধিকার, সে আজ কেবল সেই অল্প কয়েকজন পায় যাদের অর্থ আছে। সেই অল্পসংখ্যক মানুষের জন্যে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে খর্ব্ব করচে—আধুনিক সভ্যতার লক্ষণই এই। এ সভ্যতা মানুষকে মানে না; বস্তুকে, পণ্যকে, কার্য্যপ্রণালীকে মানে। বস্তুত এটা দাসত্বের যুগ। যেখানে কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মীর আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, যেখানে স্বভাবের সঙ্গে কর্ম্মের যোগ বিচ্ছিন্ন, সেখানেই দাসত্ব। সেই দাসত্ব আজ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। ইংরেজ জাতি বলে, তারা দাসত্ব প্রথা দূর করেচে। সে কথাটা স্থূলভাবে আংশিকভাবে সত্য। অল্প কয়েকজনের যে বিশেষ এক রকমের দাসত্ব ছিল, সেইটেই তারা দূর করেচে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতিই এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েচে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরদাসত্ব না করলে সে সভ্যতা চলেই না। যে সমস্ত উপকরণ তার অত্যাবশ্যক, তার পরিমাণ অতি বিপুল; তাকে যথাসম্ভব সুলভ করাও চাই; এই দ্রব্য উৎপাদন এবং সংগ্রহ চেষ্টায় মানুষের সেই অবকাশ অল্প হ'য়ে গেছে যে অবকাশে তার স্বাধীন ইচ্ছা আশ্রয় পায়, যে অবকাশে তার স্বাভাবিক আত্মীয়-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা।

প্রবৃত্তির দাস পশু, বাহ্য-প্রাকৃতিক নিয়মের শাসনে পশু একান্ত চালিত; মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই পশুবিভাগও আছে। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব এই বিভাগের উর্দ্ধে; যেখানে সে কর্ত্তা, সে মুক্ত, সেখানে সে আধ্যাত্মিক মানুষ। বর্ত্তমান সভ্যতায় সেই আধ্যাত্মিক মানুষের সঙ্গে সাংসারিক মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেচে।

এই সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে মানুষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনেক কম জান্‌ত, অনেক বিষয়ে তার অন্ধসংস্কার ছিল, এ সমস্তই সত্য। কিন্তু সংসারের সঙ্গে আত্মার বিরোধ তখন এত ভয়ঙ্কর ছিল না। আজ সংসারভার অত্যন্ত প্রকাণ্ড হয়ে উঠেচে; মানুষের প্রয়োজনের জটিলতা অতিশয় পরিমাণে বেড়ে ওঠাতে সকল দিকে তার আয়োজন দুঃসাধ্য হয়েচে। এমন কি, আমোদ-আহ্লাদ খেলাধূলার উপকরণ পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য।

জীবনযাত্রার উপকরণ যখন দুর্ম্মূল্য এবং তা সংগ্রহ যখন কষ্টসাধ্য হয় তখন সে সম্বন্ধে মানুষের অহঙ্কার খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সেইজন্যে উপকরণবানের আত্মাভিমান

আগেকার দিনের চেয়ে এখন অনেক বেশি হয়েচে। যে অভাব মোচন মানুষের অত্যাবশ্যক তার জন্যে তাকে তত বেশি প্রয়াস পেতে হয় না,—কিন্তু "আমি ধনী" এই অহঙ্কারটাকে আজ-কালকার দিনে ভাল ক'রে ব্যক্ত করবার উপযুক্ত ধন অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু এই ধনী ব'লে জানাবার আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ লোকেরই মনে জাগরূক; সেই জন্যে এই আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় মানুষ এমন কর্ম্মের বন্ধন গ্রহণ করে যে বন্ধনে তার জীবনের সমস্ত অবকাশটাকে ধন-নিষ্কর্ষণের জাঁতার সঙ্গে ঘানীর সঙ্গে পশুর মত বেঁধে রাখে।

সংসার আজকাল এত অত্যন্ত বেশি দাবী করে ব'লেই মানুষের বেশির ভাগ শক্তি তার নীচের তলায় তার আপিস ঘরেই খাটে। অর্থাৎ তার অহং-এর দরবারেই তার দিন যায়। তার উপরের তলায় যে অধ্যাত্মনিকেতন আছে, সেখানে তার যাতায়াত অসম্ভব হ'য়ে উঠেচে। সংসারটাই দলে দলে সমস্ত মানুষকে প্রবল টানে টানচে ব'লেই যেনাহং নামৃতঃস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ এটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কথার কথা হ'য়ে উঠ্‌চে। অধ্যাত্মজীবনের সম্পদের তুলনায় সংসারের ধন-মান যে তুচ্ছ একথা সমস্ত বিরুদ্ধ পৃথিবীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলবার শক্তি কত অল্প লোকেরই আছে! সমাজের অধিকাংশ লোকে মিলে যে জিনিষকে মূল্য দেয় সেই জিনিষটাই ব্যক্তিবিশেষের কাছে মহামূল্য হ'য়ে ওঠে—সেই জিনিষটা সংগ্রহের দ্বারা সকল লোকের কাছে সে গৌরব লাভ করে—এটা প্রবল প্রবর্ত্তনা। আজকালকার দিনে বাইরের উপকরণগুলি যখন সেই অত্যন্ত বেশি দাম পেয়েচে তখন আত্মার দিকে তাকিয়ে ক'জন বল্‌তে পারে, যেনাহং নামৃতঃস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

এই কারণেই আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সাংসারিক জীবনযাত্রার বিচ্ছেদ আজ এতই কঠিন হয়েচে। সেই জন্যে আপনার নীচের তলা থেকে উপরতলায় যেতে মানুষ এত বেশি দুঃখ অনুভব করে। কেননা ব্যবহারের অনভ্যাসে সিঁড়িটা হয়েচে জীর্ণ। এতে ক'রে মানুষ ছোট হ'য়ে গেচে।

য়ুরোপে যুদ্ধ যারা করছিল তারা আজ ক্লান্ত হয়েচে। তারা বলচে, এই সংসারটার পরিবর্ত্তন দরকার। তারা বলচে স্বদেশের একান্ত স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যের অত্যন্ত রেষারেষি, এতে কল্যাণ নেই। দলটাকে আরো বড় করতে হবে। কয়েকটা প্রবল জাতি মিলে একটা আন্তর্জাতিক সংঘ গ'ড়ে তোলা যাক্। কিন্তু এ-ও বাইরের কথা। সেই আন্তর্জাতিক সংঘ কা'কে প্রকাশ করবে? মানুষের শক্তিকে, না মানুষের আত্মাকে? এই প্রশ্নের সত্য উত্তরের উপরেই সব নির্ভর করবে।

আত্মার ধর্ম্ম ত্যাগ করা, লোভ তার ধর্ম্ম নয়; কেননা অমৃতধাম তার আশ্রয়। সেই আত্মা এখনকার লুব্ধ সভ্যতার স্থূল আবরণে আবৃত হ'য়ে রয়েচে—লোকালয়ে তাকে আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি না। এইজন্যে মানুষের আত্মপরিচয় হচ্চে না। না হওয়াতেই সে আপনার মর্য্যাদা হারিয়ে যা' তা' নিয়ে মারামারি করচে।

এই আত্মাকে প্রকাশের ভার কোনো সম্প্রদায়ের উপর নয়, আমাদের প্রত্যেকের উপর। যে এ'কে প্রকাশ করবে সে কেবল নিজের পথকে আলোকিত করবে না, সমস্ত মানুষকে সাহায্য করবে; মানুষ সব চেয়ে বড় ভুল ভুলেচে, আপনাকে ভুলেচে, তার ভুল ভাঙিয়ে দেবে। সবাই যখন "চাই" "চাই" ব'লে নিদারুণ হ'য়ে উঠেচে, তখন আপন অন্তরের আনন্দ থেকে বল্‌তে হবে, "চাই না।"

য়ুরোপের মধ্যযুগকে অন্ধযুগ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নাম সত্য নয়। নিশ্চয়ই সে যুগে অন্ধকার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তখনকার মানুষ সেই অন্ধকারকেই চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নেয় নি। তারা বলেছিল, "অন্ধকার থেকে আলোকে যাব।" তারা অনুভব করেছিল এই অন্ধকারের বাইরে আলো আছে। সেই আলোর লক্ষ্যই মানুষের শেষ লক্ষ্য। যেটার মধ্যে জড়িত হ'য়ে আবৃত হ'য়ে আছি সেটাকে বিদীর্ণ ক'রে ছাড়িয়ে যেতে হবে, এই কথাটা তখনকার মানুষ অনুভব করেছিল। তাই আপনার আবরণের সঙ্গে তখনকার মানুষের একটা লড়াই শেষ পর্য্যন্ত থামে নি। তখন মানুষ দারিদ্র্যব্রত নিতে প্রস্তুত হয়েছিল আত্মার সম্পদকে সত্য ক'রে জানবার জন্যে। তখন টাকাকড়ি খ্যাতিপ্রতিপত্তিকে সকলের চেয়ে বড় মান দেওয়া হয় নি।

তখন রাজাকে মাথা হেঁট করতে হয়েচে তাদের কাছে, যারা রাজত্বকে গ্রাহ্য করে নি।

আজ মানুষ গৌরব ক'রে বল্‌চে, আমাদের এই ডিমক্রেসির যুগ, আমাদের আজ সকলেই রাজা। অবশ্য একথাটা ছোট নয়। মানুষের অধিকার যেদিক থেকে যতই বড় হোক ততই ভাল। কিন্তু তবু 'ততঃ কিম্!' একজন রাজার জায়গায় দশ বিশ কোটী রাজা নিয়েই কি পৃথিবীর চরম সার্থকতা? প্রভুত্বই কি সব চেয়ে বড়? মুক্তি কি তার চেয়ে বড় নয়? এই যে সব লক্ষ লক্ষ প্রভুরা মিলে বাণিজ্যের কলুষে পৃথিবীর দেশবিদেশকে কলঙ্কিত করচে, স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতিকে সুগভীর গূঢ় মিথ্যার চোরাবালির উপর গ'ড়ে তুলতে যাচ্চে, আর পরস্পর হানাহানি ক'রে ভ্রাতৃরক্তের ভীষণ বন্যায় ধরণীকে অপবিত্র করচে—এই যে সব যূথবদ্ধ লুব্ধতা ও হিংস্রতার কীর্ত্তিকলাপ, এটা এক প্রভুর না হয়ে বহু প্রভুর কৃত ব'লেই কি মস্ত গৌরবের বিষয়?

প্রভুত্ববান বহু পুরুষের হুহুঙ্কারে আজ আকাশ আলোড়িত, কিন্তু মুক্ত পুরুষদের নির্ম্মল প্রশান্ত জ্যোতি ত আজ লোকালয়ে দেখা যায় না। আজ ঝড়ের আকাশে মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে বিদ্যুৎ হানচে, কিন্তু সপ্তর্ষিকে দেখিনে কেন? ধ্রুবতারা কোথায়? আজ মৃতমাংস নিয়ে সব গৃধ্র শকুন মাতামাতি করচে, কিন্তু অমৃতের বার্ত্তা নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষ কই আসে?

বহুলক্ষ রাজা আমাদের যা দিতে পারে না একজন মুক্ত পুরুষ জগৎকে তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে পারে, এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি বর্ত্তমান যুগ তার শ্রদ্ধা হারিয়েচে ব'লেই আজ শক্তির সাধনা পণ্যের সাধনা নিয়েই প্রভুত্ব-অধিকারদৃপ্ত ডিমক্রেসি মেতে রয়েছে; মুক্তির সাধনাকে এ যুগ বিস্মৃত হয়েচে। এই সাধনার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ভার ভারতবর্ষ কি আজ নিতে পারে না? মানুষের অহমিকা আজ বড় বড় নাম ধ'রে মানুষকে অভিভূত করচে, সেই অভিভূতি থেকে ভারতবর্ষ আপনাকে যদি বাঁচাতে পারে তাহলে সমস্ত মানুষকে বাঁচবার পথ সে বের করবে। আর কিছু নয়, মানুষের আত্মাকে সে যদি মানুষের সমস্ত কিছুর চেয়ে বড় ব'লে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে পারে তাহ'লেই সেই সত্য শ্রদ্ধার জোরে সে অসাধ্যসাধন করতে পারবে। কেননা, আত্মার শক্তি সকল শক্তির চেয়ে বড়, বিনা অস্ত্রে দেশকে এবং কালকে সে জয় করে, শৃঙ্খলে তাকে বন্দী করে না, মৃত্যু তাকে নিহত করে না, দারিদ্র্য তাকে দীন করে না, এবং অগ্নিশিখার গায়ে যেমন পঙ্কলেপন অসম্ভব তেমনি কোনো অসম্মান তাকে বাহির থেকে স্পর্শ ক'রেও কলঙ্কিত করতে পারে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষর ও অক্ষর

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম,এ

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গ দেখা যায়। পুরুষের এই ত্রিরূপ, দর্শনশাস্ত্রের নায়ককে এমনি সহজ ভাবে আমাদের আঁখিপটে আঁকিয়া দেয় যে, আমরা যেন অবলীলাক্রমে নামরূপাতীতকে মূর্ত্তির কাঠামে দেখিয়া ফেলি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই নাম-রূপের পরিচয় উপ্‌চাইয়া সেই মহামহিম যেন বিশ্বম্ভর হইয়া আমাদের কল্পনাতে একটা অসীমের স্পর্শ বুলাইয়া দেয়। বেদান্তে যে তত্ত্ব ডমরুনির্ঘোষের মধ্যে স্তব্ধমননে শুনিতে হয় গীতায় সেইটি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে পরম মনোহারী। যে ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম, তাহার রুদ্ররূপের জটাবল্কল খসাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চির নব-কিশোর সাজে তাঁহার অতুলন বেণুরবে, মানুষের কানে মধু বর্ষণ করিয়াছেন—সে অমৃতের বারতা যুগে যুগে আমাদের জন্য বহিয়া আসিতেছে, আমরা আমন্ত্রিত হইয়াও ত সে অমৃতের ভোজে পদ্ম-পত্র পাতিয়া বসি না!

বেদান্তে যে পুরুষের পরিচয়-কাহিনী সূত্রের পর সূত্রে, জটিল কঠিন প্রমাণ প্রয়োগে দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সব চাইতে বড় বাধা, যিনি আখ্যানের নায়ক যাঁহার স্তবস্তুতিতে আত্মতন্মন্ত্রিত, তিনিই অদেখা, অচিন্, নিখোঁজ; গীতায় সেই বাধাটিকে এড়াইয়া বাসুদেব স্বয়ং 'নারায়ণ' রূপে দাঁড়াইয়া সহজ দৃষ্টিতে "অদেখা, অচিন্"কে চিনাইতেছেন, অপরি-চিতকে পরিচিত করাইতেছেন! সীমার জগতে—

সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,

সসীমের মধ্যে অসীমকে দাঁড় করাইতেছেন। নামরূপের জগতে, আকার প্রকারে, অঙ্গভঙ্গি লইয়া সীমার বাঁধকে স্বীকার করিতেছেন অথচ পলকের মধ্যে সীমার রেখা মুছিয়া দিয়া কোথাও উধাও হইতেছেন! ছান্দোগ্যের ছন্দোবন্ধে অসীম সসীমের দ্বন্দ্বটি কি অভিনব কবিত্ব লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়

নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো...

নদীর স্রোতের ন্যায় কালস্রোতের কূলে মৃত্যুলোক—যেখানে জরা মৃত্যু, শোকের পারাবার দিন রাত্রি উথলিয়া উঠিতেছে সেই স্রোতের উপরে এক সেতু অমৃতলোকের বার্ত্তা লইয়া চিরন্তন স্থিতিতে বর্ত্তমান, সেখানে দিবারাত্রির যাইবার অধিকার নাই, সে লোক "সকৃদ্‌বিভাতঃ" সীমা-অসীমের মৃত্যু-অমৃত্যুর, ক্ষর (বিনাশশীল)-অক্ষরের (অবিনাশের) চলোর্ম্মির ফেনমুকুটে পদ্মপাদ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫-১৬ ॥

এইখানে দুই প্রকারের পুরুষ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি হইল, 'ক্ষর' তাহা যাহা মৃত্যুর বেলাভূমে বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে ফাটিতেছে, মৃত্যুর কবলে যাহা পরিবর্ত্তনের ক্রীড়নক মাত্র তাহাই ক্ষর। যেখানে মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না, অমৃতের স্পর্শে মৃত্যুর কণ্ঠরোধ হয়, সেই লোকেই 'অক্ষর' চির জাগ্রত চির মূর্ত্ত!

ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তৃতীয় স্তরের পুরুষোত্তম বুঝিবার সুবিধা ঘটিবে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা যে জরা ও মৃত্যু-লোকের চিত্র পাইয়াছি, উহাই "ক্ষর" নামে অভিহিত। কিন্তু শুধু নামে পরিচয়ের ত লেশমাত্রও জাগে না! ইহার সম্বন্ধে নাতি-ক্ষুদ্র বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সাংখ্যে একটি সূত্র আছে—"নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাত্তস্য" কালের দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন, মৃত্যু দ্বারা যাহা আক্রান্ত, জরা ব্যাধি দ্বারা যাহা প্রপীড়িত, সেই দেহকে কেন্দ্রগত করিয়াই "ক্ষরের" বিনাশশীল রাজত্ব। বুদ্ধদেবের সহস্রাধিক ভাষণে কেবল ক্ষরের উপরই অগ্নি-কণ্ঠের স্ফুলিঙ্গ রাশি রাশি ফেলিয়াছেন, ইচ্ছা মানুষকে ক্ষরের কবল হইতে মোচন

করা। If it were not, brethren, that there is escape from the earth-element, beings could not escape from it" (Sanyutta Nikaya, Chap XIV, 4) এখানে ক্ষর হইতে অক্ষরের দিকে বুদ্ধদেব লোক-চক্ষু ফিরাইয়া দিতেছেন।

ক্ষর কাহাকে বলি? ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে যেখানে সৃষ্টিপ্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে সেখানে জীবাত্মার রূপটি আলোচিত হইবার একটি উত্তম সুযোগ দেখা যায়। ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি ঘটাইলেন। পিতাপুত্রের তত্ত্বকথন হইতে বিষয়টি ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। পুত্র শিক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পিতা দেখিতেছেন পুত্রের বদনে অহমিকার যে ছবি ছাপ্ খাইয়া আছে উহা ব্রহ্ম-বোধের বিরোধ জাগাইতেছে মাত্র, তাই পুত্রকে ব্রহ্ম-সভায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া কহিলেন—শ্বেতকেতো, ঘট বলিয়া মাটি হইতে পৃথক্ ভাবিবার কোন পদার্থ নাই—ঘট বাস্তবিক নাম মাত্র, মিথ্যা, "মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ; সেইরূপ ঘটবৎ অবয়বযুক্ত যত কিছু সংসারে আছে সকলই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞানে মিথ্যা, এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। কারণ 'সৎ' (ব্রহ্ম) হইতে এ সকল উদ্ভূত হইয়াছে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিবে মাটির সহিত ঘটের উপাদানত্বের যে অভিন্নত্ব, ব্রহ্মের সহিত অবয়বির ত সে সম্বন্ধ নহে, কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব "নতু নিরবয়বং সৎ।" তবে পাঞ্চভৌতিক শরীর আসে কোথা হইতে? এই শরীরের সহিত ব্রহ্মের একাত্মতা থাকিবার উপায় কি? জড়ের সৃষ্টি অজড় হইতে হয় কিরূপে? এ প্রশ্ন যত বৃহৎই হউক না কেন, এখানে শুধু দু'একটি কথা কহিয়াই ইহাকে ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে যাইতে হইবে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অমর ভাষ্যে প্রশ্ন তুলিতেছেন :—

নিরবয়বস্ত সতঃ (ব্রহ্মণঃ) কথং বিকার সংস্থানং উপপদ্যতে? নৈব দোষঃ, রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদি সংস্থানবদ্ বুদ্ধিপরিকল্পিতেভ্যঃ সদবয়বেভ্যো বিকারসংস্থানোপপত্তেঃ।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্রহ্ম নিরবয়ব, রজ্জু নিরবয়ব নহে, রজ্জুর অবয়বে সর্পাকৃতি সূচিত হইতে পারে; কিন্তু নিরবয়ব ব্রহ্মে অবয়বের আকৃতি সূচিত হয় কিরূপে? তাই মনে হয় আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন ব্রহ্ম বুদ্ধিযোগে সতের অবয়ব সৃষ্টি করেন এবং তাহা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ উদ্ভূত হয়। যাহা তিনি সৃষ্টি করেন তাহা তিনি স্বয়ং নহেন। সৃষ্ট ও স্রষ্টা এক নহে। তাই ইহাতে তিনি প্রবেশ করিলেন—"এতেষাং প্রতিবোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশামি।" যাহা তাঁহার বুদ্ধি পরিকল্পিত তাহা প্রত্যুত তাঁহা হইতে উদ্ভূত—সুতরাং মাটিই যেমন সত্য তেমনি তিনিই সত্য—মাটির ঘট যেরূপ বাচারম্ভনং বিকারং তেমনি তদুদ্ভূত বিকারাত্মক জগৎও বিকারং—কেবল তিনিই সত্য। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।

এইরূপে "ক্ষরের" ভাণ্ডটি সৃষ্ট হইয়াছে—ইহারই মধ্যে "অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি," নামরূপে ইহাকে ব্যক্ত করিব, এই ইচ্ছা লইয়া জীবাত্মা রূপে ব্রহ্ম ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ছান্দোগ্য এমনি করিয়া অ-জড় ব্রহ্মকে জড়ের খোলসে আনিয়া ফেলিলেন। ভাল, "শুভ্রং অকায়ং অস্নাবীরং" শ্বেতাশ্বতরের সেই কায়হীন স্নায়ু-বর্জ্জিত জ্যোতি ত শরীরের পরিধিতে শৃঙ্খলিত হইলেন, কিন্তু কেমন করিয়া তিনি অপরিচিত দেহ-গেহে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিলেন? দেহের কোঠায় বসিয়া দেহের সহিত সম্পর্ক কেমনে পাতাইলেন? এই সম্বন্ধ নির্ণয় কথনো কঠিন হইত না যদি ল্যাম্পের চিম্নির মধ্যে দীপ যেমন আপন সত্তায় উদ্ভাসিত থাকে তদ্রূপ দেহ-মধ্যে জীবাত্মা আপন স্বরূপে দেদীপ্যমান থাকিত। যত গোল ত ঐখানে! জীবাত্মা নামরূপ প্রকট করিতে আসিয়া উহাদের সহিত পৃথক্ থাকিলে চিম্নি হইতে আলোর যতটা পার্থক্য, নামকায় হইতে জীবাত্মার ততটা পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িত—এবং 'সোহহম' সাধনার জন্য মানুষকে শাস্ত্রের মুখে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" বলিয়া অত তীক্ষ্ণ অনুশাসন শুনিতে হইত না। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে ভিন্নরূপ। জীবাত্মা নামরূপের সহিত অপৃথগ্ভূত হইয়া একেবারে ক্ষরের সহিত "ক্ষর" সাজিয়া বসিয়াছে। বিনাশশীল মর ক্ষর দেহের বাহিরে জীব-চৈতন্য আর কিছুই ভাবিতে পারে-না, মর ক্ষর ভিন্ন অক্ষর অমর যে কিছু

আছে সে ধারণাও করিতে পারে না—ক্ষর দেহের কামাদি ধর্ম্ম তাহাকে এমনি পাইয়া বসে, সে ইহার সহিত অভিন্নতা পাতাইয়া অক্ষরের ধ্যান চিন্তায়ও আনিতে পারে না।

কামাদি বৃত্তিমৎমনঃ, তেন মনসা জনশ্চৈতন্যজ্যোতির্ম্মনসো অবভাসকং ন মনুতে ন সঙ্কল্পয়তি।

ক্ষরের পরিচয়-পত্রের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরের চিত্রটি এতটুকু না ফুটাইলে উভয়ের সম্বন্ধনির্ণয়ে একটা বাধার সৃষ্টি হইবে। গীতার মন্ত্রে শব্দটি হইতেছে "ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি"—এই সর্ব্বভূতের অন্তরে—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ...ধর্ম্মাধ্যক্ষ...নির্গুনশ্চেতি" বলিয়া যাঁহার প্রশস্তি হইতেছে তিনিই আত্মন্ তিনিই অক্ষর। সুতরাং দেখা গেল সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ় (কূটাহ) লুক্কায়িত অবস্থায় অক্ষর আত্মন্ বিরাজমান্, যাহা গূঢ় তাহাই কূটস্থ। দেহের মধ্যে অক্ষর আত্মনের অভ্যুদয় কেন হইল? দেহের রোগশোক পাপতাপে দগ্ধ হইবার জন্য তিনি কেন জতু-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন? হায় হায়—ইহা ত মস্ত ভুল! তিনি স্বাধীন অমৃতাস্বাদী হইয়া কেন মৃত্যুর ভুর্জ্জপত্রে দাসখৎ লিখিয়া দিলেন? "ন হি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্ স্বস্য বন্ধনাগারং নির্ম্মিমানঃ কোষেয় কীটবৎ তৎ প্রাবিশেৎ"—গুটিপোকার ন্যায় দেহের গুটিতে আবদ্ধ হইলেন, এটা কি ভাল হইল! আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ আশঙ্কার উচ্ছেদ করিয়াছেন যে, তিনি "যদি স্বেনৈবাবিকৃতেন রূপেন অনুপ্রবিশেয়ং," যদি অবিকৃত স্ব-স্বরূপে প্রবেশ করিব এই মনন করিতেন তবে দুঃখপারাবার হইতে তাঁহার নিস্তার ছিল না। কিন্তু তিনি দেহাভ্যন্তরে অক্ষর স্বরূপে থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ ক্ষর জীবত্ব উৎপাদন করিয়াছেন এবং ঐ 'জীব'কে ঘেরিয়াই মৃত্যুর চলোর্ম্মি, ভয়াবহ ফেনিল উচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠিতেছে।

ক্ষরের সূত্রপাত তবে কি ভাবে ঘটিল? আত্মনের অবিকৃত সত্তা লইয়া ক্ষর মর-জীবের অভ্যুদয় ঘটে নাই। কি ভাবে জীবের জীবত্ব সিদ্ধ হয় ইহা লইয়া আচার্য্য শঙ্কর কবিসুলভ উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। "জীবো হি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রং, বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রসংসর্গজনিতঃ—আদর্শে ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিম্বঃ, জলাদিম্বিব চ সূর্য্যাদীনাম্।"

এক কথায় বলিতে গেলে সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণে যে সম্বন্ধ, অক্ষর আত্মনের সহিত ক্ষর জীবেরও সেই সম্বন্ধ। বহুদূরে সূর্য্য স্বস্বরূপে উদ্ভাসিত আর বহুনিম্নে জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত, এখানেও তেমনি। আত্মন্ "শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্" স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেহের পঞ্চতন্মাত্রাত্মক বুদ্ধিতে "জীব" রূপে প্রতিবিম্বিত। এইখানে উপমাটিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটু বিশ্লেষণ করিলে মহা জটিল বিষয়টি সহজ দৃষ্টিতে হৃদয়গ্রাহী হইবে আশা করি। সূর্য্যের জলস্থ প্রতিবিম্বের সহিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, জীবের তুলনা চলিতেছে। সূর্য্য-প্রতিবিম্বের আধার হইতেছে জল, এখানে জীবরূপ ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বের আধার হইতেছে কি? জিনিসটিকে বেশ ধীর চিন্তার সহিত অনুধাবন করা দরকার—জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব ঘটাইতেছে সূর্য্যের রশ্মিরাশি, জীবত্বের উদ্ভবও ঘটাইতেছে আত্মনের রশ্মিসমূহ, বৃহদারণ্যকে যাঁহাকে বলিয়াছেন—"প্রাণন্ এব প্রাণো নামো ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষু মন্বানং মনঃ"...দেহের আধারে এই সব ইন্দ্রিয়-রশ্মি-সমূহ আসিতেই দেহজ রূপরস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ পঞ্চতন্মাত্রের দর্পণে, ইহারা মুকুরিত হইতেছে বিকৃতাকারে; আদর্শের মলিনতায়, জলের আবিলতায় যেমন প্রতিবিম্ব বিকৃত হয় এখানেও ঠিক তেমনি। কাজেই জীবের আধার হইতেছে স্থূলভাবে শরীর সূক্ষ্মভাবে পঞ্চতন্মাত্র। ইন্দ্রিয়াদি যদি জীবত্বের কারণ হইয়া থাকে, তবে জীবত্বের মধ্যবিন্দু কোথায় রহিয়াছে?—মনে। মনের শক্তি কি?—বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যখন দেহাত্মক তন্মাত্র রূপরসগন্ধে একেবারে গুলিয়া গিয়া ইহাদের সহিত একীভূত হইতে হইতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয় তখনই "জীবত্বের" অভ্যুদয় ঘটে। ইহাই দ্বৈতবাদ।

এখন আমরা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে যাইতেছি—সংসারের সুখদুঃখ জন্ম মৃত্যু কাহাকে বেড়িয়া তালে তালে নাচিতেছে!—"বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রসংসর্গজনিতো। জীবঃ"—জীবের চতুর্দ্দিকে। মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে কিসের দ্বারা—মনের দ্বারা। তাই আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধিশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মনেই তাহা হইলে জীবত্ব, মনই জীবাত্মা। সূর্য্যের জলস্থ প্রতিবিম্ব যদি ব্যাঘাত পায় তাহাতে যেমন সূর্য্যে ব্যাঘাত ঘটে না, "সূর্য্যো যথা...ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ"

তদ্রূপ অক্ষর আত্মনের কিরণস্বরূপ তন্মাত্রসংসৃষ্ট বুদ্ধিস্থ প্রাণে ব্যথা হইলে উহা আত্মায় পৌঁছে না। ইহার কারণ কি? ব্যথার হেতু কোথায়?—শরীরে। সূর্য্য-প্রতিবিম্বের শরীর যেরূপ জল, জীব-প্রতিবিম্বের শরীরই পঞ্চতন্মাত্রক সূক্ষ্ম স্থূল শরীর। অক্ষর আত্মনের সে শরীর নাই, কাজেই ব্যথার কারণও নাই, ক্ষর জীবের শরীরই ব্যথার উপাদান।

প্রবন্ধারম্ভে আমরা সেতুর কাহিনী পাইয়াছি—মনই সেই সেতুস্বরূপ, মনকে যদি পঞ্চতন্মাত্রবোধক আহার হইতে বিমুক্ত করিয়া "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ"—গীতার এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করা যায়, তবে মনই ক্রমে অমৃতলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। মনের হাতেই সে চাবি রহিয়াছে। অমৃতের আস্বাদ পাইয়া মন যতই অক্ষর পুরুষের "সোহহম্" ধ্যানে বিভোর হইতে থাকিবে ততই জড়ের শৃঙ্খল খুলিয়া প্রতিবিম্ব-জীবন অতিক্রম করিয়া ক্ষর-জীব, অক্ষর আত্মনে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। নামরূপের বিকার কাটাইয়া "মৃদিতকষায়" হইয়া ক্ষর তখন অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইবে। এই চরম জ্ঞানের বিকাশে ক্ষর নামের সম্পূর্ণ বর্জ্জন হইলেও, দেহের ক্ষরত্ব জীবের সঙ্গে আমৃত্যু রহিয়া যায়। ক্ষরত্বের বিনাশ হইল তবে কোথায়? মনে। মনে উহার আত্যন্তিক নাশ হইলে পুনর্জ্জন্মেরও আত্যন্তিক নাশ হয়। "অশরীরতা হ্যাত্মনঃ স্বরূপম্" অশরীরতা অক্ষর আত্মনের স্বরূপ হইলেও, মুক্তপুরুষ দেহ-সম্বন্ধী হইয়াও অক্ষর নামে, আত্মিক-প্রতিষ্ঠা হেতু উক্ত হইতে পারেন। তাই গীতায় ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। সংসারের জরামৃত্যুর লীলা-তাণ্ডবে শ্রীকৃষ্ণ অপরূপ সুঠাম চিরযৌবন কান্তিমান হইয়া মোহন বেণুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে চম্পক করাঙ্গুলি বুলাইতেছেন, আর বিশ্বরূপের এক একটি সুরচ্ছবি জাগিয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতে পুরুষোত্তমের চিত্রসুর শুনিবার সাধ রহিল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নাগরিকার ব্যথা

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

ঐ আসে—আসে নব উল্লাসে—
গগন ঘেরিয়া কালো মেঘ,
চপলা নিশান বজ্রে বিষাণ
ঝঞ্ঝায় তার গতিবেগ।

জাগে বনে বনে নব শিহরণ
কম্পন লাগে গাছে গাছে,
কাঁপে কালো জল অথই পাগল,
তালে তালে তা'র হিয়া নাচে।

শুনি গুরু গুরু চরণ-নূপুর
দুরু দুরু বুকে চেয়ে থাকি,
কদম্বকুল সুখে বিয়াকুল
কেতকী আকুল মেলে আঁখি ;

অরুণের রাগ রক্তিম ফাগ
ছিল আকাশের থরে থরে,
সজল বাদল—মেঘের কাজল
কে লেপিল বল্ তা'র 'পরে !

আজি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
হেরি' বাদলের এ কি খেলা !
বাতাসে জাগিল এ কি এ পরশ,
আলোকে ছায়ায় একি মেলা !

শুষ্ক যা কিছু মুঞ্জরি' ওঠে
আর্ত্ত বিহগ নাড়ে পাখা,
নিদাঘ-দীর্ণ তরুর বক্ষে
দোলে কুসুমিত নব শাখা ;

বাতায়ন-পথে আঘাত করে কে !
উদ্দাম বায়ু দেয় হানা,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বাদল-নূপুর
বাজায়ে কে করে আনাগোনা !

আর্দ্র মাটির সুবাসে মধুর
গন্ধ-বিধুর খোলা হাওয়া
মনে ক'রে দেয় ছেলেবেলাকার
সেই সে মেঘের পথ চাওয়া ;

মনে করে দেয় আকাশ ঘেরিয়া
সেই ঘন-ঘোর আয়োজনে,
সারা দিনমান শুনি সেই গান
সেই ঝম্ ঝম্ বরিষণে ;

অতীত কি এল ফিরিয়া আবার
অতীতের দিন লয়ে সাথে ?
বৃষ্টির ধারা গায়ে এসে পড়ে
চুপি চুপি ডাকে ইসারাতে ;

ওগো কালো মেঘ, সম্বর বেগ
ফিরাও ক্ষণেক কালো আঁখি,
ভুলেছ বন্ধু, পুরাণো প্রণয়
সে দিন স্মরণে আসে না কি ?

কিশোর কণ্ঠে তব আবাহন
উৎসুক-চোখে পথ চাওয়া,
বৃষ্টির সুরে বাজায়ে কাঁকণ
তালে তালে তারি গান গাওয়া ;

"আয় রে বৃষ্টি—আয় হেনে আয়—
আয় চারিদিকে,—আয় ঝেঁপে,
মাঠে হোক্ ধান—দেব গুয়া পান
শুষ্ক সরসী যাক্ ছেপে ;

আয় রে বৃষ্টি, ভাসায়ে সৃষ্টি
সারা ধরণীতে আয় নেমে—"
সে কি ভুলিবার? আজও সেই সুর
বুকে যে তড়িৎ যায় হেনে।

শ্রান্ত কি সখা, ক্লান্ত চরণ
শ্রান্তি তোমার হরিব কি?
দেব কি আসন কদম্বতলে,
ভৃঙ্গার জলে ভরিব কি?
ওগো সুগভীর মত্ত অধীর,
যেয়োনাক—প্রিয়, যেয়োনাক,
থামাও ক্ষণেক পথ-চলা তব
দয়া কর—দুটো কথা রাখ।

এস প্রাসাদের শিখরে আমার,
এস উপবনে-তরুচূড়ে,
সংশয়-বাধা-বন্ধন যত
উদ্দাম বায়ে যাক্ উড়ে;
তোমারি চরণপ্রান্তে বসিয়া
দৃষ্টি মিলায়ে কালো চোখে,
শুধু দুটো কথা শুধাব বন্ধু,
গত যা অতীত ছায়ালোকে;
সেই ছায়ালোক—আমারি ভূলোক
আজও কি দ্যুলোকে ভরে লাজে?
ঝরা ফুলে ছাওয়া সে পথে বন্ধু,
চলার রাগিণী আজো বাজে?
সেথা কি এখনো নব বেণুবন
শিহরি' শিহরি' উঠে কাঁপি?

গ্রামপ্রান্তের নদীটি কি প্রিয়,
আজও কূলে কূলে যায় ছাপি'?
ওগো সেই পথ! সেই বাঁকা পথ
গৃহছাড়া জনে যায় ডেকে?
রাখাল ছেলের সকরুণ বেণু
বাজে কি তেমনি থেকে থেকে?
স্মৃতির সাগর উছলিয়া উঠে
উথলি অশ্রু পারাবারে,
মুক্ত বিহগী বন্ধ হোল রে
এ কোন্ অন্ধ কারাগারে!
ওরে হেথা নাই—উৎসব নাই
নাই কলাপীর কেকা গাওয়া,
নৃত্য দোদুল ছন্দে নাচে না
নব বাদলের খোলা হাওয়া;
কই সেই মাঠ,—খোলা পথ বাট
এ যে দেয়ালের চাপাচুপি!
অন্তর মন খুলিতে পারে না
ভয়ে ভয়ে ফেরে চুপি চুপি।

আনো আজ তবে বিস্মৃত মধু
আনো ক্ষণিকের চপলতা,
এ ক'টি নিমেষে দাও ভ'রে দাও
হারানো দিনের কলকথা!
তোল তোল সুর করুণ মধুর
ছাপায়ে অশ্রু আঁখিকূলে,
সহজ সরল অতীত ছন্দে
উঠুক্ এ হিয়া দুলে দুলে!

শ্রীকল্পনা দেবী

যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস—

—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

('দিদি' রচয়িত্রী)

১

পথে

"জগত বাহিরে যমুনা পুলিনে কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন সমান পশিতেছে কানে ভেদিয়া নিশীথ রাশি।
উদাস জগতে যেতে চায় সেথা দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবস রজনী চলেছে রে তাই পুরাইতে মনোরথ।"

সুদূর বিস্তীর্ণ মাঠ দিগন্তে মিশিতেছে। তাহারই ক্রোড়ে বৃক্ষরচিত-সবুজ প্রাচীরের আভাস। মাঠের বুকে দূরে দূরে কচিৎ দুই একটা অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষ শ্রান্ত পথিককে ছায়া দিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের বুক চিরিয়া ধূলিময় মেঠো পথ যাহা বর্ষার জলে কর্দ্দমময় এবং নিদাঘে ধূলিপূর্ণ হইয়া থাকে সটিও সুদূরের সবুজ প্রাচীরের কোণে মিশিয়া গিয়াছে। সেই পথের উপর দিয়া একখানি গোযান মন্থর গতিতে চলিয়াছে। গাড়ী খানির দুই বা টাপ্পোরখানি চট্ মোড়া, পশ্চাৎ দিকে একটা বড় ট্রাঙ্ক দড়ি দিয়া গাড়ীর-সঙ্গে বাঁধা। সম্মুখে বৈশাখরৌদ্র-নিবারণে কথঞ্চিৎ চেষ্টিত মাথালি মাথায় গাড়োয়ান নারিকেলের ছোবড়া-পূর্ণ কলিকাটি দুই হাতে ধরিয়া তাহার সেই প্রচণ্ড ধূম গাঢ়ভাবে পান করিতে করিতে 'ধূম পান' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া ও এক-একবার নিষ্ঠীবন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 'আরে হ্যাদে—আরে ডাঁ ডাঁ—আরে বাঁ'—শব্দে যুগল বলীবর্দ্দকে চালিত করিতেছে। গাড়ীর পার্শ্বে পার্শ্বে একজন 'পাইক' গোছের লোক, বগলে একগাছা প্রকাণ্ড লাঠি, রৌদ্রের ভয়ে সেও ছাতা মুড়ি দিয়া গাড়োয়ানের হাত হইতে কলিকা লইয়া মাঝে মাঝে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছিল এবং ধূমপূর্ণ মুখে বন্ধুর সাহায্যার্থে গরুর উদ্দেশে "আরে এ গরু খে-এ-তে পারে গরু লড়তে পারে না ক্যানে" ইতি মন্তব্যে চালকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তখনো বেলা পড়ে নাই, মাঠে রৌদ্রের তেজ প্রখর। সহসা পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা চকিত হইয়া উঠিল। কালবৈশাখী তাহার জয়ধ্বজা তুলিয়া বেগে অগ্রসর হইতেছে। গাড়ীর ভিতরে বিছানা পাতা, একটি অল্প বয়সী মেয়ে একখানা বই মুখের কাছে ধরিয়া ও পাশে কয়েকখানা বই খাতাপত্র পেন্সিল ইত্যাদি লইয়া ভিতরে শুইয়াছিল, তাহার পায়ের কাছে একটি দাসীর মত স্ত্রীলোক বসিয়া গরুর গাড়ীর চলনের দোলনের তালে তালে ঢুলিতেছিল। সহসা গাড়ীর গতিবৃদ্ধির হাঁচ্‌কা টানে এবং পুরুষ দুইজনের ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে তাহারা সচকিত হইয়া চাহিতেই দেখিল সূর্য্যের আলো নিভিয়া গিয়াছে, কপিশ বর্ণ মেঘ ঝটিকার আভাস তুলিয়া পশ্চিম হইতে গগনাঙ্গনে ছুটিয়া আসিতেছে। গ্রাম বহুদূরে, আশ্রয়ের কোন আশা নাই, তথাপি গাড়োয়ান প্রাণপণে বলদদের হাঁকাইয়া চলিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! হু হু শব্দে প্রচণ্ড বেগে ঝড় আসিয়া পড়িল। বাধাবন্ধ-হীন উন্মুক্ত প্রান্তরে সে বেগ যে কিরূপ ভীষণ তাহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন কাহারো বোঝা সম্ভব নয়। গরুর গাড়ীখানা সেই প্রবল ধাক্কায় উল্টাইয়া পড়িবার মত হইতেই বলদেরা ঘাড়ের 'জোয়াল' ফেলিয়া দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বায়ুর প্রহারে তাহাদের আর এক পা অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে নিকষ-কালো মেঘের একটা প্রকাণ্ড ছাতার তলায় সমস্ত মাঠটা দাঁড়াইয়া যেন ভীত বালকের মত কাঁপিতে লাগিল। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ প্রবল ঝাপটার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, বাতাসের গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ শব্দের ঘূর্ণায় গাড়ীখানা পাছে উড়িয়া উল্টাইয়া পড়িয়া যায় এই ভয়ে গাড়োয়ান এবং পাইক ব্যাচারা নিজেদের কষ্ট তুচ্ছ করিয়া গাড়ীর মুখের উপরে চাপিয়া বসিল। বৃষ্টি বা ঝড় হইতে সাধ্যমত আত্মরক্ষা

করিবার ইচ্ছারও তখন আর তাহাদের উপায় রহিল না।

ঘণ্টা খানেক এইরূপে প্রকৃতি ও মানুষকে নাস্তানাবুদ্ করিয়া ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইল এবং কালবৈশাখী মেঘের অন্ধকারটাও বৃষ্টিধারায় যেন ধুইয়া গিয়া চারিদিক ফর্সা হইয়া আসিতে লাগিল। পথিকেরা তখন নিজেদের গাত্র-বস্ত্র যথাসাধ্য নিংড়াইয়া শুখাইবার উদ্দেশ্যে দুই একখানা 'ছই'য়ের গায়ে মেলিয়া দিয়া দুই একখানা নিজেদের পশ্চাতেও পালের মত করিয়া উড়াইয়া লইয়া স্থল-গামী নৌকার মত আবার অগ্রসর হইল। মুখে তখন 'দেবতার' উদ্দেশ্যে অজস্র গালাগালি; এতক্ষণ বেচারীদের এটুকুরও সাবকাশ ছিল না।

বৃষ্টি থামিয়া গেল, ক্ষণস্থায়ী মেঘ ঝড়ের আগে আগে উড়িয়া যাওয়ায় চরাচর আবার অপরাহ্ণ সূর্য্যের আলোকে হাসিয়া উঠিল। প্রবল দুঃখের পর সুখের হাসির মত সে হাসি বড় শোভাময়। গাছে পাতার আগায় আগায় জল, পৃথিবীর বুকের ক্ষতে জলের ধারা কোথাও কল্ কল্ করিয়া ছুটিতেছে, ঘাসের বনে চোখের জলের মতই তাহারা চক্ চক্ ছল্ ছল্ করিতেছে, গাছ পাতার ধূলি-মলিনতা ধুইয়া গিয়া নব পল্লবের শ্যাম শোভা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ীর ভিতরের মেয়ে দুটির সে সময়ে সেই সিক্ত শয্যায় বোধ হয় আর গোযানের মধ্যে থাকিতে সাধ্য হইল না; সেই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে তাহারা নামিয়া পড়িল। গাড়ী পিছনে দূরে আসিতে লাগিল, আর তাহারা ঘাসের জলে পা দিয়া ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে সেই উজ্জ্বল হরিৎবসনা প্রকৃতির পানে চাহিয়া গল্প করিতে করিতে চলিল। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল—সন্ধ্যায় গ্রামের নিকটস্থ বাঁধা 'সরানে' গাড়ী উঠিলে তখন মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল। সম্মুখের গ্রামে রাত্রের আহারাদি সম্পন্ন করিতে এবং গভীর রাত্রির খানিকটা লোকালয়ের নিকটে কাটাইবার জন্য তাহাদের গ্রামে এখন কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইতে হইবে। প্রহর খানেক রাত্রি হইতেই তাহারা গ্রাম পাইল এবং বাজারের দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।

রাত্রি শেষ প্রহরে পৌছিলেও তখনো ফর্সা হয় নাই, সুপ্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে কুকুরের দল চলন্ত গরুর গাড়ীর চাকার শব্দে সন্দিগ্ধ হইয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। শৃগালের দল রাত্রি শেষ ঘোষণা করিয়া নীরব হইল। দূরে কোথায় একটা 'ফেউ' ডাকিতেছে কিন্তু গ্রামের গরু বাছুরের সেজন্য কোন চাঞ্চল্য নাই, নির্ভয়ে তাহারা পথেই শুইয়া আছে। গ্রামস্থ পুরুষেরাও কেহ কেহ স্বচ্ছন্দে বাহিরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, অবশ্য একক নহে, প্রায় স্থানেই অন্ততঃ দুই তিন জনে একস্থানে শুইয়া আছে; তাদের নিকটে এক একটি আলো এবং হাতের কাছে এক একটা লাঠি। সহরবাসী পথিকেরা একটু শঙ্কিত ভাবেই পথ অতিবাহন করিতেছিল। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িতেই পূর্ব্বাকাশ ফর্সা হইয়া আসিল। শুকতারা সম্মুখে দপ্ দপ্ করিতেছে, 'ফেউ' ডাকার তবুও বিরাম নাই, কিন্তু তখন আর কাহারো বুক দুর্ দুর্ করিতেছে না। আলোক-রাজের আগমন সূচনাতেই ভীতির জড়তা যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু অবাধ গতিতে মাঠের মধ্যে ভাসিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে তরুতলা বন ঝোপ-ঝাড় সব একসঙ্গে দুলিয়া নাচিয়া উঠিল। পাখীর কলকণ্ঠে প্রভাতী ঘোষণা দিক্ হইতে দিক্প্রান্তে বাজিতে লাগিল। মাঠের মধ্যে নিশাচর ছোট খাটো জীব কোথাও এক একটা খেঁক্শেয়ালি এইবার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিবে কিনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যেন ভাবিতেছে। পূর্ব্বাকাশ মৃদু গোলাপী হইতে ক্রমে ঘন লোহিতবর্ণ—সূর্য্যোদয় হইতে আর দেরী নাই, চরাচর সুন্দর সুপ্রকাশিত। গোযানের যাত্রিণীরা আবার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া দিক্প্রান্তে প্রকাণ্ড রাঙা থালার মত নবোদিত সূর্য্যের পানে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া পথ চলিতে লাগিল।

বেলা প্ররোধিক হইলে আবার তাহারা একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একজন গৃহস্থ দোকানির দোকানের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইতেই গাড়ীর সম্মুখে বালক বালিকার ভিড় লাগিয়া গেল। তাহারা জানে যখন 'ছাপ্পোর' ঘেরা গাড়ী এবং সম্মুখে ঈষৎ পর্দ্দা তখন নিশ্চয়ই ভিতরে বৌ আছে, এখনি রঙিন্ বস্ত্র এবং মলের শব্দের সঙ্গে টুক্‌টুকে

একখানি মুখ 'ছই'য়ের ভিতর হইতে উঁকি দিবে। যাত্রিণী দুইটি নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নানাদি সারিয়া লইবার জন্য নামিলে বালিকারা একটু ক্ষুণ্ণই হইল, তথাপি সঙ্গ ছাড়িল না; তাহাদের স্নান এবং পাইকটির দোকানির একটা ঘর লেপা-পোঁছা ও রন্ধনাদির ব্যবস্থার জন্য পোঁটলা পুঁটলি টানাটানি, দোকান হইতে সওদা খরিদ প্রভৃতি সস্পৃহ নয়নে দেখিতে লাগিল। দোকানে যাহা পাওয়া গেল না তাহা তাহারা নিজেদের তল্পী হইতে বাহির করিল। মেয়েরা সেই নানা অসুবিধার মধ্যে কুটিয়া বাছিয়া রান্না চড়াইয়া দিতে দিতে দোকানির স্ত্রীকন্যাদিগের সহিত দিব্য গল্প জমাইয়া তুলিল। দর্শক বালক বালিকারাও ফল মিষ্ট প্রভৃতি কিছু কিছু উপহার পাইয়া তৃপ্ত হইল। খাইয়া ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার যখন তাহারা রওনা হইল তখন বেলা তৃতীয় প্রহরের নিকট পৌঁছিয়াছে। গত বৈকালের ঝড়-জলের কথা তখন আর তাহাদের মনে নাই। তাহারা যে পথ চলার পথিক, তাহাদের যে চলিতেই হইবে। সূর্য্য যখন অস্তোন্মুখ, তখন এই পথিকেরা একটা ছোট খাটো 'দহ' পার হইতেছিল। তাহার নাম 'পাগ্‌লা দহ'। খেয়া নৌকায় গরুর গাড়ী মানুষ সবই একসঙ্গে পার হইতেছে। দহের জলের মাঝে ও দুধারের ঘন বনের মাথায় সূর্য্যের শেষ রশ্মির আভা তখন চিক্ চিক্ ঝিক্ ঝিক্ করিয়া হাসিতেছিল। দূরে পাগলা চণ্ডীর ভগ্ন মন্দিরের ঈষৎ আভাস, প্রবাদ তাঁহার একশত আট বাঘ এই দহে রাত্রে জল পান করিতে আসে! ক্ষুদ্র দহটি দুধারের ঘন বন ও তাহার কাজল-কালো গভীর জলে দর্শকের মনে একটি গাম্ভীর্য্য সম্ভ্রমই আনিয়া দিতেছিল। দিনদেবও তাঁহার দিনের খেয়ায় পার হইয়া অস্তাচলের পথিক হইলেন—যাত্রীদের নৌকাও পরপারে ভিড়িল। গ্রামের পথ তখন গোধূলি সমাচ্ছন্ন, 'হাম্বা' হৈ হৈ শব্দ করিতে করিতে গোপালের সঙ্গে রাখালের দল ঘরের পানে চলিয়াছে। গ্রাম্য বধূরা কলসী কাঁখে জল লইয়া যাইতে যাইতে এই পথিক কয়টির পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে গেল।

দিনে রৌদ্রে পুড়িয়া রাত্রের অন্ধকারে গ্রামের বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপ্‌টা খাইয়া এই পথিকমন কিসের আকর্ষণে এমন করিয়া চলে? আমরা জানি শুধু চলারই আকর্ষণে, শুধু পথেরই মোহে। এই সব উন্মন পথিকধর্ম্মী মন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরে বসিয়া থাকিতে তো পারে না, তাই তাহারা মাঝে মাঝে এমনি করিয়া পথে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ভয়ের আভাসে তাহাদের বুক দুরু দুরু কাঁপে, অন্ধকারের পানে চাহিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া যায়, তবু তাহারই আকর্ষণে ঘরেও থাকিতে পারে না। তাই জলে ভিজিতে, রৌদ্রে পুড়িতে, অনাহারে অনিদ্রায় অনির্দ্দিষ্ট পথশ্রমেই তাহারা দিন কাটাইতে ভালবাসে। ঘরের সুখে স্নেহের বন্ধনে তাহাদের তৃপ্তি আসে না—দুঃখের স্বাদ সাধ করিয়া পাইতে চায়। পৃথিবীর এই সদা-চঞ্চল গতির সঙ্গে তাহাদেরও অন্তরের একটা গতিবেগ সর্ব্বদা তাহাদের পীড়া দেয়, তাই পথের বাহির হইবার ঝোঁক্ তাহাদের দুর্দ্দম! এমনি যাযাবরধর্ম্মী প্রাণের বাহিরের সঙ্গে বোধহয় নাড়ীরই একটা যোগ থাকে। এ পথ চলা হইতে তাহারা জীবনে মুক্তি পায় না—পথের সঙ্গেই তাহাদের আত্মার চিরবন্ধন! একঘরে বেশীদিন বাস করাও তাহাদের পক্ষে তাই সম্ভব হয় না। পথে বাসের মতই তাহাদের সে বাস! সমস্ত জীবন-যাত্রাটাই তাহাদের একটা পথ চলা! তার কিছুকাল বা ঘরে, কিছুকাল বা মাঠে পথে ঘাটে! কিছুদিন জনসমাজে, কিছুকাল বা নির্জ্জনে! এ বন্দনা তাহাদেরই প্রাণের উক্তি—

জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য-পথের পথিক
পথে চলার লহ নমস্কার!

২

গ্রামে

—"প্রভাত শিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণি নদী তীরে।"

নদীর নামটি জলাঙ্গী কিন্তু তার অঙ্গে জল বারো মাস বেশী থাকিত না; বর্ষাতেই কেবল সে পূর্ণতোয়া হইয়া উঠিত। গ্রামখানিও ঠিক্ নদীর উপরে নয়, অন্ততঃ আধ মাইল দূরে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খরতাপে যখন গ্রামের বহু-দিনের অসংস্কৃত পুষ্করিণী কয়টি শষ্পমলিনা এবং গো মহিষ ও পল্লীবাসীদেরই ক্ষার কাচার অত্যাচারে পঙ্কিলদেহা হইয়া

পড়িত তখনি সেই নদীর সঙ্গে গ্রামবাসীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইত।

সেদিন পূর্ব্ব আকাশে তখন কেবল মাত্র শুক তারা জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। তখনো আকাশের গায়ে রাঙা রঙের ছোপ ধরে নাই, একটা পাণ্ডুর আভা কেবল তার সর্ব্বাঙ্গে আভাস দিতেছে মাত্র। তখনো গ্রামের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ঝিঙে তার জাগরণের সাড়ায় বনকে সচকিত করিয়া তোলে নাই। রায়েদের বহুস্থানে-ভগ্ন পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ীটার কোন একটা ইটের ফাটলে একটি দোয়েল-দম্পতী বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। তাহারাই কেবল উষার সেই পিঙ্গল আভাটুকুকে অভিবাদন করিয়া দুই একবার শিষ দিয়াই চুপ করিয়া গেল। সেই শিষে কিন্তু বাড়ীটার অন্ধকার পুরীর মধ্যে একটি ঘর হইতে একটু সাড়া জাগিয়া উঠিল। "মাসিমা, মাসিমা, উঠুন; আর রাত নেই।" "দুর্গা দুর্গা, ব্রহ্মা মুরারী স্ত্রিপুরান্তকারী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠের শেষে "সুপ্রভাত সুপ্রভাত" শব্দ করিতে করিতে একজন বর্ষীয়সী সেই পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকার দালানের বন 'গুল-মেক্' বসানো সেকেলে ভারি দরজাটা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যে এখনো অন্ধকার। এ পাগলের মেয়ের দেখ্‌ছি নদীর স্নানের জন্যে সারারাত ঘুমই নেই। এই অন্ধকারে কি বেরুতে আছে বাছা? শোও, আরও একটু শোও!" নিজে প্রাতরুত্থানের মন্ত্রগুলা পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—সেগুলাকে আর বাতিল করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; বলিলেন, "আমি হাত মুখ ধুয়ে একটু জপে বসি।" "না মাসিমা, মন্দাদিদিকে ওবাড়ীর দিদিদের ডাকাডাকি করতেই দেখবেন এ ঘোরটুকু কেটে যাবে। বেলা হলে রোদ পেতে হবে আসবার সময়,' তার চেয়ে এমনি ঘোরে ঘোরে গিয়ে সকাল সকাল ফেরাই ভাল।" "এই অন্ধকারে আমি তো দোরে দোরে ডাকাডাকি করতে পারব না বাছা—"

"না, না, আপনি কেন, আমি ডাকি মাসিমা!"

"তোমায় কি একা এমন সময়ে বেরুতে দিতে পারি নাও তবে গামছা কাপড়গুলো ঠিক ক'রে নাও! একটা ঘটিও নিও—একটু জল আন্‌ব!"

"সব ঠিক করাই আছে" বলিতে বলিতে বৌ ছোট একটা কলসী ও কাপড় গামছা বাহির করিতেই মাসী শাশুড়ী একটু রাগের ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আবার কলসী নিচ্চ বাপু। তোমার ধরণ দেখে কে বলবে তুমি সহরের মেয়ে, তোমার বাবা একটা হোম্‌রা চোম্‌রা লোক? চিরকাল যেন তুমি কলসী নিয়েই জল এনে থাক! পুকুর থেকে না আন্‌লে নয় তাই নাহয় আন্‌লে, কিন্তু এই আসা যাওয়া এক ক্রোশ রাস্তা ভেঙে ভিজে কাপড় গামছা, আবার তার ওপর একটা কলসী—"

"আমার বেশ লাগে মাসিমা! সকলেই তো আনবে। ছোট্ট কলসী তো—"

"যা ইচ্ছা কর বাছা—হাতে ব্যথা হবে দেখো তখন—"

"মাসিমা, মাসিমা—ছোট বৌ—"

"ঐ রাধা ঠাকুরঝি ডাক্‌ছে, মাসিমা আপনি চণ্ডী মণ্ডপের দরজায় একটু বসুন ততক্ষণ,—আমি রাধা ঠাকুরঝির সঙ্গে এ বাড়ী ওবাড়ীর দিদিদের ডাকি।"

মাসিমা অপ্রসন্ন ভাবে ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রাধার সঙ্গে একা তোমার বেরিয়ে কাজ নেই—আমিও যাচ্চি চল--" ব'লে একটু উচ্চ সুরে হাঁকিলেন, "তুই ততক্ষণ আর সবাইকে ডাক রাধা—আমি এই বেরুচ্চি বৌমাকে নিয়ে।"

যখন এই স্নানার্থিনীর দলটি গ্রামের গাছ পালার ঝোপ ঝাপ ছাড়িয়া খোলামাঠে বাহির হইয়া পড়িল তখন পূর্ব্ব আকাশ লালে লাল হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে অজস্র পাখীর ডাক, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস কখনো ধীরে কখনো ব্যস্ত হইয়া মাঠের ছোট ছোট ঝোপে ঝাপে কোথায় কোন্ ফুল ফুটিয়াছে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী

মেঘদূতে রমণী

শ্রীযুক্ত হরি সেন

এক যক্ষ যক্ষপতি কুবেরের পূজার ফুল যোগাইতে একদিন অযথা বিলম্ব করায় তিনি তাহাকে এক বৎসরের জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। সেই বিরহিত যক্ষ প্রায় আট মাস কাল জনক-তনয়া-স্নান-পবিত্র চিত্রকূট পর্ব্বতে (রামগিরি) বাস করিতেছিল; আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অবলাবিপ্রযুক্ত সেই কৃশতনু কামী নববর্ষার প্রথম মেঘ সন্দর্শনে বিরহিণী প্রিয়ার দুঃখ দূর করিবার জন্য কুঞ্জ-কুসুম অর্ঘ্যের দ্বারা সেই মেঘকে অভিনন্দিত করিয়া তাহাকে দূতরূপে প্রেরণ করিবার জন্য পথনির্দ্দেশ, অলকা-বর্ণন, আত্মপত্নীর পরিচয় প্রদান ও সমাচার নিবেদন করে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমর লেখনীর সাহায্যে অপূর্ব্ব মেঘদূত কাব্যে এই বার্ত্তাই সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়া বিরহদীর্ণ যক্ষের দীর্ঘশ্বাসকে চিরকালের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এই কাব্যে কোনও বিশেষ একটি চরিত্রেরই সম্যক্ পরিস্ফুটনের চেষ্টাও করা হয় নাই, যক্ষ-প্রিয়ার বিরহিত অবস্থার বর্ণনা ছাড়া আর কিছু ফোটেও নাই; কিন্তু শ্লোকে শ্লোকে কবির নারী-চরিত্রের প্রতি যে গভীর দৃষ্টি ও তৎসম্বন্ধে যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান আছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি নিপুণ লেখনীতে প্রতি শ্লোকে এক একটি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আর সেই সব চিত্রের মধ্য দিয়া সমগ্র নারী জাতির বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ বিকাশ ও সত্তা এমন সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে যে, সেই কাব্যের সমগ্র রসে বঞ্চিত হইতে হইলেও শুধু এই নারী-চরিত্র-বর্ণনের বিশেষত্বের আলোচনা করিলেও নেহাত কম আনন্দ পাওয়া যায় না।

কবি এই কাব্যে ত্রিজগতের নারীরই উল্লেখ করিয়াছেন,—দেবী, অপ্সরা ও মানবী; কিন্তু তিনি দেবী ও অপ্সরাকে যে মূর্ত্তিতে গঠিত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগকে অপর কোন সংজ্ঞায় না ফেলিলেও চলে। তিনি দেবীকে স্নান-রতা মানবী ও অপ্সরাকে বিরহিণী নারীর অধিক অন্য কোন মূর্ত্তিতে গঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই, অতএব আমরা তাহার আর ভিন্ন আলোচনা করিব না। বস্তুতঃ আমরা দেবী, দানবী বা অপ্সরার রূপ ও দোষগুণ অমানবীয় রূপে ব্যক্ত করিতে পারি না—মানবের রূপ ও দোষগুণের তারতম্যের দ্বারাই আমরা তাঁহাদের কল্পনা করি:—

"............আর পাব কোথা,
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"

নারীকে প্রধানতঃ আমরা দুই ভাবে পাই—

(১) সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে—মাতা, ভগ্নী, জায়া কন্যা প্রভৃতিরূপে।

(২) সমাজের আবেষ্টনের বাহিরে—বারবণিতা, গণিকা নর্ত্তকী ইত্যাদি ভাবে।

মেঘদূতের কবি এই দুই শ্রেণীর নারীরই বর্ণনা করিয়াছেন বহুপ্রকার ভেদের মধ্য দিয়া; এবং সামান্য ইঙ্গিতে তিনি নানা শ্রেণীর নারীর মধ্যে বিশেষ ও গভীর পার্থক্য দেখাইতেও কম দক্ষতা প্রকাশ করেন নাই। সাধারণতঃ গ্রাম সারল্যের আবাস, আর সহরের লোক উন্নত ও সভ্যতর হয়, তাই "সহুরে" ও গ্রাম্য লোকের মধ্যে যথেষ্ট তফাত দেখা যায়; কবি এক সামান্য ইঙ্গিতেই ইহার পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ।
প্রীতি স্নিগ্ধৈ র্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ ॥১।১৬

—"কৃষি, কর্ম্মের ফল তোমারই আয়ত্ত; এই জন্য গ্রাম্য-নারীগণ প্রীতিস্নিগ্ধ এবং ভ্রূভঙ্গ কটাক্ষপাত ইত্যাদি বিলাস-

শূন্য, সরল দৃষ্টিপাতের দ্বারা তোমাকে অবলোকন করিবে।"

আবার সহরের সেরা রাজধানী উজ্জয়িনীর কথায় বলিতেছে,

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতো হসি ॥১।২৮

—"তথায় (উজ্জয়িনীতে) পৌরনারীগণের বিলাসহেতু সন্ত্রস্ত চঞ্চলাপাঙ্গনয়নে যদি তোমার রতি না হয় তাহা হইলে তোমার চক্ষু বৃথা।"

কবি সামান্য এই ভ্রূভঙ্গে বৈষম্য দেখাইয়াই জনপদবধূ ও পৌরাঙ্গনার প্রভেদের ছবি আঁকিয়াছেন। এইভাবে তিনি সমস্ত শ্রেণীর নারীর কথাই মেঘদূতে উত্থাপন করিয়াছেন।

(১) সিদ্ধাঙ্গনা—মল্লিনাথের মতে ইহারা দেবযোনি-বিশেষের অঙ্গনা বা স্ত্রী। এই দেবযোনিগণ পর্ব্বত-শৃঙ্গে অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির প্রয়াসে রত থাকিতেন। ইঁহারা সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। জনপদবধূগণ সরল হইলেও কৃষিফল মেঘের আয়ত্তে জানিয়াই সোৎসুকদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু সিদ্ধাঙ্গনারা এত সরল যে মেঘখণ্ডকে আকাশে উড়িতে দেখিয়াই (কোনও উপকার বা অপকারের কথা চিন্তা না করিয়া)—বাতাসে পাহাড়ের চূড়া উড়িয়া যাইতেছে ধারণা করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া চকিতভাবে তাহার গমনোদ্যম অবলোকন করিতে থাকে। সিদ্ধগণ যখন জলবিন্দুগ্রহণচতুর চাতকগণকে অবলোকন করে এবং বলাকাশ্রেণী গণনা করে—তখন মেঘধ্বনি শুনিয়া ভয়ে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে।

(২) বনচরবধূ—ইহারা কিরাত, অনার্য্য, আদিম ভারতীয় রমণী। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে নর্ম্মদানদীর দক্ষিণে ইহাদের অবস্থান। কবি ইহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মাত্র একটি শব্দেই প্রকাশ করিয়াছেন—"ভুক্ত কুঞ্জে", অধিক বর্ণনার প্রয়োজন হয় নাই।

(৩) জনপদবধূ—গ্রাম্য-বালিকা। এককালে গ্রামেই ছিল অধিকাংশ লোকের আবাস, হয়তো সেইজন্যই জনপদ-বধূগণ সংখ্যায় অন্যান্য অপেক্ষা অধিক ছিলেন; ইঁহারা ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ, সরল এবং প্রীতিস্নিগ্ধ; কবি মাত্র একটি শ্লোকেই এই গ্রাম্যললনাগণের যে চিত্র আঁকিলেন, নাগরিকার শত চিত্রও তাহার মত সুন্দর নয়।

(৪) পৌরাঙ্গনা—কবি নগরবাসিনী বা পৌরাঙ্গনার চিত্র আঁকিয়াছেন তিনটি—(১) উজ্জয়িনীর (২) দশার্ণের ও (৩) অলকার। উজ্জয়িনীর প্রাসাদের ছাদে যে পৌরাঙ্গনাগণ বিহার করে, যে ব্যক্তি তাহাদের বিলাসচপল লোলাপাঙ্গ উপভোগ করে না তাহার চক্ষু বৃথা—সেই পুরুষের চক্ষু প্রকৃত সুখ উপভোগ করে নাই। বিদিশা নামে বিশ্রুত দশার্ণের রাজধানীর পৌরাঙ্গনাগণ বিলোল কটাক্ষপাতে বাক্য ছাড়াও সংবাদপ্রেরণে দক্ষ ছিলেন।

পৌরাঙ্গনাগণ ধূপের ধোঁয়ায় কেশসংস্কার করেন, ফুলে প্রাসাদ সুসজ্জিত ও সুবাসিত করেন। চন্দনের পত্রলেখা বক্ষে ধারণ করেন এবং অলক্তকরাগে পদাঙ্কিত করেন।

অলকা পৃথিবীর উচ্চে অবস্থান করে; তাহার কথা পরে আলোচনা করিব।

(৫) পথিকবনিতা—কার্য্যব্যপদেশে অথবা বেড়াইবার জন্য যে সমস্ত গৃহী ব্যক্তি আবাসে পত্নী রাখিয়া বিদেশে না যাইয়া পারেন নাই, তাহারা বিশেষ কোন দুর্ঘটনা না হইলে অথবা অন্য কোন কারণে আসিতে অসমর্থ না হইলে বর্ষায় পত্নীর সহিত মিলিত না হইয়া পারিতেন না। প্রোষিতভর্তৃকার বিরহ অন্যান্য ঋতুতে দুঃসহ হইলেও বর্ষার বর্ষণের দিনের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তখন বিরহ অসহনীয় হইয়া পড়ে। তাই এই কালের কবিও বর্ষার বর্ষণ দর্শনে বিরহব্যাকুলা পাগলিনী রাধিকার প্রেমাভিসারের কথা স্মরণ করেন। প্রোষিতভর্তৃকা গ্রীষ্মঋতুর অবসানে প্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে ব্যগ্র হয়; মেঘের আবির্ভাবে তাহাদের সেই মিলনের দিন আসন্ন দেখিয়া, "স্বামী আসিবেন" এই প্রত্যয়ে আশ্বস্ত হইয়া দৃষ্টিপ্রসারণের জন্য কুন্তলরাজি উঠাইয়া ধরিয়া তাহাকে হৃষ্টমনে অভিনন্দিত করে, আর মনে মনে মিলনের মধুর কল্পনায় আবিষ্ট হয়।

যক্ষ-বনিতা স্বয়ং প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিণী; তাহারই কথায় এই কাব্যের অনেকাংশ পূর্ণ, সুতরাং বিরহিণী বর্ণনায় ব্যাপৃত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুতির উপায় করার প্রয়োজন নাই।

এই কাব্য হইতে মোটামুটি বুঝা যায়—একপত্নী, স্বামী-সোহাগিনী হিন্দু ললনা একবেণী ধারণ করিতেন, চুলে তৈল দিতেন না, কোনপ্রকার প্রসাধনের ও বিলাসের উপকরণ ব্যবহার করিতেন না, এমন কি উভয়ের সুখের দিনের স্মৃতি-বিজড়িত শয্যা অবধি ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতেন। সময় কাটাইবার জন্য ও চিত্তবিনোদনের জন্য পালিত ময়ূরীকে করতালি দিয়া দিয়া নাচাইতেন, সারীর নিকট ভর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, বীণাযোগে স্বামীর নামযুক্ত গান গাহিতেন, চিত্রে স্বামীকে স্থাপনা করিয়া ধ্যান করিতেন—এই সমস্তই বিরহিণী নারীর প্রিয়-কার্য্য।

(৩) পুষ্পলাবী বা মালাকার গৃহিণী—ফুল সকল কালে সমস্ত যুগে সৌন্দর্য্যপ্রিয়গণের মনোহরণ করে। ফুল পূজার জন্য যত না দেওয়া হয়, অনেক বেশী দেওয়া হয় বিলাসীর বিলাস-ব্যসনে ও প্রণয়িণীর আনন্দবর্দ্ধনে। সেই সময়ে গ্রামে, নগরে এবং নগরোপকণ্ঠে বহু পুষ্পোদ্যান হয়তো নির্ম্মিত হইত এবং মালিনীগণ কঠোর পরিশ্রমে পুষ্প চয়ন করিয়া সুখী ও ভোগীকে যোগাইয়া দিত। সেই যক্ষের মুখ দিয়া মহাকবি কালিদাস এই সব বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন; সে নিজেও প্রায় এই শ্রেণীরই একজন (অলকার কুবেরের পূজার ফুল যোগাইত), অতএব যদি ইহাদের উপর তাহার পক্ষপাতিত্ব থাকিয়াও থাকে তবে তাহা দোষের হইতে পারে না। আমরা পরে বিশেষ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব কবি এই কাব্যে কোন্ শ্রেণীর রমণীর কথা উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের কোন্ বিশেষ বৃত্তির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। এই পুষ্পলাবীগণের বর্ণনায় কবি ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহারা কঠোরকর্ম্মা ও অক্লান্ত শ্রমপরায়ণা। সারাদিন কঠোর-তাপ রৌদ্রের মধ্যে ফুলচয়ন করায় ইহাদের দেহ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়াছিল এবং তাহা মুছিতে মুছিতে কর্ণোৎপলও মলিন হইয়া গিয়াছিল।

এই পর্য্যন্ত আমরা সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে বদ্ধ [illegible]গণের কথাই উল্লেখ করিলাম, এইবার অপর শ্রেণীর [illegible] উল্লেখ করিব। বর্ত্তমানকালে বারবণিতাগণ সমাজে [illegible] ও ঘৃণ্য; কিন্তু মনে হয় পুরাকালে ঠিক সেই রকম [illegible]ভাব ছিল না। কাদম্বরী প্রভৃতিতে পাওয়া যায় বেশ্যাগণ রাজাদের স্নানাদির আয়োজনের জন্য নিযুক্ত হইত, মৃচ্ছকটিকে দেখা যায় নর্ত্তকী বসন্তসেনার সহিত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'ন।

এই কাব্যে দুই শ্রেণীর উল্লেখ আছে :—

(১) পণ্যস্ত্রী—নিম্ন গিরির গুহাতে নাগরিকগণ এই পণ্যস্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইতেন—তথা হইতে উত্থিত পরিমলঘ্রাণ তাহাদের উৎকট যৌবনের পরিচয় দিত।

(২) বেশ্যা—বলিতে যে অর্থ এখন বুঝা যায় পণ্যস্ত্রী বোধ হয় তাহার দ্যোতক। মেঘদূতে বেশ্যা বলিতে আধুনিক হিন্দুমন্দিরের সেবাদাসী বা দেবদাসীর মত এক শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বুঝায়; ইহারা মহাকালের মন্দিরে নৃত্য করিত, তালসংযোগে চরণ ন্যাস করায় ইহারা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন বর্ষাগ্রবিন্দু পতিত হইলে নখক্ষতে সুখানুভব করিত এবং মেঘকে মধুকর-শ্রেণী-দীর্ঘ কটাক্ষে আপ্যায়িত করিত।

অলকা যক্ষগণের আবাসভূমি, বিলাসিতার চরম স্থল। প্রালেয়াদ্রি অতিক্রম করিয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের মধ্য দিয়া নির্গমন করিয়া উত্তর দিকে গেলে মানস সরোবর এবং তথা হইতে কৈলাসে উপনীত হইলে তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিত বিগলদ্গঙ্গা অলকাকে দেখা যায়। এই অলকায়—

(১) ললিতবনিতাগণ—বিবিধ চিত্রসমন্বিত, মুরজধ্বনি-নিনাদিত, মণিকুট্টমালঙ্কৃত, মেঘস্পর্শী সপ্তভূমিক প্রাসাদে অবস্থান করে; কল্পবৃক্ষপ্রসূত বিচিত্র বস্ত্র, নয়ন বিভ্রমাদেশ-দক্ষ মধু, সকিশলয় পুষ্প ও চরণকমল ন্যাসযোগ্য লাক্ষারাগ ব্যবহার করে।

(২) কন্যাগণ—মন্দাকিনীর তটপ্রান্তে মন্দার বৃক্ষের ছায়ায় সুবর্ণ বালুকায় লুক্কায়িত মণি সন্ধান করিয়া ক্রীড়া করে।

এই মণিগোলক বা স্বর্ণ গোলক লইয়া কুমারীগণের খেলা এই কাব্যেই পাওয়া যায় না, ভাসের বাসবদত্তাতেও দেখা যায় কুমারা বসন্তসেনা সখি ও পরিচারিকাবেশী

বাসবদত্তার সহিত সুবর্ণগোলাক-নিক্ষেপ-ক্রীড়ায় ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়াছিলেন।

(৩) বধূগণ—ষড়্ঋতুর যুগাপৎ আবর্ত্তনের ফলে হস্তে লীলাকমল, অলকে বালকুন্দকোরক, কেশবন্ধে কুরুবক, কর্ণে মনোহর শিরীষ ও সীমন্তে নীপপুষ্প ধারণ করে এবং আননশ্রী লোধ্র রেণুদ্বারা পাণ্ডুর-বর্ণ-শোভিত করে।

(৪) উত্তমবনিতাগণ—গম্ভীর বাদ্যধ্বনিমুখর মণি-নির্ম্মিত প্রাসাদে যক্ষগণের কল্পতরুসম্ভূত মধুপানের সহায় হয় এবং প্রিয়ের সর্ব্বকার সুখের বিধান করে।

(৫) বিবুধবনিতাপরমুখ্যা বা অপ্সরা বেশ্যাগণ—কুবেরের যশোগানশীল মধুরকণ্ঠ কিন্নরগণের সহিত বৈভ্রাজ্য নামক বাহ্যোদ্যানে বিহার করে। এবং

(৬) অভিসারিকাগণ—নিশাতে ভীতিকম্পিত দেহে চঞ্চল হৃদয়ে অভিসারে গমন করে। গমনের উৎকম্পনে অলক হইতে মন্দারভ্রষ্ট হয় ও পত্রচ্ছেদ পতিত হয়, কর্ণ-কম্পনে স্বর্ণকমল পতিত হয়, দ্রুত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের ফলে স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে, গলার হার ছিন্ন হয় এবং মুক্তাজাল সমস্ত পথে বিকীর্ণ হইয়া তাহার গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার অপূর্ব্ব মেঘদূত কাব্যে যে সমস্ত শ্রেণীর নারীর বর্ণনা করিয়াছেন তাহার একটা অতি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেওয়া হইল। এইবার তিনি এই কাব্যে নারীর কোনো বিশেষত্বের দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন কি না, এবং তাঁহার মতে নারীর সৌন্দর্য্য কি ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য আলোচনা করিব। আলোচনার পূর্ব্বে একটা বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই কাব্যের যিনি দূত, মেঘ—তিনি আকাশবিহারী, সকলের মাথার উপর দিয়া অতি ঊর্দ্ধপথে তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। উপর হইতে নীচের দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখা যায় এই কাব্যে সেইরূপ bird's eye viewরই বর্ণনা আছে। তাই প্রকৃতির দৃশ্য ও রমণীর রূপদর্শনে একদেশী ভাবের অভাব দেখা যায় না। অন্যত্র ইহার বিশদ্ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

কবি নারীর যে সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি বালিকা, কিশোরী ও বৃদ্ধার কথা ভুলেও বলেন নাই, ইহার একটিমাত্র ব্যত্যয় (exception) মনে করা যাইতে পারে অলকা বর্ণনার কালে; সেখানে তিনি "কন্যার" কথা বলিয়াছেন, কন্যা বলিতে অবিবাহিতা নারীকে বুঝা যায় সন্দেহ নাই, ইহারা আবার ক্রীড়ারতও। তথাপি ইহারা যে বালিকা বা কিশোরী নয়, কবি সে ইঙ্গিতও করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি শুধু বিবাহিতা যুবতীদের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করেন নাই তিনি অবিবাহিতা কন্যার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এই কন্যাগণ "অমর প্রার্থিতাঃ"—অতএব ইহারা অনুদ্ভিন্নযৌবনা বা কুরূপা নয়। অভিসারিকা নারী বিবাহিতাই হউক অবিবাহিতাই হউক, সমাজের বাহিরেরই হউক আর সমাজ-চ্যুতাই হউক—তাহাদের নিয়োগই প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা "ধনি অলপ বয়সি বালা" নয়, তাহাদের দেহেও "যৌবন লাবনি" দেখা দিয়াছে এবং মনের উদ্যানেও প্রেম-ফুলের বিকাশ হইয়াছে।

কবি আবার ইহাদের সমস্ত সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করেন নাই। কেহ বা বিলাসী, কেহ বা বিলাসবিহীন কটাক্ষের অধিকারিণী, কেহ চটুল নয়নের বিলোল কটাক্ষ ঈক্ষণে কামীজনের হৃদয়হারিণী, কেহ "ধূপের ধোঁয়ায়" কেশ-সংস্কাররতা, কেহ অলক্তকরঞ্জিত চরণচারিণী, কেহ বা ভবনশিখিনীকে করতালি যোগে নৃত্য করাইতে ব্যস্ত, কেহ বা নানা ফুলে আপনার বিলাসবেশের আয়োজনে রত। কবি কল্যাণী গৃহিণীর বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যে গুণ থাকিলে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে", যে কাজে রত হইয়া তাঁহারা সংসারের বধূ, ভার্য্যা, মাতা, ভগিনী বা কন্যারূপে সমস্ত সুখের বিধায়িনী, এবং যে জন্য তাঁহারা লক্ষ্মী ও কল্যাণী, বিশ্বের জননী আর স্বর্গের ঈশ্বরী, তার কোন আভাস কবি দেন নাই—অথবা দিতে পারেন নাই পূর্ব্বোক্ত কারণে। গৃহিণী গৃহকর্ম্মে রতা নহেন জীবনের গুরু প্রয়োজনে নারী যে কোন সহায় হইতে পারে তাহার কথা কবি বলেন না। কবি বলেন কোন্ নারী কতখানি বিলাসী, কতখানি ভোগী এবং কাহার কতখানি সৌন্দর্য্যবিস্তারের ও প্রকাশের

ক্ষমতা আছে। গৃহকর্ম্মনিরতা গৃহিণীর রূপ দর্শনীয় কিনা, জীবনের নিত্য প্রয়োজনে নারী পুরুষের কতখানি সহায়তা করে বা করিতে পারে তার কোন কথা ইহাতে নাই। ইহারও ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র এক জায়গায়। মাত্র এক জায়গায় কবি দেখাইয়াছেন যে, নারী তাহার আপন বৃত্তিতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাও নারীসুলভ কোন কার্য্য না হইতে পারে তবুও বৃত্তি তো বটে। পুষ্পলাবীগণ পুষ্পসংগ্রহে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিয়া স্বেদাপ্লুত-শরীর হইয়াছে এবং বারম্বার ঘাম মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে তাহাদের কর্ণোৎপল মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

কবি যে রমণীর এই একটিমাত্র দিকে জোর দিয়া সকল শ্রেণীর নারীর এইমাত্র সৌন্দর্য্যেরই প্রকাশ করিয়াছেন এইজন্য অথবা এইভাবে প্রকাশ করিতে করিতে পুষ্পলাবীগণকে হঠাৎ কঠোর শ্রমনিরতারূপে বিবৃত করিয়াছেন এই জন্যও তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারি না; ইহাতে বরং কবির বিচক্ষণতা ও দূর-দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কাব্যের নায়ক প্রিয়া-বিরহিত এক যক্ষ। যার যে স্থানে আঘাত তার সেই স্থানেই হাত থাকে, এই কাব্যের নায়কও তাহা হইতে রেহাই পাইতে পারেন না, অতএব এই অপূর্ণ-ভোগী যক্ষের মনে নারীর যে মূর্ত্তি উজ্জ্বলভাবে পরিকল্পিত হইবে তাহা এই রমণীমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। সে এই বিরত অবস্থায় শুধু তার স্ত্রীকেই বলিয়া পাঠায় না—

> ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলয়া
> মাত্মানং তে চরণ পতিতুং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
> অস্ত্রৈ স্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে * * ॥

—"ধাতুরাগের দ্বারা শিলাতলে প্রণয়াভিমানবতী তোমার চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজেকে তোমার চরণে পতিত, এইরূপ চিত্রিত করিতে যেই ইচ্ছা করি, তৎক্ষণাৎ মুহুঃ প্রবৃদ্ধ অশ্রুনিচয়ে আমার চক্ষু আবৃত হইয়া যায়।" নিজে প্রিয়ঙ্গু-লতায় তার সুকুমার তনুর তনিমা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে তার নয়নমহিমা, চন্দ্রে আননাভা, ময়ূরের বর্হভারে অলক-শোভা এবং ঈষদান্দোলিত নদীতরঙ্গে তার ভ্রূবিভ্রম অবলোকন করিয়া শোকসাগরে নিমজ্জিত হয় এবং বিশ্বের সকল নারী—তাহার স্ত্রী ভিন্ন—যৌবনের সকল সাধের পূর্ণ ভোগে রত আছে কল্পনা করিয়া আরও আকুল হইয়া উঠে। তারপরে যে কাজে নিজে সামান্য অনবধানতায় এই দারুণ রাহুগ্রাসে পড়িয়াছে, অপর কাহাকেও তো সেই একই ভুলের ফসল ফলাইয়া দুঃখে পতিত হইবার কল্পনা করিতে পারা সম্ভব নয়—তখন অপর সকলে এই কাজে সর্ব্বদা অবহিত থাকুক আর কেহ সেই দুঃখ না পায়, শত্রুও না—এই তো তার পক্ষে প্রার্থিত হওয়া স্বাভাবিক—সে যে স্বয়ং ভুক্তভোগী।

এই কাব্যে কবি নারীদের যে ভাব ও যে অবস্থা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় দেশ তখন সচ্ছলতায় পূর্ণ ছিল, শুধু অলকায় নয়, হয়তো ভারতেও শোকের অশ্রু ছিল না, ছিল শুধু—সুখের অশ্রু; আর শোক যদি থাকেও তাহা শুধু ক্ষণিক বিরহের, যার অন্তে দীর্ঘকালের পূর্ণ সুখের কল্পনা সেই বিচ্ছেদকেও সহনীয় করিয়া তুলিত; তখনকার "দুঁহু" বিচ্ছেদে থাকিয়াও মিলনের চিত্র কল্পনা করিয়া ও স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইত। জনপদবধূর সরল ও পবিত্র জীবনে প্রকৃতির সহিত নিরবচ্ছিন্ন বন্ধন ছিল, জননী বসুন্ধরা তাহার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল যোগাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার পরিধেয় বসন এবং তাহার অঙ্গরাগ ও ভূষণও তাহাকেই যোগাইতে হইত। সে লোধ্ররেণুর চূর্ণে মুখের আভা পাণ্ডুর করিত, কর্ণে শিরীষ পরিত, উৎপল পরিত, বেণীতে কুরুবক, অলকে বালকুন্দ, সীমন্তে নীপপুষ্প ধারণ করিত, হাতে লীলাকমল শোভা পাইত এবং পদেও পদ্ম বিরজিত থাকিত। নগরবাসিনী রমণী প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জ ছাড়িয়া কৃত্রিমতায় গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়াও একেবারে প্রকৃতির স্পর্শশূন্য হয় নাই। সে প্রাকৃত ভূষণের উপরে কিছু অপ্রাকৃত অলঙ্কারও ধারণ করে। মাথায় মুক্তার সিঁথি, সোনার পদ্ম, গলায় নানা মণিরত্নের হার, কর্ণে কুণ্ডল, হাতে নানা ধরণের বলয় ও কটিতেও রত্নবেষ্টনী। এই সমস্ত বর্ণনায় কবির অতিরঞ্জন আছে, অত্যুক্তিও আছে নিশ্চয়ই, তবুও এই হইতে যে একেবারেই সত্যের আভাস পাওয়া না যায় তাও নয়।

বলবে না। কোন একজন ছাত্র ক্লাসের একখানা বেঞ্চি ভেঙেচে—শিক্ষক এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে ভেঙেচে?' কোন ছাত্রই শাস্তির ভয়ে সত্য কথা বল্‌লে না। এখানে ছাত্রদের মিথ্যা কথা বলা (বা চুপ করে থাকা, যা মিথ্যা কথা বলারই সামিল) যে দোষার্হ তা নিশ্চিত। কিন্তু ধর একজন নিরীহ ভদ্রলোককে গুণ্ডায় তাড়া করেচে, ভদ্রলোক প্রাণের দায়ে আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়লেন; গুণ্ডারা পিঠ পিঠ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—'এইমাত্র এইরকম একজন লোক, কোন্‌দিকে গেল?' আমি যদি সত্য কথা বলি তা'হলে বলতে হয়, সে আমারই ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি তা না ব'লে মিথ্যা কথাই বল্লুম—'সে এইদিক দিয়ে ছুটে পালাল।' মিথ্যা কথা ব'লে বোধ হয় আমি খুব মন্দ কাজ করিনি। বোধ হয় তা না বল্লেই আমার বিবেক আমাকে চিরদিন ধ'রে কশাঘাত করতো।

লোকভেদেও যে কাজের ভাল মন্দ নির্দ্ধারিত হয় না, এ কথা বলাও শক্ত। আমি অসভ্য তুমি সভ্য, আমি অশিক্ষিত, তুমি শিক্ষিত। আমার যদি কেউ উপকার করে আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি তা'হলে সেটা তত দোষের হয় না, কিন্তু তোমার যদি কেউ উপকার করে আর তুমি একটা মৌখিক ধন্যবাদও না দেও তা'হলে তুমি নিশ্চয়ই একটা গুরুতর দোষের কাজ কর। তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশী, আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা কম। একই অবস্থায় প'ড়ে তুমি আমি দু'জনেই হয় ত এক কাজ করলুম, তবু লোকে আমায় নিন্দা করলে না, করলে তোমায়।

আমরা একটু আগেই বলেছি—তুমি আমি দুজনেই যদি একই অবস্থায় প'ড়ে এককাজ করি, তা'হলে সে কাজের দাম সমান হবে, কিন্তু এখন যা বল্লুম তা ঠিক তার উল্টো। এখন বল্লুম একই অবস্থায় প'ড়ে এককাজ করলেও, আমার কাজের দাম হয় ত তোমার কাজের দামের চেয়ে বেশী। এর মানে কি? এর মানে, তুমি আমি সমাবস্থ হওয়া মানে কেবল জাগতিক ঘটনার হিসাবে সমাবস্থ হওয়া নয়, জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা হিসাবেও সমাবস্থ হওয়া।

অতএব আমরা একথা বাহাল রাখতে পারি যে, একই অবস্থায় প'ড়ে তুমি যে কাজ করবে তা যদি মন্দ হয়, তাহলে আমিও সেই কাজ করলে তা মন্দ হবে। কিন্তু 'অবস্থা' কথাটিকে যতই বিস্তৃত অর্থে ধরি না কেন, এ কথা নিশ্চয় দাঁড়াচ্চে যে, যে বিবেক দিয়ে তুমি আমি কাজের দোষগুণ বিচার করি, সে তোমার আমার মনগড়া জিনিষ নয়। তা খামখেয়ালের বাইরের কোন একটা জিনিষ—যা নড়ে না, বদলায় না। তুমি আমি দু'জনেই একই বিবেকের অধিকারী—তবে আলাদা আলাদা মনে থাকে ব'লেই একটাকে বলি তোমার বিবেক একটাকে বলি আমার বিবেক—ঠিক যেমন দুই দোকানীর ঘরে দুটো আলাদা আলাদা গজকাঠি কি বাটকারা থাকতে পারে, কিন্তু গজকাঠি কি বাটকারা যদি সাঁচ্চা হয়, তা'হলে একজনের মাপ অথবা ওজনেও যা দাঁড়াবে আর একজনের মাপ অথবা ওজনেও তাই দাঁড়াবে।

এই ত গেল ধারণা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই হয়? তোমার মাপ তোমার ওজনের সঙ্গে আমার মাপ আমার ওজনের কি একটুও উনিশ বিশ হয় না? হয় বৈ কি। উনিশ বিশ ত দূরের কথা, তুমি হয়ত যে কাজটাকে ভাল বল্লে আমি হয়ত সেই কাজটাকেই মন্দ বল্লুম—অথচ দুজনের একজনও তামাসা ক'রে মিথ্যা কথা বলিনি। ধর দশরথের রামকে বনবাসে পাঠানো। তুমি বলবে দশরথের সত্য রক্ষা করাই উচিত কাজ হয়েচে, আমি বলবো সত্যভঙ্গ না করাই অনুচিত কাজ হয়েচে। এমন ধারা তফাৎ হয় কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর বোধ হয় এই যে, তোমার আমার বিবেক গোড়ায় এক হলেও, এখন আর এক নয়। কারো না কারো বিবেকে মরচে ধরেচে। তাকে ঘ'ষে মেজে ঝক্‌ঝকে ক'রে তুল্‌লেই আবার দুজনের বিবেক মিলবে। আমরা ত কথায় কথায় ব'লে থাকি তোমার বিবেক বুদ্ধিকে শানিয়ে নেও।

কিন্তু এ ত আলঙ্কারিক ভাষার কথা। আসলে কি দোষে এমন হয় যে, কারো কারো বিবেক ঠিক বিচারটি করতে পারে না? এ বুঝতে হলে, আমাদের গোড়াতে মেনে নিতেই হবে যে, প্রত্যেক মানুষের বিবেক একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব অনুভব নয়—তা একটা নিত্য সাধারণ জ্ঞান—যাকে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করা যায়—যা খাটিয়ে তুমিও বিচার

কর আমিও বিচার করি. তা সে জ্ঞাত সারেই হোক্ আর অজ্ঞাত সারেই হোক্।

এই নিত্য সাধারণ জ্ঞানের সূত্রটী যে কি তা আমরা প্রায় সকলেই ভুলে গেছি। আমরা এখন তার খেই হারিয়ে তাকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্চি। সে আমাদের মনের কোন অন্ধকার কোণে এখন জঞ্জাল চাপা হ'য়ে প'ড়ে আছে। তাকে সজ্ঞানে প্রয়োগ করতে পারচি না ব'লেই কেউ না কেউ ভুল ক'রে বসচি। আমাদের এখন দরকার সেই জ্ঞানের সূত্রটীকে খুঁজে বের ক'রে নেওয়া। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সকলেই যে তা হাতে পেয়ে হারিয়েচে তা নয়,—অনেকের কাছে তা কোন দিনই স্পষ্ট রূপ ধ'রে দাঁড়ায়নি।

যাই হোক্, এখন কথা হচ্চে এই যা—ধরে আমরা অজ্ঞাতসারেও কাজের ভালমন্দ বিচার করি সে সূত্রটী কি? অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর পণ্ডিতরা যা যা বের করেচেন, তার কোনটীর সঙ্গে কোনটী মেলে না। কেউ বলেন তা শাস্ত্র বাক্য, কেউ বলেন আত্মোৎকর্ষ, কেউ বলেন সহজ বুদ্ধি, কেউ বলেন সুখ। বলা বাহুল্য এগুলির মধ্যে একটিই সেই বিচার সূত্র হতে পারে—সবগুলিত নয়ই, দুটীও নয়। কিন্তু সেই একটি যে কোনটি সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

সায়াহ্নিকা

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম,এ

রেখো সন্ধ্যা, মোর লাগি' একটি প্রহর
শান্তদীপ্তি, মধুর মন্থর।
পরিপূর্ণ অবকাশ, স্নিগ্ধ তারা জ্বালা
সুদূর অসীম ব্যাপি' একান্ত নিরালা,
মৃদু সমীরণ বুঝি স্বপ্নের সুধীর মর্ম্মর—
সেই মতো একটি প্রহর॥

বাতায়নে কুঞ্জলতা শূন্যে চায় কা'রে
গোধূলির ম্লান অন্ধকারে।
ব্যর্থ হয় বুঝি মালাখানি
একা ব'সে ভাবিছে কে জানি;
উদাসী উৎসুক তা'র চোখ
কেশে কাঁপে শেষ সন্ধ্যালোক।
প্রতীক্ষা মিলন-সুখে ভরিছে বিরহ দুর্ভর—
সেই মতো একটি প্রহর॥

হে সন্ধ্যা, মোদের তুমি দিয়ো ভাষা নিঃসীম তোমার
সর্ব্বময়ী পুণ্য স্তব্ধতার।
দোঁহার একাত্মবাণী মুক্তি সুখে পাখীর মতন
লভুক দুর্লভ চেতন।
পূজারিণী, তব সাথে অনন্তের তীর্থযাত্রা পথে
নিয়ে যেয়ো এ আড়াল হ'তে,
মর্ত্ত্য বিচ্ছেদেরে ভরে আত্মার জ্যোতির নির্ঝর—
দিয়ো দোঁহে একটি প্রহর॥

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হবে না। কোন একজন ছাত্র ক্লাসের একখানা বেঞ্চি ভেঙেচে—শিক্ষক এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে ভেঙেচে?' কোন ছাত্রই শাস্তির ভয়ে সত্য কথা বল্‌লে না। এখানে ছাত্রদের মিথ্যা কথা বলা (বা চুপ করে থাকা, যা মিথ্যা কথা বলারই সামিল) যে দোষার্হ তা নিশ্চিত। কিন্তু ধর একজন নিরীহ ভদ্রলোককে গুণ্ডায় তাড়া করেচে, ভদ্রলোক প্রাণের দায়ে আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়লেন; গুণ্ডারা পিঠ পিঠ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—'এইমাত্র এইরকম একজন লোক, কোন্‌দিকে গেল?' আমি যদি সত্য কথা বলি তা'হলে বলতে হয়, সে আমারই ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি তা না ব'লে মিথ্যা কথাই বল্লুম—'সে এইদিক দিয়ে ছুটে পালাল।' মিথ্যা কথা ব'লে বোধ হয় আমি খুব মন্দ কাজ করিনি। বোধ হয় তা না বল্লেই আমার বিবেক আমাকে চিরদিন ধ'রে কশাঘাত করতো।

লোকভেদেও যে কাজের ভাল মন্দ নির্দ্ধারিত হয় না, এ কথা বলাও শক্ত। আমি অসভ্য তুমি সভ্য, আমি অশিক্ষিত, তুমি শিক্ষিত। আমার যদি কেউ উপকার করে আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি তা'হলে সেটা তত দোষের হয় না, কিন্তু তোমার যদি কেউ উপকার করে আর তুমি একটা মৌখিক ধন্যবাদও না দেও তা'হলে তুমি নিশ্চয়ই একটা গুরুতর দোষের কাজ কর। তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশী, আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা কম। একই অবস্থায় প'ড়ে তুমি আমি দু'জনেই হয় ত এক কাজ করলুম, তবু লোকে আমায় নিন্দা করলে না, করলে তোমায়।

আমরা একটু আগেই বলেছি—তুমি আমি দুজনেই যদি একই অবস্থায় প'ড়ে এককাজ করি, তা'হলে সে কাজের দাম সমান হবে, কিন্তু এখন যা বল্লুম তা ঠিক তার উল্টো। এখন বল্লুম একই অবস্থায় প'ড়ে এককাজ করলেও, আমার কাজের দাম হয় ত তোমার কাজের দামের চেয়ে বেশী। এর মানে কি? এর মানে, তুমি আমি সমাবস্থ হওয়া মানে কেবল জাগতিক ঘটনার হিসাবে সমাবস্থ হওয়া নয়, জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা হিসাবেও সমাবস্থ হওয়া।

অতএব আমরা একথা বাহাল রাখতে পারি যে, একই অবস্থায় প'ড়ে তুমি যে কাজ করবে তা যদি মন্দ হয়, তাহলে আমিও সেই কাজ করলে তা মন্দ হবে। কিন্তু 'অবস্থা' কথাটিকে যতই বিস্তৃত অর্থে ধরি না কেন, এ কথা নিশ্চয় দাঁড়াচ্চে যে, যে বিবেক দিয়ে তুমি আমি কাজের দোষগুণ বিচার করি, সে তোমার আমার মনগড়া জিনিষ নয়। তা খামখেয়ালের বাইরের কোন একটা জিনিষ—যা নড়ে না, বদলায় না। তুমি আমি দু'জনেই একই বিবেকের অধিকারী—তবে আলাদা আলাদা মনে থাকে ব'লেই একটাকে বলি তোমার বিবেক একটাকে বলি আমার বিবেক—ঠিক যেমন দুই দোকানীর ঘরে দুটো আলাদা আলাদা গজকাঠি কি বাটকারা থাকতে পারে, কিন্তু গজকাঠি কি বাটকারা যদি সাঁচ্চা হয়, তা'হলে একজনের মাপ অথবা ওজনেও যা দাঁড়াবে আর একজনের মাপ অথবা ওজনেও তাই দাঁড়াবে।

এই ত গেল ধারণা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই হয়? তোমার মাপ তোমার ওজনের সঙ্গে আমার মাপ আমার ওজনের কি একটুও উনিশ বিশ হয় না? হয় বৈ কি। উনিশ বিশ ত দূরের কথা, তুমি হয়ত যে কাজটাকে ভাল বল্লে আমি হয়ত সেই কাজটাকেই মন্দ বল্লুম—অথচ দুজনের একজনও তামাসা ক'রে মিথ্যা কথা বলিনি। ধর দশরথের রামকে বনবাসে পাঠানো। তুমি বলবে দশরথের সত্য রক্ষা করাই উচিত কাজ হয়েচে, আমি বলবো সত্যভঙ্গ না করাই অনুচিত কাজ হয়েচে। এমন ধারা তফাৎ হয় কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর বোধ হয় এই যে, তোমার আমার বিবেক গোড়ায় এক হলেও, এখন আর এক নয়। কারো না কারো বিবেকে মরচে ধরেচে। তাকে ঘ'ষে মেজে ঝকঝকে ক'রে তুললেই আবার দুজনের বিবেক মিলবে। আমরা ত কথায় কথায় ব'লে থাকি তোমার বিবেক বুদ্ধিকে শানিয়ে নেও।

কিন্তু এ ত আলঙ্কারিক ভাষার কথা। আসলে কি দোষে এমন হয় যে, কারো কারো বিবেক ঠিক বিচারটি করতে পারে না? এ বুঝতে হলে, আমাদের গোড়াতে মেনে নিতেই হবে যে, প্রত্যেক মানুষের বিবেক একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব অনুভব নয়—তা একটা নিত্য সাধারণ জ্ঞান—যাকে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করা যায়—যা খাটিয়ে তুমিও বিচার

কর আমিও বিচার করি, তা সে জ্ঞাত সারেই হোক্ আর অজ্ঞাত সারেই হোক্।

এই নিত্য সাধারণ জ্ঞানের সূত্রটী যে কি তা আমরা প্রায় সকলেই ভুলে গেছি। আমরা এখন তার খেই হারিয়ে তাকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্চি। সে আমাদের মনের কোন অন্ধকার কোণে এখন জঞ্জাল চাপা হ'য়ে প'ড়ে আছে। তাকে সজ্ঞানে প্রয়োগ করতে পারচি না ব'লেই কেউ-না কেউ ভুল ক'রে বসচি। আমাদের এখন দরকার সেই জ্ঞানের সূত্রটীকে খুঁজে বের ক'রে নেওয়া। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সকলেই যে তা হাতে পেয়ে হারিয়েচে তা নয়,—অনেকের কাছে তা কোন দিনই স্পষ্ট রূপ ধ'রে দাঁড়ায়নি।

যাই হোক্, এখন কথা হচ্চে এই যা—ধরে আমরা অজ্ঞাতসারেও কাজের ভালমন্দ বিচার করি সে সূত্রটী কি? অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর পণ্ডিতরা যা যা বের করেচেন, তার কোনটীর সঙ্গে কোনটী মেলে না। কেউ বলেন তা শাস্ত্র বাক্য, কেউ বলেন আত্মোৎকর্ষ, কেউ বলেন সহজ বুদ্ধি, কেউ বলেন সুখ। বলা বাহুল্য এগুলির মধ্যে একটিই সেই বিচার সূত্র হতে পারে—সবগুলিত নয়ই, দুটীও নয়। কিন্তু সেই একটি যে কোনটি সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

সায়াহ্নিকা

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম,এ

রেখো সন্ধ্যা, মোর লাগি' একটি প্রহর
    শান্তদীপ্তি, মধুর মন্থর।
পরিপূর্ণ অবকাশ, স্নিগ্ধ তারা জ্বালা
    সুদূর অসীম ব্যাপি' একান্ত নিরালা,
মৃদু সমীরণ বুঝি স্বপ্নের সুধীর মর্ম্মর—
    সেই মতো একটি প্রহর॥

বাতায়নে কুঞ্জলতা শূন্যে চায় কা'রে
    গোধূলির ম্লান অন্ধকারে।
ব্যর্থ হয় বুঝি মালাখানি
    একা ব'সে ভাবিছে কে জানি
উদাসী উৎসুক তা'র চোখ
    কেশে কাঁপে শেষ সন্ধ্যালোক।
প্রতীক্ষা মিলন-সুখে ভরিছে বিরহ দুর্ভর—
    সেই মতো একটি প্রহর॥

হে সন্ধ্যা, মোদের তুমি দিয়ো ভাষা নিঃসীম তোমার
    সর্ব্বময়ী পুণ্য স্তব্ধতার।
দোঁহার একাত্মবাণী মুক্তি-সুখে পাখীর মতন
    লভুক দুর্লভ চেতন।
পূজারিণী, তব সাথে অনন্তের তীর্থযাত্রা পথে
    নিয়ে যেয়ো এ আড়াল হ'তে,
মর্ত্ত্য বিচ্ছেদেরে ভরে আত্মার জ্যোতির নির্ঝর—
    দিয়ো দোঁহে একটি প্রহর॥

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মধ্য এশিয়ায় হিন্দুসাহিত্য

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী

১

হিন্দুজাতির প্রকৃতি এই যে, তাহারা অতীতকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র নহে। বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, হিন্দুদিগের কোনও ইতিহাস নাই। বাস্তবিকই আমাদের ইতিহাসের আদর্শ পশ্চিম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই কথা ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা আমাদের অতীতকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করিতে বসিয়াছি।

ভারত যুগযুগান্ত হইতে পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষাগুরু। রাজনৈতিক প্রভাব বলিতে গেলে ভারত তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সগ্‌ডিয়ানা, খোটান, তুখার, ও মধ্য এশিয়ায়, অন্যদিকে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, লাও, চম্পা, কম্বোজ, ফুজান, বালিদ্বীপ, লম্বক, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও ফিলিপাইন্‌ সকল দেশেই ভারতের বাণী গিয়াছে। ভারতের এক ঋষির নিকট অর্দ্ধজগত মস্তক অবনত করিয়াছে। বুদ্ধদেব হিন্দুঋষিই ছিলেন, তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া মানিয়া লইতে বোধহয় কাহারও আপত্তি হইবেনা। হিন্দুধর্ম একটি মাত্র মতের মধ্যে আবদ্ধ নয়। হিন্দুধর্ম কি এই প্রশ্নের উত্তরে একটি আখ্যা দিয়া তাহাকে বুঝান যায়না। হিন্দুধর্ম একটি জাতির সভ্যতার
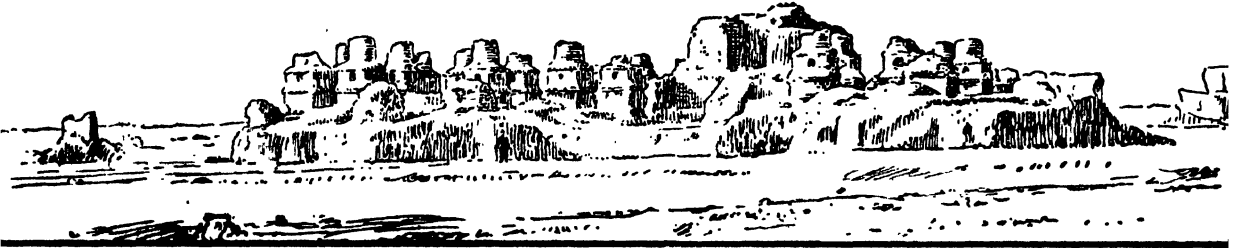
তুরফানের নিকটে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এইরূপ বহুশত বিহারের চিহ্ন রহিয়াছে। প্রাচীর গাত্রে এখনো উজ্জ্বল চিত্র আছে; জার্ম্মান ও ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু fresco প্রাচীর হইতে কাটিয়া লইয়া আসিয়াছেন। বার্লিনের Ethnographic Museumও এই সব fresco আছে।

বিকাশ। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জাতীয়তার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ইহুদীধর্ম, সিণ্টোধর্ম, মিশর ও বাবিলোনের ধর্ম—সকল প্রাচীনতম ধর্মই—নিজ নিজ জাতি ও দেশের সীমার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্মের সার্ব্বজনীন ভাব প্রথম হিন্দুগণই প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হিন্দুসভ্যতার এই বিকাশ বিশেষরূপ দেখিতে পাই।

অতি অল্পই বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। যাহাও বা করিয়াছিল তাহা বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এশিয়ার নানাস্থানের মনোরাজ্যে হিন্দুগণ যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বহুযুগের অনাদর ও অবজ্ঞায়ও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কি দিয়াছে, বিদেশীকে এই প্রশ্নের উত্তর বহু বার দিতে হইয়াছে। পৃথিবীতে ভারতের এক ঋষি সর্ব্বজীবে অহিংসা, সর্ব্বজীবে করুণা, সর্ব্বজীবে মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন, একদিকে চীন,

ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে হিন্দুধর্ম্মের বাণী সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধগণই বহিয়া লইয়া যান। মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ স্থান এখন মুসলমানের অধিকৃত, কিন্তু হাজার বছর পূর্ব্বে ইহা ছিল হিন্দুর দেশ। মরুময় এই দেশটির বিভিন্ন স্থানে যে সকল বিভিন্ন আর্য্য জাতি বাস করিত, ভারতের বাহিরে তাহারাই চীন, তীব্বত ও আলতাই

তাহার পর ইসলামধর্ম্ম বিজয় দর্পে আসিয়া হিন্দু সভ্যতা তথা হইতে মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু হিন্দু সভ্যতা লুপ্ত হইবার কারণ একমাত্র ইহাই নয়। মানুষে যাহা নষ্ট করিল তাহার চেয়ে অধিক করিল দৈবে। প্রচণ্ড বাত্যা-তাড়িত বালুকা দ্বারা বড় বড় সহরগুলি মরুভূমির মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিল। যুগযুগান্ত ধরিয়া বালুকার তলায়

ষ্টাইন ও পেলিও তুন-হুয়াঙের পর্ব্বত গাত্রে সহস্র-বুদ্ধ-গুহার বর্ণনা দিয়াছেন। তুন-হুয়াঙের নিকটস্থ চিত্র।

র্বতের ওপারে তুর্কীদের নিকট ভারতের বাণী বহিয়া ইয়া যায়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যগুলির প্রত্যেকের কীয় একটি সভ্যতা ও তাহার ইতিহাস ছিল। তাহাদের তিহাসের সহিত আবার চীন, তিব্বত ও ভারতের তিহাসও অনেকাংশে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রায় জার বছর কাল মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল।

বিস্মৃতির গর্ভে তাহারা লুপ্ত রহিল। মাঝে মাঝে দুই একজন পরিব্রাজক তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করিতেন, আভাস পাইতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে ভারতীয় সভ্যতার অমূল্য কীর্ত্তিসমূহ লুক্কায়িত আছে, কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। এই সকল কীর্ত্তির কাহিনী উদ্ধৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম

খৃষ্টধর্ম ও মণিধর্মের (Manichism) ইতিহাসের ধারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া এই সকল কীর্ত্তি উদ্ধার করা হইল তাহারই বিবরণ এখানে সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সুধীবৃন্দ প্রথম জানিতে পারেন যে, মধ্য এশিয়ার বালুকার তলদেশে বহু অমূল্য পুঁথি চাপা

তুন-হুয়াঙের সম্মুখস্থ নদী। দূরে পাহাড়ের গাত্রে গুহা।

পড়িয়া আছে। কর্ণেল Waterhouse বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে একটি ভূর্জপত্রের পুঁথি ও কতকগুলি পুরাতন মুদ্রা দেখাইয়া বলেন যে, পূর্ব তুর্কীস্থানের কাশগড়ে লেফ্‌টনাণ্ট Bower এই গুলি উদ্ধার করিয়াছেন। Bower-এর একটি ক্ষুদ্র লিপিও তিনি দেখান। লিপিখানিতে Bower লিখিয়াছেন :—

"কুচারে যখন আমি ছিলাম তখন একটি লোক আমাকে আসিয়া বলে যে, মাটির নীচে একটি সহর আছে; সেই সহরটি সে আমাকে দেখাইতে লইয়া যাইবে। কিন্তু মধ্যরাত্রে সেখানে যাইতে হইবে; কারণ চীনাগণ যদি জানিতে পারে যে, একজন ইউরোপীয়কে সেখানে লইয়া গিয়াছে তবে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে পারে। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মধ্য রাত্রে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্বে ঐ লোকটিই আমাকে ভূর্জপত্রের কতকগুলি পুঁথি দিয়াছিল। সেই পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছিল পুরাতন একটি স্তম্ভ খনন করিয়া। এই স্তম্ভটি মাটির নীচের সেই সহরটির ঠিক বাহিরেই। লুপ্ত সহরটি ও পুঁথিগুলি বৌদ্ধদিগের বলিয়া আমার মনে হয়।"

কর্ণেল Waterhouse ইহার অধিক কোনও সংবাদ আর দিতে পারিলেন না। কেহ কেহ পুঁথিটি দেখিয়া অনুমান করেন যে, ইন্দো-তাতার সংস্কৃতে ইহা লেখা। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কাশগড় ও খোটানের ভাষা ছিল ইন্দো-তাতার সংস্কৃত।

উক্ত অধিবেশনে স্থির হইল যে, পুঁথিটি যথাযথভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রে তুলিয়া দেওয়া হইবে।

তুন-হুয়াঙের নদী। আর একটী দৃশ্য। দূরে পাহাড়ের গাত্রে সহস্র-বুদ্ধ-গুহা।

সোসাইটির অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে যদি কেহ এ সম্বন্ধে নূতন কোনও তথ্য বাহির করিতে পারেন এই আশায়ই উহা প্রকাশ করা হয়। ঐ পত্র হইতে Bombay Gazetteএ উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে Dr. A. F. R. Hoernle যখন ভারতে আসিতেছিলেন তখন এডেনে ইহার একটি সংখ্যা তাঁহার হাতে পড়ে। কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কর্ণেল Waterhouseএর নিকট হইতে সেই পুঁথিটি লন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির আর একটি অধিবেশনে Hoernle এই পুঁথিটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই পুঁথির অক্ষর ও ভাষা সংস্কৃতই। ইহার পর সুধীমণ্ডলী এই অক্ষর ও ভাষা সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। Bowerএর নামে পুঁথিটির নাম হইল Bower manuscript। ক্রমশঃ এই পুঁথি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। ইহার প্রাচীনত্বই পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় পুঁথিগুলি খুব বেশী প্রাচীন নয়। Luders তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, নেপালে

তাল পত্রে লিখিত যে সব পুঁথি রহিয়াছে, তাহা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের নয়; ভারতীয় পুঁথিগুলির মধ্যে এগুলিই প্রাচীনতম। কেবল ৬০৯ খৃষ্টাব্দে দুইটি বিচ্ছিন্ন তাল পত্র ভারত হইতে চীনে ও চীন হইতে জাপানে লইয়া যাওয়া হয়। এখন সেগুলি জাপানের সুপ্রসিদ্ধ Horeuzi বিহারে সযত্নে রক্ষিত আছে।

খোটানের নিকটের এক বিহারের প্রাচীর গাত্রে এই ছবি আছে। অজন্তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

Bower পুঁথিতে তিনটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলি আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় ও এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পুঁথিটি গুপ্ত লিপিতে (Gupta script) লিখিত; সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ইহা উত্তর ভারতের একটী গ্রন্থ এবং পঞ্চম শতাব্দী অথবা তাহার পূর্ব্বেই ইহা লিখিত হয়। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইহা লিখিত। মধ্য এশিয়ায় যে গুপ্তলিপি প্রচলিত ছিল এবং তাৎকালিক পুঁথি কিরূপ ছিল তাহার একটি নমুনা আমরা চিত্রে দিলাম।

এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে চারিদিকে একটি সাড়া পড়িয়া গেল। এই আবিষ্কারে নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন জাতির পণ্ডিতমণ্ডলী বিভিন্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক সমিতি স্থাপন করিয়া লুপ্তস্থানসমূহ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। রুশীয়গণই এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের অধ্যবসায়ের ফলে যে সকল অমূল্য কীর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায়

নাই। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই রুশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

কিন্তু মৃত্তিকা খনন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মধ্য এশিয়ার লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধারে ইংরাজগণই হইয়াছেন অগ্রণী।

তুরফানের কোনো বিহারের প্রাচীর গাত্রের চিত্র।
ভারতীয় বেশ বিন্যাস।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট্ Sir Aurel Steinকে এই কার্য্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তিনি একাধারে পণ্ডিত ও পরিব্রাজক। Stein জাতিতে Hungarian, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সবই জার্ম্মাণ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কার্য্য আরম্ভ করেন; অল্পদিন হইল তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে। তাঁহার প্রথম অভিযান বাহির হইয়াছিল, আজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে।

Stein কাশ্মীর হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। এখান হইতে তুর্কীস্থানের কাশগড়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তথা হইতে নানাস্থান ঘুরিয়া তিনি Niyaতে আসেন। পথিমধ্যে বহু পুঁথি ও শিল্পের নমুনা তিনি সংগ্রহ করেন। Niyaতে কতকগুলি চীনা পুঁথি পান; সেগুলি ৎসীন রাজত্বকালে লেখা। Tsin রাজত্ব আরম্ভ হয় ৬৫ খৃষ্টাব্দে Niyaর নিকট খরোষ্টিলিপি ও প্রাকৃত ভাষায় লেখা কতকগুলি কাষ্ঠফলক তিনি পাইয়াছিলেন; সেগুলির অধিকাংশের উপর প্রাচীন শিলমোহর লাগান ছিল এইরূপ কাষ্ঠফলক ও তাহার উপর খরোষ্টিলিপির প্রতিচ্ছবি আমরা এখানে দিলাম। তীরের ন্যায় চিত্রটীর মধ্যে খরোষ্টিলিপি ও পরবর্ত্তী চিত্রখানিতে ব্রাহ্মীলিপির নমুনা রহিয়াছে। খরোষ্টিলিপিতে লিখিত কতকগুলি গ্রন্থ তিনি পাইয়াছিলেন, সেগুলি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

পুঁথিসংগ্রহের কার্য্যে যখন তিনি লিপ্ত, তখন সহসা Stein আবিষ্কার করিলেন যে, সেই সকল পুঁথির অধিকাংশই জাল। তিনি দেখিলেন যে, খোটান হইতে আনীত বিচিত্র অক্ষরে লিখিত রাশি রাশি ঐরূপ পুঁথি, কাশগড়ের ইউরোপীয় পরিব্রাজকদিগের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে; কিছু কিছু সংশয় কখনও বা কেহ প্রকাশ করিলেও এই সকল গ্রন্থ বিবিধ পণ্ডিতগণ সম্পাদন করিতেও সুরু করিয়াছিলেন। ষ্টাইন আবিষ্কার করেন যে, ইস্‌লাম খাঁ নামক এক ব্যক্তি গ্রন্থজাল করিয়া রীতিমত এক ব্যবসা চালাইতেছে; লোকেরা কি ভাবেই না প্রতারিত হইতেছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনা তুর্কীস্থান সম্বন্ধে ষ্টাইনের প্রথম বই বাহির হয়; বইখানির নাম "Sand-buried Ruins of Khotan"—খোটানের বালুকাস্তূপে নিমজ্জিত প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ। এই গ্রন্থে তিনি পূর্ব্বতুর্কীস্থানে, বিশেষত খোটানের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে, তাঁহার ভ্রমণ ও লুপ্তপ্রদেশ

খরোষ্টী লিপি: কাষ্ঠ ফলকের উপর লিখিত সরকারী দপ্তরের নথিপত্র। ইহার ভাষা প্রাকৃত ও উত্তরপশ্চিম ভারতের ভাষার সহিত এই প্রাকৃতের মিল ছিল।

সমূহ আবিষ্কারের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মাল-মশলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলির যথাযথ শ্রেণী-বিভাগ এবং তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহার আরও কিছুকাল লাগিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার *Ancient Khotan* (প্রাচীন খোটান) নামক বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। খোটানের বিহারগুলির প্রাচীর গাত্রে যে সকল চিত্র রহিয়াছে, তাহার দুই একটি নমুনা এখানে দেওয়া গেল। এগুলিতে অজন্তার শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।

ষ্টাইন্ তাঁহার নিজের কাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "১৯০০ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত 'তাকলামাকান্' মরুভূমির ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, খোটানের চতুর্দ্দিকে চীনা তুর্কীস্থানের মরুপ্রদেশগুলিতে এক সময় চীনা-ভারতীয় ও প্রাচীন (classical) গ্রীক সভ্যতা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, মিশরের ন্যায় শুষ্ক এই প্রদেশে কত শতাব্দী পূর্ব্বকার লুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন-সমূহ কেমন অক্ষতভাবে রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অভিযানে আমার অনুসন্ধানের কার্য্য ও ক্ষেত্র পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিতে লাগিলাম। দেখিলাম চীন ও মধ্যএশিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ভগ্নাবশেষ সব ছড়ান রহিয়াছে। সেগুলি হইতে জানা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল হইতে চীনের সহিত মধ্যএশিয়ার যোগ। সেই সকল নিদর্শন (Relics) হইতে তখনকার ইতিহাস, শিল্প ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এমন সব আভাস পাওয়া যায় যার কথা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। ইতিপূর্ব্বে চীনা ইতিহাসগুলির স্থানে স্থানে এসম্বন্ধে অল্পস্বল্প উল্লেখমাত্র পাওয়া যাইত।"

ষ্টাইনের অভিযান প্রতিপদে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিল। Niyaর নিকট তিনি খরোষ্টি ও প্রাকৃত অক্ষরে লেখা কতকগুলি যে কাষ্ঠফলক পাইয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ভিন্ন গ্রীক প্রভাবান্বিত ভারতীয় শিল্পকলার কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নমুনা এখানে তিনি পাইয়াছিলেন। এই সকল পাওয়াতে প্রত্নতত্ত্বের নূতন একটি দিক্ খুলিয়া গেল। গ্রীক্ শিল্প ও ভারতীয় শিল্পের যে ঘনিষ্ঠ যোগসাধন হইয়াছিল, ষ্টাইনই প্রথম তাহার আভাস পান, এবং এসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি হইল তুনহুয়াং এর 'সহস্র বুদ্ধ-গুহা' অধিকার। হুনদিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য চীনাগণ এক বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মধ্যএশিয়ার মধ্যে এই প্রাচীরের চিহ্ন অল্পস্বল্প ছিল বটে, কিন্তু ইহার ইতিহাস পরবর্ত্তী যুগের কেহই জানিত না। ষ্টাইন্ এই প্রাচীরের কিয়দংশ আবিষ্কার করেন। এই প্রাচীরসংলগ্ন বহু বৌদ্ধমন্দিরের তিনি সন্ধান পান। এই সকল মন্দিরে নয়শত বৎসর পূর্ব্বের শিল্প-চাতুর্য্যের নমুনা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ষ্টাইন এই সব মন্দির হইতে চব্বিশটি কাষ্ঠপেটিকায় পরিপূর্ণ বহু প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করেন। পাঁচটি পেটিকায় নানারূপ চিত্র ও কারুকার্য্যের নমুনা ছিল। পুঁথিগুলি তুর্কীউইগুর, তুখার, (কুচিয়ান) শক (খোটানী), শূলিক (Sogdian) প্রভৃতি মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত। ইহা ভিন্ন বহু সংস্কৃত গ্রন্থও তিনি পান। পুঁথিগুলির বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করিব।

ব্রাহ্মীলিপি: কাগজের উপর লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ। এই ব্রাহ্মী লিপি তুখার ও শক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই অক্ষরই মধ্যএশিয়ার প্রধানতম লিপি ছিল।

১৯০৮ সালে ষ্টাইন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আবিষ্কারের

কাহিনী Ruins of Desert Cathay নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই বিবরণ সাধারণের জন্য গল্পের ন্যায় লেখা। কিন্তু যে সকল উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলি বাছিতে, তালিকা করিতে এবং তাহা হইতে তথ্য নির্ণয় করিতে অনেক সময় লাগিল। Ser-India নামক পাঁচখণ্ডে বিভক্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থে তাঁহার আবিস্কারের বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইল। তিনখণ্ডে গ্রন্থগুলির বিবরণ, একখণ্ডে চিত্র সমূহ ও একখণ্ডে মানচিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হয়। অধ্যাপক লেভী, হুয়েনসাঙের সহিত ষ্টাইনের তুলনা করিয়াছেন। হুয়েনসাঙকে ষ্টাইন আদর্শপুরুষ জ্ঞান করেন। লেভী বলিয়াছেন, "দুইজনেই এক দেশের, মধ্য দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে দুইজনকেই; সেই কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের যথেষ্ট; এবং দুইজনেই রাশি রাশি মূল্যবান্ পুঁথি ও শিল্পসম্ভার লইয়া দেশে ফিরেন।" যে উপকরণগুলি ষ্টাইন আনিয়াছিলেন, সেগুলি লইয়া কাজ করিবার ভার দিলেন বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতদিগের উপর। জাতীয় দম্ভদ্বারা এবিষয়ে তিনি পরিচালিত হন নাই। ষ্টাইন যখন মধ্য এশিয়ার আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত, ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অধ্যাপক পেলিও (Pelliot) সেখানে আসিলেন। Pelliot তুনহুয়াংএ যে সকল অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, সে গুলিও অতীব বিস্ময়কর। তুনহুয়াং সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। তুনহুয়াং গুহার বাহিরের কয়েকটি চিত্র আমরা এখানে দিলাম।

ষ্টাইনের প্রকৃতিই হইল পরিব্রাজকের। এই স্বভাবগত পরিব্রাজক অধিকদিন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। মধ্যএশিয়ার মরুভূমি পুনরায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ১৯১৩ সালে ষ্টাইন পুনরায় শ্রীনগর হইতে সদলবলে যাত্রা করেন। তাঁহার এই তৃতীয় অভিযানের বিবরণ সম্প্রতি Ser-Indiaরই ন্যায় প্রকাণ্ড একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হইতেছে। ১৯১৬ সালে ইহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Report) বাহির হইয়া ছিল, তাহা হইতেই আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। দিল্লীতে ভারতীয় শিল্প ও নৃতত্ত্বের যে মিউজিয়ম সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই ষ্টাইনের সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার রক্ষিত হইয়াছে।

খরোষ্ঠী লিপি লিখিত দলিল পত্রের উপরিস্থিত পাটা। পুঁথি দড়ি দিয়া বা চামড়া দিয়া বাঁধা। মধ্যখানে একটা শীল (seal) থাকিত। এই শীলে নাম ও চিত্র আছে। কোনো কোনো শীলে গ্রীক দেবীর মূর্ত্তি আছে।

কাশ্মীরের উত্তরে Darelএ অনুসন্ধান ও খননের ফলে ষ্টাইন এক বৌদ্ধ সমাধিক্ষেত্রের চিহ্নসমূহ দেখিতে পান। তাঁহার ধারণা যে, বর্ত্তমানকালের অপেক্ষা সেই বৌদ্ধযুগে তথাকার লোক-সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। সেখান হইতে যতই তিনি আগাইয়া চলিলেন, ততই স্থানে স্থানে বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সমূহ পাইতে লাগিলেন। মন্দিরগুলির মধ্য হইতে আবার বহু পুঁথিও তিনি উদ্ধার করেন। অনেক মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে বৌদ্ধ চিত্রসমূহ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল চিত্রের বিষয় ও পদ্ধতি বিচিত্র। ভারতীয় শিল্পের প্রভাব যে এগুলির উপর কতখানি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তুনহুয়াং গুহার চিত্রগুলির সহিত এই সকল চিত্রের যথেষ্ট মিল আছে। স্থানে স্থানে ষ্টাইন ও তাঁহার
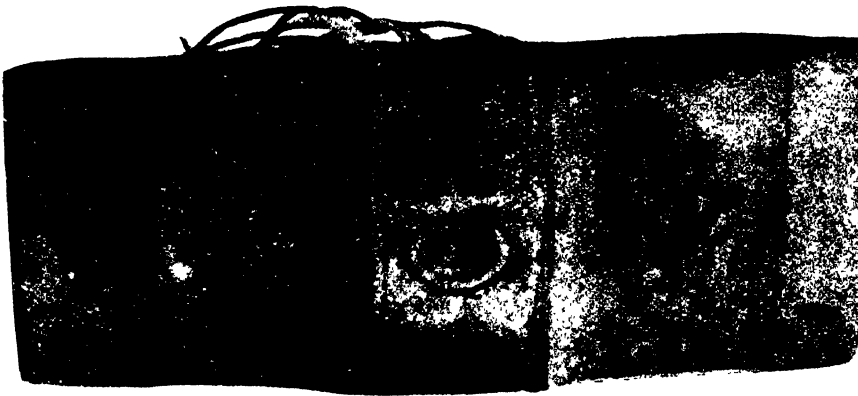
সহকারীগণ দেখিলেন যে, মুসলমানগণ এই সকল চিত্র নষ্ট করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়াছে। তারপর আবার স্থানীয় অধিবাসীগণ অর্থলোভে সেই সকল চিত্র টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছে। এই সকল দেখিয়া ষ্টাইন তাঁহার দুইজন মুসলমান সহকারীর সাহায্যে অতি সাবধানে প্রাচীর গাত্রের কতকগুলি চিত্র অক্ষত অবস্থায় সরাইয়া আনিতে লাগিলেন। সহকারীদ্বয়ের মধ্যে একজন হইলেন নায়ক শাম সুদ্দীন; অপরজন আফরজ গুল্। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, জার্ম্মান পণ্ডিত Lecoq ও এই পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

নানাস্থান ঘুরিয়া কাশগড়ে ষ্টাইন ১৮২টি তোরঙ্গ, সংগৃহীত দ্রব্য ও পুঁথিতে পূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার পর আফ্গানিস্থানে প্রবেশ করিতে যাইয়া অনুমতি না পাইয়া তিনি Seisthan নামক স্থানটিতে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। Seisthan হইল প্রাচীন শকস্থান। এইখানে Koh-i-Khwaja নামক এক নিভৃত পর্ব্বতের উপর একটি বৃহৎ বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান তিনি লাভ করেন। দেখিলেন পারস্যের সাসানীয় বংশের সময়কার শিল্পদ্বারা এই বিহারটি শোভিত। গ্রীক শিল্পের প্রভাব ইহাতে যথেষ্ট। এমন কি তাহারও পূর্বেকার শিল্পের নিদর্শন ইহাতে রহিয়াছে। Seisthan হইতে যে সকল মূল্যবান উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেন, সেগুলি বারোটি তোরঙ্গে ভরিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন।

ইহার পর বেলুচীস্থান ঘুরিয়া ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দিল্লীতে আসিয়া পৌছান। এই তৃতীয় অভিযানে তিনি দুই বৎসর আট মাস ধরিয়া ১১,০০০ মাইল ভ্রমণ করেন।

ষ্টাইনের সংগৃহীত সমুদয় পুঁথি ও দ্রব্যসম্ভার পণ্ডিতগণের গবেষণার নিমিত্ত ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেগুলি হইতে তথ্য নির্ণয় করিয়া ষ্টাইনের বৃহৎ গ্রন্থটি লিখিত হইয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবে। পুঁথি ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ পুনরায় ইংলণ্ড হইতে দিল্লীর মিউজিয়মে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

তুর্কী উইগুর জাতির সম্ভ্রান্ত লোক। উপরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। প্রাচীর চিত্র হইতে গৃহীত।

প্রাচীন চেদিগণ ও চেদিরাজ্য

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম, এ, ; বি, এল, ; পি এইচ, ডি,

প্রথম বৈদিক যুগে যে সমস্ত প্রাচীন জাতির দ্বারা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল চেদিগণ তাঁহাদের অন্যতম। ঋগ্বেদের মত প্রাচীন যুগেও যজ্ঞক্ষেত্রে দানের জন্য এবং পরাক্রম ও রাজ্যজয়ের দ্বারা চেদি-নৃপতিগণ মহাযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অশ্বিন-দিগকে সম্বোধন করিয়া কাণ্ব বংশোদ্ভব ঋষি ব্রহ্মাতিথি যে স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে চেদিরাজ কশু নিম্নলিখিত ভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন :—"অশ্বিনগণ, আপনারা জ্ঞাত হউন, আমার বর্ত্তমান উপহারের কথা, কেমন করিয়া চেদিপুত্র কশু আমাকে একশত উষ্ট্র, দশ হাজার গাভী দান করিয়াছেন ; চেদিপুত্র, যিনি আমাকে ভৃত্যস্বরূপ দশজন রাজাকে দান করিয়াছেন, (তিনি) স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ; কারণ সমস্ত মনুষ্যই তাঁহার পদনিম্নে ; যাঁহারা তাঁহার চারিপাশে আছেন তাঁহারা চর্ম্মনির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করেন। চেদিরা যে পথে গমন করেন সে পথে কোনও লোকই অগ্রসর হইতে পারে না, অন্য কোনও সাধুলোক অধিকতর মুক্তহস্ত দাতারূপে (যাহারা তাঁহার প্রশংসা করে তাহাদিগকে অনুগ্রহ) দান করে না।" (Rigveda VIII, 5, 37-39) এই বিবরণ হইতে অনুমিত হয় যে, এই চেদি-রাজাটি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন ; কারণ বর্ণনায় দেখা যায়, একজন ঋষিকে তিনি দাসস্বরূপ দশজন নৃপতি দান করিয়াছিলেন। ঋষিটি যে রাজার কোনও যজ্ঞে পৌরহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। দানস্তুতিতে বর্ণনা-বাহুল্যের আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে নৃপতি রাজাদিগকে দান করিতে পারেন তিনি সত্য সতই পরাক্রমশালী নৃপতি। দানস্তুতিতে একথাও উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সৈন্যেরা চর্ম্মনির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করিত। এই সৈন্যেরা বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তিকে প্রসারিত করিয়াছিল এবং চারিপাশের জাতিসমূহকে তাঁহার শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিল। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে চেদিরাজ কশু সত্য সত্যই একজন মহাপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, বহু রাজাও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

প্রাচীন বৈদিক যুগে চেদিগণ

পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে, যেমন ব্রাহ্মণ, কল্প সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে, চেদিদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া চেদিরা লোপ পাইয়াছিল একথা মনে করাও সঙ্গত হইবে না। কারণ মহাভারতে উত্তর ভারতের একটি প্রধান শক্তিরূপে চেদিরা বর্ণিত হইয়াছে। তবে এরূপ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে, ঋগ্বেদের সময় যজ্ঞকার্য্যে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিতে তাহারা যে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিল ব্রাহ্মণ যুগে তাহাদের ততখানি প্রাধান্য আর ছিল না। ভারতবর্ষে প্রত্যেক ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাসেই উন্নতি ও অবনতির ছাপ পড়িতে দেখা যায়, চেদিদের ইতিহাসও এই উন্নতি অবনতির ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে চেদিগণ

ঋগ্বেদের স্তোত্রে যাহার উল্লেখ পাওয়া যায় চেদি-সম্রাট সেই কশুর যশোগৌরবের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আর একজন বিখ্যাত চেদি সম্রাটের নাম বসু। ইনি উপরিচর আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ইঁহার গৌরব-গান ঘোষিত হইয়াছে এবং জাতকে ইঁহার নিজের এবং ইঁহার বংশধরগণের বিবরণ পাওয়া যায়। এই চেদিরাজটি মহাধর্ম্মশীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি নিজে একজন পৌরব ছিলেন এবং কন্যা সত্যবতীর

চেদি নৃপতিগণ সম্পর্কে প্রচলিত বিবরণ

সম্পর্কে কুরু এবং পাণ্ডবদের পূর্ব্বপুরুষদের ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

মহাভারতের আদি পর্ব্ব (M. N. Dutt, Mahabharata, p. 83) হইতে জানা যায় যে পৌরব বসু দেবরাজ ইন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে সুন্দর চেদিরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এই বসু কঠোর তপস্যাবলে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব লাভ করেন। তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনায় প্রীত হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে স্ফটিকনির্ম্মিত রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (M. N. Dutt, Mahavarata, p. 84) এই রথে আরোহণ করার জন্য এবং জড়দেহ থাকা সত্বেও দেবতাদের মত ঊর্দ্ধ দেশে গমনাগমন করার জন্য তাঁহাকে উপরিচর আখ্যা দেওয়া হয়। (Ibid, p. 85) অদ্রিকা নাম্নী একটি অপ্সরা যখন কোনও ব্রাহ্মণের অভিশাপে মৎস্যরূপে বাস করিতেছিল তখনই তাহার গর্ভে রাজা উপরিচর বসুর একটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এই কন্যার নাম সত্যবতী। ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাতা ছিলেন এবং পরে শান্তনুর মহিষী হন। রাজা উপরিচর বালকটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বালকটিই পরে মৎস্য নামে পরিচিত হন এবং পরাক্রম ও শক্তির জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু কন্যাটি একজন ধীবরের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দেখা যায় যে, উপরিচর বসুর বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশাম্ব প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটি পুত্র ছিল। ইঁহারা নিজেদের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (M. N. Dutta, Mahabharata, Ch. 63. p. 84) বসু পৌরবের দ্বারা চেদিরাজ্য জয়ের উপাখ্যান বায়ু পুরাণের দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, যযাতির একখানা রথ ছিল যাহা ইচ্ছামাত্র যেখানে সেখানে গমন করিতে পারিত। এই রথখানি চেদিরাজ বসু হস্তগত করিয়াছিলেন। (Vayupurana, Chap. 99) অন্য একটি বিবরণ অনুসারে বসু নামে একজন কুরু-বংশধর চেদিদের যাদব-রাজ্য জয় করিয়া সেখানে নিজেকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হইতে তিনি চেদিয় উপরিচর নামে পরিচিত হন। তাঁহার রাজধানী শুক্তিমতী, শুক্তিমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিকে মগধ পর্য্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে মৎস্য দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই জন্যই তিনি সম্রাট এবং চক্রবর্ত্তী রূপে পরিগণিত হন। মগধ, চেদি, কৌশম্বী করুষ এবং দৃশ্যতঃ মৎস্য—এই কয়েকটি রাজ্য তিনি তাঁহার পঞ্চ পুত্রের ভিতর ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথের হস্তে মগধের রাজ্যভার অর্পিত হয়। গিরিব্রজপুর তাঁহার রাজধানী ছিল এবং তিনিই বিখ্যাত বৃহদ্রথ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সর্ব্ব প্রথমে এই সময়েই প্রচলিত ইতিহাসে মগধের প্রাধান্য সূচিত হয়। (Pargiter, Ancient Historical Tradition, p. 282)

মহাভারতের অন্য অধ্যায়েও এই চেদি-সম্রাটটির মহত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উপরিচর বসুকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ত্তা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখা যায়। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে ১৬ জন মহর্ষিকে পৌরহিত্যের ভার অর্পণ করা হয়। যাজ্ঞিকদের ভিতর বৃহস্পতিও একজন ছিলেন। যজ্ঞের জন্য যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন তাহা সমস্তই সরবরাহ করা হইয়াছিল, কেবল মাত্র কোনও পশু বলিদান করা হয় নাই। এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে আহূত দেবতা যজ্ঞক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞাগ্রভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া তিনি যজ্ঞাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৃহস্পতি রুষ্ট হন। অবশেষে বৃহস্পতির এই রোষ শান্ত করা হয়। যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হওয়ায় এই নৃপতিটিকে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে হইয়াছিল। (Santiparva, Mahabharata, Ch. 136. p. 1802) মহাভারতের এই পর্ব্বেই দেখা যায় যে, এই যজ্ঞের সম্পর্কে দেবতা এবং ঋষিদের ভিতর একটি বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। দেবতারা যজ্ঞে ছাগবলির সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং ঋষিরা ছাগবলির বিরোধী ছিলেন। অবশেষে রাজা উপরিচর বসুকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। তিনি দেবতাদের পক্ষে মত দান করেন! এই জন্য ঋষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। অভিশাপের ফলেই তাঁহাকে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রাজার নারায়ণের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস

ছিল এবং নারায়ণই তাঁহাকে অভিশাপের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। (Mahabharata, Santiparva, Ch. 137. p p. 1803—1804)

চেদি রাজ্যের সোত্থিবতী নগরের রাজা উপচর বা অপরের পূর্ব্ব-পুরুষের একটি বংশানুক্রম চেদিয় জাতকে পাওয়া যায়। মহাসম্মতের পর রোজ, রোজের পর বর-রোজ, বররোজের পর কল্যাণ, কল্যাণের পর বরকল্যাণ, বরকল্যাণের পর উপোসথ, উপোসথের পর মান্ধাতা, মান্ধাতার পর বরমান্ধাতা, বরমান্ধাতার পর চর এবং চরের পর উপচর বা অপচর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই চেদি বা চেদিবংশের নৃপতিবর্গ। উপচরের পুরোহিত ছিলেন কপিল নামে একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা রাজার সহধ্যায়ী ছিলেন। রাজপুত্র উপচর এই ভ্রাতার কাছে শপথ করেন যে, তিনি সিংহাসনে আরো-হণ করিলে তাঁহাকে রাজপুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু রাজা হইয়া এ শপথ তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কারণ বৃদ্ধ পুরোহিতকে পদচ্যুত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই শপথ প্রতিপালনের চেষ্টায় তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হয়। ফলে তিনি অবীচি নরকে গমন করিয়াছিলেন। চেদির অধিবাসীরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা উপচরের পাঁচটি পুত্র ছিল। পুরোহিত তাঁহাদিগকে পাঁচদিকে গমন করিতে উপদেশ দেন। ফলে প্রথম পুত্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া হথিপুর প্রতিষ্ঠিত করেন, দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণদিকে গমন করিয়া অশ্‌শপুর প্রতিষ্ঠিত করেন, তৃতীয় পুত্র পশ্চিমদিকে গমন করিয়া সীহপুর প্রতিষ্ঠিত করেন, চতুর্থ পুত্র উত্তরদিকে গমন করিয়া উত্তর পঞ্চাল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পঞ্চম পুত্রটি উত্তর পশ্চিমদিকে গমন করিয়া দদ্দরপুর প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইহার পরে মহাভারতের যুগে চেদি-সম্রাটদের ভিতর শিশুপালই বিশেষ খ্যাতি এবং শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দমঘোষসুত (মহাভারত ১,৭০২৯) অথবা দম-ঘোষাত্মজ (২,১৫৯৪,৩—৫১৬) নামেও অভিহিত হইতেন। মহাবীর জরাসন্ধের সহিত তিনি যোগদান করেন এবং তাঁহার শৌর্য্য এবং পরাক্রমের জন্য তিনি মগধ সম্রাটের প্রধান সেনাপতির পদও লাভ করেন। (মহাভারত, ২য়, ১৪; ১০—১১) তাঁহার অত্যাচার সমসাময়িক ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ভয়ে কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও সাহস পাইতেন না। লোকে তাঁহাকে দৈত্য হিরণ্যকশিপুর অবতার বলিয়া মনে করিত। (আদিপর্ব্ব, ৬৭—৫) মহাভারতে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবন যাদুশক্তির দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল এবং সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে তাঁহার কোনও হানি করাও সম্ভবপর ছিল না। মাতৃকুলের দিক হইতে তিনি সত্বত বা যাদবদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু যাদবদের শত্রু কংশ এবং জরাসন্ধের সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদবদের রাজধানী দ্বারকাকেও তিনি ধ্বংস করেন; তাহা ছাড়া অন্য বহু উপায়ে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেও তাঁহাকে দেখা যায়। যাদব-বীর কৃষ্ণ তাঁহার পরিবারের এই মহাশত্রুর নিধনের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এই সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়। যুধিষ্ঠির মহাভারতের যুগে জয়ের দ্বারা উত্তর ভারতে ক্ষত্রিয় রাজাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়স্বরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। যজ্ঞের প্রথা অনুসারে সমবেত জন-মণ্ডলীর ভিতর শ্রেষ্ঠ মানবকে অর্ঘ্যদানের নিয়ম ছিল। এক্ষেত্রে এই অর্ঘ্য কাহাকে প্রদান করা সঙ্গত, যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের নিকটে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় অর্ঘ্য লাভের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক মনে করিয়া ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেন এবং তাঁহাকেই অর্ঘ্যদান করা হয়। এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপাল ভীষ্মের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং তাঁহার এই প্রতিবাদ আরও কতকগুলি নৃপতিরও সমর্থন লাভ করে। ইহার পর শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। এই গল্পের অবশিষ্ট ভাগ সোরেনসেনর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি:—"যুধিষ্ঠির যজ্ঞে বাধা পড়িবে বলিয়া ভীত হইলে ভীষ্ম তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন যে—কৃষ্ণের শক্তি অপ্রতিহত। শিশুপাল

ভীষ্ম এবং কৃষ্ণকে পুনরায় নিন্দা করিলেন এবং ভীষ্মকে একটি বৃদ্ধ রাজহংসের সহিত তুলনা করিলেন। এই রাজহংসটি সর্ব্বদা ধর্ম্ম প্রচার করিত বলিয়া পক্ষীরা তাহাকে আহার দান করিত এবং তাহার কাছে ডিম রাখিয়া বাহিরে যাইত। কিন্তু রাজহংসটি ডিমগুলির রক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করিত। অবশেষে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ায় সে পক্ষীদের হাতে নিহত হয়। ইহার পর শিশুপাল জরাসন্ধের প্রতি ব্যবহারের জন্য কৃষ্ণকে নিন্দা করেন। শিশুপাল এইরূপে যখন গর্ব্বিত বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিতেছিলেন, ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতে উদ্যত হন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—শিশুপাল তিন চক্ষু ও চারিহস্ত যাজ্ঞা করিতেছেন। অতঃপর বাল্হিক, দরদ অথবা কর্ণ প্রমুখ রাজাগণকে প্রশংসা না করার জন্য ভীষ্ম শিশুপালের দ্বারা তিরস্কৃত হন। শিশুপাল তাঁহাকে ভূলিঙ্গ পাখীর সঙ্গেও তুলনা করেন। এই সব বাক্য উচ্চারণ করার জন্য ভীষ্মের বাক্যের ভিতর দিয়াও অবজ্ঞা ও ঘৃণার আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া এইবার ভীষ্মকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম সম্পূর্ণ ভাবেই কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়া শিশুপাল কৃষ্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন সাত্বতেরা প্রাগ্‌জ্যোতিষে গমন করিলে এই শিশুপাল কিরূপে দ্বারকায় গমন করিয়া তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছিল, রাজা ভোজ রৈবতক পর্ব্বতে ক্রীড়ায় মত্ত থাকা কালে কেমন করিয়া সে তাঁহার অনুচরবর্গকে আক্রমণ করিয়া অনেককে হত্যা করিয়াছিল এবং অনেককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিল, কৃষ্ণের পিতার যজ্ঞকে পণ্ড করিবার জন্য প্রহরীবেষ্টিত যজ্ঞাশ্বকে সে কিরূপে হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাপুর হইতে সৌভীরে গমনের পথে সে কেমন করিয়া বলপূর্ব্বক বভ্রুর পত্নীর সতীত্ব নাশ করিয়াছিল, কারূষ রাজার ছদ্মবেশে কিরূপে সে ভদ্রা বৈশালীর (বৈশালীর রাজকন্যা) উপর বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, রুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী হইয়া কিরূপে সে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিল, কিরূপ অবস্থায় কৃষ্ণ তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং কিরূপে সেই সংখ্যাকে এইবার পূর্ণ হইয়া গেল—সেই সব কথা কৃষ্ণ একে একে সভায় ব্যক্ত করিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ তাঁহার চক্রকে স্মরণ করিলেন এবং চক্র তাঁহার হস্তে আসিতেই তিনি তাহা দ্বারা শিশুপালের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। রাজারা দেখিলেন যে একটি অগ্নিময় তেজ শিশুপালের দেহ হইতে নির্গত হইয়া কৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করিল। আকাশ যদিও নির্মেঘ ছিল তথাপি তাহা হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইল। যুধিষ্ঠির তখন তাঁহার ভ্রাতাগণের দ্বারা ধর্ম্মঘোষের পুত্র শিশুপালের দেহের সৎকার করাইলেন এবং সমস্ত নরপতির অনুমোদন লইয়া শিশুপালের পুত্রকে চেদির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। (S. Sorensen, An Index to the names in the Mahabharata, p. 201)

মহাভারতে শিশুপাল সম্পর্কে যে গল্প বর্ণিত হইয়াছে পুরাণের গল্পও তাহারই অনুরূপ। অগ্নিপুরাণে (৪, ১৪) দেখা যায়, চেদিরাজ দমঘোষ বাসুদেবের ভগ্নী শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুপাল ইঁহাদেরই পুত্র। (Vayu, Ch. 96. Brahma, Ch. 14) দমঘোষের পুত্র চেদিরাজ শিশুপাল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু হস্তে ধনুক গ্রহণ করিয়াই তিনি বসিয়া পড়েন। (Mahabharat, Adiparva, Ch. 87, p. 177) ভীমসেন চেদিরাজধানীতে গমন করিয়া শিশুপালকে অনায়াসেই পরাজিত করিয়াছিলেন। (Mahabharta, Sabhaparva Ch. 29, p. 241) বনপর্ব্বে দেখা যায় যে, শিশুপাল এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজন্যবর্গকে কর্ণ পরাজিত করেন। (Ibid, Ch. 259, p. 513-14) শিশুপালের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির তাঁহার পুত্র ধৃষ্টকেতুকে চেদির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবদের বন্ধু ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তিনি চেদি সৈন্যের সেনাপতি রূপে পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। (Mahabhrata, Udyogaparva, Ch. 156. p 777, Ch. 198 pp. 807—808)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় চেদিরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। কারণ দেখা যায় যে, ধৃষ্টকেতু পূর্ণ এক অক্ষৌহিনী সৈন্যকে সমরক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়াছিলেন। (V. 19) ভীষ্ম-পর্ব্বে চেদি রাজকে ভীম ও অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত সৈন্যদের পুরোভাগ অধিকার করিয়া থাকিতে দেখা যায়। (Ch. 19, p. 830) এই পর্ব্বেরই অন্যত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতিকে চেদি ও অন্যান্য সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিপুল বাহিনীর মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। (Ch. 59, p. 935) ধৃষ্টকেতু একটি কম্বোজ দেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। এই অশ্বটি হরিণের ন্যায় বিচিত্র বর্ণে ভূষিত ছিল। (Dronaparva, Ch, 22. pp. 1012—1013) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার ভ্রাতা সুকেতুও দ্রোণের হস্তে নিহত হন। (Mahabharata, Karnaparva, Ch. 6. p 1169) দুর্য্যোধনের সঙ্গে এই যুদ্ধে চেদিরা যে পাণ্ডবদের পরাক্রমশালী সহায় ছিল তাহা যুধিষ্ঠিরও স্বীকাব করিয়াছিলেন। (Mahabharata, Udyogaparva, Ch, 72 p. 714) ভীম ১৮ জন রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা মহাপরাক্রমের দ্বারা তাঁহাদের বন্ধু এবং আত্মীয়গণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই ১৮ জনের ভিতর চেদি বংশের সহজও একজন। (Mahabharata, Udyogaparva, Ch. 71, p 717)

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে দেখা যায় যে, অর্জ্জুন দক্ষিণ দিকে তাঁহার অশ্বের গতি মুক্ত করিয়া অশ্ব চেদি রাজ্যের শুক্তি নামক নগরে উপস্থিত হয়। এইখানে শিশুপালের পুত্র সরভের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সরভ পরাজিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। (অধ্যায় ৮৩-৮৪, পৃ: ২০৯৩-২০৯৪)

বিষ্ণুপুরাণ (৪-১২) এবং অগ্নিপুরাণে (২৭৫) কৌশিকের পুত্র চেদির বংশধরগণ চেদিয় নামে বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (Chap. 129, 130, 131)

পুরাণে চেদিদের প্রসঙ্গ

সুশোভনা নাম্নী একজন চেদি রাজকুমারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি রাজা মরুর বহু মহিষীর অন্যতমা ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের (৮, ১২) মতে জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভের তিনটি পুত্র ছিল, কৌশিক তাহাদেরই একটি। চেদি এই কৌশিকেরই পুত্র এবং চেদির বংশধরেরা চেদিয় নরপতি নামে পরিচিত। (বায়ুপুরাণ, অধ্যায় ৯৫ দ্রষ্টব্য) মৎস্য-পুরাণে (অধ্যায়-৪৪), চেদি নামটি চিদিরূপে লিখিত হইয়াছে। (অগ্নিপুরাণ, অধ্যায় ২৭৫ দ্রষ্টব্য) কর্ম্মপুরাণেও চেদিদের উদ্ভবের এই একই গল্প পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় যে, রাজা বিদর্ভের একটি পুত্র ছিল—তাঁহার নাম চেদি। ইঁহারই বংশধরেরা চেদিয় নামে পরিচিত। চেদির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল দ্যুতিমান। তাঁহার অন্যান্য পুত্রের নাম বপুষ্মান, বৃহৎমেধা, শ্রীদেব এবং বীতরথ। (কর্ম্মপুরাণ—অধ্যায় ২৪) মিঃ পারজিটার বলেন যে, চেদি, বৎস প্রভৃতি রাজ্য পৌরবদের শাসনভুক্ত হয় নাই। (Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, p. 293) কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, বিখ্যাত নৃপতি বসু উপরিচর যিনি চেদি রাজ্য জয় করিয়া সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন পৌরব বংশ হইতেই তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। মিঃ পারজিটার মনে করেন যে, প্রত্যগ্রহ সম্ভবতঃ চেদি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। (Ibid. p. 118).

মহাভারতে চেদিদিগকে পঞ্চাল, মৎস্য, করূষ প্রভৃতি উত্তর ভারতের জাতিসমূহের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়; আবার কাশী, কোশল প্রভৃতি পূর্ব্বভারতের জাতি সমূহের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

চেদি রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান

মৎস্যদের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়, চেদিদের সহিত মৎস্যের সম্পর্কের উল্লেখ আমরা করিয়াছি। চেদি-কারূষকাঃ ভূমিপালাঃ অথবা চেদি এবং কারূষক রাজাদের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। ইঁহারা পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। (V. 22) আবার চেদি-পাঞ্চাল কৈকেয়কেও এক মণ্ডলীভুক্ত করা হইয়াছে। (V. 196) ভীষ্ম-পর্ব্বেও চেদি-কাশী-করূষকে এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। (VI, 47; VI, 106; VI, 115; VI, 116) কখনও কখনও চেদিদিগকে কারূষদের এবং

মৎস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়—যেমন, চেদি মৎস্য-করুষঃ (VI, 54.) অথবা চেদি কারুষ-মৎস্যানাম্। (VIII, 30) আবার চেদি-পাঞ্চাল-কারূষ-মৎস্যাঃ (VI, 59) কিম্বা চেদি-কারূষ-কোশলাঃ (VII, 21) এরূপ সংযোগও দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ আরও অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অধিকাংশ স্থলে চেদিদিগকে মৎস্যদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়, এবং মনে হয় পশ্চিমদিকে মৎস্য এবং পূর্ব্বদিকে কাশী চেদিদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল।

চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর রাজধানীর নাম ছিল শুক্তিমতী; (Mahabharat, III, 22) শুক্তি হইতে এ নাম উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (XIV. 83) এই নগরটি শুক্তিমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। চেদিরাজ বসু উপরিচরের রাজধানীর নিকট দিয়া এই নদীটি প্রবাহিত হইত। (I. 63) ভীষ্মপর্ব্বের ভৌগোলিক অধ্যায়ে শুক্তিমতীকে ভারতবর্ষের একটি নদী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (VI. 9)

পদ্মপুরাণে একটি জনপদরূপে চেদির উল্লেখ পাওয়া যায়। (তৃতীয় অধ্যায়) জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেও ১৬টি মহাজনপদের একটি জনপদ বলিয়া চেদি (চেটি) বর্ণিত হইয়াছে। (Anguttara Nikaya, vol. IV. pp. 252, 256 and 260. cf Bhagavati Sutra) ডাঃ T. W. Rhys Davids বলেন, প্রাচীন পুঁথিপত্রে যে জাতি চেদি নামে পরিচিত সম্ভবতঃ চেটিও তাহারাই। তাহাদের দুইটি পৃথক উপনিবেশ ছিল। একটি এবং সম্ভবতঃ পুরাতনটি বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে নেপাল বলি সেই নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে, অন্যটি এবং সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীটি ছিল পূর্ব্বদিকে কোশম্বীর নিকট। বংসদের প্রদেশের সঙ্গে এইটিকে লইয়াই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। (Buddhist India, p. 26) Ancient India নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৮) ডাঃ এস্ কুমার স্বামী ডাঃ Rhys Davidsএর মতকেই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, চেদিদের এক শাখার বাসস্থান ছিল বুন্দেলখণ্ডে, অন্যটির ছিল নেপালের ভিতর কোনও স্থানে।

কানিংহাম বলেন—কলচুরি অথবা চেদির হৈহয় বংশের শিলালিপিতে রাজারা "কালঞ্জরপুর এবং ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি"রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কালঞ্জর বুন্দেলখণ্ডের একটি বিখ্যাত পার্ব্বত্য দুর্গ,—এবং ত্রিকলিঙ্গ নিম্নলিখিত তিনটি প্রদেশ—ধনক অথবা কিস্তনার তীরস্থ অমরাবতী, অন্ধ্র অথবা ওরাঙ্গোল, এবং কলিঙ্গ অথবা রাজমহেন্দ্রী। (Ancient Geography P. 518) ডাঃ ডি আর ভাণ্ডারকর বলেন—চেতিয় প্রদেশ বলিতে মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ডকেই বুঝায়। (Carmichael Lectures. 1918 p. 7) মিঃ র‍্যাপসনের মতে বৈদিক যুগের পরে চেদিরা মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিল। Ancient India (p. 162) Cambridge History of Indiaয় দেখা যায় যে, চেদিরা বিন্ধ্যাচলের উত্তরে বুন্দেলখণ্ডে বাস করিত। (পৃঃ ৮৪) মিঃ পারজিটারের মতে যমুনার দক্ষিণে চেদিদের বাসস্থান ছিল। (Ancient Indian Historical Tradition, p. 272) মিঃ এন-এল্ দে তাঁহার ভৌগোলিক অভিধানে (Geographical Dictionary) লিখিয়াছেন যে, টডের মতে মালয়োর চন্দেরী নামক সহর শিশুপালের রাজধানী ছিল। এই শিশুপাল কৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ডাঃ কুরারের মতে দহল মণ্ডলই প্রাচীন চেদি। কেহ কেহ আবার বলেন বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ অংশ এবং জব্বলপুরের উত্তর অংশ লইয়া চেদি রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। গুপ্তরাজাদের সময় কালঞ্জর চেদির রাজধানী ছিল। চেদি ত্রিপুরী নামেও অভিহিত হইত। (N. L. Dey, Geographical Dictionary p. 14)

বেস্সন্তর জাতকে চেদিরাষ্ট্র রাজা বেস্সন্তরের জন্মস্থান জেতুত্তর নগর হইতে ৩০ যোজন দূরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ৬০,০০০ ক্ষত্রিয় বাস করিত। ইহারাও চেতিয় রাজা নামে অভিহিত হইয়াছে। বেস্সন্তর স্ত্রীপুত্র সহকারে প্রাতঃভোজনের সময় জেতুত্তর হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যাকালে চেদিরাষ্ট্রের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (Jataka, vol. VI. pp. 514-515) চেতিয় জাতকে রাজা উপচরকে চেতিরাজ্যের সোত্থিবতি

নগরের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (Ibid, vol, III. pp. 454-461) এই বিবরণ হইতে মনে হয় সোথিবতি এবং মহাভারতের শুক্তিমতী একই নগর এবং ইহাই চেতি রাজার রাজধানী ছিল।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চেতি রাজ্য মহামূল্য ধনরত্ন মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার খনিজ সম্পদও প্রচুর ছিল। রাজ্যের নগরগুলিতে বহুলোক বাস করিত। তাহারা সচ্চরিত্র এবং সুন্তুষ্টচিত্ত ছিল এবং উপহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলিত না। পিতা পুত্রের ভিতর ধনৈশ্বর্য্যের ভাগবাটোয়ারার প্রথা ইহাদের অজ্ঞাত ছিল এবং পিতামাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে চেতিপুত্রেরা তৎপর ছিল। দুর্ব্বল গাভীর দ্বারা কখন হাল কর্ষণ করা হইত না। পণ্য বহনার্থে তাহাদিগকে শকটে সংযোজিত করাও নিষিদ্ধ ছিল। চেদিতে চারিবর্ণের লোক তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবস্থিত ছিল। (M. N. Dutt, Mahabharat, Adiparva. p. 84)

জাতকে এবং মহাভারতে চেদি-দের প্রসঙ্গ

বেস্‌সন্তর জাতকে চেতরাজ্য অথবা চেদিরাষ্ট্র উন্নতিশীল ঐশ্বর্য্যশালী, মাংস, মদ্য, ধান্যপূর্ণ জনপদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (Jataka, Fausboll, vol. VI. pp. 514-515) চৈনিক পরিব্রাজকেরা চেদিদের কোনও বিবরণ প্রদান করেন নাই।

বেস্‌সন্তর জাতকে দেখা যায় যে, বেস্‌সন্তর স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিতা জেতুত্তরের রাজা সিবির রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে বেস্‌সন্তর চেদি রাজধানীতে প্রবেশ না করিয়া নগরতোরণে একটি শালায় অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহাদের দেহে মহত্ত্বের চিহ্নসমূহ অবলোকন করিয়া চেতি অথবা চেদিরাজ্যের অধিবাসীগণ তাঁহাদের চারিপাশে সমবেত হয় এবং এরূপ শুভচিহ্নসমূহের দ্বারা ভূষিত লোকদিগকে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের জন্য দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর তাঁহারা অবিলম্বে চেদিরাজ্যে ৬০ হাজার ক্ষত্রিয় অধিবাসীকেও ইঁহাদের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করে। ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া বেস্‌সন্তরের বাসস্থানের সম্বন্ধে সন্ধান লয় এবং তাঁহাকে তাঁহার সে স্থানে আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। বেস্‌সন্তর কহিলেন—তিনি বঙ্ক পর্ব্বতে (গন্ধমাদন) গমন করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থানটি পরিদর্শনের জন্যও তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহারা তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে এবং বলে যে, তাঁহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহারা সিবি রাজার কাছেও গমন করিবে। বেস্‌সন্তর কহিলেন—সিবি রাজার প্রজারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নহে বলিয়াই তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং রাজার নিকট গমন করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার পর বেস্‌সন্তর বঙ্কপর্ব্বতের অভিমুখে গমন করেন। এই ৬০ হাজার ক্ষত্রিয়ও কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের ভিতর, হইতে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোককে বাছিয়া লইয়া নবাগতদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য অরণ্যদ্বারে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। এইরূপে তাহারা বেস্‌সন্তরকে বঙ্কপর্ব্বত গমনের পথে সাহায্য করে। (Jataka, Fausboll Vol. VI. pp. 516-519) উপরোক্ত ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে, চেদিরা অপরিচিতদের প্রতি অতিথি-সৎকার-পরায়ণ ছিল।

বেদব্ভ জাতকে দেখা যায় যে, বারাণসীর কোনও পল্লীর এক ব্রাহ্মণ বেদব্ভ নামক একটি মন্ত্র জানিত। বোধিসত্ত্ব এই ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন। একদা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন চেতিয় প্রদেশে গমন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে একদল দস্যুর দ্বারা তিনি ধৃত হন। মুক্তিমুদ্রা আদায় করিয়া লইয়া বন্দীকে মুক্তিদান করাই ছিল দস্যুদের ব্যবসায়। এ ক্ষেত্রেও তাহারা ব্রাহ্মণকে ধরিয়া রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে মুক্তিমুদ্রা আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করে। ব্রাহ্মণের হাত পা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে এরূপভাবে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে কেন? উত্তরে দস্যুরা কহিল—মুক্তিমুদ্রা আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, অর্থ পাইলেই তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেই আকাশ হইতে অর্থবৃষ্টি হইতে

লাগিল এবং অর্থ পাইয়া দস্যুরাও তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ অতঃপর এই দস্যুদলকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ইতি মধ্যে পাঁচশত লোকের দ্বারা গঠিত এই দস্যুদলটি অন্য একটি সমানসংখ্যক দস্যুদলের দ্বারা আক্রান্ত হইল। প্রথম দস্যুদল শেষোক্ত দস্যুদলকে কহিল—তাহারা যদি অর্থের কামনা করে তবে যেন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে। ইহা শুনিয়া তাহারা ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু এবার আর তাহাতে কোনও ফল হইল না। ইহার পর ব্রাহ্মণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার প্রথম দলকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষে দুইজন ছাড়া উভয় দলের সমস্ত লোকই নিহত হয়। পরে এই অবশিষ্ট দুইজন লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়া টাকা কড়ি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া যান। (Jataka, Vol. 1 pp. 121-124) ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, বারাণসী হইতে চেদিতে আসিবার সময় দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল এবং পথ মোটেই পথিকদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না।

অঙ্গুত্তর নিকায়তে Vol. 111 (P. T. S. pp. 355-356) দেখা যায়, মহাচুন্দ একবার চেদিদের ভিতর সহজাতি নগরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে

চেদিরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম

সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করেন—"যাঁহারা ভিক্ষুধর্ম্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা চিন্তাশীল ভিক্ষুদিগকে শ্রদ্ধা করিবেন। আবার চিন্তাশীল ভিক্ষুদেরও উচিত যাঁহারা ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।" এই নিকায়তেই আরও দেখা যায় যে, অনুরুদ্ধ চেদিদের ভিতর প্রাচীন বংশের মৃগোদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। এখানে একটি নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া তিনি এইরূপভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন—"বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্ম তাহাদেরই উপযোগী যাহাদের বাসনা খুব কম, যাহাদের মনে অসীম আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে ইহা তাহাদের উপযোগী নহে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাঁহাদেরই উপযোগী যাঁহারা যাহা কিছু সামান্য পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, যাঁহারা নির্জ্জনে বাস করেন, যাঁহারা সাধনা করিতে প্রস্তুত।" অনুরুদ্ধের মনের এই চিন্তা বুদ্ধ নিজের মন দিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে এইভাবে চিন্তা করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করেন—"এইরূপভাবে যদি তুমি চিন্তা কর তবে তুমি সমাধির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরে উপনীত হইবে।" ইহার পরে তিনি অনুরুদ্ধকে মৃগোদ্যানে আর একটি বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই চেদি অথবা চেদিদের ভিতর অবস্থান করিয়া অনুরুদ্ধ 'অর্হত্ব' অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (P. T. S. Vol. IV. p. 228. foll) মহাচুন্দ চেতিদের ভিতর সহজাতি সহরে যখন বাস করিতেছিলেন তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ উচ্চারণ করেন—"যে সব ভিক্ষু বলে 'আমরা ধর্ম্ম কি তাহা জানি এবং তাহা উপলব্ধি করিয়াছি' তাহাদিগকে যদি অর্থলোভ, অসূয়া, অজ্ঞান ও ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে দেখা যায় তবে তাহাদিগকে বলা উচিত যে, ধর্ম্ম কি তাহা তাহারা জানে না, এবং তাহাকে অন্তরের ভিতর উপলব্ধিও করিতে পারে নাই। যে ভিক্ষু বলে যে সে কায়, শীল, মন এবং প্রাণ সম্বন্ধে ধ্যান করিয়াছে তাহাকে যদি অর্থলোভ, অসূয়া, অজ্ঞান, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে দেখা যায় তবে তাহাকে বলা উচিত যে, সে এরূপভাবে ধ্যান করে নাই যাহাতে এই রিপুগুলিকে জয় করা যায়।" মহাচুন্দ ভিক্ষুদের কাছে বিরুদ্ধমতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (Anguttara. P. T. S. Vol. V. p. 41 foll.) সহজাতি নগরে চেদিদের ভিতরে অবস্থান কালে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া মহাচুন্দ আরও বলেন—"যদি কোনও ভিক্ষু বলেন যে, তিনি চারি স্তরের সমাধি নিরাকার সম্বন্ধে চারিস্তরের জ্ঞান, এবং নিরোধ সমাপত্তির তপস্যা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, এবং তথাগত অথবা তথাগতের শিষ্যবর্গের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া অহঙ্কারের দ্বারা যদি তিনি এই

বৃষ্টি ধারা
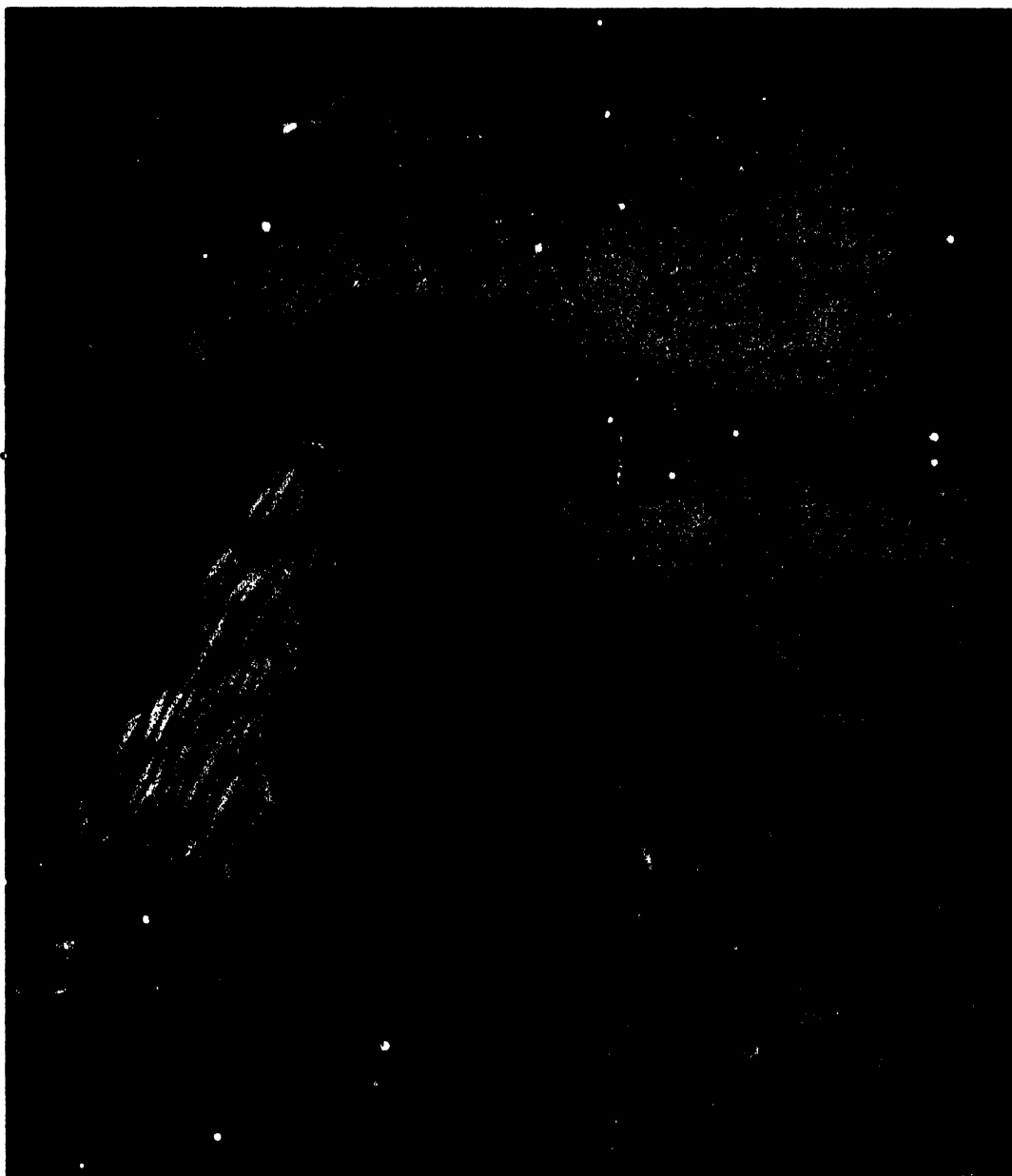
শিল্পী—শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

সমস্ত বিনষ্ট করেন, তবে সে ভিক্ষুকে দুষ্টবুদ্ধি, বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসহীন এবং শীল ভঙ্গ করার জন্য অশিক্ষিত অবাধ্য, পাপীর বন্ধু, অলস, অমনোযোগী, স্তাবক, মনুষ্য-সমাজের ভার, অজ্ঞানী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা উচিত।" তিনি ভিক্ষুদের কাছে বিরুদ্ধ মতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (Anguttara Nikaya. P. T. S. Vol. V pp. 157—161) দীর্ঘ নিকায়ে দেখা যায় যে, বুদ্ধ প্রচারোদ্দেশে চেদি এবং অন্যান্য জাতির নিকটও গমন করিয়াছিলেন। (Vol II. pp. 200, 201, 203, Janavasabha Suttanta) সংযুক্ত নিকায় বলেন,—সহজাতিকে চেদিদের ভিতর বহু থের বাস করিতেন। ভিক্ষার কাজ সমাধা করিয়া তাঁহারা একত্রে মিলিত হইতেন। নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহাদের ভিতর আলাপ আলোচনা চলিত:—"যাঁহারা দুঃখকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা দুঃখের উৎপত্তি, তাহার নির্ব্বাণ এবং নির্ব্বাণের পথও উপলব্ধি করিয়াছেন।" গবম্পতি নামে একজন থের অন্য একজন থেরকে বলিয়াছিলেন—"আমি বুদ্ধের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে, যাঁহারা দুঃখকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা দুঃখের উৎপত্তি, তাহার নির্ব্বাণ এবং তাহার নির্ব্বাপিত করিবার পথও উপলব্ধি করিবেন। যাঁহারা দুঃখের উৎপত্তি উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা দুঃখ, তাহার নির্ব্বাণ এবং তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার পথও উপলব্ধি করিবেন। যাঁহারা দুঃখের নির্ব্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারা দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, এবং দুঃখনির্ব্বাণের পথও উপলব্ধি করিয়াছেন; যাঁহারা দুঃখ নির্ব্বাণের পথকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, এবং তাহার নির্ব্বাণও উপলব্ধি করিবেন। (Samyutta Nikaya, Vol. V. pp. 436—437)

ডাঃ ভি-এ-স্মিথ বলেন—পুরু প্রভৃতি বৈদিক যুগের অন্যান্য জাতির মতই চেদি জাতিও কতকগুলি পরিবারের সমষ্টিমাত্র ছিল। প্রত্যেক পরিবারে পিতাই প্রভু ছিলেন। একজন রাজা সমস্ত পরিবারকে শাসন করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা একটি জাতীয় সভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। এই নিয়ন্ত্রণের কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, আগ্নেয়াস্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বর্ত্তমানযুগে আফগানিস্থানের জনসাধারণের জীবন যাত্রার ধারা যেরূপ ছিল, ইহাদের জীবন যাত্রার ধারা তাহারই অনুরূপ ছিল। (Ancient and Hindu India. p—22)

শাসন পদ্ধতি

চেদি রাজারা যে অব্দ ব্যবহার করিতেন সেই অব্দ অনুসারে তাঁহাদের প্রথম বৎসর ২৪৮-২৪৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়া দাঁড়ায়। এই অব্দকে ত্রৈকুটক নামেও অভিহত করা হইত। পশ্চিম ভারত এই ত্রৈকুট অব্দের উদ্ভব স্থান। সেখানে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা অনুসরণ করা যায়। চেদি রাজেরা যে কারণে এই অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট নহে। (V. A. Smith, Early History of India. p. 394) মিঃ র‍্যাপসন বলেন যে—চেদি এবং কলচুরি অব্দ ২৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ইহা ভারতের কোনও প্রদেশে একটি বড় শক্তি প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। প্রথমে ইহা ইহার প্রবর্ত্তকের রাজ্যারম্ভের বৎসরকেই বুঝাইত। (Ancient India. P. 22)

চেদি অব্দ

চেদিবংশের প্রথম কোকল্লদেব দ্বিতীয় ভোজদেবকে কনৌজের সিংহাসন-আরোহণে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিলহরীতে আবিষ্কৃত চেদিরাজদের শিলালিপি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম কোকল্লদেব পৃথিবীতে দুইটি অত্যাশ্চার্য্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। (R. D. Banerjee, Vangalar Itihasa, p. 202) মিঃ ব্যানার্জ্জি দেখাইয়াছেন যে, মহীপালদেবের রাজত্বকালে চেদিবংশের গাঙ্গেয় দেব গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন। (Ibid, p. 224) মিঃ ব্যানার্জ্জি আরও বলেন—দহলের চেদি বংশীয় গাঙ্গেয় দেবের মুদ্রাই কেবলমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে দাহলের চেদিবংশোদ্ভব অন্য কোনও রাজার মুদ্রা এপর্য্যন্ত

পরবর্ত্তী নৃপতিগণ

পাওয়া যায় নাই। (Ibid, p. 212) মুদ্রাবিদ্যা-বিশারদেরা মনে করেন—গাঙ্গেয়দেব (চেদিবংশের) উত্তরাপথে (প্রাচীন মুদ্রা-পৃঃ ২১১) একটি নূতন মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। চেদিরা মৎস্যদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয় দেবের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রা সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি একই রকমের। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে দুই পংক্তিতে রাজার নাম লিখিত আছে অন্য পৃষ্ঠে একটি চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত। (প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ২১২) একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ (কনৌজ) চেদি বংশোদ্ভব কর্ণদেবের শাসনভুক্ত হয়। (Ibid p. 215)

কল্যাণপুরের চেদি অথবা কলচুরি বংশের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির একপৃষ্ঠে বরাহ অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত, অন্য পৃষ্ঠে নাগরী অক্ষরে "মুরারি" এই কথাটি লিখিত আছে। 'মুরারি' সম্ভবতঃ কল্যাণপুর চেদিবংশের দ্বিতীয় রাজা সোমেশ্বর দেবের আর একটি নাম। মিঃ ব্যানার্জ্জিও এই মতেরই সমর্থন করেন। (R. D. Banerjee, Pracina Mudra, p. 184)

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অপচয়

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস্

আমারে ঘিরিয়া করে তীর্থ পরিক্রমা
কোটী তারা কোটী যাত্রী সমা।
দিনে থাকি আন্‌মনা রাত্রে অচেতন
ওরা হানে কপালে কঙ্কণ।
আমার নাসার পাশে ফিরে অহরহ
ত্রিলোকের ধূপ-গন্ধবহ।
দিনে থাকি আন্‌মনা রাত্রে অচেতন
দীর্ঘ শ্বাসে দক্ষিণ পবন।
আমারি মধুর নাম অষ্টোত্তর শত
বিহগেরা জপে অবিরত।
দিনে থাকি আন্‌মনা রাত্রে অচেতন
ওরা করে অরণ্যে রোদন।
আমি ভাবি আমি তুচ্ছ আমি সৃষ্টিছাড়া,
মোর কাছে কে-বা চায় সাড়া!
দিনে থাকি আন্‌মনা রাত্রে অচেতন
ব'হে যায় দুর্ল্লভ জীবন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

নেকী

—গল্প—

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

পূর্ব্ববঙ্গের মহকুমা সহর।

সহর সন্দেহ নেই, তবে বিশুদ্ধ নয়। গ্রামের খাদ আছে। চারিদিক ঘুরে এলে মনে হয় এ যেন সহর আর গ্রামের আলিঙ্গন-বদ্ধ মূর্ত্তি।

বাজার আর আপিস অঞ্চলটুকু দিব্যি সহর। আপটুডেট বাজার,—কলকাতায় কোন নতুন ফ্যান্সি জিনিষ উঠলে এক মাসের ভেতরে স্থানীয় মনিহারী দোকানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটিমাত্র বাঁধানো রাস্তা, মাইলখানেক লম্বা,—বাজারের বুক ভেদ ক'রে, আদালতের গা ঘেঁষে গিয়ে মাটির রাস্তায় আত্মগোপন করেছে। বাজারের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা শাখাও আছে।

বাজারের কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুল। কাছাকাছি পাবলিক লাইব্রেরী, টাউন হল, অফিসারদের ক্লাব, ক্লাব-সংলগ্ন টেনিস-কোর্ট, ইত্যাদি। অভাব নেই কিছুরই। সহর যেমন হয় আর কি।

বাকীটুকু কিন্তু গ্রামছাড়া কিছু নয়। বাড়ী ঘর সবই প্রায় চাঁচের বেড়া এবং টিনের ছাদ দেওয়া। কোন কোনটার ভিটেটুকু মাত্র পাকা বাঁধানো, এই যা। শুধু তাই নয়, গ্রামের যা প্রধান প্রধান লক্ষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান পুকুর ডোবা ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বেতবন থেকে আরম্ভ ক'রে সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেজী এবং টিকটিকির রাজসংস্করণ গোসাপ পর্য্যন্ত সমস্তই আছে।

সহরের পশ্চিম প্রান্তে আগাগোড়া চুনকাম-করা একটি সরকারী বাড়ী। এস, ডি, ওর বাংলো আফিসের কাছেই, এ বাড়ীটা অর্ডার অব্ পোজিসন অনুসারে বরাবর সেকেণ্ড অফিসার দখল ক'রে থাকেন। এখন আছেন হেমন্ত মুখার্জ্জি।

বাড়ীটির পিছনে প্রকাণ্ড এক আম বাগান, তারই এক দিকে ডোবা সংস্করণ একটি পুকুর। এ গল্পের আরম্ভ ওইখানে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়।

ষোল সতর বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। পুকুরের চারিদিকে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গাছপালার প্রাচীর। এত ঘন যে আট দশ হাতের ভেতরে এলেও বুঝতে পারা যায় না এখানে পুকুর আছে। আশে পাশে বাড়ী ঘরও বেশী নেই,—একান্ত নির্জ্জন। মেয়েটির শঙ্কা ছিল না, নিত্যকার মত সমস্ত পুকুরটা সাঁতরে এসে নিশ্চিন্তচিত্তে অঙ্গমার্জ্জনা করছিল। হঠাৎ ওপারে নজর পড়তে দেখল, বছর বাইশ তেইশের একটি ছেলে, চোখে সোনার চশমা,একটা আম গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রস্ত হয়ে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ক'রে দিয়ে মেয়েটি সংযত হ'য়ে নিল। জড়সড় হ'য়ে তেমনিভাবে গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে, স'রে যাবে।

ছেলেটির কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাগে বিরক্তিতে মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরল। এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা ক'রে জল থেকে উঠে এল। তারপর ধীর পদে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে গাছের উপর কি দেখছিল, যেন পৃথিবীর আর কোন দিকে তার লক্ষ্যই নেই।

রাগে গা জ্ব'লে গেল, তিক্তস্বরে মেয়েটি ব'ল্লে, দেখুন—

ছেলেটি চমকে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটি ব'ল্লে, এত দূর থেকে দেখতে আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে, ঘাটের পাড়েই চলুন না? আমার স্নানের এখনো বাকী আছে।

আমায় বলছেন ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি তো কারুকে দেখছি না এখানে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার যদি এ রকম প্রবৃত্তি—রাগে দুঃখে ঘৃণায় মেয়েটির কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে গেল।

ছেলেটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি আবার বল্লে, আর একদিন আপনি উঁকি মারছিলেন, কিছু বলিনি। কিন্তু এ আপনার কোন দেশী ভদ্রতা ? আপনার বাধে না, কিন্তু আমরা যে লজ্জায় ম'রে যাই। মানুষকে এত নীচ ভাবতেও যে কষ্ট হয়।

বিবর্ণ মুখে ছেলেটি বল্লে, এ সব আপনি কি বলছেন ? আমি—

ন্যাকামি ! ছেলেটির মুখ দেখে মন একটু নরম হয়েছিল, এই ন্যাকামিতে আবার কঠিন হ'য়ে গেল। কটু কণ্ঠে বল্লে, অন্যায় বলেছি। দুচোখ বড় বড় ক'রে দেখুন, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। স্নানের সময় গরু মহিষও তো মাঝে মাঝে জল খেতে আসে !

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। পেছনে ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, দাঁড়ান।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল।

আমায় বিশ্বাস করুন, আপনি স্নান করছিলেন আমি দেখিনি। আর একদিনের কথা বল্লেন, কিন্তু আমি কাল মোটে এখানে এসেছি। আশে পাশে যদি দুএকটা পাখী মেলে এই আশায় সকালে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। একটা ঘুঘু এই দিকে উড়ে এসেছিল, কোথায় বসল তাই দেখছিলাম ; আপনাকে নয়।

হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বল্লে, এটা দেখে আপনার বিশ্বাস হওয়া উচিত।

পিছন ফিরে মাঠের দিকে চলতে চলতে মেয়েটি বল্লে, ন্যাকামি করবেন না, আমি কচি খুকী নই।

ছেলেটির মুখ কালো হ'য়ে গেল। সকাল বেলার উজ্জ্বল আলো পর্য্যন্ত যেন এক সুন্দরী তরুণীর দেওয়া কুৎসিত অপবাদের ছাপে মলিন হ'য়ে উঠল।

ছেলেটি নিশ্বাস ফেলে স'রে গেল। পলাতক ঘুঘুটা চোখের সাম্নে দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই একটা ডালে বসল, বন্দুক তুলতে ইচ্ছা হয় না। আঁকা বাঁকা সরু পথটি ধ'রে বাগান পার হ'য়ে খিড়কির দরজা দিয়ে সাদা বাড়ীটায় ঢুকল। বন্দুকটা বড় ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বিরস মুখে খাটের একধারে ব'সে পড়ল।

মা বল্লেন, কি শিকার করলি রে অশোক ?

অপবাদ।

অপবাদ ?

হুঁঃ, ব'লে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অশোক বল্লে, গাঁয়ের মেয়েগুলি ভারি ঝগড়াটে হয়, না মা ?

কারু সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এলি নাকি ?

অশোক বল্লে, আমায় করতে হয়নি, একাই করেছে। বাবু স্নান করছিলেন, ঘুঘু খুঁজতে যেই পুকুর পাড়ে গেছি, জল থেকে উঠে এসে যা মুখে এল শুনিয়ে দিল। ওৎ পেতেছিল বোধ হয় ! বাপ্, থাক তোমরা, কাল আমি কলকাতা চম্পট দিচ্ছি।

মা বল্লেন, কোন পুকুর ? বাগানের ভেতরেরটা ?

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তবে বোধ হয় হৃদয় মোক্তারের ভাগ্নী। খুব সুন্দর দেখলি ?

দেখলাম ? সুযোগ পেলাম কই ? না দেখতেই যা শোনাল, দেখলে বোধ হয় খেয়েই ফেলত।

অশোকের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মা হেসে ফেল্লেন, না রে, ও খুব ভাল মেয়ে। দোষের ভেতর একটু তেজী আর ঠোঁটকাটা।

অশোক বল্লে, হুঁঃ !

মা বল্লেন, মেয়েদের একটু তেজ থাকা ভাল রে, কাজ দেয়। অন্যায়টা ও মোটে সহ্য করতে পারে না।

অশোক বল্লে, জানি। খুব ন্যায়বান ও ! কাল এলাম আমি এই জঙ্গলে, আর বলে কিনা আরেকদিন উঁকি মারছিলেন !

চিনতে পারেনি। নেকী তো প্রায়ই আসে আমার কাছে, চিনলেই দেখিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।

নেকী ? ওর নাম নেকী নাকি ?

হাঁা, ছেলেবেলা নাকে কাঁদত বলে ওর পিসী ওই নাম রেখেছিল। মা হেসে ফেল্লেন।

অশোক বল্লে, নাকে কাঁদত? যে রকম বলছিল মা, আমি আর একটু হ'লে কেঁদে ফেলতাম।

দুই

আজও যে সন্ধ্যার পর কালবৈশাখী দেখা দেবেন দুপুর বেলার প্রচণ্ড গুমোট সে সত্যটা নিঃসংশয়েই জানিয়ে দিচ্ছিল। কাল বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, আজ ভাপ্‌সা গরমে যেন সিদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। শুকনো খটখটে গরম বরং সহ্য হয়, এই ভিজে গরম এমন উৎকট লাগে!

বিছানায় শীতলপাটি বিছিয়েও অত্যধিক উত্তপ্ত হ'য়ে অশোক ঘামছিল। মা বাড়ী নেই, কাছেই এক মুন্সেফের বাড়ী বেড়াতে গেছেন। রোদ বৃষ্টিতে আর যা কিছু আটকাক্ মেয়েদের বেড়ানটা আটকায় না। ছোট ভাই পুলকের সকালে স্কুল, আম বাগানে তার খোঁজ মিলতে পারে।

হাতের বইটা টেবিল লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়ে অশোক উঠে বসল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্ব্বাঙ্গের ঘাম মুছে অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের গুমোট স্তব্ধ পৃথিবীর ওপর সূর্য্যালোকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের দিকে চেয়ে রইল।

দুপুর বেলা,—কিন্তু চারিদিকে গভীর রজনীর স্তব্ধতা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন স্পর্শ করা যায়, অনুভূতির সীমার মাঝে যেন আপনি হাত বাড়িয়ে ধরা দিতে চায়। রাত দুপুরের যা নিজস্ব, আজ দিনদুপুরে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত সামান্য একটু ব'তাস ব'য়ে যেতেই ভেজানো দরজাটা মৃদু শব্দ ক'রে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে চাইতেই অশোক অবাক হ'য়ে দেখল খান দুই বই হাতে ক'রে সেই মেয়েটি উঠান দিয়ে আসছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, রোদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সাড়ীর আঁচলটুকু মাথায় তুলে দিয়েছে।

বড় ঘরে উঁকি মেরে অশোকের মাকে না দেখে নেকী মাসীমা ব'লে ডাক দিয়ে অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানার উপরের লোকটির দিকে নজর পড়তেই সে রীতিমত চমকে উঠল।

আপনি! ও হাঁ। ঠিক্।

অশোক গম্ভীর ভাবে বল্লে, মা বাড়ী নেই।

বাড়ী নেই? বই দুখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে অশোক বল্লে, ওঘরের টেবিলের ওপর রেখে যান।

নেকীর যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন কল্লল, আপনি অশোক বাবু,—না?

হুঁ।

তা হ'লে কালকের ঘুঘুর কথাটা বিশ্বাস করতে হ'ল।

নেকীর মুখের দিকে চেয়ে অশোক বল্লে, আমা[র] সৌভাগ্য। বিশ্বাসটা হ'ল কিসে? আমি অশো[ক] বাবু ব'লে?

মৃদু হেসে নেকী বল্লে, হাঁ। মাসীমার কাছে আপন[ার] কথা এত শুনেছি যে, বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। আ[প]নার আসবার কথা জানতাম, রাগের মাথায় খেয়াল ছিল [না।] এখানকার কোন ফাজিল ছোঁড়া মনে করেছি[লাম] আপনাকে।

বেশ করেছিলেন।

আপনি ভীষণ চটেছেন দেখছি।

অশোক কথা বল্লে না।

নেকী বল্লে, চটার কথাই। মিথ্যে অপবাদ কে [ক]'ইতে পারে? আচ্ছা আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চা[ইছি,] তাতে হবে ত?

হবে। কেউ বাড়ী নেই, বিকেলে এসে করতেন।

অর্থাৎ, আপনি এখন যান, এই ত?

অশোক নির্ব্বিকার উদাসীনের কণ্ঠে বল্লে, [ও] রকম মানেই তো দাঁড়ায়।

নেকীর মুখ ম্লান হ'য়ে গেল, কথা না খুঁজে পেয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

না, না, তাড়াব কেন? অতখানি অভদ্রতা করতে আপনার সঙ্গে! আমার বলবার উদ্দেশ্য—অশোক [থেমে] গেল।

উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য মরুক। আসল কথা কি জানেন, আপনাকে
ৱ ভয় করি। হয়ত ব'লে বসবেন, একলা পেয়ে
নাকে আমি অপমান করেছি।
বাকীও তো রাখলেন না কিছু।
এ অপমান নয়, অন্য রকম।
অভদ্র উক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত। চারিদিকের নির্জ্জনতা
রকম অপমানের' অর্থ টাকে এমনি স্ফুটতর ক'রে তুল্ল
াপমানে নেকীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। বই দুটি মেঝের
ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে, আপনি চাষা। নিজের মনে ময়লা
লে সমস্ত পৃথিবীটাকে কালো দেখায়। স্নানের ঘাটেই
ন্ন পেয়েছি। ব'লে ঝড়ের মত চ'লে গেল।
মিথ্যা অপবাদের জ্বালা আছে, তাতে রাগ হওয়াটাও
র্য্য নয়। কিন্তু এইবার অশোক স্পষ্ট উপলব্ধি করল,
ল করেছে। শ্রদ্ধা যার প্রাপ্য তাকে দিয়েছে অপমান।
া হয় নজর দিতে যায়নি, কিন্তু অমন কি কেউ যায় না?
ষের দেহধারী পশুর অভাব তো কিছু নেই পৃথিবীতে!
লীর মেয়ে, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে কোন
ৱ ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিয়ে
অমন মুখোমুখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে
মেয়ে? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে কটি মেয়ে
স্ত নির্জ্জনে একজন অপরিচিত যুবকের মুখের ওপর
ত পারে, আপনি গরু, মহিষ, আপনাকে আমি লজ্জা
না? কটি মেয়ে পারে অশোক জানে না, একটির
ই সে জানে। আজ তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে সেই
টিকেই সে অপমান করেছে। তাও সেই মেয়েটি যখন
চেয়েছে তখন।

তিন

বিকালে ছুভাইকে খাবার দিয়ে মা বল্লেন, তোর নেকীদি
এলনা কেন রে পুলক?
পুলক আমে কামড় দিয়েছিল, আমটা সরিয়ে সজ্জেপে,
দিল, দাদা বকেছে। ব'লে আবার আমটা মুখে তুল্ল।
দাদা বকেছে! সত্যি নাকি রে অশোক?

আবার ঝগড়া হয়েছে তোদের? কি হয়েছিল?

অশোক বল্লে, পরশু তুমি বাড়ী ছিলে না, দুপুর বেলা বই হাতে ক'রে এসে হাজির। যেমনি বলেছি মা বাড়ী নেই, বিকেলে আসবেন, যা মুখে এল ব'লে চ'লে গেল।

সবটুকু দোষ অশোক নির্ব্বিচারে নেকীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। এমনি ক'রে মানুষ নিজের অন্যায় করার জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে! বেদনা দেওয়া সহজ, আঘাত করা ততোধিক! কিন্তু কি বিশ্রী জায়গা এই পৃথিবীটা! অমন একটা সহজ কাজ ক'রেও সুখ মেলে না। সুন্দরী এবং তরুণী, তার হাসিভরা মুখখানি যে কথার আঘাতে ম্লান ক'রে দিয়েছিল, এই স্মৃতিটা কাঁটার মত ক্রমাগত বিঁধে চলে!

মা বল্লেন, কি ছেলেমানুষী যে তোরা করছিস অশোক। নেকী ত গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করার মেয়ে নয়!

না। খুব ভাল মেয়ে!

রোদ প'ড়ে এলে পুলককে নিয়ে অশোক বেড়াতে বার হ'ল। আম বাগানের পরেই বিস্তৃত মাঠ, আলে আলে পায়ে পায়ে গ'ড়ে ওঠা সরু পথটি দিয়ে চলতে তার এমনি ভাল লাগে! মাঝে মাঝে লাঙল দেওয়া ক্ষেতে নেমে পড়ে, মাটির ঢেলাগুলি পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে যায়। ক্ষেতগুলি সমস্তদিন বৈশাখের বেহিসেবী সূর্য্যের তাপ চুরি ক'রে সঞ্চিত ক'রে রাখে, সূর্য্য বিদায় নিলে মৃদুভাবে সেই তাপ বিকীর্ণ করে। অশোক সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেটুকু অনুভব করে। চষা মাটির অস্পষ্ট গভীর সুবাস তার মনকে উদাস ক'রে দেয়। পুলকের হাত ধ'রে চলতে চলতে অশোক ভাবে, এমনি ভাবেই মাটি যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে চায়। নিশ্চল জড় যেন বলতে চায়, সারা জগতের জীবনের রস যোগাই আমি, আমায় চিনে রাখো!

মাঠের পরেই ছোট একটা নদী, এখন স্রোত নেই। স্থানে স্থানে জল জ'মে আছে, বাকীটুকু বালিতে বোঝাই। সাদা ধপধপে বালি। এককালে স্রোতের নীচে ছিল, জলের গতি নিপুণ শিল্পীর মত অপূর্ব্ব নক্সা এঁকে দিয়েছে। কোথায়ও বালির বুকে ঢেউয়ের ছবির হুবহু ছাপ পড়েছে, কোথায়ও বিচিত্র রেখার সমাবেশে সূক্ষ্ম আলপনা গ'ড়ে উঠেছে। এমনি সূক্ষ্ম এমনি কোমল যে, দেখলে মনে হয়

আঁকলো কে? অশোক নিত্য এইখানে এসে বসে। পায়ের দাগে বালির কারুকার্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়, অশোক ব্যথিত হ'য়ে উঠে। অথচ ওই কারুকার্য্য শতকরা নিরানব্বই জনের চোখেই হয়ত পড়ে না! তুচ্ছ ব'লে নয়; সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করবার মানুষের একটা বিপুল অক্ষমতা আছে ব'লে।

অশোক আজ সেইখানেই যাচ্ছিল। আমবাগানের ভেতরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাক দিতেই অশোক আর নেকী একেবারে মুখোমুখি প'ড়ে গেল। কাপড় গামছা নিয়ে নেকী স্নান করতে যাচ্ছিল, চোখোচোখি হ'তেই তার মুখের ভাব কঠিন হ'য়ে উঠল। নিঃশব্দে একপাশে স'রে গিয়ে সে অশোককে পথ দিল।

অশোক এগিয়ে গেল, কিন্তু পুলক নেকীর সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে, আর যে আমাদের বাড়ী যাওনা নেকীদি? দাদা আর কিছু বলবেনা, মা ব'কে দিয়েছে।

অশোক এগিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে ডাকল, পুলক আয়, দেরী হ'য়ে গেছে।

নেকী পুলককে কাছে টেনে নিয়ে কি বলতেই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। নেকীর হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বল্লে, তুমি যাও দাদা, আমি যাব না। নেকীদির সঙ্গে সাঁতার কাটব।

বেড়াতে যাবি না?

পুলক ঘাড় নেড়ে বল্লে, রোজ ত বেড়াই, আজ সাঁতার দেব। তুমিও এস না দাদা, তিনজনে সুইমিং রেস দেব; নেকীদির সঙ্গে পারবে না তুমি।

অশোক ধমক দিল, এই অ বেলায় পচা ডোবায় স্নান করলে অসুখ হবে পুলক। এখন বেড়িয়ে আসি, কাল সকালে বড় পুকুরে সাঁতার কাটব।

পুকুরের ছোট-বড়ত্বের জন্য পুলকের মাথা ব্যথা ছিল না, নেকীদির সঙ্গে সাঁতার দিতে পেলেই সে সুখী। নেকীর গা ঘেঁষে দাড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধ'রে দাদার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দিল। নেকী তার হাত ধ'রে পুকুরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

অশোক ক্রুদ্ধস্বরে বল্লে, এই অবেলায় ওকে যে পচাডোবায় স্নান করবার জন্য নাচালেন, অসুখ হ'লে দায়ী হবে কে?

মুখ না ফিরিয়েই নেকী জবাব দিল, আমি। ওর অভ্যাস আছে।

অভ্যাস আছে কি রকম? ও কি গেঁয়ো ভূত যে পচা ডোবায় স্নান করা অভ্যাস থাকবে?

গেঁয়ো ভূত না হোক, সহুরে বাবু নয়। ব'লে নেকী পুলককে নিয়ে মোটা আম গাছটার ওদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সহুরে বাবু! মেয়েটা শেষ পর্য্যন্ত তাকে সহুরে বাবু ঠাউরাল নাকি! নিতান্ত চ'টে যত দূর সম্ভব দূরে দূরে পা ফেলে হন হন ক'রে বাগান পার হ'য়ে অশোক মাঠে পড়ল।

মাঠে বেড়ানোর আনন্দটুকু মাঠে মারা গেল। অশোক ভাবল, কী কুক্ষণেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

কুক্ষণ না ত কি! ঘাত-প্রতিঘাতে যে বিষ ফেনিয়ে উঠছে সেটুকু ফেলবার জায়গা তো কোথাও মিলছে না, চোখ মুখ বিকৃত ক'রে গিলতেই হচ্ছে। বিষের প্রতিক্রিয়া জিনিষটাও মোটেই উপভোগ্য লাগছে না।

ঠাট্টা নয়, অশোকের চোখে জল এল। সুন্দরী তরুণী যদি আঘাত করে তরুণ-মনে বড়ই বাজে। বিধাতার তাই নিয়ম!

চোখে জল এল ব'লে অশোক রাগ করল। রাগ ক'রে জলটুকু মুছল না, চোখেই শুকিয়ে গেল। চোখের কোণে শুধু একটি ভিজে দাগ চিক চিক করতে লাগল।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু অস্বাভাবিক রকম ঘন হ'য়ে এল। সেদিকে অশোকের নজর পড়ল না। নজর পড়লে নদীর চড়ায় ব'সে থাকবার মত সাহস তার হ'ত না।

ঈশান কোণের জমাট-বাঁধা কালো ছায়াটি যে রকম দ্রুতবেগে আকাশের অর্দ্ধেকটা ঢেকে ফেল্লে তাতে আর অল্পক্ষণের ভেতরই যে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় রইল না। হ'লও তাই। আকাশ যখন প্রায় সবটা ঢাকা পড়েছে তখন অশোক হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যতবার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে আকাশের ভয়ানক

না, ভয়ানক গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাইল ততবারই তার বেগ বেড়ে গেল। নেকী ত নেকী, ঝড় সুরু হবার গ কোন রকমে বাড়ী পৌছানর চিন্তা ছাড়া অন্য সব তার মন থেকে বেমালুম লুপ্ত হ'য়ে গেল। এ সময় এক ম নিত্যকার ব্যাপার হ'লেও ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কাল-াখীর যে পরিচয় পেয়েছিল তাতে এই নির্জ্জন মাঠের ঝ সেই কালবৈশাখীর সঙ্গে মুখোমুখি দাড়াবার কল্পনা রেই সে ভয় পেয়ে গেল।

জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে ল। অশোকের দ্রুত চলা দৌড়নতে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল।

অশোক পুরী গিয়েছিল, দূর থেকে সমুদ্র গর্জ্জন কেমন নায় জানত। পিছন থেকে সেইরকম একটা অস্পষ্ট র্জন কানে আসতেই সে বুঝতে পারল কালবৈশাখী তাড়া 'রে আসছে এবং তাকে ধ'রে ফেলতে মাত্র ৫ তিন নিটের ওয়াস্তা।

হাঁফ ধ'রে গিয়েছিল। দৌড়ে বিশেষ লাভ নেই বরং উঁচু চু মাঠের ভেতর অন্ধকারে আছাড় খাওয়ায় আশঙ্কা পূরো াত্রায়। বাধ্য হ'য়ে দৌড়ন বন্ধ ক'রে অশোক দ্রুত চলা রু করল। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতে অশোক খেল আম বাগান তখনো পাঁচ সাত মিনিটের পথ।

আম বাগান? ঝড় তো ধ'রে ফেলবে ঠিক, তখন আম াগানের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? শোকের ইচ্ছা হ'ল একবার থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা ভাল 'রে চিন্তা ক'রে নেয়। কিন্তু পিছনের গর্জ্জনটা খুব কাছে বং বেশী রকম স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে দেখে দাঁড়াবার সাহস 'ল না। আর দ্বিতীয় পথের সন্ধান তো সে রাখে না! ন্য সময় ঘণ্টাখানেক ধ'রে খুঁজে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাবার াল রাস্তা আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভব হ'ত, কিন্তু এখন ারা রাত ধ'রে খুঁজলেও যে সে পথের খবর মিলবে না া ঠিক। আম বাগান ছাড়া পথ নেই। কাঁচা পাকা চর ফল গাছগুলি খাইয়েছে, আজ যদি নিতান্তই চাঁপা দয় কি'আর করা যাবে!

পিছন থেকে মহা কলরব করতে করতে ঝড় এসে শোককে এমনি জোরে ধাক্কা দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিল। আর জোরে চলবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন হ'ল না, বাতাসেই অশোককে ঠেলে নিয়ে চল্ল।

এই কালবৈশাখীর সঙ্গে লেখকের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, বার পঞ্চাশ ষাটেক দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। অথচ কি ক'রে যে এর বর্ণনা করব ভেবে পাচ্ছি না। ভয়ানক রকমের একটা কিছু, শুধু এটুকু বল্লেও অবশ্য হয়, কিন্তু মন খুঁত খুঁত করে। সে কি শুধু তাই!

ঠিক যেন ভোজবাজী সুরু হ'য়ে গেল। চিরকাল মাথা উঁচু ক'রেই আছে, কিন্তু গাছগুলি পর্য্যন্ত সটান শুয়ে পড়বার জন্য আকুলি ব্যাকুলি সুরু ক'রে দিল। লাখখানেক ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রকৃতি যেন বিদঘুট রকমের ওয়ার-ডান্স্ আরম্ভ ক'রে দিল, সব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ঠাণ্ডা হবে। মেঘের সংযম রইল না, ফোঁটা ছেড়ে ধারাপাত আরম্ভ হ'য়ে গেল। সেই পতনশীল বারিধারা নিয়ে পাগলা হাওয়া এমনি খেলা সুরু ক'রে দিল যে, দেহের অনাবৃত অংশের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে এবং বিদ্যুতের আলোতে দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে ভাল ক'রে অনুভব ক'রে অশোকের ইচ্ছে হ'তে লাগল সেই মাঠের ভেতরই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড়ের শব্দ ত আছেই, তার ওপরে আকাশে মেঘেদের অজস্র চকমকি ঠুকে আলো জ্বালবার অবিশ্রাম চেষ্টায় ক্রমাগত যে আওয়াজ হ'তে লাগল তাতে অশোকের শ্রবণেন্দ্রিয় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করল।

আম বাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোক্তারের বাড়ী, অশোকের পথ তার রান্না ঘরের পাশ দিয়ে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বসানো জানালার পাশে আসতেই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, অশোক বাবু, দাঁড়ান। অশোক থমকে দাঁড়াল।

নেকী অশোকের প্রতীক্ষাতেই রান্না ঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিয়েই বাইরে বেরিয়ে অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বল্লে, [illegible]া চিরে ডেকেছি, যে শব্দ! ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।

না। মা ভাববেন।

অশোকের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে নেকী বল্লে, বাগানের ভেতর দিয়ে তো যাওয়া যাবে না, এর ভেতরেই তিন চারটা

গাছ প'ড়ে গেছে শব্দ শুনেছি। দাঁড়াবেন না, আসুন।

অশোক তবু দ্বিধা করল, কিন্তু মা যে পাগল হ'য়ে উঠবেন।

নেকী ব্যাকুল হয়ে বল্লে, সে অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যদি গাছ চাপা পড়েন সত্যি সত্যি পাগল হ'য়ে যাবেন। ব'লে হাত জোড় ক'রে বল্লে, অন্য সময় যত পারেন রাগ করবেন, আপনার পায়ে পড়ি চলুন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল, সেই আলোতে নেকীর মুখের যে ব্যাকুল ভাবটা অশোকের চোখে পড়ল তাতে আর দ্বিধা করবার অবকাশ রইল না। বল্লে, চলুন।

নেকী অশোককে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠান পার হ'য়ে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠল। দরজায় বাহির থেকে শিকল লাগানো ছিল, ক্ষিপ্র হস্তে শিকল খুলে ফেল্লে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, দরজা খুলতেই বাতাসে নিভে গেল।

অশোককে হাত ধ'রে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে নেকী বল্লে, দাঁড়ান, আলো জ্বালছি। ঘরের একদিকের তাক হাতড়ে একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বল্লে, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

না।

সিগারেট খান না?

না।

খুব ভাল ছেলে ত! নাঃ, আপনার সঙ্গে তা হ'লে পারা গেল না দেখ্‌চি! রান্না ঘরেই যেতে হ'ল থাকুন অন্ধকারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে। ব'লে নেকী বাইরে চ'লে গেল।

দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে চৌকাটের বাইরে দাঁড়িয়েই বল্লে, হাত বাড়িয়ে দেশলাই নিয়ে আলোটা জ্বেলে ফেলুন অশোক বাবু। একবার তো দুজনেই খানিকটা ক'রে জল ঢেলেছি, সর্ব্বাঙ্গে যে রকম ধারা বইছে, এবার ঘরে ঢুকলে মেঝেতে নদী ব'য়ে যাবে।

নিকষ-কালো আঁধার, কিন্তু তারই ভেতর নেকীর হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি রান্না ঘরের অদৃশ্যপ্রায় আলোয় চিক চিক করছিল। দেশলাই নিয়ে অশোক একটা কাঠি জ্বালিয়ে বল্লে, একেবারে ভিজে গেছেন যে!

সেটা উভয়ত; পরে দুঃখ করা যাবে, বাতিটা জ্বালুন।

আলো জ্বেলে অশোক বল্লে, মেঝেটা সত্যি ভেসেছে।

তাহোক, মুছে নিলেই হবে। আল্‌না থেকে লালপেড়ে শাড়ীটা দিন্‌। বাক্স না খুললে আবার আপনার কাপড় জুটবে না।

অশোক শাড়ীটা এনে দিল। বারান্দার একদিকে একটু ঘেরা ছিল শাড়ী নিয়ে নেকী সেখানে চ'লে গেল।

অশোকের জামা কাপড়ের অতিরিক্ত জলটুকু ইতিমধ্যে প্রায় সবটাই ঝ'রে গিয়েছিল, কিন্তু ভিজে জামার আলিঙ্গনটা বড়ই বিশ্রী লাগছিল। জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেকীর প্রতীক্ষায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশোক একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে দুটি বড় বড় খাট জোড়া লাগিয়ে পাতা রয়েছে। তাতে যে বিছানা আছে খাটের অর্দ্ধেকটাও আবৃত করবার সাধ্য তার নেই। সেকেলে আসবাব, যেমন বিরাট তেমনি কদাকার। এক কোণে গোটা কুড়ি পঁচিশ হাঁড়ি কলসী, তাতে সংসারের চাল ডাল থাকে বোঝা গেল। পুরাণো রঙচটা একটা কাঠের আলনা, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হেলে পড়েছে। ফর্সা মলিন আস্ত এবং ছেঁড়া নানা রকমের নতুন পুরাতন ধুতি শাড়ী সেমিজ যত্ন ক'রে গোছানো রয়েছে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বাঁশের পেরেকে একটা আয়না ঝুলছে, কাছেই একটা চিরুনী গোঁজা। আয়নার নীচে একটা টুল, তার কাছে হাতল ভাঙ্গা কাঠের চেয়ার। একটা আমকাঠের সিন্দুক একটা কোণের সবটুকু দখল ক'রে আছে। মাথা নীচু ক'রে অশোক খাটের নীচে উঁকি মারল। ধূলোয় মলিন বড় বড় পিতলের হাঁড়ি কলসী ডেকচি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ ক'রে কুলো ধুচুনি পর্য্যন্ত সেখানে জমা হ'য়ে আছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দরজার কাছে নেকী খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বল্লে, ভূত দেখছিলেন না কি?

না বাঘ। অন্ততঃ একটা শেয়াল যে খাটের নীচে—

চোখ তুলে অর্দ্ধপথে থেমে গেল। মন থেকে রাগের জ্বালা নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলে লণ্ঠনের আলোতে সম্মুখের তরুণী নারীটির মুখের দিকে চেয়ে অশোক মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসেছে, ভিজে

চুল ভাল ক'রে মোছা হয় নি। এক গোছা জলসিক্ত কুন্তল গালের পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমে এসে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু জল জ'মে আছে, আলো প'ড়ে মনে হচ্ছে কে যেন মেয়েটার কপাল বেড়ে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতা ভেজা, তার অন্তরাল হ'তে যে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার যেন তুলনা নেই।

নেকী লাল হ'য়ে চোখ নত করল। হঠাৎ,—আচ্ছা তো আমি! ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়ালই নেই। ব'লে কাঠের সিন্দুকটার কাছে চ'লে গেল। ধোপদোরস্ত একখানা ধুতি এনে অশোকের হাতে দিয়ে ভিজে জামাটা নিয়ে বল্লে, কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আসছি। ব'লে বেরিয়ে গেল।

কাপড় ছেড়ে অশোক ডাকল, আসুন এবার।

নেকী এল। দরজা দিয়ে প্রথম থেকেই কিছু কিছু ছাট আসছিল, ঘরে এসে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা ক'রে নেকী দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে, আমাকে আপনি আপনি করছেন এমন বিশ্রী লাগছে! এতটুকু সাহস নেই যে তুমি বলেন?

অশোক বল্লে, সাহস আছে কি না পরিচয় পাবে। ওটা কি হ'ল? ব'লে রুদ্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নেকী বল্লে, এই সহজ কথাটা বুঝলেন না? ছাট আসছিল, বন্ধ ক'রে দিলাম। মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই কিছু।

কিন্তু—

সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে অশোকবাবু, আপনি কোঁচার খুটটা গায়ে দিয়ে ভাঙ্গা চেয়ারটাতে বসুন। আমার নাম নেকী, কিন্তু ন্যাকামি চচক্ষে দেখতে পারি না। আপনার সঙ্গে একা এক ঘরে যদি থাকতে পারি, দরজা খোলা বন্ধয় বিশেষ আসবে যাবে না। খোলা থাক'লে বরং ঘরটা ভিজবে।

অশোক ব'সে বল্লে, তুমিও বোস, কতকগুলি প্রশ্ন আছে।

খাটের কোণায় ব'সে হাসিমুখে নেকী বল্লে, বলুন।

তুমি এখানে একা থাক?

নেকী হেসে উঠল,—তাই কি আপনি সম্ভব মনে করেন না কি? হাসি থামিয়ে বল্লে, থাকি তিনজনে, মামা পিসিমা আর স্বয়ং। মামা জমি দেখতে পরশুদিন মফস্বলে গেছেন, পিসি বিকেলে কাদের বাড়ী গিয়েছিল ঝড়ের জন্য আটকা প'ড়ে গেছে। যে আচমকা ঝড় এল আজ! আপনি ফিরছেন না দেখে আমার যা—মাথা নীচু ক'রে নেকী থেমে গেল। কিন্তু থেমে যাওয়াটা যে সব চেয়ে বিশ্রী বুঝেই জোর ক'রে মুখ তুলে বল্লে, ঝড়ের সময় মাঠের মাঝে ভারি ভয় হয় অশোকবাবু।

ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে অশোক বল্লে, আমি চল্লাম।

নেকী বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, কি হ'ল আবার?

আমার মত মুর্খ আর নেই। ছি ছি, একবারও খেয়াল হ'ল না!

কি হ'ল বলুন না?

বুঝলে না? কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে—সে ভারি বিশ্রী হবে, আমি যাই।

নেকী বল্লে, ভাববেন না, এই ঝড়ে কেউ আসবে না। যাবেনই বা কি ক'রে?

না না তুমি বুঝছ না। তোমার কত বড় ক্ষতি হবে, জান?

নেকী দৃঢ় কণ্ঠে বল্লে, জানি, বসুন। সে ভয় করলে আপনাকে ডেকে আনতাম না। পাগল হয়েছেন, ভাল দিনে কেউ আসে না, আর এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে!

অশোক বসল। বল্লে, তোমার কিন্তু বেজায় সাহস। লোকে নাই জানুক, আমাকে ত একরকম জানই না, কি ব'লে ডেকে আনলে?

আপনাকে জানি না কে বল্লে?

আমিই বলছি। এসেছি পাঁচ দিন, দেখা হয়েছে তিনবার, তিনবারই ঝগড়া করেছি। চেনবার সুযোগ পেলে কোথায়? পুকুর পাড়ে বরং—

নেকী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। ওটা তার স্বভাব। বল্লে, পুকুরের ঘটনাটা ভোলেন নি দেখছি।

না ভুলি নি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বল কি ক'রে চিনলে আমায়?

নেকী বল্লে, একজনকে চিনতে হ'লে তার সঙ্গে চৌদ্দ বছর মিশবার দরকার হয় ব'লে মনে করেন নাকি আপনি? আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যে অমন ভাবে ঝগড়া করতে পারে তাকে ভয় করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। বুঝলেন?

অশোক ঘাড় নেড়ে বল্লে, না।

তবে অন্য রকম ক'রে বলি। আমাদের অনুভূতি ব'লে একটা জিনিষ আছে অশোক বাবু, একবার দেখলেই আমার মানুষকে চিনতে পারি। আর কি জানেন, মাসীমার ছেলেকে চিনবার দরকার হয় না।

নেকীর কথায় তার মার প্রতি এমনি একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেল যে, অশোক খুসী হ'য়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, আচ্ছা নেকী, তোমার ভাল নামটা কি বল ত?

নেকী নামটা পছন্দ হয় না? ও নামটা আমায় একেবারে মানায় না, কি বলেন? আপনি না হয় আমাকে লীলা বলবেন।

লীলা? বেশ নাম।

সত্যি বেশ?

অশোক জবাব দিল না, একটু হাসল।

হঠাৎ নেকী বল্লে, আপনার খিদে পেয়েছে? আম খাবেন?

অশোক ঘাড় নাড়ল।

আম খাবেন না? তাহলে কী দিই! কাল সন্দেশ করেছিলাম, গোটা চারেক আছে বোধ হয়, তাই খান তবে।

অশোক আবার ঘাড় নাড়ল।

ঘাড় নাড়ছেন যে খালি? ইচ্ছেটা কি?

ইচ্ছে কিছু না খাওয়া। বাড়ী থেকে যতদূর সাধ্য খেয়ে বার হয়েছিলাম, খিদে নেই।

নেকী মুখ গোঁজ ক'রে বল্লে, হুঁ!

রাগ হ'ল? আচ্ছা দাও, খাব।

থাক্। খিদে না থাকলে খেতে নেই।

অশোক তৎক্ষণাৎ বল্লে, খিদে যেন পাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। কি দেবে দাও, খেয়ে নি।

নেকী হাসিমুখে খাবার নিয়ে এল। শুধু সন্দেশ নয়, আমও কেটে দিল। ঘরেই ছিল। কোণের কলসী থেকে জল গড়িয়ে দিল।

অশোক নিঃশব্দে আহারে মন দিল।

নেকী বল্লে, খেতে খেতে কথা বলুন, চুপ ক'রে থাকতে ভাল লাগে না।

কি বলব?

যা খুসী।

যা খুসী নয়, অশোক নেকীর কথাই পাড়ল। একটু একটু ক'রে নেকীর জীবনের যে ইতিহাস সে শুনিল তাতে অবাক হ'য়ে গেল।

বড়লোকের মেয়ে, কলকাতায় বাবার ব্যবসা ছিল। মা কবে মারা গিয়েছিলেন, নেকীর মনে নেই। পিসিই তাকে মানুষ করেছে। জীবনের ষোলটা বছর স্কুল বন্ধু মোটর থিয়েটার ভোজ পার্টি এই সব নিয়েই তার কেটেছিল। সেবার নেকী ম্যাট্রিক দিয়েছে, কারণ কি হয়েছিল তা সে জানেনা, ব্যবসা ফেল পড়ল। বাজারে দেউলিয়া নাম জাহির হবার আগেই বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথাটা ফুটো ক'রে দিয়ে নেকীর বাবা সব দায় এড়িয়ে গেলেন। আপনার বলতে এই মামা, চোখ মুছতে মুছতে বছর খানেক আগে পিসিকে নিয়ে এই মামার আশ্রয়ে এল। পিছনে ফেলে এল আজন্ম-অভ্যস্ত সৌখীন জীবন। ভবিষ্যতের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন ঢেকে গেল নিরাশার কালো ছায়ায়।

নতুন জীবনের ভয় বাবার শোককে পর্য্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল অশোক বাবু। পাড়া গাঁ চক্ষে দেখিনি, পিসির কাছে শুনে দুচোখে খালি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গাঁয়ের মেয়েরা কী ভাবে থাকে, ভোর পাঁচটায় উঠে গোবর দিয়ে কেমন ক'রে ঘর নিকোয়, ডোবায় গিয়ে বাসন মাজতে হয়, লাউ কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে কেমন আরামে দুবেলা পেট ভরাতে হয়, পিসীর কাছে লম্বা ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছিল, কাজ নেই বাবা বেঁচে থেকে, তার চেয়ে আপিঙ্‌ গুলে খাওয়া সহজ!

অশোক বল্লে, তারপর যখন সত্যি সত্যি এলে তখন কেমন লাগল?

নেকী বল্লে, এসে দেখলাম, ভয়ের কারণ নেই। ঘর কোবার দরকার হ'ল না, বাসনও মাজতে হ'ল না। রান্নার রটাও পিসিমা নিলেন। সেদিক দিয়ে বিশেষ কষ্ট হ'ল না, ন্তু যখন পাড়ার মেয়েরা ঝেঁটিয়ে আমাকে দেখতে এসে কসঙ্গে গালে হাত দিল তখনি ভড়কে গেলাম। মনে 'ল, বিধাতা কি পাড়ার সবগুলি মেয়ের জন্মাবার সময় াঁট কেটে দিয়েছেন! তাদের গালে হাত দেওয়ার জবাবে পা নেই কওয়া নেই একেবারে কেঁদে ফেল্লাম। মামা ড় ভালবাসতেন, হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে মনি চোখা চোখা কথা শুনিয়ে দিলেন যে, পাড়ার কেউ ই থেকে আজ পর্য্যন্ত বাড়ীতে পা দিলেন না। নেকী সে ফেল্লে। হাসি থামিয়ে বল্লে, এমনি মজা দেখুন শোক বাবু, আমি আসার তিন মাসের ভেতরেই একটা াকদ্দমায় হেরে মামার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। মামা বশ্য বল্লেন না, অবস্থা বুঝে আমি নিজেই ঝিকে ছাড়িয়ে লাম। বুক বেঁধে একদিন যে ভয়ে আপিঙ খেতে ইচ্ছে য়েছিল সেই গোবর লেপা থেকে বাসন মাজা পর্য্যন্ত ব কাজগুলি ক'রে ফেল্লাম। কোথায়ও কিন্তু বাধল া।

অশোক বল্লে, রান্নাটাও বোধ হয় এখন করতে হয়?

হ্যাঁ। পিসিমার বাতের শরীর, পারেন না।

ঝড়ের বেগ কম পড়তেই নেকী বল্লে, আপনি এখন আসুন অশোক বাবু। একা ফেলে গেছে, পিসী হয়ত ঝড় ঠেলেই এসে পড়বে। এ সামান্য ঝড়ে আর গাছ পড়বে না।

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, পিসির আসার কথাই ভাবছো, আমি যদি সবাইকে ব'লে দিই সন্ধ্যেটা কোথায় কাটিয়ে গেলাম?

নেকী হেসে বল্লে, ওইটুকু আপনি করতে পাবেন না, এই দুঘণ্টার কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

মাকে কিন্তু বলতে হবে।

তাতো হবেই, মাসীমাকে বলবেন বৈকি! আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম। চলুন, আপনাকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অশোক হেসে বল্লে, তারপর তোমাকে কে এগিয়ে দিয়ে যাবে লীলা?

আমার দরকার হবেনা, একাই আসতে পারব।

অশোক ঘরের বাইরে পা দিয়ে বল্লে, বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি শিশু নই। দরজা দিয়ে বোস, এটুকু খুব যেতে পারব।

আচ্ছা আসুন তবে।

অশোক বারন্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, নেকী বল্লে, বাড়ী গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু। দুবার ভিজতে হল, অসুখ না হয়।

আচ্ছা, ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। বল্লে, তোমার ভয় করবে না ত?

একটু একটু করবে। আর দাঁড়াবেন না, পিসি এলে ভারি মুস্কিলে ফেলবে।

অশোক উঠানে নেমে গেল। নেকী চেঁচিয়ে বল্লে, আর একটা কথা অশোকবাবু, আপনাতে আমাতে সন্ধি তো?

উঠান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে অশোক বল্লে, সন্ধিপত্রের খসড়া ক'রে রেখো সই ক'রে দেব। ব'লে রান্নাঘরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেকী সেইখানে দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের বেগ কমেছিল, কিন্তু বৃষ্টি সমভাবেই পড়ছিল। ছাট লেগে নেকীর বসনপ্রান্ত ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই রইল না।

পরদিন সকালে অশোকের জামা আর কাপড় হাতে ক'রে যেতেই অশোকের মা নেকীকে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেলেন। বল্লেন, বাগানের এক একটা গাছ পড়ার শব্দ শুনছিলাম আর আমার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল মা। যে ছেলে, তুই না ডাকলে ওই বাগানের ভেতর দিয়েই আসত!

সুখে তৃপ্তিতে লজ্জায় নেকীর মুখখানি আরক্ত হ'য়ে উঠল। মাথা নত করল।

মা বল্লেন, বোস্, খাবার খেয়ে যাবি। ঠাকুরকে ভাঁড়ারটা বার ক'রে দিয়ে আসি। ব'লে চ'লে গেলেন।

আপনার জামার পকেটে এই কাগজপত্রগুলি ছিল অশোকবাবু। ভিজে চুপসে গেছে।

অশোক কাগজগুলি নিয়ে বল্লে, মনিব্যাগটা?

মনিব্যাগ? মনিব্যাগ তো ছিল না!

ছিল না কিরকম? কাগজ রইল, ব্যাগ উড়ে গেল?

নেকী হেসে ফেল্ল, যতই করুন অশোকবাবু, আর ঝগড়া বাধবে না, সন্ধি হ'য়ে গেছে। ঠাট্টা নয়, বেশী টাকা ছিল না কি?

না গোটা পাঁচেক। দৌড়বার সময় মাঠে পড়েছিল বুঝেছিলাম, তুলে নেবার সুযোগ হয়নি। ভালই হয়েছে, সারের কাজ দেবে।

তা দেবে, টাকার মত সার আর নেই।

চার

মাসখানেক কেটে গেছে।

সকাল বেলা মা চা করছিলেন, ঝরা ফুলের মত পরিম্লান মূর্ত্তি নিয়ে নেকী এসে তাঁর গা ঘেঁষে ব'সে পড়ল।

মা বল্লেন, জ্বর ছেড়েছে? উঠে এলি যে?

জ্বর নেই। আমায় এক কাপ চা দিও মাসীমা।

এখনো খাসনি কিছু?

নেকী ঘাড় নাড়ল।

তবে আগে একটু দুধ খেয়ে নে, তারপর চা খাস। দুদিনের জ্বরে কী চেহারাই হয়েছে মেয়ের!

ষ্টোভের ওপর কড়ায় দুধ জ্বাল হচ্ছিল, বাটিতে ঢেলে নেকীর সামনে ধরলেন।

অশোক বল্লে, তিনচার বার ক'রে পচা ডোবায় স্নান করলে জ্বর হবে না?

নেকী বল্লে, প্রথম দিন থেকেই ওপুকুরে স্নান করাটা আপনার চক্ষুশূল হয়েছে দেখছি!

কি মুস্কিল! এ মেয়েটা প্রথমদিনের সেই ঘটনাটুকু নিজেও ভুলবে না, অশোককেও ভুলতে দেবে না। আচ্ছা তো!

মা কি কাজে উঠে যেতেই বাটির দুধ প্রায় সবটা কড়ায় ঢেলে দিয়ে চোখ কান বুজে বাকীটুকু নেকী উদরস্থ ক'রে ফেল্লে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বল্লে, দুধ ত না, বিষ!

তাই দেখছি। মাকে বলতে হবে।

না লক্ষ্মী, বলবেন না। এক্ষুনি একবাটি দুধ গিলিয়ে দেবেন।

ভালই তো!

ভাল বৈকি! চায়ের কাপটা শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, মার আসবার আগেই পালাই তাহ'লে।

অশোক বল্লে, না বোস, বলব না।

রাঁধতে হবে, পিসিমার অসুখ।

এই শরীরে রাঁধবে?

না রাঁধলে চলবে কেন? মামা দুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছেন। ঐ যা, আসল কথাই ভুলে গেছি! বিকালে আপনার আম খাবার নেমন্তন্ন রইল, পুলককে নিয়ে যাবেন। ব'লে নেকী চ'লে গেল।

বিকালে প্রায় ছ'টার সময় পুলককে সঙ্গে নিয়ে অশোক আম খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। হৃদয় চক্রবর্ত্তী একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন। কি সৌভাগ্য— কথাটাই উচ্চারণ করলেন বার কুড়ি।

চক্রবর্ত্তীর বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চুল বলা সঙ্গত নয়, কদমফুলের পাপড়ি। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। হাসবার উপক্রম করলেই সেই জঙ্গল ফাঁক হ'য়ে তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ কতকগুলি দাঁত আত্মপ্রকাশ করে। এমনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন যে, সেগুলি প্রকাশ হ'য়েই রইল:

বড় ঘরের বারান্দায় সেই ভাঙ্গা চেয়ার আর টুলখানা পাতা হয়েছিল, অশোক আর পুলককে বসিয়ে চক্রবর্ত্তী নিজে একটা পিঁড়ি দখল ক'রে উঁচু হ'য়ে ব'সে ডাকলেন, নেকী!

নেকী ভেতর থেকে সাড়া দিল, আম কেটে নিয়ে যাচ্ছি মামা।

দুথালা বোঝাই আম দুজনের সামনে ধ'রে দিতেই অশোক বল্লে, একি ব্যাপার! এত আম খাব কি ক'রে?

চক্রবর্ত্তী মাথা নেড়ে বল্লেন, কিছু না, কিছু না। যুবাকাল, লোহা পেটে পড়লে হজম হ'য়ে যাবে। খান, লজ্জা করবেন না। আপনার মাঠাকুরুণ নেকীকে স্নেহ করেন তাই, নইলে আমাদের মত লোকের বাড়ী আপনাকে খেতে বলা—সাহসই হত না!

নেকী মুচকে হেসে ভেতরে চ'লে গেল।

কি যে বলেন! ব'লে অশোক একটা আম মুখে তুলে নিল। বল্লে, খা পুলক, উনি যখন ছাড়বেন না, যা পারি খাই, বাকী নষ্ট হবে।

চক্রবর্ত্তী মোক্তার বকতে পারেন, আসর সরগরম ক'রে রাখলেন। অশোক কখন হুঁ দিয়ে কাজ সারতে লাগল, কখন বল্লে, নিশ্চয়! কখন মৃদু হেসে বল্লে, তা-বই কি! বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ ক'রে চক্রবর্ত্তী কলিকালের লোকের ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা এবং উৎকট লোভ-পরায়ণতার কথা কীর্ত্তন করলেন। বল্লেন, আদালতে এত মামলা মোকদ্দমা কি জন্যে মশায়? ওই লোভ! মিথ্যে দলিল দিয়ে, মিথ্যে সাক্ষী তৈরী ক'রে কার দুবিঘে জমি আছে তাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা! কেনরে বাপু? পরের জিনিষ নিয়ে টানাটানি কেন? নিজের যা আছে তাই নেড়ে চেড়ে খা না!

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল, তা বই কি!

এইবার চক্রবর্ত্তীর এই চিন্তার উৎসমুখের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পাজীলোক তাঁর পাঁচ বিঘে জমি যে কিরকম ভাবে আত্মসাৎ করবার উপক্রম করেছে এবং অশোকের বাবার কাছেই মিথ্যে দাবীর মোকদ্দমা রুজু করেছে, সবিস্তার বর্ণনা ক'রে চক্রবর্ত্তী ফোঁস ক'রে একটা নিশ্বাস ফেল্লেন। শুনে অশোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল।

থালা অর্দ্ধেক খালি ক'রে ঠেলে দিতেই চক্রবর্ত্তী হাত জোড় করলেন। অশোক ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, ওকি? ওকি? সত্যি বলছি আর খাবার ক্ষমতা নেই, নইলে ফেলে রাখতাম না।

লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধায় অশোকের অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেল। বাপের বয়সী ভদ্রলোক, বিনয়ের ছলে নিজেকে ক্রমাগত হীন ক'রে ফেলছেন দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করল।

জোড় হাতেই চক্রবর্ত্তী নিবেদন করলেন, তবে দুটি সন্দেশ মুখে দিন। ব'লে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হ'য়ে হাঁকলেন, নেকী! নেকী!

নেকী নিঃশব্দে চৌকাটের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুটো আম ফেলে দিলেই হবে? একি হেঁজিপেজি লোক পেয়েছিস! বাপের তো টাকা ছিল, এটুকু শিক্ষাও হয়নি? সন্দেশগুলো কি তোর জন্যে এনেছি নাকি?

চারটে প্রশ্ন! নেকী নতমুখে শুধু সন্দেশের সংবাদটাই দিল, সন্দেশ নেই!

নেই? কি হ'ল? পাখা গজিয়েছে?

আছে, দেওয়া যাবে না। হাঁড়ি ভেঙে সন্দেশ মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিল।

হাঁড়ি ভাঙল কেন?

তাকের ওপর ছিল, বেরালে ফেলে দিয়েছে।

হুঁ! ব'লে চক্রবর্ত্তী স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন।

অশোক হেসে বল্লে, বেরাল ভাল কাজ করেছে, এর ওপর সন্দেশ খেলে ডাক্তার ডাকতে হ'ত।

চক্রবর্ত্তী সখেদে বল্লেন, ষোল সতের বছর বয়স হ'ল, কোন দিকে যদি নজর থাকে! আপনার জন্য কত যত্ন ক'রে আনা! হায়! হায়! আগেই জানি অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ!

অশোকের ভাগ্যে সন্দেশ জুটল না সে জন্য চক্রবর্ত্তীর অদৃষ্ট মন্দ হতে যাবে কেন, ভেবে অশোকের হাসি পেল। লোকটির কি অপূর্ব্ব বিনয়!

চক্রবর্ত্তী ব'লে চল্লেন, অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে এমনটা হয়! সাতপুরুষের জমি তাতে আর একজন ভোগা দেবার চেষ্টা করে! আপনার বাবার কাছে যতক্ষণ মোকদ্দমা আছে ভাবনা নেই, উনি বিচক্ষণ হাকিম চট ক'রে সাজানো মামলা ধ'রে ফেলবেন। কিন্তু তা কি থাকবে! দেবে হয়ত এক দরখাস্ত ঝেড়ে কোন কাঠখোট্টা হাকিমের হাতে গিয়ে পড়ব ঈশ্বরই জানেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, আজ আসি চক্রবর্ত্তী মশাই।

চক্রবর্ত্তীও উঠে দাঁড়ালেন, আসবেন? যা ত মা নেকী একটা আলো নিয়ে সঙ্গে।

না না, আলো লাগবে না, এখনো তেমন অন্ধকার হয় নি। এটুকু বেশ যেতে পারব।

চক্রবর্ত্তী জিভ কেটে বল্লেন, আরে বাসরে! তা কি হয়? গ্রীষ্মকাল, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

অশোকের ইচ্ছা হ'ল বলে, আপনিই আলো নিয়ে চলুন না মশাই? রোগা মেয়েটাকে না হয় নাই পাঠালেন!

এরকম ইচ্ছা দমন করতে হয়। অশোকও করল। নেকী একটা আলো জ্বেলে নিয়ে তার সঙ্গে চল্ল।

বাগানের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নেকী বল্লে, অশোকবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

অশোক হেসে বল্লে, মস্ত ভূমিকা, অনুরোধ ছোট হ'লে চলবে না।

না, ছোট নয়।

নেকী একটা ঢোঁক গিলল। আলোটা এমন ভাবে ধরল যে মুখ তার অন্ধকারেই রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে, মামা যে জমির কথা বলছিলেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের। আপনার বাবাকে একটু বলবেন?

সম্মুখে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে অশোক তেমনি চমকে উঠল।

অন্য অবস্থায় এ অনুরোধটা অশোকের কাছে এত কদর্য্য ঠেকত না। সরলভাবে নেকী যদি এই অনুরোধ জানাত অশোক মৃদু হেসে তাকে বিচারকের কর্ত্তব্যের কথাটা বুঝিয়ে দিত। নেকীর অজ্ঞতায় কৌতুক অনুভব করত। কিন্তু এ যে ষড়যন্ত্র! তাকে ভুলিয়ে আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে, নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে, শত রকম ভাবে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা ক'রে এমনি ভাবে এই নির্জ্জন আমবাগানে এ অনুরোধ করার আর কোন অর্থই তো হয় না! টাকা নয়, কিন্তু আদর যত্নও তো ঘুষের রূপ নিতে পারে! হয় ত এই মেয়েটার রূপ—চক্রবর্ত্তীর নিজের মুখে না জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জনে সুন্দরী তরুণীকে দিয়ে অনুরোধ করার আর কি মানে হয়? ঘৃণায় অশোকের অন্তর সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে, তোমার এ অনুরোধের অর্থ জান?

নেকীর গলা কেঁপে গেল, আমরা বড় গরীব অশোকবাবু!

অন্য সময় এই কণ্ঠস্বর শুনলে অশোকের হয় ত করুণা হ'ত, এখন হ'ল রাগ। বল্লে, গরীব ব'লে তোমাদের জন্য আমাকে অন্যায় করতে হবে নাকি?

অন্যায় তো নয়। জমিটা আমাদের। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয় না?

তিক্তস্বরে অশোক বল্লে, না, হয় না। হ'লেও, জমি তোমাদের কি অন্যের সে মীমাংসা হবে আদালতে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে। তোমার অনুরোধ যে আমাকে আর আমার বাবাকে কতদূর অপমান করতে পারে সে ধারণা তোমার নেই ব'লেই নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারলে।

নেকী কি বলতে গিয়ে সামলে নিল। একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে, চলুন।

থাক্, তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

নেকীর মুখ দেখা গেল না, দেখলে অশোক ভয় পেয়ে যেত। বল্লে, অতিরিক্ত সাধুতা ফলাবেন না অশোকবাবু।

অহৈতুক দংশন। অন্তরে জ্বালা ধরলে, কারণ যাই হোক, এই রকম যুক্তিহীন কথাই মুখ দিয়ে বার হয়। অশোক কিন্তু তা বুঝল না, বল্লে, সাধুতা-অসাধুতার তফাৎ বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই এ কথার জবাব দিলাম না। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ লীলা, ভগবানের দেওয়া রূপকে তুমি তুচ্ছ ঘুষের মত ব্যবহার করলে!

অন্তরে ওই কথাটাই বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধছিল; অসতর্ক মুহূর্ত্তে অশোকের শিক্ষা দীক্ষা মার্জ্জিত বুদ্ধি সকলের বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এমন বিশ্রী শোনালো যে অশোক চমকে উঠল।

নেকীর হাত থেকে আলোটা প'ড়ে গিয়ে বার কয়েক দপ্ দপ্ ক'রে জ্ব'লেই নিভে গেল।

মাগো! আপনি কসাই! আর্ত্তস্বরে এই কটি কথা উচ্চারণ ক'রে নেকী একরকম ছুটে চ'লে গেল।

পুলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল, অশোকের একটা হাত ধ'রে বল্লে, বাড়ী চল দাদা।

বাড়ী? চল।

পাঁচ

অশোক মনকে বোঝাল, নতুন একটা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হ'ল, মন্দ কি! ফুলে যে কীট থাকে সে তত্ত্বটা তো জানাই ছিল! এবার থেকে সাবধান হওয়া যাবে। উঃ, কি রকম জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধছিল! মুক্তি পেলাম, বাঁচা গেল।

মুক্তিও বটে, বাঁচাও বটে! জুটোর একটার চিহ্নও অশোক খুঁজে পেল না। বাঁধন খসেছে মনে করতেই বাঁধনে টান পড়ল। যা নেই ব'লে জানল, তারই টানে টানে পাকে পাকে হৃদয় ভেঙে পড়তে চায় দেখে অশোক চমকে গেল।

অশোক দেখে অবাক হয়ে গেল, লীলাকে সে যেভাবে ভাবতে চায় লীলা সে ভাবে ধরা দেয় না। মনে হয়, তার বিতৃষ্ণা যেন তার চোখের সামনে কুয়াসা রচনা ক'রে দিয়েছে, সেই কুয়াসার ভেতর দিয়ে লীলাকে সে নিষ্প্রভ দেখছে, কিন্তু কুয়াসার ওদিকে লীলা তেমনি উজ্জ্বল হ'য়েই আছে।

অশোক ধরতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়েছে। খোঁজে। হদিশ মেলে না।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে সে আগাগোড়া একবার ভেবে নিল। হঠাৎ ভুলটা ধরা প'ড়ে গেল।

চক্রবর্ত্তী! হৃদয় চক্রবর্ত্তী! ঠিক।

অশোক ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসল। মূর্খ, মূর্খ! নিতান্ত মূর্খ সে। সবটুকুই যে হৃদয় চক্রবর্ত্তীর খেলা এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তার নেই! মামা আদেশ করলে তাঁর কথা লীলা কেমন ক'রে অস্বীকার করবে? আজ এক মাস যার সঙ্গে পরিচয়, যার চরিত্রের এতটুকু অংশ তার কাছে গোপন নেই, তাকে কি ক'রে এতখানি হীন ব'লে সে মনে করল? লীলার তো বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই! অশোকের বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। বন্ধনের যে দড়িদড়াগুলি এতক্ষণ বেদনা দিচ্ছিল হঠাৎ সেগুলি ফুলের মালা হ'য়ে গেল।

আকাশে যে কটা তারা দেখা যাচ্ছিল নির্নিমেষ নয়নে তাদের ভেতরের সব চেয়ে উজ্জ্বল তারাটির দিকে চেয়ে থাকতে অশোকের দু চোখ জলে ভ'রে গেল। মুখের কথা, না যায় চোখে দেখা, না চলে স্পর্শ করা। কিন্তু ব্যাধের তীক্ষ্ণ শায়কের মত কি কঠিন হ'য়েই না বিঁধতে পারে! অশোকের দু কান জুড়ে নেকীর আর্ত্ত কণ্ঠ শব্দিত হ'তে লাগল, মাগো! আপনি কসাই!

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই অশোক আম বাগানে চ'লে গেল। পুকুর ধারে ঘাটের কাছে একটা তালগাছ কাৎ হয়ে পড়েছিল, তার গুঁড়ির ওপর ব'সে সরু বাঁকা পথটির দিকে চেয়ে রইল।

একগোছা বাসন হাতে নিয়ে ঝোপ ঘুরে পুকুরের তীরে এসে অশোকের দিকে নজর পড়তেই নেকী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একরাত্রে তার ওপর দিয়ে যেন ঝড় হ'য়ে গেছে। চোখ লাল, চোখের কোলে কালি! কাল বিকালে অতি যত্নে কবরী রচনা করেছিল, কার জন্য বুঝে কাল অশোকের খুসীর সীমা থাকে নি। আজ সে কবরী বিশৃঙ্খল হ'য়ে গেছে।

বেদনার ভারে দৃষ্টি যেন নুয়ে পড়তে চায়।

অশোকের বুক টন টন ক'রে উঠল। কাছে এসে বল্লে, লীলা, আমি সত্যি কসাই, আমায় মাপ কর।

নেকীর সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

অশোক আবার বল্লে, আমি বুঝতে পারি নি লীলা। তোমার কোন দোষ ছিল না।

ছিল না?

অশোক ভুল করল, বললে, না। আমি জানি তোমার মামার জন্যেই—

আপনার পায়ে পড়ি অশোক বাবু, যে নীচ, ভগবানের দেওয়া রূপকে যে ঘুষের মত ব্যবহার করে, দয়া ক'রে তাকে নীচেই থাকতে দিন। ব'লে নেকী অগ্রসর হল। পথ ছাড়ুন।

অশোক পথ ছেড়ে দিল। তার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে নেকী ঘাটে নেমে গেল।

পরদিন অশোক কলকাতা রওনা হ'ল।

ছয়

মাস তিনেক পরের কথা।

সকালে মার কাছ থেকে অশোক একখানা চিঠি পেল। মা লিখেছেন, মাসখানেক ধ'রে তিনি জ্বরে ভুগছেন, খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া ধরেছে। ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছেন, রাঁচি যাওয়া ঠিক হয়েছে। অশোকের বাবার ছুটি নেই, রাঁচি পর্য্যন্ত যেতে পারবেন না। কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, কলকাতা থেকে অশোককে সঙ্গে যেতে হবে। সে যেন প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

চিঠি প'ড়ে অশোক মিনিট পনের ভাবল, তারপর সুটকেশ গোছাতে বসল। সেইদিন রাত্রের সিরাজগঞ্জ মেলে উঠে বসল।

মা বল্লেন, তোর তো আসবার দরকার ছিল না। আমরাই তো কলকাতা যাচ্ছিলাম। যাক্, বেশ করেছিস।

অশোক মুখ নত করল। কেন যে এল, সে প্রশ্নের বিরামহীন মহলা তো তার মনেই চলেছে! জবাব দেবে কি?

তোর কি কোন অসুখ হয়েছিল অশোক?

অশোক ঘাড় নেড়েই প্রশ্ন করল, পুলকের পৈতে দেবে না মা?

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ছেলের প্রয়াস দেখে মার চোখে জল এল। বল্লেন, ঘুরে তো আসি, তারপর দেখা যাবে। আর জানিস, নেকী আমাদের সঙ্গে যাবে।

অশোক চমকে উঠল।

মেয়েটা একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে রে! তুই থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরেছিল, এখন কালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের তো সীমা ছিল না। জ্বর গায়ে কবার যে স্নান করত ঠিক নেই। কী চেহারা হ'য়ে গেছে! মা একটা নিশ্বাস ফেলে চ'লে গেলেন।

মেয়েটা একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে! শেষ হ'য়ে গেছে! দেয়ালে টাঙান ঘড়িটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে অশোকের দু'চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল। মার চেঞ্জে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য আর তার কাছে গোপন রইল না।

নেকী অল্প অল্প হাঁটতে পারত, কিন্তু আম বাগান পার হ'য়ে আসবার তার ক্ষমতা ছিল না। মা পাল্কী নিয়ে গিয়ে নিজে তাকে নিয়ে এলেন। অশোক উঠানে দাঁড়িয়েছিল, পাল্কীর খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসল। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই, সারারাত্রি ঝড়ের আঘাত স'য়ে রজনীগন্ধার দল ভোর বেলা যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত হাসি হাসে সেইরকম হাসি। অশোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

নেকীর পিসির অসুখ, চক্রবর্ত্তীর তাই এই সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। পিসি একটু ভাল হ'লেই যাবেন। যাত্রা করবার সময় ভদ্রলোক হাউ মাউ ক'রে কেঁদে ফেললেন, অশোকের মাকে উদ্দেশ ক'রে বিকৃত কণ্ঠে বল্লেন, আমার আর কেউ নেই মা, ওকে আপনি ফিরিয়ে আনবেন।

চক্রবর্ত্তীর ওপর অশোকের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না, আজ তার মনে হ'ল এর চেয়ে ভাল লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই!

সহরের প্রান্তবাহী ছোট নদীটি বর্ষার জলে ভ'রে উঠেছে। ষ্টিমার ঘাট পর্য্যন্ত গাড়ী যায় না, নৌকায় যেতে হয়। ষ্টিমার ঘাট সহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

নৌকা ছাড়লে মা বল্লেন, আহা, লোকটা বড় দুঃখী।

অশোক বল্লে, হৃদয় বাবুর ছেলেপিলে নেই মা?

তুই জানিস না? বিয়ের এক বছর পরেই নেকীর মামী মারা যান, আজ পঁচিশ বছর তার স্মৃতি বুকে নিয়ে উনি বেঁচে আছেন।

অশোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই নিতান্ত সাধারণ লোকটি, যে সামান্য ক বিঘা জমির জন্য অমন একটা কদর্য্য অভিনয় করতে পারে, সে আজ পঁচিশ বছর মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি বুকে ক'রে আছে! কেমন ক'রে এ সম্ভব হয়! লোকটা যে তুচ্ছ সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু আজ অশোক তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না ক'রে পারল না। অক্ষয় প্রেমের, একনিষ্ঠ ভালবাসার স্পর্শে অন্তর যার

সোনা হ'য়ে গেছে, তার সকল হীনতা সকল তুচ্ছতা অশোকের কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেল।

নেকী কেবিনে ঢুকতে রাজী হ'ল না। রেলিঙের পাশে ডেক চেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। অশোক আর তার মা কাছেই বসলেন। নেকী একদৃষ্টে মেঘনার জলরাশির দিকে চেয়ে রইল। ষ্টিমার এক তীর ঘেঁষে চলেছে, ওপারের তটরেখা অস্পষ্ট। এখনও দু বছর পুরো হয়নি এই পথ দিয়েই সে একটা অতি পরিচিত জীবনকে পিছনে ফেলে দুরু দুরু বুকে অজানা অচেনা জীবনের মাঝে গিয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেই পথেই কোন নতুন জীবনের সন্ধানে সে চলেছে কে জানে! দেনা পাওনা হয়ত মিটবে না, ওপারের তটরেখার মতই অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যে চিরন্তন জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সে জীবনে যেতে মন হয়ত তার কেঁদেই উঠবে। কিন্তু যেতে বোধ হয় হবেই।

অশোক শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে ডেকের পাটাতনের দিকে চেয়ে রইল। মা-ই কেবল মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলতে লাগলেন। পুলকের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের সুখ-দুঃখের বালাই নেই, রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হ'য়ে সে ঢেউয়ের ওঠা-নামা দেখতে লাগল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মা বল্লেন, তোরা গল্প কর অশোক, আমার ভারি মাথা ধরেছে, কেবিনে একটু ঘুমিয়ে নিই গে।

মা উঠে যেতেই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে নেকী হাসল। যেন বলতে চায়, রাগ তো তোমারও নেই আমারও নেই, তবে কথা বলছ না কেন?

চেয়ারটা নেকীর কাছে সরিয়ে এনে তার মুখের ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অশোক বল্লে, আমায় মাপ করেছ লীলা?

নেকী তেমনি ভাবে হেসে বল্লে, মাপ করবার কিছু নেই, সে সব আমি ভুলে গেছি। তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় ক'রে দেখবার আর আমার শক্তিও নেই, সময়ও বোধ হয় নেই।

অশোকের চোখে জল এল, বল্লে, আমিই তোমায় শেষ ক'রে দিলাম লীলা।

লীলা তাড়াতাড়ি বল্লে, না না, ওকথা বোলো না। হঠাৎ আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্লে, কতগুলি সাদা পাখী কেমন সার বেঁধে চলেছে ত্যাখো! বক ত নয়।

অশোক দেখল। বল্ল, না। বুনো হাঁস।

হাঁস? ওমা! এ আবার কি রকম হাঁস! আচ্ছা ওরা দল বেঁধে কোথায় চলেছে? বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?

অশোক বুঝল। একেবারে নেকীর পাশে স'রে গেল। নেকীর একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ ক'রে বল্লে, ওঁদের তো বাড়ী ঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়। তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সঙ্কোচ মুছে ফেলাই সব চেয়ে সহজ।

সত্যি? বাড়ী ঘর না থাকা কিন্তু বেশ! না?

বাতাসে একরাশি রুক্ষ চুল নেকীর মুখের ওপর এসে পড়ল। অশোক সযত্নে চুলগুলি সরিয়ে দিল। আরামে নেকীর চোখ বুজে এল। নিঃশব্দে অশোকের আঙুলের মৃদু স্পর্শটুকু সমস্ত প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে সত্তা দিয়ে উপভোগ ক'রে চোখ মেলে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিত সুখের হাসি হেসে বল্লে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই?

ঘুমোও।

নেকীর হাতখানি হাতের মুঠোতেই ধরা রইল। নেকীর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীল আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল শ্বেত চন্দনের ফোঁটার মত গতিশীল বুনো হাঁস গুলির দিকে চেয়ে রইল।

শ্রাবণের আকাশ, কিন্তু মেঘ নেই। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা অস্পষ্ট হ'য়েই রইল।

অশোক মনে মনে বল্লে, তাই থাক্। যে তীর ঘেঁষে চলেছি সেই তীর স্পষ্টতর হোক, উজ্জ্বলতর হোক, ওপারের তটরেখা আরও অস্পষ্ট হ'য়ে মিলিয়ে যাক।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুল

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

আজ জার্ম্মাণীর একটি অতি পুরাতন সহরের কথা লিখছি। ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের নাম বোধ হয় অনেকেই শোনেননি ও পুরাতন সুন্দর সহরের নামটা আমারও অজানা ছিলো, তবে গতবৎসর ইয়োরোপের নানা কাগজে পত্রিকাতে ও সহর সম্বন্ধে নানা কথা বাহির হওয়াতে ওই সহরের নাম আমার পরিচিত হয়,—গত বৎসর ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের ইয়োরোপে ও আমাদের দেশে অনেক আছে, তবে ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের বিশেষত্ব এই যে বহু শতাব্দী আগে সহরটি যেমন ছিল এখনও সহরটির রূপ ঠিক সেই রকম আছে, অর্থাৎ যত্ন ক'রে রাখা হয়েছে; চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর জার্ম্মাণীর সহরের রূপ, তার ঘর বাড়ী পথ ঘাট কেমন ছিল তা এ সহরে এলেই স্বচক্ষে দেখা যায়। আমরা পুরাতন

দশহাজার বৎসর বয়সপ্রাপ্তি উৎসব উপলক্ষে সহরের এক শোভাযাত্রা

এক হাজার বৎসর বয়সপ্রাপ্তির উৎসব মহাসমারোহে হয়েছিল। সহরটা নাকি আরও পুরাতন, তবে ৯২৮ থেকে তার একটা সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়; সেইজন্য ১৯২৮তে ভুরত্‌সবুর্গ (Würzburg) হ'তে ম্যুনসেনে (München) যাবার পথে এই এক হাজার বছরের পুরাতন সহরটি দেখে যাবার লোভ সামলাতে পারলুম না। অবশ্য পুরাতন সহর জাতি ব'লেই হোক বা যে কারণে হোক, পুরাতনের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রেম আছে, পুরাতন আমাদের আকর্ষণ করে। অবশ্য ইয়োরোপের লোকেদেরও পুরাতনের প্রতি টান বড় কম নয়, তবে পুরাতনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাটা হচ্ছে অন্য রকমের; আমরা পুরাতনকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাই আর তারা পুরাতনকে ছাড়িয়ে সদাই এগিয়ে

চলেছে, পুরাতন হচ্ছে তাদের গতিপথের পেছনের চিহ্ন, তাদের অগ্রসরের মাপকাঠি, তাই পুরাতনকে তারা সযত্নে রক্ষা করে, মিউজিয়াম ক'রে মাঝে মাঝে দেখে আনন্দ পায়, বস্তুতঃ ডিঙ্কেল্‌স্‌বুলটি হচ্ছে পঞ্চদশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ-মিউজিয়াম।

রাত্তির বেলা যখন ডিঙ্কেল্‌স্‌বুল ষ্টেসনে নামলুম, চারদিক নিঝুম নীরব, সুস্নিগ্ধ অন্ধকারে ঘেরা, যেন বাংলার একটি গ্রাম্য ষ্টেসনে নিশীথকালে নামলুম। ষ্টেসনটি সহর থেকে বাহিরে, খোলামাঠের মাঝখানে; পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত কোন রেলওয়ে ষ্টেসন ছিল না, সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর দেওয়ালবেষ্টিত পরিখারক্ষিত বুরুজমণ্ডিত এই পুরাতন সহরের ভেতর উনবিংশ শতাব্দীর রেলওয়ে ষ্টেসনের প্রবেশ নিষেধ। মাঠের মাঝের খোলা পথ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে সহরের সামনে এসে পৌঁছলুম, নগর-ঘেরা দেওয়াল এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে, যেন কোন বৃহৎ কালো নাগ তারাভরা আকাশের তলে অন্ধকারমগ্ন সুপ্ত সহরটিকে রক্ষা করছে, তার উন্নত ফণার মত সম্মুখে বুরুজমণ্ডিত তোরণদ্বার; পরিখার ওপর ছোট সেতু পেরিয়ে ভোরনিত্‌স্‌-দ্বারে এসে পৌঁছলুম, অন্ধকার বুরুজটির আবছায়ারূপ দেখা গেল যেন কোন খাড়া প্রহরী সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এত রাতে সহরে প্রবেশ করা সুসাধ্য হ'ত না; প্রথমতঃ, তখন এমন পাথরের পাকা পোল পরিখার ওপর থাকতো না, থাকতো একটি লোহার টানা-পোল (draw-bridge), সে পোল সন্ধ্যার পরেই টেনে তুলে নেওয়া হতো, তারপর মোটা কাঠের বৃহৎ দ্বার সুদৃঢ়রূপে লোহার অর্গল দিয়ে বন্ধ করা হোত, আর পরিখার ওই কোণের ঘরে সশস্ত্র প্রহরী প্রদীপ জ্বালিয়ে ব'সে থাকতো। যদি তখন প্রাচীন নগরবাসী হতুম তা হ'লে প্রহরীকে কিছু মদ্যপানের অর্থ দিয়ে টানা-পোল ফেলিয়ে লোহা ও কাঠের দরজা খুলিয়ে মশালের আলোয় নগরে কোনরকমে প্রবেশ করতে পারতুম। এখন অবশ্য মশালের আলোয় নয়, ইলেকট্রিকের আলোয় পুরাতন সহরটিতে ঢুকলুম, তবে ইলেকট্রিকের আলোগুলি যেন এ গেবল্‌মণ্ডিত (gabled) প্রাচীন বাড়ীর সারি ভরা আঁকা বাঁকা পথে খাপ খায় না, তারা টিম্‌টিম্‌ ক'রে জ্বলছে, অন্ধকারের প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে স্তিমিত প্রদীপের মত। মৃদু আলোকিত স্তব্ধ কয়েকটি পথ পার

ভোরনিত্‌স্‌-দ্বার

হ'য়ে হোটেলে আসা গেল, হোটেলটির নাম Weissen Ress অর্থাৎ "সাদা-ঘোড়া।" কালো সাদা ঘোড়াচালিত পথ-যাত্রীদের গাড়ী এখন আর হোটলের দ্বারে এসে থামে না, এখন জার্ম্মানীর নানা সহর থেকে পুরাতন সহর দেখবার জন্য দেশী বিদেশী ভ্রমণকারীভরা বড় বড় মোটর হোটেলের দ্বারে এসে প্রতিদিন দাঁড়ায়, তবে পুরাতন নামটি পুরাতন দিনের পথ-যানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের হোটেলের নামগুলিও সেকেলে, পুরাতন দিনের স্মৃতিভরা, হোটেল্ রিৎস্, বা হোটেল ভিক্টোরিয়া এরকম নাম নেই; একটি হোটেলের নাম হচ্ছে Gasthop zum Grünen Baum অর্থাৎ "সবুজ গাছের অতিথিশালা," আর একটি নাম হচ্ছে, Gasthop zum Goldenerk kreuz, "সোনার ক্রুশের অতিথিশালা," আর একটির নাম হচ্ছে, Dentsche Haus বা "জার্ম্মান-গৃহ"; নামগুলি শুনলে মনে হয় এ ফ্যাসানেবল ধনী মোটর-চড়া ভ্রমণ-কারীদের হোটেল নয়, এ পথশ্রমশ্রান্ত গৃহবিরহব্যথিত যাত্রীদের শান্তি ও আরামের আশ্রয়।

"সাদা-ঘোড়া" হোটেলে ঢুকতেই হোটেলের মালিক্ আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, এই হোটেলের মালিকটিকে আমাদের বড় ভাল লেগেছিল, তাঁর অভ্যর্থনা তাঁর সৌজন্যের মধ্যে এমন একটা সরলতা প্রাণ-খোলা ভাব ছিল যে সহজেই তিনি সকল অতিথির মনে হোটেলে-থাকার ভাব দূর ক'রে ঘরোয়া ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন। আমাদের ঘরে এসে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। এরকম ছোট সহরে ইংরাজী-জানা হোটেল-স্বামী পাবো ভাবি নি, তবে এখন ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুল হচ্ছে ভ্রমণকারীদের সহর, নানা হোটেলে ভরা, পৃথিবীর নানা দেশ হ'তে যারা জার্ম্মানী দেখতে আসে তাদের অনেকেই পুরাতন একটা জার্ম্মান সহর দেখবার জন্যে ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলে বা রোথেনবুর্গে যায়, এই ভ্রমণকারীদের হ'তেই সহরের এক প্রধান আয়। হোটেলের মালিকটি বলতে লাগলেন, "বহুদিন পরে ভারতবাসী দেখে
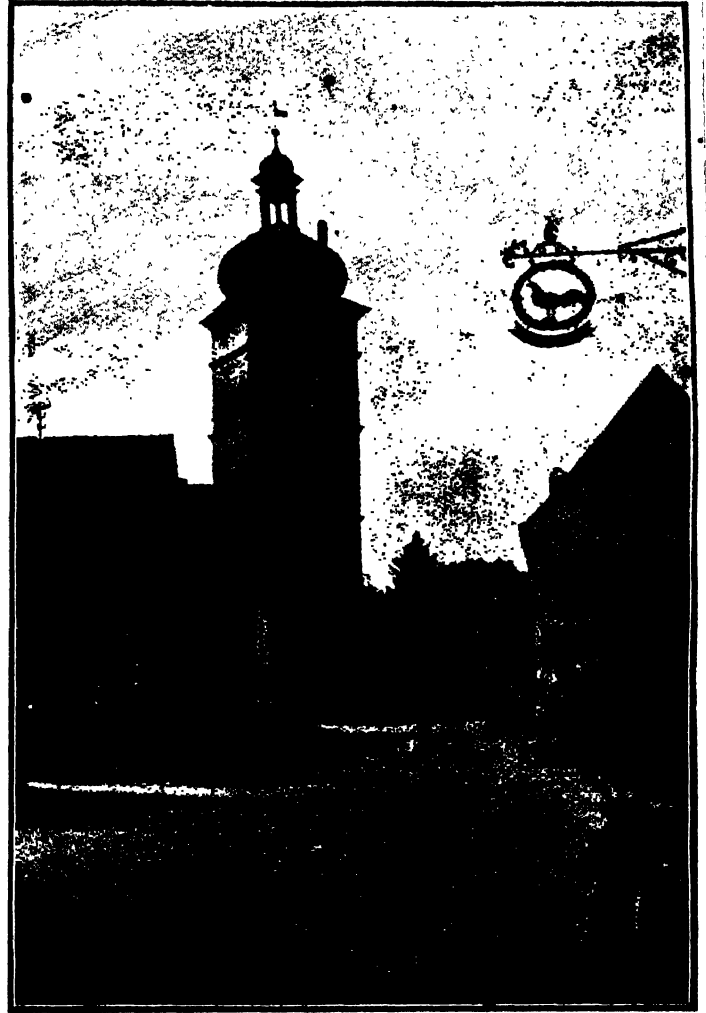
সেগ্‌রিংগার-দ্বার

আমার বড় আনন্দ, ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলে ভারতবাসী বড় কেউ আসেন না, আমি যখন লণ্ডনে ছিলুম—ও, সে যুদ্ধের আগে—তখন অনেক ভারতবাসীর সঙ্গে আলাপ ছিল—ভারতীয় মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ"—গামা না কাল্লু দু'একজন ভারতীয় কুস্তিগিরের সঙ্গে আলাপ করেছেন

বল্লেন। "আচ্ছা, এখন বিশ্রাম করুন, কাল সহর দেখবেন, রোথেনবুর্গের চেয়ে এ সহর ভাল লাগবে—তলায় একদল টুরিষ্ট এসেছেন আমাকে তাঁদের সঙ্গে কিছু আমোদপ্রমোদ করতে হবে।—এই ব'লে হোটেল-স্বামী বিদায় নিলেন। পরদিন শুনেছিলুম রাত ছুটো পর্য্যন্ত একতলার বড় রেস্তোরাঁ হলে নাচ গান বাজনা ও মদ্যপান চলেছিল।

পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়েই সহর দেখতে বাহির হওয়া গেল। ছোট গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় প'ড়েই

ছ'খানি ছোট ঘরে এক তরুণ জার্ম্মাণ-দম্পতী তাদের সুখের নীড় বেঁধেছে, তারা হচ্ছে ভ্রমণকারী, তলায় হোটেলে ঘর পছন্দ হ'ল না, এই 'টলমল মেঘের মাঝারে' উন্মুক্ত আকাশের নীলিমায় দীপ্ত সূর্য্যালোকের বন্যা ও বাতাসের মাতামাতির মধ্যে এ যুবক ও যুবতী নিভৃতে তাদের নবীন প্রেমের বাসা করেছে—ছোট একটি রান্নাঘর, তার পাশে শোবার ঘর, সে ঘর থেকে একটি শিশুর হাসির ধ্বনি আলোর স্পর্শে সদ্য-জাগা পাখীর গানের মত কানে এল।

সেগ্‌রিংগার-দ্বারের বুরুজের মাথা থেকে ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের
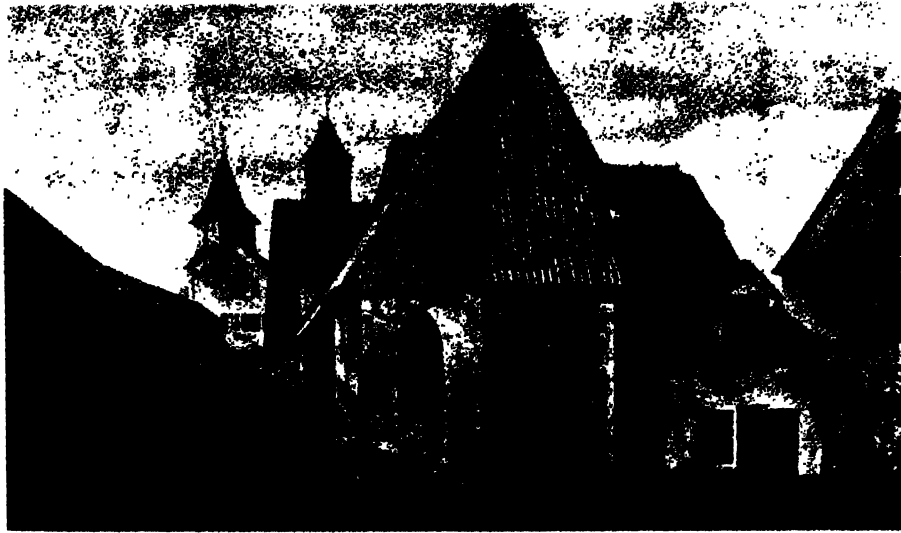
তিন রাজার চ্যাপেল

দেখি সামনে বাঁধা রাস্তা শেষে সুন্দর নগর-দ্বার, তার ওপর পতাকাশোভিত গম্বুজওয়ালা বুরুজ খাড়া উঠে গেছে, পথের ছ'ধারে বাড়ীর সারির লাল-টালি-ছাওয়া ত্রিকোণ ছাদগুলি ঝুঁকে পড়েছে, যেন তাসের ঘরের পরে তাসের ঘর সাজানো। উঁচু থেকে সহরের শোভন দৃশ্য দেখবার জন্যে বুরুজের উপর উঠতে আরম্ভ করা গেল, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে একেবারে উপরে উঠে দেখি, শরৎ-প্রভাতের সূর্যোলোকধৌত লালছাদওয়ালা সহরের শোভার চেয়ে আর একটি সুন্দর দৃশ্য মন ভুলালো। সেই বুরুজের মাথায়

রূপের একটা বেশ আইডিয়া পাওয়া গেল। সেগরিংগার-দ্বার হচ্ছে নগরের পশ্চিম-দ্বার, এই দ্বার হ'তে বুরুজের পর বুরুজের কিরীটমণ্ডিত পুরাতন ইটের দেওয়াল সুপ্রসারিত সুদীর্ঘ হস্তের মত দক্ষিণে চ'লে গেছে নর্ডলিংগেন-দ্বারের দিকে, উত্তরে চ'লে গেছে রোথেনবুর্গ-দ্বারের দিকে। নর্ডলিংগেন ও রোথেনবুর্গ বাভেরিয়ার ছুটি অতি পুরাতন সহর, ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের প্রায় সম-বয়সী, তাদের নাম থেকে সহরের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারের নামকরণ। সহরের চার দিকের চার তোরণ-দ্বার যুক্ত ক'রে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীরটি

নদীর জলধারার মত এঁকে বেঁকে গেছে ; এখন এই পুরান প্রাচীরকে সহরের শোভারূপে দেখছি, নগরীসুন্দরীর কটির কাঞ্চিরূপে দেখছি, কিন্তু মধ্যযুগে এই প্রাচীর ছিল সহরের বর্ম্ম, তার রক্ষাকবচ, এই মনোহর বুরুজগুলি ছিল অস্ত্রশালা, ওইখানে নগররক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলত।

এই নগর-প্রাচীরের তরঙ্গায়িত গতিটি বড় সুন্দর লাগল, এইখানে মধ্যযুগের স্থাপত্যের একটি বিশেষত্বের পরিচয় পেলুম। মধ্যযুগ স্থাপত্যের পাঠ প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন রোমের নিকট হ'তে নেয় নি, সে স্থাপত্যের মূলনীতি শিখেছিল প্রকৃতির কাছ থেকে, অন্তরের প্রেরণা থেকে সে সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, কোন পুরাতন দিনের স্থাপত্যের অনুকরণ করতে বা পুনর্জন্ম দিতে চায় নি ; তাই পাহাড়ের মাথার পাইনগাছের সারির উচ্চতাকে পাল্লা দিয়ে তার গথিক-গির্জ্জার থাম উঠেছিল, বনের রহস্যময় স্নিগ্ধ স্তব্ধ অন্ধকার সে নগরের জনকোলাহলময় দীপ্ত আলোর মধ্যে চার্চ্চের অন্তরে সৃষ্টি করেছিল। তাই দেখলুম, নগরের প্রাচীরটি নগরের পাশের ভোয়নিত্স-নদীর মত এঁকে বেঁকে এসেছে, সে যেন প্রকৃতির এ নদীরেখার সঙ্গে এক ছন্দে চলতে চেয়েছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে বা প্রকৃতিকে জয় করতে যায়নি। সরল রেখা হচ্ছে মানুষের সুবিধার জন্য তৈরী, তার গর্ব্ব তার ক্ষমতার পরিচায়ক, প্রকৃতির রাজ্যে রেখা বক্র, লীয়ায়িত, তরঙ্গায়িত ; পাহাড় এঁকে বেঁকে ওঠে, নদী বেঁকে বেঁকে চলে, সবুজ মাঠের ওপর নীলাকাশ নত হ'য়ে পড়ে সুন্দরীর চোখের ওপর ভ্রূর টানের মত। সহরের রাস্তাগুলিও কোনটা সোজা নয়, অথচ খুব আঁকাবাঁকাও নয়, তারাও একটা ছন্দে বাঁধা। সেগ্‌রিংগার দ্বার থেকে যে রাস্তাটি সহরের মাঝখানে বাজারের দিকে চ'লে গেছে, সেটি তৃতীয়ার শশিকলার মত বাঁকা। তারপর বাজার ছাড়িয়ে সেন্টজর্জ্জ গির্জ্জার পাশ দিয়ে পথটি পূর্ব্বদিক থেকে ঘুরে দক্ষিণে চ'লে গেছে নর্ডলিং-দ্বারের দিকে। সেগরিং-দ্বার

সবুজ টাওয়ার

হ'তে নর্ডলিং-দ্বার সমস্ত পথটি একটি ধনুকের মত বেঁকে গেছে, আর তার মাঝে মাঝে নদী হ'তে শাখানদীর মত ছোট ছোট রাস্তার সারি কাস্তের মত বেঁকে বেঁকে তরঙ্গের মত ভেঙে পড়েছে। বস্তুতঃ বার্লিনের বুলেভারের মত

সোজা টানা রাস্তা মধ্যযুগের লোকেদের দরকার ছিল না, তাদের ত মোটর হাঁকিয়ে নাকের সিধে ছুটতে হ'ত না, সময় তখন ছিল প্রচুর, জীবন ছিল মন্দগতি, পথের আঁকে বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে চলাই ছিল পথিকের আনন্দ।

সেন্ট জর্জ্জ গির্জ্জা

সেগ্‌রিং-বুরুজ থেকে নেমে দেখি বুরুজের তলার সিঁড়ির ওপর রুক্‌স্যাক রেখে একটি জার্ম্মান যুবক ও তার বান্ধবী রংএর বাক্স খুলে সহরের পুরাতন বাড়ী আঁকতে ব'সে গেছে। সেগ্‌রিং-বুরুজের বাম দিকে হচ্ছে তিনরাজার চ্যাপেল, যেন একটা ছ কোণা ঘরের ওপর কে লালটালির টোপর পরিয়ে দিয়েছে; তার পাশের গলির শেষে সবুজ-জানলা-ওয়ালা সবুজ লতায় ছাওয়া হলদে-দেওয়াল জোড়াবুরুজমণ্ডিত Grünem Turm বা সবুজ টাওয়ার নীলাকাশের পটভূমিকায় বড় সুন্দর দেখতে; এই সবুজ টাওয়ারটি যুবক আঁকছিল আর তার সঙ্গিনীটি আঁকছিল তিনরাজার চ্যাপেল; বার্লিনের নিকট কোন ছোট সহরে তাদের বাড়ী; শরৎ-কালের ছুটিতে তারা দুজনে বাহির হ'য়ে পড়েছে, তারা চিত্রকর নয়, তাদের আঁকাটা হচ্ছে সখের। এই ছবি আঁকার প্রতি বর্ত্তমান সময়ের জার্ম্মান স্কুলগুলির বিশেষ নজর; ভুরত্‌স্‌বুর্গে দেখেছিলুম সেখানকার প্রসিদ্ধ রোককো রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনাতে সকালের আলোয় সব স্কুলের ছেলেমেয়েরা আঁকতে ব'সে গেছে, কেউ আঁকছে একটি দরজা, কেউ আঁকছে একটি কারুকার্য্যকরা থাম, কেউ আঁকছে ফোয়ারার সৌন্দর্য্য; ছুটির শেষে স্কুলে তাদের এসব আঁকা ছবি দেখাতে হবে। সেদিন বার্লিনের একটি স্কুলের মেয়ের খাতা দেখ্‌ছিলুম; ছুটিতে তাদের একটি প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিল,—'একশ বছর আগেকার জার্ম্মাণী'; প্রবন্ধটি শুধু কথায় লিখলে হবে না তাকে সচিত্র করতে হবে। মেয়েটি প্রবন্ধের গোড়াতে এঁকেছে একটি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ী, তখন ত রেলগাড়ী বা মোটরকার হয়নি, লোকে ঘোড়ার গাড়ীতে ভ্রমণ করত, এই কথাটি মেয়েটির প্রথমে মনে হয়েছে; তার পর এঁকেছে আঠারো শতাব্দীর সাজপরা একটি ছেলে, তার বেশভূষা রংএ জলজল ক'রে তুলেছে। এম্নি আঁকার মধ্য দিয়ে রং ও রেখার সৌন্দর্য্য অনুভব করার শক্তি, রূপকে দেখে

আনন্দ পাওয়ার বৃত্তি তরুণমনে সহজে বিকশিত হয়, ছেলেবেলা থেকে সৌন্দর্য্যকে ভালবাসবার বিচার করবার শিক্ষা হয়েছিল ব'লেই এই জার্ম্মান যুবক ও যুবতী এই সুন্দর সহরে এসে আঁকবার তুলি নিয়ে, ব'সে গেছে।

রাট-হাউস পেরিয়ে বাজারের কাছে পৌঁছাতে দেখি আমাদের হোটেল-মালিক একদল আমেরিকান টুরিষ্ট নিয়ে বাহির হয়েছেন সহর দেখাতে, আমাদের দেখেই উচ্ছ্বসিতভাবে ব'লে উঠলেন, কি রকম দেখছেন সহর, কি, রোথেনবুর্গের চেয়েও ভাল! আচ্ছা, আসুন একটা পুরাতন বাড়ীর উঠানের বাগান আপনাদের দেখাই। টুরিষ্টদলকে সামনে সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জাতে প্রবেশ করতে ব'লে তিনি আমাদের ও এক বৃদ্ধ জার্ম্মান ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সামনের এক লোহালক্কড়ের দোকানে ঢুকলেন, তাদের বাড়ীর বাগানটা আমাদের দেখাতে ব'লে চ'লে গেলেন। বাহির থেকে পেরেক স্ক্রু ইত্যাদি লোহার জিনিষের দোকান দেখে ভাবছিলুম ভেতরে আর কি এমন বাগান থাকবে, কিন্তু বাড়ীর ভেতর আঙিনাতে ফুলের বাহার দেখে অবাক ও মুগ্ধ হলুম, ছোট আঙিনার ওপর বাড়ীর ত্রিকোণ ছাদ ঝুঁকে পড়েছে, দোতলা তেতলা চারতলার বারান্দায় নানা-রংএর ফুলের টব সাজান, রংএ জ্বলজ্বল করছে, এই বহু-পুরাতন বাড়ীর দেওয়াল বারান্দা জুড়ে লাল নীল হলদে বেগুনী রংএর নবীন ফুলগুলি বড় সুন্দর রোমান্টিক দেখাল।

সেণ্ট-জর্জ্জ চার্চ্চ (ভিতর)

গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম, আপনারা লোহার ব্যবসা করেন বটে, কিন্তু ফুলের সখ দেখে বিশেষ মুগ্ধ হলুম। তিনি বল্লেন, ওটা আমাদের বংশের রক্তে মেশা।

চৌমাথার সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জাটিতে প্রবেশ করা গেল; বহুপুরাতন এক গির্জ্জা ভেঙে তার জায়গায় বড় ক'রে পনেরো শতাব্দীতে এই গির্জ্জাটি তৈরী, পঞ্চাশ বছর ধ'রে গির্জ্জাটি তৈরী হয়েছিল, তখনকার দিনে এরকম একটা গির্জ্জা তৈরী করা সমস্ত নগরবাসীর ধর্ম্মের সাধনা ছিল। অতি প্রাচীন গির্জ্জায় কোন কোন অংশ ও গির্জ্জাতেও যুক্ত করা আছে, সম্মুখের দ্বারটি তেরো শতাব্দীর, রোমানেস্ক স্থাপত্যের একটি সুন্দর সৃষ্টি। কিন্তু এই পুরাতন দ্বারের সঙ্গে পরবর্ত্তী সময়ের তৈরী উচ্চ টাওয়ার খাপ খায়নি, আর গির্জ্জার সঙ্গেও টাওয়ারটি লাগান আছে বটে, কিন্তু যেন অঙ্গীভূত হ'তে পারে নি, খাপছাড়া একলা অত্যুচ্চভাবে দাঁড়িয়ে আছে ব'লে মনে হয়। টাওয়ারটিকে খুব উঁচু ক'রে তৈরী করাই ছিল নগরবাসীদের ইচ্ছা, যেন অতিদূর থেকে পথিক প্রথমেই গির্জ্জার চূড়া দেখতে পায়, যেন কোন নগরবাসী
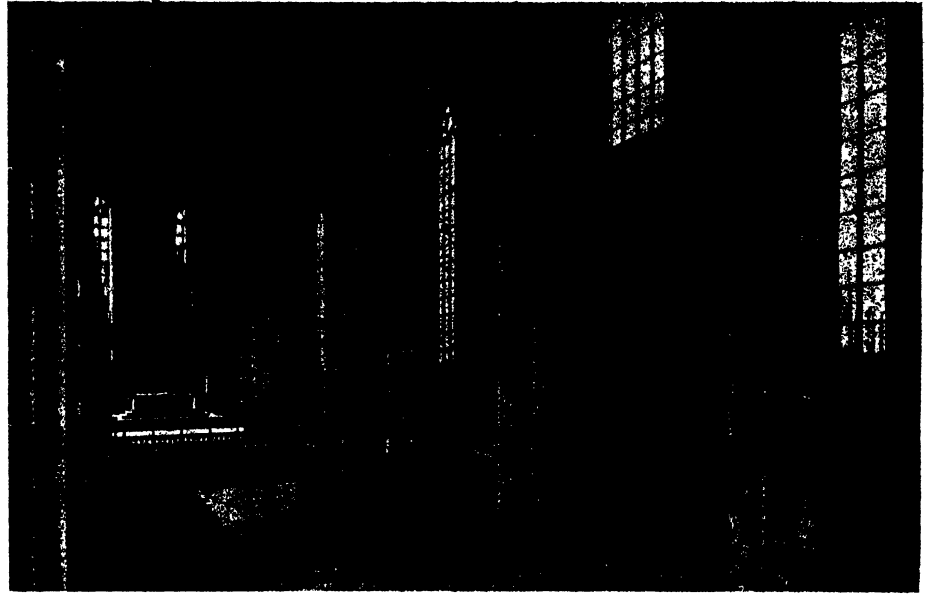
নগর ছেড়ে বিদেশে ভ্রমণে যাবার সময় বহুদূর থেকেও গির্জ্জাকে দেখতে দেখতে নগরের নিকট বিদায় নিতে পারে, যেন পথ ঘাট বাড়ী থেকে এই উচ্চ গির্জ্জার চূড়াকে নর-নারীরা বধাতার চিরজাগ্রত অভয় দৃষ্টির মত দর্শন করে। মেরীমূর্ত্তিমণ্ডিত পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি সাধারণ গথিক গির্জ্জার অন্ধকারের রহস্যময় মায়া এ গির্জ্জাতে নেই। আদিম মানবের অন্তরে অন্ধকারের প্রতি ভয় ও বিস্ময়ের যে ভাব ছিল বর্ত্তমান মানবের মনে তা কিছু বিশেষ কমে নি, সঘন স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটি কম্পিত রাঙা অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে মানবমনে কেবল রহস্য ও বিস্ময় নয়, ভীতি ও ভক্তির ভাব জাগান যায় তা যারা গথিক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেছিল তারা যেমন জানতো তেম্নি ভারতে বিশেষতঃ মাদ্রাজে বৃহৎ মন্দিরগুলি যারা গড়েছিল তারাও তেম্নি জানতো। কিন্তু সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জাটি দেখলুম আলোর ঝর্ণাধারায় ধোওয়া, ছাব্বিশটি বৃহৎ জানলা দিয়ে দীপ্ত আলোর বন্যা গির্জ্জার মধ্যে ঝ'রে পড়ছে, শালগাছের সারির মত এক এগারো জোড়া সরু থামে আলো ঝকমক করছে।

গথিকযুগের পাথরের পবিত্র জলাধার

চার্চ্চের এক কোণে একটি গথিক Taufstein বা পবিত্র জল রাখবার পাথরের বৃহৎ পাত্র বড় সুন্দর লাগল। এই পাত্রের মন্ত্রপূত জল দিয়ে সবাইকে baptise করা হয়। ধূসর রংএর এক বৃহৎ পাথর খুঁদে পাত্রটি তৈরী হয়েছে, চার কোণে চার সিংহ রক্ষিত; গোল পাথরের ওপর পাত্রটি বসান, বৃহৎ পেয়ালার মত পাত্রটির গায়ে নানা কারুকার্য্য করা।

যে যুগে এ সুন্দর আর্টের জিনিষ তৈরী হয়েছিল তখন শিল্পীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ ছিল, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না, তাই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করবার পরম অধ্যবসায় শিল্পী ধর্ম্মের প্রেরণায় লাভ করত।

গির্জ্জার কাছে Deutsches Haus বা জার্ম্মান গৃহটি বোধহয় ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর বাড়ী, জার্ম্মান রিনেসাঁ ধরণে তৈরী এই কাঠের বাড়ীটি একটু দূর থেকে দেখতে বেশ লাগে। বাড়ীটি তৈরী করার মধ্যে একটা বেশ কায়দা আছে, দোতলায় ফুলের ছোট টব সাজান জানালাগুলি ভাগ ক'রে যে শিশুকোলে মেরীর মূর্ত্তি রয়েছে তা দেওয়ালের ঠিক মাঝে বাড়ীটিকে দু'টি সমান ভাগে ভাগ ক'রে নি, তা অসমভাগে দু'ভাগ করেছে; বাড়ীর তিনটি তলা জুড়ে সুন্দর facade, ঠিক যেন একটু চতুষ্কোণ, কিন্তু এই চতুষ্কোণকে একদিকে বড় ও একদিকে ছোট ক'রে ভাগ ক'রে একতলায় প্রবেশের দ্বার, দোতলায় মেরীমূর্ত্তি ও তেতলায় পাথরে-খোদাই স্থান বিভাগের রেখার

মত উঠে গেছে ; কিন্তু বাড়ীর গেবল্ অংশে facadeর দুই বিভাগ সমান ব'লে মনে হয়। ত্রিকোণ-ছাদ ভ'রে ওপরের তিনটি তলা ভাগ ক'রে তিনটি বড় জানলার সারি গেবল-অংশের ঠিক যেন মাঝে বসান। Facade বিভিন্ন অংশে অনৈক্য রয়েছে বটে, কিন্তু সমস্তটি একটি সুন্দর ঐক্যে বাঁধা, মাপের ফিতে নিয়ে মাপ করলে একটা ছোট একটা বড় হবে কিন্তু চোখে দেখতে জিনিষটি সুন্দর। ইহাতে মধ্যযুগের স্থাপত্যের আর একটি বিশেষত্ব, তার সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি মাপের ফিতা বা অঙ্কের হিসাব নয়, তার মাপকাঠি হচ্ছে চোখ, চোখে দেখতে ভাল হ'লেই ঠিক হ'ল, প্লান বা বিভাগ ইঞ্চি ফুটেতে ঠিক সমান নাই বা হ'ল। বাড়ীর এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কি সম্বন্ধ হ'লে, বাড়ীর লম্বার সঙ্গে চওড়ার, উচ্চতার সঙ্গে প্রসারতার, জানলার মাপের সঙ্গে দেওয়ালের মাপের, থামের লম্বা ও বেড়ের সঙ্গে ঘরের প্রসারতার কি রকম সম্বন্ধ হ'লে কি যোগ থাকলে বাড়ীটি সুন্দর হয়—এই লম্বা চওড়ার ঠিক সুন্দর ঐক্য যে বাহির করতে পারে সেই হচ্ছে সত্যিকার শিল্পী। তা বাহির করতে অঙ্কের হিসাব নয়, সৌন্দর্য্যবোধ, অন্তরের প্রেরণার দরকার, কারণ সৌন্দর্য্যের বিচারক মাপের ফিতা নয়, আর্ট-রসিকের চোখ।

ভোরনিত্স্-দ্বার—সম্মুখে ফোয়ারা

চার্চ্চের পেছন গালি দিয়ে বাহির হ'য়ে একটি স্কোয়ারে এলুম, তার মাঝে একটি মনোহর রিনেসাঁ ফোয়ারা, একটি মোটা থামের মাথায় এক সিংহমূর্ত্তি, ফোয়ারার চারিদিকে ফুল দিয়ে সাজান, যেন পুষ্পশোভিত বেদিকা, ফোয়ারাটির চারিদিকে থিয়েটারের দৃশ্যপটের মত লাল ছাদ সবুজ নীল জানালা, হলদে-সাদা বাড়ীগুলি ঝুঁকে পড়েছে, তাদের ফাঁকে ভোরনিত্স্-দ্বারের বুরুজটি দেখা যাচ্ছে।

পুরাতন রাট-হাউস ঘুরে নর্ডলিং-রাস্তা দিয়ে চল্লুম ; এ রাস্তাটি ডিঙ্কেল্স্‌বুলের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর রাস্তা। নানা ভঙ্গীর গেবল্-মণ্ডিত বিচিত্র রংএর বাড়ীর সারি সজ্জিত এই পথটি দেখলে 'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ, বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক' অনুভব করা যায়, কারণ এ পথে প্রতিপদেই নব নব সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হয়, এর বাঁকে বাঁকে নব নব রূপ মন ভোলায়। লণ্ডনের শহরতলির কোন রাস্তা থেকে এ পথটি কত পৃথক, কত সুন্দর। লণ্ডনের একটানা সোজা রাস্তার দিকে চেয়ে চোখ শ্রান্ত হয়, তার দুধারে একই রকমের বাড়ীর সারির দিকে দেখলে মন ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে, প্রত্যেক বাড়ীটি পাশের বাড়ীর মত গড়া, সমতা আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই, এ যেন কোন কারাগারের সুদীর্ঘ করিডর ; কিন্তু ডিঙ্কেল্স্‌বুলের এ পথটি পঞ্চমীর

চাঁদের মত বেঁকে গেছে, তার দু'পাশের প্রত্যেক বাড়ীর বিশেষরূপ বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে অথচ সমস্ত বাড়ীগুলি একটা মূলগত ঐক্যে বাঁধা, একটি বাড়ী পাশের বাড়ীর নিখুঁত অনুকরণ নয় অথচ তাদের মধ্যে বিরোধ নেই, এ পথটি যেন রূপ ও রেখার বিভিন্ন সুরের একটা সিম্‌ফোনি। বাড়ীগুলি এক লাইনে বসান নয়, পথটি বাঁকা ব'লে সামনের বাড়ীর চেয়ে পেছনের বাড়ীটি এগিয়ে এসেছে, তার পাশের বাড়ীটি আরও এগিয়ে এসেছে, অথচ তারা সমান্তরালভাবে বসানো নয়, যেন ইচ্ছা ক'রে মাপ ক'রে তৈরী হয় নি, আপন খুসিতে গ'ড়ে উঠেছে, অথচ রেখার ছন্দ ভঙ্গ হয় নি, বাঁকা পথের তলার রেখার সঙ্গে তাল রেখে ত্রিকোণ ছাদের পর ছাদ দিয়ে সে রেখা নানাভঙ্গীতে গড়িয়ে বেঁকে দূরে নীলাকাশের মেখলার সঙ্গে মিশে গেছে, সে রেখাটি চোখকে রংএর তরঙ্গের দোলায় নাচাতে নাচাতে নিয়ে গিয়ে অনন্ত আকাশে মুক্তি দেয়। বাড়ীগুলি পাশাপাশি বসান নয় ব'লে শুধু তাদের সামনের দিক নয় পাশের দিকও দেখা যাচ্ছে, পথে দাঁড়ালে প্রথম বাড়ীটির সম্পূর্ণরূপ দেখা যায়, তারপরের বাড়ীটির সামনে ও পাশের কোণ, তার পরের বাড়ীটির সামনে ও পাশের অংশ এম্নি দু'দিক দেখতে পাওয়াতে বাড়ীগুলির স্থূলত্ববোধ বৃদ্ধি পায়, তার পরিপূর্ণ রূপের আইডিয়া হয়।

নর্ডলিং-রাস্তা

নর্ডলিং রাস্তা পার হ'য়ে নগরের দেওয়াল ধ'রে নগর প্রদক্ষিণ করতে বাহির হওয়া গেল,—পথের বাঁকে বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য। কোন বাড়ীর গায়ে লেখা দেখলুম—

Wir banen nicht so feste
Wir sind ja hier nur Gäste.

"আমরা এখানে সুদৃঢ় ক'রে কিছু গড়ি নি, আমরা ত এখানে অতিথি মাত্র।" এ বাড়ী যারা গড়েছিল তারা কত শতাব্দী আগে চ'লে গেছে, শুধু তাদের সুন্দর সৃষ্টিটি বেঁচে আছে। এম্নি অনেক প্রবাদ বচন, নীতিকথা পুরানো বাড়ীর দরজার দেওয়ালে লেখা। একটি বুরুজের কাছে পাথরে খোদাই লেখা পড়লুম, "আমার জন্মভূমি এ নগরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, আমার যৌবনের বন্ধুগণ, তোমরা সব কোথায়? শুধু প্রতিধ্বনি উত্তর দিল, হায়, তোমরা আজ কোথায়?" লেখাগুলি প'ড়ে মনে হল, যারা এ সুন্দর সহর গড়েছিল, তারা আজ কোথায়, তারা কি কোন দিন ভেবেছিল, তারা চ'লে যাবে, কত শতাব্দী পরে বাংলা থেকে কোন পথিক এসে তাদের সৃষ্টিকে সম্ভোগ, প্রশংসা করবে।

প্রতিবৎসর ওরা জুলাই ডিঙ্কেল্‌স্‌ব্যুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমস্ত সহর জুড়ে এক উৎসব-নাট্য অভিনীত হয়,

উৎসবটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বার্ষিক। জার্ম্মানীতে ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধের সময় সুইডেন-নৃপতি গুষ্টভ্ অ্যাডল্ফসের এক সেনাপতি ডিঙ্কেল্স্বুল আক্রমণ করে, নগর অবরোধ ক'রে বসে; প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রে নগরবাসীরা অবশেষে নগররক্ষার কোন আশা না দেখে আত্মসমর্পণ করল বটে, কিন্তু বিজয়ী সেনাপতি নগরে প্রবেশ ক'রে কি হুকুম দেবে, হয়ত নগর আগুনে জ্বালিয়ে দিতে বলবে, হয়ত লুটতরাজ সুরু হবে, হয়ত সব প্রধান নগরবাসীর মুণ্ডু কাটা যাবে—এই সব ভেবে মৃতবৎ হ'য়ে গেল। সেই সময়ে লোর ব'লে একটি বুদ্ধিমতী বালিকা নগরের সব ছেলেমেয়েদের জড় ক'রে সহরের মেয়র শাসন-কাউনসিলকে বল্লে, নগররক্ষা করবার সে এক উপায় ভেবেছে; যখন বিজয়ী সেনাপতি নগরে প্রবেশ করবেন, এই ছেলেমেয়ের দল তাঁর ঘোড়ার সামনে গিয়ে তারা তাদের বাপমা'র প্রাণ ভিক্ষা করবে, সেনাপতির নিজেরও ত ছেলেমেয়ে আছে, তিনি ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। সবাই বল্লে, আচ্ছা চেষ্টা ক'রে দেখো, সেনাপতির যা কঠিন হৃদয়, ছেলেদের কথায় তার কোন পরিবর্ত্তন হবে কি? লোর বল্লে, আচ্ছা আমরা চেষ্টা ক'রে দেখি। তারপর বিজয়ী সেনাপতি যখন নগরে প্রবেশ করবেন, লোরও তার ছেলেমেয়ের দল তাঁর ঘোড়া আটক ক'রে দাঁড়িয়ে বল্লে, এ নিষ্পাপ ছেলেমেয়েদের দল বিজয়ী সেনাপতির কাছে তাদের স্নেহময় বাপ মাদের প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছে। সেনাপতি প্রথমে একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেন, তারপর এই কচি মুখগুলি দেখে তাঁর সুদূর গৃহের ছেলে-মেয়েগুলির কথা মনে হ'ল, তাঁর পাষাণ-হৃদয় স্নেহে করুণায় গ'লে গেল, তিনি ছেলের দল থেকে একটি ছোট ছেলেকে তাঁর কোলে ঘোড়ার ওপর তুলে নিলেন, তারপর হেসে লোরকে বল্লেন, "তুমি ত একগাদা ছেলেমেয়ে জড় করছ দেখছি, আচ্ছা, তোমাদের কথাই রইল, তোমাদের জন্যে আমি এ নগরকে সকল লুটতরাজ দুঃখ থেকে বাঁচালুম, মেয়র, শোন, এই ছেলেমেয়েরাই ডিঙ্কেল্স্বুল আজ রক্ষা করল, আমার কাছে নয় তাদের কাছে ডিঙ্কেল্স্বুল-রক্ষার কৃতজ্ঞতা তোমরা জানাও।" বস্তুতঃ যেখানে কামান বন্দুক হার মেনেছিল সেখানে ছেলেমেয়েদের ফোটাফুলের মত সুন্দর মুখগুলি জয় করল। সমস্ত সহরটিকে নাট্যমঞ্চ ক'রে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রতি বৎসর সত্যিকার মত অভিনীত হয়, তা দেখতে শুধু জার্ম্মানীর নানা স্থান হ'তে নয়, নানা দূরদেশ হ'তে ভ্রমণকারীর দল আসে।

বালিকা লোর সহরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে
নগর-কাউন্সিলের সামনে হাজির হ'ল

দুপুর কাটিয়ে হোটেলে পৌঁছে রেস্তোরাঁয় খেতে গেলুম, দেখি জার্ম্মান ভ্রমণকারী ও ভ্রমণকারিণীর এক বৃহৎ দল রেস্তোরাঁতে যাচ্ছে, আমেরিকান টুরিষ্ট দল বোধ হয় দুপুরের ট্রেণেতেই আর একটি সহর দেখতে ছুটেছে। এ দল

এক বৃহৎ মোটর বাসে এসেছে, সকলে বিয়ার পান করছে ও আমাদের হোটেল-কর্ত্তা এক তারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এক হাসির জার্ম্মান গান গেয়ে আসর জমিয়েছেন। গান গাইতে গাইতে তিনি দুলে দুলে নৃত্যও সুরু করলেন। ঘরের এক কোণে খেতে বসা গেল। দলের মধ্যে যুবক যুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া সকল বয়সের নরনারী, কোন টুরিষ্ট-কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে দু'খানা মোটর-বাসে জার্ম্মাণী ভ্রমণে বাহির হয়েছে। আমাদের হোটেল-কর্ত্তাটি কিছুক্ষণ নেচে গেয়ে সবার মনোরঞ্জন ক'রে কিছু শ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন, তিনি গান থামিয়ে গ্রামোফন দেবার জন্যে প্রাণ ভরপুর, তবু তাঁর আনন্দনৃত্য ঠিক স্বাভাবিক লাগল না, যেন তাতে করুণতা মেশান, তাঁর এ বাজনা বাজানো, নাচগান করা কেবল মাত্র তাঁর অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য মনে হ'ল না, যেন একটা নিগূঢ় ব্যথাকে হাসির উচ্ছ্বাসে ভোলার চেষ্টা আছে। তার পরিচয় পরে পেলুম। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে টুরিষ্টদল যখন রেস্তোরাঁ-হল খালি ক'রে চ'লে গেল, হোটেল-কর্ত্তা আমাদের টেবিলে এসে বসলেন, তাঁর খাবার আনতে ব'লে আমাদের সঙ্গে গল্প সুরু করলেন। প্রথমেই পকেট থেকে তাঁর

বিজয়ী সেনাপতি নগর প্রবেশের পথে ছেলেমেয়ে দলে আটকে প'ড়ে একটি ছোট ছেলেকে কোলে তুলে নিচ্চেন

বাজানো সুরু করলেন, তারপর আমাদের কাছে একটু ব'সে গল্প ক'রে আবার গ্রামোফনের গানের সঙ্গে গান গেয়ে তার তালে তালে দুলে দুলে বাউলের মত নাচতে সুরু করলেন। গ্রামোফনের গানটি একটি পুরাতন জার্ম্মান গান, সবার জানা, সুতরাং ভ্রমণকারীদলের অনেকেই কোরসে তার সঙ্গে গাইতে সুরু করলে, খাবার আসর সরগরম হ'য়ে উঠল। হোটেল-কর্ত্তাটি মধ্যবয়সী, মাথায় একটু টাক পড়েছে, চুলও দু'চার গাছা পেকেছে, কিন্তু তাঁর অতিথিদের আনন্দ মনিব্যাগ বের ক'রে তা থেকে একটি মেয়ের ফটো আমাদের দেখালেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, দেখুন, এ আমার মেয়ের ফটো, বহুদিন তার কোন খোঁজ খবর পাইনি, আপনারা লণ্ডনে থাকেন, আপনারা বোধ হয় আমাকে তার খবর কিছু দিতে পারেন। তারপর নিজ জীবনের কথা আরম্ভ করলেন,—যুদ্ধের আগে তিনি লণ্ডনে কাজ করতেন, এক ইংরাজ মেয়েকে বিবাহ ক'রে সেখানে ঘর সংসার পেতেছিলেন, তারপর মহাযুদ্ধ এল, জার্ম্মান ব'লে তাঁকে আইল অফ্

ম্যানেতে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল, তাঁর স্ত্রী কোর্টে ডিভোর্স চেয়ে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে দিলে, তাঁর মেয়ে হাতছাড়া হ'য়ে গেল, এখন সে ইংলণ্ডে কোন স্কুলে পড়ে, ইংলণ্ডে তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন তারা দয়া ক'রে মাঝে মাঝে সে মেয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে তার খবর দেয়। এখন এখানে ভুলতে পারেন না। জাতির সহিত জাতিবিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের ফলে কত সংসার ছারখার হয়েছে, পিতৃ-অন্তরের এ বেদনার পরিচয়ে বড় দুঃখিত হলুম।

সন্ধেবেলায় যখন ডিস্কেলস্‌বুল ছেড়ে চল্লুম সহরটি আর এক রূপে প্রকাশিত হ'ল। আলোছায়ার একটা মায়া

বালিকা লোর ছেলেমেয়েদের জড় করছে

হোটেল চালিয়ে তাঁর কোন রকম চলে, আবার একটি জার্ম্মান বিবাহ ক'রে নতুন ঘর সংসার পেতেছেন। কিন্তু বুঝলুম এ ঘরে সে পুরাতন প্রথম সংসারের শান্তি ও আনন্দ অনুভব করছেন না; প্রথম বিবাহের মেয়েটিকে তিনি আছে, কোথাও ত্রিকোণ বাড়ীর মূর্ত্তি স্পষ্ট কোথাও তা রঙীন একটা দেওয়ালের মত, কোন কোণে অন্ধকার জমাট হয়েছে, কোন কোণে তা রহস্যময়; আকাশে আলো ঝলমল করছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু
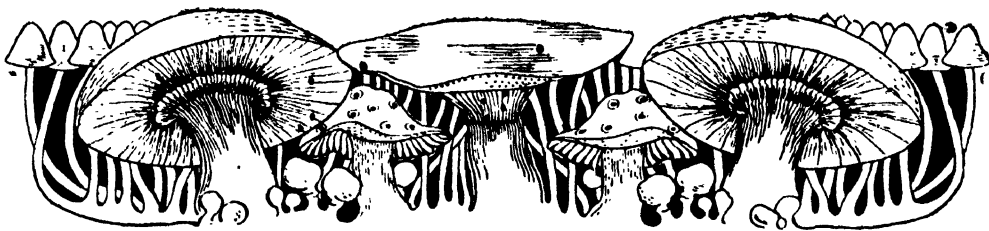
বর্ষার গান

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আজি আষাঢ়ের আর্দ্র উতল
নিশীথে, ওরে ও প্রাণ,
ভিন্ সুরে তোরে গাহিতে যে হবে
নয়া বরিষার গান।
তাই ত রে তোর সাধা বীণ্‌টার
ছিঁড়ে' গেল বাঁধা পুরাতন তার,
নও তারে আর নও সুরে, ভাই,
ফিরে' বাঁধ্ বীণাখান ;
ভিন্ সুরে তোরে গাহিতে যে হবে
আজি বরিষার গান !

মেঘ-মাদলের তালে তালে, আর
বাদলের ঝর-ঝরে,
ঝরা ফুল আর ছেঁড়া বৃন্তের
ব্যথা গেঁথে' নিবি স্বরে।
কণ্ঠ কাঁপিছে—সজল শাখীর
শাখা-শায়ী কোন্ বিরহী পাখীর ;
কেঁপে'-বওয়া হাওয়া বনে-প্রান্তরে
ব্যাপিছে কী 'হা-হা'-তান ;
সেই সুরে মিলে' গেতে হবে তোরে—
ওরে নিদ-হারা প্রাণ !

দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে বীণা—ঐ
রিম্ ঝিম্ ঝরে বারি,
কাঁপে হাওয়া হা-হা, ডাকে মেঘ, আর
ঝরে ফুল সারি সারি।
খুলিয়া খুলিয়া দুয়ার-আগল
বাহিরিল যত হিয়ার পাগল,
মনে আর বনে সবখানে সম
শিখী করে 'কেকা'-গান ;
কেতকী-গন্ধে দিশি যায় ভরে'—
নিশি তায় করে পান !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

হারান সুর

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম এ, বার-য়্যাট-ল

চরিত্র পরিচয়

তুষার } দুই বোন
নীহার }

ঠাকুমা

প্রকৃতি পরিচয়

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দৃশ্য পরিচয়

বাগান-ঘেরা সুন্দর একটি দ্বিতল অট্টালিকার উপরের তলার একটি সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষটির এককোণে একটি পিয়ানো এবং মধ্যখানে সাজান কতকগুলো কৌচ এবং চেয়ার। ঘরে অনেকগুলি ছোট বড় ছবি টাঙান, কিন্তু কক্ষে ঢুকিবামাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেয়ালে টাঙান একটি তৈল চিত্র—একখানি প্রতিমূর্ত্তি।

ঘরের একদিকে দুইটা বড় বড় দরজা এবং বাকী তিনদিকেই জানালা খোলা রহিয়াছে।

ঘরের একটি কৌচে বসিয়া তুষার কাঁটায় পশম বুনিতেছিল। নীহার ঘরে প্রবেশ করিল।

তুষার

কৈ—ঠাকুমা এলেন না?

নীহার

এখুনিই আসবেন—বল্লেন, আহ্নিক সেরেই আস্‌ছি।

তুষার

ঠাকুমার আবার আহ্নিক।—আমি হ'লে টেনে নিয়ে আস্‌তাম।

(নীহার পিয়ানোর নিকট বসিয়া, পিয়ানোতে একটি সুর বাজাইতে লাগিল)

তুষার

শুধু বাজাচ্ছিস্ কেন নীহার—একটা গান গা না।

নীহার

কি গান গাইব?

(এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল)

তুষার

ঐ ঠাকুমা এসেছেন।

(ঠাকুমা ঘরে প্রবেশ করিলেন)

তুষার

বলেছি ত ঠাকুমার আবার আহ্নিক! এরই মধ্যে আহ্নিক হ'য়ে গেল?

ঠাকুমা

তোরা ডাক দিয়েছিস্—আর কি মন ভগবানের দিকে যায় রে? তাই চ'লে এলাম।

(সুর করিয়া) তুমি ডাক দিয়েছ
আর কি পরাণ বাধা মানে।

গা না নীহার।

(ঠাকুমা একটি কৌচে বসিল; নীহার পিয়ানো বাজাইয়া গাহিল)

তুমি ডাক দিয়েছ
আর কি পরাণ বাধা মানে,
ছুটল ঐ জোয়ার-স্রোতে তোমার পানে।
তোমার ডাকে সকাল বেলার সুর অলস ভৈরবী,
তোমার ডাকে সন্ধ্যাবেলার উদাস পূরবী,
বাজল আজ বাজল সবি আমার প্রাণে।
অনেক দিনের আশা আমার অনেক সাধনা
তোমার ডাকে ফেলে যাব সকল ভাবনা।
আমার প্রাণে তোমার মোহন রূপ—হে চির নবীন,
রঙিন তুলির পরশ লাগায় সারা রাত্রি দিন;
আজকে তুমি ডাক দিলে যে—তোমার গানে।

তুষার

আচ্ছা ঠাকুমা! নীহার এ গানটা বেশ গায়, না?

ঠাকুমা

হ্যাঁ।

তুষার

তোমার ও ভাল লাগে ঠাকুমা? তুমি ত স্বয়ং কবির মুখে কতবার এ গানটা শুনেছ।

ঠাকুমা

কতবার।

তুষার

তিনি খুব ভাল গাইতেন, না?

ঠাকুমা

ভাল? ভাল বল্লে যে ঠিক বলা হ'ল না তুষার। তোরা শুন্‌লি না। গানের মধ্যে ও রকম ক'রে সমস্ত প্রাণটা ঢেলে দিতে আমি আর কারও শুনিনি। কি প্রাণের খেলা ছিল তাঁর গানে তুষার, সে তোদের ব'লে বোঝাতে পারব না।

নীহার

আচ্ছা ঠাকুমা। তোমায় তিনি গান শেখাননি কেন?

তুষার

সত্যি ঠাকুমা। অত বড় কবি ছিলেন দাদাবাবু—অত ভাল গান গাইতেন—আর তোমায় গান শেখাননি? আমি হ'লে কত গান শিখে নিতাম তাঁর কাছ থেকে।

ঠাকুমা

তোরা পাগল! দেখিসনি ত তাঁকে, তাই ওকথা বলছিস্। শুনিসনি ত কখনও তাঁর গান। তাঁর কাছে গান শিখ্‌ব কি রে! তাঁর গান শুনলে আর কি গলা দিয়ে গান বেরোয় রে—বিশেষতঃ তাঁরই কাছে। (সুর করিয়া)

আমার সারা প্রাণ
এ কী দীনতায় দিলে—ভরিয়ে দিলে
ওগো নিঠুর ওগো পাষাণ।

গা না নীহার।

(নীহার গাহিল)

আমার সারা প্রাণ
এ কী দীনতায় দিলে—ভরিয়ে দিলে
ওগো নিঠুর! ওগো পাষাণ!

ঘুম ভাঙেনি অলস ভোরে
তুমি এলে দিগ্বিজয়ী—আলো ক'রে
চোখ চেয়েই চোখের চাওয়া হ'ল অবসান।
আমার সারা প্রাণ।
কেন এলে অমন রূপে সেদিন সকালে
রক্ত-তিলক পরিয়ে দিলে আমার কপালে;
জয়ী! আমায় করলে বরণ,
তোমার জয়ে আমায় শুধু দিলে মরণ,
চরণতলে সব দিয়েছি—একি অপমান!
আমার সারা প্রাণ।

ঠাকুমা

নীহার! নীহার! শোন্ একদিনের একটা গল্প বলি। এক শরৎকালের জোৎস্না রাত্রি। আমি একলা বাগানে বসেছিলাম—একটা অস্পষ্ট জোৎস্না-আলোকের মধ্যে। সে আজ অনেক দিনের কথা।

নীহার

একলা!

ঠাকুমা

হ্যাঁ একলাই বসেছিলাম। তোর দাদাবাবু বাড়ীতে ছিলেন না।

তুষার

এ তাঁর বড় অন্যায়। অমন শরৎকালের জোৎস্না রাত্রি,—আর তুমি বসেছিলে একলা—বাগানে?

ঠাকুমা

(হাসিয়া) তোদের মত দরদী ত তখন আমার কেউ ছিল না রে। কাজেই বেশীর ভাগ সময়টা আমার একলাই কাটাতে হ'ত।

তুষার

সে কি কথা ঠাকুমা! অত বড় বিশ্ব-দরদী কবি ছিলেন তোমার ঘরের মানুষ—আর তোমার দরদী ছিল না।

ঠাকুমা

আরে, বিশ্ব-দরদীর দরদ যে ছিল সারা বিশ্বময়। আমার এই এতটুকু প্রাণে যে দরদের কণাটুকুও যে সব সময় এসে পৌঁছাত না তুষার।

তুষার

তাই বুঝি শরৎপূর্ণিমায় একলা ব'সে বিশ্বদুবদীর করুণাকণা পাওয়ার তপস্যা কর্চ্ছিলে?

ঠাকুমা

আজ এই পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে তোদের কাছে মিছে কথা বলব না তুষার। প্রাণে আশা নিয়েই বসেছিলাম যদি আসেন।

তুষার

তা তপস্যায় সিদ্ধি হয়েছিল?

ঠাকুমা

হ্যাঁ আশাতীত ফল পেয়েছিলাম সেদিন। সমস্ত কথাগুলি পর্য্যন্ত আজ আমার স্পষ্ট মনে আছে—আমার জীবনের এমন একটা অনন্ত মুহূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল সেই শরৎকালের জ্যোৎস্না রাত্রি।

নীহার

তার পর শুনি।

ঠাকুমা

তিনি এলেন—কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠ্‌লাম—এত বিষণ্ণ মুখ।

নীহার

ওঁর চোখের চাহনিটা স্বভাবতঃই বোধ হয় অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল। ফোটোতে দেখ না কি রকম একজোড়া করুণ উদাস চোখ।

ঠাকুমা

তা ছিল বটে। অদ্ভুত দুটো চোখ ছিল। যেন জগতের কোনও জিনিষই দেখছেন না, অথচ সমস্ত জিনিষই যেন ওঁর চোখের মধ্যে ভেসে উঠ্‌ছে।

তুষার

তারপর গল্পটা শুনি।

ঠাকুমা

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন, "জয়ন্তি! আজ তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।—আজ তুমি এমন বিশেষ ক'রে সেজেছ কেন?"

তুষার

তারপর! তারপর! এ যে উপন্যাসের একটি প্রেম-চিত্র হ'য়ে উঠ্‌ছে ঠাকুমা।

ঠাকুমা

আরে, আমার জীবনটা উপন্যাসের নায়িকায় চেয়ে কম কিসে? আমার জীবনের সুখ দুঃখ অনুভূতি কোনও উপন্যাসের নায়িকার চাইতে কম নয়।

নীহার

তারপর শুনি।

ঠাকুমা

আমি বল্লাম, "আজ চোখ তুলে আমার পানে চাইলে তাই ভাল লাগল।—আজ যে তোমার চোখের রূপ ছড়িয়ে পড়েছে আমার সারা অঙ্গে।"

তুষার

বাঃ বাঃ ঠাকুমা! তুমি শুদ্ধ এত বড় কবি, এতদিন ত প্রকাশ হয়নি।

ঠাকুমা

অত বড় কবি ছিলেন আমায় ঘরের মানুষ। তাঁর হাওয়া কি এতটুকুও প্রাণে লাগেনি—এত অপদার্থ আমি?

তুষার

তারপর! তারপর!

ঠাকুমা

আমার পাশে বসলেন। তারপর বল্লেন, "জয়ন্তি একটা বড় দুঃসংবাদ আছে। এক গণক আমার হাত দেখে বলেছে আমি আর এক বৎসরের বেশী বাঁচব না।" শুনে হঠাৎ আমি শিউরে উঠলাম। বুক আমার কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু মুখে বল্লাম, "ওসব গণক টনকের কথা আমি মানি না। তুমি ওসব বিশ্বাস কর কেন?" বল্লেন, "হতেও ত পারে মানুষের একদণ্ডের বিশ্বাস নেই।" তারপর হঠাৎ হেসে বল্লেন, "জয়ন্তি! তুমি কি আমাকে তোমার গান শোনাবে না জীবনে? লোকের মুখে শুনি তুমি এত ভাল গান গাও।" শুনে আমার চোখে জল এল তুষার। আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

উভয়ে

কেন ?

ঠাকুমা

কখনও কি আমায় বলেছিলেন গান গাইতে। ছেলে-বেলায় বাবা আমায় যত্ন ক'রে গান শিখিয়েছিলেন। বিয়ের পরে বাড়ীর আর সবাই গান গাইতে বলত—প্রথম প্রথম গেয়েছিও। কিন্তু উনি একদিনও আমায় গান গাইতে বলেন নি। প্রথম প্রথম দুঃখ হ'ত, তারপর অভিমান হ'ল, গান গাওয়া ছেড়ে দিলাম। পরে সব ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন, সেদিন হঠাৎ অমন ক'রে নিষ্ঠুরের মত কেন আঘাত দিয়েছিলেন—আজও বুঝতে পারলাম না।

তুষার

তা তুমি কি বল্লে ?

ঠাকুমা

কত কথা যে বলতে ইচ্ছে হ'ল—সে আর তোদের কি বলব। কিন্তু কিছু বলিনি। শুধু বল্লাম, "বেশ, তুমি একখানা নতুন গান লেখ, আমি গাইব। তোমার পুরানো গান আমি গাইব না।" তাই ওই গানখানা লিখলেন। (সুর করিয়া)

ওগো নিষ্ঠুর ! ওগো পাষাণ !

তুষার

গণকের কথা কি সত্যি হয়েছিল ? এ ব্যাপার কি ওঁর মারা যাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই ঠাকুমা ?

ঠাকুমা

না না। তারপরে কতদিন বেঁচে ছিলেন। এ ঘটনা হয়েছিল তখন আমার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। আর তিনি চ'লে গেলেন তখন আমার বয়স আটত্রিশ বৎসর। উঃ—সে আজ কতদিনের কথা।

নীহার

তারপর গেয়ে শুনিয়েছিলে ?

ঠাকুমা

হাঁ। কিন্তু গান গানই হ'ল না। কোনও রকমে গেয়ে শেষ ক'রে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু আড়ালে এই গানখানা বেশ গাইতাম আমি। তিনি কিন্তু কখনও এ গানখানা আমার কাছে গান নি, জীবনে কখনও নয়।

তুষার

তুমি গাইতে বলনি ?

ঠাকুমা

না।

নীহার

(সুর করিয়া)

কেন এলে অমন রূপে সেদিন সকালে
রক্ত-তিলক পরিয়ে দিলে আমার কপালে।

আচ্ছা ঠাকুমা ! ওঁর জীবনটা কি খুব দুঃখের ছিল ? ওঁর সমস্ত গানগুলোর মধ্যে এমন করুণ সুর কেন ?

তুষার

হাঁ ঠাকুমা, ওঁর জীবনটা কি রকম ছিল ?

ঠাকুমা

তোদের কি মনে হয় ?

তুষার

কি জানি কেমন ক'রে বলব। গানের সুরগুলো ত বড় করুণ।

নীহার

চোখ দুটোও বড্ড করুণ।

ঠাকুমা

আচ্ছা ! তোরা বল্ আগে—ঐ ছবিখানার চোখদুটোর দিকে চেয়ে আন্দাজে বল্—ওঁর জীবনটা কি রকম ছিল ; তারপর আমি বলব।

তুষার

আচ্ছা ! আমি আগে বল্‌ছি। কোথায় যেন কিসের অভাব ছিল ওঁর প্রাণে। ঠাকুমা ! সে অভাব তুমিও পুরণ করতে পারনি। তাই ওঁর চোখদুটো অমন করুণ।

ঠাকুমা

তুষার ! তুইও কবি হ'য়ে উঠ্‌লি। আচ্ছা নীহার !

নীহার

(ফটোখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া)

কি জানি ঠাকুমা! আমি কিছু বলতে পারব না। তুমি বল।

তুষার

হ্যাঁ ঠাকুমা, তুমিই বল।

ঠাকুমা

আচ্ছা বল্‌ছি শোন্‌। উনি ছিলেন একটা প্রতিমূর্ত্তি নিষ্ঠুরতার।—প্রাণটা ছিল একখানা পাষাণ। সেই প্রাণের উপর নানান রংয়ের তুলিতে রং মাখিয়ে রঙিন হ'য়ে উঠ্‌তেন বটে, কিন্তু সে রূপ ওঁর অন্তরের রূপ নয়—বাইরের মাখান রূপ মাত্র। অন্তর ছিল কঠিন—বড় কঠিন।

তুষার

কি বল্‌ছ ঠাকুমা! ঠাট্টা করছ?

ঠাকুমা

না—না শোন্‌ না। কাজেই সে প্রাণ গলল না কোনও দিন। সে প্রাণের রঙে চারিদিক সময় সময় আলো হ'য়ে উঠ্‌ত বটে—সময় সময় চোখ ঝলসে যেত; কিন্তু শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ছাপিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে তাঁর সমস্ত জগৎটাকে তলিয়ে কখনও দেয়নি—সে প্রাণ। ঐ যে গান এ সমস্ত সেই রংয়ের আলো। সুরে এই যে করুণতা—এটা সেই আলোকে সন্ধ্যার একটু ধূসর রং মাখিয়ে দেওয়া মাত্র, আর কিছুই নয়। একদিন সকাল বেলায় তিনি আমায় বল্লেন, "জয়ন্তি, প্রাণটা ক্রমেই যেন একটা বোঝা ব'লে মনে হচ্ছে, বইতে বড় কষ্ট হয়।"

আমি কিছু বলিনি। কিন্তু ইচ্ছে হয়েছিল বলবার—প্রাণটা যে পাষাণ।—ও যে গলবে না। বুকের মধ্যে পাষাণ ব'য়ে নিয়ে বেড়ালে বোঝা ব'লে মনে হবেই ত।

(সুর করিয়া)

আমার প্রাণখানা আর বইতে পারি না

তুষার

ঠাকুমা! তোমার কবিত্ব দাদাবাবুর চেয়ে কম নয়। গা—না নীহার।

(নীহার গাহিল)

আমার প্রাণখানি আর বইতে পারি না
(আমার) প্রাণের বোঝা বাড়ল ক্রমে - ফেলতে জানি না!
(তোমার) শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিধারায়
বোঝা যদি যায় ভেসে যায়
(আমি) সেই আশাতে পরাণ পেতে থাকি
(তোমার) ঐ আকাশ তলায়,
আমি তাতেও ডরিনা।
ঝড়ে যদি দোলা লাগাও—সেই আশায় থাকি
(আমার) প্রাণের পরে দাও উড়িয়ে—কালবৈশাখী॥
(তোমার) প্রাণের বোঝা তুলে নিয়ে
যা হয় তুমি যেও দিয়ে
না হয় কিছু নাই বা দিলে মোরে—
তোমার ঐ যাবার বেলায়,
আমি কিছুই চাহি না।
আমার প্রাণখানি আর বইতে পারি না॥

তুষার

ঠাকুমা! ঠাকুমা। ও সব কবিত্ব রাখ দেখি। জানি কবির স্ত্রী ছিলে, খুব কবিত্ব করতে শিখেছ। এখন সোজা কথায় বল না ওঁর জীবনটা কিরকম ছিল। বড্ড শুন্‌তে ইচ্ছে করে।

ঠাকুমা

আরে, ওঁর জীবনটা কি সোজা ছিল যে সোজা কথায় বলা যায়। কবির জীবন বল্‌তে গেলে একটু কবিত্ব করতেই ত হয়।

তুষার

সত্যি ঠাকুমা! বলো না।

ঠাকুমা

কি বলব! কি তোরা শুন্‌তে চাস্‌?

তুষার

বলো না ওঁর জীবনটা ঠিক কি রকম ছিল।

নীহার

যখন তুমি দাদাবাবুর কথা গল্প কর, আমার শুন্‌তে বড় ভাল লাগে তোমার রূপকথার চাইতেও বেশী।

ঠাকুমা

তাই ত রোজ সন্ধ্যাবেলা তোদের নিয়ে ব'সে ওঁর কথা এত বলি।

তুষার

কিন্তু তবুও ত শুনে তৃপ্তি হয় না ঠাকুমা! আরও শুনতে ইচ্ছে করে।

ঠাকুমা

কি তোরা শুনতে চাস্—তোদের ত সবই বলেছি।

তুষার

তবুও যেন ওঁর জীবনের কথাটি আমরা এখনও পাই নি। আজ সেইটি বল।

ঠাকুমা

সে কথাটি ত আমি আজও জানি না তুষার! তবে জানি আমি ওঁকে সুখী করতে পারি নি জীবনে।

তুষার

কেন ঠাকুমা—কেন ওকথা বলছ?

ঠাকুমা

আমি ওঁকে চিনতে পারিনি তুষার। আজ এই প্রায় কুড়ি বৎসর ওঁকে হারিয়েছি, যতদিন যাচ্ছে তত আমার খালি মনে হচ্ছে কি ভুলই বুঝতাম ওঁকে। কত ছোট ছোট কথা—কত ছোট ছোট জীবনের ঘটনা এখন মনে পড়ে আর ভাবি—কি অবিচার না ওঁকে করেছি। সবই ত তিনি বুঝতেন, কিন্তু বলতেন না কিছু। দুঃখ পেয়েছেন তুষার, আমার কাছ থেকে খালি দুঃখই পেয়েছেন।

তুষার

ঠাকুমা! তুমি নিজের প্রতি অবিচার করছ। এক-সঙ্গে থাকতে গেলে জীবনে ভুল বোঝাবুঝি আছেই। তা নিয়ে এখন দুঃখ করো না।

ঠাকুমা

আজ একবার—একটিবার ওঁর দেখা পেতাম—জিজ্ঞেস করতাম, এখনও কি আমায় ক্ষমা করেন নি। আজ ত আমি সত্য কথাটি পেয়েছি—আজ ত আমার মন একেবারে নির্ম্মল—তবুও কি আমায় ক্ষমা করেন নি?

তুষার

ঠাকুমা! তিনি মনে মনে তোমায় তখনই ক্ষমা করেছিলেন।

ঠাকুমা

না—না না তুষার। করেন নি। তাইত বলি প্রাণখানা ছিল একখানা পাষাণ। কতটুকু আমি, কত ছোট আমি, কত বড় ছিলেন তিনি; কিন্তু তবুও ত ছোট ব'লে আমাকে করুণা করেন নি। শাস্তি দিলেন—কঠোর শাস্তি দিলেন।

তুষার

কি বলছ ঠাকুমা?

ঠাকুমা

তবে অবহেলা করেন নি। শাস্তি দিয়েছিলেন। সেইটুকু করুণা করেছিলেন। তুষার, পাষাণে সেইটুকু করুণা ত ছিল?

তুষার

ঠাকুমা! তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঠাকুমা

কি ক'রে বুঝবি। আমার কথা বুঝতে গেলে তাঁকে বুঝতে হবে যে। তাঁকে আমিই বুঝতে পারি নি তোরা কি ক'রে বুঝবি?

তুষার

আজ ত তাঁকে বুঝতে পেরেছ—আজ আমাদের বুঝিয়ে দাও।

ঠাকুমা

না না। তোরা আমার কথা বুঝতে পারিস্ নি তুষার। তাঁকে আমি আজও চিনি না। তবে আজ এইটে বুঝেছি তাঁকে চিনবার দরকার নেই। সেদিন তাও বুঝতে পারিনি।

তুষার

(নীহারের প্রতি) ঠাকুমার মাথা খারাপ হয়েছে। যা-তা বল্‌ছেন।

ঠাকুমা

না তুষার। আমার মাথা খারাপ হয় নি। আজ প্রাণ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু

তখন ত ছিল, তাই কি দুঃখই এখন পেয়েছি। এই যে সব গান আজ নীহারের মুখে শুনে আর পাগল হ'য়ে উঠি—তখনও শুনেছি। কি প্রাণের খেলা ছিল ওঁর গানের মধ্যে, তুষার। তোরা কল্পনাও করতে পারিস্ না। আমি শুনেছি কিন্তু এমন হতভাগিনী আমি, [illegible] গান শুনে প্রাণে শান্তি পেতাম না। একটা জ্বালা—দুঃসহ জ্বালা অনুভব করতাম।

তুষার

সে কি ঠাকুমা?

ঠাকুমা

মত হ'ত আমার এ গানের সঙ্গে ওঁর প্রাণের যে যোগ সেখানে আমার ঠাঁই নেই;—আমি যেন সে যোগাযোগের বাইরে। ভয় হ'ত সে যোগ কোথায়—কিসের সঙ্গে। উঃ, পাগল হ'য়ে উঠ্‌তাম তুষার, এই সব গান শুনে তীব্র জ্বালায় একেবারে পাগল হ'য়ে উঠ্‌তাম।

তুষার

সত্যি ঠাকুমা, তুমি পাগলই বটে।

ঠাকুমা

একদিন এক মধুর সন্ধ্যাবেলায় বাগানে ব'সে আমার গান শুনোচ্ছিলেন। শুন্‌তে শুন্‌তে মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্‌ল। আমি থাক্‌তে পারলাম না। বল্লাম, "এসব গান গেয়ে তুমি কেন আমায় শোনাও—মিথ্যে আমায় অপমান করো। শুন্‌তে চাইনা আমি এসব গান।"

তুষার

কি আশ্চর্য্য!

ঠাকুমা

গান বন্ধ হ'ল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, "তোমার মনে এত ময়লা তা ত জানতাম না।" ধীরে উঠে চ'লে গেলেন। তার ছিঁড়ে গেল তুষার। সেইদিন থেকে আমাদের জীবনের তার একেবারে ছিঁড়ে গেল। আর কখনও আমায় গান শোনান নি।

(সকলেই কিছুক্ষণ নীরব)

তারপর বেশীদিন আর বেঁচে ছিলেন না। মাত্র পাঁচ ছ মাস। চ'লে যাওয়ার কিছুদিন আগে এক মাসিক পত্রে হঠাৎ ওঁর আর একখানা গান পাই। গান পেলাম কিন্তু সুর পেলাম না। ইচ্ছে হ'ল একবার গিয়ে গানখানা শুন্‌তে চাই, কিন্তু লজ্জা হ'ল। পারলাম না। তারপর কিছু-দিনের মধ্যেই সব শেষ। সুর আর পেলাম না।

তুষার

কোন গানখানা ঠাকুমা?

ঠাকুমা

আজ ভাবি কি বোকাই না ছিলাম আমি। যে গানের সঙ্গে সারা বিশ্বের যোগ সেখানে যদি আমার প্রাণের যোগ না হয় সে ত আমারই অপরাধ আমারই ক্ষতি—আমাকেই ত ক'রে নিতে হবে। নইলে আমারই পরাজয় আমারই মৃত্যু।

(সকলে কিছুক্ষণ নীরব)

তুষার

কোন গানখানার কথা বলছিলে ঠাকুমা?

ঠাকুমা

"তোমার অনুভূতি"—

তুষার

নীহার ত ও গানখানা ভারি সুন্দর গায় ঠাকুমা। সেদিন রাণীর বাড়ীতে ওগানখানা গেয়ে সকলকে মুগ্ধ ক'রে দিলে। কত সুখ্যাতি করলে সবাই।

ঠাকুমা

কিন্তু ও গানের ঠিক সুর আমি যেন পেলাম না নীহারের গলায়। ও গানখানা লিখ্‌তে যে সুর বেজেছিল তাঁর বুকে, নীহারের গলায় সে সুর যেন ধরা দিল না।

তুষার

আচ্ছা ঠাকুমা! নীহারের কোন গানখানা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?

ঠাকুমা

ওঁর সব গানগুলোই নীহারের গলায় ভারি মিষ্টি লাগে। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার দুঃখ হয়, আজ উনি বেঁচে নেই, তাঁরই সেই সব গান আমার নীহার এত মধুর গাইচে—তাঁকে শোনাতে পারলাম না।

নীহার

ঠাকুমা! আমি এই গানগুলো যখন গাই আমার মনে হয় উনি এসে দাঁড়িয়ে গানগুলো শোনেন।

ঠাকুমা

সত্যি? নীহার, সত্যি? তোর গান গাইবার মধ্যে এত সাধনা, নীহার! এতদিন আমায় বলিস্ নি।

নীহার

তোমরা শুনলে হাস্‌বে তাই বলিনি।

ঠাকুমা

তাই ত বলি এই বুড়ো বয়সে নীহারের মুখে আবার ওঁর গান শুন্‌তে আমার এত ভাল লাগে কেন? সেই প্রথম জীবনে ওঁর গান শুনেছি—তারপর উনি চ'লে গেলেন। কুড়ি বৎসর ও গান কারো মুখে শুন্‌তে আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে নীহারের গলায় আবার সেই গান রঙিন হ'য়ে উঠ্‌ল আমার জীবনে—কেন? তাইত বলি। (কিছুক্ষণ পরে)—নীহার!

নীহার

ঠাকুমা!

ঠাকুমা

নীহার! আজও মনে হয়েছিল—তিনি এসেছেন?

নীহার

হ্যাঁ ঠাকুমা।

ঠাকুমা

নীহার!

নীহার

ঠাকুমা!

ঠাকুমা

আজ একবার সেই গানখানা গাইবি? "তোমার অনুভূতি"

(নীহার গাহিল)

তোমার অনুভূতি
পরশ বুলায় আমার বুকে,
আমার জীবনখানি বাঁচিয়ে রাখে সুখে দুঃখে॥
তোমার অনুভূতি॥

আমার ঘুম ভেঙে যায়—
ফাল্গুন রাতের উদাস হাওয়ায়—ঘুম ভেঙে যায়,
তোমার ঐ পরশটুকু পাবার আশায়—ঘুম ভেঙে যায়;
জেগে দেখি আমার ঘরে—
পরশটুকু খেলা করে—
হাওয়ার পরে—
আমার এই বুকের পরে—
শিহরণে পুলক জাগায়—ঘুম ভেঙে যায়
আমার এই চোখে মুখে।
তোমার অনুভূতি॥

কবে এমন বাহির হ'ল বদ্ধ পরাণ খুলে,
সারা ভুবন ভেসে বেড়ায় হাওয়ার পরে দুলে॥
সেকি কোনও বর্ষা রাতে—
শ্রাবণ মাসের বাদলা হাওয়ায়—বর্ষা রাতে
বিজন বনে গাছের তলায়—বর্ষা রাতে
কিংবা কোনও সকাল বেলায়,
বেরিয়ে এলো আলোর মেলায়,
রূপের খেলায়,
শরতের আকাশ তলায়
পথ-হারানো মাঠের পথে—বর্ষা রাতে
কোন সে আশার নবীন সুখে॥

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সন্ধ্যা

আষাঢ়, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

রবীন্দ্রকাব্যের অধ্যাত্মসম্পদ

অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল এম, এ

রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে লালিত ও বর্দ্ধিত। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে-সময়ে উপনিষদ্ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত ছিলেন, কাজেই তাঁহার পরিবারের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের যে-হাওয়া রাত্রিদিন প্রবাহিত ছিল, বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাওয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় উপনয়ন-সংস্কারের উল্লেখ করিয়া কবি তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"একবার পিতা আসিলেন আমাদের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিকমন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সঙ্কলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধরীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। আমার বেশ মনে আছে আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম, কি ভাবিতাম স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, তবে ইহা নিশ্চয় যে কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।" উদ্ধৃত অংশ হইতে আমি দুটি জিনিষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথমটি এই যে, কৈশোরেই কবি উপনিষদমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং উহার উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রনিচয় বালক-কবির হৃদয়-যন্ত্রে একটা অনির্ব্বচনীয়, বোধাতীত বেদনা-রাগিণী ঝঙ্কৃত করিয়াছিল। দ্বিতীয় কথা, mysticism এর মর্ম্মকথা;—বাল্য হইতেই কবি কোন জিনিষ স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার পক্ষপাতী নহেন; যদি কোন সুর, ভাব, ভাষা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে প্রেরণার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে, তবে তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। খোলাখুলি কথার মধ্যে রূপদক্ষের আনন্দ নাই—ঐ যে চাঁদের চাহনি, তারকার কানাকানি, উহারা ত স্পষ্ট করিয়া আমাদের কিছু বলে না—আমাদের মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরে আলোক-লোকের রুদ্ধ-কক্ষের কোন্ গুপ্ত বাতায়ন, আমাদের চিত্তশতদলের মর্ম্ম-কোষে ঢালিয়া দেয় আনন্দ-নন্দনের কোন্ স্বপ্ন-সুধা!

> "নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে!
> লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর ভাষা যেন জানে সে।"—

এই ব্যঞ্জনা, এই ইঙ্গিত, এই আভাসে ভাবের প্রকাশ, কল্পনার রঙে রাঙাইয়া কবি-তুলিকার এই নিপুণ আলিম্পন,-ইহাই হইল অতীন্দ্রিয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কথা।

যাহা হউক, এই দৃশ্যমান বিশ্বের বস্তুগত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে যে শাশ্বত সাম্য বিরাজিত, একত্বের যে-সূক্ষ্ম সূত্রখানি লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া নানা এবং বহুকে বিচিত্র-কুসুম-দাম-গ্রথিত মাল্যের মত চিরদিন বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, সেই সাম্য ও ঐক্যের সন্ধান, উপনিষদের স্তন্য-রসে লালিত এই বালক তদীয় কাব্যজীবনের অতি প্রত্যুষেই লাভ করিয়াছিলেন। যে ঋষিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি আমরা তাঁহার শেষ জীবনের কাব্যের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহা এই ঋষিবাণীনিচয়ের উৎসমুখেই জন্মলাভ করিয়াছিল। "প্রভাতসঙ্গীতের" "প্রতিধ্বনি" শীর্ষক কবিতার মধ্যেই এই দিব্যদৃষ্টির প্রথম আলোকপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গূঢ় আনন্দ বস্তুযবনিকাকে ছিন্ন করিয়া অজস্র উৎসে ফাটিয়া পড়িয়াছে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে রচিত এই কাব্যগ্রন্থের অভ্যন্তরে। এই কবিতা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিতেছেন—"বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে; প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে! এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এই জন্য তাহার একটা

সমগ্র আনন্দ-রূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ যেন আমার অন্তরের একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক-রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ, বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।" রবীন্দ্রনাথের রচিত "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্যকাব্যটির মধ্যেও এই সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ ও মায়ার বন্ধনকে অস্বীকার করিয়াও প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তে অনন্তের উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল।

"মুছ অশ্রুজল, বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাহিক কাহার পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক কাছে, যায় যাক্ দূরে,
জেনো, বৎসে, মোর কাছে সকলি সমান।"

অবশেষে কিন্তু এই কঠোরপন্থী সন্ন্যাসী একটি বালিকার মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল এবং অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের লীলানিকেতনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। উপলব্ধি করিল, "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।" বিরাগীর কণ্ঠে তাই ধ্বনিয়া উঠিল, "প্রকৃতি এমন তোরে কখন দেখিনি।"

ঐহিকতার আবরণ উন্মোচন করিয়া অমুত্রের আলোক দেখিবার এই দিব্য প্রতিভা আমরা কবির কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত দেখিতে পাই। যদিও একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার অংশ অনেক অধিক। "এই প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দিবার, 'বহুরে আহুতি দিয়া' এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করিবার" ঐকান্তিক চেষ্টাই তাঁহার কাব্যমঞ্জুষার শ্রেষ্ঠ সেবধি। সংসার হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র ও ক্ষণভঙ্গুরকে তুচ্ছ করিয়া, মানবমনের সহজ বৃত্তিগুলিকে উৎকট আয়াসের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া যে পারমার্থিক সিদ্ধি, তাহার সহিত কবির অন্তরের যোগ কোথাও নাই। কবি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা মুক্তির প্রয়াসী নহেন—কর্ম্মযোগে নিখিলের সহিত একীভূত হইয়া প্রেমের সাধনা করিতে হইবে, তবেই মুক্তি।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"
"কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে ধর্ম্ম পড়ুক ঝ'রে।"

গতিহীনতার অনায়াস আরামের মধ্যে সাধনার ধনকে পাওয়া যায় না, কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন আকুলতাভরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকি তখনই সে ডাক সত্য ও সার্থক হয়। কর্ম্ম-প্রচেষ্টার বিপুল আবেগে কণ্ঠ হইতে প্রেরণার সঙ্গীত যখন আপনি ধ্বনিয়া উঠে আনন্দের সেই জ্যোতির্ম্ময় উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত্তে বঁধুর গলায় কবি গানের মালা দুলাইয়া দিয়াছেন। দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়া সাধ্য ও সাধক এক হইয়া গিয়াছেন। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মসর্ব্বস্ব সাধনার দ্বারা যে কৈবল্যের কামনা তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। "সবার নীচে, সবার পিছে, সব-হারাদের মাঝে"—যেখানে দয়ালের চরণ নামিয়াছে ব্যথিতের আর্ত্তি দূর করিতে—সান্ত্বনার তীর্থনীরে ধূলি-মলিন ধরণীকে অমৃতায়মান করিতে,—সেই সর্ব্বনিম্নে নামিয়া প্রণাম নিবেদন না করিলে ত তাঁহার চরণে সে প্রণাম পৌঁছিবে না, সেই পুণ্যপীঠে তাহাদের সহিত মিলিলে "মৃত্যু মাঝে হ'তে হ'বে চিতাভস্মে সবার সমান" বিশ্বমৈত্রীর এই উদাত্ত বাণী, সর্ব্বভূতে ভূমার এই আবির্ভাব কল্পনা বিশেষভাবে ভারতীয় ঋষিগণের অনুভূতিলব্ধ সত্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বতন মনীষীগণের নিকট ঋষিঋণে আবদ্ধ।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রসাহিত্যের অতীন্দ্রিয়তার আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের সর্ব্ব সময়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহা সর্ব্বাংশে পাশ্চাত্য mysticismএর অনুরূপ নহে। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার ধারা সর্ব্বথা প্রতীচ্য ভাবধারার অনুবর্ত্তন করে না; যদিচ পরমাত্মার স্বরূপ অবধারণ করিবার, ভাবদেহে পরমাত্মার সহিত একীভূত হইবার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানবমনের নিভৃত-নিলয়ে নিলীন

রহিয়াছে তাহাকে দেশকালের রেখার দ্বারা একান্তভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নহে। যে অণু হইতে অণীয়ান্, মহান্ হইতেও মহীয়ান্ আত্মা প্রাণিগণের হৃদয়গুহায় নিহিত আছেন, সেই অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ অর্থাৎ চির-বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ বিজ্ঞানে উপলব্ধি করিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা দেশকালনির্বিশেষে প্রত্যেক মুমুক্ষু মানবের মধ্যেই লক্ষিত হয়। কেবল প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, কেবল মেধা কিংবা বহুল শাস্ত্রশ্রবণেও এই আত্মতত্ত্ব উন্মেষিত হয় না। এই আত্মাকে জানিতে হইলে চাই ভক্তিমুখী, ভাবময়ী সাধনা—এইরূপ ভক্ত সাধকের সমক্ষেই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন। কবি শব্দটির মৌলিক অর্থ যিনি স্বরচিত কাব্যের দ্বারা ভগবানের স্তব গান করেন। অতীত ভারতে এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালক্রমে কবি শব্দের অর্থ ব্যাপকতর হইয়া পড়িয়াছে, এখন ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যের রচয়িতৃ মাত্রকেই এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। এখন বিশেষ করিয়া অধ্যাত্ম অথবা mystic কবি না বলিলে কবিশব্দের বাচ্যার্থের ধারণা হয় না। যাহা হউক, এই শ্রেণীর কবির রচনার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, একটি নিগূঢ় পরমার্থরসের দ্বারা তাহা অনুপ্রাণিত। একটি সর্ব্বতোব্যাপিনী পরমাশক্তির চেতনা-ময়ী অনুভূতি তাঁহাকে এমন করিয়া অধিকার করে যে, তাঁহার আবেগসমুজ্জ্বল হৃদয়াদর্শে আনন্দময়ের অপরূপ রূপ সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বিভেদ-রেখা মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইয়া যায়।

ভাবাবেশের অচিন্ত্য গভীরতার মধ্যে যে কাব্যের জন্ম তাহার অন্তরের কথাই হইল রূপের সহিত অরূপের সীমার সহিত অসীমের বিকাশের সহিত চরম পরিণামের পরম ঐক্যের বাণীটিকে বিশ্ববৈচিত্র্যের অনাহত লীলার মধ্যে অবারিত করিয়া দেওয়া। কবির জীবনের মধ্যে যে অচিন্ত্য ও অদৃশ্যশক্তির প্রচ্ছন্ন আবির্ভাবে নানা সময়ে সূচিত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলি তাহাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করিয়া সমগ্রের এক অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্যের মধ্যে মিলিত হইয়াছে তাহারই নাম দিয়াছেন তিনি জীবন-দেবতা। ফুল যখন ফুটিয়া উঠিয়া সমগ্র বনভূমিকে লাবণ্যের লীলা-হিল্লোলে নাচাইয়া দেয় তখন সহজেই মনে হইতে পারে এই সুষমা ও সৌন্দর্য্যই বুঝি কাননলক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন; কিন্তু যখন আরও দূরে রূপাবরণের অন্তরালে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করি তখন বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকে না যে, এই ফুল-ফুটান কেবল ফল-ফলাইবার পূর্ব্বাভাষ বা উপলক্ষ্যমাত্র। সেইরূপ পরিণাম না জানিয়া কবি যখন একটির পর একটি কবিতাকুসুম ফুটাইয়া চলিয়াছিলেন তখন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, সেই কুসুমসমূহের শোভন সমাবেশেই এমন এক অপূর্ব্ব সুকুমার অর্ঘ্যমাল্য বিরচিত হইবে যাহার মিলিত সুষমায় খণ্ডের ক্ষুদ্রতা মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যাইবে।

"সোনার তরীর" মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এই জীবন-দেবতার আবির্ভাব দেখা যায়। এই কাব্যে অংশের মধ্যে সম্পূর্ণতার তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহার পরবর্ত্তী সমস্ত কাব্যের মধ্যেই এই বিশ্বানুভূতির চিত্র দেখিতে পাই। প্রকৃতির প্রত্যেক সৌন্দর্য্যকে তিনি এক অখণ্ড, অমূর্ত্ত, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অংশরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, জীবনের সকল বিচিত্রতাকে এক পরিপূর্ণ সত্তার অবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত একটি অতি সহজ অতি নিবিড় প্রেম তাঁহার রচনার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যকে কবি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই, সীমার মধ্যে তিনি অসীমের আভাস পাইয়াছেন, বহুর ভিতর দিয়া একের আরতি করিয়াছেন পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আনন্দকে গ্রথিত করিয়া ভূমার বিনোদ-মাল্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কবি-হৃদয়ের এই অপরূপ ভাবসত্তা, সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তের পথে আত্মার এই নিত্য অভিসার সকলের কাছে বেশ সহজবোধ্য বলিয়া মনে হয় না। কবি-বীণায় যে বাণীটি বিকাশের ব্যাকুলতায় সান্দ্র ও নিবিড় হইয়া উঠে অনেকে তাহার অন্তরতম ইঙ্গিতটি ধরিতে না পারিয়া তাহার কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটা গোধূলির অস্পষ্টতা অনুভব করেন। কিন্তু কবি ত স্বেচ্ছায় এরূপ করেন না, যিনি অনন্ত ও অব্যক্ত, যাঁহার বাসভূমি প্রত্যক্ষের অতীত

এক অজানা রাজ্যে তাঁহাকে ত একটা বিশেষ বিগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরা সম্ভব নহে। মানুষ সান্ত ও সসীম, কাজেই তাহার অনুভূতিরও একটা সীমা আছে। চিররহস্যময় যিনি, অবাঙমনসগোচর যিনি, খণ্ড শক্তির দ্বারা তাঁহার বিভূতির প্রকাশ করিতে গেলেই একটু গোধূলির আলোছায়া, একটু বিভাবনার অনবদ্যতা, একটু রহস্যের কুহেলিকা না থাকিয়াই পারে না। Mysticism উপলব্ধির অক্ষমতা নহে, প্রকাশের পঙ্গুতা নহে, অব্যক্তকে ব্যক্তের আলোকে পরিচিত করিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী। প্রত্যক্ষ যাহা, পরিস্ফুট যাহা তাহার চিত্রও সুস্পষ্টই হইয়া থাকে; কিন্তু যে চিন্ময় বিভু জগদতীত হইয়াও জগতের মধ্যে সপ্রকাশ মানবের মন তাহার সব শক্তি লইয়া ছুটিয়াও নিজের ও সেই পরম পুরুষের মধ্যে নিরন্তর এক ব্যবধান রচনা করিয়া চলে।

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই
তোমার আমার মাঝখানেতে তাই
কৃপা ক'রে রেখেছ নাথ, অনেক ব্যবধান।

ঘোমটার-আড়ালে-ঢাকা সৌন্দর্য্যের প্রতিমা যেমন রহস্যের ইঙ্গিতে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও বিফলতার হাহাকার বাড়াইয়া চলিয়া যায়, তেমনই ভাবুকের চিত্তও এই প্রতীয়মান সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত চিদানন্দময় সত্তার অনবদ্য মাধুর্য্যের কণা-মাত্র লাভ করিবার জন্য সুদূরের অভিসারে বাহির হইয়া পড়ে। তাই কবিকণ্ঠে বাজিয়া উঠে—"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

বৈষ্ণবদিগের ভেদাভেদদর্শনের মধ্যেও এই গুহাহিত পরমতত্ত্বকে জানিবার অশেষবিধ প্রয়াস দেখিতে পাই। "আমার চেষ্টা, চিন্তা ও কল্পনা নিরন্তর ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করিয়া ভূমার সহিত স্বীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত। অদ্বৈত আমা হইতে পৃথক হইলেও আমার ভিতরে চির প্রকাশমান। বস্তুতঃ আমার চেতনার প্রবাহ, একবার অহংবোধরূপ খণ্ডচেতনার বিচিত্র তানের ভিতর আমাকে ছাড়িয়া দিতেছে, আবার সমস্ত বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি যে—বিশ্বচৈতন্য তাহারই অবিচ্ছিন্ন সমের মধ্যে আমাকে বিলীন করিয়া দিতেছে। ভেদাভেদের এই অপরূপছন্দে অনুদিন আমাদের অন্তরে বিশ্বসঙ্গীত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে; সাধনার দ্বারা এই বিচিত্রতা ও একতাকে—এই তান ও সমকে—একত্র মিলাইয়া তবেই বিশ্ববোধ পরিপূর্ণরূপে জাগ্রৎ হইতে পারে।" রবীন্দ্রকাব্যের তত্ত্বকথাও মূলতঃ এই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ভেদাভেদদর্শনের আলোচনা কখনও করেন নাই। যা কিছু আলাপ আলোচনা তাঁহার বৈষ্ণবকবিদের লইয়াই। বৈষ্ণবকাব্য তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিগণ যে পীযূষপ্রসাদ পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন, এমনকি একসময়ে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "ভানুসিংহের পদাবলী" পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবকবিগণ ত এই ভেদাভেদতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা নহেন; বৈষ্ণবদিগের মধ্যে practical mystics যাঁহারা, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবদশন-নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-দার্শনিক মতবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ভেদাভেদ-দর্শনের সম্বন্ধ নিতান্ত গৌণ। ভগবানের অসীমত্ব অথবা জগদতীত সত্তা অর্থাৎ তাঁহার transcendental aspect বা ভেদতত্ত্ব লইয়া তাঁহারা মোটেই মাথা ঘামান নাই। ভগবানকে তাঁহারা কেবলমাত্র এই পার্থিবজগতের মধ্যেই মূর্ত্তরূপে জানিয়াছেন এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শান্ত ও বিশেষ করিয়া, মধুর প্রভৃতি নানা লৌকিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মতে ত "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" তাই তাঁহার কৃষ্ণ ভগবান হইয়াও দোষে-গুণে-জড়িত একটি খাঁটি মানুষ। রাধাশ্যামের প্রেমবর্ণনাছলে চণ্ডীদাস শাশ্বত-মনুষ্যের চিরন্তন প্রেমতৃষ্ণাকেই আভাসে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কবিগণই প্রথম নানা বিগ্রহের মধ্যে আনন্দময়ের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া—তাঁহার সহিত বিচিত্র মানবী সম্বন্ধ পাতাইয়া গুহাহিত পরম তত্ত্বকে লোক বুদ্ধির গোচরীভূত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিদিগের রসসুমধুর কাব্যের অনির্ব্বচনীয় সুষমায় যদিও রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে তাহার গুণপক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি ভূমাকে সীমার মধ্যে একান্তভাবে বাঁধিয়া রাখায় তাঁহার উপনিষদ্-দীক্ষিত উদার হৃদয়ে কোন্‌খানে যেন একটু ব্যথা বাজিয়াছিল। ভগবান বন্ধুরূপে, পিতৃমাতৃরূপে সততই ত আমাদের ভালবাসা দিতেছেন ও নিতেছেন, কিন্তু উহাই কি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয়? তিনি কি এত ক্ষুদ্র যে, আমাদের হৃদয়-গোষ্পদে তাঁহার পদচ্ছায়া ধারণ করিতে পারি? কাব্যের দিক দিয়া নহে, পরন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া এইখানে একটা প্রকাণ্ড খণ্ডতা ও অসামঞ্জস্য তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন বৈষ্ণবকবিদিগের মধ্যে।

"বন্ধু হ'য়ে, পিতা হ'য়ে, জননী হ'য়ে
আপনি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে
আমিও কি আপন হাতে
ক'রবো ছোটো বিশ্বনাথে?
জানাবো আর জানবো তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে?
গীতাঞ্জলি, ১১৫।

শিল্প ও রসের দিক দিয়া কবিত্বের এই অফুরান নির্ঝর তাঁহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল, কিন্তু বোধের দিক দিয়া তাঁহার চিত্তে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের সান্ত্বনা জাগাইতে পারে নাই। উপনিষদের উদাত্ত বাণীর মধ্যেই তিনি পূর্ণতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই, উপনিষদ ও বৈষ্ণবসাহিত্যের দুই ভিন্নমুখী ধারা গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের মত আসিয়া মিশিয়াছে রবীন্দ্রকাব্যের প্রয়াগতীর্থে। এই দুয়ের মিশ্রণে যে-দর্শন জন্মলাভ করিয়াছে তাহার সহিত "ভেদাভেদের" সম্পূর্ণ অভেদ লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবদর্শনে অনভিজ্ঞ হইয়াও এইজন্যই তিনি তাহার (সেই দর্শনের) ব্যাখ্যাতা ও রূপকার।

যে ধর্ম্মের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ—যে অধ্যাত্মশিক্ষা তাঁহার মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, সেই শিক্ষাই তাঁহাকে বিগ্রহ-কল্পনা হইতে বিরত করিয়াছে। বৈষ্ণবকবিরা যেখানে প্রতীকের সাহায্য লইয়া তাঁহাদের অধ্যাত্ম-অনুভূতিকে মূর্ত্তি দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে কোনরূপ প্রতীকের সহায়তা ব্যতীতই "অরূপরতনকে" রূপের অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবকাব্যের symbolism তাই mysticismএ পরিণত হইয়াছে তাঁহার অধ্যাত্মরচনায়। "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা" ইহা নিছক রূপক (symbol), ইহার ভিতরে অস্পষ্টতা কিছুই নাই;—দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধের যতকিছু দিক বৈষ্ণবকবিকুল তাহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন; এমন কি যে-রসকে সাধকগণ সর্ব্বরসের আধার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্-মহাপ্রভুর বার্ত্তালাপ দ্রষ্টব্য) সেই মধুর রসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কলহ-বিরহ হইতে আরম্ভ করিয়া মিলন-সম্ভোগাদি কোন লৌকিক অঙ্গই বাদ পড়ে নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, একদিকে তাহা যেমন দুর্ব্বোধ্যতার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনই তাহা অধ্যাত্মমহিমার স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধরণীর ধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কতকটা শিক্ষার গুণে, কতক এই কারণে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসাহিত্যের রীতিকে শোধিত (filter) করিয়া লইয়াছেন উপনিষদ্ধর্ম্মের অনুপ্রাণনার দ্বারা। আমার মনে হয় কাব্যের এই রূপ বা রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপর সুফী-সাহিত্যের প্রভাবও নিতান্ত নগণ্য নহে। তাঁহার পিতার আমলে তাঁহাদের বাটিতে সুফীকবিদিগের কাব্যের বহুল আলোচনা হইত। আমার বিশ্বাস, এই সকল আলোচনার আসরে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন এবং তাঁহার কাব্যের—বিশেষতঃ রচনারীতির উপর সুফী মরমীদিগের প্রভাব কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পড়িয়াছে।

সুফীদর্শন, ইংরাজীতে Eclectic বলিতে যাহা বুঝায়, সেই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুফীসাধকগণের মধ্যেও সর্ব্বানুভূতির ভাব বিদ্যমান। নবম শতাব্দীতে একেশ্বর-বাদিতার নিদারুণ নিষ্করুণতায় যখন দেশবাসীর চিত্তভূমি, বিরল নিদাঘের মরুক্ষেত্রের মতই, শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তখন সুফী মরমীগণের রস-সুমধুর সাধনার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ আবার শস্যশ্যামল ও সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ের পরবর্ত্তী কালের পারসীক সাহিত্য ব্রহ্মানুভূতির আনন্দে সমুজ্জ্বল। হাফিজ এবং সাদির কাব্যেও, বৈষ্ণব সাহিত্যের মতই, ভক্ত ভগবানের নিগূঢ় পবিত্র সম্বন্ধকে

মানবী প্রেমের আলোকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। পার্থক্য এই যে বৈষ্ণব কবিগণ যেখানে, ভগবানের নাম ও বিগ্রহরূপ কল্পনা করিয়া, মানবের প্রতি মানবের প্রেমের আস্বাদ দিয়াছেন, সুফীগণ সেখানে বিশ্ববিভুকে, দয়িত ও প্রিয়তমরূপে বুঝিয়াও, বিগ্রহের নিগড়ে বাঁধেন নাই। তিনি বন্ধুরূপে বল্লভরূপে সসীম, আবার অন্তরূপে তিনি বিরাট্ ও জগদেককারণ। এইস্থানে সুফীদিগের সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল। কিন্তু এ মিল কি অহেতুক ও আকস্মিক? এইখানে হাফিজের কবিতার একটু নমুনা উদ্ধৃত করি। ইহাতে হাফিজের অসীমের প্রতি আকুতি কি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ঘরে-ফেরা পাখীর মতন
আত্মা মোর ধায় ঊর্দ্ধলোকে!
উড়ে সুখে অনন্ত অম্বরে
পাশমুক্ত পক্ষের পুলকে!
পরাণের নিভৃত-নিলয়ে
আসে যদি প্রেম নিমন্ত্রণ,
কে চাহিবে পিছনের পথে
ক্ষণিকের জীবন বন্ধন?
জাগো মন! কর আবাহন
বঁধুয়ারে আপনার প্রাণে,
নিখিলের কামনার ধন,
সব আশা ধায় তাঁরি পানে।
হাফিজের সাধন-সেবধি!
এস নাথ, আলোকের রথে।
ডাকি' লও এজগৎ হ'তে
শাশ্বত সে প্রেমের জগতে!!*

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে" প্রভৃতির ভাবসাদৃশ্য পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। ফল কথা, উপনিষদের **পরানুভূতির** বৈষ্ণবকাব্যের **রস** ও সুফী সাহিত্যের **বর্ণনভঙ্গী** বা কাব্যরূপ এই তিন বিশিষ্ট উপাদানে লোকোত্তর প্রতিভাপ্রেরণার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যহর্ম্ম্য নির্ম্মিত। তবুও স্বীকার করিতে হয়, রসাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তত্ত্বের দিকে ইহাকে প্রসারিত করিতে গিয়া। একটি বিগ্রহকে অবলম্বন করিয়া, প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম বাসনার দুর্ব্বিবোধ্য আকর্ষণের মধ্য দিয়া আবেগের যে তীব্রতা ব্যক্ত হইতে পারে বিগ্রহনিরপেক্ষ হইয়া কিছুতেই সেরূপ সম্ভব নয়। অপরদিকে, বৈষ্ণব কাব্যের অনেকাংশ অশ্লীল পুতিগন্ধময়—ভাষ্যকারগণ সযত্নে তাহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিলেও, সাধারণে তাহা বুঝিবে না। জয়দেবের গীতিকা যে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ তাহা প্রকৃত সাধক ব্যতীত প্রাকৃতজনের বোধগম্য হওয়া সহজ নহে। তবেই দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়ের আভাস দিতে গেলে ভুল বুঝাইবার আশঙ্কাও যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে, এই চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে আবেগের দিক দিয়া যেমন তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই তাহা ইন্দ্রিয়-বৈকল্যের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে কল্পনার অপরূপ আলিপনা বড় কম নাই।

এই প্রসঙ্গে অবান্তর হইলেও বলা যাইতে পারে যে, Blake বা Wordsworthএর mysticism ঠিক এই শ্রেণীর নহে। তাঁহাদের গ্রন্থাবলির মধ্যে সীমার মাঝে অসীমের সুর বড় শুনি না। Wordsworthএর মধ্যে রূপ হইতে ভাব, বাহ্য হইতে অন্তর, এবং কান হইতে প্রাণের পথে প্রয়াণের চিত্র প্রচুর দেখিতে পাই। তিনি বিশ্বশতদলের কেন্দ্রকোষে শান্তিসুধার সন্ধান দিয়াছেন, পরন্তু যে প্রেম, যে আনন্দ হইতে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের জন্ম তাঁহার কাব্যমঞ্জুষায় সে দুর্ল্লভ রত্নের সন্ধান বড় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তরে প্রাণের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন—তরুলতা পশুপক্ষীর চেষ্টার আনন্দই কেবল তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এ সুর নূতন নহে, তার পরবর্ত্তী জীবনে তিনি এই আত্মবোধকে প্রসারিত করিয়া বিশ্ববোধের অভিমুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। Blakeও

* Miss Bell কৃত ইংরাজির মর্ম্মানুবাদ— লেখক

একজন উচ্চাঙ্গের মরমী কবি। তাঁহার কাব্যে Wordsworthএর মত সর্ব্বভূতে প্রাণময়ী সত্তার অনুভাব কল্পিত হয় নাই, পরন্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বস্তুর মধ্যেই এক স্বপ্নময়ী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁহার মতে অপবিত্র বা অকিঞ্চিৎকর বিশ্বে কিছুই নাই—হিংস্র আরণ্য পশুগণের অন্তরেও ভগবদ্বিভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জাজ্বল্যমান। মরমী কবির কাব্যে প্রায়শঃই একটি বেদনার সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দুঃখ-বেদনার কণ্টককে কবি আনন্দপদ্মের সমরূপেই অনুভব করিয়াছেন। তথাপি Wordsworth বা Blake কেহই উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম. আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি অধ্যাত্ম-অনুভূতির উচ্চতম গ্রামে পৌঁছিতে পারেন নাই। যে অপার্থিব রসরশ্মিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসাধনা সমুজ্জ্বল তাহা অদ্যাপি য়ুরোপীয় কবিকুলের অনায়ত্তই রহিয়া গিয়াছে। Blakeএর

"Joy and woe are woven fine
A clothing for the soul divine,
Under every grief and pine
Runs a joy with Silken twine" এর সহিত

রবীন্দ্রনাথের "তুমি দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে। যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা নিবিড় কোরে ধরিব হে॥" তুলনা করিলে দেখিতে পাই ইংরেজকবি যেখানে দুঃখের অন্তরে সুখ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন ভারতীয় কবি সেখানে দুঃখকে "আনন্দের স্বরূপ" এই উপলব্ধিতে বুকের মাঝে নিবিড়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। অধ্যাত্মচিন্তার যে উদার স্বরলহরীতে রবীন্দ্র-কাব্য অনুস্যূত য়ুরোপীয় মরমীগণের মধ্যে তাহা সুলভ নহে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার সহিত ভক্ত কবি কবীরের কোন কোন দোঁহার ভাবসমতা লক্ষিত হয়। খণ্ডের মধ্যে পূর্ণতার পিপাসা কবীরের রচনারও বিশেষ লক্ষণ। কবীর গাহিয়াছেন—

"জো তন পায়া খণ্ড দিপায়া তৃষ্ণা নহীঁ বুঝানী
অমৃত ছোড়্ খণ্ডরস চাখা তৃষ্ণা তাপ তপানী"—ইহার সহিত ঋষি রবীন্দ্রের "অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা" ইত্যাদি তুলনীয়।

পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে গীতিকবি। তাঁহার কাব্য নাটক গল্প সকলের ভিতর দিয়াই বাজিয়া উঠিয়াছে সঙ্গীতের এক অব্যক্ত বেদনা। বিশ্বসৌন্দর্য্যকে তিনি কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়াই প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে আনন্দের যে অনাহত সঙ্গীত অনাদি অতীত হইতে ধ্বনিত হইতেছে তাহাকে তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন ও হৃদয় দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপ এবং সুর তাই একই সত্যের দুই বিভিন্নমূর্ত্তি। গ্রহে নক্ষত্রে, চন্দ্রে সূর্য্যে, তারায় তারায় সঙ্গীতের যে অবারিত স্রোত সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে বহিয়া চলিয়াছে য়ুরোপীয় কবিকুল তাহার নাম দিয়াছেন "Music of the Spheres"। নিখিল বিশ্বের পরম ঐক্যের এই শাশ্বত সুরটি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে বাঙালী কবির চিত্তবীণায়। তাই এই সুরের আবেশটি লগ্ন হইয়া আছে তাঁহার প্রত্যেক সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে। তাঁহার

"তুমি কেমন কোরে গান কর যে গুণী
আমি অবাক হ'য়ে শুনি কেবল শুনি।
সুরের আলোয় ভুবন ফেলে ছেয়ে সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।"

অথবা "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনা তোমারে।"

প্রভৃতি গানে এই সুরের সাধনাই কাব্যসৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জগৎ আলোর জগৎ, সুরের জগৎ। এই সুর ও আলোককে সাহায্যে তিনি যে কাব্যহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আকৃতিতে যেমন বিশাল, বিচিত্রতায় তেমনি অভিনব। সাধক-হৃদয়ের অনুভূতি-সংবেদ্য এই অতীন্দ্রিয় প্রেম-কথা পাঠকের চিত্তে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আবেশের সৃষ্টি করে।

দর্শনের ন্যায় কাব্যেরও ভিত্তি দুঃখবাদ। জীবন-রহস্যকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যশতদল বিকশিত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে প্রাণের পরতে প্রেমময়ের রসপরশ লাগে বলিয়াই জীবন একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠে না। বুকের মাঝে যেটুকু তাঁহাকে পাই সেইটুকুই সুখ, সেইটুকুই সার্থকতা। কিন্তু ক্ষণিকের সেই পাওয়া সেত চরম পাওয়া নয়।

"তোমায় আমি পাইনি যেন সেকথা রয় মনে,
ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।"

এই যে পাওয়া এবং না-পাওয়া, এই যে আনন্দ এবং দুঃখ, এই যে আলো এবং ছায়া ইহাই হইল Mystic বা মরমী কবির একমাত্র উপজীব্য। ভক্ত ত ভগবানকে হৃদয় মধ্যে সর্ব্বক্ষণের জন্য পান না; চিত্ত যখন নির্ম্মল থাকে, ভগবৎ সান্নিধ্যলাভের আকুলতা যখন চোখের জলের অজস্র ধারায় ফাটিয়া পড়ে, তখনই কেবল সেই তন্ময় মনে চিন্ময়ের ছবি ফুটিয়া উঠে। আবার ক্ষণপরেই সে-ছবি মিলাইয়া যায়; ঐহিকতার মেঘে অমুত্রের আলোক ম্লান হইয়া যায়, তাই ক্ষোভে দুঃখে কবি গাহিয়াছেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাইনা ?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে;
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।"
"মিশিয়ে গেছে সোরু মোটা দুটো তারে,
জীবন-বীণা ঠিকসুরে আর বাজে না রে।"
"এই বেদনাধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে,
ভুবন ভ'রে আছে যেন পাইনে জীবন ভ'রে।"

জীবনে অনুভূতির মধ্যে বিশ্বাস ও সংশয়ের এই আলোছায়া—বৈষ্ণব কবিরা যাহার নাম দিয়াছেন "বিরহ—" কবির রচনাকে অল্প বিস্তর জটিল ও অস্পষ্ট না করিয়াই পারে না। "আমার মাঝে আছে কে সে কোন্ বিরহিনী নারী" এই যে, আমার অন্তরের নিভৃতলোকনিবাসিনী চিরবিরহিনী অশ্রুজলের মাল্য গাঁথিয়া সাগ্রহ প্রতীক্ষায় অসীম তিতিক্ষার সহিত দয়িতের উদ্দেশে বাসর জাগিয়া বসিয়া আছে, সে যে সুধু একবার আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর কি সে আসিবে না? যে চিত্ত-উৎপল ফুটাইয়া রাখিয়াছি আর কি সে আনন্দকন্দ আসিয়া সে মকরন্দ পান করিবে না? পূর্ণতার জন্য এই যে শূন্যতা তাহা কি বুঝান যায় গো! যেখানে কবির সার্থকতা সেইখানেই আমরা দোষানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। কবি যেখানে ধ্যাননেত্রে আরাধ্যকে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন—ক্ষ্যাপার মত পরশপাথর খুঁজিতে খুঁজিতে বারবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন অথচ আশা ছাড়িতেছেন না—সাধনার সেই নিরতিশয় বিস্ময়কর ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার সাধ্য আমার নাই। আমি কেবল উদ্দেশে কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দন নিবেদন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করি।

১১
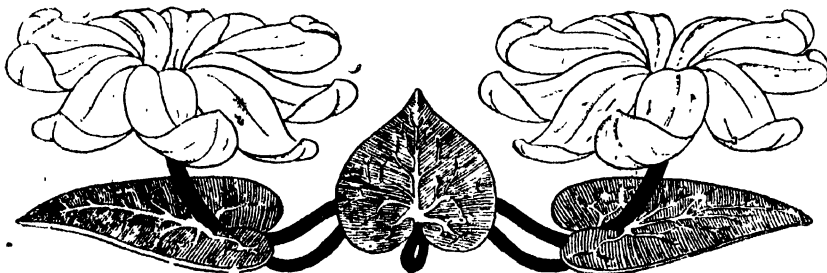
দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্ব্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোনো ত্রুটী করে নাই, কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই, সে আশা সর্ব্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুয্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনিয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বর্ত্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়াটে চাক্‌রী করিতেন, সেখানেই ইহাদের জন্ম, সেখানেই লালিত পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা প্রথম এখা'ন আসিলে সর্ব্বজয়া বড়মানুষ জা'য়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশহাজার টাকার মালিক একথা জানিয়া জা'য়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বজয়া নির্ব্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাক্‌রী করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি-পরিবার হরিহরদের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে, সর্ব্বজয়া আপনিই হঠিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে, সর্ব্বজয়া কোনোরকমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমান সমান মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলে মেয়ে সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্ সাজিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্ব্বদা আঁচ্‌ড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ

কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সেই সব গৃহকর্ম্ম করে,—মোটের উপর সব বিষয়েই সর্ব্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চালচলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য। সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত, অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরীপের সময় নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুয্যেরা ইঁহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দুখানা ঘর ইঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইঁহাদের পৃথক্ হয়। ভুবন মুখুয্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্টহয় না ; কারণ ভুবন মুখুয্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্ব্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাটী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ; নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ; অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ায় গাঙ্গুলী বাড়ীর রমানাথ গাঙ্গুলীর ছেলে তাহার সহপাঠী, গাঙ্গুলীবাড়ী রামনবমী দোলেব খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষে সেও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটায়, অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ীর পাশে পড়িয়া থাকিতে সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা ; সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটীতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেক দিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না,—সে প্রায় সব সময়ই গাঙ্গুলীবাড়ী কাটায় ; তাছাড়া সুরেশের চালচলন ও কথাবার্ত্তার ধরণ এম্‌নি যে, সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায় যে, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁসে না।

অপু এখনও পর্য্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলীদের পুকুরের বাঁধাঘাটে জলপাই তলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গিতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অপুকে বলিল—বলতো ইণ্ডিয়ার বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কসেচ? ডেসিম্যল্ ফ্রাক্‌শন্ কস্‌তে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহারও সেই টিনের বাক্সটাতে বুঝি কম বই আছে! একখানা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য এক খানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়,—ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য, অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিয়া দিবার মত সঙ্গতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে নিজের কাছে বসিয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে

অঙ্ক কসায়, যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে 'বঙ্গবাসী' কাগজের গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে; ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধূলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবনমুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে; জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিষটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টন্‌টন্ করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল, মার্টিনি দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা যাদুকর বটগাছের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফাষ্ট বুকের ঘোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্ব্বজয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখন স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহাদের যে সব শিষ্য বাড়ী আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্ব্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াছেন। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বৌ, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড় বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্য্যের অবর্ত্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভম্বলের পরিবর্ত্তে নিষ্পাপ সরল সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা পূজায় লক্ষ্মী পূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্ব্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে, এবং এইটাই বর্ত্তমানে তাহার সব চেয়ে উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া অন্য কোনো মঙ্গল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠায় পায়।

একদিন এ কথা ভুবন মুখুয্যের বাড়ী উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বজয়া সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সাম্‌নের ফাগুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পুজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তাহ'লে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ী আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলী বাড়ীর পুজোটা বাঁধা হ'য়ে যায় তাহ'লেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া তাঁহার জেঠতুত ভাই পাটনার বড় উকীল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতী করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান, অথচ খুব পসার-ওয়ালা উকীল; এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখান,—কিন্তু সুনীলের মা কেন পরের বাড়ী ছেলে রাখিতে যাইবেন ইত্যাদি সংবাদ নির্ব্বোধ সর্ব্বজয়ার মত হাউ হাউ না বকিয়াও ইতিপূর্ব্বে মাঝে মিশালে কথাবার্ত্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আস্‌তিস্, আজকাল আসিস্ নে কেন রে?

কেন আস্‌বো না রাণুদি,—আসি তো?

রাণী অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ আসিস্, ছাই আসিস্! আমি তোর কথা কত ভাবি, তুই ভাবিস আমাদের কথা?

না বৈ কি! বা রে—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো দিকি?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার যোগাইল না। রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল, থালা শুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রানুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল; রানুদির মত সুন্দরী এ পর্য্যন্ত অন্য কোনো মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্ব্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রানুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে রানুদির মত মন কোনো মেয়ের নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে তো সে রানুদি। রানুদিও যে তাহার দিকে টানে, তাহা অপু জানে।

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—রানুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না; একখানা দেবে পড়তে? প'ড়েই দিয়ে যাবো। রাণী বলিল—কোন বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখচি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল,—আচ্ছা পড়তে দিই,যদি এক কাজ করিস। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে,—জেঠামশায় আমাকে বলেছে সেখানে গিয়ে দুপুর বেলা চৌকী দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভাল লাগে না; তুই যদি যাস আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, বেশ তো? ও ছেলেমানুষ সেই বনের মধ্যে ব'সে মাছ চৌকী দেবে বৈ কি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে; যাও তোমায় বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল। রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরী অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ। এ গুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে; দু একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও; কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে দে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে। অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা সে আলমারী হইতে বাছিয়া বাছিয়া এক একখানি করিয়া বই সতুর নিকট চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলা সেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে—প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুমকুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দস্যু-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা—সে কত নাম করিবে! এক একখানি করিয়া সে ধরে, একবার আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে পারা যায় না—চোখ টাটাইয়া ওঠে, পুকুর-ধারের নির্জ্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা শেওলার দামে নামিয়া আসে, তার খেয়ালই থাকে না কোন দিক দিয়া বেলা গেল। কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে নৌকা লুটিয়া লইয়া তাঁহাদের বন্দী করিল। নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদণ্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবি তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরি, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস্ নাই, এ দেহে প্রাণ থাকিতে ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙিয়া গেল। নবাব চমকিয়া উঠিলেন—একজন জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী,

সঙ্গে যমদূতের মত বলিষ্ঠ চারপাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষ-কষায়িত নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমণ্ডলুর জলে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে; বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে। গ্রন্থকারের লিপি কৌশল ও সুন্দর সরোজের এই বিস্ময়জনক ঘটনা আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাঠকের মনোযোগ আহ্বান করিয়া কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত করিবার কৌশল করিয়াছেন—এইস্থর চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদণ্ড হইবার পর কি উপায়ে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ সম্ভব হইল।...

অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। গলায় কি যেন আট্‌কাইয়া যায়। আকাশের দিকে চোখ চাহিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবে,—আনন্দে, বিস্ময়ে তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে—পরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারের ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কি পাখীর ডাক সুরু হয়, উঠি-উঠি করিয়াও বইএর পাতার এক ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে, যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এরকম বই তো সে কখনো পড়ে নি? কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ী আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকী দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে ব'সে একখানা বই পড়্‌বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েচে তোকে—

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিকের কোনো ধারণাই নাই। আজকাল সে একখানা বই পাইয়াছে—জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা। উই ঢিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনের শুশ্রূষা করিত, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেন—শিবাজী পাঁচ হাজারী? একবার পুনায় যেও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার আছে একবার শুনিয়া আসিবে?

রাজপুতানার মরুপর্ব্বতে, দিল্লী আগ্রার রঙমহাল শিস্‌-মহালে ঘাঘরা পেশ্‌ওয়াজপরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারাদিনমান কাটে—এ কোন্ জগৎ যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়ার দীর্ঘ বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড় মাঠ পার হইয়া ছোটা?

সেদিন সে দুপুরে শুইয়াছিল, তাহার বাবা একটা মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো বাবা খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল—উৎসাহের সুরে বলিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

হরিহরের বুকটা মমতায় ভরিয়া উঠিল। সেদিন রাম-কবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ীর নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া সে তারই মধ্যে দু' টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের অতি প্রিয় সুপরিচিত গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসর খানেক পূর্ব্বে সে অধীর আগ্রহে তীর্থের কাকের মত ভুবনমুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবার হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! তাহার চোখে মুখে একটা লোভের, আগ্রহের, উত্তেজনার দীপ্তি ফুটিয়া ওঠে—চোখে দেখিয়াও যেন ভাল বিশ্বাস হয় না—কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি কথা সব লেখা আছে ইহার পাতায়?

হরিহরের মনে হয় দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কি আর বন্ধকী মাকড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ বেশী হইত?

অপু দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রীর চিঠি' বেরিয়েচে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো, খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেচে—না বাবা?

এই সবই তো তাহার ভাল লাগে। এই দেশ বিদেশের কথা, দূরে দূরে ভ্রমণের কাহিনী, নানা ধরণের বিচিত্র জীবন-যাপনের বৃত্তান্ত। এই সবই সে চায়।

তবুও তাহার মনে দুঃখ আসিয়া যায় যে, গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।

একদিন রাণী তাহাকে বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখ্‌চিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায়? তুমি কি ক'রে—

—আমি তোদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে—খুড়ীমার সঙ্গে কতক্ষণ ব'সে কথা বোল্লাম—কেন, খুড়ীমা তোকে বলেনি? তাই দেখ্‌লাম তোর বইএর দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখ্‌চিস্—আমার নাম রয়েচে, আর কি দেবী সিং না কি—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প—

কি গল্প রে? আমায় কিন্তু প'ড়ে শোনাতে হবে—

পরদিন রাণী একখানা ছোট্ট বাঁধানো খাতা লইয়া অপুদের বাড়ী গেল ও অপুর হাতে খাতাখানা দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভাল দেখে—দিবি তো? অতসী বল্‌ছিল তুই আবার লিখ্‌তে পারিস্ কিনা? লিখে দে আমি অতসীকে দেখাবো—

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দ্যাও না মা? এইটুকু লিখে রাখি আজ? তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধ্‌বো কি দিয়ে? এই এখানে রাঁধ্‌চি এই আলোতে ব'সে পড়। অপু ঝগ্‌ড়া করে। মা বকে—এ ছেলের রাত্তির হোলে যত পড়ার চাড়্—সারাদিন চুলের টিকি দেখ্‌বার যো নেই—সকালে করিস্ কি? যা, তেল দেবো না। অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্ব্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হোলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো—এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠ্‌বে—'আস্‌চে বছর ওর পৈতেটা দিয়ে নি, তারপর গাঙ্গুলি বাড়ী পুজোটা যদি বাঁধা হ'য়ে যায়—

চার পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিল। রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস্? অপু হাসি হাসি মুখে বলিল—দ্যাখো না খুলে? রাণী দেখিয়া খুসির সুরে বলিল—ওঃ অনেক লিখেচিস্ যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই—

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে? এ সব বই দেখে লেখা—

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ বই দেখে বৈ কি? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস্ ক'রো দিকি অতসী দি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রাণী বলিল—না ভাই, ওই লিখেচে আমি জানি। ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় প'ড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্ নি তোর? নাম লিখেদে—

অপু এবার একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। সচিত্র যৌবনে-যোগিনী নাটকের ধরণে গল্পটা আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই, অথচ দীর্ঘদিন তাহার কাছে খাতা থাকিলে রাণুদি, বিশেষ করিয়া অতসী দি, পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, কাজেই অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থাতে সেখানা ফেরৎ দিয়াছে। ০

তাহার বাবা বাটীতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামে এক আত্মশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতেও আসিয়াছে। এক এক ব্যক্তি পাঁচ ছয়টি করিয়া

ছেলে মেয়ে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সকলকে সুবিধামত স্থানে বসাইতে একটা দাঙ্গা হইতে হইতে থামিয়া গেল। প্রত্যেকের পাতে বেগুনভাজা দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারী লুচি দিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই, সকলেই পার্শ্ববর্ত্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে। ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চাজ্ ছোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাওনা দেখি! আবার এখুনি দেবে খেও এখন। তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া একটা সোরগোল হইতে লাগিল—"লুচির ধামাটা এ সারিতে", "কুম্‌ড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই", "গরম গরম দেখে", "মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি স্রেফ্ কাঁচা ময়দা"। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ! কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা হোলে সেখানে ভদ্দর লোকেদের নেমন্তন্ন করতে নেই—স পাঁচগণ্ডা লুচি এ একবারে ধরা বাঁধা ছাঁদার রেট্ বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েচে—চাইনে তোমার ছাঁদা—কন্দর্পো মজুমদার তেমন জায়গায় কখনও—

কর্ম্মকর্ত্তা হাতে পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এ যে কত এনেচিস্—দেখি খোল্ তো!···লুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকালবেলা খেও এখন। অপু বলিল—তোমায়ও কিন্তু মা খেতে হবে—তোমার জন্যে আমি চেয়ে চেয়ে দুবার ক'রে পান্‌তুয়া নিইচি। সর্ব্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বল্লি না কি আমার মা খাবে দাও।—তুই তো একটা হাবলা ছেলে! অপু হাত নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ তাই বুঝি আমি বলি! এমন কোরে বোল্লাম তারা ভাব্‌লে আমি খাবো—

সর্ব্বজয়া খুসির সহিত পুঁটুলি তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল।

পুঁটুলি নামাইয়া অপু সুনীলদের বাড়ী গেল। উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন আন্‌লি বাড়ীতে? কে আন্‌তে বলেচে তোকে! সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে!—

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ফলারে বামুনের ছেলে, ও এর পর ঠাকুর পুজো কোরে আরও ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে, ওই ওদের ধারা। মাও অম্‌নি—ঐ জন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এগাঁয়ে আস্‌তে চাইনি—কুসঙ্গে প'ড়ে যত কুশিক্ষে—যা, ও সব অপুকে ডেকে তাদের দিয়ে আয়—যা—না হয় ফেলে দিগে যা—নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্নে গেলি—ওসব বেঁধে আনা আবার কি!

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলদের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুসি হইল, জেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটী যে সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে! তাহার মা হ্যাংলা? সে ফলারে বামুনের ছেলে? মায়ের আহ্লাদে ভরা হাসিমুখ ভাবিয়া অপুর মন মায়ের প্রতি মমতায় ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। হোক্ তাহার মা হ্যাংলা, হোক তাহারা গরীব,—সে ভালো মা চায় না, সভ্য মা চায় না, এই মা-ই তাহার ভালো, সে চিরকাল এই মায়ের ছেলে হইয়াই থাকিবে।

১২

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যাওয়া, মাছ ধরা, জোলা কুলিদের পাড়ায় কড়ি খেলিয়া বেড়ানো। পটু—সেই ছোট্ট ছেলে জেলে পাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া যে সেবার মার খাইয়াছিল—সে এসব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়, ওপাড়া হইতে এ পাড়ায় আসে শুধু অপুদার

সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না, তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল সেকথা সে ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার সখ্ অপুর অত্যন্ত বেশী। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে খুব মাছ ছিপে ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটি গিয়া নদীতীরে একটা বড় সাঁইবাব্‌লা গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারী ভালো লাগে—একেবারে নির্জ্জন, দু'ধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতা-দোলানো কদম শিমুল গাছ, ষাঁড়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখীর ডাকে, বনের ছায়ায়, উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জ্জনতা। সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ বন নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, ছিপ ফেলিয়া সাঁইবাব্‌লার ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে, মাছ হোক্ বা না হোক্, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে ডালে সোনার সিন্দুর ছড়াইয়া সূর্য্যদেব সোনাডাঙ্গার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে তখনই তাহার মন খুসি হইয়া ওঠে, পুলক-ভরা চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে,-মনে হয় মাছ না হইলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক—এই বৈকালে ঠিক এই বড় সাঁইবাব্‌লার তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাৎনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসা খোঁজে। ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে ফাৎনা একটু একটু ঠুক্‌রাইতেছে; ছিপ্ তুলিয়া বলে,দূর্! ঝেঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না। পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা দামের পাশে ছিপ্ তুলিয়া ফেলে। জলটার গভীর কালো রংএ মনে হয় রুই কাৎলা মাছ এখনি ছিপে লাগে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশী দেরী হয় না, শরের ফাৎনা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এক একদিন সে কোনো একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে। ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের কাছে সে একখানা পুরাতন ক্লাসের ছবি-ওয়ালা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে ছবি দেখে। দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী খুব ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষার-ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিষ্টোফার কলম্বস্ কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। সার ফিলিপ সিড্‌নীর সম্বন্ধে একটু-মাত্র পড়িয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশ দা, এই গল্পটা জানো তুমি? বড় ক'রে বলো না? যে দুটি ইংরাজ বালক বালিকা সমুদ্র ধারের শৈলগাত্রে গাংচিন পাখীর বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্থ হইয়াছিল, যে সাহসিনী বালিকা প্রাস্কোভিয়া লপুলফ্ নির্ব্বাসিত পিতার নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রত্যাহারের আদেশ-পত্র লইয়া জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবিরিয়ায় হতভাগ্য পিতার খোঁজে একা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

সুরেশ বলে—ও জুট্‌ফেনের যুদ্ধের কথা—

অপু অবাক হইয়া বলে—কি নাম সুরেশ দা? জুট্‌ফেন! কোথায় সে? সুরেশ ঐটুকুর বেশী আর বলিতে পারে না।

মাসখানেক পরে একদিন মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় পুঁটীমাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে। ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পর, সুদূর-প্রসারী সবুজ উলু বনে, কাশ ঝোপে, কদম শিমুল গাছের মাথায় আবার তার শৈশব-পুলকের শুভমুহূর্ত্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী, বৈকালের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রোদ।

বঙ্গবাসীতে 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তার মনে পড়ে। সে সুরেশ দাদার ইংরাজি ভূচিত্রে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠ-তরাজ। জাতীয় জীবনের এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক-দুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায় আর মেষেরদল ইতঃস্তত ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দুটি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জ্জনে দেশের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ-কুমারী মনে উদয় হইল যে, কে তাহাকে বলিতেছে তুমি ফ্রান্সের রক্ষা-কর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড় কর, অস্ত্র ধর, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে। দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী,—দূর স্বর্গ থেকে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজদৃপ্ত ফ্রান্স সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনী অপবাদে জীবন্তে পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে। এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীরধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়! কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা তত সে ভাবে না—কিন্তু যে ছবিটি তার বার বার মনে আসে তাহা শুধু নির্জ্জন-প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছা-বিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। এক দিকে দুর্দ্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত,—অপরদিকে এক সরলা, ভাবময়ী দরিদ্র পল্লী বালিকা। ছবিটি তাহার প্রবর্দ্ধমান বালক মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ীরদিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাব্‌লা ও সাঁই বাব্‌লা বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে,—সোনাডাঙ্গা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বট গাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সোনার মত সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে, যেন কোন দেবশিশু তরল ফাঁপাইয়া প্রকাণ্ড আগুনের বুদ্‌বুদটাকে খেলাচ্ছলে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, সুদূর স্বর্গ হইতে এইমাত্র সেটা পৃথিবীর মাঠে বনে নামিয়া পড়িতেছে।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া ছাড়াইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সাম্‌নে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাই নে অপু-দা, তার পর ভাব্‌লাম তুই ঠিক মাছ ধত্তে এইচিস্, তাই এলাম—মাছ হয় নি? একটাও না?— চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

ছিপ গুটাইয়া দুজনে কদমতলার সায়েবের ঘাটে গেল। অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে—শালপাতা বোঝাই, ধান বোঝাই, ঝিনুক বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে, এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে, মাঝ-নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে, অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু একখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুসির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখ্‌ছিস্ পটু কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আর গুণে দেখি এক দুই ক'রে—পারিস্ তুই অতক্ষণ থাকতে?

নদীর দূর্ব্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে ওখানে বোঝাই নৌকার খোঁটা পোঁতা, নোঙর ফেলা। কত দেশ হইতে আসিয়াছে কত বড় নদী, খাল পার হইয়া, বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার ভাঁটা খাইয়া বেড়ায়, অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ঐ ইচ্ছাই তার মনে প্রবল। পটুও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা এক শ'টি কি দর? তোমার এই ধানের নৌকা কোথাকার ও মাঝি? ঝালকাটির? সে কোন্ দিকে, এখান থেকে কতদুর?

পটু বলিল—অপুদা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি—একটু বেড়িয়ে আসি অপু দা—

দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া তাহাতে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদী জলের ঠাণ্ডা আর্দ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমী শাকের দামে জল পিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটিয়া বাঁধিতেছে, চাল্‌তে পোতার বাঁকে তীরবর্ত্তী ঘন ঝোপে রাঙা রাঙা অজানা কি বনের ফল পাকিয়া ঝোপ আলো করিয়া রাখিয়াছে, বাবুল বনে গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের?

অপু বলিল—সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েচি একটা খুব ভাল গানের সেইটে গাইবো, আর এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না—

—তুই ভারী লাজুক অপু-দা—কোথায় লোক রয়েচে—কতদূরে আর তোর গান গাইতে—দূর্—ধর্ সেইটে—

খানিকটা গিয়া অপু গান সুরু করে। পটু বাখারীর চটাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইএ চুপ করিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া একমনে শোনে; বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ডাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল, নৌকা কমদুর আসে নাই—লা-ডাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল— ও অপুদা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখচিস্? এখুনি ঝড় এলো বলে—নৌকো ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো ভালো, চল্ আরও যাই। কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ, মাঠ, নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকদূরে একটা সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পাখা-ওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালার মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘনকালো হইয়া উঠিল, তীরের শাঁই-বাবলা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, শাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল। অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল। পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা, সাম্‌নে আর নৌকো যাবে না—যদি উল্টে যায়? ভাগ্যি সুনীলকে সঙ্গে ক'রে আনি নি!

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না, মনও ছিল না। সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের ঝটিকাক্ষুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চারিধারের কালো নদীর জল, উড়নশীল

বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব মুছিয়া যায়! নিজেকে সে বঙ্গবাসী কাগজের সেই বিলাত যাত্রী কল্পনা করে!—কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে—বঙ্গসাগরের মোহানায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া, কতদূরে অজানা সমুদ্র মাঝের কত দ্বীপ পার হইয়া, সিংহলের উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেল বনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব্ব দেশের নীলপাহাড় দূর চক্রবালে রাখিয়া, সূর্য্যাস্তের রাঙা আলোয় আলোয়, নতুন-দেশের নব নব পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সে চলিয়াছে! চলিয়াছে! চলিয়াছে! এই ইছামতী জলের মত কালো, গভীর, ক্ষুব্ধ দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ, এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও, যেখানে এই রকম সন্ধ্যায় গাছের তলায় বসিয়া উক্ত বিলাতযাত্রী লোকটির মত সেও সুন্দরমুখ পার্সী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে—চাল্‌তে-পোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যে!

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশে বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে, চীনসমুদ্রের মধ্যে আজকার এই মন-মাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবু ডুবু হইলে "আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ"-এ পঠিত নাবিকদলের মত সেও জালি-বোটে করিয়া সমুদ্রের মধ্যের ডুবো-পাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগলী শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে!...ওই তুঁতে রংএর মেঘের পাহাড় যেখানে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়াছিল—ওরই ওপারে সে সব নীল-সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারবর্ষী প্রান্তর, জেলেখা, সরীমু, গ্রেস্ ডার্লিং, জুটফেন, গাং-চিল পাখীর ডিম আহরণরত সে সব সুশ্রী ইংরাজ বালক বালিকা, সোনাকর যাদুকর বটগাছ, নির্জ্জন প্রান্তরে চিন্তারতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান—তাহার টিনের বাক্সের বই ক'খানা, রাণু-দিদিদের বাড়ীর বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলা ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে—সে সব দেশে কোথায় যেন সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—সেখান হইতে তাহারও ডাক আসিবে একদিন, সেও যাইবে!...সেও যাইবে!...

একথা তাহার মনে হয় না সে কোথায় যাইবে? কে তাহাকে লইয়া যাইবে? কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে? আর দিনকতক পরে বাড়ী বাড়ী ঠাকুর পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের কাছে মুখ খাইতে হয়, এত বয়স পর্য্যন্ত যে স্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড় ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সে মূর্খ, অখ্যাত, সহায়সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে কে আহ্বান করিতে যাইবে?

এসব সন্দেহ মনে জাগিলেও হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ, তাহার আশা-ভরা জীবনানন্দ, সকল ভয় সকল সন্দেহকে জয় করিত—কিন্তু এসকল কথা তাহার মনেই ওঠে না। শুধু মনে হয় যে, বড় হইলেই সব হইবে, এখনও তো তত বড় হয় নাই—শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র!

সে হইবে, সব হইবে, দিক দিক হইতে তাহার ডাক আসিবে, সে যাইবেই।

রঙীন্ জীবন-স্বপ্নে ভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে।

সেও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিব্বতের কথা

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল

চির-তুষারাচ্ছন্ন দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত তিব্বত যেমন বিচিত্র, সে দেশের ভাষা ও আচার ব্যবহারও তেমনি বিচিত্র। আকাশচুম্বী হিমাদ্রিপ্রাকার বেষ্টনের মধ্যে লুক্কায়িত দেশটি বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় পৃথিবী-ব্যাপী সভ্যতার তরঙ্গ ইহাকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ দেশের লোক নিজেদের ধর্ম্ম, সামাজিক ও নৈতিক নিয়মাবলী বহুমূল্য রত্নের ন্যায় সাগ্রহে সংগোপনে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিধর্ম্মীর এখনও এদেশে প্রবেশাধিকার নাই। কেহ বাহির হইতে আসিয়া ইহাদের অমূল্য ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ যাহাতে শিখিয়া লইতে না পারে সে জন্য ইহারা সর্ব্বদা বিশেষ যত্নবান। চির-পুরাতন ভাষা ও আচার ব্যবহার সগৌরবে রক্ষা করা ইহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাদের ন্যায় রক্ষণশীল জাতি আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। চট্টগ্রামের তিব্বতীভাষাবিৎ পণ্ডিত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর গোপনে লামার বেশ ধারণ করিয়া তিব্বতে গিয়া সেখানকার ভাষা শিখিয়া গোপনে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ইহা প্রকাশ হওয়ায় তিব্বত গভর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহার গুরু ও আশ্রয়দাতা লামা পেন্-ছেন্-দো-র্জে-ছেন্ (মহামহোপাধ্যায় দো-র্জে-ছেন্) নামক এক প্রসিদ্ধ লামার মৃত্যুদণ্ড হয়। এই গুরু অপরাধের জন্য তাঁহাকে তুষার-শীতল পার্ব্বত্য নদীতে ডুবাইয়া মারা হয়। সে মৃত্যুদণ্ডের করুণ কাহিনী জাপানী শ্রমণ কাওয়াগুচি প্রণীত Three years in Tibet নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে তিব্বতীরা অনেক পশ্চাৎপদ বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহারা তাহাদের জাতীয় গৌরব ছাড়িতে পারে নাই। ইহারা খুব মোটা কাপড়ের পোষাক পরে। সে সমস্ত কাপড় ইহাদের নিজেদের দেশেই প্রস্তুত হয়। চীন দেশীয় বস্ত্রাদিও ইহাদের দেশে আমদানী হয়। চীনেরা ইহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদের এদেশে অবাধ-গতি। মেয়ে ও পুরুষ প্রায় একই প্রকার পোষাক পরে; উভয়েই মাথায় দীর্ঘ বেণী রাখে। মেয়েরা দুইটি ও পুরুষেরা একটি বেণী রাখে। লামারা মস্তকমুণ্ডন করে। মেয়েরা নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরের অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। নানাপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর তিব্বতে পাওয়া যায়; ধনী ও ভদ্রলোকেদের মধ্যে এই সব প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দো-র্জে-ফা-লাম্ (হীরক), পে-মা-রা-গা (পদ্মরাগ মণি), ইন্-ডা-নী-লা (ইন্দ্রনীল মণি), বৈ-ডু-রি-য়া (বৈদূর্য্যমণি) ও য়ূ (এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর) উল্লেখযোগ্য।

ইহাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ মাংস। তন্মধ্যে ইয়াক্-শা (চমরী গাভীর মাংস), ফাক্-শা (শূকর মাংস) লুক্-শাই (মেষের মাংস) প্রধান; ছা-তে-শাও (মুরগীর মাংস) চলন আছে। কাঁচা মাংস পেঁয়াজাদি মশলা সংযোগে শুকাইয়া লইলেই উপাদেয় খাদ্য হয়। ছা থাঙ্, ছাঙ্ (চা ও মদ্য) ইহাদের প্রধান পানীয়। জল ইহারা ঠিক পানীয়রূপে ব্যবহার করে না। ইহাদের দেশে ছা-বাক্ অর্থাৎ চায়ের এক প্রকার জমাট-করা ইষ্টক পাওয়া যায়, তাহা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চা প্রস্তুত হয় এবং তাহার সহিত মাখন ও ৎচাম্-পা (এক প্রকার ছাতু) মিশ্রিত করিয়া ভোজন করে। সাধারণ লোকের ভোজন পাত্র একপ্রকার কাঠের বাটি। ইহারা আহারের পর ভোজন পাত্র ধৌত করে না; ইহাদের বিশ্বাস যে ভোজন পাত্র ধৌত করিলে সৌভাগ্যহানি হয়। স্নান ইহারা করে না বলিলেই চলে। কেহ মাসান্তে, কেহ তিন মাস অন্তে, কেহ ছয়মাস অন্তে একবার স্নান করে। কাওয়াগুচি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন তিনি কোন কোন তিব্বতীকে বৎসরান্তে জন্মদিনে একবার স্নান করিতে দেখিয়াছেন।

ইহারা কিন্তু প্রতিদিন সাবান দিয়া মুখ ও হাত পা পরিষ্কার করে।

তিব্বতে বিবাহপ্রথা অতি বিচিত্র। এক পরিবারভুক্ত যে কয় ভাই থাকে তাহারা সকলে একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে। সচরাচর পাঁচ ছয় ভাইয়ের একটি মাত্র স্ত্রী থাকে। ইহাতে নাকি সংসারের সুখশান্তি বজায় থাকে। তিব্বতী পরিবারে স্ত্রীর প্রাধান্য খুব বেশী। স্বামীগণকে সর্ব্বদা স্ত্রীর শাসনাধীনে থাকিতে হয়। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী সাধারণতঃ বয়সে বড় হয়। স্ত্রীরা অধিকাংশ স্থলেই সাক্ষাৎ চণ্ডিকা-রূপিনী; সামান্য কোনও প্রকারে অসন্তুষ্ট হইলে স্বামী বেচারার আর নিস্তার নাই। স্ত্রী হয় ত তৎক্ষণাৎ গৃহ অন্ধকার করিয়া বাহির হইয়া যাইবেন এবং স্বামীকে শত সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। স্বামী বা স্ত্রী স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। কখনও কোন কোন ব্যক্তি ঘরজামাই হইয়া স্ত্রীর বাড়ীতেই বাস করে, স্বগৃহ হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। লামাদের বিবাহ নিষিদ্ধ।

তিব্বতে স্কুল বা কলেজ নাই; যাহা কিছু গোম্-পা তে (মঠে) লামাদিগের নিকট হইয়া থাকে। তিব্বতী সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম্ম-বিষয়ক। ব্যাকরণ, গণিত ও জ্যোতিষাদির গ্রন্থও আছে। নাটক যাহা কিছু তাহা প্রায়ই ধর্ম্ম-বিষয়ক। লেগ্-শে অর্থাৎ নীতি বচন সংক্রান্ত আমাদের চাণক্য নীতি প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থাদিও আছে। নাম্-থার অর্থাৎ মহাত্মাগণের জীবনী ও ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থাদিও পাওয়া যায়। পত্র ব্যবহার সম্বন্ধে ঈগ্-কুর-নাম্-শা নামক বিস্তৃত গ্রন্থাবলী আছে। তিব্বতী পত্র লেখা একটি আর্ট বিশেষ। ভাষার আড়ম্বর খুব বেশী; উচ্চ সমাজে প্রচলিত বা সরকারী চিঠি পত্রের ভাষা সাধারণ লোকে বোঝে না। এই প্রবন্ধের শেষে একখানি তিব্বতী চিঠির প্রতিলিপি ও অনুবাদ দেওয়া হইল। তিব্বতের সাহিত্য-সম্পদ কম নহে। কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তিব্বতী গ্রন্থ প্রায়ই হাতে লেখা। ইদানীং তিব্বতে দুই একটি ছাপাখানা হইয়াছে শুনা যায়। রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য তিব্বতী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাস মহাশয় Clacutta University Libraryতে দান করিয়া সে পুস্তকগুলি রক্ষার সুব্যবস্থাই করিয়াছেন। তিব্বতীলিপি দুই প্রকার, উ-চেন্ (মাত্রাযুক্ত) ও উ-মে (মাত্রাহীন)। গ্রন্থাদি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে উ-চেন্ অক্ষর ব্যবহৃত হয়, চিঠিপত্র ও সরকারী কার্য্যাদিতে উ-মে অক্ষর ব্যবহার করা হয়। দুই প্রকার অক্ষর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উ-চেন্ অক্ষর কতকটা সংস্কৃত অক্ষরের ন্যায়। প্রবাদ আছে পুরাকালে তিব্বতাধিপতি রাজা সোঙ্-ৎচেন্-গাম্-পো কয়েকজন তিব্বতীকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া তিব্বতী-লিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কথিত ভাষা আবার পাত্রভেদে দুই বা তিন প্রকার। সাধারণ লোকের সহিত কথোপকথনে এক প্রকার ভাষা প্রযোজ্য; সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আলাপে আর এক প্রকার এবং বিশিষ্ট লামা বা রাজপ্রতিনিধির সহিত আলাপে অন্য এক প্রকার ভাষা ব্যবহার হয়। একস্থলে আর এক ভাষা প্রয়োগ করিলে অভদ্রোচিত ও শ্রুতিকটু হয়। সাধারণ ও বিশিষ্ট ভাষার পার্থক্যও সামান্য নহে। যথা—

	সাধারণ	সম্ভ্রান্ত	বিশিষ্ট
যাওয়া	ডো-ওয়া	ফেব্-পা	ছিব্-গ্যু-নাঙ্-ওয়া
হাত	লাক্-পা	ছাক্	...
বলা	সের্-ওয়া	সুঙ্-ওয়া	কা-নাঙ্-ওয়া

কথাবার্ত্তাতেও formalityর চূড়ান্ত দেখা যায়। দুইজন ভদ্রলোকের পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ এইরূপ।

বিদায়-গ্রহণকারী—থা-গোঙ-পা-শু-গী-ইন্ থা-লে-শু-দেন্-জা (তবে এখন বিদায়, আরামে বসিয়া থাকুন।)

যে বিদায় দিতেছে।—আ-খা-লে-ছিব-গ্যু-নাঙ ফেব-লাম-লা-থু-রিগ-দজো। (ধীরে ধীরে গমন করুন। পথে সতর্ক হইবেন।)

বিদায়গ্রহণকারী।—লা-সো-থু-ছে-নাঙ-দা-মে (যে আজ্ঞে ধন্যবাদ; ব্যস্ত হইবার দরকার নাই।) চোর দস্যুসমাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল দেশে এই প্রকার বিদায় সম্ভাষণ অস্বাভাবিক নহে।

বিচিত্র দেশের বর্ষগণনাও বিচিত্র। বর্ষচক্র (নো-খোর্) দ্বাদশটি জন্তুর নামে অভিহিত; যথা মূষিক (ছি-ওয়া); বৃষ (লাঙ্); ব্যাঘ্র (তাক্); শশক (ইয়ো); রাহু (ডুক্); সর্প (ডুল); অশ্ব (তা), মেষ (লুক্); মর্কট (টে); পক্ষী (ছা); সারমেয় (খী) ও শূকর (ফাক্)। বর্ষগণনার সময় ইহার সহিত আর পাঁচটি পদার্থের নাম সংযোগ করা হয়; যথা দারু (শীঙ্); অগ্নি (মে); ক্ষিতি (সা); লৌহ (চাক্) ও অপ্ (ছু)। দারু-মূষিক (শীঙ্-ছি), দারু-বৃষ (শীঙ্ লাঙ্), অগ্নি-ব্যাঘ্র (মে-তাক্) অগ্নি-শশক (মে-ইয়ো) এইরূপে বর্ষের নামকরণ হয়। ১০ম বর্ষের পর দারু-সারমেয় (শীঙ্-খী), দারু-শূকর (শীঙ্-ফাক্) এইরূপ গণনা চলে। ষাট বৎসর পরে দুইটি চক্র একত্র শেষ হইয়া একটি বৃহচ্চক্র (লোঙ্-খাম) সম্পূর্ণ হয় এবং পুনরায় দারু-মূষিক (শীঙ্-ছি) বৎসর ফিরিয়া আসে ও একটি নূতন লোঙ্-খাম্ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান ইং ১৯২৫ সাল তিব্বতী দারু-বৃষ (শীঙ্-লাঙ্) বৎসর। মাস গণনা ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদিরূপে করা হয়।

তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের ভাষায় "ঈশ্বর" শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই। যেখানে "ঈশ্বর" শব্দ ব্যবহার্য্য সেখানে তাহারা কোন্-ছোক্-সুম্ বা কোন্-ছোক্ বা ছোক্-সুম্ শব্দ ব্যবহার করে। ইহার অর্থ ত্রিরত্ন বা তিনটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ)। ইহারা বুদ্ধের তিনটি প্রধান অবতার বিশ্বাস করে, তাঁহারা তিনটি দেবতা (রীগ্-সুম্-গোম্-পো) বলিয়া পরিগণিত। তাঁহাদের মধ্যে জাম্-য়্যাঙ্* (মঞ্জু ঘোষ) চীনের সম্রাটরূপে, চেঁ-রে-সী* (অবলোকিতেশ্বর) তিব্বতের দালাই লামারূপে এবং ছাক্-দোর্* (বজ্রপাণি) টা-শী-লুম্-পো নামক মঠের প্রধান লামারূপে বিদ্যমান। তিব্বতী শাস্ত্রমতে জীব ছয়প্রকার—হ্লা (দেবতা), হ্লা-মা-ইন্ (দেবতার নীচে একপ্রকার জীব), মী (মনুষ্য), থুইন্-ডো (তির্য্যক্ প্রাণী, পশু পক্ষী ইত্যাদি), য়ী-দাগ্ (সরু গলাবিশিষ্ট একপ্রকার প্রকাণ্ড প্রাণী, তাহারা চিরনরক ভোগ করে) এবং ঞাল্-ওয়া-পা (নরকের জীব)। ইহাদিগকে ডো-ওয়া-রিগ্-ঠুক্ বলে। রিক্-সুম-গোম্ পো ও ডো-ওয়া-রিগ্-ঠুক্ এর প্রীতি সাধন জন্য ছো-থার্ প্রতিষ্ঠাদি নানাপ্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়া করা হয়। ছো-থার নানাপ্রকার মন্ত্রাদি লিখিত একপ্রকার প্রকাণ্ড নিশান। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ভুটিয়া পল্লীতেও দেখা যায়। স্তব স্তোত্রাদির মূলমন্ত্র সংস্কৃত ষট্বর্ণ (ঈ-খে-ঠুক্) "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" (তিব্বতী ভাষায় ওঁ-মা-নি-পে-মে-হুঁ), তিব্বতী প্রার্থনাচক্র (মা-নি-খোর্-লো) মঠের চূড়ায় ও লামাদের হাতে হাতে ঘূর্ণিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বার এই মন্ত্র জপের সহায়তা করে।

সংস্কারের তাড়নায় প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে লামাধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। তিব্বতাধিপতি দালাই লামা রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মানুশাসনের একমাত্র অধিকারী। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই তিব্বতের ধর্ম্ম। কোন তিব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলে—খোন্-ৎছোই-ছো-লু-থা-রে-রে? (আপনাদের ধর্ম্ম কি?), সে তৎক্ষণাৎ বলিবে—তা-লা-ই-লা-মে-ছো-রে (দালাই লামার ধর্ম্ম)। দালাই লামা বুদ্ধের অবতার ও প্রতিনিধি। তিনি লাসায় বাস করেন। গিরিশৃঙ্গ-স্থিত তাঁহার রাজপ্রাসাদের নাম ৎচে-পো-তা-লা। তাঁহার গ্রীষ্মাবাসের নাম নোর্-বু-লিঙ্। তিনি তিব্বতের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা। তাঁহার একটি মন্ত্রীসভা (কা-শাক্-হেলন্-গ্যে) আছে; তাহাতে একজন প্রধান মন্ত্রী (কা-লোন্) ও অন্য চারি জন মন্ত্রী (শা-পে) থাকেন। তদ্ব্যতীত কার্য্যাধ্যক্ষ (দ্জাক্-সা), কোষাধ্যক্ষ (ছান্-দ্জো), হিসাব-রক্ষক (ৎচী-পোন্), প্রধান সেনাপতি (দা-পোন্) প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণও আছেন। প্রত্যেক জেলায় এক এক জন শাসনকর্ত্তা (দ্জোঙ্-পোন্) থাকেন। জজ (মী-পোন্), ম্যাজিষ্ট্রেট (ঠিম্-পোন্), পুলিশ (কোর্-চাক্-পা) প্রভৃতি রাজ্যশাসনের কোন অঙ্গেরই অভাব নাই।

তিব্বতী মঠের জীবন অতিশয় কঠোর। বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর এক পা এদিক ওদিক হইবার যো নাই।

---

* এই শব্দগুলি ও অন্যান্য তিব্বতী শব্দ উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইল। তিব্বতী বানান অতি অদ্ভুত, সেইজন্য তাহা লিখিত হইল না। উপরোক্ত তিনটি শব্দের বানান এইরূপ। স্পান্-রস-গসীগস (চেঁ-রে-সী), আজম-দবাঙস (জাম্-য়্যাঙ্), ফাগ-দর্োর (ছাক্-দোর্)।

এক এক মঠে চারি পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত লামা ও ছাত্র থাকে শুনা যায়। মঠের অন্তেবাসীগণকে ঋষিদের আশ্রমের ব্রহ্মচারী শিষ্যদের ন্যায় থাকিতে হয়। অধিকার ভেদে ছাত্রগণকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা, এন্-ছুঙ্, গে-ৎছুল্, গে-লোঙ্ ইত্যাদি। মঠের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার পুস্তক আছে। রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র নিশীথে হইলেও গে-লোঙ্‌কে তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিতে হইবে এবং স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে প্রার্থনাবেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে।

কো-লাম্-তোন্-থেন্-ক্রৌঙ্-জে-ছেম্-বো-দাগ্-লা-গোঙ্-সু-সোল্।

কো-তোন্-পা-থৃ-জে-ছেম্-বো-দাগ্-গে-লোঙ্-গি-ড়ল্-ঠিম্-ঞি-গ্যা-ঙাপ-চু-সুম্-সুঙ নু-পে-ছাম্-পা-দজে-থু-সোল্। লু-থার-লা-মী-গা ওয়া-থাঙ্-রোল্ মো-থাঙ্-থার্-লা-সোক্-পা থাঙ্-জিক্-তেন-কি-দো-য়োন্-লোঙ্-ছো লা-মা-ছাক্-পা-দজে-থু-সোল।

হে পরম করুণাময় গুরুদেব, অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। হে দয়াময় প্রভু, তোমার কৃপায় অধম যেন গে-লোঙের দুইশত তিপ্পান্ন নিয়মাবলী পালন করিবার শক্তি পায়। অপবিত্র-নৃত্যগীতে যেন আসক্ত না হই, নৃত্যগীতাদি ও ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা হইতে আমাকে নিবৃত্ত কর। পরে এই বলিয়া প্রণাম করিবে—

ক্যো-ছোক্-চু-থৃ-সুম্-কি-সাঙ্-গ্যে-থাঙ্-জাঙ্-ছুব্-সেন্-পা-থাম্-চে-দাগ্-কি-থৃ-পে-সোল্-দেব্-দী-লা-গোঙ্-সু-সোল্।

হে দশদিক ও তিনকালের পবিত্র দেবতা (বুদ্ধ), হে সিদ্ধ পুরুষগণ, আপনারা সকলে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

এইরূপে প্রত্যূষের প্রথম ঘণ্টা না বাজা পর্য্যন্ত স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ করিতে থাকিবে। প্রত্যূষে ঘণ্টা পড়িলে সকলে উঠানে সমবেত হইয়া মুখ হাত ধোয়াদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবে। তারপর প্রথম আহ্বান বাঁশী বাজিবামাত্র সকলকে প্রার্থনামন্দিরে সমবেত হইয়া আপন আপন স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিতে হইবে। লামাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর পুলিশের কার্য্যের ভার থাকে, তাঁহারা বেত হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় আসন করিয়া বসিতে হইবে। অসাবধানে পায়ের নিম্নভাগ কোনপ্রকারে দেখা যাইবে না; উপরের অঙ্গের পোষাক আসন স্পর্শ করিবে না। সকলে নিস্তব্ধে বসিবে। এই সব নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই তৎক্ষণাৎ শে-ঙোর চাবুক পিঠে পড়িবে। তার পর বাঁশী বাজিলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে স্তবগান করিবে। স্তবপাঠের পর সকলকে চা দেওয়া হয়। চা পানের পূর্ব্বে আবার প্রার্থনাদি ও "ছা-ছো", "তো-ছো" নামক ক্রিয়াদি আছে; উৎসর্গ না করিয়া ও ভূতপ্রেতাদিকে আহার দান না করিয়া পান করিবার যো নাই। পরে ছুটি হয়, তখন সকলে আপন আপন কক্ষে ফিরিয়া যায়।

প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সূর্য্যোদয়ের সময় গে-লোঙেরা মাথার টুপি খুলিয়া ডান হাত সেলাম করিবার মত করিয়া তুলিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া গান করে।

উ-সের্ চেন্-মা-খে-শার্-ছুঙ্-ঙো
গা-ওয়ে ঞী-মা-শার্-ছুঙ্-ঙো।

কিরণময়ী দেবী ঐ উঠিয়াছেন। আনন্দময়ী সূর্য্যদেবী ঐ উঠিয়াছেন। (তিব্বতী ভাষায় সূর্য্য স্ত্রীলিঙ্গ)। তারপর এইরূপে সূর্য্যের স্তব করে—।

খ্যোন্-কি-ৎছেন্-ঠেন্-পা-ৎচাম-গী
জিক্-পা-কুন্-লে-রাব্-তু-ক্যাব্-দজো-চিগ্।
ডোন্-মে-দে-ছেন্-ঞে-বার্-জোন্-পা-য়ী
হ্লা-মো-উ-সের্-চেন্-লা-ছাক্-ৎছাল্-লো।
সোল্-লো-তো-খো-হ্লা-মো-উ-সের-চেন্
দাগ্-রে-ওয়া-কোঙ্-লা-জিন্-লাব্-ৎচোল।
হ্লা-মো-খ্যো-কি-দাগ্-লা-ক্যাব্-তু-সোল্।
চেন্-সেন্ ছুক্-ঠুল্-থুক্-থাঙ-উল্-ফোঙ-সোক্
ঠাক্-য়াঙ-থোম্-বোই-জিক্-লে-ক্যাব-তু-সোল্।

তোমার নাম স্মরণ করা মাত্র সমস্ত ভয় হইতে তুমি রক্ষা কর। পরমকল্যাণময়ী পুরঃসঞ্চারিণী কিরণময়ী দেবীকে প্রণাম করি। নমো নমো জয় জয় কিরণময়ি দেবি! অধমের আশা পূর্ণ হোক এই আশীর্ব্বাদ কর।

দেবি! অধমকে রক্ষা কর। হিংস্রজন্তু, বিষধর সর্প, বিষ, দারিদ্র্যাদি, উচ্চ গিরিশৃঙ্গের ভয় (উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ভয়) হইতে আমাকে রক্ষা কর।

একটু বেলা হইলে দ্বিতীয় আহ্বানের বাঁশী বাজিয়া উঠে। তখন সকলে একটি বৃহৎ কক্ষে সমবেত হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করে। গে-লোঙ্দের আবার শিষ্য আছে। তাহারা আপন আপন গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করে। তরুণবয়স্কেরা নিজেদের পাঠাভ্যাস করে।

মধ্যাহ্নে তৃতীয় আহ্বান হয়। তখন সকলে সমবেত হইয়া কাঙ্-শাক্ প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়া করে। তৎপরে সকলে আপন আপন কক্ষে ফিরিয়া গিয়া স্ব স্ব দেবতার পূজাদি সম্পন্ন করে ও পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। অপরাহ্ণে পুনরায় চতুর্থ আহ্বানে সমবেত সকলে পূজা অর্চ্চনাদি করে। সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনবার চা পানও চলে। সন্ধ্যার পরে প্রায় সাতটার সময় পঞ্চম আহ্বানে সমবেত হইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি হয় এবং কয়েকটি স্তবপাঠের পর স্ব স্ব কক্ষে ফিরিয়া গিয়া সকলে শয়ন করে। এইরূপে মঠের ভিতর লামাদের কঠোর জীবন যাপিত হয়। বহির্জগতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক খুব কমই থাকে। যাহারা লামার ব্রতগ্রহণ করে তাহাদের জীবন মন্ত্রচালিতের ন্যায় তিব্বতী মঠের শাসনে অতিবাহিত হয়।

তিব্বতী পত্র ব্যবহার পদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ একখানি চিঠির প্রতিলিপি ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল। *

লেগ্-ছে-পাল-গী-ঙোন্-পার্-থো-ওয়া-চী থ্যাব্-সা-হেব্-বা-দুর্-সি-আই-ই-ছোক্-কি-ঠুঙ্-থু।

থেঙ্-গে-ওয়ে-ছার্-য়্যাঙ্- রীঙ্-মো-ঞী-নে-ঙাক্-সার্-ও-পে-লেগ্-ছে-ছু-খুর্-তুক্-পোই-ফা-খাম্-থু-তী-ওয়া-কু- ৎছো-ঙা-য়্যাঙ্-গ্যা-সা-ছোক্-তু-তে-শীঙ্- লু-কুন্-খেন্-পে-দ্জে-সাঙ্-কি-য়্যার্-ঙা- ডোক্- শীন্-পার্-ঞে-ছার্-গ্যান্-ৎচের্- ফেব্-শু-ঈ-টোই-পাল্- য়োন্-থাম্-পার্-গ্যার দির্-য়্যাঙ্-দে-শীঙ্-তেন্-সী-শাব্-দেক্-লা-ৎচোন্-পারছী- জুঙ্-গ্যুর্-থুকি-ছার্-আঙ্-লেগ্-ছে-কি-ছুক্-ঙোক কু-ৎছো- য়ুন্-থার্- লিঙ্-ওয়ে সাব্-শে-থাঙ্- কুন্ তু-গে-ওয়ে-সুঙ্-ছি-কি-রিম্-পা-আঙ্-থাল্-ফাব্-নাম্-শিই-গ্যান্-তার্-ছে-মে-ৎচোল-ওয়া-শু-তেন-হ্লা-জে- সা-দা-শো-খোর্-চে- ৎছে-সাঙ্-পোর-ফুল্।

ছান্-দ্জো-নে।

সুকৃতি গৌরবান্বিত মহামহিম চী-থ্যাব্ (প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ) সাহেব বাহাদুর, সি, আই, ই, শ্রেষ্ঠ সমীপেষু।

আজ এই শুভলগ্নে সুদূর হইতে পুঞ্জীভূত জলধর-শিখরাবলম্বী আপনার প্রশংসার্হ সুকৃতিনিচয়, দিগন্তব্যাপী সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় বিস্তীর্ণ যশোরাশি, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনিত সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ডের অভিজ্ঞতাসূচক সদনুষ্ঠানাবলী ও সঙ্ক্ষেপে আপনার গ্যান্-ৎচে (দেশের নাম) উপনীত হইয়া অবস্থানের সংবাদ (আমার) হৃদয়ের অকপট আনন্দ গৌরবে পরিণত হইয়াছে। এখানেও সমস্ত মঙ্গল। যথাসাধ্য ধর্ম্ম ও রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত আছি। এই ঋতুপরিবর্ত্তনের সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আধার আপনার স্বাস্থ্য চিরযত্নে রক্ষা করুন। সর্ব্বদা ধীরগামিনী চারিটি নদীর স্রোতঃপ্রবাহের ন্যায় আপনার কল্যাণকর প্রসঙ্গপ্রবাহ (পত্রসমূহ) প্রার্থনা করি। দৈব বস্ত্র ও এক শো স্বর্ণ উপহার সহ কোষাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক শুভদিনে নিবেদিত হইল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

* এই চিঠিখানি টাশীলামার পক্ষ হইতে তৎকালীন Gyantseর British Trade Agent Major W. F. O'Connor C. I. E. পাইয়াছিলেন (Letter no 7 in Examples of Tibetan Letters by E. H. C. Walsh. I. C. S.)। Mr. Walsh ছু-খুর্ শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন jar of water. ছু-খুর্ শব্দের অর্থ জলের (ছু—জল; খুর্-ওয়া—বহন বা ধারণ করা) অর্থাৎ মেঘ। সেইরূপ য়্যার-ঙা শব্দের অর্থ করিয়াছেন Summer drum; প্রকৃতপক্ষে য়্যার-ঙা বলিলে মেঘগর্জ্জন বুঝায় (য়্যার-কা-গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল; ঙা-ঢাক)।

পত্রের শেষভাগে যে চারিটি নদীর উল্লেখ আছে তাহা—সিন্ধু, গঙ্গা, সাত্‌লেজ ও ব্রহ্মপুত্র (ৎচাঙ্-পো)। "শো" প্রায় ৯০ গ্রেণ ওজন। দৈববস্ত্র বলিলে তিব্বতী খা-তা বুঝায়। ইহা গলাবন্ধের ন্যায় একটি দীর্ঘ রেশমী বস্ত্রখণ্ড; মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা নানা বর্ণের নানা প্রকার হয়। প্রত্যেক চিঠির সহিত কোন মাঙ্গলিক চিহ্ন ও উপহার পত্রবাহকের হাতে প্রেরণ করা তিব্বতের রীতি।

ফিল্ম

শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র

আমেরিকার দুর্ভাগ্য এই যে,তার সরস্বতীর বেদী শূন্য। সেখানে শেক্‌সপিয়ার হয় নি, হচ্ছে না। কারণ, যে দেশে সরস্বতীর আদর অর্থের জন্য সে দেশে সরস্বতীর প্রকাশ নেই। কোটি টাকা খরচ ক'রে আমেরিকান শেক্‌সপিয়ারের বই কেনে, অথচ শেক্‌সপিয়ারের ধার ধারে না। তার ক্রয়ের অর্থ speculation। অন্যান্য দেশবাসীদের প্রবৃত্তির সন্ধান আমেরিকান খুব আগে পায়, তাই আজকে দশ পাউণ্ড দিয়ে কেনা শেক্‌সপিয়ারের হস্তলিপি দশ বছর পরে সে দশ সহস্র পাউণ্ডে বিক্রী করে। স্পষ্টতঃ, তার অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য আর্টের প্রেম নয়—investment।

আমেরিকার এই দুর্ভাগ্যের চেয়েও বেশী মারাত্মক তার দুর্বৃত্তি! সরস্বতীর ক্ষেত্রে আমেরিকান 'সেঠ' মাস-প্রোডাক্‌শ্যানের নিয়ম চালায়, ব্যাপারের কৌশল দেখায়। এতে তার লাভ খুবই হয়, কিন্তু আর্টের হয় ক্ষতি। তার দুর্বৃত্তি ক্রমশঃ উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক (অন্ততঃ musical comedy) নষ্ট করল। তারপর এল ফিল্ম। ফিল্মের কথা আলাদা। উপন্যাস কিংবা নাটকের জন্ম আমেরিকায় হয় নি। কিন্তু ফিল্মের জন্ম, বিকাশ এবং মৃত্যু তিনটিই ঘটেছে আমেরিকায়। মজা এই যে ফিল্মের এই ত্রিবিধ অবস্থার জন্য দায়ী আমেরিকানদের দুর্বৃত্তি।

ফিল্মের জন্ম হয় কৌতুকে। হঠাৎ যখন ফিল্ম ক্যামেরার আবিষ্কার হ'ল তখন সকলে ভাবলে—"বাবা, কি আশ্চর্য্য এই যন্ত্র!" একজন লোককে কলা খেতে দেখলে তাদের খুবই আনন্দ হত; এবং রাস্তায় একজন লোককে প'ড়ে যেতে দেখে হাস্যের সীমা থাকত না। এইটা খুবই স্বাভাবিক। গতির আকর্ষণ প্রবল। আমরা সকলে কখনও কখনও আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গতিশীল (!) চেহারা

চার্লি চ্যাপ্‌লিন্‌ অভিনয়ের অর্দ্ধাংশ দর্শক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করেন। যে আবেগ দর্শকেরা উপভোগ করে তিনি তার ইঙ্গিত মাত্র দেন। তিনি তেমন বিশেষ কিছু মুখ-ভঙ্গী করেন না, কিন্তু ফল খুব বেশী রকমই হয়, ঘটনা পরম্পরার পরিণতি আমাদের মনের মধ্যে ঠিক সঙ্কেতটি জাগিয়ে তোলে।

দেখি। শিশু আর একজন শিশুর বিকৃত মুখ দেখতে ভালবাসে এরই জন্য। কিন্তু এটা খুবই প্রাথমিক। গত মহাযুদ্ধের আগে সব ফিল্মই প্রাথমিক, কৌতুকময়। Douglas Fairbanks তখন ঘোড়ায় চ'ড়ে তীর ছুড়তেন (ইনি এখনও তাই করেন) এবং "Charlie Chaplin threw custard pies"। তারপর এল যুদ্ধ। সমস্ত য়ুরোপ সংগ্রামে নিরত এবং আমেরিকা আমোদের উপাদান-সঞ্চয়ে। যুদ্ধের পর দেখা গেল যে, আমেরিকা ফিল্ম-সংসারে য়ুরোপের ঢের আগে। লোকেরাই ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করল। তারপর আমেরিকা নিকৃষ্টতম দুর্বৃত্তির সৃষ্টি করল। কয়েকজন আমেরিকান য়ুরোপে এসে সুন্দরী মহিলাদের খুঁজে বের ক'রে নিয়ে গেলেন আমেরিকায়। এদের মধ্যে কেউ দোকানে কাজ করতেন, কেউ স্কুলে পড়তেন। এদের নাক-কান-চোখ-মুখ-পা দেখিয়ে আমেরিকানরা আবার এক কাণ্ড করল। সৌন্দর্য্য জিনিষটাকে standardise ক'রে এরা বের করল sex-appeal। এই boomটাও থাকল কিছু দিন। সম্প্রতি এরও শেষ হ'য়ে গেছে। এখন আমেরিকান আবার এক কাণ্ড তৈয়ার করেছে —talkies, singies, speakies, squeakies। কিন্তু আর কত দূর? এর পর আমেরিকায় ফিল্মের কোন ভবিষ্যৎ নেই। টকীজ থাকবে বছর দুয়েক। আমেরিকা তার দুর্বৃত্তি দিয়ে পোষণ করল ফিল্মকে; এই দুর্বৃত্তিই হ'ল ফিল্মের সমাধি।

আমেরিকান ফিল্ম পরিচালকদের মধ্যে চার্লি চাপ্‌লেনই শ্রেষ্ঠ। এই চিত্রটিতে (Gold rush) চার্লি চাপ্‌লেনের মুখে ভীতি যেমন সুন্দর ফুটে উঠেছে অপর লোক দুটির মুখে তেমনি সুন্দর ফুটেছে লোভ এবং লালসা। চার্লি চাপ্‌লিন তার নিজের সমস্ত ফিল্মের পরিচালক।

এই কথা একজন সমালোচক সুন্দর ভাবে বলেছেন:

'Cinematographs, which began as ingenious mechanical toys, developed suddenly into a means of popular entertainment. At one moment they were little more than glorified magic lanterns; the next, they were crude storytellers of the Wild West; then, as if by some enchantment, they became a vast international industry. When the artists and critics of the world awoke to the truth that what was potentially a new art had been born among them, they were too late. The films had already entrenched themselves in

তখনকার য়ুরোপ বড়ই ক্লান্ত, আমেরিকার সঙ্গে কিছুতেই যোগ দিতে পারল না। তখন আমেরিকা চালাক সেঠের মতন য়ুরোপীয়দের জন্য নিছক bathosএর ফিল্ম সৃজন করল। অর্থাৎ যুদ্ধের দৃশ্যসহকারে মা-বাবা-ছেলে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু বিজনিত দুঃখের অসংযত প্রবাহের দ্বারা য়ুরোপীয়ন-দের টাকা লুটল। যখন মন দুঃখে পরিপূর্ণ থাকে তখন আর্টের আলোচনা খুব কম লোকই করে। ফলে, য়ুরোপীয় মা তার মৃত ছেলের দুঃখ স্পষ্ট ক'রে দেখলে ফিল্মে। কিন্তু এই "দুঃখ-নিবেদনের" পেশা বেশী দিন চলল না। য়ুরোপীয়

error ; a great barrier of financial success had been erected between them and genuine experimentalists ; the history of the growth of every other art had, in this instance, been reversed ; and there seemed to be no way of return to first principles.

Since then persistent attempts have been made to return, but they have all been harassed by the popularity of the screen as it is. The chief reforms have, in consequence, not been æsthetic, but mechanical. Photography, lighting, and arrangement have greatly improved. Films are more elaborate, fuller of ingenious tricks, in all respects smoother and more accomplished than they were ; but, except here and there, the direction of their artistic purpose is unchanged."

২

আমেরিকানদের প্রথম ভুল হ'ল এই যে, তারা গতির অর্থ বুঝতে পারলে না ; ফিল্ম এবং ড্রামার তফাৎ ধরতে পারলে না। তারা ভাবলে যে গতিই হচ্ছে তার প্রাণ, ড্রামাই তার উৎকর্ষ। এই দুটোই ভুল।

ফিল্মের আসল গুণ হচ্ছে তার বিস্তার—epic quality, কিন্তু এর অর্থ গতির অসংযত, অর্থহীন পরম্পরা নয়,—তার ছন্দ : Rhythm। এই Rhythmই ফিল্মের প্রাণ, এ-ই ফিল্মের আসল গুণ ; এরই জন্য ফিল্ম ড্রামার চেয়ে বেশী গতিশীল ; আর্ট হিসেবে তার সমকক্ষ।

Romain Rollandএর এক নাটকের নাম হচ্ছে 14th of July। এর হিরো—আসল অভিনেতা—দু একজন লোক নয়, দশ সহস্র লোক !! রলাঁর উদ্দেশ্য জনতার—mobএর—অনুভূতি দিয়ে ড্রামা ফোটান ; জনতাকেই অভিনেতা করা। রলাঁর প্লে সফল হ'ল না, তার মধ্যে মনস্তত্ত্বের বিকাশ হয়েছিল দু একজন লোকের ভেতরে নয়, অসংখ্য লোকের ভেতরে। অর্থাৎ রলাঁর প্লে আসলে ড্রামা নয়, ফিল্ম। তার প্রাণ গতি নয় (তাহ'লে—Douglas Fairbanksএর কৃতি রলাঁর মতনই) কিন্তু গতির ছন্দ।
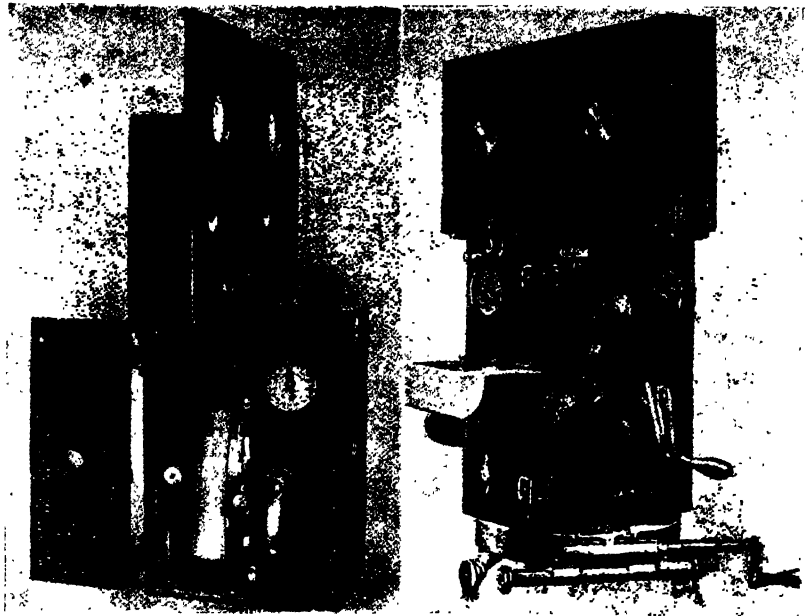
ক্যামেরা—(ক) ভিতরে খোলা ফিল্ম্ (খ) বন্ধ

কোন ড্রামাটিষ্ট্ একটা বড় গরিব পল্লীর দুঃখের বিস্তৃতি, তার পরিধি, ষ্টেজে দেখাতে পারে না। একজনের দুঃখ অন্যের দুঃখের মতন নয়ই, কিন্তু সকলের দুঃখের ভেতরে একটা যেন সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে ফিল্মের প্রাণ—গতির ছন্দ—Rhythm। এর সঙ্গে কত ব্যক্তি-বিশেষের আত্মার ইতিহাস জড়িত হ'য়ে থাকে, সেই হচ্ছে তার ড্রামা। ফিল্ম ড্রামা ছাড়া আরো কিছু, যদি তার মধ্যে এই রকম গতি-ছন্দের প্রকাশ থাকে।

প্রশ্ন ওঠে, এই গতি-ছন্দের সৃষ্টি করে কে? এইখানে আসল কথা। আমি এর স্বাধীন আলোচনা করতে চাই না। আমার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের অবস্থা মনে রেখে ফিল্মের আলোচনা করা।
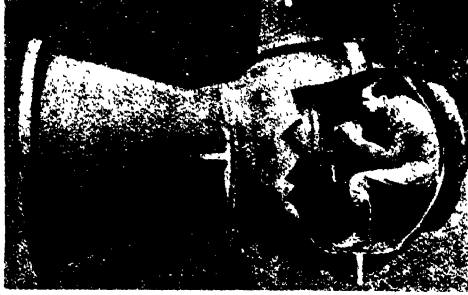
ক্যামেরাওয়ালার ঘর

আমেরিকায় একজন লোক আছে যে সব সময়েই নিজেকে সেখানকার দুর্বৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এর নাম চার্লী চাপলীন। এর মতে, ফিল্মে গতি-ছন্দের আসল স্রষ্টা দর্শক, যেমন ড্রামায় শ্রোতা। ফিল্মে অভিনেতার চরম উৎকর্ষ দর্শকের মধ্যে ভাবের প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করা। এমন উৎপাদন হয় সংযমে। সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা সেই যে অভিনয় করেই না। এই সংযমের দুই ভুজ—স্বাভাবিকতা এবং সরলতা। চার্লীর মত এই যে, মানুষের মন বড়ই কোমল। যেখানে আঙুল বুলিয়ে দিলে কাজ হয়, সেখানে প্রহার করায় কোন প্রয়োজন নেই। অভিনেতা অভিনয় করে না, সত্যের আভাস দেয় তার নিজস্ব সংযত প্রতিক্রিয়ায়। এই প্রতিক্রিয়া প্রতিধ্বনিত হয় দর্শকের মধ্যে।

জার্ম্মানেরা বলে—না, গতিছন্দের আসল স্রষ্টা ক্যামেরা। চার্লী—এদের মতে—একজন বড় অভিনেতা ড্রামার, ফিল্মের নয়। জার্ম্মানরা ক্যামেরাকে দেবতা বলে, 'Close up', 'fakes', 'light-and-shade', 'iris' ইত্যাদি tricks এর পরিচালনায় এরা অদ্বিতীয়। বার্লিন (Berlin) নামের একটা ফিল্ম এরা সেদিন প্রস্তুত করেছে। এতে কেউ অভিনয় করে না। ক্যামেরাম্যান জায়গায় জায়গায় গিয়ে, ক্যামেরা রেখে, ছবি তুলে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করল এবং ফিল্মের নাম দিল—"The symphony of a city"। এই ভৈরব রাগের মূল camera-mechanism; সুতরাং এর গতি-ছন্দ কৃত্রিম, তার প্রবাহ কৌতুকময়, অস্বাভাবিক কখনও, কখন অমানুষিক। চার্লির ভুল হচ্ছে সরল মনস্তত্ত্বের পূজা, জার্ম্মানদের ভুল হচ্ছে ক্যামেরার উপচার এবং বিজ্ঞানের সন্নিবেশ। এরা Psycho-analysis বুঝাবার চেষ্টা করে ফিল্ম দিয়ে; এরা হচ্ছে প্রকৃতিগত অঘোর-পথানুসৈবী।
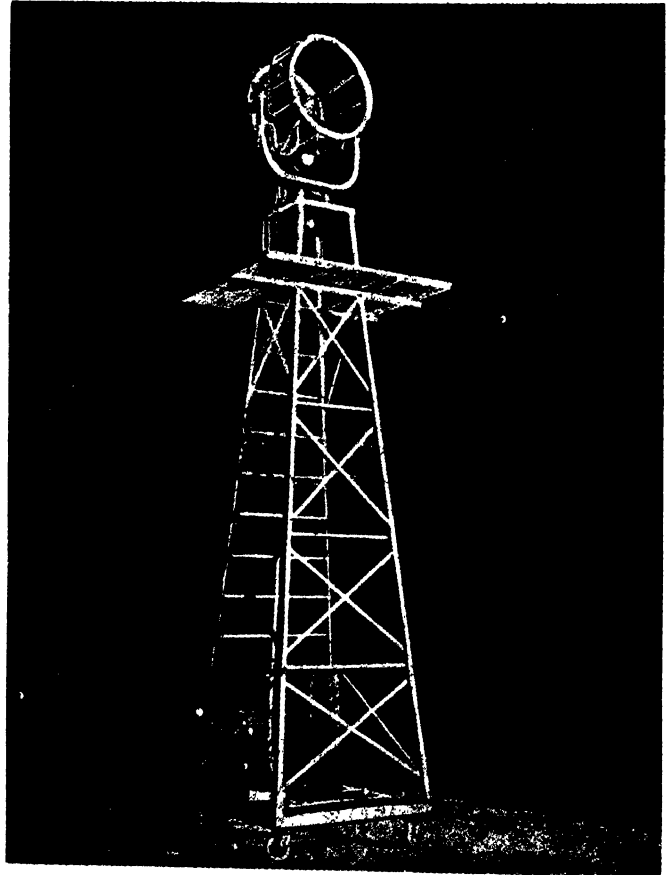
শিল্প-কক্ষের ভিতর আর্ক লাইট—একান্ত প্রয়োজনীয়

রাশিয়ানরা বলে, দুই মানি, ক্যামেরা আর সরল মনস্তত্ত্ব। কিন্তু গতিছন্দের আসল স্রষ্টা হচ্ছে cutting অর্থাৎ ফিল্মের ভেতর দৃশ্য নির্ব্বাচন। এরা ফিল্ম করে দু সহস্র দৃশ্য, কিন্তু দেখাবার সময় অর্দ্ধেক বাদ দেয়। এরা অনেকটা চার্লীর মতের, সংযমে বিশ্বাস করে। তফাৎ এই যে, এরা বলে সংযম অভিনয়ে নয় (অভিনয়ে স্বাভাবিকতা) বরং দৃশ্য নির্ব্বাচনে। অর্থাৎ এরা গতিকেই মহত্ত্ব দেয় সব চেয়ে বেশী।

এই তিনটি স্কুল ছাড়া আর কোন স্কুল নেই। ইংরাজ, ফরাসী, স্বীড প্রভৃতি সকলে এক একটা স্কুলের অনুগামী। যারা বেশী নার্ভাস, যেমন ইংরাজ, তারা তিনটেরই। আমার মতে, রাশিয়নদের স্কুলই হচ্ছে ভারতবর্ষের পক্ষে সব চেয়ে ভাল।

এইখানে ফিল্মগুলি ডেভেলাপ্ করা ও শুষ্ক করা হয়

এইখানে ফিল্মগুলি পরীক্ষা করিয়া কাটা হয়

কিন্তু রাশিয়নরা এমন একটা ভুল করেছে যা আমেরিকান, জার্ম্মান করেনি। এরা নিজের মত প্রকাশের জন্য এতই ব্যস্ত যে, আর্টের হত্যা করতে এদের কোন আপত্তি নেই; অনেক স্থলে করেছেও তাই। সুতরাং এদের উপাদান চমৎকার হ'লেও ভাবটা অনেক সময়ে পঙ্গু। মানসিক স্বাধীনতা এরা হারিয়ে ফেলেছে, তাই পরের উপর স্বাভাবিক অত্যাচার করতে চায় ফিল্মেই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অসংখ্য নরমুণ্ডের চাপে যদি রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু-সহস্রনামের মতন চরখা-মাহাত্ম্য লিখতে আরম্ভ করতেন, আমি বলতাম তাঁর কবিতা পঙ্গু; হ'ক না চরখা ভারতের "ত্বমহি সর্ব্বং!" রাশিয়ানরা তাদের প্রতিভাবান ব্যক্তিকে বলে—বল্‌সেভীজম্ প্রচার কর। এরা করে। আমরা কিন্তু দোষ বাদ দিয়ে গুণই গ্রহণ করব।

৩

রাশিয়ানদের প্রথম গুণ হচ্ছে এই যে, তারা অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর খাতির করে না, তারা একটা মস্ত humbug সৃজন করতে চায় না, তারা একজন সুন্দরী,

মূর্খ, প্রাণশূন্য অভিনেত্রীকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে বছরে একটা বিয়ে এবং তিনমাসে ডিভোর্স করতে প্রবৃত্ত করে না। এরা বলে, ফিল্ম যখন নির্ব্বাক তখন আমাদের কাজ নেই বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে। অভিনয়ের অর্থই হচ্ছে জীবনের প্রতিচ্ছায়া। যদি ঠিক জীবনেই সেই ছায়া আমরা পেতে পারি, কাজ কি তা হ'লে ষ্টার্সদের পুতুল সেজে! অর্থাৎ, ফিল্মের অভিনয় type যত সুন্দর করতে পারে, অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী তত সুন্দর করতে পারে না। রাশিয়ানরা

সমুদ্রতলে ক্যামেরাওয়ালা তার ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে

জীবনের দ্বারে ভিখারী—অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীর সহকারে এরা ভিক্ষা নিতে রাজী ন'ন। এরা সোজা-ভাবেই গ্রহণ করতে চায় সত্যের অংশ, কোন প্রতিবন্ধক এদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। এবং এরা বলে পেশাদার অভিনেতা আর অভিনেত্রী ফিল্মের পক্ষে প্রতিবন্ধক ছাড়া আর কিছু নয়।

এইবার কথা উঠে ডাইরেক্টারের। রাসিয়ান ফিল্মে এরই যা বাহাদুরী। এই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি; এর শ্রদ্ধা সত্য এবং জীবনের জন্য, ক্যামেরা কিংবা ষ্টুডিয়োর জন্য নয়। বলা বাহুল্য, আজকালকার দু একটা উৎকৃষ্ট ফিল্ম রাশিয়ান। মজা এই যে, এই ফিল্মগুলিকে প্রস্তুত করতে এদের বিশালকায়, ব্যয়সাধ্য ষ্টুডিয়োর দরকার হয় নি, ষ্টার্সদের লক্ষ লক্ষ টাকাও দিতে হয় নি। খোলা মাঠে এরা ফোটো তোলে; সাধারণ নর-নারীদের নিয়ে অভিনয় করায়। তারপর ঠিক যেমন একজন কবি তার শব্দশক্তির উপর বিচার ক'রে প্রকাশকের নিকট কবিতা পাঠায়, তেমনি এ-রা কেটে ছেঁটে, অনাবশ্যক, ছন্দহীন দৃশ্য-গুলি বাদ দিয়ে নিজের ফিল্ম সকলকে দেখায়। এদের সৃজনশক্তির ক্ষমতা অসাধারণ; ফিল্মজগতে এরাই ভবিষ্যতের স্রষ্টা।

ভারতবর্ষে এত টাকা নেই যে, একজন খামখেয়ালী-লোক ষ্টার্স তৈয়ারী করবেন; যদি করেন, তিনি নিজের এবং দেশের অকল্যাণ সাধন করবেন। ভারত-বর্ষে এখন দরকার প্রতিভাশালী ডাইরেক্টারের, অভিনেতা-অভিনেত্রীর কোনও প্রয়োজন নয়।

শেষোক্ত বাক্য আমি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছি। আমি জানি যে, আমাদের দেশে প্রতিভাশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব। এখন চারিদিকে যারা চীৎকার ক'রে বলে—'আমি অভিনেতা', তারা মুখাকৃতি-বিকৃতির স্পেসালিষ্ট। লোন চেনী তাদের গুরু; নাক মুখ কানের close up তাদের আর্ট, চুম্বন-আলিঙ্গন তাদের স্বর্গ। এদের দ্বারা ফিল্মের কোন উপকার হবে না।

যদিই-বা কারুর ক্ষমতা থাকে, সমাজ এখন তাকে চেপে রাখবে—এতই আমাদের অসহিষ্ণুতা। সুতরাং আমাদের নির্ভর করতে হবে type এর উপর, অভিনেতা অভিনেত্রীর উপর নয়। অর্থাৎ আমাদের ডাইরেক্টারদের উচিত type খুঁজে বের করা; একজন বিখ্যাত লেখক—কবি—অভিনেতা—সমাজ-সেবীকে আজকে রাম, কাল রাবণ, পরশু পরশুরাম সাজান নয়। আমেরিকানরা তাই করে। আজকে Charles Farell নামের একটি লোক Seventh Heavenএ চিত্তাকর্ষক অভিনয় করল একজন সাধারণ সৈনিক সেজে। ব্যস্, তারপর কাল Farell হ'ল পার্শিয়ার শাহ ("Fazil"-এ), পরশু ইটালির

চিত্রকার। চার্লি চ্যাপলীন আজকে যদি clown সাজে কালকেও clown সাজবে। সে অভিনয়ের মর্ম্ম বোঝে। কিন্তু অর্থ-লোলুপ, পেশাদার, অভিনেতারা এঁর জন্য পরওয়া করেনা। এমন লোক দ্বারা ভারতে ফিল্মের সৃষ্টি হবে না—আমেরিকান ফিল্মের পাশবিক অনুকরণ হবে।

অভিনেতার চরম গুণ আভাস দেওয়া—suggestion। সরলতার মূল্যই সবচেয়ে বেশী; এরা হাতি-ঘোড়া-জাহাজ-এরোপ্লেন দেখে চকিত হ'তে পারে, কিন্তু স্পর্শ করবে এদের রবীন্দ্রনাথের এক লাইন কবিতা; ফিল্মে—তাদের নিজস্ব অনুভূতির আভাস। এমন আভাস সবচেয়ে সরল এবং সুন্দর ভাবে দেবে তাদের মতনই একজন লোক—type।

স্বদেশের ডাইরেক্টার আমেরিকানদের অনুকরণ ক'রে

"Close up" এবং "make up" এর দৃষ্টান্ত। মুখসই প্রকৃত পক্ষে অভিনয় করে, অভিনয়কারী নয়। এই মুখসগুলি প্রকৃত মুখ ভঙ্গিকে বিকৃত ক'রে যে ভঙ্গিটি ফোটাবার দরকার তা ফোটাতে পারেনা। এই ফিল্মটী (The man who laughs) ভিক্টর হিউগোর যে বই থেকে নেওয়া হয়েছে তার সৌন্দর্য্য অতি অল্পই ফোটাতে পেরেছে।

টাকা নষ্ট করতে পারেন, অভিনেতা লোন চেনী ও অভিনেত্রী ডলোরিস ডেল রিও-র প্রাথমিক ভাব-প্রকাশের অনুশীলন ক'রে নিজেকে যথেষ্ট তারিফ করতে পারেন, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু আমার যায় আসে দেশবাসীদের মধ্যে দুর্বুত্তি-উৎপাদনের কথা ভেবে। এইটা হচ্ছে আমার আসল ভয়।

এই suggestion আমাদের মতন চেতনাবিহীন দেশে টাইপই দিতে পারে, পেশাদার অভিনেতা নয়। মনে রাখা উচিত, আমি জনসাধারণের কথা বলছি এবং চেতনাবিহীনের অর্থ not self-conscious। য়ুরোপ কিংবা আমেরিকায় জনসাধারণের অনুভূতি খুবই self-conscious, অনেক সময়ে sophisticated। আমাদের দেশে গ্রাম্য লোকরা প্রকৃতিগত আর্টিষ্ট। এদের কাছে

য়ুরোপ প্রবাসকালে আমি স্পষ্টতঃ দেখ্‌তে পাচ্ছি

যে, এখানকার কতকগুলো নৈসর্গিক অনুভূতি, কতকগুলো সরল সংস্কার অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়েছে। উদাহরণ,—চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা যদি কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ করে ত তার ভঙ্গী স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিকও নয়, ফিল্ম-টাইপের। অর্থাৎ দুশ' তিনশ'বাঁর যা ফিল্মে সে দেখেছে অজ্ঞাতভাবেই সেইটা প্রকাশ পায় তার ভঙ্গীতে। এমন কি অনেক সময়ে যুবক তার প্রেয়সীকে সাধারণ জীবনে সাধারণ কথা না ব'লে ফিল্ম থেকে লাইনগুলো মুখস্ত ব'লে যায়; প্রেয়সী তাকে ঠিক সেই ভাবে চুম্বন করে

"Close up" এ আলোকের ক্রিয়া। ত্রাসের ভঙ্গী বর্দ্ধিত হয়েছে

যেমন একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী চুম্বন করে একজন বিখ্যাত অভিনেতাকে—ফিল্মে। ফিল্ম জীবনের অনুযায়ী নয়, জীবনই অনুযায়ী হ'তে চলেছে ফিল্মের।

এই বিপদের আর একটা দিক আছে। কিছু দিন আগে স্বীডানের সরকার একটা কমিটি নিযুক্ত ক'রে তার রিপোর্ট থেকে জানতে পারলেন যে, বালকদের (চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত) মধ্যে যত চুরির জন্য ধৃত হয়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই চুরি করে সিনেমা দেখবার জন্য। কমিটিতে, আশ্বাসন পাবার পর অনেকে স্বীকার করলে যে, তাদের আকর্ষণের একটা কারণ Sex-promiscuity। ওর জন্য দায়ী ফিল্মের বাহুল্য, ফিল্মের অসংযত অর্থহীন ভাব প্রকাশ।

৪

আমার এত কথা বলবার কোন দরকার হ'ত না যদি না আমি শেরাজ দেখতাম লণ্ডনে। শেরাজে কোনও বড় দোষ নেই, তবে যদি তা থেকেই ভারতবর্ষে ফিল্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে তা হ'লে আমার বলতে বাধে না যে আমরা আমেরিকাকে অনুকরণ করব। এমন অনুকরণের ফলে আমাদের সরল, সাধারণ সংস্কারের উপর ফিল্মের প্রভাব খুবই পড়বে। অর্থাৎ আমরা খুব বেশী sophisticated হ'য়ে পড়ব।

আমার কথার কোন মূল্য নেই যদি আমাদের দেশের ডাইরেক্টার শুধু ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষে শুধু অর্দ্ধ-শিক্ষিত ইংরাজ এবং literate কিন্তু অশিক্ষিত ভারতবাসীদের কথা ভাবেন। কারণ আমি জানি যে, ভারতবর্ষে এখনও সিনেমা ঘর খুবই কম; যা আছে তা শহরে, এবং শহরে সেই টাইপের লোক থাকে যারা চার্লী চ্যাপলীনের চারটি স্ত্রীর নাম মুখস্থ করে এবং ডলোরিসের বয়স কত তা নিয়ে তর্ক করে। সুতরাং স্বচ্ছন্দে আমেরিকানদের অনুকরণ করাই হ'তে পারে ডাইরেক্টারের চোখে 'স্বস্তি'। এইটা ভ্রান্তি।

প্রথমত, ভারতবর্ষের ফিল্ম শুধু যে ভারতবর্ষেই দেখান হবে তা নয়। ডাইরেক্টারদের অভিলাষ থাকা উচিত খুব উচ্চ। য়ুরোপ এবং আমেরিকা ভারতবর্ষের ফিল্ম সহর্ষে গ্রহণ করতে পারে যদি তার মধ্যে কোন নূতনত্ব থাকে, কারণ এই দুটি মহাপ্রদেশের লোক আর ছেলে খেলা চায় না, চায় জীবনের সুন্দর এবং মুক্ত প্রকাশ। এমন কি, সম্প্রতি এরা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতেই ভালবাসে, যন্ত্র এবং ষ্টার্সদের পীড়নে এরা ক্লান্ত। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের ডাইরেক্টার তার ফিল্মে নূতনত্ব আনতে পারে এরা খুব টাকা দিয়ে কিনবে। তবে চাই জীবনের সত্য-প্রকাশ, মতপ্রচার; ধর্ম্মপ্রচার নয়।

এইবার বলতে ইচ্ছা হয়—'সুরসিকেষু fact-নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ"। কিন্তু লিখতে হবেই।

আমাদের দেশে সিনেমা ঘর কত এবং অন্যদেশে কত তার তালিকা এই :

The report of the Indian Cinematograph Committee appointed in October 1927, was issued in August last. Surveying existing conditions it found that the number of permanent working cinema-houses in British India (including Burma) for a population of 247,000 000 was only 300, which is about equal to one cinema for every 803,000 of the population. Great Britain, with 47,000,000 inhabitants, has 3,700 cinemas, and the 120,000,000 people of the United States are provided with 20,500 picture houses. It must not be assumed that in any near future the great vogue of the cinema in Western countries could be reproduced in India. Not only are the people very poor, but the vast majority reside in small villages, where a cinema would not be a paying concern.

A distinction has to be drawn between those picture-houses which appeal mainly to Europeans, Anglo-Indians, and educated Indians, and those which attract the general public. There are a few of the former in each of the big cities, and there are others in cantonments, hill-stations, and in connexion with clubs and institutes. The number of Western cinemas (as they may be described since they show little else but Western films) is at least one third of the total.
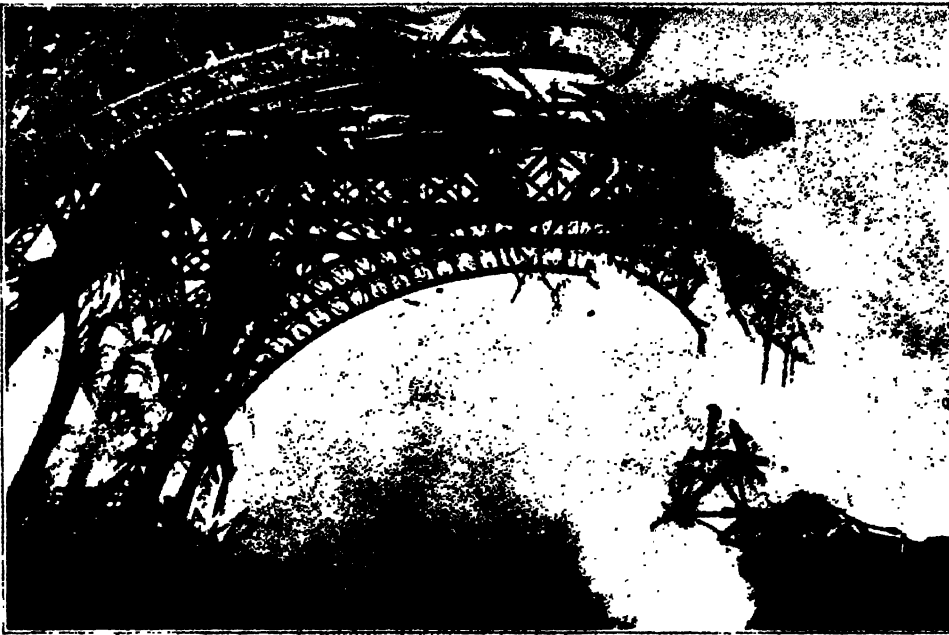
"Fake" এর একটি দৃষ্টান্ত। ফিল্মের জন্য একটি শিল্প কর্মে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের একটি প্রতিকৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে

স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের প্রথম কাজ হচ্ছে সিনেমাঘর তৈয়ারি করা।. সিনেমা-ঘর হচ্ছে ছাপাখানা। ছাপাখানা না

হ'লে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা বোলপুরে গিয়ে কয়জন শুনতাম ? সিনেমা-ঘর না হ'লেও আমরা ফিল্মে আর্টের চরম প্রকাশ করতে পারি—কিন্তু দেশে দেখবে কয়জন ?

আলোক-পাতের ক্রিয়া। ডাইমেন্‌শলাল ফটোগ্রাফির একটা দৃষ্টান্ত

মনে রাখা উচিত যে, আমাদের দেশে সাধারণ গ্রামীণের রুচি যতটা পরিমার্জ্জিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুদের ততটা নয়। ডাইরেক্টারের কষ্টিপাথর হওয়া উচিত গ্রামীণের রুচি। যদি কোন ফিল্মে তার রুচি সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত করা যেতে পারে (ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়া) তা হ'লে আমি বলতে পারি যে, সেই ফিল্মের দাম য়ুরোপে উঠবে।

ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত—গ্রামে। এই অভাবটা হচ্ছে ডাইরেক্টারের জন্য সব চেয়ে বড় পরীক্ষা, তার শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদক।

প্রথমত যখন ফিল্মের বিকাশ হয়নি তখন দৃশ্য-ছবির অভাব শব্দে পূর্ণ করার চেষ্টা হ'ত। যেমন "Came another dawn" (American English for "Next morning"), কিন্তু এখন শব্দের ব্যবহার শুধু continuityর জন্য। একজন বিখ্যাত ডাইরেক্টার বলেছেন, যে ফিল্মে ভাষার প্রয়োগ যত কম তার মূল্য তত বেশী। চালি

শহরের লোকেরা দেখতে পারে কিন্তু তাদের মাথা এখন এতই শূন্য যে, হঠাৎ নূতন জিনিষ দেখলে বুঝতেই পারবে না। তারা সরল জিনিষের অর্থ স্বীকার করতে রাজী নয়; তারা এখনও কৃত্রিমতার আনন্দ উপভোগ করতে চায়; আমেরিকান ফিল্ম দিয়ে করুক্‌!

কতকগুলো travelling সিনেমা-ঘর প্রস্তুত ক'রে দু'চারজন ডাইরেক্টার নূতন এক্‌সপেরিমেণ্ট করতে পারেন। যে দেশে এখনও গান্ধি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সে দেশে রুশিয়ার Eisenstein, Pudookin, জার্ম্মানীর Plalest, Lubitschএর মতন ডাইরেক্টার হওয়া অসম্ভব নয়, যদি আমাদের সাধনা থাকে।

পরিচালকের (Director) নিপুণতা। ক্যামেরার সম্মুখে বিভিন্ন অভিনয়কারীগণকে সংস্থাপন একটি কঠিন ব্যাপার

চ্যাপলীনের ফিল্মের ভাষা হচ্ছে তার অভিনয় এবং গতিছন্দ। একটা জার্ম্মান ফিল্ম—Warning Shadows—(জগতের

ছয়টা শ্রেষ্ঠ ফিল্মের মধ্যে একটা) তা'তে একটাও কথা নেই। অথচ তার গভীর ড্রামা বুঝতে একটুকুও কষ্ট হয় না। মোট কথা এই যে, আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ফিল্মের জন্য একটা সুযোগ। গুজরাতী, বাঙালী, মারাঠী, বিহারী, হিন্দু-মুসলমান সকলে একটা ভাষা বুঝে—ছবিতে ভাবা ভিব্যক্তির।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ড্রামার অর্থ বড়ই অস্পষ্ট। আমরাও অধিকাংশ এ বিষয়ে আমেরিকান। শেরাজ সম্বন্ধে দুচারটি কথা ব'লে নিজেদের ভাব-পঙ্গুতা দেখাবার চেষ্টা করব।

(১) শেরাজ একটা period story, অর্থাৎ আজকালকার জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। তার-পর, তার মধ্যে পরিধির প্রকাশ বড়ই বর্ব্বর। অর্থাৎ ড্রামার ঘনীভূত অংশ ভাল ক'রে না দেখিয়ে দেখান হয়েছে অতি-বিস্তৃত জীবন

অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর পরিবর্ত্তে "type" এর ব্যবহার। একটি রুষ ফিল্মের নমুনা

'Type'এর আর একটি নমুনা। এটি একজন নিপুণা অভিনেত্রী নয়, একটি সাধারণ মেয়েকে এমন সুন্দর আর স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করান হচ্চে

কাহিনী। আমেরিকায় যা দশ বৎসর আগে প্রচলিত তা আমরা আজকে গ্রহণ করলাম। শেরাজকে আমরা শিশু-অবস্থায় দেখতে চাই না। হতে পারে, ডাইরেক্টার ভেবেছিলেন, বড় সাপ দেখে য়ুরোপ নিশ্চয় খুসী হবে।

(২) শেরাজের আসল অভিনেতা তাজমহল এবং আগরার কেল্লা। মানুষের সঙ্গে তাদের যা সম্পর্ক তা হাতী-ঘোড়া বন্দুক-তলোয়ার যুদ্ধ মরুভূমি ইত্যাদির চাপে প্রস্ফুটিত হয় নি। ডাইরেক্টার ভাবলেন, দাও সব দেখিয়ে,—আগরার তাজমহল থেকে আরম্ভ ক'রে রাজপুতানার মরুভূমি,—শিশি শেরাজ থেকে আরম্ভ ক'রে বুড়ো অন্ধ শেরাজ পর্য্যন্ত। Close up, make up (অন্ততঃ সম্রাটের দাড়ী-পরিবর্ত্তনে) কোনটাই বাদ দিলেন না। এমন কি একটি আমেরিকান thrill প্রস্তুত করলেন হাতীর সহকারে। সবইত' হল, আমরা বল্লাম—"সাবাস! কি অদ্ভুত!" কিন্তু ড্রামার

অভিব্যক্তি হয় নি, গতি-ছন্দের প্রকাশ হয় নি, আমরা তামাসা দেখলাম; চকিত হ'লাম, ভাবাভিভূত হ'লাম না।

(৩) শেরাজে চুম্বন এবং আলিঙ্গনের প্রকরণ নিতান্ত অস্বাভাবিক। এই স্থলে, এইবার দুচারটা কাজের কথা বলি।

Warning Shadowsতে একটাও চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন নেই, Wax-Works এও নেই। চ্যাপলীনের Circusএ মাত্র দুএকটা, তা-ও আসল অভিনেতার (চ্যাপলীন দ্বারা) নয়।

আমি এই দুটা ফিল্মের কথা বিশেষ ক'রে বল্‌লাম এই জন্য যে ইংরাজরাও স্বীকার করেছে যে, জগতের শ্রেষ্ঠ ফিল্মের মধ্যে এই দুটি। অনেকে বলে, Wax-Works সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমার বলার অর্থ এই যে, চুম্বন আলিঙ্গন বাদ দিয়ে ফিল্মে সুন্দর ছন্দ-সৃষ্টি হয়। যেদিন লণ্ডনের ফিল্ম সোসাইটিতে বার্কার "মা" (Mutter—directed by Eisenstein) দেখান হ'ল সেদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সব কাগজওয়ালা এই বল্‌ত, "নিকালো, বের কর এই সব ছবি। সব নষ্ট হয়ে যাবে।" এদের ভয়ের মূল ফিল্মের শক্তি। এই ফিল্মে মার ভালবাসা মার আলিঙ্গন আমাদের দেশে কত পবিত্র জিনিষ দেখাবার আছে!

একটি আমেরিকান চিত্র কেমন ক'রে একটি সুন্দর দৃশ্যকে নষ্ট কর্‌তে পারে তার দৃষ্টান্ত; এটি টলষ্টয়ের রিসরেক্সনের একটি দৃশ্য। লোকগুলিকে সাজানো ভাল হয় নি; ক্যামেরা স্থাপন আরও মন্দ হয়েচে

কেউ মনে করবেন না যে, আমি চুম্বন-আলিঙ্গনের বিরুদ্ধে। কিন্তু যে স্থলে আমাদের দেশে এইটা (স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা পক্ষে) পাবলিক নয়—চোখে জনসাধারণ দেখে না, সে স্থলে তার অভিব্যক্তি নিষ্প্রয়োজন, অস্বাভাবিক, অবাস্তব।

Period storyর যুগ চ'লে গেছে। Warning Shadows এর সময় দুঘণ্টা (অবশ্য কথায় নিহিত ড্রামার), আমেরিকান ফিল্ম The Street of Sin (Jannings)—এর সময় দু এক দিন। সত্য এই যে, ড্রামার ঘনীভূত প্রকাশ পাওয়া যায় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একটা যুগ ধ'রে ড্রামা হয় না। শেরাজ ড্রামা নয়, প্রতিভাহীন জীবনকাহিনী।

৪

প্রতিভাহীন কথাটার প্রয়োগ কেন করলাম তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি। একটা খুব ড্রামাটিক মুহূর্ত্তে শেরাজ যায় সেই হাটের দিকে যেখানে তার প্রেয়সী দাসীরূপে বিক্রী হওয়ার জন্য বদ্ধ। শেরাজের মনোভাব কবি ব্যক্ত করতে পারে ভাষার দ্বারা, ড্রামাটিষ্ট কথা এবং অভিনেতার সহায়তায়, ফিল্ম-ডাইরেক্টার অভিনেতা এবং গতির সাহায্যে। এই সুযোগটা ডাইরেক্টার কি ক'রে নষ্ট করেছেন তা স্পষ্ট।

যে সময়ে শেরাজ হাটে পৌছায় সে সময়ে সকলে ব'সে রয়েছে, অনেকের পিঠ ঠেলে শেরাজ সবার আগে গিয়ে বসে। তার মুখ দেখে আমরা যা বুঝতে পারি তাই সব। কোথায় গতিছন্দ? ডাইরেক্টার কি করতে পারবেন, একটা crowd sceneএ একজন বিকল প্রাণীর দুঃখ-প্রকাশ এই ছন্দের দ্বারা কি রকম হ'ত, তার উত্তর আমি একটি উদাহরণের দ্বারা দেব।

ফিল্ম রুশিয়ান। সীন crowdএর। বিকল প্রাণী মা। First-shot—প্রথম ছবি অসংখ্য নরনারীর, তারপর অসংখ্য সৈনিকের সকলেই যেন এক একটা দানব। এরা সকলে চলেছে এক দিকে, তালে তালে। তারপর, third shotএ আমরা দেখতে পাই সেই দৃশ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই পাশবিক সৈনিকদের দলে রয়েছে এক মা। সেও চলেছে সৈনিকদের বিরুদ্ধে। যারা মনস্তত্ত্বের একটুকুও জানেন তারা বুঝবেন এই বিরোধাত্মক গতির প্রভাব মনের উপর কেমন হয়। অসংখ্য যোদ্ধার বিরুদ্ধে বিকল ক্লান্ত মা চলেছে ছেলের অন্বেষণে। ক্রমশঃ তার মুখ থেকে শব্দ ফোটে। সে কিছু বলে। সৈনিকরা একটু হাসে। এক বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে এক মা, চলেইছে, চলেইছে। তারপর শেষ হ'য়ে যায় সৈনিকদের দল, মা তখন এক বিস্তৃত মাঠে; সম্মুখে উচ্চ পাহাড়, তারই পদতলে শায়িত এক যুবক। একাই মা তার দিকে ছুটে।

বার্লিনের কোন শিল্প কক্ষে ফিল্মের জন্য
নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি

Last shot, মার বিকৃত মুখ—বুকের উপর তার হাত—নিজের বুকের উপর নয়, মৃতপুত্রের!

অসংখ্য গতিশীল (উপবিষ্ট নয়) লোকের বিরুদ্ধে চলতে পারত শেরাজ তার প্রিয়ার সন্ধানে। তখন আমরা দেখতাম তার স্ব-প্রকাশিত বিকলতার অতিরিক্ত আরো কিছু; গতির ছন্দ। তখন আমরা বুঝতে পারতাম যে, একজনের গভীর দুঃখের সঙ্গে জগতের সব লোকেরই

সম্পর্ক নেই। শেরাজের বিফলতা সমস্ত crowdএর উদাসীন আনন্দের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত ; তার দুঃখের সুর আমাদের প্রাণে বাজত, দুইটি ভিন্ন গতির তালে তালে। তখন আমরা ভাবতাম, এই ত জীবন, এই ত তার রহস্যময় সৌন্দর্য্য !

আর্টের যে কোন উপাদান তার নিয়ম সৃজন করে, তার ক্ষমতানুসারে। যে ফিল্মে গতিছন্দ নেই, তার স্থান আর্টের বাহিরে। শেরাজে গতিছন্দ কোথাও নেই।

* * *

আমি বায়স্কোপ না লিখে ফিল্ম লিখেছি একটি কারণে ;— যাঁরা বায়স্কোপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না তাঁরা বায়স্কোপকে বলেন ফিল্ম।

শ্রীঅষ্টাবক্র

হাসি কান্না

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমর সরকার

ঝঞ্ঝা বাদল গেল থেমে
উঠলো শশী নীলিমায়,
অঝোর ধারে জোছ্না ঝ'রে
বেণুর বনে মূর্চ্ছা যায় !
নদীর ধারে দুল্‌ছে কেয়া,
হাঁক্‌ছে মাঝি, এই'ত খেয়া
আয়রে ছুটে যাত্রী ওরে,
ভাস্‌বি যদি দরিয়ায়।

কোন্ বিরহী নিঝুম রাতে
বাজায় বাঁশী কসাড় বনে,
ব্যথায় কাতর মাতাল হাওয়া
কাঁদ্‌ছে ঘুরে তারি সনে !
সজল বকুল পড়ছে ঝ'রে
বনানীর ওই দুরান্তরে,
ধরণী তার -মুক্তাঝালর
মুছায় তৃণ-তুলিকায়।

সরিৎ-বয়ান ফুল্ল আজি
কাঁপ্‌ছে তাতে চপল হাসি,
ঠিক্‌রে প'ড়ে মাণিকরাজি
কোন্ সে দূরে যাচ্ছে ভাসি!
কুঞ্জবনের কুলায় ছাড়ি
শূন্যে দিল চকোর পাড়ি,
আছাড় খেয়ে উল্‌টে পড়ে
দুকুল হারা চন্দ্রিকায় !

নদীর ধারের কুটীর পাশে
কাহার আশে আছে চেয়ে
পল্লীবালা পথিক বধূ—!
যাচ্ছে মাঝি তরী বেয়ে।
নিরালার এই শাঙন রাতে
নিদ্রা জড়ায় নেত্র পাতে,
উর্ম্মিমালা মর্ম্মরিয়া
লুটিয়ে পড়ে বেদনায়।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার

শেফালি

—উপন্যাস—

—শ্রীআমোদিনী ঘোষ

১

চলিতে চলিতে পথের মাঝখানে আচম্‌কা দেখা অচিন্তিতপুর্ব্ব এক পথিক।

না কোনো কালের পরিচয়, না কিছুমাত্র জানা শোনা, তবু সে আচম্বিতে সহজ সুরে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "দিদি আমি এসেছি।"

জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী। ভরা-জোয়ার নদীর মত চন্দ্রালোক থম্ থম্ করিতেছে—স্বপ্নপুরীর সুখ-রজনীর মত। দীপ্ত-নীল স্বচ্ছ সুনির্ম্মল আকাশের তলে চাতালের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছি,—চারিদিকে ফুলগন্ধ—চাঁপার ডালে দোয়েল ডাকিতেছে, দূরে কোথায় শ্যামা শীষ দিতেছে, স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে ধীর হিল্লোলে, এমন সময়ে অপরিচিত অজ্ঞাত অনাহূত এক তন্বী তরুণী সহসা আসিয়া মধুর হাসিয়া বলিল, "দিদি, আমি এসেছি।"

কে রে মেয়ে! আমি উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। কমনীয়কান্তি মাধুরীমণ্ডিত মুখখানি, সুঠাম দেহ-বল্লী, তরঙ্গিতপ্রান্ত সুনির্ম্মল ললাট, পিঠের উপর কুঞ্চিত মুক্ত কেশের অন্ধকার, লাবণ্যময়ী সুন্দরী শ্যামা। লক্ষ্য করিলাম—সীমন্তে সিন্দুররেখা অঙ্কিত, গলায় এক গাছি সরু হার, হাতে লোহা, তার পাশে রাঙা রুলি এবং সরু দুগাছি চুড়ি। বয়স আঠারো উনিশ।

মেয়েটি আমার সম্ভাষণের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া দিব্য আমার কাছে উপবেশন করিল।

আমি বলিলাম, "তুমি কে?"

স্বচ্ছন্দে বলিল, "আমি শেফালি।"

আমি গৌরী, সুতরাং রং ময়লা দেখিলে নাক সিঁট্‌কাইতাম; কিন্তু নব কিসলয়ের মত স্নিগ্ধ কান্তি এই শ্যামলা মেয়েটির দিকে আমি সকল ভুলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

শেফালি বলিল, "আমি এখানে থাক্‌ব!"

বা রে মেয়ে! আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "এখানে?"

শেফালি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার কাছে আমি থাক্‌তে এসেছি।"

"আমাকে তুমি চেন?"

"চিনি বই কি!"

"তুমি কোত্থেকে এলে?"

"আমাকে কিরণবাবু কুড়িয়ে এনেছেন!"

ধাঁ করিয়া কুন্দনন্দিনার কথা আমার মনে পড়িল, আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিলাম।

শেফালি হাসিয়া বলিল, "আমি কুন্দনন্দিনা নই।"

স্বামীসৌভাগ্যগর্ব্বিতা আমার ও কথাটা ভাল লাগিল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ী কোথায়? কে আছেন তোমার?"

"কেউ নেই আমার।"

"এতদিন তবে কোথায় ছিলে?"

"পরের বাড়ীতে।"

"তাদের ছেড়ে এলে কেন?"

"পরে কতদিন বোঝা বয়? তারা ঝেড়ে ফেলে দিলে।"

"এখানে এলে কি ক'রে, কে তোমায় আমাদের চিনিয়ে দিলে?"

আমার সংশয় আমার গলার স্বরে প্রকাশ পাইয়া গেল, তবু তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। পৃথিবীতে এমন বিপদেও কেহ পড়িয়াছে কি?

কুসুম-গন্ধে জ্যোৎস্নালোকে ফুল্ল-ফুলদল-বিলসিত পুষ্পোদ্যানে তন্দ্রাতুর দিব্য আমি শুইয়া আছি, অকস্মাৎ কোথা হইতে বহ্নিশিখারূপিনী এই বালা দুর্ব্বোধ্য রহস্য ও জটিল ভাবনার বিভীষিকা লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া

উপস্থিত হইল,—বহ্নিশিখার মতই ত সে একদিন আমার সৌভাগ্যের দ্বারে শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে না!

শেফালি মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমার যেখানে বিয়ে হয়েছিল, ইনি তাদের বন্ধু। শ্বশুর শাশুড়ী নেই—যাঁর আশ্রয়ে ছিলুম তিনি আর রাখতে চাইলেন না।"

"দেখ্‌ছি ত তুমি সধবা মেয়ে। তোমার স্বামী কোথায়?"

"তাঁর অন্য সংসার।"

"তোমাকে তিনি পালন করেন না?"

"না।"

"তবু তোমার সেখানেই যাওয়া উচিত ছিল।"

"যাদের সংসার তারা জায়গা দিতে নারাজ।"

"তোমার স্বামীর নাম কি?"

শেফালি মুখ ফিরাইল। আমি উঠিয়া বাহিরবাড়ী গেলাম। তিনি মফঃস্বল হইতে সবেমাত্র ফিরিয়াছেন, আরদালি তখনও গাড়ী হইতে জিনিষপত্র নামাইতেছে, আমি গিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কে?"

তিনি বলিলেন, "একটি ভদ্রলোকের মেয়ে। অনাথা—আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, যার আশ্রয়ে এতদিন ছিল সে মারা গেছে। তুমি সর্ব্বদাই বল, তোমার এখন একজন দেখিয়ে শুনিয়ে লোক নইলে আর চল্‌ছে না,—বিশেষতঃ মাস দুই পরে ত আর চল্‌বেই না। হঠাৎ পেয়ে গেলুম একে—তোমারই সুবিধার জন্য নিয়ে এলুম। কিন্তু দেখো কখনও যেন ওকে অমর্য্যাদা কোরো না,—কেননা (একটু থামিয়া) এ কিন্তু আমাদের মুখাপেক্ষী নয়—ওর নামে যে সম্পত্তি আছে—তা আমার হাতেই ওরা তুলে দিয়েছে।"

ইহার ভিতর এতটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে! আমার মনের ভিতরে কেমন যেন একটা কাঁটা ফুটিতে লাগিল, তবু আমি যথাসম্ভব মুখের প্রসন্নতা রক্ষা করিয়া কহিলাম, "তা বেশ।"

আমি মাট্রিক পাশ,—কথায় কথায় উনি সেই কথাটা টানিতেন। পাছে উনি আমাকে পাড়াগেঁয়ে হিংসুক মেয়েদের দলে ফেলেন, সেই মর্য্যাদাভঙ্গের ভয়ে আমি মনের ভাবটা সাম্‌লাইয়া গেলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি শেফালি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। আমার পায়ের শব্দে চমকিয়া সে চোখ মুছিয়া ঠিক্ হইয়া বসিল।

সে যে কাঁদিতেছিল, আমার কাছে সে তাহা অতি ত্রস্তে গোপন করিল,—কেন?

রাত্রিতে শেফালিকে খাওয়াইয়া শোয়াইয়া আমি আমার ঘরে গেলাম। ইনি ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন, মাথার কাছে টুলের উপর রিডিং ল্যাম্পটি রাখিয়া শুইয়া শুইয়া তিনি বই পড়িতেছিলেন, কিন্তু আমি যখন ঘরে গেলাম, তখন বইখানা মুখের উপর চাপা দিলেন। আমি বলিলাম, "ওকি আবার?"

বাতির দিক্ হইতে পাশ ফিরিয়া শুইয়া উনি বলিলেন, "আঃ, বড্ড ঘুমে ধরেছে।"

গলার আওয়াজটা আমার কাছে ধরা ধরা বোধ হইল। মুখের উপর হইতে বই কাড়িয়া নিয়া আমি আলোর দিকে জোর করিয়া তাঁহার মুখ ফিরাইয়া ধরিলাম। ঘুম? উহুঁ, চোখের কোণ দিয়া তবে জল গড়াইয়া পড়িতেছে কেন?

আমি বলিলাম, "ঘুমোচ্ছো, না তুমি কাঁদ্‌ছো?"

শেফালির গোপন ক্রন্দনের স্মৃতিটা ধাঁ করিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল, আমার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল।

তাচ্ছিল্যভরে উনি বলিলেন, "এক ফোঁটা চোখের জল—তার নাম কান্না? কনান ডয়েলের এই ম্যাক্সম্যানখান যদি তুমি পড়—তবে তুমি যতক্ষণ পড়বে ততক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদ্‌বে।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "সত্যি তুমি বই প'ড়ে কাঁদ্‌ছিলে?"

উনি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

"তবে কি জন্যে কাঁদ্‌ছিলে?"

"বল্‌ব?"

মাথা ধরিয়া ঝাঁকিয়া আমি বলিলাম, "বল না ছাই!"

"অভয় দিচ্ছ ত?"

আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, তবু বলিলাম, "মাভৈঃ, মাভৈঃ!"

উজল পায়ে আস্‌বে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান,
উপুড় করে রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্র খান!—

শিল্পী—শ্রীমনীষী দে

গালে আস্তে চড় মারিয়া উনি বলিলেন, "তোমারই বিরহে সই, চক্ষে জল থই থই, কাঁদি তুমি গেলে কই, দশটা বাজিল অই—"

রাগ করিয়া আমি আরেক দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে জাগিতে লাগিল শেফালির গোপন ক্রন্দনের স্মৃতি, আর তারই সঙ্গে কেমন করিয়া জড়াইয়া যাইতে লাগিল এই গোপন অশ্রুধারার রেখা। মনের ভিতর কেমন একটা আশঙ্কা অস্বস্তি সন্দেহ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কে এই শেফালি, কোথা হইতে সে আসিল এবং কেন এইখানেই আসিল; ইঁহার সঙ্গে এর কি পরিচয়—হাসির অন্তরালে সে লুকাইয়া কাঁদে কেন—হাজার রকমের হাজার কথা হাজার সম্ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "বল না সত্যি এ কে?" মনে হইল, স্খলিত-প্রায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস উনি জোর করিয়া চাপিয়া রাখিলেন। উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর চোখ রাখিয়া বলিলেন, "তোমার সন্দেহ হচ্ছে?"

একটুখানি লজ্জিত হইয়া আমি কহিলাম, "না।"

"এর শ্বশুর বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে এদের সঙ্গে চেনা এবং সেই জন্যেই ভরসা ক'রে একে এনেছি। আমি মনে করেছিলুম সুরমা, অনাথা দেখে তুমি কৃপা কর্ব্বে!"

আমার মনে হইল স্বামীর চোখে আমি অনেকটা খাটো হইয়া গেলাম। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া বলিলাম, "আমায় মাপ কর, আমি আর কখনও এ রকম ভাব্‌বো না।"

আমার হাত দুখানা তাঁহার হাতের ভিতর লইয়া তিনি চোখ বুজিয়া বলিলেন, "বাস্, এই কথা রইল, এস এখন ঘুমোই।"

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, রৌদ্রপাণ্ডুর ফুলদলের মত অকথিত বেদনার অপরূপ এক কোমলতা তাঁহার মুদ্রিত-নেত্র মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত মনটা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি বাতি সরাইয়া রাখিলাম।

২

আমাদের সংসারটি ছিল ছোট। শ্বশ্রূমাতা অল্পদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, দুটি ননদ শ্বশুর বাড়ী, একমাত্র দেবর হিরণ্ময় কলিকাতায় পড়ে, ছুটিতে আসে ছুটি ফুরাইলে চলিয়া যায়। যে কয়দিন থাকে হাসি ঠাট্টা গল্পে দিনগুলা বেশ কাটিয়া যায়।

অগ্রজের সঙ্গে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ঠাকুরপোর যতখানি ছিল প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য ছিল তার চাইতে অনেক বেশী। ইনি কাজে যেমন চটপটে, কথায় তেমনি সুনিপুণ সকল ব্যাপারে অগ্রসর, কিছুতেই সঙ্কোচ বড় করেন না,—সেটা হয়ত বয়সগুণে। ঠাকুরপো আবার তেম্‌নি ডাইনে বল্‌তে বাঁয়ে যান, সহজে কাহারো সঙ্গে আলাপে অগ্রসর হন্ না, 'ফেয়ার সেক্স্' দেখিলে দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়ান, বাড়ীতে কেহ আসিলে "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন" নীতি অবলম্বন করেন।

সকালে উঠিয়া ঠাকুরপো কলতলায় মাথা নীচু করিয়া মুখ ধুইতেছে দেখিয়া বারান্দা হইতে আমি হাঁকিয়া কহিলাম, "ঠাকুরপো, আমার একটা উপকার কর না!"

গামছা দিয়া পা মুছিতে মুছিতে ঠাকুরপো বলিল, "কি উপকার কর্ব্ব?"

"বড্ড মাথা ধরেছে, দক্ষিণের ঘরে আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা ফেলে এসেছি,—এনে দাও যদি!"

আমি নীচে আসিবার সময় দরজার ফাঁক দিয়া শেফালিকে বিছানায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম সে 'দূরের পানে মেলে আঁখি' সে গভীর চিন্তায় তলাইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলাম—আর অযথা ভাবনা ভাবিব না—কিন্তু যে সন্দেহ তাঁহার আশ্বাসের দিবালোকে পুচ্ছ গুটাইয়া শিবাদলের মত দূরে প্রস্থান করিয়াছিল—নবসংশয়ের অন্ধকারে তাহা যূথবদ্ধ হইয়া আমারই ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকারে আমার অন্তরাকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

তবু ঠাকুরপোকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য সে কথাটা ভুলিলাম—মাথায় একটা নূতন ফন্দি আসায় উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

ঠাকুরপো হাতের গামছা কলের কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হও বুঝি ?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ যদি এরকম একটি ঘোড়া দেখা যায় !"

ঠাকুরপো কেমিষ্ট্রির ছাত্র, মনোবিজ্ঞানের কোনো ধার ধারিত না। তাহার আশে পাশে কোথায় কি হইতেছে, কে কি করিতেছে-না করিতেছে, বা ভাবিতেছে, সে সম্বন্ধে তাহার কোনো অনুসন্ধিৎসা ছিল না, সুতরাং স্মেলিং সল্ট আনিতে বলার উপরোধকালে আমার মুখে যে বক্র হাসি দেখা দিল, তাহা সে আদৌ লক্ষ্য করিল না, সুশীল বালকের মত আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে দৌড়াইল। একটু পরেই সে ঝড়ের মত নামিয়া আসিয়া রক্তিম মুখে বলিল "বৌঠান্, শুনুন ত এদিকে !"

হাসি চাপিয়া ভালমানুষের মত কাছে গিয়া বলিলাম, "কি হয়েছে হে বীর পুঙ্গব ?"

ঠাকুরপো চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "আপনি জানেন না কিছু ?"

"আমি জানিনে কিছু কে বল্লে ? এই শুনুন না—খৃঃ পূঃ ২৯৫০ অব্দে স্নেফ রুই প্রথম বিশ্বের বিস্ময়াবহ পিরামিড নির্ম্মাণ করেন, এবং খেফ্রেন বা চেফ্রেন হচ্ছেন প্রথম স্ফীঙ্কস্ নির্ম্মাণের প্রবর্ত্তক। গাছের পত্রস্পন্দন প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের অবিকল অনুরূপ ;—চিরবধির এডিসন্ ফোনোগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা,—রেডিয়াম্ ভবিষ্যতে—"

ঠাকুরপো হাতজোড় করিয়া বলিল, "আপনি যে বিদ্যের জাহাজ আমি ত তা কখনো অস্বীকার করিনি বৌঠান !"

"মাঝে মাঝে সেটা জানিয়ে দিতে হয়, নইলে ভয় হয় অস্বীকার ক'রে বস্‌লে বুঝি বা !"

"চালাকি রাখুন ত এখন—ওপরের ঘরে কে বলুন।"

"জগাটা আজ কাজে আসে নি, তার বদলে একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছে—বোধ হয় সেই হতভাগাটা ওখানে গিয়ে পান খাচ্ছে। পানের ডাবরটা যে ওঘরে থাকে—তা কি ক'রে যে ও হতভাগা ঠাওর ক'রে নিলে ?"

"ও ঘরে জগার ভূত—বটে ?" বলিয়া ঠাকুরপো দন্তমঞ্জনের কৌটা খুলিয়া আমার মাথায় মুখে সমস্তটা ঢালিয়া দিল। সুড়কির গুঁড়োর মত লাল গুঁড়ো নাকে মুখে মাখিয়া আমি ভূতের মত হইয়া গেলাম। ঠাকুরপো দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল, "বেশ হয়েছে।"

সহসা ঠাকুরপো র'ণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুতপদে পলাইল, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম—শেফালি।

আমি বলিলাম, "দেখলে আমার দেওরের কাণ্ড !"

শেফালি শুধু হাসিল। কিন্তু এ কি রকম হাসি কৃষ্ণপক্ষের অসম্পূর্ণ চন্দ্রের ম্লান জ্যোৎস্নার মতই তাহ তাহার মুখে বেদনার অন্ধকার আরো যেন প্রস্ফুট করিয় তুলিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম সে একটু ত্বরিত ভাবে জলের জাগটা হাতে লইয়া বলিল "এস আমি ধুইয়ে দিচ্ছি।"

আমি ঠাকুরপোর ঘরের অভিমুখে ডাকিয়া বলিলাম "ঠাকুরপো, ওপর থেকে সাবানটা ফেলে দাও।"

উত্তরে কতকগুলা আপেলের চোকলা আমার মাথা উপর আসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘো

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম

অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র মিত্র এম, এ

মানুষ আধ্যাত্মিক প্রাণী। আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর ব্যাপী মানুষের চিন্তার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে মানুষের নানা-মুখী চিন্তার বহুল বিচিত্রতার মধ্যে জড় জগতের উপর তাহার দেহ-মনের প্রকাণ্ড নির্ভরতা সত্ত্বেও, মোটের উপর সে জড় জগতের শাসন মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহার সমস্ত অস্তিত্বটুকু, যাহা সে 'আমি' কথাটির দ্বারা নির্দ্দেশ করে, সেটুকু সবটাই তাহার চেতনার দ্বারা উদ্ভাসিত; এই চেতনার বাহিরে আপনার কোনো অস্তিত্বই সে জানে না। যদিও তাহার অস্তিত্বের চাক্ষুষ সাক্ষ্য যে জড় দেহটা,—সেটাও অনেক সময়েই তাহার আমিত্ব সংজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবুও সে এটা জানে যে, তাহার এই আমিত্বটা এই জড়-দেহ অপেক্ষা অনেক বেশী, এই জড় দেহের অনেক উপরে, এবং প্রতিক্ষণেই তাহা এই জড় দেহের ভিতর দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতে করিতে সেটাকে বিপুল পরিমাণে ছাড়াইয়া যায়। তাই মানুষ তাহার দেহটাকে চেতনাময় করিয়া লইয়া তাহাকে গৌরব দান করিয়া আপনার উপযোগী করিয়া লইয়াছে, শুধু তাই নয়,—সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপরেই সে আপনার চেতনার আলোকরশ্মি ছড়াইয়া দিতে চায়; নইলে সে বাঁচে না। ব্রহ্মাণ্ডের অচেতন জড়তাটিকে যদি তাহার প্রকাণ্ড সত্তার শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়,—তবে মানুষ কোথাও তাহার যোগ-সূত্রটি খুঁজিয়া পায় না, ফলে সে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে বাধ্য হয় আপনারই ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুর মধ্যে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেখানে তাহার আত্মপ্রকাশের আশা নিতান্তই ক্ষীণ, আত্ম-প্রসারের অবকাশ একেবারেই নাই।

তাই মানুষ চায় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিলিতে; এবং এই মহা-মিলনের প্রয়াসের মধ্যেই তাহার ধর্ম্মের উৎস,—তাহার ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা। মানুষ ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্; কিন্তু এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বর্ণ রস গন্ধের মধ্যে মানুষ চিরকালই কি-যেন একটা রহস্যময় আভাস পাইয়াছে;—সেই একেবারে প্রাচীন যুগে—যখন তাহার অন্তরে জ্ঞানের আলোক জ্বলে নাই,—তখনো তাহার মনে হইয়াছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডটা যাহার প্রকাশ, তাহা মানুষের চেতনারই অনুরূপ একটা বিরাটতর চেতনা; তাই এমন-কি যখন শ্রেণীবদ্ধ মানবের অজ্ঞানাবৃত চেতনা আপন আপন শ্রেণীকে ছাড়াইয়া গিয়া জাতীয়তা বা মানবতার মধ্যে প্রসারতা লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই, তখনো মানুষ চেষ্টা করিয়াছে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত এই বিরাট্ চেতনার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের ধর্ম্মের নানা রূপের বহুল বিচিত্রতার মধ্যে যে উপকরণটি চিরন্তন ও সর্ব্ব-সাধারণ তাহা মানুষের প্রাণের এই মূল আকাঙ্ক্ষাটি, নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল জগতের অন্তর্নিহিত বিরাট্ সত্তাটির প্রতি মানুষের অন্তরের এই বিশিষ্ট মনোভাবটি। শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির ভেদে মানব জীবনের সহস্র বিচিত্রতায় এই ধর্ম্মভাব মানুষের নানা চিত্তবৃত্তির ভিতর দিয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছে; এবং মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম্মের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া মানুষের সমস্ত জীবনটাকে যে পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে সে পথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ধর্ম্মের এক রূপের সহিত আর এক রূপের সংঘর্ষ বাধিয়াছে,—এক রূপের সহিত আর এক রূপ মিলিত হইয়া একটা সমৃদ্ধতর রূপের সৃষ্টি বড় একটা হয় নাই। তাই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই নিবিড়তর সংস্পর্শের দিনে এই সংঘর্ষের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা ঠিক ততখানি গভীর ও জটিল, ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মূল আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের মনে যতখানি প্রবল।

ধর্ম্ম মানবজীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত; কোনো বিশেষ যুগেই বোধ হয় ধর্ম্মের প্রয়োজন অন্য কোন

বিশেষ যুগের চেয়ে কম নয়, কারণ মানুষের সুনীতি শুভ-বুদ্ধি, কল্যাণ-কামনা—সকলেরই প্রস্রবণ এই ধর্ম্মের মধ্যে। ধর্ম্ম হইতেই ইহারা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়া মানুষকে উন্নতির পথে, কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। তবুও বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের প্রয়োজন আমরা যতখানি অনুভব করিতেছি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বোধ হয় কোনো দিন এতখানি অনুভব করেন নাই। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনই বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের প্রয়োজনও এই সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানুষকে যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে, তাঁহাতে সে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে; বাণিজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থলোলুপতা, শক্তিমাদকতা প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে,—দেবতার উপাসনা ছাড়িয়া সে আজ যন্ত্রের পূজা আরম্ভ করিয়াছে। এই সব দুষ্প্রবৃত্তিগুলি যদি ধর্ম্মের শক্তি উচ্ছেদ করিতে না পারে, তবে বিজ্ঞান-লব্ধ বিপুল সম্পদ মানুষ সংগঠন কার্য্যে ব্যবহার করিবে না, সংহারকার্য্যে ব্যবহার করিবে—ইহা নিশ্চয়। তাই ধর্ম্মের প্রয়োজন আজ যতখানি এতখানি বোধ হয় কোনো দিন ছিল না।

অথচ বিড়ম্বনা এই যে, ধর্ম্মের এই একান্ত অনন্যসাধারণ প্রয়োজনের যুগে ধর্ম্মের বিভিন্ন রূপের পরস্পর সংঘাতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদ আসিয়া পড়িয়া ধর্ম্মের অন্ত-নিহিত মূল আকাঙ্ক্ষাটিকে যেন একটু অবশ ও অচেতন করিয়া দিয়াছে; ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণ রস গন্ধের পিছনে লুক্কায়িত রহিয়াছে যে অজ্ঞাত অব্যক্তের আভাস, তাহাকে আরো একটু কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্টতর করিয়া দিয়া ধর্ম্মের অধিষ্ঠান মানুষের যে বিশ্বাস তাহাকে যেন একটু ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিজ্ঞান বুঝি ধর্ম্মের বিরোধী। যাহা কিছু চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, স্পর্শে অনুভব করা যায় তাহা লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। অতীন্দ্রিয় এমন কিছু বিজ্ঞান স্বীকার করিতে নারাজ, যন্ত্রাগারে যাহার স্বরূপ বা ক্রিয়াপ্রণালী নির্ণীত হইতে না পারে। পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অনেক সূক্ষ্ম রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই আজ বিজ্ঞান জড় পদার্থের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে ব্যস্ত। ব্রহ্মাণ্ডের পিছনে যে একটা চৈতন্যময় অব্যক্তের আভাস মানুষ এতকাল পাইয়াছে—আজ বিজ্ঞান বলিতে চায় যে, সে আভাস মরুভূমিতে জলের আভাসেরই মত,—উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন মানুষের মর্ম্মের মধ্যে গ্রথিত আছে, তাহা তাহার সমস্ত চিন্তা অনুভূতি ও কর্ম্মের সহিত একটা নিবিড় সংমিশ্রণে তাহার সমগ্র জীবনটাকেই এমন ভাবে রাঙাইয়া দিয়াছে যে, বিজ্ঞানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সফলতার বন্যায় সে রঙ কখনো মুছিয়া যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের যে বিরোধ তাহা প্রথম দৃষ্টিতে যত খানি সত্য মনে হয়, ঠিক ততখানি সত্য নয়। বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য জ্ঞানের বিস্তার, ধর্ম্মের উচ্ছেদ নয়। অন্তরের মধ্যে যে বিশ্বাসের আলোকে ধর্ম্মের অধিষ্ঠান,—সেই একই বিশ্বাসের আলোকই বিজ্ঞানেরও অস্ত্র। সেই বিশ্বাসের আলোকেই বিজ্ঞান নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পায়, এবং যে অনুপ্রেরণায় যন্ত্রাগারে সেই সব তথ্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করে—সেই অনুপ্রেরণা ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা হইতে বিভিন্ন জাতীয় নয়। বস্তুতঃ যে বিশ্বাসের উপর মানুষের ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা মানুষের অন্তরেরই বিশ্বাস, বাহিরের নয়। বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাসের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের বিকার মাত্র। এই সব বিকৃত ধর্ম্মের পরস্পর সংঘাতের ফল যে কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে য়ুরোপের ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিজ্ঞান এই সব বিকৃত ধর্ম্মেরই চিরশত্রু,—প্রকৃত ধর্ম্মের নয়,—কেন না অনুপ্রেরণার জন্য বিজ্ঞানকে ভিক্ষা করিতে হয় এই ধর্ম্মেরই নিকট হইতে,—বিজ্ঞানকে জাগাইয়া তুলিতে হয় ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত সেই মূল আকাঙ্ক্ষাটিকে যাহা আপনার সহিত মিলনের জন্য চিরদিনই উদগ্রীব হইয়া আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে বিজ্ঞানের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যে তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেই বিরোধে এই কথাটা পরিষ্কার বোঝা গিয়াছে যে, সভ্যতার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ধর্ম্মের যে সকল উপাদানগু

চিরন্তন ও সর্ব্বসাধারণ সেই গুলিরই প্রাধান্য থাকা চাই। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির এই বিবিড়তর সংস্পর্শের দিনে ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংঘর্ষের অবসান যদি না হয়, এবং ধর্ম্মের চিরন্তন ও সর্ব্বসাধারণ উপকরণগুলি প্রাধান্যলাভ যদি না করে, তবে ধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমান মানব যে আশ্রয় চায় সে আশ্রয় পাইবে না। আজ সমগ্র বিশ্বের নিকট যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই সভ্যতার প্রথম যুগে ভারতবর্ষের নিকটও সেই একই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস এই সমস্যারই একটা নৈসর্গিক উপায়ে সমাধান-প্রচেষ্টার ইতিহাস,—এবং আজও ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সেই একই দিকে চলিয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বিজ্ঞান কিন্তু এই সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করিতেছে অন্যদিকে, কৃত্রিম উপায়ে প্রবর্ত্তিত একটি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ভিতর দিয়া। এতদিন ধরিয়া মানুষের বিচিত্র জীবন-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের যে সকল বিভিন্নরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—আজ বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানুষকে আহ্বান করিতেছে সেই সকল রূপ পরিত্যাগ করিয়া নব-প্রণোদিত এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মধ্যে মিলিত হইতে,—কেন না, সুনীতির উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্ম্ম মানুষের সমস্ত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে সংহত করিয়া সু-পরিচালিত করিবে, আশার আলোক জ্বালিয়া এই ধর্ম্ম মানুষের হৃদয়কে আশ্বাস প্রদান করিবে, এবং জ্ঞানের বিস্তার করিয়া এই ধর্ম্ম মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে।

ধর্ম্ম-সমস্যার বিজ্ঞান কর্ত্তৃক এই সমাধান-চেষ্টা কতদূর কৃতকার্য্য হইবে—তাহার বিচার কাল-সাপেক্ষ। তবে এখন শুধু এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, ধর্ম্মের একটি সার্ব্বজনীন কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট ধারণার মধ্যে মানুষের প্রাণ কখনো আশ্রয় পাইতে পারে না। ধর্ম্মের প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে মানুষের প্রাণের যে মূল আকাঙ্ক্ষাটির মধ্যে,—সেই আকাঙ্ক্ষা মানুষের বিচিত্র জীবন-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রূপ ধারণ করিবেই;—ইহা স্বাভাবিক,—বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানের গতি যতই অপরিমেয় হউক না কেন, সে শক্তি কখনো এই রূপের বিকাশ প্রতিরোধ করিতে পারে না। বস্তুতঃ ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইহার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাটি ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের ভেদে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম্মের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। আদিম যুগে যখন মানুষের সমস্ত শক্তিই আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যয়িত হইত—তখন এই আকাঙ্ক্ষা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল—একটা ভীতির মধ্যে, একটা সন্ত্রাসের মধ্যে! মানুষ চেষ্টা করিত নানাবিধ উপচার ও উৎকোচে তাহার দেবতাকে প্রসন্ন করিতে, দেবতার ক্রোধ উপশম করিতে। তারপর যখন শ্রেণীবদ্ধ মানব ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, এবং আত্মরক্ষা সমস্যার কঠিনতা ও তীব্রতা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল, তখন দেবতার প্রতি মানুষের এই সন্ত্রাসের ভাবটি ক্রমশঃ পরিণত হইতে লাগিল প্রেমের মধ্যে, এবং বর্ত্তমান কালেও বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রেমের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আধুনিকতম বিজ্ঞানের যুগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যদিও বিজ্ঞান চায় ধর্ম্মের সমস্ত বিশিষ্ট পরস্পর-বিরোধী রূপগুলির উচ্ছেদ-সাধন করিয়া ধর্ম্মকে পর্য্যবসিত করিতে একটি সার্ব্বজনীন ধারণার মধ্যে, তবুও বিজ্ঞানের অজ্ঞাতসারেই বিজ্ঞানেরই প্রয়োজন অনুসারে মানবের সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাটি আজকাল একটা নূতন রূপ ধারণ করিয়া উঠিতেছে। এই রূপের একটা অতীব মনোগ্রাহী বিবরণ আমরা পাই শ্রীযুক্ত এচ্ জি, ওয়েলসের God the Invisible King শীর্ষক গ্রন্থের মধ্যে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের এই যে রূপ তিনি লিপিবদ্ধ করিলেন, ইহা নিছক তাঁহার কল্পনা-প্রসূত নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশবাসী তাঁহার অনেক শিক্ষিত বন্ধুদের সহিত আলোচনার মধ্যে তিনি ইহার সমর্থন পাইয়াছেন।

বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞানের আহরণ। তাই বিজ্ঞান-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ওয়েল্‌স্ কর্ত্তৃক সুনির্দ্দিষ্ট এই রূপটিতে মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষাটি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যে। বিজ্ঞানের যাহা লইয়া কারবার—সে সবই সীমাবদ্ধ। সীমাহীনকে বিজ্ঞান নিক্ষেপ করিতে চায় অজ্ঞেয়বাদের অতল গহ্বরের মধ্যে,

তাই ওয়েল্‌স্ আমাদের প্রথমেই বলিতে ভয় পান নাই যে, তাঁহার ধর্ম্মের যে ভগবান্, তিনি অসীম নহেন, সসীম। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি রক্ষাকর্ত্তা। ওয়েলস্ বেশ সরলভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে অনন্ত ভগবানের যে একটি অস্পষ্ট ধারণা আমাদের আছে, তাহা ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে ভগবান সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টতর ধারণা হইতে এতই বিভিন্ন যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি এই দুটি ধারণা একই সত্তার মধ্যে মিলাইতে পারেন নাই। তাই তিনি বাধ্য হইয়া প্রথম ধারণাটিকে অজ্ঞেয়তার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয়টিকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন,—ভগবান্ আমাদের অদৃশ্য মহারাজা,—মানবজাতির বন্ধু এবং গুরু। ভগবান্ সম্বন্ধে মানুষের যে সাধারণ ধারণা—তাহা যতই অস্পষ্ট হউক—তাহা অখণ্ড। সেই অখণ্ড ধারণাকে স্পষ্টতার খাতিরে এমনি করিয়া দুটি অংশে বিশ্লেষণ করিয়া একটিকে বর্জ্জন ও অপরটিকে গ্রহণ করা হয় যে ধর্ম্মে,—সে ধর্ম্মের অনুপ্রাণনা-শক্তি কতখানি অটুট থাকিতে পারে তাহা বিবেচনার বিষয়।

যাহা হউক শ্রীযুক্ত ওয়েলস্ আমাদের বলিতেছেন যে, তাঁহার ভগবান অসীম নয়,—সসীম,—কেন না তিনি আমাদেরই মত একজন পুরুষ (person)। গুটি চারেক ছোট ছোট শব্দ দ্বারা ওয়েল্‌স্ তাঁহার ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—প্রথমতঃ তিনি সৎসাহস, দ্বিতীয়তঃ তিনি পুরুষ,—তাই সসীম, তৃতীয়তঃ তিনি তরুণ, চতুর্থতঃ তিনি প্রেম। এ বিষয়ে ওয়েল্‌সের সহিত বেশী বিবাদ আমরা না-ই করিলাম, কেবলমাত্র ভগবান্‌কে সসীম বলিতে ঠিক কি বুঝায় সেইটুকু আমরা পরিষ্কার করিয়া লইব। ভগবান্ সসীম; বেশ মানিয়া লইলাম,—কিন্তু এই প্রাচীন কথাটা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব যে, ভগবানের এই সসীম দিকটা ভগবানেরই সেই অসীম দিকের একটা প্রকাশ,—যে দিকটা ওয়েলস্ অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছেন? এই কথাটি ত সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সীমা অসীমতার একটি অস্বীকারোক্তি নয়, সীমা অসীমতার বিরোধী নয়, সীমা অসীমতারই প্রকাশ। অসীম যখন আপনাকে প্রকাশ করেন, তখন সীমার মধ্যেই প্রকাশ করেন। সীমা সৃষ্টির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ,—রবীন্দ্রনাথের কথায়,—"the medium which the Infinite Being sets before him for the purpose of his self-expression."[১] বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মও ভগবানকে সসীম বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। ভগবানের সসীম দিকটা বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার নহে।

তাই আমরা যখন বলি যে, ভগবান সসীম,—তখন আমরা ভগবান সম্বন্ধে মানুষের যে সাধারণ ধারণা, তাহার মহিমার হানি করি না,—আমরা তখন শুধু মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি করি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"Humanity is a necessary factor in the perfecting of the divine truth. The Infinite, for its self-expression, comes down into the manifoldness of the Finite; and the Finite for its self-realisation must rise into the unity of the Infinite. Then only is the cycle of truth complete."[২]

অতএব ওয়েলস্ ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যে চারিটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চিন্ত-মনে মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু তারপরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস,—তাহা তাঁহার এই নূতন ধর্ম্মের সর্ব্বসাধারণসম্মতিলাভের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই সসীম, সৎসাহসী, তরুণ, প্রেমিক ভগবানের প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা,—ওয়েল্‌সেরই কথায়,—"the attainment of clear knowledge, of knowledge as a means to more knowledge and of knowledge as a means to power. For that he must use human eyes and hands and brains. And as God gathers power, he uses it to an end that he is only beginning to apprehend, and that he

১। Personality—পৃঃ ৫৪

২। Ceative Unity—পৃঃ ৮০

will apprehend more fully as time goes on. But it is possible to define the broad outlines of the attainment he seeks. It is the conquest of death.

"It is the conquest of death ; first the overcoming of death in the individual by the incorporation of the motives of his life into an undying purpose, and then the defeat of that death that seems to thereaten our species upon a cooling planet beneath a cooling sun." ৩

ওয়েল্‌সের এই ভগবান,—মানব জাতির অদৃশ্য মহারাজা,—এমনি করিয়া মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিতে করিতে মানব জাতির কল্যাণ-সাধন করিতেছেন। এই নূতন ধর্ম্মে ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা হয় নাই,—এমন কি সৃষ্টি রহস্যের প্রতি এই ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের প্রাণে কোনো মৌন সাড়াও পাওয়া যায় না,—অথচ একটা কথা বিনা প্রমাণে যেন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে পৃথিবীর যত কিছু অকল্যাণ, দুঃখ কষ্ট বেদনা—সকলেরই জন্য দায়ী আর এক দেবতা। তাহাকে না-হয় দেবতা না-ই বলিলাম,—বলিলাম দানব,—কিন্তু এই দানব বেশ শক্তিশালী দানব,—এমন শক্তিশালী যে, আমাদের চির-তরুণ মহারাজা আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াও ইহার সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। এমন একটা কুসংস্কার পৃথিবীর আদিম মানবের অপরিণত মনের পক্ষে হয় ত শোভা পাইত ; আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের মন্ত্রে সুদীক্ষিত ওয়েল্‌স সাহেবের লেখায় ইহার প্রতি একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতও যে শোভা পায় না—এ কথা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর অকল্যাণের জন্য দায়ী করিব একটা কল্পিত দানবকে—মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় অগৌরের কথা আর আছে কি? আবার তাহার উপর এই অগৌরবের লজ্জা বহন করিতেছে যে মানুষ—তাহারই অনুরূপ করিয়া কল্পনা করিলাম আমাদের অদৃশ্য মহারাজ ভগবানকে! এমন ধর্ম্ম মানুষকে আশ্রয় দিবে কেমন করিয়া?

৩ God the Invisible King. পৃঃ ১১০-১৮।

অকল্যাণ যে সৃষ্টির মহিমারই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ—এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না। বাধা অতিক্রম করিয়াই গতি আপনার বেগ সঞ্চয় করে ; অকল্যাণের ভিতর দিয়াই সৃষ্টি মহিমান্বিত হইয়া উঠে। এখানে আমরা সেই অতি-পুরাতন অকল্যাণ-সমস্যার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে বসিব না, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় শেষ কথাটি বলিয়া দিয়াছেন। এখানে আমরা শুধু এই কথাটি বলিতে চাই যে, সকল সৃষ্টিরই মূলে রহিয়াছে বেদনা,—কিন্তু তাই বলিয়া বেদনার মধ্যে আমরা সৃষ্টির অর্থটি খুঁজিয়া পাইব না,—খুঁজিয়া পাইব আনন্দের মধ্যে ;—কেন-না বেদনা সৃষ্টির সাধন, আনন্দ সৃষ্টির দান। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য এই আনন্দেরই আরাধনা,—বেদনার ভিতর দিয়া, ত্যাগের ভিতর দিয়া, প্রেমের ভিতর দিয়া। যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষ অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া এই আনন্দেরই আরাধনা করিয়া আসিতেছে,—তাই আজ মনুষ্যত্ব আমাদের অনেক সাধনা-লব্ধ অমূল্য ধন। যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত বেদনা বুকে বহন করিয়া এই মনুষ্যত্ব আপনার অনেক অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়াছে,—ভবিষ্যতে আরো বেদনা সহিয়া এই মনুষ্যত্ব আরো চেতনা লাভ করিবে এবং অসম্পূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণতার দিকে আরো অগ্রসর হইবে।

তাই বলিতেছিলাম যে, বিজ্ঞান-প্রবর্ত্তিত এই আধুনিক ধর্ম্মের বিবরণ দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত ওয়েল্‌স তাঁহার ভগবানের উপর যে উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন—তাহা বড়ই ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ;—এমন উদ্দেশ্য লইয়া কোনো ধর্ম্মই কখনো আধুনিক মানবকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে না। বিজ্ঞান-প্রদত্ত বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভের উল্লাস-বিহ্বলতা হইতে আমরা যেমনি ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিব—তখনি দেখিব যে, জ্ঞানে সমৃদ্ধতর, আকাঙ্ক্ষায় আকুলতর, কর্ম্মে প্রবলতর আমাদের যে প্রাণ—তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা আর প্রকৃতির উপর প্রভুত্বলাভের সামান্য আত্ম-প্রসাদে মিটিতেছে না। বিজ্ঞান যে ক্রমশঃ আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিতেছে। আমরা ত আমাদের ভাবী শক্তি-সম্পদের কোথাও কোনো সীমা দেখি না। সারা বিশ্বটাই ত আজকাল আমাদের ঘর-বাড়ীরই সামিল হইতে চলিল।

ঘণ্টায় তিনমাইলের পরিবর্ত্তে আজকাল আমরা ঘণ্টায় তিন শ' মাইল চলিয়া থাকি; সহস্র যোজন দূরত্বেও আজকাল আমাদের কিছু আসিয়া যায় না,—মুখোমুখীর মতই বেশ দিব্য চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি; বিজ্ঞানের নিকট হইতে নূতন নূতন অস্ত্রগ্রহণ করিয়া আমরা জয়-যাত্রায় বাহির হইয়াছি,—রোগ, দারিদ্র্য, মৃত্যু সকলই ত আমরা জয় করিতে চলিলাম;—কিন্তু এই বিজয়ের গৌরবে আমাদের প্রাণের ক্ষুধা মিটিবে কি?

আমরা আধ্যাত্মিক প্রাণী,—আমাদের প্রাণের যে ক্ষুধা—তাহা মিলনের ক্ষুধা, প্রেমের ক্ষুধা, সৃষ্টির ক্ষুধা,—তাহা জয়ের ক্ষুধা নয়, শক্তির ক্ষুধা নয়, প্রভুত্বের ক্ষুধা নয়। জড়প্রকৃতির উপর আমাদের দেহ-মনের একান্ত নির্ভরতার জন্যই আমাদের চিন্তার ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে জড়বাদের আবির্ভাব হইয়াছে,—কিন্তু তবু ত চিরকালই আমরা জড়বাদকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি,—কোনোদিন জড়প্রকৃতির শাসন মানিতে চাহি নাই। আর আজ যখন জড়প্রকৃতিকে আমরা জয় করিতে চলিয়াছি,—তখনই কি আমাদের অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা হইবে যে, আমরা জড়বাদ স্বীকার করিয়া জড়-প্রকৃতির শাসন মানিয়া লইব? বিশ্বের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নত না করিয়া আমরাই কি জড়তার স্তরে নামিয়া আসিব?

তাই আজ এই বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার দিনে—এই দিকে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন,—যেন শক্তিই আমাদের হস্তগত হয়;—আমরা যেন শক্তির হস্তগত না হই। আমাদের সকল সময়েই এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি একটা সাধন মাত্র,—চরম উদ্দেশ্য কখনই নয়। মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ শক্তির মধ্যে নয়, সম্পূর্ণতার মধ্যে। মানুষের জীবন-যাত্রার আয়োজনে শক্তির স্থান সামান্য একটা ভৃত্যের মত—তাহার বেশী কিছু নয়, প্রয়োজন-সাধনেই তাহার সমস্ত সার্থকতা।

সুতরাং ওয়েল্‌স্‌ তাঁহার নূতন ধর্ম্মের পরিকল্পনায় শক্তিকে যে প্রাধান্য দিয়াছেন—সে প্রাধান্য শক্তি কখনই পাইতে পারে না। অবশ্য স্বীকার করি শক্তি এখানে চরম উদ্দেশ্য নয়—মৃত্যুজয়েরই সাধন,—কিন্তু তথাপি এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই ধর্ম্মের প্রধান অনুপ্রেরণা যাহা,—তাহা সৃষ্টির আনন্দ নয়, মিলনের আনন্দ নয়, প্রেমেরও আনন্দ নয়,—তাহা শক্তিরই মাদকতা। 'মৃত্যুজয়'—এই মহৎ কাজটি আমরা বিজ্ঞানের উপরেই ছাড়িয়া দিতে পারি,—হয়-ত এই মহৎ কাজে বিজ্ঞান ধর্ম্মের নিকটই অনুপ্রেরণা অনুসন্ধান করিবে এবং পাইবে,—কিন্তু সেই অনুপ্রেরণার মধ্যেই ধর্ম্মের সমস্ত ভাণ্ডার নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল—এমন কথা যদি মনে করি—তবে ধর্ম্মের প্রকৃত প্রাণটুকুরই সন্ধান আমরা পাইব না।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী না হইলেও ধর্ম্মও বিজ্ঞান নয়—বা বিজ্ঞানও ধর্ম্ম নয়। অথচ ওয়েল্‌সের এই নূতন ধর্ম্মের পরিকল্পনাটি আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-বৃত্তির মাল-মস্‌লায় পরিপূর্ণ,—যাহা ঠিক ধর্ম্মের উপকরণ নয়। অবশ্য স্বীকার করি যে, সমস্ত বইখানি পড়িয়া দেখিলে এখানে সেখানে সুনীতি-প্রচারের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের উপকরণ একটু আধটু দেখা যায়,—কিন্তু মোটের উপর ভিতরকার সুরটি বিজ্ঞানের, ধর্ম্মের নয়। সেই যে প্রথমেই ওয়েল্‌স্‌ সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌কে অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন—সেই-খানেই তিনি তাঁহার নূতন ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বটুকু বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। যাহা কিছু রহস্যময় প্রহেলিকা,—বুদ্ধিতে যাহা ধারণা করা যায় না, ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহাকে এমন করিয়া সভয়ে এড়াইয়া যাইতে চাহিলে চলিবে কেন? এই রহস্যই ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রথম কথা এবং শেষ কথা। এইখানেই ত মানুষের জীবনের আনন্দ, তাহার বিশ্বাসের আলো, তাহার প্রেমের খেলা। এ রহস্য ত বিজ্ঞান কোনোদিন উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিদূরিত করিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এই রহস্য কেবলই গভীর হইতে গভীরতর হইয়া মানুষের আনন্দকে নিবিড়তর, তাঁহার বিশ্বাসের আলোককে উজ্জ্বলতর, এবং তাহার প্রেমের ক্ষেত্রকে বিস্তীর্ণতর করিয়া তুলিবে। অতীত মানবের নিকট এমন অনেক জিনিস রহস্যময় ছিল,

—যাহা আধুনিক মানুষের নিকট আর রহস্যময় নয়,—কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের আদি-রহস্য গভীরতরই হইয়াছে, বিদূরিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান অনেক বড় বড় তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে,—ব্রহ্মাণ্ডের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়াছে,—কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত রহস্য দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। হেকেল তাঁহার Riddle of the Universe শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের শেষভাগে স্বীকার করিয়াছেন,—এই যে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইতেছে, ইহার স্বরূপ কি,—তাহা নির্ণয় করা একান্তই দুঃসাধ্য। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে বলে চিরন্তন পদার্থ,—দার্শনিকেরা বলে Absolute,—ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিতেরা বলে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্,—কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপটি আজও বুদ্ধি-বৃত্তির দুরধিগম্য রহিয়া গিয়াছে। হয়-ত বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই রহস্য দূর করিতে সমর্থ হইবে!

আমরা বলি,—ভয় নাই। হেকেলের এ আশা নিতান্তই দুরাশা! বিংশ শতাব্দীর কেন,—কোন শতাব্দীরই বিজ্ঞান এমন দুষ্কার্য্যসাধনে কখনই সমর্থ হইবে না। যদি হয়,—তবে ত মানুষের পক্ষে সেটা বড়ই দুর্দ্দিন বলিতে হইবে,—কেন-না—ক্ষুদ্র মানুষ—তাহার ক্ষুদ্রত্ব-অতিক্রমের একমাত্র উপায় এই যে সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে অনন্ত-সঙ্গমের আনন্দ,—সেইটিকে হারাইয়া বসিয়া অবিলম্বে তাহার জ্ঞান-প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িবে,—এবং জড়প্রকৃতির উপর তাহার অশেষ প্রভুত্ব সত্ত্বেও মর্ম্মভেদী বিষাদের সহিতই উপলব্ধি করিবে যে, জীবনে তাহার আর কিছুই করিবার নাই, কোনো আশারই অনুপ্রাণনা নাই, বাঁচিয়া থাকিবার মত আর কোনো অবলম্বন নাই।

•

এই আলোচনার মধ্যে এই কথাটি, আশা করি, সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, আজ পৃথিবীর নানাজাতির নিবিড়তর সংস্পর্শের দিনে একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের যে সমস্যা বিশ্বের নিকট উত্থাপিত হইয়াছে—বিজ্ঞান কখনো সে সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। ধর্ম্মের সমস্ত বিশিষ্ট রূপেরই উচ্ছেদসাধন করিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-ধারণার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিজ্ঞান যদি আজ মানুষকে পরামর্শ দেয়, তাহা হইলে সে পরামর্শ গ্রহণীয় নয়,—কেন-না, প্রথমতঃ তাহা অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হইলেও তাহা কল্যাণকর নয়। ভারতবর্ষ যে নৈসর্গিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী এখনো পর্য্যন্ত কিছু দেখা যায় না। তাই আজ মানুষ বিজ্ঞানের মুখ চাহিয়া আছে যতখানি—দর্শনেরও মুখ চাহিয়া আছে ঠিক ততখানি। মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যে পথে নিয়ন্ত্রিত হইবে—সেই পথ কাটিবার গুরুভার বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়কেই সমান ভাবে মাথায় লইতে হইবে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

মহাশক্তি রসায়ন

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

১

১৪ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারের দৈনিক 'সাহিত্যভেরী' কাগজে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল—

দুইটি মাতৃহারা বালককে দেখাশুনা করিবার ও পড়াইবার জন্য একজন অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। আবেদনকারিণী বিধবা, নিঃসন্তান, স্বাস্থ্যবতী এবং বয়স তিরিশের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। বেতন—আহার বাসস্থান বাদে ২৫৲ টাকা। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। শ্রীপ্রাণ নাথ দত্ত, ৫৬ বি নং ভগীরথ মল্লিকের লেন, হাটখোলা।

সেই ১৪ই ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে একটি শীর্ণদেহ যুবক ৫৬ বি নম্বরের সামনে আসিয়া দেখিল যে, তাহারি মত আরও দুই চারিজন যুবক ও একটি বৃদ্ধ সম্মুখের বাড়ীর টানা রোয়াকের উপর সারি সারি বসিয়া আছে। মলিন উত্তরীয় দ্বারা মুখের ঘাম মুছিয়া, যুবকটি তাহাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এইটিই কি—"

"হ্যাঁ, প্রাণনাথ দত্তের বাড়ী, যিনি আজ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এই যে"—বলিয়া ইহাদের মধ্যে একটি যুবক তাহার হস্তস্থিত 'সাহিত্যভেরী'র বিজ্ঞাপনটি আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইল। নবাগত যুবকটি তখন দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কাহারো হাতে, কাহারো জামার পকেটে, কাহারও বা বগলে এক একখানি 'সাহিত্যভেরী' রহিয়াছে।

আর একটি যুবক কহিল,—"আমাদের 'পাট' হোয়ে গেছে, আমরা এখন দর্শক। আসছেন কোথা থেকে ?"

আগন্তুক যুবক মনে মনে ভাবিল, ইহারা সকলেই কর্ম্মপ্রার্থী, সুতরাং তাহার শত্রুপক্ষীয়, সেজন্য সেখানে আর না দাঁড়াইয়া বরাবর ৫৬বি-র দরজার কাছে আসিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল এই যে, লোকটার মেজাজ্ কিরকম হবে, শান্ত-শিষ্ট-নম্র অথবা রুক্ষ-তিরিক্ষে গোছের ? হয় ত, তিরিক্ষে গোছেরই হ'বে—ইয়া দাড়ি—ইয়া গোঁফ—প্রকাণ্ড মুখ ! তা'হলে আর বেশী ক'রে কিছু বলতেই পারা যাবে না, তা হ'লে—

হঠাৎ খিল খোলার শব্দ হইল এবং পরক্ষণেই দরজা ঈষৎ ফাঁক হইলে ভিতর হইতে যে মুখখানি দেখা দিল তাহাতে ইয়া দাড়িও ছিল না, ইয়া গোঁফও ছিল না, ছিল শুধু কপালভরা উল্কির শোভা, আর ছিল দুটি কানে চুনী-বসান দু'খানি কান-ফুল আর নাকে একখান ওপ্যাল পাথরের নাকছাবি। সেই একটুখানি দরজা খুলিয়াই সে কহিল,—"চাকরী হ'বে না, বাবু ঘুমুচ্চেন।" যুবকটি কহিল,—"আচ্ছা, কখন উঠবেন ? আমি না হয় খানিক এইঘরে—"

"না-না—সে হবে না। মেয়েছেলের দরকার, বেটাছেলে তোমরা আস কেন বাবু ? আপনি যাও বাবু, দরজা বন্ধ করে দি।"

"বাবু কে হন আপনার ?"

"আমার আবার কে হবেন, আমি হলুম বাড়ীর ঝি।"

"আপনি একটু দয়া ক'রে যদি একবার তাঁকে ডেকে দেন। দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার—"

"ব্রাহ্মণের ছেলে তা আমি কি করব বাছা ? কাজ হোল মেয়েছেলের, তোমরা পুরুষরা কেন এসেছ বাবু ? বাবা ! কত লোকই যে সকাল থেকে এলো ! স'রে দাঁড়ান্, আমি দরজা দিয়ে দি।"

"শুনুন্, মা-জননী, আর একটা কথা শুনুন। আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন যে, আমি তিন বৎসর এস্, রায়ের ছোট ছোট ছেলেদের 'গার্জেন-টিউটার' ছিলুম। ছেলেদের দেখাশোনার কাজে মেয়েরা আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না; আর মাইনে আমাকে পঁচিশের জায়গায় এখন না হয় কুড়িটাকা ক'রেই দেবেন, তাতেই আমি—"

"যান বাবু, ওসব আমি বলতে পারব না।". বলিয়া ঝি দরজায় খিল লাগাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সামনের রোয়াক হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"কবে থেকে appointment হোল মশাই?" যুবকটি তাহাদের দিকে না চাহিয়া, উত্তরীয় দ্বারা কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সটান চলিয়া গেল।

অপরাহ্নকালে বৈঠকখানায় বসিয়া প্রাণনাথবাবু গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিল। একটি শ্যামবর্ণা, অতি-মাত্রায় ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোক,—পায়ে সৌখীন নাগ্‌রা স্লিপার, পরণে টাঙ্গাইলের শাড়ী, চক্ষুতে চশমা—ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"নমস্কার।"

প্রাণনাথবাবু প্রতিনমস্কার জানাইয়া সামনের চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল,—"বসুন।"

"ধন্যবাদ। আপনিই কি মিষ্টার দত্ত? আজকের 'সাহিত্যভেরী'তে—"

"আজ্ঞে হাঁ, আমারি ছেলেদের জন্যে একটি 'মিস্‌ট্রেসে'র দরকার।"

"কাগজে দেখলুম, ছেলেদুটির মা নেই। Sorry! কতদিন আপনার 'ওয়াইফ্‌' মারা গেছেন?"

"তা হোল বৈ কি, মাস পাঁচ ছয় হ'য়ে গেল।"

"বাড়ীতে তা'হলে মেয়েদের মধ্যে এখন—"

"কেউই নেই। একটা বিধবা মেয়ে আছে, সেই ঘর-সংসারের কাজ করে। তবে ছেলে দুটোকে ত মানুষ করা দরকার, সেই জন্যে একজন mistress—"

"সে ত বটেই। তা আমি আপ্‌নার গিয়ে 'চার্চ স্কুলে' পাঁচ বচ্ছর কাজ করেছি; তারপর হোগোলকুঁড়ের মিষ্টার সেনগুপ্তের নাম অবিশ্যি শুনেচেন, তাঁর ছেলেমেয়েগুলি ধরতে গেলে আমারই হাতে একরকম মানুষ। এই যে তাঁর সার্টিফিকেট্‌ আমি সঙ্গে ক'রেই এনেছি।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি একখানি খামের মধ্য হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া প্রাণনাথবাবুর হাতে দিল। কাগজখানি হাতে লইয়া প্রাণনাথবাবু কহিল,—"কিন্তু আপনার 'হেল্‌থ' ত দেখছি বড্ড খারাপ, ভয়ঙ্কর রোগা আপনি, আপনার কি—"

একটুখানি মুচ্‌কি-হাসি হাসিয়া স্ত্রীলোকটি কহিল,—"হেল্‌থ্‌ আমার খুবই ভাল, মিষ্টার দত্ত। জীবনে কখনো আমার মাথাটি পর্য্যন্ত ধরে নি, তবে রোগা যে দেখছেন, এইরকমই আমার গড়ন,—ছেলেবেলা থেকেই আমি এইরকম।"

"কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই!"

"আপনারা হিন্দু কি?—না, ব্রাহ্ম?"

"ব্রাহ্ম।"

"এই কথাটাই আমি ভাবছিলুম। দেখুন,—বিজ্ঞাপনে একটা কথা লিখতে আমাদের ভুল হোয়ে গেছে। আমরা হলুম একেবারে—যাকে বলে গোঁড়া—"

"হিঁদু; তা ত দেখতেই পাচ্চি। তাকের ওপর কোশা-কুশি রয়েছে, আপনিই পুজো করেন বোধ হয়? বড় ছবিখানা কি কালীয়দমন?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যে একজন হিঁদু স্ত্রীলোক না হোলে, আমাদের এ হিঁদুর ঘরে—" বুঝেছেন ত? কিছু মনে করবেন না, মাপ করবেন, শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলুম।"

"তা'তে কি? আপনি অত কুণ্ঠিত হবেন না, মিষ্টার দত্ত।" তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

স্ত্রীলোকটি ধীরপদবিক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহারই অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর একটী ৩০।৩২ বৎসরের যুবতী গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গের গঠন সুডোল; ভরা-যৌবনের পূর্ণবিকাশে সারা দেহে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্রতি অঙ্গে স্বাস্থ্য-শ্রী ফুটিয়া উঠিয়া তাহার শ্যামবর্ণকে প্রায় গৌরবর্ণ দেখাইতেছিল। মাথার বাঁকা সিঁথার উপর জরিদার সাড়ির অঞ্চলের একটুখানি হেয়ার-পিন্‌ দিয়া আট্‌কান। দৈহিক রূপের এবং পরিচ্ছদের অনুরূপ অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য

তেমন কিছুই তাহার অঙ্গে ছিল না, শুধু ছোট ছোট দুইটি নীলপাথরের স্বর্ণমণ্ডিত দুল তাহার দুইকানে দুল্-দুল্ করিয়া দুলিতেছিল।

যুবতীটি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রাণনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল,—"আসুন।"

যুবতীটি চেয়ারে বসিয়া কহিল,—"আপনার নামই কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রাণনাথ দত্ত। আপনার বাড়ী কোথায়?"

"আমার বাড়ী কোথায়, তা আর কি-ই বা আপনাকে বলবো! সংসারে একলা, সুতরাং যখন যেখানে থাকি, সেই আমার বাড়ী। এখন আছি আমি লেক্ রোডে আমার এক বন্ধু ভগ্নীর বাড়ী।"

"আপনাকে তাহ'লে ত এইখানেই থাকতে হবে, তা'তে আপনার কোন অসুবিধে হবে না ত? অবশ্য অসুবিধের কিছু আমি হোতে দোব না।"

"তা'ত দেবেন না,—কিন্তু—"

"দেখুন, ছেলেদুটির ভার যখন আপনার হাতে দিচ্ছি, তখন মনে করবেন, আপনার হাতেই সব; কেন না, ঘরে আর আমার দেখবার শোনবার লোক ধরতে গেলে কেউ-ই নেই; সুতরাং আপনার যা'তে সুবিধে হয় সে আপনি নিজেই ক'রে নেবেন, তা'তে লজ্জিত হবার বা কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই।"

যুবতী তাহার কানের দুলদুটী দুলাইয়া, ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল,—"আপনার ঘরের এইসব ছবিটবি দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা ভয়ানক হিঁদু। তাকের ওপর ওগুলো কি? কোশা-কুশি, শাঁক-ঘণ্টা? পুজো-টুজো হয় বুঝি রোজ?—সেইজন্যেই বলছি যে, আমরা হলুম ব্রাহ্ম কি না, আপনার হয় ত তাতে অসুবিধে—"

"আপনি একটা নতুন কথা শোনালেন বটে।" বলিয়া হো হো করিয়া প্রাণনাথ হাসিয়া কহিল—"বলি, আজকালকার দিনে হিঁদু আর ব্রাহ্ম ব'লে দুটো আলাদা কিছু আছে না কি? আপনি হাসালেন খুব! হ্যাঁ, ছিল বটে,—সে ২০।২৫ বছর আগে। তবে, খৃশ্চানরা এখনো আমাদের থেকে আলাদা বটে।"

"তাহ'লে, আপনার তাতে কোন অসুবিধে হবে না ত?"

"বিলক্ষণ! অসুবিধে কিসের? মনে করুন, আপনি যদি খৃশ্চানই হতেন, তাতেই বা কি অসুবিধে হ'ত? আপনি আপনার ঘরে ব'সে আপনার 'ক্রাইষ্ট'কে ডাকতেন, আমি আমার ঘরে ব'সে আমার শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতুম; তাতে, আমায় দেখে আপনার 'ক্রাইষ্ট'ও মূর্চ্ছা যেত না, আর আপনাকে দেখে আমার শ্রীকৃষ্ণও ভয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়ত না। মূলে—যে ক্রাইষ্ট, সেই শ্রীকৃষ্ণ,—"

"যা'ক্, তা না হয় হোল, কিন্তু—"

"কি বলুন।"

"চল্লিশটাকার কমে ত, দত্তমশাই, আমি কাজ নিতে পারব না; কেন না,—আপনাকে খুলেই বলি,—আজই আমি আর এক জায়গায় চল্লিশটাকার একটা offer পেয়েছি।"

"চল্লিশটাকা ক'রে ত আপনি এখানেও পাবেন।"

"কিন্তু, বিজ্ঞাপনে আপনার পঁচিশ টাকার কথা লেখা আছে কি না।"

"ওটা কি জানেন? সেই কোন্ বড়লোকের সকালবেলা উঠেই চাকরদের বাতি জ্বালতে বলার কথা জানেন ত? অর্থাৎ—বাবুর চাকর-বাকররা সব এম্নি কুঁড়ে ছিল যে, সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বালতে বললে বাতি জ্বালতো সেই ভোর বেলায়, তাই, ধাত্ বুঝে নিয়ে বাবু ঐ সকালে ঘুম থেকে উঠেই রোজ বাতি জ্বালার তাড়া দিত, তবে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে বাতি জ্ব'লে উঠতো।"

হাসিতে হাসিতে স্ত্রীলোকটি কহিল,—"এমন কুঁড়ে চাকরও থাকে? আমি হ'লে কিন্তু অমন চাকরদের গায়ে সেই বাত্তির আগুনের ছেঁকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিতুম।"

"যা বোল্লেচেন! তা আমারও ঠিক সেই অবস্থা কি না। বিজ্ঞাপনে একেবারেই যদি চল্লিশ্ টাকার কথা লিখে দিই, তা'হলে কেন্ না আরো দশ-পনেরো টাকার জন্যে সকলে পিড়াপিড়ি করবে, তাই গোটা পনর টাকা হাতে রেখে, ঐ পঁচিশ টাকার কথাই—বুঝেছেন ত?"

"আচ্ছা, ছেলেদুটিকে তা'হলে একবার যে দেখতে চাই, দত্ত মশাই। কোন অসুবিধে হবে কি?"

"কিছুমাত্র না,—চলুন, আমরা ওপরেই যাই তা'হ'লে। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"খুব পারেন,—সুরুচিবালা গুপ্তা।" বলিয়া সুরুচিবালা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"সার্টিফিকেট দু' একখানা সঙ্গে এনেছিলুম, আপনাকে—"

"ও আর দেখবার কোন দরকার নেই।" বলিয়া প্রাণনাথ সুরুচিবালাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

২

ফাগুনের পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়া আশ্বিন পড়িয়াছে। এবার মাসের শেষদিকে পূজা পড়িলেও এখন হইতে পূজার হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে এবং দোকানে দোকানে পূজার বাজার লাগিয়া গিয়াছে।

দত্ত মশায়ের বিধবা কন্যা কি একটা কথায় ঝগড়া গণ্ডগোল করিয়া বাপের নিকট হইতে শ্বশুরবাটীতে চলিয়া গিয়াছে। খোকা দুইটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা স্কুলে গিয়াছে। নির্জ্জন মধ্যাহ্নে দোতালার বড় ঘরের মেজের বিছানাতে শুইয়া দত্ত মশাই তন্দ্রাসুখ ভোগ করিতেছিল। তাহার মাথার ধারে বসিয়া সুরুচিবালা তাহার পাকা চুল তুলিয়া দিতে দিতে ছোট্ট একটি কাগজের টুকরা লম্বা করিয়া পাকাইয়া দত্ত মশায়ের কানের মধ্যে ঢুকাইয়া নাড়িতে নাড়িতে ডাকিল,—"ওগো, শুন্‌চো?"

একটুখানি মাথা নাড়ার সঙ্গে নড়িয়া উঠিয়া দত্ত মশাই কহিল,—"আঃ!"

সুরুচিবালা আবার সেই পাকানো কাগজের কাঠিটি দিয়া তাহার কানের মধ্যে সুড়্‌সুড়ি দিতে দিতে ডাকিল,—"মশাই, বাড়ী আছেন কি?—দত্ত মশাই?"

"আঃ, কি হচ্চে, সুরুচি?"

"কানে কাঠি দিয়ে একটুখানি সুড়্‌সুড়ি দিচ্ছি।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, বেলা প'ড়ে গেছে—ঘুম ভাঙ্গাচ্ছি।"

পাশের বালিসটাকে ঠেলিয়া দিয়া চিৎ হইয়া চক্ষু মেলিয়া দত্ত মশাই কহিল,—"এই রকম কানে কাঠি দিয়ে বুঝি ঘুম ভাঙ্গাতে হয়?"

"হয়,—শাস্ত্রে আছে।"

"কাদের শাস্ত্রে? তোমাদের?"

"আমাদের নয়, তোমাদেরই। জান না, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে কি কাণ্ড করতে হয়েছিল? বাইশ হাজার ইঁদুর আর তিন লক্ষ আরসোলা নাকের গর্ত্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আর, কানে কি করা হয়েছিল জান ত? আড়াই শ আস্ত শালগাছ ঘা মেরে মেরে কানের ভেতর ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছিল। আড়াই শ শালের জায়গায় আমি ত খালি ছোট্ট একটা শলা দিচ্চি, তা'ও কাগজের।"

"আমি কি কুম্ভকর্ণ না কি?"

"কর্ণ না হোক, মাথাটা কিন্তু অনেকটা কুম্ভেরই মত।" বলিয়া সুরুচিবালা হো-হো করিয়া ঘরময় সুমিষ্ট হাসির একটা তরঙ্গ ছড়াইয়া দিল। দত্ত মশাই হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"তুমি বড্ড ফাজিল, সুরুচি।"

"সত্যি বল্‌চ?"

"হুঁ।"

"এই আশ্বিন মাসে, রবিবাসরে ত্রয়োদশী তিথিতে? বিশেষ, এই 'সিলেট্ লাইম্ কোম্পানীর' চুণের ঘরে ব'সে?—কি, কথা কচ্চ না যে? একদৃষ্টে ওরকম ক'রে চেয়ে রইলে, কি—ভস্ম করবে না কি?" বলিয়া সুরুচিবালা দত্ত মশায়ের একখানি হাত লইয়া নিজের দুটি হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। দত্ত মশাই তাহার মুখের দিকে আরও খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল,—"ভস্মই যদি কখনো হতে হয় তোমাকে, তা'হ'লে জানবে যে, আমারও শেষ। সেই ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মেখে, লোটা চিম্‌টে নিয়ে আমিও তা'হ'লে—"

"ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না, আজ কোথায় যাবার কথা আছে জান ত?"

"খুব জানি, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে—তোমার পূজোর সাড়ী ব্লাউস্ কিনতে।"

হঠাৎ বারান্দায় কাহার জুতার শব্দ হইল এবং পরক্ষণেই প্রশ্ন—"কোথায় হে প্রাণনাথ?" সুরুচি চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি কোণের বড় আয়নাখানার পিছনে যাইয়া লুকাইল। সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কি হে, আছ কেমন? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?"

"পাপের ভোগের কথা আর বল কেন ভাই। পাড়ার এক থিয়েটার পার্টি বসিয়ে জোর-জবরদস্তি ক'রে এক পার্ট গচিয়েছে, সেইটে একবার নিজে নিজে চেষ্টা কচ্ছিলুম। তারপর এলে কবে?"

"শুক্রবার এসেছি। ভাবলুম একবার দত্তের সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি। কালই আবার চ'লে যাচ্ছি বেনারস।"

"সদর দরজাটা কি খোলাই ছিল ভাই?"

"হ্যাঁ হে। কেউ নীচে নেই, ওরকম ক'রে দোর খুলে রেখ না—বিশেষ দুপুর বেলাটায়।"

"রোজই বন্ধ ক'রে ওপরে আসি, আজকে একেবারে ভুলেই গিয়েছি। তারপর,—তোমার খবর কি বল, আছ কেমন?"

"আছি ত ভালই। তুমি কেমন বল? আরবারের চেয়ে এবার যেন তোমায় ভালই দেখচি হে।"

"হ্যাঁ, মাস পাঁচ ছয় থেকে শরীরটা একটু ভালই আছে। চল ভাই, নীচে গিয়েই বসি, তোমাকে নিয়ে আর এঘরে থাকবো না।"

"কেন বল দেখি?"

"জান না?—না, তুমি ত সরযুর ব্যায়রামের সময় ছিলে না এখানে, কি করে আর জানবে! রোগ ধরা পড়বার পর যে তিনমাস বেঁচে ছিল, এই ঘরেতেই ছিল কি না। সকলে বলেছিল—যক্ষ্মারোগ, খাট, গদি, বিছানা-পত্তর, সব ফেলে দিয়ে ঘরটাকে ধুয়ে-মুছে ভাল ক'রে চুণ-কাম ক'রে নিতে। আমি ভাবলুম, হায় রে! কি জন্যে এসব করব! বাঁচতে? সরযু চ'লে যাবার পর এই সব ক'রে আমায় বাঁচতে হবে! তাই, কিছুই ত আর এ-ঘরের আমি করিনি। যেমন সব ছিল, ঠিক তেমনিই রেখেছি। তালা বন্ধ ক'রেই রাখি, শোবার সময় এসে খালি শুই আর মাঝে মাঝে মনটা যখন বড্ড কেঁদে ওঠে, এই বিছানায় মুখ গুঁজে খানিক কাঁদি।" দত্তমশাইয়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

অতঃপর দুইবন্ধু নীচে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ে নানাপ্রকারের আলাপাদি করিয়া বাহিরের বন্ধু বাহির হইয়া গেল আর ভিতরের বন্ধু উপরে আসিয়া সুরুচির খোঁপাটা একটু টানিয়া দিয়া কহিল,—"এই রকম ভুলে সদর খুলে রেখে এসে একদিন দেখচি একটা কাণ্ড ঘটাবে।"

৩

দুর্গাপূজার ঠিক পরেই হঠাৎ একদিন দত্তমশাইয়ের বুকের উপর প্রচণ্ড এক শেল আসিয়া পড়িল,—অর্থাৎ, সামান্য একটা তুচ্ছ কথার উপলক্ষ্য করিয়া সুরুচির সহিত তাহার বিষম কলহ হইয়া গেল এবং তাহার ফলে, সুরুচি তাহার জিনিপত্র বাঁধিয়া দত্তমশাইয়ের বুকের মধ্য হইতে মনটিকে তুলিয়া লইয়া গাড়ি ডাকিয়া তাহার লেকরোডের সেই বন্ধু ভগিনীর গৃহে চলিয়া গেল।

দিন পাঁচসাত ধরিয়া দত্তমশাই গুম্ খাইয়া রহিল, অর্থাৎ, পৃথিবীর কোন লোকেরই সহিত কথা কহিল না। তাহার পর দিন পনর ধরিয়া খোঁজাখুঁজির পালা পড়িল। প্রত্যহ সকাল বিকাল লেকরোড অঞ্চল, বালীগঞ্জ, কালীঘাট, ভবানীপুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা ফুলাইয়া ফেলিল। তাহার পর শয্যাগ্রহণ করিল। আহারে রুচি নাই, চক্ষুতে নিদ্রা নাই, শরীরে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই! এমনি সময়ে তাহার সেই বন্ধুটি বেনারস হইতে ফিরিয়া একদিন দত্তমশাইকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিয়া কহিল,—"এ কি হে, হঠাৎ তোমার চেহারা এরকম হ'য়ে গেল কেন? কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?"

দত্তমশাই তাকিয়া হইতে মাথা তুলিতে পারিল না, শুইয়া শুইয়াই কহিল,—"অসুখের কথা আর বল কেন ভাই, এইবার মরব আর কি, আর তা হ'লেই আমি বাঁচি।"

"কি হোয়েছে বল দেখি তোমার?"

"সবই হোয়েছে,—অর্থাৎ মরণ-রোগের যা'. কিছু, তা'র কিছুরই আর বাকী নেই।"

বন্ধু মোটামুটি অবস্থাটা শুনিয়া উঠিয়া যাইবার সময় কহিয়া গেল,—"একটা restorative কিছু খাওয়ার দরকার তোমার, বোধ হয় লিভারটা খুব খারাপ হোয়েছে, bile secretion ভাল হয় না আর কি।"

এক সপ্তাহ আরও কাটিয়া গেল। দত্তমশাই গৃহ হইতে কোথাও আর বড় একটা বাহির হয় না, চব্বিশ ঘণ্টাই উপরের সেই ঘরখানিতেই থাকে, আর যাহা কিছু করিতে যায় কিছুই ভাল লাগে না। খবরের কাগজ? কি ছাই পড়িবে! পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র, চেয়ার টেবিল, আয়না, আলমারি?—সব রসাতলে যাউক! হার্ম্মোনিয়ম লইয়া আগেকার মত দু'একখানা গান? কিন্তু ইচ্ছা করে, উহার key-boardএর এক একখানা কাঠের ফলক সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া খুলিয়া আগুনে পুড়াইয়া ভস্ম করে! আর গল্প উপন্যাস পড়া—সে ত বিষ!

ঔষধই খাইতে হইবে। লিভারটাই ঠিক খারাপ হইয়াছে। দত্তমশাই পঞ্জিকা খুলিয়া বিজ্ঞাপনের মধ্যে লিভারের ঔষধ খুঁজিতে লাগিল। 'হুতাশন বটি'—লিভারেরই ভাল ঔষধ বটে, মূল্য প্রতি কৌটা বার আনা, ভিঃ পিঃতে আঠার আনা। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় চিৎপুর রোডে 'গৃহস্থ ধন্বন্তরী ঔষধালয়' হইতে 'হুতাশন বটি' কিনিয়া আনিয়া দত্তমশাই মধু ও যোয়ান ভিজান জল দিয়া প্রত্যহ খাইতে আরম্ভ করিল। সপ্তাহখানেক খাইবার পরও কোন উপকার হইল না। তখন দত্তমশাই আবার পাঁজি খুঁজিতে বসিল। "স্লীম্যানের কিডনী পিল্‌স্"—দত্তমশাই সমস্ত বিজ্ঞাপনটা মনোযোগ দিয়া পড়িল। হায়! হায়!—লিভার ত নয়—তাহার যে কিডনীই খারাপ হইয়াছে! মাজায় ব্যথা, তলপেট ভারি, মাথা ঘোরা, গা বমি-বমি আর—ঠিকই ঠিকই, আর দেখিতে হইবে না। পরদিনই 'স্লীম্যানের কিডনী পীল' আনা হইল এবং যথানিয়ম তাহার ব্যবহার চলিতে লাগিল।

প্রায় পনরদিন যাবৎ কিডনী পিল সেবন করিয়া দত্তমশাইয়ের দেহের অবস্থা আরও যেন খারাপ হইয়া উঠিল, তখন একদিন বৈকালে রাগ করিয়া 'কিডনী পিলের' শিশিটি পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিমর্ষমনে চৌরাস্তার পার্কে আসিয়া বসিল। কিছুপরে একজন লোক হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতে করিতে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার হাতেও হলদে রংয়ের একখানা কাগজ দিয়া গেল। দত্তমশাই সেখানিকে পাকাইয়া ফেলিয়াই দিতেছিল, কি ভাবিয়া আবার খুলিয়া পড়িতে লাগিল। একবার পড়া হইল, আবার পড়িল। তারপর আরও একবার পড়িয়া কাগজখানিকে যত্ন করিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিল। ক্রিমি? ক্রিমির দরুণই এইসব উপসর্গ? তা'হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! ক্রিমিই বটে। নিশ্বাসে ভারবোধ, গা মাটি-মাটি করা, অজীর্ণ, অরুচি, কখনো কোষ্ঠবদ্ধ কখনো পাতলা দাস্ত, জ্বরবোধ, শরীর শুখাইয়া যাওয়া, নিদ্রাবস্থায় দাঁত কিড়্‌মিড়্ করা—সবই ত হুবহু মিলে যাচ্ছে! খালি দাঁত কিড়্‌মিড়টা করে না। আর করে না যে তাই বা বলি কেমন ক'রে, হয় ত ক'রে, নিদ্রাবস্থায় করে। মুরুচি থাকলে ঠিকই জানতে পারা যেত।—যা'ক—ক্রিমিই তা'হ'লে ঠিক, এর আর কোন সন্দেহই নেই। সেইদিনই গৃহে ফিরিবার পথে দত্তমশাই মোড়ের উপরকার সরকার এণ্ড্ সরকারের ডিস্‌পেনসারীতে প্রবেশ করিয়া "ক্রিমি-মুদ্গর" চাহিলে ডাক্তারখানার লোকেরা বলিল, 'ক্রিমি-মুদ্গর' তাহাদের নাই, উহা অন্য কাহারো পেটেণ্ট, তবে 'স্যাণ্টোনাইন্' কি 'বন্-বন্' দরকার হইলে তাহারা দিতে পারে এবং ছেলেটির কত বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ওদিক থেকে আর একজন কহিল যে, তাহাদেরও একটা 'পেটেণ্ট' আছে, তাহা ক্রিমির নহে, তাহা খুব ভাল 'নার্ভটনিক', যদি কখনো তাহার দরকার হয় ত তাহা সেইখানে পাওয়া যাইবে। বলিয়া সেই লোকটি দত্তমশাইয়ের হাতে একখানা ছাপান কাগজ দিয়া গেল। সেইখানে বসিয়াই দত্তমশাই কাগজখানি পড়িতে লাগিল—দেহের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, শারীরিক ও মানসিক

অবসাদ, মন হু-হু করা, বুক ধড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা বা যেটুকু নিদ্রা হয় কেবলি তাহা দুঃস্বপ্নে—"

"এই ওষুধটাই আমার দরকার", দত্তমশাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"এই ওষুধটাই আমি চাই, আমার বলতে ভুল হোয়েছিল, কত দাম ?"

"দু'টাকা।"

"তিন শিশি ?"

"পাঁচ টাকা।"

পাঁচটি টাকা টেবিলের উপর রাখিয়া তিন শিশি সেই নার্ভটনিক লইয়া দত্তমশাই গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৪

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাধি দত্তমশাইয়ের দূর হইল না। তখন বিরক্ত হইয়া ঔষধ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দত্তমশাই হাওয়া খাইবার মৎলব করিল এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় হাটখোলা হইতে গড়ের মাঠে আসিয়া হাওয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রত্যহ অত দূর হইতে মাঠে আসিয়া হাওয়া খাইতে কিছু অসুবিধা হইতে লাগিল, সেজন্য দত্তমশাই পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই মাঠের সন্নিকটেই ভবানীপুর হরিশ মুখার্জ্জি রোডে বাটীভাড়া করিয়া বাসা বদল করিল।

একদিন সন্ধ্যায় দত্তমশাই মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়া গাছতলার একখানি বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাট-কোট-পরিহিত একটা বাঙ্গালী যুবক তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার অসুখ বোধ হয়, একেবারে pale হ'য়ে পড়েছেন। কি অসুখ ?"

"জানি না।"

"কি অসুখ তা জানেন না, এ ত বড় মজার কথা ! বলুন না—আমি বাজে লোক নই, ডাক্তার। রেঙ্গুনে practice করি, এখানে brother-in-lawর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি।"

"তা বেশ করেছেন।"

"কি হোয়েছে আপনার বলুন দেখি ?"

"কি যে হোয়েছে তা আর কত আপনাকে বোলব, তবে কি যে হয়নি, তা বরঞ্চ বলতে পারি,—Bright's disease, Appendicitis আর Hernia হয় নি ; Blood pressureটাও বোধ হয়—না না, তাও ঠিক বলা যায় না, হয় ত তা'ও হোয়ে থাকতে পারে, নইলে রোজই বিকেলে চোক জ্বালা করে কেন ? মাথাই বা ভারি হয় কেন ? ঠিকই ভারি হয়, ভারি বই কি।" বলিয়া দত্তমশাই বার দুই মাথা ঝাঁকুনি দিয়া দেখিল।

"আচ্ছা, দাঁড়ান, আমি যা' যা' জিজ্ঞাসা করি, একে একে বলুন দেখি।"

তারপর ডাক্তার আর দত্তমশাইয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা হইল। অনেক কথাই দত্তমশাইকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল। দত্তমশাইও ডাক্তারকে আনুপূর্ব্বিক তাহার সকল কথাই জানাইল, কেবল সুরুচির কথাটা বাদ দিয়া গেল। ডাক্তারটি বয়সে নবীন হইলেও বিচক্ষণ। দত্তমশাইকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার কহিল,—"বুঝিছি। এ ধরণের অসুখ আমি অনেক সারিয়েছি। দেখুন, আমি একটা 'প্রেসক্রুপসান্' লিখে দি আপনাকে, এইটে try ক'রে দেখবেন, মাসখানেকের ভেতরই আপনি আগে যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি হবেন, কিন্তু 'প্রেসক্রুপসান্'টা ঠিক follow করবেন।" বলিয়া বুক পকেটের ক্লিপ হইতে পেন্‌টি লইয়া সেই অল্পান্ধকারেই ডাক্তার তাহার পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া প্রেসক্রুপসান লিখিল—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ দত্তের জন্য

Re	খাঁটি দুগ্ধ—	১সের
	মাখন (চায়ের সঙ্গে)—	১ছটাক
	ফলের রস—	প্রচুর
	দিবানিদ্রা—	০
	কুচিন্তা—	০
	সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ—	যথাসম্ভব
	প্রাতর্ভ্রমণ—	৬ মাইল
	দারপরিগ্রহ—	যদি সম্ভব হয়
	4.9.20	B. C. Ghosh.

প্রেসক্রুপ্সানখানি ভাঁজ করিয়া দত্তমশাইয়ের হাতে দিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"এক জায়গায় যেতে হবে এখনি, চল্লুম—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। দত্তমশাইও কাগজখানি হাতে লইয়া মাঠ হইতে রাস্তায় আসিল এবং একটা গ্যাস-পোষ্টের নীচে আসিয়া প্রেস্ক্রুপসানখানি পড়িতে যাইয়া দেখিল চশমাটি ভুলিয়া পকেটে আনা হয় নাই; সুতরাং আবার ভাঁজ করিয়া সেখানি পকেটে রাখিয়া বরাবর জগুবাজারের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতঃস্তত চাহিতেই দেখিল সম্মুখেই একটি ডিস্পেন্সারী। কম্পাউণ্ডারের হাতে প্রেস্ক্রুপসানখানি দিয়া দত্তমশাই কহিল,—"ওষুধটা দিন ত। কত দাম পড়বে?" প্রেস্ক্রুপসানখানি আগাগোড়া বারকতক পড়িয়া কম্পাউণ্ডার কহিল,—"এ ওষুধ আমি দিতে পারব না।"

"কারণ?"

"কারণ, এটা হোল ডিস্পেনসারী। ডিস্পেন্সারী না হ'য়ে এটা যদি combined হোটেল আর 'অয়েলম্যান-ষ্টোর' হোত আর তার সঙ্গে একটা লাইব্রেরী আর ঘটকালী-আফিস থাকতো, তাহ'লে আপনার প্রেসক্রুপসানের ব্যবস্থা হয়ত করতে পারতুম।"

"আপনার মাথা খারাপ হয়েচে না কি?"

"হয়নি, হ'বার উপক্রম হ'য়েছে,—তবে আমার নয়—আপনার।"

সেই সময় যাহার ডিস্পেনসারী সেই ডাক্তারবাবু আসিয়া পড়িলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, ব্যাপার কি? কি চাই আপনার?"

"আপনিই ডাক্তার বাবু বুঝি? এই দেখুন না মশাই, প্রেস্ক্রুপসানটা দিলুম, সাদা কথায় বল্লেই ত হয় যে এর ওষুধ নেই; তা নয়, ব্যঙ্গ ক'রে বল্লেন কি না—'এটা combined হোটেল আর oilman store নয়, library নয়—এ কী কথা মশাই? ডিস্পেনসারীতেই লোকে ওষুধের জন্যে আসে, তা ব'লে এই রকম বিদ্রূপ করাটা কি ভদ্রলোকের কাজ? আবার বলেন কি না যে, আমার মাথা খারাপ হোয়েছে!"

ডাক্তার বাবুটি দত্তমশাইয়ের হাত হইতে প্রেসক্রুপসানখানি লইয়া বার দুইতিন পড়িয়া কহিলেন,—"বসুন—বসুন, রাগ করবেন না, ওর একটু ঐরকম ছিট্ আছে; আর ও কম্পাউণ্ডারও নয়, কম্পাউণ্ডার বাইরে গেছে, এখনি আসবে। এ ওষুধ কি আপনার জন্যেই? মশায়ের নাম?"

"প্রাণনাথ দত্ত।"

"ওঃ—তাহ'লে এ ত আপনার নিজেরই ওষুধ দেখছি। কোথায় থাকা হয়?"

"৬৫।২ বি, হরিশ মুখার্জ্জি রোড।"

"তা বেশ;—এ ওষুধ আপনি পাবেন, নিশ্চয়ই পাবেন। তবে এর ভেতর একটা ওষুধ আছে, যার infusion বার করতে সেটাকে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সেটা না থাকলে এখনই আপনাকে ওষুধটা দিয়ে দিতে পারা যেত। আপনি কষ্ট ক'রে কাল সকালে একবার এসে kindly ওষুধটা নিয়ে যাবেন।—দত্তমশাই, এ প্রেস্ক্রুপসান্ কে করেচেন?"

"ইনি রেঙ্গুনে ডাক্তারী করেন, এখানে brother-in-lawর বাড়ী বেড়াতে এসেছেন।—দাম পড়বে কত?"

"বেশী পড়বে না, কাল্কেই বোলবো। অন্য জায়গায় হ'লে চোদ্দ সিকে নিত, আমি সিকে পাঁচেকের বেশী আপনার কাছ থেকে নোবো না। চল্লেন? আচ্ছা, নমস্কার।"

দত্তমশাই উঠিয়া যাইবার কিছু পরেই একটি সুন্দরী যুবতী তাহার গরদের সাড়ির সাঁচ্চার আঁচলাখানি দুলাইয়া ডিস্পেন্সারীতে প্রবেশ করিল এবং হাতের ছোট্ট 'এট্যাসি কেস্'টি টেবিলের উপর রাখিয়া ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল—"নমস্কার।"

"নমস্কার। কেমন আছেন? ওষুধ continue কচ্চেন ত?"

বুকের ব্রুচ্টিকে আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে যুবতীটি কহিল,—"তা কচ্চি বটে, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার তেমন ত পাচ্চি না।"

"কেন! মাথাধরা, অনিদ্রা, এগুলো ত গিয়েছে বল্লেচেন।"

"হ্যাঁ, তা কতক কতক গিয়েছে বটে, কিন্তু বুকের ভেতর সদাই যেন—"

"একটা palpitation হয়, মনটা যেন হুহু করে? যাবে—যাবে, ঐ ওষুধটা খেতে খেতেই যাবে। এই ত সবে হপ্তাখানেক খাচ্চেন, আরও হপ্তাখানেক খেয়ে যান, ও সব কিছু আর থাকবে না।"

"আচ্ছা, কমলালেবুর রস—এটা কি ডাক্তার বাবু? দিবানিদ্রা ০, কুচিন্তা ০, প্রাতর্ভ্রমণ ৬ মাইল, দারপরিগ্রহ —এটা কি প্রেস্‌ক্রিপসান না কি?"

দত্ত মশাইয়ের প্রেস্‌ক্রিপসানখানি সম্মুখেই 'পেপার-ওয়েট' দিয়া চাপা ছিল। ডাক্তার বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,— "ওটা প্রেস্‌ক্রিপসানই বটে, তবে একটু অদ্ভুত রকমের।"

"কি ব্যাপার বলুন ত।" বলিয়া যুবতীটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পেপার-ওয়েট্ সরাইয়া প্রেস্‌ক্রিপসানখানি হাতে তুলিয়া লইয়া উপরের নামটি পড়িয়াই আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কহিল—"অদ্ভুতই বটে! ইনি কি আপনারই 'পেসেন্ট্' না কি?"

"না। একটু আগে ঐখানি নিয়ে—"

"ইনি থাকেন কোথায় বলতে পারেন?"

"এই, হরিশ মুখার্জ্জি রোড্, কত নম্বর ব'লে গেলেন যে, —৬৫।২ বি বোধ হয়। অদ্ভুত লোকটিকে দেখতে চান না কি? তাহ'লে কাল সকালে এখানে আসবেন।"

"না, এম্‌নিই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম। আচ্ছা ডাক্তার বাবু—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

৫

"তোমার এমন কাজ, সুরুচি!"

"আর তোমারও এমন কাজ!"

৬৫।২ বি, হরিশ মুখার্জি রোডের নীচের একখানি ঘরে বসিয়া দত্ত মশাই ও সুরুচিবালার কথা হইতেছিল। দত্ত মশাই কহিল,—"রাগ লোকের হয় বটে, কিন্তু রাগ ক'রে এমন যাওয়াই গেলে যে, আধখানা কোলকাতা চুঁড়ে ফেলেও তোমার আর সন্ধান ক'রে উঠতে পাল্লুম না। এত পাষাণ তুমি?"

"আর তুমিও এত পাষাণ যে, বলা নেই, কহা নেই, ফট্ ক'রে বাসা তুলে একেবারে নিরুদ্দেশ! খুঁজে খুঁজে মরি! শেষে, বুক-ধড়্ফড়ানি রোগই জন্মে গেল!"

"আর আমারই বুঝি কিছু কম? ধরতে গেলে, আমার যা' যা' সব হোয়েছে, তা'তে আমাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই একজন ডাক্তারের একটা গোটা হাস্‌পাতাল্ inspection করা হ'য়ে যায়। কত ওষুধ খেলুম, কত কি করলুম, শেষকালে গড়ের মাঠে—"

"সে খবর শুনিছি। যতদিন হাটখোলায় ছিলে, মনে কর বুঝি যাই নি? কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কত খবর নিয়ে এসেছি। শুনলুম, মাঠে সকাল-সন্ধ্যায় রোজ হাওয়া খাও। তাই শুনে মাঠেতেই লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন খুঁজে গেছি।"

"লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি মাঠে এসেও খুঁজেছিলে তাহ'লে?"

"খুঁজিনি কি?—শেষকালে ভাবলুম, দেখাই যদি পাই, ধরতেই কি আর পারব? হয় ত পালিয়ে পালিয়েই বেড়াবে, হাতে ক'রে একগাছা দড়ি যদি আনতুম!"

"আবার ফাজ্‌লামি আরম্ভ করলে?"

"এর আর ফাজ্‌লামি কি? মন্নের দড়ি দিয়ে যাকে বাঁধতে পারা না যায়, তাকে শনের দড়ি দিয়েই বাঁধতে হয়; হয় কি না, তুমিই বল।"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া দত্ত মশাই কহিল,—"ব'সে ব'সে এই রকম ফাজলামি করবে, না, কি কি আনতে হবে সেটা ব'লে দেবে?"

"ব'লে ত দেওয়া হোয়েছে, আবার কতবার ক'রে ব'লে দোবো?"

"আট্‌পৌরে সাড়ী—মিলের না খদ্দরের?"

"না—না—খদ্দরের নয়—সব মিলের; খদ্দরের ঢাকাই না হয় একজোড়া আলাদা এনো, মিটিং-টিটিংয়ে যাবার জন্যে।"

"তাহ'লে যাই আমি?"

"আঃ—ভাল জ্বালায় পড়লুম! যাই বলতে আছে? বল—আসি।"

"আসি ?"

"এস ।"

* * * *

মুটের মাথায় তরকারির বাজার চাপাইয়া এক হাতে কাপড়ের একটা বাণ্ডিল আর এক হাতে সাবান ও আর আর কিসের ছোট বড় দুই চারিটা কাগজের বাক্স লইয়া দত্ত মশাই হন্ হন্ করিয়া সেই মোড়ের ডাক্তার-খানার সামনে দিয়া আসিতেছিল। দূর হইতে ডাক্তারবাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"দত্ত মশাই—দত্ত মশাই !" একটু নিকটে আসিয়া দত্তমশাই কহিল, "সময় নেই, ডাক্তার বাবু, বড় ব্যস্ত ।"

"আপনার ওষুধটা নিয়ে যান।"

"থাক, আর দরকার নেই, সেরে গেছি।" বলিয়া দত্ত মশাই চলিতে আরম্ভ করিল।

"কোন্ ওষুধে সারলো, দত্তমশাই ?"

দ্রুতপদে চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া দত্তমশাই কহিল,—"ওই গিয়ে—কোবিরাজী, কি বলে ? মহা-মহা-মহাশক্তি রসায়ন !"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

তৃষিত-যৌবন

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম,এ

কাল রাতে দেখিনু স্বপন,
নিখিলের ঘরে ঘরে উঠেছে ক্রন্দন !
বিশ্ব ভরি' যত প্রেম ছিল ঘরে ঘরে,
আজ তাহা নাহি কিছু প্রিয়জন তরে !

শ্যামল ক্ষেতের পারে বনান্তের তীরে
ছিল যত রূপক্ষুধা কুটীরে কুটীরে
আজ যেন নাহি কিছু। উঠানের মাঝে
যে পুষ্প উঠিত ফুটি' ফুল্লস্নিগ্ধ লাজে
প্রতিটি সন্ধ্যায়,—নিরানন্দ মূর্চ্ছাহত
আজি তাহা—আর যেন আগেকার মত
প্রেমতৃষ্ণা রূপক্ষুধা তুলে নাহি ধরে
কৃষকের গৃহলক্ষ্মী বধূর অন্তরে !
বসন্তের উচ্ছলিত পবন হিল্লোলে
মৃদুমন্দ মর্ম্মরিত পল্লবের কোলে
কুহুরব বেজে ওঠে—সেই কুহুতানে
সরম-সঙ্কোচ-নত কিশোরী-নয়ানে
চঞ্চলতা জাগে নাক। ধরণীর পরে
সর্ব্বক্ষুধা শ্রান্ত ক্লান্ত চিরদিন তরে।

আকাশে বাতাসে যেন ভরি' চারিধার
অতৃপ্ত প্রেমের তৃষা, শুধু হাহাকার,
হৃদয়ের কান্না শুধু। মানবের মন
সারাটি ভুবন ফিরে হেন রত্নধন
খুঁজে খুঁজে পায়নাক আজ,—যাহা ল'য়ে
পূর্ণমনে যেতে পারে প্রিয়ার আলয়ে।
হেন ভাষা পায় নাক, ল'য়ে যেই সুর
ব্যক্ত ক'রে দিতে পারে নিজ ভারাতুর
হৃদয়ের লক্ষ কথা।

ব্যাকুল নয়নে
বসন্তের অপরাহ্ণে মুক্ত বাতায়নে
বসিয়া রয়েছে প্রিয়া ; সুরভি বাতাস
নিঃশব্দে নিতেছে কাড়ি' প্রতিটি নিশ্বাস

সঙ্গীতের তালে তালে। মূর্চ্ছনার সম
নীলাম্বরী শাড়ীখানি মুগ্ধ নিরুপম
অচঞ্চল তনুখানি করিয়া বেষ্টন
একপার্শ্বে পড়েছে ঘুরিয়া ; সুদর্শন
তরঙ্গিত এলোচুল পিঠে ফেলা তার।
মৌন কোন্ দৈন্য-স্পর্শে স্তব্ধ চারিধার
অব্যক্ত করুণ !—আমি তার পার্শ্বদেশে
ধীরে ধীরে যাইনু উঠিয়া ; অনিমেষে
অনিন্দিত মুখপানে রহিলাম চাহি'
আবেগ-উচ্ছ্বাসভরে ;—যেন কিছু নাহি
হৃদয়ের কথা বলিবার ; স্তব্ধ হ'য়ে
বক্ষমাঝে শুধু মোর আপনারে ল'য়ে
রহিলাম বসি' ;—হৃদয়ের লক্ষ কথা
প্রণয়ের উদ্বেলিত শত মুখরতা
আজ যেন শান্ত মৌন সবে !—সাধ মনে,
রক্তিম প্রণয়-ভরা সহস্র চুম্বনে,
অন্তরের অন্তহীন বিশ্বাসের ভরে
আপনার সবটুকু তার দুটি করে
উজাড় করিয়া দিতে। আজ কিছু নাই
প্রকাণ্ড এ বিশ্বমাঝে ; খুঁজে নাহি পাই
প্রণয়ের কোন কথা ; বিশ্ব যেন আজ
লাবণ্যের প্রেতমূর্ত্তি রিক্ত শূন্য সাজ !

মোর চিরদিবসের ছিল যেই প্রিয়া,
আজ যেন মনে হয় গেছে সে চলিয়া।
সেই হাসি, সেই সুর, চঞ্চলতা সেই,
অঙ্গে অঙ্গে ছন্দ-নৃত্য, আর যেন নেই
মোর আজিকার এই তরুণ প্রিয়ার
সর্ব্বদেহমনে। কি গম্ভীর দেহভার
তার সেই অনিন্দিত তনুখানি আজ
রেখেছে বেষ্টন করি'; নাই সেই সাজ
প্রতিক্ষণে নিত্য নব,—পরে আর খোলে
দিনে শতবার ; নাহি কথা সন্ধ্যা হ'লে,
নাহি সেই পূর্ব্বকার মান অভিমান,
নিশীথের ছলভরা সেই নিদ্রাভাণ,
নাহি আর পূর্ব্বকার সেই ছেলেখেলা।
—মনে হয় প্রিয়া মোর বড়ই একেলা
এই দীন মর্ত্ত্যঘরে। অবনত মুখে
স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রয় আমার সম্মুখে।
নিশীথের সুপ্তিসম চোখ মুখ চুল
নিদ্রালস ; সর্ব্বতনু বিষাদব্যাকুল ;
সর্ব্বাঙ্গে মিনতি মাখা। দীনহীন হ'য়ে
কেমনে বাঁচিয়া থাকে মানব-আলয়ে
প্রিয়-হারা প্রিয়া মোর ? ধরণীর ঘরে
নাহি প্রেম ভালবাসা মানবের তরে।
তার সে হৃদয়মাঝে নাহি হেন বাণী,
যাহা ল'য়ে ব্যক্ত করে নিজ প্রেমখানি
নিজ প্রিয়া-পাশে !

সমস্ত আকাশ
মানবের দুঃখে দুখী ফেলিছে নিশ্বাস।
মর্ত্ত্য ঘরে অহর্নিশি করিছে ক্রন্দন
মর্ত্ত্যবাসীদের মত তৃষিত যৌবন !

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

কাব্যের অশ্লীলতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়। এমন কি, গত শতাব্দীর ইংরাজী মতে তা ঘোর অশ্লীল। Hall নামক জনৈক ইংরাজ Orientalist "বাসবদত্তার" যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার ভূমিকার প্রতি নজর দিলেই সমগ্র সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সেকালের ইংরাজী ওরফে খৃষ্টানী সাধু মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় সকলেই পাবেন।

অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ, সে বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা বোধ হয় সকলেই একমত। চার্ব্বাক যদি অলঙ্কারশাস্ত্র লিখতেন, তা' হ'লে এ বিষয়ে অনেক পিলেচমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিশ্চয়ই পেতুম। তবে আমার বিশ্বাস, অশ্লীলতা যে কাব্য-দেহের শোভা বৃদ্ধি করে না, এ বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মতভেদ নাই।

বলা বাহুল্য শ্লীলতা— অশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়। কাব্যের দোষগুণের একটি সহজবোধ্য ফর্দ্দের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাব্যাদর্শ পুরোনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক্। দণ্ডি বলেছেন,—

কামং সর্ব্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা॥"

অর্থাৎ—যদিও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্রাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডির মতে অলঙ্কারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়, কিন্তু অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, "সালঙ্কারতয়া রসব্যঞ্জকোর্থো মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্।" প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে "বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।" অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য্য অলঙ্কারের সাহায্যে আরও মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কেন? আলঙ্কারিকদের মতে যা রসের প্রতিবন্ধক তাই দোষ, এবং যেহেতু অশ্লীলতা বিশেষরূপে রসের প্রতিবন্ধক, সে কারণ তা কাব্যের বিশেষ দোষ।

তাঁদের মতে অশ্লীলতা দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ—অপর কোন বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার poetics অন্তর্ভূত ethics-এর নয়। সম্ভবতঃ এই কারণে Hall প্রমুখ ইংরাজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল ব'লে গণ্য, সে কাব্য আলঙ্কারিকদের কাছে সরস ব'লে মান্য হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাব্য-বিচারের মার্গ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী—

'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।'

যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, তাঁরা যে কবি-প্রতিভাকে মানুষের হাত-গড়া সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন ব'লে স্বীকার করবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত; সত্য অথবা শিবের হাত ধ'রে নয়।

সেকালে গ্রাম্যতার অর্থ এ কালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডির মতে—

"কন্যে কামায়মানং মাং ন ত্বং কাময়সে কথম্।" উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে—"কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি

"সঙ্কলনে"র প্রবন্ধগুলি মূল প্রবন্ধগুলির সারাংশ।

বামাক্ষি নির্দ্দয়।" এই উক্তিটি শুধু "অগ্রাম্যোঽর্থঃ" নয়, উপরন্তু রসাবহ।

এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক্। দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজি ভাবে বললে তা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই, তা শুধু অগ্রাম্য নয়—রসাবহ হয়। একালে অনেকে হয় ত উক্ত প্রথম পদটিই বেশী পছন্দ করবেন; কারণ, তার ভিতর আর কিছু না থাক্, স্পষ্ট passion আছে, আর শেষ পদটির ভিতর যা আছে, সে শুধু সে কালের সাহিত্যিক fashion মাত্র।

কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ দোষ ব'লে গণ্য হয়। দণ্ডির পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বামন এই উভয়বিধ দোষের উল্লেখ করেছেন—বামনের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা তাঁর মতই অনুসরণ করেছেন।

এখন দেখা যাক্ এ দুই দোষের মূলে কি আছে। বামন বলেন—"লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্" অর্থাৎ যে কথা শুধু জনসাধারণের মুখে শোনা যায়—কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না,—সেই কথাই গ্রাম্য। একথা শুনে মনে হয় যে, তাঁরা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা ব'লে গণ্য করতেন। অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চলবে না,—আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

তাঁদের মতে গ্রাম্য পদের ন্যায় 'অপ্রতীত' পদ কাব্যে অব্যবহার্য্য। অপ্রতীত শব্দের অর্থ কি?

"শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তম্ প্রতীতম্"

অর্থাৎ "শাস্ত্রে এব প্রযুক্তং, ন্ন লোকে তদপ্রতীতং পদম্।" অর্থাৎ পণ্ডিতী শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কবির কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের আলঙ্কারিকদের সঙ্গে ফরাসী দেশের classical আলঙ্কারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তাঁরাও সাহিত্য-রাজ্য থেকে pedantic ও vulgar শব্দ সকল বহিষ্কৃত ক'রে দেবার জন্য ধনুক ধারণ করেছিলেন।

এর থেকে বোঝা গেল, বামন-প্রমুখ আলঙ্কারিকদের মতে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ।

অপর পক্ষে অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেও যথেষ্ট অশ্লীল বাক্য রচনা করা যায়। সুতরাং অশ্লীলতা দোষ কাকে বলে, তা আলঙ্কারিকদের মুখে শোনা যায়। বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা "ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী।" অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিম্বা জুগুপ্সার জন্ম দেয়, তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাস্য, কার মনে? আলঙ্কারিকদের মতে সামাজিকদের মনে। তাঁরা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক—যারা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় cultured society। দেশভেদে ও যুগভেদে cultured societyরও রুচি বিভিন্ন। Anatole Franceএর কথা ইংরাজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসীদের রুচিতে নয়।

সম্প্রতি বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি নূতন কথার আবির্ভাব হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা।" এখন এ কথা জোর ক'রে বলা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, তাঁরা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর যার রূপ নেই, তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী। এই রূপের বিচার করাই সমালোচকের একমাত্র কর্ত্তব্য।

আলঙ্কারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেন না, ত কাব্যের রূপ নষ্ট করে; কারণ, ব্রীড়া, জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়; একটি বদ্-সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়। কারণ, শ্রোতার কাণে তা বেসুরা লাগে।

অশ্লীলতা কাব্যের দোষ; কেন না, তা সামাজিক লোকের রুচিতে বে-খাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলঙ্কারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক।

এখন সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জার্ম্মাণদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসাবে ইংরাজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসীদের তেমনই খ্যাতি আছে।

অথচ ফরাসী রুচি ইংরাজী রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরাজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না ব'লে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নৈতিক কিম্বা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিই আলঙ্কারিকরা বহু পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিলেন।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক। সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিষটা কি এবং কোন্ কোন্ বস্তুর সদ্ভাবের উপর তা নির্ভর করে

তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন ব'লে আমি জানিনে।

আমার মনে হয়, যাঁরা মুখে বলেন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা—তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর তাঁদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজরক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক্, আর অসুস্থই হোক্, তা যেমন আছে, সেই ভাবেই টি'কে থাক্, এই হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক কামনা; এবং এ জাতীয় লোক কথাকে অত্যন্ত ডরান, কারণ, তাঁদের ধারণা, সামাজিক মনের উপর কথার প্রভাব মারাত্মক, বিশেষতঃ সে কথা যদি উজ্জ্বল ও মনোহারী হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাক্য সামাজিক লোকদের মনে এই জাতীয় আশঙ্কার উদ্রেক করে, সে বাক্য রসের প্রতিবন্ধক কি না।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা, ইংরাজীতে যাকে বলে morality, তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের moral senseকে পীড়িত করে, তাও ছিল তাঁদের মতে কাব্যে বর্জ্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন,—

"অসদুপদেশকত্বার্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্যম্ ইত্যপরে।"

অর্থাৎ অপর আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে "অস্ত্যয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বেন।" অর্থাৎ অসাধুপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে, বিধি হিসাবে নয়। রাজশেখরের সঙ্গে অপর আলঙ্কারিকদের মতের প্রভেদ কোথায়, বোঝা কঠিন। বোধ হয়, অপর আলঙ্কারিকদের মতে অসদুপদেশ কাব্যে একেবারে বর্জ্জনীয়, কিন্তু রাজশেখরের মতে কাব্যে সে উপদেশ থাক্‌তে পারে, কবি যদি সে উপদেশকে অসৎ বলেই উল্লেখ করেন। কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের উপর প্রবল, সে ধারণা তাঁদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন "কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা" "সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।" এর বাঙ্গালা—লোকের জীবনযাত্রা কবি-বচনের আয়ত্ত এবং সে জীবনযাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরাজীতে যাকে বলে virtue, welfare। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, morality হচ্ছে জীবনযাত্রার মূল, তাঁদের মতে কাব্যের ফুল সে মূল হ'তে বিচ্ছিন্ন নয় এবং সে মূলের সংস্কার কাব্য-কুসুমের অন্তর্নিহিত। এর থেকে দেখা যায়, অশ্লীলতার ন্যায় অসদুপদেশও সেকালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল; তবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এইমাত্র যে, তাঁরা অসৎ বাক্যকে aesthetic emotionএর প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত; আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।

আমরা যে "aesthetic emotionsকে আমল দিই নে, তার কারণ আমরা ইংরাজী-শিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমি পূর্ব্বে বলেছি, ইংরাজ জাতি ঘোর নৈতিক ব'লে গণ্য, তবে moralityকে তারা utilityতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর অসুন্দর, সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যার জ্ঞান, ইংরাজীজ্ঞানের অনুরূপ। কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি—ইংরাজী অরুচির তরজমা মাত্র।

[মাসিক বসুমতী · বৈশাখ, ১৩৩৬]

বঙ্গদেশে নারী-আন্দোলনের গতি-পরিণতি

শ্রীক্ষেত্রমোহন্ পুরকায়স্থ এম-এ

বর্ত্তমানে বাংলাদেশের নারীসমাজের আত্ম-চেতনা আসিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে কলিকাতার বহু অন্তঃপুরে যখন নারীর শতাব্দীর সুপ্তি প্রথম ভাঙ্গিয়া যায় তখন জাগরণের সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়াছিলেন এদেশের এক পুরুষ-সমাজ। ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিংবা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণই নাই।

নিরক্ষর সমাজে, বিশেষতঃ নিরক্ষর নারী-সমাজে, সংহতিচেষ্টা অসম্ভব। কাজেই নারী-আন্দোলনের প্রথম উন্মেষ নারীর শিক্ষা-প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম নারী-শিক্ষার চেষ্টার সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর Female Juvenile Society নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতি নানা প্রকারে বিশেষতঃ পাদ্রী মহিলাদের সাহায্যে এ দেশে বালিকাশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহার প্রায় পনের বৎসর পরে একটি ইংরাজমহিলা-কর্ম্মীর উদ্যোগে Bengal Ladies Association নামে আর একটা অনুষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহাদেরও চেষ্টা ছিল মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা-প্রচার। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতসরকারের আইন-সচিব বেথুন সাহেবের চেষ্টায় বেথুন কলেজ স্থাপিত হয়। এই প্রকারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত নারী-আন্দোলন নারীর শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টার মধ্যেই পর্য্যাহৃত রহিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার-ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিলেন বটে, কিন্তু ইহা লইয়া কোন সাধারণ আন্দোলন হইল না। নারী-আন্দোলনের এই যুগের আর দুইটি ঘটনা—সহমরণ-নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন। কিন্তু এই দুই আন্দোলনের ভিতর-কার কথা ছিল, নারী-মঙ্গল-চরিতার্থতা নহে, হৃদয়হীন সামাজিক অত্যাচারের প্রতীকার করা। কাজেই বলি আমাদের নারী-আন্দোলনের প্রথম যুগে—১৮১৭ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর —শিক্ষা বিস্তারই ছিল একমাত্র ধ্যান ও ধারণা।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নারী-আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত হইল। এই বৎসর মাঘোৎসবের সময় কেশবচন্দ্রের তরুণী পত্নী প্রকাশ্যে উৎসবে যোগদান করিলেন। বাঙ্গালী মহিলার অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলাসহ Dr. Robson নামক পাদ্রি সাহেবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাঙ্গালী মহিলারা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ইংরাজ-বাঙ্গালীর এক মিশ্র সম্মিলনে যোগদান করিলেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে খৃষ্টোৎসবে উপাসনান্তে বাঙ্গালী মহিলাদিগকে উপস্থিত ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের জন্য "বামা-বোধিনী" পত্রিকা বাহির করা হইল- "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামে একটি নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র Adult Female School প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহোদয়রা আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" নামক শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের "অবলাবান্ধব" পত্রিকা নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রচার করিতে লাগিল।

"বঙ্গ মহিলাসমাজের" প্রতিষ্ঠা হইতে নারী-আন্দোলনের তৃতীয় যুগ ধরা যাইতে পারে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সমাজের পত্তন; কিন্তু পর বৎসর হইতেই এই মহিলাসমাজের কর্ম্মঠতা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে নারী স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে শিখিতেছেন। দ্বিতীয় যুগের নারী-আন্দোলনে পুরুষেরাই অগ্রগামী, তাঁহারাই ছিলেন সমাজে ও পরিবারে নারীর যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যগ্র। এখন হইতে জাগ্রত মহিলাসমাজই এই স্থান-নির্দ্দেশের ভার লইলেন। 'বঙ্গ মহিলাসমাজ' প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া সম্মিলিত হইতেন। কিন্তু আলোচনা-অধ্যয়নের মধ্যেই তাঁহাদের কার্য্যতালিকা নির্দ্দিষ্ট রহিল না। মহিলাসমাজের মেয়েরা বালক-বালিকা-শিক্ষার ভার লইলেন—সাপ্তাহিক নীতি-বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই Mrs. Knight নামক ইংরাজমহিলার ভারত-ত্যাগের উপলক্ষে মহিলাসমাজ এক সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে মেয়েরা অবাধে উপস্থিত ইংরাজ-ভারতীয় পুরুষ-অভ্যাগতের সহিত মেলা-মেশা করেন। ঐ বৎসর একজন মহিলা সর্ব্বপ্রথম সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার আচার্য্যাণীর কাজ পর্য্যন্ত করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে Opium Commission কলিকাতায় আসিলে বাঙ্গালী মহিলারা কমিশনের সভ্যগণকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। পর বৎসর "মুকুল" পত্রিকার জন্ম হয়, ইহা সম্পূর্ণভাবেই মহিলাদের উদ্যোগের ফল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গ মহিলাসমাজ' উঠিয়া গিয়া "ভারত মহিলা সমিতি" স্থাপিত হয়। এই স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে নারী-আন্দোলনের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। নারী-আন্দোলন ব্রাহ্ম-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া উঠিলেও এখন আর ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় যুগে মহিলাদের কর্ম্মতালিকা যেমন সৌখিন সামাজিক মেলা-মেশা ও বালক-বালিকা-শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন আর তাহা রহিল না। বৎসর তিন চারেকের মধ্যেই "ভারত স্ত্রী-ধর্ম্মমহামণ্ডল"ও স্থাপিত হইল। নারী-সমাজের দৃষ্টির প্রসার হইল; কঠোরতর কর্ত্তব্যের উপলব্ধি আসিল। কিন্তু তৃতীয় যুগে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াজাত যে উত্তেজনা ছিল তাহা শান্ত হইয়া আসিল। আন্দোলনের মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইল বটে কিন্তু শক্তি হ্রাস হইল। এই আধুনিক যুগের ইতিহাস আর বিশেষ আলোচনা করায় লাভ নাই। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে নারী-আন্দোলনের আবার এক নূতন যুগের অবতারণা গণনা করা যাইতে পারে।

[বঙ্গলক্ষ্মী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬]

আর্য্যপূর্ব্ব ভারতীয় সভ্যতা

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র পাল

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা চারিটী প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র দেখিতে পাই, যথা ভারতবর্ষ, মিশর, মধ্যএশিয়া এবং আরবের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সভ্যতা জন্ম লাভ না করিয়া এই চারিটি স্থানে করিল কেন? এই চারিটি স্থানে একই রূপ কোন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমাবেশ আছে কি না, আমরা একে একে তাহা আলোচনা করিব।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মিশরকেই প্রাচীন সভ্যতার আদিস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই মিশরেই সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। পৃথিবীর মধ্যে আফ্রিকার সাহারা বৃহত্তম মরুভূমি। এই বিস্তৃত মরুভূমির পূর্ব্বদিকে যে অংশে ছোট বড় অনেক পাহাড় আছে তাহাকে মিশর বলে। এই সকল পাহাড়ের নিকট দিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় নদী নীল আঁকাবাঁকা হইয়া ভূমধ্যসাগরে গিয়া পতিত হইয়াছে। এই স্থান আফ্রিকার স্বর্গ বলিয়া কথিত হয়। এই নীল নদীর দুই তীরের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা! নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী এখানে উৎপন্ন হয়। এই উর্ব্বরতাই মিশরবাসীকে সভ্যতার দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। মিশরের এই নদী-প্রবাহিত স্থানে সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়। সেই অতীত সভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ চতুর্থ বংশীয় ফ্যারোগনের নির্ম্মিত পিরামিড্ এবং নানাপ্রকার শিলালিপি আজও দেখিতে পাওয়া

যায়। পিরামীড মিশরীয় সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। ইহা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য। এই সকল পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে যে জ্ঞানালোক ও কার্য্যকুশলতার আবশ্যক হইয়াছিল, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহা লাভ করিতে পারিয়াছে কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। মিশরের এক ফারোর প্রাচীন মন্দিরের ভিতর সুগন্ধময় এক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। বহুযুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও উহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে। এই কথা বর্ত্তমান কালের রাসায়নিকগণ ভাবিতেও পারেন না এবং কি বস্তুদ্বারা জিনিষ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

মধ্য এশিয়া জগতের সভ্যতার অন্য একটি কেন্দ্রস্থান। আবার কেহ কেহ বলেন, মধ্য এশিয়াই আদি সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। মধ্য এশিয়া ইহাতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষ, পারস্য, আফগানিস্থান, গ্রীস, রোম, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে গমন করে। মধ্য এশিয়া প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি। ইহার ভিতর অনেক ছোট পাহাড় আছে। এই সকল পাহাড়ের নিকট দিয়া দুইটা অভ্যন্তরীণ নদী (inland river) আরল হ্রদে গিয়া পতিত হইয়াছে। এই সকল নদীর উপকূলে সভ্যতা জন্ম লাভ করে। কোন্ যুগে কি ভাবে এখানে সভ্যতার আলো জ্বলিয়া উঠে আজ পর্য্যন্ত তাহা কেহ স্থির করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে মধ্য এশিয়ার রিসার্চ্চ বিভাগের নিকট জানা গিয়াছে যে, মধ্য এশিয়ার সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার ছোট ভগিনী। ঐ সভ্যতা ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতার সামসাময়িক।

মধ্য-এশিয়াতে যে সময় সভ্যতার বিস্তার হয়, সেই সময় আরবের ভীষণ মরুভূমির চারিদিকে অন্য একটি সভ্যতা তাহার উন্নতির চরম সীমায় উঠে। এই সভ্যতার আলোক পারস্য উপসাগরের নিকট টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রথম দেখা যায়। এই স্থানকে ব্যাবিলনিয়া বলে। এখান হইতে ক্রমে ক্রমে এই সভ্যতা আরবের চারিদিকে বিস্তারলাভ করে। ব্যাবিলনিয়ার বর্ত্তমান নাম মেসোপোটেমিয়া। অনেকে বলেন যে, আরবের উত্তর প্রান্তে হেতিত নামে একটি স্থান ছিল; ঐ স্থানে প্রথম সভ্যতার জন্ম। তথা হইতে ব্যাবিলনিয়া, ইরানিয়া, পারস্য, পেলেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে বিস্তারলাভ করে।

পৃথিবীর যতগুলি আদি সভ্যতার কেন্দ্র দেখা যায়, তাহার সমস্তগুলিই বিষুবরেখার উত্তরে ৬ ছয় ডিগ্রী হইতে ৪৬ ছিয়াল্লিশ ডিগ্রীর মধ্যে অবস্থিত। পৃথিবীর যে তিনটি প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কর্কট সংক্রান্তি—Tropic of cancerএর অন্তর্গত।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। ইহার ভিতর প্রাকৃতিক বিচিত্রতাও যথেষ্ট। পশ্চিম ভারতে রাজপুতনা একটা বিরাট মরুভূমি। এই মরুভূমির ভিতর ছোট ছোট অনেক পাহাড় আছে। এই সকল পাহাড়ের নিকট দিয়া ভারতের বৃহত্তম নদ সিন্ধু প্রবাহিত। এই স্থান বিষুবরেখার উত্তরে ছয় ডিগ্রী হইতে ছিয়াল্লিশ ডিগ্রীর মধ্যে এবং কর্কট সংক্রান্তি—Tropic of cancerএর মধ্যেই অবস্থিত। প্রাকৃতিক বিশিষ্টতার সহিত সভ্যতার যে একটি নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাই, উহা হইতে বলা যায় যে, ভারতের রাজপুতনায় একটি সভ্যতার স্বেচ্ছাবিকাশ হইয়াছিল। এই সভ্যতা ভারতের নিজস্ব আদি সভ্যতা। ইহার সহিত অন্য কোন সভ্যতার সংযোগ ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার ভিতর অন্য দেশীয় সভ্যতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না, বরং ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার নিকট ঋণী। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ভারতীয় সভ্যতা ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা হইতে বয়োবৃদ্ধ। অন্য দিকে দেখিতে পাই ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা মধ্য এশিয়ার সভ্যতার সমসাময়িক।

ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার নিকট ঋণী এবং পরবর্ত্তিকালের, তাহা হল সাহেব তাঁহার "History of Ancient Near East" নামক পুস্তক লিখিয়াছেন,—অর্দ্ধ মনুষ্য এবং অর্দ্ধমৎস্যাকারের এক দেবী পারস্য সাগর অতিক্রম করিয়া ব্যাবিলনিয়াতে পৌঁছেন। তিনি ভারত হইতে সভ্যতার চন্দ্র লইয়া ব্যাবিলনিয়াতে গমন করেন। সেই সময় হইতে ব্যাবিলনিয়াতে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরব সাগরের তীরে অনেক বাণিজ্য বন্দর ছিল। দ্রাবিড়ীগণ স্থলপথে এবং জলপথে ঐ সমস্ত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত। এইভাবে বাণিজ্যের সাহায্যে ভারত হইতে সভ্যতার আলোক ধীরে ধীরে ব্যাবিলনিয়াতে গিয়া পৌঁছে। মোটামুটি দেখিতে পাই যে ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার কন্যা এবং ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতা মধ্য এশিয়ার সভ্যতার সমসাময়িক। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, ভারতীয় সভ্যতা মধ্য এশিয়ার সভ্যতা হইতে প্রাচীন। সুতরাং আর্য্যজাতি মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে একটি উন্নত ধরণের সভ্যতা ভারতে বর্ত্তমান ছিল। আর্য্যপূর্ব্ব ভারতীয় সভ্যতাই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা নামে পরিচিত।

রাজপুতনা আদিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক দিন হইতেই ইহা ঠিক করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে সিন্ধু প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে হারাপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে খনন কার্য্য চলিতেছে। এই খনন কার্য্যের অন্যতম উদ্যোগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত দ্রব্য ঐ সকল স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ব্যাবিলনিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন কালের দ্রব্যের সহিত তুলনা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ সকল বস্তুর সহিত ব্যাবিলনিয়ার প্রাচীন কালের দ্রব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং ঐ সকল দ্রব্যের ভিতর আর্য্য সভ্যতার কোন চিহ্ন নাই, ঐ সকল

বস্তু আর্য্যপূর্ব্ব ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন। এই অসাধারণ কার্য্যের ফলে ভারত-ইতিহাসের একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা আর্য্য সভ্যতার পরবর্ত্তিকালের বলিয়া মানিতেন, তাঁহাদের অনেকেই ইহাকে আর্য্যপূর্ব্ব ভারতীয় সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের উত্তরাঞ্চল বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশ সমুদ্রের গর্ভে ছিল। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার মধ্যে আরব সাগর। ভৌগোলিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই স্থানে বিরাট একটা মহাদেশ ছিল। মাদাগাস্কার সিংহল এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন দেশ ছিল না। কালপ্রবাহে ভূমিকম্পে এই স্থান জলে ডুবিয়া যায়। সিংহল, ভারতবর্ষ এবং মাদাগাস্কার পৃথক হইয়া পড়ে। সিংহল, ভারতবর্ষ এবং মাদাগাস্কার দ্বীপের জীব জন্তুর সামঞ্জস্য দেখাইয়া এই সকল স্থানের প্রাণী যে একই ভূভাগের বংশধর তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন। একটা পরিবর্ত্তনের ফলে মাদাগাস্কার বহুদূরে গিয়া পড়ে, তাহার সহিত ভারতের আদান প্রদান বন্ধ হয়। সিংহল একটি দ্বীপ ভিন্ন হইলেও ভারতের অতি নিকটে, সুতরাং ইহার সহিত আদান প্রদান বন্ধ হয় নাই।

রামায়ণী যুগে সিংহলে যে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল, তাহার কোন কোন অংশ আর্য্য সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। যে অনার্য্য কোল, ভীল, সাঁওতাল জাতীয় লোক সভ্যতার সংস্পর্শে থাকিয়া আজ পর্য্যন্তও সভ্য হইতে পারিল না, সেই জাতীয় লোকেরা কি রামায়ণী যুগে সভ্যতা লাভ করিতে পারে? রামায়ণী যুগে সিংহলে যে সভ্যতার চিহ্ন দেখিতে পাই, উহা দুই একদিনের সভ্যতা নহে। এরূপ সভ্যতা লাভ করিতে যে, তাহাদের কত যুগ লাগিয়াছিল কে তাহার সংবাদ রাখে? সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। রামচন্দ্রকে রাবণের নিকট রাজনীতি শিখিতে হইয়াছিল।

দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই সভ্যতা আর্য্যপূর্ব্ব কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। অনেক ঐতিহাসিক আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতার একটা আভাস দিয়াছেন। সেই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে Rhys David লিখিত নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা ডেভিড সাহেবের লিখিত কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবেই যে আর্য্য সভ্যতার পূর্ব্বেও একটা সভ্যতা ভারতে বিদ্যমান ছিল-"It is a common error vitiating all conclusions as to the early history of India, to suppose that the tribes with whom the Aryans, in this gradual conquest of India came into contact, were savages. Some were so. There were hilltribes, gypsies, bands of hunters in the woods. But there were also settled communites with highly developed social organisation, wealthy enough to excite the cupidity of the invaders, and in many cases too much addicted to the activities of peace to be able to offer, whenever it came to a fight, a prolonged resistance. But they were strong enough to retain, in some cases, a qualified independence, and in others to impose upon the new nations that issued from the struggle many of their own ideas, many of the details of their own institutions."

[মানসী ও মর্ম্মবাণী—বৈশাখ, ১৩৩৬]

ব্যর্থ প্রতিশোধ

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়
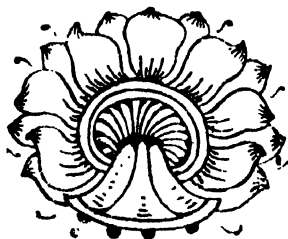
কলিকাতা হইতে মাইল কুড়ি দূরে—এই মধুপুরে যখন আসি, নীরব কবি বৌদিদি বড় আশায় বলেছিলেন, "দেখো ভাই ঠাকুর পো, জীবনে আর কখন কোলকাতার বার হওনি, চোখ চেয়ে যেন চলাফেরা কোরো। দেশ উদ্ধারের কর্ম্মী তোমরা—গেঁয়ো জীবনের সৌন্দর্য্যটি ভাল কোরে দেখে এস।"

কথাটা রোজ মনে ক'রে বড় বড় চোখে চার ধারে চেয়ে বেড়াই, কিন্তু কোন সৌন্দর্য্যই অভাগার চোখে চমক লাগায় না। বোধ হয়, এত কষ্ট ক'রে খোঁজ করি ব'লেই সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না। এ জগতে যে যাকে যত নিবিড় ক'রে পেতে চায়, সেই তার কাছে থেকে তত দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ায়।

মাঠের পথ দিয়ে শিখার ছোট হাতটি ধ'রে বাড়ী ফিরছি—এম্নি রোজ ফিরি। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। লজ্জানত বধূর মত পৃথিবী স্বচ্ছ, স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে যেন কত রহস্যময়! সাম্‌নে আবছায়া-ঢাকা শ্যাম-স্নেহাঞ্চল খানি লুটিয়ে আছে, আর মাথার ওপরে দু-একটি তারা যেন ছোট্ট শিশুর মত দীর্ঘ নিদ্রার পর পিট্‌পিট্ কোরে স্বপ্ন-ভরা আঁখি মেলচে। সাত বছরের মেয়ে শিখা, মুখে তার সদাই খই ফোটে। কিন্তু তারো মুখে এখন কথা নেই। তার চঞ্চল চিত্তটি যেন সন্ধ্যার এই জটিল রহস্যের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে।

"ও শিখা, তোর সঙ্গে কে যাচ্ছে রে?" পেছনে চেয়ে দেখি একজন বুড়ো শীর্ণ লোক। বয়স যা' তার চেয়ে বেশ বড় দেখায়। শরীর ভেঙে গেছে। মুখে দুঃখের ঘনছায়া। কথা শুনে শিখার ঘুম যেন সহসা ভেঙে গেল। কথা বলা তার স্বভাব; এতক্ষণ যে সে চুপ ক'রে ছিল—এটাই অস্বাভাবিকতা। এক নিমেষে সহস্র কথায় সে আমার পরিচয় আর গতিবিধির সংবাদ সব দিয়ে দিলে। গতবছর তার মার টাইফয়েড্ হোলে এই ছোট মামাই যে তাকে মার স্নেহ দিয়ে পালন করেছিল—সে কথাটাও বলতে সে ভুললে না।

দু-এক কথার পর লোকটি একটু কেশে ভাঙা গলায় বললে, "বেশ বাবা, সহরের ছেলে তোমরা, গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তার উন্নতি করতে চেষ্টা করো—এইত চাই। হ্যাঁ, একটা কথা বলছিলুম। তোমরা কলেজে পড়ো বাবা, একটা ভাল মধ্যবিত্ত ঘরের পাত্র দেখে দিতে পার? একটা মেয়ে আছে। বড়ই বিব্রত হোয়ে পড়েচি। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়। লেখাপড়াও জানে। বড় ঘরে বে দেবার জন্যে বিনু তাকে তৈরী করেছিল—বিনু যদি আজ থাকৃত ত'..." বেদনার ভারে স্বর রুদ্ধ হোয়ে গেল। যেন একটা কাতর কাকুতি থেমে গেল—অর্দ্ধেক পথে এসে।

যুথী এসে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, পরাণবাবু আজ পথে তোমায় ধরেছিল বুঝি! মেয়ের জন্যে পাত্তর খোঁজ—আব্দার আর কি! চেনা নেই, অচেনা নেই, দেখা হোলেই ঐ এক কথা।" বুঝলুম, শিখা এরই মধ্যে তাকে সব খবর দিয়ে দিয়েচে। ধন্য এই মেয়ে।

হেসে বলি, "হ্যাঁ ভাই। তা' ও কে রে, আমি ত' চিনি না; তবুও ধাঁ কোরে বললুম—ভাল পাত্তর একজন দেখে দোব। আশ্চর্য্য,—ও পাগল নাকি—নামও বললে না, কি জাত তাও জানি না।"

যুথী উত্তর দিলে, "সে অনেক কথা। আগে ঐ লোকেরই প্রতাপ ছিল কত—পাড়া শুদ্ধু ওর ভয়ে ত্রস্ত। দিনরাত মদ খেত। টাকা ছিল অনেক। মোসাহেবও তাই জুটত—অনেক। মধু পেলেই ভ্রমর আসে। পাড়ার বৌঝি ওদের সানে বেরুতে পার্‌ত না। এই আমাদের ওপর কী রকম অত্যাচার করেচে,. .যাক্ সে কথা।" একটু থেমে কী যেন ভাবে; পরে বলে, "টাকা-জমি সব উড়ে গেছে—কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই ফুরোয়। তবে ওর

ছেলে বিনু ভাল কোরে লেখাপড়া শিখে বেশ বড় চাকরি পেয়েছিলো। তা' বরাতে সইল না। বছর দেড়েক আগে একদিন খবর এল সে কলকাতায় কলেরায় মারা গেছে। সেই থেকে বুড়ো শকুনি একেবারে ভেঙে পড়েচে।" যূথী একটা শুক্‌নো, কটু হাসি হাস্‌লে।

—"মেয়েটি কত বড়।"

—"তা কম কি, চোদ্দ পনের বছর শেষ হোতে চলল। এই ভাঙা বুকখানা নিয়েই ওর বাপ কত খোঁজে—যার সঙ্গে দেখা হয়—তাকেই বলে পাত্তর খুঁজতে।...তা' ওরা ভট্‌চায হোলে কি হবে,—গয়লাবামুন কিনা, সহজে পাত্তর মেলা ভার।...উঃ! ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন। তা না হোলে পরাণবাবুর এমন উচিত শাস্তি হয়? এমন পাপ নেই—যা' এই পরাণবাবু করেনি! মিথ্যে নালিশ কোরে লোককে জেলে দিয়েচে। নিজের স্ত্রীকে চড় মেরে মেরে ফেলেচে। তা ছাড়া, নিজের বাড়ীতে...ছি, ছি...।" কথা শেষ না কোরে সে চ'লে গেল।

সন্ধ্যা আরো ঘনিয়ে আসে। দূরে চাষার ঘরে মাটির বাতি জ্বলে। বনে বনে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকে। আকাশে তারাগুলো হেসে হেসে আরতির বরণডালা সাজায়। আমি ভাবি—নিশ্চয়ই ভগবান্ আছেন, নইলে এমন উচিত শাস্তি হয়? তবুও প্রাণটি উদাস হোয়ে ওঠে। চোখের সাম্‌নে ভাসে—এক বিষণ্ণ ছবি।

বিকালে মাঠে না গিয়ে ছাদে বেড়াচ্চি। শিখা চুপি-চুপি ডেকে আঙুল দেখিয়ে বল্লে, "ওই দেখ মামা,—ওদের লতা।" চেয়ে দেখি, দুখানা বাড়ীর পরে ছাদের ওপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে—বিরহ রাতের নিবানো বাতিটির মত। যেন মূর্ত্তিময়ী বিষাদ। অবগাঢ় চোখদুটি—তেপান্তরের মাঠের পারে কা'কে যেন খোঁজে। একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস যেন একে ঢেকে রেখে অবর্ণনীয় ক'রে তুলেচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "যূথী, পরাণবাবুর মেয়েটি ত' খুব একেলে—আজ দেখলুম তা'কে ওদের ছাদে।"

ব্যঙ্গভরে হেসে উত্তর দিলে সে, "সে আর বোলতে দাদা! ওর ভাই বিনু ওকে বেশ লেখাপড়া শিখিয়ে বড়লোকের মেয়ের মত মানুষ করেছিল। ইচ্ছেটা ছিল—বড়ঘরে বে দেবে, তা' আর ভাগ্যে হোল না। দেখ্‌লে ত' রূপ? খেঁদি পেঁচির মতন। তবু সাজগোজ কত। বাপটা ত' ছেলে আর টাকার শোকে পাগল।"—ভাল লাগ্‌ল না, স'রে গেলুম।...

ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সে আবার বলে, "আজ শুনলুম, ওপাড়ার দীনুমুখুয্যের সঙ্গে লতার সম্বন্ধ হচ্চে।"

উৎসুক হোয়ে বলি, "পাত্তরটি ভাল? বয়েস কত? টাকাকড়ি আছে?"

—"ভাল বই কি! টাকাকড়িও যথেষ্ট আছে। কোলকাতার বার্ড কোম্পানীর বড়বাবু। তবে বয়স হয়েছে আটান্ন। এটি তৃতীয় পক্ষ।" অজ্ঞাতেই মনটা বিদ্রোহী হোয়ে উঠ্‌ল—হায়, হায়, ভগবান্! বিয়ের নামে এ কী নিষ্ঠুর বর্ব্বর বলি!

অবাক হোয়ে যাই। জিজ্ঞাসা করি, "ওর বাপ এত ক'রে পাত্তর খুঁজে খুঁজে শেষে ওইখানেই পাড়ি দেবার চেষ্টা করচে! মেয়েটির নিশ্চয় এ বিয়েতে মত নেই।"

—"তাকি থাকে? শুনচি, বাপকে নাকি লতা বলেচে এ বিয়ে সে কোরবে না। বাপেরও নাকি তেমন মত নেই। তবে ওর মামা দীনু মুখুয্যের কাছ থেকে কিছু টাকা খেয়ে জোর কোরে লেগেছে—এমন সুযোগ নাকি সে হাতছাড়া করতে দেবে না। তবে, ও যা মেয়ে,—একটা কেলেঙ্কারি না ক'রে বসে। সেদিন বীণাকে বোলছিল, টাকাই কী সব যে টাকা আছে বোলে এক থুড়থুড়ো বুড়োকে বিয়ে কোরব!"

সকালবেলা ব'সে ব'সে কি-জানি কী ভাবছিলুম। নিদ্রোত্থিত সদ্য-রবির স্বর্ণহাসি মার স্নেহের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েচে। যূথী হাসতে হাসতে দৌড়ে এসে বললে, "ও ছোড়দা, তোমার এক মস্ত নেমতন্ন এল বোধ হয়। পরাণ বাবু নীচে তোমায় ডাকচে!"

—"কী ব্যাপার বল দিকি। বুড়ো আমাকে খোঁজে কেন—শেষে আমাকেই পাত্তর ঠাওরালে নাকি?"

—"ওমা, জান না বুঝি! ওর মেয়ের যে কাল বিয়ে! তোমায় আর কষ্ট কোরে পাত্তর খুঁজতে হবে না।"

—"সেকি রে—সেই বুড়োর সঙ্গে নাকি?"

—"না, না, সে বুড়ো ত' ঢের টাকা ওর মাস্কাকে খাওয়ালে। মেয়েটাকে কদিন জামা, শাড়ী, খাবার পাঠিয়ে দিলে। তবুও লতার মন ভিজল না। সে গোঁ ধ'রে রইল—বলে, ও আমার দাদামশাই, ওকে বিয়ে করতে পারব না। শেষে বিয়ে-পাগলা ফোক্‌লা বুড়োর আশা ছুটে গেল। আহা, বেচারা বুড়োর ভাঙা বুকখানা একেবারে ফুটি-ফাটা হোয়ে গেচে বোধ হয়!" সে হো-হো ক'রে হাসে। চমকে উঠি—কত কথা মনে হয়। পরে উৎসুক হ'য়ে বলি, "তারপর?"

—"লতার দাদা শ্রীরামপুরের এক ভদ্দর লোকের চাকরী ক'রে দিয়েছিল। পরাণ বাবু খবর পেয়ে তাকে গিয়ে ধরে। তার এক ভাই আছে—এম, এ পড়ে। ছেলেটি নাকি খুব ভাল। ভদ্দর লোক রাজী হোয়েচে—মরা-বন্ধুর কথা মনে ক'রে বোধ হয়। তবে দেড় হাজার টাকা চেয়েছিল—অনেক কষ্টে এক হাজারে নেমেচে। পরাণবাবু বাকী জমিগুলো বিক্রি কোরে আর বাড়ীটাকে বাঁধা দিয়ে টাকার জোগাড় করেচে শুনলুম।"

যাক্‌, লতার বরাত ভাল। হাসি পায়। মরা বন্ধুর কথা স্মরণ কোরে বরপক্ষ দেড়হাজার থেকে হাজারে নেমেছে—খুব যে উদার তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবুও লতার সুখ হবে শুনে আনন্দ হোল কেন জানি না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই একখানা মোটর আর্ত্তনাদ কোরতে কোরতে বিয়েবাড়ার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। একসঙ্গে সাতটা শাঁক হেঁকে উঠল—অভ্যর্থনা করতে। সন্ধ্যাসন্ধিতে লগ্ন। শিখার হাত ধোরে গেলুম বিয়ে দেখতে; পরাণ-বাবু অনেক কোরে ব'লে গেছল। আয়োজন মন্দ করে নি—কৃপণতার কোথাও চিহ্ন ছিল না। বরযাত্রী এখন কেউ এসে পৌঁছয় নি, তবে পাড়া-প্রতিবেশী অনেকে এসেচে—আগেকার মনোমালিন্য ভুলে।

সদরে সহসা একটা গোলমাল উঠলো। গিয়ে দেখি, বর দাঁড়িয়ে উঠেচে। বরকর্ত্তা হেঁকে গলা ফাটাচ্ছে—"আপনার পিতাঠাকুর গয়লার পুজো কোরতেন, তা আমাদের বলেন নি; লুকিয়ে রেখে আমাদের জাত মারতে চান।"

পরাণবাবুর মুখখানা রোদে-পোড়া আমসির মত হোয়ে গেছে—বুড়ো ত্রাসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আমার পিতাঠাকুর তা' কোরতেন বটে বাবা, তবে আমরা কখন করিনি। আমিও বিয়ে করেছিলুম কুলীনের ঘরে—ছেলের বিয়েও কুলীনের ঘরে দিয়েছিলুম।"

কে কা'র কথা শোনে। বরপক্ষ রুখে উঠে ভয় দেখালে, ১৫০০৲ টাকা নগদ না দিলে বরকে নিয়ে তারা চ'লে যাবে—শ্রীরামপুরেই মেয়ে ঠিক আছে, আজই বিয়ে দেবে। পরাণবাবু অনেকের পায়ে হাতে ধরলেন,—ভিক্ষা চাইলেন, কেউ টাকা ধার দিলে না। অসময়ে একে একে প্রতিবেশীরা চ'লে গেল। কেউ কেউ গালি দিলে,—মদোমাতাল চিরকাল তাদের ওপর পশুর মত অত্যাচার করেচে—আজ সে ভুগবে না! তারা ভগবানের দোহাই দিলে।

অত টাকার যোগাড় হোল না। পরাণবাবু অনেক কান্নাকাটি কোরে পরে দোব বললেন, বরকর্ত্তার বিশ্বাস হোল না। তারা গালাগালি কোরে চ'লে গেল। উপায় না দেখে পরাণবাবু মুশড়ে পড়লেন—কালবোশেখীর রুদ্র নাচনে মাথা-ভাঙা সুপারি গাছের মত। দু-এক ঘর প্রতিবেশী সে অসময়ে তাকে ছাড়তে পারলে না—সহানুভূতি দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

চারিধারে ছুটোপাটি প'ড়ে গেল। সেই রাত্রেই অন্য বর খুঁজে বিয়ে দিতে হবে। তা না হোলে মেয়ের আর বিয়ে হবে না। শুধু তাই নয়, মেয়ের বাপের জাতিচ্যুতি হবে। কাণা ভট্‌চায বিবাহের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কোরে শাসিয়ে গেল—তার রাগ ছিল, পরাণ বাবু তাকে পুরুত করেনি। কালি ভট্‌চায চুপি চুপি এসে সাবধান কোরে দিয়ে গেল,—বলে, "রাত সাড়ে বারোটায় একটা লগ্ন আছে। একটি যাহোক ধ'রে আন বাবু—জবিয়ে দেওয়া যাক্‌। একে বলে বরাতের ফের..."

মেয়েটি তখনও বসেছিল—আল্‌পনা দেওয়া বিয়ের আসনে। মাথার অবগুণ্ঠনটা একটু স'রে গেছে। দেখি, চোখদুটি গাঢ়, সজল, ম্লান। দুঃখ যেন অভিমানের স্পর্শে জমাট বেঁধে গেছে—পুঞ্জিত, নিঃশব্দ, প্রশান্ত। বাতাস

যেন তার কাছে নিঃশেষ হোয়ে গেছে—স্বস্তিতে শুধু একটি নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য যেন সে অসহ্য যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ধুঁকচে। যেন মূর্ত্তিমতী অভিশাপ—সকলের পুঞ্জীভূত ঘৃণা!

মনে সাধ জাগে, যাই ঐ শূন্য আলপনা আঁকা আসনটায় ব'সে এক নিমেষে এ সমস্যার মীমাংসা ক'রে দেই! অন্ধ সমাজের নিষ্ঠুর নিষ্পীড়নের ভয়ে আজ রাত্রের মধ্যেই যা'কে হোক ধ'রে ঐ আসনটায় বসিয়ে দেবে—অসহ্য সে দৃশ্য! দেশের কথা মনে পড়ে—বিয়ে কোরলে দেশের কাজ ত' করা হবে না—আমার সারাজীবনের আশা নিষ্ফল হোয়ে যাবে—এ যে একেবারে বুকের ওপর পাথর হোয়ে বসবে!... সঙ্কোচ এল—এ ত' মিথ্যে ওজর! অখিল বোসের লেনের নীরেনও ত' তাই বোলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। এক বুড়ো বামুন এসে তার পায়ে জড়িয়ে পড়ল—তার সুশ্রী সুন্দরী মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্যে। নীরেন দেশের ওজর দেখিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলে। বছর শেষ হোল না, এক বড় ঘরে বিয়ে কোরে আজ সে Bengal Secretariatএ চাক্‌রী নিয়েচে।

স্তিমিত শিখার মত মুখখানা ম্লান হ'য়ে গেল। এ যে চরিত্রহীন, মাতালের মেয়ে...ছিঃ ছিঃ!...চেয়ে দেখি আকাশখানা প্রলয়ের মত—যেন মেয়েটির মুখের মত—ঘন আঁধার, আর সেই অন্ধকার চিরে চিরে বিদ্যুতের পুচ্ছ শাণিত তলোয়ারের মত হানা দিচ্ছে। ছুটে বাড়ী আসি।

ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ারের মত আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে পড়ল। কাঁদতে লাগল—উদ্দাম বৃষ্টিজল-ধারা ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ঝড়ও গেয়ে উঠল—বোঁ-ওঁ-ওঁ সর্ সর্! সে কি মাতামাতি!

যূথী এসে ডাকে। নীলসাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে। উত্তর দিলুম, "কি রে!"

—"দাদা"—কি যেন একটি বেদনা ভাষায় মুঞ্জরিত হবার জন্য তার ভেতরে গুমরে উঠচে—

—"দাদা, শুনচি আর ৩০০৲ টাকার জন্যে নাকি বাধা পড়চে। তুমি আমার এই চুড়ী ক'গাছি চুপি চুপি পরাণবাবুদের দিয়ে আসবে?" অবাক হ'য়ে যাই।

—"সে কি যূথী?"

—"এ বাদলায় আর কোথায় বর খুঁজতে যাবে দাদা! আর গাঁয়ের ত' কেউ ওবাড়ীতে বিয়ে কোর্‌বে না। রাত পোহালেই মেয়েটির কি হবে বল দিকি? দিয়ে এসো না দাদা, চুপি চুপি এ চুড়ী ক'গাছি—যদি কিছু বিহিত হয়।"

শুষ্ক হাসি হেসে বলি, "পাগল! এ বৃষ্টিতে কি আর তারা শ্রীরামপুর থেকে ফিরে আসবে? তাছাড়া এতক্ষণ অন্য মেয়ে বিয়ে ক'রে ফেলেচে!"—উদাস চোখে কি যেন ভাবতে ভাবতে সে চ'লে গেল। আমি ভাবি—কি রহস্যময় এই স্ত্রী চরিত্র! কতদিন যূথী ঐ মেয়েটিকে নিয়ে উপহাস করেছে। কিন্তু তার অসময়ে আজ সে তাকে অতি আপনার ক'রে নিয়েচে! আর আমি! অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মত সাহসটুকুও আমার নেই! অথচ দেশের নামে...হায়! দেশ যেন গভর্ণরের বাড়ীর ছাদে আর টাউনহলের দোতলায় বন্দী!

* * *

সকালে বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ যেন তখনও আফিংখোর নিঝুম মেরে ছিল। সহসা কান্নার আওয়াজ কানে বাজল। কি সে করুণ! কী ছুঁচালো! যূথী এসে খবর দিলে। কাল বৃষ্টি একটু থাম্‌লে দুপুর রাতে সেই দীনু মুখুয্যেকে ধ'রে এনে লতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েচে—অবশ্য তার মামাই সব আয়োজন করেছিল। কিন্তু মেয়েটির সে বিয়ে পছন্দ হয় নি। সে সঙ্গে যেতে রাজী হয়নি ব'লে সকলে মিলে জোর ক'রে তাকে গাড়ীতে তুলে দিয়েচে—তাই অবলা, অসহায়া নারী ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদচে।...ঘৃণায় লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়্‌ল।...সমস্ত দিন কানে সেই কান্না বাজতে লাগল! সে যেন গ্রীষ্মের খর মধ্যাহ্নে অরণ্যের ব্যাকুল মর্ম্মরধ্বনি! সে কেমন কেমন,—মানুষের অভিধানে সে কান্নার ভাষা নেই।

* * *

চারিদিকে হৈ হৈ! লতা নাকি কুশনডিঙের দিন বুড়ো দীনু মুখুয্যেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেচে। পরাণবাবুও ঠিক করেচে—মেয়েকে আর সেখানে পাঠাবে

না। কিন্তু ছিনে জোঁক ছাড়ে কৈ? দীনু মুখুয্যে যথাসময়ে তার এই সচল সম্পত্তি ক্রোক করতে এল—সঙ্গে তার দারোগা, সাক্ষী আর ভট্‌চাযের দল। উৎপীড়িত নারী সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিজের অগ্নি-পরীক্ষা দিলে। লতা দমল না—দারোগার সামনে ধীরে ধীরে তার বক্তব্য ব'লে গেল। বিয়ের রাতে সে একটিও মন্ত্র পড়েনি। কোন আচার পালন করে নি। সকলে জোর ক'রে তার গলায় মালা দিয়ে দিয়েচে! স্বামী ব'লে একবারও সে এ বুড়োকে মনে মনে ভাবে নি। তার দেহকে সে কোন দিন স্পর্শ করতে দেয়নি। সমাজ যদি তাকে না চায়—সে বরং একঘরে হ'য়ে থাকবে, তবু এ বুড়োকে সৈ স্বামী বলতে পারবে না।

ছাঁদাবাঁধা, লম্বাটিকি ভট্‌চাযের দল মাথা নেড়ে বিধান দিলে, "তুমি মন্ত্র পড় আর না পড়—শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়েচে। আমরা তার সাক্ষী!" বুকের ভেতরের মানুষটি ক্ষেপে উঠলো—ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ার নাকি এরা। এই অসহায়া মেয়েটি কি এদের লোলুপ শিকার!

দুপুর বেলা যূথী এসে বল্লে, "এ হিন্দু-সমাজ—বাঘের খাঁচা। এখানে কি নিস্তার আছে? ওরা শাসিয়ে গেচে, সন্ধ্যাবেলা এসে লতাকে নিয়ে যাবে—ভালোয় ভালোয় না গেলে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। ইচ্ছে এই আর কি, যদি কেলেঙ্কারী হয় ত' সন্ধ্যেবেলা সকলের অসাক্ষাতে হোক্!"

বিকালটা তেমন ভাল লাগচে না। বাতাসটা যেন উদাস। সহসা শিখা দৌড়ে এসে বললে, "মা তোমায় শীগ্‌গির ডাকচে মামা,—ওদের বাড়ী কী হয়েচে মা খুব কাঁদচে..."

গিয়ে দেখি, গোয়ালঘরের চালে দড়ি বেঁধে লতা ঝুলচে—বড় আরামের দোল্লা খেয়েচে। জগৎ যার বিরুদ্ধে একজোট হ'য়ে ষড়যন্ত্র করে, মরণই ত' তার একমাত্র বন্ধু—মায়ের স্নেহের মত অতি আপনার।...কী বিভৎস তার মুখখানা—সমাজের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ যেন জমাট বেঁধে মূর্ত্তি নিয়েচে! তার শেষ নিঃশ্বাস যেন ঝড়ের মুখের পাখীর মত চারিদিকে ঘুরে ফিরে তপ্ত অভিশাপ ছড়াচ্চে।—হতভাগ্য শিশুর মত ঘরটি যেন কেঁদে ডুকরে উঠচে।... বাহিরে সন্ধ্যার আঁধার অশ্রু তখনও গ'লে গ'লে তপ্ত পৃথিবীর বুকে পড়েনি। খবর পেয়ে দীনুমুখুয্যে দেখতে এল। বুড়ো পরাণের পাগল-করা মর্ম্মভেদী ভাঙা আওয়াজ কানে গেল, "নিয়ে যা বেটারা, আমার মাকে জন্মের মত তোদের বাড়ী নিয়ে যা!" হায়—আজ তাকে বাড়ী নিয়ে যাবে—সাধ্য কার? তার ঠাণ্ডা নীল দেহটাকে নিয়ে পুলিশ আর সমাজ শকুনির মত হেথায় সেথায় টানাটানি ক'রে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করবে জানি, কিন্তু, সে যা'—তা' ত আজ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অনেক দূরে!

* * *

"খুব প্রতিশোধ দিয়ে গেল সে।"

যূথী রুখে বললে—কান্না তার থেমে গেছে, দৃষ্টি তার বড় প্রখর—"একে প্রতিশোধ বল? এড়িয়ে যাবার জন্যে মরণকে ব'রে নেওয়া ত' দুর্ব্বলতা! শেষে সমাজই ত' জয়ী হোল। ম'রে লতা কি সমাজের এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে পারবে—এমন ত' কত মরেচে আর মরবেও কত, যতদিন না হিন্দুর মেয়ে ঠিক ঠিক প্রতিশোধ নিতে শেখে। এ ত ব্যর্থ প্রতিশোধ..."

ক্ষোভে অভিমানে তার বাক্য রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রিটোরিয়া

প্রিটোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত আর একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্যের ইহা রাজধানী। প্রাকৃতিক শোভা ও স্থাপত্য-গৌরবে ইহা পৃথিবীর রম্যতম রাজধানী সমূহের অন্যতম হইয়া আছে।

প্রহরী

একটি পর্বতিকা; অত্যুচ্চ নহে, নিতান্ত অনুচ্চও নহে, —তাহার শীর্ষদেশ হইতে সমস্ত নগরটি বেশ দেখা যায়; সেইখানে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত। এই সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি স্থপতি-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন ও তাহার পুরোভাগে একটি প্রহরীরূপী কামান অবস্থিত। আমরা তাহার একটি আলোকচিত্র এখানে দিলাম।

ভ্রমণকারীর পক্ষে প্রিটোরিয়া খুব সুবিধাজনক স্থান; একটি বর্দ্ধনশীল ও আধুনিক-সভ্যতা-সম্মত শহরে যাহা কিছু পাওয়া সম্ভব; এখানে তাহার সমস্তই আছে। যাঁহারা এখানে কিছু বেশী দিনের জন্য বাস করিতে চাহেন তাঁহারাও এখানকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, পছন্দসই ঘরবাড়ী ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্যে খুশী না হইয়া পারিবেন না।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আঁন্দ্রিয়াস্ প্রিটোরিয়াস্ নামক একজন বীরের নামানুসারে এই শহরটি প্রিটোরিয়া নামে অভিহিত হয়; তখন ইহা অনতিবৃহৎ গ্রাম মাত্র। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরেই ইহার ভাগ্য ফিরিয়া গেল ও ইহা গণতন্ত্রের

কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইল। তাহার পর আরো বিশ বৎসর কাটিয়া গেলে ইহার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ইহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি পরম লোভনীয় নগরে পরিণত করিয়া তুলিল। প্রিটোরিয়ার বড়বাজারে শিকারীরা হস্তি-দন্ত, উঠ্‌পাখীর পালখ, চামড়া, পশুর লোম প্রভৃতি আনিতে আরম্ভ করিল; ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বিবিধ পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান, বিনিময়-বিক্রয়ে অচিরে বহু বিপণীর সৃষ্টি হইয়া গেল; প্রিটোরিয়ার উর্ব্বর ভূমি ও প্রচুর জল সরবরাহের সুব্যবস্থা ইহাকে 'গোলাপ-নগরী' হওয়াই প্রিটোরিয়ার অধিবাসীরা অধিকতর শ্রেয়স্কর মনে করিল। ফলে একজন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা আসিলেন ও তাঁহার সঙ্গে আসিল একদল সৈন্য; একটি দ্বিতল অট্টালিকা দেখা দিল, একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল; আর হইল একটি হাসপাতাল, কয়েকটি গির্জ্জা, মিউনিসিপ্যাল্ কাউন্সিল এবং একজন মেয়র। নবাগতদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করিয়া একটি ক্রিকেট খেলার মাঠ ও একটি ঘোড়-দৌড়ের মাঠও দেখা দিল!

ক্ষণিকের জন্য মনে হইল যে সব গোলমালের শেষ

চার্চ্চ-স্কোয়ার

আখ্যা লাভ করিতে সাহায্য করিল। পুষ্প-ভূষিত বল্লরী-বিমণ্ডিত কুঞ্জকানন,—তন্মধ্যে পর্ণাচ্ছাদিত কুটিররাজি; দেখিলেই মনে হইত লক্ষ্মী দেবীর উন্মুক্ত স্বর্ণঝাঁপির প্রসাদ-পরিবেষণে শান্তিনীড়ের অধিবাসিবৃন্দ পরিতৃপ্ত ও সুখী। কিন্তু এ সমৃদ্ধির ছবি বাহিরের; প্রিটোরিয়ার অন্তর তখনো বিবিধ বিপদে বিক্ষুব্ধ। একদিকে অসভ্য দুর্দ্দান্ত আদিম অধিবাসী,—যেমন নৃশংস তেমনি অত্যাচারী; অপর দিকে শাসন-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অর্থানটন; অগত্যা গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজরাজের শরণাপন্ন হইয়াছে; এমন সময় প্রথম 'ওয়ার্ অব্ ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্' শুরু হইয়া গেল। বুয়রগণ স্বায়ত্ত-শাসন ফিরিয়া পাইল এবং ষ্টীফেনাস্ জোহানেস্ পলাস্ ক্রুগার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। আমরা এই প্রথম প্রেসিডেন্টের মর্ম্মর-মূর্ত্তির একটি আলোকচিত্র দিলাম। এইরূপে আবার কিছুকাল ধরিয়া শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল; প্রিটোরিয়া একটি কৃষি-কেন্দ্ররূপে উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধ হইতে লাগিল। ইহার পরেও কিন্তু প্রিটোরিয়ার আরও পরিবর্ত্তন ভাগ্যে ছিল। যথাকালে বার্‌বার্‌টন্ নামক স্থানের স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত

হইল ও প্রিটোরিয়ার আদর বাড়িল। আরও কয়েকটি স্থানে স্বর্ণখনি বাহির হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে মারামারি কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। হতভাগ্য ওলান্দাজের স্বায়ত্ত-শাসনের শেষ হইল; ইংরাজ ও বুয়রদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল প্রদেশ ইংরাজদের অধিগত হইল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে চারিটি প্রদেশকে একত্র ধরিয়া "ইউনিয়ন্"গঠিত হইল ও প্রিটোরিয়া তাহার রাজধানী হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শহরটির স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইল। 'চার্চ্চ-স্কোয়ার' নামক স্থানটি শহরের মধ্যে পরম রমণীয় স্থান। আমরা উহার একটি ছবি দিলাম। এইখান হইতে পূর্ব্বতন গণতান্ত্রিক শাসন কার্য্য পরিচালিত হইত। ভ্রমণকারীদের মনে এই স্থানের স্মৃতি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। আজকাল

বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিশয় সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত যে যে "ইউনিয়ন্ বিল্ডিংস্" তৈয়ারী হইয়াছে, তাহারই মধ্যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহক অফিসগুলি স্থাপিত।

বহু পৃথিবী-ভ্রমণকারী প্রিটোরিয়ার মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার ঐতিহাসিক স্মৃতিপূর্ণ স্থানগুলি, ইহার সুন্দর অট্টালিকারাজি, মনোমদ পুষ্পোদ্যান, ইউনিয়ন্ বিল্ডিংসের উপর হইতে পারদৃশ্যমান প্রাকৃতিক শোভার নয়নরঞ্জন চিত্রাবলী, সমস্ত মিলিয়া ইহাকে পরম প্রশংসনীয় দর্শনস্থান করিয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটি স্বচ্ছ শীতল জলপূর্ণ স্নানশালা আছে; তাহার বহুবর্ণ, বিচিত্র সুষমা-মণ্ডিত প্রস্তর-কুট্টিম যেন স্নানার্থীকে উজ্জ্বল জ্যোতি- বিচ্ছুরণের কোটি বাহু দিয়া আপন স্ফটিক-স্বচ্ছ তুহিন-শীতল

একটী অদ্ভুত গাছ

বার্গার-পার্কের গোলাপ মালঞ্চ

সুখ-তরল বক্ষোপরি আহ্বান করিতে থাকে! আর একটি দ্রষ্টব্যস্থান, 'বার্গার-পার্কের' গোলাপ-মালঞ্চ। লতানো গোলাপের পরিবেষ্টনী, তন্নির্ম্মিত তোরণ-শোভাসমন্বিত বহুবিধ গোলাপ-চারার এই উদ্যানটি বড়ই স্নিগ্ধ ও রমণীয় স্থান। সমস্ত শহরময়ই প্রায় সুসজ্জিত তরুশ্রেণী-শোভিত রাজপথ, সবুজ শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, লতাবিতানে ঘেরা ফুল-মালঞ্চ, ও গোলাপ ফুলের যত্ন-রচিত বহুমূল্য উদ্যান আছে।

প্রিটোরিয়ার তরুচ্ছায়াশীতল একটি রাজপথ

প্রিটোরিয়ায় যাঁহারা গিয়া থাকেন তাঁহারা আর একটু দূর গিয়া একটি হীরক-খনি দেখিয়া আসিতে পারেন। পৃথিবীর মধ্যে এতবড় উন্মুক্ত হীরক-খনি আর কোথাও নাই। এইখান হইতেই বিখ্যাত কালিনিয়ন্ হীরকটি উদ্ধার করা হয়; উহা দেখিতেও বেশ বড় এবং ওজনেও প্রায় পৌনে এক সের। বহু খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া এখন উহা ব্রিটিশ-ক্রাউন-জুয়েল্‌সের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

ক্রুগার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি ও রেল ষ্টেশন

প্রাকৃতিক ও নাগরিক সৌন্দর্য্যে প্রিটোরিয়া যেরূপ সমৃদ্ধ, অন্যান্য সুবিধাতেও উহা তদ্রূপ সৌভাগ্য-শালী। সংবৎসরে গড়ে দিন-পিছু আট ঘণ্টা করিয়া সূর্য্যালোক এখানকার লোকে উপভোগ করিতে পায়। বৎসরের মধ্যে সাধারণ মধ্যবর্ত্তী (mean) উত্তাপের পরিমাণ ৬৩·৫ ডিগ্রি। বৎসরে গড়ে ২৯ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। মৃত্যুর হার ও শিশু মৃত্যুর হার, এখানে জগতের মধ্যে নিম্নতম। স্বাস্থ্যসম্পদে ইহা আদর্শ বাসভূমি হইবার যোগ্য।

প্রিটোরিয়ায় বহু স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, ব্যাঙ্ক, লোহের কল-কারখানা প্রভৃতি আছে। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সমৃদ্ধ নগর।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

জাপানে বৌদ্ধ-মন্দির

নারা-নগরী

বৌদ্ধধর্ম্ম তার মাতৃভূমি হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হলেও ভারতের বাহিরে নানা দেশে এর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব অতুলনীয় উন্নত-আদর্শ তদ্দেশবাসীদের মন অধিকার করেছিল। মানব-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি বিবিধ প্রাচীন মঠবিহার ও মন্দিরে আজও বেশ প্রকাশ পাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—জাপানের প্রাচীন

নারা পার্ক

পার্কের মধ্যস্থলে বিখ্যাত মন্দির কোফুগো-নো-মির নামক মন্দিরের প্রবেশদ্বার—দূরে বনান্তরাল হ'তে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

বিস্তার করেছে। সিংহল, চীন, শ্যাম, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে গৌতম-বুদ্ধের লোক-মধুর চরিত্র-মাহাত্ম্য ও রাজধানী নারা (Nara) নগরী ধরা যেতে পারে। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ-নগরী জাপান-সাম্রাজ্যের রাজধানী

ছিল। সে সময়ে যে সাত জন সম্রাট এ স্থানে রাজত্ব করেন—তাঁদের সেকালের গরিমা (atmosphere) এখনও এখানে এলে মনে-প্রাণে অনুভব করা যায়। পুরাতন মন্দির দেউলাদি এরূপ সুন্দর ও আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত যে এখনও জাপানী তীর্থযাত্রী ও এমন কি অন্যান্য দেশ থেকে পরিব্রাজকের দল এখানে অতীত যুগের গৌরবময় স্মৃতি-চিহ্ন দেখ্‌তে এসে থাকে।

হরিয়ু-জি মন্দির

এ নগরীর প্রধান রাস্তা—নানাবিধ মনোহর ল্যাকার-(lacquer) করা কাঠের কার্য্য, পান্থশালা ও সেকালের দুর্লভ বস্তুবিক্রয়ের বিপণী-সমূহ এরূপভাবে সজ্জিত যে সর্ব্বদাই এ স্থানে চির-উৎসব লেগে রয়েছে ব'লে দর্শকের মনে হয়।

প্রতিবৎসর বসন্তকালে চারদিক থেকে সকলে নারার উপবনভূমিতে (Nara-Park) উৎসবের জন্য জড় হয়—এ ভূমি একসময়ে কোফুকু-জি (Kofuku-ji) মঠকে বেষ্টিত

ক'রে ছিল। সে-সব গৃহাদির চিহ্ন এখন আর নেই—যুযুৎসু নেতারা এস্থানে লড়াই ক'রে সব ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। যে সব বৃক্ষশ্রেণী একসময়ে এস্থানে ধর্ম্ম-পিপাসুদের ছায়া দিত—এখন তাদের ছায়ায় হাজার হাজার লোক পানোৎসবে অতিবাহিত করে। এখনও দুটি দেব-মন্দির (Pagoda)—একটি ১১৪৩ খ্রীঃ অঃ, অন্যটি ১৪২৬ খ্রীঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত—এ বিহারের অতীত যুগের গৌরবের সাক্ষ্য রূপে বিরাজ করছে।

'রোশনা' বুদ্ধ

সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত মন্দির—কোসুগো-নো-মিয় (Kosu-ga-no-Miya)। এ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শিন্টো (Shinto) মন্দির প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত—শতাব্দীর পর শতাব্দী পবিত্র ব'লে বিবেচিত। এর লাল-রঙের বিশাল প্রবেশদ্বার—দুধারে বিশালকায় বৃক্ষসমূহ দর্শকের মনে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে ও প্রতিপদক্ষেপে মনে ক'রে দেয় যে দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছি।

দীর্ঘপথের শেষে বনভূমির গাঢ় অন্ধকারে উজ্জ্বল হিঙুল রঙের মন্দির হঠাৎ সম্মুখে এসে পড়ে; পাথরের সোপান অতিক্রম ক'রে প্রবেশ-দ্বার দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছান যায়। চারিধারে ছাতযুক্ত বারান্দা, শ্বেত রঙের প্রাচীর—মাঝে মাঝে সবুজ রঙের বাতায়ন। বীথিকার দুধারে পাথর ও ব্রোঞ্জের দীপাধার—সংখ্যায় ৩০০০; কালক্রমে সব শেওলা ধ'রে গেছে। ভিতরে বারান্দার কড়ি হ'তে শত শত ব্রোঞ্জের দীপাধার ঝুলছে—উপাসকদের হৃদয়ের ভক্তিসূচক—দেবতাদের উদ্দেশ্য নিবেদিত। প্রতি আলোয় দাতার নাম লেখা। বায়ুতে আন্দোলিত হ'লে শরৎকালের কীট-পতঙ্গ নিঃসৃত শব্দের ন্যায় অদ্ভুত ধ্বনি শোনা যায়। উৎসবের দিনে এ সব দীপাধার জ্বালা হয়; তখন এ প্রাচীন উপবনভূমি জ্যোতির্ম্ময় অপ্সরাভূমি বলে প্রতীয়মান হয়। হাজার বৎসর ধ'রে এ বনভূমি হরিণের বিচরণ ক্ষেত্র হয়েছে—

তাদের দেবতার অগ্রদূত ব'লে ধরা হয়—তারা এ স্থানে দলে দলে বিচরণ ক'রে থাকে। সংসারের হট্টকোলাহল হ'তে বহুদূরে উজ্জ্বল গৃহাদি সহ কোয়ুগা মন্দিরের অবস্থান—বসন্তকালে এর অফুরন্ত চেরী কুসুম ও শরৎকালে তেজাল ম্যাপল বৃক্ষশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখলে ইহা ধর্ম্মস্থানের পরিবর্ত্তে অভিনয়ের উপযুক্ত স্থান বলে মনে ধারণা হয়।

উৎসব-দুন্দুভি

এ নগরীর সর্ব্বপ্রধান দর্শনযোগ্য বস্তু ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি—জাপানের মধ্যে বৃহত্তম ব'লে গণ্য; এ জ্যোতির্ম্ময় 'রোশনা' বুদ্ধমূর্ত্তি মন্দিরের তোদাই-জি (Todai-ji) নামক মণ্ডপ-গৃহে স্থাপিত; বুদ্ধদেব প্রস্ফুটিত পদ্মের সিংহাসনে বসে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন। বুদ্ধদেবের এই বৃহৎ মূর্ত্তি জাপানের প্রাচীন সম্রাট্ শোমুর (Shomu) আদেশে ৭৪৯ খ্রীঃ অঃ গঠিত হয়। কিন্তু এর বর্ত্তমান মন্দির নূতন—

পুরাতন মন্দির অগ্নিতে ধ্বংস হয়ে গেছে। লাল রঙের উচ্চ প্রবেশ-দ্বারের খিলান বীথিকার মাঝে শোভা পাচ্ছে—নিকটে স্বচ্ছ সরোবরের শান্ত জলরাশি "as calm as a temple pond"। এ মন্দির সম্রাটের আজ্ঞায় নির্ম্মিত ও ৭৫২ খ্রীঃ অঃ সম্পূর্ণ হয়। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে ভারত, চীন ও কোরিয়া হ'তে শ্রমণেরা যোগদান করতে এসেছিল।

অতিকায় ঘণ্টা

জগৎ-বিখ্যাত শোসোইন (Shosoin) বা নারা নগরীর রত্নাগার—পাশ্চাত্য দেশের কাঠের ঘরের (Log cabin of the West) মত তৈরী—ভূমি হতে উচ্চে স্থাপিত। এস্থানে সম্রাট শোমুর নানাবিধ জিনিস হাজার বৎসর ধ'রে রক্ষিত। তরোয়াল, ধাতুনির্ম্মিত আয়না, আসবাবপত্র, পুস্তক, চিত্র, চিকন-কাজ, ও অলঙ্কার প্রভৃতি প্রাচীন জাপান সম্রাটদিগের জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে মনে বেশ

জীবন্ত ছাপ এনে দেয়। এক সঙ্গে পারস্য-দেশীয় ও মধ্য-এসিয়ার কাজের চিহ্নস্বরূপ উপহার দেখে স্বতঃই মনে হয় যে এত প্রাচীন যুগেও অন্যদেশের সঙ্গে জাপানের আদান প্রদান চলত। তার মধ্যে উটের পিঠে ক'রে জল আনবার পাত্র ও সেকালের সঙ্গীত যন্ত্র বিশেষ ভাবে দর্শনীয়।

নারার অনতিদূরে হোরিয়ু-জি (Horyu-ji) মন্দির—জাপানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির। সম্রাট শোটোকু (Shotoku) ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রথম ও প্রধান 'পাণ্ডা' ছিলেন। সম্রাট শোটোকু তের শ বৎসর পূর্ব্বে মারা গেছেন—কিন্তু এ বিহারের দুটি গৃহ এখনও বর্ত্তমানকালের ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে,—প্রধান উপাসনা-গৃহ—প্রাচীরে অজ্ঞাত প্রতিভাশালী শিল্পীর frescoর কাজ করা—ও অনতিদূরে পাঁচতলা প্যাগোদা অবস্থিত। প্রথম গৃহ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাঠের তৈরী গৃহ—বহু শতাব্দী ধ'রে সুরক্ষিত। মন্দিরে লালরঙের 'ল্যাকার' করা—সময়ে টিঁকে থাকলেও প্রায় মুছে গেছে—কাঠ কালক্রমে বিবর্ণ ও জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। গৃহের ছাউনির অদৃশ্য ফাটলে চড়ুই পাখীরা সব বাসা করেছে। এসিয়ায় এ বিখ্যাত শিল্পক্ষেত্র ও নির্ব্বাণের স্থান ৬০৭ খ্রীঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হোরিয়ুজি-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার ১৪৩৯ খ্রীঃ অঃ গঠিত—আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বের ঘটনা।

উৎসবের জন্য নির্ম্মিত বিশাল দুন্দুভি (The Festival Drum)—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে অবস্থিত। ইহার প্রতিষ্ঠার পরে ও এ নগরী যখন রাজধানী ছিল তখন সে-সব ঘটনা ঘটেছিল—তাদের বার্ষিক উৎসব এ স্থানে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়।

বিশাল ব্রোঞ্জের ঘণ্টা আজ হাজার বৎসর ধ'রে উৎসবের দিনে বেজে আস্‌ছে। এ প্রকাণ্ড ধাতুর সমষ্টি ওজনে ৫০ টনের চেয়ে ভারী—৭৩২ খ্রীঃ অঃ কামাকুরা যুগে (The kamakura epoch) নির্ম্মিত হয়। পরিচারককে এক সেন (Sen—জাপানী মুদ্রা) দিলে দর্শককে সম্মুখে দোলান দণ্ড দিয়ে বাজাতে অনুমতি দেওয়া হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-শিল্প-কেন্দ্রের দৃশ্য দর্শকের মনে অতীত যুগের কথা মনে এনে দেয়—এবং সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে অতি প্রাচীন যুগে সম্রাট শোটোকু জাপানী সভ্যতার উন্নতির জন্য সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এ স্থানের চারিধারে কত মন্দির এখন পরিত্যক্ত হ'য়ে রয়েছে—তাদের হেলান ছাত স্থাপয়িতাকে শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য গর্ব্বের সহিত এখনও যেন মাথা উঁচু ক'রে আছে—ধর্ম্মের খোলস মাত্র বিদ্যমান, প্রাণ ও আত্মা কবে দেহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে!

পথের মোড়ে অদ্ভুত ধরণের পাথর মন্দিরে যাবার পথ নির্দ্দেশ করছে। পথের ধারে কতদিনের পুরাতন রাজ-প্রাসাদ ও গৃহের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে;—প্রতি পদক্ষেপে অতীতযুগের স্মৃতিস্বরূপ মন্দির—তার ভিতরে মাধুরীময় সমাহিত মহান বুদ্ধমূর্ত্তি—অতীতকালে কোন বিস্মৃত শিল্পীর কর্ত্তৃক ক্ষোদিত। সমুদয় দেশ যেন এক অতুলনীয় যাদুঘর—হাজার হাজার বৎসরের শিল্প ও কারুকার্য্য এস্থানে রক্ষিত রয়েছে। "It is the cradle of the races, and no part of Japan is full of meaning and of interest to those who believe the present is but the outcome of the past, and heavy with the fruit of the achievements of distant centuries."

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রলাল মিত্র, কমলা বুক ডিপো লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

হাজার বৎসর পূর্ব্বে সুদূর পারস্য দেশে বিদেশী ভাষায় রচিত কাব্যের অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বাংলা দেশের অল্প কবির ভাগ্যে তেমন ঘটিয়াছে। স্বদেশের ভূমিজাত ইক্ষু নিষ্পেষণ করিয়া যে সকল কারবারী চিনি প্রস্তুত করিতেছেন, বিদেশী চিনির

আমদানি করিয়া কান্তিচন্দ্র তাঁহাদের অনেককে পরাস্ত করিয়াছেন। কমলা বুক ডিপো লিমিটেড্ কর্ত্তৃক অধুনা-প্রকাশিত কান্তিচন্দ্রের ওমর খৈয়ামের সচিত্র সংস্করণের কথা স্বতন্ত্র, তাহা তাহার বহিরাবরণের আকর্ষণে এবং চিত্র-সম্পদের গৌরবে ক্রেতা সংগ্রহ করিবে; কিন্তু বিগত দশ বৎসর ধরিয়া একটির পর একটি করিয়া যে সম্পূর্ণ নিরাভরণ সংস্করণগুলি বাংলা দেশের কাব্য-গ্রন্থের অচল বাজারে চলিয়াছে তাহারই কথা বলিতেছি।

বাংলা দেশে কান্তিচন্দ্রের ওমর খৈয়াম এরূপ বহুলভাবে আদৃত হইবার প্রধানত দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ—মূল কাব্যের বস্তু-সম্পদের বহুমূল্যতা; দ্বিতীয়ত—অনূদিত কাব্যের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। সৃষ্টি-তত্ত্বে চিরাভেদ্য রহস্য সম্বন্ধে যে বাণী ওমর তাঁহার স্বল্পসংখ্যক রোবাইয়াতের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদানীন্তন গোঁড়া মুসলমান সমাজের অটল ধর্ম্ম-সংস্কারের নিকট তাহা যেমন বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাসিত যুগে তাহা তেমনি গ্রহণীয় হইয়াছে। যাহা রহস্যাবৃত, যাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ, যে অভ্যন্তরের প্রবেশদ্বার অনুদ্‌ঘাটিত, তাহা অগ্রাহ্য। তাই জীবন-বর্ত্তমানের অতীতও নাই, ভবিষ্যৎ-ও নাই;—তাই

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায় শূন্য থাক্
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে?
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

*　*　*　*

জীবন জমির 'পরে যারা
যত্নে বোনে সোনার বীজ,
হাওয়ায় বুনে ফুৎকারেতে
করচে যারা সব খারিজ;—
খতম্ সে সব এইখানেতেই—
বীজ না ফলে পুনর্ব্বার,
গোরের ভিতর যে জন, সে কি
জীবন নিয়ে ফিরবে আর।

এ যেন ঠিক ভারতবর্ষের চার্ব্বাক দর্শন। প্রভেদ এই মাত্র যে, চার্ব্বাক বলেন, "পূর্ব্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, স্বর্গ-নরক নাই, অতএব যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" আর ওমর বলেন, "আছে কি নাই তার যখন প্রমাণ নাই, তখন পেয়ালাটুকু শেষ ক'রে নাও এক চুমুকেই ফাগুন যায়।" একজন নাস্তিক, অপর জন আস্তিক নহেন; কিন্তু উভয়েই বর্ত্তমানের খরিদ্দার—যাহা হাতে ঠেকে, কানে শোনা যায়, চোখে দেখা যায়, রসনায় আস্বাদ দেয়, নাসিকা আঘ্রাণ করে এবং মনকে স্পর্শ করে কেহই তাহাকে অলীক অথবা মায়া বলিয়া অনাদর করেন না।

ওমর কবির বর্ত্তমানের এই মনোরম প্রশস্তিকে কান্তি-চন্দ্র তাঁহার অসামান্য কাব্য নৈপুণ্যের সাহায্যে অনুবাদের গ্লানি হইতে বাঁচাইয়াছেন। এ বিষয়ে গ্রন্থাগ্রভাগে রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে অভিমত মুদ্রিত হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই। তিনি বলিয়াছেন, "মূল কাব্যের এই রসলীলা যে তুমি বাংলা ছন্দে এমন সহজে বহমান করতে পেরেচ এতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েচে। কবিতা লাজুক বধূর মত এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে আসতে গেলে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। তোমার তর্জ্জমায় তুমি তার লজ্জা ভেঙেচ, তার ঘোমটার ভিতর থেকে হাসি দেখা যাচ্চে।"

বহু পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ে কান্তিচন্দ্রের ওমর-খৈয়ামের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া কমলা বুক ডিপো লিমিটেড্ বাংলা পাঠক-সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইখানি অতি পুরু মূল্যবান বিলাতী আন্টিক কাগজে মুদ্রিত, প্রতি পৃষ্ঠা চিত্রাদির দ্বারা প্রসাধিত এবং প্রতি পৃষ্ঠার সম্মুখে পৃথক আর্ট পেপারে একটি করিয়া বহু-বর্ণ চিত্র। চিত্রগুলি বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত। বইখানির প্রচ্ছদ সুকল্পিত এবং সুরুচিব্যঞ্জক। বাঁধাই, ছাপা ইত্যাদি সমস্তই মনোরম।

বইখানি প্রিয়জনকে উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

নানা কথা

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বাংলা ভাষার কথাসাহিত্যের পাঠকবর্গের নিকট শ্রীমতী নিরুপমার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার লিখিত 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'শ্যামলী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সাহিত্য-ভাণ্ডারে বহুমূল্য সম্পদ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। বহুদিন বাংলার পাঠকবর্গ নিরুপমার সাহিত্য-রচনা-রসে বঞ্চিত আছেন। বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে মাসে মাসে তাঁহার নূতন উপন্যাস 'যুগান্তরের কথা' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। জিয়ান কাঠের রস অধিকতর মিষ্ট হয় ইহা সর্ব্ববিদিত সত্য। আমরা আশা করি, বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণ মাসে মাসে নিরুপমার লেখা পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ এণ্ড্ ক্র্যাফ্‌ট্‌সের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিচিত্রার নূতন কভারের ছবিটি আঁকিয়া দিয়াছেন। এই অভিনব প্রণালীতে অঙ্কিত চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদ-চিত্রটির জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অসিতবাবুর নাটিকাদি বিচিত্রায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি কলা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি বিচিত্রায় প্রকাশিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদের সবিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কয়েকদিন হইল আমরা দি ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বাঁশীর ডাক্' নামক অসিতবাবুর একখানি নাটিকা পাইয়াছি। এই সুলিখিত নাটিকাটি ইতিপূর্ব্বে বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকটি আকার ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকের প্রচ্ছদে লেখক কর্ত্তৃক অঙ্কিত একটি চিত্র আছে। বৃক্ষতলে বসিয়া একটি পুরুষ আপনার মনে বাঁশী বাজাইতেছে—পিছনে দাঁড়াইয়া একটি নারী বংশী-রবে বিমুগ্ধা। সাদা এবং কালোয়

অঙ্কিত এই মনোরম চিত্রখানি পুস্তকটির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকের মূল্য আট আনা মাত্র।

স্বর্গীয় সরসীবালা বসু

গত ৩১শে বৈশাখ বঙ্গভাষার সুপরিচিতা লেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীমতী সরসীবালার মৃত্যুতে আমরা আমাদের আন্তরিক দুঃখ জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্যিকের সম্মান

এই বৎসর সম্রাটের জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডের দুইজন প্রধান সাহিত্যিক O. M. (Order of Merit) উপাধি লাভ করিলেন। একজন বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গল্‌সোয়াদি. অপর জন ইংলণ্ডের Poet-Laureate রবার্ট ব্রিজেস্। এই রাজদত্ত সম্মান লাভ করিয়া সাহিত্যিকদ্বয় যে অধিকতর গৌরব অর্জ্জন করিলেন তাহা নয়, বরং প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের প্রতি প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্ট শুধু তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

আফগানিস্থান-অভিনয়ের প্রথম যবনিকা

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর আমানুল্লা এবং তাঁহার পত্নী রাণী সৌরিয়া তাঁহাদের নবজাতা কন্যা হিন্দিয়া সহ গত ২২শে জুন 'মুলতান' জাহাজে বম্বাই হইতে ইয়োরোপ যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রাকালে জাহাজের ডেকের উপর বিদায়-দর্শনার্থী সমবেত ব্যক্তিবর্গ এবং ইনায়েৎ-উল্লাকে বিদায় দিবার সময়ে আমানুল্লা ভাবাবেগে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহাকে পরিবৃত করিয়া রাজ-পরিবারের এবং আফগান উপনিবেশের যে সকল ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন সকলেরই চক্ষু এই সকরুণ মর্ম্মন্তুদ বিদায়-দৃশ্যের বেদনায় সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

অনারোহীবর্গকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যখন গাঢ়স্বরে জাহাজের বাঁশী বাজিতে লাগিল তখন দেখা গেল দুইজন ভূতপুর্ব্ব রাজা,—আমানুল্লা ও ইনায়েৎ উল্লা পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমানুল্লাকে বারংবার পিছন ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে আরক্ত-সিক্ত নেত্রে আমানুল্লার অনুরাগী-গণ অগত্যা জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আফগানিস্থানের বৈচিত্র্যময় বিস্ময়কর নাটকাভিনয়ের এই প্রথম যবনিকা—ভাগ্য ও অদৃষ্টের অচিন্তনীয় বিপর্য্যয়-লীলায় যেমন আকস্মিক, তেমনি সকরুণ! ইহার অন্তরালে আরো কি বিস্ময় অপেক্ষা করিয়া আছে কে জানে!

বিগত ৮ই জুন বম্বের ইয়োরোপীয়ন জেনারাল হাস-পাতালে রাণী সৌরীয়ার গর্ভে আমানুল্লার একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। হিন্দুস্থানে জন্ম এই বিবেচনায় আমানুল্লা কন্যার নাম রাখিয়াছেন হিন্দিয়া। ভারতবর্ষের একীভূত জন-চিত্ত এই ভাগ্য-নিপীড়িত কন্যাটির মঙ্গল কামনা করিয়াছে।

মস্কোয় ঈশ্বর-দ্রোহী সম্মেলন

আটশত প্রতিনিধি মিলিত হইয়া মস্কোয় একটি ঈশ্বর-দ্রোহী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। সভানুষ্ঠাতাগণের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর-প্রতারী কোটি কোটি জনসাধারণের মন হইতে ধর্ম্ম-সংস্কার এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস একেবারে উন্মুলিত করিয়া ফেলা। এই নাস্তিকবর্গের নিকট হইতে ম্যাক্সিম্ গোর্কি বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন।

এই বিবর্জ্জনের যুগে ঈশ্বরও বাদ পড়িলেন—তাঁহাকেও বয়কট্ করা হইল। ভক্তেরা বলিবেন, এ তাঁহারই লীলার এক অংশ। 'ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও, বাম হাত হ'তে ডানে,—আপনার ধন আপনি হরিয়া কি যে কর কে-বা জানে!'—কতকটা সেইরূপ।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

হাটের দিন

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

তৃতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৩৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আহ্বান

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝড় নেবে আয়, আয়রে আমার
শুক্‌নো পাতার ডালে,
এই বরষার নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হ'য়ে যাক্ সারা,
যাবার যাহা যাক্ সে চ'লে
রুদ্র নাচের তালে॥

আসন আমায় পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে,
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধ বাণী
ছুট্‌ল নিরুদ্দেশে,—
পরাণ আমার জাগ্‌ল বুঝি
মরণ অন্তরালে॥

সীমার দুঃখ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রে যখন নিদ্রিত ছিলেম তখন এই বস্তুর জগতের মধ্যেই ছিলেম ; কিন্তু এই জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। চোখও ছিল, দেখবার জগৎও ছিল, কিন্তু দেখা ঘটল না। চোখের দেখার সঙ্গে বাইরের আলোর গভীরতর মিল না ঘট্‌লে চোখ বাইরের জগৎকে দেখে না, সেই সঙ্গে আপনাকেও জান্‌তে পায় না।

সকাল বেলায় উঠে যখন জগৎকে দেখ্‌তে পেলুম তখনই নিজের চোখের পরিচয়টা সম্পূর্ণ হল। তখনই সে আপনার আশ্রয় পেলে, আপনার অর্থ পেলে এবং আনন্দিত হল। এই যেমন আমাদের চোঁখের জাগরণ, আমাদের ইন্দ্রিয়ের জাগরণ, তাদের স্বক্ষেত্রের সঙ্গে তাদের যোগ, যে যোগে তাদের জগতের আহ্বানে তারা সাড়া দেয়—তেমনিতরই মানুষের একটি পূর্ণ জাগরণ আছে, সেই জাগরণে তার চৈতন্য পরম চৈতন্যকে উপলব্ধি করে এবং সেই উপলব্ধিতে তার নিজেকে উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের শক্তি আমাদের প্রেম সংসারে তার আপন ক্ষেত্রকে একেবারে পাচ্চে না তা নয়, ছোট ছোট আকারে ছোট ছোট সীমার মধ্যে প্রতিদিনই পাচ্চে। ছোট ঘরের চারটে দেয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে মানুষ যে বাঁচে না তা নয় ; সেইটুকুর মধ্যে তার চোখ কান যতটুকু দেখবার শোনবার তা দেখে শোনে, তার হাত পা যতটুকু আপনাদের চালনা করবার তা করতে পারে। কিন্তু সেখানে আলোকের বাতাসের পূর্ণতা নেই, এই জন্যে সেখানে মানুষের দেহ মন আনন্দ পায় না, তার আশ্রয়স্থান রোগের আকর হয়ে ওঠে ; এই জন্যেই এমন জায়গাকে কারাগার বলে। তেমনি যখন কেবল এই সংসারটুকুর মধ্যেই বদ্ধ ক'রে আমরা আমাদের আত্মাকে পেতে চাই, তখন আমাদের উপলব্ধি আনন্দময় হয় না, তখন তার মধ্যে তাপ এবং বিকৃতি জম্‌তে থাকে, তখন আপনার চেয়ে চারিদিকে আপনার বাধাকেই প্রত্যক্ষ সত্য এবং চির সত্য ব'লে মনে করি। তখন, যারা মুক্তিকে বিশ্বাস করে না, যারা দেয়ালকেই বিশ্বাস করে, তারা এই সঙ্কীর্ণতাকেই আঁকড়ে প'ড়ে থাকে ; আর যারা দেয়ালের বাইরেকার অনন্তকে জানে তারা জানে সেইখানেই তাদের মুক্তি, সেই খানেই তাদের আনন্দ ; তারা জানে দেয়ালে জানালা বসিয়ে সেই অনন্তের সঙ্গে তাদের আশ্রয়ের যোগ সাধন করলে তবেই এখন যা বন্দিশালা সেইটেই গৃহ হ'য়ে দাঁড়াবে ; আর সেই জানালা বসানো যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তবে এই দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়াই তাদের পক্ষে শ্রেয় হবে।

মানুষের সকলের চেয়ে বড় শক্তি ভালবাসবার শক্তি। এই শক্তিতে সে নিজেকে অতিক্রম ক'রে অন্যের মধ্যে আপনাকে পায়। এমনি ক'রে সীমাকে অতিক্রমের দ্বারাই নিজেকে পাওয়া হচ্চে আত্মার প্রকৃতি, কেন না আত্মার মধ্যে অসীমের ধর্ম্ম আছে। এই তার বড় শক্তিকে মানুষ যখন একান্তভাবে ছোট ক্ষেত্রে বদ্ধ করে তখন নানা প্রকার বিকৃতি আসতে থাকে, তখন এই অবরুদ্ধ প্রেমের মধ্যে ঈর্ষা হিংসা দেখা দিতে থাকে। প্রেমকে আত্মীয়ের মধ্যে অতিশয় আবদ্ধ করলে স্বার্থপরতা যে কি রকম প্রবল হ'য়ে ওঠে সে ত আমরা সংসারী লোকদের মধ্যে নিয়তই দেখ্‌তে পাই। স্বদেশের মধ্যেই মানব-প্রেমকে অতিমাত্র আবদ্ধ করার দ্বারা কি রকম নিদারুণ পাপের সৃষ্টি হ'য়ে

পৃথিবী পীড়িত হ'তে থাকে তার দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখেচি। এর কারণ, যা স্বভাবতই বড়, ছোটর বন্ধন তাকেই সব চেয়ে পীড়িত ও ব্যর্থ করতে থাকে। পাখীর পক্ষে খাঁচাটা হচ্চে বড় দুঃখের, কেন না তার যে পাখা আছে। মানুষ যদি কেবলমাত্র সংসারী হয়, বিষয়ী হয়, কিম্বা স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তাহ'লে সেটা তার পক্ষে দুর্ভাগ্য, কেন না তার 'প্রেমের মধ্যে সেই ধর্ম্মই সত্য যা সীমাকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে মুক্তিদান করে।

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,
হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

"এই যে দেবতা, বিশ্বকর্ম্মা যাঁর কর্ম্ম, যিনি মহা আত্মা, যিনি জন সকলের হৃদয়ের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁকে হৃদয়ের দ্বারা, আত্মবশ মনের দ্বারা, মননের দ্বারা যাঁরা জেনেচেন তাঁরা অমৃত হন।"—কেন না, তাঁরা আত্মাকে পেয়েচেন; সেই আত্মাকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া।

অন্ধকারের মধ্যে যখন থাকি তখন অতি অল্প পরিসরের মধ্যেই আমরা নিজেকে সাবধানে ভয়ে ভয়ে চালনা ক'রে থাকি। তখন প্রতিপদক্ষেপেই আমরা ঠোকর খাই ব'লেই পদক্ষেপ করাটাকেই আপদ ব'লে গণ্য করি। তখন যেটুকু জায়গা অতি পরিচিত তারই মধ্যে নিজের থাকা কাজ করা চলা ফেরাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে রাখা আবশ্যক ব'লে জানি। কিন্তু আলো আসবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই আমরা জান্‌তে পারি, আমাদের অধিকার বিস্তীর্ণ, এবং অন্ধকারের বাধাও ধ্রুব নয়। তেমনি সেই আলোকে আত্মার সার্থকতা যে আলোকে সে সহজেই অনুভব করে যে, যে-নিজেকে, যে-পারিবারিকতাকে, যে-স্বাদেশিকতাকে সে আপন উপলব্ধির সীমা ব'লে জেনেছিল, সেই সীমা তার ধ্রুব নয়, সত্য নয়। অসীমের আলোকে অমৃতলোকে জাগরণই তার জাগরণ।

চোখ যেমন আলোকময় আকাশে জাগে তেমনি আমাদের আত্মা পরমাত্মার মধ্যেই জাগ্‌তে পারে। অর্থাৎ পরমাত্মার মধ্যেই আত্মা আপনাকে দেখ্‌তে পায়, ঐকান্তিক সংসারের মধ্যে সে সুপ্ত, সে অন্ধ। সেখানে সে নিজেকে জানেনা ব'লেই বিষয়কে বড় ক'রে জানে। এই পরমাত্মার মধ্যেই সে বাস করছে, এই খানেই তার অমৃত, এই উপলব্ধিটিকে সে যদি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরে তা হ'লেই পদে পদে সে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচে। কেন না, সকল মিথ্যারই জন্ম সেইখানে যেখানে আত্মা নিজেকে জানে না।

এই মহা আত্মাকে প্রীতিসমুজ্জ্বল হৃদয়ের মধ্যে আত্মবশ মনের মধ্যে জানলে পর তবে সংসারে আমাদের সমস্ত প্রেম আমাদের সমস্ত কর্ম্ম সত্য হবে। সেই বিশ্বকর্ম্মকে হৃদয়ের মধ্যে জেনে আমাদের সকল কর্ম্ম বিশ্বকর্ম্ম হবে। অর্থাৎ কর্ম্ম তখন আপন বন্ধন ত্যাগ করবে, অহঙ্কারের বন্ধন; তখন কর্ম্মেই হবে আমাদের মুক্তি। মুক্ত স্বরূপ মহা আত্মা তিনিই বিশ্বকর্ম্মা,—আমাদের আত্মা তার সকল কর্ম্মে সেই বিশ্বকর্ম্মের মুক্তি লাভ করে যখন সে পরমাত্মার মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ কেবলই যে স্বার্থপ্রবৃত্ত কর্ম্ম করচে তা নয়, সেই সঙ্গে সে নানা উপলক্ষ্যে কল্যাণকর্ম্মও করচে। এই সকল কল্যাণকর্ম্ম দ্বারাই মানুষ আপনার দ্বারে আপনি আঘাত করচে। এই কল্যাণকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্ম কেবলি তার বন্ধনকে ক্ষয় করচে; কেবলি তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্চে সে আত্মা বিশ্বকর্ম্মা, মহা আত্মার মধ্যেই তার আশ্রয়। এই কল্যাণ কর্ম্ম অসীম ত্যাগের ক্ষেত্রে মানুষকে উদ্বোধিত করবে।

এই কথাটি আজ উৎসবের দিনে আমরা স্মরণ করি। এই আশ্রমে আমরা যে কাজের জন্য এসেচি সেই কল্যাণ

ব্রতের সত্যটি মনের মধ্যে উপলব্ধি করি। তা হ'লে এখানকার প্রতিদিনের কর্ম্ম বিশুদ্ধ হবে, তার সমস্ত বিরোধ দূর হ'তে থাক্‌বে, তা আত্মত্যাগের কর্ম্ম হবে। আজ আমাদের কর্ম্মকে উদ্বোধিত করি উদাসীনতা থেকে তপস্যায়, অহঙ্কার থেকে প্রেমে, সঙ্কীর্ণতা থেকে বিশ্বকর্ম্মের উদারতায়।

ইতিহাসের চলমান ধারার মধ্যেই আমরা সত্যের জয়-যাত্রাকে দেখ্‌ব। সেই যাত্রা ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় বিশেষ আকারে আটকা পড়েছে, সেইখানে সে তার চরম গন্তব্যে স্তব্ধ হ'য়ে গেচে, এই কথা যদি বা কল্পনা করি তবে সেই কল্পনা নিয়ে গৌরব করা আনন্দ করা চল্‌বে না। থামাই হচ্চে মৃত্যু, সেই থেমে যাওয়া থেকেই বিকৃতি। যখনি মানুষ সত্যকে নিশ্চল ক'রে ব্যবহার করতে গেছে তখনি সে দুর্গতি লাভ করেচে, বারে বারে তার প্রমাণ পেয়েচি।

সমস্ত মানুষের তপস্যাকে এক ক'রে দেখ্‌লে তবে আমরা তার অর্থ পাই। সেই তপস্যা যাত্রার তপস্যা। কোন্ প্রাচীন যুগে মানুষ সেই যাত্রায় বেরিয়েচে, তখনো রাত্রি অন্ধকার; তখনো তারার আলোক প্রভাতের সূচনা করেনি; তখন সেই অন্ধকারে কত ছায়া কত বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরেছে। সেই অস্পষ্টতার কুহকে মানুষ বাস্তবে অবাস্তবে মিলিয়ে নিজের মনকে নানা রকমে নানা ভাবে ভুলিয়েচে; কিন্তু সেই সমস্তের মধ্যে আসল সত্য হচ্চে তার যাত্রা। যখন অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছিল না তখনো মানুষকে ভিতর থেকে কে বল্‌ছিল পথ বের করতে হবে। কেন? কেননা, যে-টুকুর মধ্যে রয়েচ সে-টুকুর মধ্যে তোমাকে ধরে না। আরো যেতে হবে, আরো পেতে হবে। সেই একটি আরোর উদ্দেশে তার সমস্ত ভক্তি, সমস্ত পূজা। মনে যা সে কল্পনা করেচে তা সমস্ত সত্য নয়, মুখে যা সে বলেচে তা সমস্ত সত্য নয়, কর্ম্মে যা সে প্রতিষ্ঠিত করেচে তাও সমস্ত সত্য নয়। কিন্তু তার সত্য হচ্চে তার যাত্রায়, সেই যাত্রায় সে জেনে এবং না জেনে স্বীকার করচে অসীমকে। সে বল্‌চে আমি চাই। যাকে পেয়েছে তাকে নয়, যাকে পাওয়া যেতে পারে তাকেও নয়, তার চেয়েও বড়কে। তার সমস্ত ইতিহাস দিয়ে সে এই কথাই বল্‌চে—

> যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

অর্থাৎ সে বল্‌চে যাঁকে মনও পায় না, বাক্যও পায় না তাঁকেই জান্‌লে তবে আনন্দ, তবে অভয়। কিন্তু মানুষের একটা ছোট দিক আছে যে দিক্‌টা তার বিষয়ী; সে লোভী, সে কেবলি বলে হাতে পাওয়া চাই। এই জন্যে যখন সে বাঁধা মতে বাঁধা সম্প্রদায়ে এসে ঠেকে তখন ব'লে ওঠে, পেয়েচি। শুধু তাই নয়, সে গর্ব্ব ক'রে বলে এই পাওয়ার মধ্যেই জগতের সমস্ত মানুষকে এনে ঠেকাতে হবে, বাঁধতে হবে। কিন্তু এমন কথা ব'লে কোনো মানুষ কোনো সম্প্রদায় কখনই সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত সাড়া পায়নি। তাতে সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্যের বিষয়ী লোকেরা রাগ করেচে; তারা সবাইকে ভ্রান্ত বলেচে; অনেক সময়ে যাকে তারা ভ্রম ব'লে স্থির করেচে তাকে গায়ের জোরে ভাঙতে চেয়েচে। যেমন রাজ্যলোলুপেরা যুদ্ধ ক'রে রাজ্য বিস্তার করতে চায়, তেমনি ধর্ম্মরাজ্য-লোলুপেরাও নিন্দা ক'রে আঘাত ক'রে রক্তপাত ক'রে দল বৃদ্ধি করতে চায়। তার একটি মাত্র কারণ, তারা মনে স্থির ক'রে বসেচে, সত্যকে পেয়েচি, চিরকালের মত নিশ্চল ক'রে পেয়েচি। তা হোক তবু তারা গায়ের জোরে মানবের ইতিহাসের মর্ম্মগত এই বাণীকে রুদ্ধ করতে পারেনি,—

> যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

"বাক্য যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে, মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে তাঁকে যে জানে তার ভয় নেই।" একথা শুনে সম্প্রদায়িকেরা, ধর্ম্মরাজ্যের বিষয়ী লোকেরা রাগ করে, তারা বলে তবে তাঁকে জান্‌ব কি ক'রে? তার উত্তর হচ্চে, আনন্দের দ্বারা। এই উত্তর পাগলের উত্তর হ'ত জগতে প্রত্যহ যদি এর প্রমাণ না পাওয়া যেত। কোথায় প্রমাণ পাই? যেখানে আমাদের ভালবাসা সেইখানেই।

সাধারণত মানুষের সঙ্গে আমাদের যে ব্যবহার তার একটা হিসাব আছে। যে ভৃত্য আমার যে পরিমাণের ও যে প্রকৃতির কাজ করে তার একটা হিসাব আমার মনে আছে; সেই হিসাবটা যে পরিমাণে নির্ভুল হয় তার সম্বন্ধে আমার পরিচয়টাও সেই পরিমাণে নির্ভুল হয়। ডাক্তারকে উকিলকে বিদ্বানকে কোনো না কোনো তুলা দণ্ডে আমরা ওজন ক'রে জানি; একদিকে তারা এবং আরেক দিকে আমার বাটখারা, এই দুয়ের মিল ক'রে তবে আমরা বলি তাদের চিনেচি। এমন ক'রে এখনো যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি তাদের সম্বন্ধেও এটুকু জানি যে, এমনি ক'রেই রূপ গুণ ধন বিদ্যা প্রভৃতির ওজনের দ্বারা তাদের ঠিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষকে যেখানেই বিষয়ের মত ক'রে দেখি সেখানে তাদের এম্‌নি ক'রেই জানি এমনি ক'রেই পাই।

কিন্তু মানুষকে যেখানে ভালবাসি তুলাদণ্ডে সেখানে তার ওজন পাইনে। মানুষের রূপ গুণ ধন মান সমস্তই পরিমেয়, কিন্তু ভালবাসার মানুষ পরিমেয় নয়। এই জন্যে ভবভূতি বলেচেন—

স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ।

অর্থাৎ যে মানুষটি প্রিয় সে যে কি তা মনেও ভাবা যায় না, মুখেও বলা যায় না,—কেননা সেইখানেই মানুষের অসীমকে আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু এই প্রিয় মানুষকে আমরা বিষয়ের ওজনে ওজন করতে পারিনে ব'লেই এ'কে ডাক্তারের চেয়ে উকিলের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ক'রে জানি। মন এবং বাক্য এ'কে না পেয়ে ফিরে আসে ব'লেই এর মধ্যে আমাদের এত আনন্দ। তার কারণ, মানুষের মনের পক্ষে পাওয়াটাই বাধা, সুনির্দ্দিষ্ট পরিচয়টাই বাধা; সে এমন একটি অনির্ব্বচনীয়তাকে চায় যেখানে কোনো কালেই তার সক্রিয়তার অন্ত থাকে না; যেখানে তার চির-নূতন, অর্থাৎ যেখানে তার পরিচয়ের সীমা নেই।

জগতে এই যে অনির্ব্বচনীয়তাকে সে ক্ষণে ক্ষণে জেনেচে, একেই চরম সত্য পরম সত্যরূপে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সকল পথে সকল আলোকেই মানুষ উপলব্ধি করতে বেরিয়েচে। এই যে উপলব্ধি এ একটি প্রবহমান ধারা; কোনো বিশেষ কালে ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনায় এ আবদ্ধ হয়নি; অসংখ্য তরঙ্গের মধ্যে স্রোতের ঐক্যের মত এর সমগ্রের মধ্য দিয়েই একটি অখণ্ড রসের ঐক্য আছে। সেই হচ্চে সমস্ত মানুষের পূজার রস, ভক্তির রস, সেই হচ্চে তার যথার্থ মুক্তির রস। কিসের থেকে মুক্তি? না-পরিচয়ের বন্ধন থেকে, পাওয়ার বন্ধন থেকে, সীমার বন্ধন থেকে। মানুষের ভক্তির ইতিহাসের মূল তত্ত্বটাই হচ্চে এই,—মানুষ বলচে, আমার আত্মা বিষয় থেকে মুক্তি চায়; অর্থাৎ যাকে পাওয়া যায়, মাপা যায়, আসক্তির দ্বারা যাকে আঁকড়ে থাকা যায়, চারিদিকে তাঁর দ্বারা নিবিড়ভাবে বেষ্টিত থেকেও মানুষের আত্মা তাঁকেই সত্য বলচে, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

কিন্তু তবু মানুষের বিষয় বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে তার আত্মাকে ফাঁকি দিতে চায়; কতকগুলো বাঁধা মত বাঁধা শাস্ত্রের খড়কুটো দিয়ে একটা সম্প্রদায় বেঁধে, সে বলে সত্যকে এতকাল পরে আমরাই পেয়েচি এবং তাকে দড়াদড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে ফেলেচি। তখন থেকে নানা উপচারে সেই বাঁধন-দেবতার পূজা করি, সেই বাঁধন-দেবতার নামে উৎসব করি, এবং সেই বাঁধন-দেবতার কাছে নানাভাবে নরবলিও দিতে থাকি। তখন শৃঙ্খলটাকেই খুব বড় ক'রে স্বর্ণময় ক'রে তৈরী করি, এবং যে আত্মা মুক্তি চায় তাকে বলি এই ত তোমার মুক্তি, দেখ এ কত বড়, দেখ এর কত দাম! এম্‌নি ক'রে বন্ধনই যখন ভূমার ছদ্মবেশ ধ'রে আসে তখন আমাদের সব চেয়ে বড় বিপদ; বিষয় যখন ধর্ম্মের নাম গ্রহণ করে তখনই ভয়ানক ঠকবার দিন আসে।

অহমিকায় মানুষকে কেন অসত্যে নিয়ে যায়? কেননা অহমিকায় সে এই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাকে বরণ ক'রে

নেয় যে, আমাতেই আমার সার্থকতা। অথচ এর চেয়ে সত্য আর নেই যে, মানুষ আপনার একান্ত স্বাতন্ত্র্যে সম্পূর্ণ নয়। মানুষের মধ্যে তাঁরাই মহাত্মা যাঁরা সকল মানুষের মধ্যেই আপন আত্মাকে জেনেছেন এবং সেই সত্যের দ্বারাই জীবনকে চালিত করেচেন। যার অহমিকা প্রবল সে আপনার চারিদিকে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই বড় ক'রে তুলতে চায়, বিশ্বের সঙ্গে আপন যোগকে অবরুদ্ধ করে।

সম্প্রদায় যখন বিশেষ নাম রূপ এবং বাঁধা মতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তখন সে আপন পরিবেষ্টনের মধ্যে একটি অহমিকাকে আশ্রয় দেয়। সে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব্ব করতে থাকে। এই গর্ব্ববশে সে ভুলে যায় যে, সত্যকে সে আপন মাটির টবের মধ্যে পুঁতে তাকে বিশেষ নাম দিয়ে নিজের দলের সামগ্রী ব'লে অহঙ্কার করচে বটে, কিন্তু এই সত্য বনস্পতি সমস্ত মানবের বিশ্বচিত্তে মূল বিস্তার ক'রে বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে;—সকল মানুষেরই তপস্যা তাকে প্রাণ দিয়েছে। তাকে ছেদন ক'রে যদি তোমার ভাণ্ডারে বোঝাই কর তবে সে হবে জ্বালানি কাঠ, তার দ্বারা বেড়ার খুঁটি তৈরী করা চলবে, তার দ্বারা দাহন করাও সহজ হবে, কিন্তু তার থেকে অমৃত ফল ফলবে না। বৈষয়িক অহমিকা অর্থাৎ স্বার্থপরতা থেকে মানুষ পৃথিবীকে নানাপ্রকারে পীড়ন করেচে, ধর্ম্মের অহমিকা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা থেকেও মানুষ মানুষকে নিদারুণ কষ্ট দিয়েচে। আজও পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের কঠোরতম ভেদ সাধনের উপায় স্বরূপে এই সাম্প্রদায়িকতা খাড়া হয়ে আছে; সত্যের নামে সে অসত্য, প্রেমের নামে অপ্রেম, ত্যাগের নামে আত্মাভিমান, পুণ্যের নামে আচার, পূজার নামে অনুষ্ঠানবিধি বিস্তার করচে। বিষয়বুদ্ধি মানুষকে ভ্রান্ত করে ও নিষ্ঠুর করে, কিন্তু মানুষদের পরস্পরকে ভুল বোঝাবার, পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর ক'রে তোলবার পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা যত প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেচে এমন আর কিছু না। এই জন্যই সাম্প্রদায়িকের যত কিছু প্রচণ্ড বিরোধ প্রায় সমস্তই বাহ্য নিয়ম নিয়ে; সত্যকে সে অনায়াসে অবজ্ঞা করতে পারে, কিন্তু নিজের তৈরি বালির ঢিবিকে নিয়ে তার লড়াইয়ের অন্ত নেই। কেন না সে জানে সত্য তার আপন নয় বালির ঢিবিই তার আপন; এইখানেই তার স্বাতন্ত্র্য—এই স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখাই হচ্ছে তার আত্মরক্ষা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস—

—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

(দিদি রচয়িত্রী)
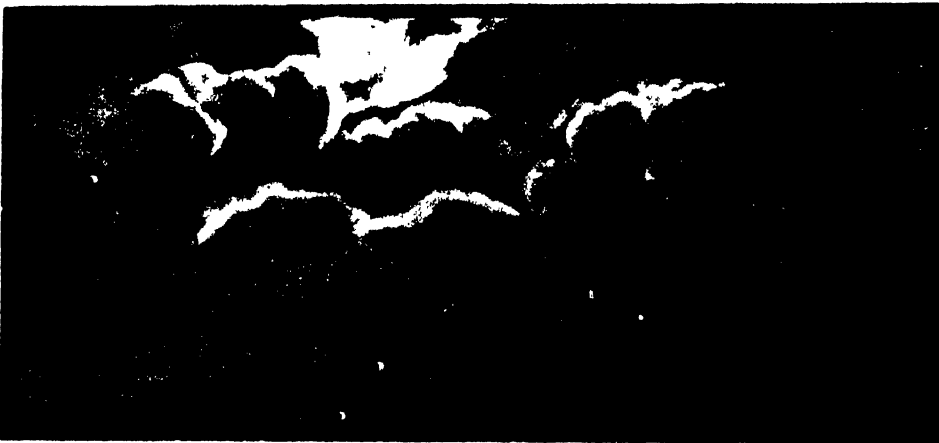
৩

দেউলদ্বারে

—"কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারী,
গোধূলি বেলায় বনের ছায়ায় চির উপবাসী ভুখারি,
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারী।"

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। বড় বড় বাঁশঝাড় ও আম জাম তেঁতুল কাঁঠালের বনে ঘেরা গ্রামখানি চারি পার্শ্বের প্রকাণ্ড মাঠ-গুলির মাঝে যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ভয়েই শ্যাম বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে।

গ্রামের রাখালেরা গরুগুলাকে শস্যহীন "মেলামাঠে" যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া নিজেরা মাঠের পার্শ্বস্থিত ক্রম-প্রসারিত-বংশ 'কালি গাছের' বিশাল ছায়ায় দল বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কেহ বা তল্‌তা বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিতেছিল, কাহারাও বা ক্রীড়া কলহে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের বৃক্ষারোহণ স্পৃহা যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকিলেও এবং সেই বহুপ্রাচীন অদ্ভুত বৃক্ষটির বহু স্থূল শাখা ভূমি স্পর্শে বহুতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া সে স্থানটিকে বৃক্ষের চক্রব্যূহে বেষ্টন করিলেও কেহ সে গাছের উপবৃক্ষের উপশাখাকেও পাদ স্পৃষ্ট করিতে সাহস পায় না। সে অঞ্চলে ঐ জাতীয় বৃক্ষও আর একটিও ছিল না। পত্র তাহার প্রায় জামের মতই, ঈষৎ সরু বলা চলে; ফল বটের মত। এ জাতীয় বট সে দেশে আর কেহ দেখে নাই তাই তাহার উপরে বহুদিন হইতে এইরূপ একটা সম্ভ্রম বা ভয়ের সৃষ্টি হইয়া আছে। গাছটির প্রাচীনত্ব এবং স্থান সংস্থান সতাই সম্ভ্রমোদ্দীপক। মূল বৃক্ষটির বিপুল দেহ বোধ হয় পাঁচ সাত জন দীর্ঘবাহু লোকেও আঁকড়িয়া ধরিতে পারে না। তাহাতে অসংখ্য কোটর, তাহার মধ্যে দুই তিন জন লোক স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারে, চতুষ্পার্শ্বে স্থূল জটা-গুলি বিশাল অজগরের মতই ঝুলিতেছে, কোনটার মাথা চ্যাপ্টা হইয়া বাঁকিয়া ঠিক যেন সাপের মতই ফণা ধরিয়া আছে। আদি বৃক্ষের বিপুল শাখাগুলি নিজ বৃদ্ধির ভারে ভূমি স্পর্শ করিয়া চারিদিকে ঠিক স্বতন্ত্র বৃক্ষের মতই স্থান গ্রহণ করিয়াছে, আবার তাহা হইতেও উপশাখা সকল মাটিতে লুটাইয়া অপর একদল তরুণতর বৃক্ষ সৃষ্টির উপক্রম করিয়া স্থানটিকে একটি ক্রমবিন্যস্ত বৃক্ষচক্রে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। পত্রবহুল সেই ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষচক্রের মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণও যেন কষ্টে প্রবেশ করে। গ্রামের ঠাকুরদাদারা ইহাকে "সত্যকালের বৃক্ষ" বলিয়া নাতি নাতিনীদিগের মনে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকে ইহাকে "চালানো গাছ" বলিয়াই জানে। পুরাকালে কোন ডাকিনীতে ইহাকে চালাইয়া আনিয়া এইখানে রাত্রি প্রভাত হওয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে, সেইজন্যই এ গাছে ৺মা কালীর অধিষ্ঠান! গ্রামবাসী ইতর ভদ্র সকলেই ইহার নিকট দিয়া যাইতে হইলেই বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়া শির নত করে।

মূল গাছের তলাটি বাঁধানো (অধুনা ভগ্ন)। সেখানে বৎসরান্তে ফাল্গুনী শুক্লপক্ষের কোন শনি মঙ্গলবারে গ্রাম-বাসী সর্ব্বসাধারণে সমবেত হইয়া ৺কালীপূজা করিয়া থাকে এবং সকলে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বনপালনি করে। মুচিরা আসিয়া প্রথমে সমস্ত বন পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া দিয়া যায়, বাঁশের ছ্যাচা ও চাটাইয়ে রন্ধনশালা নির্ম্মিত হয়, ব্রাহ্মণের বিধবা সধবা পবিত্রা নারীরা ভোগ রাঁধেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ছোট বড় সকলের সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যে একত্র হইয়া এখানে সেদিন মহা উৎসব করিয়া থাকে। সেই গাছতলায় তখনো পূজার চিহ্ন সকল বৈশাখের ঝরা পাতার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে নাই, চ্যাটাইয়ের ঘরের ভগ্নাংশ তখনো কিছু কিছু বর্ত্তমান রহিয়াছে,

জোল কাটিয়া রন্ধন হইয়াছিল সে গর্ত্তগুলা পাতায় ভরিয়া আছে। এই পাতা ঝরার সম্বন্ধেও গাছটির মহিমার কথা গ্রামে প্রসিদ্ধ। এ গাছে পুরানো পাতা থাকিতে কখনো নূতন পাতা বাহির হয় না। অল্পসল্প ভাবে পাতা ঝরিতে ঝরিতে সহসা চৈত্রশেষে বা প্রথম বৈশাখের কোন একদিনে গ্রামবাসী লক্ষ্য করে যে কোন্ দিন সব পাতা ঝরিয়া গিয়া ঈষদোদ্ভিন্ন কিশলয়ে সারা বৃক্ষ-চক্রব্যূহ শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষতলে যজ্ঞ-ভস্ম অর্দ্ধ-দগ্ধ সমিধ শুষ্ক ফুল ও সিন্দুর-চিহ্ন তখনো বর্ত্তমান। হঠাৎ এক সময়ে বালকেরা চকিত হইয়া দেখিল সেই বৃক্ষ-বেদীতে কে যেন প্রণত হইতেছে। চাহিয়াই চিনিল তাহাদের বাপ খুড়ার দিদি ঠাক্‌রুণ এবং তাহাদের পিসি ঠাক্‌রুণ, রায়বাড়ীর একটি অনতিপ্রৌঢ়া রমণী গলবস্ত্রে বৃক্ষ তল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুহূর্ত্তে তাহাদের কলহ চীৎকার ও বংশী-আলাপ থামিয়া গেল, চুপ চুপ এই রকম একটা সঙ্কেত দলের মধ্যে নিঃশব্দে সঞ্চালিত হইল। কেহ বা অস্ফুটে কাহাকেও প্রায় ইঙ্গিতেই প্রশ্ন করিল, "ঠাক্‌রুণ এত বেলা এইখানে ব'সে জপ কচ্ছিল নাকি?" জিজ্ঞাসিত বালক সেইরূপ ইঙ্গিতেই উত্তর দিল, "কি জানি।"

"নোটো!" স্নিগ্ধ আহ্বানে সচকিত হইয়া একটি বালক সেই সৌম্যদর্শনা রমণীর নিকটে অগ্রসর হইলে তিনি বলিলেন, "চাট্টি বেলপাতা পেড়ে দিবি বাবা?"

"বেলপাতা, পিসি ঠাকরুণ? তা বেলপাতা এখানে—"

"হ্যারে এইখানেই। এই ঠাকুর তলার বাইরেরই গাছটার নূতন পাতাগুলো দিব্যি বড় বড় হ'য়েছে!"

"আপনি এগিয়ে চল" বলিয়া নোটো একবার তাহার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "পিসি ঠাকরুণ. আপনাদের 'আথাল্' ঐ 'রমূল্য' তোমাদের সেই "পলুটি" গাইডে, যানার এই পইলে বাছুর হয়েছেন, তানাকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসে এইখেনে খেলা করছে, তানাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্চিনে।"

'রমূল্য' নোটার সঙ্গে এতক্ষণ যে কলহ করিতেছিল নোটোকে এই ভাবে তাহার শোধ লইতে দেখিয়া সতেজে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌নে বল্লেই হল? তোরাই তোদের গাই সব আগ্‌লিয়ে মাঠে ব'সে আছিস্ নাকি? না পিস্ ঠাকরুণ"

"না পিস ঠাক্‌রুণ!"—নোটো অমূল্যকে মুখ ভাঙাইয়া বলিল; "বটে। মিছ কথার! আয়েদেরসে "পেয়ালা" রংয়ের গাইডে দেখা যাচ্চিল? মুখুযোদের, বোরিগিদের, কি বলে গিয়ে কায়েতদের, তাবাদে আমাদের 'ফড়ে' বাড়ীর—'হাপা' বাড়ীর—'লেঠেল' বাড়ীর সাদা শামলা লালি সব গাইই তো দূরে থেকেও বোঝা যাচ্ছে, তানারা মাঠে দিব্যি চর্‌ছেন, সেই পেয়ালাডাকেই বা দেখা যাচ্চে না কেন? যদি ঘোষেদের জমির দিকে গিয়ে থাকেন, তারা জমি চস্‌ছে এখনি ধরে 'পাণ্ডবে' নিয়ে যাবেন! ক্ষেতে কিছু থাকুক না থাকুক লোক্‌সান হোক্ বা না হোক্ ঘোষেরা এমনি লোক্।—নয় কি পিসি ঠাক্‌রুণ?"

পিসি ঠাকুরাণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অমূল্যের দিকে চাহিতেই অমূল্য ঈষৎ ব্যাকুল ভাবে বলিল, "তিনি হয়ত বাড়ী চ'লে গিয়েছে পিসি ঠাক্‌রুণ; 'পাণ্ডবে' তিনি কখনই যায়নি! আপুনি দেখ গা বাড়ী গিয়ে সে হয়ত ফ্যান জলের 'পাতনা'র মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আছে, কি তেনার 'নাম কি' বাছুর খোঁয়াড়ের কাছে চর্‌ছেন।"

"আমি তো এখন বাড়ী যাব না অমূল্য,—'শিবের কোঠায়' যাব! চল্ তো নোটো বেলপাতা পাড়্‌বি।" বলিয়া রমণী অগ্রসর হইলে নোটো ঈষৎ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রশ্ন করিতে করিতে চলিল, "এতবেলায় আপনি শিবের কোঠায় যাবা পিসি ঠাক্‌রুণ? তারপরে খাবা দাবা কখন? এতবেলা তো কালিতলায় ব'সে জপ কচ্চিলে নয়? তারপরে 'আদাবল্লবের' মন্দিরে যাবা না? ও 'আদাবল্লবের' কোঠা বুঝি এখন বন্ধ? সেই সাঁজ বেলায় আরতির সময় খোলে। আজ আমি কাকার সঙ্গে কেত্তন করতে যাব, জান পিসি ঠাক্‌রুণ? নেপ্‌লা রোজ যায়, ও বেশ কেত্তন গাইতে শিখেছে।" "ওহে" বলিয়া কীর্ত্তনের সুর টানিতে গিয়াই নোটো সচকিত হইয়া উঠিল! এতক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়াই সে নিজমনে বকিয়া যাইতেছিল, এইবার নিজের সুর নিজের কাণে যাইবা-মাত্র 'পিসি ঠাক্‌রুণের' উপস্থিতির কথা মনে পড়িয়া লজ্জিত ভাবে একবার চুপ করিল; কিন্তু বেলগাছে না ওঠা পর্য্যন্ত তাহার রসনা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইল না! 'হাঁ পিসি ঠাক্‌রুণ,

আপনি সকল দিনই পুজো কর তো খাওয়া দাওয়া কখন হন? এরপরে আবার "নত্‌গে"দের পেসাদ দিতেও তো বাবা! আপনি গাঁয়ে না থাক্‌লে তো তারা ম'রেই যেত। তারা কোন্‌ গাঁ থেকে এসেছে পিসি ঠাক্‌রুণ?"

"বেশী দূরের নয় রে—ঐ যে লক্ষ্মী জোলার কাছে যেখানে গৌর নিতাইয়ের ভাঙা মন্দির আছে—সেইখানে ওদের ঘর ছিল। পাড়ার সব ম'রে হেজে যেতে ওরা উঠে এই গাঁয়ে এসেছে। কিন্তু তুই এবার গাছে ওঠ বাছা!"

"উঠি" বলিয়া শ্যামপল্লবমণ্ডিত বৃক্ষটির অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায় ঠেকাইয়া নোটো গাছে উঠিতে উঠিতেও প্রশ্ন চালাইয়া চলিল, "আচ্ছা পিসি ঠাক্‌রুণ, ঐ লক্ষ্মী জোলা দিয়ে কি সত্যি সত্যি লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ হরি হোড়ের বাড়ী থেকে কোঁদলের জ্বালায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়েছিলেন, তাঁনারই চোখের জলে ঐ লক্ষ্মী জোলার জোল? খড়ের ওপারের হাত্‌ছালা গাঁয়েই কি সেই হোড় মশায়ের হাতিশালা ছিল? ঐ দিকের ঐ 'সার বাড়ি' কি তানারই গরু মোষ হাতি ঘোড়ার নাদ ফেলা সারের বাড়ী? না পিসি ঠাক্‌রুণ, আমাদের বীরপুরের জোব্বান মিয়া বলেছে যে, কোন মোছলমান সাহা ওগাঁয়ের পত্তন করেছিল, ওর নাম সাহার বাটি! জোব্বান মিয়া বেশ লেখাপড়া জানে—হিদয়পুরের পাঠশালায় ও নাকি লেখাপড়া শিখেছিল—আর কোন্‌ মৌলুবি না কে ওকে আরবি ফার্‌সিও একটু একটু শিখিয়েছিল।"

রাশিকৃত বিল্বপত্র বৃক্ষ-নিম্নে স্তূপীকৃত হইতেছিল। ঠাকুরাণী তাহা চয়ণ করিতে করিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোরাও কে কে না পাঠশালায় পড়তে গিয়েছিলি? তা ছাড়্‌লি কেন? তোদের 'মশায়' কি আর পড়ায় না?"

"বাবা শেখ্‌তে দিলে কই পিস্‌ ঠাক্‌রুণ?—বল্লে আমাদের ছেলের আবার লেখা পড়া! গরু চরাবে নাঙল ঠেল্‌বে, তাদের আবার বাবুগিরি? বই কাগজ পেন্সিল এসব কিনিই দিতে পার্‌লো না তা লিখ্‌ব কি—নৈলে মশাই খুব ভাল ছিল—তিনি তো আমাদের চাষার ছেলেদের মাইনে নিতেন্‌ না। বই ছিল না তবু মুখেই তিনি কত কি শেখাতেন। তানার কাছেই ঐ লক্ষ্মীজোর 'হরি হোড়'—এই সব গল্প শুনেছি। তিনি কত গাঁয়ের কত গল্পই যে জান্‌তেন্‌!"

বৃক্ষ হইতে ঝুপ্‌ করিয়া নামিয়া একটি পক্ব বিল্বফল ঠাকুরাণীর সম্মুখে ধরিয়া রাখাল বালক বলিল, "এই পাকা বেল্‌ডা শিবের মাথায় দিও পিস্‌ ঠাক্‌রুণ! খাসা পেকেছে।"

স্নিগ্ধহাস্যের সহিত ফলটি গ্রহণ করিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন, "শিবকে বল্‌ব যে নোটোর বাবার যেন জমিতে খুব ধান হয়—নোটোকে যেন আবার পাঠশালায় দিতে পারে, না রে?"

নোটো সলজ্জ আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিল।

"রাধাবল্লভের কীর্ত্তনে আজ যাবি বল্লি,—হরিল্লুট পর্য্যন্ত থাকিস্‌, বুঝ্‌লি!"

দ্বিগুণ আনন্দে নোটো মাথা হেলাইয়া বলিল, "ঐ যে হরিশ 'পিয়েন' গাঁয়ে যাচ্চে। বাবা, এই রোদে সাতখানা মাঠ ভেঙে সেই 'হিদয়পুর পোষ্টো আপিস্‌ থেকে আস্‌ছে। নেকা পড়া শিখে কিই বা হয় পিস্‌ ঠাক্‌রুণ! ওতো আমাদেরই জাতের লোক! বাবার সঙ্গে গল্প করে নিজের দুঃখের কথা। এগাঁয়ে সাতদিনে দুদিন আস্‌তে হয় বটে, কিন্তু এম্‌নি চারদিকের সব গাঁয়েরই বার্‌ আছে! ওকে রোজই এমনি রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরা তবু রোদের সময় ছ্যামায় বসি। কিরে রমুল্য, গাই পেলি?"

"পাব নাত কি? যা বলেছি তাই পিস্‌ ঠাক্‌রুণ! বাড়ি গিয়ে না দেখি—"

অমূল্যের কথায় আর মনোযোগ না করিয়া ঠাকুরাণী গ্রামের 'বিটের' পিয়ন যেন তাঁহাকে কি বলিবার জন্যই সেই কালিতলার পার্শ্বগামী সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথের মাঝে দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া সেই দিকে চাহিলেন। পিয়ন তাঁহার উদ্দেশ্যে হস্তের কাগজপত্র সহ উভয় হস্ত মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "পিসি ঠাকুরাণী, দেখুন তো এই চিঠিখানা কার? এই নামে একখানা কাগজ আর বুকপোষ্টও আছে। এ নাম—"

ঠাকুরাণী দেখিয়া বলিলেন, "ও আমাদের বড় বাড়ীর বৌয়ের। অল্প দিন এসেছে। কাগজ বইও তারই ভাইরা পাঠিয়েছে। খাম পোষ্ট কার্ড এনেছ ত হরিশ? গাঁয়ের

লোকেরা তোমার ভরসাতেই থাকে এটা মনে রেখো !"

"এনেছি বই কি মা ! অনেকেই আগের 'বিটে' ব'লে দিয়েছিল" বলিয়া আবার মাথা নোয়াইয়া হরিশ গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। ঠাকুরাণী ঈষৎ অন্যমনা ভাবে হস্তে বিল্বপত্রের স্তবক লইয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যে আশার বহু দিন সমাধি হইয়া গিয়াছে তাহারই স্মৃতিমাত্র কখনো কখনো মনে পড়িয়া মানুষকে এমনি যেন বিমনা করিয়া দেয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটাইয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিয়া মৃদু একটু নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে গ্রামের পথ ধরিলেন। দক্ষিণ দিকে রায়েদের প্রকাণ্ড অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা, বামদিকের পথ ধরিয়া তিনি আবার খানিকটা জঙ্গলের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল কেবল আস্‌সেওড়া ঘেঁটু কালকাসিন্দা প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুল্মের বৃহৎ পরিণতির ফল, যাহাতে তাঁহাকে প্রায় অদৃশ্যই হইয়া পড়িতে হইল। সেই বনের মধ্যে অনতি-উচ্চ শিব মন্দিরেরও সমস্তটাই প্রায় আবৃত, কেবল মাথার দিকের খানিকটা আর লৌহ ত্রিশূলটি মাত্র দেখা যাইতেছে।

পূজান্তে তিনি যখন আবার সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহাকে যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যারতা অপর্ণার মতই দেখাইতেছিল।

বেলা তখন অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়াছে। মুখে ঈষৎ ক্লান্তির চিহ্নে পূজায় প্রসন্নতার অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছিল। গ্রামের যদি কেহ সম্মুখে থাকিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় শিব ঠাকুরের নিত্য পূজারীকে সতর্ক করিয়া দিত যে, "কৃষ্ণ-প্রিয়া দিদি ঠাকুরুণ আজ তোমার উপর রাগ করেছেন, নিশ্চয় তুমি ঠাকুরের সেবার কিছু অন্যায় করে এসেছ।"

ক্লান্ত শ্লথ গতিতে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও কিসের একটা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। গন্ধ অতি মৃদু অথচ মনোহর, যেন জন্মান্তরের সুখস্মৃতির মত। বুঝিলেন রাধা বল্লভের অঙ্গনের বকুল এইবার ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার অজ্ঞাতেই যেন তাঁহার চরণ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এমনি ভাবেই তিনি চলিলেন।

মন্দির নয়, উচ্চ-চূড় গৃহ বলাই ঠিক। দেখিলে মনে হয় একদিন অতি যত্নের সহিতই ইহার নির্ম্মাণ ও পর্য্যবেক্ষণ সবই হইত। কিন্তু আজ সর্ব্বত্রই দুর্দ্দশা ! চারিদিকের থালি চূণ খসিয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উঠানের চারিপাশেও বেশ জঙ্গল, কেবল বকুল গাছটির তলাটি খানিকটা পরিষ্কার। গ্রামের কোন ভক্তিমান বা ভক্তিমতী আসিয়া মাঝে মাঝে বুঝি ঝাঁট দিয়া বা কচিৎ লেপিয়া দিয়া যায়। বৈশাখ মাসের শেষ সারা মাস অঙ্গনে সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন হয়, তাই অন্য সময়াপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিগ্রহ তখনো নিদ্রামগ্ন,—দ্বার রুদ্ধ। প্রদীপ জ্বালিবার সময়ই হয়ত গ্রামান্তর হইতে পূজারী আসিবে। ঈষৎ ভ্রূকুটি-আচ্ছন্ন মুখে দুই চারিটা বকুল ফুল সংগ্রহ করিবার জন্য ঠাকুরাণী বকুল বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন একব্যক্তি দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বৃক্ষের গাত্রে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আপন মনে ঈষৎ সুর সংযোগে কি যেন গাহিতেছে। কৃষ্ণ প্রিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন অতি মধুর সুরে সে গাহিতেছে—

মুখর মঞ্জীর নখ শিশির কিরণাবলি
বিমল মালাভি রণুপদ মুদিত কান্তিভিঃ
শ্রবণ নেত্র স্বদন পথ সুখদ নাথ হে,
মদন গোপাল নিজ সদন মনু রক্ষ মাং !

*   *   *

ধৃত নরাকার ভবসুখ বিবুধ সেবিত
দ্যুতি সুধাসার পুঞ্জ করুণ কমপি ক্ষিতৌ
প্রকটয়ন্ প্রেমভর মধিকৃত সনাতন,
মদন গোপাল নিজ সদন মনুরক্ষমাং।

কৃষ্ণপ্রিয়া তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন লোকটি একজন বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বেশোচিত তুলসীমালা, শিখা, কন্থা, কৌপীন সমস্তই তাহার অঙ্গে রহিয়াছে তথাপি সমুজ্জ্বল গৌর বর্ণে, উন্নত সুদীর্ঘ দেহে, সাধারণ বৈষ্ণব হইতে তাহাকে সম্পূর্ণই পৃথক দেখাইতেছিল। কৃষ্ণ-প্রিয়া একটু বিস্মিতার মত দাঁড়াইলেন,—কেন না এ গ্রামে এরূপ ব্যক্তির আগমন যেন সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত।

বৈষ্ণবটি স্তব সমাপনান্তে মন্দিরের দিকে একবার চাহিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, তারপরে ঠাকুরাণীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাঁহার দিকেও মস্তক নত করিয়া বলিলেন, "এইতো এ গ্রামের রাধা বল্লভের মন্দির ?"

"হ্যাঁ" বলিয়া কৃষ্ণ-প্রিয়াও সেই বৈষ্ণবের উদ্দেশে মস্তক ঈষৎ মাত্র অবনত করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি কি এ গ্রামে নূতন এসেছেন ? কোথায় অতিথি হ'য়েছেন ?"

বৈষ্ণব শেষ প্রশ্নটির মাত্র উত্তর দিয়া বলিলেন, "অতিথি হবার দরকার হয়নি, লক্ষ্মী জোলার গৌর নিতাই মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি। ঠাকুরের দুয়ার কখন্ খুলবে বলতে পারেন কি ?"

"কি জানি—যখন পূজারী আস্‌বে! রাতও হ'তে পারে।"

বৈষ্ণবটি যেন ব্যথিত ভাবে ঈষৎ স্বগতঃই বলিলেন, "সবই বিপর্য্যয় !"

কৃষ্ণ-প্রিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী জোলার ওদিকে তো কোন লোকালয় নেই। আপনিই কি বৃন্দাবন থেকে সেইখানে এসে কিছুদিন আছেন ? কিছু মনে করবেন না, ঐ দিকের একঘর এই গ্রামে মাস খানেক উঠে এসেছে,—তারাই একদিন বলেছিল যে, বৃন্দাবন থেকে একজন খুব মহাত্মা বৈষ্ণব এসেছেন—তিনি দিন রাত সেই বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন ; কোথায় যে ভিক্ষা করেন, কি খান্ কেউ বল্‌তে পারে না।"

বৈষ্ণবটি তাঁহার কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে উভয় হস্তে মস্তক স্পর্শ করিতেছিলেন। এইবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "জনশ্রুতি এই রকমেই বেড়ে চলে। তবে আমি শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকেই এসেছি বটে।"

"ক্ষমা করবেন! আপনাদের বৃন্দাবন ধাম থেকে এই বনের মধ্যে এই সব জনহীন শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন উন্নতিহীন, এক কথায় সকল বিষয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, গ্রামে তাদের ততোধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিগ্রহের দুয়ারে আপনার মত লোকের আসা আশ্চর্য্যের চেয়েও আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়।"

"হ্যাঁরে কৃষ্ণ-প্রিয়া! বলি আজকে কি তোর পুজো ফুরুবেই না ?—শিবের কোঠার দিকে গিয়ে দেখি সেখানেও নেই। আজ কি—" একটি অশীতিপর বৃদ্ধাকে যষ্টি হস্তে সেই দিকে বকিতে বকিতে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ-প্রিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে ফিরিলেন। বৈষ্ণবটিও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয় হস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই অঞ্চলে আমার 'গুরু পাট'। সেই জন্যই আমি এখানে এসেছি।" (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
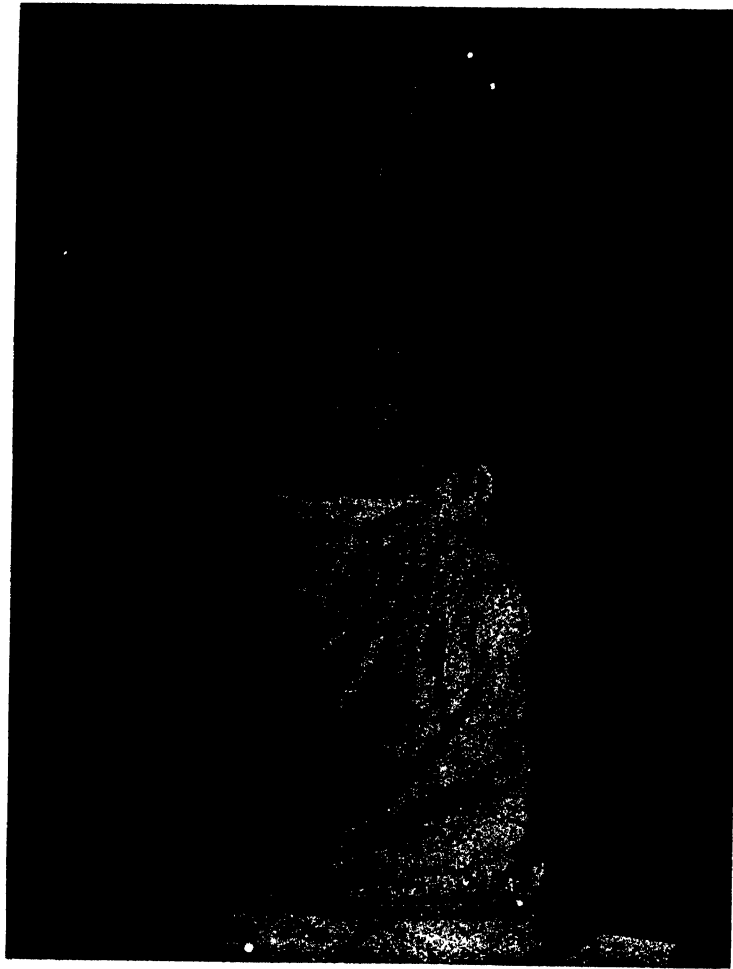
ভিনস্ অফ্ মিলো

অজ্ঞাত ভাস্কর

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়
কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত

মোনা লিসা
Leonardo da Vinci
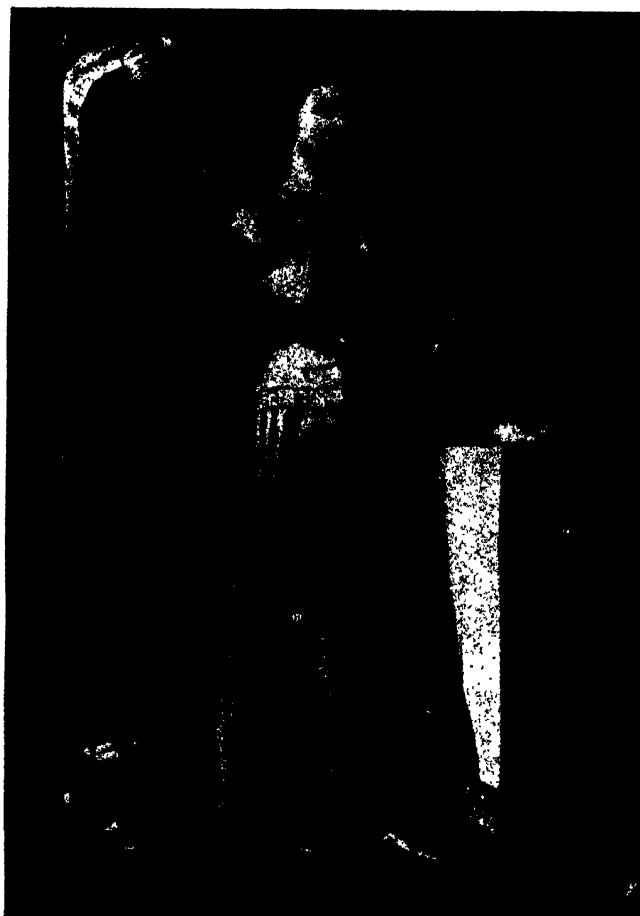
জোয়ান্ অফ্ আর্ক্

J. A. Ingres
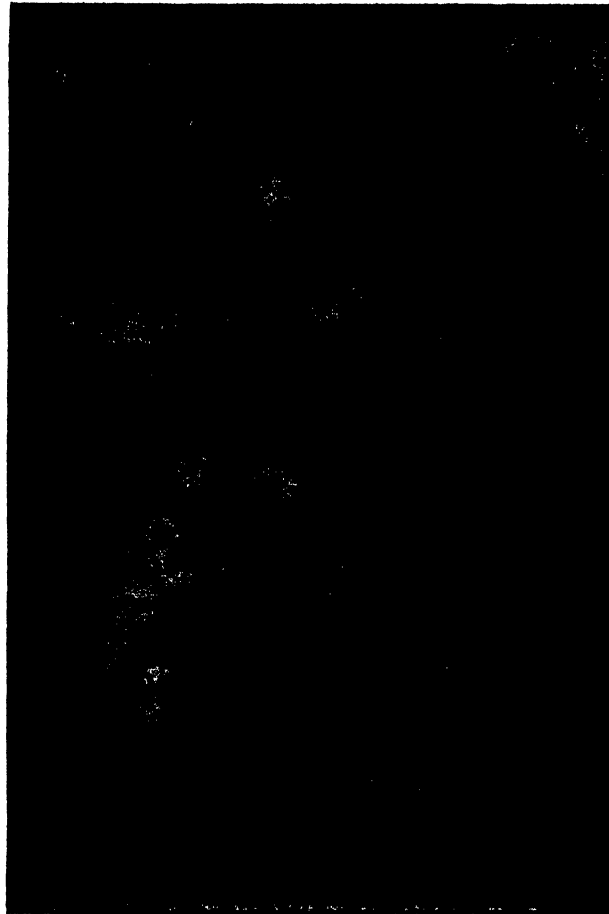
মেরী, সেণ্টজন ও ক্রাইষ্ট
Sanzio Raphael
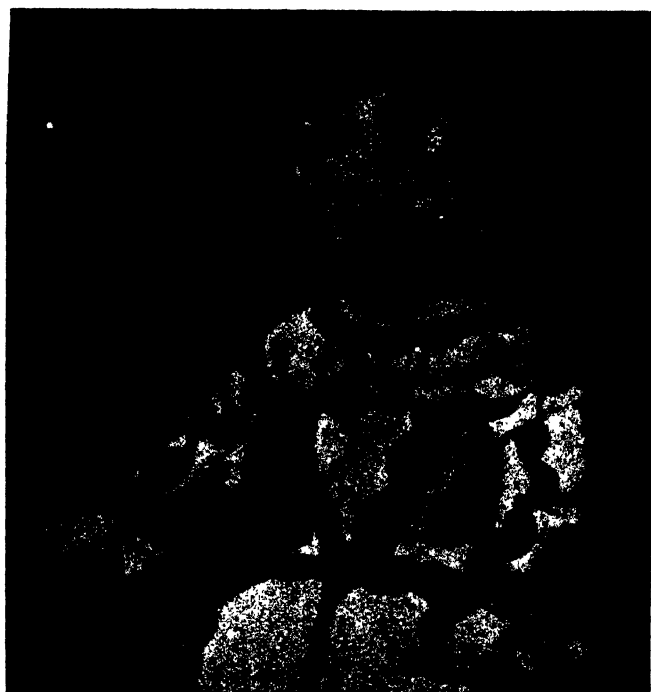
মার্গারেট্
Diego Velasquez

সংগ্রাম
J. L. David.

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ ; বি, এল ; পি, আর, এস ;

কিছুকাল পূর্ব্বে "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সম্রাট অশোকের প্রস্তরস্তম্ভগুলির পরিচয় দিয়াছিলাম। এবারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার গিরিলিপিগুলির কথা বলিব। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ উক্ত সম্রাটের আদেশলিপি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ষোলটি স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যতে আরও যে হইতে পারে না, সে কথা কেহই বলিতে পারে না। কারণ, মাত্র কয়েকমাস হইল মান্দ্রাজ প্রদেশের কুর্ণুল জেলায় একটি গিরিলিপির আবিষ্কার-সংবাদ সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের লেখার মধ্যে একটি প্রাচীন শিলালিপির উল্লেখ আমি পাইয়াছি। উহা বর্ত্তমান আফগানিস্থানের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। চীন পরিব্রাজক উহা ভগবান্ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তাহা যে সম্ভব নহে ঐতিহাসিক পাঠকের নিকট সে কথা অজানা নাই। আমার বিশ্বাস এটিও আসলে অশোকের ক্ষোদিত অন্যতম শিলালিপি, এবং ভবিষ্যতে উপযুক্তরূপ অনুসন্ধানের ফলে উহা হয়ত লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইতেও পারে। যাহা হউক, যথাস্থানে সে কথার উল্লেখ করা যাইবে।

অশোকের শিলালিপিগুলি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। মূল বা প্রধান অনুশাসনের সংখ্যা চতুর্দ্দশটি; এগুলি চতুর্দ্দশ গিরিলিপি (Fourteen Rock Edicts) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপ্রধান গিরি-লিপির (Minor Rock Edicts) সংখ্যা দুইটি। এতদ্ব্যতীত "ভাবরা অনুশাসন" নামে আর একটি অনুশাসন আছে।

অশোকের প্রস্তরস্তম্ভগুলি মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অভ্যন্তর দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের অবস্থান এত দূর-ব্যাপী নহে। কিন্তু গিরিলিপি সমূহের অবস্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এগুলি অশোকের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেজন্য ভারতের সর্ব্বোত্তর প্রান্ত হইতে সর্ব্ব দক্ষিণ অঞ্চলে, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের তটভূমি হইতে পশ্চিমে আরব সাগরের লবণাম্বুরাশিধৌত বেলাভূমি পর্য্যন্ত ইহাদের অবস্থিতি।

মূল চতুর্দ্দশ গিরিলিপি নিম্নলিখিত স্থানসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে সাহবাজগড়ী ও মানসেরা, উত্তরে হিমালয়ের পার্ব্বত্যঅঞ্চল মধ্যে ডেরাডুন জেলার কালসী, পূর্ব্বে উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের অদূরে ধৌলি এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায় জৌগড়, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় প্রদেশের অন্তর্গত গির্ণার, এবং বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভূত ঠানা জেলায় সোপারা এবং দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রদেশের কর্ণুল জেলায়। অপ্রধান গিরিলিপি নিম্নলিখিত স্থানসমূহে পাওয়া গিয়াছে,—রাজপুতানায় বৈরাট বা ভাবরা, মধ্যপ্রদেশে রূপনাথ, বেহারে সাসারাম, মহিসুর রাজ্যে ব্রহ্মগিরি, সিদ্দপুর এবং জটিঙ্গা, রামেশ্বর ও নিজাম রাজ্যে মস্কি। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আফগান রাজ্যে জেলালাবাদের অদূরে গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপির সন্ধান বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেওয়া যাইবে। এই সতেরটি গিরিলিপির মধ্যে শেষেরটি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অবশিষ্ট ষোলটির মধ্যে কয়েকটি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে।

সাহবাজগড়ী:—পেশোয়ারের ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ও আটকের ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের ইউসুফজাই জেলার সুদাম উপত্যকায় সাহবাজগড়ী নামে একটি প্রকাণ্ড গ্রাম আছে। গ্রামটি ঠিক পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে পাহাড়ের উপর প্রায় ৮০ ফুট উচ্চে প্রকাণ্ড একখণ্ড প্রস্তরের গাত্রে অশোকের অনুশাসনগুলি ক্ষোদিত। প্রস্তরখণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট, উচ্চতায় ১০ ফুট এবং বিস্তারেও প্রায় ১০ ফুট

হইবে। লেখাগুলি দুই অংশে প্রস্তরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম গাত্রে উৎকীর্ণ। প্রস্তরখণ্ডটির পূর্ব্বগাত্র সুন্দররূপ মসৃণ না হইলেও সমতল বটে, প্রস্তরটি স্বভাবতঃই ঐভাবে ভাঙ্গিয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমগাত্র নিতান্তই কর্কশ। দ্বাদশ সংখ্যক অনুশাসন প্রথমে এখানে দেখা যায় নাই, এ কারণ সকলে মনে করিতেন উক্ত অনুশাসন কোন কারণে এখানে প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল সার হেনরী ডীন সাহবাজগড়ীর অনুশাসনযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে স্বতন্ত্র এক শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ উক্ত অনুশাসন আবিষ্কার করেন।

সাহবাজগড়ীর অনুশাসন সর্ব্বপ্রথম পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের ফরাসী সেনাপতি জেনারেল কুর কর্তৃক সাধারণে পরিচিত হয়। তিনি ইহা কপুরদাগড়ীর সন্নিকটে অবস্থিত এবং কালের প্রভাবে প্রায় অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া লিখিয়াছিলেন (J. A. S. B., Vol. V, p. 418)। কিন্তু যে স্থানে এই লেখাটি অবস্থিত সেখান হইতে কপুরদাগড়ীর দূরত্ব প্রায় দুই মাইল, পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রাম সাহবাজগড়ী মাত্র আধ মাইল দূরে। তাই প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের নামেই নামকরণ করেন। প্রথম প্রথম কপূরদাগড়ী অনুশাসন নামে উল্লিখিত হইলেও বর্ত্তমানে ইহা কানিংহাম প্রদত্ত নামেই সাধারণে পরিচিত।

জেনারেল কুর লিখিত পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির বিবরণ পাঠে ঐতিহাসিক মিঃ মেসনের আগ্রহ ও কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। তখন সবেমাত্র এ দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে প্রিন্সেপ প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক রহস্য-সমাধানের পথ দেখাইয়াছেন; সিংহলে টার্ণার সাহেব মহাবংশ অনুবাদ করিয়া অশোক নৃপতির বিস্মৃত নাম সকলকে পুনরায় শুনাইয়াছেন। অনুশাসনোক্ত "প্রিয়দর্শী" এবং মহাবংশের অশোক যে অভিন্নব্যক্তি তাহাও প্রিন্সেপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ অবস্থায় নূতন শিলা-লিপির আবিষ্কারের সংবাদে ঐতিহাসিক মহলে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মেসন স্বয়ং ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে (J. A. S. B., Vol. VIII. p. 296) ইহা প্রাচীন আর্য্য পালি (তখন খরোষ্ঠি অক্ষর ঐ নামে পণ্ডিতমহলে পরিচিত ছিল) অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের গিরিলিপি সমূহের অপর এক সংস্করণমাত্র বলিয়া বুঝা গেল।

সাহবাজগড়ী নামটি আধুনিক যুগের। সাহবাজ কলন্দর নামক জনৈক ফকিরের কবর এইস্থানে ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইতেই গ্রামটির নাম সাহবাজগড়ী হইয়াছে। ঐ সাধু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এ স্থানের কি নাম ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। অশোকের অনুশাসনের অবস্থান হইতেই বুঝা যায় যে, তৎকালে এখানে অবশ্যই বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ কোন এক জনপদ ছিল, কারণ যাহাতে জনসাধারণে তাঁহার আদেশ-বাণী দেখিতে পায় এইরূপ স্থানেই অশোক তাঁহার অনুশাসনসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতেন; নির্জ্জন বা বিরলবসতি স্থানে স্থাপনা করিলে ঐগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার যে কোনই সম্ভাবনা থাকিত না তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সাহবাজগড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে পূর্ব্বে এই স্থানে যে বিশাল এক নগরীর অবস্থান ছিল, তাহার বহুনিদর্শন আজিও দেখা যায়। গ্রামবাসিদের মধ্যে আজিও একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বহু প্রাচীনকালে তাহাদের গ্রামই এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। গ্রামের অদূরে অবস্থিত কয়েকটি ধ্বংশস্তূপ সেই পুরাতন নগরের উত্তর ও পূর্ব্বদ্বার ছিল বলিয়া একটি প্রবাদ গ্রামবাসীদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল স্থানেই এখনও রাশি রাশি ভগ্ন ইষ্টক ও চিত্রিত প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ দেখা যায়। সাহবাজ-গড়ীতে প্রাপ্ত অশোক অনুশাসন, চারিদিকে অবস্থিত ধ্বংসরাজি এবং জনপ্রবাদ—এই সকল হইতে সুস্পষ্টই জানা যায় যে, প্রাচীনযুগে এই স্থানে এক সমৃদ্ধ নগর অবস্থিত ছিল। কানিংহাম ঐ নগরকে "বেস্সান্তর জাতকের" লীলাভূমি রাজকুমার সুদত্ত বা সুদানের নগরের সহিত

অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। হিউয়েনসঙ্গ ও সুঙ্গইউন উভয়েই সুদত্তের নগরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম পরিব্রাজক "পো-লু-ষা" এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি "ফো-সা-ফু" নামে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বলা ভাল যে চীনা ভাষায় "ফু" কথাটির অর্থ "নগর"।

রাজপুত্র সুদত্ত বা সুদান বা বেসসান্তরের কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপরিচিত কাহিনী। নানাগ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। সাঁচি ও অমরাবতীর ভাস্কর্য্যেও সে কাহিনী স্থান পাইয়াছে। রাজকুমার সুদত্ত তাঁহার পিতার রাজ-হস্তীটি জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, এ কারণ তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। তিনি নগর হইতে বহির্গমন করিয়া দণ্ডলোক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইস্থানে অবস্থান কালে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট তদীয় পুত্র-কন্যাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে রাজকুমার তাঁহাদিগকে উক্ত ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ বালক বালিকাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে তাহারা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হইলে উক্ত ব্রাহ্মণ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া রক্তপাত করে। এ দৃশ্য দেখিয়াও রাজকুমার অচঞ্চল থাকেন। বলা বাহুল্য বৌদ্ধ কাহিনী মতে এই সুদত্তই পরবর্ত্তী কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হিউয়েনসঙ্গ উক্ত দণ্ডলোক পর্ব্বতে সুদানের আবাসস্থল দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন তখন পর্য্যন্তও উক্ত স্থানের লতা-গুল্ম বৃক্ষ মৃত্তিকাদি সকলই লোহিতবর্ণের।

সাহবাজগড়ী হিউয়েনসঙ্গ বর্ণিত "পো-লু-ষা" হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীনযুগে এতদঞ্চলের অন্যতম প্রধান নগর ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ডাঃ ভাণ্ডার-করের মতে এই পো-লু-ষা বা সাহবাজগড়ীই অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন জনপদের প্রধান নগর ছিল (Asoka pp. 30-1, 36)।

সাহবাজগড়ীর অনুশাসন যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন ঐতিহাসিক মহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কালসীর অনুশাসন তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রয়োদশ সংখ্যক লিপি সম্বন্ধে গির্ণারের পাঠই তখন একমাত্র ভরসা ছিল। গির্ণারের এই সংখ্যক অনুশাসনটির নানাস্থান, বিশেষ করিয়া যে অংশে গ্রীক রাজগণের এবং অশোকের সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ এবং জাতি সমূহের নাম আছে সেই অংশ, নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সে জন্য সাহবাজগড়ী লিপি হইতেই উক্ত অংশের মর্ম্মোদ্‌ঘটন সম্ভবপর হইয়াছে। তা ছাড়া সাহবাজগড়ীর অনুশাসন অশোকের অন্যান্য লিপির ন্যায় ব্রাহ্মী অক্ষরের পরিবর্ত্তে খরোষ্ঠি অক্ষরে লিখিত। এ অক্ষর দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লিখিত—ব্রাহ্মীর ন্যায় বাম হইতে দক্ষিণে নহে। ব্রাহ্মী "প", "হ" এবং "স" অনেকটা এক ধরণের দেখিতে, বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন শিলা-লিপির পাঠোদ্ধারে এ কারণ কত ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু খরোষ্ঠি বর্ণমালার এ তিন অক্ষর একেবারেই বিভিন্ন। তা ছাড়া সাহবাজগড়ী লিপিতে "শ", "ষ" এবং "স"এর প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিসমূহের মধ্যে মাত্র কালসীতেই "শ"এর ব্যবহার আছে,—তাহার ও আকার আবার অনেকটা খরোষ্ঠীর "শ"এর মত, পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মী বর্ণমালার "শ"এর মত নহে। অশোকের অন্যান্য অনুশাসনে সর্ব্বত্রই এক দন্ত "স"এর প্রয়োগ দেখা যায়। মূর্দ্ধন্য "ষ"এর ব্যবহার কোথাও নাই। এইরূপে অশোক অনুশাসন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহস্থল অক্ষরতত্ত্বের দ্বারাও সাহবাজগড়ী লিপি হইতে দূরীভূত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতেও সাহবাজগড়ীর লিপির মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। সাহবাজগড়ী অনুশাসনের ভাষা অন্যান্য স্থানের অশোকলেখের প্রাকৃত ভাষার অপেক্ষা অনেকটাই সংস্কৃত ঘেঁষা।

ঐরাণ বা পারস্যের সান্নিধ্যহেতু প্রাচীন পারসীক ভাষার প্রভাবও এই অনুশাসনের ভাষার দুই এক স্থলে দৃষ্ট হয়।

(১) পঞ্চম অনুশাসনে "রাষ্ট্রিক" স্থলে "রস্তিক"। ট-বর্গ স্থলে ত-বর্গের ব্যবহার, যথা সংস্কৃত 'বসিষ্ঠ' স্থলে প্রাচীন পারসীক বা আবেস্তিয় 'বহিশ্‌ত্', উষ্ট্র ও উশ্‌ত্র, মহিষ্ঠ ও মজিশ্‌ত্।

(২) 'স্বসৃণাং' স্থলে 'স্পসুনং'; (অন্যান্য লিপিতে ভগিনী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়)। যথা,—সংস্কৃত অশ্ব ও

অশ্‌প, শ্বেত ও শপএত (ফারসী সফেদ স্মর্ত্তব্য), বিশ্ব ও বিশ্‌প।

(৩) অন্যান্য অনুশাসনে প্রযুক্ত "দিপিস্ত" স্থলে "নিপিস্ত"।

এইরূপ নানাকারণে সাহবাজগড়ীর অনুশাসন ঐতিহাসিকের নিকট সাতিশয় মূল্যবান।

এইবারে খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত অশোকের দ্বিতীয় অনুশাসনটির কথা বলা যাইতেছে।

মানসেরা:—উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত হাজারা জেলায় অ্যাবটাবাদের পনের মাইল উত্তরে মানসেরা নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। এইখানে প্রস্তরগাত্রে খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপির প্রথম দ্বাদশটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনে হয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশলিপিও স্বতন্ত্র কোন প্রস্তরখণ্ড বা গণ্ডশৈল গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়া সন্নিকটেই অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে হয় ত সাহবাজগড়ীর দ্বাদশ সংখ্যক অনুশাসনের মতই লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইলেও হইতে পারে। সাহবাজগড়ীর লিপির তুলনায় মানসেরায় আবিষ্কৃত লিপির পাঠ অনেকটাই অসম্পূর্ণ,—অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই অঞ্চল একেবারে জনসমাগমশূন্য, কিন্তু পূর্ব্বে যে এরূপ ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। Sir Aurel Stein এর মতে ব্রেরী বা বট্টারিকা (দেবী বা দুর্গা) তীর্থে যাইবার জন্য এই স্থান দিয়া প্রাচীনকালে একটি রাজপথ ছিল। তীর্থযাত্রিগণ যাহাতে দেখিতে পায় এতদুদ্দেশ্যে পথিপার্শ্বে অবস্থিত এই গণ্ডশৈলগাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।* মানসেরায় প্রস্তর খণ্ডটির একপৃষ্ঠে প্রথম হইতে একাদশ অবধি এবং অপর পৃষ্ঠে মাত্র দ্বাদশ অনুশাসনটি ক্ষোদিত। সাহবাজগড়ীতেও শেষোক্ত অনুশাসন স্বতন্ত্র এক প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় অশোকের সাম্রাজ্যের এতদঞ্চলে উক্ত দ্বাদশ সংখ্যক লেখ-কেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। এই লিপিতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের

* Epigraphia Indica, Vol. II. p. 447; I. A., XIX. p. 43.

পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং সমদর্শিতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে এই জনপদ "উরশা" নামে পরিচিত ছিল। পাণিনির গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে এই দেশ 'উরগ' নামে অভিহিত হইয়াছে। অর্জ্জুন অভিসার দেশে গমন করিলে নিকটবর্ত্তী উরগ দেশের রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অভিসার দেশের কতকাংশ বর্ত্তমান কাশ্মীর ও কতকাংশ হাজারা জেলায় অবস্থিত ছিল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঝেলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলই প্রাচীন অভিসার দেশ। বিভিন্ন পুরাণেও এই জনপদের উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ ভূবেত্তা টলেমি 'অর্শ' বা 'বর্শ' নামে এই দেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (Geography VII. 1.45)। হিউয়েনসঙ্গের সময়ে উ-ল-সি রাজ্যের পরিধি ছিল ২০০০লি বা ২৮৬ মাইল এবং ঐ রাজ্য তখন কাশ্মীর দেশের অধীন ছিল। রাজধানীর পরিধি ছিল প্রায় এক মাইল (Beal's Records, I. p. 147)। প্রাচীন 'উরশা' নাম এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই জনপদের বর্ত্তমান নাম "রশ"। মানসেরা ব্যতীত ইহার আর দুইটি প্রধান নগরের নাম নৌসেরা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বা হরিপুর। ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে এই অঞ্চলই প্রাচীন কম্বোজ জনপদ। অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যোন জনপদ যে তাঁহার মতে সাহবাজ-গড়ী অঞ্চল তাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। অশোকের অনুশাসনে যে ভাবে যোন-কম্বোজ-গান্ধার জনপদের একত্রে উল্লেখ দেখা যায়, মহাভারত পুরাণাদিতে সেইরূপ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে ঐ সকল স্থান পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ ছিল এবং অনুশাসন সমূহে নামগুলি শৃঙ্খলার সহিতই প্রদত্ত হইয়াছে। ডাঃ ভাণ্ডারকর মানসেরা অঞ্চলে কম্বোজ জনপদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার প্রধাননগর এই মানসেরারই অদূরে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন।*

কালসী:—দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কালসী তহসিলের মধ্যে কালসী নামে একটি বেশ বড় গ্রাম আছে। গ্রামটির

* Dr. D. R. Bhandarkar—Asoka, p. 31.

নাম কেহ কলসী কেহ বা কালসী, কেহ কেহ বা আবার খালসী বলিয়া থাকেন। গ্রামের দেড় মাইল দক্ষিণে, যমুনা এবং টন (তমসা) নদীর সঙ্গমের অদূরে যমুনার পশ্চিমতটে প্রকাণ্ড একখণ্ড quartz প্রস্তর গাত্রে অশোকের অনুশাসনটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থান মুশুরীর ১৫ মাইল পশ্চিমে চক্রতা হইতে সাহারাণপুর যাইবার পথে অবস্থিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যখন ফরেষ্ট সাহেব উক্ত প্রস্তরখণ্ডটি আবিষ্কার করেন তখন বহু শতাব্দী ধরিয়া সঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ শৈবালের স্তরে অক্ষরগুলি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। পরে ময়লা পরিষ্কার করিবার পর মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায়ই শ্বেতবর্ণ প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ অক্ষর বাহির হইল। উক্ত প্রস্তরখণ্ড ১০ফুট দীর্ঘ এবং ১০ফুট উচ্চ, তলদেশের বিস্তার ৮ফুট হইবে। প্রস্তরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব গাত্র কতকটা সমতল করা হইয়াছিল, তবে তাহা তেমন ভাল করিয়া মসৃণ করা হয় নাই। এই অংশে অশোকের অনুশাসন প্রধানতঃ ক্ষোদিত। পাথরের ফাটা ও গর্ত্তসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে জন্য হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি বা লেখাটির অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাথরের গায়ের দাগের জন্য এবং এই কারণে পংক্তিগুলি সমান্তরাল নহে. বড়ই আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু হইয়াছে। শেষের দিকের অক্ষরগুলি প্রথমাংশের অক্ষরের অপেক্ষা ক্রমেই আকারে বড় হইতে হইতে সর্ব্বশেষে আকারে প্রায় তিনগুণ বড় দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই হউক বা পরে লিখিত বলিয়াই হউক, ত্রয়োদশ অনুশাসনের অবশিষ্টাংশ ও চতুর্দ্দশ অনুশাসনের আর এ দিকে স্থান-সঙ্কুলান হয় নাই। ঐ অংশ প্রস্তরের বামদিকে বা পশ্চিম গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পাথরটির ডানদিকে বা পূর্ব্বগাত্রে একটি হস্তীচিত্র রেখায় অঙ্কিত আছে এবং চিত্রের নিম্নে "গজতমে" এই কথাটি ক্ষোদিত দেখা যায়। 'গজতমে' কথাটির অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গজ, এবং উহা ভগবান বুদ্ধদেবের নামান্তররূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। হস্তী বৌদ্ধগণের নিকট পবিত্র বস্তু এবং ভগবান তথাগতের স্মারকচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। গির্ণারের শিলালিপিতেও শ্বেত হস্তীর প্রশংসাদ্যোতক বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। ধৌলিতেও অশোক অনুশাসনের সহিত হস্তী-মূর্ত্তির সমাবেশ দেখা যায়। অশোকের প্রস্তর স্তম্ভের চূড়াতেও গজমূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন সর্ব্বজনপরিচিত কাহিনী। বুদ্ধজন্মের পূর্ব্বে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন যেন একটি শ্বেতহস্তী তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই হইতেই শ্বেত হস্তী বুদ্ধদেবের স্মারকচিহ্ন।

কালসীর শিলালেখের সন্নিকটে নানরূপ কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ডসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখা যায়। সেগুলি দেখিলেই কোন প্রাচীন বিহার বা সঙ্ঘারামের বা অপর কোনপ্রকার অট্টালিকার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, এই স্থানের অদূরেই যে প্রাচীন শ্রুঘ্ন নগরী অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কালসীর অনুশাসনে কয়েকটি ভাষাগত ও অক্ষরগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। লেখাটির ভাষা মাগধী প্রাকৃত, তাই "র"এর স্থলে "ল" অক্ষরের প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্ব্বেই সাহবাজগড়ী প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের শিলালেখসমূহের মধ্যে শুধু কালসীতেই তালব্য "শ" অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়। 'পংসণ্ড' এই কথাটি কখনও তালব্য 'শ' আবার কখনও বা দন্ত্য 'স' দ্বারা বানান করা হইয়াছে, অথচ পাষণ্ড কথাটির বানান হইতেছে মূর্দ্ধন্য "ষ" দ্বারা; তাই মনে হয় ব্রাহ্মী বর্ণমালায় অশোকের কালে ঐ অক্ষরের ব্যবহার ছিল না। এতদ্ভিন্ন "থ" এবং "স" এই দুই অক্ষরেও অপরাপর স্থানে আবিষ্কৃত অনুসাশনের ঐ দুই অক্ষরের সহিত কতকটা আকারগত পার্থক্য দেখা যায়। ঐ ধরণের 'থ' এবং 'স' পরবর্ত্তী যুগের লেখায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত M. Senart তাঁহার বিখ্যাত Les Inscriptions des Piyadasi নামক গ্রন্থে কালসীর পাঠই গ্রহণ করিয়াছিলেন। গির্ণারের ত্রয়োদশ সংখ্যক অনুশাসন পর্ব্বতগাত্র চূর্ণ হওয়ার ফলে অসম্পূর্ণ এবং ধৌলি ও জৌগড়ে ঐ অনুশাসন নাই। মানসে-রার লিপি তখনও অনাবিষ্কৃত এবং সাহবাজগড়ীর পাঠ দুর্ব্বোধ্য ছিল। সে জন্য তিনি কালসীর লেখাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। Dr. Burgess ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লেখাটির

আর একটি নূতন ছাপ লইয়াছিলেন। তাহা Epigraphia Indica গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে Dr. Buhler সম্পাদিত অশোক-অনুশাসন প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৮২)। সম্প্রতি Dr. Hulzsch অশোকের অনুশাসনগুলির আর এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯২৬)। সে জন্য আবার নূতন করিয়া লেখাগুলির ছাপ ও প্রতিলিপি গৃহীত হইয়াছে।

ধৌলি:—বিখ্যাত ভুবনেশ্বর তীর্থের ছয় মাইল দক্ষিণে, পুরী জেলার খুরদা বিভাগে ধৌলি নামে একটি গ্রাম আছে। কটক হইতে ইহা ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, পুরী হইতে দূরত্বও প্রায় ঐ রূপ। গ্রামের সন্নিকটে দয়া নদীর অদূরে যে গণ্ডশৈল আছে তাহার নামও ধৌলি। উড়িষ্যার অধিকাংশ স্থান একই শৈলশৃঙ্খলে বেষ্টিত, স্থানে স্থানে তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে বিভিন্ন স্থানে একই শৈলশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে; যথা,—মুণ্ডক, মহাবিনায়ক, কাপিলাশ, নীলগিরি, রত্নগিরি, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, ললিতাগিরি ও ধবলগিরি। এই ধবলগিরিরই আধুনিক নাম ধৌলি। ধৌলি পাহাড়ের সর্ব্বদক্ষিণ শৃঙ্গের উত্তরপার্শ্বে চূড়াদেশের নিকটে অশ্বত্থামা বা অশ্বষ্টম নামে অভিহিত বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডগাত্রে অশোকের অনুশাসনগুলি ক্ষোদিত দেখা যায়। ভুবনেশ্বর যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই শিলালিপিটি দেখিয়া থাকিবেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মেজর মার্কহাম কীটো কর্ত্তৃক এই শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মেজর কীটো একজন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব উদ্ধারে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না। এ বিষয়ে অগ্রনায়কদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। কীটো সারনাথে কিছু কিছু খননকার্য্য করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁহার লিখিত অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দেখা যাইবে। বারাণসীর কুইন্স কলেজের সুন্দর সৌধভবনটি কীটোরই তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত। কীটো তখন তাঁহার রেজিমেণ্টের সহিত উত্তরভারত হইতে মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কলিকাতায় তিনি প্রিন্সেপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রিন্সেপ তাঁহাকে খণ্ডগিরির পালিভাষায় উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির নকল লইবার জন্য অনুরোধ করেন। এতদুদ্দেশ্যে কীটো এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন এবং তাহার ফলে ধৌলির শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়। কীটো খণ্ডগিরির খারবেলের অনুশাসনেরও এক প্রতিলিপি লইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা মূল্যবান বিবেচিত হইত। বর্ত্তমানে সে পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঠিক এই সময়েই প্রিন্সেপ গির্ণারলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার মন তখন আশায় আনন্দে পূর্ণ। ধৈর্য্য আর বাঁধ মানিতেছে না। নূতন এক অশোক-অনুশাসন আবিষ্কারের সংবাদপ্রাপ্তির জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। এমন সময়ে তিনি কীটোর নিকট হইতে নবাবিষ্কৃত লেখার প্রতিলিপি পাইলেন। পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া তিনি সাশ্চর্য্যে দেখিলেন যে, ভাষা ও বর্ণমালাগত সামান্য সামান্য পার্থক্য ভিন্ন নবাবিষ্কৃত লিপি গির্ণারলিপির অবিকল প্রতিলিপি মাত্র। *

কীটো লিখিত ধৌলির বিবরণের সহিত (J. A. S B. Vol VII, 1837, pp. 435-37) বর্ত্তমানে ঐ স্থানের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে সামান্য এই এক শতাব্দী কালের মধ্যেই কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাহা হউক কীটোর লেখা হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ধৌলি গ্রামের সন্নিকটে দয়া নদীর দক্ষিণে এবং কোশল গঙ্গার উত্তর-পশ্চিমে তিনটি গণ্ডশৈল সমতল ভূমি হইতে উঠিয়াছে। উহারা প্রায় ৮ মাইল পরিমাণ জায়গা জুড়িয়া অবস্থিত। নিকটে ৮।১০ মাইলের মধ্যে অপর কোন পাহাড় নাই। উত্তরের পাহাড়টিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ—প্রায় ২৫০ ফুট হইবে। তাহার উপরে একটি শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

* The Dhauli inscription was in substance a duplicate of the Girnar edicts, although the language and alphabet of the two versions had very notable and characteristic differences —J. A. S. B., Vol, VII, (1837), p. 158.

সর্ব্ব দক্ষিণের পাহাড়ের চূড়ার উত্তরাংশে সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর আছে। তাহার নাম অশ্বষ্টম। পাথরটার ১৫´×১০ ফুট পরিমিত স্থান কাটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে। তাহার উপরে চারি স্তবকে গভীর ভাবে লেখাগুলি উৎকীর্ণ। প্রথম স্তবকের অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাদৃশ পরিষ্কার নহে। তাই মনে হয় এগুলি পরবর্ত্তী যুগের রচনা। চতুর্থ স্তবকের চারিপাশে বেড়িয়া একটি রেখা সুন্দর ও গভীরভাবে উৎকীর্ণ এবং ইহার অক্ষরগুলি অতীব পরিপাটি।

লেখাগুলির ঠিক উপরেই একটি চত্বর আছে, তাহা ১৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট বিস্তৃত হইবে। চত্বরের দক্ষিণদিকে একটি হস্তীর সম্মুখার্দ্ধ প্রস্তরগাত্র হইতে নিপুণভাবে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে; উহা ৪ ফুট দীর্ঘ হইবে। চত্বরের চারিদিকে ৪ ইঞ্চি বিস্তৃত ও ২ ইঞ্চি গভীর একটি নালা কাটা আছে। হস্তীমূর্ত্তির চারিপার্শ্বে ঐরূপ নালা আছে, কেবল সম্মুখে তিন ফুট পরিমিত স্থানে তাহা নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, কাষ্ঠনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ বসাইবার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ ঐ গর্ত্ত করা হইয়া থাকিবে। পাহাড়ের সন্নিকটে ও মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকা প্রদেশে অনেক গুহা ও মন্দিরাদির নিদর্শন দেখা যায়।”

অশোকের অনুশাসনগুলি তিনটি সমান্তরাল শ্রেণীতে উৎকীর্ণ। মধ্যম শ্রেণীর সমস্তটাই ও ডান দিকের শ্রেণীর প্রথমার্দ্ধ ব্যাপিয়া প্রথম হইতে দশম সংখ্যক এবং চতুর্দ্দশ সংখ্যক গিরিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়। ডানদিকের শ্রেণীর অবশিষ্ট অংশে একটি এবং বামের শ্রেণীতে অপর একটি—এই দুইটি সম্পূর্ণ নূতন অনুশাসন ধৌলিতে দেখা যায়। এই দুইটি অনুশাসন জৌগড়েও আছে। ধৌলি এবং জৌগড়ে একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপি উৎকীর্ণ হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ঐ দুইটি নূতন অনুশাসন দেখা যায়। কলিঙ্গ প্রদেশের রাজধানী তোসালি নগরীর মহামাত্র ও কুমার প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণকে উদ্দেশ করিয়া ধৌলির লিপি প্রচারিত হইয়াছিল, এবং সোমাপা নগরীর কর্ম্মচারিগণের উদ্দেশে অপর কলিঙ্গ অনুশাসনটি—জৌগড় লিপি—প্রচারিত হইয়াছিল। এই দুইটি অনুশাসন কলিঙ্গ অনুশাসন, অতিরিক্ত অনুশাসন বা প্রাদেশিক অনুশাসন নামে ঐতিহাসিক মহলে পরিচিত।

অশোক যে তোসলির রাজকর্ম্মচারিগণকে উদ্দেশ করিয়া অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, সেই তোসলি ছিল তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কলিঙ্গ বা পূর্ব্ববিভাগের প্রধান নগর। তোসলি দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্ব্বভারতের অন্যতম প্রধান নগর ছিল। পেরিপ্লাসে (আনুমানিক ৮০ খৃষ্টাব্দ) এবং টলেমির ভূগোলেও (প্রায় ১৪০ খৃষ্টাব্দ) ইহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থে এতদঞ্চলে “দেসরেণ রেজিও” নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে ঐ অঞ্চলে দোসরোণ নদীর উপরে অবস্থিত দোসর নামে একটি নগরের উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য এই দুই গ্রীক নাম মূলতঃ একই এবং যে ভারতীয় নামের ইহারা অপভ্রংশ তাহা তোসলি বলিয়াই স্থির হইয়াছে। তোসলির অবস্থান এখনও অবিসংবাদিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ মনে করেন বর্ত্তমান ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রই তোসলির নিদর্শন এবং ধৌলি, উদয়গিরি প্রভৃতি স্থান-সমূহ সুবৃহৎ নগরের উপকণ্ঠ মাত্র ছিল। আবার কাহারও মতে ধৌলিই তোসলি। সে যাহা হউক, তবে ধৌলির অদূরেই এতদঞ্চলে কোন স্থানেই যে তোসলি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ধৌলির সন্নিকটবর্ত্তী ধ্বংসনিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝা যায় যে এককালে এস্থানে বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ কোন নগরাদি অবস্থিত ছিল।

জৌগড়া:—মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলার পুবেখণ্ডা তালুকে ঋষিকুল্যা নদীতটে নৌগাম নামে একটি গ্রাম আছে। উক্ত স্থানে নদীতটে একটি বহু প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গায়ে অশোকের লেখাগুলি ক্ষোদিত। ঐ দুর্গেরই নাম জৌগড় বা লাক্ষাগড়। গঞ্জাম সহর হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব পশ্চিম উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৮ মাইল এবং বহরমপুর হইতে উত্তর উত্তর-পশ্চিমেও প্রায় সেই পরিমাণ হইবে। উক্ত লাক্ষাগড় সম্বন্ধে স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে এক কিম্বদন্তীর প্রচলন দেখা যায়। এক সময়ে কোন শত্রুপক্ষীয় রাজা জৌগড়ার

রাজার সহিত যুদ্ধকালে গড় অবরোধ করিয়া রাখিয়া দীর্ঘকালেও তাহা অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুসেনা জোগড়ার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে যাহাকে বন্দী করিতে পারিত তাহারই উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। একদিন গড় হইতে একটি স্ত্রীলোক বাহির হইবার কালে শত্রুসেনার হাতে পড়ে। তাহারা যখন উহাকে যন্ত্রণা দিবার আয়োজন করিতেছিল তখন স্ত্রীলোকটি উপহাস করিয়া বলিল, যাহারা এত আয়াসেও জোগড়ার গড় অধিকার করিতে পারিল না তাহারা রমণী ভিন্ন আর কাহার নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিবে? কথায় কথায় স্ত্রীলোকটি বলিয়া ফেলিল, জোগড়া লাক্ষানির্ম্মিত গড়, অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে উহার কোন ক্ষতি হইবে না; এক অগ্নিসংযোগ ব্যতীত উহা অধিকার করা সম্ভব নহে। এইরূপ সন্ধান পাইয়া শত্রুসেনা কেল্লা অধিকার করিল। এই পাপের ফলে স্ত্রীলোকটি প্রস্তরে পরিণত হইল। সে প্রস্তরমূর্ত্তি আজিও জোগড়ায় দাঁড়াইয়া নিজ কার্য্যের ফল দেখিতেছে। বলা বাহুল্য এ কাহিনীর কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। পরবর্ত্তী কালে জোগড়া নামের কারণ দর্শাইবার উদ্দেশ্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসন অপেক্ষা গড়টি যে পরবর্ত্তী যুগের তাহা নিঃসন্দেহ। গড়ের প্রাচীরের দক্ষিণে যে প্রস্তরের স্ত্রীমূর্ত্তিটি গ্রামবাসীরা দেখায় তাহা আসলে একটি সতীস্তম্ভ। উহার পাদদেশ খননকালে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা বাহির হইয়াছিল। ঐগুলি শকরাজগণের তাম্রমুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত এবং মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্রচলিত হয়। দুর্গটিও ঐ যুগেরই নির্ম্মিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

গড়ের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তন্মধ্যে যেটিতে লেখা আছে সেটি দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে অবস্থিত এবং ১২০ ফুট খাড়া উঠিয়াছে। লেখাগুলি তিন স্তবকে ক্ষোদিত। প্রথম স্তবকে প্রথম হইতে পঞ্চম, দ্বিতীয়ে ষষ্ঠ হইতে দশম ও চতুর্দ্দশ এবং তৃতীয় স্তবকে কলিঙ্গ অনুশাসন দুইটি উৎকীর্ণ। শেষোক্ত দুইটি ধৌলিতেও দেখা যায়। প্রস্তরগাত্র ঝরিয়া পড়ার ফলে প্রথম স্তবকের প্রায় অর্দ্ধাংশ এবং দ্বিতীয় স্তবকের প্রায় তৃতীয়াংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে অন্যান্য পঞ্চম ও দশম অনুশাসন একেবারে নাই বলিলেও চলে। প্রথম অনুশাসনের প্রারম্ভ কালসী, গির্ণার ও সাহবাজগড়ীর লিপির আরম্ভ হইতে কতকটা বিভিন্ন প্রকারের। তাহা এইরূপ, "ইয়ং ধংমলিপি খপিংগলসি পবতসি দেবানং পিয়েণ পিয়দসিনলাজিন লেখাপিতা"—অর্থাৎ 'এই ধর্ম্মলিপি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্ত্তৃক খপিঙ্গল পর্ব্বতে লিখিত হইয়াছিল।" অপরাপর লিপিত্রয়ে পর্ব্বতের নাম দেখা যায় না। ধৌলিতেও পর্ব্বতের নাম ছিল। কিন্তু প্রস্তর-গাত্র ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, শুধু "পবত" কথাটা পড়া যায়। নামটি পাওয়া যাইলে ধৌলি পাহাড়ের তদানীন্তন নাম জানা যাইত। বলা বাহুল্য জোগড়ার অনুশাসনযুক্ত গণ্ডশৈলের নামই খপিঙ্গল পর্ব্বত।

জোগড়ার অনুশাসন সমাপার মহামাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রচার হইয়াছিল, তাই মনে হয় সমাপা এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। অশোকের বহুদূরবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনের সৌকর্য্যার্থে নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল। এক একটি বিভাগে এক একজন রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন। রাজ-বংশীয় আর্য্যপুত্র বা কুমারগণই সাধারণতঃ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইতেন। পিতার জীবদ্দশায় অশোক নিজে উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। অশোকের সাম্রাজ্যে এই রূপ চারিটি বিভাগের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়; যথা,—উত্তরে তক্ষশিলা, পূর্ব্বে তোসলি, পশ্চিমে উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণে সুবর্ণগিরি। সাম্রাজ্যের মধ্যদেশ রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে স্বয়ং সম্রাটের পর্য্যবেক্ষণে শাসিত হইত। এই পাঁচটি বিভাগের মধ্যে আবার অপরাপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বিভাগ ছিল। সমাপা তোসলি প্রদেশের অন্তর্গত এইরূপ একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের প্রধান নগর ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সমাপার মহামাত্রগণকে আদেশ করিয়া প্রচারিত লিপি দুইটি যে মূল চতুর্দ্দশ অনুশাসন হইতে পরবর্ত্তীকালে উৎকীর্ণ তাহা নানাপ্রকারে জানা যায়। প্রথমতঃ, এগুলি অন্যান্য লেখাগুলির মত সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে খোদাই করা নহে।

দ্বিতীয়তঃ, এই অংশের কোন কোন অক্ষরের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের সেই সেই অক্ষরে আকৃতিগত সামান্য সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। দুইটি লিপিরই চারিদিক বেড়িয়া লাইন টানা, যেন লেখাগুলি ফ্রেমে বাঁধাই করা। প্রথম লেখাটির উপরের দুই কোণে স্বস্তিক চিহ্ন এবং নিম্নে চারিদিকে "ম" অক্ষরটি ক্ষোদিত দেখা যায়। কানিংহামের মতে উহা "ওম্" অর্থবাচক। এ ধরণের কারুকার্য্য অশোকের আর কোন লিপি সম্পর্কে দেখা যায় নাই।

ধৌলি এবং জৌগড়া লিপিদ্বয় মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত, তাই কুত্রাপি "র" অক্ষরের ব্যবহার নাই। এই দুই লিপিতে রাজনীতির অতি উচ্চ আদর্শ লক্ষিত হয়। রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক এক অভিনব ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই অশোকের উদ্দেশ্য ছিল। ধৌলি এবং জৌগড়া লিপিমধ্যেই ঐ আদর্শের চরম বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। "সবে মুনিসে পজামমা" (ধৌলি) বা "সব মুনিসে মে পজা" (জৌগড়া)—সকল মানুষই আমার পুত্র—ইহাই সেই নীতির মূলমন্ত্র।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সার ওয়ালটার ইলিয়ট জৌগড়ার গিরি-লিপি আবিষ্কার করেন। সেই সময়েই এগুলির প্রথম নকল লওয়া হইয়াছিল। পরে ১৮৫৯ অব্দে ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন লেখাগুলির কয়েকটি ফটো লয়েন এবং মান্দ্রাজ সরকারে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট লেখাগুলির ফটো এবং ছাপ উভয়বিধ উপায়েই সম্পূর্ণ প্রতিলিপি লইবার চেষ্টা করেন। তাহার পর কানিংহাম, বুলহার এবং হুলজ কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে অশোক-অনুশাসনগুলি একত্র করিয়া সম্পাদনকালে লেখাগুলির আবার নুতন করিয়া প্রতিলিপি ও চিত্রাদি গৃহীত হইয়াছে।

ধৌলির হস্তিমূর্ত্তি

গির্ণার :—কাথিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্র প্রদেশের প্রধান নগর জুনাগড়ের পূর্ব্বদিকে গির্ণার পর্ব্বত অবস্থিত। জুনাগড় প্রাচীনকালে অমরকোট নামে অভিহিত হইত এবং গির্ণার প্রাচীন গিরিনগরের অপভ্রংশ মাত্র। এই প্রাচীন গিরিনগর দীর্ঘকাল যাবৎ সৌরাষ্ট্র প্রদেশের রাজধানী ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গিরিনগর জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের নিকট পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। জৈনগ্রন্থসমূহে শকরাজ রুদ্রদমনের অনুশাসনে এবং বৃহৎসংহিতায় গিরিনগর নাম পাওয়া যায়। হিন্দুপুরাণে ইহা উজ্জয়ন্ত নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহার অদূরে বস্ত্রাপথক্ষেত্র। প্রভাসখণ্ডমতে উহা একটি প্রধান শৈব তীর্থ। পেরিপ্লসে সৌরাষ্ট্রের রাজধানী মিননগর নামে অভিহিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য উহা গিরিনগরেরই রূপান্তর। শকরাজ রুদ্র-

দমনের কাল পর্য্যন্ত বা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেও গিরিনগর সৌরাষ্ট্র প্রদেশের রাজধানী ছিল।

গির্ণার পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ৩০০০ ফুট হইবে। পর্ব্বতের পাঁচটি শৃঙ্গ আছে। গির্ণার পর্ব্বতে বহু পুরাতন জৈনমন্দির দেখা যায়। জুনাগড় হইতে গির্ণার পর্ব্বতে যাইবার পথে জুনাগড় সহরের প্রায় অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটি গণ্ডশৈল গাত্রে অশোকের অনুশাসনসমূহ ক্ষোদিত। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট ঐ প্রস্তরখণ্ড সমধিক মূল্যবান। কারণ অশোকের অনুশাসন ব্যতীত ইহার গাত্রে শকরাজ রুদ্রদমনের এবং গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের অনুশাসন দেখা যায়। এইরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচলিত বর্ণমালার সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। এইরূপে গির্ণার পর্ব্বত হইতে ভারতীয় অক্ষরমালা বিকাশের ক্রম বেশ পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। অশোকের অনুশাসনসমূহ প্রস্তরের পূর্ব্ব-ভাগে ক্ষোদিত দেখা যায়; রুদ্রদমনের লিপি পাহাড়ের চূড়ায় এবং স্কন্দগুপ্তের শাসনকর্ত্তা পর্ণদত্তের প্রচারিত লিপি পশ্চিমগাত্রে উৎকীর্ণ।

গির্ণারে অশোকলিপি

অশোকের লেখাটি বেশ সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ক্ষোদাই করা। অক্ষরগুলি পরস্পর সমান এবং দৈর্ঘ্যে ১·২ ইঞ্চি। পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ অনুশাসন বাদে লেখাটি বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। লেখাগুলি দুই অংশে উৎকীর্ণ। পাহাড়ের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ সরল রেখা টানা আছে, তাহার বামভাগে প্রথম পাঁচটি এবং দক্ষিণভাগে ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ অনুশাসন পর্য্যন্ত ক্ষোদিত। ত্রয়োদশ সংখ্যক অনুশাসন সকলের নীচে এবং তাহার ডানদিকে চতুর্দ্দশ সংখ্যক লিপি অবস্থিত। অনুশাসনগুলি সরল রেখা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। ত্রয়োদশ অনুশাসনের নিম্নে শ্বেত-হস্তীর প্রশংসাদ্যোতক এইরূপ একটি পদ দেখা যায়,—"...ব স্বেতো হস্তি সবলোকসুখাহরোণাম।" ইহার অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইত। প্রফেসার কানাই সর্ব্বপ্রথম ইহার মধ্যে ভগবান বুদ্ধদেবের উল্লেখ লক্ষ্য করেন।

কালসীতেও এইরূপ হস্তীর সম্বন্ধে পদ দেখা যায় সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কালসী এবং ধৌলির মত গির্ণারেও সম্ভবতঃ হস্তিমূর্ত্তি ছিল। কালক্রমে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রস্তর খণ্ডটির বাম অংশ বহুল পরিমাণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তীর্থযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য জনৈক স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি জুনাগড় হইতে গির্ণার পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেজন্য প্রস্তরসংগ্রহের নিমিত্ত বারুদযোগে পাহাড়টার কতকাংশ চূর্ণ করা হয়। তাহার ফলে বামভাগে অবস্থিত পঞ্চম ও ত্রয়োদশ অনুশাসনের সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শেষোক্ত অনুশাসনে যে স্থানটিতে গ্রীকরাজগণের নাম আছে ঠিক সেই অংশই নাই। মনে হয় হস্তিমূর্ত্তিটিও এই ত্রয়োদশ লিপির নিম্নে প্রস্তরের বামভাগে ছিল এবং ঐ সময়েই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দের মধ্য দিয়াই ভাল আসে।

বারুদযোগে পাহাড় ভাঙ্গিতে গিয়া বিজন অরণ্যসমাচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থিত ঐতিহাসিকের নিকট অমূল্য এই প্রস্তর লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া পড়িল।

সে আজ ১৮২২ খৃষ্টাব্দের কথা। বোম্বাই লিটারেরি সোসাইটির সভাপতি রেভারেণ্ড জেমস ষ্টিফেনসনই ইহা আবিষ্কারের গৌরবলাভের অধিকারী। কর্ণেল টডই (রাজস্থানের ইতিহাস লেখক) সর্ব্বপ্রথম গির্ণারের শিলালিপি সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। কাপ্তেন ল্যাং ও কাপ্তেন পষ্ট্যান্স গৃহীত প্রতিলিপির সাহায্যে জেমস প্রিন্সেপ কোন কোন স্থান ঠিক পড়িতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রতিলিপি সুস্পষ্ট ও নির্ভুল হয় নাই। সেজন্য ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে জেনারেল সার লিগ্রাণ্ড জেকব প্রিন্সেপের জন্য পুনরায় লেখাগুলির ছাপ গ্রহণ করেন। তাহা হইতে প্রিন্সেপ অশোক অনুশাসনের পাঠোদ্ধার করেন; ইহার অল্প পরেই ধৌলির লেখ বাহির হয়। পরবর্ত্তীকালে দেখা গিয়াছে যে, উক্ত জেনারেল মহাশয় গৃহীত এই প্রতিলিপিটী প্রায় নির্ভুলই হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শিলাখণ্ডের একাংশ বারুদযোগে চূর্ণ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে অনুশাসনের কতকাংশ নষ্ট হইয়াছে। এই ভগ্ন খণ্ডসমূহ পুনরুদ্ধার করিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী ভূমিতে অনুসন্ধান করিয়া কাপ্তেন পষ্ট্যান্স কয়েক টুকরা প্রস্তর কুড়াইয়া পান, তাহার মধ্যে দুইটিতে ব্রাহ্মী অক্ষর ছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রীস ডেভিডসও এইরূপ একটি খণ্ড পাইয়াছিলেন, তাহাতে ১১ পংক্তিতে, প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৮।১০টি করিয়া অক্ষরে ত্রয়োদশ অনুশাসনের অংশবিশেষ উৎকীর্ণ ছিল। তাঁহার Buddhist India গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় ইহার একটি চিত্র অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গির্ণারের পশ্চিমদিকে অমরকোট পাহাড়। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা প্রদেশ জুড়িয়া প্রাচীন সুদর্শন হ্রদ অবস্থিত ছিল। এই হ্রদ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে তাঁহার শাসনকর্ত্তা বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত কর্ত্তৃক কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সৌকর্য্যার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে অশোকের কালে তাঁহার শাসনকর্ত্তা যবনরাজ তুষাস্প অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য কতকগুলি প্রণালী সংযোজনা করেন। মৌর্য্যসম্রাটগণ নির্ম্মিত এই কীর্ত্তিটি সার্দ্ধ চারি শত বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকে। পরে ১৫০ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ ঝটিকায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া হ্রদের সমস্ত জল নিষ্কাসিত হইয়া যায়। অনন্তর শকরাজ রুদ্রদমন "পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ দৃঢ়তর" করিয়া ঐ বাঁধ পুনর্নির্ম্মিত করিয়া হ্রদটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের অনুশাসন যে শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ, তাহারই অপর একপ্রান্তে ক্ষোদিত রুদ্রদমনের অনুশাসন হইতে হ্রদের এই ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়,—"মৌর্য্যস্য রাজ্ঞঃ চন্দ্রগুপ্তস্য রাষ্ট্রীয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতম্।" *

তিন শত বৎসর থাকিবার পর গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের সিংহাসনারোহণের বর্ষে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের সাম্রাজ্যের পশ্চিম বিষয়ের রাজপ্রতিনিধি পর্ণদত্তের পুত্র রাজধানী গিরিনগরের শাসনকর্ত্তা চক্রপালিত ঐ বাঁধ পুনর্নির্ম্মিত করেন, এবং পরবৎসর ৪৫৮ অব্দে তাহার স্মারক হিসাবে ঐ স্থানে বহু অর্থব্যয়ে একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। গির্ণার শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ স্কন্দগুপ্তের লেখা হইতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। † তাহার পর আবার কবে বাঁধ ভাঙ্গিয়া সুদর্শন হ্রদ অন্তর্হিত হয় ইতিহাসে তাহার উল্লেখ মিলে না। ঐ প্রাচীন লিপিত্রয়ের পাঠোদ্ধারের পরই এ সকল কথা জানা গেল। গভীর অরণ্যসমাচ্ছন্ন প্রদেশমধ্যে সুদর্শন হ্রদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান খাঁ বাহাদুর আর্দাসির জেমসেদজি ঐ বাঁধের ভগ্নিনিদর্শনের কতকাংশ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ‡

---

* Epigraphia Indica, VIII, pp. 46-7.

† Fleet - Gupta Inscriptions, No. 14.

‡ J. Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, XVIII. No. 47.

সোপারা :—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ঠানা জেলার বসই তালুকে সোপারা নামে একটি সহর আছে। এইস্থানে অশোকের অষ্টম গিরিলিপির এক সংস্করণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তরগাত্রে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ যে লেখটি এখানে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অশোকের ঐ সংখ্যক অনুশাসনের কয়েকটি পদ দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে এককালে সমগ্র চতুর্দ্দশ গিরিলিপিরই এক সংস্করণ এখানে উৎকীর্ণ ছিল।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজী এবং মিঃ ক্যাম্বেল কর্তৃক অনুসন্ধানের ফলে সোপারার অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়। সোপারায় কয়েকটি পুরাতন ধ্বংস স্তূপ দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে খননের ফলে বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল। *

সোপারা অতি প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে এইস্থানের নাম সুপ্রক বা শূর্পারক ছিল। ভৃগুকচ্ছ বা বর্ত্তমান ভরোচ বা গ্রীকদিগের Barygaza এবং শূর্পারক বা সোপারা বা গ্রীকদিগের Suppara বা Soupara পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পশ্চিম এসিয়া, আফ্রিকা অর্থাৎ প্রাচীন বাবিলন, মিসর, রোম-সাম্রাজ্য প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যের ঐ দুইটিই প্রধানতম কেন্দ্রস্থান ছিল। মহাভারত, পুরাণ-সমূহ, জাতকগ্রন্থ এবং গ্রীকলেখকদিগের বিবরণ হইতে ঐ প্রাচীন বাণিজ্যের তথা সোপারার সুখসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত-মতে পরশুরামই শূর্পারক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থিত রামতীর্থের উল্লেখ ঐ গ্রন্থমধ্যে দেখা যায়। সোপারার দীর্ঘকাল অপরান্ত প্রদেশের রাজধানী ছিল। এই স্থানের ও ভৃগুকচ্ছের প্রাচীন বাণিজ্য সম্বন্ধে প্লিনির ভূগোল, টলেমীর ভূগোল-বিবরণ ও 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ন সি' নামক প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কুর্ণুল :—বিগত ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় যে, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কুর্ণুল জেলায় বিজন অরণ্য মধ্যে একজন বাঙ্গালী খনিজ-ভূতত্ত্ববিদ সুবর্ণ খনির সন্ধান করিতে করিতে একটি পাহাড়ের গাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপির অপর এক সংস্করণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঠিক কোন স্থানে অনুশাসনটি অবস্থিত, বা ইহার সম্বন্ধে অপর কোন বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ কিছু এখন বলিতে পারিলাম না। তবে এখানে চতুর্দ্দশ গিরিলিপি ব্যতীত আরও দুইটি নূতন অনুশাসন আছে, এ কথা লিখিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা যদি হয়, তবে কুর্ণুলের অনুশাসনে অপরাপর সমস্ত অনুশাসন হইতে এক হিসাবে নূতনত্ব আছে বলিতে হইবে। ঐ দুইটি অনুশাসন অশোকের অপ্রধান গিরিলিপি দুইটি কিনা তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। তাহা হইলেও বিচিত্র বলিতে হইবে, কারণ মূল চতুর্দ্দশ লিপি ও অপ্রধান দুইটি লিপির একত্র সমাবেশ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সত্যই এখানে আর দুইটি লেখা আছে কিনা তাহাও এখন বলিতে পারি না।

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। কুর্ণুল জেলায় অশোক-অনুশাসন আবিষ্কার হওয়ার সংবাদ বিগত মার্চ্চ মাসে সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজ তিন বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে এসংবাদ আমি শুনিয়াছি এবং সেই সময়েই জনৈক খ্যাতনামা অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ঐ অনুশাসনের অংশ বিশেষের ফটোও দেখিয়াছিলাম। অস্পষ্ট ফটো হইতে লেখাগুলি সব পড়িতে পারি নাই। তবে যতটুকু পড়িতে পারিয়াছিলাম তাহাতে উহা দ্বাদশ অনুশাসন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। সেই সময়েই শুনি প্রায় ৭।৮ বৎসর হইল লেখাটি আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ ১১।১২ বৎসর, অন্ততঃপক্ষে চারি বৎসর ত বটেই, ধরিয়া আবিষ্কারক মহাশয় কেন এ কথা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

নগরহার :—চীনদেশীয় পর্য্যটক হোয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণীমধ্যে বর্ত্তমান আফগানিস্থান দেশে আধুনিক জেলালাবাদ সহরের সন্নিকটে গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ একটি প্রাচীন শিলালিপির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা প্রাচীন যুগের নগরহার সহরের অদূরে অবস্থিত ছিল, একারণে

* J. B. B, R. A. S., XV, 282.

উপযুক্ত নামের অভাবে উহাকে নগরহার অনুশাসন নামেই অভিহিত করিব। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে পর্য্যটক মহাশয় ঐ লেখাটি স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে সত্য বা সম্ভবপর নহে ঐতিহাসিক পাঠককে তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। বুদ্ধদেবের সমস্ত পরিভ্রমণ প্রাচীন কোশল ও মগধ রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুদূর গান্ধার দেশ হইতেও পশ্চিমে নগরহার দেশের মধ্যে তিনি কখনও পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং তথাকার গিরিগাত্রে লেখা উৎকীর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। অশোক ব্যতীত অপর কেহ যে ঐ লিপি ক্ষোদিত করেন নাই সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহুজনাকীর্ণ নগর বা তীর্থস্থানসমূহসমীপে তাঁহার অনুশাসনগুলি প্রচার করিতেন, যাহাতে সেগুলি বহুলোকের চোখে পড়ে এবং তাহারা তদনুরূপ আচরণ করিতে পারে। বর্ত্তমান আফগানিস্থান দেশ বা কাবুল, কান্দাহারও হিরাট প্রদেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান জেলালাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নগরহার নগর প্রাচীন যুগে এতদ্দেশের অন্যতম প্রধান নগর, তথা এ প্রদেশের রাজধানী ছিল। তাহার অদূরে অবস্থিত প্রাচীন হিলো বা আধুনিক হিড্ডা নগর এবং গোপালগুহা বৌদ্ধগণের প্রধান তীর্থস্থানসমূহের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত; প্রথমোক্ত স্থানে রক্ষিত বুদ্ধদেবের করোটির অস্থি এবং শেষোক্ত স্থানে রক্ষিত শরীর-ছায়া দেখিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারী দলে দলে এই স্থানে আগমন করিতেন। এতদঞ্চলেও নগরহার হইতে প্রায় একশত কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত সাহবাজগড়ী তথা মানসেরায় অশোকের গিরিলিপি দৃষ্ট হয়। এই চারি কারণে সোঙ্গ-ইউন দৃষ্ট শিলালিপিটিও খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপির অপর এক সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়।

লেখাটি বুদ্ধদেবের যে নহে তাহা নিঃসন্দেহ। বুদ্ধদেব এবং অশোকের মধ্যবর্ত্তী অপর কোন নৃপতির নহে তাহাও স্থির বলা যায়। অশোকের পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে এক কনিষ্ক ভিন্ন অপর কাহারও হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কনিষ্কর এ ধরণের কোন লেখা এযাবৎ বাহির হয় নাই। পরন্তু তিনিও যে অশোকের ন্যায় গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া অনুশাসন প্রচার করিতেন কোন সূত্র হইতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই অপর কাহারও হওয়া অপেক্ষা অশোক নৃপতির হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং তাহাই মনে করা সঙ্গত নহে কি? সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে এধরণের 'নেতি'-বাচক প্রমাণ দুর্ব্বলতর একথা সত্য বটে। কিন্তু ইহাও সত্য বটে যে সকল কথা পর্য্যালোচনা করিলে অশোক ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি ঐ শিলালিপির প্রচারভার আরোপ করা চলে না।

বর্ত্তমানে অনাবিষ্কৃত এই নূতন অশোক অনুশাসনটির অস্তিত্ব কতকটা অপ্রধান প্রমাণের উপরই নির্ভর করিতেছে। তবে উপযুক্ত অনুসন্ধান হইলে উহা যে চীন পরিব্রাজকবর্ণিত স্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হইবে বলিয়াই আমার ধারণা। বর্ত্তমানে সে অনুসন্ধানের কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিছুকাল পূর্ব্বে আফগান সরকারের অর্থানুকূল্যে একদল ফরাসী পণ্ডিত আফগানিস্থান দেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহারা বর্ত্তমান জেলালাবাদ সহরের অদূরে অবস্থিত হিড্ডা (চীন পরিব্রাজকগণ বর্ণিত হিলো) নগরের নিকটে নানাস্থানে খনন করিয়া বহু পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন। হিড্ডা জেলালাবাদের ছয় মাইল দক্ষিণে ও পেশোয়ারের ৭২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, পক্ষান্তরে নগরহারের ধ্বংসনিদর্শন জেলালাবাদের চারি মাইল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নগরহারের সমীপেই একটি পর্ব্বতগাত্রে লেখাটি ছিল। চীন পরিব্রাজকগণের লেখা হইতে যতদূর সম্ভব অনুশাসনটির অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমি গত বৎসর আফগান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সর্দ্দার ফজিজ মহম্মদ খাঁ এবং উক্ত ফরাসী সমিতিকে উক্ত অশোক-লিপিটির জন্য অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার অল্পকাল পরেই আফগান রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমানে বা

অদূর ভবিষ্যতেও আর এ বিষয়ে কোন চেষ্টাই সম্ভব নহে। সে যাহা হউক, সোঙ্গ-ইউনের উল্লিখিত এই প্রাচীন শিলালিপিটির প্রতি আর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বা ইহাও যে আসলে একটি অশোক-অনুশাসন এরূপ সন্দেহ ইতিপূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমি জ্ঞাত নহি।

যাহা হউক, এবারে চীনপর্য্যটকগণের লেখা হইতে শিলালিপিটির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। প্রথমে সোঙ্গ-ইউনের কথাই উদ্ধৃত করা যাউক, কারণ তিনিই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। "নগরহার নগর হইতে আমরা গোপালগুহায় গিয়াছিলাম। এই স্থানে বুদ্ধদেবের শরীর-ছায়া রক্ষিত আছে। পনের ফুট দীর্ঘ গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবেশদ্বারের ঠিক অপরদিকে দেওয়ালের পশ্চিম গাত্রের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া থাকিবার পর তাহার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সমেত ছায়ামূর্ত্তিটি দৃষ্টিপথে আইসে। ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে নিকটে যাইলে মূর্ত্তিটি অস্পষ্টতর হইতে হইতে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেস্থানে ইহা ছিল সেস্থান স্পর্শ করিলে সুধু প্রস্তরগাত্র হাতে ঠেকে। পুনরায় পশ্চাৎপদ হইতে থাকিলে মূর্ত্তিটি আবার দৃষ্ট হইতে থাকে। সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে যাহা দেখা যায় না, সেই ভ্রূমধ্যবর্ত্তী ঊর্ণাচিহ্নই মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব। গুহার বাহিরে চতুষ্কোণ একখণ্ড প্রস্তরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

"গুহার এক লি উত্তরে মুদ্‌গল্যায়ণের প্রস্তর গুহা। উত্তরে একটি পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতের পাদদেশে ভগবান বুদ্ধদেব স্বহস্তে ১০ চ্যাং (১১৫ ফুট) উচ্চ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, এই মন্দির যেদিন ভূগর্ভে প্রোথিত হইবে, সেইদিন বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও বিনষ্ট হইবে। এইস্থানে আরও সাতটি মন্দির আছে। তাহাদের দক্ষিণদিকে একটি প্রস্তরখণ্ড আছে, উহার উপরে একটি লেখা দেখা যায়। কথিত আছে যে স্বয়ং বুদ্ধদেব ইহা লিখিয়াছিলেন। বৈদেশিক অক্ষরগুলি আজ পর্য্যন্তও সুস্পষ্ট রহিয়াছে।" *

এবারে ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণ হইতে মাত্র প্রাসঙ্গিক কথাগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "পুরুষ (পেশোয়ার) হইতে ষোল যোজন পশ্চিমে হিলো নগর। তাহার এক যোজন উত্তরে গিয়া আমরা নগরহারায় পৌছিলাম। নগরহারের অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে একটি পর্ব্বত-গুহা আছে। ইহা একটি উচ্চ পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম গাত্রে অবস্থিত। বুদ্ধ এইখানে তাঁহার ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"ছায়ার পঞ্চশত পদ পশ্চিমে বুদ্ধ কেশ ও নখর কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর ভবিষ্যতের সকল মন্দিরের আদর্শস্থানীয় হইবে বলিয়া বুদ্ধদেব নিজে তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ৭ বা ৮ চ্যাং উচ্চ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন।" †

এবারে হিউয়েনসঙ্গের কথা বলা যাইতেছে। "নগর-হারের ২০ লি দক্ষিণপশ্চিমে একটি গণ্ডশৈল পার্শ্বে একটি পুরাতন পরিত্যক্ত সঙ্ঘারাম আছে। তন্মধ্যে অশোকরাজ নির্ম্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটি স্তূপ আছে। সঙ্ঘারামের দক্ষিণপশ্চিমে উচ্চ পর্ব্বত হইতে একটি পার্ব্বত্য তটিনী নামিতেছে এবং জলপ্রবাহ শিলা হইতে শিলান্তরে বেগে পতনকালে বহুসংখ্যক নির্ঝরের সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ব্বতের পার্শ্বসমূহ প্রাচীরের ন্যায়। একটি পাহাড়ের পূর্ব্বগাত্রে প্রশস্ত গভীর একটি গুহা দেখা যায়। তথায় নাগ গোপাল বাস করে। পূর্ব্বে এইখানে বুদ্ধদেবের ছায়া দৃষ্ট হইত। গুহার বাহিরে দুইটি চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড আছে, তন্মধ্যে একটির উপরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়।"

এই তিন বিবরণ একত্র করিয়া পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কথা কয়টি বুঝা যায়। নগরহারের অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে বা ২০ লি দক্ষিণপশ্চিমে গোপালগুহা অবস্থিত ছিল। উহার ৫০০ শত পদ পশ্চিমে বা উত্তর-পশ্চিমে যেস্থানে একটি স্তূপমধ্যে বুদ্ধদেবের কর্ত্তিত কেশরাশি ও নখর রক্ষিত ছিল, তাহার নিকটে অবস্থিত একটি উচ্চ মন্দির (৯২ বা ১১৫ ফুট) বুদ্ধদেবের বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহারই সামান্য দক্ষিণে প্রস্তরগাত্রে লেখাটি ছিল।

* S. Beal--Records of the Western World, Introduction, p. cvii.

†--Ibid, pp. XXXIV-XXXVI.

এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ফাহিয়ান প্রভৃতি লেখকগণ দিঙ্‌নির্ণয় করিতে শুধু প্রধান দিগ্‌চতুষ্টয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, মধ্যবর্ত্তী কোণসমূহের উল্লেখ তাঁহারা করেন নাই। হিউয়েনসঙ্গই শুধু যথাযথ দিকসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ফাহিয়ান যাহাকে দক্ষিণ বা পশ্চিম বলিয়াছেন, অপর পরিব্রাজক যদি তাহাকেই দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম বলেন, তবে তাঁহার কথাই ঠিক বলিতে হইবে। 'লি' ও যোজনের দূরত্ব লইয়া মতভেদ দেখা যায়। প্রভূত আয়াসে ও পরিব্রাজকবর্ণিত পথে ভ্রমণ করিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে কানিংহাম সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা না মানার কোনই কারণ দেখা যায় না। তাঁহার মতে এক যোজনে ৬৭১ মাইল এবং ছয় 'লি'য়ে এক মাইল। * নগরহারের স্থান-নির্দ্দেশ লইয়াও মতভেদ নাই। বর্ত্তমান জেলালাবাদ সহর হইতে চারি মাইল পূর্ব্বদিকে কাবুল ও সুরখব নদীর সঙ্গমস্থানে উভয় নদীরই দক্ষিণ (বা ডাইন) তটে বালার-হিসার বা পুরাণকেল্লা নামে পরিচিত যে সুবিশাল ধ্বংসরাশি অবস্থিত তাহাই প্রাচীন যুগের নগরহার নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ এখনও 'নগ্রক', 'নগরট' বা 'নগর' নামে ঐ স্থানের উল্লেখ করে। ‡

সুতরাং অশোকের অনুশাসনটির অবস্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল,—বর্ত্তমান জেলালাবাদ সহরের চারি মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত নগরহার সহরের ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩·৩৫ বা ৩·৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত গোপালগুহার প্রায় পঞ্চশত পদ উত্তরপশ্চিমে কয়েকটি স্তূপ ও মন্দিরের (তন্মধ্যে একটি মন্দির প্রায় শতফুট উচ্চ ছিল) ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণে ঐ লেখযুক্ত প্রস্তরখণ্ডটি অবস্থিত ছিল বা এখনও আছে।

এইরূপে অশোকের আটটি আবিষ্কৃত এবং একটি অনাবিষ্কৃত মূল গিরিলিপির কথা বলা হইল। বারান্তরে অপ্রধান লিপিগুলির কথা বলা যাইবে।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* Ibid p 93

‡ Ancient Geography of India, p. 571. G. R. A. S. 1881, p. 183.

দু'জনায়

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস্
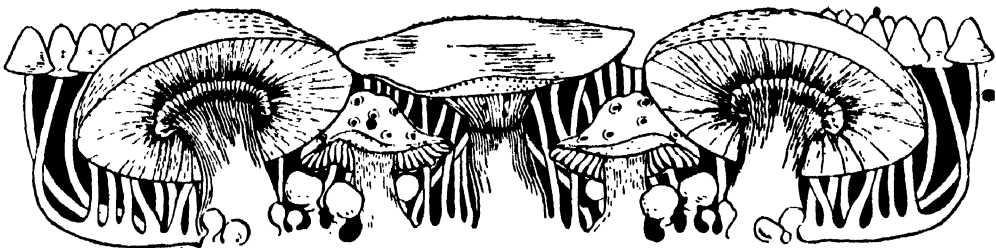
এক

সেদিনও এমনি একলাটি বসেছিলুম, পড়ার বইখানা কোলের ওপর পড়েছিল, কিন্তু তার ওপরে চোখ পড়্ছিল না। ভাবছিলুম একজনের কথা, আজ যেমন ভাব্ছি। মনে হচ্ছে, মিলনের পূর্ব্বাহ্ন আর অপরাহ্ন দুইই সমান ব্যাকুতায় ছলছল।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। সকালবেলা তার চিঠিও পাইনি, ফোনও শুনিনি। সকালের আশা দুপুরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কে জানে কার ফোন। গা তুললুম না।

মিসেস্ ফিশার বুড়ীকে তার কসাই কিম্বা মুদী স্মরণ কর্‌ছিল ভেবেছিলুম। কিন্তু বুড়ী ডেকে বল্লে, "মিষ্টার চৌধুরী, তোমার সেই বন্ধুনী।"

বিরক্ত কর্‌লে। "সেই বন্ধুনী"টির জন্যে মিষ্টার চৌধুরীর কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কেন যে তিনি এ হত-ভাগাকে মাঝে মাঝে জ্বালাতন করেন তিনিই জানেন। কম্প্রপদে নম্র নেত্রপাতে ফোনের রিসিভার কানে দিলুম। কানটাকে ঝাঁঝিয়ে দিয়ে কে যে কথা ব'লে গেল, বুঝ্‌লুম। অর্থাৎ কে তা বুঝ্‌লুম। কী তা বুঝ্‌লুম না। বাঁচা গেল যে "সেই বন্ধুনী" নন্। ইনি ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলেন না, ইনি কথা দিয়ে যেন কান ম'লে দেন।

তাকে দেখ্‌বার জন্যে এত ব্যগ্র ছিলুম, সে যে কী বল্লে শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। প্রতি প্রশ্নের উত্তরে একটা ক'রে "হাঁ" ব'লে গেলুম। বল্লুম, হাঁ, আজ বিকেলে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাবো।

গেলুম যখন তখন গায়ে ছিল অর্দ্ধেকটা টেনিসের পোষাক অর্দ্ধেকটা মামুলী, আর হাতে একখানা "Francis Thomson." সাড়ে চারটের সময় অমুক জায়গায় দেখা কর্‌বার কথা, অমুক জায়গায় পায়চারি কর্‌তে লাগলুম। সে আর আসেই না!

আশেপাশের রাস্তাগুলোর খানিকটা ক'রে গিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম যদি তাকে দূর থেকে দেখ্‌তে পাই। মনে মনে বকুনীর ভাষায় শান দিতে লাগ্‌লুম।

আধমাইল দূর থেকে অবশেষে দেখা গেল কে একজন শুক্লবসনা শুক্লভূষণা আস্‌ছেন, এত জোরে জোরে পা ফেল্‌ছেন যেন ধান ভান্‌ছেন, আর এত দূরে দূরে—যেন প্রতি-বারেই লঙ্কা ডিঙোচ্ছেন। খানিকটা কাছে যখন এলেন তখন দেখ্‌লুম হাতে একটা বেতের ব্যাগ আছে, এগিয়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিলুম। বল্লুম, "কত দেরি করেছ জানো?"

সে একটা কৈফিয়ৎ দিলে। দু'জনে মিলে ট্রেনের অভিমুখে ছুট্‌লুম। পথে যেতে যেতে সে বল্লে, "তোমার সঙ্গে কিছুই আনোনি কেন?" আমি বল্লুম, "এর বেশী কী আনতুম?" সে বল্লে, "তোমাকে বোধ হয় অন্য একটা বাড়ীতে রাত কাটাতে হবে, এক বাড়ীতে দুটো ঘর পাওয়া যাবে না।"

আমি বল্লুম, "ব্যাপার কি? রাত্রে ফিরে আস্‌বো মিসেস্ ফিশারকে ব'লে এসেছি যে!"

"এ কেমন কথা? তখন না বল্লে আমার সঙ্গে সোম-বার অবধি Week endএ আস্‌ছো?"

ঠিক শুন্‌তে পাইনি বোধ হয়। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঠিক্ করবো।"

"এখন—?"

"এখন এই বেশেই যেতে রাজী আছি। কেবল একটা ফোন ক'রে বুড়ীকে ব'লে দিতে হবে আজ রাত্রে ফির্‌বো না।"

"সঙ্গে কিছুই যে নাওনি, অন্ততঃ একটা টুথ্ ব্রাশ্ তো দরকার?"

"তোমার টুথ-পেষ্টের খানিকটা দিয়ো।"

"এক বাড়ীতে থাক্‌লে তো? তার চেয়ে বরং রাস্তায় কিনে নিয়ো একটা।"

রাতের পোষাকের নাম মুখে আনলুম না। বল্লুম, "একখানা ক্ষুর কিন্তু ভয়ানক দরকার কাল সকালে। বাড়ীর কেউ ধার দেবে না? কিম্বা কাছে কোথাও নাপিত পাবো না?"

"পাগল? চাষার বাড়ী যাচ্ছো খেয়াল নেই? আর আর গ্রাম কিম্বা শহর সেখানে কোথায়? Farmhouse."

আমি বল্লুম, "তবে দেখা যাক্ কী হয়।" এই বলে Francis Thomson খুলে বস্‌লুম। এতক্ষণে আমরা ট্রেনে উঠে বসেছি।

বল্লুম, "বেশ মজা, না? কতকটা elopementএর মতো লাগ্‌ছে!"

সে বল্লে, "দূর!"...

দুই

ওয়াটারলু ষ্টেশনে মিসেস্ ফিশারকে ফোন করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দিলে। আগামী ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা করবার ফাঁকে সে বল্লে, "টাকাও তো আনো নি। নাও এই যা দিলুম, কি কিন্‌তে চাও কিনে ফেলো।"

একখানা রাইটিং প্যাড্ কিন্‌লুম, Francis Thomson-এর সাথী।

ট্রেণের খালি কাম্‌রা দেখে উঠলুম। কখন একটি যুবক উঠে পড়েছে। অতএব মামুলী কথাবার্ত্তা। যুবকটি নাম্‌লে দুটি প্রৌঢ়া আরোহণ কর্‌লেন। তাঁরা নাম্‌তে নাম্‌তেই জনকয়েক গ্রাম্য ভদ্রলোক। অবশেষে আমরাই চেঞ্জের জন্যে নাম্‌লুম।

সে বল্লে, "এবার কিছু Francis Thomson প'ড়ে শোনাও।" কিন্তু বই খুল্‌তেই বেরিয়ে পড়লো আমার বাবার ছবি। "দেখি দেখি, এই তোমার বাবা! কতক সাদৃশ্য আছে বটে তোমার সঙ্গে।"

বল্লুম, "কেউ বলে মায়ের মতো দেখ্‌তে। কেউ বলে বাবার মতো। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এক অচেনা মানুষ এসে আমাকে বলে 'আপনি আর আমাদের ওখানে যান না কেন?' জেরা করে জান্‌লুম আমি হচ্ছি আমার মেজ ভাই।"

"আচ্ছা আমার বাবার ছবি তো দেখেছ? আমার ভাইকে দেখে কি মনে হয় তাঁর সঙ্গে তার মেলে? মায়ের সঙ্গেও না।"

"অদ্ভুত।"

"আমাদের দু'জনকে দেখে কেউ ভাব্‌তেই পারে না যে ভাই বোন। অথচ এককালে আমরা সারাক্ষণ একসঙ্গে কাটাতুম। তার নামের আধখানা আর আমার নামের আধখানা জুড়ে লোকে আমাদের দু'জনের নাম দিয়েছিল 'রেড্ রোজ্'।"

আমাদের ট্রেণ এসে পড়্‌লো, বই ও ব্যাগ নিয়ে আমরা যে কাম্‌রাটায় উঠ্‌লুম সেটাতে কে একজন বার্ণার্ড শ'র মতো টেড়ী-ও-দাড়ি ওয়ালা প্রবীণ ব'সে ছিলেন, অন্যান্য লোক ভিড় করে ঢুক্‌ল। কিছুক্ষণ পরে সে বল্লে, "ওই দেখ বক্স হিল্, পাহাড়টা চক্‌খড়ির. যেখানে যেখানে ঘাস উঠে গেছে, চক্ দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি"।

"ওই শোনো একটা কুকু ডাক্‌ছে। শুন্‌তে পাচ্ছ?"

"না।"

"থেমে গেছে।"

ডর্‌কিঙে নেমে আমরা 'বাস্' ধর্‌লুম। তার মনিব্যাগটা এতক্ষণে আমার হয়েছে। উট্‌ন্ হ্যাচের টিকিট। উট্‌ন্ হ্যাচে পৌছতে বিশ মিনিট লাগলো। তখন সাতটা বেজে গেছে, কিন্তু রোদ যেন দুপুর বেলার রোদ। লীথ্ হিলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার পথ ঘন বনের মধ্যে। তার চোখ-কান-ঘ্রাণ উদগ্র আগ্রহে গাছ-পাখী-ফুলের সঙ্গে তন্ময় হ'য়ে গেল। "উড্ পিজ্‌নের ডাক শুন্‌ছো? তোমাদের ভারতবর্ষের কুকু বুঝি অমনি ডাকে?"

"না, ভারতবর্ষের কুকু বলে কু-উ-উ। একটানা মেলোডি। তোমাদের কুকু বলে কু-উ-কু। দুটো নোট্। আর তোমাদের উড্ পিজ্‌ন্ ডাকে অনেকটা আমাদের ঘুঘুর মতো।"

"দেখ দেখ ব্লু-বেল ফুলের ছাওয়া জমীটুকু যেন একখানা গালিচা।"

"জলের ঝর্ ঝর্ শুন্‌ছো?"

"তা আর শুন্‌ছিনে?"

বনের শেষে যেখানে পৌঁছলুম সেটার নাম ফ্রাইডে ষ্ট্রীট, কিন্তু শহর নয়, গ্রাম নয়, জলার ধারে একটা সরাই—নাম "Stephan Langton" ("Stephan Langton কে ছিল গো?" "সত্যি, জানিনে।" "ওঃ মনে পড়েছে। প্রজাদের সর্দ্দার হ'য়ে রাজা Johnএর কাছ থেকে যে ম্যাগ্‌না কার্টা আদায় করেছিল।") দেখা গেল "Stephan Langton" এ ব'সে গাঁয়ের লোক পান করছে।

কাছাকাছি এক জায়গায় ঘাসের ওপর ব'সে আমরা কিছু শুক্‌নো prune খেলুম আর কিছু কিস্‌মিস্। গোটা দুয়েক water fowl ডানা ঝাপ্‌টে জল সরগরম রেখেছিল। তবু যে দু'একটা মাছ সাহস ক'রে মাথা তুল্‌ছিলনা তা নয়। অবশিষ্ট pruneটা তাকে দিয়ে বল্লুম, "জানো তো, শেষের রুটিখানা বা ফলটা যে খায় সে বছরে হাজার পাউণ্ড বা সুন্দর স্বামী যেটা হোক একটা পায়?" সে মিষ্টি হাস্‌ল।

জিনিষ পত্তর হাতে ধ'রে ও ঝুলিয়ে আমরা উঠলুম। অনেক চড়াই ওৎরাইয়ের পরে আমাদের farmhouseএ পৌঁছানো। পথে একদল গ্রাম্য ছেলেমেয়ে টেনিস্ বল দিয়ে ক্রিকেট খেল্‌ছিল।

Formhouseএ যখন পৌঁছলুম তখন সূর্য্য ডোবে। কিন্তু গোধূলির আভায় দিগঙ্গনার মুখ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে, যেন আমার সঙ্গিনীর মুখ।

তিন

দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল। মহিলাটির চলন বলনে চাহনিতে কেমন এক দুঃখের স্থিরতা, যেন বুকের উপরে পাষাণ চেপে রয়েছে। আমার সঙ্গিনী বল্লে, "আমার বন্ধু মিস্ লায়নের আজ এখানে আস্‌বার কথা ছিল। তাঁর অসুখ। তাঁর বদলে আমি এসেছি। আমার এই বন্ধুটিকে একটি ঘর দিতে পারবেন কি?" মহিলাটি ভেবে বল্লেন, "বোধ হয় পার্‌বো।"

মহিলাটি ঘর তৈরি কর্‌তে চ'লে গেলে পর আমি পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম ক'রে বসলুম। বল্লুম, "ঘর পাওয়া গেছে, ভালোই, নইলে পাহাড় ওঠা নামা ক'রে আর কোথাও ঘরের খোঁজে বেরুনো আমার সামর্থ্যে কুলোত না। হাঁ, যেতুম বটে বাড়ী খুঁজ্‌তে যদি একখানা ট্যাক্সি ক'রে আমাকে পাহাড় থেকে নামাতে। কিম্বা একখানা এরোপ্লেন ক'রে।"

"দুঃখের বিষয় দশমাইল না হাঁটলে কোনোখানাই পাওয়া যায় না।"

"অগত্যা তোমাকেই গোলাঘরে শুতে পাঠিয়ে তোমার ঘর আমি দখল কর্‌তুম।"

এবার আমরা হাত মুখ ধুতে গেলুম। মহিলাটি আমাদের জন্যে ডিম রুটির বেশী আর কিছু জোগাড় করতে পার্‌লেন না; সে ডিম খায় না ব'লে মুস্কিলেই পড়্‌তো যদি না কৌটাবন্ধ সার্‌ডিন্‌স্ (মাছ) বাড়ীতে থাক্‌তো। সে বল্লে, "তোমার জন্যে কোকো কর্‌তে বলেছি।" আমি বল্লুম, "খালি দুধই আমার সব চেয়ে পছন্দ।" "তোমাকে না মিসেস্ নরউড্ রোজ রাত্রে কোকো খাইয়ে ঘুম পাড়াতো?" "ও বদ্ অভ্যাসটা মিসেস্ ফিশার ছাড়িয়েছে। এবার খালি দুধ ধরেছি।" "তাই ভালো—farmhouseএ খাঁটি দুধ পাবে, আর তাজা।" সত্যিই দুধটা ছিল সুন্দর। কিন্তু সে দুধ খায় না।

সাপারের শেষে সে বল্লে, "তুমি বড় কম খাও।" আমি বল্লুম, "তুমিই কোন বেশী খাও?" "আমি রাত্রে বেশী খাইনে বটে।" "সকালেও বেশী খাওনা, জানি। দুপুরেও বেশী খাওনা, জানি। চা তো একরকম খাওই না। কখন বেশী খাও?" সে মিষ্টি হাস্‌ল।

সাপারের শেষে খানিকটা বাইরে বেড়ানো গেল। আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে দেখে সে বল্লে, "তবে উপরেই যাওয়া যাক আমার ঘরে।" তার ঘর থেকে পশ্চিম আকাশের তখনো কিছু আভা দেখা যাচ্ছিল। যত দূর চোখ যায় গাছ-পালা। Farmhouseএর মাঠে একটা ঘোড়া চর্‌তে চর্‌তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ঘুমের ঘোরে। কুকু তখনো ডাক্‌ছিল—সে বল্লে দুটো কুকু, আমি বল্লুম একটা।

ব্ল্যাক্‌বার্ডের গলায় শ্রান্তির সুর। বাতাস বয়ে আন্‌ছিল গর্‌সের সুগন্ধ। ঘোড়াটা বস্‌ল। তার পরে গড়াগড়ি দিতে দিতে মড়ার মতো শুলো। আমরা এই উপলক্ষে কিছু পশুতত্ত্ব আলোচনা কর্‌লুম। একটা ব্যাঙ ডাক্‌ছিল কতদূরে। একটা ঝিঁঝি পোকা কিছু কাছে।

অন্ধকার যখন সবাইকে ঘুম পাড়ালো তখন সে বল্লে, "এবার তোমার ঘুমোবার সময় হয়েছে।"

আমি ঠিক্ ক'রে ফেল্লুম আর মায়া বাড়াবো না। এই পর্যান্ত আমরা আমরা—এর পর থেকে সে সে, আমি আমি। বোধ করি একটু ক্ষিপ্রগতিতে তার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলুম। তাকে কোনো কিছুর অবকাশ না দিয়েই বল্লুম, গুড্ নাইট্।

সে প্রায় ছুটে এলো, এসে আমার মাথাটিকে দুই হাতে ধরে দুটি গালে দুটিবার চুমু খেলো। আমি কৃতজ্ঞতার ভারে তার বাহুতে ভেঙে পড়্‌লুম। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বল্লুম, "আজ সারা সকাল-দুপুর কী ভেবেছি জানো?" "কী ভেবেছ?" "ভেবেছি আজ তাকে যদি না দেখি তবে বাচবো না। দু'টি দিন দেখিনি—মনে হচ্ছিল দু'টি বছর।" সে চুপ করে রইল। বল্লুম, "কোনো প্রার্থনা নিষ্ফল হয় না, এক মনে ডাক্‌লেই সাড়া মেলে।"

বিদায় নিতেই হলো। তবু মনটা ভ'রে রইল। গাছ পাখী ফুল থেকে তার মন প্রাণ ফিরিয়ে এনে সে আমার গালে ধ'রে দিল। আমার ঘরে যখন গেলুম তখন খোলা জানালা দিয়ে গর্‌সের সুবাস এসে আমার বিছানায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়লুম। তন্দ্রার শেষের দিকে বোধ হচ্ছিল কত কাছাকাছি আমরা এসেছি, মাঝখানকার দেয়ালটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে আমরা একই ঘরে পাশাপাশি শয্যায়।

চার

সকালে উঠে প্রথম ভাবনা, দাঁত মাজি কেমন ক'রে? মুখ ধোবার জায়গায় যে সাবানখানা ছিল তাই দিয়ে কাজ চালানো গেল। চুল আঁচড়াই কেমন ক'রে? মোম বাতির সঙ্গে যে দেশলাইটা ছিল তার গোটা পাঁচেক কাঠি মিলিয়ে চিরুণীর মতো করলুম। কিন্তু দাড়ি কামাবার উপায় কিছুতেই খুঁজে পাইনে। সসঙ্কোচে নীচে নামলুম।

পোড়ো জমিটাতে দু'তিন ডজন মুরগীর ছানা কিলবিল ক'রে চ'রে বেড়াচ্ছিল। যিনি যত সদ্য ডিম থেকে বেরিয়েছেন তাঁরই ব্যস্ততা তত বেশী। ঘোড়াটা অনেকক্ষণ উঠেছে। পাখীরা এতক্ষণ অর্দ্ধেক কাজ বা অকাজ করে রেখেছে, ন'টা বাজে। তারা উঠেছে চারটের আগে—গোধূলির সঙ্গে।

রোজালি নীচে নেমেই বল্লে, "তোমাকে একটা নতুন পাখীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো—"Yellow Hammer.""

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন ঘুমুলে?"

"একেবারেই ঘুমুতে পারিনি। নতুন জায়গা ব'লেই বোধ হয় কেমন কেমন লাগ্‌লো। এ বাড়ীতে একটি খোকা আছে দেখেছ?"

"না। পুরুষ মানুষ এক আমি ছাড়া আর কেউ আছে বলে তো মনে হয়নি।"

কালকের সেই মহিলাটি আমাদের ব্রেকফাস্ট্ দিয়ে গেলেন। পাফ্‌ড্ রাইস্ যা ছিল সে একজনের মতো। বল্লুম, "তুমি যখন ডিম খাবে না এবং বেকন যখন দু'জনেই খাবো তখন ওটা তোমারই ভাগে পড়ে। তা ছাড়া অমন নরম মুড়ি ভারতবর্ষের লোকের মুখে রোচে না, আমাদের মুড়ি মুড়্ মুড়্ করে।"

সে আমাকে চা ঢেলে দিলে, আমি তাকে রুটি কেটে দিলুম। জোর ক'রে একটু বেশী বেকন দিতে গেলুম। উল্টো আমারি পাতে ফেলে দিলে। বল্লুম, "বেকন আমার ভালো লাগে না।" "ওঃ! জান্‌তুম না। আরেক পেয়ালা চা?" "না। তুমিই নাও।" সে আরো দু'পেয়ালা ক্রমান্বয়ে নিলে। "একটা কমলালেবু খাবে? চমৎকার কমলালেবু এগুলি।" "না, ফল আমি আলাদা খেতে ভালোবাসি, রাত দশটায়।" অগত্যা আমিই খেলুম একলা।

ব্রেকফাস্টের পরে তার ঘরে যাওয়া গেল ব্যাগ নিয়ে বহিরে যাবার জন্যে।

আচমকা আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কোথা থেকে একখানা চিরুণী বার ক'রে আঁচড়াতে সুরু ক'রে দিলে। "দেখ দেখি কেমন সুন্দর দেখায় তোমাকে, ক্রীম না মাখলে। কেন ক্রীম মাখো ?" বল্লুম, "ক্রীম না মাখলে চুল ওড়ে। তোমার চুলের মতো শক্ত চুল তো নয় আমার, সিংহের কেশর তো নয়।" তার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। "আচ্ছা, আরেকটু লম্বা চুল রাখো না কেন ?" "বব্ করতে বল্‌ছো ?" "জানিনে বব্ করা কাকে বলে। আমি ভেবেছিলুম এই বব্।" "না, এ হলো শিংল্। ঘাড়ের দিকটা আরেকটু লম্বা হ'লে বব্।"

ভেবে বল্লুম, "না, এই ভালো। শিংল্ ছাড়া আর কিছুতে তোমাকে মানাবে না, অর্থাৎ আর কিছুতে তোমার character ব্যক্ত হবে না।"

"তা নয়। আমার চুল কোনো মতেই বাগ মান্‌বে না, লোহার সিকের মতো সোজা ও খাড়া রইবে, সেইজন্যই বাধ্য হ'য়ে এমন করা।

গোয়াল ঘর দেখ্‌তে গেলুম। গোটা পাঁচেক পুষ্টকায় গোরু। একটা নাদুস্ নুদুস্ শুয়োর। একটি ছেলে যন্ত্র চালিয়ে টার্‌নিপ্ কুচি কুচি করছিল। আমার মনে পড়লো আমার ভাইও চাষা, তারও এমনি ছোক্‌রা আছে। কিছুক্ষণ ধ'রে আমার ভাইয়ের গল্প চল্‌ল। আমি বল্লুম, "তুমি যে বল্লে যারা চাষ করে তারা আর কিছু করবার সময় পায় না এটা ভুল। আমার ভাই একজন ভালো বাজিয়ে। আর সাহিত্যও যে সে বেশ বোঝে তার এক নমুনা পেয়েছিলুম যেদিন রবি বাবুর একখানা যৌবনে-লেখা গল্পের বই প'ড়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বল্লে, 'এমন লোককেও লোকে এক কালে অখ্যাতি দিয়েছিল! শ্রেষ্ঠ লেখক ব'লে চিন্‌তে দ্বিধা করেছিল!' অথচ ইস্কুলে সে সামান্যই পড়েছে, বাড়ীতে সামান্যই পড়বার সময় পায়। নিজের হাতে ধান বোনে ফসল কাটে, দূর দেশে বিক্রী করতে নিয়ে যায় নদীতে নিজের হাতে নৌকা বেয়ে। এমনি কত কাজ।"

অনেক বেড়া টপ্‌কে মাঠ পেরিয়ে ঝরা পাতা মাড়িয়ে আমরা বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। শহর থেকে week end কাটাতে এসে কারা সব মাঠের কোণে caravanএ বাস করছে, গাড়ীর ভিতরেই তাদের শোবার ঘর রাঁধ্‌বার ঘর খাবার ঘর, কিন্তু দিন ভালো থাক্‌লে তারা বাইরে টেবিল পেতে খায়, খেলা করে। আমি বল্লুম, "caravan-এই যদি থাকতে হয় তবে gypsyদের মতো সমস্ত ইংলণ্ড ঘুরে বেড়ানো উচিত, যেমন সেদিন Sinclair Lewis বেড়িয়েছিলেন।" সে বল্লে, "এরাও ঘুরে বেড়াবে বটে, কিন্তু এক বছরে সবটা নয়, প্রতি বছর একটা ক'রে জায়গা। আগামী বছর এদের caravan আর এখানে থাক্‌বে না।"

আমরা বনের ভিতরে এক জায়গায় ব'সে পড়্‌লুম, বস্‌তে বস্‌তে অর্দ্ধশয়ান। পাইন গাছের তলায়। তার মানে ছায়া যার সামান্যই, রোদ যার ভিতর দিয়ে পড়ে এমন গাছের তলায়। ঘাসের উপরে নয়, পাইনের ছুঁচের উপরে বস্‌তে তার ভালো লাগে। বল্লে, "Francis Thomson প'ড়ে শোনাও"। আমি বল্লুম, "তোমার গলার সুর মিষ্টি, তুমিই পড়ো। আমি বেছে দিই। 'Hound of Heaven'।" সে বল্লে, "বিষম বড়। ছোট নেই ?" আমি বল্লুম, "আচ্ছা, 'Daisy'."

সে পড়ে চল্ল। যখন শেষ করলে তখন আমি বল্লুম, "গোটা কয়েক লাইন ভারি সুন্দর। না ? ঐ যেখানে বল্‌ছেন "the rose's scent is bitterness to him that loved the rose," আর "we are born in others' pain and perish in our own." "

"কাছেই Francis Thomson শেষ বয়সে থাক্‌তেন। Meynellরা তাঁকে যত্নে রেখেছিলেন। বেচারার প্রথম বয়স কিন্তু বড় কষ্টে কেটেছিল—লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতেন, রাত্রে নদীর বাঁধের উপর প'ড়ে ঘুমোতেন, কিন্তু সব অবস্থাতেই কবিতা লিখ্‌তেন।"

"তবু ভাগ্য ভালো, বেঁচে থাক্‌তেই যশ পেলেন। এখন তো যশ বাড়্‌তেই লেগেছে। যেখানে যাও সেখানে Francis Thomsonএর সুখ্যাতি।"

"বড় unpractical মানুষ ছিলেন। ভোলা মন। কখন কি পরতেন কখন কি করতেন—একেবারে ছেলেমানুষ।"

"ওটা কবিপ্রকৃতি। ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল শেকস্‌পীয়ার বা ভিক্টর হুগোর মতো মহাকবিদের বেলা। ওঁদের ব্যবসায়-বুদ্ধিটা ছিল কবিপ্রকৃতির মতোই জোরালো।"

"এবার দেখ ক'টা বেজেছে। উঠ্‌তে হবে।"

সাড়ে এগারোটা। ওঠা গেল। চল্‌তে চল্‌তে কত কথা। কেমন ক'রে তার ভাইয়ের কথা উঠ্‌লো। রেড্‌মণ্ডকে দেখে মনে হয় খুব মিশুক লোক। কিন্তু তার মনের নাগাল পাওয়া যায় না, বড় নিঃসঙ্গ। কত মেয়ের সঙ্গে মেশে, কিন্তু সবাই তাকে ভাইয়ের মতো দেখে। বিয়ে কর্‌বার কথা উঠ্‌তেই পারে না। আমি বল্লুম, "এবার cargo boat ছেড়ে passenger steamerএ বেড়াতে বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব হবে, এইবার বিয়ে কর্‌বে ঠিক্।" রোজালী হেসে উঠ্‌লো। "আমারও তাই মনে হয়।"

পাঁচ

একটা টাওয়ার। সেকালে যারা মাশুল এড়িয়ে জাহাজের জিনিষ বাজারে চালান দিত তাদেরি গড়া কিম্বা তাদের ধর্‌বার জন্যে গড়া। গোটা কয়েক কমলালেবু কিন্‌তে পেয়ে কিন্‌লুম। মাটিতে ব'সে বহুদূরস্থিত সমুদ্রের দিকে তাকালুম। সে বল্লে, "সমুদ্র ত্রিশ মাইল দূরে।" আমি বল্লুম, "অত না।"

প্রথম লেবুটা প্রায় পচা। সে বল্লে, "আরো একটা খাও।" তাকে আরেকটা খেতে বলায় কিছুতেই খেলে না। তখন সেটাকে বিতরণ কর্‌বার জন্যে তুলে রাখ্‌লুম।

সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কবি ট্রিভেলিয়ানের নাম জানো নিশ্চয়। সেই যিনি গ্রীসের বিষয়ে লেখেন। তাঁর বংশের সবাই ডিপ্লোমাট্ বা পলিটিসিয়ান। তিনি কিন্তু দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। কেবল কবি নন্, গ্রীসের কবি। বিয়ে করেছেন এক ডাচ্ চিত্রকরকে। সুখী দম্পতী। এই পাহাড়ের তলাতেই তাঁদের বাড়ী।"

রবিবার। লণ্ডন থেকে বহু লোক বেড়াতে এসেছে। গাছতলায় ব'সে একদল স্ত্রীপুরুষ বনভোজন করছে। দূরবীণ চোখে দিয়ে কেউ কেউ সমুদ্র দেখ্‌ছে। কেবল যে মেয়েটি চকোলেট ও কমলালেবু বিক্রী কর্‌ছিল তারই ছুটী নেই।

বনের খানিকটা কাটা গেছে—জার্ম্মান যুদ্ধে বন্দীদের দিয়ে। যুদ্ধের সময় নরওয়ে থেকে কাঠ আসা বন্ধ ছিল ব'লে বনের সৌন্দর্য্য হ্রাস। রোজালী করুণ নয়নে চেয়ে রইল, যেন বনের ব্যথা তারও ব্যথা।

কারা সব বনভোজন ক'রে রাবিশ ছড়িয়ে গেছে দেখে তার যে রাগ! কেন ওরা নিজেদের রাবিশ নিজেরা বাড়ী নিয়ে যায় না, কিম্বা এইখানে পুঁতে রেখে যায় না। ওদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

দু'জন মেয়েকে দেখে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন উঠ্‌লো। বল্লুম, "Keyserling ইংরেজ মেয়েদের সম্বন্ধে যা বলেছে তা মানো?" "ঠিক্ মানিনে। 'Old girl' ও 'sport' বল্লে নারীত্ব যে কিছু কমে এমন মনে করবো কেন? অথচ অমন বলাটাও পছন্দ করিনে। ঠিক বুঝতে পার্‌ছিনে সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি।"

আমি বল্লুম, "ব্যাপারটা এই যে নারীর charm পুরুষকে যাবতীয় প্রেরণা দেয়। অথচ charmএর চর্চ্চা ইংলণ্ড থেকে উঠে গেছে। পুরুষ যখন নারীকে প্রশংসা ক'রে বলে 'she is a good sport', তখন পুরুষ এই কথা বল্‌তে চায় যে 'ওটি একটি আস্ত পুরুষ।' অর্থাৎ 'আমাদেরি একজন।'—বুঝ্‌লে না?—পুরুষের আদর্শ স্ত্রীতে দেখ্‌লে তাকে পুরুষ ব'লেই মনে হয়, এবং তার ফলে তার মধ্যে charm খুঁজে পাওয়া যায় না।"

সে বল্লে, "তা ব'লে পুরুষের মনোমতো হবার জন্যে যে সব উপদেশ মা-ঠাকুমারা সেকালে দিতেন সে সব মান্‌তে গেলে স্ত্রীর আত্মসম্মান থাকে না। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ক'রে উপায় নেই।"

আমি বল্লুম, "charmকে তুমি অত ছোট অর্থে নিচ্ছ কেন? Charm এমন জিনিষ যার সংজ্ঞা হয় না, শিক্ষা হয় না। প্রতি নারীর পক্ষে ওটা একটা নিজস্ব উদ্ভাবন, ওর প্রক্রিয়া শেখাও যায় না, শেখানোও যায় না, এমনি ওর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ওর উদ্ভাবিকা

জেই অজ্ঞ। এক কথায় ওটা প্রতি নারীর ব্যক্তিত্বরই মিল, অতএব ওতে আত্মসম্মান হানির তো কোন কারণ খ্‌ছিনে।"

সে চুপ করে রইল। আমি একটু ভেবে বল্লুম, "খুব ব তোমাকে আঘাত করছে এই ধারণাটা যে charm চ্ছ বিবাহের বরপণ, স্বামী-সোহাগিনী হবার মাদুলী-বচ। স্বামী নামক একজন বিশেষ পুরুষের জন্যে সমস্ত ক্তিত্বটা উৎসর্গ কর্‌তেই হবে, নারীর এছাড়া আর গতি ই, এই ধারণাটাই বোধ হয় তোমাকে charm সম্বন্ধে বিচার করাচ্ছে।"

সে জিজ্ঞাসু নয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে পথ চল্‌তে গল্‌। সৈনিকের মতো তার বড় বড় পদক্ষেপ ঈষৎ মন্থর য়ে এলো। আমি তার বাম বাহু দক্ষিণ বাহুতে জড়ালুম।

আমি বল্লুম, "দেখ, বিবাহটা মানুষের ইতিহাসে হাজার বছরেরই বা সৃষ্টি। ভবিষ্যতে ওর প্রয়োজনই কবে না। কিন্তু charm ততদিনের যতদিনের চন্দ্র র্য্য। যখন মানুষ হয় নি, যখন মানুষ থাকবে না, তখনো পুরুষ থাক্‌বে, অর্থাৎ নারীত্ব আর পৌরুষ থাক্‌বে এবং ই সঙ্গে নারীত্বের charm ও পৌরুষের নব নব উন্মেষ-লিনী বুদ্ধি।"

আমরা পথ হারিয়েছিলুম। বাঁকা পথে ঘুরে ফিরে ক জায়গায় দেখি কতগুলি ছেলে মেয়ে গাছে চড়েছে ও ছের নীচে খেলা কর্‌ছে। আমার হাতের সেই কমলা বুটাকে বিতরণ কর্‌বার সময় এল। তিনটি খুকীর মনে গিয়ে বল্লুম, "কাকে এই কমলালেবুটা দিই বল গা?" একটি খুকী একটুও দ্বিধা না ক'রে বল্লে আমাকে"। তাকেই দিলুম। রোজালী তাকে অনুরোধ র্‌লে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে। মজা এই যে কীর দাঁত বল্‌তে ওটি চার পাঁচ, তবু তার দাবী বল্‌তে টা কমলালেবুটা।

খোকাদের কাছ থেকে পথের সন্ধান জোগাড় করে বার সেই caravan ওয়ালাদের মাঠ বেয়ে বাসায় ফেরা ল। ছুটো ঘোড়াকে ছুটি খুকী কি যেন খাওয়াচ্ছিল, ঘাড়াছুটি অখণ্ড মনোযোগ সহকারে খাচ্ছিল।

আমরা ফির্‌তেই গৃহকর্ত্রী ডিনার দিয়ে গেলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ যাবৎ আমরা আরম্ভ কর্‌তে পার্‌লুম না।

ছয়

রোষ্ট্‌ বীফ্‌, ভাজা আলু, সিদ্ধ শাক। ডিম-কাষ্টার্ড, গুজ্‌বেরী, রুবার্ব। সে খুব আস্তে আস্তে খায়, বক্‌বক্‌ করবার অবসর আমারই বেশী।

আমি বল্লুম, "Rebecca West এক বক্তৃতায় বলে-ছিলেন 'মেয়েরা বড় বেশী ব্যক্তিবিশেষ হয়ে উঠ্‌ছে, এটা কাম্য নয়।' কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষরাও যখন অত্যন্ত বেশী ব্যক্তিবিশেষ হয়ে উঠ্‌ছে মেয়েরাও না হয়ে পারে না। ভাইয়ের পক্ষে এক নিয়ম ও বোনের পক্ষে আরেক নিয়ম খাটে না। এইজন্যে খাটে না যে ওরা একই মালমশলা দিয়ে তৈরি। বোনের মধ্যেও খানিকটা পুরুষ আছে, ভাইয়ের মধ্যে খানিকটা নারী।"

সে হেসে বল্লে, "তাই বোধ হয় কেউ কেউ বলে থাকে রেড্‌মণ্ড যদি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হতো আর রোজালিণ্ড্‌ হতো মেয়ে না হয়ে পুরুষ তবেই তাদের ঠিক্‌ মানাতো।"

আমিও হেসে বল্লুম, "প্রকৃতি তো এগারো ঘণ্টা ধরে সেই চেষ্টাই করে এসেছিল, এগারোটার সময় হঠাৎ তার হাত বেঁকে গেলো, সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো। তোমার উপরে ভুল ক'রে খানিকটা নারীত্বের আরক ঢেলে দিয়ে দেখে, সর্ব্বনাশ! এক পুরুষালী মেয়ে!"

"আচ্ছা, তুমি কি সত্যই মনে করো যে স্ত্রী হয়ে বা পুরুষ হয়ে জন্মানোটা একটা accident, এর পেছনে বিধাতার অভিপ্রায় বা নিজের মনস্কামনা নেই?"

এক্‌শোবার আছে। আমি ঠাট্টা কর্‌ছিলুম। না, নিছক ঠাট্টাও নয়। আসল কথা আমাদের মধ্যে যেটি ব্যক্তি সেইটিই গভীরতর। যেটি স্ত্রী বা পুরুষ সেটি ভাসা ভাসা। আমি যে আমি এইটে আমার চরম পরিচয়। আমি যে পুরুষ এটা আমার গুণ। যেন একটা ডিগ্রী কিম্বা খেতাব।"

মুখের গ্রাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে সে যেন বিজয়িনীর মতো বল্লে, "এবার তুমি নিজের কথার নিজে প্রতিবাদ

করেছ। একটু আগেই কি বলোনি যে মেয়েরা charmএর চর্চ্চা করছে না ব'লে জগতের কি রকম এসে যাচ্ছে, আবার এখন বল্‌ছ মেয়েরা ও পুরুষরা ওপরে ওপরে মেয়ে পুরুষ, ভিতরে তারা ব্যক্তি ব্যক্তি।”

“দুটোই সত্য। আমি তো আর নির্গুণ ব্যক্তি নই, গুণবান ব্যক্তি, আমার গুণ আমার পৌরুষ। তেমনি তোমার গুণ তোমার নারীত্ব। কথা হচ্ছে আমাদের এই বাইয়োলজিকল পৌরুষ ও নারীত্ব—যার নিদর্শন আমার দাড়ী ও তোমার দাড়ীর অভাব—এতে কোথাই বা charm কোথায়ই বা প্রতিভা। আমাদের যুগে এগুলোর চর্চ্চা কমে আস্‌ছে বলেই আশঙ্কা।”

সে এবার আরেকটু রুবার্বের রস ঢেলে নিলে। যত বল্লুম আরেকটু কাষ্টার্ড খাও, খেলে না। ছ'ঘণ্টা পরে জান্‌লুম, আমার কথা না রেখে আমাকে বাঁচিয়েছে। কাষ্টার্ডের ডিম তার মাথাব্যথার কারণ।

খাওয়া শেষ হলে সে বল্লে, “আমি যাচ্ছি একটু রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমোবো, কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।” এই ব'লে একটা বালিশ চেয়ে আন্‌লে। যেখানে গর্সের কাঁটা প'ড়ে ঘাস থেকে নরম-স্ব চলে গেছে, যেখানে মাটি আবড়া খাবড়াও অগাছা পরগাছা গায় ও পায় খোঁচার মতো বিঁধ্‌ছে, সেই খানেই তার শোবার ইচ্ছে। কিন্তু আমি অমন জায়গার ত্রিসীমানায় বস্‌তে পার্‌বো না, তাই অনেক ঘুরে তার ও আমার উভয়ের রুচি মিলিয়ে অনেক কষ্টে এক আধেক-কাঁটাবন ও আধেক-নরম জমী আবিষ্কার করা গেল।

আমার রাইটিং প্যাড্ খানাকে উল্টেপাল্টে দেখ্‌লে। দেখে বল্লে “একটাও কবিতা লেখোনি যে। এই বেলা লেখো ব'সে।” এই ব'লে বালিশ পেতে মাথা রাখ্‌লে, ভাব্‌লুম সে আর কথা বল্‌বে না, ঘুমিয়ে পড়্‌বে, কিন্তু কেমন করে কি জানি তর্ক উঠলো আমাদের ইহকালের অভিজ্ঞতাগুলো আমরা পরকালে নিয়ে যাবো কি না। আমি বল্লুম, “কখনো না। অভিজ্ঞতার বোঝা বয়ে নিয়ে গেলে সেই বোঝার ভারে নুয়ে পড়্‌বো, নতুন অভিজ্ঞতা কুড়োবো কেমন করে?” সে বল্লে, “বাঃ রে। এত কষ্ট করে যা-কিছু শিখ্‌লুম কিছুই যদি সঙ্গে নিলুম না তবে শিখ্‌লুম কেন?” আমি বল্লুম, “শিখ্‌লুম শেখাবার জন্যে, নিলুম দেবার জন্যে। জন্মের পরে যা-কিছু হয়েছে মরণের আগে সব হওয়াটি জগৎকে ধ'রে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা খালাস। দেহ বলো, মন বলো, স্মৃতি বলো, শিক্ষা বলো, ইহকালের কোনো ধারই পরকালে ধারবো না।” সে ভীষণ অবাক হয়ে রইল। তার চিরন্তন হাসি মুখ থেকে হাসি নিব্‌লো না বটে, তার চিরন্তন শিশু চোখ রহস্যের পাতালপুরীতে মুক্তা খুঁজতে নেমে গেল। “কী ভাবছো?” “ভাবছি তুমি যা বল্লে তা কি সত্যি?” “কেন সত্যি নয়? মনুষ্যত্বের বোঝা বয়ে কাঁহাতক আমরা অনন্তকাল চল্‌বো? এখনো কত হওয়াই বাকী। ফুল হতে হবে, গর্স্ ডেজী বাটারকাপ্, গাছ হতে হবে, বীচ বার্চ এল্ম্, তারা হতে হবে সূর্য্য হতে হবে কত কী হতে হবে কে জানে, জান্‌বার জন্যেই তো মরা দরকার। মানুষ হওয়াটাই যে শেষ হওয়া বা সেরা হওয়া এ কুসংস্কারটা তোমারো আছে নাকি?”

এবার সে চোখ বুঁজে বল্লে, “থামো। ঘুমোতে দাও। কাব্য লেখো।”

সাত

কাব্য লেখবার ইচ্ছা আমার আদপেই ছিল না। কাব্য ভোগ কর্‌বার এই যে সুযোগ একে আমি যেতে দেবো না আজ। তার মুদিত মুখখানির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলুম। কোনো ভাস্কর যেন সাদা পাথর কুঁদে গড়েছে। নিটোল, সুষম, শক্ত। চোখ দুটি পদ্মকোরকের মতো। বড় নম্র, বড় নিরীহ। তার চরিত্রের দৃঢ়তা তবে কি দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়? ওষ্ঠ দিয়ে। শোবার আগে সে পা থেকে জুতো ও মোজা খুলে ফেলেছিল। তার খালি পা দেখে মনে হচ্ছিল তার ঐ অঙ্গুলি যেন সব থেকে কচি।

তার ঘুম আসেনি, বুঝতে পার্‌ছিলুম। আবেদন জানালুম, “আমারও ঘুম পাচ্ছে।” সে বল্লে, “তবে জুতো খুলে ফেল তুমিও।” আমার মাথার জন্যেই ভাবনা, জুতোর

জন্যে নয়, একথাটা তন্দ্রাময়ীকে বুঝিয়ে বল্লুম। তখন বালিশের আধখানা ছেড়ে দিলে।

সে বোধ হয় মিনিট দশেক ঘুমোতে পারলে। আমার ঘুম এলো না। মুক্ত আকাশ, মেঘহীন, দীপ্ত নীল। বাতাসে ফুলের গন্ধ। চোখ মেল্‌লে কত শত যোজন দেখা যায়। ঘুমোতে আমার মায়া করছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছিল তার চোখের উপর চোখ রেখে দেখি সে কি সত্যি ঘুমিয়েছে? তার ঘুমন্ত শ্রী দেখতে দেখতে আমার এই কথাটি মনে হচ্ছিল যে সে সমস্ত সত্তার সঙ্গে ঘুমোয় না—সে ঘুমোয়, কিন্তু তার ওষ্ঠে তেমনি মৃদু হাসি জেগে থাকে।

আবছায়ার মতো মনে হচ্ছিল আমি তার কত কাছে এসেছি। এক বালিশে মাথা রেখে মুখের কাছে মুখ আনা। সে যদি আমারি মতো মানুষ হয়ে থাক্‌তো তবে বিপদ্ ঘটতো। কিন্তু সে মিরাণ্ডা, সে প্রকৃতি-সরল।

কেমন করে সে বুঝতে পার্‌লে আমার ঘুম আস্‌ছে না, তাই তারও আর ঘুম এলো না, বোধ হয় তার অস্বস্তি বোধ হলো। কখন দেখি বালিশের উপর দুটি হাত রেখে হাতের উপরে মুখ রেখে আমাকে দেখ্‌ছে। বল্লে, "তোমার চুলগুলি যদি এইরকম থাকে তো আমার দেখ্‌তে ভালো লাগে।" আমি খুসী হয়ে বল্লুম, "যে আজ্ঞে। ক্রীম কিন্‌তে আমার যে খরচ সেটা তা'হলে বাঁচবে।"

আমিও হাতের উপর মুখ রেখে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। বল্লুম, "আচ্ছা, তোমার চুল যদি সাদা হয়ে যায় তবে তুমি কি করো?" "কিছুই কর্‌বো না। কলপ মাখবো ভাবছো? কখনো না।" সে যে অমন উত্তর দেবে আমি অনুমান করেছিলুম। কোনোরকম মিথ্যার সে শরণ নেবে না, আগাগোড়া সত্য দিয়ে সে তৈরি। অধিকাংশ ইংরেজ জার্ম্মাণ মেয়ের মতো তারও গোটা কয়েক দাঁত তুলে দিতে হয়েছে—কিন্তু false teeth সে ব্যবহার কর্‌বার পাত্রীই নয়। রং মাখা তার কল্পনার বাইরে।

সে বল্লে, "কলপ মাখা অনেক সময় দরকার হয়ে পড়ে কেমন করে তা তোমাকে বল্‌ছি। আমার এক জাঠতুতো বোন ফ্লোরেন্স্। থাকে হাঙ্গেরীর এক কোণে—এখন সেটা রুমানিয়ার দখলে। ভারি আশ্চর্য্য মেয়ে সে। হাঙ্গেরীর জমীদারের ছেলেরা তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে পাগল। তবু বিয়ে সে কর্‌বেই না।"

"কেন?"

"কারণ ওরা মানুষ নয়—অসচ্চরিত্র।"

"এরিষ্টক্রাট্ হলেই অসচ্চরিত্র হয়ে থাকে, না হওয়াটাই আশ্চর্য্য।"

আমার কথাটা সে পছন্দ কর্‌লে না। বল্লে—"যাক্। ফ্লোরেন্স্ তাদের সঙ্গে রাত করে বেড়ায়, কোনোরকম বাঁধা-বাঁধি মানে না, স্ফূর্ত্তি করেই খুবই। কিন্তু তাদের কোনো রকম সাহায্য নেয় না। থাকে একলা একটা রুমে। ছেলে পড়িয়ে খায়। কতবার কত লোককে তার সব সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে ফতুর হয়ে গেল। কিন্তু উৎসাহ তার অদ্ভুত—আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করে।

"সেই শহরে আরেকটি ইংরেজ মহিলা ছিলেন, তিনিও ছেলে পড়ান। তাঁর স্বামী হাঙ্গেরিয়ান, মাতাল এবং দুশ্চরিত্র। বড় ছেলেটি ফ্লোরেন্সের প্রেমে পড়ে যায়, বলে বিয়ে করো। ফ্লোরেন্স্ রাজী হয় না। কিন্তু ছেলেরা যখন মা'কে উদ্ধার ক'রে ক্যানাডা নিয়ে যায় তখন তাদের টাকার অভাব দেখে ফ্লোরেন্স্ শুধু যে সবকিছু দিয়ে দেয় তা নয়, নিজে তাদের সঙ্গে যায় তাদের স্থায়ী করে দিতে। কিন্তু বিষম অসুখে পড়ে সেখানে। তখন সবাই মিলে তার উপরে অত্যাচার করে—কেবল ছোট ছেলেটি ছাড়া। দীর্ঘকাল ভুগে সে ইংলণ্ডে চ'লে আসে। কিন্তু তার এক অত্যন্ত স্নেহময়ী বোন ছাড়া কেউ তার মুখ দেখ্‌তে চায় না। উঁচু ঘরের মেয়ে, কোথায় respectable বর বিয়ে করে respectable জীবন কাটাতো, না কোথায় সুদূর হাঙ্গেরীর বোহেমিয়ান মহলে ছেলে পড়িয়ে একলা থাকে। আত্মীয়াদের মধ্যে এক আমি তার সঙ্গে মিশি, তার সঙ্গে খালি পায় বেড়াই, তার সঙ্গে অট্টহাসি হাসি। তার আপন বোনেরা পর্য্যন্ত ঘেন্নায় তার কাছে আস্‌তো না, এমন অবস্থা।

"ফ্লোরেন্স্ কাউকে গ্রাহ্যই কর্‌তো না। কিন্তু কপর্দ্দকশূন্য কেমন করে আবার সে তার সেই শহরটিতে ফিরে যায়। গিয়ে দেখে সেটা এখন রুমানিয়ার অধীন।

রুমানিয়ানরা আরো এক-কাঠি সরেশ। কাজেই শহরটার নৈতিক আবহাওয়া শ'তিনেক বছর পেছিয়ে গেছে। ফ্রারেন্স্ গিয়ে দেখে তার রুম, তার ফার্ণিচার, সমস্ত দখল ক'রে বসেছে এক রুমানিয়ান সৈনিক। তাকে নড়্তে বল্লে সে নড়ে না। পুলিশে খবর দিয়েও ফল হলো না। অনেক আবেদন নিবেদনের পরে বন্ধুদের চেষ্টায় তার সম্পত্তি সে ফিরে পায়। আবার ছেলে পড়ানো আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। শহরে সবাই তাকে চেনে ও শ্রদ্ধা করে। সুন্দরী যদিও নয়—বিদুষীও নয়—তবু কী আছে তার মধ্যে যা সবাইকে কাছে টানে।"

আমি বল্লুম, ঐটেই হচ্ছে charm ; সে যে সকলের সঙ্গে মাখামাখি ক'রেও সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, এই হচ্ছে তার charm এর চাবী।"

চায়ের সময় হ'লো দেখে আমরা উঠ্লুম। "আচ্ছা ফ্লোরেন্সের কথা পাড়লে কেন? সে কি কলপ মাথে?" "না মাথ্লে ছাত্র জোটে না।"

আট

সে কিছু scone-এর গায় মাখন মাখিয়ে খেলে, আমি গোটা দু'এক কেক্। ক্ষিধে ছিল না। আট্টার সময় লণ্ডনে ফির্বো টাইম-টেব্ল্ দেখে ঠিক করা গেল। সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়া যাবে গৃহকর্ত্রীকে ব'লে। ওর্কিঙ্গে ট্রেন ধ'রে ট্রেনে সাপার খাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি ওপরে গিয়েছিলুম, নীচে এসে দেখি অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে মনি-ব্যাগটা পড়ে আছে। মনি-ব্যাগটা সে আমার কাছ থেকে কিছু আগে চেয়ে নিয়েছিল বাসার দাম দিয়ে দেবার জন্যে। মনি-ব্যাগটাকে আমি পকেটে পুর্লুম দুষ্টুমির মৎলবে।

আটটার সময় আমরা রওয়ানা হবো, এই ঠিক্ করে বেড়াতে বের হলুম। লণ্ডন থেকে রবিবার কাটাতে অনেকে এসেছে। কেউ মোটরে, কেউ মোটর সাইকেলে, কা'রা সব পায়ে হেঁটে। এক ঝোঁপের আড়ালে সখের অপেরা অভিনয় চলেছে। একটি বালিকা উঁচু মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে সুর ক'রে কী একটা প্রেমের গান গাইছে তার উত্তরে একটি যুবক নীচের মাটিতে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়াচ্ছে ও গান গাইছে। দলের লোক হাত-তালি দিচ্ছে।

একটি তরুণ পিঠে রুকসাক্ বেঁধে পথ চল্ছে, তার গলায় হাত জড়িয়ে তার সাথী হয়েছে একটি তরুণী।

আমরা অনেক দলের কাছ দিয়ে অনেক ভিতর দিয়ে অনক ঘুরে ফিরে আবার এক কাঁটাবন বেছে অর্দ্ধশয়ান হলুম। আমার আপত্তিটা প্রথমে সে নামঞ্জুর কর্লে, কেননা কাঁটাবনের চেয়ে সুখকর আর কী থাক্তে পারে! পরে যখন বল্লুম, "তোমার মতো আমার পোষাক তো খদ্দর নয়, আমার এটা পাৎলা টুইড্। পোষাক নষ্ট হ'লে তুমি সাত গিনি দেবে?" তখন সে বল্লে, "তবে ওঠো।"

তখন আমি এত হাস্তে লাগলুম যে, কারণ বুঝতে না পেরে সে মহা বিব্রত হয়। "ব্যাপার কি? আমার মধ্যে এমন কি দেখ্লে যেটা হাস্যকর?" "তোমার মধ্যে না-ও হতে পারে।" "তবে আমার জিনিষপত্রের মধ্যে?" "বল্‌বো না। বল্‌তে পারি যদি এক পাউণ্ড দিতে রাজি হও।" "এক পয়সাও না।" "দশ শিলিং?" "এক কাণাকড়িও না।" "আচ্ছা, আধ ক্রাউন দিলেই চল্‌বে।" "না।" "তবে হো হো হো হো..."

আমার হাসির বাণে তার মুখের অবস্থাটা বিষণ্ণ বোধ হলো দেখে আমি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লুম, "তোমার মতো সৃষ্টিছাড়া মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছে? যত রাজ্যের কাঁটাবন বেছে বেছে বসো কেন?" তখন সে যেন একটা কিনারা পেলে। তার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সে বল্লে, "এরপর থেকে তুমি weekend এ এলে মিসেস্ নরউডকে এনো, আমাকে না।" আমি জুড়ে দিলুম —"এবং ট্যাক্সি ক'রে তাকে হাওয়া খাইয়ো এবং সিনেমায় নিয়ে গিয়ে সিগারেট খাইয়ো। এবং মিসেস্ নরউডের স্মার্ট্ পোষাকে ধুলো লাগলে নিজের খরচে ধোলাই কর্তে দিয়ো। না বাবু, তার চেয়ে আমার তুমিই ভালো, তোমার মোটা খদ্দর যেন কাঁটাবনে বস্‌বার জন্যেই তৈরি।"

একবার সে বলেছিল, "আমার সব থেকে কি ভালো লাগে জানো? পাহাড়—পর্ব্বত—পাথর। তার নীচে গাছ-পালা—কাঁটাবন। পশু আমার তেমন ভালো লাগে না, মানুষও না।" আমি বলেছিলুম, "মানুষই আমার সব থেকে ভালো লাগে, তার নীচে পশু পাখী। তোমার রুচির উল্টো আমার রুচি।" এইবার সেই কথা উঠ্‌লো। সে বল্লে, "পাহাড়ের চূড়ায় যখন যাই তখন সে যে কি আনন্দ বোঝাতে পার্‌বো না। এমন একটা sense of space আর কোথাও বোধ করিনে। যেন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে মুক্তি লাভ করেছি।" "আর কাঁটাবনে বসে কি রকম sense বোধ করো?" "প্রাণের রোমাঞ্চন। অহরহ যে প্রাণ সঞ্চারিত পল্লবিত হচ্ছে, কাঁটার খোঁচা যেন তারই সত্যতাকে জাহির কর্‌তে থাকে, ভুল্‌তে দেয় না।"

বাসায় ফিরে চল্লুম। পথ হারালুম। পথ খুঁজে পেয়ে আশ্চর্য্য হলুম, এত সোজা পথ হারিয়েছিলুম কেমন ক'রে? বাসায় ফিরে তাকে যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লুম কিছু খাবে কি না—বল্লে, "ভীষণ মাথা ধরেছে।" আমি আকাশ থেকে পড়্‌লুম।

যকৃৎ-জনিত মাথা ব্যথা। ওষুধ না খেলে সার্‌বে না। ওষুধ কোথায় পায়? রবিবার। অগত্যা লণ্ডনের বাড়ীতে না পৌছানো পর্য্যন্ত মাথা ব্যথা সইতে হবে। উইক্-এণ্ডের সমস্ত আনন্দ এক নিশ্বাসে দগ্ধ হয়ে গেল।

তাকে খুসী কর্‌লে যদি বেদনার কিছু লাঘব হয় এই ভেবে হাসি-তামাসা চালালুম। চুরি ক'রে ব্লুবেল্ তুল্‌বো পরের বাগান থেকে, পুলিশ্ এসে দু'জনকে চালান দেবে। ও পথ দিয়ে যেয়ো না গো, ঐ প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রেমালাপে ব্যাঘাত হলে ওরা অভিশাপ দেবে।...প্রেমিকার কাছ থেকে প্রেমিককে ছিনিয়ে নেবার মতো পাপ আর নেই, বাল্মীকি তাই লিখেই পৃথিবীর প্রথম কবিতা সৃষ্টি করলেন।...

যুদ্ধকালে এই ট্র্যাজেডী ঘরে ঘরে ঘটে বলেই কি ইউরোপীয় সঙ্গীত এত করুণ? ইউরোপীয় সঙ্গীত যেন বুকে করাৎ লাগায়—এত ইমোশনাল, এত হিউম্যান্। ভারতীয় সঙ্গীত ফুলের মতো, আলোর মতো, তার আবেদন নিছক্ এস্থেটিক্।...দেখ, দেখ, পাঁচটি বীচ্ গাছ কেমন পাঁচ ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। ছবিতে আঁকবার মতো।"

বাস্ যেখানে দাঁড়ায় সেখানে আমরা আধঘণ্টা দাঁড়িয়েও বাস্ পেলুম না। এতক্ষণে তার মনে পড়্‌লো মনিব্যাগ্‌টার কথা। "তোমাকে দিয়েছি?" "না তো!" অতি কষ্টে হাসি চাপ্‌তে লাগ্‌লুম। আমার একটা পকেট্ টিপে দেখ্‌লে। তার মুখ শুকিয়ে গেল। ঝুলিটাকে উজাড় ক'রে ঝাড়্‌লো। তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। "তবে কি ঐ বাড়ীতেই ফেলে এসেছি? এ্যাঁ?" তার চেহারা দেখে আমার ভয় করতে লাগ্‌ল, পাছে মাথা ব্যথা বাড়ে। মনিব্যাগ্‌টা যে পকেটে ছিল সেইটে তার দিকে ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। সে কি মনে করে পকেট্ টিপ্‌লো। মনিব্যাগের সন্ধান পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। আমি আশ্বস্ত হলুম। বল্লুম, "এবার বুঝ্‌লে তো, কেন অত হাস্‌ছিলুম?" "ওঃ এই জন্যে?" "তখন আধ ক্রাউন্ দিতে চাইছিলে না, এখন গোটা মনিব্যাগ্ আমার।" "ইস্!"

অনেক দেরিতে যে বাস্‌টা এল সেটা আমাদের ট্রেন ফেল্ করিয়ে দিলে। রোজালী বল্লে, "চলো তবে আমার বন্ধুনীর বাড়ী যাই। সে যদি দুটো ঘর দেয় তো থাকা যাবে, নয় তো পরের ট্রেনে বাড়ী ফেরা যাবে।" তার মাথা ব্যথার জন্যেই ছিল আমার মাথাব্যথা। তাই সে যখন তার বন্ধুনার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে পৌছলো তখন তার বন্ধুনীকে পরিচয়ের পর বল্লুম, "একলা এঁর জন্যে জায়গা আছে, ভালোই। আমার জন্যে জায়গার ভাবনা ভাব্‌বেন না।" বন্ধুনীটির সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিলেন তিনি আমাকে কাছাকাছি একটা হোটেলে রাখিয়ে দিতে চল্লেন। রোজালী বল্লে, "আমার মনিব্যাগ্ থেকে আমাকে সামান্য কিছু দিয়ে বাকীটা তুমি রাখো।" আমি তাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বল্লুম, "তোমার মনিব্যাগ কিসের? আমার মনিব্যাগ থেকে তোমাকে কিছু দান ক'রে বাকীটা আমি পকেটে পুর্‌লুম।"

সে বল্লে, "ইস্!"

রোজালীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কিন্তু ঠাট্টা

করবার মতো অবস্থাও বিদায় নিলে। সকলের সাম্‌নে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা হ'তে হ'লো—যদিও তার পীড়িত মুখখানির দিকে চেয়ে আমার মন-কেমন কর্‌ছিল। সারা-রাত তাকে মনে পড়্‌ছিল। যখন-তখন মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিচ্ছিলুম যে আমাদের দু'জনের দেহ যত দূরেই থাক আমাদের আত্মা তো অভিন্ন।

তার পরদিন সকাল সকাল দু'জনে মিলে ওয়াটার্‌লু ফিরে এলুম। তখনকার বিদায়টাই সত্যিকারের বিদায়। কেননা দিনের কোলাহলে, কাজকর্ম্মের মাঝখানে, দু'দিনের একত্রবাস স্বপ্নের মতো অলীক বোধ হ'লো।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ঘুমপাড়ানী গান

(সরোজিনী নাইডু)

গন্ধতৃণ কুঞ্জ হ'তে
সোনালি ধানের স্রোতে
পার হ'য়ে কমলের বন,
এনেছি তোমার তরে
উজলি' শিশির-করে
একখানি মোহন স্বপন।
হিয়ার পুতলি মোর!
মেলিস্‌নে আঁখি তোর,
জোনাকি জ্বলিছে ক্ষণে ক্ষণ,
মহুয়া ফুলের রেণু
মিশাইয়া লয়ে এনু
একখানি মদির স্বপন।
আকাশের যত তারা
জ্বলুক নিমেষ-হারা
তোরে ঘিরে করুক নর্ত্তন,
নয়নের মণি ওরে
ছেয়ে দিনু স্নেহভরে
একখানি রঙীণ স্বপন।

কুমারী মমতা মিত্র

অন্তিমে

(রসেটি)

আমি চ'লে গেলে, প্রিয়, মৃত্যুর ওপার,
গেয়োনা বিষাদ গান তীব্র বেদনায়,
ক'রোনা সজ্জিত যেন সমাধি আমার
গোলাপে, পল্লবে, পুষ্পে, ঘন তরুচ্ছায়।

শোভে যেন তৃণদল সুস্নিগ্ধ শ্যামল
বরষার বৃষ্টিধারা, শিশির শীতল;
আমারে পড়িলে মনে, হে আমার প্রিয়,
অনন্ত বিস্মৃতি মাঝে আবার ভুলিয়ো!

পা'বনা দেখিতে ছায়া, মোর মুগ্ধ হিয়া
শ্যাম বরষার রূপ হেরিবে না হায়!
শুনিবনা গাহে কি না সুকণ্ঠ পাপিয়া
গভীর করুণ সুরে কি যেন ব্যথায়!

স্বপন রচিব আমি নির্জ্জন সন্ধ্যায়
আধ আলো, আধ ম্লান গোধূলি ছায়ায়,
জাগিবে তোমায় স্মৃতি চির ব্যথাময়,
হয়ত ভুলিয়া যাব পূর্ব্ব পরিচয়!

কুমারী মমতা মিত্র

গদ্যসাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু এম-এ, এল-এল্ বি,

প্রবন্ধ আর রসপ্রবন্ধ তুটো তুরকমের জিনিষ, যদিও মোটের ওপর তুয়েরই বাহ্য লক্ষণ হ'ল কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর স্বল্প-পরিসরে গদ্য রচনা। কিন্তু প্রবন্ধে যে আলোচনা একান্তভাবে বিষয়বস্তুতেই আশ্লিষ্ট, রসপ্রবন্ধের বেলায় তাতে পড়ে রচকের হাতের একটা বিশিষ্ট ছাপ। শুধু প্রবন্ধকার যে, সে নিরপেক্ষ, অনাসক্ত; তার দায়িত্ব অনেকটা গান গাওয়াতে গ্রামোফোনের দায়িত্বের মতন। সে সাধারণতঃ নিজের মতামত, ব্যক্তিগত ভালমন্দ বিচার, বা দৃষ্টিপদ্ধতি দিয়ে প্রবন্ধের ভাব বা অর্থের স্বাভাবিক পরিণতিকে বাধা দেয় না। অপর পক্ষে রসপ্রবন্ধকার যে, সে শিল্পীও বটে। পাঠকের হাতে সে এমন একরূপ রচনা তুলে দেয় যা সম্পূর্ণ তারই সৃষ্টি। তাতে থাকে একটা সজীব হাতের কলা-কৌশল। একটা জীবন্ত হৃদয়ের পরিচয়ে সেটা অনুপ্রাণিত। এই রূপ আর রসের আকর্ষণ থাকে ব'লেই এ লেখা শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে; এর নাম দিতে পারা যায় রসপ্রবন্ধ।

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে এযুগের বাংলাসাহিত্যে পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান খুব উঁচুতে ব'লেই মনে হয়েছে। রসপ্রবন্ধে রস-পরিবেষণের ক্ষমতা তাঁর কত পূর্ণ, কত অনাবিল, কত স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল তা দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। সে রসের স্থায়িত্বে, ঔজ্জ্বল্যে, প্রাচুর্য্যে, তিনি যে তৃপ্তি বণ্টন ক'রে গেছেন তার তুলনা তাঁর আগে-পরে কমই পাওয়া যায়। রসপ্রবন্ধকারের আসন অলঙ্কৃত করতে যে ন্যূনতম গুণরাজির প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধি তাঁর ছিল। কিন্তু সে সমৃদ্ধির পরিমাপ করবার কোন অক্ষম চেষ্টা করবার পূর্ব্বে রসপ্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা-গুলিকে আরো স্পষ্ট ক'রে নেওয়া ভাল।

রসপ্রবন্ধের ব্যক্তিত্বপূর্ণ লেখায় লেখক তাঁর লেখ্য বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। তাঁর ক্ষমতার পরিচালনভার প্রতি মুহূর্ত্তেই থাকে তাঁর নিজের হাতে, তিনিই তাকে যে পথে ইচ্ছা চালান। এ লেখা আনন্দের লেখা; কোন উদ্দেশ্যের তাগিদ এতে তেমন নেই। এ কতকটা খেয়ালের ফানুস, আপনার মনে উড়ে চলে; কেউ দেখে, কেউ দেখে না। প্রবন্ধ প্রকাশ, রসপ্রবন্ধ বিকাশ। তাই আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবার কোন স্থির

প্রয়াস রসপ্রবন্ধে নেই। লেখক মনোমত দুটো একটা দিক থেকে, খেয়াল বা ইচ্ছামত, তার ওপর নানা রঙের আলো ফেলতে থাকেন। এর জন্য তাঁর কোন জবাবদিহি নেই, এবং সেটা তিনি জানেন। যুক্তির বন্ধন তাঁর কাছে অনেকটা শিথিল। তাঁর বিচার বা মতামতের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়া না দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। "সত্য বই মিথ্যা বলিব না" এমন কোন আইনের হলপ তাঁর করা নেই। তিনি চান একমাত্র তাঁর আনন্দপ্রবৃত্তি আর সৃষ্টিবাসনার কাছে সত্য হ'তে। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রেই তিনি নিশ্চিন্ত।

এ ধরণের লেখার পেছনে যদিই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে তো সেটা নিজেকে প্রকাশ করা, লেখার বিষয়কে নয়, বিষয়টা লেখকের আত্মপ্রকাশের একটা অবলম্বনের মতন হয়ে দাঁড়ায়। এ থেকে অবশ্য একথা বোঝায় না যে সরাসরি নিজের সম্বন্ধে নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবেই কিছু লিখতে হবে, কিম্বা লেখায় "আমি"র ছড়াছড়ি থাকবে। এর অর্থ এই যে রচনার প্রকৃত আকর্ষণ লেখার বিষয়েব মধ্যে নিহিত থাকবে না ; থাকবে সেই বিষয় সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র জীবিত লোকের নিজস্ব বক্তব্যে, আর তার কথার ধরণে। সে যেন কোন বন্ধুর রসালাপের মতন। হয়ত মধ্যে মধ্যে বিষয়ের দিকেও মনোযোগ যেতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগই তার আনন্দ এইতে যে আমি এসময়ে অমুকের সঙ্গে কথা কইছি। কথা তার যুক্তিহীন খামখেয়ালি ধরণের হ'তে পারে, হয়ত তার সঙ্গে মতভেদও হয়, কিন্তু তার স্বরের, তার ভাবনা চিন্তার আলোছায়া খেলার একটা মোহ থেকেই যায়।

বুঝতে পারছি যে রসপ্রবন্ধের আনন্দ স্বভাবতঃই নির্ভর করে প্রবন্ধকারের পরিচয় তাতে কতটা তার ওপর। কোন্ শ্রেণীর তা'র ব্যক্তিত্ব সেটা কতটা অলঙ্কৃত, সমৃদ্ধ, মনোহারী, তার সম্বন্ধে এই কথাই বেশী ক'রে মনে হবে। অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই তাকে অকপটভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। সে যদি বহুরূপী, কি একটা প্রতিধ্বনি মাত্র হয় তা হ'লে তার কথা শোনবার স্পৃহাটুকু থাকবে না। কারণ সে আস্থা বা স্পৃহার মূল কি এই নয় যে যার কথা শুনছি তার মতন একমাত্র সে নিজেই। ভাল হোক মন্দ হোক, তার কাছে যা পাই আর কোথাও যেন তা পাই না। সে যদি আমার চিত্ত হরণ করতে পারে, বা তার লেখা যদি সাহিত্যে চিরস্থায়ী হয় তো সে এই কারণেই হবে। সে যেন এক নতুন জগতের বাতায়ন খুলে দেয়। এক কথায়, গদ্যে রস-লেখকের কাজ তাই, যা কাব্যে গীতিকবি বা lyristএর। এই গীতোচ্ছ্বাসে বলেন্দ্রনাথ যে কত প্রবল, কত উচ্ছল, অথচ কত সংবরণশীল, সুতরাং কত মনোহারী, কত শোভন, কত ছন্দিত, কত ঐক্যসম্পন্ন ছিলেন তা পরে দেখাতে চেষ্টা করবো। উপস্থিত আরো বলি যে বন্ধুর আলাপে বা রসপ্রবন্ধকারের লেখায় তার স্বকীয়তার ছাপ এত স্পষ্ট থাকে ব'লেই তার সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ এত বেশী হয় ; তার চরিত্র আর তার স্মৃতি এত রমণীয় হয়ে ওঠে ; তার জীবনের গুণ-ভাবের সমাবেশ তার রচনায় এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। এই সকলের মিলিত প্রভাবেই সে দৈনিক সাধারণ জগতটাকে নিজের ক'রে তোলে ; পুরাণো জগত এক নতুন মহিমার সংস্পর্শে এসে নতুন প্রভায় জ্বলে ওঠে। অতএব রসপ্রবন্ধকারের কাজ হ'ল এই সুপরিচিত জগতের মধ্যে এমন সব সম্ভার আবিষ্কার করা যা আমরা পূর্ব্বে কখন লক্ষ্য করিনি। জীবনের লক্ষ লক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অংশ-ভগ্নাংশে, হাসি অশ্রুর মধ্যে, সৌন্দর্য্যের এমন সব মায়া-উৎস সে আবিষ্কার করে, যার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন ধারণাই ছিল না। এক নতুন অনুভূতির স্পর্শে আমরা গরীয়ান হয়ে উঠি। শিল্পী প্রবন্ধকার দেখায় যে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণের অঙ্কুর লুকানো আছে। পরিচিত দৈনিক ঘটনা বা দৃশ্যগুলিও তার চোখে দেখতে পারলে, বিস্ময় আর মোহ উৎপাদন করে।

এই ভাব সঞ্চার করতে রসরচনার স্রষ্টাকেও এইভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'তে হয়। ভাবপ্রবণতা আর গ্রহণশীলতা তার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। আমরা জানি জগতের ঘাত প্রতিঘাতে এই উত্তর দেবার ক্ষমতা, স্পর্শশীলতা আর গ্রহণতৎপরতার তারতম্যেই সকল লোক সমান রসিক নয়, এক কথায় বলি—জীবনীশক্তির অভাবে। সেইজন্যে সাহিত্য রাজ্যে রসপ্রবন্ধকারের দান

হেয় নয়, সে আমাদের বড়ই প্রার্থনার জন। এই সম্ভ্রম আর প্রীতির খুব একটা উঁচু আসনই বলেন্দ্রনাথের।

রসরচনার রূপ আলোচনা ক'রে তার লক্ষণ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা স্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ রচনার বিষয়-নির্ব্বাচনে শ্রেণিবিচার থাকতে পারে না। বড় বড় গুরু বিষয় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রথম দৃষ্টিতে যা ক্ষুদ্র,সাধারণ, সংক্ষিপ্ত, মামুলী, তাও তার পর্য্যায়ভুক্ত। জীবনের কোন তুচ্ছ ঘটনা, কোন অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা, কিছুই বাদ পড়ে না; শিল্পীর হাতে সে সবই নতুন রূপে আর ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এরকম করাতে স্রষ্টার স্ফূর্ত্তি এত বেশী, সৃষ্টিশক্তির উচ্ছল বাহুল্যের আস্বাদ তার কাছে এত নিশ্চিত, যে যতই কবিত্বহীন, প্রাণহীন বিষয় হোক না, সে হয়ত তার চারিদিকে চিন্তা আর কল্পনার এমন ইন্দ্রধনু রচনা করবে, তাকে হাসি-অশ্রুর মুক্তাজালে এমন উজ্জ্বলভাবে বিভূষিত করবে, যে আমাদের হাতে সেটা আসবে কল্পলোকের কোন মায়ারূপে মূর্ত্ত হয়ে। রসপ্রবন্ধের উচ্চতম শিখর এই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত রসপ্রবন্ধে কোথাও কষ্টকল্পনার পরিচয় থাকে না। শুধু যে তার ভঙ্গীটুকুই সহজ, সলীল, তাই নয়; বোধ হবে যে সেটা তেমনি একটা স্বচ্ছন্দ, মৃদু, শিথিল মনোভাবচালিত—কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার তাড়া নেই; আড়ষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কিম্বা অতিমাত্র উৎসাহ আগ্রহ বা তর্ক বচসার প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে না; দলাদলির শাণিত বায়ুমণ্ডল তাকে ছিন্নভিন্ন করে না। বরং তার মূলে ব'য়ে চলে এক অন্তঃসলিলা লঘু ধারা। আর সে ধারা বা humourও আভাসে, ইঙ্গিতে, ক্ষণিক চমকে, থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে ওঠে, ওপর থেকে চেপে বসে না। তারও ঔজ্জ্বল্য তরল, তরঙ্গায়িত—নিশ্চল কঠিন নয়। বাস্তব পক্ষে, প্রবন্ধের লঘুরস বা humourএর উৎস একটা কোমল সমবেদনার উৎস থেকে বেশী দূরে নয়। কারণ প্রবন্ধকার যে চাক থেকে মধু আহরণ করেন তার মূল নিহিত আছে মানুষের সেই অন্তর প্রকৃতিতে, যেখানে জীবনের সহজ, প্রথম, স্বাভাবিক ভাবগুলি একসঙ্গে মেলা ক'রে থাকে। সেখানে লঘু-গম্ভীর, হাসি-অশ্রুর, বাস পাশাপাশি। সেইজন্যেই রসলেখকের লেখায় কোন গম্ভীর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন বিধিব্যবস্থা দেবার ইচ্ছা বা সংস্কার-প্রবৃত্তি তাকে কখন বিব্রত করে না। সে স্বীকার ক'রে চলে যে সৃষ্টি চরাচরে এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দান দু'হাত ভরিয়েই কুড়িয়ে নিতে হবে—এর পরিচয় যে যথেষ্ট সরস, যথেষ্ট নয়নাভিরাম। এর মোহ আর বিস্ময় অফুরন্ত; মানব-মনের কাছে এর আবেদন অনন্ত, গভীর, মর্ম্মস্পর্শী। মনপ্রাণ খুলে, যেমন আছে তেমনি, এদের নিজের মধ্যে আবাহন করে নিতে হবে; কর্কশ-হাতে ভেঙ্গে গড়বার প্রয়োজন নেই। সে যে করে সে তো অজ্ঞ, তার হৃদয়বৃত্তি আংশিক, খণ্ডিত। সন্তোষ আর মনের মতন ক'রে নিতে পারাতে যে আনন্দ আছে সেটা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে।

রসপ্রবন্ধের এই যে উদ্যান, বাংলাসাহিত্যে এর উদ্যানপাল বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে এইবার আর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করি। প্রথমেই লক্ষ্য করি যে তাঁর আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল, আর সে আলোচনার ভঙ্গীতেও অশেষ বৈচিত্র্য ছিল। যখন যে বন উপবন ইচ্ছা তাইতে তিনি তাঁর কল্পনাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন আর শেষ পর্য্যন্ত মধু আহরণ ক'রে ফিরেছেন। তাঁর লেখাগুলিকে রচনাভঙ্গী অনুসারে সাজালেই তাঁর প্রসার বা range কত বিস্তৃত ছিল বোঝা যায়। যেমন, বর্ণনামূলক, চিন্তামূলক, স্মৃতিমূলক, কল্পনামূলক, গবেষণা-মূলক আর শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনা। এই প্রধান শ্রেণীর ভেতরেও অংশবিভাগ আছে। শ্রেণী অনুসারে প্রবন্ধগুলির ভাব আর ভাষা বিভিন্নতা পেয়েছে। কোন বর্ণনামূলক লেখার সঙ্গে কল্পনামূলক লেখার তুলনা ক'রে দেখলে রচনাভঙ্গী বা styleএর এই বিভিন্নতা চোখে পড়ে। কিন্তু ভেতরকার এই প্রভেদ সত্বেও তাঁর সমস্ত লেখাগুলিই এক বলেন্দ্রী ঐক্যে গ্রথিত। অর্থাৎ যত সুরই তিনি বাজান, সে একই বাঁশীর সুর, আর সে তাঁরই বাজানো। "রত্নাবলী"র সমালোচনায় দেখুন তাঁর নিজের ভাষা সংস্কৃত ভাষার মতনই ফলফুলভারে অবনত, উজ্জ্বল, সৌরভময়। আবার "স্ত্রী ও পুরুষ" নামক লেখায় সে ভাষা তেমনি গদ্যধর্ম্মী, কামের কথা পূর্ণ। শুধু তাই নয়। কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর

মধ্যেও যে সব ক্ষুদ্রতর বিভাগ আছে তার ভেতরেও এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। "স্ত্রী ও পুরুষ" এর মতন "নীতিগ্রন্থ" নামক লেখাটিও চিন্তামূলক, কিন্তু তার তুলনায় এর ভাষা কত আবেগচঞ্চল, কত বাহুল্যহীন অথচ কত প্রাণময়, কত ত্বরিত। ওদিকে "কোণার্ক" ব'লে লেখাটি দেখুন—সেই বিরাট ধ্বংসাবশেষের মহান গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ভাষাও কেমন এক ছন্দে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। এ রকম উদাহরণ আগাগোড়া দেওয়া যেতে পারে। বিষয়ের ভাবরসে লেখক যে কত পূর্ণরূপে অভিষিক্ত হয়ে কলম ধরতেন, রচনারীতির এই বৈচিত্র্য তার প্রমাণ। এ থেকে বোঝা যায় যে লেখবার সময় তাঁর বক্তব্যগুলি তাঁর কাছে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠ্‌তো। তাঁর কাছে তাঁর অনুভূতিগুলি এত সত্য হয়ে দেখা দিত ব'লেই তাঁর লেখাতেও একটা সত্য প্রেরণার ছাপ থেকে গেছে। Personal styleএর স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় কথা বোধ করি বলবার কিছু নেই। বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ অনুমানের সারবত্তা প্রমাণ হয় তাঁর লেখাগুলি পড়লেই। কলাভঙ্গীর তারতম্য তাতে যতই থাক না কেন, প্রত্যেকটিতেই একটা ব্যক্তিগত আদানপ্রদানের সুর বেজেছে। প্রত্যেকটিতেই শুনেছি পাশে ব'সে থাকা বন্ধুর আবেগময় কণ্ঠস্বর। তাই বলছিলুম যে সুরবোধ তাঁর বহুমুখী হলেও, তার প্রকাশভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। এই নিজস্ব ভঙ্গী বা styleই হ'ল রসপ্রবন্ধের মূল্যবিচারের কষ্টিপাথর। তাই সকল উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে stylistও বটে। বলেন্দ্রনাথও সব প্রথমে মনোযোগ আকর্ষণ করেন এই দিক থেকেই। styleএর প্রতি তাঁর নিজেরই যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। তাঁর সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন "শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি মানাইবে ভাল, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন।" তাঁর লেখার রসসম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি নিজে কত সচেতন ছিলেন তার পরিচয় "বেনোজল" লেখাটিতে আছে। বাধ্য হয়ে কোন নীরস বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে তিনি কি রকম কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন তা তিনি নিজের ভাষাতেই লিখে গেছেন—"এই নীরস বিষয়ের অবতারণা সাহিত্যামোদী অধিকাংশ পাঠকগণের পক্ষে কিছু অপ্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে মধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্যরসহীন প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য্য জানিয়া তাঁহারা ভরসা করি আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।" অথচ ব'লে রাখি যে, যে নীরস অবতারণার জন্যে তিনি এত ভয়ে ভয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন, সেটা বলতে গেলে উক্ত প্রবন্ধে দু'ছত্রের বেশী স্থান অধিকার করেনি, কিন্তু ততটুকুতেই লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতির তাল কেটে গিয়েছিল। এ ক্ষমা চাওয়া যেন পাঠকের কাছে নয়, এ নিজের বিবেকের কাছে, নিজের সৌন্দর্য্যবোধের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। সাহিত্যলক্ষ্মীর প্রতি এই বিশ্বস্ততা কি অনুকরণীয় নয়? রচনার সৌষ্ঠবের প্রতি তাঁর এত সপ্রেম, আস্থাপূর্ণ, বিশ্বাসের ভাব ছিল ব'লেই মাজাঘসা করা সত্ত্বেও তাঁর রচনা কোথাও আড়ষ্ট বা studied হয়ে পড়েনি, উপরন্তু সর্ব্বদাই ভাবময়, প্রাণময়। Styleএর রাজ্যে এই কৃতিত্ব আদর্শ।

রসপ্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের ক্ষমতা কত পূর্ণ ছিল সে সম্বন্ধে আরো সম্যক ধারণা হয় তাঁর স্মৃতিমূলক লেখাগুলি থেকে। কারণ স্বভাবতঃই এই ধরণের রচনায় মানুষের নিজত্ব প্রকাশ পায় সব চেয়ে বেশী। বলেন্দ্রনাথও সে নিয়মের বাইরে ন'ন। এ লেখাগুলিতে একাধারে পরিচয় পাই তাঁর personal style বা ভঙ্গীর, তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের (lyricism), তাঁর লঘুরসের (humour), আর কতক পরিমাণে তাঁর চরিত্রের। এ প্রবন্ধগুলি অনেক বিষয় নিয়ে। কতকগুলি আছে অতীত বাংলার সামাজিক জীবন উপলক্ষ ক'রে। এগুলিতে লেখক আমাদের দেশের প্রায়লুপ্ত ছোট বড় প্রথা, রীতিনীতি আর অনুষ্ঠানগুলিকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে একটা সঙ্গত সামঞ্জস্যে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এগুলি আমাদের সামাজিক জীবনে "ভাবের" একটা "অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতা"-সূত্রে গাঁথা ছিল। আর তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করতে আশ্চর্য্য রকম সূক্ষ্ম, নিখুঁত, সরস, আলো-ছায়া-খেলান, মনোহারী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বলেন্দ্রনাথ বাংলার গতদিনের যে ছবি এঁকে গেছেন তা এই দ্রুত

পরিবর্ত্তনের দিনেও অতীতের একটা সজীব উজ্জ্বল রূপ চোখের সামনে ধ'রে রাখবে। তাঁর মতে প্রকৃতি, দেশ ও মানুষ হিসাবে আমাদের আজকের প্রেয়ের চেয়ে সেদিনকার শ্রেয় ভাল ছিল। তাঁর মূল বক্তব্য—তাঁর স্বাদেশিকতার এই ভিত্তিটুকুকে—তিনি শত কবিত্বের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও কোথাও ফুটিয়ে তুলতে ভোলেন নি। রসপ্রসঙ্গে এই সম্পূর্ণ অথচ সরস হবার ক্ষমতা বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব গুণ ছিল। "সরস কোমলতা"র সঙ্গে এই "স্থিরতা ও দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা"র সমাবেশ ত্রিবেদী মহাশয় লক্ষ্য করেছিলেন। যে শক্তির বলে বাণিজ্য ব্যাপারেও বলেন্দ্রনাথ কল্পনাশক্তির আশ্রয় ত্যাগ করেন নি, এ সেই সমন্বয়ের পরিচয়। অথচ রামেন্দ্রসুন্দরের কথায় তিনি "ফুলের ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই।" তাই বর্ণনীয় বিষয়, তাঁর বর্ণনার গুণে যে কত মর্ম্মস্পর্শী, কত হাসিঅশ্রুসমুজ্জ্বল, কত রমণীয় হয়ে বিকশিত হয়েছে, তা লেখাগুলি না পড়লে উপলব্ধি করা যায় না। এ সম্পর্কে "গৃহকোণ," "নিমন্ত্রণ সভা'" "শুভ উৎসব," "প্রাচ্য প্রসাধনকলা" প্রবন্ধগুলি অবশ্য পাঠ্য। বক্তব্য আর বর্ণনার সরস সমন্বয়ের একটা উদাহরণ দি'—

"আমাদের আসবাব আড়ম্বর-বাহুল্য কোন কালেই বড় নাই। তখন দেশে এত আলোক ছিল না—তড়িতালোক, গ্যাসালোক, এ সকল তো ছিলই না, এমন কি, কেরোসিন শিখারও প্রাদুর্ভাব হয় নাই—পুরাতন পিলসুজের সরু কাঁটার উপরে মাটীর প্রদীপমুখে ঈষৎ স্নেহসিক্ত শলিতাগ্রভাগে মিটি মিটি যে আলোটুকু জ্বলিত তাহাতেই আমাদের গৃহকোণের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইত; এবং সেই বাতবিকম্পিত ক্ষীণালোকে দিদিমার মুখের আষাঢ়ে গল্পে, মায়ের ঘুমপাড়ানী গানে ভাইবোনের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে, একান্তোপবিষ্ট ননদ-ভাজের মৃদু হাস্যালাপে ক্ষুদ্র গৃহকোণটুকু এমনি জমিয়া উঠিত—সে জমাট বাহিরের কিছুতেই হয় না। নূতন সভ্যতা, নব নব বৈজ্ঞানিক আলোকে আমাদের গৃহপ্রান্তরে এই অন্ধকারটুকু একান্ত বিদূরিত করিতে যেখানেই প্রয়াস পাইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের গৃহভিত্তি হইতে অনেকগুলি চিরন্তন স্মৃতি ও বিচিত্র বিস্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়া একটা সাদা দেয়ালের কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ক্ষীণ প্রদীপশিখাটুকুর বিকম্পনে আমরা যে মাতৃদৃষ্টির স্নেহালোক, তরুণী বধূর করুণ মুখের পৌর্ণমাসী সুধা, স্নেহপ্রীতিভক্তির সহস্রধার-নিস্যন্দিত মৃদু রশ্মিবিকীরণ অনুভব করি, সেটুকু তো বাহিরের এডিসন দিতে পারে না। এবং এই বধূ ও মাতৃরূপিণী গৃহিণীর চারু চরণচ্ছটাতেই আমাদের গৃহ উজ্জ্বল। এমন কি, সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দরিদ্রের সামান্য ঘটি বাটি পিলসুজ কাজললতা সিন্দুরের কৌটাটি পর্য্যন্ত একটি নূতন শ্রী ধারণ করে, এবং আমাদের মর্ম্মস্থল অবধি তাহার প্রভা আসিয়া পড়ে।

বাস্তবিকই, বাহিরের দর্শকের চোখে ইহা যতই সামান্য হউক, ঘরকন্নার এই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির আমাদের নিকট একটু বিশেষ আদর আছে। এই সকল অতি তুচ্ছ ছোটখাট মৃৎ-কাংস্য-পিত্তল বংশ-তৃণ-কাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত সামগ্রীগুলি আমাদের গৃহিণীগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সহস্র অদৃশ্য সূত্রে যেন চিরগ্রথিত। ইহাদের প্রত্যেক ব্যবহারে কখনও তাঁহাদের বাহুবিক্ষেপ, কখনও চরণভঙ্গ, কখনও কঙ্কণের কিঙ্কিণী, কখনও সর্ব্বাঙ্গের লঘু বেপথু যেন নানাছন্দে হিল্লোলিত ও মুখরিত হইয়া উঠে। এবং সেই সঙ্গে কোথাও পুকুরপাড়, কোথাও বাঁধাঘাট, কোথাও সরিষা-ক্ষেতের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথরেখা, কোথাও তকতকে নিকান প্রাঙ্গণ, কোথাও দীপালোকিত বাতায়নপথ, চিত্রের পর চিত্র-সঞ্চারে মনে যেন ক্ষুদ্র বঙ্গভূমি তাহার সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য লইয়া একান্ত ঘনাইয়া আসে।

এই পুকুরপাড়ে ঘাটের ধাপে আম্রকুঞ্জ ও বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আমাদের চিরসহাস্য গ্রামাবধূর নিত্য রঙ্গভূমি। প্রতিদিন প্রভাতে ঐখানে ঘাটের চাতালটিতে বসিয়া তিনি রাশীকৃত তৈজসপত্র মার্জ্জন ঘর্ষণ ও পরিষ্করণে নিযুক্ত থাকেন। কত রকমের থালি, কত রকমের বাটী, কত বিচিত্র গঠনের ঘটি,—কাঞ্চননগরী, গয়েশ্বরী, জগন্নাথী, বালেশ্বরী, খাগড়াই, পশ্চিমী, দক্ষিণী, কত গঠন এবং কারুকার্য্য, কত আকার এবং প্রকার, কত কলানৈপুণ্য এবং সূক্ষ্ম কৌশল। অতি পুরাতনকাল হইতে দিদিমা কি ঠাকুরমা যখন যে তীর্থে গিয়াছেন সেখান হইতে নানাবিধ জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন—কোশাকুশি, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, ধূপাধার, ধুনাচি, বহুবিধ মনোহর ভাণ্ড, পানের বাটা, গামলা, হাঁড়ি, হাতাবেড়ী, গণনায় সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। এবং গৃহের বধূকে প্রতিদিন মাজিয়া ঘসিয়া তকতকে করিয়া রাখিতে হয়—নহিলে, লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েন। তারপর কলসীকক্ষে নিত্য দুইবেলা জল সহিতে যাওয়া এবং হাস্য-পরিহাসগল্পগুঞ্জনসুখমুগ্ধচিত্তে সরিষা ও অড়হর ক্ষেতের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথে আর্দ্রবস্ত্রে মন্থরগমনে গৃহে ফিরিয়া আসা। ঐ কলসীর জলোচ্ছ্বাসচলচ্ছলে সেই পুকুরঘাটের যত কাহিনী যেন স্বপ্ন-বিম্ববৎ ফুটিয়া উঠে। এবং ঐ সুমার্জ্জিত তৈজসপ্রভায় বধূর মুখে যেন কতদিনের শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা ঠাকুরমার স্নেহ আশীর্ব্বাদপ্রভা প্রভাসিত হয়।"—(গৃহকোণ)

কত ভাবঘন, সরস, সুস্পষ্ট এই বর্ণনা; সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করবার কি মনোহর শক্তি; সবশুদ্ধ একটা সজীব ভাব ফুটিয়ে তোলবার কি মনোরম সহজ ক্ষমতা। "নিমন্ত্রণ সভা"য় পল্লীগৃহিণীদের কাসুন্দী প্রস্তুত বর্ণনাও এমনই হৃদয়হারী। "গৃহকোণ," থেকে আর এক জায়গা উদ্ধৃত ক'রে বলেন্দ্রনাথের হাস্যরসের একটু পরিচয় দি—

"এই বাহুল্যবর্জ্জিত সরল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসিয়া প্রথম যখন অগণ্য কৌচক্যাবিনেট্কণ্টকিত আধুনিক কোন নব্যতন্ত্রীর ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেকক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভাল ঠাহর হয় না—এমন কি, বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনাকক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না, যে তিনি আমাদেরই একজন ভ্রমপ্রমাদসুখদুঃখমোহময়ী মানবী, না, বিলাতী সাহেবের অদৃশ্য তারবিলম্বিত কোনরূপ আশ্চর্য্য কলের পুতুল। কারণ অনভ্যস্ত চোখে তাঁহাদের গতিবিধি, তাঁহাদের গুরু গাম্ভীর্য্য ও লঘু হাস্যবিকীরণ, তাঁহাদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা সকলই কিছু অতিমাত্রায় যান্ত্রিক বলিয়া ঠেকে, এবং ক্ষণিকক্ষণ সেই চুরোটিকাধূমকুণ্ডলিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে নিজেকেও যেন রঙ্গালয়ের অভিনেতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং সে অভিনয়ও বড় সহজ নহে, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, কখন্ কোন্ ভঙ্গীটি বেদস্তুর হইয়া পড়ে। কারণ, এ ভঙ্গীকলার মধ্যে কোনরূপ যুগযুগান্তরাগত ভাবপ্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে অবলীলাভরে পরিচালিত করে, আছে কেবল নেপথ্যের তারওয়ালা সাহেবের অদৃশ্য হস্ত এবং আর কতক পরিমাণে শিথিল-প্রকৃতি কয়েকটি দেশী পুত্তলিকার হস্ত পদ ও রসনা সঞ্চালন।"

পাঠক দেখ্বেন এ বর্ণনার রস সত্যকথা বলার সহজ স্বচ্ছন্দ রস; তাই এতে পরিহাস থাকলেও ঈর্ষাদ্বেষের মালিন্য নেই, ভর্ৎসনার চেয়ে বেশী আছে একটা স্নেহকরপরশের সহানুভূতি; অকপট মুক্ত হাস্য। অথচ এই লঘুরসের মধ্যে দিয়েও একটা প্রচ্ছন্ন চিন্তাধারা বয়ে গেছে, যা হয়ত এক মুহূর্ত্তের জন্যে লেখককে গম্ভীর ক'রে দেয়। উদ্ধৃত অংশের শেষের দিকটায় দেখ্বেন পরিহাসবক্র কথাগুলি আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের সামাজিক জীবনে কত সুদূরপ্রসারী। রূপকের মধ্যে দিয়ে লেখক ব্যষ্টিকে ছেড়ে সমষ্টিকে ধ'রেছেন। উপরোক্ত রসবর্ণনা পরক্ষণেই কেমন ভাবমন্থর হয়ে এসেছে, হাসির ঔজ্জ্বল্যের পেছনে সহসা কি ভাবে অশ্রুর একটা মৃদুবেদনাভরা ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তার প্লাবন সংযমের বাঁধের মধ্যে কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে, লক্ষ্য করুন—

"কিন্তু তরুণী-ভামিনীগণ আক্ষেপোক্তিতে দোষ গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের প্রতি কোন প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যে স্রোতের মধ্যে পড়িয়াছি তাহাতে দেশকালের সর্ব্ববন্ধনচ্যুত হইয়া একটা উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়হীনতার অকূলে গিয়া উপনীত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এই একটানার মধ্যে তাঁহারাই যথাস্থানে নোঙ্গর ফেলিয়া আমাদিগকে কূলের নিকট টানিয়া রাখিতে পারেন। এবং বন্যার প্রথম প্রকোপ শান্ত হইয়া আসিলে আবার আমরা শুভক্ষণে নিজগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। দেয়ালে দেয়ালে কম্পিত দীপশিখায় যেখানে মরা বর ও সুয়োরাণী দুয়োরাণী নিত্য সুখে কালযাপন করেন, যেখানে ঠাকুরমার মুখের রামসীতার দুঃখকাহিনী, কুরুপাণ্ডবের বৃহৎ কথা প্রতিদিন গৃহের নববধূ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবর ও ননন্দাগণের অন্তরোচ্ছ্বাসিত অশ্রু-অভিষেকে পরিবারের অন্তরে অক্ষয় অম্লান গৌরবে মুদ্রিত হইয়া রহে, এবং নিত্য নব শুভ আনন্দোৎসবে কঙ্কণে বলয়ে হেমহারে মেখলায় নূপুরে গুর্জ্জরীতে কনককিঙ্কিণী-শিঞ্জিতে শুভ্র হর্ম্ম্যতল স্পন্দিত ও মুখরিত হইয়া উঠে আমরা সেই গৃহকোণমুখী প্রবাসী—শুধু এই সুসজ্জিত খেলাঘরমধ্যে পুত্তলবৎ নৃত্যসুখ হইতে মুক্তি কামনা করি। হে গৃহিণি, তুমিই তাহার প্রধান সহায় হও। এবং তোমারই চারুচরণনখরমণিপ্রভায় আমাদের পুরাতন গৃহকোণ নূতন সৌন্দর্য্যে ও শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।"

এ হাসি না অশ্রু, চঞ্চলতা না ব্যাকুলতা, রহস্য না বেদনা?

স্মৃতিমূলক লেখাগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে কোন ব্যক্তিগত ঘটনার অবছায়া-স্মৃতি ধরণের। কবি কবে একদিন কোথা যাত্রা ক'রেছিলেন। সে বিদায়ের সঙ্গে বুঝি সারা বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তাই সেদিন তিনি বলেছিলেন—

"ভোরের বেলায় বাঁশীর স্বর শুনিয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি। অস্ফুট সূর্য্যকিরণে সেই বাঁশীর স্বরের উপর একটা মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

একেই বলি গদ্যে কবিত্ব। তারপরে সেই "যাত্রা"—,

"আমরা চলিয়াছি—পশ্চাতে একটা কোলাহলময় আশা-নিরাশাময় ভাব ফেলিয়া রাখিয়া প্রকৃতির শ্যামল শোভার মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের চারিদিকে মেঘ কাঁদিয়া ফিরে, বায়ু গাহিয়া যায়, স্বপ্ন ঝরিয়া পড়ে। অতীতের ক্ষীণালোকে আমরা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিয়াছি—একটা দূর শুভ মুহূর্ত্তের

ছায়ার অপেক্ষা করিতেছি। সহসা ভোরের বাঁশী থামিয়া গেল—দেখিলাম যে এই বাঁশীর স্বরে চড়িয়া বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে একটা অপরিচিতের মধ্যে পরিচিতের ভাব—পুরাতনের মধ্যে নূতনত্ব—বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি।"

কল্পপন্থী বলেন্দ্রনাথ আভাসে ইঙ্গিতে কেমন স্বপ্ন রচনা করতে পারতেন এ তারই নিদর্শন। আবার দেখুন স্মৃতির সঙ্গে আবেগ মিশিয়ে ভাব রচনা করবার ক্ষমতা—

"কলিকাতার ন্যায় এখানেও জীবনের অনেক ঘটনা সাজাইয়া গিয়াছি। সেইজন্য এখান দিয়া যাইতে হইলে খানিকটা করিয়া পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে—বিস্মৃতির ঘুমন্ত ভাবের মধ্যে একটা অস্ফুট সজীবতা দেখা দেয়। এখানকার গঙ্গায় অনেকদিন অনেক মালিন্য প্রক্ষালন করিয়াছি, তাহারা হয়ত জগতের মহান স্রোতে ভাসিয়া গিয়া দূর দূর হইতে দূরতর দেশের বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া আবার একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের তলায় আসিয়া আটকাইয়া যাইবে। এখানকার রাস্তাঘাটে আমার সহস্র জীবন্ত পদচিহ্ন বসিয়া গিয়াছে। তাহারা অস্ফুটভাবে আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অস্ফুটাকারেই মিলাইয়া যায়।"

কিম্বা—

"সেই প্রাচীন কুটীরের এখানে সেখানে জীবনের খানিক খানিক ইতিহাস, মরণের শুভ্র হাসি। তাহার বটের 'শ্যামল স্নেহে' মরণ, তাহার পুকুরের জলে মরণের ছায়া, তাহার কাঁটাবনে মরণের সৌরভ। একটি ক্ষুদ্র মাছরাঙা বটের ছায়ায় প্রতিপালিত। তাহার জীবনের একটুকু হাসি সেই ক্ষীণ প্রাণটীর উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে—শুকতারার নিভ নিভ কাহিনীর স্বপ্নময়ী রাগিণীতে ক্ষীণ প্রাণ ছাইয়া ফেলিয়াছে"—(কাহিনী)।

স্মৃতিরচনাগুলির মধ্যে চারটি প্রবন্ধ আছে একটু বিশিষ্ট ধরণের—"জানালার ধারে", "তখনকার কথা", "দেয়ালের ছবি", আর "পুরাতন চিঠি।" এগুলি স্পষ্টতঃ লেখকের দৈনন্দিন জীবনের ওপর কতকগুলি ক্ষণিক ক্ষুদ্র আলোক-পাত। পাঠক অনায়াসে দেখ্‌তে পাবেন এতে কিভাবে শিল্পীর নির্জ্জনপ্রিয়তা, কল্পনা-প্রবণতা, প্রকৃতিপ্রেম আর ভাবালুতা সরাসরি আত্মপ্রকাশ করেছে, এগুলি থেকে অনেকটা বিলাতী প্রবন্ধকার Lambএর কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিও বলেন্দ্রনাথের স্পষ্ট চরিত্রে Lambএর খামখেয়ালী ভাবের কোন পরিচয় নেই, আর Lambএর জীবনে যে একটা করুণ ভাব ছিল তার আভাস এতে আছে খুব দূর থেকে ক্ষীণভাবে—কারণ Lambএর জীবনের অনেকখানি pathos তাঁর মনোভাব থেকে না এসে, তাঁর জীবনের এমন সব বাস্তব ঘটনাবলী থেকে এসেছিল, যার হাত থেকে বলেন্দ্রনাথ একরকম মুক্ত ছিলেন।

প্রকৃতিতে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। তাঁর আলোচ্য বিষয়কে তিনি সর্ব্বদাই দেখতেন কবিদৃষ্টির বর্ণসপ্তকের মধ্যে দিয়ে। ইতিপূর্ব্বে দেখেছি বাঙালীর মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেও তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কিভাবে ভাবসঞ্চার করতে পেরেছেন। তাঁর বর্ণনাত্মক লেখাগুলিতে এই প্রবণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ লেখাগুলি তিন শ্রেণীর—একরকম, ছোট ছোট সংক্ষেপে আঁকা কোন বিশেষ সময় বা স্থানের প্রকৃতি-দৃশ্য; কতকগুলি রেখা-অঙ্কন বা sketches,—যেমন "চন্দ্রপুরের হাট," "একরাত্রি" প্রভৃতি। আর এক শ্রেণী আছে, ভারতবর্ষের কোন কোন দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা, যেমন "কোণার্ক", "বারাণসী" ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, জাতি বা প্রথা সম্বন্ধীয় রচনাবলী, যেমন "অনার্য্য ব্রাহ্মণ" বা "গুজরাটে গরবা।" শ্রেণী অনুসারে লেখাগুলিতে বিষয়ের সঙ্গে বর্ণনাভঙ্গী কেমন সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রেছে সে কথা প্রথমেই উল্লেখ ক'রেছি। এইখানে "কোণার্ক" থেকে একটু উদ্ধৃত করি। পাঠক দেখ্‌তে পাবেন এ বর্ণনা কবির বর্ণনা কিনা। এবং ভাষাতে বিষয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে কিনা—

"পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিম শিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লীমুখরিত প্রান্তর-দেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকদল যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্নসূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে। কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল-শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।"

কিন্তু সমস্ত লেখাটি প'ড়ে দেখ্‌তে অনুরোধ করি। বলেন্দ্রের কল্পনাশক্তির আরো স্ফুট বিকাশ দেখ্‌তে হ'লে "একরাত্রি," "বনের ধারে" প্রভৃতি লেখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। কল্পনা আর হাস্যরসের অদ্ভুত মনোহর সংমিশ্রণের একটা ছবি দেখুন—

"রাত্রিকালে গাছটি নীরবে বসিয়া কত কি ভাবিতে থাকে—কত দুঃখের সুখের কথা তাহার মনে পড়ে, কত অতীতের কথা তাহার সেই বৃহৎ গুঁড়িটির মস্তকে আসিয়া উপস্থিত হয়, কত বালকের খেলা, কত বৃদ্ধের মাথা চুলকানো, কত হুঁকার বাদ্যধ্বনি এবং কতশত মধুমক্ষিকার গুণ্ গুণ্ গান তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, অবশেষে এখন নিশীথে নিদ্রা আসিয়া স্বপ্নে তাহার ডালপালা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে"—(একরাত্রি)।

এই শ্রেণীর লেখাগুলিতে লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি কেমন ক'রে এক স্বপ্নময় রহস্যপূর্ণ ধূসর পশ্চাৎপটের ওপর প্রখর কল্পনার একটা উজ্জ্বল মধুর ছবি ফুটিয়ে তোলেন, ক্রোড়-ভূমিতে মাত্র কতকগুলি উজ্জ্বল রেখাপাত ক'রে। এই সূত্রে "একরাত্রি" ব'লে লেখাটি বার বার পড়তে অনুরোধ করি। সেই স্বপ্নময় রাত্রির বর্ণনার মধ্যে দেখুন পথিকের বাস্তব বর্ণনা। তার ওঠা বসা, আকার প্রকার, দেহের রং, মুখের একটা আঁচিল পর্য্যন্ত, তার ভয় ভরসা, সমস্তই সেই আবেষ্টনের মধ্যে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে—

"পথিক এক্ষণে সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া এক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। মেঘের ছিদ্র দিয়া দুই চারিটি মাত্র তারা দেখা যাইতেছে। দূর হইতে বজ্রের গম্ভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে; অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা মাঠের বৃক্ষে বৃক্ষে আঘাত করিতেছে। কিন্তু বৃষ্টি অধিক পড়িতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে তড়বড় করিয়া দুই চারি ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি পড়িতেছে, আবার থামিয়া যাইতেছে। চন্দ্রমা এক একবার মেঘের কৃষ্ণসাগরে ডুব দিতেছেন আবার এক একবার আপনার সেই মধুমাখা মুখ পৃথিবীর দিকে তুলিতেছেন। বৃক্ষের নিম্নদেশ দিয়া একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট শৃগাল দৌড়িয়া গেল...মাঝে মাঝে শৃগালপাল 'হুকা হুয়া' রবে চীৎকার করিতেছে, দু একটা খেঁকী আর শৃগালদিগকে সাড়া দিতেছে, ইহা ভিন্ন সে সময় ঐ স্থানে অন্য কোন শব্দ হয় নাই। পথিক এই সকল শব্দ শুনিয়া এক একবার চমকিয়া উঠিতেছে।"

সারা দৃশ্যটি এই বর্ণনায় কেমন চোখের ওপর ফুটে ওঠে। তার সাময়িক ভাব আমাদের চারিদিকে ছেয়ে যায়। প্রহরে প্রহরে, ক্ষণে ক্ষণে, রাত্রির গতি নির্দ্দেশ; "চন্দ্রপুরের হাটে" দিনের প্রগতির বর্ণনা, হাট বসা থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যাবেলা ভেঙ্গে যাওয়া পর্য্যন্ত—এই সকল সূক্ষ্ম বর্ণনার ফলে সে সময়কার পারিপার্শ্বিক আমাদের কাছে সজীব হয়ে ওঠে। সে সময়কার আলো, বাতাস, শব্দ, গন্ধ সব যেন আমাদের কেন্দ্র ক'রে জেগে ওঠে। গ্রামের অশ্বত্থ গাছ আর তার তলায় গ্রাম্য বৃদ্ধদের দাবা খেলার মজলিসের কথা লিখতে কবি তাঁর সূক্ষ্ম বীক্ষণ-শক্তি আর পূর্ব্বস্মৃতির যে দক্ষ অথচ সহজ ব্যবহার ক'রেছেন তা থেকে বোঝা যায় খুঁটিনাটি বর্ণনায় কবির সপ্রেম সহানুভূতির ভাব। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তর-প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এ তারই পরিচয়। একটা সামান্য পথের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যেন তাঁর মনটাকে সেই পথের ওপর লুটিয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে সরতে চান না; প্রতিমুহূর্ত্তেই casting a longing lingering look behind!—

"চন্দ্রপুরের হাট নদীর খুব নিকটেই। নদী হইতে উঠিয়া একটা সরু গলির মতন রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া খানিকটা যাইলেই হাট। রাস্তাটী অত্যন্ত সরু। দুইজনের অধিক মনুষ্য এক সঙ্গে পাশা-পাশি যাইতে পারে না। রাস্তার দুই ধারে গাছপালা জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক একটা পর্ণকুটীর। কিন্তু কুটীরগুলির দরজা এই সরু রাস্তায় দিকে নয়। এই রাস্তাটিতে বর্ষাকালে প্রায় একহাঁটু জল দাঁড়ায়। অন্যান্য সময়েও রাস্তাটি কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় দু' একটা লতাগাছ এদিক হইতে ওদিকে গিয়াছে। অনেক সময় মুটেদের মাথার মোট লাগিয়া লতাগাছ ছিঁড়িয়া যায়। এই পথটি দিয়া যাইলেই হাট"—(চন্দ্রপুরের হাট)।

ওপরে যে সকল কথার অবতারণা করেছি তারই একটা উদাহরণ দিলুম। ছোট ছোট কথায় সাধারণ ভাষাবিন্যাসে, এই লেখাও কবিত্ব, কোণারকের বর্ণনাও কবিত্ব, "গৃহকোণ" লেখাতেও কবিত্ব, কিন্তু ভাষা ভঙ্গীতে কত প্রভেদ, কত বৈচিত্র্য, অথচ সবগুলিতে একই শিল্পীর যাদুস্পর্শের পরিচয়। এই যাদুস্পর্শ রামেন্দ্রসুন্দর সুন্দর ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন এই ব'লে—"বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ, কোমল, প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝলসাইয়া দেয় না কেবলই তৃপ্তি উৎপাদন করে।" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতই

ব'লেছেন—"ইহাতে প্রখরতা নাই কেবল শুভ্র মাধুরী; ঔজ্জ্বল্য আছে, দাহ নাই।"

বর্ণনামূলক লেখাগুলিকে অবলম্বন ক'রে লেখকের কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে আর দুটি একটি কথা না ব'লে এ প্রসঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারছি না। বলেন্দ্রনাথের কল্পনায় অনেকটা নাটাকারের সচেতন দৃষ্টিও ছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা অসংলগ্ন নিঃসঙ্গ জিনিষকে, তার একটু কোন বিশেষত্বে আকৃষ্ট হয়ে, তিনি এমন ভাবে চোখের সামনে টেনে আনেন যা কোন দক্ষ নাট্যকারই পারে। ক্ষুদ্র জিনিষ হয়ে যায় একটা বড় সামঞ্জস্যের অঙ্গ। বলেন্দ্রনাথ জানেন কি করলে সমগ্র দৃশ্যটি দর্শকের চোখের সামনে সত্য হয়ে উঠ্‌বে। তাই চন্দ্রপুরের হাটের পথে অবিরল জন-স্রোতের মধ্যেও চন্দ্রপুরের বাবুদের একজন সরকার ও একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না, কেননা তারা এমন একটা কাজে নিযুক্ত যাতে সেই ভীড়ের মধ্যেও তারা সকলের কুটিল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই লেখক তাকে সকলের হাতে সমর্পণ ক'রে তামাসা দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। অর্থাৎ তারা হাট থেকে জমিদারের পক্ষে "তোলা আদায় করে," সেই সঙ্গে কোন্ না—বলাই বাহুল্য। এই ধরণের দুষ্ট হাস্য বা sly humour রসপ্রবন্ধকারের এক আগ্নেয়াস্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার মধ্যে অর্থরচনা করার চেয়ে চোখে দেখা ছবি আঁকাতেই যেন বলেন্দ্রনাথের কল্পনা মুক্তি পেত বেশী। গাছের ডালপালা গুলো রাস্তার ওপর নুয়ে থাকে না ব'লে তিনি বলেন "অনেক সময় মুটেদের মাথার মোট লাগিয়া লতাগাছগুলি ছিঁড়িয়া যায়।" বলেন্দ্রনাথ তাঁর বর্ণনীয় বিষয়ের ভাবরসে কি রকম পূর্ণসিঞ্চিত হয়ে থাকতেন তা তাঁর বর্ণনার এই সহজ সরলতা থেকেই জানা যায়। হাটশেষে কোন পথিকের বাড়ী ফেরবার দৃশ্যটির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করি। পাঠক দেখ্‌বেন সে বর্ণনার ভাষা সত্যই "স্নিগ্ধ কোমল" ভাষা কিনা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা প্রশান্ত সন্ধ্যার গোপন পায়ের পূর্ণনীরব মৃদুতা কি সে বর্ণনাকে আবেশে জড়িয়ে নেই? কোন সমালোচক ব'লেছেন দৃশ্যবর্ণনার আদর্শপ্রথা নিছক বর্ণনা ক'রে যাওয়া, আর সেটা যদি সত্যবর্ণনা হয় তো সে আপনিই রসঘন হয়ে উঠ্‌বে, তাতে কষ্ট-কল্পনা ক'রে সৌন্দর্য্য আরোপ করবার দুর্বুদ্ধি মাথায় আসবে না। কথাটার সত্যতা বলেন্দ্রনাথের সহজ রসচঞ্চল বর্ণনা থেকেই উপলব্ধি হয়। "বনপ্রান্তে" লেখাটিতে দেখুন একটা গরুর গাড়ীর মন্থর গতির অনাড়ম্বর বাস্তবতার ভেতর দিয়ে কল্পনা কেমন উড়ে উড়ে চলেছে—

"আমার সেই গরুর গাড়িটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ীও চলিয়াছে বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই। সে যে সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; সেই সুনির্ম্মল ক্ষেত্রে তাহার চাকার একটি চিহ্নও পড়ে না, কেবল তাহার চারিদিকে তাহার পথের পার্শ্বে তারা ফুটিয়া উঠে, চাঁদ হাসিয়া চায়, সূর্য্য জাগিয়া উঠে; তাহার চারিদিকে জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু, সংসারের যোঝাযুঝি; কিন্তু সে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মুখের উপরে গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া একাকী নিঃশব্দে মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বা বীজ বপন করিয়া যাইতেছে, কোথাও বা শস্য কাটিয়া যাইতেছে। কেহ তাহাকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কথার উত্তর দেয় না।"

"পুলের ধারে" সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠার দৃশ্যেও কতটা চেতন রূপের সৃষ্টি আছে পাঠক পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারেন।

বলেন্দ্রনাথের কল্পনামূলক লেখাগুলির একটা আলাদা বিভাগ করেছি। তাতে তাঁর কল্পপন্থার খুব স্পষ্ট সহজ—পরিচয়ই পাওয়া যায়। নীচে উল্লিখিত কতকগুলি লেখা এই শ্রেণীর মধ্যে। বলেন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যা বলা হয়েছে তার বেশী এখানে বলবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এ লেখাগুলিতে সেই শক্তিরই আরো অমিশ্র প্রকাশ দেখা যায়। তবে যেখানে কোন কোন বিশেষ ভাবের অবতারণা আছে সে স্থানগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, "হৃদয়াঞ্জলিতে" কবির অন্তরপ্রকৃতির বিষাদ ভাব আর প্রেমভাবের পরিচয় পাই। "দুজনায়" আছে নিছক কবিত্ব—

"নীলিমার স্বপন-উপকূলে দুইখানি সান্ধ্য-হৃদয়ের গভীর নিরাশা শেষ চুম্বনের দুইটি কনক রেখায় পরস্পরের গভীর বিস্মৃতি রাখিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। দুজনার মিলন-আশার বিকাশে যে দুইটি সুন্দর

চম্পক-মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল ম্লান-মুখে ছলছল নয়নে তাহা অবসিত হইল। সন্ধ্যার আলুথালু কেশজালের মধ্য দিয়া সেই নৈরাশ্য-ছিন্ন বিরহ-আকুলদের চিরবিদায়ের স্মৃতির আকুলতা ফুটিয়া উঠিল। সান্ধ্য নীলিমার একটী গবাক্ষদ্বার খুলিয়া একজন গ্রহবালা সেই নিরাশ আকুলতার জন্য এক ফোঁটা অশ্রু মোচন করিল।"

"বিরহ" লেখাটিও এই ভাবের। একস্থানে পাই, বলেন্দ্রনাথের একটু হাস্যরসের নমুনা—

"শ্রাবণের মুখশ্রীর অনেকে খুব সুখ্যাতি করেন—তাঁহারা বলেন শ্রাবণের মুখে কি একটা মিষ্ট ভাব আছে। আষাঢ়েরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যে কেহ একবার রথের ভেঁপু শুনিয়াছে সে আর এমন কথা বলে না। গাল দুটি ফুলাইয়া রথের দিনে ছেলেরা কেমন ভেঁপু বাজায়---আষাঢ় না হইলে সে ভেঁপু বাজে না। আষাঢ়ের মিষ্ট ভাবে ভেঁপু মধুর শুনায়"—(আষাঢ় ও শ্রাবণ)।

"ভাদ্রমাসে ভরাগঙ্গা" লেখাতে বাস্তব-বর্ণনা আর কল্পনার ওতঃপ্রোত মিলন বড় মধুর হয়েছে, আবার "সে" নামক লেখাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবের গীতোচ্ছ্বাস—

"সে আর নাই। যে যায় সে কি আর থাকে? সে আর ফিরিবে না। লতাকুঞ্জে বসিয়া প্রতিদিন সে আনমনে মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার মালাগাঁথা কখনও শেষ হইল না, ঊষা আসিয়া সেখানে এখন চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া থাকে, শ্যামল নবীন কিসলয়গুলির মধ্যে কোন্ নিশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা শুনিতে গিয়া যেন চমকিয়া উঠে। বকুল ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া লতাকুঞ্জের সম্মুখে স্তূপাকার হইয়াছে, ঊষা সেই ঝরা ফুলের উপর দিয়া নীরবে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া যায়; ঊষার মস্তকে, কেশগুচ্ছে, বাহুপরি আরও বকুল ঝরিয়া পড়ে। সেখানে যে বসিত, সে আর এখন বসে না। সন্ধ্যা একবার আকুল হৃদয়ে লতাকুঞ্জে আসিয়া বসে, ঝরা ফুলগুলি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে; কিন্তু সন্ধ্যা আর থাকিতে পারে না, তাহার প্রাণ বুঝি কেমন করিয়া উঠে, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। সারাদিন সারানিশি উন্মত্ত পবন শুধু সেখানে হাহাকার করিয়া বেড়ায়; লতাকুঞ্জ শিহরিয়া উঠে, বকুল ঝরিতে থাকে, আর জন-প্রাণীর সেখানে সাড়া শব্দ নাই।"

কল্পনাশ্রেণীর লেখাগুলিতে কতকগুলি আছে বিশেষ ক'রে প্রকৃতিবর্ণনা। "সন্ধ্যাতে" আছে প্রকৃতির মোহিনী শক্তির প্রকাশ; "ঊষা ও সন্ধ্যায়" কবি সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতির চেতনরূপ। "বসন্তের কবিতা," "আষাঢ় ও শ্রাবণ" ও এই ধরণের প্রবন্ধ। এই প্রকৃতিবিলাসে কবি মগ্ন হয়েছেন—কখন তিনি সৌন্দর্য্য সন্ধান করেন প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সূক্ষ্ম তুলনামূলক সমালোচনা ক'রে, যেমন "শরৎ ও বসন্ত;" আবার কখন ভেসে চলেন মুক্ত কল্পনার অবাধ স্রোতে।

দুটি লেখা একটু বিশিষ্ট ধরণের—"গান" আর "হৃদয়াঞ্জলি।" এগুলি থেকে কবির রহস্যবাদ বা অলোকপন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। তাঁর চোখে বহিঃপ্রকৃতির শ্যামলরূপ, অনন্তরূপেরই ছায়া। বাল্যকাল থেকে বলেন্দ্রনাথের জীবনে আর কাজে যে ধর্ম্ম ও শান্তভাবের আভাস ছিল তার সঙ্গে এ ভাবের যোগ থাকা বিচিত্র নয়। এই সম্পর্কে তাঁর শেষ রচনা "প্রার্থনাও" পাঠ্য। তাতে আরো জ্বল জ্বল করেছে বলেন্দ্র জীবন সম্বন্ধে যা শেষ কথা—অর্থাৎ তাঁর জীবনে তিনি সত্য আর বিবেককেই তাঁর চরিত্রের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ধারণ করেছিলেন—

উপরোক্ত সমস্ত আলোচনা থেকে পাঠকের মনে ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে বলেন্দ্রনাথ বুঝি মোটের ওপর নিছক কল্পনাবিলাসী কবিই ছিলেন। এ ধারণা যে তাঁর পক্ষে অপমানকার হ'ত তা মনে করি না, যদি না বাস্তব অন্যরূপ হ'ত। কারণ বাংলা রসপ্রবন্ধের ইতিহাসে বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথাটাই বিশেষ ক'রে মনে রাখবার, যে তিনি তাঁর কবি প্রেরণার সঙ্গে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিরও সংযোগ করেছিলেন—তাঁর লেখার রসমূল্যের কোন হানি না ঘটিয়ে। সেই জন্যেই রসপ্রবন্ধকার হিসাবে তাঁকে এত আদর্শ, এত কেন্দ্রিক (central), এত true to type ব'লে মনে করি। এই বুদ্ধিবৃত্তিকে উপলক্ষ ক'রে রামেন্দ্রবাবু বলে গেছেন—"তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতেন; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া মেরুদণ্ডহীনের মত ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই... ইহাতে তাঁহার সংযম ও নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন স্বাস্থ্যের ও বলিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।" এই সূত্রে তাঁর চিন্তামূলক লেখাগুলির আলোচনা করতে হয়।

এ লেখাগুলিতে ভাব ও বুদ্ধির সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এ গুলিতে লেখক তাঁর লেখ্য বিষয় থেকে কখন দৃষ্টিচ্যুত হ'ন না, অথচ তার মধ্যে "সৌন্দর্য্য আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল।" বলেন্দ্রনাথ এরকম করতে

পেরেছিলেন তার কারণ শক্তির সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই সহানুভূতিকেও ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর বল ছিল "হৃদয়ের বল।" সত্য উদ্ঘাটনে এই ছিল বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব পন্থা। তথ্য থেকে সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে সৌন্দর্য্যবোধের সাহায্য নেবার প্রবণতা তাঁর ছিল বলেই তিনি শুধু প্রবন্ধকার নন, তিনি রসপ্রবন্ধকার। তিনি ছিলেন রূপের কারবারী। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি তাঁর "ক্ষণিক শূন্যতা" বা "নগ্নতার সৌন্দর্য্য" নামক লেখাগুলি। প্রত্যেকটিতে দেখা যায় তাঁর কল্পনার আবেগ যতই প্রবল হোক না কেন, তিনি তাঁর তীক্ষ্দৃষ্টির বলে হস্তগত বিষয়টির মূল সত্যটুকু সহজেই ধরতে পেরেছেন। সেটাকে ঘিরেই তিনি তাঁর স্বপ্নজাল বুনতে থাকেন, কিন্তু সেটা সে জালের মধ্যগ্রন্থি হয়েই থাকে। মনে হয় সমস্ত বয়ন-কারুতা এই কেন্দ্রটিতেই ধৃত—সে পরিধি যেন কেন্দ্রেরই বিস্তার, তারই অর্থ, ভাষ্য, টীকা, বা আধার। কল্পনাবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থের স্পষ্টতা আর স্বচ্ছতার একটু পরিচয় দি—

"নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্য তাহার সৌন্দর্য্য কূলে কূলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করিবার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নগ্ন সৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশ। উষার সৌন্দর্য্য কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়? শকুন্তলা, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর দেখ প্রফুল্লমুখী—ব্যাখ্যা না করিলে তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? প্রাচীন নিষ্কাম ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া চৌধুরাণী স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন; দরবার, রাজত্ব—সকলই ভাগ্যে জুটিয়াছিল, ভাবও নিষ্কাম, তথাপি সে চরিত্র তেমন ফুটিল না—যেন জাঁতায় পেষা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পাশে শৈবলিনীকে দেখ, নগ্ন সৌন্দর্য্যে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজায় আছে। নগ্নতায় সৌন্দর্য্য ফুটে অধিক। তাহার মর্ম্মে কি যেন 'লজ্জাহীনা পবিত্রতা' জাগিয়া আছে" (নগ্নতার সৌন্দর্য্য)।

পাঠক দেখলেন বর্ণনাশক্তির সাফল্য, সূক্ষ্ম তুলনাশক্তির প্রাচুর্য্য, বস্তুপরিচ্ছিন্ন অর্থকঠিন ভাবের সরস, মূর্ত্ত, প্রকাশ? এইখানেই রসপ্রবন্ধকারের বৈশিষ্ট্য আর বলেন্দ্রনাথের প্রিয় পাঠক এই দিক থেকেই তাঁকে বুঝবেন। অর্থ উদ্ঘাটন করতে যে তীব্র বিশ্লেষণশক্তি, ন্যায়জ্ঞান, আর যুক্তি অবতারণা করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল তা বিস্ময়কর। এমন কি, এই শক্তি তুলনামূলক সমালোচনায় বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায় ব'লে এ ধরণের আলোচনা তাঁর একটা mannerism বা ভঙ্গিমার মতন দাঁড়িয়ে গেছলো, যদিও তাতে বিশ্লেষণ আর অর্থ বা ভাব পরিস্ফুটনের সাহায্য হয় ব'লে তিনি সে পদ্ধতিটাকে সহজে ত্যাগ করতে পারতেন না। তাঁর নিছক কল্পনামূলক লেখাগুলিতেও এই পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধগুলির নাম থেকেই অনেকটা বোঝা যায়। যেমন "শরৎ ও বসন্ত," "আষাঢ় ও শ্রাবণ," "রং ও ভাব," "গোধূলি ও সন্ধ্যা" ইত্যাদি। এইখানে বলেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণশক্তি ও যুক্তিজ্ঞানের একটা উদাহরণ দি—

"তবে কি এই অতীতের প্রতি প্রেমের মূল চির বিরহ? তাহা নয় ত কি। মিলনে প্রেম আরম্ভ হয়, কিন্তু বিরহ না হইলে প্রেম ধরা দেয় না। বিরহে অভাব অনুভব করা যায়, হৃদয়ের আকুলতা ধরা পড়ে, সুপ্ত প্রেম জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান নাকি কেবলই মিলন তাই তাহাতে প্রেম তেমন বিকশিত হইয়া উঠে না। কিন্তু যখনই বর্ত্তমান হইতে আমরা তফাৎ হই—বর্ত্তমান অতীত হইয়া দাঁড়ায় তখনই তাহার প্রতি কেমন একটা টান দেখা যায়। বিরহে প্রেম ঘনাইয়া আসে। সীতাকে বনবাস দিয়া রামচন্দ্র থাকিতে পারিলেন, কারণ সীতা তখনও বর্ত্তমান। কিন্তু সীতার সহিত যখন তাঁহার চিরবিরহ হইল, যখন ইচ্ছার উপরে মিলন নির্ভর করিতেছে না, যথার্থ বিরহ হইয়াছে, তখন রাম আর থাকিতে পারেন না—পর্ব্বতের মত অটল হইয়াও রামচন্দ্র অধীর। অতীতের সহিত নাকি সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে—তাহাকে ধরিবার, স্পর্শ করিবার, উপভোগ করিবার উপায় নাই, তাই তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অতীতের দুঃস্বপ্ন ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়, জ্যোৎস্নালোকই পড়িয়া থাকে।"

তুলনামূলক সমালোচনার ঐ লেখা থেকেই একটা নমুনা দেখুন—

"মিলনে স্মৃতি নাই—বিরহ স্মৃতিময়। বর্ত্তমানের স্মৃতি কোথায়? অতীতেরই স্মৃতি। আমরা বর্ত্তমানে অনেক জিনিষ এত বেশী করিয়া দেখি যে তাহার রহস্যটুকু সৌন্দর্য্যটুকু মুছিয়া যায়। ছবি নিকটে আসিয়া দেখিলে অনেক সময় দেখা এত অধিক হয় যে রঙের আতিশয্য বই আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়া উঠে। যখন চক্ষের সম্মুখে একটি খোলার ঘর দেখি, তখন আমরা হয়ত একবার ফিরিয়া চাহি না, কিন্তু চিত্রে যখন

সেই ঘরটি দেখি তখন জন্মের মত হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য প্রথমাবস্থায় আমরা তাহার সমস্তটাই দেখিতে পাই। চিত্রে তাহার অস্ফুট ছায়ামাত্র দেখি, বস্তু গিয়াছে, ভাবমাত্র অবশিষ্ট। অতীতেও বস্তু গিয়াছে—ভাব আছে মাত্র। সেই ভাবই স্মৃতি। স্মৃতিতেই অতীত মধুর। বর্ত্তমানে বস্তুরই অধিকার—ভাব যেন ফুটিতে পায় না। বস্তু স্থায়ী নহে, ভাব স্থায়ী। এইজন্য অতীত হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে--অতীতের জন্য আমরা বিলাপ করি। বর্ত্তমান প্রতিদিন শুকাইয়া যায়। অতীত আসিয়া সেই শুষ্ক ভূমির উপরে শ্যামল উদ্যান রচনা করে"—(অতীত)।

এই ধরণের তুলনার খুব সুন্দর পরিচয় আছে "অশ্রুজল" ব'লে লেখাটিতে, যেখানে লেখক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অশ্রুর তুলনা করেছেন।

চিন্তামূলক লেখাগুলিতে আরো দু'একটি বিষয় লক্ষ্য করি। "কৃতজ্ঞতা", "বড় মানুষী", "উপভোগ" শীর্ষক লেখা তিনটিতে বলেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ন্যায় আর ধর্ম্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি ক'রে আমাদের সামাজিক ব্যবহারের একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা ক'রেছেন। তার সার কথা এই যে আমাদের ব্যক্তিগত আদান-প্রদান আর ব্যবহারে যদি আমরা আর একটু সত্যপরায়ণ হই, আর একটু বিবেককে মেনে চলি, তা হ'লে অনেক ঝঞ্চাটই মিটে যায়।

আর একটা কথা—বলেন্দ্রনাথের হাস্যরস এক এক সময়ে কত ঝাঁঝালো বিদ্রূপাত্মক হ'য়ে উঠ্‌তে পারতো, বিশেষতঃ বাঙালীর বিদেশিপ্রিয়তা প্রসঙ্গে, এই লেখাগুলি থেকে তার একটু নমুনা দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু বিদ্রূপবাণের মধ্যেও তিনি হাস্যরসের বারিসিঞ্চনে আঘাতকে লঘু করতে পারতেন। নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল —

"শুনিলে বিশ্বাস করিতে লজ্জা বোধ হয় আমাদের বসনান্তরালের নিভৃত বুনুশীটি পর্য্যন্ত এক্ষণে জার্ম্মণি হইতে আমদানী হইতে সুরু করিয়াছে। এবং কেবলমাত্র এই রঙীণ সুতাগাছি দিয়া জার্ম্মণি বর্ষে বর্ষে নিঃশব্দে কয়লক্ষ মুদ্রা গৃহে লইয়া যাইতেছে। আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, বানরের মত কটিদেশে ঐ রজ্জুখণ্ড বাঁধিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছি; গলায় বাঁধিয়া ঝুলিবার সুবুদ্ধিটুকু একবারও মনে উদয় হইল না"—(বেনোজল)।

"অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব" প্রবন্ধটিতে এইরূপ বিদ্রূপরস যথেষ্ট আছে। তা থেকে উপলব্ধি হয় বলেন্দ্রনাথ কাপট্যের কত বড় শত্রু ছিলেন। বাস্তবিক, একটা অন্তর্নিহিত বিশ্বস্ততা তাঁর চরিত্রে, কাজে, চিন্তায়, লেখায় সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

চিন্তামূলক রচনাগুলির মতন গবেষণামূলক লেখাগুলিতেও সেই বিশ্লেষণ শক্তি, সেই সম্পূর্ণতা, সেই স্বচ্ছদৃষ্টি, সেই জ্ঞান, সেই ন্যায়ভিত্তি, সেই বিচারক্ষমতা, সেই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, সেই তর্কপ্রতিভা, স্থির বিশ্বাসের সেই আবেগ, হাস্যরসের সরসতা, আর সবার ওপর সেই স্বকীয়তার ছাপ লক্ষ্যগোচর হয়। এ সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘ না ক'রে মোটের ওপর "স্ত্রী ও পুরুষ" প্রবন্ধটি উল্লেখ ক'রে ক্ষান্ত হ'ব।

শিল্প ও সাহিত্য সমালোচক বলেন্দ্রনাথের কথা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়, কেননা বর্ত্তমান প্রসঙ্গ, স্রষ্টা বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে; যদিও সমালোচনাক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ স্রষ্টাই ছিলেন।

আজকের আধুনিকতার প্রবল বন্যায় বলেন্দ্রনাথ তাঁর স্থান রাখ্‌তে পেরেছেন কিনা জানি না, যদিও তাঁর কাছে এমন জিনিষ পাওয়া যায় যাতে অনেকের আধুনিকতার ক্ষুধা তৃপ্ত হ'তে পারে। তার কারণ মনে হয় বলেন্দ্রনাথ ছিলেন কতকপরিমাণে সত্যদ্রষ্টা। তিনি অনেক কথাই এমন বলে গেছেন, অনেক জিনিষেরই এমন অর্থ ক'রে গেছেন যা চিরদিনই নির্ভুল। বাংলা সাহিত্যে আজকের দিনে অশ্লীলতাতত্ত্বের প্রবল আলোচনা চল্‌ছে। অশ্লীলতা কথাটার পরিভাষা যা বলেন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন তা এই— "অশ্লীলতা সাময়িক সমাজের ভদ্রনিয়মের ব্যভিচার মাত্র।" কথাটা মনে থাকৃলে বর্ত্তমানের অনেক জটিল আলোচনা সহজ হয়ে যায়। কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"কৃতজ্ঞতা তো আর কিছু নয়, হৃদয়ের আশ্রয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাহার নিকট আপনাকে বলিদান।" এ ভাবে চল্‌লে আধুনিক সমাজের দিক্‌পালরা সামাজিক ব্যবহাররীতিতে অনেকখানি শোভন সম্ভ্রম আর ভদ্রতার আমদানী করতে পারেন, যেটা ক্ষুদ্রতর জীবদের অনুকরণীয় হবে। বিশেষ ক'রে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে "স্ত্রী ও পুরুষ" এ বলেন্দ্রনাথ যে পথে নারী সমস্যার আলোচনা ও সমাধান নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন, আজকের অনেক সমাজতাত্ত্বিক অনেক তর্কের পরও, তার উর্দ্ধে উঠ্‌তে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না; কারণ

বলেন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাইরের নিয়মের দিকটা ছেড়ে ভেতরের যুক্তির দিকেই দেখ্‌তেন বেশী। তাই তাঁর মতামতে বেশীর ভাগ পাই তথ্যের কাঠামোর চেয়ে সত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

ঠিক বলেন্দ্রনাথের শ্রেণীর প্রবন্ধকার আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যে কয়জন তা বলতে পারি না। রসপ্রবন্ধের জন্ম আনন্দের উৎসে, অথচ আজকের অধিকাংশ লেখার প্রেরণা তাইতেই, কিম্বা "একটা নতুন কিছু কর"র মত্ত আবর্ত্তে, অথবা একটা অক্ষম নিষ্ফল, এবং অনেক সময়ে, অনাবশ্যক সমস্যা-সমাধান-প্রিয়তায়, তা সব সময়ে বোঝা যায় না। তর্ক যেখানে সেখানে শান্তি নেই, আর শান্তি যেখানে নেই সেখানে আনন্দও নেই, আর রসেরও বিন্দুস্ফুরণ হয় না। রসপ্রবন্ধ তাই সেই স্বর্ণযুগের, বা ব্যক্তিগত জীবনে সেই স্বর্ণমুহূর্ত্তের, লেখা যখন কোন যুদ্ধযাত্রার তাগিদ নেই, যখন পক্ষ অবলম্বনের বিড়ম্বনা নেই, যখন কেবল মুক্ত আকাশের তলায় আছে এককার মিলনের রাখীবন্ধন। রসপ্রবন্ধকার শিল্পীর মুখে লেগে থাকে সাম্য, মৈত্রী, আর প্রীতির একটা উজ্জ্বল মধুর হাসি। আর বলেন্দ্রনাথের মধ্যে এই ধরণের "শান্ত ও বিনম্রভাব" এত বেশী ছিল যে সেটা তাঁর প্রাণ থেকে এসে তাঁর লেখাকেও ছুঁয়ে গেছ্‌লো। হয়ত কোন জ্যোতির্লোকের সীমানা ভেঙ্গেই সেটা তাঁর জীবনের মন্দাকিনী ধারাতে উছ্‌লে পড়েছিল। তাই বুঝি তিনি গরীবদের দান ক'রে আনন্দ পেয়েছেন, তাই "যে একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে গেছে।" আজ অনেক পাঠক বলেন্দ্রনাথের চরিত্র, সাধনা ও রচনা থেকে শান্তি, তৃপ্তি আর আনন্দ সংগ্রহ করতে পারেন। আর তাঁর সাহিত্যকীর্ত্তি থেকে যে অনেক লেখকই মন্ত্রদীক্ষা নিতে পারেন সে ধারণাও ভ্রান্ত ব'লে মনে হয় না।

শ্রীনবেন্দু বসু

সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় !

শিল্পী—শ্রীমনীষী দে

হাতিরাম

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

(ধর্ম্মমূলক কাহিনী)

তার নাম ছিল হাতিরাম।

নাম শুনে হাসি পেলেও, যে তার চেহারা দেখেছে, সে আর নামকরণের দোষ দিতে পারবে না। মোটা সোঁটা নাদুস্-নুদুস্ ঘাড়ে-গর্দ্দানে, গোদা গোদা পা, তবে চারটে নয়, দুটো।

চেহারায় যদি বা কিছু গলদ থাকে ত' বুদ্ধিতে একেবারেই নেই। ঠিক যেন হাতী, সেই রকম মোটা আর ভারী।

হাতিরামের সাধ হ'ল, সে তার ভগবান বালাজীকে পায়। বালাজীর অনেক রকম অদ্ভুত কাহিনীর কথা সে ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে; তাঁকে একবার পেলে নাকি আর কোনও দুঃখ, কোনও কামনা থাকে না; আর দুনিয়ার পেট-মোটা সয়তানদের নাকি সেই-রকম ক'রে চ'ষে ফেলা যায়, যেমন ক'রে হাতি তার প্রকাণ্ড চার পায়ে ক্ষেতের শস্য মাড়িয়েমাড়িয়ে চলে। বালাজীকে পাওয়ার ত' মোটামুটি এই লাভ, কিন্তু সে আরও অনেক রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য লাভের কথা শুনেছে, যা সে ভাল বুঝতে পারে নি, কিন্তু যা মোটের ওপর তার মনকে তাঁকে পাবার জন্যে আরও একাগ্র ক'রে তুলেছে।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল আসল জায়গায়। তাঁকে পাওয়ার যে সহজ সনাতন পন্থা, পুজো-আচ্চা, ধ্যান—ধারণা, সে তার একেবারেই আসে না। পুজো করতে গেলে পেট ফোলে, ধ্যান করতে বসলে দম্ আটকে আসে। অথচ তাঁকে না পেলেই নয়, বালাজী ছাড়া এত বড় দেহ, দেহ বলেই মনে হয় না, মনে কোন ফূর্ত্তিই আসে না।

তখন সে গুরু খুঁজতে বেরোলো। এমন গুরু যিনি তাকে তার নিজের মনের মত পথটি বলে দিতে পারেন। এই সুস্থ সবল শরীর নিয়ে সে খেটে দিতে পারে অসাধারণ, কিন্তু পুজো-আচ্চা সে পারবে না। এতে যদি পাওয়া যায় তাঁকে।

পাতি পাতি ক'রে সে অযোধ্যার মন্দিরে মন্দিরে, ঝোপে জঙ্গলে, গুরু খুঁজলে, কিন্তু কোন ও গুরুই তার এই অদ্ভুত সর্ত্তে রাজী হ'লেন না। তাঁরা একটু খানি হেসে তার মোটা চেহারার দিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে জানালেন, তা হয় না।

সূর্য্য অস্ত যায় যায়। সমস্ত দিন ব্যর্থ পরিশ্রমের পর, ভয়ানক দ'মে গিয়ে হাতিরাম এসে বসল সরযূর তীরে। সরযূর জল তখন রাঙ্গা রোদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাতিরামের চোখে যেন জল আসবার মত হ'ল। মোটা-লোকরা তা হ'লে বালাজীকে পাবে না। এ কি বিচার তাঁর! সে কি ইচ্ছে ক'রে মোটা হ'য়েছে? ক'রে দিন না তিনি তাকে পাঁকাটির মত রোগা, ট্যাংটেঙ্গে! অভিমানে তার বুক ভরে উঠল।

'হাতিরাম'—।

হাতিরাম ফিরে দেখলে রোগা ছিপ-ছিপে একজন লোক, রং যেন ফেটে পড়ছে, মুখে প্রশান্ত হাসি। কালো চুলের পাশে পাশে পড়ন্ত রোদের রাঙ্গা আলো যেন আগুনের মত জ্বলছে।

'কি চাও হাতিরাম?'

হাতিরাম চুপ ক'রে বসে রৈল। অভিমানে একটি কথাও বলতে পারলে না।

তখন তিনি এসে তার পাশে ব'সে পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন,—বলো।

বুক যেন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। হাতিরাম তখন তার সব কথা বল্লে, কেমন ক'রে তার মন বালাজীকে পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়েছে, আর গুরু খুঁজে পাবার জন্যে তার কি লাঞ্ছনা গেছে সমস্ত দিন। ব'লে সে তার দুই হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে রৈল।

তিনি বল্লেন হাতিরাম, দুঃখ করোনা, আমি তোমার গুরু হব।

কথা শুনে হাতিরামের প্রাণ যেন নেচে উঠল। তার ভারী মুখ চোখ হাল্কা হ'য়ে গিয়ে হাসবার মত হ'ল। সে বল্লে কিন্তু আমি ত' পুজো-আচ্চা কিছু পারব না।

তিনি হেসে বল্লেন, তার ত' দরকার নেই হাতিরাম।

হাতিরাম আনন্দে হেসেই ফেল্লে। বল্লে, তা হ'লে কি করতে হবে?

গুরু বল্লেন, পুজো-আচ্চা আর দরকার নেই বটে, কিন্তু আমি যা বলব তা তোমাকে একমনে, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।

হাতিরাম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে সে কি গুরুদেব?

গুরুদেব বল্লেন, বালাজীর নাম ক'রে বালাজীর সেবায়, তোমাকে একটা কাজ একাদিক্রমে বারো বৎসর করতে হবে। সে যে কাজই হ'ক না কেন, যত ছোটই হ'কনা, যা তোমার ভাল লাগে বালাজীর সেবায় সেই কাজ ক'রবে। বুঝেছ,—বার বৎসর, অবিচলিত নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে, যেন একটি দিনও বাদ না যায়। তা হ'লে তাঁকে পাবে, বারো বৎসর যে দিন শেষ হবে, সেইদিন।

হাতিরাম ভারী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, তা হ'লেই তাঁকে পাবো, বারো বৎসর পরে, একটুও পুজো-আচ্চা না ক'রেই?

গুরু বল্লেন, হাতিরাম, একেই ত' বলে পুজো। হাঁ তা হ'লেই তুমি তাঁকে পাবে।

হাতিরাম সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বল্লে, আর যদি বারো বছরের পর তাঁকে না পাই।

গুরু হেসে বল্লেন, তার দায়ী রৈলাম আমি।

হাতিরাম প্রণাম ক'রে গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মাখালে। বল্লে গুরুদেব, আমার কাজে ভুল হবে না, কিন্তু বারো বৎসর পরে যেন নিশ্চয়ই পাই তাঁকে।

গুরু তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন তাকে।

সেখান থেকে সোজা চ'লে গিয়ে অনেক পথ হেঁটে হাতিরাম পৌঁছল বালাজীর মন্দিরে। সেখানে ব'সে ভাবতে লাগল, কি এমন কাজ সে বালাজীর জন্যে করতে পারে, যাতে আর কারুর আপত্তি হবে না।

বালাজীর ভোগ রাঁধা? সে তাকে নিশ্চয়ই করতে দেবে না। মন্দির পরিষ্কার করা? তাও হয়ত' দেবে না। বালাজীর ঘরে হয়ত' তাকে ঢুকতেই দেবে না। তখন সে ভাবতে লাগল কি কাজ করে। অনেক ভেবে ঠাওরালে যে সে রোজ বালাজীর ভোগের জন্যে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবে—এতে তাকে কেউ বাধা দেবে না, অথচ বালাজীর কাজও করা হবে।

তার পরদিন থেকে সুরু হ'ল কাঠ ব'য়ে নিয়ে আসা। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ্দুর, শীত, কিছুতেই কামাই নেই। চন্দ্র সূর্য্যি বরং ভুল করতে পারে, কিন্তু তার ভুল নেই। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিনে সে সেই কাঠ-যোগানর কাজে;—তার একাগ্র মন, আর ব্যাকুল প্রাণ।

কাঠ যখন এত সহজে নিয়মিত যোগান হ'তে লাগল, তখন তা কাজেও লাগতে লাগল, আর সে যে-সে কাজ নয়, বালাজীর ভোগ-রাঁধা কাজে। এই একটা লোক, না—বলা না—কওয়া, রোজ রোজ যে এমনি একটা পরিশ্রমের কাজ নিয়মিত করতে লাগল, তাতে পুরুত-ঠাকুরের ও ক্রমে ক্রমে দয়া হ'ল খুব, আর তার ফলে হাতিরাম জায়গা পেয়ে গেল মন্দিরের এক-পাশে, এমন কি রোজ—দুবেলা সে দুটি ক'রে বালাজীর ভোগও পেতে লাগল।

অবিচলিত, অস্খলিত নিষ্ঠার সঙ্গে এমনি ক'রে দশবৎসর সে নিয়মিত কাঠ যোগাড় ক'রে নিয়ে আসতে

লাগলো, কোনও গোলযোগ হয়নি। কিন্তু তারপরে হ'ল মুস্কিল।

যে বন থেকে সে কাঠ আনত, হঠাৎ একদিন তার রক্ষক এসে হাজির—মেজাজ একেবারে তেরিয়া, রুক্ষ কণ্ঠে বল্লে, হাতিরাম এ তোমার কি কাণ্ড! কাঠ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বনটাকে যে একেবারে সাবাড় ক'রে দেবার দাখিল। দশ বৎসর, কর্‌ছ এই চুরি,—বাস্, আর তোমাকে কিছুতেই কাঠ নিয়ে যেতে দোবো না।

এই রোগা কাঠির মত চেহারা তার এত দাপট। একবার ইচ্ছে হ'ল মোটা মোটা দু হাতের দুই মোক্ষম চড়ে ওর মাথার খুলিটা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেয়, কিন্তু হাতিরাম সামলে নিলে, এই কথা ভেবে, যে এখনও বালাজীর সেবার তার দু'বছর বাকী,—এখন রাগ করলে তার আসল জিনিষই ফাঁকি পড়ে যাবে।

কপালের ঘাম মুছে, একটা প্রকাণ্ড ঢোঁকের সঙ্গে রাগটাকে বোধ করি পেটের ভেতর হজম হ'তে পাঠিয়ে দিয়ে, হাতিরাম খুব ঠাণ্ডা কোমল স্বরে বল্লে, ভাই রক্ষক, তুমি কি না পার, তুমি ত ইচ্ছে করলে আজই আমার কাঠ-নেওয়া বন্ধ ক'রে দিতে পারই!

একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে রক্ষক বল্লে পারিই ত!

হাতিরাম বল্লে, আলবৎ, একশো-বার! কিন্তু ভাই কাঠ ত আমি চুরি করিনে, আমি যে নিয়ে যাই বালাজীর সেবায়, আর এইতে তাঁর রোজ ভোগ রাঁধা হয় যে!

রক্ষক ব'ল্লে, বালাজী—টালাজী বুঝিনে। কাঠ আর তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, এই আমার হুকুম।

হাতিরাম বল্লে, রাগ ক'রছ কেন ভাই, আমি ত' তোমার গাছের একটা কাঠও ভাঙ্গি না। তোমার এত বড় বনে যে কাঠ কুটো ডাল-পালা মাটিতে পড়ে থাকে, আমি ত তাই সংগ্রহ করি, তাই আমার যথেষ্ট! রাগ ক'রোনা ভাই, কাঠ আমাকে নিয়ে যেতেই হবে যে।

ব'লে তার হাতে পায়ে ধ'রে সাধ্য-সাধনা ক'রে হাতিরাম রক্ষক-কে রাজী করলে, কিন্তু সর্ত্ত এই হ'ল যে যেদিন হাতিরামকে রক্ষক গাছের কাঠ ভাঙ্গতে দেখবে, সেইদিন থেকে হাতিরামের বনের দিকে আসা বন্ধ।

হাতিরাম স্বীকার ক'রে হাসতে হাস্‌তে কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরল।

এই রকম আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে কাঠ ব'য়ে ব'য়ে বারো বৎসর উত্তীর্ণ হ'ল। পরিবর্ত্তনের মধ্যে তার নিজের চেহারাটা হ'য়ে গেছে একটু রোগা, ও আর-একটু কালো—কিন্তু কোথায় বালাজী? কোথায় তিনি, যাঁকে পাবার লোভে সে আজ বারো বৎসর ধ'রে প্রাণপাত করলে? মন্দিরের পাষাণ মূর্ত্তি, সে যে অচল অটল!

তখন তার ভারী অভিমান হ'ল গুরুর ওপর, সে মুখে জল পর্য্যন্ত না দিয়ে বেরোলো গুরুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

গোঁ-এর ভরে হন্ হন্ করে চলছে, মাথার ওপর রোদ ঝাঁ—ঝাঁ করছে, এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকলে,—হাতিরাম ও হাতিরাম।

হাতিরাম ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে সেই বনরক্ষক। বন-রক্ষক চীৎকার ক'রে ব'ল্লে দক্ষিণের বন সাবাড় ক'রে এখন বুঝি যাওয়া হচ্ছে উত্তরের বনের কাঠ চুরি করতে!

হাতিরাম ঝাঁপিয়ে উঠে বল্লে, খবরদার। মুখ-সামলে কথা ক'য়ো, সাত-জন্মে হাতিরাম কারুর কাঠ চুরি করে নি—কারুর মুখ-নাড়া সে বরদাস্ত করবে না, বলে রাখছি।

বন-রক্ষক হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এসে হাতিরামের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বল্লে, ব্যাপারখানা কি হে হাতিরাম, মেজাজ যে এত তেরিয়া। একেবারে সপ্তমে! এই না সে-দিন তুমি আমারই পায়ে ধ'রে এত সাধ্য-সাধনা করলে, আর আজ একি ব্যাপার!

হাতিরাম লোকটা ছিল ভাল। সে একেবারে হেসে ফেল্লে, বল্লে সে-দিন যে আমার বড্ড জরুরী কাজ ছিল, উদ্ধার না হ'লে নয়, তাই ত' তোমার কাছে ছোট হ'য়ে মিনতি করতে হ'য়েছিল—কাঠ যে না হ'লে কিছুতেই চলত না!

বন-রক্ষক বল্লে, তাই নাকি! রোজ রোজ কাঠ নিয়ে কি করতে হাতিরাম?

হাতিরাম বল্লে, বলেছিলাম ত' বালাজীর ভোগ রাঁধবার জন্যে।

রক্ষক বল্লে, আর তাঁর ভোগ রাঁধার কাঠের দরকার নেই?

হাতিরাম বল্লে—নাঃ! তবে বলি শোন। বালাজীকে পাবার আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পুজো-টুজো ত' আমি পারিনে, তাই একজন এমন গুরু খুঁজতে লাগলাম, যিনি অন্য রাস্তায় আমাকে বালাজীকে পাইয়ে দিতে পারেন। অনেক খুঁজে সরযূর তীরে এক গুরু পেলাম, তাঁরই কথামত বারো বছর ধ'রে একাদিক্রমে বালাজীর সেবার জন্যে কাঠ ব'য়েছি, ঝড় মানি নি, বৃষ্টি মানি নি, রোদ্দুর মানিনি! তিনি ব'লেছিলেন বারো বছর পুরলে বালাজীকে পাব। বারো বছর ত' পুরল, কিন্তু কোথায় বালাজী!

রক্ষক জিজ্ঞাসা করলে, এখন তা হ'লে যাচ্ছ কোথায়?

হাতিরাম দৃঢ়স্বরে বল্লে, সরযূর তীরে আমার সেই গুরুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

কি বলবে তাঁকে?

হাতিরাম উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ল্লে, বলবো গুরুদেব, বারো বছর ধ'রে ত' তোমার কঠিন আদেশ পালন করলাম, এখন কোথায় বালাজী, দেখাও তাঁকে।

রক্ষক স্নেহস্বরে ব'ল্লে, হাতিরাম, তা হ'লে তোমাকে আর কষ্ট ক'রে সরযূ পর্য্যন্ত যেতে হবে না,—আমিই যে তোমার সেই গুরু!

হাতিরাম চেয়ে দেখলে, তাই বটে, তেমনি 'পাৎলা ছিপছিপে গৌর-কান্তি চুলের পাশে পাশে আলোর খেলা!

হাতিরাম দমল না। সে গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে, ব'ল্লে, কিন্তু কোথায় বালাজী, গুরুদেব?

প্রশান্ত হাসিতে সমস্ত বনপথ আলোকিত হ'য়ে উঠল, গুরুদেব বল্লেন, আমি-ই ত' বালাজী, হাতিরাম!

হাতিরাম মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রৈল, তাঁর মুখের পানে—আশ্চর্য্য সে মুখ, আশ্চর্য্য তার হাসি! দেখে দেখে তৃপ্তি যেন হয় না। মন্দিরের সেই নিটোল, নিখুঁত পাষাণ মর্ম্মর মূর্ত্তি, আজ সে আশ্চর্য্য প্রাণবন্ত হ'য়ে দাঁড়াল তার সম্মুখে, এই বনের-পথে, সবুজের অফুরন্ত মেলায়!

হাতিরাম তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বারবার বলতে লাগলো, প্রভু, আমার সকল সাধ মিটলো, সকল সাধ মিটলো আজ!

বালাজী তাকে তুই-হাতে ধ'রে তুলে মাথায় চুমু খেয়ে হেসে বল্লেন, কিন্তু আমার যে এখনও একটা সাধ বাকি র'য়েছে, ভক্ত-রাজ!

হাতিরাম হাত-যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রৈল।

বালাজী বল্লেন - বালাজীর সমস্ত সম্পত্তি যে নষ্ট হ'য়ে গেল হাতিরাম। দুঃখীরা খেতে পায় না, যারা আশা ক'রে আসে, তাদের চোখের জল নিয়ে ফিরতে হয়। তুমি দিন-কতক মোহান্ত হ'য়ে, এর একটা সুব্যবস্থা কর, এই আমার আদেশ হাতিরাম।

হাতিরাম কম্পিত—কণ্ঠে বল্লে, কিন্তু মোহান্ত তার গদি ছাড়বে কেন?

বালাজী হেসে বল্লেন,—ছাড়তেই হবে তাকে! তুমি শুধু তার গদিতে উঠে ব'সগে—আর কিছু করতে হবে না।

সকালবেলা মোহান্তর লোক-লস্কর সিপাই-সামন্তরা এসে দেখে মোহান্তর গদাতে ব'সে, ইয়া চেহারা একজন গোদা-পানা লোক।

তারা চোখ পাকিয়ে ব'ল্লে, তুমি কে হে আমাদের মোহান্তর গদিতে?

হাতিরাম বল্লে,—হাতিরাম।

শুনে তারা হেসে ফেল্লে। ব'ল্লে হাতিরাম টাতিরামের জায়গা এ নয়—সে অন্যত্র। নাবো বলছি।

হাতিরাম নাবলও না, কথার জবাবও দিল না। তখন তারা চ'টে জিজ্ঞাসা করলে নাববে না?

—না।

তারা গিয়ে মোহান্তকে খবর দিলে, বল্লে—হুজুর একটা মোটা মতন লোক আপনার গদিতে এসে বসেছে, নাবতে বল্লে নাবে না, একেবারে কায়েম হ'য়ে বসেছে, নড়তে চায় না। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, হাতিরাম।

শুনে মোহান্ত বাইরে এসে বল্লেন, কে ও হাতিরাম? ঘোড়া-রাম, ছাগল-রাম, বেরাল-রাম এ সব কিছু নয়—একেবারে হা-তি-রা-ম! তা' হাতিরামের ত' এ জায়গা নয়। ওরে একে নিয়ে যাত' এর উপযুক্ত জায়গায় ওই ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে একে বন্ধ ক'রে রাখ, আর হাতি-রামের যাতে খাবার কষ্ট না হয় সেই জন্যে ডাল-পালা পাতা সব দিয়ে রাখিস্। এমন বিশিষ্ট অতিথির যেন কোন অসুবিধা না হয়।

ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে মোহান্ত হো হো ক'রে হাসতে লাগলো, আর তার সেপাই—শান্ত্রীরা হাতিরামকে পুরে রাখলে একটা অন্ধকার ঘরে, পুরো এক দিনের হাতির খোরাক দিয়ে!

পরদিন সকালে উঠে মোহান্ত হাতিরামের দরজা খুলে, তার কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক্! হাতিরাম ব'সে রয়েছে সুপ্রসন্ন মুখে, ডাল-পালা-পাতা একটিও নেই, আর হাতি-রামের সুহজমের চিহ্ন-স্বরূপ প'ড়ে রয়েছে বড় বড় হাতির নাদ।

যে যেমন লোক তার কাছে প্রমাণ-বিশেষের মূল্যও তেমনি। হাতিরামের অলৌকিকত্বের এই রকম অকাট্য প্রমাণে মোহান্ত একেবারে অভিভূত হ'য়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, এবং তারপর তাকে নিজে হাতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে, গদিতে বসিয়ে দিলে।

হাতিরাম কিছুদিন মোহান্তর কাজ করলে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে। কিন্তু তার-পর একদিন আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না,—বোধ করি সে বেরিয়ে পড়েছে কোন নতুন পথের সন্ধানে, বালাজীর আবার কোন প্রাণ-ভোলান নতুন ডাকের সাড়া পেয়ে!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩

আসলে অপু তো ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল, শুইয়া শুইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার রাত্রে যে সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে! এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্পবয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিষ পত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই, দুঃখ এদেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা এখনি যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর বাড়ীতে সর্ব্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায় এজন্য এপর্য্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল সে পূজা দিয়া আসিবে ও ঐ গ্রামে তাহার এক পিসিমা থাকেন, তাঁহার সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ বকিস্ নে তুই একলা যাবি বৈকি? এখান থেকে চার ক্রোশ পথ—

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক সুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এই রকম বাড়ীতে বসে থাক্‌বো? যেতে পার্‌বো না কোথাও বুঝি? আমার বুঝি চোখ নেই, কাণ নেই, পা নেই?

—সব আছে যাঃ—উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ যে! অবশেষে কিন্তু অপুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহাকেই পাঠাতে হইল। তাহাছাড়া আর অন্য উপায়ও ছিল না। পূজার জিনিষপত্র ছেলের কাছে দিয়া সর্ব্বজয়া গাঙ্গুলীপাড়ার পথ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল, এই ছেলে একা প্রথম বিদেশে যাইতেছে, বার বার ডাকিয়া বলিয়া দিল—বেশীদিন যেন থাকিস্ নে সেখানে? বলিস্ আমার মা ভাব্‌বে আমি থাক্‌তে পারবো না—বুঝ্‌লি?

সোনাডাঙা মাঠের পাশ বাহিয়া উঁচু মাটির পথ, পথের দুধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দ ফুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দুর্ব্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। যাইতে যাইতে খুসিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, আজ একা সে পথে বাহির হইয়াছে এই প্রথম, এই তো সে বড় হইয়াছে আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা ছাড়িয়া দিত? এখন কেবলই চলা, কেবলই

সাম্‌নে যাওয়া, কেবলই পথের বাঁকে বাঁকে নতুন ফুলফলে তাহার অভ্যর্থনা। তাহাছাড়া কেবলই তাহার মনে হইতেছিল সাম্‌নের মাসে এই দিনটিতে তাহারা কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে। কোথায় সেই কাশী—সেখানে।

বৈকালের দিকে সে গঙ্গানন্দপুর গ্রামে গিয়া পৌছিল। পাড়ার মধ্যে পৌছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে কোনো দিকে সে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনোরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে...। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে, হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে ত্মাখো, ত্মাখো চেয়ে। সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল লাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলেই জানে। তাহার পিসেমশায় কুঞ্জ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা কোনদিকে একথাটা পর্য্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সাম্‌নে পাঁচিল ঘেরা, উঠানে ঢকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না ; দুএকবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কি ? কতক্ষণ সে চৈত্র মাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল দরজার কাছে—কাহাদের একটি অপরিচিত, প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিত ভাবে বলিল—কে খোকা ? কোত্থেকে আস্‌চো ? অপু আনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই-আমার এই—নিশ্চিন্দিপুরে আমার— .

তাহার মনে হইতেছিল না আসিলেই ভাল হইত! হয়তো তাহার পিসিমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইয়াছে, হয়তো ভাবিতেছে কোথা হইতে এক আপদ আবার আসিয়া জুটিল !...তাহাছাড়া—কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্ত্তা কওয়া এত কঠিন কাজ ? তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহাআদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া হাত মুখ ধোয়াইয়া শুক্‌না গামছা দিয়া মুছাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির সরবৎ করিয়া আনিল। লজ্জার প্রথম বেগটা কাটিলে সে চোখ তুলিয়া তাহার পিসির দিকে চাহিয়া দেখিল (এতক্ষণ সে পিসির মুখের দিকে না চাহিতে পারিয়া তাহার কাপড় বা হাতের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল) পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্পবয়স রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়। মুখের কোনো সৌন্দর্য্য নাই, চোখ ছোট ছোট, হাতের নখগুলি ছোট ছোট, কথায় কথায় হাসিবার অভ্যাসটা খুব বেশী। তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহা সে বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ী হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু গর্ব্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ী, বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে—সম্পর্ক খুবই আপন তবে আসা যাওয়া নেই তাই! পরে সে পুনরায় গর্ব্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এই—ত্মাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, আপন সম্পর্ক, এখন বোঝো কি দরের বংশের লোক আমি !...

সন্ধ্যার পর কুঞ্জচক্রবর্ত্তী বাড়ী আসিল। পাকশিট মারা চোয়াড় চোয়াড় চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই—তাহার পিসিকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে দেখিয়া তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায় সে যে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত তেমনি যেন

চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিতে পারে বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখ্‌চি তো তুমি?

৬

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিকে ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। বড় জঙ্গলে ভরা দুর্ব্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী আবার বনে-ঘেরা সুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া পথ। দু'চারজন তাহার বয়সী ছেলেকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন বেজায় হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাহিতে পরিল না।

পিসির বাড়ীর দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে সে খাবার খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা খাবার দিবে? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছেন। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারী পেটুক্। খাবার খাইবার লোভে লোভে এত সকালে বাড়ী ফিরিল।...রোজ রোজ খাবার খাওয়া কি ভাল?... এখন সে কি করে! বাড়ী ফিরিবে না আরও খানিক পথে পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ী যাইবে? এতক্ষণ অপরিচিত জায়গার পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে?

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়ীতেই আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পিসি বলিল—আমি খাবার নিয়ে ব'সে আছি যে? কোথায় বেরিয়েছিলে মাণিক? কাল রাত্রে তো খাওয়াই হয় নি—পরে পিসি তাড়াতাড়ি খাবার আনিয়া দিল। একটি ছয় সাত বছরের ছোট মেয়ে একটা কাঁসার বাটী হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাউ রেঁধোচো জেঠীমা মোরে একটু দেবা? অপুর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কে রে গুল্‌কী? না, ওবেলা রাঁধবো, এসে নিয়ে যাস্। গুল্‌কী বাটী নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলা ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া, যেন ছেলেদের চুলের মত খাটো। ময়লা কাপড় পরণে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া কি বুঝিয়া একবার হাসিয়া সে বাটী উঠাইয়া চলিয়া গেল। অপু জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসিমা? তাহার পিসি বলিল—কে গুল্‌কী? ওদের বাড়ী এখানে না—ওর মা বাপ কেউ কোথাও নেই—নিবারণ মুখুয্যের বৌ, এই যে পাশের বাড়ী, ওর দূর সম্পর্কের জেঠী—সেখানেই থাকে—।

তার পর দিন পাড়ার একটা ছেলে যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। অপুর মনে হইল গ্রামটাতে বড় বেশী জঙ্গল এবং লোকের বাসও কম। বনের মধ্যে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার থাকেন, মরিচা-পড়া টিনের সাইন-বোর্ডে তাঁহার নাম পড়িল—এম্, বি, সান্যাল, এইচ্, এম্, বি। তিনি যে সকাল সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন, ইহাও উক্ত সাইনবোর্ড পড়িয়া সে জানিতে পারিল। অপু মনে ভাবিল এত বড় একজন ডাক্তার এই জঙ্গলে পড়িয়া আছে কেন? সে ডাক্তার হইলে এরকম বনের মধ্যে কখনই ডাক্তারী করিতে আসিত না। বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল সেই ছোট্ট মেয়েটি গুল্‌কী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কি খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল গুটাইতে গেল—আঁচলে একরাশ আধপাকা বকুল ফল। অপু ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে তার আরও পরিচয় লইয়াছে, নিবারণ মুখুয্যের বৌ ভাল ব্যবহার করে না, লোক ভাল নয়। পিসিমা বলিতেছিল—কচি বয়সে ওর বড় কষ্ট। কেউ নেই যে যত্ন-আত্যি করে, জেঠী তো নয় রণচণ্ডী, কতদিন খেতেও দেয় না, এর ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়—নিজের পুষ্যিই সাতগণ্ডা তাই জোটে না তার আবার পর! গুল্‌কীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয়

না—ছোট্ট একটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভাব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—কি আঁচলে লুকুচ্চিস্ দেখি খুকী? গুল্‌কী হঠাৎ আঁচল গুটাইয়া লইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া নীচু হইয়া দৌড় দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল—ছুটিবার সময় গুল্‌কীর আঁচলের বকুলফল পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—প'ড়ে গেল, সব প'ড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকী, কিছু বোল্‌বো না, ও খুকী,—গুল্‌কী ততক্ষণ উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়্‌কী দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুল্‌কী ফিক্ করিয়া পাগলের মত হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়া তোকে ধরি এক দৌড়ে—পরে সে খিড়্‌কী দরজার দিকে ছুটিল। গুল্‌কী আর পিছন দিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুর পাড়ের দিক ছুট্ দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পারিবে কেন? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই অপু তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলা মুঠা চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল—বড় ছুট্ দিচ্ছিলি যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি খুকী?—গুল্‌কীর প্রথমটা ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে!—নিরুপায় ও হাল-ছাড়িয়া-দেওয়া চোখের দৃষ্টিতে সে অপুর দিকে চাহিল—ভাবটা এই—মারিবে তো মারো—এই দাঁড়াইয়া আছি—কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায় সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল। অপুর বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা কিছু ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায়—কিন্তু ছেলেমানুষ কথা কহিতে জানে না বলিয়া এই রকম উঁকি ঝুঁকি মারিয়া—ফিক্ করিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নাই। এযেন ঠিক তাহার দিদি—এই বয়সে দিদি যেন এরকমই ছিল—এরকম আঁচলে কুল বেল বাঁধিয়া ঘুরিয়া আপন মনে বেড়াইত—কেহ বুঝিত না—কেহ দেখিত না—এই রকম পেটুক—এরকম বুদ্ধিহীন ছোট্ট মেয়ে। অপু ভাবিল—এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না—একে নিয়ে একটু খেলি—আহা, আপন মনে বেড়ায়, কারুর সঙ্গে খেল্‌তে পায় না—পরে সে গুল্‌কীর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—খেলা করবি খুকী?···চল্ ঐ পুকুরের পাড়ে—না এক কাজ কর্—আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে ছুটে যাবি—ঐ কাঁটাল গাছটা বুড়ী—আয়্—চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিতেই গুল্‌কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল—অপু বলিল—আচ্ছা যা—যা—দেখি কদ্দূর যাবি—ঠিক তোকে ধরবো দেখিস্—আচ্ছা ঐ গেলি তো—এই স্বাশ্—নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ-উ—গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ছোট ছোট পায়ে—মেয়েমানুষ কতদুর যাইবে?—অপু একটুখানি ছুটিয়া ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিতে লাগিল।—ভারী ছুট্‌তে শিখিচিস খুকী না?...তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস্?...চল চোর-চৌকীদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁটাল পাতা চুরি করে পালাবি বুঝ্‌লি?···আর আমি হবো চৌকীদার তোকে ধরবো। গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয় ত সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে তার ভাব হয়। তাহার মনের খুসি সে বার বার ছুটিয়া পলাইয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু এবার অপু তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল—নহিলে পাঁকাল মাছের মত পালায়। গুল্‌কী মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—কাঁইবিচি নেবে?...অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া থাকিয়া এ যে কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদ্‌গোপের মেয়েছেলেরা কথা বলে তেম্‌নি।

দুপুরবেলা তাহার পিসিমা খাইতে ডাকিলে পিছনে পিছনে গুল্‌কী আসিল। অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসি জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্‌কী? অপুর পাতে

বোস্—মোচার ঘণ্ট আছে—ডাল দিচ্ছি। অপু ভাবিল—আহা, ও খাবে জান্‌লে দুখানা মাছ ওর জন্যে রেখে দিতাম। গুল্‌কী দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্লজ্জ ভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে ভাত রাশীকৃত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর পিসিমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্‌কী—হাঁস্ ফাঁস্ কচ্চিস্—নে ওঠ্—কত ভাত নিয়ে ফেল্‌লি ছাখ্ তো?...তোর কেবল দিষ্টিখিদে—পরে বলিল--জেঠীমাগীর কাণ্ড ছাখো—এতখানি বেলা হয়েচে--কাঁচা মেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না?—হলোই বা পর—তা হোলেও কচি তো?...

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাঁর বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বৃদ্ধ বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল—চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের'পুজোতে দু' আনা দক্ষিণে লাগ্‌বে—। অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই? মেয়েটি খানকতক কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের দিও। অপু ভাবিল—বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাকৃতো আরও দু'পয়সা দিতাম—।

পিসিমার বাড়ী ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসিমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুল্‌কীদের বাড়ীতে হঠাৎ গুল্‌কীর সরু গলার আকাশ-ফাটানো চীৎকার শোনা গেল—ওরে জেঠী, অমন ক'বে মেরোনা--ওরে বাবারে—ও জেঠী মোর পিঠ কেটে অক্ত পড়্‌চে—মেরো না জেঠী—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলার চীৎকার শোনা গেল—হারামজাদী—বদমায়েস—চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েচো নেমন্তন্ন খেতে এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা না দিই—লোকের বাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেক্কোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পায় না, বলে কিনা খেতে দেয় না—আপদ্ বালাই কোথাকার—বাড়ীতে তোমায় খেতে দেয় না?...তোমায় আজ—

অপুর পিসিমা বলিল—দেখ্‌চো—ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌চে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তা হোলেই তুমি খারাপ—অপুর মনটা আকুলি বিকুলি করিতেছিল, চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুণ কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সে বাড়ী যাইবে। তাহার পিসে মশায় ঠিক করিয়া আসিল যে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ী যাইবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে। দুপুরেতে অপুর সেই বন্ধুটি আসিয়া তাহাকে পাড়ায় এক বাড়ীতে বেড়াইতে লইয়া গেল। বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে—কতকগুলা বেশীবয়সের ছোক্‌রা জুটিয়া এমন অশ্লীল কথাবার্ত্তা বলিতেছে ও তামাক খাইতেছে যে অপুর বড় খারাপ লাগিল। ও ধরণের অশ্লীল কথায় অপুর কি জানি কেমন ভয় ভয় করে। সে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল—চল ভাই'আমার আবার দেরী হ'য়ে যাবে—

সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালা পাড়ার দিকে চলিল। একটু পূর্ব্বে কার্ত্তিক ঘোষ লোক পাঠাইয়া খবর দিয়াছে গাড়ী এখনি ছাড়িবে, সে যেন দেরী না করে।

অল্পদূর গিয়া বামুন পাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু

বলিল—বাড়ী চ'লে যাচ্ছি রে খুকী আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়? খেল্‌তে এলিনে কিছু না—পরে গুল্‌কী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যিরে, সত্যি বল্‌চি, এই ত্থাখ্‌ পুঁটুলী—কার্ত্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়ে গাড়ী উঠ্‌বো—আয় না আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে দিবি?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেক দূর চলিল। বামুন পাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ, তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্য্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই আঙা জামাটা ক'পয়সা? আজ কয়দিন হইতে সেইটাই বিশেষ করিয়া তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে। অপু হাসিমুখে বলিল—দু' টাকা—তুই নিবি? গুল্‌কী ফিক্‌ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ—তুমি যদি দাও, এখ্‌খুনি নি—

অপুর হঠাৎ সাম্‌নের পথে চোখ চাহিতেই দেখিল মাঠের শেষে গাছপালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অমনি তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায়, কতদূরে চলিয়া যাইবে! সে বলিল—আর আসিস্‌ নে খুকী তুই চ'লে যা—অনেকদূর এসে গিইচিস্‌—তোর বাড়ীতে হয়তো আবার বক্‌বে—চ'লে যা খুকী—আবার এলে দেখা হবে কেমন তো? হয়তো আর আস্‌বো না, আমরা কাশী চ'লে যাবো বোশেখ্‌ মাসে, সেখানে বাস কর্‌বো—গুল্‌কী আর একবার ফিক্‌ করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দ্দশী এম্‌নি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ গমন সম্পর্কিত একটা ছবি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথের দূর প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, (বা চতুর্দ্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ, ঝাঁকড়াচুল ছোট্ট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

১৪

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর, নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিষপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচ্‌রা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠাল কাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেক গুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্য্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল। অপু অনেকবলিয়া কহিয়া ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটাকে সঙ্গে করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেটাকে অন্নদা রায় মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত রাখিয়া যাইবার প্রস্তাবই ধার্য্য হইল কারণ সঙ্গে লটবহর অনেক গেলে লগেজ খরচ পড়িবে বিস্তর, তাহা ছাড়া উঠানোর নামানোর খরচ ও ঝঞ্ঝাট তো আছেই।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিলেন এবং এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন যে মস্তিষ্ক নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে বাপ পিতামহের ভিটার বাস উঠাইয়া কেহ কখনও বিদেশে চলিয়া যায় না। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কিছু উৎসাহের কথা বলিলেন, স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাক্‌তে বোল্‌বো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হ'য়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আস্‌বো, যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণু দি, জিজ্ঞেস্‌ করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্ব্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক্‌ হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে?

—সাম্‌নের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আস্‌বি নে আর কখনো?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস্ নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে?

অপু বলিল—আমি কি কল্‌বো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণু দি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল,—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ কোরে দিলি নে, খাতায় নাম সইও কোরে দিলি নে, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণু'দি মিছামিছি কেন রাগ করে! সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল,—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট্ কাট্‌লাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে? অপু বলিল সেইদিনই বৈকালে সে মাছ ধরিতে যাইবে। পটু স্নান করিতে করিতে বলিল—এমন কালো জল আর কোথাও পাবিনে কিন্তু অপু-দা!

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পরে পড়িল। প্রতিবৎসর এই সময় অপূর্ব্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ী মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ীর সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড় হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনির ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ী ডাইনি নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে? সৎকারের লোক হয় না? ঘরের মধ্যে খান দুই ছেঁড়া কাঁথা, একখানা শেলাই করা থান কাপড়, একটি নুন্ রাখিবার কাঠের খোরা ও কয়েকটি হাঁড়ি কলসী ছাড়া অন্য কিছু নাই। পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল—এক হাঁড়ি শুক্‌না আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ী আম্‌সি আমচুর তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আরবছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু একখানা সীতা-হরণের পট দেখিস্ যদি মেলায় পাস্? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পানসে পুতু পুতু পট তাই তোর কিন্‌তে হবে, আমি পারবো না যা—কেন রাম রাবণের যুদ্ধু একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধু আর যুদ্ধু—ছেলের যা কাণ্ড!...কেন ঠাকুর দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? দিদির শিল্পানুভূতি শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশী বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভাল লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল মালপাড়ার হারাণ মাল এক বাণ্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন

স্বরূপ—একটি বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক' পয়সা? হারাণ মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ—হ্যাঁগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল—কোন্ কোন্ ফুটোতে আঙ্গুল টেপ হারাণ কাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি?

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়াছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠীর মাঠের পথের দিকে তত রাত্রে কে উচ্চস্বরে গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠীর মাঠের পথে বেশী রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙ্গা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সে বার যাহা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নূতন। সুরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন কোনোদিন আর তাঁহার সন্ধান মেলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙীণ কাপড়, জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ী পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। সোলার পাখী, কাঠের পুতুল, রঙীন্ কাগজের পাখা, রং-করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি ফুলুরীর দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু' পয়সার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না! মনে ভাবিল--সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বোল্‌বো, আমি মেলা দেখ্‌বো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাধা ছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে। সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই কোন্ আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে। এই তাহাদের বাড়ীঘর, ওই বাঁশবন, সল্‌তে-খাগীর আমবাগানটা, নদীরধার, দিদির সঙ্গে চড়ুই ভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার

সায়েরের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে? এই তো বেশ আছে তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া? পটু, রাণু-দি—আর কি এদের সঙ্গে দেখা হইবে!

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যের তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কি লওয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে, উঁচু তাকের একটা মাটির কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কি জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ধূলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা মেজ-ঠাক্‌রুণেদের বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ী নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, চৈত্র দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জ্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্ত্তার মত কাণে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল পরে ধীরে ধীরে খিড়্‌কী দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্য্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান্ মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরকে ডাক দিলে যে ঘন বন ঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুক্‌না বাঁশ পাতায় রাশির মধ্যে বৈঁচিঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জান্‌তে পার্‌বে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

উঃ কি আনন্দ ও বিষাদ-ভরা দিনগুলি! কতকাল, কতকাল, এ সব দিনের কথা তাহার মনে ছিল! অজানা দেশ দেখিবার কৌতূহলও মনে জাগে অথচ চিরপরিচিত নীড়ও ছাড়িয়া যাইতে বেদনায় মন টন্‌টন্ করে। অপু ছুটিয়া গিয়া দিদির চড়ুইভাতি করার সেই জায়গাটা দেখিয়া আসে। খিড়্‌কী দুয়ার খুলিয়া প্রিয়, পরিচিত বাঁশবনের দিকে কতক্ষণ এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। ইচ্ছা হয় একদৌড়ে গিয়া একবার কদম তলার সায়েরের ঘাটটা দেখিয়া আসে। আর কি সে এসব দেখিতে পাইবে?

দুপুরে একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে কিন্তু বেলা দশটার পূর্ব্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ,প্রখর, বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছে পালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপু-দা, এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুন্‌তে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালি-মাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়াছিল তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ

তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন? গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সাম্‌নে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!...

ক্রমে রৌদ্র পড়িল। গাড়ী তখন সোনাডাঙা মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। হরিহর, মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—ওই ত্যাখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার শ্বশুরের পূর্ব্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তাহার অবোধ পুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সেকালের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয় তো পুত্রের বাড়ী ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে ছেলে আর ফেরে নাই—মাগো! সর্ব্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আট্‌কাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমুল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-ক, পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রংএর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য্য আর বিশাল মাঠটার শ্যাম-প্রসার। সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রা-পথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু মুগ্ধ, স্বপ্নময় চোখে তাহার চিরকালের রহস্যভরা সোণাডাঙার মাঠের ও চারিধারের অপূর্ব্ব আকাশের রংএর দিকে চাহিয়া ছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে আবার কত কি শৈশব কল্পনার আসা যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব্ব জীবন!

হরিহরপুরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হোল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওই খানে বনবিবির দরগা-তলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ়ু বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময়ই চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্ চিক্ করিতেছিল। আজ আষাঢ়ুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়ীশুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, সেক্‌রার দোকানের ঠুক্‌ঠাক্ শুনা যাইতেছে, একটা খেজুরগুড়ের আড়তের সাম্‌নে বহু গরুর গাড়ীর ভিড়। মাঝেরপাড়া ষ্টেশন এখনও প্রায় চারিক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠীর সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারাপথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানে রক্তাভ কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা

জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণ হাওয়ায় উল্লাস আনন্দনৃত্য সুরু করিয়াছে! এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের, সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনা-মুহূর্ত্তগুলি মাধুর্য্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌছিলে জিনিষপত্র গাড়ীর মধ্যেই রাখিয়া ষ্টেশনের পুকুরের ধারে রাঁধিয়া খাওয়ার যোগাড় হইল। গাড়ী থামিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে এদিক ওদিক রেলরাস্তা, তার, সিগন্যাল দেখিয়া বেড়াইতেছিল। একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া ষ্টেশনের বাবু খট্ খট্ শব্দ করিতেছে, তাহার বাবা বলিল, ওই হোল টেলিগ্রাফের কল। একটা লোহার বাক্সমত ডাণ্ডাওয়ালা কি কলে দুজন রেলের খালাসী তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছিল।

রাত্রে আহারাদি করিয়া সকলে বিশ্রাম করিল। পরদিন খুব ভোরে সর্ব্বজয়া উঠিয়া ষ্টেশনের পুকুরে স্নান সারিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেও সাতটার মধ্যে আহারাদির সকল কাজ মিটিয়া গেলে জিনিসপত্র প্লাটফর্ম্মে আনানো হইল। সাড়ে সাতটার সময় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্লাটফর্ম্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হঠাইয়া দিতেছিল। কতবড় ট্রেনখানা! কি ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ! কী কাণ্ড! সর্ব্বজয়া ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেন খানার দিকে চাহিয়াছিল। গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেজেটা যেন সিমেণ্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখান; জানালা দরজা সব হুবহু। এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এমনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ আর চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কি কৃপার পাত্র। আজকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া ষ্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সট সট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপ ঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোট খাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ীর তলায় যাঁতা পেষার মত একটা একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা!

অপুর হঠাৎ মনে পড়িল অনেকদিন আগে শীতের সকালবেলা তাহার দিদির সঙ্গে হারানো বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে দুজনে মিলিয়া সেই রেলরাস্তা দেখিতে ছুটিয়া যাওয়ার দিনটা! সেদিন শুধু রেলরাস্তাটা দেখিবার জন্য তাহারা অতটা বৃথা দৌড়িয়া মরিল, তাহাও দেখা হইল না, আর আজ যে বাড়ীর সবাই রেলগাড়ী চড়িয়া কতদূর চলিয়াছে, আজ দিদি কোথায়? দিদি হতভাগী এসব কিছুই দেখিল না! সে এতক্ষণ কাহাকেও বলে নাই কিন্তু কাল সারাদিন গরুর গাড়ী করিয়া পথে আসিতে আসিতে পথের ধারের বন-ঝোপের ছায়া, নোনাগাছ, পাকা রড়া ফলের থোকা ডালে ডালে দুলিতে দেখিয়া জন্মিয়া অবধি খেলার সাথীরূপে যাহাকে সে চিনিত সেই হাস্যমুখী দিদির কথাই সে ভাবিয়াছে, নিশ্চিন্দিপুরের বনে বাগানে, ঝোপেঝাঁপে,

পথের ধূলায় সর্ব্বত্র যে দিদির পায়ের দাগ আঁকা। দিদি মরিয়া গেলেও দু'জনের খেলা করার পথে ঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙ্গা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহকোণে; আজ কিন্তু সত্য সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল! তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ যেন ভাল বাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে দুঃখিত নয়। তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা উচ্ছ্বসিত চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল—ভাবিস্ নে দিদি, আর কেউ তোর না থাকুক, আমি আছি, আমি তোকে কখনো ভুলবো না।

সত্যই সে ভুলে নাই। উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল —কিন্তু দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে গাড়ীর বেগ যখন খুব বেশী, মাঠ মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যার বেশী দেরী থাকে না, অজানা নদীবন কাটিয়া ধূসর আলোছায়ার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিত, এক্স্প্রেস্ কি মেল—ট্রেনের দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া সে পাদানির উপর পা রাখিয়া বসিয়া পড়িত—সে উড়িয়া চলিয়াছে। সবুজ গাছপালা পাহাড় বন কাঁকরভরা ঊষর জমির উপর দিয়া নীল হাওয়া ভরা শূন্য বাহিয়া সে উড়িয়া চলিয়াছে অস্তসূর্য্যের পারের কোন মায়ালোকেরদিকে! মাথার উপর তাহারই মত অশান্ত একআধটা পথিক তারা। যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক্ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো বিরাট তুষারমৌলী ফুজিসান কি দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত অন্য কোন নীল পর্ব্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই এই সব সময়েই তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—।

—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?

মাঝেরপাড়া ষ্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অপুর শৈশবকাল কাটিয়া গেল---তখন সে একথা বোঝে নাই, বুঝিয়া ছিল অনেক পরে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
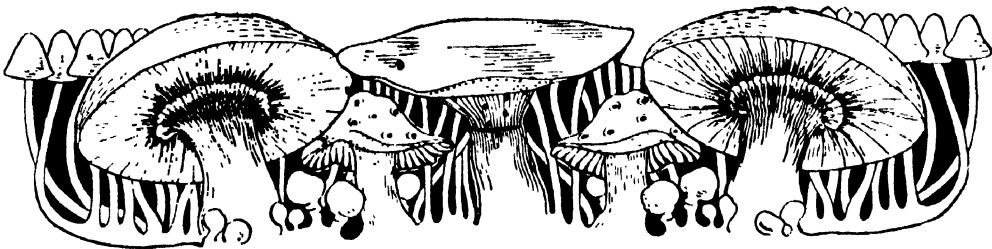
বাঙ্‌লা সাহিত্য ও প্রবাসী বাঙালী *

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু

আপনাদের সভায় আমাকে কিছু বল্‌তে ব'লেছেন ব'লে আমি আপনাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কোন সভায় কিছু বলতে গেলে দুটি অধিকার চাই, প্রথম বলার, দ্বিতীয় বলার মত কিছু থাকার। এই নগরেই আমার জন্ম; এরই সুখদুঃখের আলোছায়ায় আমার জীবনের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল সুতরাং এর সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ আছে; তাই যদিও আমি সম্প্রতি প্রবাসী, আপনাদের কাছ থেকে দূরে আছি তবুও সেই পুরাতন নাড়ীর অধিকারই আমাকে আপনাদের কিছু বলবার অধিকার দিয়েছে। আমি জানি এখানে আমার চেয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বহু সুধী উপস্থিত আছেন, তাঁরা আমার কথাগুলাকে যেন ধৃষ্টতা না মনে করেন। আমি যে কথাগুলো বলবো সেগুলো একজন আত্মীয়ের উক্তি, অনাত্মীয়ের হৃদয়হীন সমালোচনা নয়।

আমার কিছু বলবার আছে ব'লে মনে হয়েছে; দীর্ঘকাল পরে আমি এসেছি; চারিদিকে অনেককিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি, নূতন অচেনা মুখ সব চোখে পড়্‌ছে, পরিচিত পুরাতন মুখগুলো প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি না। পরিবর্ত্তনই জীবনের ধর্ম্ম; সুতরাং পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে মহাকালের নৃত্যলীলার ছন্দে ক্ষণে ক্ষণে যে নব নব সৃষ্টি চলেছে তাকে অভিনন্দন করি; তার স্রোতে পুরাতন জীর্ণ ভেঙ্গে পড়্‌ছে, নূতন জাগ্‌ছে; তার জন্য দুঃখ করি না। বিজ্ঞান বলে এই পরিবর্ত্তনের অন্তরালে ক্রমবিকাশ চলেছে আর সেই অভিব্যক্তিতে যে প্রবলতম তারই জয়, যে সংগ্রামনিপুণ তারই প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং এখানে চারিদিকে যে পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি আমার মন স্বভাবতই সেখানে ক্রমবিকাশের পরিচয় খুঁজ্‌ছে, মন জান্‌তে চাইছে আগে এখানে প্রাণধারার যেটুকু বিকাশ দেখেছিলে আজ কি তার কোন উন্নতি দেখ্‌ছো? আমার মনের কোণে এই যে প্রশ্ন উঠেছে তার উত্তর আপনাদের কাছে চাইছি।

জীবনের বহুধা প্রকাশ; আপনাদের বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে সমূহে পরিচয় ঘটবার সুযোগ এখন পাই না, নেই ও। সুতরাং আজ যদি বলি এখানকার প্রবাসী বাঙালীদের জীবনে প্রাণধারার অভিব্যক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাঁরা দশবৎসর পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন আজও সেইখানেই আছেন তাহলে আপনারা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারেন কতটুকু দেখে তুমি একথা বল্‌ছ?

আমি মনে করি মানুষকে বিচার করবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাওয়া যায় তার অবকাশ সে কি রকম ক'রে কাটাচ্ছে তাই দেখে; কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে নয়, সমাজের আচার-ব্যবহারে নয়, সভাসমিতিতে নয়, মানুষের অন্তরের culture-এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন তাকে বিশ্রব্ধ মুহূর্ত্তে অবকাশ যাপন করতে দেখি।

কয়েকদিন আমি আপনাদের এই অবকাশ যাপনের কেন্দ্রে এসেছি; আপনাদের কাউকে কাউকে এখানে বিশ্রাম ও অবসর বিনোদ কর্ত্তে দেখেছি। সেই যেটুকু এই নগরের শিক্ষিত বাঙালীর অবসর জীবন দেখেছি শুধু তারই উপর আমার মতামত প্রতিষ্ঠিত; যদি এর মধ্যে কোন অন্যায় বা অত্যুক্তি থাকে ক্ষমা করবেন।

এই প্রাঙ্গণের পাশেই আমার বিদ্যালয়; সেই বিদ্যালয়ে আমার শৈশবে সাহিত্যে দীক্ষা পেয়েছিলাম। সেদিনকার সাহিত্য পরিষদ্ যে অলক্ষিত প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, আমায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল; আমার শৈশবে এখানকার সাহিত্যপরিষদের

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভাগলপুর শাখার, বার্ষিক সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ।

কৈশোর ও যৌবনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও উৎসাহ দেখেছিলাম। তখন এখানে সাহিত্য সম্মিলন দেখেছি; হয়ত অনেকেরই মনে তার উজ্জ্বল স্মৃতি জাগরূক থাকতে পারে।

সে ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, যে যুগে বাঙালী জাতি নূতন ক'রে জীবনকে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করছিল; যখন সাহিত্যে, শিল্পে, রাজনীতিতে বাঙালী আপনার যৌবনবেগে নূতনভাবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করছিল।

সেদিন বাঙলা হ'তে দূরে এই প্রবাসে যে এমনভাবে সাহিত্য সম্মিলন হ'তে পেরেছিল তার কারণ জাতির মধ্যে এই নবজীবনের স্পন্দন।

সেদিনকার এই সাহিত্যভূমিতে আমরা ভূমিষ্ঠ-হয়েছিলাম; তার প্রাণরস আহরণ ক'রে আমাদের জীবন গ'ড়ে উঠেছিল। সারা বাঙ্‌লা ছেয়ে যে একটি নবজাগরণের, নূতন জীবনের হিল্লোল উঠেছিল তার ঢেউ এখান পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিল।

তারপরের যুগের কথা মনে পড়ে। ধীরে ধীরে জাতির জীবনে অকাল-বার্দ্ধক্যের সঞ্চার হ'ল। সাহিত্যচর্চ্চার চেয়ে অন্য অনেক কিছু মুখরোচক পাওয়া গেল; ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদ, অবসর বিনোদনের এই কেন্দ্রে অনাদৃত অবস্থায় এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করল। প্রবাসিনী ভাষা জননীর সেই দীনহীন অবস্থা কোন কোন কিশোর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার ক'রেছিল, উৎসাহ জাগিয়েছিল, কিন্তু ইতিহাসে স্থান পেতে পারে এমন কিছু কাজ সেদিন হয় নি।

তারপর দীর্ঘকাল নানাস্থনে নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি জাতিগঠনের, সাহিত্য সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টার অল্প বিস্তর পরিচয় লাভ করেছি; আমার এই মাতৃভূমির সঙ্গে তখন বাহিরের সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু অন্তরের নাড়ীর বেগ বিচ্ছিন্ন হয় নি; মাঝে মাঝে যখন দু'একদিনের জন্য এসেছি তখন এই পথে চলতে চলতে সতৃষ্ণনয়নে আমার বাল্যের এই বিদ্যালয় সাহিত্য পরিষদের এই অতি পরিচিত প্রাঙ্গণের দিকে চেয়েছি, ভেবেছি এর আজ কি অবস্থা!

অনেকদিন পরে আপনাদের মধ্যে এসেছি; আজও সাহিত্য পরিষদের সেই অবস্থা দেখছি। মনে মনে আশা ছিল্ নূতন যৌবনের উৎসাহে এর মধ্যেও নূতন প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ দেখতে পাবো; কিন্তু পাই না। সেই সেদিনকার আমাদের অনাদর ও উপেক্ষায় সাহিত্য পরিষদ এইখানে যে অতিতুচ্ছ নগণ্য কোণ আশ্রয় করেছিল আজও সে সেইখানে প'ড়ে আছে। যে দু'একজন বন্ধু প্রতিকূলতার মধ্যেও তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আশ্রয় ক'রে আছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একদিন যে তাঁদের এই ধৈর্য্য সমাদর লাভ করবে, তাঁদের ভক্তি পুরস্কৃত হ'বে এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু সাহিত্য পরিষদের এই অবস্থাই কি আমাদের এই নগরীর প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্ঘজীবনের পরিচয় দিচ্ছে না? সাহিত্য, জীবনেরই প্রতিচ্ছবি; জাতির সাহিত্য, জাতির জীবনকে অনুসরণ ক'রে চলে।

কথা উঠতে পারে জাতি সাহিত্য গড়ে, কি সাহিত্য জাতিকে গড়ে? এ প্রশ্নের সমাধান নৈয়ায়িক করুন; আমরা জানি এই দুইটি ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে যুক্ত। জাতির বিকাশ বিচিত্রপথে হয়; সাহিত্য তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ; জাতির চিন্তা, সাধনা আদর্শ জাতীয়-সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাহিত্য অনাগত ভবিষ্যদ্বংশীয়কে পথ দেখিয়ে চলেছে। সাহিত্য যে জাতির কত বড় সম্পদ তা নূতন ক'রে বলবার দরকার নেই; সাহিত্য যে জাতিকে কতখানি অনুপ্রাণিত ক'রেছে ইতিহাস থেকে তারই একটু নজীর দিতে চাই।

আপনারা সকলেই জানেন উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে নেপোলিয়নের বিজয়ী সেনা জার্ম্মানীর কি অবস্থা করেছিল। জাতির সেই মহাদুর্দ্দিনে যাঁরা জাতিকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলবার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা নবীন জার্ম্মান সাহিত্যের জন্মদাতা। রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে তাঁদের আসন ছিল না; নগরের কোলাহল হ'তে দূরে নিভৃতে বিদ্যায়তনের ছায়ায় তাঁরা আসন পেতে সাধনা করেছিলেন। সেই সাধনার হোমাগ্নিশিখা হ'তে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে নবীন জার্ম্মানী জেগে উঠ্‌ল; কি অমিত তেজে তার জয়যাত্রা আরম্ভ হ'ল তার পরিচয় ইতিহাসেই পেলাম যখন দেখলাম উনবিংশ শতকের শেষপাদে ফ্রাঙ্কোপ্রাশিয়ান যুদ্ধে জার্ম্মানী ফ্রান্সকে অর্দ্ধ-শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অপমান-ভার ফিরিয়ে দিলে।

এও ত পুরাণ কথা। চোখের সামনে আয়র্লণ্ডকে উঠ্‌তে দেখেছি; আইরিশ জাতির সেই উত্থানের ইতিহাসের অন্তরালে Coltic movement কত বড় কাজ করেছে অনেকেরই হয়ত' জানা থাকতে পারে। অনেক স্বদেশ প্রেমিকের রক্তের বিনিময়ে সে জাতি গ'ড়ে উঠেছে; কিন্তু তাঁদের মধ্যে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন নাই; তাঁদের অনেকেই জাতির শিক্ষার ভার নিয়ে পল্লীগ্রামের বিপুল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সাধনায় তিলে তিলে জীবনের রক্ত ক্ষয় করেছিলেন। Padriac Pearse, Æ, Yeats, Lady Gregory প্রভৃতির নাম আপনারা শুনে থাক্‌বেন। এঁদের মধ্যে কেউ ভার নিয়েছিলেন দেশের রূপকথাগুলা সংগ্রহ ক'রে তার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার, কেউ নিয়েছিলেন নূতন কেল্টিক নাট্য সৃষ্টি ক'রে জাতির আদর্শ জনসাধারণের কাছে প্রচার করবার ভার, কেউ নিয়েছিলেন দেশের চারণগাথাগুলো নূতন ক'রে গাইবার ভার। এঁদেরই সাধনায় আইরিশ জাতি গ'ড়ে উঠেছে, আয়র্লণ্ড নবজীবন লাভ করেছে।

জানি এসব পুরানো কথা; কিন্তু তবুও আপনারা ক্ষমা করবেন। আমরা আজ যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি; আমাদের সম্মুখে জাতিগঠনের মহাভার বিধাতা অর্পণ করেছেন; রাজনীতিতে তার নানা পরীক্ষা চলেছে; সে সকল কথা আপনারা জানেন; তার উল্লেখ করার দরকার নেই। কিন্তু সকলেই রাজনীতিতে যোগ দিতে পারে না। কিন্তু সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ব'লে সাহিত্যের যে ব্যাপক-সংজ্ঞা আমরা নির্দ্দেশ করেছি—সেই উদার সাহিত্যের সেবায় সকলেই অল্পবিস্তর যোগ দিতে পারেন। এই ভাবেই জাতিগঠন প্রচেষ্টায় সকলেরই অল্পাধিক স্থান আছে; সে স্থান, সে অধিকার, সে কর্ত্তব্য যদি আমরা গ্রহণ না করি তবে ভবিষ্যদ্বংশীয়ের কাছে, মহাকালের দরবারে আমরা কি ব'লে জবাব করব? লজ্জানত বদনে মূত নীরব হয়ে কি পরাজয় স্বীকার ক'রে অন্তরে ধিক্কার ভার বহন ক'রে ব'লব কিছুই ত' করিনি? নিজের মনুষ্যত্বের, পৌরুষের, এত বড় অপমান কি আমরা সহ্য ক'রে যাব? পারি নি বলবার অধিকার, মস্ত বড় অধিকার; যে চেষ্টা করেছে সেইই পারিনি বলতে পারে—সে অধিকারও সেদিন আমাদের থাক্‌বে না।

পারি কিনা জানি না কিন্তু করবার অনেক কিছুই আছে এইটুকু জানি; আর ইতিহাসেও ত দেখলাম সাহিত্য জাতিকে গ'ড়েছে, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বেদী রচনা ক'রে জাতির প্রাণদেবতার বোধন করেছে।

আজ আমাদের সামনে যে একটা নূতন বিরাট জাতি গ'ড়ে তোলার সাধনা চলেছে সে সাধনা যেমন বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে গ'ড়ে তোলার তেমনি সমস্ত প্রদেশের culture-এর ঐক্যে গঠিত অখণ্ড ভারতীয়তাকে গ'ড়ে তোলার। বাঙ্‌লা সাহিত্যের সেবা ক'রেই আমরা এই দুই উদ্দেশ্যকেই সার্থক করতে পারি।

সম্পূর্ণ কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করা এখানে সম্ভব নয়; সেটা আপনারাই ঠিক কর্‌বেন। কিন্তু একটা দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ত্তে চাই। এ সম্বন্ধে অনেকস্থলে আমি কিছু আলোচনা করেছি।

আমি প্রবাসী, বিহারে আমার জন্ম, তার জলবায়ু শস্য আমার অঙ্গ পুষ্ট করেছে; তার প্রতি আমার ঋণ আছে; সেই ঋণের বোধ এইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এখানেই অনেকেই এমন আছেন যাঁরা আমারই মত এদেশের অন্নে মানুষ। তাঁদের আমি এই জন্মঋণের প্রতি সচেতন ক'রে দিতে চাই—কারণ এই ঋণের কথা আমরা অনেক সময়েই ভুলে থাকি।

এই প্রসঙ্গে ভারতের রাজনীতির একটা বড় সমস্যার কথা ওঠে; অনেকেই হয়ত' জানেন বাহিরের ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অন্তরের ঐক্যের মস্ত বড় অভাব আছে;—যে অভাবের জন্যে আমাদের মধ্যে অখণ্ড-ভারতীয়তা-বোধ জাগ্রত হ'তে পারচে না, যার ফলে আমাদের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা পদে পদে খণ্ডিত হচ্ছে—শুধু রাজনীতিক চালবাজিতে পরিণত হ'চ্ছে।

আমি মনে করি অখণ্ড ভারতীয়তা স্বপ্ন নয়। আর এটাও আমার মনে হয় এই যে ঐক্য, এ ঐক্য রাজনীতির ঐক্য নয়, এ ঐক্য cultureএর ঐক্য, বিভিন্ন প্রদেশের স্বপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতিই (culture) সেই মিলনের উপাদান।

আমার বাল্যকালে আজ যাকে আপনারা Bengali-Bihari feeling বলেন সেটা এত প্রবল ছিল না, নানা কারণে। আজ শুনেছি নাকি সেটা প্রবল আকার ধারণ ক'রে এ দেশের সমষ্টি-জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করছে। দুই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটা অন্যায় রেষা-রেষি জেগে উঠেছে উভয়কে ক্ষমাহীন দোষদর্শী ক'রে তুলেছে। বোধ করি সেটা কতকটা বাহিরের রাজনীতিক আবহাওয়ার ফল— অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেটা ব'লেই সেটাকে মেনে নিতে হ'বে, তার জন্য কোন প্রতিকার চেষ্টা করবার নাই, এটি আমি মনে কর্ত্তে পারি না।

আমি মনে করি এর মধ্যে আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের অনেককিছু অপরাধ আছে। যে জন্মঋণের কথা আমি বলেছি সেই ঋণ আমরা শোধ করিনি। আমাদের শাস্ত্রে বলে মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ ঋণ নিয়ে জন্মায়; তার মধ্যে ঋষিঋণ শোধ কর্ত্তে হয়, পঠন ও পাঠন ক'রে। আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে ঠিক ইংরেজেরই মত আমরা এ প্রদেশে প্রবাসী জীবন যাপন করি—আমাদের স্বার্থ শুধু এ প্রদেশের অন্ন ও অর্থ নিয়ে। এদেশের লোককে—তাদের সভ্যতা, ধর্ম্ম সাহিত্য,রীতিনীতি, আচার, দরদ দিয়ে বুঝতে, ভালবাসতে—আমাদের কোন চেষ্টা হয় নি; যেটুকু আমরা জানি সেটা অশ্রদ্ধায় অবহেলায়, নেহাত চোখে প'ড়েছে ব'লেই জানি। এর জন্যে আমাদের কোন দরদ নেই। আমার মনে হয় বিহারের প্রতি এই উদাসীন্যই এই Bengali-Bihari feeling এর জন্য অনেকটি পরিমাণে দায়ী।

শুধু এই প্রদেশে নয়, সর্ব্বত্রই, শুধু বাঙালী বিহারীর মধ্যে নয়, যে কোন দুইটি প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর মধ্যে আজ এই হৃদয়হীন সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এটা একটা মস্ত বড় সমস্যা।

এই হৃদয়হীন ঔদাসীন্য দুর করতে হ'বে---এ প্রদেশের লোকের cultureএর নিকটতর পরিচয় লাভ করতে হবে —এদের আপন করে নিতে হ'বে। তবেই এই সমস্যা দুর হ'বে।

কিন্তু শুধু জানাই নয়—অপরকে জানাতে হবে; এই জ্ঞানকে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত করতে হ'বে। এ প্রদেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম, রীতিনীতি, সভ্যতা, এক কথায় এদের প্রাণকে আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বাঙালীদের সামনে উন্মুক্ত ক'রে দিতে হবে—এদের মর্ম্মবাণী সমগ্র বাঙালীকে শোনাতে হ'বে। বাঙলা ভাষাই হ'বে সেই প্রাণবিনিময়ের ভাষা আর সেই মিলন, সেই বিনিময়, আনবে প্রবাসী বাঙালী।

আপনারা অনেকেই জানেন ইংরেজী সাহিত্য কি বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধিলাভ ক'রেছে। ইংরেজ যে দেশে গেছে সে দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সভ্যতা নিয়ে নিজের ভাষায় আলোচনা ক'রেছে; কিছুই তুচ্ছ করে নি; ছোটখাট রীতিনীতি আচার বিচার ব্রত পার্ব্বণ পর্য্যন্ত নিয়ে গ্রন্থ-রচনা ক'রেছে; এর ফলে শুধু অনাত্মীয়কে আত্মীয় ক'রেছে তা নয় তাদের নিজেদের জাতীয় সাহিত্যকে পরম ঐশ্বর্য্য দান করেছে।

বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের কাছে বাঙলা সাহিত্য কি এইটুকু দাবী করতে পারে না? এ শুধু সাহিত্যসৃষ্টি হ'বে না, জাতিগঠনের মহৎ উপাদান হ'বে।

কিন্তু আমি উপরে যে শ্রেণীর সাহিত্যের কথা ব'লেছি জানি সে সাহিত্যে রসের প্রাচুর্য্য নেই বলে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। সাধারণ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়েও আমার মনে পড়ছে আজ যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের কারো কারো সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত এই নগরেই হ'য়েছিল। শরৎচন্দ্র, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতি-ভূষণ ভট্ট, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের কৈশোরে এই মাটিতেই সাধনা আরম্ভ ক'রেছিলেন।

আজ সেই কথা স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি নিঃশেষিত ধনসম্পদ বিত্তহীন নিঃস্ব অহঙ্কারের ফাঁকা অধিকার নিয়েই থাকব? আমাদের কিছু করবার নেই কি? সন্তান যখন বিদেশে প্রবাসে থাকে তখনই ঘরের মায়ের প্রতি তার টান বেশী থাকে। এই প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ কি তাদের জননী মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনই থাকবে—তাদের অধিকার, স্নেহ, তাঁদের কর্ম্মচেষ্টায়

জীবনে ফুটে উঠ্‌বে না?

আমি আশা করি ভাগলপুরের প্রবাসীবাঙালীর এই আশ্রয় স্থল, সাহিত্য সাধনার এই কেন্দ্র, দিনে দিনে আমাদের সাধনায় ও সেবায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে। যাঁরা সাহিত্যসেবায় এই নগরে আমাদের পূর্ব্বজ, অগ্রজ, তাঁদের আদর্শ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হবে এবং যে বিশ্ববিধাতা যুগে যুগে পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পথে এই জাতিকে চরম সার্থকতার পথে নিয়ে চলেছেন, যিনি "বহুধা শক্তিযোগাদ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধতি" তিনি আমাদের মধ্যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর্‌বেন—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

তৃষাতুর

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

ভুবন ভরিয়া উঠেছে ফুটিয়া জ্যো'স্নারাশি;
নিশীথ রয়েছে জাগিয়া আমারি তন্দ্রা নাশি'!
হেরিব কখন গহন আঁধার গগন হ'তে,
পূর্ব্বতোরণে তরুণ তপন উঠিছে হাসি'!

নিয়ত চলেছে কত না ছন্দে মালিকা গাঁথা,
নিভৃত হৃদয়ে, মানসি, তোমারি আসন পাতা,
হে প্রিয়া, তোমার কমল করের লিপির মোহে,
সম্বোধনের মদির সুরের নেশায় মাতা!

তুলনা বিহীন ও রূপ তোমার, করুণাময়ী!
মধুর তোমার গুণের গন্ধ জীবনজয়ী!—
প্রবাস ভবনে পবন স্বননে তাহারি ধ্বনি
রণিয়া রণিয়া চলে রমণীয়, শুনিতে রহি।

দয়িতা তোমার নিরালা ঘরের একটি কোণে,
চিরপ্রিয়তম কবিরে ক্ষণেক করিয়ো মনে;—
সেই সে বঁধুয়া তোমারি তরে যে সজল আঁখি,
তোমারি নামে যে উতল চকোর আথর বোনে!

এই যে কাব্য নাচিয়া নাচিয়া চলে যা ছুটি',
পাগল হিয়ার সকল আগল বাঁধন টুটি,
শিরায় শিরায় নব মদিরার বহায়ে আনে,—
উৎস তাহার কি জান? তোমার নয়ন দুটি!

আমার এ প্রেম বিঘ্নবিপদ করেনা ভয়;
মান অপমান দুঃখকষ্ট অর্থক্ষয়;
তোমারি মুখের একটি সুখের হাস্যরোল,
জীবনমরণে সাধনা আমার অসংশয়!

বহু পরিচয় লভিলে তাহার দীর্ঘদিনে,
কত না পরখ করিয়া আমারে লয়েছ কিনে!
আজিকে আমার বন্ধু আমার দোসর তুমি,
কি সুখে রয়েছ আমার বুকের পরশ বিনে?

তোমারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া রচিনু যতনা বাণী,
সেগুলি লইও দিনের মতন সত্য মানি!
তোমারে গোপন করিনি করিনি হৃদয় মম,
প্রভাত আলোর মতন যে ভালো বেসেছি রাণী!

যত্নে রচিত লিপিরে একটি হাসির আশে,
লিপি আমার, পাঠানু সরমে তোমার পাশে!
ভালো কি লাগিল কহ বঁধু কহ সরল মনে,
যে গীতি ঝরিল ঝরণাধারার কলোচ্ছ্বাসে?

শেফালি

—উপন্যাস—

—শ্রীআমোদিনী ঘোষ

৩

শেফালি আমাকে ডাকিত দিদি, তাঁহাকে বলিত 'উনি' 'তিনি', চাকর বাকরের কাছে বলিত—'বাবু'। শুনিয়া আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত রি রি করিয়া উঠিত, অমন করিয়া 'উনি' বলার যে কি মানে তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না।

উনি, উনি, উনি! কি জন্য তার এই উনি বলা! বাঁশীতে সাধা রাধা নামের মত এ-উনি যে চিরদিনের সাধা বাঁধা উনি! কত সুখসাধ অভিলাষে গড়া এ, কত ব্যথা কত কথায় গড়া এ, কত দুরু-দুরু স্পন্দনে ভরা এ! কোন্ আস্পর্দ্ধায় এ ডাক সে মুখে আনে! মনে মনে বলি, তবু মুখে বলিতে পারি না একটি বর্ণও!

আবার শুধু তাই নয়—কিরণ্ময় বাবুর মত ঠাকুরপোকে হিরণ্ময়বাবু না বলিয়া আমারই মত সে তাহাকে ঠাকুরপো বলিয়া ডাকে। ইহারই বা কি অর্থ! ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া সেত স্বচ্ছন্দে তাহাকে 'হিরণদা' বানাইতে পারিত—তাহা না করিয়া ঠাকুরপো নাম দিল কোন্ হিসাবে!

শেফালিকে দেখিলেই ঠাকুরপো ঘর ছাড়িয়া পলাইত, এবং অকস্মাৎ অতর্কিতে পলায়নের কারণ উপস্থিত হইলে কখনও বা এক পাটি চটি লইয়া, কখনও বা আধখানা মাথা আঁচড়াইয়া, কখন ও বা অর্দ্ধভুক্ত জলখাবারের রেকাবি হাতে করিয়া পলাইত। কিন্তু শেফালি এ সবে দমিত না। খাওয়ার সময় হইলে ঠাকুরপোর ঘরের ভিতর মাথা বাড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ডাকিত, "ঠাকুরপো খেতে আসুন", এবং খাইতে বসিয়া ঠাকুরপো ভাতের থালার উপর হাজারো মাথা গুঁজিয়া বসিলে সে দিব্য পরিপাটি করিয়া পরিবেশন করিয়া খাওয়াইত। খাওয়া হইলে ডিবা ভরিয়া পান তাহার ঘরে দিয়া আসিত।

একদিন ঠাকুরপো আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠান, আমি 'ঠাকুরপো' কোন্ সুবাদে?"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।" কথাটা বলিলাম আমি হাসিয়া, কিন্তু আমার চোখে কি প্রকাশ পাইল জানি না,—হয়ত দাহ, হয় ত ঈর্ষার তাপ, হয় ত বা তাহা ব্যঙ্গভরা-কৌতুক;—ঠাকুরপো হাততালি দিয়া বাড়ী ফাটাইয়া হাসিয়া উঠিল।

কৃত্রিম কোপ সহকারে আমি বলিলাম "আহা, ও আবার কি?"

আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া ঠাকুরপো বলিল,

"তোমার গোপন কথাটি রেখো না মনে,
শুধু আমায় শুধু আমায় বল আমায় গোপনে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া আমি বলিলাম, "কখ্খনো নয়" ঠাকুরপো আরো বেশী করিয়া হাসিয়া বলিল "কি কখ্খনো নয়?"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "জানি না।"

ঠাকুরপো আমার আঁচলের কোনটা ধরিয়া টানিয়া বলিল "বলুন না, খুলেই বলুন না। কবি ব'লেছেন—'অন্ধজনে দেহ আলো'—তার মানে—যে জানেনা তাকে জানিয়ে দাও ওটা পুণ্যকর্ম্ম।"

খোঁপা হইতে কাঁটা খুলিয়া আমি ঠাকুরপোর হাতে ফুটাইয়া দিলাম।

আঁচল ছাড়িয়া দিয়া ঠাকুরপো হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

পাশের ঘরে উনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, কাগজ রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে হিরণ, কি হয়েছে?"

"বৌঠান সূর্য্যমুখীর পার্ট মুখস্ত বল্‌ছিলেন, তাই শুন্‌ছিলাম।" বলিয়া ঠাকুরপো চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

আমার মুখের উপর চোখ রাখিয়া উনি বলিলেন "ছিঃ স্মর, ছিঃ!"

আমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, আমি বলিলাম, "বাঃ, ঠাকুরপো ঠাট্টা কর্চ্ছে—বাস্তবিক আমি কিছু বলি নি।"

"কিছু বল নি? তাহ'লে আমি ধ'রে নিতে পারি, অনেকখানি বোলেছো। কথায় সব বলাও যায় না, সব শোনাও যায় না। সবার সেরা বক্তা হচ্ছে এই দুটি—বলিয়া তিনি দুটি অঙ্গুলি আমার চোখের উপর রাখিয়া ধীরে চুম্বন করিলেন।

ঠাকুরপোর ভয়ে—আমি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

৪

আমার চেয়ে শেফালি ঘরকন্না গুছাইয়া লইল ভাল করিয়া। যে রাঁধুনী ছিল তাহাকে জবাব দেওয়াইল; বলিল, "ও-ছাই রান্না কি ক'রে যে খাও দিদি, আমি ও মুখে দিতে পারি না।"

প্রথমটা মনে হইল, ভালই হইল, এক ঢিলে ইহাতে দুই পাখী মরিবে। মেয়েটা রাঁধিবেও ভাল, ওদিকে বাজে কাজে বা কথায় মনও দিতে পারিবে না—সঙ্গে সঙ্গে রাঁধুনীর মাইনেটাও বাঁচিয়া যাইবে।

কিন্তু দু'দিন না যাইতে শেফালির রন্ধন-পটুত্বে আমার মনে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব অতিথি-অভ্যাগত নাই—তবে এত পরিপাটি করিয়া উপাদেয় বিচিত্র ব্যঞ্জন কাহার জন্য!

রান্না করিত শেফালি, কিন্তু কাছে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতাম আমি। উনি উঠিয়া গেলে শেফালি অন্য কাজের ছলে আসিয়া চকিতে দেখিয়া যাইত, যে-বাটিগুলি সে সাজাইয়া দিয়াছে তাহার কোন্‌টা খালি হইল, এবং কোন্‌টা পড়িয়া রহিল।

রাঁধিত সে চমৎকার। সুতরাং পাতে কিছু পড়িয়া থাকিত না—শেফালির মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিত। দেখিয়া আমার মনে জ্বালা ধরিয়া যাইত।

রন্ধনে যে আমি খুব পটু ছিলাম, অবশ্য হলপ করিয়া আমি এমন কথা বলিতে পারি না, তবে আমাদের লছমন ঠাকুর যখন গাঁজায় দম দিয়া জ্বর হইয়াছে বলিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিত, অথবা এক একদিন 'নিশার স্বপন সম' হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যাইত তখন আমি রাঁধিতাম। রান্না অভ্যাস ছিল না বলিয়া মাঝে মাঝে নুনটা বেশী পড়িয়া যাইত, ডাল পোড়া লাগিয়া যাইত, তরকারি গলিয়া ক্ষীর বা মোহনভোগ হইয়া যাইত। ঠাকুরপো খাইতে খাইতে বলিত, "বৌঠান, আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন আমরা ষাটের কোঠা পার হয়েছি—সুতরাং চিবিয়ে কোনো জিনিষ না খেয়ে গিলে বা চুষে খাব,—তা হ'লে আপনি বড় ভুল করেছেন—মা'র সিন্ধুক খুলে আমাদের কোষ্ঠী দেখ্‌বেন, আমার বয়স বাইশ এবং দাদার সাতাশ, নয় আটাশ হবে।"

পরদিন আমি এমন সাবধান হইয়া রাঁধিতাম যে ঠাকুরপো স্বাস্থ্যতত্ত্বখানা আনিয়া আমাকে পড়িয়া শোনাইতে বসিয়া যাইত,—অসিদ্ধ বা অল্পসিদ্ধ ভাত তরকারি খাইলে পরিপাক যন্ত্রের কিরূপ ব্যাঘাত হয়। আমি উঠিয়া পলাইতাম।

ঘরের কাজ কর্ম্মেও শেফালির অক্লান্ত উৎসাহ। আপন হাতে সে সব গুছাইয়া করে, কোনো পরিশ্রম বাঁচাইয়া চলে না, কষ্টকে কষ্ট বলিয়া ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না। দেখিয়া আমার মাঝে মাঝে রাগ হয়—ভাবি 'মা'র চেয়ে যা'র মায়া বেশী তারে বলে ডাইন'। আমার ঘর আমার সংসার—দরদ হোল ওঁর আমার চেয়ে চার কাঠি! এত বেশী কেন রে বাপু! কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতাম না।

অবিশ্রান্ত জল পড়িলে পাথরেরও ক্ষয় হয়। শেফালি অবিরাম সেবা ও যত্নে ঠাকুরপোর সঙ্গে দুই তিন মাসের মধ্যেই ভাব করিয়া লইল। ঠাকুরপোর স্বভাবই ঐ; সহজে তাহাকে ধরা যায় না, কিন্তু একবার ধরা পড়িলে আর ছাড়ান্ নাই। দু'দিনের ভিতর শেফালিও তাহার ঠাট্টা ও জব্দ করার জ্বালায় আমারই মত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঝখানে আসিয়া পড়িল দোল। আমরা উভয়েই ঠাকুরপোর ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঠাকুরপো

এমন ভাবে তাহার পড়াশুনায় মন দিল যে, দেখিয়া আমরা দু'জনেই মনে করিলাম, বাঁচা গেল, আর ভয় নাই।

দোলের দিন স্নান করিয়া আমি স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়াছি মাত্র, এমন সময় ঠাকুরপো অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া আমার মুখময় রঙ-তেল লেপিয়া দিল। রান্না সারিয়া শেফালিও এই সময় স্নান করিতে আসিতেছিল, আমার দুরবস্থা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া ঘরে খিল দিল।

ঠাকুরপো হাত ধুইয়া ফেলিয়া ডাকিল, "কৈ, ভাত দেবেন কে, আসুন!"

আমি বলিলাম, "ভাত আবার কে দেবে তোমাকে! প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজে বেড়ে খাও।"

"নিজেই বেড়ে আমি খেতে বসেছি—খাওয়াবার লোক অমন ঢের আছে সংসারে! বসি একবার পাতে—দেখি কেমন না ভাত পাই।"

ঠাকুরপো আসন টানিয়া বসিয়া পড়িল। এমন সময় উনি আসিলেন, এবং ঠাকুরপোকে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "এই যে তুই ব'সে গেছিস,—আমি ভাবছি রান্না বুঝি হয় নি। দে ঐ আসনটা, আমিও ব'সে যাই!"

দোলের ছুতায় ঝি বা চাকর কেহ আজ কাজে আসে নাই, সুতরাং পাত-পিঁড়ী আগে করা হয় নাই। ঠাকুরপোর হাত হইতে আসন লইয়া উনি নিজেই পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, "কই, কারো ত দেখা নেই—ভাত দেবে কে?"

ঠাকুরপো বলিল,—"সেইটে ত আমিও ভাবছি।"

"তোর বৌঠান কোথায় গেল?"

ঠাকুরপো জোর পাইয়া বলিল, "দেখুন না কি অন্যায়! ডাকছি; কেউ আসছেন না। ও বড় বৌঠান, এবার দাদা এসেছেন, ফাঁকি-জুকী আর খাটছে না—আসুন শিগগীর।"

স্নানের ঘর হইতে আমি বলিলাম, "তুমি ত চোরকে বল চুরি কর্ত্তে—গৃহস্থকে বল সজাগ থাকতে—। যা দুর্দ্দশা করেছো আমার—কি ক'রে আমি ভাত দি।"

ঠাকুরপো বলিল, "আপনি ভিন্ন কি জগতে আর লোক নেই,—যিনি রান্না করেন, তিনি বুঝি একদিনের তরেও পরিবেষণ কর্ত্তে পারেন না?"

ঠাকুরপো উঠিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ও নতুন গিন্নী, শাগ্‌গির আসুন, ভাত দিয়ে যান্।" শেফালি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল "তা হচ্ছে না। আমি কাব্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করলুম—তোমরা যাও, বাটনা বাট, কুটনা কোট, দাও লক্ষ্মী-পুজোর আলপনা।"

গায়ে সাবান মাখিতে মাখিতে আমি আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। ঠাকুরপো হাসিতে হাসিতে বলিল, "বটে, এই উত্তর? বলি গিয়ে দাদাকে এই কথা?"

ব্যগ্র কণ্ঠে শেফালি চেঁচাইয়া বলিল, "পায়ে পড়ি ঠাকুরপো, পায়ে পড়ি, বলবেন না—কখনও বলবেন না। আসছি, আমি এখুনি আসছি।"

আমি জোরে সাবান কচলাইতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে শেফালি নামিয়া আসিল। ঠাকুরপো সিঁড়ীতে তাহার পদশব্দ পাইয়া বলিল, "শাগ্‌গির ভাত আসুন, আর তর সয় না।"

উনি ঠাকুরপোর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমারো আর আধ ঘণ্টার ভেতর বেরুতেই হবে।"

শেফালি ততক্ষণে রান্না ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

জানলার ফাঁক্ দিয়া দেখিলাম এক হাতে ভাতের থালা ও আরেক হাতে জলের গেলাস লইয়া শেফালি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বাহির হইল। ঠাকুরপো হাঁকিয়া বলিল, "এক, দুই, তিন—এর মধ্যে ঘরে এসে ঢোকা চাই।"

"আমি কি পক্ষীরাজ ঘোড়া"—বলিতে বলিতে শেফালি দরজার চৌকাঠে পা দিয়া আরক্ত মুখে থমকিয়া পিছু হটিল। তাহার মাথার কাপড় স্খলিত হইয়া পড়িল, ও হাত হইতে জলের গেলাস খসিয়া সিঁড়ী দিয়া গড়াইয়া গেল।

ঠাকুরপো উঠিয়া ভাতের থালাটা নামাইয়া নিয়া বলিল, "চৌকাঠে হোঁচট খেলেন বুঝি! ভাগ্যে ভাতের থালাটা ফেলেন নি!"

আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম, উনি শেফালির দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছেন—অতি

স্নিগ্ধ, কোমল, ব্যগ্র, বেদনাভরা দৃষ্টি। শেফালি সে দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।

আমি আসিতেই শেফালি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। উনি বলিলেন, "আমায় এক্ষুণি বা'র হ'তে হবে, সময় নেই বেশী—চাপরাশীকে বরঞ্চ গাড়ী আন্‌তে ব'লে দাও।"

আমি ফিরিয়া রান্নাঘরে গেলাম।

শেফালি নিশ্চল নিস্পন্দভাবে করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমার মন তখন শত সংশয়ে দোলায়মান। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আমি বলিলাম,—"উনি এক্ষুণি বেরিয়ে যাবেন,—ও'র ভাতটা তাড়াতাড়ি দিয়ে এসো—দেরী কর্লে খাওয়াই হ'বে না। আমি কাপড়টা বদ্‌লে আস্‌ছি।"

নত নয়নে শেফালি থালা লইয়া ভাত বাড়িতে বসিল, আমি উপরে কাপড় বদ্‌লাইতে গেলাম।

এও কি কখনো হয়! এক বাড়ীতে থাকিয়া দৈবাৎ মুহূর্ত্তের দেখা কি কেহ বারণ করিয়া রাখিতে পারে! মুখের কথা বন্ধ রাখা যায়, কিন্তু চকিত-বিদ্যুদ্দীপ্তির মত এই পলকের-ভিতর-সকল-উজাড়-করা চাহনি—কোন্ শাসনের জালে ইহাকে আটক রাখা যায়! আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

নীচে আসিয়া দেখি উনি উঠিয়া গিয়াছেন, খাইতে যাহা কিছু লাগে, না লাগে, শেফালি পাতের কাছে সব সাজাইয়া দিয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "উনি কোথা?"

ঠাকুরপো বলিল, "দাদা কাপড় পর্‌তে গেছেন। জান্‌তুম না যে আপনার হাত ছাড়া আর কারো হাতে খান না—তা হ'লে আরেক বেচারাকে—মিছামিছি কষ্ট দিতুম না।"

কথাটা শুনিয়া মনে মনে খুসী হইলাম; বলিলাম—"হে গোবর, ঘুঁটেকে পুড়তে দেখে তুমি হেসো না, যেহেতু একদিন তোমারও এই দশা হ'বে।"

উনি নিবিষ্ট মনে শার্টে বোতাম লাগাইতেছিলেন, আমি গিয়া বলিলাম, "ভাত ফেলে কাপড় পরতে এলে কেন?" উনি বলিলেন "তুমি না থাক্‌লে খাওয়াটা যুৎসই হয় না।"

আমার মনের সকল সন্দেহ জল হইয়া গলিয়া গেল! মনে মনে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলাম।

৫

আমি একদিন শেফালিকে বলিলাম "কি বোকা মেয়ে তুমি শেফালি!"

শেফালি চমকিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, "পরের সংসারের জন্য এত খাটো কেন?" আমি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলাম যে, প্রাণপণ করিয়া খাটিলেও, এবং সংসারে সর্ব্বময়ী হইয়া দাঁড়াইলেও, সংসার তাহার হইয়া যাইবে না। অনেকে ভাবিবেন আমি হিংসুক—ক্ষুদ্রমনা। কিন্তু নিজের স্বার্থ ও স্বত্ব সংরক্ষণের বেলায় কে-ই বা বৃহৎ-চিত্ততার পরিচয় দিয়া থাকে এবং যে লোক হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া বুকের উপর পা চড়াইয়া দেয় তাহাকে কে-ই বা ক্ষমা করিয়া থাকে! আমার কথায় শেফালি হাসিয়া বলিল "ওঃ, এই কথা? সবাই নিজের সংসারের জন্য খাটে—আমি না হয় পরের সংসারের জন্যে খাটলুম! তাতে ইহকালের কিছু না হোক্, পরকালের ত হ'বে।"

"পরকালের লোভ? ম'রে যাই লোভের ভঙ্গি দেখে!"

শেফালি বলিল, "ইহকালে যার লোভ কর্ব্বার কিছু নেই—তার পরকালের লোভের জিনিস যদি না-ও থাকে—তাতে খুব বেশী কিছু আসে যায় না। আসলে কথা হচ্ছে —আমি ব'সে থাক্‌তে পারিনে। তা ছাড়া, আমার শরীরে ভারী বাত—ব'সে যদি থাকি তাহ'লে একেবারে জড়পদার্থ হয়ে পড়্‌ব।"

বাত? ভাস্কর্য্যের আদর্শ সুঠাম সুললিত এই তনুলতা, —ইহার ভিতর বাত? আমি চাহিয়া রহিলাম। প্রত্যক্ষতঃ এটা একটা ওজর—কিন্তু তাহার সঙ্গে আমি পারিয়া উঠিতাম না, সুতরাং অধিক কিছু আর কহিলাম না।

আমি কাজ করিতে গেলে সে আমার হাতের কাজ কাড়িয়া করিত। ফলে আমি হইয়া উঠিলাম কুঁড়ের বাদশা। কাজ যে আমি করিতে পারিতাম না, বা করিতে চাহিতাম না, তা ত নয়; কাজ করিতে গেলে যদি আর একজন হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে তবে কাজ কি করিয়া করাই বা যায়! সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শেফালির হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া আমি অবসর লইয়া বসিলাম। হয় গল্প পড়িয়া না হয় গল্প করিয়া আমার দিন কাটিতে লাগিল। দেখিয়া উনি একদিন বলিলেন, "আজকাল যে তুমি ন'ড়ে ব'স না—মানেটা কি? খালি বিছানায় গড়াগড়ি! বলিলাম, "মানেটা হচ্ছে এই যে, আজকাল আর একজন বাড়ীর গিন্নী হ'য়েছে—আমি এখন বেগানা লোক।"

"নিজের অধিকার কোনও অবস্থাতেই ছাড়্‌তে নেই।"

হাসিয়া বলিলাম, "নেই না কি?"

স্পষ্ট বুঝিলাম কথাটা তাঁহার প্রাণে গিয়া পৌঁছিয়াছে, —কিন্তু উনি কথাটা যেন কানেই তোলেন নাই, এরূপ ভাবে বলিলেন, "ডাক্তার তোমাকে কিন্তু এ সময় ব'সে থাক্‌তে নিষেধ কোরেছেন। এখন শুনছ না, শেষে মুস্কিলে পড়্‌বে আর কি!"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "তুমি আরো দু' চার জন এ রকম হিতৈষিণী এনে জুটিয়ে দাও—তাহ'লেই আমি খুব কাজ কর্ত্তে পার্‌ব। কেউ যখন ছিল না, সংসার নিজের ওপর ছিল, তখন বুঝি আমি কাজ করিনি! এখন আর একজন আমায় কাজ কর্ত্তে দেয় না, বসিয়ে রাখে, আমার তাতে ভারী অপরাধ!"

উনি কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য আমি শেফালির কথা বেশী করিয়া বলিলাম, কিন্তু উনি সে কথার ধার দিয়াও গেলেন না; বলিলেন, "রাঁধুনীর ত জবাব হয়েছে—আর কাকে কাকে জবাব দিতে হ'বে বল।"

বলিলাম, "উপস্থিত ক্ষেত্রে সেটা বরঞ্চ আমাকেই হোক্।"

উনি ফয়সলা লিখিতেছিলেন, হাতের কলম রাখিয়া উঠিয়া আমার কাছে আসিলেন। মনে হইল কি যেন বলিতে চাহিতেছেন অথচ বলিতে পারিতেছেন না, কি যেন সংবরণ করিতে চাহিতেছেন, অথচ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আমি নিস্পন্দ হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মাথার উপরে হাত রাখিয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "অপরাধ কি কিছু আমি কোরেছি সুর? কেন আজ এ কথা!"

হাসিয়া বলিলাম, "বাসি ফুলের মালা কে গলায় পরে!"

ক্ষুব্ধ ভাবে কহিলেন, "বাসি ফুলের মালা ত আমিও তোমার! তোমার চাইতে আমার বয়স কত বেশী! প্রায় ত বুড়ো হ'তে চলেছি—তিরিশ পার হয়েছি, চল্লিশ হ'তে আর কতদিন! আর কয়েক বছরেই চুল পাক্‌বে, দাঁত পড়্‌বে, তখন এ বাসি ফুলের মালা তুমি কি গলা থেকে খুলে ফেলে দেবে?"

রাগ করিয়া মাথার উপর হইতে হাতখানি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আমি বলিলাম "যাও।"

মাথার উপর মাথা রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন,— "আমাকে নিয়েই তোমার যত ভয়, আর তোমাকে নিয়ে আমার বুঝি কোনও ভয় নেই?"

এমন সময় ঠাকুরপো জুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে দরজার কাছে আসিল, আমি ত্রস্তে উঠিয়া বসিলাম।

ঠাকুরপো বলিল, "দাদা বসোরা থেকে ভুপেন বাবু এসেছেন!"

"ভুপেন এসেছে বসোরা থেকে! দেখি ব্যাপার কি?" বলিয়া উনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

নীচের রক হইতে শেফালি ডাকিল, "দিদি এ-বেলা কি রাঁধ্‌বো?"

শেফালি পারৎপক্ষে আমার ঘরে ত আসিত-ই না, উপরেও বড় আসিত না। নীচের তলায় বাড়ীর পিছন দিকে একটি ছোট ঘর ছিল, দিনমানে সে সেইখানেই থাকিত—এবং সে সম্বন্ধে তাহাকে কিছু বলিলে বলিত, সিঁড়ী দিয়া ওঠা-নাবা সে করিতে পারে না, এই ঘরে সে পরম আরামে থাকে।

শেফালির ডাক শুনিয়া ঠাকুরপো জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, "হার্ ম্যাজেষ্টিকে আপনি নীচে থেকে

ডেকে কথা বল্‌ছেন? ওপরে একবার আস্‌তে পার্‌লেন না?"

শেফালি বলিল "সব-তাতেই আপনি একটা না একটা কিছু বল্‌বেন! জিজ্ঞাসা করুন ত দিদিকে এবেলা কি রাঁধব?"

"কবে থেকে আমি আপনার ভৃত্য-তালিকাভুক্ত হ'লাম দয়া ক'রে বলেন যদি—"

শেফালি হার মানিয়া উপরে আসিল।

আমি বলিলাম "আসল কথাটা কি জান, ওঁর কাছে কে একজন এসেছেন—কাজেই এখান থেকে ডাকাডাকি ক'রে কথা বলা যায় না!"

শেফালি চোখ ঘুরাইয়া ঠাকুরপোকে বলিল, "এই কথাটা আর বল্‌তে পার্‌লেন না!"

"কেন বল্‌ব? কত টাকা মাইনে পাই আপনার কাছে!"

"মাইনের চাকরের চেয়ে বিনা মাইনের চাকরের ওপর দাবী অনেক বেশী—তা জানেন?"

ঠাকুরপো কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু শেফালি হঠাৎ সন্ত্রস্ত ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই উনি আসিলেন, ঠাকুরপোও চলিয়া গেল।

চকিত দৃষ্টিক্ষেপে ঘরের চারিদিকে যেন একবার উনি চাহিলেন—ঠিক্‌ যে চাহিলেনই তাহাও আমি বলিতে পারি না,—অন্ততঃ আমার মনে হইল যেন চাহিলেন।

বলিলাম "কি খুঁজছ?"

"খুঁজছি?" বলিয়া বিস্মিত-নয়নে তিনি আমার দিকে চাহিলেন।

আমি হাসিলাম।

বলিলেন, "এ পার থেকে মার্‌লুম তীর লাগল গিয়ে কলাগাছে—ইত্যাকার দারুণ অভিসন্ধি দেখা যাচ্ছে যেন!"

সন্দেহ উদ্রিক্ত করা ভাল নহে, সুতরাং বলিলাম, "মোটেই তা নয়। আসলে কথাটা হ'চ্ছে কি জান, আমার মনে একটা খট্‌কা আস্‌ছে।"

"খট্‌কা? পট্‌কা নয় ত?"

"সে কথাটা তোমার কাছেই জানতে চাই। শেফালি তোমাকে এত ভয় করে কেন?"

"যার চেহারা পর্য্যন্ত আমি ভাল ক'রে দেখি নি—তার মনস্তত্ত্বের খবর আমার কাছে পাওয়া যাবে—এরকম নিষ্পত্তি কল্লে তাতে মিথ্যাযুক্তিই ষোল আনা থাক্‌বে।"

"শুধু শেফালিই যে তোমাকে এড়িয়ে চলে তা নয়—তুমিও কখনো ভুলেও তার কথা মুখে আন না। 'মডেষ্টি' এত বেশী সাবধানী হয় না।"

"বলিনা তাইতে এত,—বল্লে না জানি কি কর্ত্তে! কিন্তু তুমি যখন উল্টো সুর ধরেছ—তখন এবার থেকে সহস্রবার করে বল্‌ব—শেফালি, শেফালি, শেফা—"

আমি মুখ চাপিয়া ধরিলাম।

বলিতেছিলেন উনি কৌতুকের ছলে—কিন্তু তাঁহার স্বরে এক অপরূপ প্রগাঢ়তা ফুটিয়া উঠিতেছিল, যেন কত যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত পিপাসা, কত উচ্ছল ব্যাকুলতা, কত প্রাণপূর্ণ আকিঞ্চন সে বলার সঙ্গে হিল্লোলিয়া উঠিতেছিল, নামোচ্চারণের সঙ্গে তাঁহার উদ্ভিন্ন ওষ্ঠপুট যেন ধ্বনির স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া সে নামের উপরে, এক অদৃশ্য চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল।

অসংবরণীয় এক ক্রন্দনের ভারে আমার সমস্ত মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কষ্টে তাহা সংবরণ করিয়া বলিলাম, "এই, কচ্ছ কি—শেফালি পাশের ঘরে! কি ভাব্‌বে সে তোমার এই বলা শুন্‌লে!"

উচ্চকিত হইয়া তিনি বলিলেন, "শেফালি পাশের ঘরে?"

অর্দ্ধ-হাস্যে বলিলাম, "আজ্ঞে মশায়, হ্যাঁ।"

লজ্জাসহকারে বলিলেন, "দেখে এস ত আছে না কি? না— নেই বোধ হয়—আমাকে জব্দ করার জন্যে তুমি বল্‌ছ!"

আমি বাহির হইতেছিলাম এমন সময় বসিবার ঘরে ভুপেন বাবু তাঁহার প্রতিশ্রুত পাঁচমিনিটকাল নিষ্ফল অপেক্ষা করিয়া অসহিষ্ণুভাবে ডাকিলেন, "কৈ হে কিরণ, পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট কল্লে যে! অভ্যাগতকে বসিয়ে রেখে এ রকম আত্মবিস্মৃত হওয়া কি শিষ্টাচার?"

ভুপেন বাবু এঁর বাল্যবন্ধু। দু-জনের ভিতর ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। আমার বিবাহের সময় তিনি অকস্মাৎ যুদ্ধ-বিভাগে কাজ লইয়া মেসোপটেমিয়ায় চলিয়া যান, সুতরাং

এ পর্য্যন্ত আমাকে দেখার তাঁহার সুযোগ ঘটে নাই। ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই তিনি বন্ধু-সন্দর্শনে আসিয়াছেন।

ভূপেন বাবুর ডাক শুনিয়া উনি তাড়াতাড়ি বলিলেন "চল, ভূপেন তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব'সে আছে।"

আমি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সুতরাং বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "কী তুমি! যাও আমি যাব না!"

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা, এই জানালার কাছে একটু দাঁড়াও, সে শুধু 'আড়াল থেকে হাসি দেখে চ'লে যাবে দেশান্তরে।"

আমি রাগ করিয়া ফিরিয়া বসিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তাও না? উল্টো অভিমান! বদসি যদিকিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী; হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্, স্ফুরদধরসীধবে তব বদন চন্দ্রমা'—"

উঠিয়া ঝনাৎ করিয়া কপাট ঠেলিয়া আমি নাচে ঠাকুরপোর ঘরে চলিয়া গেলাম।

খানিক পরে যখন আমি আমার ঘরে ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখি ভূপেন বাবু দিব্য সেখানে বসিয়া আছেন; আমাকে দেখিয়া হাস্যমুখে তিনি সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, "বহুদূর হ'তে আমি আপনাকে দেখতে এসেছি—আমাকে কি এতক্ষণ বসিয়ে রাখ্‌তে হয়!" আমি লজ্জায় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম, দরজার দুই দিক্ হইতে দুই ভাই হাসিতে হাসিতে তখন বাহির হইয়া আসিলেন।

ঠাকুরপো বলিলেন, "বৌঠান ভয়ানক কাজে ব্যস্ত থাকেন, কাজেই তাঁর আপনাকে বসিয়ে রাখতে হ'য়েছে।"

ভূপেন বাবু উঠিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আপনার কাজের ক্ষতি কর্ব্ব না এখন, আর এক সময়ে আলাপ হ'বে।"

ভূপেন বাবু বাহিরের ঘরে গেলেন। আমি ঠাকুরপোর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, "কি বিশ্বাসঘাতক লোক তোমরা!"

ঠাকুরপো হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঢিল মার্‌লে পাটকেল খেতেই হয়।"

মনে পড়িল ঠাকুরপোর বাকি হিসাবের কথা।—হাসিয়া বলিলাম, "শোধ-বোধ হয়ে গেল, এখন তবে সন্ধি।"

উনি বলিলেন "সন্ধি হ'য়ে গেল?

"রমণীরে কেবা জানে,
মন তার কোন্ খানে!"

কথাটা বলিতে বলিতে মুখের হাসি মলিন হইয়া আসিল। "ভূপেন বাইরে ব'সে আছে" বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

সমাজ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

দিলীপকুমারের পণ্ডিচারী গমন সমাজের দিক থেকে একটি অর্থসূচক ও গুরুত্ববিশিষ্ট ঘটনা মনে হয়। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে তার প্রাণে ধর্ম্মভাব আসে—তার ইতিহাস সে নিজেই কোনদিন ব্যক্ত কোরবে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোন লোকের ধর্ম্মজীবন আলোচনা করা নয়। দিলীপকুমার শুধু আমার বক্তব্যে দৃষ্টান্তস্থল। শনিবারের চিঠির আক্রমণ তাকে দেশছাড়া কোরলে বিশ্বাস করি না। দিলীপকুমার নিজের ক্ষতি কোরেও দেশের কাজ কোরছিল। সঙ্গীত-প্রচারের জন্য সে নিজেকে উৎসর্গ কোরেছিল। এই কালা বাংলাকে সে গান শুনিয়েছিল, সাধারণ ভদ্রঘরে গান তারই জন্য সমাদৃত হয়েছিল, সুমিষ্ট গলা ওস্তাদের কাছে আশা করা অন্যায় নয় তারই জন্য আমরা বুঝেছিলাম। জাতি জাগ্রত হ'লে জাতীয় প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী হয়—দিলীপকুমার সেই প্রতিভার একটি মুখ। এই মুখ নীরব হ'ল কেন আমাদের জানবার অধিকার আছে। সুভাষবাবু মাত্র এই দাবীটুকু কোরেছিলেন। কারণগুলি জানলে লাভ বই ক্ষতি নেই। আমি দেশ-নায়ক নই—আমি যুবকদের সাবধান কোরতে পারি না। আমি বলি—সন্ন্যাসগ্রহণ কিংবা আশ্রমবাস যদি কোন সামাজিক রোগের চিহ্ন হয়, তাহ'লে তার প্রতীকার করা উচিৎ—আর যদি স্বাস্থ্যের লক্ষণ হয়, তা হ'লে যত লোকে সন্ন্যাসগ্রহণের সুযোগ পায়, তার চেষ্টা করা বিধেয়।

বুঝে-সুঝেই স্বাস্থ্যের তুলনা দিচ্ছি। এক রকম নৈতিক মনোভাব আছে যার বশবর্ত্তী হ'য়ে লোকে ঘটনাকে ভাল-মন্দর শ্রেণীতে ভাগ করে। এ যেন বিচারের পূর্ব্বেই রায় দেওয়া। বিচারকের সংস্কার প্রকাশ ছাড়া এই প্রকারে বিচারের কোন মূল্য নেই। নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের গোটা কয়েক মূলকথা জেনে তার ওপর রায় দেওয়াই ভাল। নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি বোধ হয় অনেকেই গ্রহণ কোরবেন :—

আমাদের সমাজ জীবন্মৃত হ'য়ে পড়েছে।

সেজন্য আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতা অনেকটা দায়ী।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতা লাভের আশা করা যায় না।

যে কারণেই হোক রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর অনেকের—বিশেষতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস এবং তারই ফলে সাধারণের মনে একটা নৈরাশ্য এসেছে। সমাজ-মনের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে—আমরা বড়ই একান্ত-বাদী। আপোষ করা আমাদের ধাতে সয় না। মারি ত হাতি লুটি ত ভাণ্ডার। ধর্ম্ম বোলতে একেবারে মোক্ষধর্ম্ম, ধার্ম্মিক বোলতে একেবারে সন্ন্যাসী বুঝি; আনন্দ বোলতে একেবারে ব্রহ্মানন্দ, জীবন মানে মৃত্যুর অর্থাৎ শেষদিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। চতুর্ব্বর্গের সেরা যখন মোক্ষ, তখন সন্ন্যাস-গ্রহণই মানবত্বের পরাকাষ্ঠা। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কামবর্গের যত কাজ সন্ন্যাসী কোরতে পারেন, অন্যে তা পারে না। স্বদেশী-যুগের প্রবর্ত্তকরা এখন অন্য কথা বোল্লেও ১৯০৫-৬ সালে এই কথাই ভেবেছিলেন।

তাহ'লে দাঁড়াল এই, যে মানুষ বা জাতি নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে নিরাশ হয়েছে, সেই মানুষ বা জাতি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, আশ্রমকেই সমগ্র সমাজের কেন্দ্র মনে করে। যার সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে কিংবা সম্পত্তিজ্ঞান নেই, সেই আশ্রমবাসী হয়।

এ সব ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির ও জাতির একটি বিশিষ্ট প্রেরণার ইতিহাস থাকে। প্রেরণার মানে কোন

অতিপ্রাকৃত, নিগূঢ় রহস্যময় শক্তি নয়। প্রেরণার পিছনে কোন দেবতা নেই, শুধু দৈব আছে। প্রেরণা বোলতে গোটা কয়েক অতীত ঘটনার অনুক্রম বা পর্য্যায় বুঝি। এই পর্য্যায়কে মানুষ বুদ্ধির ধর্ম্মানুযায়ী রীতি ও নীতি-সাপেক্ষ কোরে তোলে। তার মানে নয় যে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন রীতি নীতি গুপ্ত আছে যাকে আবিষ্কার কোরলে তবেই তাদের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়। যদি কোন মানুষ অল্প বয়সে ভগবদ্‌ভক্ত পরিবারে পালিত হয়, কোন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গলাভ করে, মোক্ষ-শাস্ত্র পড়তে থাকে, কিংবা যে কোন কারণে ভগ্ন-মনোরথ হয়—তাহ'লে সেই মানুষের পক্ষে ভগবদ্‌ভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পূর্ব্বাভ্যাসই প্রেরণা। সারাদিন হেয় কার্য্যে ব্যাপৃত হ'য়ে যত লোক সৌভাগ্যশালী হন্—তাঁদের মধ্যে অনেকেই শুধু অভ্যাসের বশে (কিংবা লোভের বশে—অর্থাৎ লাভের আশায়) ধার্ম্মিক হন এবং আয়ের যৎকিঞ্চিৎ আশ্রমের (এবং পিঞ্জরাপোলের) জন্য দান করেন। আর্থিক হিসাবে সার্থক জীবনেই ধর্ম্মপ্রেরণা বেশী খুঁজে পাওয়া যায়। মন্ত্র নেবার পর থেকে—কিম্বা আশ্রমে গৃহী-সভ্য হবার পর থেকে সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সকলেই জানেন। সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য শস্ত্রের অপেক্ষা শাস্ত্র কম দায়ী নয়।

অন্য এক রকমের প্রেরণা আছে - যার নাম প্রবৃত্তি। জাতির অভিজ্ঞতা ঐতিহ্য বা প্রেরণা যখন একটি মানুষের ভেতর থেকে কাজ করে তখনই তাকে প্রবৃত্তি বলি। যদিও কোন প্রবৃত্তি অ-সংস্পৃষ্টভাবে কাজ করে না, অন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে, তবুও, সুবিধার জন্য, কোন ব্যবহারের পিছনে একটি বিশেষ প্রবৃত্তি আছে মনে কোরতে পারি। সন্ন্যাসের অন্তরালে instinct of submissiveness রয়েছে। একেই আমরা গুরুগম্ভীর নীতির ভাষায় ত্যাগ বলি। সংসারে বিরক্ত হবার পূর্ব্বেও ত্যাগের স্পৃহা আসতে পারে। অনেকে ত্যাগী হ'য়েই জন্মায়—তারা পরের জন্য বেঁচে থাকে। পরে, জন্মগত প্রবৃত্তিকে rationalise কোরে বলে যে গুরুর পায়ে আত্ম-সমর্পণ কোরলেই, নিজেকে বিলিয়ে দিলেই, ভগবানে অচলা ভক্তি স্থাপন কোরলেই নিজেকে পাওয়া যায়। গুরুর পায়ে আত্ম-সমর্পণ কোরলেই, গুরুর আশ্রমের শুভার্থে, অর্থাৎ তার প্রতিপত্তির জন্য নিজের শক্তি প্রয়োগ কোরতে হবে। কেননা আশ্রম হচ্ছে ইউটোপীয়া, আদর্শ সমাজ। সেখানে সংসারের বিরোধ, বিবাদ, বিসম্বাদ, ঘাত প্রতিঘাত কিছুই নেই। আশ্রমের পুরুষ এক—গুরু, যিনি গ্রহণ করেন; বাকী সব ত্যাগী পুরুষ—ভক্তসম্প্রদায়—নারীর দল। প্রত্যেক আশ্রম যেন একটি রোমান পরিবার—যেখানে একমাত্র পিতারই অধিকার আছে—অন্যের ভক্তি-অর্ঘ্য দান করা ছাড়া অন্য অধিকার নেই। এটি শুধু তুলনা নয়। কথাটি কতখানি সত্য যিনি নব্য মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি জানেন তিনিই বুঝবেন।

অতএব একধারে নৈরাশ্য ও অসহায়তা, অন্যধারে ঐতিহ্য ও ইতিহাস, একধারে অবচেতনায় গুপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ, অন্যধারে আধিভৌতিক প্রতিপত্তি লাভ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আধিদৈবিক ও তথাকথিত আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অতি-প্রাকৃত যন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ, একধারে জন্মগত ত্যাগের প্রবৃত্তি ও পিতৃভক্তির প্রসারণ, অন্যধারে আত্মশক্তি স্ফূরণের সুযোগের অভাব এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের গোলমাল—এই হ'ল বর্ত্তমানে সন্ন্যাসগ্রহণের সামাজিক ব্যাখ্যা। সন্ন্যাস-গ্রহণের সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই—সংসার দুঃখময়, এই সংসারে দুঃখ নিরাকরণের উপায় নেই—একজন দুঃখত্রাতা চাই যাঁর হাতে কিংবা পায়ে আত্মসমর্পণ করা সহজ এবং কোরলে ব্যক্তিগত দুঃখ ও দায়িত্বের লাঘব হয়—এবং একটি সুখের সংসার প্রয়োজন যেখানে বাস কোরলে শান্তি পাওয়া যাবে।

অনেকে এই আপত্তি কোরবেন যে সন্ন্যাস ধর্ম্মের মর্ম্ম বুদ্ধির অগোচর—সে মর্ম্ম গ্রহণের জন্য বুদ্ধির অতীত কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। 'অতীত' কথাটি দ্ব্যর্থ বোধক। হরিদ্বার কাশীর অতীত বোল্লে দুটি জিনিষ বুঝি—প্রথমতঃ হরিদ্বার যেতে হ'লে কাশী হয়ে যেতেই হবে—দ্বিতীয়তঃ হরিদ্বার কাশীর চেয়ে দূর হলেও সেখানে যাবার জন্য কাশী হ'য়ে যাবার দরকার নেই। অতীতের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় অন্তঃস্থিতের বালাই

নেই। বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মের কিংবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মর্ম্ম গ্রহণ করা যাক আর নাই যাক্‌, যদি কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বা আশ্রমবাসী আচার ব্যবহারে, চিন্তায়, বুদ্ধির নিম্নজগতে আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে বিচরণ করেন, তা হ'লে বুদ্ধির দ্বারাই তাঁর আচার ব্যবহার এবং চিন্তাকে বিচার করতে বাধ্য হব। যতদিন এই জগতে আছি ততদিন বিচার-বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র বা মাপকাঠি আমাদের নেই। বুদ্ধির অনেক দোষ আছে জানি কিন্তু এর একটি মহৎগুণ এই যে বুদ্ধির দ্বারাই anti-intellectualist হওয়া যায়। যোগ নেবার পর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যদি কোন ব্যক্তি বোকা হ'য়ে যান, তা হ'লে সমগ্র মানব জাতির চেষ্টা—অর্থাৎ সভ্যতা, বিফল হয়েছে স্বীকার কোরতে হবে। অবশ্য তর্কের খাতিরে বলা যায়—বিফল হ'লে ক্ষতি কি? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যায় না? ঐ হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞান ও সন্ন্যাস গ্রহণও বিফল হয়েছে। কেননা যাজ্ঞবল্ক্য থেকে, বুদ্ধ, যীশু, প্লটিই-নস্‌, মহম্মদ, শঙ্কর, রামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্ত অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন—এখনও মানস-সরোবরের ধারে এবং ভারতবর্ষের নানা আশ্রমে অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী আছেন, প্রত্যেকেই এক একটি দল তৈরী কোরেছেন, এবং প্রত্যেকের ধারণা ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সব জ্ঞানই মুঠোর ভেতর এসে যায়—তা সত্ত্বেও অনেক সজ্জন সভ্যতার জন্য প্রাণ দিচ্ছে, বিজ্ঞানের অনুশীলন কোরছে, মানবের মঙ্গল-কামনা কোরছে। মোদ্দা কথা এই যে যেমন বুদ্ধির সঙ্গে বোধির সম্বন্ধ না থাকতে পারে, তেমনি বুদ্ধ হলেও বুদ্ধিমান নাও হ'তে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞান বুদ্ধকে বাতিল করতে এখনও পারেনি। সভ্যতার ভিত্তি বুদ্ধি, চূড়া যাই হোক না কেন। যদি ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে Einsteinকে নতুন কথা না শোনাতে পারেন, তা হ'লে তাঁর নির্ব্বিকল্প সমাধি সভ্যতার পক্ষে অবান্তর। এই কথাই আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাঁর অমার্জ্জিত বৈজ্ঞানিক-ভাষায় বোলতেন 'একজন ব্রহ্মজ্ঞানীকে খুব high voltage এর shock দিতে ইচ্ছা করে, দেখি তিনি কি করেন!' আমার বন্ধু জানতেন না যে সন্ন্যাসী হ'লে আর shock লাগে না, আশ্রমের গণ্ডীর মতন insulation নেই। Shocked হই আমরা, যাঁরা মাটিতে দাঁড়াই—কোন কাঠের tripodএর ওপর উঠি না।

প্রত্যেক মানুষের হাতে দুটি কাজ আছে—নিজের উন্নতি এবং সভ্যতার সমৃদ্ধি সাধন করা। দুই কাজের মধ্যে বিরোধ নেই এবং একটি অপরটির ওপর নির্ভর কোরছে বোল্লে যথেষ্ট বলা হ'ল না। সভ্যতাকে বাতিল কোরে যখন মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হচ্ছে এবং নিজে মানুষের মতন মানুষ না হ'য়ে, আত্মশক্তি না বাড়িয়ে লোকে যখন দেশ-নায়ক হচ্ছে, তখন নিজের উন্নতির সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির বিরোধ রয়েছে স্বীকার কোরতেই হবে। দৃষ্টান্তের অবধি নেই—এত ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে বহু সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা যে বিরোধই সমাজের একমাত্র নিয়ম। ধনিসম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও মৌলবীর দল, Bureaucrat, aristocratএর দল স্বার্থের তাড়নাতেই কাজ করতে উদ্যত হয়েছিল, প্রথম প্রথম সভ্যতার উপকারও হয়েছিল—আজকাল নানা কারণে তাদের দ্বারা উপকার হচ্ছে না সভ্যতার অপকারই হচ্ছে।

দোষ কার? দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। এখন ধরা যাক, একজন প্রতিভাশালী যুবক সত্যের সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ কোরল। সাধারণতঃ, এ সত্য তার নিজের স্বার্থ। যতক্ষণ না সে চরম সত্য উপলব্ধি কোরছে, ততক্ষণ তার উন্নতির ক্রম-বিকাশের প্রত্যেক স্তরে স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ মঙ্গলের বিবাদ বাধবেই বাধবে। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে দেখলে নীচু জায়গা সমতল বলে মনে হয়, কিন্তু উঠতে উঠতে যখন পথিক বিশ্রাম নেয়, আত্মতৃপ্ত হয়, তখনই উপত্যকার অসমানত্ব বেশী কোরে চোখে ঠেকে। বুদ্ধির জগত থেকে অন্য জগত মিথ্যা মনে হয়, প্রাণময় জগত থেকে মনোময় জগতকে বাতিল করা স্বাভাবিক—যেমন বের্গ্‌সঁ কোরেছেন। আবার আত্মার জগতে প্রাণময়, মনোময় জগত মরীচিকার মতন। কারণ মানুষের উন্নতির ধারা অব্যাহত, অবিশ্রান্ত কিংবা অবিচ্ছিন্ন নয়। Cataract of Lodorএর ছন্দে জীবন চলে—per Saltum লাফিয়ে লাফিয়ে কখনও বা মন্থর গতিতে। সমাজেরও দোষ এই যে তার গঠন সকলকে নিয়ে—সেই

জন্য অসাধারণকে সে ভয় করে—তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। ভয়ের পিছনে একটি স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্য-সূচক প্রবৃত্তি আছে—তার নাম আত্মরক্ষা। একধারে ব্যক্তিগত উন্নতির তাড়না—বিপরীত দিকে সমাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কার জোর বেশী প্রমাণ হবে কিসে? প্রমাণ যখন পরে পাওয়া যায়, তখন ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখন সম্ভব নয়। সেই জন্য বলি, সভ্যতার অপকারের জন্ত সমাজের চেয়ে, ব্যক্তিই দায়ী। যে ব্যক্তি যত প্রতিভাশালী, তার দায় তত বেশী। এই দায়-খালাসের এক উপায় আছে--মানুষ যদি আশ্রমকে স্বার্গ অর্থাৎ সত্যসন্ধানের শুধু উপায় মনে করে। সমাজের নিজে হ'তে কাজ করবার উপায় নেই। এই সামাজিক সভ্যতার জন্য মানুষের প্রাণ শক্তিমান হ'ল, বুদ্ধি ক্ষুরধার হ'ল, হৃদয়বৃত্তি প্রসারিত হ'ল, কিন্তু সেই মানুষ যখন কোন রহস্যময় স্বার্গের জন্য, নৈরাশ্যের বশে, কিংবা কোন অতি সাধারণ অথচ গুপ্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা কোন অপরিতৃপ্ত বাসনার ক্ষতিপূরণ কোরতে আশ্রমে প্রবেশ কোরল, তখন তাকে সভ্যতার অকৃতজ্ঞ সন্তান নাম দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যদি দেখি যে সন্ন্যাসগ্রহণের পর সন্ন্যাসীর বুদ্ধি সূক্ষ্মতর হয়েছে, আনন্দ উপভোগ করবার ক্ষমতা বেড়েছে, প্রাণে নূতন শক্তি জন্মেছে, শুধু তাই নয়, যদি দেখি আশ্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি হচ্ছে, রস-সৃষ্টি, বিজ্ঞানালোচনা চলছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিপুষ্ট হচ্ছে, যদি দেখি আশ্রমে সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার বিরোধের অবসান এবং সমস্যার সমাধান হচ্ছে এবং জাতের মঙ্গল সাধনার জল্পনা-কল্পনা চলছে, যদি দেখি আশ্রম থেকে সন্ন্যাসীর দল বেরিয়ে এসে গৃহী হ'য়েছেন--সমাজের ও সভ্যতার হিতসাধন কোরছেন, সাধারণের মধ্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রভাব বিস্তার কোরছেন—তখনই আশ্রমকে সমাজের কেন্দ্রস্থল ও বীজক্ষেত্র বোলব। শিক্ষাকেন্দ্র যেমন সমাজের আদিও নয়, অন্তও নয়, চিরজীবন কলেজে পড়লে (কিংবা পড়ালে) ছাত্র (অধ্যাপকও) যেমন মূর্খই থেকে যায়, তেমনি আশ্রম সমাজের আদিও নয়, অন্তও নয়, এবং আজন্ম ও আমরণ, সন্ন্যাসী, সমাজ ও সভ্যতার ভীষণ শত্রু। হিন্দুসভ্যতার আদিতে আশ্রম ছিল না এবং আশ্রমেই সে সভ্যতা শেষ হবে না। আশ্রমের পূর্ব্বে সমাজ ছিল, সে সমাজ রোগদুষ্ট হবার পরই আশ্রম তৈরী হয়েছিল (তাও আবার বর্ণাশ্রম)। যীশুকে জেরুসালেমে ফিরতে হ'য়েছিল, বুদ্ধকে সারনাথে যেতে হ'য়েছিল, মহম্মদকেও মক্কায় আস্‌তে হ'য়েছিল। বীজ-ক্ষেত্র থেকে নূতন বীজ বপন করা হোক—কিন্তু বীজ-ক্ষেত্রই পৃথিবীর সমগ্র ভূমি নয় এই কথা আশ্রমবাসী মনে রাখলে আশ্রম ও সমাজের বিরোধ-সমস্যা মিটবে।

বর্ত্তমান ভারতের কয়টি আশ্রম শিক্ষাকেন্দ্র বোলে পরিগণিত হ'তে পারে? যতদূর জানি ও শুনেছি, কোন আশ্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার নামে ভূতুড়ে বিদ্যার আলোচনা হয়, কোন আশ্রমে চরকার ঘরঘরানি বীণাধ্বনি অপেক্ষা মধুর মনে হয়, কোন আশ্রম থেকে অপাঠ্য কবিতা বেরুচ্ছে, কোন আশ্রমে প্রবেশ কোরলেই মনে হয় প্রত্যেক আশ্রমবাসীর মুখে ত্যাগের আত্মাভিমান ফুটে উঠেছে—আবার প্রায় সকল আশ্রমই দ্বেষ হিংসা সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ। কয়টি আশ্রমে নূতন সভ্যতার বীজ তৈরী হচ্ছে? কয়টি আশ্রমে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত গৃহী শিক্ষিত হচ্ছেন?

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছুটির দিনে

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, বি-এ

সেদিন ছিল মহরমের ছুটি। কাছারী বন্ধ। ড্রয়িং-রুমে এক কেদারার উপর কাৎ হইয়া চুরুট টানিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম এই দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ-বৎসরব্যাপী জীবনের বিফলতার কথা। লোকে বলিত আমি বুদ্ধিমান, জীবনে খুবই উন্নতি করিব। কিন্তু আত্মীয় ও বন্ধুদের এই ভবিষ্যৎবাণীকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া বুদ্ধিমান আমি, আজও এক বুদ্ধিমাত্র লইয়াই বাঁচিয়া আছি। অনেকেই তাই আমার বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত। কেহ বলে যে আমি বেশী চালাক। কাহারও মতে আমি কুড়ে। কেহ বলে যে টাইটা ভাল বাঁধিতে না পারায় মক্কেলরা আমায় বিশ্বাস করে না। আমার কাজে একাগ্রতা নাই সেইজন্য জীবনে কিছু করিতে পারিলাম না—এরূপ কথাও আমি শুনিয়াছি। আবার কারও বিশ্বাস, চেয়ারগুলি বছরে দু'বার করিয়া পালিশ ও রং করাইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাক্‌টিস্ জমিত। এই বাঁধি গৎ ও ছেঁদো কথা শুনিয়া শুনিয়া আমি পাগল হইয়া উঠিয়াছি; ঋণের দায়ে ঘুম আমার একরূপ বন্ধ। মক্কেল অপেক্ষা পাওনাদার বেশী; আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী; বন্ধুত্ব অপেক্ষা হিতোপদেশ বেশী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রামস্‌বোথাম প্রাইজ ও স্নেহশীলা মেডেল পাইয়া, ছাত্রজীবনে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে আমি একটু দয়ার সহিত মিশিতাম। আজ তাদের মধ্যে কারও মিনার্ভা গাড়ী, কারও বালীগঞ্জে বিরাট প্রাসাদ। আর প্রাইজ ও মেডেল প্রাপ্ত আমার ছেঁড়া প্যাঁতালুন, ভাঙ্গা চেয়ার, ও ডবল মর্গেজে আবদ্ধ চূণবালীখসা পৈতৃক বাড়ী।

নিজের দুঃখময় জীবনের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন—"মতি ক'লকাতায় এসেছে, কাল ডেরাডুন যাবে। তাকে দু'টি না খাওয়ালে কেমন দেখায়।"

মতি আমার স্ত্রীর পনর বৎসরের ছোট ভাই, ডেরাডুনে ফরেষ্টারী পড়ে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর একমাত্র পুত্র সে। তাকে না খাওয়াইলে কেমন দেখায় তা সত্য। কিন্তু খাওয়াই কি? রুদ্ধ বাতাস ভিন্ন সব জিনিষই পয়সা দিয়া কিনিতে হয়!

আমি হতাশভাবে মায়ার দিকে চাহিলাম। সে আমার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। বলিল, "বাবা মতির মারফত ক'টা টাকা পাঠিয়েছেন। তা' থেকেই ব্যবস্থা ক'রবো'খন।"

শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম।

এমন সময় বেয়ারা আসিয়া বলিল—"একঠো বাবু।" মক্কেলও হইতে পারে ভাবিয়া বলিলাম—"ভীতর লে আও।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই খাকীর হাফপ্যাণ্ট-পরা খর্ব্বকায় স্থূলবপু একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলাম, পাওনাদার নয়—। মায়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আগন্তুক ও মায়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়াছিলেন।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনিই হাইকোর্টের উকীল ডক্টর তারানাথ রায়, পি-আর-এস, পি-এচ্-ডি, ডি-এল্?" ব্যর্থ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি ছিল যেন বিড়ম্বনার চরম চিহ্ন, জীবনের বিরাট পরিহাস। যাহা হউক আমি উত্তর করিলাম—"হ্যাঁ আমারই নাম তারানাথ। আপনার প্রয়োজন?"

তিনি বলিলেন—"একটু দরকার আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মোশন্, না এ্যাপীল?"

"না সে সব কিছু নয়।"

"তবে?"

বলিয়াই আমি তাঁর দিকে চাহিলাম। মনে মনে একটু বিরক্তও হইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় চিন্তে পাচ্ছেন না?"

বলিলাম—"না, মনে ত পড়ছে না।"

"আপনার শ্বশুরবাড়ীর পাশে সোমেদের বাড়ী। আমার নাম দুলালচন্দ্র সোম।"

মনে পড়িল বিশ বৎসর আগের কথা,—একখানা গোলগাল মুখ, শান্ত ডাগর চোখ দুটি, সদাহাস্যময়, নম্র। আমি বলিলাম—"ওঃ দুলালবাবু!" তাঁকে চিনিতে পারায় দুলাল খুসী হইল।

আমার যখন বিবাহ হয়, দুলাল তখন বিশ বছরের। শিবপুরে ওভারসিয়ারী পড়ে। খুব ভাব ছিল শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সোমেদের। বিবাহের পর ক'বার দুলালের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীতে দেখা হইয়াছে। তারপরেই একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম তার কথা।

প্রশ্ন করিলাম, "কি করা হ'চ্ছে আপনার এখন?"

"রেঙ্গুনে কন্ট্রাক্টরী কত্তু'ম।"

"ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?"

"হাঁ ছেড়েই দিয়েছি"

"এত অল্প বয়সে?"

"আর দরকার নেই আমার, বে-থাও করিনি। ভাই-ভাই-পোরা সচ্ছল অবস্থাতেই আছে। আর খাটতে ইচ্ছে হয় না।"

এইরূপ অনেক কথা হইল। ব্যবসা সংক্রান্ত কথা, রেঙ্গুনের কথা, বর্ম্মী রমণীর কথা, রেঙ্গুনে বাঙ্গালী জীবন, আরও কত কি? দেখিলাম মানুষটা ঠিক তেমনিই আছে—সরল, সহজ, হাস্যময়।

বেলা বেশী হইয়া গেল। আমি বারবার ঘড়ির দিকে চাহিতেছিলাম। দুলাল বলিল—"আপনার সময় আমি বৃথা নষ্ট কর্ব্ব না। একটা কথা—।"

জিজ্ঞাসা করিলাম —"কি?"

"সামান্য কিছু টাকা আমি আপনার ছেলেমেয়েদের দিতে চাই।" আমি তার দিকে চাহিলাম। দুলাল বলিল—"এই টাকাটা সঞ্চয় ক'রেছি আপনার ছেলেপিলেদের জন্যে।"

আমি বলিলাম—"আপনার ভাইপোরা রয়েছে, এ টাকাটা তাদেরই ত দেওয়া উচিৎ।"

দুলাল বলিল যে এই সঙ্কল্প লইয়াই তার সঞ্চয় করা।

দুলালের কথা শুনিয়া অনেক কথাই আমার মনে হইল। বিবাহের পর মায়া বলিয়াছিল দুলাল তাকে ভাল-বাসিত;—পাগল হইয়াছিল তাকে বিবাহ করিবার জন্য। দুলালদের অবস্থা ভাল ছিল না। সে ওভারসিয়ারী পড়ে আর আমি তখন প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করিয়াছি। তাই মায়ার পিতা আমাকেই মনোনীত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ছেলেবেলার একটা খেয়ালের জন্য যে দুলাল চিরকুমার রহিয়াছে তাহা আমি জানিতাম না। আজ তার তরুণ জীবনের প্রেমিকার জন্য তার সঞ্চিত অর্থরাশি উপহার আনিয়াছে—আর তাহা দিতে চাহিতেছে অত্যন্ত বিনয় সহকারে। দাতার আত্মপ্রসাদের ভাবটিও যেন তার মনে উঁকি মারে নাই।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া দুলাল বলিল, "ইতস্ততঃ কচ্ছেন কেন? সঙ্কোচের ত কিছুই নেই এর ভেতর!" এই বলিতে বলিতে সে একটা চেকের বই বাহির করিয়া লিখিল—

Pay to Dr. Taranath Roy
Rs. 50,000/—
(Fifty thousand rupees only)
D. Shome

তারপর চেকখানা ক্রস্ করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "দয়া ক'রে নিন।" দাতার যে এত অনুনয় বিনয়, এত আগ্রহ হইতে পারে, ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল।

এমন সময় মায়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল,"এই যে দুলাল-দা'। প্রথমটা তুমি যখন ঘরে ঢুকলে, চিনতেই পারিনি। ভাবলুম কে হবে। হঠাৎ মনে পড়ল যে এ দুলাল-দা না হ'য়ে যায়না।"

দুলাল একটু হাসিয়া বলিল, "এখনও মনে আছে আমাকে তা হ'লে।" তার গলাটা শেষ দিকে একটু কাঁপিয়া গেল।

তরুণ যৌবনে দুলালের প্রতি মায়ার মনোভাব কি ছিল জানিনা। হয়ত বা তারও ইচ্ছা ছিল দুলালকে বিবাহ করিবার। কিন্তু স্ত্রীলোক সহজে ধরা দেয়না। আজ বাল্য-কালের এই প্রতিবেশীর সঙ্গে মায়া ঠিক ভগ্নীর মতই মিশিতে-ছিল। দ্বিধা নাই, জড়তার চিহ্ন নাই। সে বলিল—"দুলাল-দা'কে ভুললে চলবে কেন?"

দুলালের মুখখানা একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মায়ার স্মৃতিপটে ভ্রাতার আসন দখল করিয়া সে ত বাঁচিয়া থাকিতে চায় নাই।

মায়া ছিল খেয়ালী ধরণের মানুষ। কখনও খুব হাসিয়া লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিয়া মানুষকে আপনার করিয়া লইতে পারিত। আবার সামান্য কারণে পরমুহূর্ত্তেই রূঢ় ব্যবহার করিয়া আঘাত দিতেও তার জুড়িদার কেহ ছিলনা। আমিও সেই ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতাম। আমার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ভয় করিয়া চলিত। দুলালের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। দু' পক্ষেই বেশ একটা সরসতা জমিয়া উঠিয়াছিল, এক সময়ে হঠাৎ চেক্‌খানা মায়ার চোখে পড়িল।

মায়া বলিল, "এ চেক্ কিসের?"

দুলাল বলিল—"ওটা কিছু নয়।"

"পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক্ দেখছি; কিছু নয় তার মানে কি? এত বড়মানুষ তুমি কবে হ'লে?"

এই খোঁচা খাইয়া হতভাগ্য দুলালের মুখখানা তামার মত হইয়া গেল। সে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলিল, "তোমার ছেলে মেয়েদের জন্য।"

মায়া বলিল. "কেন তুমি তাদের দিতে যাবে! আর তারাই বা নেবে কেন?"

"যদি দয়া ক'রে—।"

"এ সব বিষয়ে দয়ার কথা উঠতেই পারে না। অনেক নিকট আত্মীয়স্বজন তোমার আছে, টাকাটা তাদের দিয়ো। আমার ছেলেমেয়েদের কারও কাছে সাহায্যের দরকার নাই।"

"আমি যে সঞ্চয় করেছি এই উদ্দেশ্যে।"

"ভুল করেছ।"

মায়া যেন অতীতের কোমল সম্বন্ধটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায়।

দুলালের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, তারও ইচ্ছা একটা পাল্‌টা আঘাত করে। আঘাত করিবার যথেষ্ট উপকরণ হয়ত বা তার ছিল, কিন্তু সত্যকার বীরের মত সেই অস্ত্র সে প্রয়োগ করিল না। একবার খালি আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি মায়ার দিকে চাহিবামাত্র সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "না না তা হ'তে পারে না। অভাব কি তোমার এতই বেশী হ'য়েছে যে স্ত্রীর এত বড় অপমানের চিহ্নটাকে তুমি হাতে ক'রে তুলে নেবে?" ইহা বলিয়াই সে চেকখানা হাতে তুলিয়া লইল, তারপর টেবিলের উপরেই তার দিকে একটু আগাইয়া দিয়া বলিল—"আমাদের চেয়েও গরীব সংসারে থাকতে পারে দুলাল-দা'। এতই যদি তোমার দান করবার সখ হ'য়ে থাকে ত টাকাটা তাদের দিও।"

বেত্রাহতের মত দুলালের মুখে ফুটিয়া উঠিল একটা তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। তার সমস্ত জীবনের একমাত্র আশাকে মায়া যে এমন করিয়া পদদলিত করিয়া দিবে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

সে আস্তে—আস্তে টুপীটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তিন চার সেকেণ্ড সময় কি যেন ভাবিয়া একবার আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দুলালের সে করুণ মুখচ্ছবি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই।

মায়ার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই হয় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় যে চেকখানা দিতে আসিয়া দুলাল যতটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, চেকটা গ্রহণ না করিয়া মায়া যেন তার চেয়ে অনেক বেশী ধরা দিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

মনীষী গিরিশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সকল মনীষী স্বদেশের হিতসাধনকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন স্বর্গীয় মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় আজকালকার দিনে অনেকেই তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, অনেকেই তাঁহাকে জানেন না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন তাঁহার নাম লোকে নিত্য স্মরণ করিত, তদানীন্তন কালে তিনি বাংলাদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর-কর্ম্মী ও দেশনায়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীলকরগণের অত্যাচারের সময়ে তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনী-দ্বারা দুর্ব্বল, অত্যাচারপীড়িতদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক ও অকপট সহানুভূতি ছিল তাহা বাস্তবিকই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নানাপ্রকারে তিনি জন-সাধারণের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতেন। সংবাদপত্রসেবাই তাহার মধ্যে প্রধান। তাঁহার নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলিদ্বারা তখনকার দিনে নানাপ্রকারে দেশের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি সে সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রূপে সম্মানিত হইতেন। প্রসিদ্ধ "Bengalee" পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন। অধুনা-বিলুপ্ত "Hindoo Patriot"ও তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই পত্রিকাখানিরও তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সে সময়ে এই পত্রিকাদুইখানি জনসমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হইত এবং তদানীন্তন কালের রাজপুরুষগণ এই পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন এবং তাঁহাদের শাসনকার্য্যের নিরপেক্ষ ও তীব্র সমালোচনাগুলির সহিত তাঁহারা সব সময়ে একমত হইতে না পারিলেও প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

"Hindoo Patriot" পত্রিকাখানি তিনি মাত্র তিন বৎসর কাল সম্পাদন করিবার পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার

অকৃত্রিম বন্ধু, স্বদেশ হিতৈষী স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ইহার সম্পাদনভার ন্যস্ত করেন। গিরিশচন্দ্রের জ্ঞাতি-ভ্রাতা স্বর্গীয় যদুনাথ ঘোষ, "Hindoo Patriot" সম্পাদনে হরিশ্চন্দ্রকে প্রভূত সাহায্য করিতেন। "Hindoo Patriot"-এর অনেক সম্পাদকীয় মন্তব্য যদুনাথের রচনা।

হরিশ্চন্দ্রকে সম্পাদনভার সমর্পণ করিবার পরেও গিরিশচন্দ্র উক্ত কাগজে লেখা বন্ধ করেন নাই। সোদর-প্রতিম হরিশ্চন্দ্রকে তিনি সম্পাদন কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। গিরিশচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামরিক আয়-

কৈলাস কামিনী

ব্যয় বিভাগে কর্ম্ম করিতেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়াও গবর্ণমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে তিনি অনেক সময়ে নির্ভীকভাবে তাঁহার তেজস্বিনী ভাষায় যে সকল মন্তব্যাদি প্রকাশিত করিতেন তাহা পড়িলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি তাঁহার অসাধারণ নির্ভীকতার পরিচয় প্রদান করে। নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখিত তাঁহার মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ফলে গবর্ণমেণ্ট Indigo Commission নামে একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করেন।

গিরিশচন্দ্র, শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৩৬ সালের ১৫ই আষাঢ় (ইং ২৭শে জুন ১৮২৯) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কাশীনাথ, নদীয়া জিলার মনসাপাতা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতার মালির বাগানে (অধুনা ব্রিডনষ্ট্রীট, সিমুলিয়া) বাস স্থাপন করেন।

কাশীনাথ কলিকাতায় আসিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সমাজে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। বাটীতে দুইটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রঘুনাথজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নানা পর্ব্বোপলক্ষে পূজা ও কাঙালী-ভোজনে অজস্র অর্থ-ব্যয় করিতেন। আজও সেখানে প্রতিদিন ষোড়শো-পচারে নিত্যপূজা হয়। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। বিপন্ন আত্মীয় ও বন্ধুগণের সাহায্যে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না—যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। একদা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, স্বনামধন্য রামদুলালের আশ্রয়দাতা ও বন্ধু, কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ মদনমোহন দত্তের বংশের কালী প্রসাদ দত্ত,তথাকথিত অখাদ্য-ভোজনের জন্য সমাজচ্যুত হন। সেই সময়ে তাঁহাকে পুনরায় সমাজে গ্রহণের জন্য রামদুলাল কাশীনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে কাশীনাথ রামদুলালের সহিত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া একটি "সমন্বয়ের" আয়োজন করেন এবং এই "সমন্বয়ের" দ্বারা উক্ত কাশী-প্রসাদকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করা হয়। কাশীনাথের ছয়টি পুত্র ছিল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামধন। রামধনের তিনটি পুত্র—ক্ষেত্রচন্দ্র, শ্রীনাথ ও গিরিশচন্দ্র। তিন ভ্রাতাই অসাধারণ গুণসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তিন ভ্রাতা "সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ" (Literary Triumvirs) বলিয়া অভিহিত হইতেন।

গিরিশচন্দ্র, গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (Oriental Seminary) বিদ্যালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইংরাজিসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময় হইতেই তিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন।

পঠদ্দশাতেই (১৫ বৎসর বয়সে) স্বনামধন্য ধর্ম্মপ্রাণ শিবচন্দ্র দেবের প্রথম কন্যা কৈলাসকামিনীর সহিত গিরিশ-চন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পরে শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং পরে তাহার সভাপতি হন। সহধর্ম্মিণীর অসাধারণ গুণে তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

বিবাহের অল্পদিন পরেই ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে তাঁহার কর্ম্ম হয়। পরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, সামরিক আয়-ব্যয় বিভাগে বেশী বেতনে একটি পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মসূত্রে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। উভয়েই তাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্ম-নিপুণতায় উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্ম-চারিগণের যথেষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন, গিরিশচন্দ্রকে সাতিশয় ভালবাসিতেন এবং সাহিত্য-সাধনায় তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎসাহ দান করিতেন।
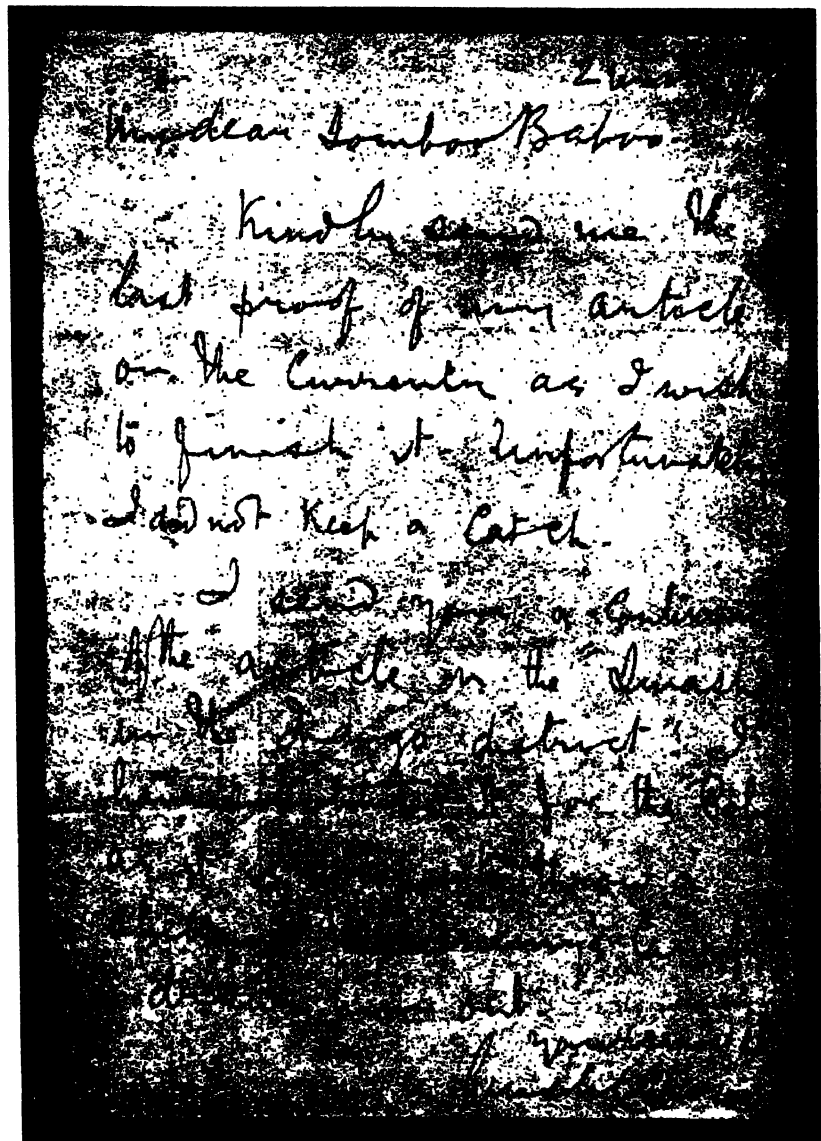
৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রের প্রতিলিপি

"Bengalee" ও Hindoo Patriot ব্যতীত আরও অনেক পত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "হিন্দু-ইন্টেলিজেন্সার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের তিনি প্রধান লেখক ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র বসুর "লিটারেরী ক্রনিক্‌ল্" পত্রে তাঁহার অনেক লেখা প্রকাশিত হইত। ১৮৫০ সালে মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষের সহিত তিনি "Bengal Recorder" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি তখনকার দিনের

"Friend of India" ইত্যাদি কাগজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। হরিশচন্দ্র তখনও সাংবাদিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। "Bengal Recorder"এ তিনি মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে পত্রাদি লিখিতেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তখনও তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে "Bengal Recorder" উঠিয়া যায়। ইহার এক বৎসর পরে "Hindoo Patriot" প্রকাশিত হয়। প্রথমে স্থির হয় ক্ষেত্রচন্দ্র, শ্রীনাথ ও গিরিশচন্দ্র—এই

৺ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ

তিন ভ্রাতাই ইহার সম্পাদনকার্য্য করিবেন কিন্তু ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথের অবসরাভাবে গিরিশচন্দ্রকেই সমস্ত সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হয়। তিনবৎসর পরিচালনার পর হরিশচন্দ্র কাগজখানির স্বত্ব তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে ক্রয় করেন। অতঃপর হরিশচন্দ্রই ইহার সম্পাদক হন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে সম্পাদনকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সেইসময়ে হরিশচন্দ্রের অসহায়া পত্নী ও জননীর সাহায্যকল্পে গিরিশচন্দ্র পুনরায় "Hindoo Patriot"এর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ কাগজখানির স্বত্ব ক্রয় করেন এবং স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে উহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র ও তাঁহার সাহিত্যগুরু গিরিশচন্দ্র, নীলদর্পণের মোকদ্দমা, লঙ্ সাহেবের বিচার, প্রভৃতি বিষয়ে একান্ত নির্ভীকভাবে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "Bengalee" পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বপর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র "Hindoo Patriot"এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "Calcutta Monthly Review" নামে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন হয়। এই পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র "জাতি নির্য্যাতন" ও "জাতি-বিদ্বেষ" সম্বন্ধে যে সকল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তদানীন্তন য়ুরোপীয় সম্পাদকগণ বিশেষভাবে বিচলিত হন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "মুখার্জিস্ ম্যাগেজিন" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন—গিরিশচন্দ্র তাহার প্রধান লেখক ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাখানি পাঁচ সংখ্যার বেশী বাহির হয় নাই। এই পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের ভ্রমণ-কাহিনী, জীবন চরিত, নক্সা, রাজনীতি ও রাজস্ব বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু, সোদর-প্রতিম হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে জীবন-কাহিনী লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে ধারণা করিতে পারা যায় যে হরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার কতদূর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে, "Bengalee" প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। গিরিশচন্দ্রই ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। "Hindoo patriot" কৃষ্ণদাস পালের হস্তে আসিয়া জমিদার-সভার মুখপত্র হইয়া উঠে। যে পত্রিকাখানি একসময়ে দুর্ব্বল ও অত্যাচারপীড়িতদের সহায় ছিল, প্রজাপক্ষ সমর্থন করা যাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেই পত্রিকা অবশেষে জমিদার-সভার মুখপত্রে পরিণত হওয়াতে, দুঃখে, ক্ষোভে, ন্যায় ও সত্যানুমোদিত নীতির সমর্থনের জন্য, বিশেষ করিয়া প্রজাপক্ষের সহায়ের জন্য

গিরিশচন্দ্র "Bengalee"র প্রতিষ্ঠা করেন। 'Bengalee'তে তিনি "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জমিদারদিগের প্রতি তাঁহার কোনও বিদ্বেষ ছিল না কিন্তু জমিদারদিগের অবস্থার অবনতিসাধন

শ্রীনাথ ঘোষ

না করিয়া প্রজাগণের উন্নতিসাধনই তাঁহার লক্ষ্য ও সঙ্কল্প ছিল। অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ অনেক সময়ে তাঁহাকে কঠোরভাবে রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইত। অন্যান্য কাগজের সম্পাদক তখনকার দিনে এ প্রকার তীব্র ও কঠোরভাবে লিখিতে সাহস করিতেন না কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুরাগী গিরিশচন্দ্র কখনও কর্ত্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইতেন না, নির্ভীকতার সহিত তিনি সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে নিজমত ব্যক্ত করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি তদানীন্তন বাংলা সরকার ও লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর স্যর সিসিল বিডনের উদাসীনতা ও দীর্ঘ-সূত্রতার যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আন্তরিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই সময়কার প্রবন্ধগুলির ফলে তদানীন্তন পার্লামেণ্ট্ কর্ত্তৃক স্যর সিসিল বিশেষভাবে তিরস্কৃত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত 'Bengalee' পরিচালিত করেন। গিরিশচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র আমাদের দেশে সংবাদপত্র পরিচালনায় এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেন। জনমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য তাঁহারা উভয়ে যাহা করিয়াছেন তাহা আমাদের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বাস্তবিকই বিরল। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সংবাদপত্র সেবা ব্যতীত তিনি আরও অনেক জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখনকার দিনে প্রায় সকল সভাসমিতিরই সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল এবং এই সকল কার্য্যেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইংরাজি বক্তৃতাতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এবং সেই জন্য প্রত্যেক সভাসমিতিতে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইত। এই সময়ে বিখ্যাত বাগ্মী ডক্টর ডাফ্, স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলস, প্রভৃতির সহিত তিনি একজন সুবক্তা বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কর্ণেল ম্যালিসনের সাহায্যে তিনি Dalhousie Institute এর সভ্য-পদ লাভ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তরুণ বয়সে)

করেন। এই সভার অনেক অধিবেশনে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। *

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের স্মরণার্থে বীটন সভা নামে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশচন্দ্র এই সভার প্রধান সভ্য ছিলেন এবং পরে ইহার সাহিত্য ও দর্শনশাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তর্কশক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। এই সভায় নানা বিষয়ে

কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন

বক্তৃতার পর যে সকল তর্ক-বিতর্ক হইত, গিরিশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সেই সকল তর্কসভায় যোগদান করিতেন।

নানাপ্রকার সাংসারিক অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তাঁহাদের সিমুলিয়ার বাটী পরিত্যাগ করিতে হয়। বেলুড়ে এক বাগানবাটীতে আসিয়া তিনি সপরিবারে বাস করেন। বেলুড়ের বিদ্যালয়ের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেন এবং উহার নানাপ্রকার উন্নতি-সাধনে কৃতকার্য্য হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হন এবং তাঁহার দ্বারা হাওড়ার পথ ঘাটের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহার গৃহসংলগ্ন রাস্তাটির নাম 'গিরিশচন্দ্র রোড' রাখিয়াছেন। হাওড়ার জিলা স্কুল পরিচালন সমিতির সভ্যরূপেও তিনি ঐ বিদ্যালয়টির অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া হিতকরী-সভার সহিতও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সহকারী সভাপতিরূপে নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এই সভায় 'শিক্ষা' বিষয়ে তাঁর এক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কর্ণেল ম্যালিসন বলিয়াছিলেন যে য়ুরোপের বহুদেশ তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও গিরিশচন্দ্রের ন্যায় উদারপ্রকৃতি, সহৃদয় ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বেলুড়ে অবস্থান কালে তাঁহার সাংসারিক জীবন নানা-প্রকারে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে আসিয়া সিমুলিয়াবাটীর নানা প্রকার অশান্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া-ছিলেন। এখানে তাঁহার নানা গুণসম্পন্না সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যা সহ নানা প্রকার সদালাপ, সাহিত্যালোচনা, ইত্যাদিতে দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। প্রায়ই সন্ধ্যাকালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যসহ একত্র বসিয়া ইংরাজ লেখকদিগের পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া তিনি তাঁহাদের শুনাইতেন। এই ভাবে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিসন্ধ্যা মধুময় হইয়া উঠিত।

তাঁহার বাল্যজীবনও বেশ সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। উত্তরকালে যে প্রশান্তচিত্ততা সহৃদয়তা ইত্যাদি গুণের জন্য তিনি সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছিলেন বাল্যকাল হইতেই তিনি সেই সকল সদ্‌গুণ সম্পন্ন ছিলেন। মাটির ঠাকুর গড়িয়া পূজা করা তখন তাঁর প্রধান খেলা ছিল। মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ পৌরোহিত্য করিতেন এবং পৌরোহিত্যের প্রাপ্য বলিয়া নৈবেদ্যের ফল মিষ্টান্ন ইত্যাদি সব নিজেই খাইয়া ফেলিতেন।

* কর্ণেল ম্যালিসন গিরিশচন্দ্রের বক্তৃতাশক্তি সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন :-

"The lecturer, Babu Girish Chandra Ghose, the Editor of one of the best native papers in this part of India, is well-known as a speaker for the brilliancy and fertility of his ideas which he gives utterance to with a fluency which many English speakers might well covet."

জ্ঞাতিভ্রাতা দীননাথের সহিত শৈশব হইতে তাঁর খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল। দীননাথ তাঁহার বাল্যকালের প্রধান খেলার সাথী ছিলেন। দীননাথ, কাশীনাথের পঞ্চম পুত্র বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ সন্তান। উত্তরকালে ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টের উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সিবিল সার্ব্বিস কোড রচনায় তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হন। পুরস্কার স্বরূপ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের সময় গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য এক বিশেষ পেন্‌সনের ব্যবস্থা করেন ও রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। সেকালের কলিকাতা-সমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক যখন "বেলগেছিয়া ভিলা"তে প্রথম অভিনীত হয়, তখন ইনি তাহার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং নিজে "শুক্রচার্য্য"র ভূমিকায় অভিনয় করেন। পূর্ব্বে যে যদুনাথের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি দীননাথের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। Hindoo Patriot, Mukherjee's Magazine, Oriental Miscellany, Monitor ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেকালে কলিকাতার দুইটি কায়স্থবংশ—রামবাগানের দত্ত এবং সিমুলিয়ার এই ঘোষ বংশ—ইংরাজী culture এর জন্য প্রখ্যাত ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অধুনাতন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত কবি শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ও জীবনী লেখক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরাসী ভাষাতেও গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মলিয়ারের নাটকগুলি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। ভল্টেয়ার প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন।

হুগলী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উক্ত কলেজে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রামদুলাল দে'র জীবনী সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব পাঠ করেন। এই জীবনীখানি সঙ্কলনে তাঁহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ, কর্ণেল ম্যালিসন প্রভৃতি সমালোচকগণ এই জীবনীখানির ভূয়সী প্রশংসা করেন। জে, টাইলবস্ হুইলার তাঁহার সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষের ইতিহাস"-সঙ্কলনে এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন। জীবনীখানি হইতে অনেক অংশ হুইলার উক্ত ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর শরীর ভগ্ন হয়। তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন।

রায় দীননাথ ঘোষ বাহাদুর

২০শে সেপ্টেম্বর মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে সে সময়ে দেশবাসী সকলেই নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন। সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার অসামান্য গুণাবলীর কথা প্রকাশিত হয়। ১৬ই নভেম্বর টাউন-হলে দেশবাসিগণ কর্তৃক এক বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় তদানীন্তন দেশনায়কগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য বিলাপ করেন। শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কৈলাসচন্দ্র বসু, জেম্‌স্ উইলসন,
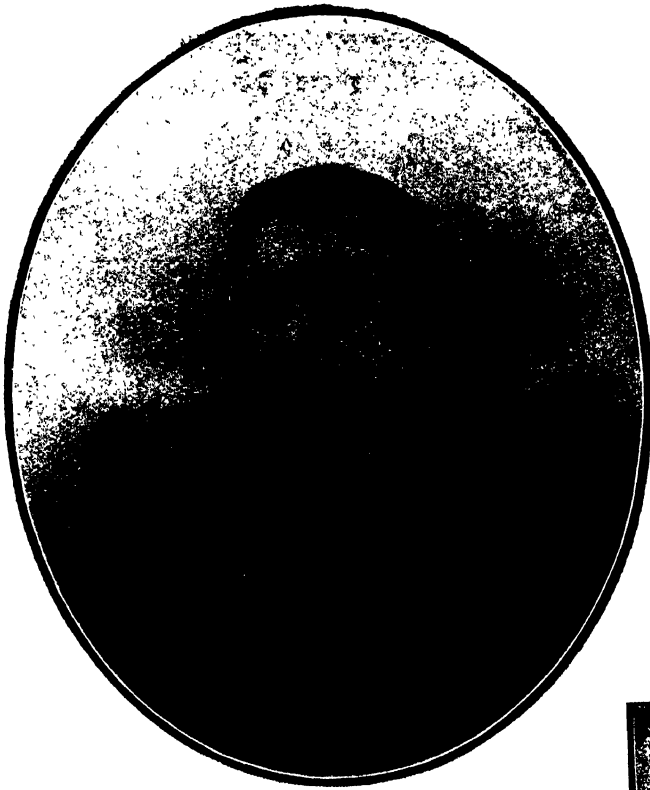
যদুনাথ ঘোষ

চন্দ্রনাথ বসু, নবাব আবদুল লতিফখাঁ বাহাদুর, প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করেন। এই সভায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং এই সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থে তাঁহার বাল্য শিক্ষাস্থল ওরিয়েণ্টেল সেমিনারীতে তাঁহার নামে একটি ছাত্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবন্ধু স্যার হেনরী কটন তাঁহার "Indian and Home Memories" নামক গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় ভারতবন্ধু ইংরাজগণ গিরিশচন্দ্রকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কটনের মতে, গিরিশচন্দ্র বাংলা দেশের যোগ্যতম দেশনায়ক ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক দিনের পরে বিলাত হইতে স্যর হেনরী গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষকে কয়েকখানি পত্র লেখেন এবং তিনি তাঁহার পিতামহের জীবনকাহিনী ও রচনাবলী সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অভিনন্দন করেন। *

উপসংহারে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি যে-কোন ও দেশের গৌরব। এবং আজ শতবর্ষ পরেও তাঁহার জীবন-কাহিনী এবং তাঁহার নানা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বর্ত্তমানের তরুণদলও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

বিগত ১৫ই আষাঢ় তাঁর জন্মতিথির শত বার্ষিকী হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ঐ তারিখের সংবাদপত্রগুলি তাঁর জীবনকথা প্রকাশ করিয়া সাধারণের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন। আমরা শতবর্ষ পরে তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীরামেন্দু দত্ত
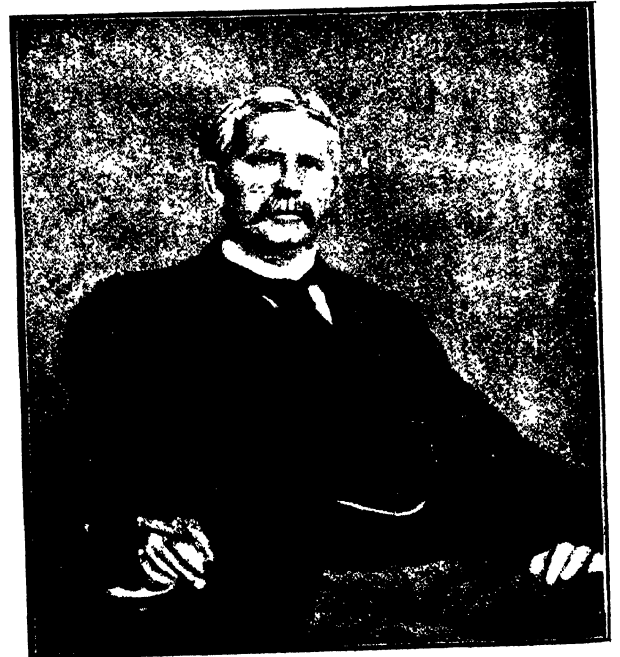
স্যর্ হেনরী কটন

* একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"I feel the greatest admiration for the general character of your grandfather's writings and for the high moral tone and political insight they display. They amply confirm the impression I have always entertained of his ability and literary gifts and show how great was the loss Bengal sustained by his premature death."

কজরী

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শ্রাবণ মাসে বর্ষা-উৎসবের রীতি প্রচলিত আছে। অর্থাৎ এ সময় ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকলের ঘরেই 'ঝুলনা' বা 'দোল্‌না' অঙ্গনে বা উদ্যানের বৃক্ষ শাখায়, এমন কি ঘরের চালেও টাঙ্গানো হয়।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিকালে সীমন্তিনীগণ—তরুণী, বালিকা, বয়স্থা, সকলেই—রঙীণ বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া হস্ত ও চরণতল 'মেহেদী'র রঙে রাঙাইয়া সমবেত প্রতিবাসিনীদিগের সহিত 'ঝুলনা'য় দুলিতে দুলিতে এই বর্ষার গান বা 'শাওন' ও 'কজরী' গাহিয়া থাকেন। রাজপুতানায় এ গানকে 'সাঁড্‌' বলে।

এই বর্ষা-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিবাহিতা কন্যাগণকে পিত্রালয়ে আনা হয়। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কন্যার শ্বশুরালয়ে এবং বধূর পিত্রালয়ে 'শাওনে'র 'তত্ত্ব' করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। 'তত্ত্বে'র দ্রব্যসম্ভারে বস্ত্র, অলঙ্কার, মিঠাই, 'মেহেদী' এবং ঝুলনের সরঞ্জাম, যথা—দড়ী ও লম্বা কাঠের পিঁড়া বা 'পট্‌রি'; ধনিগৃহে রেশমী দড়া এবং রূপার পাতে মোড়া ঘুঙুর-দেওয়া 'পিঁড়া'ও দিতে দেখা যায়।

এ উৎসব শ্রাবণ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চলে। এই চিরাগত উৎসব-অনুষ্ঠানে বাধা দিবার অধিকার পুরুষদের নাই। এমন কি, ছোট ছেলেদের তো কথাই নাই, সময়ে সময়ে কিশোর ও যুবকেরাও এই শ্রাবণ-উৎসবে আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া থাকে।

এই একটি মাস অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরিকারাও অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করেন। এ সময়ে যেন তাঁহাদের সাত খুন মাফ্‌!

অবশ্য, গানগুলিতে বৈশিষ্ট্য তেমন কিছুই নাই, কিন্তু মেঘ-মেদুর বর্ষা-সন্ধ্যায় শ্রাবণ রাতের রিম্‌ ঝিম্‌ বারি-বর্ষণের মধ্যে এই 'শাওন' গান শুনিতে বড় সরস, বড় মধুর লাগে।

তাই সুদূর প্রবাসের এই বর্ষা-মঙ্গল গীতি হয় তো আমার স্বদেশবাসিগণের অন্তরেও বর্ষার দিনে এতটুক আনন্দ দিতে পারে--এই ভরসায় বঙ্গানুবাদ সহ কয়েকটি গান পাঠাইলাম।

কজরী

কাহে মচাওয়ে শোর—পপইয়া! কাহে মচাওয়ে শোর?
বাদর গরজে, বিজলী চমকে,
ছায়ে ঘটা-ঘন-ঘোর।
পপইয়া! কাহে মচাওয়ে শোর?

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বুঁদে বরষে,
পবন চলে ঝক্‌ ঝোর!
বাগ্‌মে 'পিউ-পিউ' বোলে পপইয়া.
বনমে বোলে মো'র!

পিয়াকি বোলি বোল পপইয়া!
পিয়া যো আওয়ে মোর!
চুন্‌ চুন্‌ কলিয়ন শেজ বিছাই
শোওত হো গয়ে ভোর!
পপইয়া! কাহে মচাওয়ে শোর?

অনুবাদ

পাপিয়া রে! কেন এই কলরব তোর?
গরজে বাদল শুন, বিজলী চমকে হের,
ছাইল যে ঘটা-ঘন-ঘোর!
রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বরষিছে বরষা,
সমীরণ চলিছে কি জোর!

বনমাঝে 'পিউ-পিউ' ডাকিছ পাপিয়া তুমি,
শিখী-রবে কানন বিভোর!
প্রিয়-সঙ্কেত-গীতি গাহ গাহ পাপিয়া রে,
আসে যদি প্রিয়তম মোর।
চয়নিয়া ফুল-কলি শয়ন পাতিয়াছিনু,
জাগরণে নিশি হ'ল ভোর!
পাপিয়া রে! কেন এই কলরব তোর॥

শাওন

শাওন কে ঋত্ ঘন ঘেরি আয়ি বদরা।
পিয়াকে মিলন্ কো ভিজি মোরি আঁচরা।
অবহিঁ যো আয়ে মেঘা, গরজ বরষ গয়ে,
ভরি আই নীর,—চরক্ গয়ে কজরা।
পিয়াকে মিলন কো ভিজি মোরি আঁচরা।

অনুবাদ

শ্রাবণ দিবস, ঘন ঘেরিল বাদল।
প্রিয়কে মিলিতে মোর ভিজিল আঁচল!
সহসা বাদল এল,
গরজি বরষি গেল;
নয়নে ভরিয়া দিল জল,
সে জলে মুছিয়া গেল আঁখির কাজল!
প্রিয় মিলিবারে মোর ভিজিল আঁচল!

শাওন

উমড়ি ঘুমড়ি আয়ি কারিরে বদরিয়া।
যায়ে রহে পিয়া কওন নগরিয়া?
যব্ সে গয়ে মোরি
সুধহুঁ না লিনি।
এহি শোচ মোরে বারি রে উমরিয়া।

অনুবাদ

ঘুরে ফিরে এল কালো বাদল অরি।
কোন্ সে নগরে প্রিয় আছে বিসরি'!
যে অবধি গেছে, মোরে
ভুলেছে কি একেবারে!
তরুণ বয়স মোর ভাবিয়া মরি!

শাওন

জীয়া তরসে—বদরিয়া বয়ষে,
সখিরি! দিন ক্যায়সে কটেঙ্গে বাহারকে!
যোবনওয়ালী, ম্যায় ছোবন ওয়ালি
মেরি উমর বালি;
ভঁওরা গুঞ্জে ডালি ডালি
পিয়া বিনা শেজ্ পড়ি মোরি খালি
পিয়া নহিঁ আয়ে,—
হায়! রহুঁ ক্যায়সে একেলী জীয়া মারকে!

অনুবাদ

হৃদয় কাঁপিতেছে, বরষে বারি।
সখি, কেমনে কাটে কাল বুঝিতে নারি!
এ ভরা যৌবন মধুর ক্ষণে
বালিকা বয়সের তরুণ মনে।
গাছের ডালে ডালে অলিরা ডাকে
শয্যা প্রিয়হীন পড়িয়া থাকে।
প্রিয় না আসে,
কেমনে রহি একা মরি যে ত্রাসে!

সাঁড়্

উঠো পিয়া! জাগো—
একেলী ডর্ লাগেরে!
রয়ন আঁধিয়ারী কারি
মোহে ডরাওয়ে রে!
মেরে পিয়া! জাগো—
একেলী ডর লাগেরে!
বাদল গরজে, বুঁদে বরষে,
বিজলী চমকে ডরাওয়ে রে—

মেরে সইয়াঁ ! জাগো—
একেলী ডর লাগেরে।

অনুবাদ

উঠ প্রিয়, জাগো জাগো,
একেলা ডরি।
আঁধার তামসী নিশি
তরাসে মরি!
বাদল গরজে ঘন,
বারি ঝরে অনুক্ষণ,
বিজলী চমকে, চিত
উঠে শিহরি!
উঠ মোর প্রিয়তম,
একেলা ডরি।

শাওন

(হিন্দি ও উর্দ্দু মিশ্রিত)

মওসমে বরষাত হ্যায়,
ক্যাহি কেরামত ছায়ে হ্যায়!
আ পপীহা ! তু ইধর,—
ম্যাঁয় ভি তো শিরা-পা দরদ হুঁ।
আম পে কেঁও জম্ রহা ?—
ম্যায় ভি তো ওয়েসি জরদ্ হুঁ,
ফরক্ ইতনা হ্যায় কে উস্‌মে রস হ্যায়,
মুঝ্‌মে 'হায়!' হ্যায়।
হায়! কন্তা!— চল্ বসে,
মুঝকো একেলী ছোড়কে;
ইয়ে খবর মালুম ন থি,
মর যায়েগি দম্ তোড়কে ?
সচ্ হ্যায় বেদরদোঁকে দিল্
লোহে সে টক্কর খায়ে হ্যায়!

অনুবাদ

আজি ঘন-ঘোর বরষার ধারা, একি দুর্যোগ ছাইল হায়!
আমিও ব্যথিতা বিরহ-বিধুরা পাপিয়া রে তুই আয় হেথায়!
আমের শাখায় ব'সে কোন্ আশে ?—অমনি পাংশু আমিও ভাই,
তফাৎ কেবল, রস আছে ওতে,—আমাতে রয়েছে 'হায় রে হায়!'
কান্ত! আমারে একাকী ফেলিয়া চ'লে গেলে তুমি না মানি মানা।
নিশ্বাস-রোধে মরিয়া যাব যে, এ খবর বুঝি ছিল না জানা।
ইথে নাই ভুল, বেদরদী প্রাণ লোহার অধিক কঠিন যায়!

শাওন

ক্যায়সি বদরিয়া কারি ছাই!
পিয়া বিনু বরখা ঋত্ আই।
ঝিঙ্গুর মোর টিঘার পুকারে, কল্ না পরে মোহে
বিরহা কে মারে,
পাপী পপীহা নে আন্ জগাই ॥
হমরে পিয়া পরদেশ বিলম্ রহে,
ইতে বদরওয়া দিন রয়ন্ ঘুমড় রহে,
দেত্ ঝকোড়্ পবন পূরবাই ॥
নিশিদিন ছায়ে ধুঁধর বদরওয়া,
অব্ সোহত নাহি মোহে ইয়ে ঘরোয়া,
না লিখি পাতি না খবর পঠাই।
পিয়া বিনু বরখা ঋত্ আই ॥

অনুবাদ

সঘন নীরদ নীল ঢাকে গগনে,
আইল বরষা ঋতু দয়িত বিনে।
ঝিল্লী ময়ুর রাজি হরষে ডাকে,
চঞ্চল চিত অতি বিরহ বশে,
জাগাল পাপিয়া পাপী বিরহী জনে।
প্রবাসে আমারে প্রিয় আছে বিসরি,
হেথায় বরষা দিবারজনী ধরি!
দিবানিশি নভ ঢাকা ধূসর মেঘে,
কেমনে কাটাই কাল এ ঘরে জেগে!
চিঠি বা খবর নাই, রহি কেমনে!
সঘন নীরদ নীল ঢাকে গগনে।

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

ভারতের বৈশিষ্ট্য কি

শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

আজকের দিনে যার-তার মুখে শুনা যায় যে, সকল বিষয়ে ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ করিতে না পারিলে ভারতের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। ভারতকে বৈশিষ্ট্য-শূন্য করিলে, ভারতের সহস্র উন্নতি হইলেও ভারত থাকিবে না ও থাকিতে পারে না। এই বাণী শুধু রক্ষণশীলদের মুখে ধ্বনিত হইতেছে না; এ বাণী আজ যে-কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের অমোঘ মন্ত্ররূপে প্রাচ্য প্রতীচ্য ভাবাপন্ন নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইতেছে। সংরক্ষণশীলের দল বলেন যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য পালন করা ও শাস্ত্রের বাক্য অসংদিগ্ধ চিত্তে বিশ্বাস করা ও তদনুসারে মনঃ প্রাণে কাজ করাই ভারতের সত্য ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিলে ভারতের মুক্তি সম্ভব-পর। মানুষকে স্বাধীন হইতে হইলে কঠোর সাধনাগ্নি-প্রবেশ করিতেই হইবে। এ স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়। ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলিতে মানুষ যতখানি দাবী ও আশা করিতে পারে ঔপনিষদিক্ স্বারাজ্য লাভ করিলে মানুষ ততখানি পাইতে পারে। এই স্বারাজ্য লাভ করিতে হইলে জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। প্রথম-জীবনে আশ্রমধর্ম্ম পালন নিতান্তই আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে চিত্ত-শুদ্ধি হইতে পারে না। আর চিত্ত মলিন থাকিলে কোন কালেই জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরে, ও অঙ্কুর, ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। আর এই বর্ণ-ধর্ম্ম যে উপযোগী তাহা প্রাচীন কাহিনীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। জনকরাজ প্রভৃতি অনেকেই আশ্রম ধর্ম্ম মানিয়াই শুদ্ধচিত্ত ও স্বারাজ্য লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যাঁহারা পাশ্চাত্যের ছায়া লইয়া জাতীয় পতাকার ও জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র,তাঁহারা আজ ভারতের চতুর্দ্দিক ও গগন, 'ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের বৈশিষ্ট্য' রবে প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। কোন কোন মহাত্মা অহিংসা ও আত্মত্যাগই ভারতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেহ কেহ ভারতীয় প্রাচীন-সভ্যতাকে সংস্কৃত করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য-স্থাপন বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন।

এখন এই হইল সমস্যা যে, ভারতের বৈশিষ্ট্য কি বাস্তব? আর যদিও বাস্তব হয় তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা কি আবশ্যক ও প্রকৃত হিতজনক?

ভারত জগৎছাড়া নয়। ভারতীয় লোকেরাও লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল দেশে যে সকল সমস্যা উঠিয়াছে ও তাহার সমাধানের প্রচেষ্টা হইয়াছে, ভারতেও তাহাই হইয়াছে। যেমন সকল দেশই শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছে বস্ত্রাদির দ্বারা শরীর আবৃত করিয়াছে ভারতেও তাহা ঘটিয়াছে। গৃহ বা বস্ত্রের বৈজাত্য আছে সত্য, কিন্তু তাহার দ্বারা বৈশিষ্ট্যের সূচনা হইতে পারে না, কারণ একই অভাবের প্রেরণায় ভারতীয়েরা গৃহবিদ্যা ও বস্ত্রনির্ম্মাণ-বিদ্যার আবিষ্কারে নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন।

সকল দেশে ও সমস্ত সমাজে খাদ্যসমস্যাই চিরন্তন ও প্রথম সমস্যা। এই সমস্যাই আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সকল সামাজিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন প্রচেষ্টাই সভ্যতার বিভিন্ন স্তর। এই সমস্যা অন্যদেশেও যেমন, ভারতেও তেমন। ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা যত থাকুক্ আর না থাকুক্, এই সমস্যাসমাধানের দিক্ দিয়া তার একটা মূল্য আছে। কুটীরশিল্পের প্রতিষ্ঠার দিনে শ্রমবিভাগ না থাকিলে উক্ত শিল্প সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না। রাম-রাজত্বই বলুন আর যে কোন আদর্শ রাজার রাজত্বের কথাই বলুন, সে সকল রাজত্বের প্রধান প্রশংসা আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়,—তাহাদের প্রধান প্রশংসা যে,

খুসি

সেই সব রাজত্বে প্রজারা সুখে ছিল; সেই সব রাজত্বে প্রজাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার মূল্য যে অল্প, তাহা বুঝা যায় রাজধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইতে। যখন ভারতীয় রাজসিংহাসন বৌদ্ধ রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত তখন রাজানুগ্রহের লোভে অসংখ্য আর্য্য-সন্তান বিদ্বান্ ও মূর্খ নির্ব্বিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিসের জন্য এই সকল লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন? হিন্দু ধর্ম্মে কি উচ্চ আদর্শের বা আধ্যাত্মিকতার অভাব ছিল? অন্তর্গূঢ় অভিপ্রায়, রাজধর্ম্ম গ্রহণে সুপ্রাপ্য যশঃ-অর্জ্জনকে দ্বার করিয়া আর্থিক উন্নতি সহজেই হইবে। অতি প্রাচীন কালেও মহা আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণেরা যদি যাগযজ্ঞে দক্ষিণার ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে, কেমন পৌরহিত্য বরণ করিতেন বুঝা যাইত! মানুষ খাদ্যের সমাধান না করিয়া চলিতে পারে না; এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশেও সেই নিয়ম। কোথাও বা ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা অধিকাংশ লোকের উদরান্নের সংস্থান হয়, কোথাও বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া।

এক্ষণে ভারত জগতের সকল দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছে। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিলে ভারতীয়েরা তাহার ফলভোগ করে, খাদ্যসমস্যা জটিল হইয়া উঠে। ভারত এখন আর জগৎ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে পারে না। বর্ত্তমানে, ভারতে কুটীর-শিল্পের কিছু প্রয়োজন থাকিলেও, কুটীর শিল্পের দ্বারা ভারতীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইতে পারে না। ভারতকে বাণিজ্যে অন্য সকল দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় কল-কারখানার পারিপাট্যই বিজয়-দুন্দুভি বাজাইবে। সুতরাং যতদিন না ভারতে ভাল করিয়া কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন ভারতের জগতের কাছে দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। এখন 'জাতীয়তা' শব্দের কোন মূল্য নাই; কারণ জগতের লোক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—ধনী ও শ্রমিক। প্রথম দল শুধু অর্থ দেন,—দ্বিতীয় দল সেই অর্থের ব্যবহার দ্বারা প্রথম দলের অর্থপুষ্টি ও নিজেদের দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেন। ভারতেও এই বিভাগ। ভারতের জাতিভেদ ও ধর্ম্মভেদ প্রভৃতি এই বিভাগের কাছে নতমস্তক। বর্ত্তমান কালে জাতি ও ধর্ম্ম উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে পারে না, সুতরাং খাদ্যসমস্যা সমাধানের দিক দিয়া তাহারা গৌণ। যে মতবাদে খাদ্যসমস্যা সমাধানের উত্তমরূপ উপযোগিতা নাই, সেই বাদ বর্ত্তমানে উপেক্ষণীয়। খাদ্যসমস্যা সমাধানের পর অপরাপর বিষয়গুলি উঠিতে পারে। বর্ত্তমানে খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত মতবাদ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যেও অবান্তর বিষয় দেখা যায় তাহার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত মতবাদ আছে সেইগুলিতে কিছু কিছু অবান্তর বিষয় আসিতে বাধ্য; যেমন, সমাজ কি? তাহার কর্ত্তব্য কি? লাভে ধনীর কতটা অংশ থাকিতে পারে? রাষ্ট্র কি? রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়ের উপর কি অধিকার আছে? মানুষের মধ্যে স্বতঃভেদ আছে কিনা? ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের সমাধান না হইলে সামাজিক খাদ্যসমস্যা-সমাধানের জন্য উদ্যুক্ত হইতে পারেন না, সুতরাং এইসব প্রশ্নের সুমীমাংসা আবশ্যক। এই সব মীমাংসা আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়; তাহাদের উপযোগিতা শুধু খাদ্যসমস্যার সুচারুরূপে মীমাংসার জন্য।

এই মীমাংসার জন্য আমরা কি অহিংসা নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিব? অহিংসা সমাজ বা দেশ রক্ষার জন্য ভারতে কোন কালেই বিশ্বাসের সামগ্রী হয় নাই। শুধু ভারতে কেন, কোন দেশেই হয় নাই। ভারত-সংগ্রাম অহিংসার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধযুগেও রাজ্য-রক্ষার জন্য যুদ্ধের বিরাম ছিল না। মানবসমাজে যতদিন সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য থাকিবে ততদিন সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

এক্ষণে জগৎকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে; ধর্ম্মগত ও ধনগত ভেদ দূর করিতে হইবে; উচ্চ নীচ সমান করিতে হইবে। এই হইল বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ভারতের কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। ভারতেরও এই সমস্যা। এখানে জাতীয়তার, বর্ণাশ্রমের বা অহিংসা নীতির স্তোকবাক্য জঠরাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না।

শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য

বেহাগ—আদ্ধা কাওয়ালা

হৃদয় মাঝে কে আসিলে হে,
মধুর সাজে !
রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি ঝিনিনিনি,
হৃদয়-বীণা বাজে !
একি হর্ষ-লহরী উঠে প্রাণে !
দিশিদিশি ভরি ভরি তানে তানে
আশার বাণী জাগিল রে ;
চোখে লাগিল রে, নব অরুণতা যে !

কথা ও সুর—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বরলিপি—কুমারী ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়

I -া সা গা মা । পা -হ্মা পা -া I না ধা র্সা না । পা হ্মপা -গমা -গা I
• হৃ দ য় মা ০ ঝে ০ কে আ সি লে হে

I -া গা পা মা । গা -রগা রসা -া I -া সা গা মা । পা -হ্মা পা -া I
• ম ধু র সা ০ জে ০ ০ হৃ দ য় মা ০ ঝে ০

I সা সা সা ন্া । সা সা গা রা I গা পমা গরা গা । সা গা মা পা I
রি নি কি ঝি নি কি ঝি নি ঝি নি নি নি হৃ দ য় বী

I গা -পমা -গরা -গা । পমা -গা রসা -া I -া সা গা মা । পা -হ্মা পা -া I
ণা • • • • • বা ০ জে ০ ০ হৃ দ য় মা ০ ঝে ০

I না ধা র্সা না । পা -হ্মাপা -গমা -গা I -া গা পা মা । গা -রগা রসা -া I
কে আ সি লে হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম ধু র সা ০ ০ জে ০

I -া সা গা মা । পা -হ্মা পা -া I -া -া -া -া । -া -া গা মা I
০ হৃ দ য় মা ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ কি

I পা না না না । না না না নর্সা I র্সা -া র্রর্সা -নর্সা । -া -া গা মা I
হ র্ ষ ল হ রী উ ঠে প্রা ০ ণে ০ ০ ০ এ কি

I পা না না -না । না না না নর্সা I র্সা -া র্রর্সা -নর্সা । -া -া -া -া I
হ র্ ষ ল হ রী উ ঠে প্রা ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা না । র্সা র্সা র্গর্রা র্গা I র্গা র্মর্গা র্পা র্মা । র্মর্গা -র্রর্গা -া -া I
দি শি দি শি ভ রি ভ রি তা ০ ০ নে তা নে ০ ০ ০

I -া সা সা গা । গহ্মা -পা পা -া I -া পা না ধা । না -া পা পা I
০ আ শা র বা ০ নী ০ ০ জা গি ল রে ০ চো খে

I -া পা ধা পা । মা -গা গা গা I -া গা পা মা । গা -রগা রসা -া I
০ লা গি ল রে ০ ন ব ০ অ রু ণ তা ০ ০ যে ০

সা সা সা ন্া । সা সা গা রা I গা পমা গরা গা । সা গা মা পা I
রি নি কি ঝি নি কি ঝি নি ঝি নি নি নি হৃ দ [illegible] বী

গা -পমা -গরা -গা । পমা -পা রসা -া I -া সা গা মা । পা -হ্মা পা -া II
গা ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ জে ০ ০ হৃ দ য় মা ০ ঝে ০

আকৃতি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

সুধার বাড়া সুতার ধারা বহাও অনুরাগে ;
বিশ্বজনে করাতে পান,
পাত্র ভ'রে করিব দান ;
পূর্ণ হই বিলায়ে মোরে মধুর ভাগে ভাগে ।

নিঙাড়ি নিয়ে জড়ের সার উঠিল ফুটে প্রাণ ;
লক্ষ যুগ যুঝিয়া সে যে
নরের রূপে দাঁড়াল সেজে,
তবুও যে রে জড়ের কারা লভেনি অবসান ।

তরল কর কঠিন মাটী করুণা-ধারা ঢালি' ;
উছল বানে স্রোতের টানে
ছুটাই প্রাণ প্রাণের পানে ;
পড়িয়া থাক্ জড়ের গুঁড়া—মরুতে যেন বালি ।

জড়ের ঘোর মূঢ়তা মোরে আঁধারে রাখে গুঁজে ;
মানুষ—যার পরশে বাড়ি,
চেতনা মরে তাহাকে ছাড়ি' ;
বিজন কোণে পাবনা প্রাণ চক্ষু মিছে বুজে ।

লোকের ভিড়ে সমর-জয়ী অমর প্রাণ জাগে ;
বিজন-কারা ভাঙ্গিয়া ছুটি ;
চেতন প্রেমে ফুটিয়া উঠি ;
সুধার ধারা ঢালিয়া দাও সেবার অনুরাগে ।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দুসাহিত্য

["হেমচন্দ্র বসু মল্লিক" অধ্যাপক, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ]

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী, বি-এ

২

তুন্‌হুয়াং

মধ্য এশিয়া, চীন ও তিব্বতে হিন্দু-সাহিত্য বিস্তারের বিষয় আলোচনা করিতে যাইলে তুন্‌হুয়াংএর গুহাগুলির সম্বন্ধে না জানিলে চলেনা। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। চীনের পশ্চিম সীমান্তে বণিকদের বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপন। তুন্‌হুয়াংএর মধ্য দিয়া চীনাদিগের এই পথটী Lop মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। এই পথটী অতিক্রম করিতে অবশ্য কষ্টবোধ হইত, কিন্তু উত্তরের পথের দস্যুর আক্রমণের ভয় এখানে ছিলনা। তখনকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ বর্ব্বর দস্যুর দলকে চীন ইতিহাসে বলা হইত Hiung-nu (হুন)। পশ্চিমে চীন সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে তাহারাই ছিল সর্ব্বপ্রধান বাধা। কিন্তু বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ Pan-chao ও তাঁহার পুত্র Pan-yang তাহাদের সমূলে বিনাশ করেন। তাহার পর হইতে পশ্চিমে চীনসাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া গিয়াছিল। Taklamakan মরুভূমির একেবারে অগ্রভাগে হইল তুন্‌হুয়াং সহর। সুতরাং পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে বণিক ও যাত্রীর দলকে ইহার মধ্য দিয়া যাইতে হইত। চীনা ও ভারতীয় পরিব্রাজকগণও এখানে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া যাইতেন।
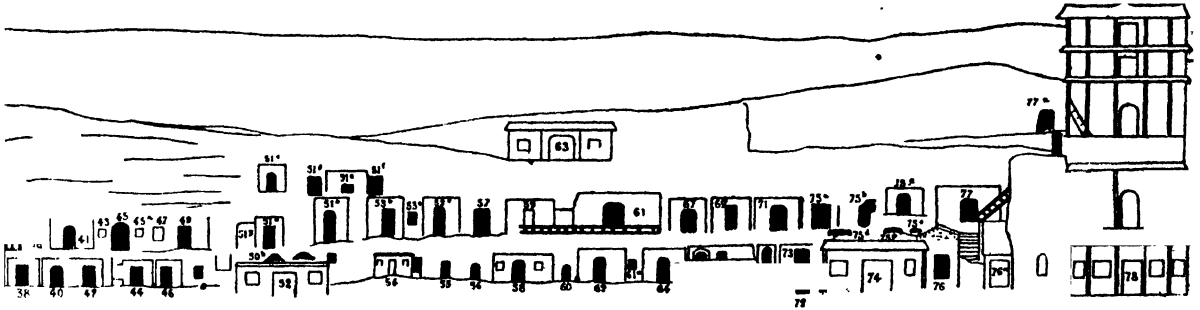
গুহার মধ্যাংশ

কাংসু রাজ্যের মধ্যে এই তুন্‌হুয়াং নগর। নগরটী এমন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত যে, পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানের সমগ্র দৃশ্যটী এখান হইতে পাওয়া যায়। চীন সম্রাট্ Shih Huang Ti খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৪ অব্দে যে বৃহৎ প্রাচীর (Great Wall) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা তুন্‌হুয়াংএর উত্তরে। ক্রমশঃ পরবর্ত্তী চীন সম্রাট্‌গণ এই প্রাচীর বাড়াইতে থাকেন। তুন্‌হুয়াংএর মধ্য দিয়া এই প্রাচীর বহুদূর পর্য্যন্ত যায়। Stein ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখানে কিছু কিছু দেখিতে পান।

তুন্‌হুয়াং সহরের মধ্য দিয়া চীন সম্রাট্‌গণ প্রাচীরের পরিধি যে বাড়াইতেছিলেন তাহার একটী উদ্দেশ্য ছিল চীনের সহিত মধ্যএশিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীক্ ও রোমান্

তুন্‌হুয়াংএর দক্ষিণপূর্ব্বদিকেই কতকগুলি বৃক্ষহীন পর্ব্বতের সারি রহিয়াছে; সেগুলির মধ্যে অসংখ্য গুহা। চীনাগণ এই সকল গুহাকে বলেন Tsien-fo-tang বা সহস্র-বুদ্ধের গুহাবলী। এই তুন্‌হুয়াং গুহাগুলি ভারতীয় শিল্পের

যে অপূর্ব্ব নিদর্শন তাহাদের বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার আর তুলনা হয়না। ভারতীয় শিল্প আবার চীনা শিল্পের উপর কতদুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

জার্ম্মাণ, জাপানী ও রুশীয় অভিযানগুলি তুন্‌হুয়াংএ যাইয়া কিছু কিছু আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

থাকে থাকে গুহা রহিয়াছে।

অনেক জিনিস তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। ১৯০৬ সালে Pelliotর নেতৃত্বে ফরাসীদল Urumtsia (উরুমচি) মধ্য দিয়া তুন্‌হুয়াংএ আসেন। ভাগ্যক্রমে এই দল এমন একটী স্থানের সন্ধান পাইলেন যা পূর্ব্বে আর কেহ পান নাই। Pelliotর নিজের ভাষায় তাঁহাদের এই আবিষ্কারের কাহিনী দিতেছি। তিনি লিখিতেছেন:—

প্যারিস্ হইতে যখন আমরা যাত্রা করিলাম, তখন আমাদের গন্তব্য স্থানগুলির মধ্যে তুন্‌হুয়াংও নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলাম। আমাদের জানা ছিল যে, তুন্‌হুয়াং সহরের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, ২০ Kilometre দূরে কতকগুলি গহ্বর আছে, সেইগুলিকে বলা হয় Tsien-fo-tang বা সহস্রবুদ্ধের গুহাবলী। সেগুলি কবে যে খোদিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায়না। কিন্তু নানারূপ খোদিত চিত্রে সেগুলি শোভিত। মধ্য-এশিয়ার মুসলমান রাজারা এই গহ্বরগুলির বিষয় কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদের আগমনের বহুপূর্ব্বে এগুলি নির্ম্মিত হয়। আমরা ঠিক করিলাম ঐগুলি আবিষ্কার করিব এবং সেগুলির সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিব। পূর্ব্বে তুন্‌হুয়াং গহ্বরগুলির কথা জানা থাকিলেও আর কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক এবিষয়ে আলোচনা

করেন নাই। আমরা কাজে হাত দিয়া দেখিলাম আমরা ঠকি নাই। দেখিলাম গুহাগুলির মধ্যে সপ্তম ও দশম শতাব্দীর চীনদেশীয় বৌদ্ধ শিল্পের চমৎকার চমৎকার নমুনা রহিয়াছে। আর একটী কারণে আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়। এখানে আসিবার পথে উরুমচিতে শুনিলাম যে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তুন্‌হুয়াংএ কতকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ শুনিতে পাইলাম যে, Wang-tao নামক এক তাও-মতাবলম্বী ভিক্ষু তুন্‌হুয়াংএর একটী বড় গুহা খুঁড়িতে খুঁড়িতে সহসা একটী ক্ষুদ্র গুহার সন্ধান পায়। সেই গুহায় সে দেখে পুঁথি স্তূপাকার করা রহিয়াছে। আমরা তুন্‌হুয়াংএ পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বেই Stein সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বিশেষ কিছু পাইবার আশা আমার ছিলনা। সেখানে পৌঁছিয়াই আমি ভিক্ষু Wang-taoএর খোঁজ করিলাম। সহজেই তাঁহার সন্ধান পাইলাম। আমাকে সে সেই গুহায় লইয়া যাইবে স্থির হইল। ক্ষুদ্র গুহাটীর দ্বার যখন সে খুলিল তখন দেখি তাহা পুঁথিতে একেবারে পূর্ণ। গুহাটী এক metre-এরও অধিক হইবে না। পুঁথিগুলি নানাপ্রকারের। অধিকাংশই roll করা, কতকগুলি folio (ভাঁজ করা)। তাহাদের মধ্যে চীনা, তিব্বতী, উইগুর (Uigur) ও সংস্কৃত সকল ভাষারই গ্রন্থ ছিল। এইগুলি দেখিয়া আমি অপূর্ব্ব এক ভাবে অভিভূত হইয়া গেলাম। বুঝিলাম এরূপ মূল্যবান সম্পদ্ ইহার পূর্ব্বে আর কেহ আবিষ্কার করে নাই। আমি নিজের মনেই ভাবিতে লাগিলাম যে, কেবল এগুলি দেখিয়াই

চারিরত্না গুহা। বর্ত্তমানে সারানো হইয়াছে।

কি আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে? আর এগুলি ক্রমশঃ এমনিভাবেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে? সৌভাগ্যক্রমে Wang-tao লেখাপড়া জানিত্ না। গুহার কতকগুলি মন্দির সারাইবার জন্য তাহার টাকার প্রয়োজন ছিল। সে-সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি তিন সপ্তাহ ধরিয়া পুঁথি-সংগ্রহের কাজে লাগিয়া গেলাম।

১৫,০০০ হাজার গ্রন্থের মধ্যে, তাহাদের রচনার কাল ও বিষয় দেখিয়া দেখিয়া যেগুলি বিশেষ মূল্যবান মনে হইল সেইগুলি বাছিয়া লইলাম। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এইরূপে
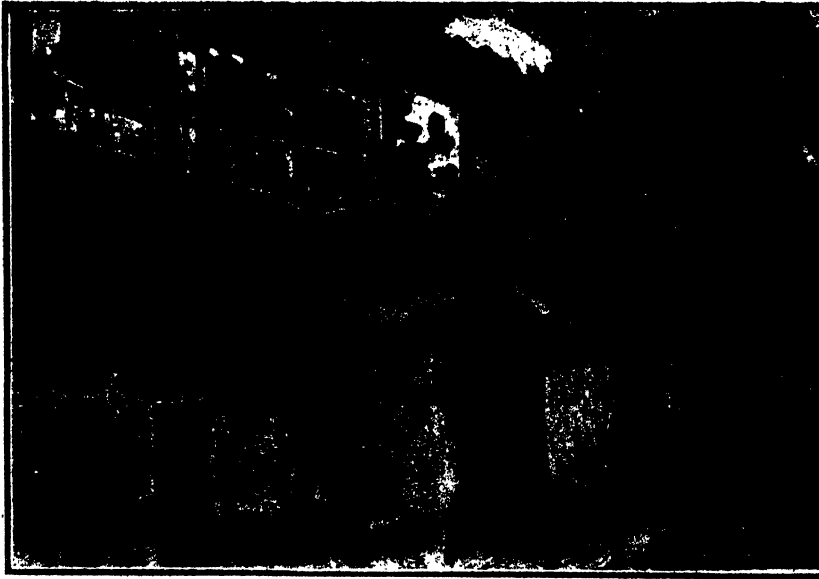
তুনহুয়াঙের গুহা। দোতলা দেখা যাইতেছে।

এক-তৃতীয়াংশ আমি লইলাম। ব্রাহ্মী ও উইগুর (Uigur) ভাষায় লেখা সব গ্রন্থগুলি লইলাম, তিব্বতী গ্রন্থ কতকগুলি এবং চীনাগ্রন্থ প্রায় সবগুলি লইলাম। এই গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে; কতকগুলি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক গ্রন্থও ছিল। বিশুদ্ধ সাহিত্যের গ্রন্থও কিছু কিছু ছিল; ইহা ছাড়া দৈনন্দিন হিসাব ও বিবরণের লিপিও ছিল। এই সকল গ্রন্থই একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকার। ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন পূর্ব্বদিক হইতে শত্রুদল আসিয়া দেশ আক্রমণ করিল, তখন এখানকার শ্রমণগণ এই গুপ্তস্থানে গ্রন্থ ও চিত্রগুলি লুকাইয়া রাখিয়া প্রবেশদ্বার আঁটিয়া এবং প্রবেশপথটি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেন। লুণ্ঠন ও ধ্বংসের ঝঞ্ঝায় এইস্থানের অস্তিত্ব সকলের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; কেহ আর জানিতেও পারে নাই যে, এখানে অমূল্যরত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবার ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই তুনহুয়াং গুহাগুলি সম্ভবত প্রথম খোদিত হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার বহুপূর্ব্বে যাইলেও বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাব প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম শতাব্দীতে Wei সম্রাট্‌দিগের সময় প্রথম বিস্তৃত হয়। অন্যান্য অনেক রাজবংশের ন্যায় চীনের এই Wei রাজবংশও বিদেশী। Wei সম্রাট্‌গণ ছিলেন তুর্কী; পূর্ব্বমঙ্গোলিয়া হইতে তাঁহারা আসেন। চীনের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ইহাকে একটী বিশেষ আকার দান করেন। Pelliot বলেন যে, Wei রাজত্বের বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শনগুলি অন্য সকল কালের বৌদ্ধ শিল্পগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। Wei সম্রাট্‌গণ, Yunan, Tun- huang প্রভৃতি নানাস্থানে পর্ব্বতগাত্রে গুহা খনন্ করাইয়া এইরূপ অপূর্ব্ব শিল্প দ্বারা সেগুলি শোভিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তুনহুয়াংএর গুহাগুলির অধিকাংশ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে Wei সম্রাটগণ কর্ত্তৃক খোদিত হয়। কালের চক্রে কতক বিনষ্ট ও কতক সংস্কার করিতে যাইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তথায় তখনকার মূর্ত্তির কতকগুলি এখনও অধিকৃত রহিয়াছে। তুনহুয়াং স্থানটির জলবায়ু বেশ শুষ্ক; এবং বহুদূরে ইহা অবস্থিত বলিয়া মানুষেও তাহা বিনষ্ট করিবার বেশী সুযোগ পায় নাই। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীর মূর্ত্তিই যে কেবল রহিয়াছে তাহা নয়, প্রাচীরগাত্রের চিত্র-গুলিও সুন্দর রহিয়াছে। অবশ্য তুনহুয়াং-এর সকল চিত্র বা গ্রন্থই অত প্রাচীন নয়। তাঙ্ রাজত্বের সময়, সপ্তম হইতে

দশম শতাব্দীর মধ্যে বহু পুরাতন গুহার সংস্কার করা হয় ও নূতন গুহা খনন করা হয়। বিভিন্ন সময়ের খোদিত বিভিন্ন গুহা হইতে আমরা চীনা শিল্পের বিকাশের একটি ধারা লক্ষ্য করি। Pelliotর মতে তুনহুয়াঙের প্রাচীনতম শিল্পের উপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব অধিক। এই গান্ধার শিল্প আবার গ্রীক প্রভাব দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত। ভারত হইতে চীনে যাতায়াতের পথ যখন ক্রমশ সুগম হইল, এবং ক্রমাগত যাতায়াত চলিতে লাগিল, তখন চীনা পরিব্রাজকগণ ভারত হইতে নিজেরাই ভারতীয় শিল্পের নমুনা সকল চীনে লইয়া যাইতে লাগিলেন; তাহার মধ্যে 'গুপ্ত' যুগের (Gupta) শিল্পই অধিক। সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে চীনা পরিব্রাজকগণ ভারত হইতে ভারতীয় বহুবিধ চিত্র ও মূর্ত্তি লইয়া যাইয়া এবং ভারতীয় শিল্পের প্রণালী কিছু কিছু শিখিয়া যাইয়া চীনা শিল্পকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তুনহুয়াঙের চিত্রগুলি দেখিলেই তাহাতে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।

Chien-fo-tung বা সহস্র-বুদ্ধ গুহাবলী তুনহুয়াং সহরের নয় মাইল দূরে অবস্থিত। সারি সারি কতকগুলি বৃক্ষহীন পর্ব্বত, সেই সকল পর্ব্বতের গুহার মধ্যেই অপূর্ব্ব সম্পদ্ লুক্কায়িত ছিল। Pelliot সেই সকল গুহাই তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাদের মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন।

গুহাগুলি পর্ব্বতের দুই ধারেই আছে। দক্ষিণ সারির গুহাগুলিই অনেক দূর বিস্তৃত। সহস্র গজ ধরিয়া এই গুহার সারি চলিয়াছে। কতকগুলি গুহা খুব উঁচু, কতক গুলি নীচু। আবার, একটি গুহার উপরে আর একটি গুহা; দুই তিন তলা গুহা আছে। অধিকাংশ গুহার সম্মুখে ছোট ছোট ত্রিকোণ মন্দির ছিল; সেই মন্দিরগুলি এখন ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনটির ভাঙা দেয়াল, কোনটির ভাঙ্গা ছাত রহিয়াছে এবং সেগুলিতে নানারূপ সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। উপরের গুহাগুলিতে যাইবার জন্য কাঠের সিঁড়ি ছিল সেই সব সিঁড়ি এখন নাই, সুতরাং সেই গুহা গুলিতে যাওয়া এখন কষ্টকর। গুহাগুলির নির্ম্মাণ-প্রণালীর মধ্যে বেশ একটি সামঞ্জস্য দেখা যায়। বাহিরের ছোট মন্দির হইতে আসল গুহাটিতে যাইবার জন্য মাঝখানে একটী

মৃত্তিকা নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি

চওড়া পথ। সেই পথটি থাকাতেই গুহার মধ্যে আলো হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে। গুহাটী প্রায়ই চতুষ্কোণ, দেয়ালগুলি ৫০ ফিট করিয়া লম্বা, নিরেট পাথর কাটিয়া সেগুলি তৈরী, ছাতগুলি ঢালু; দেখিতে অনেকটা ছাতার মত।

প্রত্যেক গুহার ঠিক মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি। তাহার পাশে পাশে স্তরে স্তরে ছোট বড় দেবতার মূর্ত্তি। ইহার পিছনে খানিকটা জায়গা খালি রহিয়াছে, যাহারা পূজা করিবে তাহারা যাহাতে মূর্ত্তিগুলি প্রদক্ষিণ করিতে পারে। আজকাল যেমন খড় কুটো দিয়া মূর্ত্তি বানাইয়া তাহার উপর কাদা লেপিয়া দেয় তুনহুয়াং এর মূর্ত্তিগুলিও সেইরূপ উপকরণে তৈয়ারী। দেওয়ালের ছোট বড় সব মন্দিরেরই গায়ে চিত্র আঁকা; সব চিত্রই বৌদ্ধ। এই সকল চিত্র বিশেষ নষ্ট হইয়া যায় নাই; Pelliot এই সকল চিত্রের ফটোগ্রাফ লইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এবং বাহিরের ছোট মন্দিরগুলিতে সাধারণত বোধিসত্ত্বদিগের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। কোথাও বা বোধিসত্ত্বগণ সার বাঁধিয়া চলিয়াছেন, কোথাও আবার তাঁহারা স্তরে স্তরে বসিয়া আছেন। ইহা ছাড়া অতি ছোট ছোট গুহার (cells) মধ্যেও বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে দেখা যায়। বড় বড় গুহাগুলির ছাদে নানারূপ কারুকার্য্যের সহিতও বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি দেখা যায়।

বুদ্ধমূর্ত্তি। পার্শ্বে বৌদ্ধ দেবদেবী

বড় বড় গুহাগুলির প্রাচীরগাত্রেই কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য এবং শিল্পের চরম উৎকর্ষের নমুনা পাওয়া যায়। সুবৃহৎ Panelগুলির ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর বিচিত্র রকমের চিত্র অঙ্কিত; জানালার উপর ফুলপাতার কাজ করা ঝালর। এইরূপ চিত্রিত অংশ কোথাও পৃথক পৃথক ভাবে দেয়ালের এখানে-সেখানে, কোথাও বা সারি সারি রহিয়াছে।

চিত্রিত অংশ গুলির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও দুইটি প্রধান ভাগে সে গুলিকে ভাগ করা যায়। একশ্রেণীর চিত্রে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বদিগের দ্বারা ও অনুচরদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সুশোভিত মণ্ডপের উপর অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম; স্পষ্টই বুঝা যায় সেগুলি শান্তিধাম সুখাবতীর চিত্র। অন্য শ্রেণীর চিত্রগুলি পার্থিব জীবন অবলম্বনেই অঙ্কিত। সাধারণ মানবের সুখ-দুঃখের মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও কোনও বোধিসত্ত্ব ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল চিত্রিত অংশের উপরে বা ধারে ধারে চীনা উপকথার চিত্রসমূহও অঙ্কিত দেখা যায়, চিত্রগুলির সঙ্গে চীনা অক্ষরও খোদাই করা রহিয়াছে।

চীনা উপকথার চিত্রগুলি দেখিলে চীনা ধরণ (style) বেশ বুঝা যায়; তবে এগুলির মধ্যে যে সকল দেবতার চিত্র রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট।

গুহার মধ্যে মাটীর (Stucco images) মূর্ত্তিগুলি দস্যুদলের আক্রমণে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছে বটে, তবুও সেগুলিকে দেখিলে এখনো গ্রীক-ভারতীয় শিল্পের প্রভাব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এই শিল্প যে বহুকাল ধরিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের মনে স্থায়ী রকমের ছাপ রাখিয়া দেয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম কতদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাও বুঝা যায়। চিত্র ও মূর্ত্তিগুলি মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের; তান্ত্রিক মন্দির এখানে কোনও গুহাতেই নাই।

মূর্ত্তিগুলি সাধারণত স্বর্ণমণ্ডিত; কোন কোন বুদ্ধ মূর্ত্তি ঠিক জীবন্ত মানুষের ন্যায়। দুইটি অতি বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে; একটিতে বুদ্ধ দণ্ডায়মান অবস্থায়, অপরটীতে বসিয়া। দুইটীই উচ্চে ৯০ ফিট। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কিছু কিছু এবং দস্যুর অত্যাচারে অনেক মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ কেহ কেহ এই সকল মূর্ত্তি মেরামত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে মূর্ত্তিগুলি অনেকস্থলে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মেরামত যে করা হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তুনহুয়াংএর অধিবাসিগণের বুদ্ধের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এবং সহস্র-বুদ্ধ গুহার উপর তাহাদের আকর্ষণের জন্যই এতদিন পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে নাই।

গুহার ভিতরে ছাদের চিত্র

চীনা শিল্পের ইতিহাসে দেখা যায় যে তাঙ্ রাজত্বের সময় চীনা শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঙ্-রাজত্বকালের শিল্পের নিদর্শন আমরা বড় বেশী পাই না। এই তুনহুয়াং গুহাগুলির মধ্যেই সেই নিদর্শনের সন্ধান আমরা পাই। কিন্তু তুনহুয়াংএ যে কেবল চীনা শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে এমন নহে, ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকের প্রভাব আসিয়া মিশিয়াছে। চীন হইতে ভূমধ্যসাগরে যাইবার পথে তুনহুয়াং অবস্থিত; ইহার উত্তরে মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে তিব্বত। সুতরাং পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকের প্রভাব ইহার উপর আসিয়া পড়া অতি সহজ।

একস্থানে একটি প্রাচীরগাত্রে পরপর দশটী চিত্রে একজন বোধিসত্বের জীবন অঙ্কিত রহিয়াছে। এই চিত্রখানি নেপালী চিত্রকলার নিদর্শন। সূক্ষ্মকার্য্য ইহাতে বিশেষ না থাকিলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়া এই চিত্রখানি অতি মূল্যবান। পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানে গ্রীক শিল্প ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, তুনহুয়াংএ তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। চিত্র অঙ্কণ প্রণালীর (technic) মধ্যে পশ্চিমের প্রভাব খুব বেশী; পশ্চিমের প্রভাব বলিতে কেবল গ্রীক প্রভাবই নয়, পারস্যের বিশেষত তথাকার সুপ্রসিদ্ধ গুরু ও শিল্পী মণির প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু চীনা শিল্পের উপর বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঙ্ রাজত্বের সময় ভারত হইতে যাহা কিছু আনা হইত সে সকল জিনিষই অতি সমাদর লাভ করিত এবং সেগুলির অনুরূপ চীনা শিল্প গঠনের চেষ্টা হইত।

তুনহুয়াংএ রেশমের উপর একটী চিত্র রহিয়াছে, সেটীতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি তুলি দিয়া নিপুণ ভাবে আঁকা হইয়াছে; আকৃতি সব ভারতীয়। বুঝা যায় হুয়েনসাঙের ন্যায় চীনা পরিব্রাজকগণ ভারতীয় চিত্র সমূহ স্বদেশে লইয়া গিয়া চীনা শিল্পী ও চিত্রকরগণের সম্মুখে বৌদ্ধ চিত্রকলার একটি আদর্শ ধরিয়া দিয়াছিলেন। চীনা ধর্ম্মগুরুগণ ভারতীয় প্রতীক, ভারতীয় আচার ব্যবহার কিছু কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধ শিল্পও তদনুরূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ (secular) চীনা শিল্পের সহিত বৌদ্ধ শিল্পের কোন কোন স্থলে বেশ পার্থক্য ছিল, কিন্তু তুনহুয়াংএর চিত্রাবলী দেখিলে বুঝা যায় বৌদ্ধ শিল্প সমগ্র চীনা শিল্পের উপর অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

Binyon জাপানের শিল্পের উপরও মধ্য-এশিয়ার শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "বৌদ্ধ শিল্পের ভিত্তি প্রধানত গান্ধার শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত, তৎপরে অন্য শিল্পের প্রভাব আসিয়া ইহাতে কিছু কিছু মিশিয়াছে, বিশেষ করিয়া ইরাণীয় শিল্পের প্রভাব। এই বৌদ্ধ শিল্প পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের মধ্য দিয়া চীনে যাইয়া তথাকার গুণী শিল্পীদের হাতে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া যায়; চীন হইতে আবার জাপানে যাইয়া তথাকার বিশেষ রূপ গ্রহণ করে।

তুনহুয়াংএর প্রাচীরের চিত্র ও পতাকাগুলিতে জাতকের গল্পসমূহ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল চিত্রের কোন কোনটির নীচে যাঁহারা চিত্র আঁকাইবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি (portraits) আছে। একটী চিত্রের নীচে তারিখ দেওয়া আছে ৮৯৭ খৃষ্টাব্দ, আর একটিতে ৮৬৪। অন্য চিত্রগুলি নবম শতাব্দীর এবং দশম শতাব্দীর। অধিকাংশ চিত্রই নবম শতাব্দীর; কতকগুলি কিছু পূর্ব্বের, কতকগুলি কিছু পরের।

তুনহুয়াংএর সহস্রবুদ্ধ গুহায় বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন প্রথম ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে দুইজন শ্রমণ, Lo-tsun এবং Fa-ling-in।

Ch. Baun তনহুয়াংএ কতকগুলি চীনা লিপি আবিষ্কার করেন। Chavannes পরে সেগুলির অর্থ বাহির করেন। এই সকল লিপিতে মন্দিরের একটী ইতিহাস পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রাচীনতম লিপিটী ৬৯৮ খৃষ্টাব্দের। সেই লিপিতে মন্দিরের কতকগুলি মূর্ত্তিসংস্কার করাইবার জন্য প্রশংসাবাদ (eulogising) প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতেই বলা হইয়াছে যে মন্দিরটী প্রথম নির্ম্মিত হয় ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে।

এই বৎসর শ্রমণ Lo-tsun পরিব্রাজকের দণ্ড হাতে লইয়া বন জঙ্গল পার হইয়া এই পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হন; হঠাৎ একটী স্বর্ণময় দৃশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দৃশ্যটী সহস্রবুদ্ধের। প্রেরণালাভ করিয়া তিনি একটী গুহা খনন করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ

করিলেন। তারপর ধ্যান শাখার গুরু Faliang পূর্ব্বদিক হইতে এখানে আসেন। তিনি Lo-tsunএর মন্দিরের পার্শ্বে আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া যায়। ক্রমশ তুনহুয়াং সহর হইতে একজনের পর একজন আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অন্য লিপিগুলিতে কোনও দানের কথা, কোনও মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের কথা, অথবা মন্দিরের সংস্কারের কথা রহিয়াছে।

এই সকল সংস্কার অধিকাংশই অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যাঁহারা অর্থদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মঙ্গোলিয়ার এক রাজা; তাঁহার নাম Shou-lang বা সুলেমান।

গুহার মন্দির গুলি বিদেশীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বারদেশে প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক তাও মতাবলম্বী ভিক্ষু হঠাৎ একটি মন্দিরের সন্ধান পাইয়া তাহার দ্বার খুলিয়া ফেলেন। দেখেন যে সেই মন্দিরে বহু মূল্যবান্ পুঁথি ও রেশমের উপর আঁকা সুন্দর সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। ষ্টাইন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এইখানে আসেন; পেলিও আসেন ১৯০৮এ। দুইজনেই এখান হইতে মূল্যবান পুঁথি অনেক লইয়া যান; অবশিষ্ট গুলি Pekingএর গভর্ণমেণ্টের আদেশে তথায় লইয়া যাওয়া হয়।

এইখানে যে বহুবিধ গ্রন্থের স্তূপ ছিল, তাহা হইতে কিছু কিছু গ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথি,

পাহাড়ের গায়ে গুহা। অদূরে নদী

চীনা পুঁথির মধ্যে ব্রাহ্মী অক্ষর, ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রস্তরখণ্ড-(Tablets), ব্রাহ্মী অক্ষরে খোটানী ভাষায় লেখা পুঁথি ও তাহার অনুবাদ, ব্রাহ্মী অক্ষরে কুচিয়ান পুঁথি, তিব্বতী পুঁথি, উইগুর পুঁথি, সগ্‌ডিয়ান বৌদ্ধ গ্রন্থ, সগ্‌ডিয়ান ভাষায় মণিধর্ম্মের গ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম্মের গ্রন্থ এবং 'Runic' তুর্কী ভাষার গ্রন্থ—এই বিচিত্র রকমের বিচিত্র পুঁথি সেখানে পাওয়া যায়।

ষ্টাইন পাঁচ হাজার টাকা দিয়া এই পুঁথি গুলি Wang নামক সেই 'তাও' ভিক্ষুর কাছ হইতে কিনিয়া লইলেন এবং পাছে এই বন্দোবস্তের কথা চীনাগণ জানিতে পারেন সেই ভয়ে গোপনে এগুলি সরাইয়া ফেলিলেন।

তুনহুয়াঙের পাহাড় ও নদী

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পেলিও তুনহুয়াংএ পৌছান। Wangএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। তিনি নিজে চীনা ভাষা জানেন সুতরাং পুঁথিগুলির মধ্যে যে কি সম্পদ্ লুক্কায়িত আছে তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন। বিশেষভাবে চীনা পুঁথিসমূহের সন্ধান তিনি করিতে থাকেন; ১৫০০০ হাজার পুঁথি এইরূপে তিনি সংগ্রহ করেন।

চীনা পুঁথি ছাড়া অন্যান্য পুঁথিও বিস্তর ছিল। ১০০০ খৃষ্টাব্দেই মনে. হয় এ সকল পুঁথি দস্যুহস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য মন্দিরটীর দ্বার প্রাচীর রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ৯০০ বৎসর এই অবস্থায় থাকিবার পর Wang ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সেগুলির সন্ধানলাভ করেন।

পেলিওর চীনা পুঁথি সংগ্রহের সংবাদ চীনা গভর্ণমেণ্টের কানে যাইতেই সমগ্র পুঁথি Pekingএ লইয়া যাইবার হুকুম হইয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। বহু পুঁথি চুরি হইয়া যায়, অনেক পুঁথি Wang নিজেই সরাইয়া ফেলে। ষ্টাইন্ তৃতীয় বারে (১৯১৪-১৯১৬) যখন তুনহুয়াংএর মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং Wangএর নিকট হইতে বহু পুঁথি পান। আবার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জাপানী পণ্ডিত Tachilana, Wangএর নিকট হইতে, বহু চীনা পুঁথি সংগ্রহ করেন। জাপান হইতে দুইখণ্ডে চীনাগ্রন্থের একটী সম্পূর্ণ তালিকা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ তুনহুয়াং হইতে পাওয়া গিয়াছে। তালিকাগ্রন্থখানিতে পেলিওর লিখিত একটী ভূমিকা রহিয়াছে।

আজকাল মধ্য এশিয়ার বর্ণমালা হইতেছে আরবী; কিন্তু দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার বর্ণমালা প্রধানত ছিল ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত পুঁথিগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত সংস্কৃত পুঁথি, দ্বিতীয়ত খোটানী, তৃতীয়ত কুচিয়ান। তুনহুয়াংএ এবং Khadlik প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে Hoernle সে সকল পুঁথির শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তালপাতার পুঁথি; আর কতকগুলি কাগজের rolls। তিন ভাষায় লিখিত যাবতীয় পুঁথিই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

তুনহুয়াং হইতে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কয়েকটী গ্রন্থ de La Vallie Poussin প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাযানের কতকগুলি অসম্পূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ ভিন্ন ধর্ম্মত্রাতের উদাণবর্গের কতকগুলি পৃষ্ঠা এবং মাতৃচেত-রচিত গানটী পাওয়া যায়। মধ্যএশিয়াতেই যে পুঁথিগুলি লিখিত হইয়াছিল তাহা লিখিবার ধরণ দেখিলেই বুঝা যায়। শতসহস্রিকা সংস্করণের প্রজ্ঞাপারমিতার একতৃতীয়াংশ ৬৪ পৃষ্ঠার তালপাতার একটী পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়। এই পুঁথি এবং আরও কতকগুলি তালপাতার পুঁথি দেখিলেই বুঝা যায় সেগুলি ভারত হইতে আনীত। এই পুঁথিগুলি সোজা গুপ্ত (Gupta) অক্ষরে লিখিত। নেপালের দিক দিয়া তিব্বতের মধ্য দিয়া এইগুলি তুনহুয়াংএ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কাগজের roll এর মধ্যে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে দুইটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটী হইল নীলকণ্ঠ ধারণীর কতক অংশ; তাহার মধ্যে আবার ইহার সগডিয়ান সংস্করণও আছে। Poussin এবং Ganthiot এই গ্রন্থটী প্রকাশ করিয়াছেন। Levi র মতে এই দুই ভাষায় লিখিত গ্রন্থটী ৬১০ হইতে ৭৫০এর মধ্যে লিখিত। অন্য গ্রন্থটী হইল প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়-সূত্র। মূল সংস্কৃত ও তাহার চীনা অক্ষরে প্রতিশব্দ (transliteration) পর্য্যায়ক্রমে ইহাতে রহিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর Horinji সংস্করণের সহিত ইহার খুব মিল আছে। ম্যাক্স্ মূলার তাঁহার Anecdota Occencisia সিরিজে এই Horinji সংস্করণটী প্রকাশ করিয়াছেন।

চীনা গ্রন্থগুলির উল্টোদিকে অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় দ্রুত (cursive) গুপ্ত অক্ষরে লেখা দেখা যায়। এগুলি দেখিয়া মনে হয় ঐস্থানে গ্রন্থগুলি নকল করা হইয়াছে। (Giagantic) বড় বড় rollগুলির ভাষা ঐ একই রকম, তবে সেগুলি সোজা গুপ্ত অক্ষরে লেখা। অবশিষ্ট কতকগুলির খোটানী ভাষা, দ্রুত গুপ্ত অক্ষরে লেখা।

খোটানী ভাষায় লেখা তালপাতার পুঁথি ও roll অনেক আছে। ষ্টাইন তুনহুয়াং গুহাবলীর মধ্যে ১৪টী

সরাই। পর্ব্বতে গুহা দেখা যাইতেছে।

পুঁথি এবং ৩১টী কাগজের মোড়কে (roll) বাঁধা খোটানী গ্রন্থ পান। কাগজের গ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেকটীর পিছন দিকে চীনা ভাষা ও অক্ষরে লেখা সম্পূর্ণ পৃথক্ একটী গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দুইটী গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য বজ্রছেদিকা ও অপরিমিতায় সূত্র। Sten Konow এই দুইটী গ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন ও সম্পাদন করিয়াছেন। খোটানী পুঁথিগুলির মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যার দুইটী বৃহৎ অথচ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ রহিয়াছে। মূল সংস্কৃত হইতে সেগুলি অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। আর একটী বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুঁথি

রহিয়াছে, সেটী সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গ্রন্থখানির নাম কি বুঝা যায় না।

দ্রুত গুপ্তঅক্ষরে লেখা খোটানী rollগুলির মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ, কতকগুলি দলিলপত্র ও কতকগুলি চিকিৎসা শাস্ত্রের মন্ত্রসমূহ (formulae) আছে। ইহা ছাড়া কতকগুলিতে ব্রাহ্মী অক্ষর শিখিবার নিয়মাবলী আছে। মনে হয় নূতন শিক্ষার্থীর জন্য এগুলি লিখিত।

সংস্কৃত ও খোটানী গ্রন্থ ছাড়া কুচিয়ান গ্রন্থ কতকগুলি আছে তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তবে কুচিয়ান গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অল্প। মনে হয় তুনহুয়াংএর

তুনহুয়াঙের সম্মুখস্থিত নদী

গুহাগুলির দ্বার যখন প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া হয় তখন হইতেই কুচা ও তুর্ফান প্রভৃতি উত্তর প্রান্তস্থিত সহরগুলির সহিত তুনহুয়াংএর যোগ কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

দুইপ্রকার গুপ্তঅক্ষরে ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা পুঁথিগুলি ছাড়া তুনহুয়াংএ আরও নানারকম লিপির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। চীনা পুঁথি এত ছিল যে একা ষ্টাইনই ২৪টী তোরঙ্গ ভরিয়া চীনা পুঁথি বৃটীশ মিউজিয়মে লইয়া যান। Pelliot লণ্ডনে ষ্টাইনের সেই সংগ্রহ দেখেন। তিনি বলেন যে, সম্পূর্ণ পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৩০০০; ইহা ছাড়া খাতা এবং অসম্পূর্ণ পুঁথির সংখ্যা ৫০০০ হইতে ৬০০০এর মধ্যে। ইহার অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থ। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থগুলি অতি মূল্যবান্। ষ্টাইনের সংগ্রহের অপেক্ষা পেলিওর নিজের সংগ্রহ আরও বিপুল এবং তাহাতে অধিকতর মূল্যবান্ গ্রন্থ অনেক আছে।

হাজার হাজার চীনা পুঁথির মধ্যে একটী ঐতিহাসিক ও আর একটী ভৌগোলিক গ্রন্থ সম্পাদন করা হইয়াছে। দুইটি গ্রন্থই ক্ষুদ্র। একটি হইল Tung-huan-lu। ইহাতে তুনহুয়াং স্থানটীর যাবতীয় বিবরণ বিস্তারিত ভাবে রহিয়াছে। অন্য গ্রন্থটীতে ৪১৬ খৃষ্টাব্দে তুনহুয়াং এর জনসংখ্যা (official census) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

চীনা পুঁথির পরেই তুনহুয়াংএ তিব্বতী পুঁথির সংখ্যা অধিক। ৩০টী বস্তা ভরিয়া তিব্বতী পুঁথি ছিল, তাহা ছাড়া ছোট ছোট পুঁথির তাড়াও ছিল অনেক। মোট পুঁথির সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে—প্রায় ৮০০। ইহা ছাড়া একই গ্রন্থের দুই কপি করিয়াও আছে। সেগুলি বাদ দিয়াই ৮০০। Poussin এই তিব্বতী পুঁথিগুলির একটি তালিকা করিয়াছেন।

অধিকাংশ তিব্বতী পুঁথি অষ্টম শতাব্দী ও নবম শতাব্দীতে লেখা। সেই সময় ঐখানে তিব্বতীদেরই প্রাধান্য (রাজত্ব) ছিল। তবে ইহা ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, Khadalik, Miran প্রভৃতি স্থান হইতেও তিব্বতী পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুনহুয়াং এমন এক স্থানে অবস্থিত, যেখানে বিচিত্র দেশের বিচিত্র ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। Aremaic হইতে উদ্ভূত এক অক্ষরে লেখা সগ্‌ডিয়ান ভাষার কতকগুলি গ্রন্থও তুনহুয়াংএ পাওয়া যায়। ষ্টাইন তুনহুয়াং গুহা হইতে প্রায় এক ডজন ঐরূপ গ্রন্থ

পান। Ganthiot, Poussin, পেলিও কতকগুলি সগ্‌ডিয়ান গ্রন্থ প্রকাশ (publish) করিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে বেসসান্তর জাতক ও নীলকণ্ঠধারণীর সগডিয় সংস্করণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তুর্কীভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুঁথিও তুনহুয়াংএ পাওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথিগুলি 'Runic' লিপিতে লেখা। ভাষাতত্ত্ববিৎদের নিকট এইকারণে পুঁথিগুলি অতি মূল্যবান্। তুর্কীভাষায় মণিধর্ম্মের পুঁথিও গুহাগুলির মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। সাধারণত তুর্কীভাষায় হইলেও বিভিন্ন পুঁথির ভাষার মধ্যে অল্পাধিক পার্থক্য আছে। মণিধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান চীনা গ্রন্থ সেখানে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে মণিধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনেক বিষয় জানা যায়, এবং মণিধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের কতখানি প্রভাব ছিল, তাহাও জানা যায়।

'Runic' লিপি ছাড়া উইগুর লিপিতেও তুর্কীভাষার গ্রন্থসমূহ লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশই বৌদ্ধগ্রন্থ; চীনা হইতে অনুবাদ।

ষ্টাইন ও পেলিও তুনহুয়াং হইতে যে অমূল্য সম্পদ্ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিবার বহুল উপকরণ পাওয়া যায়। ইঁহাদের আবিষ্কার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

"মুক্তি অন্বেষণ"

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

(বিশ্বযোগে)

গৃহছাড়া দক্ষিণের উত্তাল হাওয়াতে
চ্যুত শাখা উত্তোলিত শাল বন মাতে,
গন্ধে ভরি' চৈত্র সন্ধ্যা আসে স্নিগ্ধ হ'য়ে
বনে বনান্তরে তারি স্পর্শ যায় ব'য়ে।

জলের কল্লোল জাগে তরুশ্রেণী মাঝে
সাড়া লাগে বাঁশ বনে প্রতিধ্বনি বাজে,
সন্ধ্যামণি অক্ষি মেলে পক্ষী কলরোলে
ক্ষণে ক্ষণে যূথিকারে মত্ত করে তোলে।

অস্তের অন্তিম আলো অপূর্ব্ব মায়ায়
কি রঙ্গীণ স্বপ্ন রচে বৃক্ষের ছায়ায়!
সেই আলোচ্ছটাময় এ অম্বর-তল
আমারে করিয়া দেয় বেদনা-বিহ্বল।

মসীলিপ্ত কিশলয়ে, তরুগুল্মময়
রাত্রির শীতল স্পর্শ বদ্ধ হ'য়ে রয়;
তাহারি প্রচ্ছন্ন ছায়ে ঘন অন্ধকার
নিঃশেষে হরিয়া নেয় সমস্ত আমার।

সকলের বক্ষ হ'তে মহানন্দ ধারা
আমার আনন্দে যেন হ'ল আত্মহারা।
প্রেমে সুখে পৃথিবীরে আঁকড়িয়া ধরি,
তারি প্রতি ছন্দে উঠি শিহরি শিহরি!

আপনারে ছিন্ন করি সর্ব্ব বন্ধ হ'তে
সৌন্দর্য্যের মধু স্পর্শ মৃদু মন্দ স্রোতে,
ভেসে চলি সুধাগন্ধে চিত্ত উছলিয়া
আপনারে চারি পার্শ্বে ব্যাপ্ত করি দিয়া।

তবু মনে ধাধা বাজে, তবু মনে হয়—
এ ত মোরে যুক্ত করা, এ ত মুক্তি নয়!

(ত্যাগযোগে)

তার পরে বর্ষ গেছে, বৈশাখের বায়ে
মোর গৃহপাশে নদী এসেছে শুকায়ে,
আমারে এনেছি টেনে বহু সাধনায়
বিশ্ব হ'তে ভিন্ন ক'রে প্রাঙ্গণ-কোণায়।

নীরব নিস্তব্ধ রাতে অন্ধকারে ঘোর
তনুরে করেছি ভিন্ন চিত্ত হ'তে মোর,
রুদ্ধ করি গৃহদ্বার প্রভাত বেলায়
হারায়েছি স্নিগ্ধ উষা নির্ম্মম হেলায়;
মধ্যাহ্নের খরতাপে বৈরাগ্য-আগুনে
আমারে করেছি দগ্ধ পল গুণে গুণে।
কেঁপেছে বহ্নির শিখা তারি তপ্ত বায়ে
সমস্ত বাসনা মোর দিয়েছি জ্বালায়ে।

সে উন্মত্ত দীপ্ত শিখা মোর সব লয়ে
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি আসে ক্ষীণ হ'য়ে।
সমস্ত আহুতি দিনু যে অগ্নিতে আনি
নিবে নিবে আসে দেখি তারি দীপ্তিখানি!
আপনারে রিক্ত লাগে, সে শূন্যতা ভরি
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে গুমরি গুমরি।
তবু এই স্বর্গ্যালোকে কেন মনে হয়
এ ত মোরে শূন্য করা, এত মুক্তি নয়।

(আত্মসৃষ্টিতে)

খুলে দিয়ে রুদ্ধ দ্বার শ্যাম মাঠে চাহি
অশান্ত হৃদয় মোর উঠে অবগাহি।
রৌদ্র আসে স্নিগ্ধ হয়ে, বৈকালের বায়ে
উত্তপ্ত ললাটে দেয় পরশ বুলায়ে।
উন্মুক্ত দ্বারের পাশে চিত্তে অকারণে
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে আজ হয় মনে,—

এ মহা যাত্রার পথে সকল সঞ্চয়
আমারি এ চিত্ত যদি নিত্য করি লয়
যত সুধাভরা মুখ, যত মধুহাসি
জীবনের চিত্রপটে উঠেগো উদ্ভাসি'
যত কিছু ভাল মন্দ, ভাঙ্গা গড়া যত
যত সুখ যত দুখ আসে অবিরত,
সে সকল প্রতিদিন আমার হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যদি রহে লেখা হ'য়ে;
যে নিয়ম বন্ধনেতে বাঁধি পরস্পর
বহু চিত্ত চলে নিত্য দূর দূরান্তর,
এক গন্ধে আমোদিত, এক ছন্দমাঝে
সকল নিখিল হিয়া বদ্ধ রহিয়াছে;
এ বিপুল সৃষ্টি চলে যে নিয়ম স্রোতে,
যাহা কিছু লভিলাম সেই স্রোত হ'তে,
সে সমস্ত দানগুলি নিয়া ভিন্ন করি,'
সে বন্ধন হতে মোরে যদি ছিন্ন করি,
আপন নিয়মে তারে নূতন করিয়া
পারি যদি নব বিশ্ব লইতে গড়িয়া,
উজ্জ্বল জ্ঞানের দীপ মুগ্ধ হস্তে ধরি'
বিষম বন্ধুর পথ আলোকিত করি—
নীরবে পশিতে পারি আমারি হৃদয়ে
আমারি রচিত বিশ্বে, নিভৃত আলয়ে!

মহা পৃথ্বী বদ্ধ করি ক্ষুদ্র চিত্ত মাঝে
সেথা মোরে ছাড়ি দিব শত লক্ষ কাজে।
ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নব সৌরভ বৃষ্টিতে
আমারে রাখিব পূর্ণ আমার সৃষ্টিতে,
সেই পরিপূর্ণতায় সেথা মোর তবে
ধরিয়া অনন্তকাল মহামুক্তি র'বে॥

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিধাতা যদি প্রসন্ন হয়ে আমাদের বর দিতে আসেন তবে তাঁর কাছে আমাদের একটি বর চাইবার আছে—আমি কী চাইব এবং কেমন ক'রে চাইব সেটি আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও। আমার যে সত্যিকারের চাওয়া সেইটি আমায় দান করে যাও, তারপরে পাওয়া, সে আমার শক্তিতেই হবে। অমনি আমি কিছু নেব না—আমার চাওয়ার রাস্তাতেই ত তুমি আমাকে দাও, নইলে ত আমি পাব না। তাই আমাদের প্রথম চাওয়া হচ্ছে—আমাকে চাইতে শেখাও।

মানুষে জন্তুতে অনেক মিল রয়েছে—দৈহিক জীবন-যাত্রায় মানুষে জন্তুতে প্রভেদ অল্পই। কিন্তু মানুষে কী চায়, আর জন্তু কী চায়, এইখানেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জন্তু যতই বুদ্ধিমান হোক্ না কেন মানুষ যে সবার চেয়ে বড়ো ক'রে কী কামনা করে তা সে কল্পনাও করতে পারে না। আমাদের মধ্যে সেই যে বড়ো চাওয়াটা আছে, সেইটিই অভিভূত হয়ে থাকে। আমরা যেখানে ছোট, জন্তুর তুল্য, তারই কান্না যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন আমাদের সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে কেটে যায়। মানুষ এই যে সবার চেয়ে বড়োকে চাইবার মহৎ অধিকার পেয়েছে এই তার সম্পৎ—এটার মধ্যে তার সত্যকার আত্মপরিচয় এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে কেবলমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই সে তার মুক্তিকে অনুভব করে। এই যে পঞ্চভূতে সে বর্ত্তমান রয়েছে, এটা ত তার বাইরের আশ্রয় মাত্র। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার সত্যতা দ্বারা সে অনুভব করতে পারে যে, না, এখানেও কুললো না—এই যে সংসার যেখানে আমরা গাছপালা জীবজন্তুর সরিক হয়ে রয়েছি এখানেও তাকে ধর্‌ল না। যদি এই বড়ো আকাঙ্ক্ষাটা ম্লান হয়ে যায় তবে ত অনুভব করতে পারিনে যে আমরা অমৃতলোকের অধিকারী। আপনার মধ্যে চিরন্তনকে জানতে পারলুম না ব'লে রিপুর দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে মরছি এইখানেই ত আমাদের মহত্তা বিনষ্ট—সংসারের বিভ্রান্তিবশে আমাদের এই চিরদিনের পথের সহায়টিকে যদি অশ্রদ্ধা করি তবে ত অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারব না। তার বদলে যা পেলুম ধনে মানে তা যতই উচ্চ হোক না কেন মৃত্যু যে তার চূড়ায় ব'সে উপহাস করছে। সেখানে, যে মৃত্যুর অধিকার। যদি দেখি মানুষ সেখানেই তার অধিকার খুঁজে মরছে তবে বুঝ্‌ব তার আত্মাকে সে চাপা দিয়েছে। তাহলে সে বাঁচবে কিসে—অমৃতের অধিকারী যে প্রাণ, তাকে মানুষ খোয়ালো -জন্তুর গতিকে সে পেল। জন্তু জানে না যে অমৃতেই তার শেষ লক্ষ্য, আনন্দ, তৃপ্তি। মানুষের গভীরতম অন্তরে আছে সেই আকাঙ্ক্ষা।

যখন প্রশ্ন এল—সত্য, না উপকরণ? স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে সহজেই উত্তর এল--না, এই যে উপকরণগত জীবন, এ ত তুচ্ছ। এই যে সহজ কথাটি, একে সহজে অনুভব করার সুযোগ মানুষের সব সময়ে আসে না। ব্যথা যখন আসে তখন তারই মধ্য দিয়ে আমাদের মনে বেজে ওঠে চাইনে, চাইনে, এ নিয়ে আমার কিছু হবে না। বস্তুর মতো সংখ্যা দিয়ে বোঝাবার জিনিষ যা নয়, সেই সত্যকে চাই, অন্তরে থেকে তা অন্তরকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে, মুক্তি দেয়। উপনিষদে বলেছে, মা গৃধঃ · ছোটোকে চেয়ো না, এইখানেই ত বন্ধন। কাড়াকাড়ি ক'রে যা নিতে হয়, যে ধন নিলে অন্যের ভাগে কম প'ড়ে যায়—তাতে লোভ কোরো না। বলেছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।—অনন্ত যিনি, মহৎ যিনি, তিনি আপনাকে দান করেছেন, তার মধ্যেই ত পূর্ণতা, ঘরবাড়ি গোরু-বাছুরের মধ্যে ত পূর্ণতা নেই। সেই আনন্দ আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে যখন আমাদের ছোট চাওয়াগুলি দূরে যাবে। যেমন বৃহৎ বনস্পতির বীজ জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে অঙ্কুরিত হতে পারে না, কিন্তু সেই জঙ্গল

পরিষ্কার ক'রে দাও, তা মহীরুহে বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। সেই বড় চাওয়া তেমনি কখনো মরতে পারে না, সে যে বৃহৎকে চায়, ভূমাকে চায়। ভূমৈব সুখম্—ভূমাকে ছাড়া ত সুখ নেই। ভূমৈব দুঃখঞ্চ—সেই ভূমার সাধনায় দুঃখ আছে। 'কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেই সুখ যে নিহিত রয়েছে। অল্পেতে আরাম হতে পারে—কিন্তু তৃপ্তি হতে পারে না, সুখ হতে পারে না। যে সব জাতি জগতে বড়ো হয়েছে, তা'রা আকাঙ্ক্ষায় বড়ো, সাধনায় বড়ো। আমাদের গ্রামের লোক প্রতিদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে চলেছে, মধ্যাহ্নে দিবানিদ্রা, বৈকালে পরনিন্দা এই নিয়ে তার আরাম অভ্যাসের চক্রে সে আবর্ত্তিত। আরামে আছে, কেন না তার কোনো চেষ্টা নেই। সাধনা নেই, মানবলোকে তার প্রতিষ্ঠা নেই, মহতী বিনষ্টির ছায়ায় সে গতিহীন জীবনকে পলে পলে ব্যর্থ করছে। বড়োকে চাইবার অধিকার সে দাবি করলে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা ভূমাকে তপস্যা করলেন, কর্ম্মের ক্ষেত্রে যাঁরা ভূমাকে সাধনা করলেন, মুক্তি পেলেন তাঁরা। তাঁরা বড়ো চাওয়াকেই স্বীকার করেছেন, তার দাম দিচ্ছেন, তাই এঁরা বড়ো হয়েছেন। ঈর্ষ্যা ক'রে কী হবে? আত্মার ধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে এঁরা আত্মাকে জয় করেছেন। আত্মাকে অস্বীকার ক'রে, ছোট চাওয়াকে বড়ো ক'রে তুলে, ম্লান জীবন যাপন ক'রে যদি আমরা বলি আমরাও ঐ রকম প্রভুত্ব করব, তা ত হয় না। বাইরে থেকে দিলেও ত আমরা পাব না। যে-জাত চাইতে শিখল না, যে শুধু কোলাহল অভিমান ঈর্ষাই করে, তপস্যা করে না, সে ত পাবে না। যেটা না চাইবার তাকে অবজ্ঞা করতে হবে। এতে দুঃখ আছে · কিন্তু সব দুঃখ পূর্ণ হয়ে যায় বড়ো চাওয়ার আনন্দে। এইটেই মানবের সব চেয়ে বড়ো আত্মপরিচয় যে সে ছোটকে চায় না, সে চায় দেহের চেয়ে মনের চেয়ে যা বড়ো, মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে যা বিরাজ করছে।

অগ্নিগৃহে যেমন অগ্নি রক্ষা করা হত তেমনি সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু প্রবাহ শোক অপমান, সবার মধ্যে অন্তরে নির্ব্বাণহীন শুদ্ধ অগ্নিশিখাকে রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে। মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় শিখা হ'তে আমাদের দীপ যদি জ্বালিয়ে নিতে পারি তবেই আমরা ধন্য হ'ব। সেই সাধনা সেই ইচ্ছাকে যেন নিজের মধ্যে জাগ্রত করে রাখতে পারি আজকে এইটিই আমাদের স্মরণ করবার কথা। চাইতে শিখি যেন, আমাদের চাওয়া যেন সমস্ত অন্তরকে উদ্বোধিত করে তোলে। সত্যকে পেলে এখনো ত আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোভক্ষোভের দ্বন্দ্ব হ'তে উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারি—খণ্ড খণ্ড আকারে আমাদের সেই পাওয়া যেন অখণ্ডরূপে আমরা পেতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা।

[প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৩৬]

স্বামী বিবেকানন্দ

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর সি-আই-ই

* * * মানুষকে পরিচালন করিবার উপযুক্ত শক্তি দিয়াই যেন প্রকৃতি তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী পূত-চরিত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কাহারো কাহারো স্বভাব নিষ্কলঙ্ক ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র থাকিলেও তাঁহার চরিত্র কখন কোনরূপ মলিনতা-স্পৃষ্ট হয় নাই। তিনি আজীবন অধ্যয়নশীল ও জ্ঞানানুশীলনে রত ছিলেন। * * *

তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাচুর্য্য, বিচারে অনেক স্থলেই তাঁহাকে অজেয় করিয়া তুলিত। বয়সে তিনি নবীন হইলেও অনেক প্রবীণ খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ক বিচারে তাঁহার নিকট অনেক সময়ে অপদস্থ হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি ও বিচারপ্রিয়তা ছাত্রজীবনে তাঁহার বিপদের কারণও হইয়াছিল। ইহার ফলে এক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইলে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিলেও তাঁহার এই বিষম সংশয় নিরাকৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুদিনের জন্য এক প্রকার নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঈশ্বর আছেন কি না, এই কঠিন সমস্যার সন্তোষকর সমাধানের জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকিত।

এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের সাধু পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবনের আশ্চর্য্য ত্যাগ ও ভক্তির কাহিনী এবং তাঁহার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব ধারণা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন ও পরীক্ষা করিবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদয় হইল এবং কালবিলম্ব না করিয়া সংশয়-বিক্ষিপ্ত অথচ সত্যান্বেষী এই যুবক জিজ্ঞাসু হইয়া পরমহংস দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। * * *

গুরু-শিষ্যের, এই শুভ মিলনে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তের প্রভাব স্পষ্টভাবে দর্শন করিতেছি। বিবেকানন্দের মত প্রতিভামণ্ডিত শক্তিশালী পুরুষ জগতে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিলে সমাজের ঘোর অমঙ্গল ও অকল্যাণ সংসাধিত হইত। * * *

স্বামী বিবেকানন্দের, তাঁহার স্বদেশবাসীকে প্রধান দান—নূতন ভাবে আর্ত্ত বিপন্নের সেবা। দরিদ্রের সেবা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই সেবাকে তিনি যে গৌরব

ও মহত্ত্বের গরিমায় অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগের একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। * * *

দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্য জাতির প্রতি হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় মর্ম্ম-বেদনা বোধ করিতেন এবং ইহার প্রতীকারকল্পে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বহু পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের" আন্দোলনের মধ্যে তাহার উপদেশের মঙ্গল প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

তিনি অস্পৃশ্যতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি রহস্যচ্ছলে সর্ব্বদা বলিতেন যে, বর্ত্তমান কালে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহার "চৌকায়" (রান্নাঘরে) আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! * * *

[ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৩৬]

রংপুরে রামমোহন রায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের সহিত রংপুরের সংস্রব এক সময় কিছু ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তিনি রংপুর কালেক্টরীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন,—কালেক্টর জন্ ডিগবী ছিলেন তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী।—এই-সব কথার ভিত্তি বোধ হয়, ডিগবীর ১৮১৭ সালে লিখিত রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি :—

"রামমোহন রায় জাতিতে অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় ৪৩ বৎসর। তিনি প্রভূত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তাহার উপর আবার তিনি ফার্সী ও আর্ব্বীও জানেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়াতে তিনি ধর্ম্ম এবং জাতি-সম্পর্কিত অন্ধ-সংস্কার সম্বন্ধে অল্প বয়স হইতেই অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি ইংরাজী শিখিতে সুরু করেন। কিন্তু প্রথমে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর পরে যখন আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই, তখনও তিনি কেবল নিতান্ত সাধারণ বিষয়ে কোনরূপ কাজ চালাইবার মত ইংরেজী বলিতে পারিতেন,—নির্ভুলভাবে এ ভাষা মোটেই লিখিতে পারিতেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্ব্বিসে আমি যে জেলায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া কালেক্টর ছিলাম, পরে তিনি সেই জেলার দেওয়ান, অর্থাৎ রাজস্ব-আদায়-বিভাগের প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার লিখিত সরকারী চিঠিপত্র যত্ন ও মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়া এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোকগণের সহিত বার্ত্তালাপে এবং পত্রাদি ব্যবহারে অবশেষে তাঁহার এমনি সঠিক ইংরেজী-জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তিনি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে এই ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িবার খুব অভ্যাস তাঁহার ছিল।"

[রামমোহন-অনূদিত কেনোপনিষদ ও বেদান্তসারের একটি বিলাতী সংস্করণ ১৮১৭ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে অবস্থানকালে ডিগবী ইহা সম্পাদন করেন। ভূমিকায় তিনি অনুবাদক রামমোহনের এই পরিচয়টি দিয়াছেন।]

রংপুরে রামমোহনের এই সরকারী চাকরি সম্বন্ধে তাঁহার চরিতকারেরা আরও লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যের অনুরোধে উচ্চপদস্থ দেশীয় লোককে পর্য্যন্ত সিবিলিয়ানদের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত,—তখনকার দিনে ইউরোপীয় সিবিলিয়ানরা এই নিয়ম জোর করিয়া চালাইতেন। কালেক্টরের উপস্থিতিতে রামমোহনকে কখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে না, এবং একজন সাধারণ দেশীয় আমলা বলিয়া তাঁহাকে আদেশ প্রদান করা হইবে না,—মিঃ ডিগবীর দস্তখতে তাঁহার সহিত রামমোহনের এইরূপ একটা চুক্তি ছিল।"

[রামমোহনের মৃত্যুর পর, ১৮৩৩, ৫ই অক্টোবর তারিখের Court Journal-এ আর, মণ্টগোমারি মার্টিন-এর একখানি পত্রে সর্ব্বপ্রথম এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়।] * * *

রামমোহনকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেব বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর সেক্রেটারীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন :—

"আপনার গত মাসের ২৩শে [নভেম্বর] তারিখের পত্রের নির্দ্দেশমত, এই আপিসের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গোলাম শা'র পদত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছি এবং বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, সেই পদে আমি রামমোহন রায়কে নিযুক্ত করিয়াছি। রামমোহন অতি সম্ভ্রান্ত বংশজাত, বিশেষ সুশিক্ষিত এবং দেওয়ানের কার্য্য পরিচালন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহাকে আমি বহুকাল ধরিয়া জানি, সেই হেতু আমি মনে করি, তিনি সাধুতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম-সহকারে দেওয়ানের কার্য্য চালাইতে পারিবেন। আশা করি, বোর্ড তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিবেন।" (১৮০৯, ৫ই ডিসেম্বর)

* * * বি-ক্রিস্প তখন বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর অস্থায়ী সভাপতি ও পুরাতন সদস্য। তিনি ডিগবীর প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন এবং মন্তব্য করিলেন,—"শুনিয়াছি, ডিগবী যে-লোকের হইয়া সুপারিশ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে ঢাকা জলালপুরের অস্থায়ী কালেক্টর মিঃ উডফোর্ডের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। রামগড়ে শেরিস্তাদাররূপে কার্য্যকালে রামমোহনের আচরণসম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যও আমার কানে আসিয়াছে। এ অবস্থায় রংপুরের দেওয়ান পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে মত দিতে আমি অনিচ্ছুক। বাস্তবিকপক্ষে, আপত্তি হিসাবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট

হইবে যে, কোন ফৌজদারী আদালত রাজস্ব-বিভাগীয় কার্য্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের শিক্ষাস্থল নয়, এবং রামগড়ের আদালতে তাঁহার তিন মাস কাল শেরিস্তাদারের কার্য্য রাজস্ব-বিভাগের গুরু দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ান পদ-প্রাপ্তির যোগ্যতারূপে নিশ্চয়ই বিবেচিত হইতে পারে না।..."

যাহা হোক, সভাপতির আপত্তিতে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ রামমোহনকে দেওয়ান পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।

রামমোহনের উপর ডিগবী সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না,—বোর্ডের পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, রামমোহনকে দেওয়ানী দিবার জন্য পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—

"আমি আপনার ১৫ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বোর্ড আমার সুপারিশ এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে এমন অনুকূল মন্তব্য-প্রকাশ এবং তাঁহার অতি উচ্চ গুণগ্রামের বিবৃতি-সত্ত্বেও বোর্ড মৎকর্ত্তৃক তাঁহার দেওয়ান-পদে নিয়োগে আপত্তি করিলেন।

"আপনার পত্রের প্রথমাংশ পড়িয়া মনে হয়, প্রস্তাবিত পদে রামমোহন রায়ের নিয়োগের মঞ্জুরীতে বোর্ডের অসম্মতির একটি কারণ এই,—দেওয়ান পদ-সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহে অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহারা তাঁহাকে ঐ পদের কর্ত্তব্যসম্পাদনে অনুপযুক্ত মনে করেন। গত মাসের ৩০শে তারিখের পত্রে আমি জানাই, যশোহর জেলায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে আমি যখন কাজ করিতেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত মুন্‌শীরূপে কার্য্য করিবার কালে তিনি রাজস্বআদায়ের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন; আমি ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সমস্ত আপত্তি দূর হইবে। আরও আমি না জানাইয়া পারিতেছি না, কখনও সরকারী কাজ করেন নাই এমন লোকদের কালেক্টরীর দেওয়ান পদে নিয়োগ বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন,—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে।

"আমি যে-লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্‌কুজাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রধান মুন্‌শী এবং ঐ-সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট খোঁজ লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করি।

"তাঁহার গুণ ও যোগ্যতা ভালরূপে জানি বলিয়া, যে কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি সে কাজ হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া দেশীয়দিগের চক্ষে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে আমার মনে আঘাত লাগে। আমি তাঁহাকে অস্থায়িভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম এই আশায় যে, যাঁহাদের নিকট সন্ধান লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছি সেই দেশীয়গণ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জানাইবেন সেই ধারণা, এবং কাজকর্ম্মে তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া জানাইয়াছি সেই জ্ঞান, আমার আপিসের দেওয়ানের পদ-নিয়োগ-সমর্থনে বোর্ডকে প্ররোচিত করিবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি এই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

"জামিন-সম্বন্ধে বোর্ডকে এই কথা জানাইতে চাই যে, তিনি অন্যান্য জেলা হইতে যত টাকার হোক জামিন জোগাড় করিতে পারেন।" (৩১ জানুয়ারী, ১৮১০)

* * * অধীন বাঙালী কর্ম্মচারীর অনুকূলে ইংরেজসিবিলিয়ানের এরূপ উচ্চগুণগান বড় সুলভ নহে,—বিশেষতঃ সে যুগে। কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ তাঁহাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিলেন না, অধিকন্তু চটিয়া কালেক্টর ডিগবীকে কড়া চিঠি লিখিলেন,—

* * * "বোর্ডের ইচ্ছামত আপনাকে আরও জানাইতেছি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ ভঙ্গীতে পত্র লিখিয়াছেন বোর্ড তাহা অত্যন্ত অপছন্দ করেন; তাঁহাদের প্রতি পুনরায় এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, বোর্ড যে তাহা অত্যন্ত গুরুতরভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।" (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১০)

বোর্ডের নিকট ডিগবীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু তবুও তিনি শেষবার রামমোহনের নিয়োগের জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়িলেন না। অন্ততঃ আরও কিছুদিন রামমোহনকে কাজ করিতে দিবার জন্য বোর্ডের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন :—

* * * "দেওয়ানের কাজে একজন সুদক্ষ লোককে নিযুক্ত করাই বোর্ডের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যও আমার ইচ্ছার অনুরূপ। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে অভ্যাস নাই বলিয়া যখন অনুমান-বলে ধরিয়াই লওয়া হইতেছে যে, আমার মনোনীত লোকটি রাজস্ব-আদায় ব্যাপারের সাধারণ পদ্ধতিতে অজ্ঞ, তখন আমি প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বোর্ডের নিকট আমার এই একান্ত আশা জানাইবেন যে তাঁহারা যেন রামমোহন রায়কে আরও কয়েক মাস দেওয়ানের কার্য্য করিতে দিবার অনুমতি আমাকে দেন; তাহা হইলে বোর্ড তাঁহার প্রকৃত গুণপনা ও দেওয়ান-পদে তাঁহাকে বাহাল রাখার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন; যদিও আমি নিজে আশা করি যে, অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসের তৌজী ও রিপোর্টগুলি দেখিয়া (এ কয় মাসে অতি অল্পই খাজনা বাকি পড়িয়াছে) বোর্ড তাঁহার গুণ ও সাধুতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকিবেন।" (৮ই মার্চ্চ, ১৮১০)

এবারও বোর্ড ডিগবীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

রামমোহনের নিয়োগ-সম্বন্ধে লেখালেখি করিয়া যে, কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিয়া ডিগবী দেওয়ান-পদের জন্য অন্য লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রামমোহনের দেওয়ানী লইয়া কালেক্টর ডিগবী ও বোর্ডের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল, রামমোহন

রায় প্রকৃতপক্ষে রংপুরের দেওয়ান হন নাই, তবে নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল অস্থায়িভাবে এই পদে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র। এই দেওয়ান-পদের বেতন তখনকার দিনে দেড়-শত টাকার বেশী ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় লোকও বোর্ডের চক্ষে এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই।

[ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩৬]

অধ্যাপক রমণের আবিষ্কার

১৩৩৫ সালের হেমন্ত সংখ্যা 'প্রকৃতি'তে অধ্যাপক রমণ কর্তৃক আবিষ্কৃত এক অভিনব রশ্মির অপূর্ব্ব কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। এই রশ্মি কালে যে পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে বহু সন্দেহের মীমাংসা করিতে পারিবে, অধ্যাপক মহাশয় পূর্ব্বেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি এক অতি প্রাচীন সমস্যার নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন। জল বরফে পরিণত হইলে আয়তনে বাড়িয়া যায়—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। পদার্থ সাধারণতঃ শীতল হইলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কিন্তু জল কেন এই সাধারণ রীতি উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ এ-পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু একখণ্ড বরফের এবং এক গ্লাস (কাচের) পরিষ্কার (পরিস্রুত) জলের উপর পারদপ্রদীপের তীব্র আলোক নিক্ষেপ করতঃ বিচ্ছুরিত রমণরশ্মির বর্ণলেখা গ্রহণ করিয়া উক্ত পদার্থমধ্যস্থ কণাসমূহের অবস্থান, প্রকৃতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বেন্‌জিন্, প্যারাফিন্, প্রভৃতি যে সকল পদার্থ শীতল হইলে অথবা কঠিনাকারে পরিণত হইলে আয়তনে বাড়ে, তাহাদের রমণরশ্মির বর্ণলেখাতে কতকগুলি উজ্জ্বল সূক্ষ্ম রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। জলের বেলাতে কিন্তু অনুরূপ বর্ণলেখায় দেখা যায় কতকগুলি প্রশস্ত রেখা। সেই রেখাগুলি আবার বহু সূক্ষ্ম রেখার সংমিশ্রণে গঠিত। উত্তাপ বাড়াইলে অথবা কমাইলে এই প্রশস্ত রেখাগুলির প্রস্থ, অবস্থানক্ষেত্র এবং ঔজ্জ্বল্যের আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন তাপমানের বর্ণলেখা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ফুটনবিন্দুতে (boiling point) জলের রাসায়নিক গঠন সাধারণ জল অপেক্ষা ভিন্ন। তারপর জল শীতল হইতে হইতে যখন ক্রমে তুষারবিন্দুর (freezing point) নিকট-বর্ত্তী হয়, তখন উষ্ণাবস্থার কণাগুলি সংমিশ্রিত হইয়া এক নূতন প্রকার কণার সৃষ্টি করে। সলিলকণার এইরূপ ক্রমপরিবর্ত্তন অতি নিখুঁত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। পর্য্যবেক্ষণ ফলে দেখা গিয়াছে, যখন বরফ গঠিত হইতে থাকে, তখন বর্ণলেখায় সূক্ষ্ম রেখার পরিবর্ত্তে প্রশস্ত রেখা দেখা দেয়। জলকণার এই প্রকার দেহ-বিবর্ত্তনের জন্যই নিম্ন তাপমানে সাধারণ রীতির ঐরূপ ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে।

আমরা জানি, কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের স্ফটিকদেহ গঠন-কালে জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। রমণরশ্মির সাহায্যে উক্ত জলকণারও বর্ণলেখা আলোচিত হইয়াছে; দেখা গিয়াছে, এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণলেখাতে সূক্ষ্ম রেখার অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাহাতে মনে হয়, স্ফটিকের অভ্যন্তরস্থ জলকণা বরফাকারেই বর্ত্তমান থাকে, সলিলাকারে থাকে না।

সাবানজলের বুদ্বুদ সকলেই দেখিয়াছেন। তাহার গঠনবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক রমণ এক অতি অভিনব আবিষ্কার করিয়াছেন। বুদ্বুদের ভিতর হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে পড়িতে অবশেষে উহা সূক্ষ্ম ও পাতলা হইয়া যায়; এই অবস্থায় বুদ্বুদের উপরিভাগে একটা গোল কালো দাগের আবির্ভাব হয়। এই কালো দাগটা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া কখনও কখনও অর্দ্ধ অথবা তিনপোয়া ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, তখন বুদ্বুদটা ফাটিয়া যায়। কালো দাগটা অতি সূক্ষ্ম পর্দ্দা ব্যতীত আর কিছু নহে; কিন্তু ইহারই প্রকৃতিনির্দ্দেশ এবং স্থূলতা (গভীরতা) পরিমাপ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ বহু গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। কয়েকজন পদার্থতত্ত্ববিৎ ইহার স্থূলতা নিরূপণে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহারা বলেন, পর্দ্দাটা এক ইঞ্চির $\frac{১}{২০০০০০}$ অংশ গভীর; তাহাতে মনে হয় ইহা এক অথবা দুই-সারি কণার সমষ্টি।

অধ্যাপক রমণ বলেন, সাবানের অতিসূক্ষ্ম বুদ্বুদ সাধারণ তরল পদার্থ নহে, পরন্তু তরল স্ফটিকপদার্থ মাত্র। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কঠিন স্ফটিক পদার্থের একটি খণ্ড দেখিতে যেমন হয়, ইহাও সেইরূপ হওয়া উচিত। পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপক রমণ তাঁহার এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। বুদ্বুদপৃষ্ঠে যখন কালো দাগটির আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার নির্ম্মিত দুই খণ্ড নিকোল-ত্রিশির-কাচের মধ্যে স্থাপন করিয়া পারদবাষ্প-প্রদীপজাত তীব্র আলোক সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, বুদ্বুদের গায়ে উদ্‌বৃত্তকারের (Hyperbolic) দুইটি অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে। নবনির্ম্মিত বুদ্বুদে এই বৃত্তাংশ দুইটি সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ বুদ্বুদটি যতই বিস্তৃত হইয়া পাতলা হইতে থাকে, বৃত্তাংশও ততই আলোকিত হয়। এইপ্রকার পরিবর্ত্তন হইতে সহজেই প্রতীতি হয় যে, বুদ্বুদটি ক্রমে সাধারণ তরল পদার্থ হইতে তরল স্ফটিকপদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সময়ে কালো দাগটিও অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়।

[প্রকৃতি— গ্রীষ্মসংখ্যা ১৩৩৬]

তারকার জন্ম

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত আকাশে লক্ষকোটী তারকা বিরাজমান। বর্ত্তমান কালের জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ এই নক্ষত্রপুঞ্জের গতি, অবস্থান, পরস্পর হইতে পরস্পরের দূরত্ব, নব নব
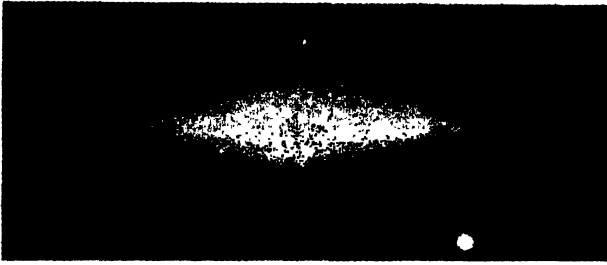
নীহারিকার শৈশব (N.G.C. 3115)

তারকার আবিষ্কার প্রভৃতি লইয়াই যে শুধু ব্যস্ত থাকেন তাহা নহে, কি কি উপাদানে এই সকল তারকা গঠিত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর তারকা কি অবস্থায় আছে, তাহাদের বিবর্ত্তনের ধারা কি প্রকার, এই সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানেই আজকাল তাঁহারা বেশী ব্যস্ত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পুরাতন আমলের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গতির মোড় ঘুরাইয়া সম্প্রতি এই নূতন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাদারফোর্ড ও টম্‌সনের নব পদার্থ-তত্ত্ব ও আইনষ্টাইনের Relativity-তত্ত্ব এই অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে ও অনেক অন্ধকারময় স্থানে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। বর্ত্তমানের স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণচ্ছত্রবিশ্লেষণযন্ত্র পুরাতন আমলের দূরবীক্ষণকে ক্রমশঃ হঠাইয়া দিতেছে। এই সকল নব আবিষ্কারের ফলে এক অত্যন্ত পুরাতন বিদ্যা আবার নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। আবহমানকাল হইতে মানুষের মনের চিরন্তনী পিপাসা—অনন্তকে সে জানিতে চায়, নিজে কোথা হইতে আসিল বুঝিতে চায়, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে সকল তথ্য আয়ত্ত করিতে চায়। এই দৃশ্যমান নক্ষত্রজগৎ কি প্রকার, ইহার আকার ও আয়তন কিরূপ এসকল বিষয় লইয়া প্রাচীন যুগের টলেমি হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সমানরূপ আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। তবে বর্ত্তমানের এই নক্ষত্রতত্ত্ব দৃশ্যমান তারকাজগৎকে বুঝিবার ও জানিবার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে ও ইহাকে নূতনরূপে আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে।

নাক্ষত্রিক-বিশ্বের আয়তন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা

নীহারিকার শৈশব—দ্বিতীয় অবস্থা (N.G.C. 4594)
(ক্রান্তি-বৃত্তস্থ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের বেড় দেখা যাইতেছে)

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত হইয়াছে এবং যত বৎসর যাইতেছে এই ধারণা ক্রমশঃ বিস্তৃততর হইয়া পড়িতেছে। এখন

কথা হইতেছে এই যে, এই বিস্তৃতি কতদিন ধরিয়া চলিবে? প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Jeans বলেন যে, ইহা চিরকাল চলিতে পারে না, শীঘ্রই আমরা ইহার সীমারেখাতে পৌছিয়া যাইব। আইনষ্টাইনের Theory of Relativity অনুসারে মহাকাশ অসীম নহে—সীমাবদ্ধ; যদিও এমন কোনও স্থান নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না এই বিস্তৃত স্থানের এমন কোনও স্থানে, যেখান হইতে বলা যাইতে পারে বিশ্বের সীমা এইখানে, ইহার পর আর বিশ্ব নাই। আমাদের পৃথিবী যেমন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক স্থানযুক্ত বটে কিন্তু কেহ ইহার কোথাও দাঁড়ি টানিয়া বলিতে পারে না এইখানে পৃথিবী শেষ হইয়া গেল, মহাকাশের ব্যাপারও তদ্রূপ। ইহার বক্রতা দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ, যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতা দ্বারা এই অনুমান করা শিশুর পক্ষেও সহজ যে কোন না কোন স্থানে দুইমুখ এক হইবেই, মহাকাশের এই বক্রতা পণ্ডিতগণকে সেই সিদ্ধান্তেই লইয়া গিয়া ফেলিতেছে।

ঠিক করিয়া কোনো সংখ্যা বলা না গেলেও ডাঃ হাব্‌ল্ গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা আকাশের যে সর্ব্বাপেক্ষা দূরের নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবী হইতে তাহার যে দূরত্ব, মহাকাশের বিস্তৃতির সীমা তদপেক্ষা হাজার গুণের বেশী নহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সুদূরতম নীহারিকার দূরত্বকে যদি মাপকাঠি ধরিয়া লওয়া যায় তবে একহাজার মাপকাঠি গুণিয়া শেষ হইবে যে বিন্দুতে, মহাকাশের আনুমানিক সীমা মোটামুটি সেই বিন্দু পর্য্যন্ত।

আলো ও বেতার বার্ত্তার ঢেউ সমানবেগে ধাবিত হয়, কারণ উভয়েই আসলে একই বস্তু। সমগ্র পৃথিবীটা একবার ঘুরিয়া আসিতে এই উভয় বস্তুই এক সেকেণ্ডের সাতভাগের এক ভাগ মাত্র সময় লইয়া থাকে এবং সমগ্র বিশ্বের চারিধার একবার ঘুরিয়া আসিতে সেই স্থানে লয় প্রায় একহাজার কোটী বৎসর। যদি পৃথিবীটাকে একটা পরমাণু কল্পনা করা যায় যাহার ব্যাস এক ইঞ্চির একশত কোটী ভাগের একভাগ মাত্র, তাহা হইলে সেই অনুপাতে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ যোগে যতদূর দৃষ্টি চলে তাহার পরিমাণ হইবে আমাদের এই পৃথিবীর মত, ও Theory of Relativity অনুসারে সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটার আয়তন হইবে একশত কোটী পৃথিবী একসঙ্গে তাল পাকাইয়া রাখিলে যত বড় হয় তত বড়! এই সমুদয় আয়তন ও দূরত্বের বিপুলতার বিষয় ধারণা করিতে গেলে মানুষের কল্পনা স্তম্ভিত, হতভম্ব হইয়া পড়ে।

শুধু যে মহাকাশের আয়তনই এরূপ বিশাল তাহা নয়, যে বিপুল বস্তুসম্ভার ইহার নানাস্থানে ইতস্ততঃ ছড়ানো
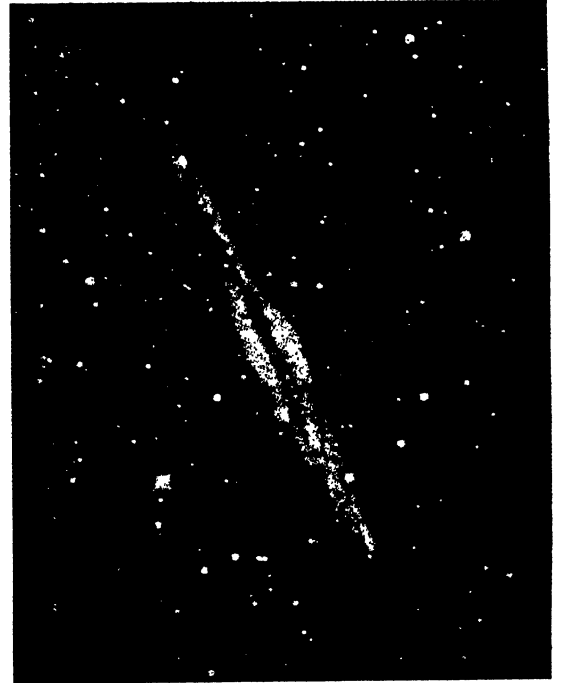
বিচক্র নীহারিকা (Spiral Nebula N.G.C. 891)
আড়ভাবে দেখা যাইতেছে।

আছে, তাহাদের পরিমাণের বিষয় চিন্তা করিতে গেলেও দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। যে সূর্য্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা আয়তনে দশ লক্ষ গুণ বড় ও তিন লক্ষ গুণ বস্তুভার-সমৃদ্ধ, তাহা এই বিপুল মহাকাশজলধিবেলার এক ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র। এই সূর্য্য যে শ্রেণীর তারকা, অনন্ত আকাশে সে শ্রেণীর তারকা যে কত কোটী আছে তাহার স্থিরতা নাই। ডাঃ সিয়াসের গণনানুসারে এই শ্রেণীতে

অন্ততঃ তিনশত কোটী তারকা আছে। কিন্তু এই বিশেষ শ্রেণী ছাড়া আকাশে আরও নানা শ্রেণীর তারকা বর্ত্তমান এবং তাহা ছাড়া প্রত্যেকটী নীহারিকা ও ছায়াপথের সীমার বহির্ভূত অন্যান্য Spiral Nebula সমূহও রাশি রাশি

বিচক্র নীহারিকা (Spiral Nebula—M. 81)
সপ্তর্ষি মণ্ডলে (Ursa Major) অবস্থিত নীহারিকা।

তারকাপুঞ্জের সম্মিলন মাত্র। কোনো কোনো স্থানে এই সকল তারকা এখনও বিবর্ত্তনের নিম্ন ধাপে অবস্থিত, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহারাও তারকা হইয়া উঠিবে। কুম্ভকারের চক্রে মৃৎপিণ্ডের মত তাহাদের স্থান এখনও বিশ্বগঠনের সর্ব্ব নিম্ন কোঠায়। পণ্ডিতেরা এই সকল নীহারিকার প্রত্যেকটীর মধ্যে কতটা বস্তু আছে তাহা গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক একটী নীহারিকার দ্বারা আমাদের সূর্য্যের ন্যায় একশত কোটী সূর্য্যের গঠন সম্ভবপর হইতে পারে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে এই নীহারিকা গুলি কত বড়। এই প্রবন্ধের ফটোগ্রাফ- গুলির আয়তন বাড়াইয়া যদি এসিয়া মহাদেশের সমান করা যায় তবে পৃথিবীর মত আয়তন বিশিষ্ট কোনো বস্তু উহাদের পৃষ্ঠে পরিদৃশ্যমান হইবে খালিচোখে নয়, অত্যন্ত শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে!

ডাঃ হাব্‌ল্‌, মাউণ্ট্‌ উইল্‌সন্‌ অবজারভেটারীর ১০০-ইঞ্চ দূরবীক্ষণ সাহায্যে এরূপ আয়তনের প্রায় বিশলক্ষ নীহারিকা বাহির করিয়াছেন, যদিও সমগ্র বিশ্বের একহাজার কোটী ভাগের একভাগ মাত্র এই দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একহাজার কোটীকে যদি বিশ লক্ষ দ্বারা গুণ করা যায় এবং ঐ গুণফলকে যদি পুনরায় একহাজার কোটী দ্বারা গুণ করা যায় তবে যে গুণফল দাঁড়াইবে, আমাদের এই দৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ততগুলি। অতগুলি বালুকণা যদি বাংলাদেশের উপর ছড়াইয়া দেওয়া যায় তবে সমগ্র বঙ্গভূমি শত শত ফুট উচ্চ বালুকাস্তূপের মধ্যে প্রোথিত হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে,এই অনুপাতে আমাদের পৃথিবীর আয়তন উক্ত বালুকাস্তূপের এককণা বালুকার দশলক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র।

নীহারিকা হইতেই যে তারকাদল উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। সাধারণতঃ Spiral আকৃতির নীহারিকা হইতেই এ ঘটনা সম্ভবপর হয়। এই সকল নীহারিকা নানা আকৃতির হইয়া থাকে,

তবে সাধারণতঃ ইহারা সকলেই অতি বিশাল বাষ্প-পিণ্ড এবং প্রত্যেকেই নানারূপ বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং এই ঘূর্ণনবেগের বিভিন্নতা হেতু ইহাদের আকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। যে বাষ্পপিণ্ডের ঘূর্ণন নাই, তাহার আকৃতি
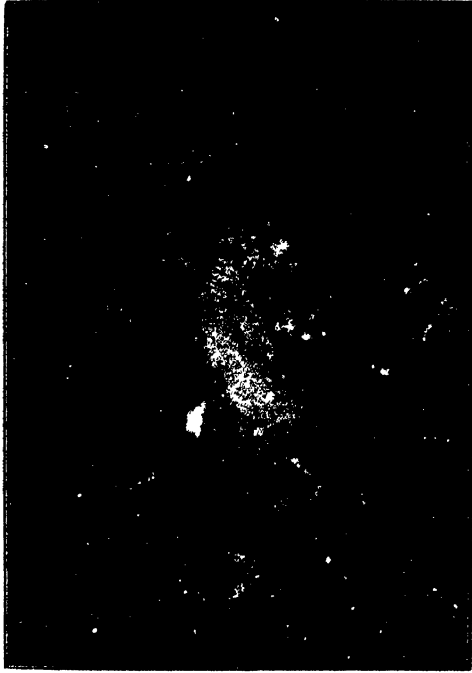
Greater Magellanic Cloud নামক নক্ষত্র-পুঞ্জের এক অংশ

(নীহারিকার শেষ পরিণতি। নীহারিকাটি ভাঙ্গিয়া গিয়া অসংখ্য নক্ষত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।)

হইবে গোল কিন্তু ঘুরিতে আরম্ভ করিলেই তাহার আকৃতি ক্রমশঃ চেপ্টা হইতে থাকিবে এবং পরিশেষে খুব পাৎলা একখানা থালার আকৃতি ধারণ করিবে। এই প্রবন্ধের ১ হইতে ৪ সংখ্যক ছবিতে যে নীহারিকাগুলির ফটোগ্রাফ দেওয়া আছে, উহা এই পদ্ধতির ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ নং নীহারিকাটীতে (N. G. C. 3115) এই কার্য্য সবে সুরু হইয়াছে, ২ নংএ (N. G. C. 4594) ব্যাপার কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, ৩ নংএ ও ৪ নংএ এই পদ্ধতির শেষক্রম, নীহারিকা দুটী অত্যন্ত পাৎলা ও চেপ্টা হইয়া গিয়াছে (N. G. C. 891 ও M. 81)। এইবার এই পাৎলা থালাখানি ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ডে পরিণত হইবে, এই প্রত্যেক বাষ্পপিণ্ড এক একটা শিশু তারকা। ৪ নং ছবির নীহারিকাটী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ইহার মধ্যে ও চারিপাশে এরূপ তারকা বিন্দুর সৃষ্টি সুরু হইয়াছে। ৫ নং ছবিতে এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি দেখানো হইতেছে। এই ছবিতে দেখা যাইবে যে, নীহারিকাটী অনেককাল পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ তারকায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং এই ফটোগ্রাফে (The Greater Magellanic Cloud) শুধুই তারকা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে Sir J. H. Jeans বলেন, "Our galactic system of stars is probably the final product of just such a transformation, the Milky Way still recording the position of the equitorial plane of the original nebula." অর্থাৎ—আমরা যে নক্ষত্র জগতের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও অতীতযুগের এক নীহারিকা

বিচক্র নীহারিকা (Spiral Nebula-N. G. C. 7217)
সামনা-সামনি দেখা যাইতেছে।

হইতে ঠিক এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হইয়াছে ও বর্ত্তমানে ছায়াপথ সেই আদিম নীহারিকার ক্রান্তিবৃত্তের অবস্থিতি স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন প্রায় আটলক্ষ কোটী বৎসর পূর্ব্বে মহাকাশের এই অঞ্চলে এক ঘূর্ণায়মান নীহারিকা ভাঙ্গিয়া গিয়া আমাদের সূর্য্য ও চারিপাশের তারকারাজির সৃষ্টি করিয়াছে।
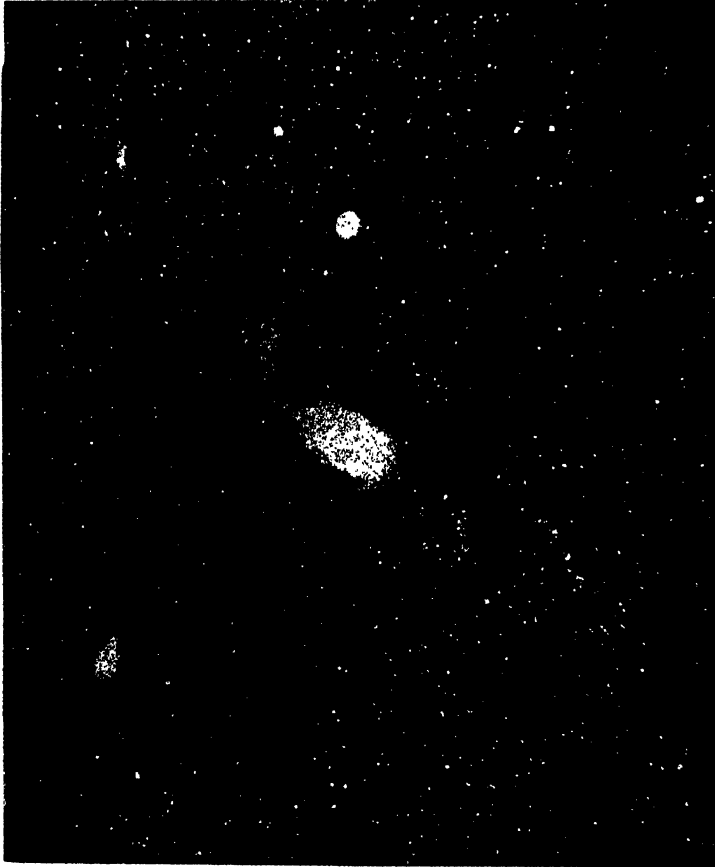
উত্তর ভাদ্রপদ (Andromeda) নক্ষত্র-পুঞ্জস্থিত বিরাট নীহারিকা

অবশ্য উপরে মাত্র এক শ্রেণীর তারকার কথা বলা হইল। তারকার নানাবিধ শ্রেণী আছে এবং শ্রেণীভেদে তাহাদের বয়সেরও তারতম্য আছে। তারকার বয়স বলা গেলেও, যে বস্তুতে তারকার জন্ম তাহা নীহারিকা অবস্থাতে কতকাল কাটাইয়াছে তাহা আদৌ বলা যায় না। বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ কোন সময় হইতে, ব্রহ্মার সৃজন দিবসের সে ঊষা কতকাল আগে মহাকালসমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান সে বিষয়ে কোনো আলোকপাত করিতে পারে না। একথাও বলা যায় না যে, এই সৃষ্টিটা হঠাৎ একসময়ে একদিন ঘটিয়াছিল বা ধীরে ধীরে সুনির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে দৃষ্টির গোচর ও অগোচর এই বিশাল বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

উত্তর-কুইন্স্‌ল্যাণ্ড্

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত

যাঁহারা প্রবন্ধের নাম শুনিয়া পাতা উল্টাইয়া চলিয়া যাইবেন তাঁহাদিগের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন নারিকেলের গঠন-বৈশিষ্ট্যটি স্মরণ করেন। বহি-রাবরণের নীরসতার জন্য যেমন তাহাকে কেহ ত্যাগ করে না, তেমনি আমারও আশা আছে যে এই প্রবন্ধকেও একটি ভৌগোলিক-বিবরণমাত্র মনে করিয়া কেহ অবহেলা

করিবেন না। নিতান্ত ধৈর্য্য না থাকে, দশম অনুচ্ছেদ (paragraph) হইতে আরম্ভ করিবেন।

অষ্ট্রেলিয়ার যে অংশের পরিচয় দিতে বসিয়াছি, উহা খনিজ পদার্থের ঐশ্বর্য্যে, উদ্ভিজ্জ ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্যে, ভূমির উর্ব্বরতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই মহাদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান, ইহার নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, লোক-সংখ্যা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা, পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নীরস প্রসঙ্গগুলি ভূগোল ও ইতিহাস-লেখকদের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আমরা

নদী ও নদী-সৈকত

এই অঞ্চলটির একটা বর্ণনাত্মক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। যাহারা তাহার অতিরিক্ত কিছু চাহেন, সবিনয়ে তাঁহাদিগকে 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রীটানিকা'র পাতা উল্টাইতে অনুরোধ করি।

স্থলপথে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাভিমুখে রেলপথে ভ্রমণ করিলে অনেকটা এইরকম দৃশ্যাবলী আমাদের নয়ন-গোচর হইবে:—

ট্রেণে চড়িয়া আমরা 'টাউন্‌সভিল্' হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলাম। দু'ধারে চমৎকার গ্রাম্য দৃশ্য। দিনের আলোয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সুপ্রকাশিত হইয়াছে। সমতল ভূমির উপর দিয়া লৌহবর্ত্ম চলিয়াছে। দুই পাশে, পথের মধ্যে মধ্যে, খরস্রোতা স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী, অগভীর হ্রদ ও নৃত্য-চটুলা উপলবহুলা ঝর্ণা। হ্রদের বুকে বিবিধ বর্ণের জলকুমুদ, বিচিত্র ভূষায় সজ্জিত বালক বালিকাদের মত সমীরণের দোলায় হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতেছে! 'রোলিং-ষ্টোন্' সহরটি পার হইলে গ্রীষ্ম-প্রধানদেশের বৈশিষ্ট্যময় শোভা নয়নগোচর হইতে থাকে। বৃক্ষলতাদি চিক্কণ-শ্যাম-পত্রাচ্ছাদিত; বন্ধুর-ভূমি-প্রবাহিণী নির্ম্মল-সলিলা নদীর উপরে গাছপালা নুইয়া পড়িয়াছে; বুঝি তাহারা আর্শির মত এমন পরিষ্কার জলস্রোতে নিজেদের মুখচ্ছবি দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছে না। দীর্ঘ-শির তরুদল অরণ্যানীর মধ্য হইতে সুনীল আকাশকে দেখিবার ব্যগ্রতা লইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে! এই অঞ্চলে তালীবনও বিরল নহে। কোথাও কোথাও গহন বনের শোভার পর-ই কুটির-কোণের শান্তি-চিত্র।

দুই-চারিটি পর্ণ-কুটির একটা মাঠের মাঝখানে বসিয়া জটলা করিতেছে, যেন বয়োবৃদ্ধ ঠাকুরদাদার দল,—নড়িবার নামটি নাই, চাঞ্চল্যের লেশটুকুও নাই। যেন হাতে হুঁকা,—দাবাখেলাটা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। কুটিরগুলিকে পরিবেষ্টন করিয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যময় কুসুম-সুষমা-সমৃদ্ধ যত্ন-রচিত উদ্যান-নিচয়। যেন, ঠাকুরদাদাদের ঘিরিয়া তাঁহাদের সুন্দর সুন্দর নাতি-নাতিনীগুলি! তাহাদের হাতে হুঁকা নাই, সাম্‌নে দাবার ছক্ নাই, ঘুঁটির চালের জটিলতা মাথার মধ্যে জমাট বাঁধে নাই,—হাসিয়া খেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া তাহারা আপন মনেই মাতিয়া আছে!

এইভাবে তর্‌তর্‌ করিয়া একটির পর একটি নয়ন-রঞ্জক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে না-জানি কখন আমরা 'সাউথ-ইন্‌হাম্‌' শহরে উপস্থিত হইলাম। বিস্তীর্ণ ছায়াতরু, বিশাল বেণুবন, নিবিড় আম্রকুঞ্জ, দীর্ঘ দেবদারু, রোরুদ্যমান ঝাউগাছ, (দিবা-রাত্র বাতাস আসিয়া তাহার শাখায় শাখায় ক্রন্দনের কম্পন-ধ্বনি তুলিতেছে), সমস্ত মিলিয়া শহরটিকে আর শহর রাখে নাই, একটি কুঞ্জ-কাননে পরিণত করিয়াছে! নানাবিধ ফলের গাছ, ফুলের চারা, এই কুঞ্জের মনোহারিত্ব বাড়াইয়াছে।

'ইন্‌হাম্‌' শহরটি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অংশ অতি সুন্দর এবং একটি সুদৃশ্য জল-প্রণালী শহরটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। পশ্চিম-খণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত অট্টালিকা ও ছায়াশীতল রাজপথসমূহ আছে।

এখানে অনেকগুলি চিনির কল এবং পশু-পালকের অবস্থান। চতুর্দ্দিকের চারণ-ভূমিতে দুগ্ধবতী গাভী দৃষ্ট হয়। এখানকার মাটি কৃষ্ণবর্ণ এবং সাতিশয় উর্ব্বর। এক সময়ে এই শহরের অনেকখানি জুড়িয়া আখের চাষ হইত। এখান হইতে সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত একটি সরু ট্রাম্‌রাস্তা আছে, এই ট্রাম্‌-রাস্তা 'হ্যালিফ্যাক্স্‌' বন্দরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই বন্দরটিতে জগতের সর্ব্বদেশের অধিবাসীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিবিধ বন্যজন্তু-পূর্ণ অরণ্য ও নক্র-সঙ্কুল নদী-বিশিষ্ট 'আফ্রিকা' মহাদেশের সহিত এই অঞ্চলের একটি সাদৃশ্য আছে। শীতের সময় বিশালকায় কুম্ভীরেরা জলগর্ভ হইতে উঠিয়া নদীর উভয় পার্শ্বে ও সাগরতীরে রৌদ্রোপ-ভোগ করিতে আসে। সেই সময় শিকারীর দল ইহাদিগকে অতি সহজেই নিহত করে। বৎসরের অন্যান্য ঋতুতেও এই কুম্ভীর-শিকার যে চলে না তাহা নয়, তবে তখন এই সব জল-মগ্ন জলচরদিগকে হত্যা করা বিশেষ দুরূহ-ই হইয়া থাকে। শিকারীদের আর-একটি বিচরণ-ক্ষেত্র—এখানকার সরোবরগুলি। সেখানে নানাবিধ জলচর পক্ষী পাওয়া যায়; তন্মধ্যে হংস-ই প্রধান।

'ইন্‌হাম' ছাড়াইয়া উত্তরদিকে পুনরায় রেলপথে গেলে দুইপার্শ্বে ইক্ষু-ক্ষেত্র ও পশু-পালন-ভূমি পড়ে। রেল-পথ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে জল-পথে 'হিন্‌চিন্‌ব্রুক্‌'-প্রণালী দিয়া লোকে যাতায়াত করিত। তাহাতে জলের শোভা ও উভয়-কূলের স্থলের শোভা দৃষ্টি-গোচর হইলেও রেলপথে ভূমির যে বৈচিত্র্য নয়ন ও মনকে বিমুগ্ধ করে, যাত্রীরা তাহা হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইত। তথাপি আমরা 'হিন্‌চিন্‌ব্রুক্‌' প্রণালীর একটি আলোক-চিত্র এখানে দিলাম। দিগন্ত-প্রসারিত জলরাশি; তাহার মধ্যে মধ্যে বিরল-তরু পর্ব্বত; এই উন্মুক্ত প্রশান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া একটি যাত্রী-বোঝাই পাল-তোলা জাহাজ চলিয়াছে!

উত্তরে, আরো উত্তরে, স্থলের সৌন্দর্য্য ও উর্ব্বরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। জগতের অন্য কোথাও এমন সুন্দর, এমন উর্ব্বর ভূমিখণ্ড আছে কিনা সন্দেহ। কৃষি-কার্য্যের দ্বারা এই উর্ব্বর ভূমিতে সোনা ফলাইবার ভার গ্রহণ করা মানবের পক্ষে এতদিন সম্ভব হয় নাই। ভূমি ছিল, তাহার উর্ব্বরতা-ও ছিল, কিন্তু ছিলনা মানুষ! রেল-পথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে আসিল তাহার সৃজনের সোনার-কাঠি লইয়া, রূপ-কথার নিদ্রিতা রূপ-কুমারীর পালঙ্কপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল সাত-সমুদ্র-তের-নদী-পারের রূপকুমার! উর্ব্বরা ধরিত্রীর উষর বুকের ধূসর বেশ ঘুচাইয়া

একটি 'গেছো' ক্যাঙ্গারু

মানব সেখানে শ্যামল শোভার সঞ্চার করিল। মাটির দুলালেরা মাটি-মায়ের বুকখানিকে ছায়া-মায়াবিনী করিয়া তুলিল!

এইভাবে 'টুলি' নগর ও তাহার পর 'ইনিস্ফেল্' নগরে আমরা পৌঁছাই। কোটি-কোটি-মুদ্রা-সমৃদ্ধ এই 'ইনিস্ফেল্' নগরের একটু ইতিহাস আছে। এই শহরের সমস্ত রাস্তাটি সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত। এ-টি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি, ইহার কর্ম্মিষ্ঠ অধিবাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে লক্ষ্মীর উন্মুক্ত স্বর্ণ-ঝাঁপির প্রসাদ-পরিবেষণে ধন্য! পৃথিবীর মধ্যে যে-সকল স্থান পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য-ভূমি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে 'আয়র্ল্যাণ্ডের' ইনিস্ফেল্ তাহার অন্যতম। কুইন্স্ল্যাণ্ডের 'ইনিস্ফেল্', আয়র্ল্যাণ্ডের নিকট হইতে নাম ধার করিয়া গৌরবান্বিত হয় নাই, আয়র্ল্যাণ্ডকে-ই গৌরবান্বিত করিয়াছে!

পর্ব্বত,—পর্ব্বতসানুচুম্বী উপত্যকা, একটি প্রশস্ত শাখা-বহুল বিশাল প্রবাহিণী, ঘনসন্নিবিষ্ট ইক্ষু-কুঞ্জ, বর্ণ-বৈচিত্র্য-শালী পুষ্প-মালঞ্চ, শ্যামলোজ্জ্বল ক্রম-নিম্ন ভূমি, রাঙা-কাঁকরের পথঘাট, অদূরের সমুদ্র-শোভা, সমস্ত মিলিয়া সমতলভূমি হইতে ইনিস্ফেল্ নগরীটিকে একটি স্বপ্নরাজ্যে পরিণত করিয়াছে এবং পর্ব্বত-চূড়া হইতে দেখিলে সে দৃশ্য আরও রমণীয় হইয়া উঠে! ফুল-মধু'র লোভে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল আসিয়া ফুল-মালঞ্চে ভীড় করে, স্থানীয় সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধির লোভে তেমনি লোলুপ মনুষ্যকুল আসিয়া অচিরেই বুঝিবা এই সৌন্দর্য্য-ভূমির মাধুরী ঢাকিয়া ফেলে! জন-সংখ্যা বাড়িতেছে, আর তাহার সমান অনুপাতে বাড়িতেছে ইঁট-কাঠের স্তূপের সংখ্যা। শ্যামল প্রান্তর কুশ্রী ইষ্টক-স্তূপে ভরিয়া উঠিতেছে, শ্যামবনানীর মাথা মুড়াইয়া মানুষ সেখানে ঘোল ঢালিতেছে,—ফলে, গজাইয়া উঠিতেছে ধূমোদ্গারী বিকট-দশন অগ্নি-জিহ্ব লোহার চোঙা,—কল্কারখানার চিম্নী,—অসভ্য মানবসভ্যতার প্রতীক! শ্যামা, দধিয়াল, পিক্, চন্দনার কল-কাকলী নিমজ্জিত করিয়া মানুষের তৈরী মোটর-গাড়ীর হর্ণ, ইঞ্জিনের হুশ্-হুশ্ শব্দ ধ্বনিত হইতেছে; নীল-নির্ম্মল গগন-শোভা মানুষের তৈরী কারখানার কৃষ্ণ-ধূম্রে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে; প্রকৃতির দুলালী' তরঙ্গিণীর বক্ষ চিরিয়া সাহেবের 'মোটর-বোট্' ছুটিতেছে; বনের হরিণ যম-রাজের গৃহ-কোণ আশ্রয় করিয়াছে; প্রকৃতি-সরল অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী-দিগকে ধরার বক্ষ হইতে অপসৃত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। অমনি কত দেশের প্রকৃতি-শোভার উপর দর্পী নরের নিষ্ঠুর হস্ত হৃদয়হীন অত্যাচারের দ্বারা যে তুমুল ঝড় বহাইয়া দিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা রাখে! সভ্যতা-গর্ব্বী ভ্রান্ত মানব সন্তানের স্বার্থপরতায় প্রকৃতি দেবীকে যে কত জায়গা হইতে বিতাড়িত হইয়া মানুষের অগোচর, সুদূর বন-কান্তারে পলাইয়া গিয়া

হিন্ চিন্‌ব্রুক প্রণালী

চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে হইয়াছে সে কথা কে ভাবে! স্বার্থের যূপ-কাষ্ঠে মানুষ স্বাস্থ্য বলি দিতেছে। যখন-ই শুনি, কোন স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যশালী ভূমিখণ্ডে নগর নির্ম্মাণ হইতেছে, যখন-ই পড়ি কোন দেশে সরল-প্রকৃতির দুলাল আদিম অধিবাসীদিগকে সভ্য করিবার জন্য, ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য, উন্নত করিবার জন্য, মানুষ আদা-জল খাইয়া লাগিয়াছে, তখন-ই মানবের প্রতি মানবের এই শত্রুতায় মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

নির্ঝরিণী

আমরা রেলপথে বিচরণ করিতে করিতে চিন্তারাজ্যে খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। রেলপথ সে দেশ দিয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহার কাছা-কাছি আনিয়া আমাদিগকে নামাইয়া দিয়াছে। ঐ ভ্রমণটুকু সেইজন্য বাষ্পরথে না করিয়া মনোরথেই সমাপ্ত করিতে হইল।

'ইনিস্‌ফেল' হইতে বাহির হইয়া গভীর সমুদ্রোপকূলস্থিত বন্দর পর্য্যন্ত একটি ট্রামরাস্তা গিয়াছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "See Naples and die," (নেপ্‌ল্‌স্ নগর দেখিয়া তবে মরিয়ো)। ইহা দ্বারা বুঝায় যে স্বর্গে বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত মর্ত্তে যদি কোন স্মৃতি থাকে, তবে সে স্মৃতি 'নেপ্‌ল্‌সের' সৌন্দর্য্যের। 'ইনিস্‌ফেলের' অদূরবর্ত্তী 'মৌরিলিয়েন্' সমুদ্রবন্দরটি সেইরূপ একটি নেপ্‌ল্‌স্।

ইহার পর 'কেয়ার্ণ্‌স্' নগর। 'কেয়ার্ণস্' নগরীটির একটি প্রাচীন শাসন-কর্ত্তার নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রতীরস্থ এই নগরীটি একটি ভাল বন্দরও বটে। পথঘাটের কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের দ্বারা মানুষ এই সহরটিকে রমাদশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু যাহার দেখিবার চক্ষু আছে সে উহা লইয়া এখানে বসিয়া থাকিবে না। নগরের সীমার বাহিরে, যেখানে বিশাল প্রান্তর আপন মনে সারাদিন ঊর্দ্ধে চাহিয়া আকাশের স্বপ্ন দেখিতেছে, যেখানে কাহার ফরমাসে কে জানে, নৃত্য-নিপুণা নির্ঝরিণী দিবানিশি উপল-নূপুর-ঝঙ্কারে শ্যাম-বনানীর রম্য নাট্যশালা মুখরিত করিতেছে, নয়নের সার্থকতা হইবে সেইখানে। আমরা তাহারি বর্ণনা করিব; সেই অনুপম সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ ভাষায় ও চিত্রে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইব। তাহারি উপক্রমণিকায় আমরা একটি নির্ঝরিণীর চিত্র দিলাম।

" অন্ধকারের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া যূথিকা-শুভ্র, কুন্দ-কুসুম-পেলবা যেন কোন নটী নামিয়াছে, কটিতে তাহার দিগন্তশায়ী শ্যামবনানীর কৃষ্ণ-মেখলা, নৃত্যোচ্ছল চরণ-ভঙ্গে উজ্জ্বল জলকণার জ্যোতি-তরঙ্গ, এলায়িত কৃষ্ণ-কুন্তলের পাশ দিয়া দুগ্ধ-ফেননিভ শুভ্র ওড়্না খসিয়া পড়িয়াছে, একটি বিজলী দীপ্তির মত সমগ্র তরুলতা নানা বিভঙ্গে তরঙ্গায়িত। পটদৃশ্যে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় বনভূমি, পদতলে ঘনকৃষ্ণ পাষাণ

স্তূপ,—যেন কোন বন-বালা মনের ভুলে পাষাণ-বক্ষে পদার্পণ করিয়াছে ; তাহার লীলা-মঞ্জুল চকিত চরণ, শিলা-স্তূপ চুম্বন করিয়া বিচিত্র নৃত্যভঙ্গীর সৃষ্টি করিয়াছে ! বনের বালা সে, সবুজ পাতায় সবুজ লতায় ঢাকা তাহার শ্যাম তপোবন,—বন-বিহগের কূজন-মুখর, চন্দন-বন-গন্ধবাহী মলয় সমীরণ তাহার কিঙ্কর, কঠিন-বুক্ষ শিলার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই,—পথ ভুলিয়া সে পাষাণ-স্তূপে পা দিয়াছিল, তাই বুঝি সে ছুটিয়া পলাইতে চায়,—উপল হইতে উপলান্তরে নাচিয়া, শিলা হইতে শিলান্তরে ছুটিয়া, তড়িৎ-চরণে সে মুক্তি-পথের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে ! পাষাণের বুক তাহাকে বাঁধিতে পারিল না, শিলার আকুতি তাহাকে রাখিতে পারিল না, সে ছুটিয়া যাইবেই—কিন্তু যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে পাষাণের বক্ষে ফুল ফুটাইয়া গেল ! সমস্ত শিলাভূমি তাহার নৃত্যচ্ছন্দে সুরের রাজ্যে পরিণত হইল। যে উপল তাহাকে বাধা দিতে গেল, সে-ই তাহার লাস্যরত চরণ-চুম্বনে স্বর্ণতন্ত্রী বীণার মত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল ! যে পাষাণের উদ্যত-বাহু তাহার গতিরোধ করিতে চাহিল, সুন্দরী তাহার-ই কৃষ্ণগাত্রে যেন একমুঠি বেলি-যূঁই ছড়াইয়া দিয়া রঙ্গভরে আর একদিক দিয়া পলাইয়া গেল ! তাহার পুলক-হাস্যে, তাহার রঙ্গলাস্যে পর্ব্বত-সানু চঞ্চল হইয়া উঠিল !

হার্বার্টান্

একটি জলপ্রপাত.

পাঠকগণ ! মার্জ্জনা করিবেন, কল্পনার ভূত আমাদিগকে ঘাড়ে করিয়া অনেকটা অবান্তর প্রসঙ্গের অপথে-

বিপথে ঘুরাইয়া আনিল, নহিলে আমরা নিশ্চয়-ই এতক্ষণ 'হার্বার্টানে' পৌঁছিতাম। এই শহরটি টিন ও তামার খনির জন্য বিখ্যাত। ভূমির উর্ব্বরতা এ অঞ্চলে কিছু কম, কিন্তু খনিজ সমৃদ্ধি সে অভাব যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করিয়াছে। হার্বার্টান যাইবার পথে এক জায়গায় রেল-পথ একটি জল-প্রপাতের অতিশয় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। জল লইবার জন্য রেলগাড়ী সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। যাত্রীরা সেই অবকাশে উৎসারিত স্নিগ্ধ-শীতল জলকণার শৈত্য উপভোগ করে।

উত্তর-কুইন্স্‌ল্যাণ্ডে এইরূপ বিবিধ আকর্ষণ থাকায় অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণকারীরা এই অঞ্চলটিতেই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ করিয়া থাকেন। আমরা কতকটা-পথের মাত্র বৃত্তান্ত দিলাম। দৃশ্য দেখিতে ক্লান্তিবোধ হয় না সত্য, কিন্তু কালো-কালীর খোঁচা খোঁচা 'হরফে' কেবল তাহার বর্ণনা পড়িতে ক্লান্তিবোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, সুতরাং আমরা এইখানেই বিরত হইলাম।

মণিভঙের রাজ্যাভিষেক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

সম্প্রতি মহাসমারোহের সহিত কাম্বোডিয়ার রাজা শিশোয়াথ মণিভঙের রাজ্যাভিষেক হইয়া গিয়াছে। রাজ-জ্যোতিষীগণ পূর্ব্ব হইতেই পঞ্জিকা দেখিয়া গণনা করিয়া অভিষেকের শুভলগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অভিষেকের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে রাজপ্রাসাদ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সমস্ত প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ যথাযথ ভাবে পুষ্প পতাকা ইত্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ভূতপ্রেতাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহাদের উদ্দেশে ফল ফুল ইত্যাদি অর্ঘ্যের আয়োজনও ছিল।

অভিষেকের দিন সম্রাট সিংহাসনকক্ষ হইতে রাজবেশে বিভূষিত হইয়া পারিষদগণ সহ নগর প্রদক্ষিণ করেন। সম্রাট স্বয়ং একটি সুসজ্জিত পালকীতে আরোহণ করেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহাদের পদোচিত বিভিন্ন প্রকারের ছত্রতলে সম্রাটের পালকীর সহিত অগ্রসর হন। নগর প্রদক্ষিণের পর একটি সুসজ্জিত বেদির উপর সম্রাট আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে তাঁহার মস্তকোপরি শুদ্ধিজল প্রদান করা হয়। কাম্বোডিয়া ইণ্ডোচায়নায় ফরাসীদের আশ্রিত রাজ্য। সেইজন্য প্রথমে ফরাসী রাজপ্রতিনিধি শুদ্ধিজল দিয়া থাকেন তাহার পর আট জন রাজপুরোহিত অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অভিষেকান্তে সকলে সিংহাসনকক্ষে গমন করেন। সকলের মস্তকেই নানা প্রকারের ছত্র। সম্রাটের মস্তকোপরি সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজছত্র থাকে। রাজছত্রটি স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত। সম্রাট সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিলে ফরাসীরাজপ্রতিনিধি সম্রাটের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দেন এবং হস্তে রাজ-তরবারী প্রদান করেন। এই সময়ে চারিদিক হইতে শঙ্খধ্বনি হইয়া উঠে এবং ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, আজ হইতে শিশোয়াথ মণিভঙ্ কাম্বোডিয়ার রাজা হইলেন। ঘোষণার পর পুরোহিতগণ পুনরায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় হইতেই অভিষেকের জন্য পুরোহিত নির্ব্বাচিত করা হয়।

সিংহাসনকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া সম্রাট যখন সভাসদ্‌গণসহ শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন সেই সময়ে নাগরিক ও প্রজাগণ উৎসব-কালোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পথিমধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সম্রাট নানাপ্রকার উপহার প্রদান করেন।

শোভাযাত্রার সময়ে সম্রাটের পুরোভাগে কেহ বা পতাকা

লইয়া কেহ বা ছত্র ধারণ করিয়া, কাহারও হস্তে চামর, কাহারও হস্তে ময়ূরপুচ্ছ, কেহ বা শিঙ্গা বাজাইতেছেন, কেহ বা বন্দুক, কেহ বা ড্রাগন অঙ্কিত নিশান ইত্যাদি লইয়া অগ্রসর হন। সৈন্য সামন্ত ইত্যাদি যদিও থাকেনা, তথাপি একদল বন্দুকধারী অশ্বারোহী থাকে। রাজা ব্যতীত সকলেই পদব্রজে গমন করেন। প্রাদেশিক প্রতিনিধিবর্গ, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, রাজপরিবারের প্রাচীন ব্যক্তিগণ, রাজমন্ত্রীগণ শোভাযাত্রার সহিত গমন করেন। সম্রাটের পশ্চাদভাগে হস্তী, অশ্ব, রথ ইত্যাদি থাকে। রাজকঞ্চুকী স্বর্ণপাত্রে পুষ্পরাজি লইয়া সম্রাটের পার্শ্বে থাকে। পুষ্পগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত, শোভাযাত্রার সময়ে সম্রাট সেই পুষ্প জনতার উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে যান। রাজভৃত্যগণ আশাশোটা ইত্যাদি রাজচিহ্ন লইয়া যায়। সকলের পিছনে হস্তীর দল থাকে; তাহার মধ্যে তিনটি শ্বেত হস্তী এবং আর একটি হস্তী বুদ্ধমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যায়।

সম্রাট শিশোয়াথের মহিষী

শোভাযাত্রার পথে একটি সেতু আছে,—সেই সেতুটির অপর পার্শ্বে ফরাসী রেসিডেণ্ট ইত্যাদি সম্রাটের প্রতীক্ষায় থাকেন। রাজা বেদী গ্রহণান্তে ইঁহাদের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন তাহার পর নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণের সহিত আলাপ করেন। এইখানে সম্রাট পালকী হইতে অবতরণ করিলে তাঁহার মস্তকে পঞ্চশীর্ষ মুকুট পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তিনি অশ্ববাহিত একটি রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হন। পথিমধ্যে আর একটি বেদীর নিকটে আবার পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি হয়। এখানে সম্রাট বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রেসিডেন্সি অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে তৃতীয়বার মুকুট পরিবর্ত্তন করিয়া শুদ্ধিজল দ্বারা সম্রাট মুখ প্রক্ষালন করেন এবং

সিংহাসন কক্ষ

ধরিত্রীর সম্মানের জন্য কয়েক ফোঁটা জল মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং সর্ব্বশেষে সিংহাসনকক্ষে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া সম্রাট বিশ্রামার্থে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন।

রৌপ্যমণ্ডিত বুদ্ধ মন্দির

কাম্বোডিয়া রাজ্যটি বহু পুরাতন। চৈনিক ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে। চৈনিক ইতিহাসে "ফাউন-ন্যান" নামে এই দেশটির উল্লেখ আছে। পরে ইহার নাম "চিন-লা" হয়। খামার নামে এক জাতির সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে বসতি ছিল, পরে মধ্যএশিয়া হইতে আসিয়া অনেকে এখানে বসতি স্থাপন করে। পূর্ব্বভারতের পণ্ডিতগণ আসিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃত-ভাষা দ্বারা সর্ব্বপ্রথম এখানে শিক্ষা বিস্তার করেন; সেই জন্য খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে হিন্দুদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। খামারগণ এই দেশের নাম প্রথমে কম্বু রাখেন পরে কম্বুজ হয় এবং কম্বুজ হইতে এখন কম্বোডিয়া হইয়াছে।

খামারগণের অধিপতি শ্রুতবর্ম্মণের রাজত্বকালে খামার-গণ প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতিগঠন করে। শ্রুতবর্ম্মণের বংশাবলী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাহার পর রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে জয়ভরমের বংশাবলীর রাজত্বকালে কাম্বো-ডিয়ার নানাপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন—তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে যশোবর্ম্মণ আঙ্গোরটম নামে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সম্রাটের পিতা বহুকাল পূর্ব্বে একবার য়ুরোপে গিয়াছিলেন। তিনি যখন পারী নগরীতে যান তখন পারীতে তাঁহার সম্মানার্থ নানা-প্রকার আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাঁহার বহু মহিষী ও পারিষদগণকে দেখিয়া সেখানকার সকলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার নাকি তিন শত মহিষী ছিল।

আঙ্কোর ভাট মন্দির

কাম্বোডিয়ার টৌনলি-সপ নামে হ্রদটিই ইহার প্রধান সম্পত্তি। এই হ্রদের নিকট প্রায় ত্রিশ সহস্র ধীবর মাছের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ-উপার্জ্জন করে।
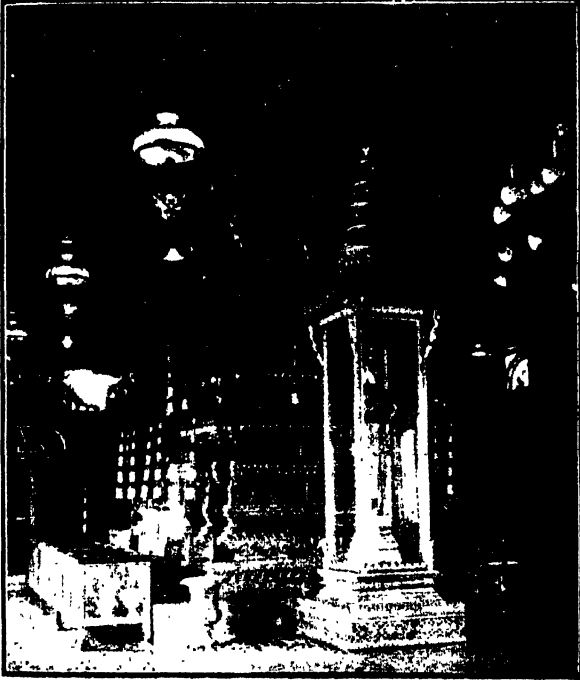
স্বর্ণ বুদ্ধ

কাম্বোডিয়ায় এখনও পর্য্যন্ত নানাপ্রকারের মন্দির ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের স্থাপত্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী "এঙ্কোর-ভাট"ই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমে ইহা হিন্দুদিগের মন্দির ছিল, পরে বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান সম্রাট মণিভঙ্ তাঁহার রাজধানী নোম-পেনে অবস্থিতি করেন। তাঁহার পিতামহ এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে অঙুডঙে রাজধানী ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পুরাতন অট্টালিকা ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া এই শহরটিকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়।

সম্রাট মণিভঙের সম্পূর্ণ নামটি পাঠকগণকে জানাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সুখের বিষয় এই নামটি তাঁহার পোষাকী নাম, উৎসবের সময়েই ইহার ব্যবহার হয় নচেৎ সচরাচর তাঁহাকে সম্রাট "মণিভঙ্" বলিয়া অভিহিত করা হয়। সম্পূর্ণ নামটি "প্রিয়া-বাট-সামতাক-শিশোয়াথ মণিভঙ্-চামচা-ভ্রাপং-হরিরিক-বারমিণ্টর-ফাউভাকো-ক্রাই-ভিকো, সুলালে-প্রিয়া-চান-ক্রাং-কাম্পুডিয়া-টিপ্লেডে"।

যৌবন-শেষ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

চোখের চাওয়া—আব্ছা-ছাওয়া, সাঁঝের হাওয়া বয় বেগে;
যায় যৌবন,—হায়, যৌবন—দিনের তপন অস্ত যায়!
শুভ্র কেশে শীর্ণ কে-সে ধর্ছে এসে হস্ত হায়,—
উঠ্ছে মনে ভয় জেগে'॥

অরুণ-আঁখি কোথায় সাকী,—পেয়ালা কি নেই হাতে?
কই বাগিচায় বুল্‌বুলি গায়,—ফুটবেনা হায়, আর গোলাপ?
কোথায় বাঁশী? কোথায় হাসি? আস্ছে ভাসি' কার বিলাপ!
যাক্ না জীবন এই সাথে॥

যষ্টি এ কার?—কই তরবার? বাহুর বল আর রইবে না?
শিখার মত শরীর—নত? শ্রান্ত-শ্লথ এ-ই জীবন?
তিমির-তীরে অন্ধ নীড়ে দেখ্‌ব কি রে দুঃস্বপন?—
সইবে না, মোর সইবে না॥

প্রজাপতি—দিনের জ্যোতি করেই যদি বঞ্চনা,
আলোর সে-প্রাণ হয় অবসান আলোয় সমান ম্লান ক'রে;
আমার তপন ডুব্‌ছে যখন দীপ্ত গগন ম্লান ক'রে,
মলিন হ'য়ে বাঁচ্‌ব না॥

কালের প্রহরী

শ্রীমতী ইলা দেবী

আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে,—এক বসন্তদিন। নগরে নগরে উৎসব, রাজপথে জনস্রোত চলেছে; রাজপুরী নন্দনগড় হ'তে দূরে উদ্যান মাঝে রাজাধিরাজ অশোকের শিলালিপি প্রতিষ্ঠানের আয়োজন। রাজার শিবির স্থাপিত হ'য়েছে সেখানে, মুক্ত আকাশতলে,—বৃক্ষের বেষ্টনে অনাড়ম্বর শিবির। মানুষ সেদিনও প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে নিজের জীবনের সজীবতা ও আনন্দের উপর দেয়াল গেঁথে গেঁথে "ইটের পর ইট মাঝে মানুষ কীট" হয়ে উঠেনি, প্রকৃতিরই তৈরী বৃক্ষনিকেতনে শৈল-আবাসে তাদের নিপুণ হস্তের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে ঘর করত তারা। আর রাজর্ষি অশোকের কাছে ত প্রাসাদ প্রান্তর সবই এক, সামান্য ভূষণে তাঁর সন্তুষ্টি, সামান্য খাদ্যে তাঁর পরিতোষ, সামান্য গৃহেই তাঁর আনন্দ, এবং ধ্যানেই তাঁর চিত্তবিনোদন,—তাই তাঁর শিবির সর্ব্বপ্রকারে বাহুল্য বর্জ্জিত।

ললনারা ডালাতে পুষ্প চন্দন ধূপ শঙ্খ সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সেখানে তথাগতের বন্দনা হবে। সেদিনে সকল বিষয়ের উৎসব মাত্রেই প্রয়োজন হত পুষ্প সুগন্ধি সঙ্গীতের,—এ গুলি না হ'লে আয়োজন অঙ্গশূন্য, উৎসব অর্থহারা হ'ত। পুরনারীরা হাসির উচ্ছ্বাস ছিটিয়ে চলেছে পথে; বাহুল্যবর্জ্জিত বসন তাদের, কারও কুঙ্কুমের পত্রলেখায় আবৃত বক্ষ, রক্তাম্বর মেখলা সুবর্ণ-নূপুর-জড়ানো চরণপদ্ম দু'খানিকে ছুঁই ছুঁই করছে, কারও বা ময়ূরকণ্ঠি নিচোলাবরণের সাথে ধূপছায়া রঙের নীবীবন্ধ জানুপর্য্যন্ত নমিত। মুখে লোধ্র রেণু, দেহে সিত চন্দনপঙ্ক, নগ্ন চরণ দুটি ফুলের রসে রাঙানো, ধূপ-সুবাসিত মেঘকৃষ্ণ কেশভার কতক কবরীবদ্ধ, কতক আবরণবিহীন স্কন্ধের উপর ঘুমন্ত সাপের মত এলায়িত। কালো কেশে মণিময় ললাটিকার সাথে স্তবকে স্তবকে কুন্দকলি রক্তঅশোক সাজান। বঙ্কিম গ্রীবার উপর রত্নজড়ানো কণ্ঠির সহিত সুন্দর মল্লিকা মালা, মণিদীপ্ত কর্ণভূষণে শিরীষগুচ্ছ; বাহুতে কঙ্কণে কাঞ্চীতে মুকুতা মরকত প্রবালের সাথে করবী কুরুবক মালতীর মোহন সমাবেশ। ভাবাকুল মেদুর চোখ দুটি, কল্যাণময় লতানো হাতগুলি,—সারা দেহমনের প্রাণের নির্ঝর যেন ঐ সুন্দর হাতের মাঝে প্রকাশের পথ পেয়েছে; তনু দেহখানি প্রদীপশিখার মত যেন লালিত্যে কেঁপে উঠছে। এরা সেই অজন্তা চিত্রের নারী,—মূর্ত্তিমতী হয়ে তখন ধরার বুকে জেগে ছিল।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের দলও চলেছে। তাদের কারও কটি-বসনের সঙ্গে উত্তরীয় উড়ছে। কারও চুল বাব্‌রী কাটা, স্বর্ণের বেষ্টনী বদ্ধ, কারও চুল জটার আকারে জড় করা, ভূষণ-বর্জ্জিত। কণ্ঠে বাহুতে মণিবন্ধে সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত কঠিন অলঙ্কার। তারা নবজাত শৈলশ্রেণীর মত অটল, দৃঢ়; নবীন শালতরুর মত সরল, সতেজ উন্নত,—সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার ভারতের মানব।

জনস্রোত ব'য়ে চলেছে, পুরোহিত ভিক্ষু হ'তে সৈন্য সামন্ত ধনী শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর, গ্রীক চৈনিক পারসীক ইত্যাদি সকল দেশীয় লোক সমান হ'য়ে চলেছে আজ,—মহারাজ অশোকের রাজদণ্ডের তলে কোথাও পার্থক্য বা কোনও অসামঞ্জস্য নেই, কোনও ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। পথের মাঝ দিয়ে রাজপরিবার ও পারিষদবর্গ মণিমাণিক্যে বসনে ভূষণে অস্ত্র শস্ত্রে পথ আলোকিত ক'রে চলেছেন, কিন্তু তাঁদের মাঝে সবার রাজা যিনি তিনি চলেছেন ভূষণ বিহীন গৈরিক বসনে, নগ্নচরণে; নিরলঙ্কারেও তিনি প্রভাত সূর্য্যের মত স্নিগ্ধ ভাস্বর।

উদ্যানে গিয়ে অশোক যুক্ত করে মুণ্ডিত মস্তকে স্তম্ভের লিপির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চারপাশে সসম্ভ্রমে মহামাত্যগণ বৃথগণ,রজ্জুকগণ শির আনমিত ক'রে স্তম্ভটিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিরাট জনস্রোত মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। যুগ-যুগ-প্রসারিণী এক ধ্যানগম্ভীর বাণী ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল, সেই বিরাট জন-অরণ্যের সেই বিরাট নিস্তব্ধতার কণ্ঠভেদ ক'রে,—সে বাণী এক ঘরছাড়া রাজকুমারের প্রাণের আবেগের বাণী, সে বাণী এক দেবোপম রাজার হৃদয়-মুকুরের প্রতিফলিত সুদূরবিদীর্ণ বাণী,— যে বাণী শুনে পাষাণ দ্রবীভূত হয়েছিল, পীড়িত অত্যাচারজর্জ্জরিত মানব হৃদয়ে বল পেয়েছিল, যে বাণী শুনে পশুপক্ষীও আশ্বস্ত হয়েছিল,—সেই বাণী। অজীবিক ব্রাহ্মণ যিনি তিনি এই বাণীকে আপনার ইষ্টদেবতার বাণী বলে ভাবলেন। শ্রমণ যিনি তিনি ভাবলেন এ এক তরুণ বেদমন্ত্র, এ মন্ত্রের ঋষি "দেবানাম্‌প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা।" এ মন্ত্র কাজ করে মনের গোপন গুহার তলে—তাই এ মন্ত্র নীরবে জপ করতে হয়। এ মন্ত্রে আবেগ নেই, আছে নীরবতা; ভাষা নেই, আছে ভাব; কারণ এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সাধনাই হল সংসারের সাধনা, অহিংসার সাধনা, মৈত্রীর সাধনা।

সম্রাটের ধ্যান ভঙ্গ হল, তিনি জনারণ্যের নীরব অভিবাদন সস্নেহে গ্রহণ করলেন। তাঁহার শিরে রাজমুকুট নাই, অঙ্গে রাজাভরণ নাই, যেন ভস্মাচ্ছাদিত ব্যক্তি। যিনি অহঙ্কারকে জয় করেছেন, খ্যাতিলিপ্সা যাঁর কাছে সুদূর-পরাহত, তাঁর আবার নামের পরিচয়ের কি আবশ্যক? তাই শুধু যে, তাঁর অঙ্গে রাজাভরণ নাই তাই নয়, তাঁর শিলালিপিতেও তাঁর নাম স্থান পেল না। তিনি দেবতাদিগের প্রিয়, এবং প্রিয়দর্শী তিনি, এই তাঁর যথেষ্ট পরিচয়; তিনি যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট অশোক—এই দম্ভের উক্তি শিলালিপিতে জ্ঞাপন করেননি। এই নীরবতাই তাঁর গৌরব, এই নীরবতাই অযুত ঢক্কা-নিনাদের চেয়েও সুস্পষ্ট।

উৎসব অবসানে, দিন শেষে রাজা পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন; উদ্যান হ'তে নরনারী চ'লে গেল নগরে, সব কোলাহল মিলিয়ে এল ধীরে ধীরে, শুধু দূরে গ্রাম হতে সন্ধ্যাপূজার শঙ্খধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছিল।

নগরে তখন ঘরে ঘরে ধূমের নয়ন সদৃশ গবাক্ষগুলির পরে দীপবৃক্ষে দীপ জ্ব'লে উঠেছে, নারীরা সন্ধ্যাপূজা সমাপনান্তে ধূপের ধোঁয়া দিচ্ছে, কোনও তরুণী সারাদিনের কাজের শেষে অঙ্গনে পুষ্পিত পলাশতরুর তলে পালিত হরিণীটিকে নিয়ে ব'সে নূতন-ওঠা চাঁদের দিকে তাকাচ্ছে। কেউ মৃন্ময় কলসী নিয়ে বঙ্কিম ভঙ্গীতে ফুলেভরা লতাগুলিতে জল ঢেলে দিচ্ছে। শঙ্খপদ্ম আঁকা কুটীর দ্বারে কপোতগুলি ফিরে এসে কোমল পাখা স্ফীত ক'রে বিশ্রামমগ্ন, রৌপ্যদাঁড়ে মুখর সারী ডানার তলায় মাথা লুকিয়ে নিদ্রিত; প্রবেশপথে শিকলে ঝুলানো ধাতুপ্রদীপটি হতে স্নিগ্ধসুবাস, মৃদু আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোনও গৃহের প্রবেশদ্বারে পাথরের জালির উপর সন্ধ্যারাণী রজনীগন্ধার মালা মেয়েরা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। অষ্টাপথের মাঝে মর্ম্মর বেদীতে প্রবীণদলের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।

সুদূর উদ্যানে তখন সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। মখমল-কোমল সবুজ ঘাসের উপর হতে মেয়েদের ফুলের মত নরম পাগুলির নূপুরের রিণিঝিণী থেমে গেছে;—কিন্তু তখনও কেশের সুবাস ফুলের সুরভিতে বাতাস আকুল হয়ে আছে। অলঙ্কারের শিঞ্জনি হাসির ধ্বনিতে নীরবতা থম থম করছে। জনশূন্য উদ্যানে পূর্ণ নীরবতার মাঝে শুধু সেই স্তম্ভটি একা দাঁড়িয়ে রইল, অতীতের একটি দৃশ্যের মূক সাক্ষী হয়ে, সম্রাট অশোকের আদেশলিপি বুকে ক'রে।

সন্ধ্যা শেষে রাত্রি এল; রাতের কালো যবনিকার পরে কালের কৃষ্ণতর প্রলেপে ধীরে ধীরে সব মুছে গেল,—অজন্তার নারীরা, অশোকের প্রজারা, শেষে রাজাধিরাজ অশোকও ডুবে গেলেন সেই অতলে।

সেই কালোর ওপর আলোর তুলি বুলিয়ে বিশ্বশিল্পী নূতন ছবি ফুটিয়ে তুল্লেন তখন। হিন্দুরাজ্যের পুনরাগমন ধ্বনিত হ'ল সমুদ্রগুপ্তের হস্তের বীণার ঝঙ্কারে, তার প্রতিষ্ঠা হ'ল তাঁর অপর হস্তের অসির আঘাতে। প্রাণহারা দেবভাষা তাঁর কাব্যের পরশমনির ছোঁয়াচে প্রাণ পেয়ে নরনারীর

মুখে আবার জেগে উঠল। প্রসারিত ঘাগ্‌রা, পিনদ্ধ কাঁচলি, অতিরিক্ত অলঙ্কার-ভূষিতা, অতিরিক্ত অলঙ্কার-ভাষিতা হিন্দুরমণীরা নব নব সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকে ঝঙ্কার তুললো; সাড়ম্বর অস্ত্রশস্ত্রের নিপুণ শৌর্য্যে হিন্দুবীরেরা চমক জাগাল। কালিদাসের মেঘমন্দ্র কাব্যসুরে ভারতের কবিত্বময় প্রাবৃট-গগনে এক বিচিত্র ঝঙ্কার উঠল; বরাহ মিহিরের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে, ব্রহ্মগুপ্তের জটিল জ্যামিতিতে নব নব চিন্তার ধারা উন্মুক্ত হল। তারপর অযুত কবির অযুত কাব্যে কাব্যশ্রী পড়লেন নিবিড় অলঙ্কারের নিগড়ে বাঁধা; কবির পর কবি এসে তাঁর রক্তিমচরণে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার স্তূপীকৃত ক'রে তাঁকে জড় নিশ্চল ক'রে দিলেন,—সহজসুরের লঘু জীবন চ'লে গেল, এল বিবিধ বসনের, বিবিধ ভূষণের, বিবিধ ভাষণের সুনিবিড় আড়ম্বর।

শেষে সব আড়ম্বরকে রিক্ত অনাড়ম্বর ক'রে দিয়ে অনেকটা রক্ত ঝরিয়ে দীপ্ত অগ্নিতে আগুনের চেয়ে প্রদীপ্ত অনেক রূপরাশির অঞ্জলি ঢেলে মহাকালের রথ যুগের বুকের উপর দিয়ে চ'লে গেল,—প্রাসাদ সৌধ সকলি গুঁড়িয়ে দিয়ে নির্ম্মম চক্রের পেষণে। দগ্ধ শ্মশানে শেষ হিন্দু সভ্যতার ভগ্নদেহ লুটিয়ে প'ড়ে রইল, মহাচক্রের চিহ্নকে জাগিয়ে রেখে, ঝঞ্ঝাহত মহীরূহের মত প্রেতমূর্ত্তিতে।

সেই শূন্যপটে রঙের নূতন রেখা পড়ল আবার, তখন এল পাঠান মোগলের বিরাট বাহিনী; ওড়না উড়িয়ে, বেণী দুলিয়ে, স্ফীত পায়জামায় বদ্ধনীর্ষ চরণাবরণে সুর্ম্মাটানা চোখে মেহেদিমাখা হাতে মদিরা পাত্রে নিয়ে এল মোগল রমণীর দল। দীর্ঘদেহ গুম্ফশ্মশ্রুমান্ পাঠান যোদ্ধা, মোগল পুরুষ নূতন ধর্ম্মে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করলে। সারা ভারতে যেখানে তারা পা ফেলত নির্ম্মম যুদ্ধের বিকট ঝঞ্ঝায় লোকে ত্রাসে আকুল হয়ে উঠত, আবার সেই মখমলজরী-জড়িত মহার্ঘ মণিখচিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে শোভন শিবিরে, সুরার স্রোতে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারায় তড়িৎবরণা হরিণ নয়না ভাবচঞ্চলা জগতের সেরা সুন্দরীদের মদির গীতোচ্ছ্বাসে লোকে অবাক হত।

সেই রকম বিচিত্রবাহিনী সহ মীরজুম্‌লার এক সেনা-নায়ক বাংলা জয় ক'রে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন পথে শিবির স্থাপনা করলেন হিমালয়ের কোলের কাছে এক ধ্বংস স্তূপের পাশে। সেখানে তাঁর চোখ পড়ল একটা প্রস্তর স্তম্ভের পানে;—সৈন্যদের তখনি আদেশ দিলেন, 'কাফেরের ভণ্ড কীর্ত্তিচিহ্ন গুলিতে উড়িয়ে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় কর।' গুলির আঘাতে স্তম্ভের শিখরে গর্বিত মহিমায় দাঁড়ানো সিংহের মূর্ত্তির ঈষৎ অংশ চূর্ণ হয়ে গেল। আর স্তম্ভের বক্ষভেদ ক'রে ফার্সী ভাষায় আঁকড় কাটা হ'ল— মহীউদ্দিন মুহাম্মদ আওরংজিব পাদসাহ্ আলমগীর গাজী। এই শিলাস্তম্ভের সামনেই একদিন মহারাজ অশোক দাঁড়িয়ে বিশ্বকে তাঁর হৃদয়ের বাণী শুনিয়েছিলেন। গর্ব্বস্ফীত মোগল সেনানী জানল না যে, মানুষের সার বাণী মৈত্রীর বুকে সে আজ তীর হানল। তবু ঐ পাষাণ পশুর যদি প্রাণ থাকত তার আত্মা এই আঘাতকারীকেও বন্ধু ব'লে প্রীতি জানাত, অপমান নিয়ে আনন্দ দিত,—অশোক যে তার বুকে প্রেমের মন্ত্র লিখে গেছেন, সে যে সেই মন্ত্রের প্রহরী। নির্ব্বোধ সেনাপতি স্তম্ভগাত্রে দম্ভভরে তার প্রভুর নাম জাহির ক'রে সফল করলেন সেই প্রাচীন উক্তি,—মহৎ যেখানে চলে দ্বিধাভরে, গর্দ্দভ সেখানে দৌড়ায় পুচ্ছ তুলে। যে অনুশাসন লিপিতে অশোক তাঁর নাম লেখেননি বাহুল্যের ভয়ে, সেথায় নাম লেখা হল এক রাজ্যলোলুপ রাজার।

* * *

কালের প্রকাশে রঙের উৎস ঝ'রেই চলে, তার বিরাম নেই, সীমাও নেই, তার নূতনত্বও চির অনন্ত। একটি ছবি অতি যত্নে গ'ড়ে তুলে তার উপরে সহসা রঙের পিচ্‌কারী ছিটিয়ে অরূপের মাঝে রূপের লীলা চলে।

এমনি ক'রে যুগের স্রোতে ভেসে এল সাগরপারের বিদেশীরা, বণিকের বেশে। যন্ত্র তাদের বাহন, বিজ্ঞান তাদের গুরু, বাস্তব তাদের রাজা। ভারতের কানে তারা নূতন মন্ত্র দিলে, নূতন কল্পনার দৃশ্য এঁকে চোখের সামনে মেলে ধরল। তাদের সঙ্গিনীরা লালিত্যের বাহুল্যকে পরিহার ক'রে কর্ম্মঠ জীবনের আদর্শকে বসনেভূষণে আচারে ব্যবহারে প্রচলন করলে। ভাবাকুললোচনা অপূর্ব্ব কবরী-সংবদ্ধা নারী, ধীরগমনা সালঙ্কারা বেদাভিজ্ঞা রমণী ও ভূলুণ্ঠিত-বেণী বিদ্যুৎবরণা আকুল-অঞ্চলা সুন্দরীদের যুগ চ'লে

গিয়ে এল ক্ষিপ্রগামনা, সংক্ষিপ্তবেশা, অতি ক্ষুদ্রকেশা বাস্তবের উপচার নিয়ে আদর্শবাদের পূজারিণীর দল। যন্ত্রমুগ্ধ ভারতে তখন দ্রাক্ষাবনবিহারিণী সুন্দরীদের মর্ম্মর প্রাসাদে সৈন্যাবাস স্থাপিত হ'ল, নন্দনগড়ের ধ্বংসস্তূপের পরে ধোঁয়ার জটা উড়িয়ে চিম্‌নিওয়ালা factory রচনা হ'ল। বিজ্ঞানের জয়-পতাকা জগতের সকল দেহের ভূষণ হ'ল। প্রকৃতি আজ মানবের বন্ধু নন্, বন্দিনী মাত্র।

নূতনের মোহ ক্রমেই কেটে যায় তাই পুরাতনের প্রতি আবার দৃষ্টি পড়ে। বাস্তবের নেশার প্রাথমিক উত্তেজনা ঈষৎ অপসারিত হ'লে মানুষের মনে আবার সৌন্দর্য্য অনুভূতি জেগে উঠ্‌ল। সেটাই যে মানুষের প্রাণের খোরাক,—প্রাণকে উপবাসী রেখে মানুষ বাহিরের প্রয়োজনের আবর্ত্তন বিবর্ত্তন যতই সৃষ্টি করার চেষ্টা করুক, মূলে রস তাকে যোগাতেই হবে।

প্রাণের এই খোরাক যোগান,—সাহিত্যকলা-সৌন্দর্য্য হ'তে এই যে অফুরন্ত রসের ঝরণা, এই থেকে মানুষ যেদিন আনন্দ পাবার সামর্থ্য হারাবে, সত্যের প্রতি সুন্দরের প্রতি অনুরাগ ভুলবে, সেদিন মানবজাতির ধ্বংসের বিষাণ বাজবে, যন্ত্রকে মানুষ আর চালিত করবে না, যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হবে, পিষ্ট হবে সে নিজে। এই সৌন্দর্য্যশ্রীর আনন্দেরই মাঝে মিশিয়ে আছে সেই শক্তি যা মানুষকে ক্ষয় হ'তে, ধ্বংস হ'তে বাঁচিয়ে রেখে তার প্রাণকে আলোয় উজ্জ্বল ক'রে গেলে। সেই আলো নিভে গেলে মানুষ আদিমকালে যে স্তরে পশু হতে প্রথম পৃথক হয়েছিল সেই স্তরেই পুনর্ব্বার ফিরে যাবে।

তাই যুগে যুগে কলালক্ষ্মীর আগমন হবেই, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে। তাঁর আগমনী চিরদিনের, তবে তার সুর চির-নূতন। আজকের মানুষ তাই কলালক্ষ্মীর মন্দির সাজায় নিউ-ইয়র্ক, প্যারী, বার্লিন, লণ্ডন কলিকাতা তৈরী ক'রে, আর তাঁর পুজোপকরণ সাজায় গবেষণা-গৃহে বদ্ধ নন্দনগড় পাটলিপুত্র, পম্পি রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি হ'তে। বর্ত্তমানের নূতনত্ব পুরাতনকে আজ লোভনীয় ক'রে তুলেছে। নূতন যেমন সৃষ্ট হচ্ছে, পুরাতনের তেমনি আকর্ষণ বাড়ছে। . . . .

ভারতবর্ষের পদপ্রান্ত হ'তে কাবুলের দ্বার পর্য্যন্ত এই সকল মৌর্য্যস্তম্ভলিপিকে ঘিরেও তাই নানা দেশের পণ্ডিতরা অনেক পর্য্যবেক্ষণ • নিরীক্ষণ নিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে গেলেন। নানারকম মতামত গ'ড়ে উঠ্‌ল। প্রথমে কোনও পণ্ডিত দুএকটি শিলালিপির কথা মাত্র অবগত হ'য়ে স্থির করলেন, 'দেবানাম্ প্রিয়' ব'লে কোনও এক ক্ষুদ্র রাজা ছিল। কোনও পণ্ডিত পাণিনিঘটিত বিশেষ ব্যাখ্যা পাঠ ক'রে অসমাসবদ্ধ 'দেবানাম্ প্রিয়' হতে স্থির করলেন রাজাটি ছিলেন গর্দ্দভ, এবং তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্যরা তাঁকে উপহাস করবার জন্যে গর্দ্দভ আখ্যা দিয়ে এই শিলালিপি গড়েছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানতার যবনিকা যখন স'রে যেতে লাগল, ভারতের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত সর্ব দেশে যখন সেই দেবানাম্ প্রিয়ের শিলালিপি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল, তখন পণ্ডিতরা বুঝলেন এ কোন্ মহান্ রাজার কীর্ত্তি-কাহিনী। বল্মীকাগ্র হ'তে কবি যেমন আখণ্ডলের ধনুঃখণ্ড উদ্ভূত হয় কল্পনা করেছিলেন, আজ তেমনি বিস্মৃতির বল্মীক ভেদ ক'রে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সমগ্র ভারতে দেখা দিয়েছে ঐ শিলালিপির নীরব ভাষায়। যুগ যুগ আগে অহিংসার মহামন্ত্র যেমন দিকে দিকে ধ্বনিত হয়েছিল, আজ বহু দীর্ঘশতাব্দী পরে যুদ্ধক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত জগতে সেই মহামন্ত্র আবার মানবের মনের দ্বারে এ'সে উপযাচকের মত বল্‌ছে, "আমায় গ্রহণ কর, তোমার শান্তি হবে।" ঘড়ির কাঁটা যেমন বৃত্তপথ অতিক্রম ক'রে আবার পূর্বের লক্ষ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, মানবের ভাগ্যনিয়ন্তা আজ আবার সেই প্রাচীন অহিংসামন্ত্রের দিকে তাঁর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌ছেন, মানব কি সেই লক্ষ্যকে বরণ ক'রে নেবে? শান্তির বৈঠকে ইয়োরোপের পঞ্চায়েতরা সেই ওয়াটার্লুর যুগ থেকেই ত ওঠা বসা করছেন, কিন্তু জগতে শান্তি ত আসে নি। এর মধ্যে যে-ক'টা যুদ্ধ হ'য়ে গেল তার মধ্যে কতগুলা নিছক অন্যায়ের শাস্তি দিতে, আর কতগুলা কেবল লোভের প্ররোচনায়, ঐতিহাসিক মাত্রেই তার খবর রাখেন। যে সমস্যা আজ উঠেছে সে সমস্যার সমাধান আড়াই হাজার বছর পূর্বেই হয়েছিল। জগৎ সে বাণী নেয় নি, আজও হয়ত নেবে না। কিন্তু তা'তে

ত বাণীর দোষ নেই, দোষ তারই যে এ বাণী সফল করতে পারে না। * * *

আড়াই হাজার বৎসর পরে আর এক বসন্তদিন। অপরাহ্ণের লাল আভায় উচ্ছ্বসিত ধরণীর বুকে রাঙা ধুলোর মেঘ রচনা ক'রে একখানা মোটর এসে থামল, সেই অতীত নন্দনগড়ের শ্মশানভূমে, শিলাস্তম্ভের কিছু দূরে, হিমালয়ের পদপ্রান্তে, ভারতের সীমান্তদেশে। একদল তরুণতরুণী কলরবে প্রান্তর মুখরিত ক'রে নেমে এল, রঙীন শাড়ীতে পরিপাটি বেশে এক একটি বিকশিত ফুলের মত। আজ আর তাদের কেশে পুষ্পজড়ানো সিঁথি নেই,—কারো মাথা জড়িয়ে স্কার্ফ বাঁধা, কারোও বা কুণ্ডলি পাকান কৃষ্ণসর্পের মত খোঁপাটির উপর আঁচলের প্রান্তভাগ ক্ষুদ্র ব্রোচের শাসনবদ্ধ। তাদের সুন্দর সুঠাম পদে আজ নূপুরের ধ্বনি নীরব, কারো গোড়ালি উঁচু সুদৃশ্য চর্ম্মের চরণাবরণ, কারো জরির ফুলতোলা মখমলের সুন্দর নাগরা। তাদের সুডৌল হাতে আর ফুলের অলঙ্কার নেই, কারো বা বলয়বিরল ঘড়ি-সম্বল, কারো বা কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত হস্ত। ধূপ শঙ্খের বরণডালা নেই আর, কেউ নিয়েছে রেশম-চর্ম্মের ক্ষুদ্র আধার, কেউ বা রেশমের সূর্য্যকিরণনিবারণী। কটিতে কাঞ্চী নেই, নিরাবরণ গ্রীবায় অর্দ্ধমুক্ত কেশের লীলা নেই ; মুখে লোধ্ররেণু নেই, আছে পাউডারের মৃদুস্পর্শ। কুঙ্কুমের পত্রলেখার পরিবর্ত্তে আজ রেশমের গাত্রাবরণ; কবির ভাব যেমন তাঁর ভাষাকে জড়িয়ে থাকে তেমনি তাদের সুন্দর সুঠাম তনুলতাকে জড়িয়ে আছে ধূপছায়া শ্যাম্পেন জাফ্রাণ নানা রঙের শাড়ি। তরুণদের কেশে বাব্‌রির ছাঁদ নেই, স্বর্ণবেষ্টনীবদ্ধ জটাজাল নেই,—পেছনে ফেলা চুলগুলি প্রশস্ত কপালে আলোর পথ মুক্ত ক'রে রেখেছে, কারো বা চুলগুলি বিভক্ত ক'রে সাজানো। অলঙ্কার আর তাদের নেই, বসনের বিচিত্র বিভিন্নতা, কারো খদ্দরের পাঞ্জাবীসহ ভূলুণ্ঠমান উত্তরীয়, কারো বা বণ্ড্‌ষ্ট্রীটের পোষাকে আচ্ছাদিত দেহ।

সূর্য্য তখন অস্ত গেছে। দিনান্তের শেষ আলোতে সুদূর আকাশের গায়ে—গর্বোন্নত গৌরীশৃঙ্গের হীরায় গড়া চূড়ার মালা অসংখ্য রামধনু রচনা করছে। দূরে দিগন্তে বিস্তীর্ণ শ্যামল ঘাসের মাঠের পরে নীল পাহাড়ের ঢেউ, ধরণীর চোখে অঞ্জনের মত লেগে রয়েছে। একটি লাল শাড়ীপরা ছোট্ট মেয়ে ভেড়ার পাল চরিয়ে বাড়ী ফিরছে, ঐ নাকি তিনটা মাঠ পার হ'য়ে ওদের বাড়ী। দূরে একটা বৎসহারা গাভী থেকে থেকে ডেকে ডেকে ফিরছে। সন্ধ্যার ছায়ায় অনতিদূরে বাগান ঘেরা কখানি বাড়ী রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। চারিপাশের ঘাসে ঢাকা স্তূপগুলি অতীতের কোন্ এক দুঃখ-মলিন ছবি বুকে নিয়ে মৌন হ'য়ে আছে, যেন অনেক কথা জানে, কিন্তু কে ওদের ভাষা হরণ করে নিয়েছে।

বর্ত্তমানের এই নরনারীর দল শিলাস্তম্ভটিকে ঘিরে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল। একজন তরুণ স্তম্ভের লিপিগুলি পাঠ ক'রে তার মানে বুঝিয়ে যেতে লাগল, আর অন্য তরুণ তরুণীরা নির্বাক হ'য়ে শুনল। শান্তিভরা শব্দহারা সন্ধ্যায় অতীতের এই নিদর্শন বহুযুগের ওপার হতে তাদের মনে ঘরছাড়া এক রাজার তনয়ের দরদী হৃদয়ের অনাদি মহিমা, উদার এক ঋষিরাজার প্রাণের আবেগ ব'য়ে এনে শ্রদ্ধার আবেশে তাদের মাথা নত করিয়ে দিলে। বিশ্বপ্রেমিক সেই মহামানবেরা যুগ যুগ আগে পৃথিবীকে ভালবেসে প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করেছিলেন, পৃথিবী আজও তাই তাঁদের প্রেমলিপি বুকে ক'রে রেখেছে। রিক্ততার মহান ঐশ্বর্য্যের মাঝে অচল সেই গতগৌরবের পায়ে ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ ক'রে তরুণ তরুণীরা চ'লে গেল ধীরে ধীরে ঘনায়মান আঁধারের মাঝ দিয়ে আবার সেই লাল ধূলার পথে।

'মুখর দিনের চপলতা মাঝে' চিরস্থির সেই পাষাণ প্রহরী তেমনি মৌন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, অতীতের কত সঞ্চয় নিয়ে, ভবিষ্যৎ কত জীবনের ধারাকে গ্রহণ করবার জন্য, সকল পরিবর্ত্তনের নির্বাক সাক্ষী হ'য়ে। তার বুকে পাষাণের উপর দাগ এঁকে যে মন্ত্র আঁকা আছে তারই মায়ায় সে অক্ষয় অবিনশ্বর হ'য়ে জেগে থাকবে অনাদিকাল মানব সমাজে,—চঞ্চল মানুষের ক্ষণিকের আদর অনাদর সকলের প্রতি চির-উদাসীন হ'য়ে।

ওগো নিস্তব্ধ পাষাণ, ঐ মহান্ বাণী তোমার প্রতি অনুপরমাণুতে যে প্রাণের লীলা বইয়েছে,—জগতের প্রতি

জীবাত্মার মিলিত সমন্বয়ের যে বিরাট এক,---তার মাঝেও ঐ একই প্রাণের লীলানর্ত্তন চলছে। তুমি যেন মহা ওঙ্কারের মত,বেদের ঋক্‌ছন্দের মত, সকল কালে জয়পতাকা উড়িয়ে সকল যুগে বিরাজ করছ। যে তোমায় চিনেছে সে আলোয় অ-মৃত হয়েছে, যারা তোমায় চেনে নি তারাও জন্মজন্মান্তর আনাগোনা করবে—তোমার লিপিতে যে অহিংসা-সংযম-মৈত্রীর চিরজাগ্রত চির-নবীন মন্ত্র আছে তাকে গ্রহণ করার জন্য। তোমার লিপি মানবের সাথে আত্মার পরিচয় ঘটায়, মহৎকে আয়ত্ত ক'রে মৃত্যুকে অতিক্রম করার পথ দেখিয়ে দেয়; আদিম মানবকে তুমি এই অহিংসার বাণী শুনিয়ে এগিয়ে এনেছ, বর্ত্তমানকে তুমি সংযমের পথে পরিচালিত করবার দীক্ষা দিচ্ছ, ভবিষ্যৎকে তুমি মৈত্রীর মন্ত্রে বাঁধবে। তোমার জয় মানুষের সকল দ্বন্দ্ব, সকল মন্দ, সকল ব্যথার উপর—ত্রাণের পরশ ছুঁইয়ে অনিবার্য্য হ'য়ে থাকবে চিরকাল।

শ্রীইলা দেবী

কাজরী মেয়ে

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজরী মেয়ে বাদল বেলায়
ছড়িয়ে গেছে হাসি.
তাইত জাগে মাঠের পারে
শুভ্র কাশের রাশি!
নদীর পারে পারে
মোহন তাদের মুখটী ফোটে কেয়ার ভারে ভারে!

কাজল দেশের মেয়ে তারা
মেঘের বরণ আঁখি,
লাস্যে তাদের বকুল ফোটে—
ডাকে কোকিল পাখী।
শিউলি বনের পাশে—
তাদের বনের গোপন কথা ঝরছে ফুলের রাশে!

নীপের ডালে দোল্‌না বেঁধে
আষাঢ় মাসের ভোরে,
দোদুল দোলায় কাজরী গাহে
মেঘকে উতল ক'রে।
আজকে তারা কই!
সাঁঝের মেঘে রঙিন আঁচল দুলিয়ে বেড়ায় ওই।

কখন তারা চ'লে গেছে
গহন মেঘের রথে!
নতুন রূপে ফিরল আবার
সবুজ মাঠের পথে!
ভরা নদীর বুকে
কমল হ'য়ে উঠল ফুটে ফুল্ল মধুর মুখে!—

৩২

শিলাময়ী ধরিত্রী প্রাণময়ী হ'লে তখন নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হ'ত। কিন্তু প্রাণময় পদার্থও যে সহনশীলতায় বসুন্ধরার চেয়ে কম নয়, তার পরীক্ষা হ'য়ে গেল যখন আধ ঘণ্টাটাক্ পরে দ্বিজনাথ কমলা সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত সন্তোষের নিকট ব্যক্ত করলেন। প্রচণ্ড অগ্নি-দাহ বুকের মধ্যে চেপে রেখে বসুমতী বাহিরে যেমন প্রসন্ন হাসি হাসেন, দ্বিজনাথের কথা শুনে সন্তোষের অবস্থা ঠিক তেম্‌নি হ'ল। মনের ভিতরটা টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে উঠ্‌লেও প্রশান্ত মুখমণ্ডলের মধ্যে তার বিশেষ কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না ; মৃদু হাসি হেসে সে বল্‌লে, "না, এ অবস্থায় আপনি যা করেছেন তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কমলা সুখী হ'লে আমরা সকলেই সুখী।"

এ উত্তরে দ্বিজনাথ বিস্মিত হ'লেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হ'লেন না। নিজে হিসাবে ভুল ক'রে মনে মনে ভাবলেন, 'এ ছেলেটি দেখ্‌চি একেবারে বেণের মত হিসিবী! সেন্টিমেন্টের কোনো ধার ধ'রে না। বিফলতায় যে বেদনা বোধ করে না, সফলতা ত তার কাছে সামান্য বস্তু। দুঃখ যে অনুভব করলে না, কি হবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে!' প্রকাশ্যে কথার উত্তর দিতে গিয়ে মুখে কিন্তু সান্ত্বনার কথাই কতকটা বেরিয়ে এল : বল্‌লেন, "সুখ-দুঃখের ত' গণ্ডীবাঁধা এলাকা নেই সন্তোষ, সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা সকলে যে কেবল সুখীই হব তা নয় ;—এমন কি আমার মনে হয়, কমলা নিজেও হবে না। সুখ দুঃখের হিসেব ঠিক টাকা-আনা-পয়সার হিসেবের মত নয়। সুখ থেকে দুঃখ, আর দুঃখ থেকে সুখ বিয়োগ দিয়ে দিয়েই আমাদের জীবনের কারবার চলে বটে—কিন্তু সে যোগ-বিয়োগের ফলে যা অবশিষ্ট থাকে তা নিছাক সুখ কিম্বা নিছাক দুঃখ নয়। আঠারো আনা সুখের মধ্যে ষোলো আনা দুঃখের একেবারে নিরবশেষ কাটান্ হয় না সন্তোষ, এক-আধ পাই বাকি থাকেই।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে স্মিতমুখে সন্তোষ বল্‌লে, "সেই এক-আধ পাই আমাদের বাইরের কারবার থেকে তুলে নিয়ে মনের মধ্যে সঞ্চিত করলে সেখানে তা সম্পদ হ'য়ে থাকে।"

সন্তোষের সংযমকে নির্ম্মমতা ব'লে ভুল করেছিলেন বুঝ্‌তে পেরে দ্বিজনাথ অনুতপ্ত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বল্‌লেন, "এর চেয়ে আর সত্যি কথা কিছু নেই সন্তোষ, এর চেয়ে আর বড় কথাও কিছু নেই! আমি একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করি, আজ তুমি যে দুঃখ পেলে তা যেন তোমার ভবিষ্যৎ সুখের মূল হয়।"

এই অনিশ্চিত মূল থেকে কোন্ ভবিষ্যতে গাছ উৎপন্ন হ'য়ে তাতে সুখের ফুল ফুটবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে শয্যা গ্রহণ ক'রে সন্তোষ বুঝ্‌তে পারলে আপাতত সেই সুখের মূল থেকে কাঁটা-গাছ

বেরিয়েছে। দ্বিজনাথের সহিত, এমন কি আহার-কালে কমলার সম্মুখে, সে যে-দৃঢ়তা রক্ষা ক'রে চলেছিল, প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে শয্যা গ্রহণ করবার পর সে দৃঢ়তা তাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'রে গেল। অন্ধকারের এবং নিঃসঙ্গতার আশ্রয়ে তার বিক্ষেপহীন মন যথার্থরূপে বুঝতে পারলে কতখানি ক্ষতি আজ হ'য়ে গেছে। হৃদয়ের এক দিক থেকে অপর দিক পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখ্‌লে, সমস্ত নিশ্চিহ্ন নীরব; এতদিন ধ'রে পলে পলে যে বিশাল আনন্দলোক গ'ড়ে উঠেছিল, অকস্মাৎ যেন কোথা থেকে একটা দুর্দ্ধর্ষ বন্যা এসে তার সমস্ত ধুয়ে-মুছে নিয়ে গেছে। দুঃখ, গ্লানি, অপমানে হৃদয় মথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বাড়িখানাকে মনে হ'ল কারাগার, আর শয্যাকে মনে হ'ল কণ্টক-শয্যা। নিতান্তই চক্ষুলজ্জার বশে আজই রাত্রের ট্রেণে কলকাতা রওনা হয় নি ব'লে মনে গভীর পরিতাপ উপস্থিত হ'ল।

বৈঠকখানা-ঘরে ক্লক্‌-ঘড়িতে টং টং ক'রে দুটো বাজ্‌ল। বারোটা বাজার কথা মনে আছে, কিন্তু একটা বাজার কথা মনে পড়ল না,—বিরক্ত হ'য়ে সন্তোষ পাশ ফিরে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে নিদ্রার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ল। কিন্তু চিন্তা চিত্তকে কোনো মতেই পরিত্যাগ করতে চায় না, সুতরাং নিদ্রা নেত্রকে পরিত্যাগ ক'রেই রইল। অবশেষে শেষ রাত্রের দিকে সামান্য একটু ঘুম হ'ল—কিন্তু পাঁচটা বাজবার পূর্ব্বেই সে ঘুমটুকুও ভেঙে গেল।

শয্যা পরিত্যাগ ক'রে বাইরে এসে সন্তোষ দেখ্‌লে শরৎ কালের প্রত্যূষের সুষমায় জাগ্রত হ'য়ে পৃথিবী হাস্‌ছে;—তার মুখে অনিদ্রার কোনো গ্লানি নেই। মনটা হঠাৎ হাল্কা হ'য়ে উঠ্‌ল। অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে নিয়ে সন্তোষ রাজপথে বেড়িয়ে পড়িল। তখন দ্বিজনাথের গৃহে সকলেই নিদ্রিত, শুধু মাঝারী। সানিটোরিয়মের অধিবাসী এবং অধিবাসিনীগণের মধ্যে কেউ কেউ পথে বেরিয়েছেন।

সন্তোষের মনের কোন্ এঞ্জিনে হঠাৎ জল-কয়লা-আগুনের সংযোগ হ'ল বলা কঠিন যার ফলে সে দ্রুতপদে দেওঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। প্রভাত-কালের শান্ত শীতল সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঘুটিং-ঢালা পরিচ্ছন্ন পথটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে প'ড়ে ছিল;—তার দুধারে মনোহর দৃশ্য, মাথার উপর নির্ম্মল আকাশের অবগাঢ় দৃষ্টি, গাছে গাছে পাখীর ডাক। এই মাধুর্য্যময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে একরকম নিশ্চেতন হ'য়ে সন্তোষ এক মনে হন্ হন্ ক'রে পথ চ'লে যখন সুকুমারদের বাড়ি উপস্থিত হ'ল তখন সবে মাত্র চাকরেরা জাগ্রত হ'য়ে বাড়ির গেট্ খুলে দিয়েছে।

কম্পাউণ্ডে প্রবেশ ক'রে একজন ভৃত্যকে দেখতে পেয়ে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করলে, "বাবুরা কোথায়? এখনো ওঠেন নি না-কি?"

ভৃত্য বল্‌লে, "আজ্ঞে না হুজুর।"

সবিস্ময়ে সন্তোষ বল্‌লে, "এখনো ওঠেন নি? প্রায় সাড়ে ছটা বাজে যে! আরো দেরি হবে না কি?"

"আজ্ঞে না, এখনি উঠ্‌বেন। ডেকে দোবো?"

"তোমাকে ডাকৃতে হবে না, আমিই ডাক্‌ছি। বিনয় বাবুর ঘর কোন্‌টা?"

ভৃত্য হস্ত-সঙ্কেতে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "ওই পশ্চিম দিকেরটা।"

বারান্দায় উঠে পশ্চিম দিকের ঘরের খোলা জান্‌লা দিয়ে সন্তোষ দেখ্‌লে মশারীর ভিতর বিনয় নিদ্রিত। অনুচ্চস্বরে ডাক্‌লে, "বিনয় বাবু! বিনয় বাবু!"

বিনয়ের ঘুম তরল হ'য়ে এসেছিল; জেগে উঠে শয্যার উপর উঠে ব'সে বাইরে তাকিয়ে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কে? সন্তোষবাবু? আসুন, আসুন!"

সন্তোষ বল্‌লে, "আমি ত এসেইছি; আপনি বেরিয়ে আসুন।"

তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে নেমে প'ড়ে দরজা খুলে বিনয় বাইরে এসে সন্তোষের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "দেরি ক'রে ওঠার অপরাধ আমি করেছি নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনিও যে একটু বেশি সকালে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই সন্তোষবাবু। জশিডির হিসেবে বলছি।" ব'লে হাস্‌তে লাগল।

সন্তোষ সহাস্যমুখে বল্‌লে, "ঘুম যখন ভেঙে গেল তখন শেষ রাত্রি। কিছুক্ষণ পরে পথে বেরিয়ে কি খেয়াল হ'ল মনে করলাম আপনাকে কংগ্র্যাচুলেট্ ক'রে আসা যাক্।"

বিনয়ের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল; একটু কি চিন্তা ক'রে সে বল্‌লে, "আপনি সব শুনেছেন সন্তোষবাবু?"

"শুনেছি বৈ কি। না শুন্‌লে কংগ্র্যাচুলেট্ করতে আসি কি ক'রে?"

ব্যথিত স্বরে বিনয় বল্‌লে, "যদিও ইচ্ছা ক'রে নয়, তবুও আমি আপনার কষ্টের কারণ হয়েচি সন্তোষবাবু, —আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বিনয়ের বাম স্কন্ধে ডান হাত রেখে একটু নাড়া দিয়ে সন্তোষ বল্‌লে, "আপনি অতি ছেলেমানুষ বিনয়বাবু! কমলার সঙ্গে আমর বিয়ের একটা কথা চল্‌ছিল, সেই কথা বল্‌ছেন ত? অমন্ আমাদের বাঙালীর ঘরে কত কথা চ'লে থাকে, তার হিসেব রাখ্‌তে গেলে আর চলে না। এ-সব কথার কি কিছু ঠিক আছে বিনয়বাবু? তাই লোকে কথায় বলে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে।"

বিনয় বল্‌লে, "বিধাতা নিয়ে নিশ্চয়ই—তা নইলে কি আপনার জায়গায় আমি দাঁড়াতে পারি!"

সন্তোষ হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "এ আপনার নিতান্তই বিনয় বিনয়বাবু! আপনি আপনার মহত্তর শক্তি দিয়ে কমলাকে জয় করেছেন। আমি আপনার কাছে পরাভব স্বীকার করছি।—আচ্ছা, আমি আধঘণ্টাটাক ঘুরে আস্‌ছি, ততক্ষণে আপনারা তৈরী হ'য়ে নিন্। এখানে এসেই চা খাওয়া যাবে অখন্।" ব'লে সন্তোষ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

বিনয় ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,"না, না, আপনার আর কোথাও যেতে হবে না—এইখানেই বসুন। চার মাইল পথ চ'লে এসে আরো আধঘণ্টা ঘুরতে আপনার ইচ্ছে হচ্চে?"

সন্তোষের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "ভগবান সময়ে সময়ে আমাদের পায়ে চাকা বেঁধে দেন বিনয়বাবু, তখন চার মাইল কি, চল্লিশ মাইলেরও হিসেব থাকে না। তা ছাড়া, বেশি ঘুরব না; আজই বিকেল পাঁচটার গাড়িতে কলকাতা যাব কি-না—তাই এ-দিকটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিতে ইচ্ছে হচ্চে।"

ভগবান চাকা যে পায়ে বাঁধেন নি, মনে বেঁধেছেন, আর ঘুরে ফিরে দেখবার ইচ্ছেটা যে মানসিক অস্থিরতার ছদ্মনাম, এ বুঝতে বিনয়ের বিলম্ব হ'ল না। সুতরাং ও বিষয়ে আর কোনো আলোচনা না ক'রে সে বল্‌লে, "আজই কলকাতা যাবেন? এখন ত' আপনার ছুটি আছে, দিন কতক এখানে কাটাতে পারতেন।"

সন্তোষ বল্‌লে, "না বিনয়বাবু, যত শীঘ্র সম্ভব চ'লে যাওয়াই ভাল। আপনি বুদ্ধিমান, বুঝ্‌তে পারছেন ত, এ অবস্থায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সঙ্কোচ হবেই। আমি বরং কতকটা সহজে আমার সঙ্কোচ কাটাতে পারব, কিন্তু ওঁদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা একটু শক্ত।"

একটু চিন্তা ক'রে মৃদুস্বরে বিনয় বল্‌লে, "তা বটে।"

সন্তোষ প্রস্থান করলে বিনয় বারান্দার বেঞ্চে ব'সে খানিকক্ষণ কত-কি ভাবলে, তারপর বারান্দার প্রান্তে এসে মুখ বাড়িয়ে সুকুমারের ঘরের দিকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চস্বরে সুকুমারকে ডাকৃতে লাগ্‌ল।

সুকুমার জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বল্‌লে, 'কি হে, আজ এত উৎসাহ কেন? রসুনচৌকীর ফরমাস দিতে যেতে হবে না-কি?"

বিনয় বল্‌লে, "তার আগে সন্তোষবাবুকে চা খাওয়াতে হবে। তিনি খানিক আগে এসেছিলেন, বেড়াতে গেছেন, আধঘণ্টাটাক্ পরে আস্‌বেন।"

অর্দ্ধোচ্চস্বরে ত্রস্তভাবে সুকুমার বল্‌লে, "ডিউএল্ লড়্‌তে নাকি?"

বিনয় বল্‌লে, "তাহ'লে ত' তত ভয়ের কথা ছিল না। এ ঠিক তার বিপরীত,—কংগ্র্যাচুলেট্ করতে।"

শুনে সুকুমার মুখ উদ্বিগ্ন ক'রে বল্‌লে, "সাবধানে থেকো বিনু, বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং—"

"কিন্তু ইনি ত স্ত্রীলোকও নন, রাজকুলও নন্।"

"তবু-ও। চোট্ খেয়ে যদি কেউ সন্দেশ খাওয়াতে আসে সে সন্দেশকে সন্দেহ কোরো।"

বিনয় মৃদু হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা, তা না হয় করব; কিন্তু চা খেতে সন্তোষবাবু সন্দেহ করবেন না, অতএব তার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি কর। আর দেখ,—বক্তিনাথের বিখ্যাত জিনিস একমাত্র রসুনচৌকী বাজ্‌নাই নয়, পেঁড়াও। পার যদি ত' সন্তোষবাবুকে দু-চারটে পেঁড়াও খাইয়ো।"

সুকুমার বিনয়ের কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "তা মন্দ নয়, নিয়তির বিধানে একজনের ভাগে পড়্‌ল রসুন-চৌকী আর একজনের ভাগে পেঁড়া;—একজনের ভাগে পড়ল কমলা, আর একজনের ভাগে কদলী।"

বিনয় বল্‌লে, "কিছু বলা যায় না সুকুমার। আমার মনে হয় পাশার দান উল্টো পড়েছে,—শেষ পর্য্যন্ত আমারই ভাগ্যে কদলী না জোটে।"

"কদলী যদি মর্ত্তমান হয় ত' পেঁড়া সংযোগে মন্দ জিনিস নয়। আচ্ছা, শৈলকে খবরটা দিয়ে আমি আস্‌ছি।" ব'লে সুকুমার অদৃশ্য হ'ল।

৩৩

সন্তোষ ফিরে এসে দেখ্‌লে বারান্দায় একটি গোল টেবিলের ধারে দুখানি চেয়ারে ব'সে সুকুমার এবং বিনয় অপেক্ষা করছে;—তৃতীয় একখানি চেয়ার তার-ই জন্যে রাখা।

সে নিকটে আস্‌তেই উভয়ে উঠে দাঁড়াল। সুকুমার এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধ'রে প্রসন্নমুখে বল্‌লে, "ভারি খুসী হয়েচি সন্তোষ বাবু, আপনি আসাতে। কিন্তু এতখানি পথ হেঁটে এসে আবার বেরিয়েছিলেন কেন? আমাকে একটা ডাক্‌ দিলেই ত' হ'ত।"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে সন্তোষ বল্‌লে, "না, আপনাকে আর তখন ডাকি নি। সে উপদ্রবটা আপনার বন্ধুর উপর ক'রেই নিরস্ত হয়েছিলাম।"

সুকুমার হাসিমুখে বল্‌লে, "কিন্তু এ পক্ষপাতে আমি ত ক্ষুণ্ণ হ'তে পারি।"

সুকুমারের কথায় সন্তোষ হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "আপনাকে ক্ষুণ্ণ না করা শক্ত দেখচি সুকুমার বাবু!"

বিনয় বল্‌লে, "সেই জন্যেই বোধ হয় ওকে খুসী করা অত সহজ।"

বিনয়ের কথায় সন্তোষ এবং সুকুমার উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল।

চায়ের ব্যবস্থা প্রস্তুতই ছিল,—অনতিবিলম্বে একজন ভৃত্য চা এবং খাবার দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে কথাবার্ত্তা বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে এগিয়ে চল্‌ল, কিন্তু যে বিষয়টা সম্ভবতঃ তিন জনেরই মনে সর্ব্বোচ্চ হ'য়ে বিরাজ করছিল সেইটেই প্রকাশ হ'ল না। সাধারণ অবস্থায় সেই কথাটাই আজকে চায়ের মজলিসে আলোচনার প্রধান প্রসঙ্গ হ'ত,—কিন্তু জলের একটা দিক বরফ হ'য়ে জমাট্‌ বেঁধে তরল অংশের দিক্‌টার গতি রোধ ক'রে রইল।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল; সুকুমার বল্‌লে, "চলুন সন্তোষ বাবু, চা খেয়ে গাড়ি ক'রে খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্‌।"

সন্তোষ বল্‌লে, "আমার ত' না বেড়িয়ে উপায় নেই,—অন্তত জশিডি পর্য্যন্ত। কিন্তু এবার আর পদব্রজে নয়,—ট্রেনে। চলুন, না হয় ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবেন। কিন্তু পৌনে-আট্‌টার গাড়িত' চ'লে গেল, এখন বোধ হয় সওয়া-নটার গাড়ি ভিন্ন উপায় নেই?"

সুকুমার বল্‌লে, "সে গাড়িতেও আপনার উপায় আছে ব'লে মনে করবেন না; এ বাড়ির এক ব্যক্তি সে বিষয়ে আপনার বিঘ্ন হয়েচেন। তিনি পাশের ঘরে অপেক্ষা করচেন, আপনার চা খাওয়া হ'লেই আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।"

সন্তোষ বল্‌লে, "কে, শৈল? তা পাশের ঘরে অপেক্ষা করবার দরকার কি? এখানে এসে বস্‌লেই ত' হয়।"

"নিশ্চয়ই হয়; কিন্তু সে বিষয়ে আমাকে তিনি বিঘ্ন ব'লে মনে করেন।"

সুকুমারের কথায় সন্তোষ এবং বিনয় হেসে উঠ্‌ল। সন্তোষ বল্‌লে, "এতে আপনার দুঃখ করবার বিশেষ কারণ নেই সুকুমার বাবু,—অনেক বৃহৎ ব্যাপার তুচ্ছ ব্যাপারের পক্ষে বিঘ্ন। কিন্তু সওয়া নটার ত এখনো অনেক দেরি, তবে সে গাড়িতে আমার যাওয়া চল্‌বে না কেন?"

কেন চল্‌বে না শুনে সন্তোষ একটু চিন্তিত হ'ল; বল্‌লে, "কিন্তু আমি যে আপনাদের এখানে আসছি সে কথাও দ্বিজনাথ বাবুর বাড়ি কাউকে ব'লে আসি নি। চায়ের

সময়টা এক রকম ক'রে চ'লে যাবে—কিন্তু ভাত খাবার সময় আমি উপস্থিত না হ'লে তাঁরা ভারি অসুবিধায় পড়বেন।"

সহাস্যমুখে বিনয় বল্‌লে, "আপনার এ আপত্তি তোলবার পথ বউদিদি রাখেন নি। দ্বিজনাথ বাবুর নামে তাঁর চিঠি নিয়ে পৌনে আট্টার গাড়িতে লোক চ'লে গিয়েছে।"

শুনে সন্তোষ একটু চুপ ক'রে থেকে হতাশভাবে বল্‌লে, "তা হ'লে আর উপায় কি?"

সুকুমার বল্‌লে, "আমি ত' বল্‌ছিলাম, উপায় নেই।"

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল;—ভৃত্য এসে পেয়ালা রেকাব প্রভৃতি তুলে নিয়ে যাওয়ার পরই পাশের ঘরে মৃদু কাশির শব্দ শোনা গেল।

সুকুমার বল্‌লে, "এ কাশির সঙ্গে সর্দ্দির কোনো যোগ নেই সন্তোষ বাবু; এর অর্থ আছে। আপনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আমার প্রতি এ সঙ্কেত। আপনি যান,—কিন্তু একটু সতর্ক থাকবেন। পর্দ্দার আড়াল থেকে যাঁরা এই রকম কেশে থাকেন তাঁরাই হচ্চেন আপনাদের আইন-রাজ্যের পর্দ্দা নশীন্ লেডী। পর্দ্দার ও-দিকে এঁরা অবলীলার সঙ্গে যে সব আশা-ভরসা দেন তার অর্থ পর্দ্দার এ-দিকে এসে অনেক অনর্থ ঘটায়।"

সন্তোষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "কিন্তু সেই অনর্থ আমাদের পকেট অর্থে পূর্ণ ক'রে দেয় সুকুমার বাবু। পর্দ্দা প্রথা উঠে গেলে প্রধান ক্ষতি হবে উকিল ব্যারিষ্টারের।"

কৌতুক হাস্যের মৃদু আভাসটুকু মুখে বহন ক'রে সন্তোষ পাশের ঘরে প্রবেশ করল। একটা চেয়ারের হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে শৈলজা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শৈলজার মুখের দিকে তাকিয়ে সন্তোষের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বাইরে এতক্ষণ হাস্য-পরিহাসের যে তরঙ্গ চল্‌ছিল তা শৈলজাকে একেবারে স্পর্শ করে নি। মুখে তার নিবিড় সমবেদনার ছায়া, চক্ষে সকাতর দৃষ্টি। চেয়ারখানা সন্তোষের দিকে একটু ঠেলে দিয়ে মৃদুস্বরে সে বল্‌লে, "বসো।" তারপর সন্তোষ উপবেশন কর্‌লে নিজে একখানা হাল্কা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে বল্‌লে, "কাল রাত্রেই আমি সব শুনেছি। মনে সত্যিই ভারি কষ্ট পেয়েছি ফন্তুদাদা!"

সন্তোষের মুখে আবার ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "মন জিনিসটা মোটেই সুবিধের নয় টুলু। আঘাত খাবার পক্ষে কেমন ওর একটু বিশেষ পটুতা আছে। জ্ঞানী লোকেরা তাই মনকে জয় করবার জন্যে উপদেশ দেন।"

এই তত্ত্ব কথার প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ না দিয়ে শৈলজা বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে ত কথা এক রকম স্থিরই হয়ে গিয়েছিল, তবে আবার এ রকম হ'ল কেন?"

একটু চিন্তা ক'রে শৈলজার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে সন্তোষ বল্‌লে, "অদৃষ্ট ব'লে মেনে নিলেই ত' সব চুকে-বুকে যায় টুলু।"

শৈলজার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল; রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌লে, "অদৃষ্ট, না আরো কিছু! এমন অবিচারকে তুমি অদৃষ্ট বল?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্তোষ মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

বাইরে বারান্দায় ব'সে সুকুমার এবং বিনয় মৃদুস্বরে কথা কচ্ছিল, গুণ গুণ ক'রে তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কথা বোঝা যাচ্ছিল না। পথ দিয়ে একটা সাঁওতাল বালক বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলেছিল,—তার একটানা করুণ স্বরে বায়ুমণ্ডল যেন শিউরে শিউরে উঠ্‌ছিল। কম্পাউণ্ডের পাঁচিলের পাশে নিম গাছের ডালে ব'সে একটা দয়েল অবিশ্রান্ত শিস্ দিয়ে যাচ্ছিল।

"ফন্তু দাদা?"

শৈলজার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সন্তোষ বল্‌লে, "কি বল?"

"তুমি যেমন কষ্ট পেয়েছ, আর একজন ঠিক তেমনি কষ্ট পেয়েছে; তোমার চেয়ে একটুও কম নয়। কে জান?"

"তোমার ননদ শোভা?"

"কি ক'রে জান্‌লে? তোমাকে সে-দিন বলেছিলাম বুঝি?"

"বলেছিলে।"

শৈলজা বল্‌লে, 'ভালবাসা যদি বল্‌তে হয় ত' সে শোভার ভালবাসা! কোথায় লাগে তার কাছে কমলার

চোখের নেশা! এত চাপা মেয়ে, তবু কাল থেকে শুনে পর্য্যন্ত মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আমি ওর মুখের দিকে চাইনে, পাছে কেঁদে ফেলে!"

সন্তোষ বললে, "আহা!"

"ফস্তুদাদা, একটা কথা বলব?"

"বল।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে শৈলজা বললে, "তুমি শোভাকে বিয়ে কর।"

শুনে সন্তোষ হাসতে লাগল; বললে, "তুমি কমলাদের ওপর সত্যিই চটেছ দেখ্‌চি টুলু।"

শৈলজা বললে, "চটেছি খুবই, কিন্তু আমি সেজন্য বল্‌ছিনে। এতে ভাল হবে।"

সহাস্য মুখে সন্তোষ বললে, "কার ভাল হবে? আর যারই হ'ক, শোভার ত নয়ই। আমি নিতান্তই বাজে জিনিস টুলু! দেখলে না, দু-দুবার তার প্রমাণ হ'য়ে গেল। আমি পাবার মত বস্তু নই—এ আমি বেশ বুঝেচি।"

শৈলজার চক্ষু ছল্‌ছলিয়ে এল, এ কথার মধ্যে তার সঙ্গে সন্তোষের বিবাহ ভেঙে যাবার উল্লেখ ছিল, তা সে বুঝতে পারলে; বললে, "শোভার যদি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য থাকে তা হ'লে সে তোমাকে পাবে। সে তোমার উপযুক্ত কি না তা আমি বলতে পারিনে ফস্তু দাদা। তুমি সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে রাজি হও।"

সন্তোষ বললে, "এ যদি শুধু যোগ-বিয়োগের বিবেচনা করা যায় তা হ'লে তোমার কথা সমীচীন ব'লে মনে হবে। কিন্তু মনের হিসেব ত ধারাপাতের নিয়মে চলবে না টুলু,—তুমি শোভাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, সে-ও বলবে চলবে না।"

এর পর শৈলজা নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের জাল দিয়ে সন্তোষকে পরাভূত করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই মত পরিবর্ত্তন করলে না; বললে, "তুমি যদি নিতান্তই আমার দুঃখ লাঘব করতে চাও ত' ভাল ক'রে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করগে। সমস্ত দিন যদি তর্কই করবে ত' রাঁধবে কখন?"

শৈলজা হাসতে লাগল; বললে, "দুঃখ লাঘবের জন্যে কি খাও তা, যথাসময়ে দেখা যাবে। এখন আর বেশি পেড়াপিড়ি করব না,—কিন্তু আমার আর্জি পেশ ক'রে রাখলাম ফস্তুদাদা।"

সন্তোষ বললে, "কিন্তু আমার মর্জ্জির কথা ত তুমি শুনলে।"

আহারাদির ঘণ্টাখানেক পরে সন্তোষ বললে, "ছটার সময়ে যখন কলকাতা যাবার ট্রেণ, তখন এবার আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিই সুকুমারবাবু। আমাকে অনুগ্রহ ক'রে একখানা ঠিকে গাড়ি আনিয়ে দিন।"

সুকুমার বললে, "ঠিকে গাড়ির দরকার নেই—ঘরের গাড়িই জুতিয়ে দিচ্ছি।"

সন্তোষ বললে, "না, না, ঘরের গাড়ি নয়, ঠিকে গাড়িই আনিয়ে দিন্। ঘরের গাড়ি এতখানি পথ যাবে তারপর ফিরে আসবে।"

সুকুমার বললে, "ফিরে আসবে সেটা চিন্তার কারণ নয়, ফিরে না এলেই চিন্তার কারণ হবে। তা ছাড়া সমস্ত দিন ঘোড়া ব'সে রয়েছে—একটু ফেরাই ভাল।"

কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই তাতে স্বীকৃত হ'ল না। অগত্যা সুকুমার ঠিকা গাড়ির জন্যে লোক পাঠালে।

গাড়ি এলে বিনয় বললে, "চলুন সন্তোষবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও যাই—আপনাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে ফিরে আসব।"

সন্তোষ বললে, "অনর্থক কেন কষ্ট করবেন।" তারপর একটা কথা সহসা মনে পড়ায় বললে, "আচ্ছা, চলুন।"

সুকুমার বললে, "তা হ'লে আমিও ত যেতে পারি বিনু।"

বিনয় মাথা নেড়ে বললে, "না, তুমি বাড়িতে থাক। একজন গেলেই যথেষ্ট।"

সুকুমারের মুখে অর্থব্যঞ্জক হাসির আভাস ফুটে উঠল।

সমস্ত পথ বিনয় সন্তোষের সঙ্গে নানা গল্প করতে করতে চলল, বাড়ি পৌঁছে সন্তোষের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ যোগ দিয়ে রইল, চা খাওয়ার সময়ে পীড়াপীড়ি ক'রে তাকে একটু বেশি ক'রে খাবার খাওয়ালে এবং যাবার সময়ে মোটর এসে দাঁড়ালে দ্বিজনাথকে বললে, "আপনার যাবার দরকার

নেই—আমি গিয়ে তুলে দিচ্ছি।" সুকুমারের বাড়ি থেকে এসে পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য সে সন্তোষের সঙ্গ ছাড়ে নি, এবং তার নিরবসর পরিচর্য্যার মধ্যে এমন একটু ফাঁক ছিল না যার মধ্য দিয়ে দ্বিজনাথ কমলা বা অন্য কেউ প্রবেশ ক'রে একটু কাজে লাগ্‌তে পারে।

অন্দর থেকে পদ্মমুখীকে প্রণাম ক'রে এসে সন্তোষ দ্বিজনাথকে প্রণাম করলে। অদূরে কমলা দাঁড়িয়ে ছিল, নিকটে এসে নত হ'য়ে সন্তোষকে প্রণাম করলে। যুক্ত করে তার প্রত্যভিবাদন ক'রে সন্তোষ গাড়িতে উঠে বস্‌ল।

ষ্টেশনে পৌঁছে বিনয় ড্রাইভারকে বল্‌লে, "সাহাব হাওয়া খানে যাঙ্গে—গাড়ি লে যাও।" তারপর প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে এসে দেখ্‌লে হোম্ সিগ্‌নাল্ ডাউন্ হয়েচে, গাড়ি আসবার দেরি নেই।

টিকিট কেনাই ছিল। অল্পক্ষণ পরে গাড়ি এলে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস্ কামরার পাশের দিকের বেঞ্চে কুলিকে দিয়ে বিনয় সন্তোষের শয্যা পাতিয়ে দেওয়ালে। তার পর সুট্ কেস্, ষ্যাটাসি কেস, টিফিন্ কেরিয়ার, খাবার জলের সোরাই প্রভৃতি ভাল ক'রে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখিয়ে সে বিছানার উপর সন্তোষের পাশে বস্‌ল। জশিডিতে এই প্যাসেঞ্জার গাড়ি পনেরো মিনিট দাঁড়ায়;—দুজনে এই দীর্ঘ সময় পাশাপাশি নীরবে ব'সে রইল—একটা কথাও কারো মুখ দিয়ে বার হ'ল না। গার্ড হুইস্‌ল্ দিলে বিনয় গাড়ি থেকে নেমে জানলার ধারে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল।

সন্তোষ তা'র ডান হাতখানা বিনয়ের দিকে প্রসারিত ক'রে বিনয়ের একখানা হাত চেপে ধর্‌লে।

"কল্‌কাতায় গেলে দেখা করবেন।"

বিনয় বল্‌লে, "নিশ্চয় করব।"

সেদিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে যাত্রীর ভিড় ছিল—একখানা দেওঘর যাবার ট্রেন্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে অপেক্ষা করছিল। সন্তোষের গাড়ি দৃষ্টির অন্তরাল হ'লে একখানা টিকিট কিনে বিনয় গাড়িতে চ'ড়ে বস্‌ল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কি মনে ক'রে গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে রেলের লাইন ধ'রে দ্বিজনাথের গৃহে উপস্থিত হ'ল। দ্বিজনাথ নিয়মিত বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখনো ফেরেন নি;—কমলা বিষণ্ণ চিত্তে পূর্ব্বদিনের মত সেই শিলাখণ্ডের উপর ব'সে ছিল, বিনয় নিকটে উপস্থিত হ'লেও সে উঠ্‌ল না—নিঃশব্দে ব'সে রইল।

কমলার ডান পাশে যে স্বল্প-পরিসর একটু স্থান ছিল তাইতে ব'সে প'ড়ে কমলার ডান হাতখানি দুহাতের মধ্যে গ্রহণ ক'রে বিনয় বল্‌লে, "সন্তোষকে বিদায় দিয়ে এলাম কমলা।"

উত্তরে কমলা কিছু বল্‌লে না—যেমন ব'সে ছিল ঠিক তেমনি স্থিরভাবে ব'সে রইল,—শুধু তার দুই চক্ষু হ'তে নিঃশব্দে ঝর্ ঝর্ ক'রে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

এই শিলাখণ্ডের উপর ঠিক একদিন আগে ব'সে সন্তোষ প্রার্থনা করেছিল, তার সঙ্গে কমলার মিলন যেন অটল হয়। তখন তার মনে পড়ে নি,—শিলার আর একটা নাম পাষাণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাষ্ট্র ভাষা

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক প্রয়োজনানুযায়ী একটি রাষ্ট্র ভাষা প্রচলন করিবার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে মনোনয়ন করিয়াছেন। তদনুসারে বাংলাতেও হিন্দী প্রচারের জন্য হিন্দীভাষীগণ বিপুল উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাংলার মনীষীগণ কিন্তু এদিকে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই—যেন ইহার সহিত বাংলার হিতাহিতের কোন সম্পর্ক নাই। "বিচিত্রা" এই দিকে মনোনিবেশ করায় সুখী হইবার কারণ আছে।

জাতীয় ঐক্যের জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাষাভাষীগণের মধ্যে মিলন সহজ নহে। সমভাষা থাকিলে ভাবের আদান-প্রদান, একাভিমুখী কর্ত্তব্য ও পরস্পর সহানুভূতি প্রকাশের পথ থাকে। সে জন্য কংগ্রেস হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিচালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু জননায়কগণ কেহই সময়সাপেক্ষ বিচার করেন নাই এবং গণমতের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন নাই।

ভারতের সকল প্রদেশেরই এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতি প্রাচীন ও জনজীবনের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত। সেই প্রদেশগুলির ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক দোষগুণ বিচার না করিয়া সত্বর একটি ভাষাকে কেবল সেই ভাষাভাষীর সংখ্যাবাহুল্যের জন্য রাষ্ট্রভাষা করা, এবং বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্যকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করা অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা।

প্রথমে জনসংখ্যার হিসাব করিলে দেখা যায় যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা নয় কোটীর উপর। কিন্তু এই ভাষার মধ্যে হিন্দী ও হিন্দুস্থানী নামক দুইটি ব্যাপক বিভাগ আছে। প্রথমোক্তটি প্রধানতঃ বিকৃত সংস্কৃতমূলক এবং শেষোক্তটি অতিরিক্ত আরবী ও পার্শীমূলক। এই দুই ভাষার ব্যাকরণ ভিন্ন ও সাহিত্যও পৃথক। উর্দ্দুভাষীগণ সাধারণতঃ মুসলমান এবং তাহারা কিছুতেই হিন্দী ও উর্দ্দুকে এক বলিয়া স্বীকার করেন না। সে হিসাবে হিন্দীর সংখ্যাবাহুল্য থাকে না। (আমরা বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দীর বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিলাম না।)

ইহার পরেই বাংলাভাষীর সংখ্যা পাঁচ কোটীর উপর। এই ভাষার সঙ্গে আসামী ভাষার বিশেষ পার্থক্য নাই। "স"কে"হ" উচ্চারণ করা (যাহা পূর্ব্ববঙ্গে হয়) এবং "র"কে "ৰ" (পেটকাটা) লেখা এমন কোন প্রভেদ নহে যাহার জন্য এই দুই ভাষা পৃথক্ গণ্ডীভুক্ত হইবে। তাহার উপর শ্রীহট্টের বাঙ্গালীগণ ও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান উপনিবেশকারীগণ আসাম ছাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ভাষার ও ভাবের আদান প্রদানে আসামী ও বাংলা অতি শীঘ্রই এক হইয়া যাইবে। সুতরাং আসামীর সংখ্যা বাংলার সহিত যোগ করা উচিত। মোগল যুগের "সুবে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার" মধ্যে বাংলার প্রান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে যে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহার সহিত বাংলার কোন প্রভেদ নাই। তাহাদের সংখ্যা কত তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। আগামী আদমসুমারীতে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বাংলা ভাষাভাষীর সঠিক সংখ্যা জানা যাইবে।

তাহার পর দ্রাবিড়ী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, মারাঠী, প্রভৃতির সংখ্যা এত কম যে তাহাদের সংখ্যামূলক কোন বিচারের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সংখ্যাবিচারই সব নহে। ভাষার সৃষ্টিবৈচিত্র্য, এবং সাহিত্যিক সমৃদ্ধি গণনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষার তুলনা সমস্ত ভারতে নাই। বাংলা আজ বিশ্বসাহিত্য-আসরে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে। প্রাচীনতাতেও বাংলা অন্যান্য প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা কম যায় না। যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্ভারে মণ্ডিত

হইয়া বাংলার সাহিত্য-কমল নানারূপে পূর্ণ বিকশিত হইয়া আপনার সহস্রদল বিস্তার করিতেছে তাহা সর্ব্বতোমুখী। বাংলা জীবন্ত ভাষা। দেশ বিদেশের জয়টীকা তাহার ললাটে; রবিরশ্মি-উদ্ভাসিত বাংলাকে সুদূর পশ্চিম অর্ঘ্য দিয়াছে। জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কত বিভিন্ন সমস্যার সমালোচনা ও সমাধান করিয়া বাংলা বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষার সহিত সমতালে চলিয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রাচীনকালে ভারতে সংস্কৃত ও পরে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ ভাষা দুটিতে আমাদের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য-গুলি রহিয়াছে। এখনও এমন একটি ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত যাহার ঐ ভাষা দুটির সহিত অধিকতম সাদৃশ্য আছে। সে ভাষা বাংলা। আর্য্যসমাজীগণ ত হিন্দী প্রচলনের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহী; তাঁহাদের সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা ৺দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় এই কারণেই বাংলা ভাষার কথা বলিতেন।

হিন্দী ভাষা শিক্ষাও বিশেষ সহজ নহে। বিচিত্র বক্ররেখা-সংকুল, বিকট চিহ্ন-কণ্টকিত অক্ষরগুলি শিক্ষার্থীর প্রাণে ভয় লাগাইয়া দেয়। অক্ষরগুলি সুখপাঠ্য নহে, তাহার উপর ব্যাকরণও কটু এবং কঠিন। লিঙ্গভেদে ও বচনভেদে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়।

আরও একটি বিশেষ কারণে বাংলায় হিন্দী প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গালী বণিক্ আজ হিন্দীভাষীর নিকট ব্যবসায়ে পরাজিত ও বিতাড়িত। বিদেশী বণিক্ বাংলার অর্থকে অবাধে লুণ্ঠন করিতেছে। যদি তাহারা নিজেদের কথিত একটি ভাষার সাহায্য পায় তাহা হইলে তাহাদের শোষণের আরও সুবিধা হইয়া যাইবে। পরাধীনতা আমাদের জীবনে সর্ব্বাবস্থায়, তাহার গ্লানি ও বেদনা কি ভাষা ও সাহিত্যের জগতেও ভোগ করিতে হইবে?

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অখণ্ড জাতীয়তার উদ্ভব ও উন্নতির বিরোধী মনে করা ভুল। প্রতি জাতির বৈশিষ্ট্য নিজের সাহিত্যে রক্ষিত থাকে, তাহাকে নিরসন করিতে যাওয়া অন্যায়। ইউরোপে স্লাভ (Slavonic) জাতিকে তাহার সভ্যতা ভুলাইবার জন্য জার্ম্মান ও মেগিয়ার (Magyar)-গণ স্লাভ ভাষা শিক্ষা রহিত করিয়া মেগিয়ার ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করে। কোনও জাতিকে পরবশ করিতে হইলে তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভুলাইয়া বিজেতৃ-ভাষা শিক্ষা দেওয়া একটি উৎকৃষ্ট উপায়। পরের ভাষা চিরকালই পরের ভাষা। ঠিক যে কারণে ইংরেজীকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিতে চাই ঠিক সেই কারণেই হিন্দীও উপেক্ষণীয়। যে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহার প্রতি আর্থিক কারণে আকর্ষণ থাকিবেই; এবং সে হিসাবে ইংরেজীভাষা বাংলার যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা হিন্দী বাঙ্গালার প্রতি—এবং প্রতি দেশীয় ভাষার প্রতি করিবে।

বৈশিষ্ট্যহীন যে ঐক্য তাহা প্রাণহীন।

কেবল ভাষাগত ঐক্যই সব নহে—জীবনে ভাবগত ঐক্যও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। যেখানে ভাবের ঐক্য নাই, কর্ত্তব্যের সমতা নাই, সহানুভূতির লেশ মাত্র নাই সেখানে ভাষার ঐক্য যে মিলন আনিবে তাহা ত সাময়িক বালুকা-প্রাসাদ। ভাষার ঐক্য যদি মিলন আনিয়া দিত তাহা হইলে যুক্ত সাম্রাজ্য ও ইংলণ্ডে চিরবিচ্ছেদ হইত না; স্বার্থের মিলন আছে বলিয়া ও কর্ত্তব্য সদা জাগ্রত আছে বলিয়াই যুক্ত সাম্রাজ্য বিপুল জনসংখ্যা লইয়া এমন একটি দেশ গড়িয়াছে যাহার অধিবাসী পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী। আর মনের মিলন নাই বলিয়াই ভারতে ধর্ম্ম ও প্রাদেশিকতার বিবাদ এত তীব্র।

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কিরূপে অখণ্ড জাতীয়তা বজায় রাখিতে পারে তাহা ৺ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষায় এম, এ পরীক্ষার সৃষ্টি করিতে হইবে। "যাঁহারা এই এম, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ একটি মূল ভাষা ও তাহার সহিত অন্তত একটি ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে।...এইভাবে...প্রতিবর্ষে আমরা কয়েকজন শিক্ষিত লোক পাইব যাঁহারা স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া ভারতের অপর দুই চারিটী ভাষাতেও সুপণ্ডিত।... ফলে দাঁড়াইবে এই—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা,

দীক্ষা, মতি, গতি, ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। এক দেশের যে সাহিত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য, তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রবেশ করিবে।...বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে এক হইতে থাকিবে।"

যদি অন্য কোন রূপে মিলন সংসাধিত হয় তাহাও উত্তম। আমরা শ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করিতে চাই। একের জন্য অন্যের ধ্বংস বা ক্ষতি উচিত নহে। মনে রাখিতে হইবে রাজনৈতিক বাক্‌পটুতাই জীবনে একমাত্র পথনির্দ্দেশক নহে। বিবেচনাহীন ত্বরিত মত-প্রকাশই কর্ম্মপথে শ্রেয় নহে। যেখানে একটি কার্য্যের উপর দেশের ও প্রতি প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেখানে নেতাগণের নিকট আমরা অধিকতর দূরদর্শিতা ও চিন্তাশীলতা আশা করি। ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় ভারতীয় নিগড় নির্ম্মাণ অবাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ-বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

নানা কথা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্যানাডা এবং জাপান ভ্রমণ শেষ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ৫ই জুলাই কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। উপস্থিত তিনি শান্তি-নিকেতনে অবস্থান করিতেছেন। বিদেশ ভ্রমণের ফলে কবির স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সুস্থ ও সবল চিত্তে দেশের কল্যাণ সাধন করুন সমগ্র ভারতবর্ষের এই একান্ত কামনা।

ভ্যাঙ্কুভরের আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে ক্যানাডা গবর্মেণ্ট্ রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন—এ কথা সকলে জানেন। ক্যানাডার কার্য্যাবসানে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌-এ গিয়া রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অভিভাষণ দিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। যথাকালে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌-এ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌-এ প্রবেশ করিবার যোগ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য ভ্যাঙ্কুভরের ইমিগ্রেশন আফিসে তাহাকে একজন মামুলী যাত্রীর মত শুধু যাইতেই হয় নাই, তথায় সেখানকার একজন কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত যেরূপ অশিষ্ট আচরণ করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ব-বরেণ্য নিমন্ত্রিত যাত্রীর পক্ষে অচিন্তনীয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন সাধারণ-নিয়ম-পালনোৎসুক কর্ম্মচারীর অসঙ্গত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়া তাহাকে বোধ হয় ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌কে ক্ষমা করেন নাই। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌-এ পদার্পণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তিনি জাপান যাত্রা করেন। এ সকল কথা সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন।

এই ঘটনায় ভারতবাসিগণের পক্ষে দুঃখের চেয়ে উল্লাসের কারণ অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। অপমানিত করিয়া মহৎকে হীন করা যায় না,—সে অপমান ফিরিয়া আসিয়া

অপমানকারীকেই ম্লান করে। এ ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমগ্র জগতের মধ্যে কোনো ব্যক্তির শ্রদ্ধা কমে নাই, কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর প্রতি অনেকের কমিয়াছে। এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথ এবং ইমিগ্রেশন্ অফিসের সেই কর্ম্মচারীর মধ্যে পরিসমাপ্ত বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহার এক দিকে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ এবং অপর দিকে এশিয়া। ভবিষ্যতে এশিয়ার যে-কোনো প্রদেশ হইতে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া যখন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এ যাইবেন তখন এ কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। আপাতত, রবীন্দ্রনাথ সমস্ত এশিয়ার মুখ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া এশিয়ার অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরলোকে অমৃতলাল বসু

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, রসরচনানিপুণ অমৃতলালের মৃত্যুতে বঙ্গনাট্যশালা ও সাহিত্য অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি যেমন কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, অভিনয়-কুশলতায়ও তাঁহার খ্যাতি অবিনশ্বর হইয়া আছে। অমৃতলাল হাস্যরসাবতারণায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিল।

পরলোকে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও স্বদেশহিতকারী ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। দেশের সমস্ত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্ব তেজোব্যঞ্জক ছিল,—এবং সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থে ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বঙ্গদেশে জমিদার-সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং কয়েকদিন ব্যবস্থাপকসভায় মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ এক কৃতী সন্তান হারাইল।

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাঁ

গত ২৭শে আষাঢ়, ১৩৩৬, বরাহনগর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র দাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ পোষাক ও বস্ত্র ব্যবসায়ী জহরলাল পান্নালাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্যবসা বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং পটুত্ব ছিল। যখন বালি ও ইম্পিরিয়াল্ পেপার মিল্ উঠিয়া গিয়া টিটাগড় পেপার মিলের সহিত যুক্ত হয় তখন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা টিটাগড় পেপার মিলের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবাবু কর্ম্মী এবং দাতা ছিলেন। অনেক দীন, দরিদ্র, বিধবা তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের ক্ষতি হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

বিশ্বভারতীতে যুযুৎসু

রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়া সেখানকার অন্যতম ক্রোরপতি বেরণ কে ওকাকুরার অতিথি ছিলেন। ভারতবর্ষে যুযুৎসু খেলার প্রচারকল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞকে স্বদেশে পাঠাইবার জন্য বেরণকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে মিষ্টার সিন্জো টকাগাকি আগামী নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিতেছেন। যুযুৎসু বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অপরিসীম।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

বুদ্ধের জন্ম

ভাদ্র, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

তৃতীয় বর্ষ, ১ম, খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৩৬ | তৃতীয় সংখ্যা

সীমার সার্থকতা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ কথা মাঝে মাঝে শুনেচি যে, কবিত্বের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নেই। ঈশ্বরের সাধনাকে কাব্যালঙ্কারের ক্ষেত্র হ'তে সংসারে কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করলে সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজে এ কথা ভেবেচি। কিন্তু আমি জানি এরূপ চিন্তা মনের মধ্যে মরীচিকা-বিস্তার মাত্র। মানুষের যে রিপু তার কানে মিথ্যা মন্ত্র জপ করে, লোভ তার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, তুমি যা তার মধ্যে সত্য নেই, তার বাইরেই সত্য।

কিন্তু উপনিষদ্ বলেচেন :--"মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং।" কারো ধনে লোভ কোরো না। অর্থাৎ তোমার সীমার বাইরে যা আছে তার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত কোরো না।

কেন করব না, ঐ শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষদ বলছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে আছেন; অতএব যার মধ্যে তিনি আছেন, যা তাঁর দান, তার মধ্যে কোনো অভাবই নেই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্য্যকে উপলব্ধি করিনে তখনই মনে করি ঐশ্বর্য্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু যে দীনতাবশত ঐশ্বর্য্যকে নিজের মধ্যে পাইনে, সেই দীনতা বশতই তাকে অন্যত্র পাবার আশা নেই।

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি তখনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনি আমরা এমন একটা ভুল ক'রে বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাব,—যেন আত্মহত্যা করলেই অমর জীবন পাওয়া যায়! যেন আমি না হ'য়ে আর কিছু হ'লেই আমি ধন্য হব। কিন্তু আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্য কোনো আমিত্ব লাভ ক'রে তা হ'তে নিষ্কৃতি পাব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বার হ'য়ে যায় তবে সে জলের দোষ নয়, দুধ ঢাললেও সেই দশা হবে এবং মধু ঢাললেও তথৈবচ। জীবনে একটি মাত্র কথা ভাববার আছে যে, আমি সত্য হব। আমি কবি হব, কি কর্ম্মী হব, কি আর কিছু হব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হব এ কথার অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করব। দুরাশার প্রলোভনে সেইটের সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি তবে সত্য ব্যবহার হ'তে ভ্রষ্ট হব।

অহঙ্কারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি তার কারণ এই, আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে

আমাদিগকে ঠিকটা বুঝতে দেয় না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্যায় বাধা দিয়ে কেবলি বলতে থাকে, তুমি যা তুমি তার চেয়ে আরো বেশি অথবা অন্য কিছু। এ হ'তে পৃথিবীতে যত দুঃখ যত বিদ্বেষ যত কাড়াকাড়ি হানাহানির সৃষ্টি হ'তে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যা মিথ্যা তাকেই গায়ের জোরে সত্য করতে গিয়ে পৃথিবীতে যত কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতি দান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকলে মঙ্গল নেই। ভূমাকে আমাদের পেতেই হবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পেতে হবে এ ছাড়া গতি নেই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব্ব ক'রে থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না, কিন্তু অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এই জন্যে একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করতে যাই তখন দেখি বিশ্বকে আয়ত্ত না করলে তাকে পাবার জো নেই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ; তার এমন একটা দিক আছে যে-দিকটাতে কিছুতে তাকে শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করব এই আমাদের সাধনা। কারণ সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করেছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁর বিলাস, তাঁর বিহার। তাঁর সেই নিকেতনকে ভেঙে ফেলে তাঁকে বেশি ক'রে পাব এমন কথা মনে করা ভুল।

গোলাপফুলের মধ্যে সৌন্দর্য্যের একটি অসীমতা আছে তার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ ফুল—সে সম্বন্ধে কোনো অনির্দ্দিষ্টতা নেই। এই জন্যেই গোলাপ ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়েচে যা চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে, যা জগতের সমস্ত সুন্দরের মধ্যে। সে সুনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ফুল ব'লেই সমস্ত জগতের সঙ্গে তার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা, সুতরাং সেই খানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁর আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এই জন্য জগৎ-সৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলি সুব্যক্ত হ'য়ে উঠচে। সীমা হ'তে সীমার অভিমুখে চলেছে অসীমের অভিসার যাত্রা। কুঁড়ি হ'তে ফুল, ফুল হ'তে ফল, কেবলি রূপ হ'তে ব্যক্ততর রূপ।

এই জন্যেই আপনাকে স্পষ্ট ক'রে পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট ক'রে পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ ক'রে পাওয়া। যখনি নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হ'তে নিজেকে সংহত ক'রে সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট ক'রে দাঁড় করানো যায় তখনি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভাল সাঁতার যেম্নি শিখি অম্নি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হ'য়ে আসে এবং তা সুন্দর হ'য়ে প্রকাশ পায়। পাখী যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখতে হয় কারণ, তার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নেই, তা সুনিয়ত অর্থাৎ তা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পেয়েছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা থেকে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্য্যতা, নিরানন্দ, তাই বিনাশ।

কাব্যালঙ্কার তখনি ব্যর্থ যখনি তা মিথ্যা—অর্থাৎ যখনি তা আপনার সীমাকে না পেয়ে আর কিছু হবার চেষ্টা করচে। তখনি সে ভাণ করে; তখনি সে ছোটকে বড় ক'রে দেখায়, বড়কে ছোট ক'রে আনে। তখনি তা কথার কথা মাত্র, তা সৃষ্টি নয়। কিন্তু কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মূর্ত্তি দান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে। জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যেই তার স্থান। সত্যকর্ম্মী যে কর্ম্মের সৃষ্টি করে, সত্য সাধক যে জীবনের সৃষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন নেবার অধিকার তার।

কার্লাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড় স্থান দিয়েচেন ভেবে দেখলে বোঝা যায় তার অর্থ এই যে, তাঁরা মিথ্যা বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গৌরব দান করতে চান। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিথ্যা কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়।

আসল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক্ না কেন তা একই, তা-ই মানুষের চিরসম্পদ। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকা আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে সে টাকা কেবল মাত্র টাকা নয়, তা অন্নও বটে, বস্ত্রও বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; তখন সে টাকা সত্য মূল্যের সীমায় সুনির্দ্দিষ্টরূপে বদ্ধ ব'লেই আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সে আপনার সত্য-মূল্যের দ্বারাই আপনার বাইরের বিবিধ সত্যপদার্থের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়; তেমনি সত্য কবিতার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকার সত্যসাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কবিতা আকারেই থাকে না। তা মানুষের প্রাণের মধ্যে হ'য়ে মিলিত কর্ম্মীর কর্ম্ম ও তাপসের তপস্যার সঙ্গে যুক্ত হ'তে থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকত তবে মানবজীবনের সকল প্রকার কর্ম্মই অন্য প্রকার হ'ত। কারণ, মানুষের সত্য বাক্য চিরদিনই মানুষের সত্য কর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হচ্চে, তাকে শক্তি দিচ্চে, মূর্ত্তি দিচ্চে, তার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করচে।

অতএব এই কথাটি আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করলেই নিজের অসীমকে লঙ্ঘন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্ম্মে বা ধর্ম্মসাধনায় যে-কোনো মানুষ সত্য হয়েচে তার সঙ্গে অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার ক'রচে, অন্য সকলে সীমাভ্রষ্ট অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন তেমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই অস্পষ্টতাই তুচ্ছ। নদী যখন আপন তটসীমাকে পায় তখনই সে অসীম সমুদ্রের অভিমুখে ছুটে যেতে পারে—যদি সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়ে আরো বড় হবার জন্যে আপনার তটকে বিলুপ্ত ক'রে দেয় তা হ'লেই তার গতি বন্ধ হ'য়ে যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে জলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এ কথা মনে রাখতে হবে আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সঙ্কীর্ণতা নয়, নিশ্চেষ্টতা নয়। বস্তুত সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মানুষ উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিধৃত হওয়ার দ্বারাই মানুষের চেষ্টা বেগবান হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তি, ব্যক্তি হওয়ার দ্বারাই মানুষের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি, জাতীয়ত্বলাভের দ্বারাই সর্ব্বজাতির মধ্যে স্থান পেতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নি, সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারিয়েচে। যে লোক বড় লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ ক'রে নিজেকে পেয়েচে। যে ব্যক্তি নিজেকে পেয়েচে তার আর জড়তার মধ্যে প'ড়ে থাকবার জো নেই—সে আপনার কাজ পেয়েচে, সে আপনার স্থান পেয়েচে, সে আপনার আনন্দ পেয়েচে—নদীর মত সে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলতে থাকে—তার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাকে সহজে চালনা ক'রে নিয়ে যায়।

আবিরাবীর্ম্ম এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ, তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে প্রকাশিত হ'ন এই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দোব। পাহি মাং নিত্যম্—আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর! আমার সত্যের মধ্যে সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা কর—আমি যেন সীমার বাইরে আপনাকে হারিয়ে না ফেলি। আমি যা পূর্ণরূপে তাই হ'য়ে যেন তোমার প্রসন্নতাকে তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে অনুভব করি; অর্থাৎ আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ ক'রে আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করতে পারি, এই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
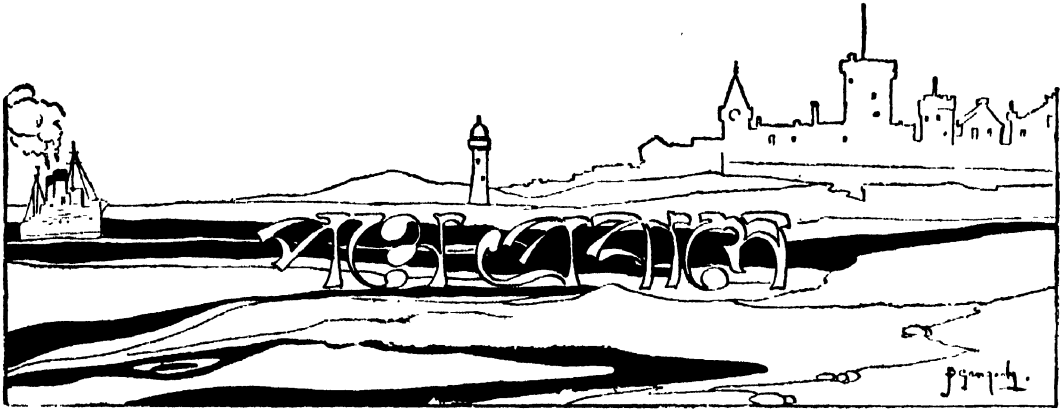
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৮

কেবলমাত্র সূর্য্যের আলোর দ্বারা একটা দেশের কতটা পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে তার সাক্ষী গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড। মাটি তেমনি আছে, মানুষ তেমনি আছে, সভ্যতার জগন্নাথের রথ তেমনি উদ্ভ্রান্তগতিতে চলেছে; কিন্তু মেঘ কুয়াশার কপাট যেই খুল্‌ল অমনি দেখা দিল সূর্য্যালোক চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোক। ইংলণ্ড ছাড়াও যে দেশ আছে সমুদ্রের নজরবন্দী হ'য়ে মেঘ-কুয়াশার কারাগারে সেকথা আমরা জান্‌তুম না; এখন দেখা গেল আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাত বাড়ানোটাই শক্ত, কেননা হাত দিয়ে যে আমরা মাটি আঁক্‌ড়ে থাক্‌তেই ব্যস্ত।

এমনি মধুর গ্রীষ্মকালে কেমন ক'রে মানুষের যুদ্ধে মতি হয় অনেক সময় আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি। শীতের অন্ধকারে শরীরটাকে গরম রাখ্‌বার জন্যে পরস্পরের শরীরে বেয়োনেটের চিম্‌টি কাটা ও পরস্পরের মুখ দেখ্‌বার জন্যে বারুদে আগুন ধরানো, এর অর্থ বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু বসন্তকালে গ্রীষ্মকালে শরৎকালেও অরসিকের মতো যুদ্ধ কর্‌তে কেমন ক'রে ইউরোপের লোকের প্রবৃত্তি হলো? আকাশের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দিনের পর দিন যায়, তবু তার রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। সে আমাদের নিত্য বিস্ময়। পাখীগুলো যে কেন সারাবেলা গান গেয়ে মরে, এত ফুল যে কোন আনন্দে ফোটে, বন ও মাঠ দখল করেও রাজপথের বক্ষ ভেদ ক'রে ঘাস মাথা তোলে কেন, মোটরের দাপাদাপিকে অগ্রাহ্য ক'রে শামুক তার অবসর মতো ঘণ্টায় দশ ইঞ্চি অগ্রসর হয় কেন, এই অপরূপ শহরটাকে কেন এমন অপূর্ব্ব দেখায়, কলকারখানার কলঙ্ক নিয়েও কেন ইংলণ্ড এখনো অম্লানযৌবনা—এসব ধাঁধার একমাত্র জবাব, সূর্য্যের করুণা।

সূর্য্য অভয় দিয়ে বল্‌ছে, পৃথিবীকে তোমরা যত খুসী কুৎসিত যত খুসী দুঃখময় যত খুসী বিশৃঙ্খল করো না কেন আমি আছি তার সুখ-সৌন্দর্য্য-শৃঙ্খলার কুবের-ভাণ্ডারী, আমি তাকে সোনা ক'রে দেবো।

সূর্য্য আমাদের বিনামূল্যের বীমা-কোম্পানী। যখন যা হারায় তা গড়িয়ে দেয়। জীবন হারালেও জীবন ফিরিয়ে দেয়। সূর্য্যের assurance শুন্‌লে তাই ফুল-পাখী-ঘাস-শামুকের মতো আমাদেরও প্রাণে ভরসা আসে. আমরা জীবনকে একটা কাণাকড়ির চেয়ে মূল্যবান মনে করিনে, আমরা ওদেরি মতো নিরুদ্বেগে দিন কাটাই, অকারণে খুসী হই। ঐ যে সাদা প্রজাপতিটি, ওর জীবন একটা দিনের—কোথায় ওর মৃত্যুভয়, কোথায় ওর জীবনের মূল্য, কোথায় ওর অপ্রিয় কর্ত্তব্য? খোলা আকাশের

জানালা দিয়ে সভ্য মানুষের অর্থহীন হট্টগোল ও আর্ত্তনাদ সুতো-ছেঁড়া ফানুসের মতো কোথায় উড়ে গেল।

এমন দিনে চোখ-কান-মন খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে সুখ আছে। যাই দেখি তাই নতুন মনে হয়, আশ্চর্য্য মনে হয়। রাস্তার এক কোণে দুই বুড়ী ব'সে ফুল বেচ্ছে। অত ফুল তারা পেল কোথায়? সব ফুলের কি তারা নাম জানে, মর্ম্ম বোঝে, যত্ন জানে? শাকসব্জীর হাট; নানাদেশের ফল পাতা জাহাজে ক'রে গাড়ীতে ক'রে এসেছে। গাড়ী সেই মান্ধাতার আমলের টাট্টুঘোড়ার গাড়ী, গাধার গাড়ী, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গাড়োয়ান তুরুচ্চার শব্দ ক'রে চলেছে, তার হাঁটু থেকে পা অবধি একটা পাটের থলে কম্বলের কাজ করছে, তার অলক্ষিতে কখন একটা ছোঁড়া গাড়ীর পেছন ধ'রে ঝুলে পড়েছে। হাটের কাছে অপেরা হাউস্, রাত্রে Chaliapine অপেরায় নাম্‌বেন, সকাল থেকে লোক জ'মে গেছে; এক একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ার ভাড়া ক'রে এক একজন ব'সে গেছে সন্ধ্যাবেলা কখন টিকিট-ঘর খুল্‌বে তারি প্রতীক্ষায়; কেউ সঙ্গীতের স্বরলিপি নকল করছে; কেউ বই পড়্ছে; কেউ গল্প করছে; কেউ বা চেয়ারের উপর নিজের নামের কার্ড্ এঁটে দিয়ে আপিসে গেছে কিম্বা বেড়াতে গেছে। কাছেই ড্রুরী লেনের থিয়েটার—কবেকার থিয়েটার—গ্যারিক্ ও সেরা সিডন্‌স্ একশো দেড়্শো বছর আগের মানুষ। ইংলণ্ডের থিয়েটারগুলোর অধিকাংশই অত পুরোনো নয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে বহু শতাব্দীর রুচি ও সাধনা রয়েছে—এক অভিনেতার থেকে আরেক অভিনেতায় সংক্রামিত, লুপ্ত থিয়েটার থেকে চলিত থিয়েটারে হস্তান্তরিত। সেইজন্যে ইংলণ্ডের থিয়েটার এক একটা যুগে খুব উঁচুদরের না হ'লেও কোনো যুগেই নীচু দরের হ'তে পারে না, আগের যুগের আদর্শ তাকে পাঁক থেকে টেনে তোলে। ফ্রান্সের থিয়েটার আরো পুরাতন—ফ্রান্স্ যতদিনের থিয়েটার ততদিনের। সে যেন জাতির ধমনী। তার স্বাস্থ্যনাশ জাতির স্বাস্থ্যনাশের সামিল। ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, মহাযুদ্ধের দিনেও ফ্রান্সের থিয়েটারে লোকারণ্য। ইংলণ্ডের থিয়েটার তার অতখানি নয়—ইংলণ্ডের ধমনী তার ক্রিকেট খেলার মাঠ, তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

কাছেই হাইকোর্ট। হাইকোর্টটি যে-কোনো ভারতবর্ষীয় হাইকোর্টের থেকে ছোট ও জন-বিরল। ইংরেজের দেশে স্পেক্‌টাকুলার কিছুই নেই, এক যুদ্ধ জাহাজ ছাড়া। তাই ভারতবর্ষের লোক লণ্ডনে এসে বিষম ক্ষেপে যায়—এই তো দেশ, এই তো মানুষ, এই তো দৃশ্য, এই তো খাদ্য, এই দেখ্‌তে এতদূর আসা! লণ্ডনের অর্দ্ধেকের বেশী লোক অকথ্য বস্তীর বাসিন্দা, মে-ফেয়ারের অদূরেই ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের বস্তী, পার্লামেন্টের প্রদীপ যেখানে জ্বলছে সেইখানেই আঁধার। মে-ফেয়ারও এমন কিছু আহা-মরি নয়, আমাদের মালাবার হিল্ ওর থেকে ঢের বিলাস-যোগ্য। বিলেত দেশটা মাটির ব'লে মাটির! ব্যাঙ্ক্ পাড়াতে বেড়াতে যাও—কল্‌কাতার ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের দোসর। টেম্‌স্ নদীর চেহারা তো জানোই—সিন্ধুপ্রদেশে বোধ করি ওর থেকে বড় বড় নালা আছে। লণ্ডনের বাগানগুলো দেখে একজন লাহোরবাসীর নাক সিঁটকানো দেখ্‌বার মতো। উত্তর ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মস্‌জিদ্ ও দক্ষিণ ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির ইংলণ্ডের ক্যাথিড্রল্‌গুলোকে হার মানায়। রাজবাড়ীর তুলনা ভারতবর্ষে অন্ততঃ ছ'শো বার মিল্‌বে, কেননা ভারতবর্ষের সামন্তরাজারা ক্ষমতায় যাই হোন জাঁকজমকে এক একটি চতুর্দ্দশ লুই। পঞ্চম জর্জ্জ তো তাঁদের তুলনায় একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের লোক সাইট্‌সীয়ার হিসাবে ইংলণ্ডে এলে ঠ'কে যাবে। সিনেমা দেখাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে সিনেমা স্থাপন করতে তো বেশী খরচ লাগে না। বিদ্যা-লাভের জন্যে যদি আস্‌তে হয় তবে এত দেশ থাকৃতে কেবল ইংলণ্ডে কেন? হাঁ, ব্যবসা করতে আসা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তা করতেও গোটা দুনিয়া প'ড়ে আছে।

তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে বেশী ক'রে ইংলণ্ডেই আসা উচিত। এবং সব দেশের লোকের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরই ইংলণ্ডে আসা বেশী দরকার।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড চরিত্রের জগতে antipodes। ইংলণ্ডের যে গুণগুলি আছে ভারতবর্ষের সেই গুণগুলি নেই, ও ভারতবর্ষের যে গুণগুলি আছে ইংলণ্ডের সেই গুণগুলি নেই। এই এক কারণে এত দেশ থাকতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যোগাযোগ ঘটলো। এবং এই এক কারণে স্বাধীন ভারতবর্ষকেও সাম্রাজ্যহীন ইংলণ্ডের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স্ জার্ম্মানী রাশিয়া কমবেশী ভারতবর্ষেরই মতো। তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শেখবার আছে অনেক, কিন্তু তাদের চরিত্র ভারতবর্ষের চরিত্রের সঙ্গে এত মিলে যায় যে তাদের চরিত্র থেকে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করবার আছে অল্পই। অন্য কথায় তারা ভারতবর্ষের সগোত্র, তাদের সঙ্গে বিবাহ বড় বেশী ফল দেবে না। ইংলণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বার করে। ইংলণ্ড খোঁজায়, ভারতবর্ষ খোঁজার শেষ ব'লে দেয়। ইংলণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ব্রিটানিয়া নিষ্ঠুরা স্বামিনী,—তাকে খুসী করবার জন্যে প্রাণ হাতে ক'রে জাহাজ ভাসাতে হয়, হয় রত্ন নিয়ে ফিরে আসা, নয় প্রাণ হারিয়ে দেওয়া, নয় উপনিবেশ গ'ড়ে ফিরে আসবার নাম না করা। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি—গৃহস্থ, —ক্রৌঞ্চ পাখীকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামীবর্জ্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সেই তার স্নেহের অতিথি। একের চরিত্রের চির বিপদ্বরণস্পৃহা অপরের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে সমন্বিত হবে, এই অভিপ্রায় উভয়ের বিধাতার মনে ছিল। ইতিহাস তো এক রাশ আকস্মিকতা নয়। আকাশের এক কোণে বাতাসের অভাব ঘটলে অন্য কোণ থেকে যেমন বাতাস ছুটে যায়, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণতা দিতে ইংলণ্ড তেমনি ছুটে গেছে। অন্য দেশ যায়নি, কারণ অন্য দেশ ভারতবর্ষেরই মতো। অন্য দেশ গিয়ে ফিরে এসেছে, কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না।

একথা ঠিক্ যে, ফ্রান্স্ যদি ভারতবর্ষের হাত ধর্ত তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার মনের অমিল ঘটতো না, যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু তা হলে ভারতবর্ষের চরিত্র কোনোদিন পূর্ণতা পাবার সুযোগ পেত না। ফ্রান্স্ যে দেশে গেছে সে দেশকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, সে দেশকে বলেছে—তোমরাও ফরাসী, তোমরাও স্বাধীন। এ বাণীর সম্মোহন কোনো দেশ এড়াতে পারে নি। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরা কেউ কেউ ফ্রান্সের সেনাপতি হ'য়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা সম্রাট্ও হ'তে পারতুম, যেমন কর্সিকা-বাসী ইতালীয়ান-বংশীয় নেপোলিয়ন একদিন হয়েছিলেন। কেবল নিজেকে ফরাসী ব'লে ঘোষণা করতে হতো, এই যা কষ্ট। ফরাসীরা অনেকটা মুসলমানদের মতো ডেমক্রাটিক—তাদের দলে ভর্ত্তি হওয়া খুব সোজা, এবং ভর্ত্তি হ'লে আর পালাতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষের মুসলমান আরব দেশের মুসলমানের কাছ থেকে কীই বা পেয়েছে, শুধু নামটা ছাড়া। তবু সেই নামটাকে পাস্পোর্ট্ ক'রে সে পৃথিবীর সব দেশে সমনামাদের প্রীতি পায়। ফরাসী নামটারও তেমনি মহিমা। এই নাম নিয়ে আমরা এত দিনে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে লিখতুম "ফ্রেঞ্চ্ রেপাব্লিকের কয়েকটা জেলা"—যেমন আল্সাস্ লোরেন বা সাভয়, তেমনি বাংলা বা আসাম।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সবই আমরা পেতুম, ফ্রান্স্ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতুম না। কিন্তু আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকেই ফ্রান্স্ আমল দিত না, ফ্রান্সের লজিক-প্রিয় মগজ অসঙ্গতি সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত ফরাসীরা আমাদের দেশে একটিও দেশীয় রাজা থাকতে দিত না, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা আঁকবার পক্ষে সোজা হতো। হিন্দু মুসলমান আইনের বদলে চালাতো কোড্ নেপোলিয়ন। এক কথায়, আমাদের ভারতীয়ত্বটুকু কেড়ে নিয়ে আমাদের দিতো তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ফরাসীত্ব।

কিন্তু, গোড়ায় গলদ, ফ্রান্স্ কোনোদিন ভারতবর্ষ নিতেই পারতো না। কেন না ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষগুণ মোটের উপর আমাদের কাছাকাছি। ফরাসীরা গৃহপ্রিয়, দেশ ছেড়ে বেরুতেই চায় না, বড় জোর খিড়কীর কাছে আফ্রিকা পর্য্যন্ত ওদের গতিবিধি। ইন্দোচীন প্রভৃতি খুচরো উপনিবেশগুলোকে ধর্ত্তব্য মনে করলে ফিজি প্রভৃতি জায়গার আমাদের উপনিবেশকেও ধরতে হয়। গৃহপ্রিয়

মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া করা; চক্রান্ত করা; সন্ধি করা ও পাশাপাশি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভায় যতগুলো চেয়ার ততগুলো দল। ফ্রান্সের সাহিত্যরাজ্যেও যতগুলি লেখক ততগুলি পত্রিকা, যতগুলি পত্রিকা ততগুলি দল। কোনো একটা দলের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে লেখককে লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে খাতিরই করতে চায় না। ফ্রান্স্ পরিবার-প্রধান দেশ। পরিবারের সঙ্গে জড়িত না হ'লে পরিবারের ভার মাথায় না নিলে ব্যক্তিকে সে ব্যক্তিই মনে করে না। ইংলণ্ড ব্যক্তিকে চ'রে বেড়াবার পক্ষে যথেষ্ট মুক্তি দিয়েছে, John Bull ষাঁড়ই বটে, তার পারিবারিক দায়িত্ব সামান্য। তাই ইংরেজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ষাঁড়েরও গোষ্ঠ থাকে, বৃহৎ গোষ্ঠ। ইংরেজের বৃহৎ ক্লাব, বৃহৎ পার্টি। বৃহৎ পার্টির একজন না হ'লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এদেশে নগণ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অক্রিয়। এদেশের মাটিতে আকাশকুসুম যদি বা জন্মায় তবে সে নেহাৎ আগাছা,তাকে উপড়ে ফেল্‌বার আগেই সে মানে মানে স'রে পড়ে। Shelley ইতালী প্রয়াণ করলেন, Bertrand Russell আমেরিকা প্রয়াণ।

ইংলণ্ডের চরিত্রের আরেকটা গুণ, তার চরিত্র মুহুর্মুহু বদলায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজকে দেখ্‌লে প্রপৌত্র ব'লে চিনতে পারবে না, এরা আরেক জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘ'টে গেছে। কিন্তু চাকার তলার দিকটা কখন উপরের দিক হয় চাকা তা জানে না, চাকা ঘুরতেই ব্যাপৃত। প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বিপ্লব চলেছে; চোখে পড়ে না এই জন্যে যে, চোখও বিপ্লবের অঙ্গ। Galsworthyর নতুন নাটক "Exiled"এ নীচের ধাপের লোক উপরের ধাপে উঠ্‌লো, Galsworthy একে ঠাট্টা ক'রে বল্লেন, "evolutionary process" এবং যারা নবাগতের ধাক্কা খেয়ে উপরের ধাপ থেকে পা পিছলে পড়্‌ল তাদের জন্যে দুঃখ করলেন। কিন্তু তারাও তো "evolutionary process"-এরই কল্যাণে ভুঁই ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। এখনকার ভুঁইফোঁড়রাও পঞ্চাশ বছর পরে উপরের ধাপ থেকে "exiled" হবে। তা ব'লে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ইংলণ্ড যতই বদ্‌লাক ইংলণ্ডই থাক্‌বে, চাকা যতই ঘুরুক চাকাই থাক্‌বে। পুরাতনকে ইংলণ্ড সমীহ করে, কিন্তু নির্ব্বাসিতও করে, এ্যারিষ্টক্রাটের প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা, কিন্তু পালা ক'রে সবাইকে সে একই গদিতে বসাবে ব'লে কাউকেই দীর্ঘকাল গদিয়ান হ'তে দেয় না। পর্ব্বতের চূড়ায় যেই ওঠে সেই টাল সাম্‌লাতে না পেরে আছাড় খায়, অথচ যে দেশের সমাজের গড়ন পার্ব্বত্য সে দেশে কতকগুলো লোককে চূড়ায় চ'ড়ে চূড়াচ্যুত হ'তেই হবে। অধিকাংশ এ্যারিষ্টক্রাটেরই বংশলোপ হয়, সুতরাং কষ্ট ক'রে তাদের মাথা কাটতে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ বাড়াতে গিয়ে অতিমাত্রায় জন্মশাসন, তার ফলে বংশলোপ। উচ্চতর মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসন-পূর্ব্বক নিজেদের সংখ্যা কমাতে লেগেছে, তার ফলে নিম্নতর মধ্যবিত্তরা উচ্চতর মধ্যবিত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের পরিবারে আজকাল তিনচারটির বেশী সন্তান দেখ্‌তে পাওয়া ভার। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর লোক ক্রমশ নিম্নতর মধ্যবিত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই হলো "evolutionary process।" এটা ইংলণ্ডের একটা মস্ত উদ্ভাবন। এতে শ্রেণী-বিশেষের লাভ লোকসান হতে পারে, সমস্ত দেশটার লাভ লোকসান কিছুমাত্র নেই। পরিবর্ত্তন বিনা কোনো জীবন্ত দেশের জীবন থাকে না, এবং দু'তিন পুরুষ অন্তর মাথা-কাটাকাটি না ক'রে প্রতি পুরুষেই একের নির্ব্বাসন ও অপরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভালো, না, মন্দ? এতে জাতির চরিত্রটাতেও মরচে ধরে না, নতুন গুণাবলী পুরোনো গুণাবলীকে মুছে সাফ ক'রে দেয়। পুরোনো এ্যারিষ্টক্রাসীর সঙ্গে তুলনা করলে নতুন এ্যারিষ্টক্রাসীর কোনো গুণ দেখ্‌তে পাও না কি? ভুঁইফোড় ব'লে ঠাট্টা যদি করো তবে ভুঁইফোড়ের ভিতরকার সত্যকে হারাবে। দুটোকে যে একসঙ্গে বাহাল করেনি এর কারণ ইংলণ্ড একসঙ্গে দুটো সত্যকে সইতে পারে না। ইংলণ্ডের পাকশাস্ত্রে পাঁচমিশেলি নেই। মাছমাংসের সঙ্গে আমরা আলু-কপি মিশিয়ে রাঁধি, একথা শুনে একজন থ' হ'য়ে গেলেন। "তা হ'লে তোমরা

মাছের কিম্বা মাংসের কিম্বা আলুর কিম্বা কপির বিশেষ স্বাদটি পাও কি ক'রে?" এর জবাব—"তা পাইনে। কিন্তু সমস্তটার সমন্বয়ের স্বাদটি পাই।"

বিপ্লবকে ইংলণ্ড ঠেকিয়ে রাখে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে ঘট্‌তে দিয়ে! সূর্য্যের চার দিকে পৃথিবীর রেভল্যুশন যেমন প্রতিদিনের ব্যাপার অথচ কোনোদিন আমরা খবর পাইনে যে আমরাও সেই রেভল্যুশনের ব্যাপারী, ইংলণ্ডেও তেমনি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক রেভল্যুশন নিত্যকারের ঘটনা ব'লে কোনো ইংরেজ টের পায়না কত বড় ঘটনায় সে লিপ্ত। টের পেলে সে ঘট্‌তে দেবে না, সেইজন্য বিপ্লবটাকে কিস্তিবন্দীভাবে ঘটাতে হয়। এ্যারিষ্ট-ক্র্যাটের হাত থেকে শ্রমিকের হাতে শাসনভার আস্‌তে দু'শো বছর লেগেছে; স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন অন্তত একশো বছরের; দেড়শো বছর ধ'রে আক্রমণ ক'রেও টাট্টু-ঘোড়ার গাড়ীকে এখনো ঘায়েল করতে পারা যায়নি, চরকা এখনো কোনো কোনো ঘরে ঘর্ ঘর্ করছে; এবং এমন লোক এখনো অনেক যারা "immaculate conception"প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস হারায় নি। তথাচ ইংলণ্ড কোনোদিন চুপ ক'রে ব'সে নেই, সে প্রতিদিন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, প্রতিদিন পুরোনো গহনাকে ভেঙে নতুন ফ্যাসানে গড়িয়ে নিচ্ছে। ইংলণ্ডের মন সংস্কারকের মন। পলিটিক্সের মতো সব বিষয়েই ইংলণ্ডে একটা চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ (permanent opposition) আছে—ইংরেজ মাত্রেই কোনো না কোনো বিষয়ে একজন বিদ্রোহী। আবহমান কাল ইংরেজ মাত্রেই ব'লে আস্‌ছে—"This state of things must not continue." আমাদের বুলির সঙ্গে এ বুলির কত না তফাৎ। আরো ভাব্‌বার কথা, এ বুলি আবহমান কালের ও প্রতিজনের। "Something must be done"—এই হলো এ বুলির উপসংহার। একটা নমুনা দিই। সার্কাস্ ইংলণ্ডে নেই বল্লেও হয়। তবু সার্কাসে বাঘ হাতী প্রভৃতি বন্য জীবকে নাচানো অনেকের চোখে নিষ্ঠুর ঠেকে। এখনো ইংলণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় খরগোস-শীকার পাখী-শীকার চলে, সেটাও নিষ্ঠুর কাজ। খুনীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তো রীতিমতো বর্ব্বরতা। এই সব বন্ধ কর্‌বারজন্যে পার্লামেন্ট্‌কে আবেদন করা চলেছে। এই ধরণের আবেদন প্রতি বছর পার্লামেণ্টে পৌঁছয়। Vivisectionএর বিরুদ্ধে লোকমত গড়া বহুকাল থেকে চ'লে আস্‌ছে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখ্‌তে হবে যে, এই সব ছোটখাটো সংস্কার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের উদ্যোগিতার ফল—মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাধারণ লোকের সারা সময়ের কাজ নয়। সমাজ-রাষ্ট্রের এক একটা চক্রাংশ যদি প্রত্যেকে ঘোরায় তবে সমস্ত চাকাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরে, সমাজ-রাষ্ট্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে বদ্‌লে যায়, অধ্যবসায়ীর পক্ষে জীবিত-কালেই চক্র-পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা শক্ত হয় না। প্রত্যেক ইংরেজ মরণকালে এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, আমিও কিছু না কিছু ঘটিয়েছি। অবশ্য খুব বেশী নয়, খুব অসাধারণ নয়, তবু কিছু!—আমাদের দেশেও যদি সবাই সামান্য ক'রেও কিছু কর্‌তো—প্রতিদিন কর্‌তো—তবে আমাদের অসাধারণ মানুষগুলিকে অহরহ চরকার মতো ঘুর্‌তে হতো না, চরকাও ঘোরাতে হতো না এবং আমাদের সাধারণ মানুষগুলি কর্‌বার মতো কত কাজ প'ড়ে রয়েছে দেখে "কোনটা করি, কোনটা করি" ভাব্‌তে ভাব্‌তে জীবন ভোর ক'রে দিতো না, কিম্বা এক-সঙ্গে সব ক'টাতে হাত দিয়ে সব ক'টা মাটি কর্‌তো না, কিম্বা হাজার বছরের আলস্যের হাজারটা নোঙরকে এক বিপ্লবের ঝড়ে বিপর্য্যস্ত কর্‌বার দিবাস্বপ্ন দেখ্‌তো না। Eternal vigilanceএর বদলে দুটো দিনের খুনোখুনি খুব স্পেক্‌টাকুলার বটে, কিন্তু দুটো দিনই তার পরমায়ু।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস—

—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
('দিদি' রচয়িত্রী)

৪

গৃহে

"কথা কও, কথা কও! অনাদি অতীত! অনন্ত রাতে কেন ব'সে
চেয়ে রও?

যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে!
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই, তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী—স্তম্ভিত হ'য়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও!"

গ্রামের মধ্যে প্রবেশের প্রথমেই চোখে পড়ে বহু পুরাতন প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীটা তার সেকালের ছোট ছোট ইটে গাঁথা বিস্তৃত দেহের অস্থি-পঞ্জরের কিয়দংশ কতকগুলা গাছের আড়ালে লুকাইয়া খানিকটা বা দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পুড়াইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরের দিকের কথঞ্চিৎ অভগ্ন ইমারত বা সু-উচ্চ চণ্ডীমণ্ডপের থামের মাথায় তাহার চওড়া এবং স্থানে স্থানে ভগ্ন কার্নিশের উপরে বনপায়রারা একেবারে তাহাদের উপনিবেশই স্থাপন করিয়াছে; এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তাহাদের কূজনের আর বিরাম নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে একদিকে দুইখানা ভাঙা পাল্কী ও কতকগুলা ভগ্নাবশিষ্ট দামী 'কাঠ কাঠ্‌রা' ধূলি-জঞ্জালের মধ্যে অৰ্দ্ধমগ্ন ভাবে বোধ হয় তাহাদের অতীত সৌভাগ্যেরই ধ্যান করিতেছিল। অঙ্গনের সবটাই প্রায় কালকাসিন্দার বনে আচ্ছন্ন। সম্পূর্ণ ভগ্ন দেউড়ির দুইধারে ছাতহীন কতকগুলা ইষ্টক স্তূপেমাত্র পর্য্যবসিত গৃহের ভিতরে শেব্‌ভেরেণ্ডার গাছগুলা বোধ হয় উঠানের ফলগুলার সহিত পাল্লা দিবার জন্যই সদলে ক্রমশঃ মাথা উঁচু করিয়া তুলিতেছে। এখানে বোধ হয় এক কালে দ্বারবানদিগের গৃহ ছিল। চারিদিকে ভগ্ন প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান, কোথাও বা তাহা একেবারে সমভূম কোথাও বা খানিকটা অংশ অতিকষ্টে তখনো নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। বিস্তৃত অঙ্গনের একপার্শ্বে কয়েকটা "রাম লক্ষ্মণ গোলা" বা ধানের মরাই; এককালে তাহাতে হয়ত শত শত মণ ধান্য বোঝাই হইত, এখন তাহাদের অধিকাংশই জীর্ণ গলিত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে; যে কয়টি দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের অবস্থাও শোচনীয়। কোনটার চালে মোটেই খড় নাই, বাঁধন পচিয়া বাতা খসিয়া পড়িতেছে, কোনটা বা হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গৃহস্থ তাহাদের মধ্যে এখন বর্ষার জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বেই একটা বিস্তৃত গোশালার চিহ্ন বর্ত্তমান, কিন্তু সেস্থানে আর গরু রাখা চলে না, অদূরে অধুনা-প্রস্তুত একটি চালায় দুই একটি গাই ও বাছুরের উপযুক্ত স্থানেই গৃহস্থের বর্ত্তমান গোধন-সম্পত্তির পরিমাণের প্রমাণ দিতেছে।

দূরে কোন মাঠের দিকের বন হইতে একটা চাতক পাখী কেবলই 'ফটি-ই-ইক্ জল' বলিয়া চেঁচাইয়া মরিতেছিল। তাহার তীব্র শিষে সেই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের বুকে যেন একটা শিহরণ আনিয়া দিতেছে। গৃহস্থের রন্ধন-গৃহের পার্শ্বে শাখাপত্রবহুল ঝাঁকড়া আম গাছের ঝোপের মধ্যে বসিয়া ঘুঘু দম্পতি তাহাদের ঘুঘু ঘুৎকারে সেই ফটি-ই-ইক্‌জল শব্দের বিরাম অবসরটুকুও একটা করুণ অলসতায় পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। রন্ধন গৃহের মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা বিধবা বধূ তখনো গৃহকার্য্য সারিতেছিল। একটি মধ্যবয়স্কা রমণী "মাসিমা কই" বলিয়া ক্ষুদ্র উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূটি মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কে রাধা ঠাকুঝি! এস ভাই! মাসিমা বুঝি কারও বাড়ী বেড়াতে গিয়েছেন।"

"এই রোদে পাড়া বেড়াতে?"

"আর তুমি?" বলিয়া বৌটি মৃদু হাসিল। "আমার কথা?" বলিয়া রাধা ঠাকুর্ঝি-অভিহিতা নারী একটু বিষাদ-গম্ভীর হাস্যে উত্তরটার সেইখানেই সমাধান করিয়া বলিল, "তা হ'লে এখন যাই, একটু কাজ ছিল, অন্য সময়ে আস্‌ব।" "এই রোদে আবার ফিরে যাবে কেন, ব'স না ভাই!" রাধা যেন আপত্তিসূচকই কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু দাওয়ার একপাশে দুই একখানা চিঠির সঙ্গে একটা অছিন্ন পুস্তকের মোড়ক দেখিয়া সহসা ধপ্ করিয়া তাহাদের নিকটে বসিয়া পড়িল এবং বালিকার মত আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি বই এসেছে ভাই বৌদিদি? একটু প'ড়ে শোনাবে বল? তাহ'লে বসি।"

"বই নয়, মাসিক কাগজ।" "কাগজ! কাগজের এরকম চেহারা তো কখনো দেখিনি! আমরা যা দেখ্‌তাম খুব বড় বড়, নবাবু পড়তেন—"অর্দ্ধপথে সহসা থামিয়া রমণী যেন বাক্যহারা হইয়া গেল, যেন কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে। একটু পরে যথাসাধ্য সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া ভগ্ন কণ্ঠে যেন কোন্ দূর দেশ হইতে এই বলিয়া কথাটার সমাপ্ত করিল—"এরকম কাগজ কখনো দেখিনি!"

বৌটি আপন মনেই কাজ সারিতেছিল; উত্তর দিল, "এখন এই রকমই হ'য়েছে! বড় বড় যা আছে সেগুলো সপ্তাহে সপ্তাহে আসে। এ অন্য জিনিষ!" "প'ড়ে শোনাবে বৌদিদি?" বধূ চারিদিক চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে শোবার ঘরে চল, সেখানে পড়্‌লে কেউ শুন্‌তে পাবে না। আচ্ছা তুমি তো লেখাপড়া জান শুনেছি, নিজেও তো পড়্‌তে পার।"

রাধা একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হয়ত মনে নেই বৌদি! ছোট বেলায় দাদামণিরা জুলুম ক'রে কেউ কেউ আমায় পড়াতেন। মা খুড়িমারা তাতে তাঁদের কত বক্‌তেন, তবু দাদারা আর খোকারা আমার ওপর মাষ্টারির লোভ ছাড়তে পারতেন না। কোথায় সেসব দিন আর সে সব—!" বক্ত্রী এবং শ্রোত্রী উভয়ের মধ্যেই সেই দ্বিপ্রহরের মতই একটা স্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। একটু পরে আবার রাধা বলিল, "যাঁরা আছেন তাঁরাও যদি বাস করেন তা হ'লে কি এ গাঁয়ের আর এ বাড়ীর এমন দুর্দ্দশা থাকে? দশ বৎসর আগেও এর এমন দশা ছিল না। কর্ত্তারা গেলেও বড় দাদাঠাকুর এক রকমে কতক ঠাট বজায় রেখেছিলেন। তখনো বাড়ীতে কত 'কৃষাণ মুনিস' খাট্‌তো, ধানের জমি থেকে ধান, আকশাল থেকে জালা জালা গুড় আস্‌ত! ঐ সব পুকুরেরই বা কত ছিরি ছিল, ওর থেকে কি মাছটাই না ধরা হ'ত! আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনকার সঙ্গে তুলনা না হ'লেও—"

"আজ বই পড়া থাক্, তোমার ছোটবেলার গল্পই বল না রাধা ঠাকুর্ঝি! খুব ছোট বেলাকার কথা, যার আগে আর কিছু মনে পড়ে না সেইখান থেকে বল।"

"আমার প্রথম কথা বৌ, তোমার বড় জেঠ্‌শাশুড়ী যদি বেঁচে থাক্‌তেন তাঁর কাছে শুন্‌তে পেতে। আমার তো তা মনে নেই। শুনেছ তো আমার মা এদেশের লোক নন্, এখানে তিনি কখনো আসেনওনি। আমাকে আর আমার একটা বোন্‌কে দুটাকায় তিনি তোমার বড় জেঠ্‌শাশুড়ীর কাছে বেচে দুর্ভিক্ষের দিনে প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁদের গাঁয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। বোন্‌টা চার পাঁচ বছরের আর আমি মাত্র নাকি তখন এক বছরের। তাকেও আমার মনে পড়ে না, কেননা সে বেশি দিন বাঁচেনি। তোমার জেঠ্‌শাশুড়ীর মেয়ে ছিল না তাই যত্ন ক'রেই আমায় বাঁচিয়েছিলেন। কুচবেহার থেকে ঐরকমে তার আগে যে-সব মেয়ে কিনে এনে বড় করেছিলেন তারা ঝি চাকরাণীর মতই কতকগুলো এ সংসারে তখন থাক্‌তো; তারা নাকি ঐ জন্যে আমার কত হিংসে কর্‌ত!"

বৌটি একটু বাধা দিয়া বলিল, "তাদের মধ্যের যারা এখনো আছে, তারা তো ভাই, দেখ্‌তে কেউ তোমার মত নয়! তুমি—"

রাধা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি যাঁর পেটে হয়েছিলাম তিনি নাকি খুবই সুন্দর ছিলেন—মার মুখেই একথা শুনেছি। তোমার জেঠ্‌শাশুড়ীই যে আমার মা ছিলেন তা বোধ হয় শুনেছ। আমার দেশের মেয়েগুলো যে হিংসে করত তার এও একটা কারণ। কিন্তু আমার

বাবা আমার মার বিয়ে-করা স্বামীই ছিলেন। আমার সে মা কোথা থেকে অত-সুন্দরী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু আমরা আমাদের বাপেরই সন্তান। পুষ্‌তে না পেরেই তারা বিক্রি করেছিল, একথা কর্ত্তারা কতবারই বলেছেন। এক টাকায় একটা জীবন বিক্রি। এ কি এখন কেউ বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে? ন'দাদাবাবুর কাছে শুনেছিলাম কোন্ সভ্যদেশেও নাকি এই রকম মানুষ বিক্রি ছিল। তাদের যে কি ভীষণ দুঃখের কথা, ওঃ, শুন্‌তে শুন্‌তে আমি—"

বৌটি আবার বাধা দিয়া বলিল, "টম কাকার কুটীর তুমি শুন্‌তে বুঝি? ন'দাদা বাবু কে? তিনিই শুনিয়েছিলেন তোমায়?"

রাধা একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া শেষে বলিল, "ও বাড়ীর বাবু। এখন তো তাঁরা কেউ নেই। তাঁর দিদি ঠাকুরুণের কাছেই তো আমি থাকি।"

"কেন ভাই ঠাকুর্ঝি! তুমি আমাদের শ্বাশুড়ীর পালন-করা মেয়ে, এই বাড়ীরই তো তুমি, তুমি ও বাড়ী থাক কেন? ও বাড়ীর ঠাকুরঝি ঠাকরুণ আর তাঁর পিসি তাদেরও আর কেউ নেই বটে, কিন্তু তাঁদের সেবা কি আমাদের কাছে থেকেও করা চল্‌তো না? তুমি ও বাড়ীর হ'লে কেন ভাই?"

"আমার ভাগ্য বৌদিদি! যা বলছিলাম শোন, কিন্তু তাই ব'লে কিনে এনে এঁরা তেমন কষ্ট কাউকেই দিতেন না। যাঁদের এখানে এনেছিলেন তাঁদের সব বৈষ্ণব ক'রে কণ্ঠি মালা দিয়ে তাঁদের একটা জাত একটা দল ক'রেই দিয়েছিলেন। যে মেয়েগুলো এনেছিলেন তাদের সব ঐরকম বৈষ্ণবদের এনে বিয়ে দিয়ে দিতেন। তাদের কিছু কিছু জমি দিয়ে ঘর দুয়োর ক'রে গরু বাছুর দিয়ে দিব্যি এক একটা সংসারই ক'রে দিতেন। ঐ যে হরিদাসী, জান তো ও-ও কেনা মেয়ে ছিল তোমাদের। বেচারা ক'বছর হ'ল মরেছে ছেলে মেয়ে রেখে। দুটুরা এ গাঁ থেকে চ'লে গিয়েছে, নন্দ দিদি বুড়ো হ'য়ে এখনো বেঁচে আছে। ওকে আমরা জ্ঞান হ'তে ছেলে পিলের মা-ই দেখে আসছি। ওরা সবই ত তাদের কেনা মানুষ। এখন এক এক ঘর গৃহস্থ হয়েছে।"

বৌটি বলিল, "সে বইয়েও এরকম দয়ালু মনিবের কথাও দু একটা আছে বটে। কিন্তু যাই থাক্, কি কাণ্ডই ছিল তখন।"

রাধা সে কথা যেন কানে না করিয়া পূর্ব্বের জের টানিয়াই বলিল, "ছিল নাকি? ভুলে গেছি কবে পড়েছিলাম!"

"তবে তুমি তা হ'লে নিজেই পড়্‌তে পার্‌তে। তবে কেন শোনাতে বলছিলে। লুকুতে চাও বুঝি?"

"লুকুতে নয় বৌ, ভুলে গিয়েছিলাম! তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎই মনে হ'ল ও কথাটা, তাই মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল। ভুলে গেছি এখন সবই, বোধ হয় নিজেকেও। এ সব কথা থাক্ বৌ, চল কি পড়্‌বে বলছিলে শোনাবে না?"

বৌটি তখন অবশিষ্ট কার্য্য সমাপনান্তে রান্নাঘরে কুলুপ দিয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিল। পুরাতন ইটের ছাদ্‌লা-ধরা আলিশা ও প্রাচীরযুক্ত গৃহ—সমস্ত বাড়ীতে বহু পুরাতন গৃহের একটা ভাপ্সা গন্ধ। মেঝে সোঁতা ধরা—'খেলো ডোবা' স্থানে স্থানে সুরকি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বত্রই চুণ-বালি-খসা ইষ্টকের কঙ্কাল মূর্ত্তি। ঘরের মধ্যে সেকালের লম্বা লম্বা হুড়কাযুক্ত কাঠের সিন্দুক, কড়ির আল্‌না, সেকেলে ভারি ভারি পায়াযুক্ত খাট! দেয়ালের গায়ে খানিকটা করিয়া মাটির লেপ এবং তাহাতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে সূক্ষ্ম আলিপনার কারুকার্য্য এক একখানা প্রতিমার চালিচিত্রের মত দেখিতে। বধূ বলিল, "উপরের ঘরে গেলেই ভাল হয়। যাবে সেখানে?" রাধা একটু দ্বিধা করিল, শেষে বলিল, "আচ্ছা চল।" যে বারান্দা দিয়া সিঁড়ির ঘর তাহার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। মেঝেটায় ইটের চিহ্নই বোঝা যায়না, মাটি দিয়া সমস্ত ভরাট্ ও নিকানো, তথাপি অসমতল। এক দিকের কড়িতে দুই তিনটা বাঁশের ঠেকা দেওয়া বা 'খোপ্ ধরানো' রহিয়াছে। সিঁড়িঘরের দরজাও খুব নীচু, মাত্র ইটের-গাঁথা সঙ্কীর্ণ সিঁড়িগুলিও প্রায়ই ভগ্ন—তবে ধাপ খুব নীচু নীচু—উপরে গিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানের খিলানেও দুইটি বাঁশের 'খোপ্'। সিঁড়ির একটা বাঁকের উপরে দুই ধারের ভিত্তিতে লৌহের শিকলে-ঝোলানো দুই-

খানা ভারি কপাট বড় বড় লোহার গুল্ বসানো—মাঝে মাঝে দুই চারিটা ফুটা তোলা রহিয়াছে। রাধা সেই কপাটের গায়ে হাত দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কোথায় বা 'যদুপতির মথুরা' আর 'রামের অযোধ্যা', তবু এ দুখানা এখনো ঝোলানো রয়েছে। যখন কর্ত্তারা সাত সমুদ্র না হোক্ তেরো নদীর পার থেকে নৌকাভরা নানা জিনিস পত্র টাকাকড়ি সঙ্গে দেশে আস্তেন দেউড়ি ঘরে তো দারোয়ান থাক্‌তোই, তবু এই দরজা বন্ধ ক'রে নাকি তাঁরা ডাকাতের ভয়ে থেকে নির্ভয় হয়ে ঘুমুতেন। ঐ যে সব ফুটো—ঐ দিয়ে নাকি দরকার হ'লে গুলি চালাতে পারা যেত। আমার কালে আর তাঁদের এত "দব্‌দবা" ছিল না—'মরন্ত' 'পড়ন্ত' দশাতেই অলক্ষ্মীর মত আমি আসি! ঐ জলাঙ্গীর ঘাটেই তাঁদের নৌকা এসে গন্ধের সদাগরদের মত লাগ্‌তো নাকি! আমিও ঐ ঘাটেই এসে প্রথম হয়ত নেমেছি।" বধূটি মুগ্ধ ভাবে একমনে এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য রমণীর কথা শুনিয়া যাইতেছিল; এইবার বলিল, "তুমি কিন্তু ভাই অন্য সকলের মত নও, অনেক যে জান্‌তে তোমার কথার ফাঁকে তা যেন বেরিয়ে পড়ে। তুমি কি চিরকাল এমনি ভাবে এই-খানেই আছ ভাই? তা কিন্তু মনে হয় না।" তাহারা তখন সিঁড়ির উপর ধাপে পৌঁছিয়াছে। সিঁড়ির উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে একটা টানা চোর কুঠরীর মত সুদীর্ঘ অনতি-উচ্চ কক্ষ; রাধা সেইদিকে চাহিয়া প্রসঙ্গটা যেন উল্টাইয়া দিবার জন্য বলিল, "ঐ ঘরটায় গিয়েছ কখনো? ওর উত্তরের দেয়ালে লম্বা লম্বা কাঠের বড় বড় 'ঝিলিমিলি' গাঁথা আছে। চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর পুজো হ'ত, আর যেখানে এখন ভাঙা পাল্কীগুলো রয়েছে ঐখানে গানের আসর বস্‌ত। তখন ঐ ঝিলিমিলি তুলে মেয়েরা ঠাকুর দেখ্‌ত, গান শুনতো! ও ঘরটায় কি আছে এখন?" "দেখ্‌বে? চল।" বলিয়া বধূ একটু কৌতুক ও উৎসাহপূর্ণ ভাবে সেইদিকে যাওয়ায় রাধাও অগ্রসর হইয়া তাহার ক্ষুদ্র দরজার ভিতর দিয়া গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিল—সেকালের অনেকগুলো ছোট বড় বেতের পেঁট্‌রা অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় এক কোণে জড় করা রহিয়াছে; কয়েকটা লুপ্তবর্ণ চিত্রকরা হাঁড়ি, গাদা করা কাঠের বড় বড় বারকোস্, পায়াভাঙা টুল, সামাদানের কয়েকটি আধার, এক কোণে কতকগুলো নীল শ্বেত সবুজ রঙের কাঁচের ভাঙা ও গোটা হাঁড়ি, কতকগুলা ঝুলাইবার কাঁচের বেল আর দুই তিন খানা বড় বড় জলচৌকির উপরে বহুপুরাতন সামিয়ানা; বৃহৎ সতরঞ্চ—জীর্ণ গলিত অবস্থায় অব্যবহারের দরুণ শ্যাওলা ছাতাধরা দেহে সুপ্ত করী-শাবকের মত বসিয়া আছে। এ সব ছাড়া একটি কোণে ভিত্তি-গাত্রলগ্ন একটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপরে একটি শ্বেতবর্ণের পেচকরাজ পরম গম্ভীর মুখে বিরাজমান! সেই বিজন গৃহে সহসা জনসমাগমে তিনি সচকিতে চাহিলেন এবং খানিকক্ষণ পট্ পট্ করিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া দারুণ বিরক্তিভরে শেষে ঘাড় না ফিরাইয়াই চক্ষুর দৃষ্টিকে গৃহের ভগ্ন জানালাটির দিকে ফিরাইয়া লইলেন। তাহার সেই দৃষ্টি ফিরাইবার ভঙ্গীটিই বধূটির কৌতুক ও উৎসাহের উৎস! রাধাও হাসিয়া বলিল, "তুমি এইখানে আস্তানা নিয়েছ!—আচ্ছা থাক, থাক!—চোখ ফিরাতে হবে না—আমরাই চ'লে যাচ্চি।"

উপরের বারান্দার বিরল এবং ভগ্ন কপাট-জানালা হইতে ক্ষুদ্র গ্রামের বিরল বসতির কতকটা দেখা যাইতেছিল। দূরে আর একটা ইষ্টকস্তূপ; তাহার অর্দ্ধেক ধসিয়া-পড়া বক্ষোপঞ্জর ভেদ করিয়া একটি তরুণ অশ্বত্থবৃক্ষ কালের জয়পতাকার মত তাহার সবুজ পাতা নাড়িয়া পত্ পত্ শব্দ করিতেছিল। তাহারই নিকটে ত্রিশূল-চূড় শিব-মন্দিরটি, জঙ্গলে যাহার অর্দ্ধেকই প্রায় ঢাকিয়াছে। রাধা সেইদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "যাঁদের প্রতিষ্ঠিত ঐ মন্দিরটি, তাঁদের বাড়ীটি পর্য্যন্ত ধ্বংস পেয়েছে—বাকি ঐ মন্দিরটুকু! আমার দিদি ঠাক্‌রুণ হয়ত এখনো কালিতলা থেকে মন্দিরে আসেন নি।" বধূ বিস্মিতভাবে বলিল, "এখনো পুজো শেষ হয়নি?—আচ্ছা উনি কি রোজই কালিতলায় আর শিবের মন্দিরে যান্?" "রোজ! শুধু যাওয়া কি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে পুজো করেন—জপ করেন।" অল্পবয়স্কা বধূ ঈষৎ চপলতার সহিত বলিল, "কেন ভাই? কৈ আর কেউ তো তা যান্ না—বরং রাধাবল্লভের মন্দিরের দিকেই সকলের যাবার একটু ঝোঁক্ দেখি।"

"এঁরা সব বৈষ্ণব, এ বাড়ীর সকলে পুরুষ-পরম্পরা ধ'রে ঐ রাধা-বল্লভের পূজো কচ্চেন—আর উনি আর ওঁর শ্বশুর বাড়ীর সবাই শাক্ত—তাই উনি—"

"আচ্ছা উনি তো কখনো শ্বশুরবাড়ী যান্‌নি শুনি—তবে সেখানকার ধারা কি ক'রে ধর্‌লেন ? আর শাক্ত হ'লেই কি বিষ্ণুমন্দিরে যেতে নেই—না পূজো কর্‌তে নেই !"

"বৌ, ভাই জান না ত এই আমাদের ধর্ম্মের শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া মনান্তর নিয়ে ওঁর জীবনের কি হয়েছে ! কি পরিণাম তার ! সেই কাণ্ড ঘটার পর আর তো উনি শ্বশুর-বাড়ী যেতেও পান্‌নি, তারাও নিয়ে যায়নি ! ওঁর বাপ জেঠারা ওঁকে তাদের কোন ধারা নিতেও দেননি জীবনে, নিজেদের গুরুকে দিয়েই ওঁকে দীক্ষা দেন্। কিন্তু তাঁরা গত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে উনি এই রকম পূজো ধরেছেন। কেউ বলে উনি স্বপ্নে মা কালীর দয়া পেয়েছেন, মা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঁকে স্বামীর কুলের দীক্ষা দিয়েছেন—এমনি কত কি!"

"উনি তো বিধবা কিন্তু পূজোর পরে লাল চন্দনের ফোঁটায় ওঁকে কি এক রকম লাগে, না ভাই ? কি সুন্দর চেহারা—যেন আলো ঝ'রে পড়ছে। উনি তো তোমারও খানিকটা বড় বলেছিলে না ? কিন্তু ওঁকে ছোট বা বড় কিছুই মনে হয় না, মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের মতই উনি নন্, যেন দেবতা ! আমার ওঁর সঙ্গে কথা কইতে বড্ড ইচ্ছা করে—কিন্তু মুখের দিকে চাইলেই এমন একটা ভাব আসে যাতে কেবল প্রণামই কর্‌তে হয়—আর কিছু না ! নৈলে তোমাদের গাঁয়ের লোকের কথা—ছোট ছোট বৌরা গিন্নি বান্নিদের সঙ্গে কথা কইছে—এ নিন্দে আমি গ্রাহ্য করতাম না। আমি ওঁর সব কথা তেমন খুঁটিয়ে তো শুনিনি ভাই, যাকে তাকে ওঁর সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছে করে না, লোকে অনেক ভুল বোঝে—ভুল বলে। তুমি ওঁর চিরদিনের সঙ্গী, তুমি যেমন ওঁকে জান এমন কে জান্‌বে ! বল্‌বে ভাই একদিন সে গল্প ?—আর তোমার সঙ্গেও কথা কইতে আমার কেন এত ভাল লাগে তাও জানি না ! সবাই কত বলে—দিদিরা কত ঠাট্টা করেন—" বলিতে বলিতে বৌটি নিজের সহসা-উত্তেজিত মনের বাক্-প্রগল্‌ভতায় নিজেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। রাধাও যেন তখন কোন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই মৃদুস্বরে বলিল, "জানি, সত্যিই যে আমি তোমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কইবার উপযুক্ত নই, আমি যে তোমাদের বাড়ির দাসী বৌ—আর তাছাড়া—"

বধূটি ব্যথিতভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ও কথা ব'লনা—আমি তোমায় ননদের মতই দেখি ভাই ! তবে তুমি যে আমার বড় তা মনে থাকে না, সমবয়সীর মতই মনে হয় যেন। আমার কারও সঙ্গে তো বেশী গল্প করতে এমন ইচ্ছে আসে না—কেবল তোমারই কথা কেন মনে পড়ে জানি না। নৈলে আমি তো একা নই, আমার সাথী—"

"জানি। আরও জানি যে তোমার সঙ্গী সাথী কারুই দরকারও নেই। তুমি নিজের সঙ্গে নিজেই পূর্ণ, তাই তুমি এমন নিঃসঙ্গ ঘরেও ছুটে ছুটে এস। তোমার হাতে যারা রয়েছে ঐ বই-কাগজগুলি ওরাই তোমার আদত সঙ্গী।—আমার ঐ দিদি ঠাক্‌রুণ—ওঁকে চিরদিন ধ'রে যা দেখে আস্‌ছি তারই নতুন আর একরূপ তোমার মধ্যেও আমি দেখেছি বৌ, তাই তোমার কাছে আমিও ছুটে ছুটে আসি। মনে হয় নিজের জীবনেরও সব ভার সব কথা যা জগতের কাছে অকথ্য তা তোমারই কাছে বলি। তুমি এখনি বল্‌লে না জগত অনেক ভুল বোঝে ভুল বলে ? আমারও সম্বন্ধে কত কথা তুমি বোধহয় শুনেছ, কিন্তু একমাত্র ঐ দিদি ঠাকরুণই জানেন সত্য যা ; আর তোমাকেই কেবল বল্‌তে ইচ্ছা করে।"

"কিন্তু বলনা ত কখনো ভাই ! আমারও যে কত শুন্‌তে ইচ্ছে হয়, সাহস ক'রে বল্‌তে পারি না।"

"রাধা দাসি ! তুই কি বৌমার কাছে ? কৃষ্ণপ্রিয়া যে তোকে খুঁজছেন ! মন্দির থেকে ফিরেছেন যে তিনি !" নিম্নতল হইতে কে ডাকিল। রাধা তড়িৎচমকের মত চমকিয়া দাঁড়াইল। "এত বেলা গেছে ? ওঃ, কি অন্যমনস্ক হ'য়েই আবোল তাবোল বক্‌ছি ! আর একদিন এসে আমার দিদি ঠাক্‌রুণের গল্প তোমার কাছে কর্‌ব বৌ ! ওঁর জীবনের কথা ওঁর কাহিনী মনে পড়লেই যেন চোখের ওপরই

সেই দু'যুগের কথা ভেসে ওঠে। অথচ কিছু বড় হইনি তখন আমি! এমনি মনে দাগ পড়ার মত ঘটনা সে সব। আর-একটি কথাও এ পর্য্যন্ত বলিনি তোমার কাছে, আজ একবার বলি। তোমার স্বামী আমার মানুষ করা ছোট ভাইটির মতই ছিল! ছোটবেলায় আমারই বুকে সে বড় হয়েছিল!" বধূটি নতনেত্রে বলিল, "মন্দাদিদির কাছে শুনেছি।"

তার পরে উভয়ে নীরবে নীচে নামিয়া আসিলে বধূটির মাসি শ্বাশুড়ী অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, "এত কি গল্প কর্‌ছিলে বাছা? বেলা যে গেছে। আর জান বৌমা, আজ চিঠি এসেছে, ছেলের বিয়ে দিতে তোমার জ্ঞাতি শ্বশুর হরিনাথ রায় বাড়ী আস্‌ছেন। বংশের মধ্যে উনিই তো মাত্র একটু পুরোণো লোক! আসুন, তবু যে যেখানে আছে একবার গাঁয়ে আস্‌বে একসঙ্গে। আমাদের কিশোরীরাও বাড়ী আস্‌ছে গো, বড় বৌমা কৃষ্ণপ্রিয়াকে লিখেছেন শুনে এলাম!" বধূ সানন্দে বলিল, "তাই নাকি মাসিমা? দিদি যে বড় আমায় লিখলেন না? আচ্ছা আসুন তো আগে, তখন ঝগড়া কর্‌ব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

অক্ষরের প্রতিহারী মন

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

পলকে বিজলী-লেখার ন্যায় সংসারে তরুণ তরুণীর রূপ-শিখা ক্ষণিকের জ্বলিয়া উঠা মাত্র, তারপর কাজল-ঢালা আকাশ যেমন নিভান-দীপের বিবর্ণচ্ছটায় ম্রিয়মাণ হয়, জীবনকুসুমের যৌবন-রেণু যখন বয়সের খর বাতাসে ঝরিয়া যায়, ঠিক তেমনি করিয়া জীবনটিও তখন আভাহীন্ ফুলদল-গুলির উপর ছড়াইয়া পড়িয়া অতীত-যৌবনের দুঃস্বপ্নে কাতর হয়। কিন্তু এই চলদ্‌যৌবনের মোহ কত—ইহার মাধুরী কি অফুরন্ত! কৈশোরকে রাঙাইয়া যৌবন এমনি মোহের নির্ম্মাল্য গাঁথিতে থাকে যে, ইহার পরশ পাইবার জন্য নিখিলের মন বুভুক্ষায় ভরিয়া উঠে, তারপর সে মালা পরিতে না পরিতেই—

> সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
> ফুলগুলি সব ঝরা।

যৌবন ফুল ছড়াইয়া আসিল বটে, কিন্তু ফুল-ঝারিতে গোপনে আসিল জরা,—ফুল-ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই জরা ধীরে ধীরে আপন রূপখানি খুলিতে থাকে। রাক্ষসীর অপূর্ব্ব রূপ যেমন উপকথায় দেখা যায় রাজপুত্রের মনোহরণ করিতে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র, তারপর রাজ-পুরীতে আসিয়া রাক্ষসী-রূপের খোলসখানি ফেলিয়া ধ্বংসের লাল ডগ্‌ডগে জিহ্বা বাহির করিয়া হাতী-শালে হাতী ঘোড়া-শালে ঘোড়া সাবাড় করিতে লাগিয়া যায়, যৌবনের রমণীয় কমনীয় মুখসখানির পিছনে জরার তেমনি পূর্ণ সর্ব্বগ্রাসী রূপ রহিয়াছে।

তরুণ-তরুণীর যৌবন-অভিযানে দুন্দুভি-ধ্বনি শুনাইতে কত রূপ-কথা কত কাব্য কত গল্প কত উপন্যাস স্তবকে স্তবকে বর্ষে বর্ষে মঞ্জরিত হইতেছে তথাপি ইহাদের ক্লান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই। রোমান্স কত অভিনব আকারে দিন দিন নব-তরুণকে অভিনন্দন জানাইতেছে। যাহাদের যৌবন ঝরিয়া গিয়াছে তাহাদের দিকে কাহারো খোঁজ নাই, যাহার জীবনে নূতন যৌবন জাগিয়াছে তাহার যৌবনে রাজ-টীকা পরাইতে উপন্যাস থরে থরে বিকশিত হইতেছে। যৌবনের চঞ্চল পাদবিক্ষেপে ইহার গতি যেমন নিত্য নব, বাসি ফুলের ন্যায় একদিনের অনুগৃহীতকে পেছনে ফেলিয়া ইহা যেমন কেবল বিশ্বের পুরোভাগে চিরনবীন হইয়া ফিরিতেছে, ইহাকে ধরিতেও সেই জন্য নিত্য নূতন উপন্যাসের সৃজন ঘটিতেছে।

কিন্তু উপন্যাসের তালে তালে দর্শন নাচিতে পারে না—দর্শনের Dramatis Persona যিনি তিনি হন অ-ক্ষর, আর উপন্যাসের নায়ক ক্ষর। চির-পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহার ঘর তিনি ক্ষর, চাঞ্চল্য যাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না তিনি অ-ক্ষর। উপন্যাস ক্ষরের গলায় মাধবী ফুলের মালা পরাইয়াছে, তাই ইহা নীহার-সিক্ত রূপটি খসিতে খসিতেই শুকাইয়া যায়, আবার মালা গাঁথিতে হয়। এই জন্যে উপন্যাস-রচনার শেষ নাই। কিন্তু দর্শন অক্ষরের উদ্দেশে রুদ্রাক্ষের মালা গাঁথিয়াছেন, রুদ্রাক্ষ মাধবীর ন্যায় যৌবন-সুষমায় ঢল ঢল না হইলেও ইহা বিবর্ণ হইতে জানে না, তাই নিত্য নূতন দর্শনের উদ্ভব ঘটিতে পারে না।

জরালোকে আজ ক্ষর রাজার সাজে মহিমান্বিত, কাল তাহার মহিমায় ভাটা ধরিয়াছে; কিন্তু অমৃতের হাটে অ-ক্ষর অচপল রূপে চির-দেদীপ্যমান্, চির-রূপবান্। কিন্তু জগতে এমনি বিচিত্র ধারা, যে ইহার প্রতি মানুষের মনে অনুরাগ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে না—মানুষ ইহাকে খুঁজিতে চায় না। যে জীবনেশ্বর সেই জীবন-পতির দিকে মনের ঝোঁক কই। ইনি নিশিদিন অচ্যুতের মোহন-বেণু জীবন-তারে বাজাইতে-ছেন, অনন্ত সুরের মীড় খেলাইতেছেন, কিন্তু মনে সে ধ্বনি পৌছিবে কি করিয়া? মনের সকল আঙ্গিনা ভরিয়া ঐ একখানি মধুর মুখের আল্পনা আঁকিয়া আছে—মনের সমুদ্রপ্রমাণ গভীরতা শুকাইয়া গিয়া একটুখানি পল্বলে ঐ কোন মনোহারিণী তন্বীর কুসুমাননের আভা প্রতিবিম্বিত

হইয়াছে—মনের আকাশসম বিপুলতা লয় পাইয়া একটুখানি ছোট্ট গবাক্ষ-পথে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং ঐ গবাক্ষ-পথে কাহার চমক-জাগান দুইটি চোখের তারা গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদি মন এমনি করিয়া ক্ষরের মরণোন্মুখ রূপ-তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ে তবে অক্ষরের বেণু-রব শুনিবার অবকাশ কই? সেইজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ কহিয়াছেন,—

> যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
> আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

সেই অ-ক্ষরের অনুসরণ করিতে যাইয়া মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে—তাঁহাকে পাওয়া ঘটে না। তাই তিনি অবাঙ্মনসোগোচর, বাক্য-মনের অগোচর। এক খণ্ড কাচে যাহার তুষ্টি তাহাকে কাঞ্চন দিয়া কি ফল? যদি তরুণীর রূপে মনের পূজা সমাধান হয়, যদি তরুণীর চিন্তা মনের দলগুলিকে মেলিয়া দেয় এবং মানস-লোকে উহার ছবি ধ্যানার্হা হয় তবে জীবন-পতির কেন অভিমান হইবে না? জীবন-পতি কেন সহজ চিন্তাতেই তাহাকে ধরা দিতে যাইবেন? প্রেমের আদর্শ ত ইহা নহে—যে যাহার ভালবাসা পাইতে চাহিবে তাহার ভালবাসা প্রার্থিতের অভিমুখী না করিলে অভিলষিত কেন তাহার দিকে তাকাইবে? তাই বৃহদারণ্যক জানাইয়াছেন,—

> তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ
> ...স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্যপ্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

ওগো, আমরা সেই সর্ব্বময়কে সেই অচপলকে কেমন করিয়া পাইব? যাঁহাকে দর্শন করিতে না পারায় আমরা জীবনের অঙ্গনে একবার ফুটিতেছি, কত না দুঃখদগ্ধ হইয়া আবার ঝরিতেছি—এই ফোটা-ঝরার পালা ত আর চুকে না, তাঁহাকে পাওয়াও ঘটে না—তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইব? বৃহদারণ্যক সে পন্থা কহিতেছেন—তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে কোন্ ব্যাকুলতায়? মানুষের মধ্যে কোন আস্বাদ প্রাণ মন মাতায়?—প্রেমিক প্রেমিকার অভিসার-সাধ। অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনের যে অনঙ্গ-রঙ্গ উহারই রঙ্গালয় এ সংসার। সেই ব্যগ্রতা, সেই মন-ভরা ভালবাসার ভরা-জোয়ার লইয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে হইবে। নিজে নায়িকা হইয়া যদি তাঁহাকে প্রিয়তম বলিয়া আকুল অন্বেষণ করা হয়, তবে তাঁহার আভাস ধীরে ধীরে প্রাণে জাগিতে থাকিবে, বেণুরবের মধু-মন্ত্র মানস-লোকে ক্ষীণ মূর্চ্ছনায় ভাসিয়া আসিবে।

বৃহদারণ্যক কহিতেছেন, ডাকো দেখি প্রেমিক, প্রিয়তম বলিয়া! অক্ষরের সহিত যাহার মাল্য-বিনিময় হয় তাহার কি সৌভাগ্য! সংসারে সকল সুখের সেরা যেমন প্রিয়তমকে জড়াইয়া ধরিয়া,—আবার সকল দুঃখের বাড়াও তেমনি প্রিয়তমকে হারাইয়া! ইহার চাইতে আর কি সুখ এবং কি দুঃখ আছে! বৃহদারণ্যক কিন্তু কহিতেছেন—প্রিয়তমকে পাওয়ার সুখ ইহাতে যেমন অমৃতোপম, হারাইবার আশঙ্কাও তেমনি ইহাতে একেবারে নিরস্ত। প্রিয়তমার বাহুডোর এড়াইয়া যদি শত শত প্রিয়তমকে মৃত্যু কাড়িয়া লয়—জানিয়া রাখ, তোমার প্রিয়তমকে মৃত্যু কখনো ছুঁইতেও পারিবে না; অ-মৃত কখনো মরণের অধিকারভুক্ত নহে। কাজেই এমন জনকে ভালোবাস যাহার মরণ নাই—এমন জনের প্রেমে মাতোয়ারা হও যে তোমাকে প্রেমের পরশ ছুঁয়াইয়া মৃতের মুখ-ব্যাদান হইতে অ-মৃতের হাটে লইয়া যাইতে পারে। প্রেমের অমর স্বরূপ ত ইহাই; যেখানে মৃত্যুময় দেহ ইহার লক্ষ্য সেখানে ইহা কাম—তাঁহাকে ঘেরিয়া যে আকর্ষণ তাহাই প্রেম।

এই পরশ-মণিকে ভালোবাসিতে হইলে ইহার কোথায় ঘর, কি নাম, কি রূপ সকলি জানা দরকার। কথায় ব'লে, love at first sight। ইহাকে ত দেখি নাই তবে ইহার প্রতি অনুরাগ হয় কেমন করিয়া? রূপকথায় মিলিবে হয়ত মেঘবরণ চুল শুনিয়া রাজকন্যা পাইতে রাজপুত্র মাতিয়া উঠিল—উদয়নের অনুরাগে বাসবদত্তা উজ্জয়িনী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের উদ্দেশে বরমাল্য দিয়া প্রেমের উদ্বোধন করিলেন, আর

> মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে
> সেই চাহনি এল ভেসে .....

প্রিয়তমকে আভাসে জানিয়া যতটা প্রেমের ফল্গু বহিয়াছে, প্রিয়তমের সহিত গল্ফ্ (golf) খেলিয়া, কোর্ট-সিপ্ করিয়া আদৌ তেমন মালাবদল হয় নাই। তবে

প্রেমাস্পদের যে খোঁজ উপনিষদের জ্যোৎস্নাতরঙ্গে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যে দয়িতের অতি নিকট সঙ্গোপন বসতি আমাদের শ্রবণে মননে ও দর্শনে বারতা পৌঁছাইতেছে—তাঁহাকে আমরা চাহি কই? তাঁহার সম্বন্ধে যেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল অমনি যেন কেমন সব বেসুরা হইয়া গেল—যেন তিক্ত চিরতার স্বাদ ভিতরে প্রবেশ করিল—আমাদের যেন মনে হইতে লাগিল এতক্ষণ যেন বেশ স্বর্গা-লোকে ছিলাম, এইবার

ধূমলপিঙ্গলময় মুখ
আকাশে জাগি নিভাল আলোক !

কিন্তু উপন্যাস-পাঠে ত এমনটি হয় না—পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমরা যেন পাতার সহিত গাঁথিয়া যাই। কেন? উপন্যাসের উপাদানে আমরা ভরপুর। পরশ-মণিতে যে উপাদান, আমাদের মনে কি সে উপাদান নাই? শাস্ত্র বলিতেছেন "মনসো মনো যৎ"—মনের মননশক্তি তাঁহারই।

যন্মনসা ন মনুতে যেন আহুর্মনো মতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি......

কিন্তু মন সেই মণি-পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইলেও সংসারী সাজিয়া ইহা "কামাদি বৃত্তিমৎ" হইয়া জড়-মনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাই ইহা যে উপাদানে প্রস্তুত তাহাকে, "চৈতন্য-জ্যোতির্ম্মনসোঽবভাসকং"—মনের উদ্ভাসক চৈতন্য-জ্যোতিকে মনন করিতে পারে না। আলো-ঝল্‌সান মণি যেমন পাঁকে পড়িয়া একেবারে পঙ্ক-প্রলেপে আপন স্বরূপ হারাইয়া ফেলে, আমাদের জ্যোতির্ম্ময় মনটিও তেমনি কামকর্দ্দমে মজ্জমান হইতে হইতে ইহার স্বরূপকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া "ন মনুতে ন সঙ্কল্পয়তি।" তাই উপন্যাস আমাদের প্রাণ যত কাড়িয়া লয়, উপনিষদ্ ততই বিস্বাদ ঠেকিতে থাকে। তাই যিনি সব চাইতে আপনার তাহাকে জানিতে আমাদের এই গভীর ঔদাস্য !

সুতরাং দেখা গেল পুষ্কর-পলাশ স্বরূপ সেই পুরুষকে ভালোবাসিতে হইলে আমাদের আসল মনটিকে উদ্ধার করা দরকার—উহাকে পঙ্ক-প্রলেপ হইতে মোচন করিতে হইবে। মনের উপর জড়ের যে শৈবাল জমাট বাঁধিয়াছে উহাকে ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে, তবে মনের মণিময়-সোপান উন্মোচিত হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষরের অধিকার এড়াইবার জন্য কহিতেছেন,

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

অ-ক্ষরকে পাইবার পথে কামরূপ অসুরই প্রধান অন্তরায়—এই দুর্নিবার কামাসুরকে বধ না করিলে ক্ষর কখনো অ-ক্ষরকে পাইবে না। কাম-কালিমা হইতে মন যতই বিমুক্ত হইবে ততই প্রিয়তমের নিকটতম সঙ্গোপন বসতি জানা যাইবে এবং যে আবরণ প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছিল, উহার ও উচ্ছেদ ঘটিবে।

কথা আছে light absorbs light, আলোতে আলোতে কোলাকুলি হয় কিন্তু আলোকে আঁধারে নয়—যদি মনের উপরে কামের একরাশ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠে তবে ইহার সহিত জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর আত্মনের কেমনে মিলন ঘটে; যেখানে একে অন্যকে পৃথক্ ভাগ করিয়া চলে সেখানে মিলনের নাম নাই, বিচ্ছেদের মোহনা গড়িয়া উঠে মাত্র! তাই গীতায় শত সহস্র কথার ফাঁকে ফাঁকে বর্শাফলকের মত কামানুশাসন শুনা যায়। মানব-জীবন বলিতে মানবের মন—সে মনেই জীবননাট্যের রঙ্গভূমি—সে মন যদি বিকার-ঘেরা হইয়া অভিনয় সুরু করে তবে ইহার অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে বিকারের সপল্লব শোভা-যাত্রা যত রঙীন হইয়া উঠুক না কেন সংসারে যত নাম যশই অর্জ্জন হউক না কেন, ইহাতে সেই পুরুষ-প্রধানের সাড়া মোটেই জাগে না, কারণ সেই আলো ও অন্ধকার—বিকারে নির্ব্বিকারে চিরপরাঙ্মুখতা।

মন যখন বিধৃত-কল্মষ হইয়া স্ব-রূপে উদ্ভাসিত হয় তখন ইহাতে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরের জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া হাসিয়া কুটি কুটি হয়—সমুদ্রসঙ্গমে নদীর ক্ষুদ্রত্ব তলাইয়া যাইয়া যেমন অসীম জলধির বিরাটে আপন সত্তা সমাহিত হয়, তেমনি অ-ক্ষরের মধ্যে "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" চঞ্চল মনের পল্বলত্ব ঘুচাইয়া ইহা বিশ্বম্ভরের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ খুঁজিতে খুঁজিতে বিশ্ব-জোড়া হইয়া উঠে। কত ক্ষুদ্র গণ্ডীর বেষ্টন ডিঙাইয়া ইহা কত বিপুলে প্রতিষ্ঠালাভ করে! যে মন

সুন্দরীর নূপুর-নিক্কণে বাঁধা পড়িয়া যাইত, একটুখানি বাঁকা চোখের চপল ইঙ্গিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ছাড়িত, সে মনের কি বিরাট স্ফীতি! সাগর-সৈকতে ঝিনুক লাবণ্য-লেখায় ঝল্‌সাইলেও যেমন সাগরের মন হইতে ইহা বহু দূরে, তেমনি অক্ষরের রূপে যাহার চিত্ত উদ্ভাসিত তাহার মানস-লোকের বহুদূরে থাকে যৌবন-শ্রীবিভূষিতা তন্বী। ঝিনুকের আকর্ষণে সমুদ্র কি কখনো ধরা দেয়? ঝিনুকের সৌন্দর্য্যে সমুদ্রে কখনো বান ডাকে না—পূর্ণিম শশধরের পূর্ণ সৌন্দর্য্যে

……….শিহরিলা জলধি
চলোর্ম্মি ফেনিল লাস্যচরণা নৃত্যা বারিধি।

তাই শ্রীকৃষ্ণ মোহন বেণুরব তুলিতেছেন—

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

প্রিয়তমের ধ্যান বৃহদারণ্যক গাহিয়াছেন—সেই প্রিয়তমকে পাইলে আমরা পরমারাধ্য প্রিয়ের পরশ পাইব। শরীর লইয়া প্রিয় প্রিয়ার যে পরশ উহা কাম, শরীররূপ কাঠামের ভিতরে অশরীর অক্ষরের সহিত মুক্ত মনের যে অভিসার উহা প্রেম। এ প্রেমেরই আর এক নাম যোগ। সেই প্রিয়তমকে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ডাকিলে আমরা তাহাকে নিতান্ত আপনার করিয়া পাইব—দূরে সিংহাসনে তিনি স্পর্শাতীত হইয়া রহিবেন এমন নয়, আমাদের "দরশ" "পরশ" উভয়ই হইবে—তবে চর্ম্মচক্ষে নহে, রক্তমাংসের হস্তে নহে। সেই জন্য প্রোষিতভর্ত্তৃকা যেমন পলকে পলকে ভর্ত্তৃ-স্মৃতি স্মরণে আনিয়া দয়িতের সন্নিকট-বসতি কল্পনা করিয়া সুখ পায়, তদ্রূপ অক্ষর-প্রেমিকও

অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি,
সমীপতঃ সমরতি সাধকো নিরন্তরং……

মনের মধ্যেই অক্ষর আপনার পরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন, আপনার ছবিখানি আঁকিয়া দিয়াছেন; মন ইচ্ছা করিলেই অ-মৃত-লিপি পাঠ করিতে পারে, দরশ-পিপাসু হইলে অ-ক্ষরের প্রতিকৃতি স্বচ্ছন্দে দেখিতে পারে। তাই কঠোপনিষদ্ কহিতেছেন :—

যথাদর্শে তথাত্মনি

দর্পণে যেমন আপনার মুখখানি দেখা যায়, যদি মনের মলিনতা দূর হইয়া যায় তবে মনোদর্পণে অ-ক্ষরের প্রতিবিম্ব পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে। মন অ-ক্ষরের পরিচয়-কাহিনী লইয়া ক্ষরের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পরিচয়-প্রচার দূরে থাকুক আত্ম-বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং ক্ষর-জীবের হাল ধরিয়া ক্ষর সাজিয়া বসিয়াছে। এই আত্ম-বিস্মৃতিই জীবের জন্মে জন্মে পুনরাবির্ভাব ঘটাইয়া থাকে, ইহাকে উপলক্ষ করিয়া সাংখ্য কি সুন্দর কবিত্বই না করিয়াছেন! চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম সূত্রটি 'রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ', রাজার ছেলে ব্যাধগৃহে প্রতিপালিত হইয়া জন্মাবধি জানিল যে সে ব্যাধের ছেলে—ব্যাধের চিন্তা আকার প্রকার অবলম্বনে তাহার মন ব্যাধ সাজিয়া গেল, আবার যখন উপদেশ দ্বারা তাহার মনে রাজপুত্রের অভিমান জাগ্রত হইল তখন ব্যাধের খোলসখানি তাহার মন হইতে খসিয়া গিয়া রাজ-পুত্রের রূপে তাহার মন ছাইয়া গেল—সে সত্য সত্য রাজপুত্র হইয়া গেল। এখানেও সেই এক কথা—অ-ক্ষরের অ-মৃতাধিকারী যে মন, ক্ষরের সহিত অভিন্নতা পাতাইয়া ক্ষরের মরণ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উহা জন্মে জন্মে মর মর করিতেছে।

ব্যাধ-গৃহে রাজপুত্র যেরূপ রাজ-মন্ত্রী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিল, ক্ষর-গৃহেও "অমৃতস্য পুত্র" আমরা যাহাতে আত্ম-পরিচয় জানিয়া "সোঽহম" হইতে পারি তদভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ অমৃত-ভাষণ শুনাইতেছেন :—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ

যে মন ক্ষরলোকে অক্ষরের প্রতিহারী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠ সে মন ত কামনার সোনার হরিণ দেখিয়া উহার পেছনে ধাইতে ধাইতে আপনার সর্ব্বস্ব খুয়াইতে বসিয়াছে—উহাকে উহার আত্ম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই কোন সাড়াই ত মিলে না! তাই ইহার উদ্ধরণ বাণী এত তীব্র ভাষায় শুনান হইতেছে। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মুখে যে দৌবারিক থাকে সে যদি ভাঙ খাইয়া নেশায় চুর হইয়া পড়ে তবে রাজার খবর যেমন মিলে না, ক্ষরের লালসা পানে যে মন মদিরা-মশগুল হইয়াছে তাহার প্রভুর খবরও সে কতটা বলিবে যতক্ষণ না নেশা ছুটিয়াছে?

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যেনাহম্ নামৃতা স্যাম্—

শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য এম-এ

যারা মৃত—যাহাদের মনে নাই শত প্রশ্ন, সহস্র সংশয়,
কঠিন দুঃখেরে যারা প্রতিক্ষণ সর্পসম করিয়াছে ভয়,
তাহাদের প্রেত-আত্মা বিশ্বের শোণিতে যত ঢালিছে গরল
সে সব করিয়া পান আপন জীবন আমি করিব সফল।

কোটি মানবের মাঝে আপনারে মনে হয় একান্ত একাকী
তথাপি পরম যত্নে সকলের মণিবন্ধে বাঁধি দিব রাখী ;
সিদ্ধার্থ রচিয়াছিল নিজ হাতে আপনার সুখের শ্মশান,
আমার বক্ষের তলে জ্বলিছে কি অনির্ব্বাণ সিদ্ধার্থের প্রাণ ?

আপনারে চিনিবার দুঃসহ বেদনাময় অসীম প্রয়াস,
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে জীবনের নবছন্দে পূর্ণতর নূতন প্রকাশ—
তারপর একদিন মাধুর্য্যে ভরিয়া যাবে এ মনের ক্ষুধা
সমুদ্র-মন্থন-শেষে উঠিয়া আসিবে লক্ষ্মী হাতে ল'য়ে সুধা,—

সেদিন তপস্যাতপ্ত এ অন্তর যদি হর্ষে চূর্ণ হ'য়ে যায়
আলোর কণিকা হ'য়ে জ্বলিব অনন্তকাল তারায় তারায়।
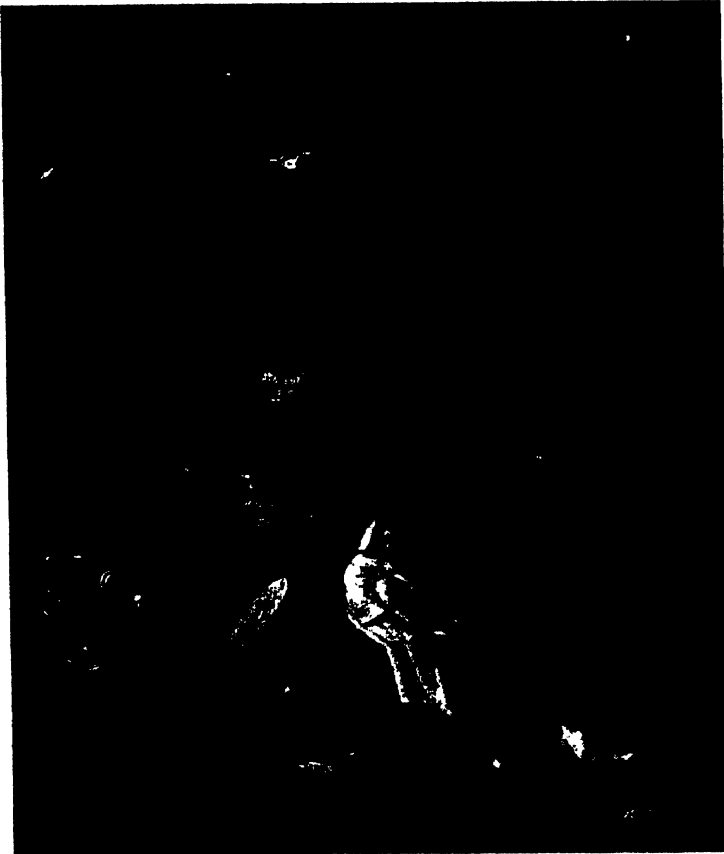
গৃহ-পালিতের খোয়াড়
Jan Stean

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়
কর্তৃক প্রেরিত
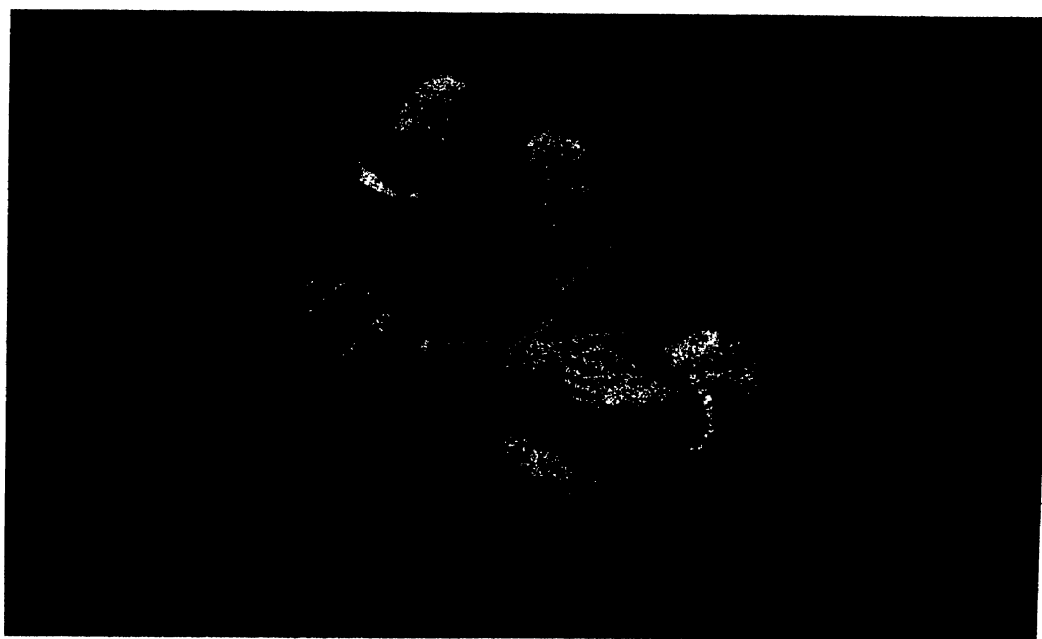
ইহুদি বধূ
Rembrandt
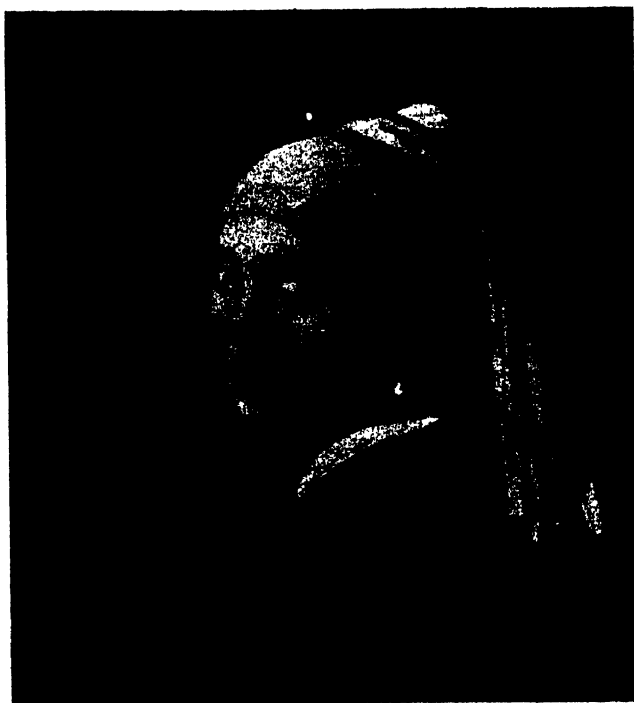
একটি নারীর মুখ
Vermeer

কৌতূহল
Torborch

গ্রে বয়

Backer

চরকা

Jan Scorel

রুগ্ন শিশু
Metsu
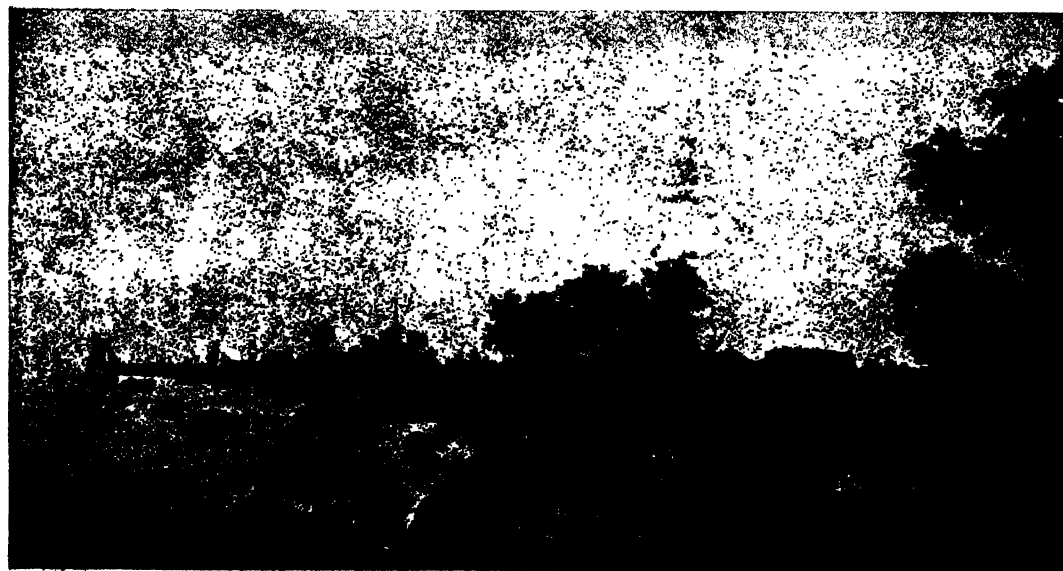
নদীর ধার
H. Avercamp

হার্লেম্
Jacob Ruisdael

ডেল্‌ফ্
Vermeer

আষাঢ়-সন্ধ্যায়

—গল্প—
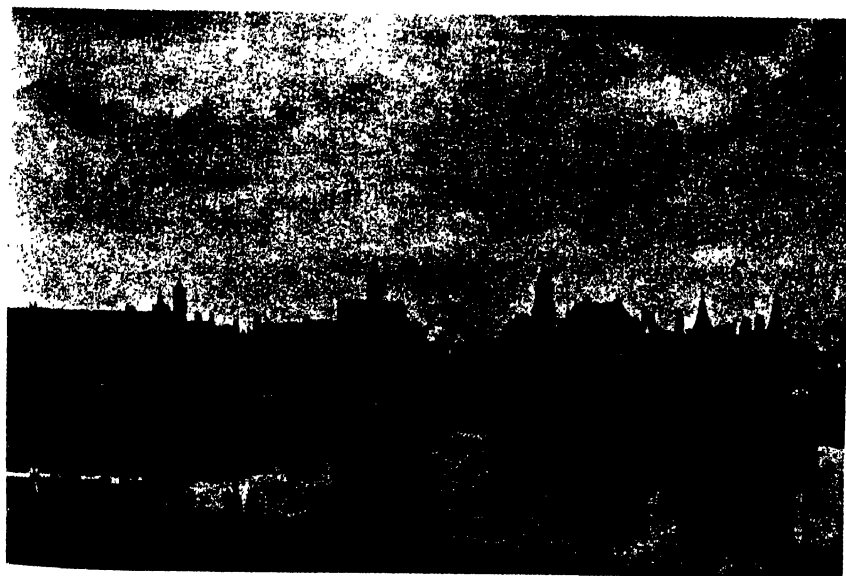
—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র এম-এ

আষাঢ়ের এক বাদল সন্ধ্যায় বাংলাদেশের একটি ছোট সহরের ভিতর একটি ছোট বাড়ীর দোতালার পশ্চিম বারান্দায় ক্ষেত্রমোহন একখানি ইজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। রাস্তার উপরেই এই বারান্দা,—এখান হইতে রাস্তার অপর পার্শ্বের কয়েকটি খোলার ঘর টপ্‌কাইয়া দৃষ্টি চলিয়া যায় খানিকটা খোলা আকাশের মধ্যে, এবং আরো দূরে খানিকটা তরঙ্গায়িত সবুজ মাঠ পার হইয়া একটা বাঁশঝাড়ের অন্তরালে যেন হারাইয়া যায় একখানি ছোট গ্রামের অস্পষ্টতায়। আজ সারা দুপুর ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে,—ক্ষেত্র-মোহন দেখিল তাহার সম্মুখে দূরে যেন একটা প্রকাণ্ড দীঘি। তাহার জলের নীচে, দূরের ঝোপগুলির এবং দু-একটা কুটীরের অস্পষ্ট ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এখন বৃষ্টি থামিয়াছে,—আকাশটাও কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যা প্রায় সাতটা হইতে চলিল; তাই সূর্য্যদেব গ্রামের ঝোপগুলির অন্তরাল হইতে ক্ষেত্রমোহনের সম্মুখস্থ আকাশটিকে রাঙাইয়া তুলিবার আর অবসর পাইলেন না। অথচ অন্ধকারের ছায়াও এখনো নামিয়া আসে নাই,—তাই আকাশটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা, তাহার ধূসর বর্ণে মাখান ছিল যেন একটা অবসন্ন শূন্যতা, কি-যেন একটা হারিয়ে যাওয়ার বেদনা, প্রাণের গোপন আকাঙ্ক্ষার যেন একটা আকুলি-বিকুলি।

ক্ষেত্রমোহন কাজের মানুষ,—স্থানীয় আদালতের উকীল, স্বরাজ্যদলের নেতা, কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। তবুও এমন বাদ্‌লার অবসন্ন সন্ধ্যায় হাতে এত কাজ সত্ত্বেও, এখন কোনো কাজেই তাহার মন বসিতেছিল না। তাহার চঞ্চল দৃষ্টি কেবলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল,—কখনো আকাশের মাঝখানে,—কখনো,—রাস্তার উপরে একটা খোলা-ঘরের সম্মুখে যে দু-চারটি ছেলে-মেয়ে ছুটাছুটি খেলা করিতেছিল,—তাহাদের দিকে,—কখনো বা দূরে প্রান্তরের মধ্যে থৈ থৈ জলের উপর, কখনো বা সেই জলের নীচে গ্রামখানির উল্টে-পড়া ছায়ার দিকে। সহসা তাহার মনে হইল,—তাহার জীবনেও বুঝি-বা এমনি বর্ষা নামিয়া আসিয়াছে,—বুঝি-বা তাহার আশৈশবের সঞ্চিত আশাগুলি,—তাহার ভরা যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন,—তাহার আরব্ধ সাধনার অর্দ্ধসমাপ্ত সৃষ্টি,—সবই তাহার জীবন-বর্ষায় এমনি করিয়া ওলট্-পালট্ হইয়া যায়!

ক্ষেত্রমোহনের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। লম্বা দোহারা গড়ন, দাড়ি-গোঁফ কামানো,—প্রশস্ত ললাটের নিম্নে উন্নত নাসিকার দুই পাশে দুটি ঈষৎ কোটর-গত চোখের চাহনির মধ্যে তাহার চরিত্রের দৃঢ়তার একটু আভাস পাওয়া যায়। কি রাষ্ট্র-নীতিতে, কি সামাজিক সমস্যায়, কি ব্যক্তিগত জীবনে তাহার মতামতগুলি ছিল যেমনি সুস্পষ্ট তেমনি সুদৃঢ়। কোনো বিষয়েই মত পরিবর্ত্তন করিতে বা কাহারো নিকট তর্কে পরাস্ত হইতে তাহাকে বড় একটা দেখা যায় নাই। অথচ উন্নতি ও অগ্রসরের অন্তরায় যে স্থিতিশীলতাবাদ, সে ছিল তাহার বিরোধী। মানুষের ও জগতের ক্রম-বিবর্ত্তনবাদে তাহার বিশ্বাস ছিল অগাধ। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল জগতের নূতন নূতন অবস্থার সহিত আপনাকে মানাইয়া লইতে পারে না যে মানুষ,—সে হয় মরিবে, নয়ত জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে,—কোনোদিন জগতের কোনো উপকারেই সে আসিবে না,—এই বাণী সে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিত। সুতরাং তর্কে কখনো পরাস্ত না হইলেও প্রয়োগকালে তাহার মতামতের একটু আধটু পরিবর্ত্তন যে দেখা যাইত না তাহা নয়; তবুও আপাত-দৃষ্টিতে তাহার প্রচারিত মতামতের সহিত তাহার কোনো কোনো কর্ম্মের যতই বিরোধ দেখা যা'ক না কেন, একটু

তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত চিন্তার মধ্যেই একটা নিবিড়তর সামঞ্জস্য আছে।

একটা উদাহরণ দিই। সমাজ-সংস্কারের সে বিরোধী ছিল না,—বরং সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিত। কিন্তু য়ুরোপ হইতে যে হাওয়া আসিয়া বর্ত্তমান বাঙালী সমাজে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সে সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর মনে করিত না। য়ুরোপের নারী-জাগরণের কথা ভাবিলে সে শিহরিয়া উঠিত,এবং বলিত, ভারত-নারী চিরকাল ঘুমাইয়া থাক্,—তবু যেন য়ুরোপের আলোকে,য়ুরোপের আদর্শে জাগিয়া না উঠে। আমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে,—তাহাতে সে কানে আঙুল দিত। বিবাহ-বিচ্ছেদ ত চুলোয় যা'ক্,—বিধবা-বিবাহের চেয়ে কোনো গর্হিত কাজ সে কল্পনাও করিতে পারিত না। একদিন তর্কের সময় সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিল,—বিধবা-বিবাহ-আইন প্রচলন করিয়া বিদ্যাসাগর যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন,—তাহা তাঁহার মহত্ত্বটাকে একেবারেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে,—এমন কুকীর্ত্তি, তাঁহার জীবনের সমস্ত সৎকাজকে এমনি কলঙ্কিত করিয়াছে যে মহত্ত্বের প্রতি কোনো দাবিই তাঁহার আর অবশিষ্ট রাখে নাই। বিধবা-বিবাহটাকে আইন-সঙ্গত না করিয়া বিপত্নীকের পুনর্ব্বিবাহটা যদি তিনি আইন-বিরুদ্ধ করিয়া দিয়া যাইতে পারিতেন,—তবে তিনি একটা কাজ করিতেন। কিন্তু তাহা করিবেন কেন?—বিদ্যাসাগরের হৃদয়টা যত বড়ই হউক না কেন, কল্পনা যে তাঁহার একেবারেই ছিল না, তাই সত্য যেখানেই গভীর, সেইখানেই তাঁহার বুদ্ধিটাকে এড়াইয়া গিয়াছে—ইত্যাদি।

তাহার বন্ধু অরিন্দম এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিল, "যে সব অভাগিনী বালিকার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য-প্রবৃত্তিটা শিথিল,—কি অবলম্বন ক'রে তা'রা সমস্ত জীবনটা কাটাবে? তা'দের প্রাণের ক্ষুধা মিটবে কেমন ক'রে?" ক্ষেত্রমোহন উত্তর করিয়াছিল,—"মেটবার প্রয়োজন নাই, ও ক্ষুধা দমন করতে হ'বে, কেন-না ও ক্ষুধা, পশুর ক্ষুধা, মানুষের নয়।"

অরিন্দম বলিয়াছিল,—"মাপ করতে হ'চ্চে। মানুষের মধ্যে যে ক্ষুধা থাকে তা মানুষেরই ক্ষুধা,—পশুর মধ্যে সেই একই ক্ষুধা থাক্‌লেও।"

ক্ষেত্রমোহন বলিয়াছিল, "কিন্তু ক্ষুধা থাক্‌লেই তা যে মেটাতে হ'বে,—তার কোনো মানে নেই। অনেক ক্ষুধাই জীবনে দমন করতে হয়।"

অরিন্দম বলিয়াছিল,—"ক্ষুধা-পরিতৃপ্তি আর ক্ষুধা-দমনের মধ্যে আমি বিশেষ কিছু তফাৎ দেখতে পাই নে,—শুধু এইটুকু ছাড়া যে ক্ষুধা মিটিয়েই ক্ষুধা দমন করতে হয়, তা ছাড়া ক্ষুধা-দমনের অন্য কোনো উপায় নেই।"

ক্ষেত্রমোহন বলিয়াছিল,—"এই কথা আমায় মানতে হ'বে? তুমি কি বল্‌তে চাও প্রকৃত ব্রহ্মচারী জগতে নেই?

অরিন্দম বলিয়াছিল,—"নিশ্চয় আছে। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মচারী শুধু তাঁরাই, যাঁরা ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে আনন্দ পা'ন,—রস পা'ন। এবং সেই রসেই তাঁরা তাঁদের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে আনন্দ যারা পায় না,—তাদের ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে হ'বে।"

ক্ষেত্রমোহন বলিয়াছিল,—"তার মানে তুমি বল্‌তে চাও যে তাদের আমাকে প্রশংসা করতে হ'বে?"

অরিন্দম বলিয়াছিল,—"মোটেই তা' বল্‌তে চাই নে। সাত্ত্বিক আহার যাঁরা করেন,—তাঁদের আমরা প্রশংসা করবো। কিন্তু তামসিক আহার যাঁরা করেন, ভালো-মন্দের সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে তাঁদের আমরা প্রশংসা না করলেও নিন্দাও করবো না। তাঁদের ও কাজটা তোমার ন্যায়-অন্যায় বিচারের বাইরে।"

কিন্তু ক্ষেত্রমোহন হঠিবার পাত্র ছিল না। উত্তেজনার সহিত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ভাল-মন্দের সাধারণ মাপ-কাঠি যে কি তা আমি জানিও না,—বুঝিও না। আসল কথাটা হ'চ্চে এই,—যে মানুষটা চ'লে যায়,—তার মরণ হয় ঠিক তখনি, যখন তার পরিত্যক্ত স্থানটা তুমি আর একটা মানুষকে দিয়ে পূরণ করতে চাও। মানুষের মনে, মানুষের স্মৃতির মধ্যেই ত মানুষের স্থান। সেইখানেই সে বেঁচে থাকে,—এবং সেইখানেই সে মরে। বাইরের

জগৎটা ত অনিত্য, মায়াময়, সেখানে মানুষ যখন মরে, তখন তার সে মরণ কখনই সত্য মরণ নয়।”

অরিন্দম শান্তভাবে উত্তর করিল,—“ঠিক কথা। যদি কোনো হৃদয়ে মানুষ তার প্রাণের প্রকৃত আশ্রয়টি খুঁজে পায়,—তবে সেইখানেই সে বাঁচে,—এবং চিরকাল বেঁচে থাকে। কিন্তু তেমন আশ্রয় কোথা? সে আশ্রয় সবাই পেলে ত মানুষ দেবতা হ'ত, পৃথিবী হ'ত স্বর্গ। কিন্তু তোমার এই 'মায়াময়' জগতে চিরকাল বেঁচে থাক্‌বার চেষ্টাটা যেমন বৃথা, মানুষের মিথ্যা মায়াময় স্মৃতিতে চিরকাল বেঁচে থাক্‌বার চেষ্টাটাও ঠিক তেমনি বৃথা।”

ক্ষেত্রমোহন তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলিল,“তোমার এসব কথা হচ্ছে নিতান্তই বাস্তবের কথা, আদর্শের নয়। ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারায় আমাদের অগ্রসর হ'তে হ'বে আদর্শের দিকে, আমাদের উন্নতির পথে আরোহণ করতে হ'বে,—অধোগতির পথে নাম্‌লে চল্‌বে না। পৃথিবীটা স্বর্গ নয়,—তা ঠিক, কিন্তু তাকে স্বর্গ বানিয়ে তুল্‌তে হ'বে। তাই ত এমন কোনো কাজ আমি বরদাস্ত করতে পারিনে,—যা' আমাদের আদর্শের দিকে পরিচালিত না ক'রে উল্টো পথে পরিচালিত করে।”

অরিন্দম বলিল,—“দেখ ক্ষেত্রমোহন, আদর্শের একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিজেকে এমন ক'রে প্রতারণা ক'রো না। কা'কে তুমি আদর্শ বল্‌ছ? বাস্তবকে যা' আকর্ষণ করে, সেইটেকেই আমি বলি আদর্শ; বাস্তবকে যা' অস্বীকার ক'রে পিশে মেরে ফেলে, তাকে আমি আদর্শ বল্‌তে পারিনে।”

এমনি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের প্রত্যেকটি অস্ত্র যখন অরিন্দমের নিপুণতর অস্ত্রের নিকট আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিত, তখন বাগ্‌যুদ্ধে অজেয় ক্ষেত্রমোহন তাহার ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করিত,—সেটি অরিন্দমের ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণ। অরিন্দম বিপত্নীক, বিবাহের পর তিনটি বৎসর মাত্র তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল, কোন সন্তানাদিও হয় নাই; তবুও আজ দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া অরিন্দম অনেক কন্যা-পক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যুক্তকরের মিনতি, অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রলোভন, সকলই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—এমন-কি মায়ের অশ্রুজল এবং মৃত্যুশয্যার শেষ অনুরোধও তাহাকে আজও টলাইতে পারে নাই। ক্ষেত্রমোহন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“আত্ম-প্রতারণা আমি করছি,—না,—তুমি করছ? মুখে যা বল্‌ছ,—জীবনে দৃষ্টান্ত দিচ্ছ ঠিক তার উল্টো।”

অরিন্দম গভীর ব্যথায় ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিত,—“না, না—আমার জীবন থেকে কেউ যেন দৃষ্টান্ত না নেয়। আমি কোনো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি নে।” ক্ষেত্রমোহন বলিত, “তুমি বল্লেই ত লোকে শুন্‌বে না। সত্যই ত তোমার জীবনটা লোকের কাছে একটা আদর্শ। এই জন্যেই ত আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। একটা আদর্শের খাতিরে মায়ের শেষ অনুরোধটি পর্য্যন্ত আজও রাখ্‌লে না।”

অরিন্দমের জীবনের এই দিকটায় একটা গোপন ব্যথা তাহার অন্তরের নিভৃততম কোণে এমনই গভীরভাবে বাজিয়া ছিল যে এই প্রসঙ্গ-উত্থাপনে সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না। তাহার বুকের সমস্ত হাড় ক'খানা যেন টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিত, বেদনায় তাহার হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে যেন একটা চাপা মর্ম্মভেদী কান্না উঠিয়া বুকের মধ্যেই প্রাণের ছিন্ন তারে গুমরিয়া গুমরিয়া মিলাইয়া যাইত, এবং তাহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তার ধারা এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া যাইত যে সে যেন বর্ত্তমানের মধ্যে আপনাকে আর খুঁজিয়া পাইত না, তর্কের সূত্রটি হারাইয়া ফেলিয়া বেদনার নিবিড় গভীরতায় আত্ম-বিস্মৃত ও বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া নীরব হইয়া যাইত। ক্ষেত্রমোহন মনে করিত এইবার বুঝি অরিন্দমের পরাজয় সম্পূর্ণ হইল,--নতুবা এমন আত্ম-প্রশংসা-শ্রবণের লজ্জায় সে একেবারে চুপ করিয়া যাইত না, ভদ্রতার উপযোগী একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও অন্ততঃ করিত।

কিন্তু কোথায় যে অরিন্দমের এই ব্যথা, তাহা ক্ষেত্র-মোহন তাহার অলৌকিক-তম স্বপ্নেও বোধ হয় ধারণা করিতে পারিত না। ক্ষেত্রমোহন মনে করিত, অরিন্দমের অনন্যসাধারণ পত্নী-প্রেমই বুঝি তাহার পত্নী-শোককে এতদিন পর্য্যন্ত এমনভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে,—যে পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ-উত্থাপনেই সে এমন কাতর হইয়া পড়ে। এইজন্য

অরিন্দমের প্রতি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধাও ছিল যেমন প্রগাঢ়, সমবেদনাও ছিল তেমনি গভীর,—তাই নিতান্ত নারাজ না হইলে তর্কের সময় অরিন্দমের জীবনের এই দিকটায় সে অস্ত্র নিক্ষেপ করিত না। সেদিন অরিন্দমের সেই নীরবতা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া সে বলিয়াছিল,—"অরিন্দম, এই জন্যে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে,—জানি তুমি শেষ পর্য্যন্ত সইতে পার না।"

"কেন যে সইতে পারিনে,—তা যদি বুঝ্‌তে পারতে,—তাহ'লে আর তর্কের কোনো প্রয়োজন থাকৃত না,—আমার সঙ্গে তুমি একমতই হ'তে পারতে। তর্ক করতে হয় তর্ক করো—কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি কেন? জান ত এ আমি পছন্দ করি না।"—এই বলিয়া অরিন্দম উঠিয়া পড়িল।

"রাগ ক'রে চল্‌লে না কি?"

"না,—আর একদিন আস্‌ব,—আজ কাজ আছে।" বলিয়া অরিন্দম চলিয়া গেল।

আজ বাদলসন্ধ্যায় ইজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ক্ষেত্রমোহনের এই সব কথা মনে পড়িতেছিল। অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা,—ব্রহ্মাণ্ডের ক্রম-বিবর্ত্তনের নিয়মের এমনি নিষ্ঠুর দাবি, যে অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া লইবার জন্য এই ক্ষেত্রমোহনকেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইয়াছে। আজ এক'বৎসর হইল, স্ত্রী বকুলবালা একটি সন্তান প্রসব করিয়া বিসূচিকা রোগে সূতিকা-গৃহেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তারপর তাহারই বোন্ পারুলবালাকে ক্ষেত্রমোহন বিবাহ করিয়াছে, তাহাও দেখিতে দেখিতে আজ ছয়মাস হইতে চলিল।

কিন্তু অরিন্দমের প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি,—তাহা মিথ্যা ছিল না। জীবনে সে তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছে। দু-একটা বলি। পারুলের সহিত অরিন্দমের বিবাহ ঘটাইবার জন্য তাহার স্ত্রী বকুলবালার কত বৎসর ধরিয়া সে কী চেষ্টা! কতবার বকুল অজানিতে অরিন্দমের সেই গোপন ব্যথায় আঘাত করিয়া বলিয়াছে,—"যে চ'লে গেছে,—তার জন্যে মিছামিছি সারা জীবন কেঁদে কাটিয়ে কি ফল? তাতে তারও কোনো লাভ নেই,—আপনার কেবলি ক্ষতি।" এই কথায় অরিন্দম নীরব হইয়া যাইত। বকুল মনে করিত বুঝি পারুলকে অরিন্দমের পছন্দ হইবে কি-না জানা নাই,—অথচ সে কথা স্পষ্ট করিয়া অরিন্দম তাহাকে বলিতে পারিতেছে না,—তাই এই নীরবতা। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিত, "পারুল ত এইবার বি, এ পাশ করতে চল্‌ল,—দেখ্‌তে তত ভাল না হ'লেও—বোধ হয় আপনার নিতান্ত অযোগ্য হ'বে না।" এই কথায় অরিন্দম অস্থির হইয়া বলিত,—"না—না সে-জন্য নয়। বিয়ে ত আমি একবার করেছিলাম,—ও যে কি জিনিস তা আমি বেশ জেনেছি। ও রস আর গ্রহণ করতে চাই নে।"

বকুল বুঝিত না,—বকুল কেন, কেহই বুঝিত না যে অরিন্দমের এই যে দ্বিতীয়বার বিবাহে আপত্তি,—ইহার কারণ তাহার পত্নী-প্রেম নয়,—ইহার কারণ ঠিক তাহার বিপরীত। অরিন্দম তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারে নাই। অথচ বিশ্ব-দরদী অরিন্দম সমস্ত বিশ্বের বেদনা অকাতরে আপনার বুকের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। জগতের যেখানে যা-কিছু অসম্পূর্ণতা, যত কিছু কদর্য্যতা যতই নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার প্রাণে আঘাত করুক না কেন, সকল সময়েই অরিন্দম আপনার কোমল প্রাণের সকরুণ ব্যথায় সেই আঘাত গ্রহণ করিয়া বহন করিয়া বেড়াইত,—কখনো ঘৃণায় সে আঘাত ফিরাইয়া দেয় নাই। এমন অরিন্দমের প্রাণে স্বভাবতঃই দুই কূল ছাপিয়া যে স্নেহ, অনুকম্পা ও সমবেদনার নদী উছলিয়া বহিয়া যাইত,—সেই বন্যায় তাহার আশে-পাশের সকল প্রাণীই ডুবিয়া এক হইয়া যাইত, কেহই ভাসিয়া উঠিয়া আপনার বিশেষত্বটুকু অটুট রাখিতে পারিত না। অরিন্দমের বালিকা-বধূ বোধ হয় চাহিয়াছিল যে সে তাহার স্বামীর প্রেম-নদীর জোয়ারে পাল তুলিয়া মৃদুমন্দ হাওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গায়িত আনন্দে একাকিনী ভাসিয়া যাইবে,—কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সে সুখ লেখা ছিল না; তাই সে ডুবিল। কিন্তু চেষ্টার সে ত্রুটি করে নাই। যতটুকু শক্তি সেই

বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ছিল,—সবটুকু সংগ্রহ করিয়া সে তাহার স্বামীর পূজার আয়োজনে নিয়োগ করিয়াছিল। ভাসিয়া উঠিবার জন্য তাহার সে কী প্রচণ্ড চেষ্টা! কী আকুলি-বিকুলি! কিন্তু কোনো ফল হইল না। অবশেষে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িল,—তারপর তিলে তিলে ক্ষয় হইতে হইতে একদিন তাহার অন্তিম শয্যায় গোধূলির অন্ধকারে মিলাইয়া গেল!

অরিন্দম বুঝিয়াছিল কোথায় তাহার বধূর রোগ,—জানিত কি তাহার ঔষধ,—কিন্তু তাহার অন্তরের অত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও সেই ঔষধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বধূ মরিল। ব্যথা এই,—যে হতভাগিনী যাহা চাহিয়াছিল,—তাহা সে দিতে পারিল না,—অথচ এই না-পারার জন্য সে আপনাকেও দোষী করিতে পারিল না, বধূকেও দোষী করিতে পারিল না। তাই তাহার বিবাহিত জীবনের এই যে মর্ম্মন্তুদ পরিণাম,—ইহার বোঝা সে না পারিল অনুতাপের অনলে দগ্ধ করিতে, না পারিল পরলোকগতা বধূর স্কন্ধে ফেলিয়া দিতে; ইহার বেদনা কাহাকেও বলিবার নয়, কেহ বুঝিবেও না, শুধুই চিরজীবন গোপনে বহন করিয়া বেড়ান ছাড়া উপায় নাই। তাহার জীবনে এমন একটা দিক ছিল না যে,—তাহা নয়—যে দিকটা বিধাতার আশীর্ব্বাদ পাইলে দাম্পত্য-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া রঙীন ও মধুর হইয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদ একবার সে পায় নাই, দ্বিতীয়বার যে পাইবে,—এমন ভরসা কোথায়? তাই বিবাহের নামেই তাহার এমন একটা আতঙ্ক হইয়া গিয়াছিল যে বিশ্বপ্রেমে ভরপুর তাহার প্রাণেরও এই দিকটায় যে শূন্যতাটুকু রহিয়া গিয়াছিল, সেটুকু ভরাট্ করিবার সাহস সে কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিল না, এমন-কি, মায়ের শেষ অনুরোধেও নয়। বরং এই অনুরোধের ফল হইল এই যে, ইহা রক্ষা করিতে না পারার বেদনা তাহার প্রাণের বোঝাকে এমনই গুরুতর করিয়া দিল যে মায়ের মৃত্যুর পর হইতে কেহ তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই সে যাতনায় আত্মহারা হইয়া একেবারে নীরব হইয়া যাইত।

কিন্তু এসব কথা কে বুঝিবে? বকুল মনে করিত, পারুলকে বিবাহ করিতে অরিন্দমের যে একটা চির-প্রচলিত সংস্কার-গত বাধা আছে,—সেই বাধাকে কঠিনতর করিয়া দুরতিক্রম্য করিয়া দিতেছে,—পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে তাহার স্বামীর মতামতগুলি। তাই সে তাহার স্বামীকে ধরিয়া পড়িল। অনুরোধ, মিনতি, পায়ে-সাধা, কান্নাকাটি, অভিমান, উপবাস কলহ, কথাবন্ধ,—এমনি করিয়াই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, বৎসর ঘুরিয়া গেল,—কিন্তু ক্ষেত্রমোহন বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধায় ও সমবেদনায় অটল হইয়া রহিল,—তাহাকে এক পা-ও নড়ান গেল না। তাহার মুখে সেই এক কথা,—"অরিন্দমকে আবার বিয়ে করতে বলা,—এ যে তা'কে অপমান করা,—তা'র পত্নীশোকের বেদনায় আঘাত করা,—আমার দ্বারা এ কাজ কিছুতেই হ'বে না।"

এ দিকে দিন দিন পারুলের বয়স বাড়িয়া চলিল, কিন্তু ঘরে বর আসিল না। তাই সে পাঠশালা হইতে স্কুলে এবং স্কুল হইতে কলেজে চলিয়া গেল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় সব ক'টি পরীক্ষা-পাশের প্রশংসা-পত্রগুলি পুরস্কার ও মেডেলের মালায় গাঁথিয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিল,—কিন্তু তবুও যখন কোনো বর আসিয়া গলায় মালা দিল না, তখন বকুল একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল। কলিকাতা হইতে তাহাকে আনাইয়া অরিন্দমকে নিমন্ত্রণ করিল,—যদিই বা শিক্ষিতা পারুলের সহিত আলাপ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া অরিন্দমের সঙ্কল্পটা একটু নরম হয়। বলা বাহুল্য ক্ষেত্রমোহন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া গর্জ্জিয়া বলিয়াছিল, "আমি বাড়ী থাকতে এসব হ'বে না।" বকুল ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিয়াছিল,—"বেশ, তুমি কোর্টে গেলেই হ'বে।" অরিন্দম স্থানীয় জমিদার,—অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন না থাকায় তাহার আপিসের বালাই ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন বলিয়াছিল,—"তা-ই বা কেন হ'বে? এই সব কদর্য্য খেলোমি করবে না কি অরিন্দমের মত মানুষকে নিয়ে?"

বকুল বলিয়াছিল,—"খেলোমি কিসের? কোথায় বাঙালীর মেয়ের বিয়ে হ'য়েছে, আগে একবার 'কনে' না

দেখিয়ে? অরিন্দম বাবুকে মেয়ে দেখাব,—তাঁর পছন্দ হয় হ'বে,—না-হয় না হ'বে।"

ক্ষেত্রমোহন গর্জ্জিয়া বলিয়াছিল,—"যা-খুসী করো,—কিন্তু অরিন্দমকে মিছে বিরক্ত করা যেন না হয়।"

এইটুকু গর্জ্জন করিয়াই ক্ষেত্রমোহন ক্ষান্ত হয় নাই। নিমন্ত্রণের দিন আদালতে যাইবার পূর্ব্বে একখানি চিঠি লিখিয়া অরিন্দমকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল যে বকুলের মতলব ভাল নয়, হয়-ত তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিবে; যদি আসিতেই হয়, তবে যেন ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসে। চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও অরিন্দম আসিয়াছিল, বকুল কিন্তু তাহাকে মোটেই বিব্রত করে নাই,—বিবাহের কোনো কথাই উত্থাপন করে নাই; শুধুই খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, গল্পগুজব করিয়া, আদর-আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল।

বকুলের আশা কিন্তু নিতান্ত অমূলক ছিল না। সেদিন-কার আদর-আপ্যায়নে, পারুলের সহিত আলাপ-পরিচয়ে অরিন্দম অন্তরে যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার নিরালা-ক্লিষ্ট উপবাসী মন বহুদিন লোক-সংসর্গে এমন আনন্দ পায় নাই। মেয়েদের সেই প্রাণ-খোলা হাসি-তামাসা তাহার অন্তর স্পর্শ করিয়া সেখানে একটা মাধুর্য্যের লহরী বহাইয়া দিয়াছিল। সেই হিল্লোলে ভাসিয়া ভাসিয়া অরিন্দম অনুভব করিয়াছিল,—যে বেদনা ত শুধু তাহার একলারই নয়; ঐ যে দুটি তরুণী আজ তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া এমন আদর অভ্যর্থনা করিতেছে,—গল্প করিয়া, তামাসা করিয়া, হাসিয়া, গাহিয়া, চারিদিকে, মর্ম্মে মর্ম্মে, হাওয়ায় হাওয়ায় এমন একটা আনন্দের কম্পন জাগাইয়া তুলিতেছে,—উঁহাদেরও গোপন প্রাণে যে গভীর বেদনা লুক্কায়িত আছে,—তাহার পরিমাপ কে করিতে পারে? সৃষ্টির সমস্ত বেদনা ভেদ করিয়াই ত জগতে এমনি করিয়া আনন্দের গান বাজিতে থাকে, কেন-না এই আনন্দই সৃষ্টির অর্থ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টির সার্থকতা। জীবনটা ত কেবলই ব্যথা নয়, কেবলই সমস্যা নয়, কেবলই কর্ত্তব্য নয়,—জীবনটা যে একটা সৃষ্টি, সেখানে যেমনি বেদনা তেমনি আনন্দ, যেমনি কর্ত্তব্য তেমনি অবসর, যেমনি বন্ধন তেমনি মুক্তি। সাধ্য কি পুরুষের,—যে নারীকে বাদ দিয়া কেবলই গম্ভীর চিন্তার সাহায্যে সমস্যা সমাধান করিতে করিতে জীবনের অর্থটা খুঁজিয়া পায়?

আর পারুল! লোকে যাহাকে 'রূপ' বলে, তাহার কোনো বালাই তাহার ছিল না, অথচ কেমন একটা দীপ্তি তাহার চেহারায়! কেমন লাজ-নম্র, ধীর-শান্ত অথচ সঙ্কোচ ও জড়তা-বিহীন তাহার কণ্ঠস্বর ও কথাবার্ত্তা! অরিন্দম একবার মনে করিয়াছিল,—হয়-ত বা সে তাহার মাতার অন্তিম অনুরোধটি এইবার রক্ষা করিতে পারিবে। বকুল যদি সেদিন কথাটি তুলিত, তবে হয়ত আচম্‌কা একবার সম্মতি দিয়া ফেলিলে, অরিন্দম আর সে সম্মতি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না, বকুলের কার্য্যসিদ্ধি হইত। কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচে ও আশঙ্কায় বকুল সেদিন সে কথা বলিতে পারিল না। অরিন্দম বাড়ী আসিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সেই বহুদিনের সঞ্চিত বেদনার বোঝাগুলি একটি একটি করিয়া বুকের উপর চড়িয়া বসিতে লাগিল; কোথা হইতে আতঙ্কের একটা মেঘ প্রাণের একটা গোপন কোণে দেখা দিয়া একটু একটু করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিল; অরিন্দমের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, শিহরিয়া উঠিল, চুপি চুপি আপন মনে বলিল,—কাজ নাই! কাজ নাই! কি-জানি মানুষের মন কোথা থেকে কোথায় যায়? কাজ নাই! কাজ নাই!

পারুলের বর জুটিল না। অবশেষে দিদি মরিয়া তাহাকে বর জুটাইয়া দিয়া গেল।

বকুল মরিল। বাপের বাড়ীতে প্রসব হইতে গিয়া সেইখানেই মরিল। স্বামীর ঘরের কোনো পরিবর্ত্তনই হইল না। শুধু এইটুকু পরিবর্ত্তন যে একটি ছোট্ট শিশু-পালনের গুরুভার স্বামীর মাথার উপর দিয়া গেল। এই গুরুভার অবশ্য আপাততঃ গ্রহণ করিল কলিকাতায় বসিয়া পারুল ও তাহার বিধবা জননী,—কিন্তু এমন করিয়া ত বেশি দিন চলিতে পারে না। ক্ষেত্রমোহনকে একটা বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। দিন যায়। ক্ষেত্রমোহন তাহার নানা কাজে ব্যস্ত,—আদালতের কাজ, সভা-সমিতিতে

বক্তৃতা করা, দেশ-সেবা, দেশোদ্ধার,—এই রকম কত কি কাজ! এই সব কাজের ভিড়ের মধ্যে এক আধবার যখন ঘরের দিকে ফিরিয়া চায়,—তখন দেখে সেখানে কিছুই নাই। বকুল নাই। সে যখন এই ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল,—তখন যেন তাহার প্রাণের সমস্ত সম্বলটুকু নিঃশেষ করিয়া লইয়া গিয়াছিল,—কিছুই রাখিয়া যায় নাই,—এমন-কি স্মৃতিটুকুও না। তাই ক্ষেত্রমোহন ঘরে আর টি`কিতে পারে না,—তাহার ঘরের মধ্যে যেন একটা বিরাট্ শূন্যতা।

সমস্ত কাজের ভিড়ের মধ্যেও ক্ষেত্রমোহনের মনে কেবলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল—অরিন্দমের সেই কথাটা,—মিথ্যা জগৎটায় মানুষকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাটা যেমন বৃথা, মিথ্যা স্মৃতিতে মানুষকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাটাও ঠিক তেমনি বৃথা। তবে আর কেন? বিধবা শাশুড়ী বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, অরিন্দম উৎসাহ না দিলেও নিষেধ করে না,—শিশুসন্তানটিরও একটা উপায় করা চাই ত,—বেচারা ক্ষেত্রমোহন নিতান্ত বিপাকে পড়িয়া পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বহুকালের পোষিত মতামতগুলি বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহা,—কেবলই বিপাকে পড়িয়া মাত্র,—অবস্থান্তরে আপনাকে মানাইয়া লইবার জন্য,—নইলে এখনো সে তাহার পূর্ব্ব মতেরই সমর্থন করে। কিন্তু কি করিবে? ঘরটি যে একেবারে ফাঁকা,—সেখানে যে থাকাই দায়! বকুল যে কিছুই রাখিয়া যায় নাই! সেখানে তাহার মনের ভিতর মধ্যে মধ্যে যে রূপ ভাসিয়া উঠে,—সে রূপ যে বিশ্ব-নারীর রূপ,—সে ত বকুলের রূপ নয়! ক্ষেত্রমোহন পরিষ্কার বুঝিল,—যে এই বিশ্ব-নারীর রূপ দিয়াই তাহার ঘরখানি এত দিন ভরা ছিল,—এই বিশ্ব-নারীর রূপ দিয়াই সে ইহা আবার ভরাইবে। চুলোয় যাক্—বকুল-পারুল! তাহার কথায় ও কাজের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় যে বিরোধ,—সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে এই বিশ্ব-নারীর রূপকে আশ্রয় করিয়া একটা নিবিড়তর সামঞ্জস্যে সেই বিরোধ সার্থক হইয়া উঠুক্!

তবে বকুল বুঝি এইবার সত্যসত্যই মরিল! ছয়মাস পরে তাহার শিশু-সন্তানটিকে কোলে লইয়া ক্ষেত্রমোহনের ঘরে আসিল পারুল।

পারুল আসিল,—বিশ্ব-নারীর রূপ লইয়া; তাই তাহার প্রাণখানি ছড়ান,—সারা বিশ্বে,—ক্ষেত্রমোহনের সঙ্কীর্ণ গৃহটুকুর মধ্যে নয়। সে রূপে সেবা ছিল, স্নেহ ছিল, দয়া ছিল, মায়া ছিল, মমতা ছিল,—কিন্তু ক্ষেত্রমোহনের সঙ্কীর্ণ ঘরটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,—কোথায় ভাসিয়া যাইত, ক্ষেত্রমোহন যেন তাহার নাগাল পাইত না। আর সে রূপের কটাক্ষে অরিন্দম লক্ষ্য করিয়াছিল,—কি যেন একটা বিরামহীন কান্না,—কোথায় কোন্ অনন্তপুরীর আদালতে কি যেন একটা বিচার-প্রার্থী নালিশ,—আর কি যেন একটা মর্ম্মভেদী, কঠিন, তীব্র তিরস্কার! অরিন্দম সহ্য করিতে পারিল না,—দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেল।

* * *

এই সব পুরাণো কাহিনীর দু-একটা পরিচ্ছেদ আজ বাদল সন্ধ্যায় ক্ষেত্রমোহনের অবসন্ন নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট চেতনার উপর এলোমেলো ভাবে তড়িৎ-প্রবাহের মত খেলিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—কই পারুল ত আসিল না! বেহারার নিকট সন্ধান করিয়া জানিল,—সে খোকার কাঁথা সেলাই করিতেছে।

ক্রমে তাহার সম্মুখের সেই ফাঁকা আকাশটা সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। আকাশে কখন আবার একটু মেঘ আসিয়াছিল,—আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। ক্ষেত্রমোহনের গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া লাগিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু অমন কর্ম্মী ক্ষেত্রমোহনের আজ যেন নড়িয়া বসিবার উদ্যমটুকু নাই। তাহার হইল কি? সবেতেই শ্রান্তি,—সে শ্রান্তির যেন শেষ নাই।

তারপর বৃষ্টির ছাঁট্ যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন অতিকষ্টে ক্ষেত্রমোহন চেয়ারখানা ঘুরাইয়া একটু ফিরিয়া বসিল; সহসা চোখে পড়িল,—বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো একটা ফ্রেমে বাঁধানো কতকগুলি পশমের কাজ-করা বকুলগুচ্ছ,—নীচে পশমের কাজে লেখা বকুল-বালা। হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে বকুলের মুখখানি ভাসিয়া উঠিল,—বকুলের স্মৃতিতে প্রাণখানা ভরিয়া উঠিল,

বকুলের জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাট অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া ঘটনা একটি একটি করিয়া মনের মধ্যে হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল; বিশ্ব-নারীর রূপে ভেসে-যাওয়া ঘরের মধ্যে আজ আবার তাহার সেই অশিক্ষিতা বকুল ভাসিয়া উঠিল; বকুল বুঝি আবার বাঁচিয়া উঠিল!

ক্ষেত্রমোহনের জীবনে তবুও বর্ষা নামিল। আকাশ ঘন অন্ধকার, বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি; অন্তরে ঘনীভূত বিষাদ ও রাশি রাশি অবসাদ! এমন দিনে বাড়ী থাকিলে বকুল ত বরাবরই কাছে আসিয়া বসিত। পারুল ত কই আসিল না। অরিন্দমও চলিয়া গেল। কিন্তু আজও ত বকুল আবার আসিল! বিশ্ব-নারীর রূপের বন্যায় বকুলের এই নূতন-ক'রে পাওয়া রূপ আজ ক্ষেত্রমোহন রাখে কোথায়? যে ঘর বকুল একদিন নিঃশেষে ফাঁকা করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ সেই ঘরে আবার সে আসিল কেন? আজ যে সেই শূন্য ঘর আবার ভরাট্ হইয়া গিয়াছে!

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

ভাদ্র-ভোরে

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ভাদরিয়া-গাঙ্, উপছি' উঠেছে
জোয়ার-জল,
নদীর বাঁকের ধান-ক্ষেতে পশি'
হাসিছে কেবল ছলাৎছল্।
নৌকা ভাসায়ে চলিয়াছে মাঝি
পাল্ তুলে'
গান ধরিয়াছে
প্রাণ খুলে',
সাদা-সাদা মেঘে হেসেছে সুনীল
আকাশ-তল।
ভাদরিয়া-গাঙ্, হাসিছে অধীর
ছলাৎছল্।

ভাঙনের ধার, স্রোত ছুঁয়ে কাঁপে
গাছের-ডাল্
পুরাণো হাটের ছোট ঘর আজ
ডুবে গেছে সব, ভাসিছে চাল্।
ছোট্ট ছোট্ট 'বাচারি' ঘরের
চা'র পাশে
ঢেউ-সখীগুলি
জোর হাসে,
—কাক-চিল-দলে মেলা বসে সেথা
সাঁজ-সকাল।
পুরাণো হাটের ডুবে গেছে সব,
ভাসিছে চাল্।

ভাঙা-দালানের চারিদিক্ ঘিরে
নাচন্-জল
প্রলাপের সুরে কি কহিয়া চলে
নব-যৌবনে অনর্গল।
ভোরের আলোয় ঝক্‌ঝকি' ওঠে
রূপ্ জ্বালা
সাজে লাখে লাখে
ঢেউ-বালা,
তা'রা কি সবাই বরুণ-পুরীর
পরীর দল ?
ঢেউগুলি হাসে লুটে' লুটে' পড়ে
নাচন্-জল।

* * *

জলখেলা করে ছিটায়ে ছিটায়ে
ছেলের পাল,
তাহারি ওধারে—বাঁয়ে বেঁকে ওই
রেখা এঁকে গেছে গাঁয়ের খাল।
পাল্ তুলে ফেলে, খালে 'নাও' দিয়ে
লগি ঠেলে
দুরন্ত ঢেউ—
দূরে ফেলে,
বেয়ে চলে মাঝি ; লগি টেনে ধরে
গাছের ডাল্,
'হিজল', 'বন্না'—শাখা-প্রশাখায়
মেলেছে জাল।

সরু খাল শেষ, এসেছে বিশাল
বিলের বুকে,
চারিদিকে জল, শাপ্‌লার দল
হাসিছে আলোয় স্বপন-সুখে।
উঁচু ভিটাটুক্, কুঁড়ে ঘিরে' বিল
আছে ছেয়ে
—নেমে এসে ধীরে
ভেলা বেয়ে,
চলেছে গাঁয়ের কৃষাণ-তরুণী
শান্ত-মুখে,
তারি যেন সখী শরতের মেঘ
আকাশ-বুকে।

* * *

গেঁয়ো তরুণীতে, আকাশের মেঘে
কুটুম্বিতা ;
বন-রাণী আজ চিকণ আলোয়
এঁকেছে মাথায় সোনার সিঁথা।
ধান-মঞ্জরী হাওয়ার দোলায়
হেলে দোলে,
—কা'র রূপ দেখে
আঁখি ভোলে ?
কুমুদিনী তারে বেড়িয়া ফুটেছে
অনিন্দিতা।
আকাশে ভুবনে জানাজানি আজ,
হয়েছে মিতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
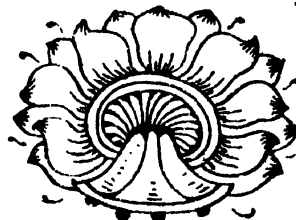
আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপক লক্ষণ হইতেছে দুঃখবাদ, pessimism। এই দুঃখবাদ আমাদের জাতীয় জীবনের সহিত এমনই মিলিয়া গিয়াছে যে, ইহাকে আকাশ, বাতাস, আলোর ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দুঃখের সাগরে আমরা ভাসিতেছি, সাহিত্যের মধ্যেও আমরা তাহারই ছবি দেখিতে চাই। কেহ কোনও সুখের কথা বলিলে মনে হয়, তাহা অসম্ভব, তাহা শুধু কল্পনাবিলাস, জীবনের অনুভূতিতে তাহার সহিত কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজিয়া পাই না। যে যত দুঃখের, দৈন্যের, নৈরাশ্যের ছবি অঙ্কিত করে, মনে হয় সেই তত সত্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার সৃষ্টিই বস্তুতান্ত্রিক, বাস্তব, realistic।

শুধু আমাদের দেশেই নহে, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বত্রই আজ এই দুঃখবাদের প্রভাব এবং সাহিত্যেও তাহা প্রতিফলিত হইতেছে। এতদিন মানুষ ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে যে-সকল আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, যে-সকলকে ধরিয়া জীবনের পথে চলিতেছিল, সে-সব আজ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে, ঠেকিয়া শিখিয়া মানুষ সে-সবের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে, অথচ ধরিবার মত নূতন আদর্শ, নূতন ধর্ম্ম নিশ্চিতভাবে কিছুই পাইতেছে না। এরূপ কোনও সত্য, সনাতন আদর্শ আছে কিনা সে বিষয়েও লোকের মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; ইহার ফলে আসিয়াছে বিষাদ, অতৃপ্তি, নৈরাশ্য। যে-সব দেশে প্রাণশক্তি সজাগ আছে তাহারা পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে নূতন সত্যের সন্ধান করিতেছে, পুরাতন গতানুগতিক রীতি নীতি বর্জ্জন করিয়া সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সত্যের উপর নূতন ভাবে, নূতন তন্ত্রে ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে গড়িতে চাহিতেছে। তাহাদের সাহিত্যেও তেমনই নব নব রূপ ও রসের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু, জীবন-সংগ্রামে যাহারা পরাজিত লাঞ্ছিত, প্রাণশক্তি যাহাদের ক্ষীণ, সুপ্ত তাহারা পুরাতন অবলম্বন হারাইয়া চারিদিকে শুধুই অন্ধকার দেখিতেছে। বাংলাদেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যে আমরা ইহারই পরিচয় পাইতেছি।

এত দিন সমাজে যে-সব আইনকানুন রীতি নীতি চলিয়া আসিয়াছে সে-সবের লক্ষ্য প্রধানতঃ ব্যক্তির প্রাকৃত জীবনকে নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়া। ব্যক্তির জীবনকে এই ভাবে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং সমাজের কল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ, কারণ ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে এ-সব কেবল মন-ভুলানো ছাঁদা কথা। যুগে যুগে দেশে দেশে যে-সব শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহাতে সমাজের সাধারণ কল্যাণের নামে কেবল শ্রেণীবিশেষেরই সুখ সুবিধা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ নিজের সুবিধার জন্য অব্রাহ্মণকে, পুরুষ নিজের সুবিধার জন্য নারীকে, ধনী নিজের সুবিধার জন্য নির্ধনকে, সবল নিজের সুবিধার জন্য দুর্ব্বলকে বিধি-নিষেধের অসংখ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে এবং সেই বন্ধনকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কিন্তু শ্রেণী-বিশেষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য অধিকাংশের জীবনকে এই ভাবে পিষ্ট করিয়া দেওয়ায় সমস্ত সমাজজীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফলে জগৎ জুড়িয়া আজ বিপ্লব, বিদ্রোহ, ধ্বংসকাণ্ড। গত ইউরোপীয় যুদ্ধের তাণ্ডব-লীলার পরে লোকের চক্ষু বিশেষ ভাবে খুলিয়া গিয়াছে, তাহারা বুঝিয়াছে আদর্শ, ধর্ম্ম, নীতি, সত্য এ-সব ফাঁকা কথা, পরকে ঠকাইয়া নিজেদের স্বার্থ-

সিদ্ধি করিবার বিচিত্র কৌশল মাত্র। মানুষ আর এইরূপ ঠকিতে চাহে না। তাহার নিজের মধ্যে অদম্য ভোগ-বাসনা, সম্মুখে বিলাসের সামগ্রী, কিসের জন্য সে এই তীব্র সুখ পরিত্যাগ করিবে ?

> সমাজ ! নহে সে সৃষ্ট আমাদেরই তরে ?
> চাহে যদি ভোগবাসনার চারিধারে—
> প্রতি পদে বাঁধি বেড়া খর্ব্বিতে তাহারে—
> দাম চেয়ে তবে বস্তু গুণ অপহরে।

তাই আজ সর্ব্বত্র ডাক উঠিয়াছে, "বাঁধন ছিঁড়িতে হবে এই মোর মতি"—"হরে মুরারে, হরে মুরারে"।

আমাদের অতি-আধুনিক কবি মোহিতলাল বলিতেছেন, সত্য কি তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্র ঘাঁটিতে হইবে না, অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না, তোমার "প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর, বুঝিতে পারিবে। নিজের মধ্যে যে শক্তি যেটুকু আছে, সেই শক্তিটুকুই সত্য, তাহার প্রেরণায় যে জীবধর্ম্ম তোমার পক্ষে স্বাভাবিক তাহাই সত্য। যে সংস্কার তোমার প্রাণে বদ্ধমূল তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম।" প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন শাস্ত্র, রীতি-নীতি বিধি-নিষেধকে উড়াইয়া দিয়া নিজেদের বদ্ধমূল সংস্কারকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, প্রথমেই যেটা পাওয়া যায় সেটি হইতেছে কাম, যৌনলালসা। তাই আজ জগতের সর্ব্বত্র সকল সাহিত্যেই কামের চর্চ্চা, philosophy of sex। তবে অন্যান্য দেশে কাম ছাড়া প্রাণের অন্যান্য ধর্ম্মেরও চর্চ্চা আছে। বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া সংসারে নিজের জন্য স্থান করিয়া লওয়া, ধন সম্পত্তি প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জ্জন করা, নিজেদের শক্তি-প্রকাশের, ভোগবিলাসের নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করা, সংসারের উপর একটা ছাপ মারিয়া দিবার জন্য জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা, এইরূপ জীবনসংগ্রামে যে আনন্দ আছে তাহাও অতি তীব্র, তাহাও জীবধর্ম্ম। তাই পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যে শুধুই কামের বর্ণনাই নাই, নানারকম adventureএর বর্ণনা স্থান পাইতেছে। যুদ্ধের পর দশ এগারো বৎসর কাটিয়া গেল তবু ইউ-রোপের সাহিত্যে সেই যুদ্ধের কথা ফুরাইল না। বিলাতে আজ যে বইখানির আদর বোধ হয় সব চেয়ে বেশী সেটি হইতেছে, Edmund Blunden লিখিত "Undertones of War"। কিছুদিন পূর্ব্বে Wellsএর Outlines of History আমেরিকাতে যে আদর পাইয়াছে, কোনও নাটক বা নভেল সে আদর পায় নাই। এই ইতিহাসটিতে দেখান হইয়াছে যে, সকল দেশে সকল যুগেই লোক মিথ্যা আদর্শের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে, "that all peoples in all times had lived upon illusions just as we had been living, and illusions founded upon bunk no less then ours." তাহা হইলে মানুষ সম্মান করিবে কাহাকে ? ধরিবে কি ? আমেরিকায় একজন ইহার উত্তর দিয়াছেন—business and oneself। "Americanization of Edward Boc" নামক একখানি পুস্তকে একটি যুবকের জীবন চিত্রিত করা হইয়াছে, সে শুধু নিজের ব্যক্তিগত শক্তি ও চরিত্রের জোরেই ব্যবসাক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে উঠিয়াছে। আমেরিকাতে এই বই খানির আদর Wellsএর Historyর পরেই। সেখানে গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন মানুষের জীবনের ব্যাপার যে সাংঘাতিক ভাবে বেবন্দোবস্তায় চলিয়া আসিয়াছে, এ বিশ্বাসটা এক রকম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের নিজের পথ করিয়া লইতে হইবে, সমাজের দোহাই দিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে গা' ভাসাইয়া দিলে আর চলিবে না। এই ভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্মবিকাশের বর্ণনাই আজ পাশ্চাত্য দেশে জনপ্রিয় সাহিত্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কামের দিকে যে দৃষ্টি যে ঝোঁক সেটাও একটা সাময়িক লক্ষণ মাত্র। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই লোকে প্রকৃত সত্যটি কি তাহাই জানিতে চাহিতেছে, কি দেহের জীবনে, কি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে বাঁধা বুলির উপরে নির্ভর না করিয়া সকলেই আপন আপন সাক্ষাৎ অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিতেছে। যুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে এক কথায় তাহাদের নাম দেওয়া যায়, the literature of disillusion.

আমাদের দেশেও বিশ্বের ঢেউ লাগিয়াছে, আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যকেও বলিতে পারা যায়, literature of disillusion। সমাজে, ধর্ম্মে, নৈতিকতায় যে-সব ভণ্ডামি ও মিথ্যা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, সেই সবকে নির্ম্মম ভাবে ধরাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে আপত্তি বা দুঃখ করিবার কিছুই নাই। পরন্তু আমাদের জরাজীর্ণ সমাজকে নূতন জীবন লাভ করিতে হইলে এইরূপ চোখে-আঙুল-দেওয়া সাহিত্যের, "অঞ্জন-শলাকা"র খুবই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ-রূপ সাহিত্যের দ্বারা যথার্থ কল্যাণ লাভ করিতে হইলে ইহার পশ্চাতে যে গভীর দৃষ্টি, সততা ও সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত তাহা বিশেষ কোথাও দেখা যাইতেছে না। তাই আমাদের কামায়ণ সাহিত্যের লেখকেরা যৌনবৃত্তি সম্বন্ধে সত্যের সন্ধান না করিয়া নির্ব্বিবাদে ফ্রয়েড্‌কেই তাহাদের শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। ফ্রয়েড্‌ মগ্নচৈতন্যের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের তরুণেরা মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু, ভারতেরই যোগশাস্ত্রে মানবপ্রকৃতির মানবচেতনার যে গভীর হইতে গভীরতম বিশ্লেষণ আছে, যাহা না বুঝিলে ভারতের জাতীয় জীবনের ধারা বা সত্য আদর্শটি ধরিতে পারা যায় না, বর্ত্তমান experimental psychology যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও জ্ঞানের ধার পর্য্যন্তও এখনও যাইতে পারে নাই, আমাদের তরুণেরা সে-দিকে দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না। অ-শ্লীল সাহিত্য সৃষ্টি করিতে তাঁহারা আধুনিক রুশিয়াকেই অনুকরণ করিতেছেন। কিন্তু, রুশিয়াতেও জাতীয় জীবনের গতি অতি দ্রুতবেগে প্রসারিত হইতেছে। বল্‌শেভিক বিদ্রোহের পরে সমাজে যে বিপ্লব আসিয়াছিল তাহাতে যৌনলালসা, নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈরাশ্য, কদর্য্যতা এই-সবই তাহাদের সাহিত্যে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু রুশিয়ায় ১৯২৪, ১৯২৫ সালে যে সাহিত্য চলিয়াছে, এখন তাহা অচল বলিলেও হয়। কাম জিনিষটা বস্তুতঃ মানুষের জীবনে খুব বেশী স্থান অধিকার করে না সেইটাকে বাড়াইয়া দেখাইতে গেলে কদর্য্য কৃত্রিমতারই সৃষ্টি করিতে হয়। রুশিয়ার সাহিত্য ইতিমধ্যেই সেই কৃত্রিমতা ছাড়াইয়া উঠিতেছে; এখন সোভিয়েট-তন্ত্রে নরনারীর সাধারণ স্বাভাবিক জীবন যেরূপ তাহাই বর্ণিত হইতেছে এবং ব্যক্তিকে সমাজেরই একটা অংশমাত্র না ভাবিয়া স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবেই দেখান হইতেছে। কিন্তু, রুশিয়াতে জীবনের যে তীব্রস্রোতে তাহাদের সাহিত্যের দোষ গ্লানি ধুইয়া যাইতেছে, আমাদের দেশে সে স্রোত এখনও নিশ্চল বলিলেই হয়, তাই গ্লানির উপর গ্লানি জমিয়াই উঠিতেছে। মানুষের উপর কাম বা যৌনলালসার প্রভাব খুব বেশী হইলেও এইটাই মানব-জীবনের সব নহে। শুধু কামলালসা, কামচর্চ্চা লইয়া থাকিলে অতি অল্পদিনেই অবসাদ, বিতৃষ্ণা, গ্লানিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। কামের চর্চ্চায় কামের লালসা কিছুই কমে না তাহা বরং বাড়িয়াই যায়, কিন্তু তাহাতে আর আনন্দ থাকে না, শুধু জ্বালাই থাকে এবং তখন জীবন হয় বিড়ম্বনা। ফ্রয়েড্‌ কামকেই জীবনের মূল সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া শেষকালে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এ জীবনে প্রকৃত সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকেরাও কাম ও অশ্লীলতা ছাড়া রসের, আনন্দের আর কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া, জীবনে দুঃখ, দৈন্য, নিরাশা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বতোমুখী দৈন্য এই দুঃখবাদকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদের আরম্ভ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গানে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দুঃখকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, দুঃখ না থাকিলে জীবন শূন্য, আস্বাদহীন, দুঃখের আনন্দই তীব্র আনন্দ,

> যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে—
> দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে

রবীন্দ্রনাথ শুধু সেই আনন্দেরই মর্ম্ম বুঝেন। ভগবান মানুষকে ব্যথা দিয়াই তাঁহার আনন্দের লীলাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, মানুষের দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়াই তাঁহার স্বর্গীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে—

> কত তীব্র তারে তোমার
> বীণা সাজাও যে,
> শত ছিদ্র ক'রে জীবন বাঁশি বাজাও হে।

রবীন্দ্রনাথ যে দুঃখের কবি তাহা দেখাইবার জন্য কষ্ট করিয়া দৃষ্টান্ত খুঁজিতে হয় না। গীতাঞ্জলিখানি খুলিলেই পাতায় পাতায় দুঃখের গান দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,

দুখের পর পরম দুখে,
তারি চরণ বাজে বুকে।

ভগবান বেদনার দূতী পাঠাইয়াই মানুষের সহিত প্রেম করেন,

বেদনা দূতী গাহিছে, "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান!
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।

ভগবান দুঃখ হইতে, বিপদ হইতে রক্ষা করুন, এ প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথ কখনও করেন নাই—

বিপদে মোরে রক্ষা কর,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
*   *   *
আমার ভার লাঘব করি
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

শুধু তাহাই নয়, তিনি ভগবানের নিকট দুঃখই চাহিয়া লইয়াছেন।

গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়ন-জলে।
*   *
এই করেছ ভালো নিঠুর
এই করেছ ভালো।
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।

ভগবান যত বেদনা, যত দুঃখ দিতেছেন অহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না, তিনি আরও চান!

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবনতারে ঝঙ্কারো।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজেনি তা চরমতানে,
নিঠুর মূর্চ্ছনায় সে গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো।

আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বলে ভগবানের কাছে যে যাহা প্রার্থনা করে, ভগবান তাহাই প্রদান করেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি যদি আমরা আন্তরিকতার সহিত গাই তাহা হইলে "তোমার হাতের বেদনার দানে" ও নয়ন জলেই আমাদের জীবন ভরিয়া উঠিবে।*

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুঃখের উপাসনা কোথা হইতে আসিল? এটি ত ভারতের বিশিষ্টতা নহে।—ভারতের সাহিত্যে অনেক দুঃখ বেদনার বর্ণনা আছে, অনেক করুণ রস আছে, কিন্তু এই ভাবে দুঃখকেই শুভ বলিয়া, ভগবানের আশীর্ব্বাদ, ভগবানের প্রেম বলিয়া, আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া কোথাও বরণ করা হয় নাই।—দুঃখ অশুভ, দুঃখ অভিশাপ, দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে হইবে ইহাই ভারতের চিরন্তন সাধনা। ভারতীয় সাহিত্যও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত।—তাই তাহাতে আছে মূলতঃ একটা শান্ত, সাত্ত্বিক ভাব। দুঃখ, দ্বন্দ্ব, মৃত্যুর মধ্যেই যে একটা রাজসিক আনন্দ আছে, যে আনন্দের নেশায় বিভোর হইয়া রবীন্দ্রনাথ মরণকেই বলিয়াছেন:

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।

ভারতীয় সাহিত্য সে আনন্দকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই। জগতে দুঃখ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, মৃত্যু আছে। কিন্তু এই-সবই চরম সত্য নহে, চরম সত্য হইতেছে শান্তি, সামঞ্জস্য, আনন্দ, অমৃতত্ব। জ্ঞানের চক্ষুতে সেই চরম

* জীবনের পথে, কর্ত্তব্যের সাধনায় দুঃখ অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িলে তাহাকে ধীরভাবেই সহ্য করিতে হইবে, তান্ তিতিক্ষস্ব, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখকে সাধ করিয়া, ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিতে নাই।

সত্যকে দেখিয়া সকল সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যেও যে আত্মপ্রসাদ ও শান্তি আনন্দ লাভ করা যায়, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলা সেই সাত্ত্বিক ও অধ্যাত্ম আনন্দকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদে আমরা পাশ্চত্যের প্রভাবই দেখিতে পাই। পাশ্চাত্যের মানুষ রাজসিক। রাজসিক প্রকৃতির লোকের একঘেয়ে সুখ ভাল লাগে না, বিনা যুদ্ধে যে জয়লাভ, যে সুখে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখের ছায়া নাই, এই সবে রাজসিক মানুষ বেশী দিন তৃপ্তি অনুভব করে না, শীঘ্রই এ-সব অরুচি, ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে, পশ্চাতে অন্ধকারের ছায়া না থাকিলে কোন আলোককে পূর্ণভাবে উপভোগ করা এরূপ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ এরূপ লোক যে সুখ চায় ও উপভোগ করে তাহার স্বরূপই এই, তাহা আপেক্ষিক—বিপরীত দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ না করিলে সে-সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে সর্ব্বত্র আমরা এই রাজসিক প্রকৃতিরই পরিচয় পাই। সংঘর্ষই জীবন, সংঘর্ষই আনন্দ। Tragedy'র রসই জীবনের রস। Tragedy'র ভিতর দিয়াই জীবনলীলা কিরূপ বিকাশ হইতেছে রবীন্দ্রনাথ "রক্ত করবীতে" তাহারই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র "রক্ত করবীর" সমালোচনায় লিখিয়াছেন, "ঘাত প্রতিঘাতের ফলে জীবন কতদূর গভীর হয়, তাহা আধুনিক যুগের মানুষের জীবনের সহিত প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের মানুষের জীবনের তুলনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। প্রাচীন যুগের শান্তি যেন শ্মশানের শান্তি।* ইহা রিক্ততা বা শূন্যতার নামান্তর মাত্র। আধুনিক যুগের লোক এরূপ শান্তিতে দম আটকাইয়া মরিয়া যায়। আমাদের আশার পেটটাও যেমন বড়, তাহার খোরাকীও তেমনি বেশী। আমাদের এরোপ্লেন, মোটর, রেল না হইলে একদিনও চলে না। এ-সব ছাড়িয়া যদি আমাদিগকে কেহ বলে যে, বনে অনেক বেশী শান্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা উত্তরে বলিব,'চাই না আমরা এরকম শান্তি, আমরা ছুটাছুটি করিয়া মরিব, সেও ভাল, তবুও রিক্ততার শান্তি প্রার্থনা করি না।"

পাশ্চাত্য জগতে আমরা এই ছুটাছুটি করিয়া মরার নেশাই দেখিতেছি। তাহাদের বাসনার পেটটা দিনে দিনে এমনই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে সমস্ত জগতের ভোগ্য বস্তুতেও তাহাদের যথেষ্ট খোরাকী হইতেছে না। না হউক, ঐ অতৃপ্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট করার যে সুখ তাহাই জীবন!

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে অন্তর্গূঢ় আত্মা রহিয়াছে তাহা আরও গভীর, পূর্ণ, অখণ্ড আনন্দ চায়। রাজসিক মানুষ সেইরূপ শুদ্ধ, শান্ত আনন্দের মর্ম্ম বোঝে না বলিয়াই তাহা মিথ্যা নহে। সে আনন্দ রিক্ততার আনন্দ নহে, তাহাই পূর্ণতার আনন্দ, তাহা মৃত্যুর শান্তি নহে, তাহাতেই জীবনের সকল শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ও সমন্বয়।—সে শান্তির জন্য বনে যাইতে হয় না, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না, বরং সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই কর্ম্মের সুকৌশল, জীবনের পূর্ণবিকাশের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই কুরুক্ষেত্রের ভীষণ ধ্বংসকাণ্ড করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তস্মদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

বস্তুতঃ আমাদের আত্মা বিশুদ্ধ আনন্দের আধার, সচ্চিদানন্দ; প্রকৃতির সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব তাহাকে স্পর্শ করে না, আমরা সেই আত্মাকে ভুলিয়া নিজেদিগকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া দেখি, প্রকৃতির দ্বন্দ্বে সুখ দুঃখ বোধ করি, কিন্তু এই সব দুঃখ দ্বন্দ্বের মধ্যে সেই আত্মার অখণ্ড আনন্দই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, দ্বন্দ্বময় জীবন যাপন করিতে আমাদিগকে শক্তি দেয়, তাই দুঃখের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যেও আমরা আনন্দ পাই। আত্মার সেই পূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আনন্দকে জীবনের মধ্যেও নামাইয়া আনিতে হইবে, প্রকৃতিকেও তাহার আধার করিতে হইবে। এই আনন্দময় আত্মা কবির কল্পনা নহে, দার্শনিকের থিওরি

---

* প্রাচীন বা মধ্যযুগে ঘাতপ্রতিঘাত ছিল না, সংঘর্ষ ছিল না এ তত্ত্ব মৈত্রমহাশয় কোথায় পাইলেন? বস্তুতঃ এখানে তিনি তামসিক জীবনের সহিত রাজসিক জীবনের তুলনা করিতেছেন, কিন্তু এই দুইয়েরই উপরে যে সাত্ত্বিক ও অধ্যাত্ম জীবন আছে সে-সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই।—লেখক

(theory) নহে, ধার্ম্মিকের অন্ধ বিশ্বাস নহে। ইহাই আমাদের অন্তরতম বাস্তব সত্তা, যে-কেহ অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা করিবে, নিজের চেতনার গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবে, সে নিজেই নিজের মধ্যে এই আত্মার সন্ধান পাইবে। সেই আনন্দময় আত্মার সন্ধান আমরা যতদিন না পাইতেছি এবং তাহার আলোক ও শক্তিতে আমাদের দেহ, প্রাণ, মনকে, সমগ্র প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিতে না পারিতেছি ততদিন জীবন-লীলায় যে দিব্য জ্যোতি, শক্তি, আনন্দের সম্ভাবনা আছে—তাহাকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। রাজসিক জীবনের দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হইয়া মানুষ যখন সেই উদ্ধের অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ করিতে চাহিবে, তখনই মানবজাতির, মানবসমাজের সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব, সকল সমস্যার চরম সমাধানের পথ পরিষ্কৃত হইবে।

আজ সমস্ত জগতে যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, অতৃপ্তি দেখা যাইতেছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ছাড়াইয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান করিবার ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই শুভ চেষ্টারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক রাজসিক সভ্যতাই যে মানবজীবনের চরম কথা নহে, ক্রমশঃ লোক তাহা উপলব্ধি করিতেছে। রাজসিক জীবনের অশান্ত দ্বন্দ্বময় খেলা যে কত অসার তাহার বর্ণনাই আজিকার বিশ্ব-সাহিত্যের বিষয়বস্তু। এই ভাবটি বর্ত্তমানে জর্ম্মন সাহিত্যেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। নব্য জর্ম্মনীর একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক Kurt Muzner একটি ছোট গল্পে রাজসিক জীবনের "ছুটাছুটি করিয়া মরা'র" চিত্রটি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। একটি বালিকা পর্ব্বত-উপত্যকায় দরিদ্র পিতামাতার গৃহে ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিল। বাহিরের জগৎ সে কখনও দেখে নাই, তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামের বাহিরে সে কখনও যায় নাই। পিতামাতার মৃত্যু হইলে আশ্রয়হীনা বালিকাকে কিছু দূরে একটি সরাইখানায় পরিচারিকার কার্য্য লইতে হইল। সে-পথে বিশেষ লোক-চলাচল নাই। বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই সে স্থানটি বরফে আচ্ছাদিত থাকে, গৃহের বাহিরে কেহ বড় যায় না। কেবল গ্রীষ্মের কয়েকমাস পর্য্যটকদের আবির্ভাব হয়। বালিকা তাহাদের পরিচর্য্যা করে, আর প্রত্যেক নবাগত-কেই জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কোথায় যাবেন?" কোথায় বাড়ী, কোথা হইতে আসিতেছেন, সে-সব প্রশ্ন নহে, শুধু প্রশ্ন "কোথায় যাবেন?" পর্য্যটকেরা যে-সব সহরের নাম করে বালিকা দিগন্তের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া সেই-সব সহর দেখিতে চায়, কিন্তু কিছুই দেখা যায় না, শুধু কুয়াসা। বাহিরের জগতে যাইবার জন্য তাহার কি ছট্‌ফটানি! রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বালিকার মনোভাবটি ব্যক্ত করা যায়—

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙ্গে
বিশাল এই ভবে।
প্রাণের পথে বাহির হতে পারব কবে?

তাহার "সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে", তাই সে প্রত্যেক নবাগতকে বলে—"আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন?" কিন্তু সকলেই তাহাকে ফেলিয়া যায়। শেষে একজন তরুণ শিল্পী সেই পার্ব্বত্য বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাত্রে তাহাকে লইয়া পলাইয়া গেল। তাহার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার জীবনের আর কোনও কথা বলা হয় নাই। একদিন দেখা গেল, সে এক বহুমূল্য fur গলায় দিয়া একটি সুন্দর মটোর-কারে সেই সরাইখানার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। এক গ্লাস দুগ্ধ আনিবার জন্য শোফারকে ভিতরে পাঠাইয়া দিল। সেই গাড়ীতে বসিয়া সে তাহার অতীত জীবনের কথা ভাবিতেছিল, বেদনায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল, তাহার চক্ষুতে বোধ হয় দুই এক ফোঁটা জলও আসিল। একটি বালিকা সরাইখানা হইতে তাহার জন্য দুগ্ধ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধন্যবাদের সহিত গ্লাসটি লইয়া সে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। সহসা শুনিল অতি মৃদুস্বরে সেই বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আপনি কোথায় যাবেন?" রমণী চমকিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল—"আমিই কি ঐ বালিকা এখানে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতেছি? ইতিহাসের পুনরভিনয় কি এইভাবেই হয়? সকলেই সমান, সকলের জীবনই এম্নি

অসার? একজন আর একজনার স্থান অধিকার করিতেছে কিন্তু সেই গন্তব্যস্থানে কেহই পৌছিতে পারিতেছে না?" অনন্ত বাসনা, অবিরাম চাঞ্চল্য, দুর্দ্দমনীয় পিপাসা!

শোফার ফিরিয়া আসিল। রমণী বলিল "চালাও।" তাহার হৃদয় সহানুভূতি, লজ্জা, প্রেম, নৈরাশ্য, বাসনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালিকাকে বলিল—"কোথায় যাচ্চি? জিজ্ঞাসা করো না, জান্‌তে চেয়ো না, যেয়ো না। সেখানে কেহ কখনও—কখনও পৌছিতে পারে না।" যেখানে কেহ কখনও পৌছিতে পারে না তদভিমুখে তখন সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে!

রবীন্দ্রনাথও এই রাজসিকতার প্রেরণায় বলেন, পথই আমার ঘর।

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

—ইহাই তাঁহার প্রাণের কথা।

রাজসিকতারও প্রয়োজন আছে। এই অবস্থাতে যে আনন্দ তাহাও যে একেবারে দোষের বা অলাভের তাহা নহে। ভারতে আজ যে প্রাণহীন তামসিক অবস্থা, এই অবস্থা হইতে উঠিতে হইলে ভারতবাসীর মধ্যে রাজসিকতাই জাগাইতে হইবে, তাই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির আবির্ভাব। মানুষের জড় সত্তা (material being) তামসিক অজ্ঞান ও জড়তার একান্ত অধীন, এই অবস্থার উপরে আমাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইলে রাজসিক দ্বন্দ্বময় জীবনের ভিতর দিয়া, বাসনাময় জীবনের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়; মানুষকে যে স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া পরম জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হয়, সেই উর্দ্ধগমনেরই পথে ইহা রাজসিক স্তর। গীতাতে এই স্তরকেই "মধ্যমা গতিঃ" বলা হইয়াছে, কিন্তু আমরা যদি চিরকাল এই স্তরেই পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের উর্দ্ধগমন, আত্মার বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছান হয় না। সাত্ত্বিক সত্তা, সাত্ত্বিক স্বভাবের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় যাওয়াই আত্মার পূর্ণ বিকাশ, জীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভের পন্থা। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা এই পথের সন্ধান দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে রাজসিকতার খেলা তাহাও "মৃত্যুসুরের খেলা"। যে রাজসিকতার প্রেরণায় নিজেদের শক্তির পূর্ণ প্রয়োগের জন্য পাশ্চাত্য জাতি বিপদের মাঝে, মৃত্যুর মাঝে, ভীষণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়ে,

গিয়া সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
গিরি উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাজসিকতার সে পূর্ণ বেগ আমরা পাই না। ভগবান তাঁহাকে নিজে হাতে তুলিয়া দুঃখ দিবেন এবং সেই দুঃখ তিনি মাথা পাতিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহার প্রেম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে সেই কোমল খ্রীষ্টানী ভাব যাহার বশে, কেহ এক গালে চড় মারিলে তাহার দিকে অপর গালটি ফিরাইয়া দিয়া বলিতে হয়,

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।

দুঃখই সাধনা, দুঃখভোগই মুক্তির পন্থা, Suffering is the means of salvation, Blessed are they that mourn, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এই শিক্ষাটিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীকেও আমরা মূলতঃ এই শিক্ষাই প্রচার করিতে দেখি—যে যত দুঃখ, দৈন্য, নির্য্যাতন নিজের উপর টানিয়া আনিবে সেই তত বড় দেশসেবক, সাধু, সত্যাগ্রহী! খ্রীষ্টান ইউরোপ যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা ভুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মুখে তাহারা পুনরায় আবার যীশুখ্রীষ্টের বাণীই শুনিতে পাইতেছে, এই সর্ব্বব্যাপী নৈরাশ্যের দিনে ইহার মধ্যেই যেন তাহারা আশার ইঙ্গিত পাইতেছে, তাই আজ পাশ্চাত্য দেশে ভারত-মাতার এই দুইটি সুসন্তানের এত আদর।

কিন্তু, ভারতে দুঃখভোগ মুক্তির পন্থা বলিয়া কখনই স্বীকৃত হয় নাই। দুঃখ অশুভ, দুঃখের দ্বারা মানুষের নৈতিক অবনতিই হয়, দুঃখকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে,—

দুঃখ ত্রয়াভিঘাতে জিজ্ঞাসা।
তদুচ্ছিত্তীতি পুরুষার্থঃ ॥

ইহাই ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার মূল কথা। যাহারা ভ্রমের বশে শরীরকে উগ্র কষ্ট দিয়া মনে করে খুব ধর্ম্ম হইতেছে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অসুর বলিয়াছেন। ভারতের সন্ন্যাসীরা শরীরকে যে অবহেলা করেন বা কষ্ট দেন তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, কষ্টভোগ করিলেই ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন, দুঃখই মুক্তির মূল্য। শরীরটাই মানুষের চরম সত্য নহে, শরীরের ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মাই মানুষের প্রকৃত সত্তা, Reality, সেই সত্তাকে উপলব্ধি করিবার জন্যই ভারতের কোন কোন সম্প্রদায় শরীরকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে। কিন্তু, ইহাই ভারতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নহে। শরীরের, ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধ সংযত ভোগের ভিতর দিয়া, অর্থ ও কামের ভিতর দিয়া, মোক্ষ বা অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়, ইহাই ভারতের প্রকৃত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহারও আভাস আমরা পাই। বস্তুতঃ তাঁহার লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় আদর্শেরই প্রভাব মিশ্রিতভাবে রহিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দুঃখ অনেকটা তাঁহার ব্যক্তিগত ভাববিলাস; জাতির, সমাজের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী তাঁহার লেখায় সজীব হইয়া কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।—গিরিশ চন্দ্র তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া বাঙ্গালীর সাজান বাগান শুকাইয়া যায়।—তারক গাঙ্গুলী তাঁহার স্বর্ণলতায় বাঙ্গালী সংসারের বাস্তব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু, এই দিকে যাঁহার সৃষ্টি আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তিনি হইতেছেন বাঙ্গালীর বড় আদরের শরৎচন্দ্র।—আমাদের জাতীয় জীবনে দুঃখের যেমন সীমা নাই, শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে সহানুভূতিরও বুঝি তেমনিই সীমা নাই। এমন করিয়া সমাজের দুঃখ নিজের বুক পাতিয়া লইতে আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। অনেকে শরৎচন্দ্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু এটাকেই আমার খুব বড় বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার চিত্ত-বিশ্লেষণ সর্ব্বত্র ঠিক বিজ্ঞানসঙ্গত না হইতে পারে। তাঁহার শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, বিরাজবৌ, কিরণময়ী এ-সংসারের জীব নহে, তাহারা শরৎচন্দ্রেরই কল্পলোকের মানুষ, তাঁহারই অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু, ইহাই ত শিল্পীর ধর্ম্ম। মানবজীবনের সঠিক বাস্তব চিত্র দেওয়া শিল্পীর কাজ নহে, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকের কাজ। তবে শরৎচন্দ্রের বেদনার অনুভূতিতে কোনও ভুল নাই। প্রেমহীন ধর্ম্ম, হৃদয়হীন সমাজ তাঁহার মর্ম্মে যে ব্যথার সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি তাহাকেই রূপ দিয়াছেন নিজের হৃদয়ের রসমাধুর্য্য মিশাইয়া। এইভাবে নিজের বেদনা সমস্ত জাতির প্রাণে তিনি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আজ চারিদিকে সমাজসংস্কারের যে উদ্যোগ চলিতেছে, বাঙ্গালীর প্রাণহীন অসাড়তা দূর করিয়া এই জীবনের সাড়া আনিতে শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলি যে কত সাহায্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শরৎচন্দ্র দুঃখকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া, শুভ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি জানেন এই "অকূল সংসারে দুঃখের আঘাত প্রাণে বীণার ঝঙ্কার" তোলে না, বরং জীবনের সমস্ত সঙ্গীত নষ্ট করিয়া দেয়, প্রাণের রসকে শুকাইয়া দেয়, মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে। তাঁহার গল্পে ও উপন্যাসে তিনি ইহাই দেখাইয়াছেন। "অরক্ষণীয়া"য় মা ও মেয়ে, দুর্গামণি ও জ্ঞানদা, বাৎসল্যরসের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। বাপ মায়ের বড় আদরের একমাত্র মেয়ে এই জ্ঞানদা, জ্ঞানদাও মা-অন্ত প্রাণ। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর দুঃখে পড়িয়া স্নেহময়ী দুর্গামণির চিত্ত কন্যার প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল। জ্ঞানদার মত গুণবতী মেয়ে হয় না, সেবা করিতে, মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে সংসারে তাহার জুড়ি ছিল না। কিন্তু, সে কুরূপা, রুগ্না। সেবা শুশ্রূষা করিয়া একজনকে জ্ঞানদা কঠিন রোগ হইতে বাঁচাইয়াছিল, কিন্তু সে জ্ঞানদার পিতার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে বিবাহ করিবার কথা দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কথা রাখিল না। মেয়েটা দিন দিন চোখের সম্মুখে বড় হইতেছে তাহা দেখিতে না পারিয়া কন্যাগতপ্রাণা দুর্গামণি একদিন কন্যাকে পদাঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিল। ভগবানের কাছে জ্ঞানদার সেই নীরব আত্মনিবেদন, "ভগবান! আমি

কার কাছে কি দোষ করেছি যে সকলের চক্ষুশূল? আমার রূপ নাই, বসনভূষণ নাই, আমার বাপ নাই, সে কি আমার দোষ? আমার রোগগ্রস্ত এই কঙ্কালসার দেহ, এই জীর্ণ পাণ্ডুর মুখ যে একজনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে কি আমার ত্রুটি? আমার বিবাহ দিতে কেউ নাই, তবুও আমার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, সেও কি আমার অপরাধ? প্রভু! এতই যদি আমার দোষ, অপরাধ, ত্রুটি, তবে আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও, তিনি আমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন না।" এ যে বাঙ্গালী ঘরের কত অনূঢ়া বালিকার মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনী! তবু জ্ঞানদা মুখ ফুটিয়া মায়ের কথার কোন প্রতিবাদ করে নাই। একদিন নিরতিশয় কঠিন হইয়া দুর্গামণি বলিলেন—"এত ধিক্কারেও তোর প্রাণ বেরোয় না গেনি? এক বছর ধ'রে নিত্য জ্বরের সঙ্গে যুঝ্‌ছিস, তবু ত' তোকে যমে নিতে পারলে না রে? অন্য মেয়ে হ'লে, মনের ঘেন্নায় এতদিন জলে ডুবে মরত—"

মা বসুমতীর মত সহিবার শক্তি পাইয়াও জ্ঞানদা আর সহ্য করিতে পারিল না, মায়ের মুখের উপর বলিয়াছিল, "মা, মরতে আমি জানি। শুধু তুমি ব্যথা পাবে ব'লেই সব স'হে আছি।"

দুঃখে মানুষের কেমন অধঃপতন হয় তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরাজ-বৌ। তাহার মত সাধ্বী সতী জগতে কে আছে? সে লীলাচ্ছলে বলিত, "অসতী মেয়েমানুষ কেমন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখ্‌তে সাধ হয় তারা কি রকম।" সে আরও বলিত, সতীত্বে সাবিত্রী হউন বা আর যেই হউন কাহারও চেয়ে সে এক তিল কম নয়। ঘুম হইতে উঠিয়া স্বামীর মুখ না দেখিলে সে একটা দিনও কাটাইতে পারিত না। গাঁয়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে স্বামী নীলাম্বরের যখন জ্বর হইল বিরাজবৌ 'সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল—পাঁচ দিন পরে নীলাম্বরের জ্বর ছাড়িলে মা শীতলার পূজা পাঠাইয়া দিয়া তবে জলগ্রহণ করিল। মা শীতলার নিকট মানস করিয়াছিল, "ভাল যদি কর মা তবেই আবার খাব দাব, না হ'লে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবো।" মনে ভাবিয়াছিল, 'সিঁথের এ সিঁদুর তোল্‌বার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেল্‌বো।'

এ-হেন বিরাজবৌ একদিন কুলত্যাগিনী হইল! সে যে কত বড় দুঃখে, তাহা জানিতে হইলে উপন্যাসখানিই পড়িতে হয়। মানুষের হৃদয়ে দুঃখবোধের যতখানি স্থান আছে, শরৎচন্দ্র বুঝি তাহার তিলার্দ্ধও ফাঁক রাখেন নাই।

শরৎচন্দ্রের লেখার এক মস্ত ত্রুটি এই যে, সংসারের এই নিদারুণ দুঃখ হইতে মানুষ কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে তিনি তাহার কোনও পথ দেখান নাই। তাই তাঁহার লেখা পড়িলে কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। তিনি নিজেই নিজের লেখা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্ম্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমা-রেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিই নাই, সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।" কিন্তু, এইভাবে সাহিত্যরচনার সীমা-রেখা টানিয়া তিনি নিজের রচনাকে খর্ব্ব করিয়াছেন। সংসারে যে শুধু দুঃখ আছে, তাহাই নহে, সেই দুঃখের সমাধানও সেখানে আছে, প্রশ্নও আছে, উত্তরও আছে, শরৎচন্দ্র শুধু একটি দিকই দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন।

তবে এই-সব সমস্যার সমাধান তিনি নিজে না করিলেও, ইহাদের যে সমাধান হইতে পারে, সে বিশ্বাস শরৎচন্দ্রের আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে অতি-আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে এ-বিশ্বাসের আর গন্ধমাত্র নাই। শরৎচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে, সামাজিক বিধি-নিষেধের নৈতিকতায় হয়ত আস্থাবান নহেন, কিন্তু, তাই বলিয়া যে নীতি, ধর্ম্ম, ভগবান এ-সব মিথ্যা, কুসংস্কার তাহাও তিনি মনে করেন না। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের "ছিছি" গল্পের দাদা অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের

philosophy * এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মানুষকে কোন দিন যেন বিশ্বাস কর না, ভগবানকে মানার চেয়ে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তিকে স্বীকার করো; পুণ্যকে এড়িয়ে চলো কারণ তার রং শুধু সাদা, কিন্তু পাপকে ভালবেসো,—তার মধ্যে রঙয়ের খেলা পাবে, বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে।—যদি প্রেমে পড় তা'হলে আনন্দ পাবে, কিন্তু প্রেমের ব্যর্থতা না ঘটলে পরিপূর্ণ রসের আস্বাদ পাবে না। আত্মার বন্ধন কোন দিন স্বীকার কর না কারণ তাই তোমার মৃত্যু।"

সাধারণতঃ লোকে পাপ পুণ্য ভালমন্দ যে-ভাবে বিচার করে, শরৎচন্দ্র তাহার গলদ দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পাপকেই কোথাও ভালবাসিতে বলেন নাই,—পাপকে তিনি ক্ষমাও করেন নাই।—তাঁহার "চরিত্রহীন" চরিত্রগুলিতেও আমরা অপূর্ব্ব সংযম শক্তি, সহানুভূতি, সহৃদয়তা দেখিতে পাই এবং প্রকৃত পক্ষে এই সবই চরিত্রের, নৈতিকতার উপাদান। তিনি বিরাজবৌয়ের ন্যায় সাধ্বী সতীরও সাময়িক দুর্ব্বলতা ক্ষমা করেন নাই, তাঁহার কিরণময়ী শেষ পর্য্যন্ত পাগল হইয়াছিল। এইখানে শরৎচন্দ্রের সহিত প্রাচীন সাহিত্যিকদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাঁহারা জগতে একটা moral order, নৈতিক শৃঙ্খলা, ধর্ম্মের রাজত্বে বিশ্বাস করেন; যদিও এই moral order, এই নৈতিক নিয়মের রাজ্য যে বাস্তবিক কিরূপ তাহা লইয়া লেখকে লেখকে সম্পূর্ণ মিল নাই। বস্তুতঃ একই সত্যকে বিভিন্ন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। Shakspeareএর নাটকে এক প্রকার moral order দেখিতে পাই, বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসে আর এক রকম moral order দেখি, শরৎচন্দ্রের লেখায় আর এক রকম। সংসারে ঠিক ঐরূপ moral order দেখিতে পাওয়া না যাইলেও উহা যে একেবারেই মিথ্যা একথা যাহাদের সংসারসম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাহারা কথনই বলিবেন না। তবে বঙ্কিম-চন্দ্রের সহিত শরৎচন্দ্রের একটি বিশেষ তফাৎ এই যে, বঙ্কিম-চন্দ্র ভারতের সনাতন আদর্শ অনুযায়ী দুঃখকে আত্মার জীবনে একটা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র দেখাইয়াছেন। প্রতাপকে তিনি স্বর্গে পাঠাইয়াছেন, শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইয়াছেন, গোবিন্দলাল তপস্যার দ্বারা ইহজীবনেই ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত tragedy নাই, ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও tragedy নাই, শরৎচন্দ্র এই রীতির বাহিরে পড়িয়াছেন। কারণ, "উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে" সে সন্ধান না রাখিয়া তিনি চোখের সম্মুখে জীবনকে যতটুকু দেখিতে পারিয়াছেন, তাহাই রূপে ও রসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে moral order আছে,বাংলার অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা সেইটুকুও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ, এক পাশ্চাত্য নাস্তিকতার প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ আমাদের জাতীয় জীবনের চরম দুর্গতি। শেষোক্ত কারণটিতে আমাদের দেশে ধর্ম্মভাবে কেমন আঘাত লাগিয়াছে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাহা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রমোহন দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং সেজন্য রাজদ্বারেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, "দেশের পরাধীনতা যে একটা অসহ্য বেদনার জিনিষ! বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মভাব যে আমাদের মনে স্থায়ী আসন পাততেই পারে না। শুধু তাই বা কেন, আমরা যে আজ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাতে বসেছি; দেশের দুঃখ দৈন্যে এত অভিভূত হয়েছি যে, প্রতিকারের পথ না পেয়ে আজ আমরা ভাবতে যাচ্ছি, দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা, পরোপকার, সহানুভূতি, বিশ্বপ্রেম, ধর্ম্ম ও-সব মিথ্যা, ভোজ-বাজি; সত্য শুধু মারামারি আর কাটাকাটি।" পাশ্চাত্য

---

* মানুষ একটা philosophy, আদর্শ, মতবাদ না হইলে থাকিতে পারে না। নবীনেরা প্রাচীন আদর্শ সকলকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, তাহার স্থলে নিজেদের মনের মত কতকগুলা ধারণাকে আদর্শ বলিয়া খাড়া করিতেছেন—এবং তাহারই নাম দিতেছেন সত্য, বাস্তব, reality। আবার কিছুদিন পরে এই realityই illusion বলিয়া বর্জ্জিত হইবে। যতদিন না মানুষ সত্যকে সমগ্রভাবে ধরিতে পারিতেছে ততদিন এইরূপ ভাঙ্গা গড়া

দেশে গত যুদ্ধের পরে ঠিক এই রকম মনোভাবেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য মনীষী লিখিয়াছেন—"Certainly the war threw most of the old illusions into limbo. The old codes had failed us in our time of need. The ancient standards had proved inadequate. I cannot conceive of a really thoughtful person who did not come out of the war period feeling as if all of his mental and spiritual props had been kicked out from under him."

ঘরে বাইরে এই আব্‌হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া বাংলার অতি-আধুনিক সাহিত্য যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। কে কত বেশী দুঃখের হৃদয়-বিদারক চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন সে বিষয়ে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সংসারের দুঃখই দেখাইয়াছেন। কিন্তু, বর্ত্তমান জগৎব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের ফলে আমাদের দেশের শ্রমিকদের দুর্দ্দশার দিকে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, শ্রমিকদের দুঃখ,দৈন্য,পাপ,কদর্য্যতাপূর্ণ জীবনে তাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্য-রচনার মনোমত উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই সঙ্গে কেরাণী শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনও তাঁহাদের খুব কাজে লাগিয়াছে। এই মধ্যবিত্তদের জীবন সম্বন্ধে একজন লিখিতেছেন—'যে যেমন অবস্থাতেই আছে, সে যেন নিতান্তই অনিচ্ছায়! কারো জীবনেই ছন্দ নাই, মিল নাই,—অবস্থা শুধু তাদের টুঁটি টিপে মেরেছে।"

অবস্থা ভাল হইলেই যে দুঃখের হাত হইতে এড়ান যায় না, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত তাঁহার "অরণ্য" নামক গল্পে তাহারই ছবি দিয়াছেন। বড়লোকের ছেলে ললিত মদে টাকা উড়াইতেছে।—

"কত উড়োলে ?"

"বহু ;—রেখেই বা কি হ'ত ? দারিদ্র্য আর স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই আমার কাছে সমান। আচ্ছা, তোমার মনে হয় না ক্ষিতি-দা, সমস্ত সৃষ্টিটাই একটা নিরর্থক আর্ট! মনে হয় না, আমাদের জন্মটা একটা নিদারুণ পাপ,—সমস্ত জীবনটা আমাদের অন্তরীণ-বাস, মুক্তি আমাদের মৃত্যু। মনে হয় না ? তুমি ত' ভারতের মুক্তিকামী,—তুমি তা'লে মদ খাও না কেন ক্ষিতি-দা ?"

তবে পাপকেই বরণীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া আমাদের অতি-আধুনিকগণ শরৎচন্দ্রকেও back number করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহারা সানিনের কথা তুলিয়া বলিতেছেন, "মদ্যপান অথবা অবাধ যৌন-সম্বন্ধে লজ্জিত হইবার মানুষের কিছুই নাই। যাহাতে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতে পাপ নাই। এমন কি পাপ বলিয়া কিছু নাই। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে মানুষ যাহা করে, তাহা কখনই পাপ হইতে পারে না।" কিন্তু, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কি ? তাহা কি শুধুই মদ্যপান আর অবাধ যৌন-সম্বন্ধ ? ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপ নরক প্রভৃতি যে-সব কথা আছে সে-সব না হয় পণ্ডিত পুরোহিতদেরই জুয়াচুরি ধরিয়া লইলাম, যাহাতে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা পাপ হইতে পারে না, এ কথাও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মদ্যপান আর অবাধ যৌন-সম্বন্ধই কি মানুষের আনন্দের চরম ? এই চরম আনন্দের একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁহার নূতন গল্প "স্বর্গের চাবি"তে *। নলিনীর পিতামহ মদে ও বেশ্যায় সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিলেন, নলিনী বিষয় না পাইলেও পিতামহের গুণের অধিকারী হইয়াছিল। পশ্চিম দেশের এক গুণধর রাজার বন্ধু হইয়া সে কি রকম "স্বাভাবিক" আনন্দ আস্বাদন করিয়াছিল এই গল্পটিতে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে। মদ খাইতে খাইতে বমি, পাকা যকৃতের উপর অস্ত্রোপচার, মদের নেশায় ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাঙ্গালীর cowardice দুর্নাম দূর করা, সুন্দরী বাইজীর সহিত মদের বোতল লইয়া এক তরীতে ভাসিয়া যাওয়া, হাতের আংটিটির দিকেই বাইজীর নজর এবং একজনার সহিত প্রেম করিতে করিতে আর একজনার পথ চাহিয়া থাকা—চরম আনন্দের সকল উপসর্গই ইহাতে আছে। তবে নলিনীর মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, জীবনে এত সুখ, এত আলো, এত আনন্দ, মরিলে হয়ত নরকে গিয়া পচিতে হইবে। কিন্তু, একদিন তাহার স্বর্গগত পিতামহ স্বপ্নে আসিয়া নলিনীর সে-সন্দেহ দূর

* "মানসী ও মর্ম্মবাণী"—বৈশাখ ১৩৩৬

করিয়া দিয়া গেলেন এবং তাহার হাতে স্বর্গের দ্বার খুলিবার চাবিটি দিয়া গেলেন। পাঠকদের নিশ্চয়ই জানিতে আগ্রহ হইতেছে, স্বর্গের চাবিটি কি রকম জিনিষ। সেটি আর কিছু নহে, মদের বোতল খুলিবার স্ক্রু। তাহার পর হইতে নলিনী সকল সময় সেইটি কবচের মত গলায় ঝুলাইয়া রাখিত। মরিবার পর সে যে নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার বন্ধু বান্ধবদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মানবজীবন যদি বাস্তবিকই দুই দিনের হয়, যদি আত্মা না থাকে, ভগবান না থাকে, মরিলেই যদি সব ফুরাইয়া যায়, তবে বৃথা নীতি, বৃথা ধর্ম্মকর্ম্ম। পরোপকার, সমাজ-সেবা দেশ-সেবা এ-সবে সময় ও শক্তি বৃথা ব্যয় না করিয়া এইরূপ ইন্দ্রিয়-স্রোতে গা ভাসাইয়া যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই আদায় করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। তবে কথাটা হইতেছে এই যে, এই চার্ব্বাক-নীতিকে আমাদের তরুণেরা যত আধুনিক মনে করেন, বস্তুতঃ সেটা তত আধুনিক নহে। মানুষের মধ্যে এই দিকে একটা ঝোঁক বরাবরই আছে, সকল দেশে, সকল যুগেই কতক মানুষ এইরূপ "আনন্দ" লইয়া থাকে, কিন্তু, সাধারণতঃ মানুষের আত্মা এই আনন্দে বেশী দিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, মহান্, গভীর, তীব্র, পূর্ণ আনন্দের অধিকারী মানুষ এই বাণী তাহার অন্তরাত্মা হইতেই সে শুনিতে পায়। তাই এই নীচের অপূর্ণ মিশ্রিত ক্ষণস্থায়ী আনন্দের খেলাকে ছাড়াইয়া উপরের দিকে উঠিতে চায় এবং ইহাই মানবজাতির সভ্যতাবিকাশের ইতিহাস।

কিন্তু সেই উপরের আনন্দ কেমন করিয়া লাভ করিতে হয় মানুষ তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না, ধরিতে পারে না। উপরের দিকে উঠিতে চাইলেই তাহার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, শুধু তাহাই নহে, জগতের সমস্ত শক্তি যেন পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে নীচের দিকেই টানিতে থাকে, তাই দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার সে পড়িয়া যায়। দুই চারিজন মহাপুরুষ দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত সাধনার বলে উপরের দিকে চলিয়া যান, কিন্তু সমাজহিসাবে, জাতিহিসাবে মানুষ এই নীচের স্তরেই ঘুরিয়া মরে।—মনে করে ইন্দ্রিয়কে, শরীরকে পীড়ন করিলেই বুঝি উপরে উঠা যায়, তাই সমাজ বিধি-নিষেধের নানা কৃত্রিম বন্ধন সৃষ্টি করে। সেই বন্ধনের ফলে কালক্রমে মানুষের প্রাণশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, মানুষের আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, ফলে আবার গোঁড়া- হইতে, ইন্দ্রিয়পরতা হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। তবে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া আসিয়া মানবজাতি এতদিন যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহার প্রকৃতির যে সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নহে, সমষ্টিগত ভাবেই এক উচ্চতর জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে, মানবসমাজ অভিনব সাম্য, শান্তি, শৃঙ্খলা ও আনন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই নূতন জীবন সত্য সত্যই লাভ করিতে হইলে সমাজ এতদিন যে-ভাবে চলিয়া আসিয়াছে * তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিতেই হইবে। তাই আজ বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বত্র অতীতের বিরুদ্ধে, প্রাচীনের বিরুদ্ধে গতানুগতিক সমস্ত সংস্কার, রীতি, নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যাইতেছে।

কিন্তু, মানবসমাজের ক্রমবিকাশের এই নিগূঢ় রহস্যটি এখনও মানুষের মনে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, তাই সাহিত্যেও তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এখনও শুধু ধ্বংসের দিকেই ঝোঁক, গঠনের দিকে নহে, অন্ততঃ আমাদের দেশের এখন ধ্বংসটাই জাতির জীবনের প্রধান সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের হাওয়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে সে আর প্রচলিত শাস্ত্র, বিধি-নিষেধ মানিতে চাহে না, সকলেই সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। ইহা খুবই আশার কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু সত্যকে সন্ধান করা, সত্যকে যাচাই করা, শুধু মুখের কথাতেই হয় না, তাহার জন্য শক্তি চাই, সাধনা চাই। আমাদের তরুণেরা সে সাধনা করিতে নারাজ। তাই যাঁহার যেমন শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, সংস্কার, প্রাণ মনের

---

* It is now a general belief "that the affairs of the world had been dreadfully bungled"—F. P. Stockbridge.

গতি তিনি সেই মতই সত্য দেখিতেছেন। যেটা ভাল লাগে, যাহাতে সহজেই বিশ্বাস হয়, সেইটাকেই তাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ফলে পাশ্চাত্য জগতে যত নূতন নূতন ism উঠিতেছে, নূতন নূতন ফ্যাশন্ উঠিতেছে, আমাদের তরুণেরাও আগ্রহের সহিত তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। কামোপভোগই জীবনের পরম সত্য, এটা বেশ সহজেই বিশ্বাস করা যায়, ইহাতে মজাও আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া দিতেছেন ইহাই scientific, ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্য, আর কথা কি আছে?

তবে আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছে, সেটি একেবারে মৌলিক। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ছোট গল্পে যে ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই হয়! তিনি Philosophy of Sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না। তিনি দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম্ম, নৈতিকতা এ-সবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ-সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্ম্মম ক্রূর হৃদয় সয়তান। অন্যান্য আধুনিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করুন, তাঁহারা জগতে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তি ও জড় অন্ধ শক্তিরই খেলা দেখেন কিন্তু এ জগৎটা যে সয়তানেরই রাজ্য এটাও তাঁহারা বলেন না। তাঁহাদের লেখায় মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ ফুটিয়া উঠে, "নিখিলব্যাপী এই বিরাট মিথ্যাচারের বাহিরে সত্যবস্তু হয়ত বা কোথাও কিছু থাকিতেও পারে।"* কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মধ্যে সেরূপ সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থান নাই। তিনি সর্ব্বত্র দেখিতেছেন শুধু সয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাহার ছোটগল্পগুলি রচনা করিতেছেন, তাই সেইগুলি হইয়া উঠিতেছে, "রূপে রসে অদ্বিতীয়।"

"বিনোদিনী" জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প-পুস্তক। এই পুস্তকটি বাংলার অতি-আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। "বিনোদিনীতে" যতগুলি গল্প আছে তাহার প্রত্যেকটিতে এক একটি সয়তানী ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ-জগতের যে নিয়ন্তা সে মানুষের সুখ দেখিতে পারে না, নানাভাবে মানুষকে যন্ত্রণা দিয়াই তাহার আনন্দ, মানুষের মধ্যেও যে-সব প্রবৃত্তি আছে তাহা ঐ নিয়ন্তারই অনুরূপ। শিবপ্রিয় মা, স্ত্রী ও তিনটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া পল্লীপ্রান্তে সুখেই ছিল। কিন্তু বিধাতার তাহা সহিল না। একজন সাধু আসিয়া তাহাকে লোভ দেখাইল, সোনা তৈরি করিবার বিদ্যা শিখাইয়া দিবে। সুখের সংসার ছাড়িয়া শিবপ্রিয় সাধুর সহিত চলিয়া গেল, ছয়মাস গাধার মত খাটিয়া সাধুর সেবা করিল, তাহার পর একদিন সাধু তাহাকে ফেলিয়া চম্পট দিল, অসময়ের সম্বল বলিয়া শিবপ্রিয় যে কাঁচা টাকা দশটা আনিয়াছিল তাহাও সাধুর সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল। উপবাসে অনিদ্রায় শিবপ্রিয়ের এমন চেহারা হইয়াছে যে, দেখিলে চেনা যায় না। ছয়মাস পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সে শুনিল, তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছিল, সে অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। আরও দুই একটা আঘাত পাইবার পর শিবপ্রিয় পাগল হইয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায় সে চীৎকার করিয়া বেড়াইত—"চুন্ চুন্ স এ হমারে মরী ঐ" অর্থাৎ বাছিয়া বাছিয়া আমার শত্রু নিপাত কর। উন্মাদ শিবপ্রিয়ের ছবিটি "বিনোদিনার" প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত হইয়াছে। সব গল্পগুলিই এই ছাঁচে ঢালা। রবীন্দ্রনাথ "পুরাতন ভৃত্য" নামক কবিতায় মানবমহত্ত্বের একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র যেন সেইটিকে ব্যঙ্গ করিয়াই তাহার "পুরাতন ভৃত্য" গল্পটি লিখিয়াছেন। মাঠে একটা নামগোত্রহীন লোক পড়িয়া মরিতেছিল, যাজক ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর তাহাকে ঘরে আনিয়া বাঁচাইল। পরে সে ঐ সংসারের অতি বিশ্বাসী ভৃত্য হইল, কর্ত্তাও গৃহিনীর ছেলের মত। তারপর একদিন মাঠের মাঝে প্রভুর বুকে ছুরি মারিয়া তাহার টাকাগুলি লইয়া ভৃত্য চম্পট দিল। সতৃষ্ণা একটি গ্রাম্য কুলবধূর রূপে মুগ্ধ হইয়া কিরূপ প্রতারণার দ্বারা আত্মীয়তা পাতাইয়া তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া তুলিল, "প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠীতে" তাহার বর্ণনা আছে। জসিম্ তাহার

* "দিক্‌ভুল"—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বৌকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বৌ নিজেই আর জসিমের কাছে ফিরিয়া আসিতে চাহিল না। "পয়োমুখম্" গল্পটিতে দেখান হইয়াছে, পিতা কেমন পুত্রের বিবাহ দিয়া পণের টাকা লইবার জন্য একটির পর একটি পুত্রবধূকে বিষ দিয়া হত্যা করিতেছে, কিন্তু মুখে তাহাদের প্রতি স্নেহ আদরের কোনও ত্রুটি নাই। "অন্নদার অভিশাপ" গল্পে দেখান হইয়াছে, একজন লোক আত্মসম্মান রক্ষার জন্য চাকুরীতে জবাব দিয়াছিল, ফলে স্ত্রীকে লইয়া দুইটি অন্নের জন্য আত্মীয়ের গৃহে তাহাকে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, শেষকালে মনের ধিকারে স্ত্রীকে লইয়া সে খ্রীষ্টান হইল এবং মিশনারী স্কুলে পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিল। আর একটি গল্পের নাম "ভরা সুখে।" নামটি পড়িয়া ভরসা হইয়াছিল জগদীশচন্দ্র অন্ততঃ একটিও সুখের সংসার বর্ণনা করিবেন। তা' তিনি করিলেন। হরমোহিনার রত্নগর্ভা সাতটি সন্তান তার মধ্যে একটি মেয়ে। ছেলেদের মাসিক আয় ছ' হাজারের উপর। মেয়ে, বৌ, ছেলেরা সকলেই মা বলিতে অজ্ঞান। মায়ের আদেশ একটিও লঙ্ঘিত হয় না। এই ত ভরা সুখ। হরমোহিনী অসুখে পড়িয়াছিলেন, বাঁচিবেন এ আশাই ছিল না, অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছেন, আজ তিনি অন্নপথ্য করিবেন। ছ'টিছেলের ছয়ছক্ ছত্রিশটি ছেলেমেয়ে লইয়া গাঙ্গুলীদের প্রকাণ্ড সংসার—সবার উপর মা। সেই মা পথ্য করিতেছেন, সবাই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিশে ঠেশ্ দিয়া সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরমোহিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পথ্যের বাটি মুখে ধরা হইল, মা নীরব। গঙ্গাধর মায়ের নাড়ী টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "মা ত নাই।" পরক্ষণেই মা মা আহ্বানে আর আর্ত্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই "ভরা সুখের" আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

শুধু মানুষই যে মানুষের সহিত নির্ম্মম ব্যবহার করে তাহা নহে, জগতে সব অদৃশ্য শক্তি রহিয়াছে মানুষের উপর অত্যাচার করিয়াই তাহাদের আনন্দ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচু গোপালের মাদুলী ধারণ করে—তার পর পেটে আসে পাঁচু। পাঁচু পাঁচ বছরের হইল, তাহাকে অসংখ্য কবচ তাবিজ পরাইয়াও পাঁচুর মায়ের স্বস্তি নাই, কখন কি অমঙ্গল ঘটে। সেই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—মা আজ আমায় কুমীরে নেবে। এই হ'ল গল্পের আরম্ভ। পাঁচু ভয়ে আড়ষ্ট, পাঁচুর মা বাপ কখনও ভাবে এসব অসম্ভব কথা ছেলেতে বলিয়াই থাকে, কামদা নদীতে কেহ কখনও কুমীর দেখে নাই, আবার কখনও ভাবে যদি পাঁচুর কথা সত্য সত্যই ফলিয়া যায়। কি সর্ব্বনাশ! প্রতিবেশীরা দু'রকমই বলে। পাঠকের মনও একটা উৎকট আশঙ্কায় শেষ পর্য্যন্ত দুলিতে থাকে। এ কদিন ছেলেটাকে নদীর ধারে না পাঠালেই কোন আর গোল থাকে না, কিন্তু এমনই ঘটনাচক্র যে "দিবসের শেষে" বাপই ছেলেটিকে নদীর ধারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল এবং সত্য সত্যই তাহাকে কুমীরে লইয়া গেল। জগদীশ-চন্দ্রের ছোট গল্প লিখিবার বাস্তবিকই যে ক্ষমতা আছে এই একটি গল্পটি পড়িলেই তাহা বুঝা যায়।

কি বলা হইতেছে তাহার হিসাব না করিয়া কেমন করিয়া বলা হইতেছে তাহাই যদি আর্টের মাপকাটি হয় তাহা হইলে এই "দিবসের শেষে" গল্পটি একটি নিখুঁত সৃষ্টি, a perfect piece of art। জগৎ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের যাহা অনুভূতি, এই গল্পটিতে তিনি তাহা অতি সুন্দর ভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু, আর্টের ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ বিচার করিতে হইলে শুধু প্রকাশ-ভঙ্গিটি দেখিলেই চলে না, কি প্রকাশ করা হইতেছে তাহাও দেখিতে হয়। "বিনোদিনী"তে যদি দুই একটি গল্প এরূপ থাকিত তাহা হইলে হয়ত বলিবার কিছুই ছিল না, কারণ সংসারে এরূপ নিয়তির নির্ম্মমতা কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগদীশচন্দ্রের সকল গল্পই এই একছাঁচে ঢালা। গ্রামের পাশে কামদা নদী, মায়ের মত স্নেহময়ী,—কোনও দিন সে নদী কাহারও অনিষ্ট করে নাই, হঠাৎ তার বুকের মধ্য হইতে একটা কুমীর উঠিয়া রতি নাপিতের পাঁচ বছরের ছেলেটাকে লইয়া গেল।—ঠিক এই রকমই সংসারের

সর্ব্বত্র সয়তানী শক্তি খেলা করিতেছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। সে শক্তি শুধুই জড় নহে, প্রকৃতির অন্ধ খেলামাত্র নহে, তাহা সজ্ঞান, সচেতন, তাহা জানিয়া শুনিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে এবং তাহাতেই আনন্দলাভ করে, তাই আমরা ইহার নাম দিয়াছি সয়তানী শক্তি। জগদীশচন্দ্রের humoner বা রসিকতার চেষ্টাতেও কিরূপ সয়তানী ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, "দিবসের শেষে"র শেষ অংশটুকু পড়িলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।— কুম্ভীরটি পাঁচুকে লইয়া একেবারে লুকাইয়া গেল না, আর একবার তাহার বাপকে এবং অন্যান্য লোককে দেখাইয়া লইয়া গেল—"যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্ব্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।— …জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্য্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল…সূর্য্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।" সয়তানীর এমন জীবন্ত, মর্ম্মান্তিক চিত্র আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

"বিনোদিনী"র শেষ গল্পটির নাম "তৃষিত-আত্মা," সুস্থ সবল সীতাপতি তামাক খাইতে খাইতে অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া মারা গেল। তাহার পর হইতেই সীতাপতির পুত্রবধূ ভয় খাইতে লাগিল। তাহার কোলে তিন মাসের শিশুপুত্র। সীতাপতি এই নাতিটিকে খুব স্নেহ করিত। মরিয়াও সে তাহার মায়া কাটাইতে পারিল না। তাহার তৃষিত প্রেতাত্মা ঐ শিশুটিকে কয়েকদিনের মধ্যেই চুষিয়া মারিয়া ফেলিল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"চোখের উপর শিশু-হনন চলিতেছে, অথচ ত্রিভুবনের কুত্রাপি তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই মানুষের জানা নাই, বাধা দিবার সাধ্য নাই, সান্ত্বনা নাই।"

ইহাই জগদীশচন্দ্রের জগৎ! এখানে মানুষ, জড়প্রকৃতি, প্রেতাত্মা সকলেই মানুষের মর্ম্ম ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত এবং এই সবের অন্তরালে থাকিয়া একজন নিয়ন্তা—তাহাকে সয়তানই বলা যায়—মানুষের এই মর্ম্মবেদনায় আনন্দলাভ করিতেছে। এই আনন্দের রসকে রূপ দিয়াছেন বলিয়া কি জগদীশচন্দ্র তাঁহার এই বইখানির নাম দিয়াছেন "বিনোদিনী"? * শুধু "বিনোদিনী" নহে, প্রতিমাসে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই জগদীশচন্দ্রের একটা না একটা নূতন গল্প বাহির হইতেছে, সবেরই বিষয়বস্তু এক, সয়তানী। বাপের আদর, মায়ের স্নেহ, পত্নীর প্রেম, সাধুর ধর্ম্ম, এ-সব সয়তানীরই বিভিন্ন প্রকারভেদ! এই ভাবে তিমিরান্ধ বাঙ্গালীর চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতেছেন বলিয়া জগদীশচন্দ্র তাঁহার আর একটি গল্প-পুস্তকের নাম দিয়াছেন "অঞ্জন-শলাকা।" অন্যান্য আধুনিক লেখকদের লেখা পাঠ করিলে মনে হয় মানুষের মধ্যে পশুটা সত্য, জগদীশচন্দ্রের লেখা পড়িলে মনে হয় মানুষের মধ্যে সয়তানটাই একমাত্র সত্য। অন্যান্য রচনাতে এক প্রকারের আনন্দ আছে তাহা যতই নীচের বা পাশবিক হউক; কিন্তু, জগদীশচন্দ্রের লেখা পাঠ করিলে প্রাণের রস শুকাইয়া যায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, আতঙ্কে মন বিষাক্ত হইয়া উঠে। অতএব, শুধু সত্যের দিক হইতে বা নীতির দিক হইতে নহে, রসের দিক হইতেও জগদীশচন্দ্রের লেখা সৎ সাহিত্যের মধ্যে কেমন করিয়া স্থান পায় তাহা আমরা বুঝি না। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ অশ্লীলতাকে কাব্যের দোষ বলিয়াছেন। যে কথা শুনিয়া মনে লজ্জা, ঘৃণা অথচ অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয় সেই বাক্যই অশ্লীল—ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী। অশ্লীলতা দোষের কেননা তাহা কাব্যের রস নষ্ট করে, "কারণ, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়, একটি বদ্ সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়।" জগদীশচন্দ্রের আগাগোড়াই বদ্ সুর, বদ্ রস। আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু সয়তানী আছে তাই "শনিবারের চিঠি" পড়িতে আমাদের বেশ লাগে। "বিনোদিনী"তে আমরা রূপ রসের সন্ধান পাই। কিন্তু, আমাদের মধ্যের এই সয়তানী ভাবটা দূর করা, আমাদের রুচিকে উন্নত ও মার্জ্জিত করাই সৎ সাহিত্যের কার্য্য নহে কি?

জীবনে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, সয়তানীও আছে, সে-সব বর্ণনা করিলেই যে কাব্যের রসভঙ্গ হয় তাহা

* কামদা, শিবপ্রিয়, ভরাসুখে প্রভৃতি নামগুলির ভিতরেও সংসারের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

নহে। পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন "our sweetest songs are those that tell of saddest thought"। শরৎচন্দ্র যে-সব বেদনার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিই জাগিয়া উঠে, ঘৃণা বা আতঙ্ক নহে, তাই রসভঙ্গ হয় না। Shakespeareএর Tragedyগুলি রূপে রসে তাহার Comedyগুলির অনেক উপরে। যে-সকল Tragedy জগতের রস-সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইয়াছে সেগুলিতে দুঃখ দৈন্যের চিত্র এমন ভাবে দেওয়া হইয়াছে—যেন মানুষের প্রতি সমবেদনার উদ্রেক হয়, জীবনে নূতন interest বা রস জন্মায়, মানুষের সুপ্ত শক্তি সকল জাগিয়া উঠে, বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষ পরাজিত হইলেও সেই সংঘর্ষ ও সংগ্রামই উৎসাহের সৃষ্টি করে, যে-সকল ভুলের জন্য মানুষের শোচনীয় পরিণাম হয় Tragedyতে তাহার চিত্র দেখিয়া মানুষ সে-সবের প্রতি অবহিত হইতে শিখে, নম্রতা শিখে, সহিষ্ণুতা শিখে, এই ভাবে Tragedy'র দ্বারা ভাবশুদ্ধি হয়। তাহা ছাড়া সকল দেশের সকল Tragedy'র পিছনেই একটা moral order আছে, নৈতিক নিয়মের শৃঙ্খলা আছে, তাই সে চিত্র দেখিয়া মানুষ অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে না। Shakespeareএর Tragedyগুলিতে দেখা যায়, কোথাও বড় রকমের কোন অন্যায়, অত্যাচার, পাপ সংঘটিত হইলে সংসার তাহা বরদাস্ত করে না, চতুর্দ্দিকে একটা বিষম উপদ্রবের সৃষ্টি হয় এবং সেই পাপের কারণকে সংহার না করিয়া সে উপদ্রব শান্ত হয় না। কিন্তু, ঐ উপদ্রব শুধু পাপীকে, দোষীকেই সংহার করে না, সেই সঙ্গে নির্দ্দোষী, নিরপরাধীও সাজা পায়, এইটাই Shakespeareএর Tragedy'র নিগূঢ় রহস্য। ঠিক যেমন একটা বিস্ফোটকে অস্ত্র করিলে শুধু বিষাক্ত পুঁয্ রক্তই বাহির হয় না, তাহার সহিত কতকটা তাজা রক্তও বাহির হইয়া যায়। যাহাই হউক, জগতে যে মূল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা যে এইরূপ নির্ম্মম ভাবে পাপকে, অন্যায়কে, অত্যাচারকে নির্ম্মূল করিতে করিতে চলিয়াছে, ইহা দেখিলে প্রাণে আশারই সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সাহিত্যেও দেখা যায়, লোকে আপন আপন কর্ম্মের ফলেই দুঃখভোগ করে, আবার ধর্ম্মের দ্বারাই তাহা হইতে মুক্ত হয়। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এরূপ moral order বা নৈতিক নিয়মের কোনও বালাই নাই, সেখানে মানুষ শুধু সয়তানের তৃপ্তির জন্যই কষ্ট পাইতেছে।

আমাদের প্রাচীনেরা সংসারকে অসারই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সংসারের সাধারণ জীবন ছাড়াইয়া যে এক দিব্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায় তাহার সন্ধানও তাঁহারা দিয়াছিলেন, অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। সংসারের দুঃখে ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন এই সকল হইতে মুক্তির পথ সন্ধান করে তখনই দুঃখ সার্থক হয়, এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে সংসারের দুঃখ আলোচনা করিবার উপদেশ আছে, জন্ম মৃত্যু জরা—ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সংসারকে সয়তানের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা নয়, পরন্তু এই সকল দুঃখকে অতিক্রম করিবার প্রযত্ন করা। জগদীশচন্দ্র সংসারের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। বাস্তবিকই জগতে অসুর, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি অদৃশ্য শক্তি রহিয়াছে, মানুষকে যন্ত্রণা দিয়াই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু, তাহারাই জগতের চরম নিয়ন্তা নহে, জগতে যেমন অসুর আছে, পিশাচ আছে, রাক্ষস আছে তেমনি দেবতাও আছে এবং সকলের উপরে আছেন ভগবান। মানুষকে লইয়া, জগৎকে লইয়া দেবতা ও সয়তানে সংগ্রাম চলিতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে, এই সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত দেবতারই জয় হইবে, এই সংসারেই ধর্ম্মরাজ্য, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে তাঁহাদের বাণী শুনিয়াই এই দুঃখময় সংসারে মানুষ সাহস পায়, আশা পায়, শক্তি পায়।

প্রাচীন গ্রীস্‌দেশীয় tragedyতে নিয়তির (Doom, Necessity, Ate) খেলা বর্ণিত হইয়াছে, জগদীশচন্দ্রের সয়তানী শক্তির সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ অদৃষ্ট বা নিয়তি যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে, কোথাও একটু ফাঁক পাইলেই মানুষকে আক্রমণ করিবে। সে-শক্তি মানুষের ভোগের, সুখের, উন্নতির শত্রু। তাই পদে পদে মানুষকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে, যতক্ষণ মানুষের পুরুষ-

কারের শক্তি থাকে ততক্ষণ সে কিছু করিতে পারে না, কিন্তু, সর্ব্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করে এবং একটু ভুল, ভ্রান্তি দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইলেই মানুষের উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু, এই নিয়তিও খামখেয়ালী নহে, কারণ মানুষ যতক্ষণ না অতি বাড় বাড়িতে যায় ততক্ষণ নিয়তি তাহার পিছনে লাগে না, এই নিয়তি যেন বলে, "যদি তুমি বাড়িতে যাও তাহা হইলে সেইরূপ শক্তি অর্জ্জন করা চাই, নতুবা ফাঁকি দিয়া বড় হইতে পাইবে না।" এই জন্যই সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যবহার করা গ্রীসদেশীয় আদর্শ, "moderation in all things is the great part of virtue।" অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে একটা moral order, নিয়মের রাজ্য। মানুষ নিজের কর্ম্মফলেই নিজের উপর নিয়তির নির্ম্মম আঘাত ডাকিয়া আনে। কিন্তু, জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। রতি নাপিতের পাঁচ বছরের ছেলেটাকে কুমীরে লইয়া গেল। সীতাপতি প্রেত হইয়া তিন মাসের শিশুকে শুষিয়া মারিয়া ফেলিল, আত্মীয়ের মৃতদেহ সৎকার হইল না, নদীর জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে দেহ ভাসিয়া উঠিয়া নদীর দুই তীরে এত স্থান থাকিতে তাদেরই ঘাটে আসিয়া লাগিল, পরম আত্মীয়দের চোখের সম্মুখে শিয়াল কুকুরে কাকে শকুনে ঝাপ্‌টা-ঝাপ্টি কাড়াকাড়ি করিয়া সেই দেহ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল—এই সব লইয়াই জগদীশচন্দ্রের রূপ ও রসের সৃষ্টি!

এ-হেন "বিনোদিনী" সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যরথীগণ কি মত প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে দুঃখবাদ আমাদের আধুনিক সাহিত্যে কত গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের বিনোদিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"ছোট গল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।" কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন—"রূপে রসে অদ্বিতীয়।" কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেন—"গল্প-সাহিত্যে বিনোদিনীর স্থান বহু ঊর্দ্ধে।" কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন—"অতি সুন্দর।" ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বলেন—"এমনটি আর নাই।"

আমাদের দেশের পতিত, লাঞ্ছিত অবস্থাই যে আমাদের সাহিত্যকে এরূপ গভীর দুঃখবাদে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সাহিত্য জাতির মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু, আবার সেই মনোভাবকে পরিবর্ত্তিত করা, জাতিকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করাইয়া দেওয়াও সাহিত্যের কাজ, কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা, সা চ নিঃশ্রেয়স-মূলম্—(রাজশেখর)। কবিকে যে সাক্ষাৎভাবে সমাজ সংস্কারক, বা দেশোদ্ধারক হইতে হইবে তাহা নহে, কবি রূপ রসেরই সৃষ্টি করিবেন এবং তাহার দ্বারাই মানুষের ভাব শুদ্ধ হইবে, হৃদয় উন্নত হইবে, জীবনে নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে। কিন্তু কেবল জাতির, সমাজের, মানুষের দোষগুলি, দৈন্যগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখাইলে জাতিকে উঠিতে সহায়তা করা হয় না, নীচের দিকেই ঠেলিয়া দেওয়া হয়। সত্য, শিব, সুন্দর—কোনও আদর্শ অনুসারেই এরূপ মক্ষিকাবৃত্তি-সাহিত্যকে সমর্থন করা যায় না।

বহুদিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের আসিয়াছে একটা Inferiority complex, জাতি হিসাবে, মানুষ হিসাবে আমরা নেহাৎ ছোট, নেহাৎ নীচ, অক্ষম, এই ভাব। তাই দেখিতে পাই আমাদের কি সাহিত্যিক, কি ঐতিহাসিক, কি রাজনীতিক, কি সমালোচক, সকলেই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, "ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।"

যে-দেশে এই পরাধীন অবস্থাতেও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে,—যে-জাতি "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র দিয়া সমগ্র ভারতে এক অভিনব জাতীয় শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে, যে জাতি ইতিমধ্যেই জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে জগৎ-সভায় নিজের আসন করিয়া লইতে পারিয়াছে, সে জাতি মানুষ নহে, শুধুই বাঙ্গালী, একথা কেমন করিয়া বলিব? আজ বাঙ্গালী জীবনসংগ্রামে যে পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ সে সংগ্রাম করিতে নারাজ, নিজের শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক, এখনও সে পিছাইয়া পড়িয়া থাকিয়াই তামসিকতার আরাম উপভোগ করিতে যায় এবং সেই তামসিকতাকে সমর্থন করিবার জন্য সমস্ত দেশকে,

সমস্ত জাতিকে গালি দেয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এমন কোনও বাধা নাই যাহা সে ইচ্ছা করিলে জয় করিতে, অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু, আত্মশক্তিতে তাহার বিশ্বাস নাই, সংগ্রাম করিতে উদ্যম নাই, তাই বলিতে ও শুনিতে বেশ লাগে যে, জগৎ আমাদিগকে ঠকাইয়াছে, তাই জগৎকে, মানুষকে, সমাজকে গালি দিয়া আমরা প্রতিশোধ লইতে চাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে, এইরূপ নিন্দা, বা গালির দ্বারা আমরা নিজেকেই আরও হীন ও অধম করিয়া তুলিতেছি। জাতির এই দুর্দ্দিনে আমরা চাই সেইরূপ সাধক যিনি শুধু দেখিবেন না মা কি হইয়াছেন, তিনি দেখিবেন মা কি ছিলেন, মা কি হইবেন।—আমাদের বর্ত্তমানই একমাত্র সত্য নহে, আমাদের অতীতও সত্য, ভবিষ্যৎও সত্য, সেই সমগ্র সত্যকে রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে যাঁহারা ধরিতে পারিবেন, তাঁহাদের সাধনাতেই এই পতিত জাতিও আবার প্রাণ পাইয়া উঠিবে, মা আবার চিরকল্যাণময়ী রাজরাজেশ্বরীরূপে আবির্ভূতা হইবেন—বন্দেমাতরম্।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

শেষ

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী

ফুল ফুটেছিল তবু ঝ'রে গেল
জ্যোৎস্নার অবসানে,
যাবার বেলায় ব'লে গেল হায়
তরু লতিকার কানে।

শীতল পরশে ফুটিয়াছিলাম,
রবির কিরণ মাখি,
ত্রাসে সঙ্কোচে লুটিয়া ধরায়
ভয়ে মুদিলাম আঁখি !

১৫

দুপুরের পর রাণাঘাট ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু দুবার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্ত্বেও সে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ও গুলাকে কি বলে? সিগন্যাল? পড়িতেছে উঠিতেছে কেন? গাড়ী যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমত ইটের গাঁথা ঠিক যেন রোয়াকের মত। তাকে প্ল্যাটফর্ম্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলাতে সব ষ্টেশনের নাম লেখা আছে—কুড়ুলগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ি ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পড়ে—ঢং ঢং ঢং ঢং—চার ঘা, অপু শুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতল-পরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে—কুড়ুলগাছি ষ্টেশনে অপু লক্ষ্য করিয়া দেখিল। সর্ব্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকার কথা? সে খুসির সহিত ষ্টেশনে ষ্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের ওঠা-নামা লক্ষ্য করিতেছিল। বউ-ঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে—কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড় চোপড়, গহনাপত্র! জগন্নাথপুর ষ্টেশনে ভাল মুড়ির মোয়া ফিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু, মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভাল বাসিস্ নেবো তোর জন্যে? ষ্টেশনে টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখী বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো মা কাদের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটা ময়নাপাখী পালিয়ে এসেচে! নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ী বদ্লাইয়া গঙ্গার প্রকাণ্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময় সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল, সর্ব্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—ওপার হইতে হুহু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভাল ভাল বাড়ী বাগান, এ সব দৃশ্য জীবনে সে কখনো দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখিচিস্ অপু একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি, অপরাধ নিওনা মা, কাশীতে গিয়ে ফুল বিল্লিপত্রে তোমায় পুজো করবো, অপুকে ভাল রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে, পুলকে, অনিশ্চিততার রহস্যে তার হৃদয় দুলিতেছিল—এরকম মনোভাব এর আগে সে কখনো অনুভব করে নাই। সুবিধায় হোক, অসুবিধায় হোক্, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনে বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে

এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে, পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে,সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া—নদনদী, দেশ বিদেশ ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ!...এই তো সেদিন একবৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ?

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গাড়ি আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ী হুহু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!...উঃ—! ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পৌছিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিল। এদিকে ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়ীগুলা ষ্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে—হৈ হৈ শব্দ—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তালা-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড সবুজ নিশান ডুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনের পূর্ব্বে পশ্চিমে লাইনের ওপর এত সিগ্‌ন্যাল ঝাঁকে ঝাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—রেল, এঞ্জিন, গাড়ী, সিগ্‌ন্যাল!—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কাশী যাইবার গাড়ী আসিয়া বিকটশব্দে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইল। বিশাল ষ্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্ব্বজয়া কেমন দিশেহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত, আড়ষ্ট পায়ে স্বামীর পিছনে পিছনে একখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জ্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশেহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ীর বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলীর সাহায্যে মোটগাঁট্ উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্ব্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা, একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—রাত্রির গাড়ী বলিয়া তাহারা সকলে এক গাড়ীতেই উঠিয়াছে,—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কাম্‌রায় দেয় নাই। গাড়ীতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। ওপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না খোকা, এখ্‌খুনি চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়্‌বে—

কয়লার গুঁড়া তো নিরীহ জিনিস, চোখদুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায় তবুও অপুর সাধ্য নাই যে জানালার দিক হইতে এখন সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া। বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল—সে যে কত কি দেখিয়াছে! কত ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন শুদ্ধ ষ্টেশনটা হুস্ করিয়া হাউইবাজীর মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—রাত্রে কখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়ীখানা ঝড়ের বেগে একটা কোন্ নদীর ছোট্ট সাঁকো পার হইতেছে,—সাম্‌নে খুব উঁচু একটা কালোমত ঢিবি, ঢিবিটার ওপারে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশে শাদা শাদা মেঘ—তার পর সেই ধরণের বড় বড় আরও কয়েকটা ঢিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় ষ্টেশন, লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল!—ষ্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাষ্টার মশায় নীরেন বাবুর কাছে ঘড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ী ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার

সেই ধরণের উঁচু উঁচু ঢিবি—অনেক সময়ে রেল রাস্তার দুধারেই সেইরকম ঢিবি—গাড়ীতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ী চড়িয়াছে যে কেন! কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত ঢিবি কিসের? এক একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল গাড়ীখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া চলিয়াছে,—উঃ! রেলগাড়ী কি জোরে যায়!—কৌতূহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

রওনা হইবার পূর্ব্বে কাল বৈকালে সে নরোত্তম বাবাজীর উঠানের গাছটা হইতে একরাশ মুচুকুন্দ চাঁপা পাড়িয়া কতক তাহার টিনের বাক্সটাতে, কতক তাহার গায়ের সাটিনের জামার দু পকেট ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছিল—আজ সারাদিন ও সারারাত তার প্রিয়, পরিচিত ভুর ভুরে গন্ধে গাড়ীর বাতাস ভরিয়া রাখিয়াছে—মাঝে মাঝে পূর্ব্বদিকের দ্রুতবিলীনমান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল ওরই ওপারে অনেকদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর, সেই সাঁইবাব্‌লা গাছটা—কোথায় পড়িয়া রহিল কত দূরে!...কত দূরে তাহারা আসিয়াছে? এসব কোন্ দেশের উঁচু নীচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড ষ্টেশনে সশব্দে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্ল্যাটফর্ম্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি।

তাহার পর কত ষ্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল! গাড়ী চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না—কত ধরণের সিগ্‌ন্যাল, কত কল কারখানা, একটা কোন্ ষ্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙলাগানো মত—তারই মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট্ নম্বর?...হাঁ... আচ্ছা—সিক্স্‌টি নাইন্—সিক্স্‌টি নাইন্—হাঁ?...উনসত্তর... ছয়ের পিঠে নয়—হাঁ—হাঁ—

সে অবাক্ হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি কল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বল্‌চে কেন?

যখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবো, বাঁ দিকে চেয়ে থেকো গঙ্গার পুলের ওপর গাড়ী উঠ্‌লেই কাশী দেখা যাবে—

অস্তশিখরশায়ী তপন দেবের শেষ রশ্মি যখন পঞ্চসঙ্গম ঘাটের মহিমান্বিত মন্দিরচূড়া ও আওরঙ্গজেবের মস্‌জিদের গগনস্পর্শী সুউচ্চ মিনারের উপর স্বর্ণরেখাপাত করিয়াছে—ঠিক সেই সময় গাড়ীখানা রাজঘাটের পুলের উপর উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার তটবর্ত্তী যুগ যুগান্তের পুণ্য-স্মৃতিপূত বারাণসীর গৌরবময় সীমারেখা বাম ধারে দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইতেই গাড়ীর সকল যাত্রী একধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহাউৎসাহে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় বিশ্বনাথজীকি জয়!...জয় অন্নপূর্ণা মহারাণীকি জয়!..

১৬

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ীর একতলায় হরিহর বাসা লইয়া আছে। কোনো পূর্ব্ব-পরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহারা যে সব জায়গায় ছিল, এখন সে সব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বর গলির পুরাতন হালুকির রামগোলাম সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে। বাড়ীর ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশে পাশের দু'তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর। এ পাঁচ ছয়দিনে সর্ব্বজয়া নিকটবর্ত্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে।, স্বপ্নেও কখনো সে এমন সব দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির! এমন ঠাকুর দেবতা! এত ঘরবাড়ী!—আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের

মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন বলিয়া জানা ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির ?—অন্নপূর্ণার মন্দির ?—দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরকার লাল-পাথরের মন্দিরগুলা ?.. মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্র-লোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপ ধূনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁক জমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশভূষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রাণী আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চারপাঁচজন চাকরাণী। দামী বারানসী সাড়ী পরনে, সোনার কল্কা বসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মত জ্বলিতেছিল—কি টানা ডাগর চোখ—কি ভুরু, কি মুখশ্রী,—সত্যিকার রাণী সে কখনো দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রাণীর মত রূপ বটে! তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে কি ঠাকুরের আরতি বেশীক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না। ঠাকুর দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসত বাড়ীই বা কি!...দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া সে গাঙ্গুলীদের নাটমন্দির, দো-মহলা বাড়ী, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গা বলিয়াছিল... দেখেচিস্ বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষীছিরি ?—

এখন সে যে সব বাড়ী রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলীবাড়ী ?—আহা অভাগী দুর্গা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত। গাড়ী ঘোড়াই বা কত!...এত গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনো সে দেখে নাই। গাড়ীই বা কত ধরণের! আসিবার দিন গোয়াড়ীতে, রাণাঘাটে, নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছে বটে,—কিন্তু এত ধরণের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নাই। দু-চাকার গাড়াই যে কত যায়!...তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দু দণ্ড এইসব ছাখে—কিন্তু পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না। অপু তো একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। এরকম কাণ্ডকারখানা সে কখনো কল্পনায় আনিতেও পারে নাই। তাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধঘাট বেশী দূর হয় নয় রোজ বিকালে সে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মহাউৎসাহে গল্প করে। কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে,—তার নাম পল্টু, ভাল কথা কহিতে জানে না, ভারী চঞ্চল তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ীর লোকেদের এই জেল-কয়েদীর মত ব্যবস্থা। অপু হাসিয়াই খুন্। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরণের ব্যবহার যে প্রতিবাদ-যোগ্য, সে জ্ঞানই তাহার হয় নাই। অপু বাড়ী ফিরিয়া আসিলে সর্ব্বজয়া রোজ তাহাকে বকে—একলা একলা ওরকম যাস কেন ?—সহর বাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস ?...মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া দুবেলা অধ্যবসায়সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ও বাড়িল। কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ পাঠের কার্য্য যোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্ব্বজয়া স্বামীকে বলিল,—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন ? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল ব'সে ব'সে পরামর্শ আঁটা—

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখণ্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ পাঠ করা তাহার কিছু নূতন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্যবাড়ী গিয়া কত ব্রত পার্ব্বণ উপলক্ষে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান সুরু করে—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গোপদ ক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ।

সে বাসায় সারা দুপুর বসিয়া বসিয়া বালির কাগজে কি লিখিতে লাগিল। স্ত্রীকে বলিল—শুধু শ্লোক প'ড়ে গেলে কেউ শুন্‌তে চায় না—ওই বাঙ্গাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশী ভিড় হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখ্‌বো, গান থাক্‌বে, কথকতার মতও থাক্‌বে নৈলে লোক জমে না—বাঙ্গালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হোল, দেবনাগরীর অক্ষর পরিচয় নেই শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়...আমার রেকাবী কুড়িয়ে ছ আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়...শুন্‌বে একটু কেমন লিখ্‌চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শোনায়। বলে—ওই কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

—তুমি কোন্ খানটায় ব'সে কথা বলো বলতো? একদিন শুন্‌তে যেতে হবে—

—যেও না, ষষ্ঠীর মন্দিরের নীচেই বসি—কালই যেও, নূতন পালাটা বল্‌বো, কাল একাদশী আছে, দিনটা ভালো—

—আস্‌বার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পান ফলের জিলিপী এনো দিকি অপুর জন্যে—সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পূজো ক'রে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পান্ ফলের জিলিপী, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাব্‌লাম অপু জিলিপী খেতে বড় ভালবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি ব'লে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার?

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোষে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ীর ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্ব্বজয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি বারের পূজো? উনি বাড়ী আস্‌চেন দেখ্‌লে হ্যাঁ ঝি? ঝি চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আয় অপু—এই ত্থাখ্ তোর সেই নারিকেলের কোঁপল—তুই ভাল বাসিস্? কিস্‌মিস্, কলা, কত বড় বড় আম দেখিচিস্ আর খাবি দিই—বোস্ এখানে—

এত নানারকমের ভাল জিনিস সর্ব্বজয়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে কখনও পায় নাই। তাহার কত কালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশ বনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে তাহার অবসন্ন, অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব কাল্পনিক সচ্ছলতার ছবি আপন মনে ভাঙ্গিত গড়িত সে সব দিনের সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে-ঢাকা ভাঙা পাঁচিলের দীর্ঘ ছায়ার সঙ্গে মিশাইয়া যে সব দুরাশায় রঙে রঙীন্ দূর কালের ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো তাহারা এতদিনে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে!

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্ব্বজয়া বলে—ধ্রুবচরিত্র শুন্‌তে শুন্‌তে লোকের কান যে ঝালা পালা হোল, নূতন একটা কিছু ধরো না? সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড় ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে। তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া বসিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না—দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারির দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরণের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত—নবাবগঞ্জের বাজারের বারোয়ারীতে কবির গান হচ্ছে বুঝ্‌লে? ব'সে ব'সে শুন্‌লাম বুঝলে?...সোজা পদ সব...কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভাল হ'য়ে—নতুন ধরণের পালা বাঁধ্‌বো—এরা সব গায় সে সব মান্ধাতা আমলের পদ—রাজুকে তাই কাল বল্‌ছিলাম—

সর্ব্বজয়া সলজ্জ হাসিয়া বলে—আজ ঘাটে সেজ জেঠিমা বল্‌ছিলেন তোমার কথা—

—কি বল্‌ছিলেন?

—তোমার নাম ক'রে বল্‌ছিলেন—দেখো কেমন—পরে থামিয়া গিয়া খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে হঠাৎ যেন লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মুখ নীচু করিয়া বলে—বল্‌ছিলেন কেমন ভিটে আলো করেচে...

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দ্দিষ্ট কোন আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মত হাল্‌কা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে!...

ঝাড় লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায় দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূরদূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙ্গিয়া লোকে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ী আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারী চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?—“কবির গুরু ঠাকুর হরু”—হরু ঠাকুরের?—না। নিশ্চিন্দি-পুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

দাশুরায়ের মত বড় পাঁচালী লেখক হইবে,—বাংলা-দেশে ফিরিয়া নিজে দল বাঁধিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, ঝাড়-লণ্ঠন টাঙানো আসরে,মুগ্ধ শ্রোতৃদলের সম্মুখে—কার গান? কবির গুরু ঠাকুর হরু—হরু ঠাকুরের! —না, নিশ্চিন্দিপুরের শ্রীহরিহর রায়ের। এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসিয়া তো বাইশ বৎসর পূর্ব্বে মনে মনে কত ভাঙা-গড়া করিয়াছে—তারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল - কবে ধীরে নূতন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াসার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল। হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে, জীবনের সে সব দিনকে আর একটিবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে! পল্টুর দাদা সম্প্রতি পল্টুদের দেশ মেদিনীপুর হইতে পূজার ছুটিতে কাশী বেড়াইতে আসিয়াছে—তাহার সঙ্গেও অপুর খুব পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সী সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সেই কেবল এখনও কোনো স্কুলে পড়ে নাই, নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকা বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে কিন্তু এখানে সমবয়সীদের সঙ্গে মিশিতে সে সুখ পায় না। এটুকু সে আজকাল বোঝে, কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে, দেশে থাকিতে যাহারা নবাবগঞ্জের স্কুলে পড়িত, তাহাদের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছে—কেহ কি পড়ে জিজ্ঞাসা করিলে বলে—মাইনর সেকেন্‌। অথচ সে জানেও না কাহাকে বলে মাইনর স্কুল বা সেখানে কি পড়ান হয়।

তাহা ছাড়া, দশাশ্বমেধ ঘাটে যে সব ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পল্টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব দেশ বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য বাড়ী আছে? পল্টুর দাদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—শিষ্য বাড়ী? কিসের ভাই?...

অপু সদুত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে বলিল—আমার বাবা কণ্ট্রাক্টারী করেন কিনা? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারী আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

এক একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাট বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণ-পাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণবালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা ও পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী ষষ্ঠী মন্দিরের পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহুগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে; ঠিক ঘটিবে। কথকতার শেষে পূরবী সুরের আশীর্ব্বচনটি তাহার ভারী ভাল লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ·· ···

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্য্যের রাঙা আভা ও পূরবীর উদাস মূর্চ্ছনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়ীতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ঐ যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং ?...

হরিহর খুসি হইয়া বলে—তুই বুঝি শুনিস্ খোকা ?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভরতের মা মারা যাওয়ার কথা বল্‌ছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে ব'সে—ষষ্ঠীর মন্দিরের ধাপে—

—তোর কি রকম লাগে—ভাল লাগে ?

—খু-উ-উ-উব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে না কি ?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পন্টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে, কাশীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়াছে, দেশেও খুব বড় বাড়ী, তাহার বাবা কণ্ট্রাক্টারী করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারীও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারী থাক্‌লে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে ?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোষাক পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষতঃ তাহার সুন্দর মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরের ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পর হরিহর কথা শেষ করিয়া ঘাটের রাণায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কথক ঠাকুর ঘাটের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখ্‌লেন তো কাণ্ড, পুন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভাল আছে, বামন-ভিক্ষা লাগাই—মাসে মাসে এই কাশীতেই বামন-ভিক্ষা হোলে পরে পনের সের আধমণ ক'রে চাল পড়্‌তো—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষাতেও লোকে ভেজে না—চালের তো একটা দানাও না—এদিকে সিকে পাঁচেক হবে, তার মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি—মশায়ের শিক্ষা কোথায় ?

—শিক্ষা তো ছিল এই কাশীতেই, অনেকদিন আগে। তবে এতদিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা ক'রে আছি...

—মশায়ের বাসা কি নিকটে ?...একটু চা খাওয়াতে পারেন ?...ক'দিন থেকে ভাব্‌চি একটু চা খাবো—এই দেখুন না চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুকিরের দোকানে একটু গরমজল করিগে...গলা ব'সে গিয়েচে, একটু লোন্-চা খেলে গলাটা...

—হাঁ হাঁ, আসুন না ? এই তো নিকটেই আমার বাসা...চলুন না ? কথককে লইয়া হরিহর বাড়ী আসিল।

চা খাওয়ার পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরি হইল। অপু কাঁসার গ্লাসে চা ও রেকাবিতে কিছু খাবার কথকের সাম্‌নে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথকঠাকুর ভারি খুসি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলে বুঝি! বাঃ বেশ ছেলে তো আপনার ? ভারী সুন্দর দেখ্‌তে—বাঃ—এস এস বাবা—থাক্ থাক্ কল্যাণ হোক্—লোন্-চা করিয়েচেন তো মশাই ? .দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসারই নেই তো ছেলেপিলে ?···দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচও মূলেও হাভাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ

থাক্‌তো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন!...এসব কি আর দেশ মশাই?...বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন—এমন শীতকাল যাচ্চে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই তুকুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাই-এর দেশটা কোথায়?...

—সাতক্ষীরের সন্নিকট,—বাদুড়ে-শীতলকাটি—জানেন? শীতলকাটির চক্কত্তিরা খুব ঘরাণী—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান্ দিয়া কথক-ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—খান্—

—কিছু না মশাই, ফাগুন মাসের দিকে দেশে তো যাই—একটা বাগান আছে দিয়ে আসি বিক্রি ক'রে—আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা?...তা জমি দশ বিঘে ছিল তাই বন্ধক দিয়ে পণ যোগাড় করলাম—বিয়েও করলাম,—মশাই, দশ বছর ঘরও করলাম—হোল কি জানেন?... সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাট্‌তে গিয়েচে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরি হ'য়ে—হাতে দিয়েচে কাম্‌ড়ে—আমি আবার নেই সেদিন বাড়ী—কেই বা বন্দি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা কি করেচে—পাটুলির ঘাট পার হচ্চি—গাঁয়ের মহেশ সাধুখাঁ ওপার থেকে আস্‌চে আমায় বল্লে—শিগ্‌গির বাড়ী যান্ মশায়—আপনার বাড়ী বড় বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই বৌ তো গিয়েচে ম'রে।—এই গেল ব্যাপার মশাই...জমি কে জমিও গেল—এদিকেও—সেই থেকে বলি যাই, দেশে থেকে আর কিই বা হবে—কোত্থেকে পাবো তিন চারশ টাকা যে আবার বিয়ে করবো?...যাই বিশ্বনাথের ওখানে...অন্ন কষ্টটা তো হবে না...আজ বছর আষ্টেক হ'য়ে গেল—এক খুড়্‌তুতো ভাই আছে- জমি জমা সামান্য যা একটু আছে, দখল ক'রে ব'সে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখ্‌খনো আমি যাবোনা—করগে যা দখল। উঠি মশাই,—আপনার এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল?...বেশ ছেলে, খাসা ছেলে—

পুরাণো চাম্‌ড়ায় তালি-দেওয়া কেম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথক ঠাকুর পায়ে দিয়া দরজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামন-ভিক্ষে—দেখি কি হয়—

১৭

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভাল নয়। নীচের তলায় স্যাঁতসেঁতে ঘর, তাও মাত্র তুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের মধ্যের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্ব্বজয়া কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ী পুরাণো হইলেও রৌদ্র হাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা, সব্বদা খট্ খট্ করিত শুক্‌না। এ বাসার স্যাঁতসেঁতের মেজে ও অন্ধকারে সর্ব্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটে ঘরে থাকে না, সূর্য্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠের, নদীর আলো হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে. একদণ্ডও সে এখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা ও ওকথার পর বলিল—কৈ আপনার ছেলেকে দেখ্‌চিনে?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকেই বোধ হয় বেরিয়েচে—

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে বাঁধা কি দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হ'য়ে গিয়েচে মশাই—সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেল্‌তে ভালবাসে, তাই এই তুটো বড় বড় সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধেয় কারা দিইছিল. ভাব্‌লাম ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্ত্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও

পড়্‌বো—ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে এটুখানি গিয়েই ভাল ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্কুল তবে ইংরাজি পড়াও হয়। রাজু গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে—সে প্রায় চার পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে—এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি কথকঠাকুর একটুক্‌রা বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুক্‌রা দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই প'ড়ে এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া দেখিল কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে কোনো লোক কথকঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুখ তারিখ। কথক ঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের দেশের কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্কত্তি ভারী পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বল্লেন—রামধন তোমার তো কিচ্ছু নেই, ভাব্‌চি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান কর্‌বো—তুমি নেবে কি? তা ভাব্‌লাম সদ্‌ব্রাহ্মণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কি? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি, কাশীতেই থাক্‌বো, দেশে ঘরে থাক্‌বো না, কি হবে জমি? তারপর চক্কত্তি মশায় গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই র'য়ে গেল। এতকাল পরে ভাব্‌চি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হোলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বল্‌তে কি, শ তিনেক টাকা হাতে করেচি—জলাহার ক'রে মশাই—আর শ দুই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাব্‌লাম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্কত্তি মশাইএর ছেলেরা মান্‌বে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা ব'সে ব'সে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সই টই সব—জন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বোল্‌বো এই ভাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন।—

উঠিবার সময় কথক ঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবারে মাঘীপূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো ওই টেঁওটার রাজার ঠাকুর বাড়ীতে, ঠিক মানমন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কিনা? একটু সগর্ব্বে বলিল—আমায় একখানা ক'রে নেমন্তন্ন পত্তর ছায়, বেশ ভাল খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘী পূর্ণিমার দিন শেষ রাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্ব্বজয়া অবাক্ হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে "জয় বিশ্বনাথজীকি জয়", "বোলো বাম্, বোলো বাম্" বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের শীতকে উপেক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্ব্বজয়াও স্নান করিতে গেল—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির, পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠীর মন্দিরের লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথক ঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্ব্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথক ঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দিয়া হিসাব লেখা। নমুনা:—

সিন্নার সোলের রাণীর বাড়ী ভাগবত পাঠ ... ৪৲
মুসম্মত কুম্ভার ঠাকুর বাড়ী ... ঐ ... ... ২৲
ধারক লালজী দোবের একদিনের খোরাকী ... ।০

বিশেষ কিছু আসবাব পত্র নাই। একখানা সরু চৌকা পাতা, একটা ছোট টিনের তরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আল্‌না, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথক ঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার ?

কি জানি কেন এই কথক ঠাকুরের কাছে তাহার কোনো প্রকার লজ্জা কি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং" জানেন আপনি ?

"—কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং ?" খুব জানি, রোজ বলি তো একদিন শুনো না—

—এখন বলুন না একবারটি ?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভাল লাগে। কথকের গলা বড় মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথক ঠাকুর নানা খুচ্রা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল খেল্না, শিবলিঙ্গ, মালা, কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে. অপুকে দেখাইয়া বলিল—কাশীর জিনিস, সবাই বল্‌বে কি এনেচ দেখি! তাই নিয়ে যাবো—

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ীর দরজার সাম্‌নে আসিয়া কথক ঠাকুর দাঁড়াইল। নীচু দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইল বাড়ীটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথক ঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চায়পাই হইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দীতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না। কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরী করিতে লাগিল যে অপুর মনে হইল হয়তো ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহাই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানে একস্থানে আধ অন্ধকারে খানকতক শালপাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল। একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ী কি না জানি খাওয়ায় ? অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেষ্টার আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল। মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদগন্ধহীন বেগুনের ঘণ্ট—শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড্ডুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথক ঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—পেট ভ'রে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু না ? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোনো বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে না পারে। এই লাড্ডু খাইবার অধীর ভঙ্গিতে কথকঠাকুর অপুর বালক-মনে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিল। আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আসার অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক হইলেও বুঝিয়াছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথক ঠাকুর অতি অভাজন। ভাবিল কথক ঠাকুর কখনো কিছু খেতে পায় না, আহা, এই লাড্ডু তাই অমন ক'রে খাচ্ছে—ওকে একদিন মাকে ব'লে বাসাতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবো—

করুণা ভালবাসায় সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনী বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙ্গাল কথক ঠাকুর তাহার দিদি ও গুল্‌কীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল শুদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গীতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথক ঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের ষ্টেশনে কথক ঠাকুরের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল—এই ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান বয়সের

চেয়েও অন্ততঃ আট বৎসর বেশী বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ী ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্ব্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল,— কি হয়েচে এমন ক'রে ব'সে পড়্‌লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবা ফুলের মত লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্ব্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর ঘোর, আচ্ছন্ন ভাবে বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্ব্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—অপু আস্‌চে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয় গোধুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সাম্‌নে ছাদে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দ বাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে ব'সিয়া অপু বই পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল—আরে রেখে দাও, তোমার ব'সে ব'সে যত ঐ সব বই পড়া, কোথাকার জিনিষ কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে।

নন্দ বাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভাল জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন একটু শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল বেশ ভুরভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল হইতে লাল মত কি একটা ঔষধ খায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারী বকিয়াছিল। নন্দবাবুদের ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে—আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক বিছানায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে—ও আমাদের নীচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোঝে সোজে না।

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া নন্দবাবুকে বলিল, সাতপুরুষের শালাপতি ভাই—কত রঙ্গই জানো মাইরি—

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে, তোমার মাকে ব'লে পান নিয়ে এস দিকি? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া ওপরে প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন টলেন নাকি—না?...অপু বাড়ী আসিয়া

মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক মা—তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে—

—আমার কথা? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করে?

—বল্‌ছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস্ করি টরি—বেশ লোক—

—করুক সে—তুই পাজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্ টাস্ কেন? ওপরে বিকেলে ব'সে ব'সে কি করিস্?

একদিন দুপুরবেলা অপু ছাদে উঁকি মারিয়া দেখিল নন্দবাবু ঘরে আছে। সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটকের তখনও দু অধ্যায় বাকি—সকাল হইতে দশবার ছাদে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে—কিন্তু সকালে নন্দবাবু বাসায় ছিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া ভয়ে ভয়ে সে ঘরের দুয়ারেই আসিতেই নন্দবাবু বলিল, এস এস অপূর্ব্ব—বোসো তোমার বাবা কোথায়?...

—বাবা বাসায় নেই—আপনি সকালে বুঝি আজ ছিলেন না?

—না, আমি একটু বরাত ছিল—ষ্টেশনে মালের পার্শ্বেল করতে গেছলাম—বসো, এই বিছানেতেই বসো না!...এসো। অপু বইখানার জন্য উস্‌খুস করিতেছিল। পরে সাহসে ভর করিয়া সে গিয়া বইখানা আলমারি হইতে আনিল। নন্দবাবু লেপ গায়ে দিয়া শুইয়াছিল—সে বিছানার ধারে বসিয়া পড়িতেছিল। নন্দবাবু তাহাকে বলিল, শুয়ে শুয়ে পড় না? ব'সে কেন? এস এই লেপ গায়ে দিয়ে শোও দিকি? বড্ড শীত—

শুইবার ইচ্ছা অপুর ছিল না, শুইলে পড়া ভাল হয় না। তবুও নন্দবাবুকে খুসি করিবার জন্য সে একপাশে ধারের দিকে শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। খানিকটা পরে নন্দবাবু তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া বলিল—লেপের মধ্যে ভাল ক'রে এস না অপূর্ব্ব? বেশ মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে—যে শীত...

পরক্ষণেই নন্দবাবু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে নিজের দিকে টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল—লেপটা গায় দাও না? এস না স'রে...

হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—কোথা হইতে তাহার ক্ষীণ, মেয়েলি গড়নের হাত পায়ে বল যোগাইল সেই জানে—তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিয়া আতঙ্কে ব্যাকুল, দিশেহারা অবস্থায় হাত পা ছুঁড়িয়া নন্দবাবুর দৃঢ় বেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া ছিটকাইয়া খাট হইতে লাফাইয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। তার মুখ পাকা দাড়িমের মত রাঙা হইয়া রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। নন্দবাবু বলিল—বারে, ওরকম ক'রে পালিয়ে গেলে যে? ভারী ছটফটে ছেলে তো?

কেন সে পলাইয়া গেল তাহা সে নিজেই জানে না। মনের মধ্যে সেই অজ্ঞাত ভয়টাতে তাহার বুক এত জোরে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে যে বাহির হইতে যেন শব্দ শোনা যাইবে। দিশেহারা ভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মনে মনে ভাবিল—আচ্ছা দুষ্টু তো? কেন ওরকম? অথচ নন্দবাবু কেন দুষ্ট, কি সে করিয়াছে, একথাও কিন্তু তাহার কাছে পরিস্ফুট হইল না। সেই হইতে দিন কতক সে উপরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু 'রেলে খুন' বইটার গোয়েন্দা নবীনচন্দ্র এখনও পলাতকা আমিনা বিবির সন্ধান পায় নাই, আসল জায়গাটাই বাকি, কাজেই সম্প্রতি আবার উপরে যাইতে সুরু করিয়াছে।

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—খোকা এস একটু বসো বাবা—

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প করিতে লাগিল। হাসিমুখে নীচু সুরে বলিল—এই দুমাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, স্কুলের সবাই খুব ভালবাসে, রোজ রোজ ফাষ্ট বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা ছাপিয়ে কাগজ বার করবে একমাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো বাবা বেরুলে—

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। তাহার নিজের বাল্যের সেই সব দিন আবার ছেলের জীবনেও দেখা দিয়াছে! পরে অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজ খানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা দুটাকা কোরে

চাঁদা দেবে? শুধু তাদেরই লেখা ছাপ্‌বে বলেছে—দু'টাকা দেবে বাবা?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে সুরু করে। ছেলে যে লেখে, সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প, সুন্দর বানানো, হরিহর খুসি হইয়া বালিসে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে—তুই লিখিচিস্ খোকা?

—আমি তো আরো কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প রাজকন্যের—বাড়ী থাক্‌তে রাণুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্ব্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া, এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে—দাও গিয়ে, আহা, খোকার লেখাটা ছাপিয়ে আসুক—সেরে উঠে পথ্যি করলেই ঠাকুর বাড়ির ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে, হ'লো না বাবা ছাপাখানাওয়ালা লোকেরা বেশী দাম চেয়েচে, তাই আজ বলে ব'লে দিয়েচে চার টাকা ক'রে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ্ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে—দ্যাখ্ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল? বালিসের তলা হইতে চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চির কলমের বাণ্ডিল আছে, ওইটে খোল্ তো?...কোণে দ্যাখ্ তো ক টাকা আছে? তাহার পর হরিহর সন্তর্পণে বাক্সখোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতাভরা চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ!...ওর সুন্দর, শুভ্র চাঁদের মত ললাটটি ওর মায়ের ললাট ওর ডাগর ডাগর নীলাভ চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্ব্বজয়ার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল, নবীন মুখে। অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে। অপু যেন প্রথম বসন্তের নব কিশলয়, তার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখদুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শাল তরুশ্রেণীর উল্লাস মর্ম্মর, কূলহারা সমুদ্রের দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে—চারটে টাকা আছে বাবা—হরিহর সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানেনা, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস্, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিস্‌নে?

অপু খুসির সুরে বলে—ছাপা বেরুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্ব্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বল্‌গে যা তো—একবার এসে দেখে যান্—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব্ব, তোমার মাকে বলো। বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে—ব্রঙ্কো নিমনিয়া—বড্ড নার্সিং চাই,—নীচের ঘরে কি এম্‌নি ক'রে থাকে!...খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এস আমার ডাক্তারখানায়, ওষুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের ওদের ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী হইতে ঔষধ আনিল। বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্ততঃ এক সের করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল না খাইতে দিলে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশ, বিভুঁই জায়গা।

একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্ব্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্ব্বজয়া আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। ওপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তার রান্নার উপর উঁকি ঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর পর্য্যন্ত নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্ত্তা বলে। প্রথমটা সর্ব্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময় এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বৌ-ঠাকরুণ—সাজুন দিকি একবার—তাহাতেও সর্ব্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বৌ ঠাকরুণ!···হাত হইতে সর্ব্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাটীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না—ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সে সময়টিতেই কিনা নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে!···ছলছুতায় একথা ওকথায় আধঘণ্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে—কোনো ভয় নেই বৌঠাকরুণ—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছতে গেলে······একটু চূণ দাও তো!···বোঁটা নেই?···আহা—আঙুলের মাথাতে ক'রেই একটু দাও না অম্‌নি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এদিকে ওদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলে—খোকা কৈ!···খোকা কৈ!···সর্ব্বজয়া বলে—আস্‌চে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বস্‌বে?···বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ী এলে বলে—বস্‌তে পারিস্‌নে একটু কাছে!···খোকা খোকা ক'রে পাগল—খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বসগে যা; গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হ'য়ে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবেন কিনা?

অপু লজ্জিত হইয়া বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিকটা বসিয়াই মনে হয়—ওঃ! কতক্ষণ ব'সে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই! কন্‌কনে ঠাণ্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কিছু নজর আসে না। তাহার মন ছটফট করে—একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। জলের রাণা, নির্ম্মল মুক্ত হাওয়া, সুবেশ নরনারীর ভিড়। পন্টু···সুধীর···গুলু···পটল—পন্টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ূরপঙ্খীটার আজ আবার বাচ্ বেলা চারটার সময়। উস্‌খুস্ করিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্ব্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল—হ্যাঁরে ওই সাদা বাড়ীটায় পাশে কোন ছত্তর জানিস্?

—উঁহু—

—তুই ছত্তরে যাস্ নি একদিনও এখেনে এসে? কাশীতে এলে ছত্তরে যেতে হয়—কিন্তু জানিস্‌নে বুঝি! খেয়ে আসিস্! না আজ?···দেখেই আসিস্ না?

—কাশীতে এলে ছত্তরে যেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অম্‌নি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস্—বুঝ্‌লি!

বেলা বারোটার সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ী ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—লুকাইতে গেলে সন্দেহ জানানো হয় ভাবিয়া

...জস্বরে বলিবার চেষ্টা করিল—খেয়ে এলি? কেমন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল ভিজা খাইতেছে।

—ভালো নাঃ—কুমড়োর একটা ছাই ঘণ্ট—ব'সে ব'সে হয়রাণ—বড্ড ময়লা কাপড় পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্চি নে, পুণ্যিতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্চ মা? তোমার বের্ত্তো নাকি? রান্না হয় নি?···

—আজতো আমার কুলুই চণ্ডী—এই দুটো অড়লের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড্ড ভালবাসি··· খাবি দুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অড়লের ডাল ভিজে খেয়ে ছাখ্ দিকি? বেশ লাগ্‌বে এখন—এবেলা রাঁধ্‌লাম না, ভারী তো খাস্, এত কটা ভাতে বসিস্ বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পার্‌বি? ছেলেকে প্রতারণা করিতে সর্ব্বজয়ার বুকে শেল বেঁধে। নির্ব্বোধ ছেলে তাই তাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়, যদি সে বুদ্ধিমান হইত?

দুপুরে নন্দবাবু এক তাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্ব্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে, নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বজয়া যে ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্ব্বজয়ার ঝিমানি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবুকে দেখিয়া সে জড়সড় হইয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। নন্দবাবু বলিল—পান সাজা হয়েচে বৌ ঠাক্‌রুণ? সর্ব্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকাবিতে করিয়া সাম্‌নের দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চূণ বড্ড কম হয় বৌঠাক্‌রুণ তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি—

সর্ব্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাটীতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্ব্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চূণ লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে যাইতেছে—একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। একটা বিদ্যুৎতের মত কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্র স্বরে বলিল—চ'লে যান এখ্‌খুনি ওপরে—কখ্‌খনো আর নীচে আস্‌বেন না—নীচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আস্‌বেন না—

সর্ব্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে,—তাও বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্ব্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নীচে নামে—এক আধ বার সর্ব্বজয়াকে ওপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্ব্বজয়া না পারে হিন্দী বলিতে, না পারে ভাল বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। অদ্য তার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া রুদ্ধ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সুরযকুঁয়ারী, স্বামী স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী, স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও বেশ সুশ্রী, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁট সাঁট দীর্ঘ গড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল—কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদ্‌মায়েসীর ভাব দেখেন আমায় বলিবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িব।

ঠিক দুপুর। কয় রাত্রি জাগিবার পর সর্ব্বজয়া মেজেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নন্দবাবু ওপরের জানালা দিয়া বাঁকা ভাবে একফালি রৌদ্র আসিয়া সরু

উঠানটাতে পড়িয়াছে। অপু মাটির মাল্‌সাতে গাঁদা ফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্ত ভাবে ফুটিয়া আছে,—তলায় একটা বিড়াল ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়াছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভাল আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধ হয় জীবনের আশা হইল। ভাল থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁস্ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। অপু সরিয়া যাইতে হরিহর রোগশীর্ণ, ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক্ হইল, বাবার চোখের ওরকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কি শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানা সুরে যেন কি একটা শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ঝুল-মাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতা মেজে, হাড় ভাঙ্গা শীত, কাঠ কয়লার আগুনের ধোঁয়া—সবটা মিলিয়া যেন একটা কঠিন দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যে বাঁচা যায়!

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

—অপু—ও অপু ওঠ্, শীগ্‌গির গিয়ে ওপর থেকে হিন্দুস্থানী বৌকে ডেকে আন্‌তো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সুরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ বর্ষার ধারামুখর কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলা স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়া লীলার মত চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্ব্বজয়াকে কি এক কুয়াসায় ঘিরিয়া ফেলিল। তার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াসা হয় বেলা হইলে, রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রংএর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ও ভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস্ কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙ্গালীটোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌছিল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সৎকার অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিম বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্তদিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে:—

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী......

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা, জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্ব্বচন গান করিতেছে:—

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী......
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ.........

সৎকার অন্তে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। সূর্য্য-কুমারী অনেকক্ষণ ছিল, নারী হইয়া সে বুঝিয়াছিল এ সময়ে সর্ব্বজয়াকে মিথ্যা প্রবোধবাক্য বলিয়া লাভ নাই। সে চুপ করিয়া কাছে বসিয়াছিল মাত্র, সন্ধ্যার কিছু আগে বিশেষ কাজে উঠিয়া গেল। সর্ব্বজয়া এতক্ষণ নির্জ্জীব অবস্থায় মেজের উপর পড়িয়াছিল, অপূ সৎকারান্তে বাসায় ফিরিয়া আসিতেই সে আলু থালু বেশ অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া বসিল।

মেজেতে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সদ্যোবিধবা সর্ব্বজয়া ও শুভ্র উত্তরীয় পরিহিত অপূ মুখোমুখি বসিয়া আছে। যতই লোকে নির্ব্বোধ বলুক, এটুকু বুঝিতে অপূর দেরী হয় নাই যে বাবার মৃত্যুতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অবলম্বনহীন হইয়া পড়িল। রাত্রিজাগরণক্লিষ্টা, শোকাকুলা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে মনে মনে ভাবিল—মা ভারী কষ্ট পেয়েচে, মার সাম্‌নে কাঁদা হবে না—সে ভরসা দিবার সুরে বলিল—ভয় কি মা, তুমি আমার পৈতেটা দিয়ে দাও না, আমি ঠাকুর পুজো করবো এবার থেকে—বাবা সেই যেখানে—কোন্ ঠাকুর বাড়ীতে মা?…তাতেই তো অনেক চাল পাওয়া যায় রোজ রোজ—তাতেই—

সর্ব্বজয়া ছেলেকে কথাটা শেষ করিতে দিল না। নির্ব্বোধ অপূ—সংসারের যে কিছুই জানে না, তাহার মুখে এ ধরণের কথা মোটেই মানায় না। সে ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—তোর কিছু কত্তে হবে না—তুই যেমন ইস্কুলে যাচ্চিস্ তেম্‌নি যাবি—। অন্য কিছু ভরসা দিবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—আমি ওই খোট্টা বউকে সব ঠিক ক'রে নেবো, তোর ভাবনা কি?…

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতার ভিক্ষা

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

পুত্র কহিল, "কি দিবে আমারে?"
তারে লইলাম কোলে,
বন্ধু কহিল, "কি দিবে আমারে?"
জড়ায়ে ধরিনু গলে।

ভ্রাতা আসি কহে, "কি দিবে আমারে?"
বাহুবন্ধনে বাঁধিলাম তারে;
জননী কহিল, "কি দিবে পুত্র?"
লুটানু চরণ তলে॥
"আমারে কি দিবে?" কহিল প্রেয়সী,
চুমিনু তাহার সুধামুখশশী;
"আমারে কি দিবে?" কহিল দেবতা
ভাসি নয়নের জলে॥

খাসিয়া পাহাড়ে নরবলি

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

আসামের সুদূর সীমান্তবাসী নরমুণ্ড-সংগ্রাহক নাগা জাতির কথা অনেকেই জানেন। আজকাল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে এবং মিশনারীদের চেষ্টায় তাহাদের মধ্যে নরবলি দিবার প্রথা এক রকম লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আসামের রাজধানী শিলং সহরের অনতিদূরে খাসিয়াদের মধ্যে দেবতার পূজার জন্য নরবলি সংঘটিত হইতে পারে ইহা বোধ হয় কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। এবার শিলং সহরের নিকটে এরূপ একটি ঘটনা সত্য সত্যই ঘটিয়াছে,—তাহা যেমন ভীষণ, তেমনি বিস্ময়কর। এই নরহত্যার মোকদ্দমা প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার ফলে সমস্ত সভ্য সমাজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

ঘটনাটি এইরূপ। গত ১৯শে মে তারিখে শিলংএর নিকটবর্ত্তী স্মিট গ্রামের একটি লোক হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। অনেক চেষ্টাতেও তাহার কোনও খোঁজ না পাওয়া যাওয়ায় তাহার স্ত্রী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশও খোঁজ করিয়া এই ব্যাপারের কোনও কিনারা করিতে পারিল না। এদিকে লোকটি অদৃশ্য হইবার প্রায় এক মাস পরে পুলিশ খবর পাইল যে লোকটিকে তাহার গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি নিবিড় পাইন বনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। লোকটির দেহ একটি পাইন গাছের সঙ্গে ঝুলিতেছিল। তদন্তের ফলে প্রকাশ পাইল যে, লোকটিকে খাসিয়াদের সর্পদেবতা 'থেলেনের' পূজার জন্য হত্যা করা হইয়াছে। তখন এই ব্যাপারটিকে সি, আই, ডি পুলিশের হ'তে অর্পণ করা হয়। সি, আই, ডি পুলিশের চেষ্টায় অপরাধীরা ধরা পড়িল। তাহাদের বিচারকালে খাসিয়াদের মধ্যে নরবলিপ্রচার এমন এক ভীষণ কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহা বর্ত্তমান যুগে বিশ্বাস করা কঠিন।

খাসিয়াদের প্রাচীন কাহিনীতে আছে যে খাসিয়াদের দেবতা মওলঙ্গ সীমের কামাখারাই নামে একটি কন্যা ছিল। এই মেয়ের সঙ্গে কোনও এক উপদেবতার অবৈধ প্রণয় হয়। ফলে কামাখারাই গর্ভবতী হয়। সে তখন পিতার ক্রোধের ভয়ে পলাইয়া চেরাপুঞ্জীর নিকটবর্ত্তী পথডলই নামক একটি গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে একটি ভীষণ সর্প তাহার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম রাখা হয় থেলেন।

থেলেন বড় হইয়া ভীষণ নররক্তপিপাসু হইয়া উঠিল। প্রত্যহ মানুষের রক্ত না হইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাহার মা কামাখারাই প্রত্যহ পথ হইতে পথিকদিগকে নানা ছলে ভুলাইয়া আনিয়া সন্তানের আহারের আয়োজন করিত। কালক্রমে থেলেন বড় হইয়া নিজেই নিজের আহারের জন্য নরহত্যা করিতে লাগিল। ফলে খাসিয়া জাতির মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কি উপায়ে এই ভীষণ শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা স্থির করিবার জন্য সমস্ত খাসিয়াদের এক সভার অধিবেশন হইল। এই সভা সুইডনো নামক এক ব্যক্তির হস্তে থেলেনকে ধ্বংস করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার ভার অর্পণ করিল।

সুইডনো দেবতাদের পূজা দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থেলেন যে গুহায় বাস করিত তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সেখানে সে গুহার ছাদে একটি ছিদ্র করিয়া এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া থেলেনকে খুব মোটা মোটা শূকর হত্যা করিয়া দিতে লাগিল। গুহার অন্ধকারে থেলেন এগুলি মানুষ না শূকর তাহা বুঝিতে না পারিয়া মানুষ ভবিয়াই খাইতে লাগিল। আহারের সময় উপস্থিত হইলেই সুইডনো আসিয়া তাহাকে বাহির হইতে ডাক দিত। ডাক শুনিয়াই থেলেন আহারের জন্য ছাদের নিকট যেখানে ছিদ্র করা হইয়াছিল তাহার নীচে হাঁ করিত। সুইডনো সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া তাহার আহার্য্য গলাইয়া দিত। এইরূপে ক্রমে থেলেনের বিশ্বাস জন্মাইয়া, সুইডনো

একদিন একটি লোহার দণ্ড আগুনের মধ্যে রাখিয়া লাল করিয়া থেলেনের মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। থেলেন ছটফট করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

এখন থেলেনের এই বিরাট মৃত দেহের কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য খাসিয়াদের এক সভা বসিল। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে থেলেনের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইয়া প্রত্যেক খাসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিবে। তদনুসারে থেলেনের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল। প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ অংশের মাংস লইয়া গিয়া খাইয়া ফেলিল।

একটি বৃদ্ধা খাসিয়া স্ত্রীলোকের ছেলে বাড়ী না থাকায় সে তাহার অংশের মাংস একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। ছেলে বাড়ী ফিরিলে, স্ত্রীলোকটি ছেলেকে মাংস দিবার জন্য পাত্রের মুখ খুলিয়া দেখিল যে পাত্রের মধ্যে মাংস নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাহার মধ্যে ছোট একটি সাপ কিলবিল করিতেছে। তাহারা সাপটাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে সাপটি তাহাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিল যে, সে থেলেন, আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তাহারা যদি উহাকে না মারিয়া গোপনে বাঁচাইয়া রাখে তবে সে তাহাদিগকে অনেক ধনরত্ন দিবে। স্ত্রীলোকটি ধনরত্নের লোভ সামলাইতে না পারিয়া সাপটিকে না মারিয়া পুষিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সাপটি আবার বড় হইয়া উঠিল। বড় হইয়া সে নররক্ত পান করিবার জন্য সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার ভয়ে এই পরিবারের লোকেরা আবার তাহার জন্য মানুষ হত্যা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল।

খাসিয়াদের বিশ্বাস, সমস্ত খাসিয়া পাহাড়ে কয়েকটি পরিবারে এখনও এই থেলেনের পূজা করা হয়; এবং থেলেনকে নররক্ত দিয়া পূজা করিতে পারিলে থেলেনের কৃপায় প্রচুর অর্থলাভ হয়। বৎসরের মধ্যে কোনও কোনও সময় থেলেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠে। তখন থেলেনের উপাসকেরা তাহার জন্য নররক্ত সংগ্রহের জন্য বহির্গত হয়। অন্ধকার রাত্রে এক প্রকার বিশেষ মদ্য পান করিয়া তাহারা শিকারের সন্ধান করিতে থাকে। শুধু খাসিয়ার রক্তেই থেলেনের তৃপ্তি হয়, বাঙ্গালী, ইংরাজ বা অন্য কোনও জাতির রক্তে হয় না। সেজন্য শুধু খাসিয়া হত্যা করাই থেলেন উপাসকদের লক্ষ্য থাকে। রাস্তায় কোন সঙ্গীহীন খাসিয়া পথিক পাইলেই থেলেন-উপাসক তাহাকে নিজের হস্তস্থিত কাঠের গদা অথবা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দিয়া আঘাত করে। থেলেন পূজার জন্য, লোককে লৌহনির্ম্মিত কোনও অস্ত্র দিয়া হত্যা করা নিষেধ। সেজন্য সমস্ত থেলেন-হত্যাই গদার আঘাতে গলা টিপিয়া অথবা পাথরের আঘাতে সম্পন্ন করা হয়। যাহা হউক, আক্রান্ত লোক পড়িয়া যাইতেই থেলেন-উপাসক, তাহার নাকের মধ্যে একজোড়া রৌপ্য-নির্ম্মিত ছুরি চালাইয়া দিয়া তাহা কাটিয়া ফেলে। নাকের মধ্য হইতে যে রক্তধারা বাহির হয় তাহা একটি বাঁশের চোঙ্গায় ধরিয়া এবং রৌপ্যনির্ম্মিত একটি কাঁচি দিয়া হত ব্যক্তির চুল ও আঙ্গুলের ডগা কাটিয়া লইয়া হত্যাকারী সেস্থান ত্যাগ করে।

এইরূপে নররক্ত আহৃত হইলে থেলেনের পূজার আয়োজন করা হয়। থেলেন সাধারণতঃ একটি সূতার আকারে একটি কৌটার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পরিবারের বড় একটি ঘরের মধ্যে মূল্যবান বস্ত্রাদি পাতিয়া তথায় কৌটার মুখটি খুলিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে আহৃত নররক্ত রাখা হয়। খাসিয়াদের বিশ্বাস, থেলেনের আকৃতি তখন ক্রমেই বড় হইতে থাকে। ক্রমে সূত্রাকার সাপটি একটি বিশালদেহ সর্পে রূপান্তরিত হয়। এদিকে যে থালার উপর আহৃত নররক্ত রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানে মৃতব্যক্তির আত্মা দেহ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। থেলেন তখন এই দেহটিকে গ্রাস করে। তারপর তাহার দেহ একটু একটু করিয়া ছোট হইতে থাকে। ক্রমে তাহার দেহ আবার সূত্রাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন সে আপনার আবাস-স্থান ক্ষুদ্র কৌটাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং থেলেন-উপাসকেরা আসিয়া তাহা কোনও গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখে।

খাসিয়াদের বিশ্বাস, প্রত্যেক বৎসরই থেলেনের পূজার জন্য দুই চারিটি নরবলি হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হত্যার সংবাদ পুলিশের নিকট পৌঁছে না। কারণ যে কয়েকটি পরিবারে থেলেন-পূজা হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সমস্ত খাসিয়া জাতি তাহাদিগকে অতিশয় ভয় করে;

তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশে কোনও প্রকার সংবাদ দেওয়া তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

এ সম্বন্ধে শিলংএর ডেপুটিকমিশনার মিঃ ম্যাকেঞ্জী তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন :—

"The Thlen superstition inspires such a feeling of terror in its believers that evidence was very difficult to collect and it was not until the accused were arrested that people could speak with any freedom." বিশেষতঃ খাসিয়া-পাহাড়ের মত গিরি-অরণ্য-সঙ্কুল প্রদেশে হতব্যক্তির দেহটি লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া ফেলা অসম্ভব নয়। ফলে আসামের গবর্ণরের আবাসস্থান শিলং সহরের অনতিদূরে, পুলিশের সতর্কদৃষ্টির অন্তরালেও দেবতাপূজা করিবার জন্য নরবলির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতেছে।

খাসিয়া জাতিকে আজ অসভ্য বলা চলে না। আসামের অধিকাংশ জেলা হইতে খাসিয়াদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। বর্ত্তমানে আসামের শিক্ষামন্ত্রীর পদে একজন খাসিয়া অধিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া বহু খাসিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তথাপি এই ভীষণ কুসংস্কারের ফলে একটা বিরাট আতঙ্ক জগদ্দল পাথরের মত সমস্ত খাসিয়া জাতির বুকে চাপিয়া আছে। ইহা হইতে খাসিয়াদের মধ্যে যে কত রোমাঞ্চকর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে Folk Tales of the Khasis নামক পুস্তকে Mrs. Rafy বলিয়াছেন :—

"To them (Thlen-worshippers) are attributed many kinds of atrocities, such as kidnapping of children, murders and attempted murders, and many are the tales of hair-breadth escapes from the clutches of these miscreants···Within quite recent times murders have been committed which are still shrouded in mystery....

এ সম্বন্ধে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গর্ডন তাঁহার 'The Khasis' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "This superstition is deep-rooted amongst these people, and even nowadays in places like Shillong and Cherapunji, Khasis are afraid to walk alone after dark." তিনি ঐ পুস্তকে এ সম্বন্ধে আর একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল এক সাহেবের একটি মুসলমান ভৃত্য একটি খাসিয়া রমণীর প্রেমে পড়িয়া তাহার সঙ্গে বাস করিতে থাকে। কিছুদিন পর সে জানিতে পারিল যে তাহার খাসিয়া স্ত্রীর মায়ের একটি পোষা 'ভূত' আছে। সে কৌতূহলী হইয়া অনেকবার তাহার স্ত্রীকে ঐ ভূতটি দেখাইতে বলে। কিন্তু তাহার স্ত্রী সম্মত হয় নাই। অবশেষে একদিন তাহার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে বাড়ীর মধ্যে একটি গোপন স্থানে লইয়া যায়। সেখানে ছোট একটি কৌটা খুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরে। কৌটার মধ্যে ঘড়ির তৈয়ার স্প্রিং-এর মত ছোট একটি সাপ জড়াইয়া ছিল। তাহার স্ত্রী উহার উপর হাত দিতেই সাপটি ক্রমে আকারে বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সাপটি প্রকাণ্ড একটি গোখুরা সাপের মত আকার ধারণ করিয়া ফণা ধরিয়া উঠিল। মুসলমান ভৃত্যটি তখন ভয় পাওয়ায় তাহার স্ত্রী সাপটির উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। তখন সাপটি আবার ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া কৌটার মধ্যে প্রবেশ করিল। (The Khasis by Lieutenant Colonel Gurdon page 101.)

থেলেন-পূজার কয়েকটি বিশেষ সময় আছে। বর্ষাকালে অক্টোবর মাসে শীতের প্রারম্ভে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে থেলেন ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠে। এই সময়ই থেলেন-উপাসকেরা তাহার পূজার জন্য শিকার খুঁজিতে বহির্গত হয়। এই সময় কোনও খাসিয়াই, সে খৃষ্টানই হউক আর অখৃষ্টানই হউক, শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, হাজার সাহসী হইলেও রাত্রে কিছুতেই একাকী ঘরের বাহির হইবে না, এমন কি ইলেক্ট্রিক্ লাইট্-আলোকিত শিলং সহরেও না। বিশেষ কোনও দরকার হইলে দুই তিন জনে মিলিয়া বাহির হইবে। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনারীরা হাজার চেষ্টা করিয়াও এই কুসংস্কার দূর করিতে পারিতেছেন না।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

য়াঘাট—ভাগলপুর

শিল্পী—ডি, দত্ত

শেফালি

—উপন্যাস—

—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

৬

খোকা যখন হইল, তখন সব চেয়ে আনন্দ কাহার বেশী হইল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু যত্ন যদি ভালবাসার মাপকাঠি হয়, তাহ'লে শেফালির ভালবাসাই সকলের চেয়ে বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। খোকা কিছুদিনের মধ্যেই সে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইল; তাহাকে পাইলে সে আমার কাছেও আসিতে চাহিত না।

ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে একটি গুম্ফা আছে। কথিত আছে জরাসন্ধ রাজা এক শত নৃপতিকে বন্দী করিয়া এই গুম্ফা মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। গুম্ফার একটি মুখ ভাগলপুর গঙ্গার ধারে এবং অন্য মুখটি মুঙ্গেরে। গুম্ফাটি এখানকার একটা সুপ্রসিদ্ধ স্থান, বহুলোক তাহা দেখিতে যায়। শেফালি একদিন কথায় কথায় গুম্ফা দেখিবার কৌতূহল প্রকাশ করিল।

অমনি ঠাকুরপো লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজকেই তবে গুম্ফায় যাওয়া হোক্। রাঁচি থেকে ছোট কাকা আমাকে আবার যেতে লিখেছেন—আজ যদি না যান, তবে আমার আর যাওয়াই হয় না। চলুন আজ সেখানে গিয়ে বনভোজন করা যাক্। সে বেশ মজা হ'বে।"

শেফালি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বনভোজন করে বনমানুষে; ও আমার ভাল লাগে না!

"বটে, বনভোজন করে বনমানুষে!" বলিয়া ঠাকুরপো কি একটা উত্তর দিতে গিয়া দ্বিধাভরে থামিয়া গেল।

শেফালি সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, বনভোজন করে সহুরে মানুষে!"

ঠাকুরপো হাসিয়া বলিল, "সাহস ত দেখি এই পর্য্যন্ত—এক পা এগোলে দশ পা পিছিয়ে যান—তবু লড়্‌তে আসেন!"

আমি বলিলাম, "বনভোজন টোজন হাঙ্গামা—চল, এমনি বেড়িয়ে আসি।"

ঠাকুরপো আমার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "থাক্ থাক্, ও সব উৎপাতে কাজ নেই। এখন ত তিনটে বেজেছে—এক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা তৈরি হ'য়ে নিন। এক ঘণ্টা আপনাদের প্রসাধনকার্য্যের জন্য প্রচুর হবে আশা করি!"

"প্রসাধন আমরাই করি শুধু—তোমরা কর না, নয়? ও অঙ্গে আভরণ যদি সাজ্‌ত—বা আফিসে কলম পিশ্‌তে না বাধ্‌ত—তা হ'লে তোমরাই তা ছাড়্‌তে কি না! সাজে না—তাই সাজ না—ওরই মধ্যে যতটুকু পার তার কসুরই বা কম কর কি! কঙ্কণের জায়গায় ত রিষ্টওয়াচ উঠেছে হাতে—আর দুদিন বাদে বাজুবন্ধ, হার ইত্যাদিও উঠ্‌বে হয়ত।"

"আপনাদের পাদপদ্মে যে নূপুর মঞ্জীর ইত্যাদির জায়গায় জুতো মোজা উঠেছে সে খবর রাখেন কি? ইউরোপ ত নর-নারীর বিভেদ চুকিয়ে ব'সে আছে।—মেয়েরা স্কার্ট ছেড়ে ব্রীচেস্ ধরেছে। এত ছাঁদের এত ফাঁদের কবরী গত! ঢেউটা এখানে তেমন জোরে এসে লাগে নি তাই এখনও এখানকার বিনোদিনীরা বিননিয়া বেণী বাঁধ্‌ছেন! আমরা যদি আপনাদের বলয় বাজুবন্ধ থেকে নাগাদ চন্দ্রহার পর্‌তে সুরু করি তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে আপনাদের বাঁধনগুলিতে আমরাও বাঁধা পড়্‌লাম—তাহ'লে ত আমাদেরই জয় জয়কার!"

"ভগবান রক্ষা করুন আপনাদের এমন দুর্গতি থেকে! মেয়েলি ছাঁদের পুরুষ দেখ্‌লে গা জ্বালা করে!"

শেফালি আমাদের কথায় যোগদান না করিয়া বলিল, "খোকাকে নিয়ে যাবে না দিদি?"

"চারটের সময় রোদ তত থাক্‌বে না—ওখানে পৌছ্‌তেও ত কিছু সময় লাগ্‌বে। চল ওকে নিয়ে।"

খুসি হইয়া শেফালি খোকার পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক করিতে গেল।

শেফালির সব তা'তেই বাড়াবাড়ি! কি যে সে চায়—কোন্‌খানে যে তাহার আসনটি বিছাইবার উদ্দেশ্য—তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। স্বামীর উপর ভাগ বসাইবে বলিয়া যত ভয় করিলাম—নিজের জল্পনা ভিন্ন তাহার প্রমাণ ত কোথাও পাইলাম না! সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হয়—শেফালিকে আমি ভুলিয়াও সে দিকে এক পা বাড়াইতে দেখি নাই। কিন্তু খোকার বেলায় ত কোনো বিধি বিধান, আইন কানুন, শাসন সংযম নাই—তাহাকে সে এমন করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে তাহার কি আমার অন্যের পক্ষে তাহা বোঝা ভার হইত। খোকাকে বুকে করিয়া সে মাঝে মাঝে এমন আত্মহারা হইয়া থাকিত যে, দেখিয়া আমার সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিত, মনে হইত খোকাকে তাহার বুক হইতে তখনই ছিনাইয়া আনি! সবার বাড়া ধন তাহার খোকা, তাহাকে পাইলে তাহার আর কোনও জ্ঞান থাকে না, পরের ছেলেকে এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া কেহ ভালবাসে কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের মনকে হাজার বার প্রশ্ন করিতাম,—সংশয় কিছুতেই ঘুচিত না!

যাওয়ার জন্য যখন প্রায় প্রস্তুত হইয়াছি, তখন উনি আসিলেন। সাজসজ্জা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

বলিলাম, "গুম্ফা দেখ্‌তে। তুমিও চল না!"

"কে কে যাচ্ছ শুনি।"

"আমি, শেফালি, খোকা, আর ঠাকুরপো।"

"আমাকে আর কেন তবে! হিরণই ত যাচ্ছে!"

"কেন, হিরণ গেলে তোমার আর যেতে নেই?"

"যেতে নেই নয়, ও গেলে আমার আর যাওয়ার দরকার নেই।"

"দারোয়ান হিসাবে ত তোমাকে যেতে বল্‌ছি না!"

"কোন্ হিসাবে বল্‌ছ সেইটে শুনি!"

"দারোয়ানের প্রভু হিসাবে।"

মনে মনে কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা চল, যাব।"

মনে পড়িয়া গেল, পোড়ারমুখী শেফালির কথা—বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "তোমায় যেতে বল্‌ছিলাম—এদিকে আসল কথা ভুলে গেছি,—সবাই গেলে বাসায় থাক্‌ছে কে?"

"তাও ত বটে! তোমরা যাও বেড়িয়ে এস, আমি বাসায় থাক্‌ছি।"

অন্যান্যবার কোথাও গেলে চাপরাশী বাড়ী পাহারা দেয়, এবার সেকথা আমি ভুলিয়া গেলাম।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে ঠাকুরপো বলিল, "চল্লেন ত আপনারা—কিন্তু—"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আবার কি এর ভিতর?"

"ভূতের ভয় আছে সেখানে।"

শেফালি আমার দিকে চাহিয়া হাসিল, প্রকৃত পক্ষে ঐ ভয়টা আমার কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছিল।

ঠাকুরপোর কাছে আমি তাহা ব্যক্ত না করিয়া বলিলাম, "দিনের বেলা ভূতের ভয় কি?"

"কিন্তু গোল হচ্ছে এই যে সে মোটেই দিনের রাজ্য নয় 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি—'একমেবাগ্নি শুধু সেখানে আলো করেন—বুঝলেন? সুতরাং লণ্ঠন জন পিছু একটা ক'রে সঙ্গে নেওয়া দরকার।"

শেফালি বলিল, "দুটো ত নিয়েছি"।

"আরো একটা নিন। জরাসন্ধ রাজা রাজমেধ করবেন ব'লে বিজিত একশ' জন রাজাকে ওখানে কয়েদ ক'রে রেখেছিলেন। যদিও কৃষ্ণার্জ্জুন এসে তাদের উদ্ধার সাধন কোরেছিলেন—তবু দু চার জনের হয়ত বন্দী অবস্থায়ই ওখানে মৃত্যু হ'য়েছিল। এক আধটা কুঠরিতে হয়ত দেখা যাবে—শেকলে বাঁধা এক হাড়-খসা কঙ্কাল ঝুল্‌ছে।"

"ঝুল্‌ছে ত ঝুল্‌ছে—ব'য়ে গেছে তার জন্যে!" বলিয়া আমি উপরের জানালার দিকে চাহিলাম।

শেফালি তখনো গাড়ীতে ওঠে নাই, খোকাকে বুকে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—উনি আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় একটু অপ্রস্তুত ভাবে কহিলেন, "শুন্‌লে ত হিরণের কথা? রক্ষাকবচ টবচ থাক্‌লে এই বেলা সঙ্গে নাও।"

"তোমাকে কেউ ফোড়ন দিতে ডাকেনি—যাও!" বলিয়া আমি সরিয়া বসিলাম। শেফালি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

এ কী রকম চুরি! শেফালি যেদিকে থাকে ভুলিয়াও কখনও সেদিক্ মাড়ান্ না, বাড়ীর ভিতর আসেন মাথাটি নীচু করিয়া অথচ নিঃশব্দে অলক্ষিতে এমন করিয়া চাহিয়া থাকা কেন!

সন্দেহ সব চেয়ে প্রখর হয় তখন—যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট কোনও হেতু পাওয়া যায় না। দিনের বেলা যে সাপ পথের উপর পড়িয়া থাকে, তাহাকে বরঞ্চ এড়ানো যায়, কিন্তু রাত্রিতে অন্ধকারে যে সাপ গৃহ-বিবরে লুকাইয়া থাকে, তাহার দংশনভয় সব চেয়ে বেশী হইয়া ওঠে। বাড়ী হইতে যখন কেহ বেড়াইতে যায়—তখন উপরের জানালায় দাঁড়াইয়া দেখা একটা অসাধারণ কাজও নয় অবৈধ আচরণও নয়—এবং অপ্রতিভ ভাবটাও আমার সন্দেহের জন্য উদয় হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়—তবু আমার সমস্ত মন জ্বালা করিয়া উঠিল। আমার পাশে শেফালির বসিয়া থাকাটা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

খোকাটা তখন শেফালির কোলে শুইয়া হাস্য-বিকসিত আননে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া "তা ত্তা তা" ইত্যাদি বিচিত্র কলরব জুড়িয়াছে, আমার ইচ্ছা হইল ছেলেটাকে তিন চড় মারিয়া উঠাইয়া লই।

ঠাকুরপো আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বল্‌ব আমি, আপনি কি ভাব্‌ছেন?"

খুব একটা ঔদাসীন্য দেখাইয়া বলিলাম, "স্বচ্ছন্দে! গভর্ণমেণ্ট ত কারো কথার উপর ট্যাক্স বসান নি!"

"বল্লে ত আর আপনি স্বীকার কর্‌বেন না, সুতরাং এই পর্য্যন্ত থাক্।"

৭

বাড়ী ফিরিবার পথে আমাদের গাড়ীর অশ্ববরযুগলের মধ্যে একটি ভারবহনে অসমর্থতা প্রকাশপূর্ব্বক মাটিতে শুইয়া পড়িল। গাড়োয়ানের বেত সশব্দে তাহার পাঁজর-বাহির-করা পিঠের উপর ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহার রেজলিউসন কিছুতেই টলিল না। নিষ্ক্রিয় অসহযোগের এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্তে আমরা তাহাকে কিঞ্চিৎ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

আমি বলিলাম, "কত আর দূর হবে—চল, হেঁটেই যাওয়া যাক্।"

শেফালি শঙ্কিত ভাবে খোকার দিকে চাহিল।

রাগে আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল! এ কি রকম আদেখ্‌লেপানা! মা'র চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলে ডাইন! আমার ছেলে, আমি হেঁটে নিয়ে যেতে চাচ্ছি— ভয় ওঁর!

ঠাকুরপো বলিল, "কতটা আর রাস্তা—মাইলটেকেরও কম—চলুন হেঁটেই, দিব্যি জোৎস্না রাত আছে। খোকাটাকে বেশ ক'রে ঢাকাঢুকি দিয়ে নিন।"

শেফালি খোকাকে কাপড় চোপড় দিয়া এত ঢাকিয়া রাখিত যে, ঠাকুরপো তাহার নামকরণ করিয়াছিল পোঁট্‌লা। আমরা অবশ্য পুঁটু বলিতাম,—ঠাকুরপো তাহা শুনিতে পাইলে চোখ টান করিয়া বলিত, "বাব্বা, ছেলের কি আদর!" লজ্জা পাইয়া আমি আর কিছু বলিতাম না। শেফালি খোকার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লড়িত,—আমার অন্তরালে আদর করিয়া পোঁট্‌লা বলিয়াও ডাকিত। উনি ডাকিতেন, "বুড়ো কর্ত্তা" বলিয়া, শেফালি সে নাম কখনও মুখে আনিত না।

ঠাকুরপো চলিতে চলিতে শেফালিকে বলিল, "পোঁট্‌লাটাকে আমার কাছে দিন, এখনও অনেকটা পথ আছে।"

শেফালি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিল, "থাক্, আমার কাছে—আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।"

আমি তিক্ত স্বরে বলিলাম, "দাও না খোকাকে ঠাকুরপোর কাছে—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আমি লজ্জিত হইলাম, কিন্তু তখন সে নিক্ষিপ্ত তীর ত আর ফিরাইবার উপায় নাই। শেফালি অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে খোকাকে ঠাকুরপোর কোলে উঠাইয়া দিল।

পথ-সংক্ষেপের জন্য আমরা রাস্তা ছাড়িয়া নবজলধারা-নিষিক্ত কোমল তৃণদলমণ্ডিত মাঠের উপর দিয়া যাইতে-ছিলাম। চারিদিকে নিশ্চল নীরবতা, মাঠের এখানে সেখানে এক একটা নিঃসঙ্গ গাছ বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টি মেলিয়া জ্যোৎস্নায় মগ্ন হইয়া আছে, মুকুলিত পল্লবাগ্রে চন্দ্রকলার

অনির্ণেয় দীপ্তি, নীচে—সকল জানা শোনার মাঝে একটুখানি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মত অন্ধকার ছায়া।

আমরা নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া চলিতেছিলাম, ঠাকুরপো নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমার যে যেতে হবে—সেই দুঃখটা এখন মনে পড়্‌ছে।"

আমি ক্ষোভসহকারে বলিলাম, "বাস্তবিক, তুমি চ'লে গেলে ভাল লাগ্‌বে না ঠাকুরপো!"

"সত্যি বল্‌ছেন?"

"এ-ও কি আদালতের সাক্ষী দেওয়া যে, হলপ্‌ ক'রে বল্‌তে হবে!"

"খোস্‌ খবরের ঝুটোও ভাল। মনে করবেন তা হ'লে মাঝে মাঝে?" ফিরিয়া—শেফালির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ত বাঁচবেন আমি চ'লে গেলে?"

শেফালি হাসিমুখে বলিল, "এখন তা হ'লে কি ম'রে আছি বল্‌তে চান?"

"এক রকম তাই ত,—আমার জন্যে আপনার খাট্‌তে ত কম হয় না, দিব্যি আরামে থাক্‌বেন তখন!"

আমি হাসিয়া শেফালিকে বলিলাম, "আসলে ওঁর শোনার ইচ্ছা যে, উনি চ'লে গেলে "নন্দকুলচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" যেমন হ'য়েছিল—তেমনিতর একটা কিছু মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবে কি না!"

"সত্যি ইচ্ছে হচ্ছে শুন্‌তে—আমি চ'লে গেলে আপনাদের কার দিন কি রকম ফাঁকা লাগ্‌বে,—কার ক ফোঁটা চোখের জল খরচ হবে—দিনে রাতে কবার কে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বেন?"

আমি বলিলাম, "ভোরের বেলা কনকবরণ চাঁপার দলে যে শিশির বিন্দু ঝল্‌মল্‌ করে—আমি তোমাকে তারই দু-চার ফোঁটা উপহার দোবো।"

"কি সুন্দর! কি সুন্দর! পদ্মপাতার মত আমি তাকে বুকের উপর মুক্তো ক'রে রেখে দেব!" শেফালির দিকে চাহিয়া বলিল, "আর, আপনার কাছ থেকে কি পাব?"

আকাশের প্রান্ত-লগ্ন শুভ্র মেঘপুঞ্জের দিকে চাহিয়া শেফালি কহিল, "থেকে থেকে পাহাড়ের মাথায় যে জল-ভরা মেঘ নেমে আসে—অথচ জল বর্ষণ কর্‌তে পারে না—কাজলের মত দিগন্তের নয়ন-তটে লেগে থাকে—আমি তাকে আপনার গমন-পথ জলোৎসেকে স্নিগ্ধ করতে পাঠিয়ে দেব।"

আমার এত কবিত্ব ভাল লাগিল না, বলিলাম, "শেফালি বুঝি পাতাকে পাতা বই মুখস্থ ক'রে রাখ!"

ঠাকুরপো কিন্তু মহা খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল, "স্প্লেন্‌ডিড্‌! আমি তাকে মেঘদূতের এক পৃষ্ঠায় এঁকে রেখে দেব!"

বলিলাম, "দেখো, উৎসাহের চোটে পাত্র ভুল ক'রে বোসো না যেন। নেহাৎ বেওয়ারিশ মাল যদি ভেবে থাক—"

আমরা তখন বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, শেফালি তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখেছো দিদি, সুকুয়াটা কি কুঁড়ে! একদিন আমরা বাড়ীতে নেই,—তা কাপড়-গুলো তুল্‌তে পারে নি!"

"হতভাগাটা আবার মাইনে বাড়িয়ে দিতে বল্‌ছিল।"—বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম।

শেফালি হাঁটে আস্তে, ঠাকুরপো কাজে কাজেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিতেছিল, আমি তাহাদের আগে বাড়ী পৌঁছিলাম। বৈঠকখানায় উঁকি দিলাম, দেখিলাম তিনি সেখানে নাই, সরাসর উপরে গেলাম। শয়ন-কক্ষেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, বিস্মিত হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে শেফালির ঘরের দিকে নজর পড়িল। সন্দেহবশতঃই হোক্‌, অথবা কৌতূহলবশতঃই হোক্‌, সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়া উঁকি দিলাম; দেখিলাম উনি শেফালির বালিশটা বুকে আঁকড়িয়া তাহার বিছানায় শুইয়া আছেন। জানালা দিয়া জ্যোৎস্না পিঠ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।

আমি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সর্ব্বদেহের রক্ত মাথায় উঠিয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

ঠাকুরপো ও শেফালি তখন বাড়ীতে পৌঁছিয়াছে—নীচে তাহাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চমকিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ফিরিয়া শেফালির কেশের

সৌরভময় অচেতন উপাধানটির উপর মুখ নত করিলেন।

ঘরে আলো ছিল না, জানালা দিয়া চাঁদের আলো খাটের মাথায় আসিয়া পড়িয়াছিল। আলো-ছায়ার ভিতরে অসমগ্র ভাবে দৃষ্ট এই জাগ্রত বিভীষিকার দিকে আমার চক্ষু নির্নিমেষ হইয়া আবদ্ধ রহিল।

মুহূর্ত্তের ভিতর তিনি দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন—এত ত্রস্ত, এত ভীত, যে, আমি যে দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া আছি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, শরীর কেমন অবশ বোধ হইতে লাগিল,—মনে হইল যেখানে দাঁড়াইয়া আছি—শুইয়া পড়ি!

নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াইতেই মনে হইল সেখানে উনি আছেন। ইচ্ছা করিল—বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও পলাইয়া যাই। কিন্তু পলাইব কোথায়!—

মাঝের ঘরে আসিয়া কপাটে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইলাম,—কোথায় যাই কি করি, আমার দুই চক্ষু ভরিয়া তপ্ত অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

হঠাৎ ঠাকুরপো পিছন হইতে ঝাঁকি দিয়া বলিল, "এ কি হচ্ছে, ব্যাপার কি?"

লণ্ঠন উঁচু করিয়া ঠাকুরপো আমার অশ্রু-প্লাবিত মুখের সম্মুখে ধরিল। আমি মুখ লুকাইলাম।

ঠাকুরপো আমাকে টানিয়া তাহার ঘরে লইয়া গিয়া চৌকির উপর বসাইয়া বলিল, "কি হয়েছে বলুন দেখি!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "শেফালি কোথায়?"

"খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুরপো অভিমানের সুরে বলিল, "বল্‌বেন না? মনে থাক্‌বে কিন্তু একথা চিরদিন!"

রোদনাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলাম, "আমার মনে যা সন্দেহ হয়েছে ঠাকুরপো,—তা মিথ্যে নয়!"

ঠাকুরপো চিন্তিত ভাবে কহিল, "মিথ্যে নয়? হবে হয়ত! কে কার জন্যে গ্যারেন্টি দিতে পারে! কিন্তু বাড়ীতে ঢুকেই হঠাৎ কি হোল?"

কোনোরূপে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

শুনিয়া ঠাকুরপোর অধর-প্রান্তে হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "খবর ভাল নয়। তবে—একেবারে মারাত্মকও ত নয়! এর জন্যে এত কান্না? ছিঃ!"

রাগ করিয়া বলিলাম, "বল্‌বেই ত, পুরুষ হ'য়ে কত আর বুঝ্‌বে! তার ওপর নিজের ভাই—টান ত পুরো ঐ দিকে! আমি ত পরের মেয়ে!"

কিন্তু কথাটা ঠাকুরপোর কানে পৌঁছিল না। তাহার মুখ হইতে হাসির রেখা অন্তর্হিত হইয়াছে, সে তখন নিজের মনে চিন্তামগ্ন।

খানিক পরে সে সচেতন হইয়া বলিল, "কে যে এই শেফালি—কিছুই বোঝা গেল না। কোথায় সে ছিল, কেন বা সে এল! বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং যখন এনেছেন—তখন কে কি বল্‌তেই বা যাবে এ সম্বন্ধে! উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনিই না হয় খোলাখুলি দাদাকে বলুন—"

উদ্বেলিত স্বরে আমি বলিলাম, "কখনো না।"

"কেন না!"

ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, তাহাকে কি বলিব,—চুপ করিয়া রহিলাম।

এমন সময় শেফালি আসিল। আমার দিকে চাহিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, "কি হয়েছে দিদি?"

আরেক দিকে মুখ ফিরাইয়া আমি বলিলাম, "কিছু হয় নি।"

কিছু যে হইয়াছে—তাহা ত অপ্রত্যক্ষ ছিল না—শেফালি কুণ্ঠিত ভাবে চলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে বাড়ীর ছাদ যদি শেফালির মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িত তাহা হইলে আমি বোধ হয় দুঃখিত না হইয়া আহ্লাদিতই হইতাম।

উনি আসিবার আগে বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। এমনটি কখনও হয় না, না আসা পর্য্যন্ত আমি প্রায়ই বসিয়া বই পড়িতাম। সুতরাং আমাকে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া—আমার মাথা ধরিয়া নাড়িয়া বলিলেন, "এই, কি হয়েছে?"

অন্যের স্মৃতি-লিপ্ত তাঁহার স্পর্শ আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, সরিয়া গিয়া কহিলাম, "আমার শরীর ভাল নেই।"

"জ্বর হয়েছে ?" বলিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, আমি হাত সরাইয়া দিলাম।

বলিলেন, "এ কি ? অভিমান ? বিনা মেঘে বজ্রপাত কেন ?"

আমি উত্তর দিলাম না।

চিন্তিত ভাবে মাথার কাছে বসিয়া বলিলেন, "কথাটা কি খুলেই বল না ! কি অপরাধ হয়েছে আমার ?"

বলিলাম, "ঘুমোও এখন, মিছেমিছি বক্‌বক্ কোরো না।"

আদর করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া নিয়া বলিলেন, "অকারণে রাগ কোরো না, তাতে তুমিও সুখী হ'বে না আমিও হ'ব না।"

এইমাত্র যাহাকে দেখিয়াছি গোপনে নির্জ্জনে সকল চক্ষুর অন্তরালে অনুপস্থিতার উদ্দেশ্যে সোহাগ নিবেদন করিতে—তাহার শূন্য শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া স্মৃতি-সুখে নিমগ্ন হইতে—তাহার কেশের সৌরভ মাখা অচেতন উপাধানটিকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জগৎ সংসার বিস্মৃত হইতে—তাহার এই অকুণ্ঠিত প্রেমাদর !

উঃ, পুরুষ কি কপট ! অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদস্তূপের আকস্মিক বিদারণের মত বিমুখ বিদ্বেষের এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ-বহ্নি গর্জ্জিত শব্দে আমার বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। উনি আমার মাথায় বাতাস দিতেছিলেন, কিন্তু সে বাতাস আমার সর্ব্বাঙ্গে গরলের মত জ্বালা বিস্তার করিতে লাগিল--চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া অভিশাপ দিয়া কঠিন শানের উপর আপনাকে আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবার মত অকস্মাৎ একটা ক্ষিপ্ত উত্তেজনা আমাকে প্ররোচিত করিতে লাগিল। আমি দুই হাতে বালিশ আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পিঠের উপর হাত বুলাইয়া তিনি কহিলেন, "এমন করছ কেন সুর ?"

বলিলাম, "বাতিটা নিভিয়ে দাও, চোখে বিঁধছে।"

৮

ঠাকুরপো বলিল, "আপনাকে একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি—এ রকম করবেন না।"

বলিলাম, "উপদেশ দেওয়াটা চিরদিনই সহজ কাজ, ওতে টাকাও খরচ করতে হয় না, কষ্টও স্বীকার করতে হয় না, বরঞ্চ নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের সুযোগ ঘটে।"

ঠাকুরপো মুখ ভারি করিয়া কহিল, "আপনার ভাল'র জন্যেই বল্‌ছিলাম। আপনি যদি অনর্থক কাঁদাকাটি করেন—দাদার সঙ্গে কথা না বলেন—ছোট বৌঠানের সঙ্গে আন্‌চান্ করেন—তাহ'লে আরো সব গোল পাকিয়ে ফেল্‌বেন। আপনার জায়গা থেকে আপনি কখনও নড়্‌বেন না। আপনি যদি নিজে জায়গা ছেড়ে না দেন, জোর ক'রে আপনার জায়গা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না--এটি ধ্রুব জান্‌বেন।"

আমি হাসিলাম। পুরুষ মানুষ শুধু বোঝে--চাকরী, ব্যবসা কল-কারখানা। প্রাণের কারবারে আসল বিকিকিনি লাভ ক্ষতি যেখানে—সেখানে এরা এক কড়ার হিসাবও যদি বোঝে ! মুখে বলিলাম, "তোমার উপদেশ শিকেয় তোলা রইল ঠাকুরপো—যদি কখনও—"

ঠাকুরপো রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খাওয়ার সময় বাতাস করিতে করিতে আমি বলিলাম, "ঠাকুরপো রাঁচি যাচ্ছে,—আজ্ঞা যদি দাও, তবে আমিও একবার এই সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।"

উনি ভাত ভাঙ্গিয়া মাছের ঝোল ঢালিতে যাইতেছিলেন, আমার কথায় হাতের বাটি হাতে রহিয়া গেল, অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাখাটা জোরে চালাইতে চালাইতে বলিলাম, "রাঁচি যাব ঠাকুরপোর সঙ্গে—এ ত কিছু দুর্ব্বোধ্য কথা নয়।"

মুখ নামাইয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "না গেলে যদি তোমার দুঃখ হয় তবে যাও। হঠাৎ এ বাতিক চাপল কেন ?"

"বেড়ানর ইচ্ছে কি বাতিক ?"

"এদিকে কি হবে ?"

মুখের উপর চোখ রাখিয়া কহিলাম, "এদিকে ত শেফালিই আছে !"

"শেফালি থাক্‌ছে—তুমি যাচ্ছ—এ কি রকম বন্দোবস্ত? তুমি যদি যাও, তবে তাকেও তোমার সঙ্গে নিতে হচ্ছে। একলা সে এখানে কি ক'রে থাকবে? হঠাৎ এরকম বেড়াবার জন্যে ব্যস্ততা কেন? পূজোর সময় আমিই ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারব।"

"তখন আবার বাড়ী আগ্‌লাবে কে?"

"তখন আমি আর তুমি যাব—আর সব এখানে থাক্‌বে।"

সন্দেহের সহিত বলিলাম, "মন রাখা যা হয় একটা কথা ব'লে দিলে আর কি!"

"মন রাখা কথা! তোমার বুদ্ধিটি আজকাল উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণ হচ্ছে—কিসে শাণ দিচ্ছ?" বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

খাওয়া তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, আমি তাড়াতাড়ি "দুধ নিয়ে আস্‌ছি" বলিয়া রান্না ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

কেঁচো খুঁড়িতে যদি সাপ বাহির হয়—তবে ব্যাপারটা কাহারও প্রীতিপ্রদ হয় না, কিন্তু সাপ খুঁজিতে গিয়া যদি কেঁচো বাহির হয় তাহা হইলে মনটা খুসি হইয়া উঠে অনেকেরই। আমি ভাবিয়াছিলাম, ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার চলিয়া যাওয়ার কথায় উনি বোধ হয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন, কিন্তু উনি না হইলেন আমাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি, না হইলেন শেফালির সঙ্গে একলা বাড়ীতে থাকিতে স্বীকৃত।

হয়ত ঠাকুরপোর কথাই ঠিক, বসিয়া বসিয়া আমি মিথ্যা কল্পনার জাল বুনিতেছি—নিজে জড়াইয়া মরিবার জন্য! আমার সন্দেহের কালিতে হয়ত সবই কালি-মাখা দেখিতেছি।

সত্য কথা বলিতে কি, ঠাকুরপোর সঙ্গে যে রাঁচি যাইব তাহা আমি ভাবিয়া ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া বলি নাই। বলিয়াছিলাম কথাটা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়—তাঁহাকে পরখ করিয়া দেখিবার জন্য। যদি এক কথায় নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া 'তথাস্তু' বলিতেন, তাহা হইলে এখনি মাথা কুটিয়া কান্না শুরু করিতাম। আপাততঃ তাহা নিবারিত হওয়াতে মনটা অনেক খানি হাল্‌কা হইয়া গেল।

শেফালি স্নান করিয়া রাঁধিতে যাইত, আজ তাহার স্নান হয় নাই। সব কাজ সারিয়া স্নান করিতে অনেক বেলা হইবে—ভাবিলাম, আমি গিয়া দুধটা জ্বালে চড়াইয়া তাহাকে স্নান করিতে পাঠাই। অন্যের সম্বন্ধে মানুষ উদার হইতে পারে তখন, যখন তাহার নিজের সুখ ভরপুর থাকে। দান করা চলে মুঠায় না আঁটিলে—নিজে উপবাসী থাকিয়া সম্মুখে উপস্থিত অন্ন কে অন্যকে বিলাইয়া দিতে পারে?

শেফালি রান্নাঘরে বা তাহার নিজের ঘরে নাই দেখিয়া আমি তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে উপরে গেলাম। পুলিশ রাজনৈতিক আসামীর উপর যে রকম প্রখর দৃষ্টি রাখে—শেফালির উপর আমি সেই রকম দৃষ্টি রাখিতাম—এক দণ্ড চোখের বাহিরে থাকিতে দিতাম না। বুঝিতাম কাজটা ভাল করিতেছি না—তবু না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। যে আমার জাগা ঘরে সিঁদ কাটিতেছে তাহাকে আমি ক্ষমাই বা করিব কি করিয়া, ভুলিবই বা কি প্রকারে!

শেফালির ঘরের পাশেই আমার স্বর্গগতা শ্বশ্রূমাতার কক্ষ। তাঁহার মৃত্যুর পর সে ঘর আর ব্যবহৃত হইত না, সন্ধ্যাবেলা শুধু আমি ধূপ দীপ দিয়া তাঁহার ও শ্বশুরের বৃহৎ তৈলচিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতাম। তাঁহাদের একদিকে আমার স্বামীর একখানা হাফ্‌টোন্ ফটো—ও আরেকদিকে কয়েকখানি দেব দেবীর চিত্র। ঘরের এক কোণে আমার শ্বশ্রূমাতার পূজার তাম্রতৈজস মলিন হইয়া রহিয়াছে, তাহার কাছে দড়িতে বাঁধা কুশাসনখানি দেয়ালের গায় পেরেকে ঝুলিতেছে!

কপাটের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, শেফালি স্নানান্তে গলায় আঁচল জড়াইয়া আমার শ্বশুর শাশুড়ীর তৈলচিত্রের নীচে উপুড় হইয়া প্রণাম করিতেছে।

আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। শেফালি উঠিয়া আমাকে দরজার কাছে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও লজ্জিতভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

নেপালের পথে

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ

মুখবন্ধ

নেপাল পরাধীন ভারতমাতার একমাত্র স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য—হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত একটি বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ। পূর্ব্ব পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ৪৫০ মাইল, বিস্তার উত্তর দক্ষিণে ১৫০ হইতে ১৬০ মাইল। নেপাল রাজ্যের আয়তন বা রাজ্যের উত্তর দিকেই অবস্থিত। এভারেষ্ট পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ, সমুদ্রবক্ষ হইতে ২,৯০০১ ফিট্ উচ্চ। কাটমুণ্ড সহর হইতেই এভারেষ্ট গৌরীশঙ্কর, গোঁসাইথান ও ধবলাগিরির শুভ্র তুষারশৃঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখা যায়।

হিজ্ ম্যাজেষ্টি নেপালের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ পঞ্চশ্রী ত্রিভুবন বিক্রম সাহ বাহাদুর জঙ্গ বাহাদুর সমসের জঙ্গ এবং তাঁহার দুই মহারাণী

নেপালের পূর্ব্ব সীমা সিকিম ও দারজিলিং; পশ্চিম সীমা কুমায়ুন জেলা ও কালী নদী; দক্ষিণ সীমা অযোধ্যা ও যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার প্রদেশের চম্পারণ (মতিহারী) মজঃফরপুর দ্বারভাঙ্গা এবং পূর্ণিয়া জেলা। নেপালের দক্ষিণে শ্বাপদসঙ্কুল অতি অস্বাস্থ্যকর প্রায় ২০ মাইল চওড়া তরাই নামে ভীষণ অরণ্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় বিরাজমান। এই অরণ্যের মধ্য দিয়াই নেপাল যাইবার পথ।

রকবা ৬০,০০০ ষাট হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ছাপান্ন লক্ষ। নেপাল রাজ্যের উত্তর সীমা তিব্বত এবং হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছাদিত শৈলমালা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এভারেষ্ট, গৌরীশঙ্কর গোঁসাইথান ধবলাগিরি, নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছাদিত উচ্চ শৃঙ্গসমূহ নেপাল

নেপালের বর্ত্তমান রাজবংশ— ইক্ষাকু-কুলোদ্ভব শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বংশোদ্ভব সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। আলাউদ্দিন খিলিজি যে সময় চিতোর আক্রমণ করেন সেই সময় চিতোর মহারাণার বংশসম্ভূত কয়েকজন রাজপুত্র এবং বহু ক্ষত্রিয় সৈন্য সামন্ত সহচর সহ হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে—বর্ত্তমান

কাটমুণ্ডু সহর হইতে চল্লিশ মাইল পশ্চিম গোরখা নামক স্থানে বাস করেন। এই গোরখা নগর হইতেই ইঁহাদের নাম হয় গোরখা বা গুর্খা। উদয়পুরের রাণাদের ন্যায় ইঁহারাও রাণা উপাধি ধারণ করেন। গোরখাগণ ক্রমে নেপালের সপ্ত গণ্ডকী প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ভারতে ইংরাজগণ ক্রমশঃ তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময় গোর্খাবংশোদ্ভব পৃথ্বীনারায়ণ ভাটগাঁও, পাটন, কাটমুণ্ডু প্রভৃতির নেবার-বংশীয় মল্লরাজগণকে ক্রমশঃ পরাস্ত করিয়া ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র নেপালের অধিপতি হইয়া কাষ্ঠমণ্ডপ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথ্বীনারায়ণ হইতে অষ্টম রাজা মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীত্রিভুবন বিক্রম সাহ বাহাদুর জঙ্গ বাহাদুর সমসেরজঙ্গ নেপালের বর্ত্তমান অধিপতি। নেপালের মহারাজাধিরাজ রাজকার্য্য পরিচালনা করেন না, দেবতার ন্যায় পূজিত হন, এবং সময়ে সময়ে দরবার করিয়া প্রজাগণকে দর্শন দেন। তাঁহার নামের পূর্ব্বে পাঁচটি শ্রী সংযোজিত আছে, এই জন্য তাঁহাকে নেপালে পাঁচ সরকার বলা হয়। নেপালের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা তিন সরকার বা তিন শ্রীযুক্ত প্রধান রাজমন্ত্রী লেপট্‌নেণ্ট জেনেরেল মহারাজা সার চন্দ্র সমসেরজঙ্গ বাহাদুর রাণা G. C. B, G. C. S I, G. C V. O, D. C. L. নেপালের রাজমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান কর্ম্মচারীগণ রাজবংশীয়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও চিতোর মহারাণার বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়-রাজশাসিত। নেপাল আদর্শ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য হিন্দুর গৌরবের ও গর্ব্বের দেশ। নেপালী সৈন্যের বীরত্ব জগৎবিখ্যাত। ইংরাজদের মতে গোরখারা ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। গত ইয়োরোপীয় মহাসমরের নেপালরাজ দুই লক্ষ গুর্খা সৈন্য ইংরাজরাজের সাহায্যার্থ ইউরোপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ফ্রান্সে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া ভারতের বীরত্বগৌরব বৃদ্ধি করেন। ইংরাজের ভারতীয় সৈন্যের অধিকাংশই নেপালী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নেপালের নিকট যথেষ্ট সৈন্য পাইয়া থাকেন, তজ্জন্য জার্ম্মান যুদ্ধের সময় হইতে নেপালরাজকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ১৮৫৪ সালে নেপালের সহিত তিব্বতের যুদ্ধ হইয়া যে সন্ধি হয় তাহার সর্ত্তানুসারে তিব্বত নেপালকে দশ হাজার টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন এবং লাসার প্রধান লামার দরবারে নেপালের একজন প্রতিনিধি (President) নিযুক্ত আছেন। নেপাল সৈন্য ব্রিটিশ প্রণালীতে যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত। নেপালের স্থায়ী সৈন্য পঞ্চাশ ষাট হাজার। ইহার মধ্যে অশ্বারোহী কামান প্রভৃতিও আছে। নেপালের প্রায় দুই লক্ষ লোক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। রাজার আবশ্যক হইলে দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। নেপালের শাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী মাত্রকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়।

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। হিন্দুমন্দিরে হিন্দুদেবতা ও বৌদ্ধচৈত্যে বুদ্ধদেব পাশাপাশি পূজিত হইতেছেন। উভয়কে লইয়া কোনও বিরোধ নাই। গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দিরে হিন্দু বৌদ্ধ উভয়েই পূজা করেন। বৌদ্ধতীর্থ—স্বয়ম্ভুনাথ—আদিবুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তীর্থ। স্বয়ম্ভু-পুরাণে লিখিত আছে, স্বয়ং শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব এই তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন (১)। এখনো মঙ্গোলিয়া, চীন, রুষিয়া, তুর্কিস্থানের বৌদ্ধতীর্থযাত্রী কত দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া আট দশ মাস পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এই মহাতীর্থ দর্শন করিতে আসেন।

নেপালে কখনও মুসলমান-আক্রমণ হয় নাই। সুতরাং বৌদ্ধচৈত্য ও হিন্দুমন্দিরাদির অবস্থা এবং আচারপদ্ধতি কতকটা প্রাচীন কালের মতই চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গের (Huen Thsang) ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে পনের শত বৎসর পূর্ব্বে—শ্রীহর্ষ দেবের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ও

(১) শাক্যসিংহের জন্মের পূর্ব্বে স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য বিদ্যমান ছিল। Having travelled through the greater part of North-western India he (Sakya Budhha) made a pilgrimage to Nepal accompanied by one thousand three hundred and fifty Bhikshus...... .During his stay Sakya paid his devotion at the shrine of Swayambhu a temple to the Eaternal Self-Existing spirit on the sacred hill still known as the hill of স্বয়ম্ভুনাথ। Oldfield's Nepal.

হিন্দুভারতে ও নেপালে ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক যেরূপ অবস্থা ছিল তাহার অবিকল চিত্র আজও নেপালে দেখা যায়। (২) সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের সভ্যতা, শিল্পনৈপুণ্য ও ধর্ম্মবিষয়ক এবং সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা যদি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হয় তবে নেপালে যাওয়া আবশ্যক।

নেপাল প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডার। এখানে যত নানা ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথি, চিত্র ও ধাতব শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তত আর কোথাও হয় নাই। প্রাকৃত ও প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন পুঁথি, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও পালি পুঁথি নেপালেই অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপাল মহারাজার পুস্তকালয়ে এখনও বহু দুর্লভ ও অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগৃহীত আছে। এখনও যে কত দুর্লভ রত্ন নেপালে খুঁজিলে পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতেই সংগৃহীত বৌদ্ধগান ও দোঁহা সংক্রান্ত পুঁথি ও অন্যান্য পুঁথি হইতে বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন রূপ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

নেপালের পিত্তলশিল্প, প্রস্তরভাস্কর্য্য, সুরঞ্জিত কাষ্ঠের কারুকার্য্য, মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপাদির নির্ম্মাণকৌশল জগতের শিল্পরসিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। নেপালের ধাতুনির্ম্মিত হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি অপূর্ব্ব ভাবাভিব্যক্তি ও কারুকার্য্য এবং দীপ ধূপাধার মন্দিরের চালি ও তৈজসাদির কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ইউরোপ আমেরিকা ও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতায় নেপালী প্রাচীন শিল্প দ্রব্যের কয়েকটি দোকান আছে। শীতকালে ইউরোপ ও আমেরিকার ভ্রমণকারীগণ তাহা হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দেশে লইয়া যান।

কিন্তু নেপালী শিল্পের ও মন্দিরাদির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে নেপালে যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পশুপতিনাথ চঙ্গুনারায়ণ কাষ্ঠমণ্ডপম ভাটগাঁও প্রভৃতির মন্দিরাবলীর অপূর্ব্ব শিল্পসৌন্দর্য্য এবং মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভোপরিশোভিত রাজাগণের পিত্তলনির্ম্মিত ভক্তিবিনম্র মূর্ত্তিগুলি এবং পিত্তলকারুকার্য্যযুক্ত মন্দিরদ্বারসমূহ স্বচক্ষে না দেখিলে নেপালী শিল্পের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ধারণা হইবে না। ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ইহা না দেখিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে। নেপালী শিল্পের প্রাচীন উৎপত্তি স্থল গৌড়মগধ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ নেপাল জয় করিয়া তথায় লিচ্ছবি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ইঁহাদের দ্বারাই ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা, শিল্প ও বিদ্যা নেপালে প্রচারিত হয়। ঐ সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই পূর্ব্বভারতের শিল্প, সভ্যতা, বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। নেপালরাজগণ গৌড়মগধ হইতে যে শিল্পী ও পণ্ডিতগণকে লইয়া যাইতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুসলমান কর্ত্তৃক নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইলে উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ আচার্য্য ও শিল্পীগণ প্রাচীন পুস্তকাদি সহ নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নালন্দায় লিখিত অনেক বৌদ্ধ পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে।

নেপাল হইতেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিব্বতের রাজা রংসানগম্পো নেপালরাজ অংশুবর্ম্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী চীন সম্রাটের কন্যা। এই রাণীদ্বয়ের চেষ্টাতেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাঁহারা তিব্বতে তারার অবতার বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। (৩) নেপাল হইতেই শিল্পীগণ তিব্বতে বৌদ্ধ মূর্ত্তি এবং মন্দিরাদি নির্ম্মাণ

(২) Nepal of fifteen hundred years ago bore in many respects a striking resemblance to the Nepal of the present day. Percy Brown—Picturesque Nepal.

(৩) The first king of Tibet (King Srongtsan Gompo) who was the maker of the Tibetan nation.... married a 'Nepalese princess about the year 630 A. D The young bride brought with her, her gods & priests She converted her husband and after her death she was given a place in the Tibetan Pantheon as an incarnation of the Goddess Tara.

History of Indian & Indonesian Art.

Ananda K. Coomarswamy. Page 146.

করিয়াছেন। তিব্বতে আবিষ্কৃত অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে নেবারি অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। যাহাকে তিব্বতী শিল্প বলে প্রকৃতপক্ষে তাহা মূলে নেপালী শিল্প বা নেপালী শিল্পের শাখা। (৪) শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌড়ীয় ভাস্করের মূর্ত্তির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে—গৌড়ের ভাস্কর গিয়া নেপালে নূতন শিল্পরীতি প্রবর্ত্তন এবং তিব্বতে গৌড়ীয় রীতির শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।" (৫) গৌড়মগধে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-শিল্প বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, কিন্তু নেপালে এখনও সুন্দর সুন্দর ধাতুমূর্ত্তি ও তৈজসাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

নেপালের মন্দির ও গৃহাদির নির্ম্মাণকৌশল অতি অপূর্ব্ব। সুরঞ্জিত কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরগুলির কারুকার্য্য এবং শিল্প-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না। নানারূপ কারুকার্য্য ও দেবমূর্ত্তিসমন্বিত রৌপ্য বা পিত্তল কপাটযুক্ত নেপালী প্রণালীতে নির্ম্মিত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি-খোদিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আকাশচুম্বী মন্দিরাবলীর শিল্পচাতুর্য্য ও শোভা দর্শককে মুগ্ধ করে। যখন কাটামুণ্ড ভাতগাঁও পশুপতিনাথের মন্দিরাদি এবং এই সকল বিচিত্র নগর প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল আমরা যেন স্বপ্নে কোন মধ্যযুগের নগরীতে আসিয়াছি এবং অতীত যুগের হিন্দুভারতের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছি।

নেপালের দৃশ্য

নেপাল অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভার ভাণ্ডার অনন্তরত্ন-প্রভব দেবর্ষিসিদ্ধচারণসেবিত দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। হিমালয়ের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পবিত্র তীর্থমালাবিভূষিত পার্ব্বত্য মহাদেশ পৃথিবীতে নাই। শাস্ত্র লিখিয়াছেন, "সর্ব্বত্র হিমবান পুণ্য।" মহাদেব বলিয়াছেন—"আমি সর্ব্বত্রই আছি, কিন্তু হিমালয়ে আমার বিশেষ প্রকাশ। হিমালয়তুল্য পবিত্র পর্ব্বত আর নাই, প্রভাত সূর্য্যের কিরণসম্পাতে যেমন শিশির অপগত হয় সেইরূপ হিমালয় দর্শনমাত্রেই পাপক্ষয় হইয়া যায়।" স্কন্দ পুরাণান্তর্গত হিমবৎ খণ্ডে স্কন্দ অগস্ত্য ঋষিকে বলিয়াছেন,

(৪) তিব্বতে প্রস্তুত নেপালী লিপিযুক্ত একটি চমৎকার মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্ত্তির চিত্র এবং বিবরণ Rupam পত্রিকায় ১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। The Lamaistic school was the result of a direct pupilage to the Nepalese tutors. Vide Rupam No 11. Page 73.

Lhasa to a great extent a Nepalese Colony & it was chiefly Newaris who built temples there, cast statues, painted images; their reputation spread all over central Asia. Vide page 145. History of Indian & Indonesian Art.

(৫) প্রবাসী মাঘ ১৩৩৪ ৫০৮ পৃষ্ঠা।

"হে ঘটোদ্ভব! হিমালয় সদৃশ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষদায়ক পবিত্র তপঃস্থান পৃথিবীর মধ্যে আর নাই।"

হিমবৎ সদৃশং পুণ্যং তপঃ স্থানং ঘটোদ্ভব।
নাস্তি নাস্তি ধরামধ্যে চতুর্বর্গফলপ্রদম্॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—হিমালয়ের সর্ব্বতীর্থ আমার অংশ এবং নদীসকল তোমার অংশ।

তীর্থানি চ মদঙ্গানি সর্ব্বানদ্যস্তুদংশকাঃ।

দেবর্ষিসিদ্ধচারণসেবিত আর্য্য সভ্যতার আদি বিকাশ-ক্ষেত্র হিমালয় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত।

খণ্ডা পঞ্চহিমালয়স্য কথিতা নেপালকূর্ম্মাচলৌ।
কেদারোথ জলংধরোথ রুচিরঃ কাশ্মীরসংজ্ঞোন্তিম॥

হিমালয়ের পঞ্চ খণ্ড

(১) নেপাল

(২) কূর্ম্মাচল বা কুমায়ুন জেলা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহ।

(৩) কেদার খণ্ড—গাড়োয়াল ও টিহ্‌রি জেলা—যথায় গঙ্গাযমুনার উৎপত্তি ক্ষেত্র, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী এবং কেদারনাথ বদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থরাজি বিরাজিত।

(৪) জালংধর—কাংগরা, কুলু, জ্বালামুখী ও জলংধর এবং পার্শ্ববর্ত্তী পাব্বত্য প্রদেশের প্রাচীন নাম জলংধর।

(৫) কাশ্মীর।

এই পঞ্চ প্রদেশেই অসংখ্য তীর্থরাজি এবং উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত নদীরই উৎপত্তিস্থল। প্রত্যেক প্রদেশের বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ ও তীর্থমাহাত্ম্যযুক্ত স্কন্দ পুরাণের এক একটি বৃহৎ খণ্ড আছে। কাশ্মীর খণ্ডে কাশ্মীরের, কেদারখণ্ডে কেদারবদরী গঙ্গোত্রীর এবং হিমবৎখণ্ডে নেপালের পশুপতিনাথ, গোঁসাইথান বুড়া নীলকণ্ঠ গণ্ডকী নদীর উৎপত্তিস্থান, মুক্তিক্ষেত্র, দামোদরকুণ্ড বরাহক্ষেত্র, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে আছে—

"নেপালদেশ—সাধকানাং সুসিদ্ধিদঃ।"

অর্থাৎ নেপালে তপস্যা করিলে সাধকগণ সহজেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। হিমবৎখণ্ডে বর্ণিত আছে মরীচি ঋষির পুত্র "নে" নামক ঋষির নাম হইতে "নেপাল" নামের উৎপত্তি। নে ঋষি বজ্রযোগিনী দেবীর নিকট দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেবী তাহাকে বর দিলেন, "তুমি পশুপতিনাথ অধিষ্ঠিত এই পবিত্র ক্ষেত্র পালন কর, তোমার নামানুসারে এই প্রদেশের নাম নেপাল হইবে।" নে ঋষির পালিত প্রদেশের নাম হইল নেপাল। (৬) সত্যযুগে নেপালের নাম ছিল সত্যপুরী, ত্রেতায় তপোবনী, দ্বাপরে মুক্তিকাপুরী এবং কলিতে নেপাল।

কৃতে সত্যপুরী জ্ঞেয়া ত্রেতায়াংচ তপোবনী।
দ্বাপরে মুক্তিকা নাম কলৌ নেপালিকা পুরী॥

হিমবৎ খণ্ড ১৭২ অধ্যায়।

পৌরাণিক মতে নেপালের সীমা পূর্ব্বদিকে কৌশিকী বা কুশীনদী, পশ্চিমে ত্রিশূলী বা ত্রিশূল গঙ্গা, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে গঙ্গা।

পূর্ব্বস্যাং কৌশিকীপুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
তথা ত্রিশূলগঙ্গাখ্যা প্রতীচ্যাং দিশি সংস্থিতা॥
উত্তরস্যাং দিশিতথা সীমা শিবপুরী মতা।
দক্ষিনস্যাং দিশি নদী পবিত্রা শীতলোদকা॥
এতৎমধ্যে মহাপুণ্যং নেপালক্ষেত্রমীরিতম্॥ নেপালমাহাত্ম্য।

* * *

উত্তরেণ তু গঙ্গায়াঃ দক্ষিণে চাশ্বিনীমুখাৎ।
ক্ষেত্রং হি মম তৎজ্ঞেয়ং যোজনানি চতুর্দ্দশ॥
বরাহপুরাণ ২১৫ অঃ।

---

(৬) নে নামা মুনিশ্রেষ্ঠ আসীৎ পুরা মহাতপাঃ।
মরীচে স্তনয়ো ধীমান সর্ব্বসত্ত্ব দয়াপরঃ।

* * *

দেবীর বর—

ত্বংচ লালয় হে বৎস ইদংস্থানং নিরন্তরং
বরং পশুপতেঃ ক্ষেত্রং ধর্ম্মেণ ধর্ম্ম রক্ষতু।
ততো লোকাবদিষ্যন্তি তেহভিধানেন সংজ্ঞতম্। হিমবৎখণ্ড।

* * *

নে নাম্না মুনিনা যস্মাৎ পালিতং পুণ্যকর্ম্মণা।
ক্ষেত্রং হিমবতঃ কুক্ষৌ ততোনেপাল সংজ্ঞকম্॥
নেপালমাহাত্ম্য ১১ অধ্যায়।

অসংখ্য পুণ্যতীর্থ এবং দেবগণের সান্নিধ্যে বিশেষতঃ জ্যোতির্লিঙ্গ ভগবান পশুপতিনাথের অধিষ্ঠানক্ষেত্রবশতঃ নেপাল মহাপুণ্য ক্ষেত্র এবং সকলের কামনাপূরক অপূর্ব্ব তপস্যাভূমি। পুরাণ বলিতেছেন—

> ধন্যং নৈপালিকং ক্ষেত্রং লোককামবরপ্রদং।
> রাজন্তে যত্র লিঙ্গানি কোটীনাং চ প্রমাণতঃ॥
> ক্ষেত্রং নেপালকং পুণ্যং তীর্থৈর্লিঙ্গৈস্তথামরৈঃ।
> পশুপতীশ্বরো যত্র জ্যোতির্লিঙ্গং বিরাজতে।
> সুরগণৈঃ সমং শশ্বৎ নেপালো বিশিষ্যতে॥
>
> হিমবৎখণ্ড ৮০ অধ্যায়।

পুরাণে বর্ণিত আছে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জ্ঞাতিবন্ধু-হত্যাজনিত পাপক্ষয়ার্থ পাণ্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন করিয়াও যখন চিত্তে শান্তি পাইলেন না তখন প্রত্যাদেশ হইল যে হিমবৎ-পৃষ্ঠে জ্যোতির্লিঙ্গ দেবাদিদেব কেদারনাথ দর্শন করিলে পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিহত্যাজনিত সমস্ত দুরিত ক্ষয় হইবে। বহুক্লেশে হিমালয় অতিক্রম করিয়া পাণ্ডবগণ কেদারক্ষেত্রে পৌঁছিয়া বহু অন্বেষণেও দেবাদিদেবের দর্শন পাইলেন না; দেখিলেন চারিদিক শুভ্র তুষারাচ্ছাদিত, দেবাদিদেব অদৃশ্য। ভক্ত পাণ্ডবগণ কাতর প্রাণে মহাদেবের স্তবস্তুতি করিলে মহাদেব কতিপয় মহিষের আকারে সহসা আবির্ভূত হইলেন। এই প্রাণীহীন হিমারণ্যে মহিষযূথের সমাগম দেখিয়া পাণ্ডবগণ তাহা আসুরীমায়া কি সত্য এইরূপ বিচার বিতর্ক করিতেছেন এমন সময় মহিষগুলি অদৃশ্য হইয়া একটি মহিষে পরিণত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেটিও অন্তর্ধানের উপক্রম করিলে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় মহাবল মধ্যমপাণ্ডব প্রাণপণে ধাবমান হইয়া ঐ মহিষমূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিলেন। ভীমস্পৃষ্ট ঐ পশ্চাদ্‌ভাগ প্রস্তরীভূত হইল। অবশিষ্ট ভাগ পাতালপ্রবিষ্ট হইয়া প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে নেপালে দৃষ্ট হইল। পাণ্ডবগণ দৈববাণীতে অবগত হইলেন যে ঐ অদ্ভুত মহিষমূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগ শ্রীকেদারনাথ, ও মস্তক—নেপালের জ্যোতির্লিঙ্গ পশুপতি-নাথ। (৭) পশুপতিনাথ কেদারেশ্বর লিঙ্গের শিরোভাগ। (৮) এই কারণে উভয়মূর্ত্তি দর্শন না করিলে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের পূর্ণফল হয় না। তাই সাধুসন্ন্যাসীগণের মধ্যে চিরাচরিত প্রথা আছে, তাঁহারা যে বৎসর কেদারনাথ দর্শন করেন তাহার পর বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে পশুপতিনাথদর্শনে গমন করেন। আমরা ১৩২০ সালে কঠিন কেদার ও বদরীবিশাল দর্শন করিয়াছিলাম, সেই সময়ই সাধুসন্ন্যাসীগণের নিকট উপরিলিখিত উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও এতদিন আমাদের পশুপতিনাথদর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। গত বৎসরের শিবরাত্রির সময় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপাল এবং পশুপতিনাথদর্শন ঘটিল।

নেপালের পথে

(১) ব্রিটিশরাজ্যে—রেলপথে

নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ড, পশুপতিনাথ, পাটন ভাটগাঁও প্রভৃতি নেপাল উপত্যকায় অবস্থিত। নেপাল উপত্যকার পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল এবং প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে ১৫ মাইল। ইহার আয়তন ২৫০ বর্গমাইল। সমুদ্রবক্ষ হইতে নেপাল উপত্যকার উচ্চতা ৪৫০০ ফুট হইতে ৪৭৫০ ফুট। কিন্তু ইহার চারিদিকে যে সকল পর্ব্বতমালা আছে তাহার উচ্চতা ৬০০০ ফুট হইতে ৯৭২০ ফুট। গিরিসঙ্কটের পথে (Pass) নেপাল উপত্যকায় প্রবেশ করিতে হয়। উক্ত গিরিসঙ্কট নেপালী সিপাহী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। তথায় ছাড়পত্র (Passport) দেখাইতে না পারিলে কেহই নেপালে প্রবেশাধিকার পান না। নেপালীকেও ছাড়পত্র দেখাইয়া নেপালের বাহিরে আসিতে হয়।

---

(৭) শিবোহি পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা মাহিষং রূপমাস্থিতঃ।
মায়ামাস্থায় তত্রৈব পলায়নপরোভবৎ॥
ধৃতশ্চ পাণ্ডবস্তত্র হ্যবাঙ্ মুখতয়াস্থিতঃ।
পুচ্ছং চৈব ধৃতং তৈস্তু প্রার্থিতশ্চ পুনঃ পুনঃ॥
তদরূপেণ স্থিতস্তত্র ভক্তবৎসলনামভাক্।
নয়পালে শিরোভাগো গতস্তদ্রূপতঃ স্থিতঃ॥

(৮) নয়পালাখ্য পুর্য্যাংতু প্রসিদ্ধায়াং মহীতলে।
লিঙ্গং পশুপতিশাখ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥
শিরোভাগস্বরূপেন শিবলিঙ্গতদস্তি হি।
দ্বিতীয় শিবপুরাণ কোটীরুদ্রসংহিতা।

রাজধানী কাটামুণ্ডুর চারিদিকে বারো মাইলের বাহিরে কোন ইংরাজ বা বিদেশী লোক যাইতে অনুমতি পান না। যখন লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন সেই সময় এভারেষ্ট আরোহণকারীগণকে নেপালের মধ্য দিয়া

প্রধান রাজমন্ত্রী শ্রীশ্রীশ্রীলেফ্‌টেনাণ্ট. জেনারেল মহারাজা স্যর চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা

যাইবার অনুমতি দিবার জন্য স্বয়ং বড়লাট সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াও অনুমতি পান নাই। সুতরাং এভারেষ্ট আরোহণকারীগণকে দারজিলিং হইয়া তিব্বতের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। (১) নেপালের উত্তরে হিমালয়ের গিরিসঙ্কট দিয়া তিব্বত যাইবার যে কয়টি পথ আছে তাহাও নেপালী সিপাহী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুতরাং কেহই উক্তপথেও পাশ ব্যতীত নেপালে আসিতে পারে না। তিব্বতের ব্যাবসায়ীগণ এবং বৌদ্ধতীর্থযাত্রী উক্তপথে নেপালে যাতায়াতের অনুমতি বা পাশ পাইয়া থাকেন। যদিও কোন ইংরাজ বা বিদেশী নেপাল উপত্যকার বাহিরে যাইবার অনুমতি পান না. হিন্দু তীর্থযাত্রীগণ রাজার নিকট প্রার্থনা করিলে মুচিনাথ, গোঁসাইথান প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে যাইবার অনুমতি এবং সাহায্য পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে নেপালী পুলিশও প্রেরিত হয়। প্রতি বৎসরই বহু ভারতীয় হিন্দু তীর্থযাত্রী ঐ সকল দুর্গম তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস নেপালে ভারতবাসীর পক্ষে শিবরাত্রির সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রবেশাধিকার নাই। একথা সত্য নহে। নেপালে বহু মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী বিহারী ও পাঞ্জাবী হিন্দু মুসলমান দোকানদার এবং কারিকর আছেন। ব্রহ্মোত্তরভোগী বহু মৈথিল এবং বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে নেপালে বাস করিতেছেন। এইরূপ একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মোত্তরভোগীর বংশধর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আজকাল বীরগঞ্জের ছোট হাকিম। অনেক বাঙ্গালী কলেজ স্কুলের

(১) এ সম্বন্ধে Younghusband সাহেব Epic of Mount Everest (Page 16) পুস্তকে লিখিয়াছেন "This permission was not forthcoming, so nothing came of Lord Curzon's proposal. The Nepalese are a very seclusive people, but as they have been for many years friendly to the British, the Government of India humour them in their desire to be left to themselves.

অধ্যাপক এবং ডাক্তার আছেন। শিবরাত্রির সময় সহস্র সহস্র ভারতবাসী পশুপতিনাথ দর্শনে গিয়া থাকেন। সে সময় হিন্দুযাত্রীর পক্ষে নেপাল অবারিতদ্বার হয়। নেপালের রাজকর্ম্মচারী রক্‌সোল ষ্টেশনেই শিবরাত্রির সময় পাশ বিতরণ করেন। তজ্জন্য কোনরূপ কর দিতে হয় না। এই পাশ শিবরাত্রির পর সাত আট দিন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে, আরও বেশী দিন থাকিতে হইলে কাটমুণ্ডর থানায় গিয়া পাশ বদলাইয়া লইতে হয়। অন্য সময় নেপালে যাইতে হইলে কাটমুণ্ডতে কোন পরিচিত ব্যক্তিকে পত্র লিখিয়া পাশ আনাইতে হয়, অথবা বীরগঞ্জে বড় হাকিমের নিকট লইতে হয়। অন্যসময় পথ ঘাটের নির্জ্জনতায় চুরির আশঙ্কা আছে ও যানবাহনও সুবিধামত পাওয়া যায় না। কাটমুণ্ডতে সংবাদ দিয়া আনাইতে হয়। শিবরাত্রির সময় যাত্রীগণের সুবিধার জন্য রাজপক্ষ হইতে নানারূপ সুবন্দোবস্ত,যাত্রীগণের তত্ত্বাবধানের জন্য ও পাহারার জন্য পুলিশ মোতায়েন এবং প্রত্যেক চটিতে সদাব্রত খোলা হয়। সাধুসন্ন্যাসীগণ এবং গরীব যাত্রীগণ রাজার পক্ষ হইতে বিনামূল্যে আহার্য্য পাইয়া থাকেন। এই সময় প্রচুর যান-বাহনের ও কুলীর সরবরাহ হয়, এবং রাস্তাও যথাসম্ভব মেরামত করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক চটিতে ধর্ম্মশালা ত আছেই, অধিকন্তু এবৎসর প্রত্যেক চটিতে রাজপক্ষ হইতে যাত্রীগণের জন্য পাঁচটি করিয়া তাম্বু খাটান হইয়াছিল।

বঙ্গদেশ হইতে নেপাল যাইবার দুইটি পথ। কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে মোকামাঘাট, তথায় ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া সিমিরিয়াঘাট বি, এন, ডব্লিউ রেলওয়ের ষ্টেশন। সিমিরিয়াঘাটের পর ষ্টেসন বারুণী জংসন। তথা হইতে সমস্তিপুর, মজঃফরপুর ও সিগোলী প্রভৃতি ষ্টেসন হইয়া রক্‌সোল পৌছিতে হয়; অথবা সমস্তিপুর হইতে দ্বার-ভাঙ্গা হইয়াও রক্‌সোলে যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে রক্‌সোলের দূরত্ব ৪৫৬ মাইল। দ্বিতীয় পথ ই, বি, আর রেলপথে কাটিহার জংসনে পৌছিয়া বি, এন, ডব্লিউ রেলে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া বারুণী জংসন। তথা হইতে রক্‌সোল।

২৯শে মাঘ সন্ধ্যার সময় আমরা মনিহারি হইতে রওয়ানা হইয়া প্রত্যূষে বারুণী জংসনে পৌছি। ই, আই, রেলের যাত্রী লইয়া যে গাড়ী বারুণী জংসনে নয়টার সময় আসিবে তাহাতেই আমাদিগকে আরোহণ করিয়া সিগোলী যাইতে হইবে। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলাম গাড়ীতে বেজায় ভিড়। গাড়ী আসিলে দেখিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল কামরাই সম্ভ্রান্ত নেপালী যাত্রীতে পূর্ণ। নেপালের মন্ত্রী মহারাজ এই সময় কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী অনেক নেপালী সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কামরায় উঠিলাম তাহাতে নেপাল মহারাজের Home Secretary'র সর্দ্দার নারায়ণ ভক্তের ভ্রাতা নিরঞ্জন ভক্ত মহাশয় তাঁহার পীড়িতা মাতা এবং স্ত্রীর সহিত যাইতেছেন। গাড়ীতে অনেক জিনিসপত্র; বসিবার স্থান নাই। তিনি জিনিসপত্র সরাইয়া আমার এবং আমার খুড়ীমাতা ঠাকুরাণীর বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। ইঁহার মাতা ঠাকুরাণীর একটি অপারেশন্ হইয়াছে, তাহাতেই তিনি কাতর অবস্থায় একটি বেঞ্চে শায়িতা ছিলেন। ইঁহাদের সহিত আলাপে আমরা নেপাল ও নেপালীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইলাম। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার ভ্রাতার নামে একটি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিয়া বলিলেন, তাঁহার বাড়ী এই পত্রসহ গেলে আমাদের বাসা প্রভৃতির ব্যবস্থা সহজে হইবে। মাতার অসুস্থতানিবন্ধন তাঁহাকে কয়েকদিন বীরগঞ্জে থাকিতে হইবে, নতুবা তিনি আমাদিগকে সঙ্গেই লইয়া যাইতেন। কথাবার্ত্তা হিন্দিতেই হইতেছিল। ইঁহার সহিত কথোপ-কথন করিতে এবং উভয় পার্শ্বের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম। মুঙ্গের, মজঃফরপুর ও চম্পারণ জেলা দিয়া যাইতেছি। ইহাই প্রসিদ্ধ মিথিলা প্রদেশ, ভূমি খুব উর্ব্বরা ও শস্যভূয়িষ্ঠা; এ বৎসর প্রায় সৰ্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ কিন্তু এ অঞ্চলে ফসল ভালই হইয়াছে। আম্র ও লিচুর গাছে প্রচুর মুকুল, মাঠ মুকুলগন্ধে আমোদিত। এই অঞ্চলে লঙ্কা ও আকের চাষ প্রচুর। বেলা এগারোটায় আমরা সমস্তিপুরে পৌছিলাম। দ্বারভাঙ্গা যাত্রীগণ এখানে ট্রেন পরিবর্ত্তন করিবেন। পর ষ্টেসন

পুসারোড্। পুসারোড্ হইতেই পুসা যাইতে হয়। পুসায় গবর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি-কলেজ আছে। এখানে বিশেষজ্ঞগণ কৃষি ও কীটতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিয়া থাকেন। ট্রেন যতই অগ্রসর হইতেছে যাত্রীসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে ; তন্মধ্যে অনেকেই নেপাল-যাত্রী। মজঃফরপুর মতিহারি প্রভৃতি ছাড়িয়া বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা সিগোলী পৌঁছিলাম। এই সেই সিগোলী যেখানে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের সহিত নেপালরাজের সন্ধি হইয়াছিল ; সেই সন্ধির সময় হইতেই নেপাল তরাইএর অনেকাংশ এবং নৈনীতাল, মসুরী প্রভৃতি নেপাল গবর্ণমেণ্টের হস্তচ্যুত হইয়াছে। সিগোলী সিমিরিয়া ঘাট হইতে ১৩২ মাইল এবং বারুণী জংসন হইতে ১২৬ মাইল।

শ্রীপশুপতিনাথজীর মন্দির

সিগোলীতে অন্য গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আঠারো মাইল দূরবর্ত্তী ইংরাজরাজ্যের সীমান্ত ক্ষুদ্র ষ্টেসন রক্সোলে যাইতে হইবে। গাড়ীতে অতিশয় ভিড়—রক্সোলে পৌঁছিতেও রাত্রি হইবে। শুনিলাম রক্সোলে কলেরা হইতেছে। তথায় ক্ষুদ্র ষ্টেসনে রাত্রিযাপনের স্থান পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। রাত্রিটা সিগোলীতে কাটাইব, কি রক্সোলে যাইব এই সকল কথা ভাবিতেছি এমন সময় গাড়ী থামা-মাত্র দেখিলাম আমাদের পরিচিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ লালা আমার গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত। ইনি Special Excise Sub-Inspector, রক্সোলে থাকেন। নেপাল রাজ্য হইতে যে সকল মাদকদ্রব্য চুরি হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে গোপনে আসে তাহা ধৃত করা ও আবকারী বিভাগের তদারকাদি ইঁহার কার্য্য। এই ট্রেনেই মতিহারি হইতে আসিতেছেন।

রক্সোলগামী ছোট ট্রেন প্লাটফরমের অপর পার্শ্বেই ছিল, তাহাতে খুব বেশী ভিড়, লোকের উপর লোক; মালগাড়ীর মত বোঝাই হইতেছে। আমরা যদুবাবু ও তাঁহার কনেষ্টবলের সাহায্যে কোনরূপে উঠিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে ট্রেন রক্সোলে পৌঁছিল। রক্সোল ষ্টেসন দেখিলাম লোকারণ্য—কুলী পাওয়াই কঠিন। যদুবাবুর বাসা ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। তাঁহার কনেষ্টবলরা কুলী সংগ্রহ করিলে আমরা পদব্রজে তাঁহার বাসায় রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টায় পৌঁছিলাম। পার্শ্বেই তাঁহার জমাদার কনেষ্টবল প্রভৃতির জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাতে এখনও কেহ বাস করে নাই। এই নূতন গৃহ আমাদের রাত্রিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্তদিন রেলে ভ্রমণ করায় আমরা ক্লান্ত ছিলাম। আহারাদি ও চা পান করিয়া সুখে নিদ্রা গেলাম। রাত্রে যে এরূপ আরামে কাটাইতে পারিব তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই।

রক্সোলের বাজারে, মাড়ওয়ারীদিগের নির্ম্মিত একটি ধর্ম্মশালা, আড়ত ও দোকান, বাজার, ডাকঘর, তারঘর ও পুলিশ ষ্টেশন প্রভৃতি আছে। ষ্টেশন হইতে বাজার প্রায় একমাইল দূরে। এ সময় এখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিল। রক্সোল ষ্টেশনের অনতিদূরে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও নেপাল রাজ্যের মধ্যে সীমানা একটি খাল বা নদী। খালের নাম "শ্রীসোয়া" বোধ হয় ত্রিস্রোতার অপভ্রংশ।

নেপালের পথে—নেপাল রাজ্য

নেপালী রেল ও মোটর

রক্সোল হইতে কাটমুণ্ডুর দূরত্ব আশি-বিরাশি মাইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত পথই পদব্রজে অথবা তাঞ্জাম বা কাণ্ডীযোগে নরস্কন্ধে যাইতে হইত। প্রথম পঞ্চাশ মাইল ভীষণ অরণ্য, ও অস্বাস্থ্যকর স্থান। এই অঞ্চলে শীতকাল ব্যতীত অন্য সময়ে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। পথ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। কুড়ি-বাইশ মাইল সমতলভূমির উপর জঙ্গলী কাঁচা সড়ক; তাহার পর উপলসঙ্কুল নদীগর্ভ দিয়া ক্রমশঃ চড়াই উৎরাই করিয়া পাহাড়ী পথে যাইতে হইত। জল এত অস্বাস্থ্যকর ছিল যে উহা পান করিলেই ম্যালেরিয়া ধরিত। সাবধানী যাত্রী ম্যালেরিয়ার ভয়ে কুইনাইন সেবন করিতে করিতে যাইতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে রক্সোল হইতে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত আমলেকগঞ্জ পর্য্যন্ত চব্বিশ মাইল নেপাল গবর্ণমেণ্ট ছোট মাপের (Narrow gauge) রেলপথ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই রেলের প্রস্থ আড়াই ফুট মাত্র। কলিকাতার মার্টিন কোম্পানী এই রেলপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এবং এখনও তাঁহারাই বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদ্বারা তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কতকগুলি নেপালী ভদ্রলোক রেলের কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছেন। শিক্ষিত হইলে তাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। ইংরাজী ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির পূর্ব্বেই এই রেলপথ খোলা হয়। নেপালের স্বাধীন নরপতি মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবনবীর বিক্রম সাহ্ বাহাদুর স্বয়ং ইহার কল টিপিয়া ইঞ্জিন চালাইয়াছিলেন। রেলপথ উদ্ঘাটন উপলক্ষে যে দরবার হয় তাহাতে নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা স্যর চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর বলিয়াছিলেন—"এই নূতন রেলপথ পশুপতিনাথ-দর্শনেচ্ছু তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। নেপালের এই অংশে ম্যালেরিয়ার প্রভাব প্রবল। তাঁহার বিশ্বাস এই রেলপথ নির্ম্মাণের ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক পরিমাণেই কমিয়া যাইবে। আমলেকগঞ্জ হইতে ভীমপেদী পর্য্যন্ত মোটরের পথে যাত্রীদিগের জলাভাব নিবারণের জন্যও নল বসাইয়া জল সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" এই রেলপথ নির্ম্মাণের ভার ছিল মার্টিন কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাসের উপর।

উক্ত রেলওয়ে খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমলেকগঞ্জ হইতে ভীমপেদী পর্য্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল পথ নদীর ধারে ধারে মোটর যাতায়াতের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাও গভীর অরণ্য, চড়াই উৎরাই করিয়া পাহাড় ভেদ করিয়া গিয়াছে। বর্ষা হইলেই এই পথ ভাঙ্গিয়া যায়। সর্ব্বদা মেরামতের জন্য নেপাল গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বিভাগের লোক মোতায়েন আছে। দিল্লীর জনৈক মাড়ওয়ারী মোটর লরি ও মোটর গাড়ী চালাইবার

ঠিকা লইয়াছেন। রেল ও মোটর খোলায় গত বৎসর হইতে নেপালের এই পঞ্চাশ মাইল পথ সুগম হওয়ায় এবার বাঙ্‌লার গৃহস্থ যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। নেপাল যাত্রার আর এক বিশেষ অসুবিধা ছিল বীরগঞ্জে পাশ লওয়া। রক্সোল হইতে দুই তিন মাইল দূরবর্ত্তী বীরগঞ্জে গিয়া এই পাশ সংগ্রহ করিতে হইত। পাশ দেওয়ার সময় ডাক্তাররা পরীক্ষা করিতেন। এই পরীক্ষা ও পাশ লইতে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইত খোলা ময়দানে বসিয়া। রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে যাত্রীগণকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইত। বর্ত্তমান বৎসর হইতে ব্যবস্থা অনুযায়ী নেপাল গবর্ণমেণ্টের রেল ছাড়িবার পূর্ব্বে ষ্টেশনেই রাজকর্ম্মচারীরা পাশ্‌ গছাইয়া দেন। ডাক্তারী পরীক্ষাও করা হয় না।

পথের সার সঙ্কলন

		বর্ত্তমান পথ
(১) রক্সোল হইতে আমলেকগঞ্জ (পূর্ব্ব নাম বিচাগড়ী) চব্বিশ মাইল।	রেল খোলার পূর্ব্বে জঙ্গলের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তা। পদব্রজে বা নেপালী তাঞ্জামে বা কুলীর পৃষ্ঠে কাণ্ডীতে যাইতে হইত।	নেপাল গবর্ণমেণ্টের রেলপথ। সময় তিন ঘণ্টা।
(২) আমলেকগঞ্জ হইতে ভীমপেদী ছাব্বিশ মাইল।	উপলসঙ্কুল নদীগর্ভের পথ। ঐ রূপে যাইতে হইত।	মোটরে যাতায়াত করা যায়। সময় চার পাঁচ ঘণ্টা।
(৩) ভীমপেদী হইতে থানকোট কুড়ি-বাইশ মাইল।	শিষাগড়ী ও চন্দ্রাগড়ী পাহাড় চড়াই উৎরাই করিয়া পার্ব্বত্য কঠিন পথ।	পদব্রজে বা ট্যাণ্ডামে বা কাণ্ডীতে যাইতে হয়। দুই দিন সময় লাগে।
(৪) থানকোট হইতে কাটমুণ্ড দশ মাইল।	সমতল ভূমির পথ	
(৫) কাটমুণ্ড হইতে পশুপতিনাথ তিন মাইল।	ঐ	
মোট পঁচাশি মাইল।		

পহেলা ফাল্গুন। অষ্টমী।

প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম আমাদের বাসার পাশ-দিয়াই পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য যাত্রী মাথায় পুঁটুলী লইয়া পদব্রজে চলিয়াছে। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। ইঁহারা রেল বা মোটরে চড়িবেন না, বরাবর হাঁটিয়াই যাইবেন। অধিকাংশ যাত্রী গরীব বটে কিন্তু আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি অর্থবান বিহারী ও পশ্চিমা যাত্রীও পূর্ণ পুণ্য লাভের কামনায় পদব্রজে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে সমর্থ হইলে পদব্রজেই তীর্থযাত্রা করিতে হয়। "পুণ্যার্দ্ধং হরতে-যানে তস্মাৎ যানং বিবর্জ্জয়েৎ।" (১০)

আমরা স্নান আহার করিয়া বেলা এগারোটায় নেপাল গবর্ণমেণ্টের রেলের রক্সোল ষ্টেশনে গমন করিলাম। ষ্টেশনটি অতি ক্ষুদ্র। তৃতীয় শ্রেণীর মুসাফেরখানা বাঁশ দিয়া ঘেরা। দ্বিতীয় শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র একটি কুঠুরী। ষ্টেশনে নেপালী সিপাহীর কড়া পাহারা। বহু

(১০) পুণ্যার্দ্ধং হরতে যানে তদর্দ্ধং ছত্রপাদুকে।
তদর্দ্ধং তৈল মাংসেভ্যঃ সর্ব্বং হরতি মৈথুনে॥
ঐশ্বর্য্যলাভমাহাত্ম্যাৎ গচ্ছেদ্‌ যানেন যো নরঃ।
নিষ্ফলং তস্য তৎতীর্থং তস্মাৎ যানং বিবর্জয়েৎ॥
মৎস্যপুরাণ।

যাত্রী, মুসাফেরখানায় স্থান নাই ; অনেক যাত্রী বাহিরে মাঠে বসিয়া আছে। ইহার পর দুইটি ট্রেন দ্বারভাঙ্গা ও সিগৌলী হইতে আসিবে; তাহারও যাত্রী এই গাড়ীতেই যাইবে। নেপালগামী ট্রেনটিও ক্ষুদ্র। দুই তিনটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী, একটি প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী। বাকী সাত-আটটি খোলা মালগাড়ী। মধ্যম শ্রেণী নাই। যে ট্রেনখানি আসিতেছিল, শুনিলাম তাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণী নাই, সুতরাং আমরা দুইখানি প্রথম শ্রেণীর এবং এগারো খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিলাম। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারাও আসিয়া পৌছিলেন। আমরা মোট তেরো জন যাত্রী হইলাম। তিন জন স্ত্রীলোক, আট জন পুরুষ যাত্রী এবং দুইজন চাকর ও বরকন্দাজ। আকাশ ঘন ঘোর কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল এবং দুই এক ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। বেলা চারটায় ট্রেন আসিল। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া মালপত্রসহ যেমন ট্রেনে উঠিয়াছি অমনি মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হইল। সহযাত্রীগণ ও আমাদের মালপত্র খোলা গাড়ীতে, সুতরাং তাড়াতাড়ি মালপত্রসহ নামিয়া পড়িলাম। কারণ এই শীতকালে জলে ভিজিয়া চব্বিশ মাইল যাওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু বিছানাদি জলে ভিজিয়া যাইবে। মেঘের যেরূপ অবস্থা তাহাতে শীঘ্র বৃষ্টি ছাড়িবে বলিয়া বোধ হইল না। অন্য অনেক যাত্রীও নামিয়া পড়িলেন। যাত্রীগণের কোলাহলে ও দৌড়াদৌড়িতে ক্ষুদ্র প্লাটফরম ও বিশ্রামকক্ষ তুমুল হইয়া উঠিল। রীতিমত ভিজিয়া গেলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষ লোকে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাতেই কোন রকমে ঠেলাঠেলি করিয়া আশ্রয় লইয়া ভিজা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলাম। বৃষ্টি হইতে লাগিল, আমরা পরের ট্রেনে যাইব স্থির করিয়া এই ট্রেনে আমাদের সহযাত্রী গোসাইজী ও সাহাজীকে আমলেকগঞ্জে বাসা ঠিক করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। কারণ আমরা কত রাত্রে পৌছিব তাহার স্থিরতা নাই। সেই রাত্রে অপরিচিত স্থানে বাসা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি ছাড়িল, ট্রেনও আসিয়া পৌছিল। এবারও যাত্রীর বিষম ভিড়। রেল-কর্ম্মচারীর ও পুলিশের সাহায্যে আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। সঙ্গীগণ সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে স্থান পাইলেন; এবার খোলা মালগাড়ীতে চড়িতে হইল না। সন্ধ্যার পর রাত্রি সাতটায় গাড়ী ছাড়িয়া অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই বীরগঞ্জে পৌছিল। বীরগঞ্জ একটি বড় বাজার ও নেপাল রাজ্যের একটি জেলার হেড্‌ কোয়ার্টার। এখানে বড় ও ছোট হাকিম থাকেন, কোর্ট এবং সরকারী হাঁসপাতাল আছে। রেলরাস্তার দুই পার্শ্বেই বাজার ও মাড়ওয়ারীদিগের দোকান ও আড়তসমূহ, মন্দিরাদি আলোকমালায় দেখা যাইতেছে। বীরগঞ্জে পৌছিয়া গাড়ী আর ছাড়ে না, শুনিলাম এঞ্জিন বিগ্‌ড়াইয়াছে; মেরামত না হইলে চলিবে না। কতক্ষণে মেরামত হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারিল না। আমলেকগঞ্জে গিয়া নৈশ ভোজন করিব স্থির ছিল। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট একটু জল সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে যাহা ছিল তাহা দ্বারাই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। রাত্রি বারোটা কি একটায় গাড়ী ছাড়িল। অতি ধীরে ধীরে গাড়ী চলে, মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার দুই ধারে গভীর অরণ্য। এই চব্বিশ মাইল রেলপথে আসিতে দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট লাগে। রেল খোলার পূর্ব্বে এই পথ চলা বড় বিপদজনক ছিল। বীরগঞ্জ হইতে সিমরা বারো মাইল, ধান্যক্ষেত্র দিয়া কাঁচা সড়ক, মধ্যে মধ্যে নদী নালা প্রবাহে উক্ত পথ ভাঙ্গিয়া যাইত। সিমরা চটি হইতে আমলেকগঞ্জ আট মাইল, শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানীর মধ্য দিয়া যাইতে হইত। নেপালের দক্ষিণে কুড়ি মাইল চওড়া তরাইয়ের ভীষণ জঙ্গল ও শালবন আছে, এই পথ তাহারই মধ্য দিয়া। এই স্থানে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। পথটিও জঙ্গলে আবৃত হইয়া যাইত। শিবরাত্রির পূর্ব্বে রাজ-আজ্ঞায় পথ পরিষ্কৃত হইত এবং স্থানে স্থানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইত। পথে সর্প ও ব্যাঘ্রভীতিও যথেষ্ট। আমরা রাত্রি সাড়ে চারটায় আমলেকগঞ্জে পৌছিলাম। পূর্ব্বগামী সহযাত্রীগণ ষ্টেশনে কুলীসহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই রাত্রে তাঁহারাও ঘুমাইতে পারেন নাই এই স্থানের অপর নাম বীচাগড়ি। পার্শ্ব দিয়াই বিছাগাড়ী নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী

প্রবাহিত। একটি পাকা ধর্ম্মশালার দ্বিতলে কক্ষ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাকী রাত্রিটা নিদ্রায় কাটাইলাম।

২রা ফাল্গুন। ইং ১৫।২।২৮। বিচাগড়ী একটি ব্যাঘ্রভীতিসঙ্কুল জঙ্গলাবৃত পার্ব্বত্য স্থান। কয়েকটি দোকান ও পাহাড়িয়াদের বস্তি। এখান হইতে মোটরে ভীমপেদী পর্য্যন্ত পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল যাইতে হইবে। বিচাগড়ী তরাইর শালবনের মধ্যে অবস্থিত। কাঠ চেরাই

মহারাজ দেব সামসের ও দেবী কর্ম্মকুমারী

কারখানা ও কল বসিয়াছে। এখান হইতে প্রচুর শালকাঠ নেপাল উপত্যকায় এবং ভারতবর্ষে চালান যায়।

দিল্লীর একজন মাড়ওয়ারীর বিলাতী কাপড় ও মোটর সার্ভিসের একচেটিয়া ব্যবসায়। মোটর বাসের ভাড়া জন প্রতি পাঁচ টাকা এবং খোলা মালের গাড়ীর ভাড়া জন প্রতি সাড়ে তিন টাকা। অধিক মাল থাকিলে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়। পাঁচ টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়া আমরা টিকিট খরিদ করিলাম। শুনিলাম মোটর বাসে যাত্রীর ভিড়ও অত্যন্ত অধিক। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বাজার হইতে গরম পুরী তরকারী ও জিলাপী সংগ্রহ করিয়া জলযোগ এবং ষ্টোভে চা প্রস্তুত করিয়া পান করিলাম। দুগ্ধ পাওয়া গেল না,—'মাওয়া' দ্বারা দুগ্ধের অভাব পূরণ করিলাম।

মোটর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বেলা সাড়ে দশটার সময় মোটরে আরোহণ করিলাম। আমরা তেরো জন। আমাদের মোটরে ষোল জন ও মালপত্র-বোঝাই হইল। কতক মাল ছাতের উপরে রাখা হইল। আমি ও সাহাজী ড্রাইভারের পার্শ্বে একটাকা হিসাবে অতিরিক্ত দিয়া বসিলাম। ইহা ড্রাইভারের প্রাপ্য। ড্রাইভার মহাশয় যদিও ভোজপুরিয়া হিন্দীতে কথা বলিতেছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গালী। ক্রমশঃ আলাপ ঘনীভূত হইলে জানা গেল ইনি প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয় এবং আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। বোম্বাই ভ্রমণকালে আমরা এক বাসায় ছিলাম। এক্ষণে কালীবাবু নামে পরিচিত। বেলা প্রায় এগারোটার সময় মোটর ছাড়িল। মোটরের উচ্চাবচ পার্ব্বত্য পথ নদীর পার্শ্ব দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষাকালে পাহাড় ধ্বসিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কল্য রাত্রেও বৃষ্টি হইয়া রাস্তা খারাপ হইয়াছে। এই পথেও একদিকে উচ্চ পাহাড়, অন্য দিকে গভীর খাতে নদী প্রবাহিত। সময়ে সময়ে মোটর নদীগর্ভে পড়িয়া আরোহী মারা গিয়াছে। কল্য রাত্রে বীরগঞ্জ হইতে একজন হিন্দুস্থানী বণিক ট্রেণে আসিতেছিলেন; তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম মোটরে যাওয়া বিপদজনক, আমলেকগঞ্জ হইতে ভীমপেদী ঝাপান বা তাঞ্জামে বা কুলীর পৃষ্ঠে যাওয়া ভাল। দেখিলাম অনেক যাত্রী হাঁটিয়াই যাইতেছে। মোটরে যাইতে ভয় করিতে লাগিল। একস্থানে কাদায় চাকা বসিয়া গেলে সকলে নামিলাম, মোটর ঠেলাঠেলি করিতে হইল। নেপাল গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবিভাগের নীলকোর্ত্তা পরিহিত কুলী মজুর রাস্তা মেরামতের জন্য স্থানে স্থানে উপস্থিত আছে এবং মেরামত করিতেছে।

পরিচিত ব্যক্তিকে ড্রাইভার পাওয়ায় আমাদের সাহস বৃদ্ধি পাইল। একটু সাবধানতার সহিত গাড়ী লইয়া যাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে এবং হিমালয়ের অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য ও আরণ্য শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইলাম। তিনিও যেখানে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহা দেখাইতে লাগিলেন। একস্থানে শ্লেট ও সিমেণ্টের পাহাড় দেখিলাম। মোটর ক্রমশঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতেছে।

এক ঘণ্টার মধ্যে সাত-আট মাইল দূরবর্ত্তী চুড়িয়াঘাটিতে পৌছিলাম। চুড়িয়ায় একটি ধর্ম্মশালা আছে। চুড়িয়া একটি গিরিসঙ্কট। জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। পাহাড়ে ক্রমশঃ চড়াই করিয়া চুড়িয়াঘাটী পর্ব্বতমালা পার হইতে হয়। পূর্ব্বে গোরুর গাড়ীতে এই পর্ব্বত পার হইতে বড়ই বিপদ হইত। কারণ উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া নিম্ন পথে পুনরায় অবতরণ করিতে হইত। সম্প্রতি গোযান ও মোটরের জন্য পাহাড় কাটিয়া একটি টানেল বা সুরঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে। টানেলের গাত্র বড় বড় কাঠ দিয়া বাঁধান। এরূপ কাঠ বাঁধান টানেল ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। টানেলের মধ্যে জল পড়িয়া কাদা হইয়াছে।

টানেলের প্রবেশপথের পার্শ্বে চুড়িয়া দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির। পূজারী আসিয়া আমাদিগকে দেবীর প্রসাদ ও সিন্দুর-তিলক দিয়া দক্ষিণা লইয়া গেলেন। টানেলের মুখে ঘন ঘন হর্ণ বাজাইয়া মোটর অপেক্ষা করিতে লাগিল, কারণ দুইদিক হইতে দুইটি গাড়ী যাইবার স্থান নাই। টানেল পার হইয়া মোটর ক্রমশঃ নদীধারের পথ দিয়া অগ্রসর হইল।

বেলা সাড়ে বারোটার সময় সুপারিটার চটিতে পৌছিলাম। সুপারিটার আমলেকগঞ্জ হইতে বারো তেরো মাইল দূরে একটি বড় চটি। এখানে একটি ধরমশালা, অনেকগুলি দোকান ও কাঠ-চেরাইর কারখানা আছে। হাঁটাপথের যাত্রীরা এখানে রাত্রি বাস করিয়া থাকেন। এই চটির পার্শ্ববাহিনী উপলপ্রতিহতা বিবিধ রঙ্গ ভঙ্গে ঝঙ্কারিণী প্রখর পার্ব্বত্য নদীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। নদীর পার্শ্ব দিয়াই পথ। কিছু দূর অগ্রসর হইলে নদীর অপর পারে পাহাড়ের উপর ত্রিখণ্ডেশ্বর মহাদেব দেখা যায়। নদীর উপরে বিলম্বমান একটি প্রকাণ্ড মালা—ত্রিখণ্ডেশ্বর মহাদেবের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর বেলা একটা পনেরো মিনিটের সময় আমাদের গাড়ীর গতিরোধ হইল। কামানধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতেছে, অনেক গাড়ী ও যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাপার কি? পাহাড় ধ্বস্ খাইয়া কি রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল? অবশেষে বুঝা গেল ডিনামাইট দিয়া রাস্তা ভাঙ্গা হইতেছে। রাস্তা প্রশস্ত করা হইবে। তজ্জন্য প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। স্থানটি বড় সুন্দর, নাম ভঁইসা দোভান। দুইটি পার্ব্বত্য নদীর সঙ্গমস্থান, তন্মধ্যে একটি নদীর নাম ভঁইসা। পার্ব্বত্য ও বনপথের এবং পর্ব্বতপাদমূলবিহারিণী নদীরও শোভা অতি চমৎকার। অনেক প্রকার পার্ব্বত্য পুষ্পাদি ও বৃক্ষ লতা দেখিতে পাইলাম। বেলা চারটায় ভীমপেদী দ্বিতল ধরমশালার সম্মুখে আমাদের মোটর পৌছিল। রক্সোল ষ্টেশনে যে পাশ পাইয়াছিলাম তাহা এখানে দিতে হইল। চার পাঁচ ঘণ্টায় আমরা যে পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম তাহাই অতিক্রম করিতে পূর্ব্বে দুই দিন লাগিত। পূর্ব্বে কোন পথ ছিল না। নদী-গর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপল খণ্ড বিকীর্ণ—নদীধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত, তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া বা কোন স্থানে নদীর পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অতি কষ্টে চড়াই উৎরাই করিয়া পদব্রজে বা তাঞ্জাম কাণ্ডীতে যাইতে হইত। পথ শ্বাপদসঙ্কুল ও জঙ্গলাবৃত। যাত্রীগণ দল বাঁধিয়া একসঙ্গে চলিতেন। শীতকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এই পথে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপালের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহারাজা দেব-সামসের জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী মহারাণী কর্ম্মকুমারী দেবীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পথিকগণের পানীয়-ক্লেশ নিবারণার্থ বীরগঞ্জ হইতে সমস্ত পথ দুই দুই মাইল অন্তর জলধারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

কোন পাহাড়ের নির্ম্মল নির্ঝরিণীতে নল লাগাইয়া এই সকল জলধারা আনা হইয়াছে। এক একটি স্তম্ভের দুইদিকে দুইটি হস্তাকার জল নির্গমনের ধারা; কোন স্থানে বা জলের ফোয়ারা—বৃত্তাকার একটি বাঁধান চৌবাচ্চা

জলে পূর্ণ করিতেছে। প্রত্যেক জলধারার উপর দেবনাগরী অক্ষরে দেবী কর্ম্মকুমারীর নাম লিখিত আছে। বীরগঞ্জ হইতে কাটমুণ্ড পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে জনশূন্য অরণ্য প্রদেশে ও পর্ব্বতোপরি ঐরূপ জলদান কার্য্য নেপালের হিন্দু রাজমন্ত্রীর ও তাঁহার পুণ্যচরিতা পত্নীর অফুরন্ত পুণ্য ও দয়ার অজস্র নির্ঝর স্বরূপ বিরাজিত আছে। এই নির্ম্মল

প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ—স্বয়ম্ভুনাথস্তূপ

জলই পথিকের একমাত্র অবলম্বন। এই পথে মোটা চিড়া ও চাউল ভিন্ন অন্য খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না।

খড়দার বা খরিদার ছত্রবাহাদুর এবং তাঁহার পুত্র খড়্গা বাহাদুর মোটরে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। খরিদার অর্থে জমিদার বা বড় জোতদার। আমলেকগঞ্জের নিকট ইঁহার জমিদারী দেখিতে গিয়াছিলেন। পুত্র খড়্গা বাহাদুর ইংরাজী স্কুলের ছাত্র, উভয়েই খুব সদাশয়। ইঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিলেন নেপালে যেন আমরা তাঁহাদের বাড়ীতেই অতিথি হই। কাটমুণ্ড সহরে ও পশুপতিনাথের মাঝামাঝি দিল্লীবাজারে তাঁহার বাড়ী। তথা হইতে পশুপতিনাথের মন্দির প্রায় দেড় মাইল।

ভীমপেদীতে একটি দ্বিতল বৃহৎ সুন্দর ধরমশালা আছে। কিন্তু যাত্রী-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী;—এমন কি ধরমশালার সম্মুখস্থ খোলা ময়দান এবং পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রান্না-ঘরগুলিও যাত্রীতে পূর্ণ। বাজারের ঘর গুলিও খালি নাই। অনেক যাত্রী রাস্তায় বসিয়া আছে। যে ঘরে যাই, স্থানাভাব। মোটর আসামাত্র আমি ধরমশালার দ্বিতলে পৌছিয়া একটু অনুসন্ধানের পর দেখিলাম কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলা-যাত্রী বিছানা পত্র বাঁধিয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এখানেও বিষম প্রতিযোগিতা। যাহা হউক অতি কষ্টে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান করিয়া লইয়া রান্নার ব্যবস্থা হইল। রান্নার উদ্যোগ করাইয়া আমি ও ডাক্তার শশীবাবু তাঞ্জাম বহনের ও মাল বহনের কুলী অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলাম। এইবার আমাদিগকে হাঁটা পথে পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এবার অনেক বাঙ্গালী যাত্রী আসিয়াছেন। সুতরাং তাঞ্জাম বা ডুলী পাওয়াই কঠিন হইয়াছে এবং ভাড়াও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, এখনই কুলী ঠিক করিতে না পারিলে কল্য প্রত্যূষে রওয়ানা হইতে পারিব না। প্রত্যূষে রওয়ানা হইতে না পারিলে পাহাড়ী পথে বিষম কষ্ট হইবে।

এই পথে নিম্নলিখিত প্রকার যানবাহন পাওয়া যায়।

(১) তাঞ্জাম—কাষ্ঠ নির্ম্মিত যান। চেয়ারের ন্যায় বসা যায়। সামান্য খাদ্যদ্রব্য ও জলপাত্র সঙ্গে লওয়া

যায়। চারজন কুলী বহন করে। ইহাতে কম্বলাদি পাতিয়া ও ছাতা মাথায় দিয়া বেশ আরামে যাওয়া যায়।

(২) কার্পেট—নীচে কার্পেট মোড়া, কতকটা ছোট পানসী নৌকার ন্যায়। শুইয়া বা বসিয়া আরামে যাওয়া যায়। উপরে একটি কাঠের ঢাকনা। নেপালী সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই যান ব্যবহার করেন। ভাড়াটিয়া কার্পেট অল্পই পাওয়া যায়।

(৩) ডোলী বা ঝোলা—কার্পেটের অনুকরণে একটি কাষ্ঠদণ্ডে চট বা সতরঞ্চী ঝোলাইয়া প্রস্তুত। শুইয়া যাইতে হয়। রৌদ্রের সময় উপরে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেয়। ইহাতে বসার উপায় নাই এবং দৃশ্য দেখার অসুবিধা আছে।

(৪) খটোলী—গাছের ডাল কাটিয়া দড়ি বাঁধিয়া একটি চতুষ্কোণ তক্তার মত করা হয়। তাহার চার কোণে দড়ি বাঁধিয়া একটি বংশ দণ্ডে ঝুলান হয়। আরোহীরা আসনপিঁড়ি হইয়া বসেন।

(৫) কাণ্ডি বা তোকা—একটি পাহাড়ী টুকরি দার্জিলিংএর মালবহা ঝুড়ির মত। ইহার উপর একজনকে বসাইয়া একজন কুলী ঘাড়ে করিয়া লইয়া যায়। মোটা লোককে কাণ্ডীবালারা লয় না। ক্ষীণ-কলেবর স্ত্রী ও পুরুষ অল্প ব্যয়ে ইহাতে যাইতে পারেন। বিছানা ও অন্যান্য মাল কাণ্ডীতেই কুলীরা বহন করিয়া লইয়া যায়।

ভীমপেদী ইহাতে কাটমুণ্ড বা পশুপতিনাথ লইয়া যাইবার নেপালী কুলীদের মজুরী লোক প্রতি তিন টাকা হিসাবে। যানবাহনকারীদেরও প্রত্যেক কুলীর মজুরী তিন টাকা হিসাবে। সুতরাং তাঞ্জাম খটোলী বা ঝোলার বহনকারী কুলীর মজুরী তিন জন কুলী লইয়া গেলে নয় টাকা এবং চার জন হইলে বারো টাকা। কার্পেট তাঞ্জামের ভাড়া এক টাকা হিসাবে অতিরিক্ত দিতে হয়। পথে কুলীদিগকে কিছু জলযোগ ও সিগারেটের জন্য বকসিস্ দিতে হয়। গড়হী কাষ্টম্ আপিসে প্রত্যেক কুলীর জন্য তেরো পয়সা হিসাবে বা নেপালী অর্দ্ধমোহর কর দিতে হয় এবং কুলীদের নাম ধাম রেজেষ্টারি করাইয়া খাতায় লিখাইয়া কুলীদের ও যাত্রীর পাশ লইতে হয়। যাত্রীদিগকে কোনরূপ কর দিতে হয় না।

ভীমপেদী একটি পর্ব্বত-বেষ্টিত বিস্তৃত উপত্যকা। মধ্য দিয়া একটি পার্ব্বত্য নদীর খাত, শীতকালে জল শুষ্ক থাকে। এই নদীর দুই দিকে দুইটি বাজার এবং দুইটি ধরমশালা। নদীর এপারের গ্রামে গৃহস্থ যাত্রীদের ধরমশালা এবং অপর পারের গ্রামে সন্ন্যাসীদের ধরমশালা। তথায় সাধুদিগকে আহার্য্য বিতরিত হয়। নেপালরাজের কুলী ঠিকাদারের আড্ডাও এইস্থানে! দুইটি বাজারই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একটি তাঞ্জাম বা দোলার চার জন কুলীর মজুরী কেহ চল্লিশ টাকা কেহ পঞ্চাশ টাকা চাহিতেছে। শুনিলাম গত কয়েকদিন অনেক বাঙ্গালী যাত্রী ঐরূপ মজুরী দিয়াই কাটমুণ্ড গিয়াছেন। কোন কুলী কম ভাড়ায় রাজী হইলে ঠিকাদার তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হাতায় পুরিতেছে ও বলিতেছে, পরদিন রেসিডেণ্ট সাহেব কিম্বা মন্ত্রী মহারাজের লোকজন আসিতেছেন, তাঁহাদের মালবহার জন্য বহু কুলীর প্রয়োজন। যাত্রীগণকে বলিতেছে তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিলে অর্থাৎ তাহাদিগকে কিছু দিলে তাহারা কুলী ছাড়িয়া দিবে বা বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। মন্ত্রী মহারাজ এই সময় কলিকাতায় ছিলেন এবং রেসিডেণ্ট সাহেব দিল্লী গিয়াছিলেন। তাঁহাদের এখনও আসিতে বিলম্ব আছে। ইহারা এই সুযোগে বেগারের ভয় দেখাইয়া বেশ বিলক্ষণ রোজগার করিতেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আমরা একদল কুলীর সঙ্গে যেমন দুইটি তাঞ্জাম চব্বিশ টাকার হিসাবে ভাড়া স্থির করিয়াছি, অমনি ঠিকাদারের একজন লোক আসিয়া কুলীদিগকে বিগড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বেগার ধরিবার ভয় দেখাইল। অগত্যা ঠিকাদারের লোককে প্রত্যেক তাঞ্জামের জন্য এক টাকা বকসিস্ বা দস্তুরী স্বীকার করিয়া পঁচিশ টাকা হিসাবে একটি তাঞ্জাম ও অন্য তাঞ্জাম না পাওয়ায় একটি দোলা ভাড়া করিয়া বায়না দিলাম। মালবহনের কুলীর মজুরী চার টাকা হিসাবে স্থির হইল। বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদির পর সেই সঙ্কীর্ণ স্থানেই কোন রকমে পাশাপাশি শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

শ্রীপান্নালাল সিংহ

ছোট বাবু

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

এক

তেপান্তরের মাঠ।

—রূপকথার দৈত্য বুঝি নিঃশেষে প্রাণীগুলোকে উদরসাৎ করেছে।—সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখা যায়—সকালে, সন্ধ্যায়, উদয়-অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটা, সীমন্তিনীর সিঁথির সিন্দুরেখার মত, দূর বনানীর ললাটে রক্ত টীকা পরিয়ে দেয়। তা ছাড়া মাধুরী বলতে, কমনীয়তা বলতে আর কিছু ছিল না। চারিদিক খাঁ খাঁ করে।

—তারই বুক-চেরা রেলের লাইনটি, কোন দূর অচেনা দেশের উদ্দেশে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

মাঠের মাঝখানে ছোট ষ্টেশন। একেবারেই নগণ্য। তবু আয়োজন সবই করতে হয়েছে।

টং, টং. টং!

মাষ্টার বাবু বেরিয়ে এসে হাঁক দেন, "রামদত্ত, ঘণ্টি লাগাও। লাকধারি, ডাউন টেরেন কো সিগনল দে দেও।"

'ঘটাং ঘট্' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখার হাত ঝুলে প'ড়ে।

দূরে ধোঁয়াও দেখা যায়।

টিকিট ঘরের সামনে দু'একজন যাত্রী দাঁড়িয়ে, বলে, "ছোটবাবু গো, লাটোরের একখানা টিকিস্!"

ছোটবাবু ভারী বড় বড় খাতা সামনে নিয়ে লিখে চলেন, "লাইন ক্লিয়ার; সিক্স্টি থ্রি ডাউন ইত্যাদি।"

অধীর কণ্ঠ শোনা যায়, "ছোটবাবু, টিকিসখানা দেন্ গো; গাড়ী হোই এল যে।"

খাতা মুড়ে, ছোটবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। আলস্য ভেঙে বলেন, "হেঁ, গাড়ী এল ত কি হ'ল? আমার হুকুম না নিয়ে কই ছেড়ে যাক্ দেখি? হুঁ বাবা! তা কোম্পানীর আইন নয়। শর্ম্মা প'ড়ে আছে এখানে কিন্তু আদা জল খেয়ে কাজ শিখেছিল।"

'ঘটাং ঘট্' ক'রে টিকিটের উপর তারিখের ছাপ মারতে মারতে ছোটবাবু হাঁক দেন, "চোবে, লাইন ক্লিয়ার লে যাও।"

'টিং টিং' ক'রে শব্দ হ'তেই টেলিফোনের চোঙ্গাটা কানে তুলে বলেন, "ইয়েস, সিক্সটি থ্রি ডাউন, রাইট টাইম —ফোরটিন টোয়েন্টি।"

ফোনের চোঙ্গাটা নামিয়ে রেখে, শশব্যস্তে এসে ছোট বাবু কলম তুলে নিয়ে খস খস ক'রে লিখে চলেন। মুখে বিড় বিড় করতে থাকেন, "করুক ত দেখি কোন্ ব্যাটার সাধ্যি আছে একলা সব কাজ। ভারী ত আমড়া —হ্যাঁ! কাল এক পোঁচড়া ঝেড়ে দেব রিলিভ করতে একজন পাঠাও। ব্যস্।"

হুস্ হুস্ ক'রে প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়াল।

সামান্য দু'একজন লোক ওঠা নামার পর ট্রেন ছেড়ে গেল।

আবার সারা ষ্টেশন জনশূন্য পুরীর মত খাঁ খাঁ করে।

হাতের কাজ সারা হ'তে, ছোটবাবু টেবিলের উপর পাতা কম্বলের বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সম্ভব অসম্ভব, অতীত ভবিষ্যতের কত কথাই মনে হয়।

বোধকরি একটু তন্দ্রার মতও আসে।

একরাশ খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি নিয়ে, দূর গ্রামের হরিধন মণ্ডল ঘরে প্রবেশ ক'রে, স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় রসিকতা ক'রে ওঠে, "কি মাষ্টের. বৌয়ের চাঁদপানা মুখখানা ভাব্‌ছ নাকি?"

কণ্ঠস্বরের সে রূঢ় আঘাতে ছোটবাবুর চিন্তা বা তন্দ্রার সূক্ষ্ম সূতা নিমেষে ছিন্ন হ'য়ে যায়। উঠে ব'সে বলেন, "আরে মণ্ডল লাট যে! এস, এস!"

হরিধন মণ্ডল দূর গ্রামের পাণের দালাল। নিজে কিছু উপায়ও করে এবং তার দৌলতে মাষ্টারেরও দু'পয়সা আয় হয়; তাই ভাবও উভয়ে বেশী।

প্রতীক্ষা

কৌটা থেকে এক খিলি পাণ মাষ্টারের হাতে দিয়ে, নিজে একটা পাণ এবং তৎপরে কতকটা দোক্তা মুখবিবরে চালান ক'রে দিয়ে মণ্ডল বল্‌ল, "বলি মাষ্টার, নতুন যে বিয়ে করলে,—তা বৌ কি বাপের বাড়ী ফেলে রাখবার জন্যে? আর নিজে এইখানে চিৎ হ'য়ে শুয়ে শুয়ে কড়িকাট গোণ।"

ছোটবাবু চারুচন্দ্র গম্ভীর মুখে বললেন, "নতুন বিয়ে ক'রে বউকে সাধে কি আর দূরে ফেলে রাখি রে ভাই! কাজ কর্ম্মের এমনি ঠেলা যে একদণ্ড অবসর পাই না। সঙ্গী ত কেউ নেই, বেচারা এসে একলা করবে কি?"

মণ্ডল মুখভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "আরে হাঁা। এই চিন্তেটাই তোমার বড় হ'ল! বলি, এই যে তুমি, কাজ নেই, কম্ম নেই, চিৎ হ'য়ে শুয়ে শুয়ে রামগঙ্গা ভেবে মরছ, —বলি, এই ফাঁকে, এক চটকে একবার বউএর চন্দ্রাননটা দেখে আসতে পারতে ত? আর তাছাড়া,—বুঝলে না, একবার ভালবাসাটা জমাট বাঁধলে, তখন তিনি কাজ কম্মের অবসর থাকলে, ছোট্ট ঘুলঘুলি জানলাটা খুলে, তোমার পিরতীক্ষেয় পথপানে তাকিয়ে থাকবেন।"

কথাটা চারুচন্দ্রের মন্দ লাগল না। সদ্যবিবাহিতের কাছে এর মধ্যে অনেকখানি রোমান্সের গন্ধ ছিল। চিন্তাসূত্র অবলম্বন ক'রে, মনোভাব চ'লে গেল কোন সুদূর প্রদেশে, যেখানে বিরহিণী প্রিয়া, একাকিনী ভূলুণ্ঠিতা হ'য়ে প্রিয়জন কারও প্রতীক্ষা করছে; শিথিল কবরী, স্রস্ত বসন, মলিন বদন। সহসা অত্যন্ত কোমল সুরে ছোটবাবু বললেন, "নাঃ! বউকে এবার আনতেই হচ্ছে দেখছি। হাত পুড়িয়ে আর খাওয়া যায় না।"

মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠে, সোৎসাহে মাষ্টারের পিঠ চাপড়ে বলল, "বহুত আচ্ছা! আর সামনেই শীত, তারপরই বসন্ত, বর্ষা—সেটা ভুলো না দাদা—"

ছোটবাবু তার উত্তরে একটু মৃদু মধুর হাসি হাসেন।

"টিং টিং" শব্দ বেজে উঠ্‌তেই কানে চোঙ্গ লাগিয়ে বলেন, "হ্যাঁ।—কত?—গুড্‌স্!···সিক্‌স্‌টিন টোয়েন্টি ফাইভ।···ইয়েস্!"

দুই

অতঃপর বসন্তের এক শুভ লগ্নে, সত্যিই এক দিন, দিন পাঁচেকের ছুটি নিয়ে ছোটবাবু স্ত্রীকে আনতে রওনা হ'য়ে গেলেন।

বড়বাবু বলেন, "বুঝলি রামদেও, এই সব চেঙ্গড়া মাষ্টারগুলোর বউ বউ ক'রেই মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

রামদেও পয়েণ্টের চাবি নিতে এসেছিল। পেরেকে ঝোলানো চাবির গোছা নিয়ে, মুচ্‌কে হেসে চ'লে গেল।

কালাচাঁদ বাবু এলেন রিলিভ করতে।

বড়বাবু চশমা জোড়া খাতার পাতার উপর খুলে রেখে সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন, "বুঝলেন না কালাচাঁদ বাবু, এই চারুবাবু আমাদের সম্‌পীরতি বিয়ে ক'রে, সুন্দরী ইস্ত্রি পেয়ে কাজ কর্ম্মে জবাব দেবেন নাকি তাই ভাবছি।"

কালাচাঁদ বাবু সবটা বোঝেন না। চুপ ক'রে থাকেন।

বড়বাবু মুচকি হেসে কলমটা তুলে নিয়ে বলেন, "বুঝলেন না কথাটা? যাকে সোজা কথায় ইয়ে বলে আর কি?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উদরটা তাঁর দুলে ওঠে।

তিনি বিপত্নীক, এবং জীবিতাবস্থাতে স্ত্রীটির সুন্দরী ব'লে খ্যাতি ছিল না। তবু প্রমাণ করবার জন্যই বোধ করি জোর ক'রে বলেন, "বুঝলেন কালাচাঁদ বাবু, আমরাও এক কালে জোয়ান ছিলুম, বিয়েও ক'রেছিলুম; স্ত্রীর রূপের কথাটা নিজ মুখে না হয় নাই বললুম। কিন্তু তা ব'লে,—হেঁ, হেঁ—যখন এ, এস, এম, ছিলুম,—কতদিনই নাইট্‌ ডিউটিতে কেটে গেছে। কই বলুক ত দেখি কেউ? তা আর শর্ম্মা রামকে বলতে হচ্ছে না।"

কিন্তু ছোটবাবু যে দিন সস্ত্রীক এসে পৌঁছালেন, বড়বাবু তখন রেলের দৈনিক হিসাব মিলাচ্ছিলেন।

হাতের কলম হাতেই রইল। চশমার উপর দিয়ে, চোখদুটো বড় বড় ক'রে বড়বাবু হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

ছোটবাবুর স্ত্রীর রূপ দেখবার মত। মুখখানা পানের মত,—মাধুর্য্যে ভরা। দেহবল্লরী বিদ্যুৎশিখার মত।

অনুযোগ ক'রে বড়বাবু ছোটবাবুকে শোনালেন, "তা চারুবাবু, এ ঘরে অমন ইস্ত্রি মানায় না। ভাঙ্গা কুঁড়েয় চাঁদের জোছনা! এ্যা—"

ছোটবাবু তৃপ্তি ভরা মুখে একটু মুচকে হেসে সামনে থেকে স'রে গেলেন।

মুখভঙ্গী ক'রে বড়বাবু কলম নামিয়ে লিখে চললেন।

কিন্তু A. S. M.-এর রোমান্স যেন কৃপণের সঞ্চিত ধন। বেচারার নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে নির্জ্জন ষ্টেশনে। তরুণী স্ত্রী থাকে একলা ঘরে। ব্যথায় মাষ্টারের বুক কির কির করে; তবু উপায় নেই।

রাত্রি জাগরণের পর, সকাল আটটায় ছুটি।

ঘুমের তাড়নায় বেচারার রোমান্স জমি জমি ক'রেও জমে না।

ক্লিষ্ট অবসন্ন দেহকে কোন রকমে টেনে তুলে স্নান, আহার।

বেচারা ভাতের থালা ছেড়ে, ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে পরিবেশনরত স্ত্রীর মুখের পানে।

এইটুকুই মিষ্ট অবসর! তাই ক্ষণেকের তরে উদরের ক্ষুধা নিভে যায়—মনের ক্ষুধার আধিক্যে।

মৃদু তাড়না আসে, "হাঁ ক'রে তাকিয়ে রয়েছ কি? খেয়ে নাও, ভাতগুলো কড়্‌কড়ে হ'য়ে গেল যে।"

চমকভঙ্গে চারুচন্দ্র পাতের উপর নত হ'য়ে পড়েন।

আহার্য্য ওঠে বেশী। বলেন,"এমন নৈলে রান্না! হা!—এতদিন হাত পুড়িয়ে কি ছাইপাঁশই যে গিলছিলুম, আর এ—আহা অমৃত!" কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ প্রয়োগের জন্যই বোধকরি হাতটা ঘন ঘন নামা ওঠা করে।

স্ত্রীর মুখে সলজ্জ কুণ্ঠার হাসি ফুটে ওঠে।

কিন্তু তার পরিমাপ ওই পর্য্যন্তই।

স্ত্রীর খাওয়া সাঙ্গ হবার পূর্ব্বেই তাঁর অতৃপ্ত নিদ্রা প্রবল হ'য়ে আসে।—না হয় যেতে হয় ষ্টেশনে কর্ম্মরাজ্যের কোলাহলে।

অস্তগামী সূর্য্য ডুবে যেতে থাকে দূর বনানীর প্রাচীরের তলে। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘনিয়ে ওঠে। মনের রোমান্সও আলোর সঙ্গে সঙ্গে নিভে যেতে থাকে। অন্ধকারের মত বিভীষিকার ছায়া নিয়ে মনের মাঝে জেগে ওঠে নিঃসঙ্গ রাত্রি জাগরণ—ষ্টেশনের খুপরি ঘরে;—শয্যা বড় বড় বাঁধান খাতার কঠিন মলাট।

মনটা বড় বাবুর ওপর বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে।

রাত আটটায় ডিউটি। তাই নৈশ আহার তার পূর্ব্বেই সমাধা ক'রে নিতে হয়।

চারুচন্দ্র সন্ধ্যার সময়ই বাড়ীতে যেতে চান। যতটুকু সান্নিধ্যরস উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু হারাধন মণ্ডল ছাড়ে না। বলে, "তুমি যে একেবারে ভেড়ো হ'য়ে পড়ছ হে!—বলি, আমরা কি কেউ নয়? বউ না হয় তোমার সুন্দরীই হয়েছে, তা কালো ব'লে কি আমাদেরও ঘরের টান নেই?"

লজ্জায় আরক্ত মুখে "হেঁ, হেঁ" ক'রে হাসতে হাসতে ছোট বাবু আবার ব'সে পড়েন। মনটা উস্ খুস্ করতে থাকে। গল্পে বসতে চায় না। মণ্ডলের উপর ক্রুদ্ধও একটু হয় বোধহয়। তবু লজ্জায় উঠ্‌তে পারেন না।

মণ্ডল গল্প ফাঁদে, "এবার পাণের দফা গয়া মাষ্টার।. লাট সাহেব এবার সারা দেশটায় কামান বন্দুকে..."

চারুচন্দ্র কিন্তু একটুও রস পান না। "হাঁ, হাঁ" ক'রে সায় দিতে দিতে হঠাৎ এক সময় উঠে প'ড়ে বলেন, "সময় হ'য়ে এল মোড়লের পো, ওঠা যাক্।"

অনিচ্ছার সঙ্গেও মণ্ডল উঠে দাঁড়ায়।

বাড়ীতে এসে মাষ্টার সন্ধান করেন স্ত্রী কোথায়। একটা ছল ক'রে রান্না ঘরের দোর গোড়ায় চেপে ব'সে বলেন, "ভাত দেবে?"

আগুনের তাপে কমলার সুগৌর মুখ টক্ টক্ করে—যেন রক্ত জবা।

লুব্ধ নেত্রে চারুচন্দ্র লোলুপ মার্জ্জারের মত কমলার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

সেইখানেই ঠাঁই হয়। তিনি খেতে বসেন।

মনটা অজানা আনন্দে সিক্ত হ'য়ে ওঠে। দু'চারটা কথা বলার প্রলোভন সংবরণ করতে পারেন না। বলেন, "আমি এমনি হতভাগা কমলা, তোমায় জোর ক'রে নিয়ে এসে একলা ফেলে রাখি।"

কমলা মুখ তুলে কোমল কণ্ঠে জবাব দেয়, "তুমি ত আর ইচ্ছে ক'রে..."

স্ত্রীর রাঙামুখের ছোট একটি কথা চারুচন্দ্রের কাঙাল মনের সামনে ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দেয়। সবেগে ব'লে উঠেন, "জান কমলা আমার যে কি দুঃখ এতে; এক এক সময় ইচ্ছে করে, দিই কলার চাকরীতে জবাব—"

হঠাৎ তিনি থেমে পড়েন। বক্তৃতাটা অভিনয়ের মত নিজের কানেই বাজে।

কমলা বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রথমটা বোধহয় কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর এক সময় নীরবেই ঘর ত্যাগ ক'রে যায়।

আপনার অত্যধিক উত্তেজনার লজ্জায় চারুচন্দ্র তাড়াতাড়ি আহার সমাধা ক'রে উঠে পড়েন।

মাথার ভিতর কেমন সব জট্ পাকাতে থাকে। কিন্তু তার পক্ষে স্ত্রী যেন ক্রমেই মরীচিকা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল। এ কেবল নিকটে এসে প্রলোভনই বাড়ায়। ধরতে গেলে উধাও হয়।

আশে পাশে, চোখের সামনে অহর্নিশি স্ত্রী হাতের গোড়াতেই ঘুরে বেড়ায়; তবু যেন সে বহু দূরে। তৃষ্ণায় বেচারা মাষ্টার ছট্‌ফট্ করতে থাকেন, কিন্তু পিপাসা মেটে না—বাড়ে।

দিন কতক ঘন ঘন বিলম্ব হ'তেই বড় বাবু ঠুক্‌লেন, "চারুবাবু, নতুন বিয়ে করলে ত রেল কোম্পানি বোঝে না, আর হনিমুনের ছুটিও দেয় না।"

ছোট বাবুর ঘাড়টা সামনে ঝুলে পড়ে। বলতে চেষ্টা করেন, "আজ্ঞে, না—একটু ইয়ের জন্যে, এই দেরীটা—"

মণ্ডল মুখ টিপে হেসে বলে, "মাষ্টার, রেখে ঢেকে খেও হে!...প্রেমের ভাঁড়ারটা কুবেরের মালখানা নয়।"

মনটা চারুচন্দ্রের ব্যথিত হ'য়ে ওঠে। বেচারা স্ত্রীর সঙ্গে বঞ্চিত হ'য়ে সে মনের কষ্টে দিন যাপন করছে, তার জন্য কেউ সমবেদনা না জানিয়ে, উল্টে সকলেই বিদ্রূপ করে। পীড়িত মনটা ততই ঝুঁকে পড়ে বঞ্চিতা, রিক্তা স্ত্রীর দিকে।

রাত্রের ডিউটিতে যাবার জন্য জামা পরতে পরতে স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বলেন, "রাত্রে তোমার একলা বড্ড কষ্ট হয়, না মণি?"

এ জিজ্ঞাসা, স্নেহ-সম্বোধন কমলাকে নিত্যই শুনতে হয়, তাই অভ্যাস হ'য়ে গেছে। কোন কথাই বলে না।

কুণ্ঠিত হাতটা বাড়িয়ে পত্নীর লাল আপেলের মত গালে আঙুলে ক'রে ছোট একটি টোকা দিয়ে বলেন, "দেখ না, আমি শিগ্‌গির ব্যবস্থা করছি।"

অনিচ্ছার সঙ্গে চারুচন্দ্র বাইরের দিকে পা বাড়াতে থাকেন। চোখের দৃষ্টিতে ভাসতে থাকে সেই নীরব কাতরতার ছবি—যেটা দেখতে পাওয়া যায় কোল থেকে ছেলেকে শ্মশানে ছিনিয়ে-নিয়ে-যাওয়া মায়ের চোখে।

রাত্রি বেড়ে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ষ্টেশনের সেই নিস্তব্ধ নির্ম্মম কুঠ্‌রী। একটা যাত্রী পর্য্যন্ত নেই—যে ডাকে 'ছোট বাবু, একটা টিকিস দাও গো!'

শুধু প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হয় মেলের ক্রশিং-এর তরে, মালের শ্লথ মন্থর আগমনের জন্য। কিন্তু শয়নকক্ষে, সুকোমল শয্যায়, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থেকে নবোঢ়া স্ত্রীর প্রতীক্ষা করার মত, তাতে না আছে রস, না আছে রোমান্স।

ভারি রাত! চারিদিক ঝাঁঝাঁ করে। মনের ভারও ছোট বাবুর অসহ্য হ'য়ে ওঠে।

মাল গাড়ীকে পার ক'রে দেন। 'ঘটাং ঘট' 'ঘটাং ঘট' ক'রে ফোন করেন, "হ্যাঁ...গুড্‌স্...ওয়ান্ থারটিন..."

আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ট্রেন নেই তাই অবসর মাষ্টারের অসহ্য হ'য়ে ওঠে।

চোরের মত সন্তর্পণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

একবার পত্নীকে দেখার প্রলোভন সংবরণ করতে পারেন না।

অন্ধকারের রাজ্যে, টিপে টিপে পা ফেলে শোবার ঘরের জানালার ধারে এসে দাঁড়ান।

ঘরে মৃদু আলোক জ্বলছিল। তাঁরই ক্ষীণ রশ্মি এসে পড়েছিল সুপ্তিমগ্না কমলার সুন্দর মুখের উপর। নীল পদ্মের মত চোখ দু'টো মুদিত; দীর্ঘ পল্লব স্থির। পাতলা রাঙা

ঠোঁট ঈষৎ বিস্ফারিত।···তারই উপর একটা—শুধু একটা চুম্বনের ছাপ এঁকে দেবার জন্য চারুচন্দ্রের মন মাতাল হ'য়ে উঠল।

বিদ্রোহী মনকে বশে না আনতে পেরে, জানালার গরাদে মুখ রেখে তিনি ডাকলেন, "কমলা!"

মৃদু ভীতস্বর কেঁপে উঠল। কমলার গাঢ়সুপ্তির সিংহদ্বারে সে স্বর জাগরণের তূর্য্যধ্বনি করতে পারল না।

পাশেই বড়বাবুর ঘর। কথাটা মনে পড়তেই ছোট-বাবুর সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায়, ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। আর দ্বিতীয়বার ডাকতে সাহস না ক'রে, লুব্ধ দৃষ্টিতে, ঘন ঘন নিদ্রিতা পত্নীর পানে তাকাতে তাকাতে তিনি ফিরে এলেন।

ক্ষুব্ধ হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাতের বোঝা বিধাতার চরণতল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় কিনা, বোঝা যায় না।

কিন্তু ঘটনাটা বিকৃত হ'য়ে বড়বাবুর কানে যায়। তিনি কড়া ক'রেই জানিয়ে দেন, "এটা চাকরী-স্থল;—গভীর রাত্রে, লুকোচুরি খেলার মত স্থানবিশেষ নয়। রাত্রের বিচ্ছেদ অসহ্য হ'লে, চাকরী ছেড়ে,—প্রেমের পাথারে গা ভাসানই ভাল—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তিন

জলকল্লোল যেখানে উতরোল হয়, ঢল যেখানে নামবেই, সেখানে বাধার চেষ্টা মানে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত হ'তে দেওয়ার অবসর দান। তারপর একদিন সব বাধাবিঘ্ন ভাসিয়ে আপন পথে সে ছোটে।

তাই চারুচন্দ্রের যে মিলনাকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ বাধার প্রাচীরে ক্রমাগতই আহত হচ্ছিল—কাঙ্ক্ষিতজনকে পাবার লোভও সে তেমনই বাড়িয়ে চলেছিল।

দুপুর বেলা। হরিধন মণ্ডল খবর দিয়ে গেল, "মাষ্টার, সকালে একটি ছিষ্টিধর বংশধর হয়েছে;—কাল মিষ্টিমুখের নেমন্তন্ন—"

আনন্দসংবাদটা আরও দুচার জায়গায় দিতে মণ্ডল যখন বিদায় নিল—সেই সঙ্গে নিয়ে গেল চারুচন্দ্রের মনের সমস্ত আনন্দটুকুও।

মনটা তাঁর অত্যন্ত অকস্মাৎই উদাস হ'য়ে গেল। কেবলই মনে ধ্বনিত হ'তে লাগল—"আর যদি আজ অমনি একটা খোকা হত!—ছোট একটু মিষ্টি কাকলীতে সারা বাড়ীটা ভ'রে থাকত। কমলার তবু সান্ত্বনার একটা উপায় হত।"—কিন্তু কথাটা মনে আসতেই তার বুক ফেটে যেতে লাগল। হায় রে! আজ পর্য্যন্ত যে তার স্ত্রীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হ'ল না।

বাইরের মেঘলা দিনের আকাশের মত, মনটাও তাঁর থমথমে হ'য়ে উঠল।

সন্ধ্যার দিকে টিপি টিপি জল নামল।

নিত্যকার মত বিদায়ের পালা। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে যে মনের এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা চারুচন্দ্র এর আগে কল্পনাও করতে পারেন নি।

বাদলার বারিধারার মত, স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে মনের ভিতরটাও তাঁর গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল। আজকের রাতটা—খালি আজকের তরে—যেন তাঁর মন স্ত্রীকে বাহুপাশে বেঁধে রাখবার জন্য উদ্ধত হ'য়ে উঠতে চায়।

খালাসী ডাক দিল, "দেরী হ'য়ে গেছে, বড়বাবু গোসা করছেন।"

চারুচন্দ্র গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাতর নেত্রে পত্নীর মুখের পানে তাকাতে তাকাতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

কমলা হাতে ছাতাটা গুঁজে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "মাগো! যেমন অন্ধকার, তেমনি পোড়া বিষ্টি নেমেছে! এমন ভয় করছে আজ!"

নীরবে চারুচন্দ্র পথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাত এগারোটার সময় প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামল।

উঠে ঘরের শার্শিগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে, মাষ্টার এসে আবার চেয়ারে বসলেন।

মনটা যেন সিক্ত ধরণীর মত কাব্যরসে স্নান ক'রে উঠেছে। কিন্তু নীরস কর্ম্মজীবনে, কাব্যলক্ষ্মীর কোন অস্তিত্বই নেই। তাই ফোনও করতে হয়, লাইন ক্লিয়ারও দিতে হয়।

মোহচিন্তার সূত্র ছিন্ন ক'রে বিকট হুঙ্কারে, একসপ্রেস্

ট্রেন উল্কা বেগে ষ্টেশনের বুকের উপর দিয়ে ছুটে গেল।

বাঁশির শব্দ যেন আজ তাঁর কানে অর্থহীন লৌহদৈত্যের আর্ত্তনাদেরই মত বোধ হ'ল।

রামদেও ঘরে ঢুকে বলে, "ভারি জবর বিষ্টি ছোটবাবু! এখোন পয়েণ্ট্‌সমে যাওয়া ভারি শোক্ত হোবে।"

ছোটবাবু একবার শার্শির ভিতর দিয়ে বাইরের অশ্রান্ত ধারার দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বললেন, "থাক্! সেই সময় সময় পয়েণ্ট্‌সে গেলেই চলবে।"

রামদেও খুসী হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "হাঁ বাবু, ঠিক বাত। আপনি ভি ইষ্টিসানমে থাকবেন ত? হামকো থোড়া মেহেরবানি করকে বোলাইয়ে গা।—"বলতে বলতে থলি থেকে কতকটা খৈনি বার ক'রে নিয়ে সে অন্ধকারের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

একা;—একেবারে একা!

সহসা একটা তীব্র গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের শার্শি, দরজাগুলো ওলোটপালোট হ'য়ে গেল। তাদের বিকট ওদ্দাম শব্দে চারুচন্দ্র সশঙ্কিত হ'য়ে উঠে বসলেন।

বাইরে অশ্রুসজলা প্রকৃতি রুদ্রমূর্ত্তি ধরেছে;—ভীষণ ঝড়!

মত্ত হাওয়ার উদ্দাম বেগ এসে বন্ধ শার্শি, দরজায় প্রতিহত হ'য়ে আকুল ক্রন্দনে লুটিয়ে পড়ছিল। চারিদিকে যেন বিপ্লব ঘনিয়ে উঠেছে।

চারুচন্দ্র উদ্বিগ্নচিত্তে উঠে, ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

ঝড়ের বেগে মাথার উপর টিনের চাল কট্‌কট্‌ করতে থাকে। ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ শার্শির কাঁচের ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে লাগল। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা।

একে অল্পবয়স্কা স্ত্রী ঘরে, তার উপর তাঁদের বাসার ছাউনি খড়ের।

চারুচন্দ্রের মন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

একবার দ্বার খুলে দেখলেন বাহিরে যাওয়া সম্ভবপর কি না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ছাটে, বিদ্যুৎদীপ্তিতে সারা ঘর প্লাবিত হ'য়ে গেল।

সভয়ে দ্বার বন্ধ ক'রে তিনি ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। তার শেষ নেই, হিসাব নেই, তাল নেই, যতি নেই।

কড়্‌ কড়্‌ ক'রে একটা তীব্র শব্দ ক'রে নিকটে কোথাও বোধহয় বাজ পড়ল। চারিদিক সে গভীর গর্জ্জনে প্রকম্পিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারুচন্দ্রের বুক দুর-দুর ক'রে উঠ্‌ল। কপালে স্বেদধারা ফুটে উঠ্‌ল।

একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে বারোটা। দুইটায় মেলের ক্রশিং।

এখনো দেড়ঘন্টা অবসর।—মাঝে হয়ত কোন গুড্‌স্‌ট্রেন নেই।

ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে, চারুচন্দ্র ছাতাটা তুলে নিলেন।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে, দ্বারে শিকল তুলে দিলেন।

প্রবল ঝড়ের সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তীরের মত অশ্রান্ত বৃষ্টির ছাটে, ছাতা উল্টে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল।

কিন্তু কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কানে কেবল ধ্বনিত হচ্ছিল স্ত্রীর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ, ভীতিবিহ্বল উক্তি, "এমন ভয় করছে আজ—।"

ক্ষিপ্র পদে তিনি বাসার দ্বারে এসে দাঁড়ালেন।

আজ আর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিলেন না।

সবই রুদ্ধ।

দ্বারে অশান্ত হস্তে করাঘাত ক'রে, অনুচ্চ-ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্‌লেন, "কমলা, কমলা, ঘুমিয়েছ?"

দ্বার খুলে গেল। কমলা জেগেই ছিল।

চারুচন্দ্র ত্বরিত পদে ঘরে প্রবেশ ক'রে হাঁফাতে লাগলেন।

ভীত শুষ্ক মুখে কমলা বলল্‌,"একটুও ঘুমুতে পারিনি।—

—ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলুম।"

তপ্ত আলোয় চারিদিক ঝল্‌সে দিয়ে, অত্যন্ত বিকট শব্দে আর একটা বাজ কাছেই কোথাও পড়ল।

ধরণী যেন সে আঘাতে খান্‌খান্ হ'য়ে গেল।

"মাগো।"—ব'লে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রেই ভয়ে কম্পিত দেহে কমলা স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চারুচন্দ্র সবলে তাকে বুকে চেপে ধ'রে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় কি কমলা,—এই যে আমি রয়েছি।"

তাকে ধ'রে শয্যায় শুইয়ে নিজেও তার পাশে যখন শুলেন, তখনও কমলা কাঁপছে।

চারুচন্দ্র আদর ক'রে বললেন, "এখনও ভয় করছে?"

কমলা স্বামীর অত্যন্ত সান্নিধ্যে স'রে যেয়ে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে শুধু বলল, "হুঁ!"

এ জীবন চারুচন্দ্রের অভিজ্ঞতায় নূতন। পুলকে, তৃপ্তিতে তাঁর বুক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নিজের একখানা হাত দিয়ে পত্নীর দেহলতা বেষ্টন ক'রে চক্ষু মুদে রইলেন।

* * *

সহসা একটা কামান গর্জ্জনের মত বিকট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল সাগরতরঙ্গের গভীর আরাবের মত কোলাহলে ঘুম ভাঙ্‌তেই চারুচন্দ্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় বিছানার উপর উঠে বসলেন।

তখনও পত্নী বাহুপাশে বদ্ধা। কিন্তু শব্দটা যে ট্রেন-সংঘর্ষের, তা বুঝতে পেরে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে গিয়েছিল, বুদ্ধিটাও বোধকরি লোপ পেয়েছিল।

শত সহস্র হতভাগ্য যাত্রীর কাতর আর্ত্তনাদ তখন মাতাল প্রকৃতির ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ভেদ ক'রে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

স্বভাব ও অভাব

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর

সেদিন এক বন্ধুর সহিত সন্ধ্যার সময় রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখি, রাস্তার পাশে এক জায়গায় একটা বটগাছের তলায় জনকয়েক মজুর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ রান্নার আয়োজন করছে। দলের সঙ্গে কয়েকটি দুগ্ধপোষ্য শিশু—তারা মায়ের কোলে-কোলে। শুক্‌নো ধূলোমাটিই তাদের আসন, তাদের বিছানা। গায়ে এক একখানি শতচ্ছিন্ন বাস, ময়লা এক একটা পুঁটুলী সবার সামনে,—তার মধ্যে বড় জোর রাত্রির শীত নিবারণের জন্য এক-একখানি ক'রে কাঁথা কি চট। তখন তারা খান তিনেক ইটের উপর উনোন পেতে হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছে। কৌতূহলী হ'য়ে আমার বন্ধুটি একটু এগিয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস্ করলেন। উত্তরে জান্‌লেম—"তারা সাঁওতাল, দুম্‌কা পাহাড় থেকে কাজের যোগাড়ে সহরের দিকে যাচ্ছে, দু-তিন দিন যাবৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, এখন পথই তাদের ঘর বাড়ি। রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় আজকের মত তাদের বিশ্রামের আশ্রয় এই বটতলা।" অন্ধকার বেশ ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে, আর শীতের প্রকোপটাও বৃদ্ধির মুখে দেখে আমরা বেশী দূর আর এগুলুম না।

ফিরবার পথে বন্ধুটি বল্লেন, "দেখুন, এদের জীবনযাত্রা কত সহজ আর কত অনাড়ম্বর! খাটপালঙে শুয়ে লেপতোষক মুড়ি দিয়েও আমাদের সুখ নেই, আর এরা পৌষের এই দারুণ শীতে খোলামাঠে খালি গায়ে কেমন রাত কাটাচ্ছে। আমরা কত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় লাভ ক'রেও অতৃপ্তি বোধ করি, এরা ঐ চারটি মোটাচালের ফেন-ভাতে নুন ছিটিয়ে নিয়ে অমৃতের মত উপাদেয় বোধে তা গ্রহণ করবে। একদিনের জন্যে বাড়ী ছেড়ে বেরুতে হ'লে আমাদের ভাবনার অন্ত নেই, এরা সে-বিষয়ে কেমন নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার; স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের কত-কিছু দুধ-ঘি, ডিমরুটির ফরমাস্, আর এদের সেখানে ফেন-ভাত-শাক চচ্চড়ি! পথেপ্রবাসে শিশুদের নিয়ে যেতে হ'লে মাঠাকরুণদের দুধের বোতল চাই, আর কত ফ্লানেলের জামা-কাপড়; আর এদের দেখুন, শিশুদের আহার হচ্ছে মায়ের বুকের দুধ আর ঐ ভাতের সারাংশ একটু মাড়, জামাকাপড় হচ্ছে মায়ের আঁচল। বিদ্যে কেউ এদের শেখায় না ব'লে, বুদ্ধিতে এরা আমাদের চেয়ে ছোট, কিন্তু, স্বাস্থ্যের দিকে দেখবেন মোটামুটি বিচারে এরাই উন্নততর।"

বন্ধুর এই সুদীর্ঘ সমালোচনা থেকে একটা ইঙ্গিত পেলাম, —যারা ভদ্রলোক, তথাকথিত শিক্ষিতশ্রেণী, তারা চারদিক দিয়ে অভাবদায়গ্রস্ত, অনেক অনাবশ্যক অভাব বাড়িয়ে তারা পাকে প'ড়ে দিনরাত ক্লিষ্ট হচ্চে, আর এই-সব দীন-দরিদ্র মজুরশ্রেণী, এরা সে দায়-মুক্ত; অভাবের সূক্ষ্ম বোধ নেই ব'লেই এরা সুখে দিন কাটাচ্ছে। বন্ধু এ' দু'য়ের মধ্যে ভালমন্দ বিষয়ে সরাসরি কোন রায় দিলেন না; কিন্তু মনে হ'ল যেন সাঁওতাল প্রভৃতির সহজ ও স্বাবলম্বনশীল পবিত্র জীবনযাপনই আপাততঃ তাঁকে একটু অভিভূত করেছে।

কথায় কথায় মনে প'ড়ে গেল, দু'তিন বছর আগে নবপর্য্যায়ে আত্মশক্তির কোন-এক সংখ্যায় চিন্তাকণা-সঙ্কলন বিভাগে একবার এমনি একটি ভাবদ্যোতক কথা পড়েছিলেম যে—"অভাব যত কমানো যায়, ততই মানুষ মহৎ হ'তে পারে।" কথাটা প'ড়ে অবধি অনেকদিন ভেবেছি। অনেকের কাছে ঐ উক্তিটির অন্তরগত তাৎপর্য্য ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করেছি; কিন্তু মনের মত সমাধান মেলেনি। সেদিনও সেই কথাটাই ফিরে স্মরণ হলো,—"সত্যিই কি তবে অভাব কমানোতে মহত্ত্ব আছে?" শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্নটা এই ভাবে রূপ নিল—"শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী এই যে ভাব-জগৎ থেকে বাস্তবজীবনে নিত্য নূতন অভাব আমদানি ক'রে চলেছে, এ অভাববোধ ও তার

পূর্ণতা সাধনের সচেষ্টতার পিছনে কোন ন্যায্য কৈফিয়ৎ নাই কি ?"

প্রকৃতি থেকে জীব আহার-নিদ্রা-ভয়াদি কয়েকটি আদি সংস্কার পেয়ে থাকে। এই কয়টির অভাব পূরণে তারা স্বাভাবিক ক্রিয়াশীল। এই অভাববোধ ও তা নিয়ে যে সক্রিয়তা, ইতর বিশেষ, সকলের জীবনেই তা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীব যত উন্নত হচ্ছে, ততই সে আদি সংস্কারকে ছেড়েও অধিকন্তু আরো নূতন-নূতন অনুসংস্কারের জালে ইচ্ছে ক'রে জড়িয়ে পড়ছে। এক আহার সংস্কার সম্পর্কেই দেখি,—নিম্নশ্রেণীর জীব কেঁচো,—সে মাটি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, কিন্তু তার চেয়ে সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি উপর স্তরের জীবদের রসাল রক্ত-মাংস আস্বাদন ছাড়া কিছুতে রুচি হয় না। পশুর থেকে উন্নত আদি মানব, তারও উর্দ্ধতর অনার্য্য-আর্য্য, ক্রমে দেখছি, এরা এক আহারের সংস্কারই কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। কত রকম রসের সমাবেশ, কত রকম আহার্য্যের উপাদান, তার আবার এক-একটা উপাদান থেকে কত রকমের সৃষ্টি! এ সব আহার্য্য বস্তুর উপাদান চিন্তা ক'রে, পরখ ক'রে নির্ব্বাচন করা, সেগুলো সংগ্রহ করা, তা আবার একটার সঙ্গে আর একটাকে মিলিয়ে মিশ্র-পদ তৈরী করা—কতই না তার হাঙ্গামা! সাঁওতালের সহজলভ্য আহার্য্য 'ফেনভাতের' তুলনায় 'পোলাও' রান্নার বেলায় কত হলুদ-নুন, ঘি, পেস্তা বাদাম, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি মালমসলার দরকার, আর কত পরিশ্রম, কত সময় নষ্ট, কতই না মাথা খাটানোর দরকার হ'য়ে পড়ে! কিন্তু এ অভাব বৃদ্ধি কিসের জন্য ?

সাঁওতালের চোখে দেখতে গেলে পোলাও রান্নার এত হাঙ্গামার অনেকখানি হয়তো অনাবশ্যক ব'লে মনে হবে, কিন্তু মানুষ এই প্রয়োজনাতিরিক্ত হাঙ্গামার মধ্যে সাধ ক'রে কি অমনি ভিড়ে!—তা ঠিক নয়। একটা লাভ আছে—যা নাকি জীবনের মহৎ লাভ, সেটা হচ্ছে শিল্প-সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ। সাধারণ মানুষ যেখানে শুধু প্রয়োজনকেই পরম ও চরম সাধনার বিষয় ব'লে ধ'রে থাকে, উন্নত মানুষ সেখানে সে প্রয়োজনকে তো স্বীকার করেই, তা ছাড়া সে প্রয়োজনের বস্তুকে সুন্দর ক'রে মনোরম ক'রে উপভোগ করতে চায়। ক্ষুন্নিবৃত্তিসাধন ফেনভাতেও চল্‌তে পারে, কিন্তু পোলাও গ্রহণে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, উপরন্তু অপূর্ব্ব রসসৃষ্টিজনিত শিল্পকৃতিত্বের আনন্দের যোগও রয়েছে।

এই "আনন্দ"কে লক্ষ্য ক'রেই মানবসভ্যতার প্রগতি সুরু হয়েছে। এই তিনটি অপর-একটি শব্দেই মানব তার যা-কিছু সম্পদ, যা-কিছু সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। তাই সে বলেছে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

সৃষ্টির মূলে শুধু আনন্দ। সর্ব্বশক্তির আধার ভগবানও তাঁর শক্তিকে নিজের মধ্যেই মৌলিক আকারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আবদ্ধ রাখেন নি। অন্তরে তাঁর নিছক্ রসসৃষ্টিজনিত আনন্দের প্রয়োজন হ'তে নব-নব সৃষ্টি-ঐশ্বর্য্যের অভাববোধই তাঁকে এইভাবে সৃষ্টিক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করেছে। মানুষেরও বেলায় এই একই নিয়ম। সাহিত্য-বিজ্ঞান মানুষের এই আত্মার আনন্দ ও অভাববোধের তাগিদ এবং তা পূরণ করবার সাধনা নিয়েই রচিত। আজকের এই শিল্পসম্ভারে ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ মানবসভ্যতার স্বর্ণ মন্দির কত কালের কত মহামানবের বিপুল কামনা, বিরাট সাধনা ও মহান আত্মত্যাগের মালমসলার গাঁথুনিতে যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। যুগে যুগে যে তাঁরা শতশত দুঃখ দুর্গতির নিদারুণ নির্য্যাতন স্বেচ্ছায় শিরে বরণ ক'রে নিয়ে আত্মার রসবস্তুর অভাববোধ পূর্ণ করবার সাধনায় জীবনপাত ক'রে গেলেন, এ'তে দোষ কোথায়, বরঞ্চ দেখি তাঁদের মহত্ত্বই বিশেষ ক'রে এতে প্রকাশ পেয়েছে!

মন্ত্র ছিল তাঁদের—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" ভোগ করবেই—কিন্তু ত্যাগের দ্বারা। তাঁদের এই ভোগেরও বেলায় অল্পেতে সুখ নেই—ভূমাতেই আনন্দ। এ সব উপদেশের মধ্যে অভাববোধের ইঙ্গিত বেশ আছে। কারণ, ভোগ করতে গেলেই তো ভোগ্য বস্তুর দরকার। দরকার হ'লেই যে অভাবের কথা এসে পড়ল। তবে ত্যাগের কথা বলে'ছন বটে, কিন্তু কি অর্থে, সেটাও একবার তলিয়ে দেখা দরকার।

মানুষ ধাতে শিল্পী। শিল্পীর ধর্ম্মই স্বাবলম্বন। সে চায় আপন হাতে সৃজন। তাই নিরেট স্বভাবের বস্তু

ার সত্যিকার ভোগপিপাসা মিটাতে পারে না। দুধ এক খাদ্য, স্বভাব হ'তে একরূপ অনায়াসেই পাই, কোন দুঃখ, কোন ঝঞ্ঝাট নেই, কিন্তু মানুষ সেই অনায়াসলব্ধ বস্তু নিয়ে সুখী রইল না। সে দুধ থেকে শিল্পপ্রেরণার তাগিদে, কত কাঠ পুড়িয়ে, তাকে জ্বাল দিয়ে, ঘেঁটে-ঘুঁটে কত কারিকুরী ক'রে, তৈরী করল অপূর্ব্ব জিনিষ —দই, মাখন, ঘি, ছানা—কত কি! দুধ স্বভাবের বস্তু, কিন্তু দই-মাখন জিনিষগুলো শিল্পীর শিল্প, পরিশ্রমলব্ধ, 'স্বাবলম্বনের' ফল।

এ যেমন বস্তুর দিক দিয়ে দেখা গেল, তেমনি সংস্কারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে "কাম" একটি প্রাকৃতিক সংস্কার, তাতেও শিল্পীর সুখ নেই। শিল্পী সেই সংস্কারের প্রাকৃতিক খোলস ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে নূতন এক শিল্পের পোষাক পরাল। তার রূপ গেল বদলে। নূতন রূপে সে নাম ধরল "প্রেম"। ছানা করলে দুধকে যেমন দুধ ব'লে চেনা যায় না, প্রেম রূপে কামও হ'য়ে ওঠে অচেনা। তখন তার লীলার রাজ্য হয় দেহ ছেড়ে মন, বস্তু ছেড়ে ভাব। হালের যত ভাল ভাল কাব্য-নাটক, গান-গল্প, সবই প্রেমের লীলাগাথায় ভরপুর এবং সব ছেড়ে হালের খাঁটি সভ্য মানুষ এ সমস্ত নিয়েই আনন্দ পায়। মানুষের রসানুভূতি এখন এত সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে যে স্থূল স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বিলাসের আমেজ তাকে আর তৃপ্তি দিতে পারে না। আহার সংস্কারেও এই একই কারবার লক্ষ্য করি। এখন আহারের প্রাকৃত উদ্দেশ্য উদরপূর্ত্তির কথাটাই আহারের বৈঠক থেকে যায় বাদ প'ড়ে, বৈঠক গুলজার হয়, রাঁধুনির রসসৃষ্টির এবং ভোক্তাদের রসবোধের সুখ্যাতি অখ্যাতির আলোচনা নিয়ে।

এই রূপে দেখি, মানুষের ত্যাগের দ্বারা ভোগের তাৎপর্য্য হচ্চে—"স্বভাব ত্যাগ ও তার স্থলে শিল্প-সৃষ্টি থেকে আনন্দ রসাস্বাদন।" স্বভাব ত্যাগ বলতে স্বভাবের অভাব অর্থাৎ materialএর অভাব না বাড়িয়ে, তা কমাতে হবে। সুতরাং অভাব কমানোর নীতি এ অর্থে খুবই সত্য; কিন্তু আবার যখন মানুষ স্বভাবকে ত্যাগ ক'রেই নিবৃত্ত হচ্চে না, পরন্তু সঙ্গেসঙ্গেই দেখি শিল্পসৃষ্টি ক'রে তার আনন্দ-আস্বাদনের জন্যই সে-ত্যাগের অনুষ্ঠান করছে, তখন বুঝি যে ত্যাগ তার কাছে ভোগের শিখরে পৌঁছাবার জন্য সাধনার একটা সোপান বিশেষ বই আর কিছুই নয়। আত্মার আনন্দবিধান উদ্দেশ্যে শিল্প-বস্তুর জন্য অভাববোধ ও তা পূরণেই মানুষ তার জীবনের সফলতা মনে করে। এই অভাববোধ না থাকলে তার সভ্যতাই আজ গ'ড়ে উঠ্‌ত না—সে জড়ের সামিল হ'য়ে থাকত। মানুষ যে যুগে যুগে আত্মত্যাগ করেছে, মহৎ হয়েছে—সে-ও শুধু এই শিল্পের অভাববোধকে পূর্ণ করবার সাধনাতে ব্রতী হ'তে গিয়েই। তার আত্মত্যাগের ইতিবৃত্ত শিল্পেরই জন্মপত্রিকা।

শরৎ বাবুর 'গৃহদাহের' নায়ক সুরেশের চরিত্রে এই স্বভাব ও অভাবের দ্বন্দ্ব-রহস্যটি চমৎকার রূপ ধরেছে। মহিম ও সুরেশ দুই বন্ধু। অচলা মহিমের বিবাহিতা পত্নী। সুরেশ স্বভাবের সংস্কারে অচলার দেহ-সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে তার প্রতি অনুরক্ত। আনন্দরসম্বাদনের ইচ্ছা যেমন মানুষের প্রাণে স্বভাবে যা-নাই, ভোগের জন্য এরূপ শিল্পবস্তুর অভাব জন্মায়, তেমনি স্বভাবও তার মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে ভোগের জন্য স্বাভাবিক বস্তুর (materials) অভাববোধ জাগ্রত করে। সুরেশের ভোগলিপ্সু চিত্ত দিন দিন অচলার অভাববোধের নির্য্যাতনব্যথায় অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়ল। সে নানা ফিকিরে অচলাকে প্রলুব্ধ করল এবং একদিন মহিমের পল্লী আবাসে আগুন লাগার পর গৃহহীন অসুস্থ বন্ধুকে কিছুদিন সেবা ক'রে শেষে ফাঁকি দিয়ে সে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। ফলে, মহিমের দু'দিক দিয়েই "গৃহদাহ" হ'য়ে গেল। তারপরে সুরেশ যখন অচলাকে সম্পূর্ণরূপে একেবারে মুঠোর মধ্যে পেলে, তখন তার প্রতি অচলার মনও গেল সম্পূর্ণরূপে বিরূপ হ'য়ে। যা-হউক, এর প্রতিক্রিয়ায় সুরেশের মধ্যে খুব একটা বড় রকমের ওলট-পালট হ'য়ে গেল। আগে স্বভাবের অনুগত হওয়ায় যেখানে, ভোগপিয়াসী সুরেশ প্রাকৃতিক সংস্কার স্থূল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য প্রাকৃতিক বস্তু দেহের অভাবই সংসারে একমাত্র বড় অভাব ব'লে মনে করত, পরে সেখানেই তার চিত্ত হঠাৎ বৈদগ্ধ্যের অনুগামী

হওয়ায় সে প্রকৃত মানবীয় সংস্কার সূক্ষ্ম প্রেমরসাস্বাদনের জন্য শিল্পবস্তু 'প্রাণ' বা মনোভাবের অভাব বোধ করতে লাগল। এইখানেই দেখতে পাই, তার কাছে "প্রাণশূন্য দেহের বোঝা দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে," আর সে-ও তখনি দেহকে ছেড়ে নূতন ক'রে নিজের মধ্যে প্রাণসৃষ্টির সাধনাকেই জীবনব্রত ক'রে নিল।

গ্রন্থের উপসংহার হয়েচে, সুরেশের এই প্রাণের সাধনার ইঙ্গিত নিয়ে। সে অচলার সান্নিধ্য থেকে দূরে স'রে গিয়ে, অর্থাৎ রূপকভাবে দেখতে গেলে স্থূল দেহকে ত্যাগ ক'রে, রোগাক্রান্ত বিপন্ন গ্রামবাসীদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করল,—নিজেকে এই ক'রে নূতন ক'রে সৃষ্টি করল। এইখানে সুরেশের যে প্রাণের পরিচয় পাই, তা একেবারে যেমনি নূতন, তেমনি অপূর্ব্ব এবং তেমনি সুন্দর ও মানবীয়। গৃহদাহক সুরেশ আর প্লেগরোগাক্রান্ত ডাক্তার সুরেশে অনেকখানি তফাৎ—একেবারে যেন সেই "দুধ-ঘির" মত, চেনাই দুঃসাধ্য। সুরেশ বদলে গিয়ে স্বভাব ত্যাগ ক'রে শেষাবধি মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে অভাবকেই শ্রেয় ব'লে উপলব্ধি করল।

'গৃহ-দাহ' উপলক্ষ্য ক'রে আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্বভাব ও অভাবের ত্যাগ ও সৃষ্টির তাৎপর্য্য দেখে এসেছি; কিন্তু এবারে দু'টি বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে সেই জিনিষটি দেখিয়ে এ আলোচনায় নিবৃত্ত হব। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দের জীবন দু'টিই ধরা যাক্।

কলিকাতায় ভারতীয় যুবক-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে একস্থানে দেশের বর্ত্তমান নিরুদ্যম কর্ম্মবিমুখতার জন্য মহাত্মাজী ও শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগের আদর্শকে দায়ী করেছেন। এঁদের ত্যাগধর্ম্মী ব্যবহারিক জীবন দেখে অভাব-কমানো'র নীতিটাই দেশ-বাসীর কাছে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ব'লে ধারনা হচ্চে। তার ফলে, শিল্পভোগটাকে নিছক বিলাসব্যসন সুতরাং নীচ কাজ কল্পনা ক'রে তারা সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টাতেই উদাসীন হ'য়ে পড়ছে। দেশ থেকে মহাত্ম ও শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ ও যোগপ্রণোদিত ব্যাবহারিক জীবনের আদর্শ এখন হ'তে বাতিল ক'রে উৎখাত ক'রে দিতে হবে,—সুভাষবাবু দেশের উন্নতির জন্য দেশবাসীর সমক্ষে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, সুভাষবাবু একটা বিষয় বোধ করি তেমন লক্ষ্য করেননি।—বিষয়টি আমি ইঙ্গিত করছি—এঁদের জীবনের philosophy বা আদর্শতথ্য।

এঁরা ভোগকে পূর্ণ, পবিত্র, সার্থক করতেই ত্যাগের পথ নিয়েছেন;—ত্যাগ মানে—"স্বভাব ত্যাগ"। এঁরা দেখছেন,—আজ দেশে ভাবগত আদর্শে ও কর্ম্মের ব্যাব-হারিকতায় মনুষ্যত্বের দুর্গতি ঘটেছে। দেশে স্বাবলম্বন নেই, ভোগের বস্তুকে স্বাবলম্বন দ্বারা সৃষ্টি ক'রে নিতে কেউ ব্যগ্র নয়। যে স্বাবলম্বন নীতি হচ্চে শিল্প তথা মানুষের মনুষ্যত্বকে পরখ করবার কষ্টিপাথর, যা ভোগক্রিয়াকে ন্যায্য পথে নিয়ন্ত্রিত করবার একমাত্র পরিচালনদণ্ড, তাকে অবহেলা ক'রে যখন মানুষ কলের তৈরী জিনিষ এমন কি বিলাতি জিনিষ ব্যবহারের দ্বারা শিল্পরুচির পরিচয় দিতে মোটেই ইতস্ততঃ না ক'রে ক্রমেই অধিকতর অভ্যস্ত হচ্চে, তখন তাঁরা মানুষের এই ভোগনীতিকে মনুষ্যত্বের বিরোধী সুতরাং গর্হিত ব'লে মনে করলেন। মানুষ এখন নিজের হাতে ছবি আঁক্‌বার পরিশ্রমটুকু করতে চাইবে না, রাগ-রাগিণী সাধবার কষ্টভোগ করবে না, কিন্তু বাজারের ছবি কিনে বিলাস-কক্ষের শোভাবর্দ্ধন করবে, গ্রামোফোনে গান শুনে সঙ্গীতপিপাসা মিটাবে। এই রকম হয়েছে আধুনিক মধ্যমশ্রেণীর মানুষের কলারুচির পরিচয়। এরা নিজেদের উন্নত এবং মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ভেবে অহমিকার ঘোরে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আর এ ক'রেই নিত্য নব আভি-জাত্যের সৃষ্টি করে; অথচ পরখ করলে দেখা যায়, এদের যে শিল্পচর্চ্চা, সে হচ্চে স্বভাবেরই সেবা। এরা বহুরূপী। নিজেদের সেই স্বভাবসেবকের বিকৃত মূর্ত্তিটাকে, উপরে মেকী শিল্পীর প্রচ্ছদ পরিয়ে লোকচক্ষে নিয়ত নিঁখুত ও সুন্দর ক'রে ধরে। শিল্পীর শিল্পত্ব চিন্‌বার কষ্টিপাথর—স্বাবলম্বনের আদর্শ দিয়ে বিচার করলেই এদের সে কৃত্রিম রূপসৃষ্টির কারসাজি বেশ ধরা পড়ে,—আজ মহাত্মাদের হাতেও এ ভাবেই সে কারসাজি ধরা পড়েছে।

ব্যাপারটা সাময়িক হ'লেও এই নিকৃষ্ট ভোগনীতি আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিকে ক্রমেই শিথিল ক'রে দিচ্ছে। ফলে, আমরা কঠিনকে ছেড়ে সহজের উপাসক অর্থাৎ যথার্থ শিল্পবৃত্তি ছেড়ে স্বভাবের অনুগত হ'য়ে পড়ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভোগের উদ্দেশ্যটাও বিকৃত রূপ ধরেছে। শিল্পকৃতিত্বের গৌরব চিন্তায় অ— উপভোগ হচ্ছে—শিল্পীর ভোগ, প্রকৃত মানবের ভো আদর্শ ভোগ;—ইন্দ্রিয় চারতার্থ করায় আবাম সম্ভোগ হচ্ছে স্বভাবের ভোগ—নিকৃষ্ট ভোগ। এ রকম ভোগে মানুষের স্বাভাবিক সংস্কারের তাগিদে স্বাভাবিক বস্তুর অভাববোধ বাড়তেই থাকে।

মহাত্মাজী ও শ্রীঅরবিন্দ যে অভাবহ্রাসনীতি অবলম্বন করেছেন, তাঁদের এই অভাব মানে স্বাভাবিক বস্তুর অভাব। কিন্তু মূলতঃ তাঁরাও অভাব-বাড়ানো'রই পক্ষপাতী এবং এই অভাববোধ ও তার পূরণ চেষ্টা নিয়েই তাঁদের জীবনসাধনা। এ অভাব পূরাতে গিয়েই সাধনার প্রথম সোপানে তাঁরা স্বভাববস্তুর প্রতি ব্যাবহারিক জীবনে উদাসীন হ'য়ে পড়েছেন। এঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গের কর্ম্মের আদর্শ লক্ষ্য করলে সে কথাটাই ভাল ক'রে প্রমাণিত হবে। তাঁরা সব আসমুদ্র-হিমাচল বিশাল ভারতের স্থানে স্থানে আশ্রম বনাম কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন ক'রে দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, মানবসভ্যতার অন্তর্গত যত-কিছু শিল্পসম্পদকে কুসংস্কারের যোগজনিত দুর্গতির হাত থেকে পুনরুন্নত বিশুদ্ধ করবার,—এক কথায় মনুষ্যত্বের সাধনাতেই, জাগতিক সুখসম্ভোগ ত্যাগ ক'রে স্বাবলম্বনের আদর্শে ব্রতী রয়েছেন। সুতরাং এঁদের আদর্শই চিরন্তন মানবের আদর্শ—সেই "ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা" র আদর্শ। একে পরিত্যাগ করতে গেলে দেশ ভুল করবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে,—দৃষ্টির ভ্রমে বিনাশের পথে এখন যেমন অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে, তেমনিই হ'তে থাকবে।

এ ভাবে, সাহিত্য ও ব্যবহারিক জীবন দুদিক থেকেই আমরা দেখতে পেলাম—প্রকৃতপক্ষে অভাব-বাড়ানোই মানবের পথে শুভকর। "নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব সুখম্"—মানবসভ্যতার এই বীজমন্ত্রেও আমরা আমাদের এ সিদ্ধান্তের খুব দৃঢ় পোষকতা পাই। এখন মনে হচ্ছে, সাঁওতালের জীবন সহজ হ'লেও বাস্তবিক পক্ষে তা স্বভাবেরই অনুগত, তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ খুব অল্পই আছে। কিন্তু বিদগ্ধ মানবের জীবন অভাবদায়গ্রস্ত, দ্রব্যসম্ভারের ভারে আড়ম্বর-পূর্ণ ও বিচিত্র ভাব ও কর্ম্মপ্রবণতায় বিড়ম্বিত হ'লেও, তা স্বভাব ছেড়ে শিল্পের অনুগত, সুতরাং মহত্তর।

বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনীতে পঠিত

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সাহিত্য

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

["হেমচন্দ্র বসু মল্লিক" অধ্যাপক, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্]

ও

শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী বি-এ

জাতি বর্ণ ও দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মোক্ষধর্ম প্রচারের ইতিহাস সুরু হইয়াছে ভারতবর্ষে। বুদ্ধদেবের পূর্বে ধর্ম ছিল জাতির মধ্যে আবদ্ধ; নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন ধর্মের গোড়ার কথা ছিল। মোক্ষধর্ম সাধন ছিল কঠিন ও জটিল। শাক্যমুনি গৌতম যে দিন বোধি লাভ করিলেন সেই দিন জগতের লোকে জানিল তাহারাও বোধি লাভ করিতে পারে। যে-মুক্তির সন্ধান বোধি-বৃক্ষমূলে শাক্য সিংহ লাভ করিলেন তাহাই তিনি জগতের প্রত্যেক জীবের নিকট দিবার জন্য প্রচারে বাহির হইলেন। তাঁহারই পথে বাহির হইল ভিক্ষু ভিক্ষুণীর দল। পরিচিত গৃহ, পরিচিত পরিজন, পরিচিত দেশ সবই তাহারা ত্যাগ করিল—সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য। বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করিয়া-ই ভিক্ষু ভিক্ষুণীর দল মগধের সীমানা ত্যাগ করিয়া ভারতের সুদূরতম দেশে চলিল। প্রতিকূল ঘটনার স্রোতে উজান বহিয়া নিঃসম্বল বীরের দল চলিল। সঙ্গে মাত্র ভিক্ষাপাত্র ও ভিক্ষাদণ্ড। তারপর একদিন রাজানুগ্রহ হইল। দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক হইলেন সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্। সম্রাট্ ছিলেন ভিক্ষু। সম্রাট্ হইয়া অনেক রাজ্য জয় করিলেন, অনেক জাতি জয় করিলেন; কিন্তু সকল জয়ের সেরা জয় করিলেন ধর্ম বিজয়—এষে চ মুখমুতে বিজয়ে দেবনাং প্রিয়স যো ধম বিজয়ো—অর্থাৎ ধর্মবিজয়কেই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী প্রধানতম মনে করেন। সেই জন্য তিনি স্বরাজ্যে ও ছয় শত যোজন ব্যাপিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিদিগের রাজ্যে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য ভিক্ষুদের পাঠাইলেন। দক্ষিণভারতে চোড় (Chola) ও পাণ্ড্যদের মধ্যে দূত গেল সদ্ধর্ম প্রচার করিবার জন্য। তাম্রপর্ণী বা সিংহল দ্বীপে পাঠাইলেন নিজ পুত্র-কন্যাকে প্রচার উদ্দেশ্যে। ভারতের মধ্যে সীমান্তে যে-সব অন্ত্যজ জাতি ছিল তাহাদেরও মধ্যে বুদ্ধের বাণী পৌঁছিল। মহারাজ অশোক এখানেই নিবৃত্ত হইলেন না, কাষায় বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষুগণকে পাঠাইলেন সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া যবন রাজ্যে। আলিক-সন্দরের মৃত্যুর পর তিনটি মহাদেশ জুড়িয়া তাঁহার রাজ্য এখন পঞ্চ সেনাপতিদের বংশধরদের হাতে। সেই সব
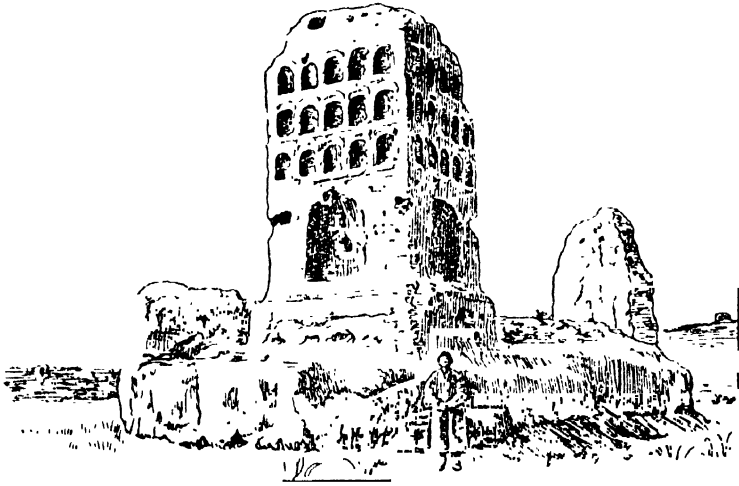
স্তূপ। ছোট ছোট কুলুঙ্গিগুলি এককালে সুসজ্জিত থাকিত।

রাজ্যে গেল এই কাষায় বস্ত্র পরিহিত দূতেরা—নিঃসম্বল। মিশর, মবিদান, সিরিয়া, বক্ত্রিয়ার অধিপতিদের দেশে। সেই আনন্দে তিনি লিখিলেন তাঁহার গিরিলিপিতে—ধর্ম-বিজয়কেই তিনি প্রধানতম বিজয় মনে করেন। "এইরূপেই যে-বিজয় হইতেছে সেই বিজয়ই বাস্তবিক প্রীতিপ্রদ।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "আমার পুত্র, পৌত্রগণ নূতন দেশ জয় বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন না; যদি কখনো তাহারা দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শমতা ও নম্রতায় আনন্দ অনুভব করিবে। আরও তাহারা ধর্ম বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করিবে।"

ইহাই হইল ভারতের ধর্ম বিজয়ের প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক দিক হইতে গ্রীক্ রাজ্যে অশোকের ভিক্ষুপ্রেরণের ফলে বৌদ্ধধর্ম কতদূর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। হয় ত' তখনই তেমন ফল হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল মধ্য-এশিয়ায়। মধ্য-এশিয়ার সহিত ভারতের যোগ কত দিনের তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। বাণিজ্যসম্ভার লইয়া মানুষ যে কোন আদিম যুগে পাহাড়ী নদীর পথ বাহিয়া, গিরিসঙ্কট ধরিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে সুরু করিয়াছে তাহার ইতিহাস কেহ বলিতে পারে না। তেমনি ধারা পথ ধরিয়া পাঞ্জাবের হিন্দুরা মধ্যএশিয়ার যাযাবরদের সহিত বাণিজ্য করিত; সীমান্ত-প্রদেশে তক্ষশিলা ছিল সেই বণিকদের বড় রকম কেন্দ্র। বৌদ্ধ জাতকে এই নগরীর সম্বন্ধীয় বিস্তর প্রমাণ পাই। সে প্রমাণগুলি যে নিতান্ত কবিচিত্ত হইতে উদ্ভূত তা' নয়—তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে মার্শাল্ সাহেবের খননকার্য্য হইতে। নগরীর লোকেরা করিল ষড়যন্ত্র অশোকের প্রিয় পুত্র কুণালের বিরুদ্ধে। অশোকের দুর্ভাগ্য—তাই মহিষী তিষ্য-রক্ষিতা গেলেন স্বামীর বিরুদ্ধে; তিনি সম্রাটের সহধর্ম্মিণী হইলেন না; তাঁহারই ক্রোধাগ্নিতে বুদ্ধদেবের সাধনার ক্ষেত্র বোধি-দ্রুম ভস্মীভূত হইয়াছিল; তাঁহারই চক্রান্তে কনিষ্ঠ পুত্র কুণাল অন্ধ হইল এই তক্ষশিলা নগরীতে। এই রাজদ্রোহের শাস্তি অশোক দিলেন নগরীর অনেক লোককে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া। লোকে নির্ব্বাসনে গেল খোটানে; হিন্দু উপনিবেশের ইহাই প্রাচীনতম কিম্বদন্তী। খোটানের কথা আমরা অন্যবার বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।
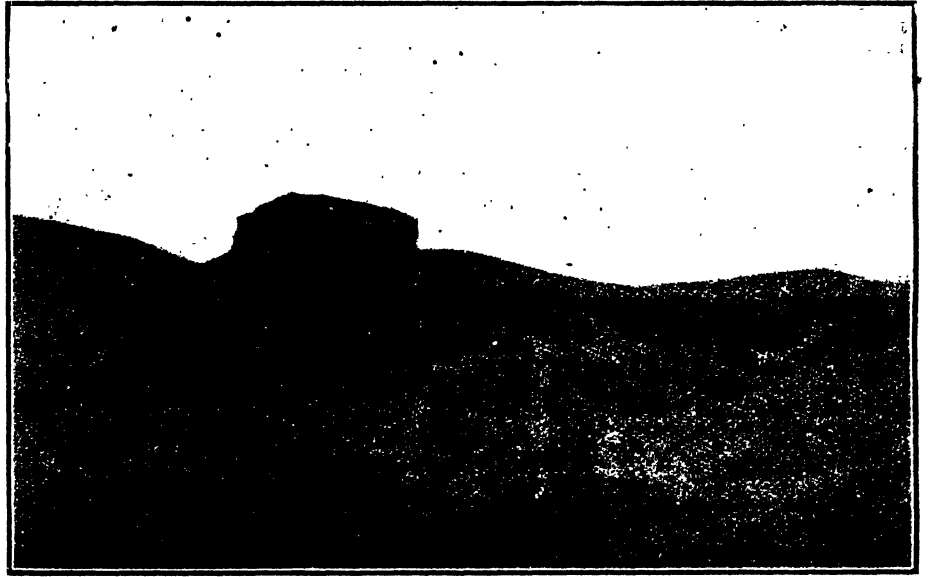
ভগ্ন স্তূপের ছবি

মধ্য-এশিয়া হইল বহুজাতির মিলনভূমি বহু জাতির বিচিত্র সৃষ্টির সঙ্গমস্থল। সে-যুগে মধ্য-এশিয়ার প্রধান বাসিন্দা ছিল আর্য্য (ইংরাজী)-ভাষাভাষী জাতিরা। আর তা'র আশে পাশে ছিল অন্য জাতি, পূর্বে চীন, দক্ষিণে তিব্বতী, দূরে উত্তরে তুর্কী। মাঝখানে তাকলামাকাল মরুভূমি, উভয় দিকে মরূদ্যানের সারি দূরে দূরে অবস্থিত, এক একটি এক এক সভ্যতার কেন্দ্র। কাহারও সহিত কাহারও রাজনৈতিক যোগ ছিল না; এত কাছাকাছি বাস করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সত্তা বজায় রাখিয়াছিল—নিজ নিজ

ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল; প্রত্যেকের কৃষ্টির মধ্যে যেন সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিচিত্র জাতি-উপবিষ্ট মরুস্থানগুলির প্রতি সকল প্রবল জাতির দৃষ্টি ছিল, যে যখন পাইত সুযোগ বুঝিয়া গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত। এ বিষয়ে চীনাদের চেষ্টা সব প্রথম। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে তাহাদের চেষ্টা হয় এই মরুরাজ্যজয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এদেশ। আবেল্ রেমুসা (Abel Remuset) খোটানের ইতিহাস উদ্ধার করেন; তারপর তিব্বতী ইতিহাসের যে তর্জ্জমা রকহিল সাহেব ও শরৎচন্দ্র দাস প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। ষ্টাইন (Stein) সাহেবই আমাদের কাছে এই লুপ্ত সভ্যতার বিস্তৃত ইতিহাস মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখাইয়া দিলেন। বুদ্ধের ধর্ম সে দেশে

খোটানের নিকটে মঠে গণেশের মূর্ত্তি

চঙ্ কি'এন দশ বৎসর কাল এই সকল জাতির মধ্যে বাস করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। চীনা ইতিহাসে চঙ্-কি'এনের নাম গৌরবে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর মধ্যে ইনিই বোধহয় সর্বপ্রথম পর্যাটক—যাঁর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এই সব মরুস্থানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে খোটান; খোটান যে এককালে হিন্দু সভ্যতার বড় কেন্দ্র ছিল সে কথা আমরা বিশ বৎসর পূর্বে জানিয়াছি। চীনা ইতিহাস হইতে কিভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল সে আলোচনা আমরা বিস্তৃতভাবে করিব। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মও সে দেশে গিয়াছিল, সে প্রমাণও দুর্লভ নহে। পুরাতন মঠের মধ্যে যে-সব প্রাচীর-চিত্র আছে তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ, কিন্তু কয়েকখানি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু, যেমন মহাদেবের ছবিখানি; মহাদেব, ভগবতী, নন্দী, বৃষ সকলই উপস্থিত। এ যেন আমাদের পটের ছবি। তারপর গণেশ; অতি পরিচিত আকৃতি। আমরা একটু পরেই দেখিব যে খোটানের নিকটেই ভারতীয়

হিন্দুদের প্রকাণ্ড রাজ্য ছিল। এ কথা ভাবা অন্যায় হইবে যে খোটান বা তাহার নিকটস্থ মরূস্থানগুলিতে কেবল ইরাণী আর্য্য বা শকদেরই বাস ছিল; হিন্দু উপনিবেশ পাকা রকমের ছিল; রাজ্যও ছিল হিন্দুদের। একটা কথা বলিয়া রাখি। মধ্য-এশিয়ার মরূস্থানগুলিতে আমরা যে কয়টি ভাষা পাই সবগুলিই হইতেছে আর্য্যভাষা; তবে তুখার (Tokhavian) ভাষা হইতেছে আর্য্য ভাষার খুব পুরাণের স্তরের ভাষা; খোটানের শকভাষা ইরাণী ভাষার অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা পরে ত করিব—এখন সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখি যে মধ্য-এশিয়ার আর্য্য ইরাণী ভাষা ছাড়াও সংস্কৃতজ ভাষার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে পণ্ডিতেরা প্রাকৃত বলিয়াছেন। অনেকে মনে করেন এই প্রাকৃতভাষা গান্ধার তক্ষশিলা প্রভৃতির প্রাকৃত বা সেই যুগের কোনো কথ্য ভাষার

খোটানের প্রাচীর-চিত্রে মহাদেব, ভগবতী, নন্দী, সকলেই আছেন।

লেখ্য-সংস্করণ। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; আবিষ্কারক ষ্টাইন—১৯০১ সালে এক দফা, ১৯০৭ সালে আর এক দফা। খোটানের কাছে নিয়া নামে এক নদী; সেই নিয়া-নদীর ধারে বিস্তৃত প্রাচীন নগরের ধ্বংসের মধ্যে প্রাকৃত ভাষার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। বালি-চাপা-পড়া বাড়ী, দপ্তরখানা, ও চলা-ফেলা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে লেখা পাওয়া গিয়াছে। লেখাগুলির ভাষা প্রাকৃত, কিন্তু লিপি হইতেছে খরোষ্ঠী। খেরোষ্ঠীলিপি পণ্ডিতগণ পূর্বেই জানিতেন; উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি অশোক-লিপির অক্ষর হইতেছে খরোষ্ঠী; তা' ছাড়া গ্রীক-খরোষ্ঠী লেখা বিস্তর মুদ্রা ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খরোষ্ঠী লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়—যেমন আরবী ফার্সী। বর্ণমালা সংস্কৃতের অনুরূপ অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত হইত; অন্য ভাষা খরোষ্ঠীতে লিখিত হইত কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। খরোষ্ঠী সম্বন্ধে সব থেকে বড় আবিষ্কার হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে; Dutrenil de Rhins নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পর্য্যটক খোটানের কাছে কোনো স্থানে প্রাকৃত ধম্মপদের একটা পুঁথির কিয়দংশ পান। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Senart তাহা প্রথম প্রকাশ করেন ফরাসী কাগজ জুর্ণাল আসিয়াটিকে। পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব একটা সাড়া পড়িয়া গেল এই ধম্মপদ লইয়া,—বিশেষ করিয়া উহার ভাষা লইয়া; জার্ম্মাণ ও ফরাসী অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেমন করিয়া প্রাকৃত ভাষায় এই গ্রন্থ মধ্য এশিয়ায় গেল সে প্রশ্নের মীমাংসা তখন হইল না। সে-মীমাংসা হইল ১৯০১ সালে ষ্টাইন-আবিষ্কৃত নিয়া নদীর তীরস্থ রাজ্যের খরোষ্ঠী-লেখ হইতে। বহুশত খরোষ্ঠী-লিপি ও প্রাকৃতভাষা-লিখিত লেখ। এই লেখ-গুলিতে মোটামুটিভাবে কি আছে তাহাই আমরা এইখানে নির্দেশ করিলে হিন্দু সভ্যতা বিস্তারের একটা বড় অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইবে। খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতকের মধ্যে এই হিন্দু উপনিবেশ নিয়া তীরে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল।

প্রকৃত লেখগুলি অধিকাংশই হইতেছে দলিল, পত্র ও তজ্জাতীয় বিষয়। লেখের উপাদান প্রধানতঃ কাষ্ঠফলক ও চর্ম। বিস্তৃত চর্মের উপর যে দলিলগুলি লিখিত সেগুলি খুব সতর্কতার সহিত ভাঁজ করা; ফলে ভিতরে লেখা সুস্পষ্ট আছে। পুঁথির মত করিয়া দলিলগুলি চামড়ার দড়ি দিয়া বাঁধা। গাঁঠের উপর একটা শীলমোহর; দলিল বা লেখ বলিয়া এত সাবধানতা, পাছে কেহ খোলে। কাঠের ফলকের উপরে যে-সব দলিল লেখা—সে-ফলক দুই তিন রকম আছে; কতকগুলি চোকা (oblong), কতকগুলি কীলকাকৃতি। একটা বিশেষ জিনিষ দ্রষ্টব্য; পূর্বোল্লিখিত শীলমোহরের মধ্যে কয়েকটি গ্রীক দেব দেবীর শীল, কতক-গুলি আবার চীনা। এই সামান্য ঘটনা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই রাজ্যের হিন্দু বণিকেরা পশ্চিমে গ্রীক ও পূর্বে চীনদের সহিত বাণিজ্য করিত; বাণিজ্যকালে সংগৃহীত মুদ্রা বা শীলই ক্রমে শীল-মোহরের কাজ করিল। গ্রীক্ মূর্ত্তিগুলি দ্বিতীয় শতাব্দীর খোদাই।

ষ্টাইন আবিষ্কৃত খরোষ্টি-প্রাকৃত লেখগুলি ইংরাজ পণ্ডিত র‍্যাপসন্ ও ফরাসী সেনার ও বোয়ের (Senart ও Boyer) সম্পাদন করিয়াছেন; গ্রন্থটি ভারত সচিবের আজ্ঞায় অক্সফোর্ড প্রেসে ছাপা হইয়াছে। এই লেখগুলির প্রাকৃত ভাষার সহিত প্রাকৃত ধম্মপদের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে লেখগুলির মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। তবে এই সংস্কৃত বয়াত বিশেষভাবে দেখা যায় চিঠি পত্রের মধ্যে। লেখগুলি সাধারণত দলিল, চিঠি পত্র, ছাড়পত্র (passport), নানাবিধ সরকারী দপ্তরের ও শাসনের কাগজপত্র; কোনোটি আদেশ—'লিবিস্তরেন অনদিলেখ' অর্থাৎ সংস্কৃতে লিপিবিস্তরেণ আজ্ঞপ্তিলেখ। একটি হইতেছে রাজকীয় কাজকর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে উষ্ট্র ও পাইক দিবার জন্য আদেশ; আর একটি একটি লোকের আবেদন—সরকারী কাজে গিয়া তাহার যে খরচ হইয়াছে তাহাই সে হতভাগ্য চাহিতেছে অনেক কাকুতি করিয়া। আর একখানি হইতেছে কড়া হুকুম—কতকগুলি পলাতকের বিচার হইবে—অবিলম্বে তাহাদের হাজির করিতে হইবে। এইরূপ বহু লেখ। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে মধ্য-এশিয়ার

সন্তুষ্ট ছি -উপনিবেশে রাজা ও প্রজা কিরূপভাবে থাকিত রাজতিরাকখানি চিদ্রে পাই এই খরোষ্ঠী প্রাকৃত লেখ সমূহ খরোষ্ঠীর্তি

হয় যে ক্তগত চিঠিপত্র এই সব লেখার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। যেমন পথের মানুষ, ঘরের মানুষ, বাজারের মানুষ—খোটানেরই ছবি। তাহাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার দুই তাহা টুকরা; ছোট কথার চিঠি—দৈনন্দিন জীবনের মৃত্য। পড়িতে পড়িতে মরুস্থানের সেই লুপ্ত রাজ্যের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করি। ওগু চীনকর ও চোঝবো চীণ্যশস (Cojhbo Cinyasasa) তাহাদের প্রিয় ভ্রাতা চোঝবো ষংমসেনকে কোনো একটি অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া জানাইতেছে যে যদি সে সে-বিষয়ের একটা মীমাংসা না করে তাহা হইলে বিষয়টাকে হাতে লইতে হইবে এবং 'রয়দ্বরে' (রাজদ্বারে) চালান করিতে হইবে। কি বিষয় লইয়া তাহাদের বিবাদ উল্লেখ নাই ও প্রিয় ভ্রাতা ষংমসেন কি করিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারি না। আর একখানি চিঠি—কাল কুষণসেন চোঝবো শিতকের সংবাদ না পাইয়া খুবই চিন্তিত। বারে বারে বিচিত্র ভাষায় তাহাকে তাহার কুশল সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। আজকালও চিঠি লেখার ভঙ্গি সেইরূপই; পত্রের মধ্য দিয়া আগ্রহ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে—পুনরুক্তির দোষে যতই দুষ্ট হোক ভাষা। অপর একখানি পত্রে শ্রমণ বংগসেন ও পোচ্গয়েস লিখিতেছেন তাঁহাদের প্রিয় বন্ধু নন্দসেন ও চতরোয়ের নিকট; এ পত্রে শ্রমণেরা বন্ধুদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য জানিবার জন্য ব্যাকুল; শেষে কাহার মৃত্যু সংবাদে ঘোরতর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

এই শ্রেণীর পত্র আরও আছে। পত্রে ও লেখের মধ্যে আমরা অনেক নাম পাই; নামগুলি খুব বিচিত্র; নামের কতকগুলি সম্পূর্ণ হিন্দু নাম, যেমন, ভীম, বংগসেন, নন্দসেন, ষমসেন, শিতক, উপজাব; কতকগুলি আধা হিন্দু নাম, যেমন, অংগচ, চুবয়লিন ফুম্মসেব, পিতেয়, গিলি, সংঘিল, সংজক, সোমজক, সুচম, সুঘিয়। কিন্তু কতকগুলি নাম
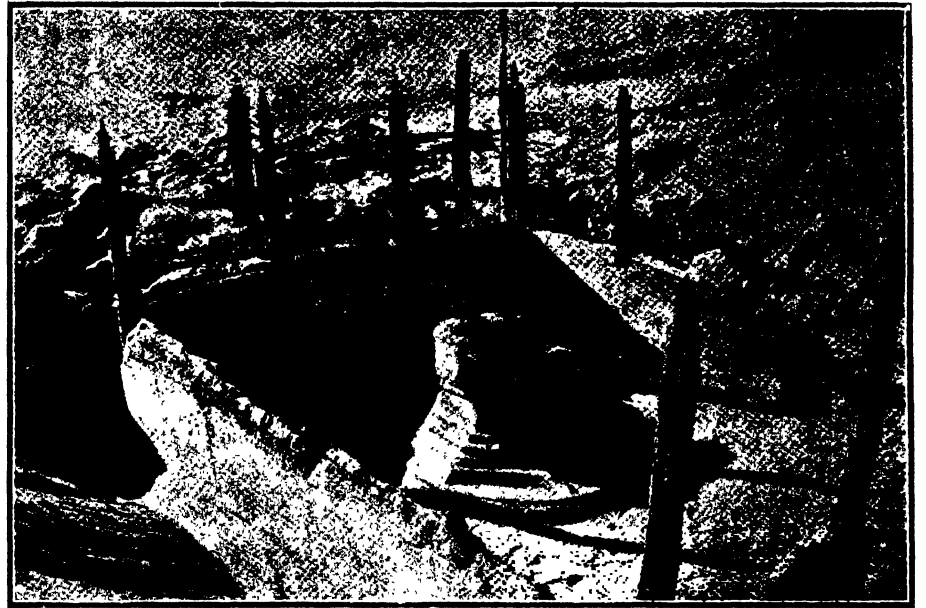
খননকার্য্য হইতেছে খোটানের মঠে। মন্দিরের ভিতরের ছবি—মধ্যখানে বেদী। চারিদিকে ভক্তেরা প্রদক্ষিণ করিতেন।

পুরা মধ্য-এশিয়ার—যেমন লিপেয়, ওপগেয়, লিমির, মঙ্গয়, ৎস্ময়। নানাজাতির মানুষ যে নিয়া নদীর তীরে এই হিন্দুরাজ্যে বাস করিত, তার নির্দেশ পাওয়া যায় এই নামের তালিকা হইতে। কয়েকটি নাম ত যেন স্পষ্টই ইরাণী।

এই সব খরোষ্ঠী-প্রাকৃত লেখগুলির মধ্যে অনেক রাজ-পুরুষের উপাধি পাওয়া যায়; উপাধিগুলি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-ভারত হইতে ঔপনিবেশিকগণ লইয়া গিয়াছিল। 'দিবির' দপ্তর খানার কেরাণী লেখ লিখিয়া থাকেন কাঠের ফলকে বা

চামড়ার উপরে। দপ্তরখানায় সরকারী কাগজের কপি থাকিত। তারপর 'লেখ-হারক' চলিত পত্র লইয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে। রাজকার্য্যের গোপন ব্যবহার চলিত 'চর' বা 'বরতে'র দ্বারা; রাজকার্য্যের সরকারী কাজ চলিত 'দুতিয়' (বা দূত) এর দ্বারা। বিচার হইত 'রয়দ্বার' পুরস্থিত-এর কাছে। কতকগুলি নাম অপরিচিত, তাঁদের কর্ত্তব্যও কি ঠিক বুঝা যায় না—যেমন চোঝবো, ষোঠংঘ, কল। দেশী ভাষায় এই উপাধিগুলি হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ রাখিয়াছিলেন।

এই অসংখ্য লেখের মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র রাজার নাম পাই। প্রায় প্রত্যেক সরকারী লেখের মধ্যে তিন জনের মধ্যে একজনের নাম পাওয়া যায়। রাজাদের সাধারণ উপাধি যাহা আমরা পাই তা সম্পূর্ণ ভারতীয় হিন্দু রাজাদের উপাধি, কেবল প্রাকৃত ভাষায় লেখা সংস্কৃতের বদলে—এই যা পার্থক্য; মহনুঅব [মহানুভব], মহরয় [মহারাজা] হইতেছে খুব সাধারণ উপাধি। কখনো পাই ভটরগ [ভট্টারক], মহরথভিরয় [মহারাজাতিরাজ], মহনুঅব-মহরয় [মহানুভব-মহারাজ], মহরজ, রজতিরজ [রাজতিরাজ]। উপাধিগুলি আমাদের খুবই পরিচিত; কুশল রাজগণ—যাঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের শিলালিপিতে আমরা এই সব উপাধি পাই, আবার অনেক ব্রাহ্মী লিপিতেও রাজাদের এই সব উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাই। কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন যে এই সব উপাধির দুই একটি ইরাণী উপাধির তর্জমা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে খরোষ্ঠী লেখমালায় আমরা তিনজন রাজার নাম পাই; প্রত্যেকের নামের পূর্ব্বে আছে 'জিতুঘ'—সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকথিত সম্মানসূচক বিশেষণগুলি। নিয়ার কাছে আবিষ্কৃত প্রায় সকল খরোষ্ঠীলেখেই 'জিতুঘ' বা 'জিতুংঘ' বা 'জিতুগ' পাওয়া যায়। এই সব লেখ হইতে আমরা যে-তিনটি নাম পাই—তাহা হইতেছে—বষমন, অঙ্কুগ, (অঙ্গুবক, অংগোক,) মহিরিয় (মৈরিয়, মহিরে, মৈরি)। আমরা নিম্নে দুটি লেখ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সম্বৎসরে ৪ ৩ মহনুঅব মহরয় জিতুঘ বষমন দেবপুত্রস মসে ৪ ২ দিবসে ১০ ৪ তম্ কালম্মি" অর্থাৎ মহারাজ জিতুঘ বষমন, দেবপুত্রের ৭ম বর্ষে, ৬ষ্ঠ ১৪শ দিবসে সেই সময়ে..."

আর একখানি লেখ—

"সম্বৎসরে ৪ ৩ ভট্টরগস মহনুঅব মহরয় চিটুঘি দেবপুত্রস মসে ৩ তিবসে ৪ ১ ইশ চুংনম্মি"...অর্থাৎ ভট্টর মহানুভব চিতুঘি মহিরিয় দেবপুত্রের ৭ম বর্ষের ৩য় ম. ৫ দিবসে" লেখখানি লিখিত হইয়াছিল।

এই নামগুলি লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে; ইঁহারা কোন বংশের ইতিহাসে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা ইত্যাদি বিষয় লইয়া। পণ্ডিতপ্রবর ষ্টেন কোনো (Sten Konow of Oslo University) এ বিষয়ে কিছু মতামত দিয়াছেন। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন দেখাইতে যে এই খরোষ্ঠী নামগুলি খোটানের রাজাদের নাম। চীনা ইতিহাসে তিনি এই নামগুলির আভাস পাইয়াছেন—এইরূপ অনুমান করেন। চীনা ইতিহাসে দেখা যায় যে খোটানে ১২৯ হইতে ১৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফা-ৎসিএন নামে এক রাজা ছিলেন। আর এক রাজা কিএন; কিএন (Kien) নিহত হন ১৫২ অব্দে। এই কি-এনের পুত্রের নাম অন-কুও। অন-কুও খোটানে ১৫২ হইতে ১৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ষ্টেন কোনো সাহেব Fartsien খরোষ্ঠ-লেখের রাজা বষমন ও চীনা An-kuoকে খরোষ্ঠী-লেখোল্লিখিত অংকবগ এর সহিত অভিন্ন করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহিরিয় ইঁহাদের পরে। লেখসমূহের মধ্যে কতকগুলি মহিরিয়ের ২৮ম বৎসরে লিখিত; সুতরাং তিনি ২১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন বলিয়া বোধ হয়।

লেখমালার মধ্যে মহারাজ মহিরিয় হইতেছেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজা; কারণ তাঁরই সময়ের বেশী লেখ। তা ছাড়া তাঁরই উপাধি দেখি মহারাজ রাজাধিরাজ; রাজাধিরাজ—এই উপাধি অন্য দুইজন গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে বষমন ও অংকবগ কোনো রাজচক্রবর্ত্তীকে ডরাইতেন—সেজন্য তাঁহারা কেবলমাত্র মহারাজা উপাধিতেই

সন্তুষ্ট ছিলেন। মহিরিয় সেই ভয় এড়াইয়া রাজাধিরাজ বা রাজতিরাজ (সাইনসাহী) উপাধি গ্রহণ করিলেন। খরোষ্ঠীলিপি ব্যবহার, ও রাজ-উপাধি সমূহ দেখিয়া মনে হয় যে এই রাজাদের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন মহারাজ কনিষ্ক। যেমন খুব সম্ভব ছিলেন মহারাজ কনিষ্কের সমসাময়িক; খোটান অঞ্চলে কনিষ্ক ১২৯ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তাহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তারপর—কনিষ্কের মৃত্যুর পর অংশুবক স্বাধীন হইলেন ও তাহার পরে মহিরিয় নিজেকে রাজাধিরাজ করিয়া প্রচার করিলেন। লেখমালা হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহিরিয়-এর সময়ে তাঁহার রাজ্যে মহাযান সম্প্রস্থিত চোঝবো ধর্ম্মসেন নামে জনৈক ভারতীয় ভিক্ষুক বাস করিতেছিলেন।

নিয়া নদীর তীরে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠী-প্রাকৃত লেখমালা হইতে এই হিন্দুরাজ্যের এই পর্য্যন্ত ইতিহাস জানিতে পারি। একটা কথা। ষ্টেন কোনো সাহেব এই রাজাদিগকে খোটানের রাজা বলিয়াছেন। কিন্তু খোটানের রাজাদের যে-ইতিহাস আমরা তিব্বতীতে পাই, তাহার মধ্যে এই রাজাদের নাম নাই। সেইজন্য অনুমান হয় যে নিয়ার এই লেখগুলি খোটানের নয় এগুলি অন্য একটি রাজ্যের।

অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য-এশিয়ার এই রাজ্যে খৃষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; সংস্কৃত ভাষার প্রভাব এই প্রাকৃতের উপর যথেষ্ট দেখা যায়। হিন্দুরাজাদের উপাধি ও রাজ্য পরিচালনার আদর্শ তদ্দেশীয় রাজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছিল। প্রাকৃত ভাষায় ও খরোষ্ঠীলিপিতে বৌদ্ধগ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল; তাহার একটিমাত্র নিদর্শন হইতেছে খণ্ডিত প্রাকৃত ধম্মপদ। অন্য গ্রন্থও হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই।

নিয়ার লেখমালার মধ্যে চীনা লেখপত্র পাওয়া গিয়াছে। একখানি চীনা লেখ ২৬৯ অব্দের—তখন চীনের সম্রাট Wu, Chin বংশের স্থাপয়িতা। রাজবংশের ইতিহাসে আছে যে 'পশ্চিম দেশসমূহে' সম্রাট বু-র প্রভাব বিস্তৃত হয়,—অর্থাৎ মধ্য-এশিয়াতে। খরোষ্ঠী ও চীনা লেখ ওঁচনা-গাদায় পাওয়া যায়। সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে দেশীয় রাজাদের পর এই রাজ্যটি চীনাদের হস্তগত হয়। এবং সেই হইতে চীনা লেখ ঐ দেশে রাজকার্য্যে প্রচলিত হয়। এইখানেই এই হিন্দু-উপনিবিশের ইতিহাসের উপর যবনিকা পড়িল।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

ব্যথার পূজা

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বন্ধুর জীবনের কাহিনী।

বন্ধুর আমার জীবনের সমাপ্তি হ'য়ে গেছে। সুদীর্ঘ তেরো বছরের অত্যুগ্র তপস্যার তাপে, যে বয়সে যৌবন বিদায় নেয় না সেই বয়সে বন্ধু পৃথিবী হ'তে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তার ব্যথার পূজা সমাপ্ত হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্নের জবাব আজ আর মিলবে না। জীবনের ওপারে, যেখানে দুঃখলেশহীন অফুরন্ত আনন্দ উৎসবের অপরিম্লান হাসিই শুধু ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে শুনতে পাই, সেখানে গিয়ে যদি তার দেখা পাই, তবে হয়ত এ প্রশ্নের জবাব পাব।

এক একটি অভিশপ্ত জীবনে এক একটি বিশিষ্টক্ষণে মরণের প্রলোভন কি দুর্জ্জয় হ'য়েই না দেখা দেয়। বেদনা বিকল প্রাণ দেহের বন্ধন কাটিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। জীবন হয় রসহীন, তিক্ত ; মরণ হয় মধুর। বন্ধুর জীবনে তেমনি একটি ক্ষণ এসেছিল। কিন্তু ইহজগতে থেকেই দিনের পর দিন স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠা বেদনার আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করবার আশায় মৃত্যুর সে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা সে জয় করেছিল। এ পারের ব্যর্থ সাধনায় ওপারের জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য সে বেঁচেছিল ব'লেই আজ এই কল্পনাতীত বেদনার্ত্ত কাহিনী বলবার সুযোগ আমি পেয়েছি ; না হ'লে কোথায় কবে এক দীর্ণ আত্মা অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিককে বরণ ক'রে নিত, নিখিল অন্তরে যার আনা-গোনা তিনি ছাড়া এতটুকু আভাসও হয়ত কেউ পেত না।

তার তপস্যার, তার সুতীব্র সাধনার সমাপ্তি হ'য়ে গেছে। গেছে যাক্। চোখে আমার জল আসে আসুক। বিরাম নেই, বিচ্যুতি নেই, ক্ষণিকের বিস্মৃতি নেই, সুদীর্ঘ তেরো বছরের প্রত্যেকটি অনুপল সে জ্বলেছে। অতল বিস্মৃতির অন্ধকারে তার বেদনা ঢাকা পড়ুক, স্বপ্নহীন চিরনিদ্রার কোলে তার দীর্ঘ হৃদয় অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকুক। তার কথা ভেবে চোখের জল ফেলি, কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কামনা সে বেঁচে থাকতেও ছিল না।

উচ্ছ্বাস থাক, ভাল লাগে না। বেদনার সমুদ্রের পরিচয় দিতে খানিকটা ফেনা তুলে দেখিয়ে লাভ নেই, লজ্জাও করে।

নাম জগদীশ,—জগদীশ মিত্র। ঢাকা সহরে আমাদের ছিল পাশাপাশি বাড়ী। কবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল, ভুলে গেছি। তার বাবা ছিলেন টাকার কুমীর না কি বলে তাই। তাদের রাজপ্রাসাদের পাশে আমাদের বাড়ীটা নিতান্ত খাপছাড়া দেখাত নিশ্চয়, কিন্তু কেন যে এই বাড়ীটা জগদীশের ভাল লেগেছিল সেই জানে। জন্মেই মাকে হারিয়েছিল, আমার মার কাছেই তার দিন এবং রাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটত। বাবা তার ছিলেন ভারি ভাল মানুষ। টাকার গদীতে ব'সেও যারা তুলোর গদী ছাড়া বসবার জন্য কিছু পায় না তাদের ছোট মনে করতেন না। জগদীশ যে আমার সঙ্গে মিশতো তাতে তাঁকে খুসী হ'তেই দেখেছি।

তেইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব জমাট বাঁধল, তারপর হ'ল ছাডাছাড়ি। এক সঙ্গে এম, এ পাশ ক'রে আমি চাকরি নিলাম এবং একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনের সঙ্গে বাকী জীবনটা গেঁথে ফেল্লাম। জগদীশ সে সব কিছু করল না, বাপের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে আউটরাম ঘাটে মস্ত জাহাজে চেপে বসল।

মনে পড়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কি পড়তে যাচ্ছিস রে ?

ছোঃ! পড়তে নয়, বেড়াতে। যাবি ?

বিয়ে ক'রে ফেল্লাম যে !

ওই তো দোষ! করলি কেন ? বৌদি অভিশাপ দেবে তাই, নইলে তোকে কি ফেলে যেতাম রে !

পূর্ব্ব হ'তেই স্থির ছিল বিদায়ের সময় কেউ মুখভার করতে পারব না। হাসি মুখেই কথা বলছিল, কিন্তু যখন আমার নেমে আসার সময় হ'ল চকিতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে তেইশ বছরের বন্ধু আমার কাঁদল!

যাবার সময় কাঁদল কিন্তু দু'বছরে চিঠি লিখল তিনখানা! জগদীশকে চিনতাম, চিঠিপত্র লেখা তার ধাতসই নয়।

জগদীশের বাবা ডেকে পাঠালেন। চিঠিপত্র পাও?

আজ্ঞে না। জানো তো চিঠি লিখতে ওর কত আলস্য। ভাবনা হচ্ছে যে হে! যে ছেলে! তার বাবা হ'য়ে একটু ভাবনাও হবে না?

বল্লাম, আজ্ঞে, এমনিই তো চিঠি লেখে না, তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

একটা টেলিগ্রাম করব কিনা ভাবছি। কোথায় আছে তাও কি ঠিক জানি ছাই! চরকির মত ঘুরছেই তো খালি। বৃদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেললেন।

বছর চারেক পরে ফিরল। ফিরবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, বাপের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে বাধ্য হ'য়ে এল।

তার আসার দিন পাঁচেক আগেই তার বাবা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধের পর মাস তিনেক বাড়ী থেকে কলকাতায় চ'লে গেল।

তারপর দশ বছর আর সাড়া শব্দ নেই। মাঝখানে কেবল খবর শুনলাম, সে তার সর্ব্বস্ব দান করেছে। অদ্ভুত দান! যা ছিল সব বিক্রি ক'রে গবর্ণমেণ্টের হাতে টাকা দিয়েছে, বাংলা থেকে প্রতি বৎসর দুটি মেয়েকে মিউজিক শিখবার জন্য বিলাতে পাঠাতে। যে বছর বাঙ্গালী মেয়ে পাওয়া যাবে না সে বছর ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের মেয়েরা ওই বৃত্তি পেতে পারবে।

দশ বছর পরে রাঁচি থেকে একটি পোষ্টকার্ড বন্ধুর বার্ত্তা বহন ক'রে আনল। বেঁচে থাকা চাই, কিছু টাকা চেয়েছে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না। রাঁচি সহর নয়, চিঠি লিখেছে একটা কটমটে নামযুক্ত গ্রাম থেকে। রাঁচির অভ্যন্তরে এক বিকট নামের এবং খুব সম্ভব নামের চেয়েও বিকটতর গ্রামে আমার বাল্যবন্ধুটি কি করছে, এতকাল পরে বেঁচে থাকার প্রয়োজন জানিয়ে সামান্য কটা টাকাই বা চেয়ে পাঠাল কেন অনেক ভেবেও প্রশ্ন দুটির জবাব পেলাম না।

সেইদিন রাত্রের এক্সপ্রেসে রওনা হ'লাম। রাঁচিতে এক বন্ধু থাকতেন, তিনিই খবর নিয়ে জানালেন গ্রামটি হুড্রু ফলস্ যেতে মোটরের শেষ ষ্টপেজ। এই গ্রামের পর মাইল দেড়েক হেঁটে ফল্স্-এ যেতে হয়।

তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে বার হলাম। ষোল মাইল ভাল এবং মাইল আষ্টেক খারাপ রাস্তা পার হ'য়ে গন্তব্য স্থানে যখন পৌছলাম তখন চারটে বাজে। শীতের বেলা, এরি মধ্যে রোদের তেজ ক'মে গেছে।

যেখানে মোটর থামল তার হাত কয়েক দূরে খড়ের ছাওয়া কতগুলি মাটির ঘর। মোটরের শব্দে কোমরে তিনহাত চটের মত মোটা কাপড় জড়ান জন পাঁচেক লোক ছুটে এল। নিজের একান্ত আধুনিকত্ব নিয়ে প্রকৃতির একেবারে অন্তর রাজ্যে প্রবেশ ক'রে মোটরটি বোধ হয় লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল, ড্রাইভারের ইঙ্গিত পাবা মাত্র নিঃশব্দ হ'য়ে গেল। আমার মনে হ'ল যে সভ্যতা ও আধুনিকতা চব্বিশ মাইল পিছনে ফেলে এসেছি তারই একটা অস্ফুট আওয়াজ কানে আসছিল, হঠাৎ সেটিও বন্ধ হ'য়ে গেল।

কিন্তু ও তো গেল কবিত্বের দিক। জগদীশ কি সত্যি এইখানে বাসা বেঁধেছে? ঠাট্টা করে নি তো? দশবছরের নীরবতার পর এমনি একটা পরিহাস করবে সেই বা কেমন কথা!

একটি লোককে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এখানে এক বাঙ্গালীবাবু আছে রে?

বংগালী বাবা? হঁ!

বাবু নয়, বাবা! সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে নাকি?

কোথায় থাকেন? ঘর চিনিস্?

কুটিরগুলির পিছনে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লোকটা সঙ্কেত করল।

তাকেই সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলাম। আনাচ কানাচ দিয়ে খানপাঁচেক ঘর পার হ'য়ে দেখা গেল অন্য কুটির থেকে

একটু তফাতে একখানা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে গিয়ে ডাকলাম, জগদীশ!

জগদীশ ভেতরে ছিল বাইরে এসে চমকে উঠল। এত দূরে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি একথা যেন কোনমতে সে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জগদীশই বটে। মানুষ বদলায়, তার নাম বদলায় না, নইলে জগদীশ ব'লে এর পরিচয় দিতে বাধত। আউটরাম ঘাটে চার বছর য়ুরোপ বাসের পর দামী বিলাতী পোষাক পরা যে লোকটি ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে সিগারেট চেপে ধ'রে অন্য কোণে সাহেবী হাসি ফুটিয়ে সজোরে আমার হাত ধ'রে নাড়া দিয়ে প্রীতি জানিয়েছিল, সে যদি জগদীশ, এই ময়লা চটে কোমর থেকে হাঁটু অবধি ঢেকে, খালি গায়ে খালি পায়ে একমাথা রুক্ষ চুল আর জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ দেহ নিয়ে যে লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে জগদীশ বলব কোনমুখে?

নীচে নেমে এসে আমার দুটি হাত চেপে ধ'রে বল্লে, স্বপ্নেও ভাবিনি তুই আসবি ভাই! এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভেতরে আয়।

সে না হয় যাচ্ছি, কিন্তু এ কি কাণ্ড বল তো? এখানে কি করছিস? এমন চেহারা হয়েছে কেন? কতদিন আছিস এখানে?

ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে বল্লে, বলব, ভেতরে আয়। পাতার কুটিরের প্রাসাদে চাটাইয়ের সিংহাসনে বসিয়ে আজ তোর অভ্যর্থনা করব। এত দিনে আমায় ভুলিসনি! এত দূরে ছুটে এসেছিস বন্ধুকে দেখতে!

হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে গেল। ছোট ঘর, হাত দশেক লম্বা, হাত আষ্টেক চওড়া। এককোণে কয়েকটা হাঁড়ি কলসী। একপাশে উনুন, তার কাছে মাটির বেদীর ওপর কালিমাখা গুটি দুই হাঁড়ি। একদিকে খাবার জলের কলসীর কাছে একটা এলুমিনমের গেলাস ছাড়া সমস্ত ঘরে ধাতব বাসন আর চোখে পড়ল না। অন্য পাশে খড়ের গদীতে চাটাই বিছানো,—জগদীশের রাজশয্যা! বালিশ নেই, বাড়তি এবং ছেঁড়া কাপড় মাথার কাছে পুঁটলি করা আছে।

এম্‌নি সব আসবাবের মাঝে নিতান্ত খাপছাড়া একটি অপূর্ব্ব আসবাব চোখে পড়ল। বিছানার পাশে, সিল্কের রুমাল ঢাকা দামী মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটি জল-চৌকী। তার ওপরে একটি চওড়া পাড় শাড়ী। শাড়ীটির জায়গায় জায়গায় লালচে দাগ, বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

ওটা কি রে?

যেন নিতান্ত বিস্মিত হয়েছে এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে জগদীশ বল্লে, অমন ক'রে বলছিস যে? বুঝ্‌তে পারছিস না? আমার স্ত্রীর কাপড়।

স্ত্রীর কাপড়! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলাম।

স্বপ্নের জড়তা কাটাতে মানুষ যেমন নিজের মাথায় ঝাঁকুনি দেয়, তেমনি ভাবে মাথাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জগদীশ যেন নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে নিল। লজ্জিত কণ্ঠে বল্লে, তুই যে জানিস না! খেয়াল ছিল না ভাই। সব বলব, তখন বুঝবি। তোর কাছে পয়সা আছে?

ব্যাগটা বার ক'রে তার হাতে দিলাম। একটা সিকি বার ক'রে জগদীশ ডাকল, জিরাই।

দরজার কাছে পাঁচ সাতজন লোক বসেছিল, একজন সাড়া দিল, আজ্ঞে বাবা?

কিছু দুধ আর কলা যোগাড় ক'রে নিয়ে আসতে হবে যে বাবা!

আমি হাঁ ক'রে জগদীশের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এ কী কণ্ঠস্বর! এ কী বলবার ভঙ্গি! ঠিক যেন প্রবীণা গৃহিণী। পরের ছেলেকে কাজে পাঠাবার সময় এমনি অননুকরণীয় কণ্ঠে তারাই অনুরোধ জানান বটে! সংসারের ছোট বড় ঝঞ্চাটে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে যারা, অথচ যাদের জীবনের সমস্তটুকুই নিহিত আছে ওই ঝঞ্চাট ভোগ করার মাঝে, তাদেরই শান্তি আর ক্লান্তির ছায়াপাতে অপূর্ব্ব মুখচ্ছবির এ কি অবিকল প্রতিলিপি আমার এই বাল্যবন্ধুটির মুখে ফুটে উঠল!

ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলছিল, দুধ কলা আর মোটা চিড়ার ফলার অমৃতের মত লাগল। বাইরে ছোট বারান্দার মত ছিল, জলযোগের পর সেইখানে গিয়ে বসলাম। তারপর

দুজনের যে সুখ দুঃখের গল্প চলল তার সঙ্গে এ কাহিনীর সম্বন্ধ নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শীতের সন্ধ্যা, তবু আমার মনে হ'ল এ সন্ধ্যারও যেন একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। আর সেই মাধুর্য্যের খোঁজ মেলে এমনি এক নির্জ্জন, নিঃশব্দ, সভ্যতার বাঁধন খসানো অখ্যাতনামা গ্রামে পাতার কুটিরে ছেলেবেলার বন্ধুর পাশে ব'সে। যতদূর দৃষ্টি চলে,—অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী। সবুজ আর সবুজ। সেই সবুজ গাঢ় হ'তে হ'তে সবুজের সীমা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে কালো হ'য়ে ওঠে।

জগদীশ হঠাৎ বল্লে, সহরে ফিরে যাবি ত?

এই চব্বিশ মাইল ফিরে যাব?

কিন্তু এখানে কি রাত কাটাতে পারবি ভাই, ভারি কষ্ট হবে?

বল্লাম, তুই যদি আজ ন বছর এখানে কাটাতে পেরে থাকিস, একটা রাত কাটাবার ক্ষমতা আমার হবে।

জগদীশ একটু ভেবে বল্লে, আমায় কিন্তু জিরাই-এর মেয়ে রেঁধে দিয়ে যায়, খাবি তো?

তুই খাস, আমি খাব না?

জগদীশের সঙ্কোচ তবু গেল না, ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে, বিছানা নেই, কিছু নেই—

বাধা দিয়ে বল্লাম, নেই তো নেই! এই চাটাইয়ে পাশা-পাশি শুয়ে দুই বন্ধুতে গল্প ক'রেই রাত কাটিয়ে দেব।

খানিক পরে জিরাই-এর মেয়ে হাজির হ'ল। আঁট সাঁট গড়ন, বিধাতা গায়ের রঙের দোষ পুষিয়েছেন অতিরিক্ত যৌবন দিয়ে। সরমকুন্ঠিত পদে জল আনতে চ'লে গেল। জল এনে মসলা বেটে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে অস্ফুটস্বরে কি বলল, বুঝতেই পারলাম না।

জগদীশ বল্লে, আচ্ছা যা। মাছ পাস্ তো আনিস।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চ'লে গেল।

জগদীশ বল্লে, আমি হলাম জিরাই-এর বাবা, সেই সূত্রে ওর দাদামশাই। তোকে দেখে আজ মুখ খুললো না অন্যদিন কত গল্পই করে। স্বামীটা পাঁড় মাতাল, দিন রাত খাড়ি গেলে আর ওকে ধ'রে মারে। কিন্তু মেয়েটা সেই মাতালটাকেই যে কি ভালবাসে ভাবলে অবাক হ'য়ে যাই। জাত অজাত মানে না, ভদ্র অভদ্র জানে না, মার্জ্জিত অমার্জ্জিত মনের খবর রাখে না, ভালবাসা বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাই ভাবি। অমন চেহারা, মাতালটাকে ছেড়ে যে-কোন ভাল লোককে বিয়ে করতে পারে, ওদের সমাজে তাতে দোষ নেই। সবাই উপদেশও দেয় তাই। ও শুনে ঘাড় নেড়ে বলে, করব। কিন্তু করে না। আমি একবার বলেছিলাম, জবাব দিয়েছিল, কি করব ভাইয়া, ওকে ছাড়তে মন কাঁদে! যে মারে, যে একতিল ভালবাসে না তাকে ছাড়তে মন কাঁদে! আশ্চর্য্য!—জগদীশ একটা নিশ্বাস ফেল্‌ল।

চাটাইয়ে পাশা পাশি শুয়ে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। জলচৌকীটির সামনে হাঁটু গেড়ে নিস্পন্দ হ'য়ে জগদীশ ব'সে আছে। তার সমস্ত মুখ আমার নজরে পড়চে না, যেটুকু পড়ল তাতে আমার বুকের ভেতর টন টন ক'রে উঠল। একবার জগদীশের সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নত ক'রে সে শাড়ীটিকে চুম্বন করল। সে কি চুম্বন! মনে হ'ল শাড়ীটির ভাঁজে ভাঁজে, প্রত্যেকটি সূতার পাকে পাকে সুধা সঞ্চিত হ'য়ে আছে, অধরের স্পর্শ দিয়ে অনন্তকাল জগদীশ সে সুধা পান ক'রে যাবে। কতক্ষণ পরে হিসাব ছিল না জগদীশ মাথা তুলল। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইতেই দেখলাম তার দু'চোখ জলে ভ'রে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে নিঃশব্দে প'ড়ে রইলাম। তার বুক ভাঙ্গা দুঃখের এমন অপূর্ব্ব প্রকাশের সাক্ষী হ'য়ে যে রইলাম, সে কথা গোপনই থাক।

নিজে থেকে যদি বলে, শুনব। যার যা বেদনার সম্পদ সে তার গোপন থাকাই শ্রেয়ঃ।

পরদিন অতি ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছর কাটিয়ে দেবার পর সেই দিন প্রথম অনুভব করলাম পাখীর ডাকে ঘুমভাঙ্গা জিনিষটা সত্যি সত্যি কী। কিচির মিচির প্রলাপ, কিন্তু কি মিষ্টি! যেন প্রভাতকে বরণ ক'রে নেবার বরণডালায় লক্ষ প্রাণীর প্রকাশব্যাকুল আনন্দ প্রদীপের শঙ্কিত শিখা!

ড্রাইভার এসে সেলাম জানিয়ে বল্লে, কখন ফিরবেন বাবু ?

বাহুল্য প্রশ্ন। আসল কথা, ভাল রকম সেলামীর ব্যবস্থা না করলে সে আর এই জঙ্গলে প'ড়ে থাকতে রাজী নয়। তাই করা গেল।

বেলা বাড়ল। জগদীশকে বল্লাম, ফল্‌স্ দেখে আসি চল্।

জগদীশ ঘাড় নেড়ে বল্লে, এখন নয়, বিকেলে।

প্রায় তিনটের সময় জগদীশ আমাকে ফল্‌স্ দেখাতে নিয়ে চল্‌ল। উঁচু নীচু বাঁকা পথ। কোথাও সর্ষে ক্ষেতের বুক ভেদ ক'রে গেছে, কোথাও ছোট বড় পাথরের টুকরো দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। অৰ্দ্ধেক পথে ছোট একটি নদী পড়ল। ঝরণাই; এরা বলে নদী। হেঁটেই পার হওয়া যায়। গোটা পনের মহিষ স্নান করছিল, সেই মহিষবাহিনীর সেনাপতিকে দেখে আমি হেসে ফেল্লাম। বছর পাঁচেকের একটা উলঙ্গ ছেলে সকলের বড় মহিষটার পিঠে গদীয়ান হ'য়ে তারস্বরে আদেশ জারি করছে। এই ধুম্‌সো কালো দৈত্যগুলিকে আগলাবার ভার পড়েছে এই পুঁচকে মানবসন্তানটির ওপরে! হাসির কথাই!

জলপ্রপাতের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে আসতে বুঝতে পারলাম, কাছে এসেছি। আরও কিছু দূর অগ্রসর হ'তে শব্দ বাড়ল এবং দেখা গেল পাথরে ঠাসা নদীগর্ভে জলস্রোত ব'য়ে চলেছে। শীতকাল, জল বেশী নেই।

জগদীশ আঙুল বাড়িয়ে বল্লে, ওই পাথরের ওপাশে চল, সেখানে চারশো ফিট নীচে এই জলের ধারা আছড়ে পড়ছে।

পাথরে পাথরে পা দিয়ে প্রপাতের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

নর্ম্মদার বিপুল জলরাশির বিপুলতম পতনের সৌন্দর্য্য দেখে এসেছি; আজ বুঝলাম বিপুলতাই সব নয়, সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র বৃহতের অপেক্ষা রাখে না। নর্ম্মদা সুন্দর, কিন্তু এই যে গুচ্ছ গুচ্ছ সৌন্দর্য্যের ফুল ফুটে আছে এখানে শ্যামসুন্দর রূপ তরুর শাখায়, এরও তো তুলনা বোধ হয় নেই! চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল, ওস্তাদ শিল্পী বটে! এ যেন ছবির মাঝে চঞ্চল জীবনের প্রকাশ। পাথর পড়ে না, পাহাড় নড়ে না, চতুর্দ্দিকের তরুশ্রেণীর শাখায় বাতাসের বেগে যে দোলা জাগে তাও চোখে ধরা পড়ে না, সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা নিশ্চল ছবি। তার মাঝে এই পাহাড়ী ঝরণা জীবন্ত, এর প্রাণ আছে, এ চঞ্চল। প্রতিমুহূর্ত্তে বিরামহীন গতিতে চারশো ফিট নীচে লাফিয়ে প'ড়ে নিজেকে চূর্ণ ক'রে শুভ্র কুহেলির জাল বুনে সূর্য্যকিরণের রশ্মি-বিশ্লেষণে অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়ে তুলছে!

পাশ দিয়ে ঘুরে নীচে নামলাম। নীচে থেকে সবটুকু জলধারা দৃষ্টিগোচর হয়। মুগ্ধ হ'য়ে দেখলাম। সূক্ষ্ম জলকণা ঝরণার প্রীতিস্পর্শ জানিয়ে দিল।

ওপরে যখন উঠলাম তখন চারটে বেজে গেছে এবং হাঁফ ধ'রে গেছে।

একপাশে প্রকাণ্ড একটি মসৃণ পাথর পড়েছিল। দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাত করেছে। বল্লাম, আয়, এই পাথরটাতে বসি।

অগ্রসর হ'তেই জগদীশ আমার হাত চেপে ধ'রে বল্লে, না।

চেয়ে দেখি তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

হাত ধ'রে সেই পাথরের পাশে অন্য একটা পাথরে বসিয়ে বল্লে, বলছি।

সেইখানে প্রপাতের একটানা ছন্দের সঙ্গে গলা মিশিয়ে সে তার কাহিনী ব'লে গেল।

২

তেইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ঘরের কোণে কাটিয়ে যখন বাইরে পা দিলাম তখন এই কথা ভেবে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে, মানুষ ঘরের কোণটা আঁকড়ে থাকে কি সুখে! কী সে বাইরের রূপ! দেশে দেশে প্রকৃতির নব নব রূপের বিকাশ, দেশে দেশে মানুষের বিভিন্ন, নিজস্ব, বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রাপ্রণালী। এই দুয়ে, প্রকৃতি আর মানুষে মিলে বাইরেটাকে কত রঙেই না রাঙ্গিয়েছে! রূপসী ধরণী! বিচিত্রা!

বাবা জানতেন পড়তে গেলাম। ছাই পড়া! আমি তখন মানুষকে পড়ছি। দেড়শো কোটি নরনারীকে

অনেকগুলি পরিচ্ছেদে ভাগ ক'রে ভগবান যে বইটি লিখেছেন সেই বইখানা পড়ছি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ আমায় কি শেখাবে?

মুক্তির উন্মাদনা, বাঁধন-ছেঁড়ার দৌড়ে চলা সে যে কি জিনিষ বলবার ভাষা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সৃষ্টি। মুক্তির আনন্দকে নিবিড়তর ক'রে তুলবার জন্য চারিদিকে কত বন্ধনই ছড়িয়ে আছে! নারী।

কি অদ্ভুত সৃষ্টি বিধাতার। পথ চলতে দেবে না। মনের আনন্দে জীবনের পথে গান গেয়ে চলেছ, শ্রান্তি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই, কণ্ঠে অপূর্ব্ব করুণা ফুটিয়ে বলবে, পথিক, বড় শ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম চাই না? এসো, তোমায় নতুন শক্তি দেব, নতুন পাথেয় দেব। দেয়। কিন্তু দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে পায়ে শিকল বাঁধে!

লিওনরার গণ্ডা চারেক আত্মীয় বন্ধু বল্লে, চলো চার্চ্চে।

ভারতবর্ষের রাজাদের ওপর ওদের একটা বিশ্রী লোভ আছে।

লিওনরার হাতে হাজার কয়েক টাকা গুঁজে দিতেই তার আত্মীয় বন্ধুরা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

নোটের তাড়া নিয়ে রুমালে চোখ ঢেকে লিওনরা বল্লে, বন্ধু, তুমি কি নিষ্ঠুর!

একটা তৃতীয় নেত্র হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল।

আমি তখন কনষ্টাণ্টিনোপলে। কলেজের আহমেদকে মনে পড়ে? তারই এক খুড়োর বাড়ীতে। ইচ্ছা ছিল ভদ্রলোকের বাড়ীতে দিন দুই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আফ্রিকাটা ঘুরে আসব। শুনেই খুড়োর মেয়েটি ঠোঁট উল্টালে। থেকে গেলাম।

দিন কুড়ি পরে খুড়োটি মুখ অন্ধকার ক'রে বল্লে, সাদি। গো।

গো আমি নিজেই করতাম; সেই দিনই বাবার অসুখের সংবাদ পেয়েছিলাম।

জগদীশ কতক্ষণ নিঃশব্দ থেকে ধীরে ধীরে বল্লে, আজ আমার একমাত্র সান্ত্বনা ভাই, আমার কথা তাদের মনে নেই। থাকেও না। তারা আমার যৌবনকে যে জাগরণে জাগিয়েছিল সেই জাগরণই আমার জীবনকে অভিশপ্ত ক'রে দিয়েছে। ওই দুটি নারী যদি প্রথম যৌবনে আমার অন্তরের ব্যাকুল কামনাকে অমন ক'রে উত্তেজিত ক'রে না তুলত তবে হয়ত আজ আমায় এমন ক'রে জ্বলতে হ'ত না। তারা আমায় ভুলেছে, তাদের যে ক্ষতি আমি করেছিলাম আমার ক্ষতির কাছে সে ক্ষতি তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। তবু, বিদায় নেবার কালে তাদের অনুচ্চারিত অভিশাপবাণী আজও এক এক সময় আমার নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আনে! যাক্।

জাহাজেই তাকে দেখি। মন ভারি খারাপ ছিল। ডেক চেয়ারে কাত হ'য়ে চোখ বুজে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিলাম। চোখ মেলেই দেখলাম, অদূরে রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে, আর একটু নামলেই সাগরের জলে ডুবে যাবে। পড়ন্ত সূর্য্যের সোনালী আভা তার মুখে এসে পড়েছে। চোখে আমার কি ভালই যে লাগল, পলক পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। আমার সমগ্র সত্তা মুগ্ধ হ'য়ে অপরিচিতা মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে রইল।

রূপ? রূপ বৈকি! দৃষ্টিকে সম্মোহিত ক'রে মনের ভেতরে যে জিনিষ অমন আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পারে তাই তো রূপ! সে বছর সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সেরা রূপসী ব'লে যে স্বীকৃত হয়েছিল তাকে দেখে এসেছিলাম; তার রূপের সঙ্গে এ রূপের এতটুকুও নৈকট্য নেই। সে রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, মুগ্ধ হয়েছিলাম, এবং চোখের আড়াল হ'তেই এক ঘণ্টার ভেতরে ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন সেই বাঙ্গালী তরুণীর রূপ দেখে মনে হয়েছিল, সে যেন আমারই অন্তরের আনন্দ-

প্রদীপের বিচ্ছিন্ন শিখা। এতকাল পরে হঠাৎ দেখা দিয়ে আনন্দের আলোকচ্ছটায় আমার অন্ধকার অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে!

সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন।

পশ্চিমের আকাশের গাঢ় রক্তবর্ণের শেষচিহ্নটুকু ঘনায়মান কালোর মাঝে লুপ্ত হ'য়ে গেল। জাহাজে আলো জ্ব'লে উঠল। ধীরে ধীরে সে চ'লে গেল।

পরদিন আলাপ হ'ল।

প্রথম দিন একাই দেখেছিলাম, পর দিন বিকালে ডেক্-এ এল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ডেক্-এ আর বাঙ্গালী ছিল না, ভদ্রলোক বার বার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। নীচু গলায় তরুণীকে কি বলায় স্পষ্ট বোঝা গেল সে আপত্তি করছে। কিন্তু তার আপত্তি করার মর্য্যাদা না রেখেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বল্লেন, আপনি নিশ্চয় বাঙ্গালী?

বাংলাতে বল্লাম, সন্দেহ আছে!

ভদ্রলোক ভারি খুসী। মাথা দুলিয়ে বল্লেন, ঠিক্, সন্দেহ থাকতেই পারে না, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যাবে কোথা! হা হা হা! সেই জন্যই তো যেচে আলাপ করা! বাঙ্গালী ব'লে চিনতে কি আর পারি নি? ও হ'ল যা হোক কিছু ব'লে কথা আরম্ভ করা। আপনি বিরক্ত হবেন ভেবে আমার মেয়ে তো আপত্তিই করছিল।

বিরক্ত হব! আপনারা বিরক্ত হবেন ভয়েই তো আমিও যেচে আলাপ করবার চেষ্টা করি নি!

ভদ্রলোক আরও খুসী। হাসতে হাসতে বল্লেন, ভাগ্যে আপনার বিরক্ত হবার রিস্কটুকু নিয়েছিলাম! না হ'লে এক জাহাজে থেকে বাঙ্গালী হ'য়েও পরস্পরের পরিচিত না হওয়ার কলঙ্ক থেকে যেত! আমিও হাসলাম।

নাম শুনলাম, অনন্তলাল সেন। কলকাতার এটর্ণি। পরিচয় ছিল না, নাম আগেই শুনেছিলাম।

বাবাকে চিনতেন, বিষয়সূত্রে পরিচয়। বাবার নাম শুনেই 'আপনি' থেকে একেবারে 'তুমি'তে নেমে গেলেন। দশবছরের ছেলের মত আমার পিঠ চাপড়ে সস্মিত মুখে বল্লেন, খাসা লোক তোমার বাবা। তাঁর ছেলেও যে তাঁরই মত খাসা হবে সন্দেহ নেই!

মনে মনে হাসলাম। না থাকে ভালই!

মিঃ সেন দেখলাম মনে প্রাণে নিতান্তই বাঙ্গালী। সাহেবের সঙ্গে হয়ত সাহেবী এটিকেট বজায় রেখেই আলাপ করেন, আমার সঙ্গে আলাপ করলেন একেবারে বাঙ্গালী প্রথায়। তখন আমি ভীষণ সাহেব, নকল কিনা, আসলকে ছাড়িয়ে উঠার চেষ্টা করছি! কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে এটিকেটের অভাব থাকলেও রাগ করতে পারলাম না। খুসীই হলাম।

চিত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন, ওর জন্যই এবার বিলাত ভ্রমণটা হ'য়ে গেল। মিউজিক শিখ্‌ছিল, এইবার ডিগ্রি পেয়েছে। আমার ছেলে শরৎ আইন পড়ছে, দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিল। তার পড়া শেষ হয়নি, কাজেই মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিজেকেই যেতে হ'ল। বিলাতে শিক্ষা পেলে কি হবে, বাঙ্গালীর মেয়ে তো! একা ফিরবার সাহসটুকু নেই।

চিত্রা সকোপে বল্লে, মিথ্যে নিন্দে করছ বাবা! আমি তো একাই ফিরব ঠিক করছিলাম, টেলিগ্রাম ক'রে বারণ করেছিল কে?

আমার নাম শুনেই চিত্রা যে চমকে উঠেছিল স্পষ্ট দেখেছিলাম। বিলাতে শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সে যেন কি রকম নার্ভাস হ'য়ে পড়ল। কি কারণে জানি না বরাবর দেখেছি মেয়েরা প্রথমটা আমাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বেশ বুঝি, আমার সঙ্গে পরিচয় না হ'লেই যেন তারা খুসী হত। একজন তো স্পষ্টই স্বীকার করেছিল, প্রথম দিন আপনাকে দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলাম মিঃ মিত্র!

সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বল তো?

কিছুতেই বলবে না, শেষে মুখ লাল ক'রে বলেছিল, কী জানি! আপনার এমন মিষ্টি স্বভাব, কিন্তু প্রথম দিন মনে হয়েছিল আপনার ভেতরে কি যেন আছে, আঘাত করবে!

ব্যাপারটা অনুভূতির, ওটা বরং বুঝতে পারি। কিন্তু আমার নাম শুনে চম্‌কাবার কি আছে ভেবে পেলাম না।

বল্লাম, কাল তো আপনাকে দেখিনি মিঃ সেন।

কাল ভয়ানক মাথা ধরেছিল। ওর মা তো কালকের সামান্য দোলানিতেই শয্যা নিয়েছেন।

মিসেস সেন সঙ্গে এসেছেন নাকি?

হ্যাঁ, ছাড়লেন না। বল্লেন, এই সুযোগে বিলাত দেখা না হ'লে আর হবে না।

চিত্রা বল্লে, ডেক্-এ খুব সম্ভব মাকে দেখতে পাবেন না মিঃ মিত্র। জাহাজ পোর্ট ছাড়ার পরেই শুয়েছেন, আবার পোর্টে জাহাজ পৌঁছলে উঠবেন।

আপনি কি পড়তে গিয়েছিলেন মিঃ মিত্র?

পড়তে নয়, বেড়াতে।

বেড়াতে! সত্যি? কোথায় কোথায় ঘুরলেন?

ঘুরেছি অনেক, আজ চার বছর ঐ কাজই তো করছি!

আমেরিকায় গিয়েছিলেন?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

চিত্রা মিঃ সেনের দিকে চেয়ে বল্লে, বাবাকে কত বল্লাম, চল বাবা ঘুরে আসি। আর কি আসা হবে!

সস্নেহ অভিযোগ। মৃদু অভিমানের ছায়ায় চিত্রার মুখখানি অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠল। মিঃ সেন কন্যার ডান হাতটি হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে সস্নেহে বললেন, সময় হ'ল না যে রে! আর তোর মা সঙ্গে রয়েছেন, অত ঝোরা কি তার পোষায়?

চিত্রা বল্লে, বুঝি ত! তবু—

মিঃ সেন বল্লেন, তবু দুঃখটা চেপে রাখতে পারি না। ভাবনা নেই রে, আমেরিকা তোর দেখা হবে। সেকালের রাজাদের মত আমিও না হয় একটা পণ ঠিক ক'রে দেব যে, বিয়ের পর আমার মেয়েকে আমেরিকা বেড়িয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করবে, তবে মেয়ের বিয়ে দেবো।

চিত্রার মুখের ওপর কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিল, বল্লে, যাও! তুমি বুঝি রাজা?

আরে রাজা হওয়া তো সোজা! তোর মত একটি রাজকন্যা মেয়ে থাকলেই হল।

৩

মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন হ'ল না, স্পষ্টই বুঝলাম চিত্রাকে আমার চাই। এ চাওয়ার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। রূপ হিসাবে সেই তুর্কী মেয়েটির কাছে চিত্রা হয়ত দাঁড়াতেও পারবে না, কিন্তু সে মেয়েটির রূপ ছিল শুদ্ধ দেহের সৌন্দর্য্য। অন্তরের ছায়াপাতে তার বাইরের রূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে নি। সে চেয়েছিল খেলা করতে, আমিও তাই। অন্তরের যোগ না থাকায় তাই তার অমন রূপও আমার অন্তরে রেখাপাত করতে পারেনি।

চিত্রার রূপের স্পর্শে আমার সেই জ্বালাভরা রূপ-পিপাসা তেমন ভাবে সাড়া দিল না। তাকে পাবার কামনা অপূর্ব্ব মধুর বেদনার রূপ নিয়ে আমার অন্তরে শু'য়ে গেল। প্রথম দর্শনে ভালবাসা কাব্যের কথা; সে সব কিছু নয়। কিন্তু কেমন যেন একটা নতুন রকম অনুভূতি। চিত্রাকে চাই, কিন্তু এতদিন যে ভাবে চেয়েছি সে ভাবে নয়। মনে হ'ল কোথায় যেন একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আমার এতদিনকার চাওয়া দিয়ে চিত্রাকে কামনা করা মাত্র সে কুঁড়িটি ঝলসে পুড়ে যাবে, ফুটবে না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত ডেক্-এ ব'সে নিজের অন্তরকে একবার বুঝবার প্রয়াস করলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে অনেক তারা। কোনটি শুধু চেয়ে আছে, যেন সে মহাশূন্যে চিরদিনের জন্য তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেছে তার সীমা কোথায় গিয়ে মিশেছে সে কথা ভেবে পলক হারিয়ে ফেলেছে। কোনটি চপল বিরাট আকাশের বিপুল গাম্ভীর্য্যের মাঝে থেকেও চোখ টিপে টিপে কেবলি ইসারা করছে!

নিজেকে বড় ছোট, বড় অপদার্থ মনে হ'তে লাগল। কেউ ব'লে দিল না কিন্তু অন্ধকারে ব'সে একটা অহেতুক বেদনার সঙ্গে আমার মনে হ'ল, অসংযত যৌবন যেন ধাপে ধাপে আমায় পশুত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জানি সবই, যৌবনের যত জয়গান, নর নারীর সম্পর্ক নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতের যত গভীর গবেষণা, বিশ্বসাহিত্যের নতুন প্রবাহে যৌবন বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব,—জানতে তো বাকী ছিল না কিছুই! যৌবন যখন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছিল তখন মনে প্রাণে বিশ্বাসও করেছি, পাপপুণ্য

মিথ্যা, নরনারী পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, তাদের মিলনকে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার সমাজ ধর্ম্ম কারুরই নেই! তখন জেনেছি, হিসাব ক'রে যৌবনকে খরচ করা ভয়ের পরিচয়, যৌবনের পঙ্গুতার লক্ষণ।

কিন্তু সেদিন অন্ধকার নিশীথে মনে হয়েছিল, তাই কি? অসংযত যৌবনের পরিচর্য্যা করা পশুধর্ম্মের কতটুকু ওপরে? দোষ না থাক, লক্ষ লক্ষ ঈশ্বরবিশ্বাসীর মতে যা অন্যায়, যা পাপ তা শুধু স্বভাবের নিয়ম হোক, বিজ্ঞান অঙ্ক ক'ষে স্থির করুক, প্রেম ভালবাসা সমস্তই সেই স্বভাবের চিরন্তন দাবীর রূপান্তর মাত্র, কিন্তু সেইটুকুই কি সব? তবে সেই স্বভাবের নিয়ম মেনেই যে দুটি নারীর সঙ্গে খেলা ক'রে এলাম তাদের কথা ভেবে আমার মনে এ আগুন জ্বলে কেন? সংস্কার? আজন্ম অভ্যস্ত ভাল মন্দের জ্ঞান? সেও তো স্বভাবেরই নিয়ম!

হায়রে, তখন তো বুঝিনি! দেহের যৌবনকে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম অস্ত্রে বিশ্লেষণ ক'রে যে সত্য আবিষ্কৃত হল, সে যে সত্য অস্বীকার করা চলবে না, কিন্তু সেই সত্যের মাপ-কাটিতে মনের যৌবনের বিচার করি কোন যুক্তিতে? বিকৃত যৌবন দেহের অণুতে পরমাণুতে যে অত্যুগ্র জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তারই জের টেনে চলি মনের দোর-গোড়া পর্য্যন্ত। সে যৌবন যতখানি জ্বলে, ধূমোদ্গার করে তার চেয়ে অনেক বেশী। সেই ধূমের স্পর্শে মনের শুদ্ধতম, শুভ্রতম শাশ্বত যৌবন মলিন হ'য়ে যায়। জ্ঞানের হাটে তখন তাকে দেহের যৌবনের সঙ্গে এক দামে বিক্রি করি! আমারি মতন সর্ব্বহারা দুঃখের মাঝে যারা যৌবনের স্নিগ্ধ-শান্ত কমনীয় মূর্ত্তির দেখা পেয়েছে, তাদের বুকে লুকিয়ে থেকে যৌবনের দেবতা মানুষের নির্দ্দয় লাঞ্ছনায় কাঁদে।

একটু চুপ ক'রে থেকে জগদীশ বল্লে, থাক গে। ও লাঞ্ছনার তো শেষ নেই, সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত সমভাবেই চ'লে আসছে।

জাহাজে চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ সে দেয় নি। স্পষ্ট বুঝতাম আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। আলাপ করত ভাসা ভাসা ভাবে, আন্তরিকতার পরিচয় পেতাম না।

জাহাজ যেদিন বোম্বে পৌঁছবে তার পূর্ব্ব দিন একটি ঘটনায় আমার প্রতি তার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। অন্ততঃ তার বাইরের ব্যবহারে অনেকটা আন্তরিকতা দেখা গেল।

সেদিন বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস বইতে আরম্ভ করল। সাগরের ঢেউয়ের মাতলামি বেড়ে যাওয়ায় জাহাজ অত্যন্ত দুলতে লাগল। মিঃ সেন সঙ্গে সঙ্গে শয্যা নিলেন। মিসেস সেন একটু সামলে নিয়েছিলেন, দুদিন ডেক্‌-এও এসেছিলেন, তিনি আবার কেবিনে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লেন। ডেক্‌-এ বায়ুসেবনকারীর সংখ্যা হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম ক'মে গেল।

চার বছরে কতবার সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি, প্রবল ঝড়ে উত্তাল সাগরের বুকে জাহাজের অত্যধিক রকমের বিশ্রী দোলায় কতবার দুলেছি, এতো তার কাছে ছেলে খেলা। কেবিনে বন্ধ থাকা আমার পোষায় না, রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাগর দোলায় দুলতে দুলতে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগলাম।

মিঃ মিত্র!

ফিরে দেখি, চিত্রা।

অবাক হ'য়ে বল্লাম, আপনি যে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? জাহাজের অর্দ্ধেক লোক শুয়েছে।

চিত্রা বল্লে, বাবাও শুয়েছেন। কি করা যায় বলুন তো?

করবার কিছু নেই। বাতাস কমলেই মিঃ সেন উঠে পড়বেন। কাল বোধ হয় পৌঁছে যাব।

কিন্তু আমারও যে মাথা ঘুরছে; আর গা বমি বমি করছে! কোন ওষুদ নেই?

বল্লাম, শুয়ে থাকাই সব চেয়ে ভাল ওষুদ। মাথা ঘুরছে যখন বিছানায় গিয়ে চুপ চাপ প'ড়ে থাকুন, আপনা হ'তে ক'মে যাবে।

ডেক্‌-এ বাতাসে বেড়ালে মাথা ধরাটা—হাতের রুমালের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রা দু'হাতে শাড়ীর আঁচলটা মুখে গুঁজে দিল। তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল।

বুঝলাম। বল্লাম, শীগগির আসুন আমার কেবিনে। ব'লে অগ্রসর হতেই চিত্রা আমার একটা হাত এক হাতে চেপে ধরল। পাকস্থলীর যে জিনিষগুলি বাইরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছিল, তাদের দমন ক'রে রাখতেই তার সবটুকু শক্তি ব্যয় হচ্ছে বুঝে আমি চিত্রার বাহুমূল ধ'রে নিয়ে চল্লাম।

চিত্রাদের কেবিন জাহাজের শেষ প্রান্তে, একটু দূরে। আমার কেবিন কাছেই, দরজা ঠেলে ভেতরে আসতেই চিত্রা মেঝেতে ব'সে পড়ল। এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় দমন ক'রে ছিল আর পারল না।

মুখে চোখে জল দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে হাত ধ'রে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। চিত্রা তখন থর থর ক'রে কাঁপছে। বয়কে ডেকে নেবু এনে কেটে দিলাম, নেবুর রসে বমি বমি ভাবটা কেটে যায়।

একটু সুস্থ হ'য়ে মাথা তুলে মেঝের দিকে চেয়ে চিত্রা বল্লে, ছি! ছি! কি করলাম! মেঝেটা নোংরা হ'য়ে গেল।

বল্লাম, কুণ্ঠিত হবেন না মিস সেন, ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। মেথরকে ডেকে দিতে ব'লে দিয়েছি। আর একটু নেবু খাবেন?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল। উত্তেজনায় তখনো তার দু'চোখ জলে পরিপূর্ণ। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বল্লে, আপনার কেবিনটা যদি কাছে না থাকত মিঃ মিত্র, অত লোকের মাঝে ওই কাণ্ডটি করলে লজ্জায় আমি ম'রেই যেতাম। আপনাকে যে কি ব'লে—

লজ্জা দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সে কাজটা না হয় পরেই করবেন। বমি বমি ভাবটা কমল?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল, একটুও না। গলাটা জ্বলছে। কি করব?

শিশুর মত অসহায় প্রশ্ন! দু'বছর বিলাতে কাটিয়েছে!

কি আবার করবেন? একটু শুয়ে থেকে উঠে কেবিনে চ'লে যাবেন।

উঠব কি ক'রে? দাঁড়ালেই এবার নাড়ী শুদ্ধ উঠে আসবে।

না না, কিছু হবে না। না হয় আপনি এখানেই থাকবেন, আমি অন্য বন্দোবস্ত ক'রে নেব।

আপনি বোধ হয় ভাবছেন মিঃ মিত্র, এরকম তো আজ অনেকের হয়েছে, আমার মত কেউ অস্থির হ'য়ে পড়েনি। সত্যি বলছি আমার মত বেশী কারো হয়নি। কি রকম যে লাগছে বলা যায় না। মনে হচ্ছে বিছানা ছেড়ে কোনদিন উঠতেই পারব না।

আগে আর হয় নি কিনা, তাই এরকম লাগছে। কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ব'লে সান্ত্বনা দিলাম।

মেথর এসে মেঝে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল।

চোখ বুজে চিত্রা কি ভাবল সেই জানে, খুব সম্ভব আমার কেবিনে বেশীক্ষণ থাকাটা লোকের চোখে বাজবে এ কথাটা তার হঠাৎ খেয়াল হ'ল। চোখ খুলে বল্লে, আমায় বরং কেবিনে দিয়ে আসুন।

আর একটু যাক্ না?

না, অনেকটা ভাল লাগছে, এই বেলা যাওয়া ভাল।

আমার একটা হাত চেপে ধ'রে মনের জোরে কম্পিত পা দুটিকে স্থির করবার চেষ্টা করতে করতে চিত্রা তার কেবিনে প্রবেশ করল।

ফিরে এসে আমি সেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

মনে হ'ল, এইটুকু সময়ের ভেতরে যেন বিছানার স্পর্শটুকু পর্য্যন্ত বদলে গেছে। উপাধানে মৃদু সুবাস, যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে যে কুন্তলের পরশ পেয়েছিল সেই স্পর্শের অতি মৃদু স্মৃতি। ঘরের বাতাসটি পর্য্যন্ত যেন চৈত্র রাতের দখিনার মাধুর্য্যে ভ'রে উঠেছে মনে হ'ল।

জগদীশ চুপ করল।

আমার কাছেই পাথরের ফাটলে একটি বনফুলের চারায় একটি মাত্র ফুল ফুটেছিল। পাথরের বুকে রসের সংবাদ চারাটি কি ক'রে পেয়েছিল সেই জানে, কিন্তু ভুল সংবাদ পায় নি। ফুল ফুটিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। ফুলটি তুলে নাকের কাছে ধরলাম। অস্পষ্ট সুবাস। নীল সাগরের বুকে গতিশীল জাহাজের কেবিনে, আমার বন্ধুর শয্যার উপাধানটি তার প্রিয়তমার কেশের যে মৃদু

গন্ধটি চুরি করে রেখেছিল যেন তারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি এই নাম-না-জানা ফুলটির বুকে ফুটে উঠেছে!

জগদীশ আবার বলতে আরম্ভ করল, বিকালের দিকে বাতাস ক'মে গেল। যাঁরা বিছানা নিয়েছিলেন তাঁরা একে একে শুকনো মুখ নিয়ে ডেকে এসে হাঁফ ছাড়লেন। মিঃ সেন, মিসেস সেন ও চিত্রা তিন জনেই এসে চেয়ার দখল ক'রে ব'সে পড়লেন।

হেসে প্রশ্ন করলাম, কেমন আছেন সব?

প্রত্যুত্তরে মিসেস সেন ক্ষীণ হাসি হাসলেন। মিঃ সেন বল্লেন, তুমি কিন্তু মহা ভাগ্যবান!

চিত্রা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

চিত্রা আর আমাকে এড়াবার চেষ্টা করল না। তার ব্যবহারে এতদিন যে ইচ্ছাকৃত আন্তরিকতার অভাব আমায় পীড়া দিচ্ছিল তার চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। মনে হ'ল, দুজনের পরিচয়ের মাঝখানে যে পর্দাটি ছিল সেদিনের জোর বাতাসে সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেল। বিশেষ কিছু নয়, যে কোন পরিচিতা মেয়ে আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করত, কিন্তু তার বিমুখতার ভাবটি কেটে গিয়ে আমাদের পরিচয় যে স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লাভ করল তাই আমার পরম সম্পদ ব'লে মনে হ'তে লাগল।

কলকাতায় বিদায় নেবার সময় মিঃ সেন ও মিসেস সেন কলকাতায় এলেই তাঁদের বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। চিত্রা শুধু বল্লে, আসবেন কিন্তু মিঃ মিত্র, ভুলবেন না।

আহ্বানের সুরটা আমার মনের পছন্দ হ'ল না। মনকে বোঝালাম, ওই যথেষ্ট।

বাড়ী ফিরে দেখলাম, বাবা নেই। তারপর মাস চারেকের কথা তুমি জান।

৪

বাড়ী ব'সে থাকতে ভাল লাগল না, হঠাৎ একদিন কলকাতা চ'লে গেলাম। চিত্রাদের বাড়ী যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। এবং ড্রইংরুমে সান্ধ্য মজলিস বসেছে।

চিত্রা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। মিসেস সেন ভারি খুসী।

চারমাস বাড়ীতেই ছিলেন নাকি মিঃ মিত্র?

হ্যাঁ।

চলুন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। ভয়ানক কাজ পড়েছে, আপিস ঘরেই প্রায় সময় থাকেন।

ঘরের বাইরে এসে বল্লাম, আপনার অনেক বন্ধু জুটেছে দেখছি।

হ্যাঁ। সব গুণীলোক। মিঃ রায়ের গান শুনলে অবাক হ'য়ে যাবেন।

মিঃ রায়? সকলের শেষে যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন?

হ্যাঁ। ভেতরে আসব বাবা?

ভিতরে মিঃ সেনের কণ্ঠ শোনা গেল, না না এসো না, তুমি এলেই মাথা গুলিয়ে দেবে।

চিত্রা হেসে বল্লে, মিঃ মিত্র এসেছেন বাবা।

মিঃ মিত্র? কোন মিঃ মিত্র? ললিতার বাবা? নাঃ, তুমি সব গোলমাল বাধিয়ে দিলে দেখছি! চলো যাচ্ছি।

চিত্রা আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বল্লে, কাজ করবার সময় বাবা বিশ্বসংসার ভুলে যান।

মিঃ সেন দরজা খুলে আমায় দেখে বল্লেন, আরে, তুমি! তুমি আবার মিষ্টার নাকি? বিদেশে যাই হোক, দেশে ও সব মিষ্টারের বালাই রেখো না হে! ব'লে সশব্দে হাসলেন।

চিত্রা হেসে বল্লে, তুমিও তো মিষ্টার বাবা।

এক কালে ছিলাম, এখন আর নাই। অনন্ত বাবু হ'তে ভারি ইচ্ছে, কিন্তু কর্মলি ছাড়ছে না! ব'লে আবার হাসলেন।

আমার আগমনে যে ভারি খুসী হয়েছেন এবং বিপর্য্যয় কাজের জন্য দুদণ্ড আমার সঙ্গে গল্প করতে পারছেন না ব'লে যে ভারি দুঃখিত হয়েছেন বার বার একথা প্রকাশ করতে করতে ঘরে ঢুকে মিঃ সেন নথিপত্রে ডুব দিলেন। আর একটা কাজ করলেন, পরদিন আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন।

ড্রইংরুমে ফিরবার পথে বল্লাম, আপনার বাবার সহজ ব্যবহার আমার এমন ভাল লাগে মিস্ সেন!

চিত্রা বল্লে, বাবা ঐরকম, যাকে স্নেহ করেন তার সঙ্গে ব্যবহারে এক বিন্দু এটিকেট মেনে চলেন না।

স্নেহ করেন! কথাটায় অত্যন্ত খুসী হ'য়ে উঠলাম।

সকলের মিলিত অনুরোধে চিত্রা গান ধরল। ইংরাজী গান। বার্ণস্‌এর মিষ্টি করুণ সুর।

গান শেষ হ'লে সকলে এমন সকলরব প্রশংসা আরম্ভ ক'রে দিলেন যে আমার অন্তরের সুর-প্রেমিক লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

জলধি রায় কেবল দেখলাম নীরব প্রশংসায় গানের প্রকৃত মর্য্যাদা দিলেন। আরও একটা জিনিষ দেখলাম, লোকটির চেহারা। বাঙ্গালা যুবকের যে গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মূর্ত্তির মত অমন চেহারা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বড় বড় ঢুটি চোখে অন্তরের কবি প্রাণ উঁকি মারছে। খদ্দরের পাঞ্জাবী আর চাদর মাত্র তার পরিধানে, কিন্তু মনে হয় লোকটা কত যত্নেই না বেশভূষা করেছে! স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। মাথার চুলে পর্য্যন্ত বৈশিষ্ট্যের ছাপ, যে ভাবে বিন্যাস করা আছে মনে হয় ঠিক সে ভাবে ছাড়া আর কোন উপায়েই বিন্যস্ত করা চলে না।

রায়ের দিকে চেয়ে চিত্রা বল্লে, আপনি তো প্রশংসা করলেন না জলধি বাবু?

মৃদু হেসে রায় বল্লে, প্রশংসা? এমন ভাল লাগছিল যে প্রশংসা করতে ভুলেই গিয়েছি, এটা কি কম প্রশংসা হ'ল?

চিত্রা হাসল। তা বটে, আপনার প্রশংসার অরিজিনালিটি আছে। মিঃ মিত্রকে আপনার গান শুনিয়ে দেবেন না জলধিবাবু? ব'লে আমার দিকে চাইল।

বল্লাম, এই মাত্র মিস সেনের কাছে আপনার গানের এমন প্রশংসা শুনেছি মিঃ রায়, যে আপনার গান না শোনার ক্ষতিটা বড় বেশী হবে ব'লে মনে হচ্ছে।

চিত্রা বল্লে, ইংরাজী নয় কিন্তু, বাংলা কিম্বা হিন্দী।

রায় বল্লে, তোমার ইংরাজী সুরে সবার কান ভ'রে আছে, একটা বাংলা গান গেয়ে সেটুকু কাটিয়ে দাও, তারপর না হয় মিঃ মিত্রের ছোট ক্ষতির অহেতুক ভয়টা বড় ক্ষতি দিয়ে মিটিয়ে দেব।

রায়ের তুমি সম্বোধনটা আমার কানে বাজল।

চিত্রা হেসে বল্লে, কি গাইব?

ফরমাস? আচ্ছা, এই লভিনু সঙ্গ তব।

কারণ কি বোঝা গেল না, রায়ের ফরমাস শুনে চিত্রার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল ও গানটা গাইতে তার বিশেষ আপত্তি আছে! ভারি বিস্ময় বোধ হ'ল।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে চিত্রা গাইল। কবির অন্তরে সুন্দরের সঙ্গলাভে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দসুধা সঞ্চিত হয়েছিল ছন্দে গাঁথা কথায় চারিদিকে সুরের মালা জড়িয়ে সেই আনন্দ বাইরে প্রকাশ করবার চেষ্টা শ্রবণে যেন মধুবর্ষণ ক'রে গেল।

রায় গাইল। হিন্দী গান। মিষ্টি গলা, গাইবার ভঙ্গি চমৎকার। রাগরাগিণীর জ্ঞান আমার খুব টনটনে নয়, কিন্তু মালকোষ ব'লেই চেনা চেনা ঠেকল। অনাড়ম্বর চেষ্টায় প্রকৃত সাধকের মত রায় গেয়ে গেল। আনন্দ পেলাম অনেকখানিই, কিন্তু গান যখন শেষ হ'ল তখন আমার মনে হ'ল কি রকম একটা অস্বস্তি সেই আনন্দের গলা টিপে ধরেছে।

চিত্রার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। অমন অনবদ্য সুর-সৃষ্টির গর্ব্বটা যেন তারই!

বাইরে তখন জ্যোৎস্নার বান ডেকে গিয়েছে। বাগচি প্রস্তাব করল, লনে গিয়ে চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না উপভোগ করা যাক্।

চিত্রা বল্লে; চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না! আপনি হাসালেন মিঃ বাগচি!

হাসালাম? কবি ছাড়া জ্যোৎস্নার উপভোগের এমন চমৎকার উপায় আর নেই মিস সেন।

সবাই হাসল।

মিসেস সেন বল্লেন, হিম লেগে তোমাদের অসুখ করবে। কার্ত্তিকের জ্যোৎস্না উপভোগের জন্য নয়।

বোস বল্লে, ডোণ্ট ইন্‌সাল্ট আওয়ার ইয়ং এজ্, মিসেস সেন!

লনে যেতে এক পাশে ফুলের বাগান। পথের ধারেই ছোট্ট একটি গোলাপ চারায় প্রকাণ্ড এক রক্ত গোলাপ ফুটে আছে দেখলাম। অন্য চারায় অজস্র ফুল কিন্তু সে চারাটির সম্পদ ঐ একটি। সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে নিঃসঙ্গ ফুটে আছে।

বল্লাম, ভারি সুন্দর ফুলটি তো! কতটুকু চারায় ফুটেছে!

চিত্রা থমকে দাঁড়াল।

ফুলটি তুলে নিয়ে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করল। তারপর রায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, আপনার গান আজ ভারি আনন্দ দিয়েছে জলধিবাবু, এই ফুলটি আমার হ'য়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

রায় হাত বাড়িয়ে ফুলটি নিয়ে অস্ফুটস্বরে কি বলল বোঝা গেল না। জ্যোৎস্নার দীপ্তি নিমেষে আমার চোখে ম্লান হ'য়ে গেল। জেলাসি নয়, ঈর্ষার জ্বালায় মাধুর্য্য আছে। অপমানের জ্বালায় জ্বলুনি ছাড়া আর কিছু নেই। জ্যোৎস্নালোকে চিত্রার অপূর্ব্ব সুন্দর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে কামনা করলাম, এই শরতের জ্যোৎস্না শ্রাবণের মেঘে ঢেকে দিক্। জ্যোৎস্না উঠবার কোন প্রয়োজন আজ নেই।

রায়ের হাতের গোলাপটির ওপর চোখ পড়ল, মনে হ'ল আমার সবটুকু রক্ত জমাট বেঁধে ওই ফুলটির সৃষ্টি হয়েছিল, আমার অন্তরের মালঞ্চ হ'তে চিত্রা সেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

এত গম্ভীর হ'য়ে পড়লেন যে আজ মিঃ মিত্র?

চমকে চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম। সব জিনিষের সীমা আছে, নারীর নিষ্ঠুরতার বোধ হয় সীমা নির্দ্দেশ করতে ঈশ্বরের ভুল হয়েছিল। এক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির হ'য়ে গেল। হেসে বল্লাম, জ্যোৎস্না দেখে ভাব লেগেছে, মিস সেন!

কিন্তু এদিকে চায়ের যে শীত লাগবার উপক্রম হ'ল!

অনাবশ্যক হাসি হেসে বল্লাম চা তুচ্ছ! এমন জ্যোৎস্না—রায়ের দিকে নজর পড়ল। তার মুখে হাসি নেই, মুখে বেদনার ছাপ। উপহারের গোলাপটি নাকের কাছে ধ'রে স্থির ম্লান দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সহানুভূতিভরা করুণ দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টি যে মানুষকে এতখানি লজ্জা দিতে পারে আর অপমান করতে পারে সেই দিনই প্রথম অনুভব করলাম। ইচ্ছে হ'তে লাগল চায়ের চামচ দিয়ে লোকটার বড় বড় চোখ দুটি উপড়ে আনি! কিন্তু হাসিমুখেই বল্লাম, মিঃ রায়, শুনলাম আপনি বাঁশী বাজাতে পারেন। আপনার গান শুনে যারা একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে, বাঁশী বাজিয়ে তাদের একেবারে আত্মহারা ক'রে দিন না? এমন জ্যোৎস্না, একটু বাজালে কৃতার্থ হব।

চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম, আঘাতটা ঠিক পৌঁচেছে কিনা!

চিত্রার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে রক্তশূন্য হ'য়ে গেল। বোঝা গেল, আমার সূক্ষ্মতম প্রহার তার অন্তর মাথা পেতে নিয়েছে। আর সূক্ষ্মতম ব'লে বেজেছেও বড় তীক্ষ্ণ হ'য়ে। রায় প্রশংসার প্রতিবাদ করল না, বিনয় প্রকাশের চেষ্টা করল না, শুধু বল্লে, বাঁশী তো এখানে নেই।

নেই? ও!

পরদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। মিঃ সেন দেখলাম সেদিন অন্য সকলকে একেবারে বাদ দিয়েছেন, নিমন্ত্রিত একা আমি।

বিনা ভূমিকায় ব'লে বসলাম, কাল রাত্রের গাড়ীতে পুরী যাচ্ছি মিঃ সেন। চিত্রা চমকে আমার মুখের দিকে চাইল।

মিসেস সেন ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে হাসি পেল। মিষ্টার সেন আর মিসেস সেনের মনোভাব তো আমার অজ্ঞাত ছিল না!

এমন হঠাৎ? মিসেস সেন বল্লেন।

হেসে বল্লাম, হঠাৎ নয়, বাড়ী থেকেই ঠিক ক'রে বার হয়েছিলাম। পুরীতে থাকব না, ঘুরে বেড়াব। পরের দেশ দেখতে চার বছর কাটিয়ে এলাম, নিজের দেশটা ভাল ক'রে দেখা উচিত।

কবে ফিরবে?

তার কোন ঠিক নেই। কোন প্রোগ্রাম করিনি। যেখানে ভাল লাগবে কিছুদিন থাকব। পাঁচ ছ' বছর তো লাগবেই!

পাঁচ ছ' বছর!

মৃদু হেসে বল্লাম, বাড়ী ব'সেই বা কি করব বলুন? দূরসম্পর্কীয় ছাড়া আত্মীয় কেউ নেই, তাদের কাছে থাকার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল লাগে।

মিষ্টার সেন বল্লেন, এ রকম ঘুরে ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে নাকি?

হেসে ইংরাজীতে বল্লাম, তাকি বলা যায়! There may be some one waiting to end my freedom! কি জানি কখন সে দুর্ভাগ্য হয় এই বেলা স্বাধীনতাটুকু ভোগ ক'রে নি!

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলাম।

চিত্রা ততক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এবার কিছু বলা কর্ত্তব্য মনে ক'রেই বোধ হয় বল্লে, পুরী কেন? সমুদ্র তো আপনার দেখা আছে!

তা আছে, চার বছর সমুদ্রই দেখেছি। সে জন্য নয়। জগন্নাথের দিকেও বিশেষ টান নেই। একজন বন্ধুর অসুখ, কিছু টাকা চেয়েছে। ভাবছি, নিজে গিয়ে দেখে আসি। না হ'লে দিল্লি আগ্রার দিকে আগে যেতাম।

কথাটা সত্য। সকালে বন্ধুর চিঠি পেয়েছিলাম।

চিত্রা বল্লে, বন্ধুর কি অসুখ?

যক্ষ্মা।

যক্ষ্মা! তিন জনেই চমকে উঠলেন। চিত্রার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। কেন গেল সে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছা বা শক্তি দুয়েরই তখন অভাব। এখন? এখন সে চেষ্টা করতেও ব্যথা বোধ হয়।

ডিনারের পর মিনিট দশেক ব'সেই কাজের ছুতা ক'রে উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার সময় বল্লাম, যেখানেই থাকি, মিস্ সেনের শুভ পরিণয়ের সংবাদ পেলেই ছুটে আসব। চিত্রার বিবর্ণ মুখ একবার আরক্ত হ'য়েই ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল।

ওরিভোয়া! ব'লে বিদায় নিলাম।

৫

পুরী পৌঁছে বন্ধুর কাছে যাবার পথে মন্দির পড়ল। চোমাথায় গাড়ী যেতেই নেমে পড়লাম। মন্দিরে উঠে অভ্যন্তরের আবছা আলো আর প্রদীপের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দশ বছর বয়সের পর যা করিনি, হঠাৎ তাই ক'রে বসলাম। একেবারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে মনে মনে বল্লাম, তোমার প্রতি আমার ভক্তির যে নিতান্তই অভাব সেকথা তুমিও জান আমিও জানি। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা তো পেয়েছ, আমার একটুখানি ভক্তি দিয়ে তুমি কি করবে? যদি পার নিঃস্বার্থ ভাবেই এইটুকু দয়া কোরো ঠাকুর, তোমার সৃষ্টি এই অগ্নিশিখাগুলিকে আমার নয়ন পথের অন্তরালেই রেখো।

উঠে দাঁড়াতেই এক পাণ্ডা গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বল্লে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে বাবু।

তথাস্তু। পাণ্ডাটির মনস্কামনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ ক'রে দিলাম।

বন্ধু আমায় দেখে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেল্‌ল। অর্থাভাব এবং রোগের পীড়নে দেখ্‌লাম মরণের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

বন্ধুর ব্যবস্থা করতেই সমস্ত দিন কেটে গেল। সন্ধ্যার পরেই নিশ্চিন্ততার আরামে বহুকাল পরেই বোধ হয় বন্ধু সুস্থভাবে ঘুমিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ বাড়ীতে ব'সে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে গিয়ে ফ্ল্যাগষ্টাফের কাছে পাকা বাঁধানো একটি আসনে ব'সে পড়লাম।

সেইখানে ব'সে চিরবিচ্ছেদের বেদনা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরের এক অপূর্ব্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করলাম। চিত্রার রূপকে নয়, চিত্রাকেই আমি ভালবাসি! তীব্র বেদনার মাঝে এই সত্যের অনুভূতি আমায় খুসি ক'রে তুল্‌ল।

পূর্ণিমার লঘু শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রের সঙ্গে উর্ম্মিপাগল উচ্ছ্বসিত সাগরের অপরূপ মিলনের দিকে চেয়ে স্পষ্ট অনুভব করলাম পৃথিবীর তুচ্ছ সুখ দুঃখ মিলন বিচ্ছেদের বহু উর্দ্ধে আমি চ'লে গেছি। আমার পিছনেই কালো ইংরাজী অক্ষরে 'পুরী' লেখা বাড়ীটার মাথার ওপরে একটা আলো ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সঙ্কেত পাঠাতে লাগল। মনে হ'ল আমার অন্তর-সমুদ্রের কোনো তীরে তেমনি একটি মৃদু

আলো জ্ব'লে আমার দিক্‌হারা মনের সন্ধানে দিকে দিকে তার ক্ষীণ রশ্মিরেখার সঙ্কেত প্রেরণ করছে। পাগলের মত মন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ সেই সঙ্কেতের অস্পষ্ট অর্থ বোধ ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে সলাজ-শঙ্কিত-আনন্দের দৃষ্টিতে সেই আলোটির দিকে চেয়ে আছে।

ডাক্তার বল্লেন, পুরীতে উপকার হবে না।

বল্লাম, চলো বন্ধু, রাঁচি যাব তোমার সঙ্গে।

বন্ধু কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লে, ছোঁয়াচে রোগ—

তার একটা হাত চেপে ধ'রে বল্লাম, বন্ধুর কাছে বন্ধুর রোগ আবার ছোঁয়াচে হয় নাকি ?

কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে জল এল। হায় রে! ছলনার ভালবাসারও এত দাম।

লালপুরে বাড়ী ভাড়া করলাম। একমাস পরে বন্ধুটি ইহলোক ত্যাগ করল।

সকালে বাড়ীর সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে একটি সদ্য ফোটা লাল গোলাপের দিকে চেয়ে চিন্তা করছি পরদিনই পশ্চিমে পাড়ি জমাব কি না, চেনা গলার ডাক শুনলাম, মিঃ মিত্র!

চমকে চাইলাম। পাশের বাড়ীর বাগান আর আমার বাড়ীর বাগানের মাঝে শুধু একটি তারের বেড়া, সেই বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে চিত্রা!

বল্লে, কি আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য বটে! কবে এলেন আপনারা ?

কাল সকালে। আপনি ?

মাসখানেক এসেছি। মিষ্টার সেন, মিসেস সেন ভাল আছেন ?

মার ভারি অসুখ হয়েছিল। সেইজন্যই তো আমাদের আসা। বাবা ভাল আছেন। আসুন না আমাদের বাড়ী ?

আসব ? আচ্ছা।

ঘুরে দাঁড়াতেই নজরে প'ড়ল সেই গোলাপটি। তুলে নিয়ে এসে চিত্রার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম, হঠাৎ দেখা দিয়ে আপনি যে আনন্দ দিয়েছেন মিস সেন, এ ফুলটি আমার হ'য়ে সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

চিত্রার মুখ হাতের ফুলটির মতই লাল হ'য়ে ফুলটি নিয়ে সুবাস অনুভব করার ছলে মাথা নীচু কর্‌ল।

মিঃ সেন মহাখুসী। মিসেস সেন আরও। মিসেস সেনের চেহারা দেখেই বোঝা গেল কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন।

গল্প চল্‌ল।

মিসেস সেন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কতদিন থাকবে এখানে ?

চ'লে যাবার কথা ভাবছি শুনেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। আমরা এলাম অমনি তুমি চ'লে যাবে ? তাহ'লে আমাদের মনে হবে আমরা এসেছি ব'লেই তুমি চ'লে যাচ্ছ!

সবিনয়ে প্রতিবাদ কর্‌লাম। বল্‌লাম, আপনারা এসেছেন জানবার আগেই আমার অর্দ্ধেক জিনিসগোছান হ'য়ে গেছে!

চিত্রা হঠাৎ কি ভেবে বল্লে, কিছুদিন থেকে যান না মিঃ মিত্র ? কাজ তো নেই, দুদিন পরে বেড়াতে গেলে আর কি ক্ষতি হবে ? আপনি থাকলে বেশ আনন্দে দিন কাটবে।

বল্‌লাম, থাকব কি মিস্ সেন, আপনি কি আমায় থাকতে দেবেন ?

তার মানে ?

আপনি যদি আমায় মিঃ মিত্র ব'লে ডাকেন তাহ'লে কি ক'রে থাকি বলুন ?

চিত্রা হেসে বল্লে, আপনার পছন্দ নয় বুঝি ? কি ব'লে ডাকব তবে ? জগদীশ বাবু ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি আমায় মিস সেন মিস সেন করবেন আর আমি আপনাকে জগদীশ বাবু বল্‌ব, সে যে ভারি বিশ্রী শোনাবে! আপনি যদি আমায় চিত্রা বলেন, তাহ'লে রাজী আছি।

নাম ধ'রে ডাকলে চটবেন না ত ?

চিত্রা হেসে বল্লে, নাম ধ'রে ডাকলে চট্‌ব না, কিন্তু নাম ধ'রে ডেকে যদি আপনি ব'লে কথা কন তাহ'লে চটব!

মিসেস সেন সে বেলা তাদের ওখানে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

চিত্রা বল্লে, আমি নিজে রাঁধ্‌ব জগদীশ বাবু।

বাড়ী ফিরে মনে হ'ল, জীবনের পাত্রে সঞ্চিত সমস্তটুকু বেদনা এই ক'ঘণ্টায় উপে গিয়ে সেই শূন্য পাত্র অকস্মাৎ সুধাবর্ষণে পূর্ণ হ'য়ে গেছে।

বিচিত্র জীবন! বিচিত্র তার দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ!

সন্ধ্যার পর চিত্রা গান শোনাল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাদের ওখান থেকে ফিরলাম। জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক ভ'রে গেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে জ্যোৎস্নালোকে অদূরে আব্‌ছা মোরাবাদী পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম। বাইরের জ্যোৎস্না আমার অন্তরের জ্যোৎস্নার কাছে তখন ম্লান হ'য়ে গেছে!

ইজিচেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল, অন্ধকার নেই। ঠিক সামনে গাছপালার ওদিকে বুঝি সূর্য্য উঠবে, আকাশের গায়ে রঙের ছাপ পড়েছে। সোজা হ'য়ে ব'সে সিগারেট ধরালাম।

খুব ভোরে উঠেছেন যে! চিত্রা এসে দাঁড়াল।

বোসো। এখনো উঠি নি।

উঠেন নি মানে?

মানে, ঘুম ভেঙ্গেছে বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠা হয় নি!

এই চেয়ারটাতেই কাল বিছানার কাজ চালিয়েছিলেন বুঝি? বেশ লোক তো!

বললাম, ইচ্ছে ক'রে নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার স্নান পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে দেখছি!

সকালে স্নান না করলে আমার ভারি বিশ্রী লাগে। উঃ, আকাশটা কি রকম লাল হ'য়ে উঠ্‌ল দেখেছেন?

আকাশ নয়, আমি তখন চিত্রাকে দেখছি। ভেজা ফুলের মত মুখখানিতে না-ওঠা সূর্য্যের আভা লেগে যে সৌন্দর্য্য সেদিন জেগেছিল, দেখে মনে হয়েছিল কোন্ পুণ্যে আমার চোখ দুটির অতবড় সৌভাগ্য সম্ভব হ'ল! হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বার হ'য়ে গেল, তোমাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছে চিত্রা!

কবির চোখে কি না সুন্দর লাগে বলুন? বেড়াতে যাবেন?

চিত্রার সহজ কণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হ'ল। উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, চল।

ফিরবার সময় হঠাৎ চিত্রা প্রশ্ন করল, আপনার কি কোন অসুখ হয়েছিল?

না। কেন বল ত?

রোগা হ'য়ে গেছেন।

চিত্রা!

বলুন।

আমার একটা কথা রাখবে? আমাকে আপনি বোলো না।

চিত্রার মুখ গম্ভীর হ'ল। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে, কি যে বলেন! জগদীশ বাবু বলা চলতে পারে, তুমি বলা কি সম্ভব?

সম্ভব নয়?

আপনিই ভেবে দেখুন সম্ভব কিনা। রাগ করবেন না, বুঝে দেখুন।

না রাগ করব কেন?

চিত্রা একবার আমার মুখের দিকে চাইল, কিন্তু কিছু বল্‌ল না।

নিঃশব্দে বাকী পথটুকু অতিবাহিত হ'য়ে গেল।

গেট পার হ'য়ে বাগানের মাঝামাঝি গিয়েছি, চিত্রা ডাকল, জগদীশ বাবু দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম।

রাগ ক'রে আমাদের বাড়ী যাওয়া যেন বন্ধ করবেন না।

রাগ তো আমি করিনি। রাগের কি আছে?

না থাকলেই ভাল, ব'লে চিত্রা চ'লে গেল। যে কথা ব'লে গেল সে কথা বলতে সে যে আমায় দাঁড় করায়নি, সেটুকু বেশ বুঝতে পারলাম। বুঝে, হঠাৎ খুসী হ'য়ে উঠলাম। মূর্খ আমি, অন্ধ আমি, তাই!

স্থানীয় সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে বিলাতে পরিচয় হ'য়েছিল। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বিকালে এক রকম জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেলেন। যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে।

ফিরেই চিত্রাদের বাড়ী গেলাম। মিষ্টার সেন আর মিসেস সেন বেড়াতে গিয়ে ফেরেন নি। চিত্রা এক ইজিচেয়ারে চুপচাপ প'ড়ে আছে। বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

পায়ে কি হ'ল ?

মচকে গেছে।

কি ক'রে মচকাল ?

সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়েছিল। বসুন।

খুব ব্যথা হয়েছে ?

না সামান্য। মা বাবা দু জনেই বেড়িয়েছেন, একা একা এমন বিশ্রী লাগছিল! ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন, জগদীশ বাবু!

বাইরে চল, জ্যোৎস্নায় বসা যাবে। ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা।

মাথা নেড়ে চিত্রা বল্লে, পূর্ণিমা নয় চতুর্দ্দশী, এক কথা এখনো বাকী আছে। যেতে তো ইচ্ছে করছে, কি ক'রে যাই ?

সেও একটা কথা বটে! থাক্, পায়ে আবার লাগবে।

ডান হাতটি নিঃসঙ্কোচে বাড়িয়ে দিয়ে চিত্রা বল্লে, ধরুন, হাঁটতে পারি কি না দেখা যাক। এইটুকু তো।

হাত ধ'রে সন্তর্পণে চিত্রাকে দাঁড় করালাম। বাঁ পায়ের ওপর ভর দেবার চেষ্টা ক'রে বল্লে, উঁহুঁ, লাগছে। আর একটু স'রে আসুন, ভাল ক'রে ধরি।

স্পন্দিত বক্ষে কাছে স'রে গেলাম। চিত্রার শাড়ীর প্রান্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করল। তার কেশের সুবাস আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল। ডান হাতখানা আমার কাঁধে রেখে শরীরের সবটুকু ভার আমার ওপরে দিয়ে চিত্রা বল্লে, চলুন।

চলব ? কোথা চলব ? পায়ের নীচে তো মাটি ছিল না! বিশ্ব তখন লুপ্ত হ'য়ে গেছে, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে পাগলের মত নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিঃশেষে মুছে গিয়ে কালের মহাশূন্যে কেবল বর্ত্তমানের ক্ষণটি দুলছে! যুগযুগান্তের সঞ্চিত কামনার উষ্ণ নিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত সেই ক্ষণটি যেন আমার জন্মজন্মান্তরের সম্পদ,—অতীতকে মুছে নিয়ে, অসহ দ্যুতিময় তৃষ্ণা-যবনিকার অন্তরালে ভবিষ্যৎকে আড়াল ক'রে সেই ক্ষণটি যেন আমার কানে কানে মিনতি ক'রে গেল, নাও, নাও, এইবেলা যুগান্তের সঞ্চিত তৃষ্ণা মিটিয়ে নাও।

সংজ্ঞা ফিরতে দেখ্‌লাম আমার দুই বাহুর বেষ্টনে চিত্রা আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, আমি তার ওষ্ঠে গালে কপালে পাগলের মত চুম্বনের পর চুম্বনের রেখা মুদ্রিত ক'রে দিয়ে চলেছি।

চিত্রা যখন মুক্তি পেল তখন তার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হ'য়ে গেছে।

একটা চেয়ারের পিঠ চেপে ধ'রে সে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

চিত্রা!

যান্! চিত্রা খোলা দরজার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিল।

আমার—

Brute! Idiot!

আমার একটা কথা শোনো চিত্রা, তারপর তাড়িয়ে দাও, চ'লে যাব।

কথা ? যা বলবেন আমি জানি, শোনাবার দাবী ইচ্ছে ক'রে খুইয়েছেন। যান।

শুনবে না ?

না, না, না। একটা কথা মনে রাখবেন, আমি হিন্দুর মেয়ে, লিওনরা নই। আমি দাঁড়াতে পারছি না, পায়ে লাগছে।

৬

সেইদিন যদি আমাদের দুজনের অদৃষ্টে যে জট পাকিয়েছিল তার সব কটি পাক খুলে যেত! সেইদিনই যদি সব শেষ হ'য়ে যেত! আজ এ বেদনা হয়ত এমন কঠিন, এমন জ্বালাময়, এমন অসহ হ'ত না। দূরে থেকে দেখতাম তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে, আমার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে সে সুখী হয়েছে। আমার সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত লজ্জা, প্রিয়বিরহের সবটুকু বেদনা, ক্ষণিকের ভুলের জীবনব্যাপী অনুতাপ এ সকলই যাকে ভালবাসি সে সুখী হয়েছে এই সান্ত্বনার

কিরণসম্পাতে সহনীয় হ'য়ে উঠত। কিন্তু তখনো বাকী ছিল।

পরদিন সকালেই রাঁচি ত্যাগ করলাম।

আমার দুর্ভাগ্য, অমন একটা ঘটনার পরেও আমার আশাদীপ একেবারে নিভে গেল না। সব আশা তো মিটেছে, কিন্তু চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে প্রত্যেকটি ছোট বড় ঘটনা বার বার তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলাম. যদি কোন আশা এখনো থাকে! ক্ষীণ হোক আশা আছে, এ সান্ত্বনা ছাড়া যেন বেঁচে থাকাই অসম্ভব মনে হ'ল।

মুহূর্ত্তের ভুল। ওই ভুলটি না করলে চিত্রা একদিন আমার হ'ত। লিওনরার কথা জেনেও সে দিনের পর দিন আমার কাছে স'রে আস্‌ছিল। একদিন সত্যকার ভালবাসার দাবীতে আমার অতীতের দুর্ব্বলতার কথা ভুলে গিয়ে চিত্রা আমার হ'ত।

আমার হ'ত। মনে করতেও রক্তস্রোত যেন থেমে যাবার উপক্রম হ'ল। চিত্রা আমার হত, আমার! একমুহূর্ত্তে নিজের হাতে সে সম্ভাবনাকে অসম্ভবই হয়ত ক'রে দিয়ে এসেছি!

পনের দিন ধ'রে ভাবলাম আর জ্বললাম। তারপর মনস্থির হ'য়ে গেল। চিত্রার সঙ্গে একটিবার দেখা ক'রে অন্তরের সবটুকু তার সামনে ধ'রে দেব। যদি আমায় নিমেষের ভুলকে ক্ষমা ক'রে থাকে, চিরজীবনের মত শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষ ছেড়ে চ'লে যাব।

এই স্থির করার পর আমার মন হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম স্থৈর্য্য লাভ করল। আশা কেবলি আমায় কানে গুঞ্জন করতে লাগল, সে ক্ষমা করেছে।

উত্তেজনার মুখে সে যা বলেছে, সত্য নয়, তার অন্তরের কথা নয়। তার মন শান্ত হয়েছে, নিমেষের ভুলে যে সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে নেই একথা সে এখন বুঝেছে।

যদি অপমান করে! অপমান? শুধু চিত্রাকে নয়, নিজের ভালবাসাকে যদি আমি অত বড় অপমান করতে পেরে থাকি, চিত্রার দেওয়া কোন অপমানকেই তো অপমান ভাববার অধিকার আমার নেই।

আমার তখনকার মনের ভাব ঠিক ক'রে বর্ণনা করা অসম্ভব। কত বিরুদ্ধ চিন্তা, কত অসম্ভব কল্পনা, কত যুক্তি কত তর্ক দিয়ে যে আমি তখন আমার জ্বালাভরা অনুতপ্ত মনের অগ্ন্যুতপ্ত আত্মগ্লানির তীব্রতা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলাম তার সীমা ছিল না।

চিত্রার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারব কিনা সন্দেহ হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত চিঠি লিখতে বসলাম। দেখলাম, সে আরও কঠিন।

আট দশখানা চিঠি ছিঁড়ে শেষ চিঠিখানা জোর ক'রে খামে ভ'রে ফেললাম। মুহূর্ত্তের উত্তেজনা, নিমেষের ভুল ওই সব লিখতে লজ্জা বোধ হ'ল। নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে, তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার আশা জানিয়ে, সারা জীবন যে আমি এই চিঠির জবাবের প্রতীক্ষা করব এই কথা লিখে শেষ করলাম। কত কি লিখবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জাগছিল! মনে মনে বললাম, ভালই যদি বাসে আমার অকথিত বাণী তার মনের দুয়ারে পৌঁছবে, মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হবে না।

সে চিঠি তাকে দেওয়া হয় নি। এইখানে, এই পাষাণভরা নদীগর্ভে সে চিঠি হারিয়েছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অক্ষর যে এখনো কেঁদে বেড়াচ্ছে, এখানে এলেই আমি স্পষ্ট অনুভব করি।

জগদাশ থেমে গেল। তার চোখে জল নেই, কিন্তু মনে হল, তার চোখের অন্তরালে অনলকণা আর অশ্রুধারা এক সঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে।

প্রায় দশমিনিট নিঃশব্দ থেকে জগদীশ সুরু করল।

রাঁচি ফিরলাম। ষ্টেশন থেকে সোজা চিত্রাদের বাড়ী গেলাম। কেউ বাড়ীতে নেই। চাকর জানাল, সকলে হুড্রু গেছে।

হুড্রু! যে মোটরে ষ্টেশন থেকে এসেছিলাম সেই মোটরেই হুড্রু রওনা হলাম। চিত্রার পায়ে ব্যথা, এই কদিনে কমলেও হয়ত সে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে

প্রপাতের নীচে নামতে পারবে না। মিঃ সেন আর মিসেস সেন যদি প্রপাতের সৌন্দর্য্য দেখতে নীচে নামেন, চিত্রা একা থাকবে। সেই হবে আমার সুযোগ। প্রকৃতির উদারতার ছাপ লাগবে চিত্রার মনে। চারিদিকের শান্ত কোমলতা তার অন্তরের কাঠিন্য গলিয়ে দেবে।

তিনজনে এক পাথরে ব'সে চা পান করছিলেন, আমি দূরে এক পাথরের আড়ালে ব'সে চেয়ে রইলাম। আধঘণ্টা পরে দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে মিষ্টার সেন আর মিসেস সেন নীচে চ'লে গেলেন।

চিত্রা উঠে ধীরে ধীরে প্রপাতের মুখের দিকে অগ্রসর হ'ল।

মিনিট দশেক চুপচাপ ব'সে থেকে জোর ক'রে উঠে পড়লাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে নজরে পড়ল, ঢালের ধারে ব'সে চিত্রা নীচের দিকে চেয়ে আছে।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চিত্রা চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে ভীত বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল। বুঝলাম এই নির্জ্জনে অকস্মাৎ আমার আবির্ভাবে চিত্রা ভয় পেয়েছে। বুক-পকেট থেকে চিঠিটা বার করতে করতে দু'পা অগ্রসর হ'য়ে বললাম, চিত্রা—

অস্ফুট শব্দ ক'রে চিত্রা সভয়ে পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়েছিল একেবারে ধারে। হঠাৎ চিত্রা এক নিমেষে আমার দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল।

তারপর নিকষকালো অন্ধকারে বিশ্ব ঢেকে গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরল তখন—তখন—

শেষের দিকে জগদীশের কণ্ঠ ক্রমেই বিকৃত এবং অস্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল; হঠাৎ সে সেই পাথরের ওপরেই ঢ'লে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই বুঝলাম সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে।

*　　*　　*

আর একটি কথা বললেই এ কাহিনী শেষ হয়। চিত্রা জগদীশকে ভালবাসত।

আমার পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকারা, প্রশ্ন করবেন, কি ক'রে জানলে?

সেই জলধি রায়। জগদীশের মুখ থেকে তার জীবনের এই শোচনীয় কাহিনী শোনার প্রায় পাঁচ বছর পরে জলধির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, বলবার প্রয়োজন নেই।

জলধি চিত্রাকে ভালবাসত। যেদিন সে তার মনের কথা চিত্রাকে জানায়, চিত্রা ব্যথিত হ'য়ে তাকে জগদীশের কথা বলেছিল।

ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় জলধি জগদীশের য়ুরোপ প্রবাস-কালের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জানাতে চিত্রা বলেছিল, সে আমি জানি জলধিবাবু। এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভব হবে কিনা ঈশ্বর জানেন। সত্য ভালবাসা যদি তার বুকে জাগে ধরা দেব। আর যদি আমার রূপটাই তার কাম্য হ'য়ে আমার ভালবাসার অপমান করে ত তার সেই কামনা আমি কোনদিনই মেটাব না।

দূর আকাশের দিকে স্বপ্নের দৃষ্টি মেলে বলেছিল, তাঁর ভেতরে বড় দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে জলধিবাবু। আমার ভালবাসা ব্যর্থ হবে না, একদিন আমার রূপকে নয়, আমাকে তিনি ভালবাসবেন।

জলধির কাছে একথা শোনার ছমাস পূর্ব্বে জগদীশের শেষ নিঃশ্বাস হুড্রুর বাতাসে মিশে গেছে।

পরলোক যদি থাকে, চিত্রার মুখেই সে শুনবে, না যদি থাকে, তবে তো কথাই নেই।

কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি কি এমনি খাপছাড়া হবে? তবে এমন সৃষ্টির কি কৈফিয়ত তিনি দেবেন?

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী এ, ডি, টমাস ও ভারতের খৃষ্টীয় আর্ট

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

প্রায় চার শত বৎসর পূর্ব্বে ডচ ও পর্ত্তুগীজদের দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গোড়াপত্তন হয় ভারতবর্ষে। এখনো ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাদের স্থাপিত প্রাচীন গির্জ্জাগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্চে। ডচ ও পর্ত্তুগীজরা যেমন মোগল আমলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে ইউরোপীয়দের ব্যবসা কারবারের সুযোগ সুবিধা ক'রে দিয়েছিল, তেমনি খৃষ্টীয় আর্টেরও নমুনা তারাই সাত সমুদ্র তের নদী পারে তাদের দেশ থেকে এ দেশে বহন ক'রে এনেছিল।

হুগলী গোয়া প্রভৃতি স্থানের ইউরোপীয়দের স্থাপিত গির্জ্জাগুলি রোমন ক্যাথলিক গির্জ্জা, তাই তাদের মূর্ত্তি-পূজার জন্যে নানান ইটালীয় ভাস্কর্য্য ও খৃষ্টীয় চিত্রকলার নমুনা এখন এগুলিতে রাখা আছে। হুগলী ডচদের একটি বহু প্রাচীন বাণিজ্য স্থান এবং তারা এইখানে গঙ্গার তীরে গড়বন্দী ক'রে আরামে মোগল আমলে কাটিয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা তারাই হুগলীতে সে সময় স্থাপন ক'রে গেছে।

মোগল আমলে সার টমাস রো প্রভৃতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংএর অনুচরেরাও মোগল বাদশাদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে বড় বড় ক্যানভাস্ ভ'রে আঁকা বিলাতী বিরাট অয়েল পেন্‌টিংও এদেশে কখন কখন আমদানী করেছিলেন। মোগল বাদশাদের miniature ছবির তুলনায় সেগুলি ঐরাবৎবৎ, তাই তাঁদের চোখে সেগুলি "ক্যাবাৎ" "ক্যাবাৎ" মনে হ'ত। একটি প্রবাদ আছে যে সার টমাস রো নাকি একবার একটি ছবি বিলাত থেকে এনেছিলেন বাদশাকে উপহার দেবার জন্যে। তাতে শয়তানকে একটি অর্দ্ধনারী-ঘোটক নাক ধ'রে টেনে নিয়ে চলেচে আঁকা ছিল। বাদশা জাহাঙ্গীর ভাবলেন যে তিনি নূরজাহাঁর দ্বারা এইভাবে চালিত হচ্চেন এই ইঙ্গিত করবার জন্যেই সার টমাস ছবিখানি তাঁর দেশ থেকে আঁকিয়ে এনেচেন। শেষে সম্রাটের রোষানলে প'ড়ে তাঁর প্রাণ যায় আর কি! পরে সার টমাস একটি বিলাত থেকে আনা ভাল জাতের 'বুলডগ' কুকুর তাঁকে উপহার দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। খৃষ্টীয় ছবি যে তখন ভারতবর্ষে আনা হ'ত তা' এই প্রবাদ কতকটা সাক্ষ্য দেয়; তা ছাড়া মোগল ধরণের আঁকা প্রাচীন খৃষ্টীয় ছবির নমুনা এখনও নানান চিত্রশালায় রাখা আছে আমরা দেখেছি। আকবরের সময় তাঁর খৃষ্টীয় পত্নী মরিয়মের মনোরঞ্জনার্থে অনেক মোগল শিল্পীরাও খৃষ্টীয় বিষয় নিয়ে চিত্র আঁকতেন। ছবিগুলি হুবহু মোগল ছাঁচে আঁকা কিন্তু খৃষ্টীয় ভাবে ও রসে ম'জে আছে।

শিল্পী শ্রীযুক্ত আর্থার ডেভিড্ টমাস্

আসলে খৃষ্টীয় বিষয়ের ছবি ইউরোপীয়েরা যা এঁকেচেন বা এঁকে থাকেন তা' তাঁদেরই দেশের আবহাওয়ার মধ্যে

তাঁদের দেশেরই ভাব ফুটিয়ে তোলেন। খৃষ্টের লীলাভূমি হ'ল এশিয়া-প্রাচ্য সুতরাং তাঁর ভিতর যে একটি প্রাচ্য ভাব আছে সেটা কোথায় যাবে? তার জন্ম ও লীলাভূমি প্রাচ্য ইহুদী স্থানের আঁকা প্রাচীন খৃষ্টীয় ছবির খবর বড় একটা পাওয়া যায় না। যা' কিছু ইটালী-ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যেই তার চলন দেখা যায়। সুতরাং যদি আজ এশিয়ার কোনো খৃষ্টীয় সন্তান দেশী রীতিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে খৃষ্টীয় ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন তো তাতে দেশের

পরীর তৃষ্ণা

গৌরব দশের কাছে যে কত বেশী বাড়বে এ কথা এই লেখকের মনে জাগরূক হয়েছিল যখন টমাসকে লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্ররূপে তিনি পান।

আচারগত, সংস্কারগত ও বংশগত অনুরাগ মানুষকে কি ভাবে দখল ক'রে থাকতে পারে এ বিষয় একটি ঘরওয়া ঘটনা থেকে বেশ জানা যায়। (আশা করি পাঠকদের সেটি পড়তে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না।) দেখা গেছে একটি দু' বৎসরের মেয়েকে উদ্যানের প্রস্ফুটিত মধুমালতী কুঞ্জের নিকট নিয়ে গেলেই সে উৎসাহিত হ'য়ে নাচে আর গায়—"ধল ধল মালা পল গলে"—কিন্তু বাগানের অন্যান্য ফুল দেখে তার এরূপ প্রেরণা জাগে না। বাঙালীর কাব্য বাঙলার মধুমালতীর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে সেটা অস্থিমজ্জাগত হ'য়ে মধুকোমল শিশুরও চিত্তকে দুলিয়ে দিয়ে থাকে। সেইরূপ খৃষ্টান বংশে জন্মগ্রহণ করায় টমাসের জন্মগত সংস্কার তাকে খৃষ্টীয় চিত্রকলার দিকেই স্বভাবতই টানলে এবং তার সহজ অনুরাগই সহজে তার শিল্পকমলদল ফুটিয়ে তুলবে এই ভরসা।

আর্থার ডেভিড্ টমাস এই লেখকের নিকট যখন এলেন তখন তিনি সবেমাত্র লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের ভার নিয়েছেন। বাঙলায় একটি কথা আছে, "আগ্ ন্যাঙলা যেদিকে যায় পাছ ন্যাঙলা সেদিকে চলে।" লেখক তাই মনে মনে স্থির করলেন যে গোড়াতেই যদি তিনি একটি ছাত্রকে দেশী-রীতিতে চিত্রকলা শিক্ষায় দীক্ষিত করতে পারেন তাহ'লে অপর শিষ্যরা দেখাদেখি ঠিক পথ দেখে নিতে পারবেন। টমাসকে শিক্ষা দেবার সময় এখানে আরও একটি বিষয় পরীক্ষা করা গেল যে রেখাঙ্কন ক্ষমতার দুর্ব্বলতা দেশী চিত্র-রীতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী চিত্ররীতি শিক্ষা দিয়ে দূর করা যায় কিনা। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে অনেক ভাবুক শিল্পী আছেন যাঁরা Dr. Cousinsএর মত Theosophist Art Criticদের সহজেই মুগ্ধ করছেন। তাঁরা যথার্থই ভাবুক বটেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের ভাব রেখাঙ্কন ক্ষমতার পঙ্গুতার দরুণ হয় কুণ্ডলী পাকিয়ে বা জট-গাঁটের জাল রচনা ক'রে ভাব আর বর্ণকে একেবারে আচ্ছন্ন করবার যোগাড় করে। সম্প্রতি কোনো নবীন শিল্পীর আঁকা একটি সরস্বতীর ছবি দেখা গেল। তাঁর প্রজ্ঞা দেবীটি যেন বেশ একটু self-conscious—তিনি বেশ জানেন যে তিনি "রূপে সরস্বতী" এবং তাঁর profile খুব সুন্দর, তাই ঘূর্ণায়মান অতি-কমলের উপর ব'সে শিল্পীর দিকে (glad eye) আড়নয়নে কটাক্ষপাত করছেন। দেখা যায় এই সব দোষ দেশী ধরণে ছবি আঁকতে যাবার পূর্ব্বে বিলাতী ধরণে প্রকৃতির নকল করতে না জানলে বা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন না হ'লে কোনো শিল্পীই সহজে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। টমাসের শিক্ষার গোড়াপত্তন তাই লেখকের নিকট দেশী ধরণের ছবি

আঁকার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ নায়ক আর্ট মাষ্টারের নিকট বিলাতী ধরণের portrait প্রভৃতি দ্বারা করা হয়েছিল।

টমাস অতি বিনয়ী নম্র ধীর প্রকৃতির ছাত্র। প্রথম প্রথম কিছুকাল স্কুলের বাঁধা সময় ছাড়াও সকাল বিকালে এবং ছুটির দিনে লেখক নিজের বাসায় এসে শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরুর উপর অধিক উপদ্রব করা হচ্চে মনে ক'রে বড়ই সঙ্কুচিত হ'তেন। তবে তাঁর অধ্যবসায় গুণে এবং সত্যিকারের শিল্পানুরাগ থাকায় সে-সব সঙ্কোচ সত্ত্বেও লেখকের নিকট অতিরিক্ত সময়ে ছবি আঁকতে আসতেন। অল্পদিনেই তাঁর সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে পরিকল্পনার দ্বারা স্বকপোলকল্পিত চিত্র আঁকা আরম্ভ করেছিলেন। ক্রমশঃ দেখা গেল যে তিনি তাঁর বাইবেলের বিষয়ই বেশী আঁকতে চান যদিও তাঁর তাতে দ্বিধা এই যে ভারতীয় চিত্ররীতিতে রামায়ণ মহাভারত না আঁকলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়। কিন্তু লেখক তাঁকে তাঁর নিজের পথেই চলতে উৎসাহিত করলেন। ধীরে ধীরে সে সব বাধা সব ভয় তাঁর কেটে গেল এবং ১৯২৫ সালের শেষে লক্ষ্ণৌএর The All India Fine Art Exhibitionএ ছাত্রদের প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। সেই সময় শিল্পগুরু পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শিল্প প্রদর্শনী দেখতে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন। টমাসের চিত্রকলার পরিচয় পেয়ে তিনি খুব খুসি হ'ন এবং তাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন। প্রথম বৎসরেই টমাসের চিত্র অনেক গুণী জ্ঞানী সমাজে সমক্যরূপে আদৃত হয়েছিল। এইরূপে প্রথম প্রদর্শনীতেই টমাস তাঁর খৃষ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে ভারত-শিল্পের সুন্দর সুযোগ ঘটতে দেখালেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই কৃতিত্ব তাঁর আর্টস্কুলের সহপাঠীদেরও ভারতীয় রীতিতে আঁকা চিত্রকলায় উৎসাহিত ক'রে তুল্লে। লেখকেরও মনোবাঞ্ছা সেই সর্ব্বশক্তিমান বাঞ্ছাকল্পতরুর দ্বারা পূর্ণ হ'ল। ঠিক এই সময়, ১৯২৬ সালে যখন রূপদক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন, এম, এ এই চিত্রকলা বিভাগের বিশেষ শিক্ষক এবং হেডমাষ্টার হ'য়ে আসেন তখন তাঁর হাতেই ভার পড়ল চিত্রবিভাগের শিক্ষা দীক্ষার। টমাস তখন তাঁর নিজের পথ ধরেছেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসরও অনেকটা হয়েচেন সুতরাং বীরেশ্বর বাবুর হাতে পড়ায় তিনি আরো উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতে লাগলেন।

সংক্ষেপে শিল্পীর পরিচয় এই। এ, ডি, টমাস আগ্রার St. John's High Schoolএর হেডমাষ্টার মিঃ এস, জি, টমাসের পুত্র। টমাস ইউ, পি-বাসী দেশী খৃষ্টান। আগ্রায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং St. John High Schoolএ শিক্ষালাভ করেন। ইনি ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্টসে এই লেখকের নিকট চিত্রকলা শিখতে আসেন এবং ১৯২৮ সালে পাঁচ বৎসরের যায়গায় চার বৎসরেই চিত্রবিদ্যা শেষ করেন। লক্ষ্ণৌ চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও বম্বে কলকাতা মাদ্রাজ মহীশূর প্রভৃতি নানানস্থানে তাঁর চিত্রকলা বহু আদরের সহিত গৃহীত ও প্রদর্শিত হয়েচে। এবং নানাপ্রকার প্রশংসাপত্র ও পদক প্রভৃতি লাভ এই অল্প সময়ের শিক্ষার মধ্যেই ঘটেচে। সম্প্রতি ইউ, পি, গভর্মেণ্ট টমাসকে লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে ১৪০ টাকা বেতনে একটি পাকা চাকরী
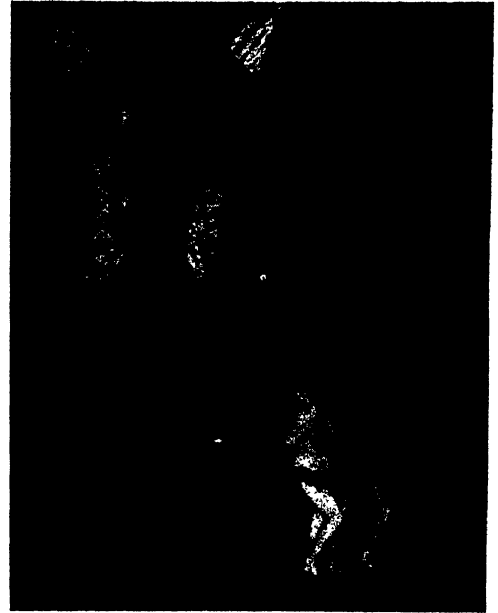
ইডেন হইতে এডাম্‌ ও ঈভের নির্ব্বাসন

দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শিল্পী টমাস দাসত্ব করতে স্বীকৃত হলেন না। তিনি ঘরে ব'সে আর্থিক ও মানসিক যা শান্তি শিল্পকলার চর্চ্চার দ্বারা পাচ্চেন সেটা মাষ্টারী ক'রে খোয়াবার তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। এটা একদিকে যেমন ত্যাগ এবং অপরদিকে তাঁর তেমনি শিল্পী-হৃদয়েরই পরিচয় দিয়েচে।
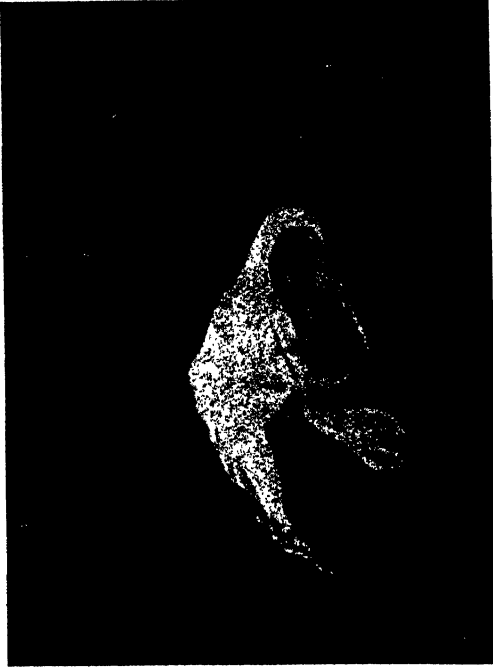
ম্যাডোনা

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের করুণা ও দয়ার বাণী চিত্রকলায় টমাস যেরূপ সুন্দর ফোটাতে পারেন তা' দেখে অনেক বড় বড় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকেরা মুগ্ধ হয়েচেন। লেখক কিছুদিন পূর্ব্বে কলকাতা Oxford Missionএর বন্ধু মিঃ T. E. T. Shore সাহেবকে টমাসের আঁকা ছবির কতকগুলি একরঙা ফোটো পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেগুলি পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং লেখকের পরামর্শ মত তাঁকে ইটালীতে প্রাচীন খৃষ্টীয় চিত্রকলার সম্যক পরিচয় নিতে যাবার জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন। টমাস এই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করবেন। তাঁর স্বাভাবিক খৃষ্টীয় চিত্রের প্রতি অনুরাগ ইটালীর মাইকেল আঞ্জিলো র‍্যাফেল প্রভৃতির চিত্রকলা দেখার পর আরো রঙিয়ে তুলবে ব'লে বিশ্বাস করা যায়। আমাদের কালোদেশের আবহাওয়ায় মানুষ দেশী শিল্পী বিলাতি শীতপ্রধান দেশের সিতকান্তিদের আঁকা বড় বড় ক্যানভাস দেখে এসে যে কি করবেন তা' এখনও বলা বড় শক্ত। তবে ভরসা করা যায় যে টমাসের শিক্ষা দীক্ষার এতটুকু জোর আছে যে তিনি দেশের সবটা সে দেশে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে আসবেন না। বরং দেশের ভাবপ্রধান চিত্রকলার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরো বাড়বে বই কমবেনা। তাঁর ইটালী যাবার পূর্ব্বে অজন্তা যাবার ব্যবস্থা করা হয়েচে। নতুবা বিদেশী কলালক্ষ্মীর চটকে দেশের শিল্পী না দেশের শিল্পলক্ষ্মীর পূজা করা একেবারে ছেড়ে দেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের নিজের শিক্ষার প্রারম্ভে বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে গুরুর উপদেশের কথা স্মরণ হয়। শিল্পগুরু পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ লেখকের অভিভাবকদের বলেছিলেন, "ওকে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত পাঠাও তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু ছবি আঁকা শিখতে যেতে বলতে পারি না। সময় যখন হ'বে তখন ও আপনি যাবে।" তাঁর এই উপদেশ লেখকের পক্ষে বিশেষ ফল দিয়েছিল। নিজের দেশের ঐতিহ্যের traditionএর ভিত্তির উপর না দাঁড়িয়ে যদি

ক্রুসের বোঝা

খুঁড়িয়ে উঁচু হ'বার জন্যে অভিনবত্ব করতে যাওয়া যায় তাহ'লে তার ফলে আর্ট না হ'য়ে হয় curio এবং কলার স্থলে হয় ছলা। যাই হোক, টমাসের পক্ষে ইটালী যাওয়ার উপদেশ

লেখককে শিল্পগুরুই দিয়েছিলেন কেন না তাঁর খৃষ্টীয় আর্টের স্বর্গই হ'ল ইটালী। যীশু খৃষ্টের কোনো চেহারা জীবিত কালে কেউ আঁকেনি। কিন্তু প্রাচীন ইটালীয় শিল্পীদের পরিকল্পিত যীশু খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তিই সর্ব্ববাদীসম্মত যিশুর মূর্ত্তি ব'লে জগতের কাছে গৃহীত হয়েচে। তাই অতি-অভিনব আধুনিক শিল্পী এপষ্টাইনের গড়া আধা বুদ্ধ আধা খৃষ্টীয় মূর্ত্তি দেখে সমস্ত খৃষ্টীয় দেশ তাঁর প্রতি খড়্গাহস্ত হ'য়ে উঠেছিল। তিনি যীশুকে একটি চাষার ছেলের মত ক'রে গড়েচেন এবং দাঁড়ানো বুদ্ধের মত বরাভয় হস্তে আবার ক্রুসের ক্ষতচিহ্ন ধারণ ক'রে আছেন। মূর্ত্তিটির অতি-অভিনবত্ব সকলকেই বিস্মিত করে। এমন কি না তার তলায় লেখা থাকলে গোঁপ দাড়ী চাঁচা মূর্ত্তিটি যে যীশু খৃষ্টের তা' কেউই বলতে পারবেন না।

সার্ব্বজনীনতা আর্টের মধ্যে সহজেই আছে। শিল্পীর জাত এক। সে যে জাতেরই শিল্পীই হোক না কেন। তাছাড়া শিল্পকলা যাঁরা দেখেন তাঁরাও সেই দেখবার সময়টুকুর মধ্যে যখন তন্ময় হ'য়ে যান তখন শিল্পীর সঙ্গে যোগযুক্ত হ'য়ে এক হ'য়ে যান। এই হ'ল শিল্পকলার মহত্ত্ব। চিত্রকলার মতই সঙ্গীতকলাও গায়ক ও শ্রোতাকে সুর-তান-লয়ে ঠিক এক গোত্রে এনে ফেলে, তখন দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান যাঁরাই সেখানে থাকুন-না-কেন তাঁদের সবাইকার মন-প্রাণ সেই গায়কের সঙ্গেই যোগযুক্ত হ'য়ে যায়। আর্টের মোহিনী শক্তি আছে ব'লেই আর্ট এত বড় এবং আর্টিষ্টের জগতের সভ্য মনুষ্য সমাজে এত কদর। তাই আজ টমাস যে শিল্প-শিক্ষার জন্যে ইউরোপে অভিযান করচেন এবং যদি তাঁর সে-অভিযান সফল হয় তবে কেবল কোনো জাতি বা সমাজ বিশেষের নয়—সমগ্র ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে। তাঁর শিল্পের মোহিনী শক্তি দেশকাল-পাত্রের সীমা ছাড়িয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সৌভাগ্যক্রমে তার সূচনা এখনই কিছু কিছু দেখা যাচ্চে। এখনই তাঁর ছবির একরঙা ফোটো Rev. T. E. T. Shore সাহেবের নিকট দেখে ইটালীর অনেক সুধী-শিল্পীমণ্ডলী তাঁকে পত্রদ্বারা সাদরে ইটালীতে আহ্বান করচেন।

আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ইটালীর গুণী রূপদক্ষের পত্র দেখেছি—(১) Prof Tealdi, ইনি ইটালীর শিল্প-কলার একজন নামজাদা অধ্যাপক। ইউরোপের নানা-স্থান থেকে এঁর নিকট ইটালীর প্রাচীন চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে শিল্পীরা আসেন। (২) La Contereo Bona Gigluici ইনি একজন ইটালীর চিত্রশিল্পী।
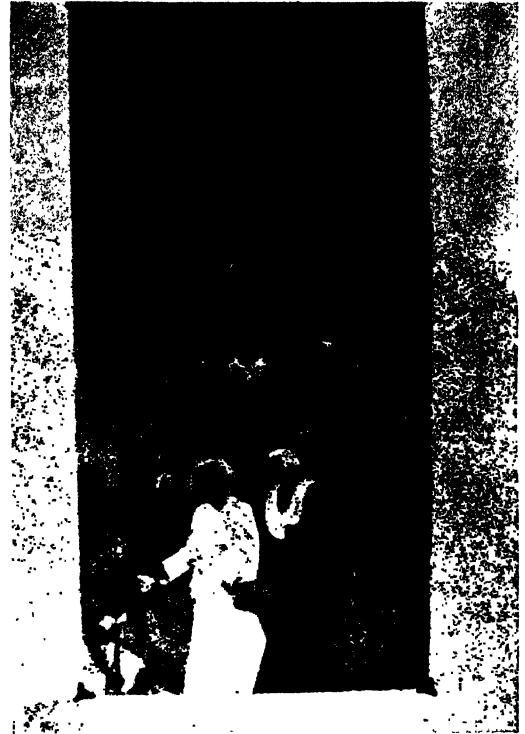
ভারতে খৃষ্ট

(৩) S. Piazza Savonarola ইনি একজন মহিলা শিল্পী। (৪) Mr. Ernest Thayaht।

টমাসের শিল্পকলার গৌরব টমাস সেখানে পৌছবার পূর্ব্বেই পৌছে গেছে; এখন আমরা লেখক ও পাঠক মিলে এই তরুণ উদীয়মান শিল্পীর ঈশ্বরের নিকট শুভকামনা ক'রে এখন শেষ করি।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কর্ম্মবীর হেন্‌রি ফোর্ড

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অর্থসমস্যাই বোধ করি, আজকাল পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সমস্যা। সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, টাকা থাক্‌লে আর ভাব্‌না কি? টাকাতে কি না হয়?

কিন্তু এমন কথাও যে শুনিতে না পাওয়া যায়, তাও নহে; টাকাতে মানুষের মন ছোট করে, টাকা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকাণ্ড বাধা। প্রভু শঙ্কর ত' অর্থকে অনর্থ বলিয়াই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মানুষের স্বভাব বড় একদেশপন্থী; হক-না-হক এক দিকে ঢ'লে পড়া যেন তার একটা মজ্জাগত ব্যাধি। তাই বোধ হয়, মহাপণ্ডিত সক্রেটিস্ সুবর্ণময় মধ্য পথের নির্দ্দেশ করিয়া গেছেন। অবশ্য দুকূল রক্ষা করা খুবই কঠিন।

নিজেদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে দেখি, অর্থ নইলে সংসারে চ'লে না; আবার টাকাকে ধ্যান-জ্ঞান করাটাও ভাল নয়। তাতে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

অর্থের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ নিশ্চয়ই খুব কঠিন ব্যাপার এবং তার যথার্থ প্রাপ্যটুকু তাকে দিতে জানার ভিতর অনেকখানি সংযমের কথাই আসিয়া পড়ে!

আমেরিকার ধনকুবেরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন, কর্ম্মবীর হেন্‌রি ফোর্ডের জীবনে এই দুই এর অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাই। তাঁর অর্থের শেষ নাই, আবার, সেই টাকার সদ্ব্যবহারে সুচারু ব্যবস্থা দেখিয়াও মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

কিছুদিন আগেকার কথা, তখন হেন্‌রি ফোর্ডের দৈনিক আয় ছিল এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা। তাঁর ব্যবসা যেরূপ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল তা'তে তখনি অনুমান করা হইয়াছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা তিন কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে।

হেন্‌রির পিতা একজন সাধারণ অবস্থার কৃষক ছিলেন। ১৮৬৩ সালে হেন্‌রির জন্ম হয়, পিতার কৃষি-ফার্ম্মে।

বাল্যকাল হইতেই হেন্‌রি যন্ত্র-পাতি এবং কল-কব্জার উপর একান্ত আস্থাবান। কৃষি-কর্ম্মের সহিত পশু-সংরক্ষণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এদিকে বালক হেন্‌রি স্পষ্ট দেখিলেন যে, পশুই চাষবাসের প্রকৃত উন্নতির প্রকাণ্ড বাধা। একথা কিন্তু আমাদের কানে বাতুলের প্রলাপের মতই শোনায়। কিন্তু হেন্‌রির অধ্যবসায় এবং অপূর্ব্ব উদ্ভাবিনী শক্তি, তাঁর জীবদ্দশায় ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, কৃষি-কার্য্য হইতে পশুকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া বিধিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-বাসের প্রভূত উন্নতি করা সম্ভবপর; এবং হয়ত' অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল দেশেই তাহা প্রচলিত হইয়া পড়িবে। কারণ, আমেরিকাতে পশু-হীন কৃষি-ফার্ম্ম আর মোটেই কবির কল্পনা কি, গল্প-কথা নহে।

ফোর্ড অলীক বিষয়ে বিশ্বাস করিবার লোক নহেন; তিনি যাহা চিন্তা করেন তাহাকে একদিন বাস্তবে পরিণত করিবার শক্তি যে তাঁহার সত্যই আছে সে কথা অস্বীকার করিবার পথ নাই। এখানে তাঁহার আর একটি অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা বলিতে চাহি।

ফোর্ড বলেন,—উপযুক্ত সময় এবং সুবিধা পাইলে. যন্ত্রের সাহায্যে খানিকটা ঘাস খড় এবং সালগম হইতে খাঁটি দুধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—পশু-বর্জ্জিত কৃষি-কর্ম্ম সম্ভব—সেদিন লোকে হয়ত' হাসিয়াছিল; কিন্তু আজ ট্র্যাকটর ও কয়েকটিন তেলের সাহায্যে, ভূমি-কর্ষণ, বীজ-

বপন ইত্যাদি কৃষির সকল কাজই চলিয়াছে। তাই দুধের কথা শুনিয়া আর অবহেলার হাসি হাসিতে সাহস হয় না আমাদের।

সাধারণ কৃষক বালকের মতই হেনরির জীবনও কঠিন পরিশ্রমের অগ্নি-পরীক্ষায় আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বেশী দিন গ্রামে থাকেন নাই। চাষীরা সর্ব্বত্রই পুরাতন-পন্থী। সংস্কার তাহাদের বরদাস্ত হয় না। ট্রাক্‌টর তাঁহার অনেক পরের আবিষ্কার; তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়া যাইতে হইয়াছিল।

ট্রাক্‌টার সম্পর্কে যে বিশ্বাসটি তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল সেটি বিচিত্র বটে; কিন্তু তাহার ভিতর হেন্‌রির প্রতিভার জ্যোতি নিহিত—এবং জগতের কি বিশাল উন্নতির মোহন চিন্তায় তাঁহার মন নিত্য মথিত হয়, তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তিনি বলেন, মানুষ বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে মাত্র পঁয়ষট্টি দিন চাষ-বাসের কাজ করিলেই প্রভূত আহার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে—তাহার অধিক সময় তাহাকে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই—বাকি তিনশত দিনে জগতের বহু উন্নতির চেষ্টায় সে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে।

একথাগুলি আমাদের পক্ষে গভীর চিন্তার বিষয়। আমাদের দেশে চাষ-বাসের যে দীর্ঘ বিলম্বিত প্রকরণ প্রচলিত, তাহাতে যে কত শক্তি এবং সময়ের অপব্যয় হয়, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে যিনি নামিয়াছেন, তিনিই জানেন। কেবলমাত্র উদর-চিন্তায় যাহাদের দেহ-মন অবসন্ন তাহারা যে হতভাগা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের দ্বারা জগতের অন্য কোন্ কাজই বা হইতে পারে?

হেন্‌রির জননী একটি কথা প্রায়ই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন; ভবিষ্যতে তাহা যে এত বড় সত্য হইয়া দাঁড়াইবে তাহাই বা কে জানিত? তিনি বলিতেন হেন্‌রি আমার "জন্ম-মিস্ত্রি।"

একদিন পিতার সহিত সহরের দিকে আসিতে আসিতে হেন্‌রি অবাক্ হইয়া গেলেন একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া। এইটিই তাঁহার জীবনে প্রথম ইঞ্জিন-দর্শন। তৎক্ষণাৎ তিনি
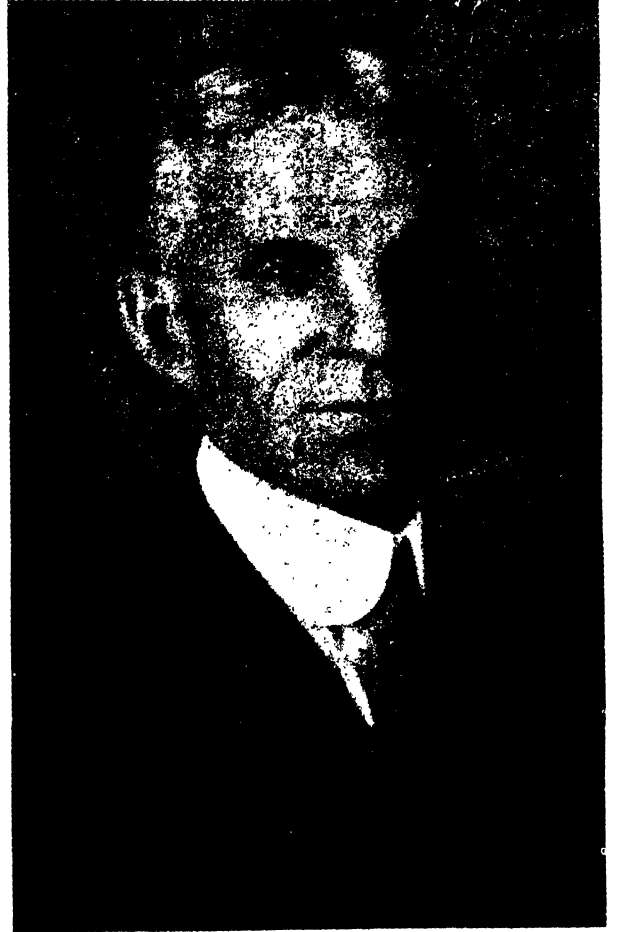
হেন্‌রি ফোর্ড

সেখানে ছুটিয়া গিয়া লোকদের প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

পিতার সহিত ফিরিবার পথে এই বালকটি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে তিনি একদিনের জন্যও আলস্য করেন নাই; এবং সেই স্বপ্নই তাঁহার জীবনে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সূচনা করিয়াছিল। হেন্‌রি

সেদিন অশ্বহীন বিদ্যুৎগতি মোটরের স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন। সে স্বপ্ন যে কত বড় সার্থকতা লইয়া আজ তাঁহার জীবনে দেখা দিয়াছে তাহার কথাই কিছু কিছু বলিতে চাহি।

জগদ্বিখ্যাত গ্রামোফোন-নর্ম্মাতা এডিসনের কারখানায় হেন্‌রি কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে এখন পরম বন্ধু।

হেন্‌রি কিছুদিন সস্তায় ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা ত্যাগ করেন, কারণ তাহা মোটরের মত লাভজনকও নহে, এবং জগতের আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রীবৃদ্ধির—মোটরের মত, সহায়কও নয়।

এডিসন কিম্বা ফোর্ডের নাম বৈজ্ঞানিক হিসাবে খুব বেশী নয়। ইঁহারা বিজ্ঞানের তত্ত্ব লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই। উচ্চ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগাইবার চেষ্টা উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেকানিকাল ইঞ্জিয়ার হিসাবে ইঁহাদের স্থান বহু উচ্চে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবসাকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা ফোর্ডের মত, পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই জানেন।

বড় হইতে হইলে মানুষকে যে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় তাহার ঠিক হিসাব-নিকাশ হয় না। তবে তাহার মধ্যে জীবন-মরণের পণ নিহিত থাকে; তাহা কতশত বিনিদ্র রজনীর সহিত জড়িত, হয়ত বা ক্ষুদ্র বিফলতার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত! এ সবই ফোর্ডের জীবনে ঘটিয়াছে—এবং সেই ঘটনাগুলি তাঁহার হৃদয়টিতে—কতখানি দৃঢ়তা দিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি—তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত লেখাটিতে :

যে মানুষের চিন্তা এবং কাজ করার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক —তিনি তো সাফল্যমণ্ডিত হবেনই।...আমি জানিনে,—কেমন ক'রেই বা বলি? দু'জনের মধ্যে কোন মানুষটি বেশী সুখী!—একজন নিরন্তর খাট্‌চেন,—সর্ব্বদাই এগিয়ে যেতে সচেষ্ট,—আর সেই জন্যে এগিয়ে যাওয়াই তাঁর অবশ্যম্ভাবী; আর একজন, সময় বেঁধে বাঁধা কাজটুকু ক'রেই খালাস। কিন্তু এ কথার নিষ্পত্তিরই বা কি দরকার? একটা দশ-ঘোড়ার ইঞ্জিন বিশ-ঘোড়ার কাজ কেমন ক'রে করবে? যিনি বাঁধা খাটেন তিনি নিজের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করেন। কাজ আর বিশ্রামের ফল তো এক হ'তে পারে না। যিনি অবসর চান, তিনি তাই পান—তবে তাঁর কি ওজর থাক্‌তে পারে যদি অপরে তার শক্তিকে নিরন্তর বাড়িয়ে তুলে অনেক কিছু বেশী করতে পারে?

এই কথাগুলি হইতে ফোর্ডের মনের অনেক মূল তত্ত্ব জানা যায়। জীবনে কাজই মানুষকে অগ্রসর করে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি নিহিত তাহাকে বাড়াইয়া তুলিতে মানুষ নিজের চেষ্টাতেই পারে। যে অবসর চায় সে নিজের ক্ষমতাকে খণ্ডিত করে।

তখন ফোর্ড একটি কারখানায় মাসিক দেড়শত টাকার ইঞ্জিনিয়ার, সেই সময়ে তিনি মোটরকারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। অবসরের এক মুহূর্ত্ত বাজে কাটে না, শনিবার রাত্রে তিনি ঘুমাইতেন না।

অবশেষে বাইসিকলের চাকা দিয়া গাড়ি তৈরি হইল। লোকে হাসে, বলে, পাগল আর কি! সে গাড়ি পথে বাহির করিতে হইলে আগে লাল নিশান হাতে মানুষ ছুটাইতে হয়।

কিন্তু তাহার পর?—মূলধন কোথায়?

এই মূলধন সম্পর্কে ফোর্ড যে কথা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য :

উন্নতির মূলের কথা মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমই। কাজই সকল সাফল্যের ভিত্তি।...প্রথমেই অর্থের কথা ভাব্‌তে ব'সলে মানুষের মনকে বিফলতার ভয় চেপে ব'সে অভিভূত ক'রে ফেলে! তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!

সকলের নিন্দা-তিরস্কার পরিহাস-অবহেলাকে তুচ্ছ করিয়া হেন্‌রি মূলধনের চেষ্টায় চরকির মত ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন টাকা দিতে রাজি হইলেন; কিন্তু ফোর্ডকে একটি বিচিত্র প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। যিনি টাকা দিতেছেন তাঁহার নাম কোন কারণে প্রকাশ হইবে না; কারণ তিনি জানিতেন যে হেন্‌রির সকল চেষ্টাই

ব্যর্থ হইবে এবং টাকা দিয়া সাহায্য করার জন্য জগতের কাছে তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন।

তাহার পর কি হইয়াছে সকলেই জানেন—১৯০৩ সালের পর কুড়ি বৎসরের মধ্যে ৬০,০০০০০ মোটর বিক্রয় করিয়া হেনরি ফোর্ড ধনকুবের হইয়াছেন।

ফোর্ড সাহেব কিছুতেই পছন্দ করেন না যে, সংবাদ পত্র মহলে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা আলোচিত হয় কিন্তু এখন প্রতিদিনই সংবাদ পত্রে তাঁহার সম্পর্কে কিছু না কিছু থাকিবেই!

কয়েক বৎসর আগেকাব কথা; তাঁহার বার্ষিক আয় ছিল তখন, ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং হাত-মজুত মূলধন ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

এই বিপুল সম্পত্তির মালিক, হেন্‌রি ফোর্ড, এত ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করেন? এ প্রশ্ন সহজেই লোকের মনে আসে।

আমাদের একজন বন্ধু কিছুদিন, ফোর্ডের কারখানায় গিয়া কাজ করিয়াছিলেন; তাঁর কাছে শুনিয়াছি যে, ফোর্ড নিত্যই সাধারণ শ্রমিকের সহিত, একান্ত সাধারণ ভাবে, পায়ে হাঁটিয়া, কারখানায় গিয়া কাজ করেন। এ কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; কারণ আমাদের দেশের ধনবানের এ চাল একেবারেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের বন্ধুটিকেও তো অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

ফোর্ড সাহেব অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করেন। মদ তিনি স্পর্শ করেন না; ধূমপানের অভ্যাসও তাঁহার নাই। তিনি স্বল্পাহারী। যাহারা বেশী খায় তাদের তিনি তীব্র মধুর পরিহাসে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন।

তবে ত' দেখা যাইতেছে, আহারে, বিহারে, বিলাসিতায় তাঁর টাকার অপব্যয় হয় না। তবে কি তিনি টাকাগুলি সিন্দুক-জাত করিয়া রাখিতেছেন?

তাও না। তবে? চল্লিশ সহস্র শ্রমিক তাঁর কারখানায় নিত্য কাজ করে। আমেরিকার শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের যে হার, ফোর্ড সকলকেই তাহার বেশীই দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বড় সুন্দর।

ফোর্ড নিজে একদিন শ্রমিক ছিলেন, তাই ভাল করিয়াই জানেন, শ্রমিকের মনের নিহিত আকাঙ্ক্ষাটি কি, তা'র সুখ-সুবিধা কিসে? তাদের সহিত সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার করিয়া তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শ্রমিকেরা চায় যে তাদের পারিশ্রমিকের হার বেশী হয়; তাদের কাজের সময় সংক্ষিপ্ত হয় এবং কাজে তারা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকে। নিজের কারখানায় এই কয়টি সুবিধা দান করিতে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না। ইহা ছাড়া আরো সব ব্যবস্থার কথা জানিতে পারিলে এই কর্ম্মবীরটির প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা সহজেই উৎসারিত হয়।

নিজের খরচে শ্রমিকদিগের জন্য একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাসপাতালের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। শ্রমিক অসুস্থ হইলে বিনা খরচে সে চিকিৎসার সকল সুব্যবস্থাই পাইয়া থাকে; অধিকন্তু কাজ হইতে অনুপস্থিতির জন্য তাহার বেতনও কাটা পড়ে না।

ইহা ছাড়া, যক্ষ্মা রোগীর জন্য ফোর্ড একটি সানাটোরিয়াম করিয়া দিয়াছেন, সেখানেও অনুরূপ ব্যবস্থা। অর্থের এমন সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে পারে?

অনেক স্থলে কারখানার সঙ্গে একটা মামুলি ধরণের হাসপাতাল জুড়িয়া রাখা, মনকে চোখ ঠারার মত ব্যাপার, এদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে কেবল ধোকার টাটি। ফোর্ডের ব্যবস্থার মধ্যে আত্ম এবং পরকে প্রতারণার

ব্যাপার কিছুই নাই। সে কথা মুক্ত কণ্ঠে তিনিই বলিতে পারেন, যিনি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন।

মানুষ সম্বন্ধে ফোর্ডের একটি বিশ্বাসের কথা বলা আবশ্যক। ফোর্ড সব মানুষ সমান, একথা কিছুতেই মানিতে চাহেন না। তিনি বলেন যে, তাঁর কারখানায় গাড়িগুলিকে যথা সম্ভব একই রকম করিবার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি ঠিক দুইখানা গাড়ি একই রকমের দেখেন নাই।

তাঁহার কারখানার এত বিরাট উন্নতির কারণ খুঁজিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শুধু সময়ের নয়, সকল বিষয়ের অপব্যয় বন্ধ করিয়া--সময় শক্তি এবং বস্তুকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাইবার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার পরিচয় সেখানে অপূর্ব্ব!

মোটর করিতে কাঠের প্রয়োজন, অতএব একটা অরণ্য-বিভাগ থাকিবারই কথা; কিন্তু গাছের সকল অংশই কিছু মোটরের প্রয়োজনে লাগান যায় না; কিন্তু তাই বলিয়া, তাহার ক্ষুদ্র অংশটি পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার উপায় নাই। গাছের ডালপালা পাতা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কার্ড-বোর্ড তৈরি হয়। ইহা একটি কম লাভের ব্যাপার নয়।

ফোর্ড কারখানার একটি দৃশ্য

এইরূপ বিশ্বাসের ফলে তাঁর কারখানায় ব্যক্তিগত শক্তির ও প্রতিভার বিশেষ মর্য্যাদা আছে এবং যে সত্যই স্বচেষ্টায় বড় হইবার ইচ্ছা পোষণ করে—তাহাকে সুবিধা দিবার ব্যবস্থাও ফোর্ডের চমৎকার।

আগে দেখিয়াছি, ফোর্ড সময়ের অপব্যবহার ভাল বাসেন না; এমন কি বিশ্রামকেও তিনি কাজে লাগাইতে চাহেন।

ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগে কাজ চলিয়াছে। কয়লা, লোহা, কাঠ, রেল ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপার লইয়া ফোর্ডের কারখানা। খনি হইতে লোহা এবং কয়লা তুলিয়া মাত্র ছয়দিনের মধ্যে একখানি গাড়ির উপকরণ তৈরি হয় এবং প্রতি সাত সেকেণ্ডের মধ্যে তাহার অংশগুলি জুড়িয়া একটি গাড়ি প্রস্তুত। স্বচক্ষে না দেখিলে এই সকলের সম্পূর্ণ ধারণা করা সকলের পক্ষে সহজ নয়।

ফোর্ডের বর্ত্তমান অফিস, কারখানা ইত্যাদির ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কেমন করিয়া একজনের

কর্তৃত্বে এই বিরাট ব্যাপারটা এমন নিখুঁত সুন্দর ভাবে চলিয়াছে !

এই সকল কথার পর, হেন্‌রি ফোর্ড মানুষটি কেমন জানিবার ইচ্ছা মনে সহজেই আসে। ছোটখাট দুএকটি পরিচয় দিতেছি।

একদিন কয়লার খনিতে গিয়া কাজ করিতে করিতে ফোর্ড বুঝিলেন, বদ্ধ বাতাসে কাজ করিতে করিতে শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। অচিরে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে খনির মধ্যে শ্রমিকেরা দিনের কতকাংশ কাজ করিয়া উপরে উঠিয়া মুক্ত হাওয়ার মধ্যে কাজ করিতে পাইবে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে খনির শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য-হানি আর তেমন হয় না।

একটা কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় প্রতিবেশীদের পরিষ্কার কাচা কাপড়গুলি নোংরা হইয়া যাইত ; এ কথা জানিবামাত্র তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কারখানাটি সেখান হইতে অন্যত্র সরাইয়া দিলেন। অন্যের সুখ সুবিধা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর এমনি তীক্ষ্ণ নজর এবং সুবিবেচনা।

দরিদ্র শ্রমিকেরা ফোর্ডকে বন্ধুর মত দেখিয়া থাকে। দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়া তিনি সেই লাভে নিজের চাল সহস্রগুণ বাড়াইয়া চলিয়াছেন, একথা তাঁর পরম শত্রুও বলিতে পারে না।

আমেরিকার লোকের কাছে তিনি এত প্রিয় যে, হয়ত একদিন ফোর্ড প্রেসিডেন্ট হইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ভোট পাইতে তাঁর কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

চল্লিশ হাজার শ্রমিকের নিত্য ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া যিনি জগতে এত বড় ধনশালী হইয়াছেন, তাঁর কর্ম্ম-কুশলতায় সন্দেহ করিবার কোন পথ নাই। তাঁর কর্ম্ম-তৎপরতার তুলনাও জগতে বিরল। তাঁর কর্ম্মের পদ্ধতিও অপূর্ব্ব।

ভাঙ্গা কারখানা জোড়া দিবার শক্তি ফোর্ডের অসামান্য। এই সম্পর্কে তাঁর সাহসের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। অন্যলোকে অচল কারবার লইয়া প্রথমেই তার ব্যয় সংক্ষেপে মন দেয় ; কিন্তু ফোর্ড মনে করেন ওটি একটি ভুল। তিনি শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া উৎসাহের তরঙ্গে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তোলেন। কাজে মানুষের মন না থাকিলে, সে কাজ কতক্ষণ বাঁচে ? ফোর্ড মনে করেন যে শ্রমিকের তৃপ্তি আনন্দ এবং সন্তোষের উপরই কারখানার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। একথা, ঘোর অবিশ্বাসীরাও শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

সাধারণের ধারণা যে মানুষ চল্লিশে পা দিয়া বৃদ্ধ হয়। একথা শুনিলে ফোর্ড হাসেন ; তিনি বলেন, জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর ত' কঠিন সাধনা এবং উদ্যোগেই কাটিবে ; নহিলে কোন বড় কাজই করা যায় না। একথা তাঁর জীবনে খুবই সত্য কথা। ১৯০৩ সালে অর্থাৎ তাঁর ঠিক চল্লিশে তিনি তাঁর প্রথম মোটর প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন —তারপর এই ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে কি অসম্ভব না সম্ভব হইয়াছে !

ফোর্ড মনে করেন যে প্রতি মানুষ তাহার কর্ত্তব্য যদি নিষ্ঠার সহিত করিয়া যায়, যদি জীবনের এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় না করে তো সে কিছুতেই যেখানে জীবন আরম্ভ করে সেখানেই চিরদিন দাঁড়াইয়া থাকিবে না। সৌভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন হইবেই হইবে।

ফোর্ড আরো মনে করেন যে প্রতি মানুষই তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া সংসারকে নিত্য গতিশীল উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। তিনি বলেন, "As we serve our jobs, we serve the world."

"ডেলি হেরাল্ডে" হেন্‌রি ফোর্ড নিজের মতামতগুলি অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখার সহিত তাহা পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকার ফোর্ডকে বুঝিবার আরো সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া—ঐ লেখাটির অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল।

"প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করিবার আছে"

[হেন্‌রি ফোর্ড]

পরিশ্রমের উঁচুহার দক্ষিণায় আমার বিশ্বাস। ভিক্ষায় কিম্বা দানে আমি বিশ্বাস করি না। মনে করি, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উৎপন্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।
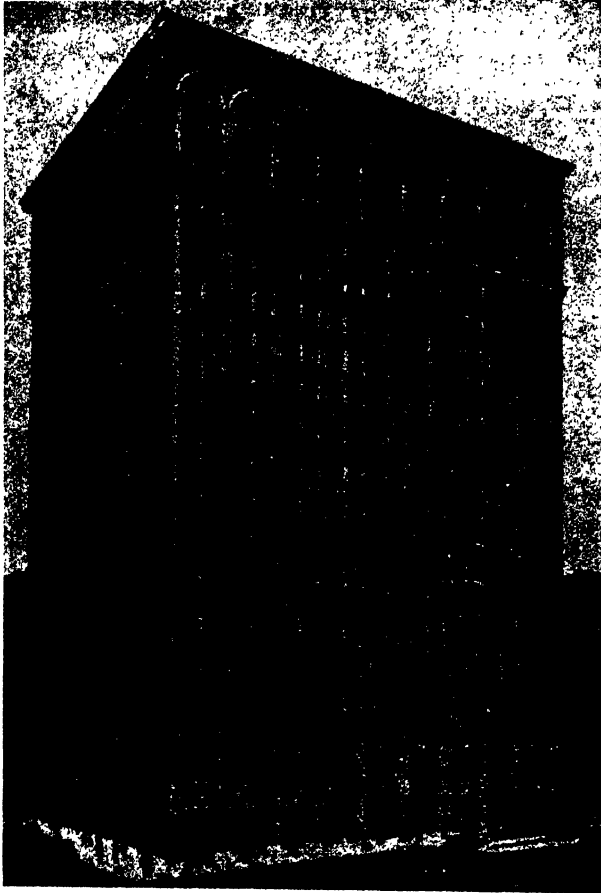
ফোর্ড কারবারের অফিস

দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির কিম্বা দরিদ্রকে দান করিবার বিধির মূলে গলদ আছেই। নিশ্চেষ্ট দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে কোন বড় জিনিষ উঠ্‌তে পারেই না।

একটা রেল পথের খানিকটা যদি এম্‌নিই ভেঙ্গে যায় যে, গাড়ি সেখানে গেলেই চূর্ণ হ'য়ে যাবে—তো তার প্রতিকার কি প্রতিবিধানের উপায়, নিশ্চয়ই একটা গাড়ি মেরামতের কারখানা খুলে দিলে হয় না। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো এই মেরামতের কারখানার মতই—যতই না কেন সেটা ভাল হোক—সত্যকার অভাবকে তা' কিছুতেই দূর করতে পারে না। মানুষের দুঃখের আদি কারণ ভিক্ষা দিয়ে দূর করতে পারে, এমন দাতা এখনো পৃথিবীতে জন্মায় নি।

এই বিনা আয়াসে কিছু একটু পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে—আমার একটুও ভাল লাগে না। আশা করি, অল্পদিনের মধ্যে এই বিশ্রী ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে দূর হ'য়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, সত্যকার চেষ্টার বলে, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করতে পারলে, আমরা সকলের জন্যেই নিশ্চয়ই কিছু না কিছু উপার্জ্জনের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। আমাদের কারখানায় আমরা কি এটা প্রমাণ করতে পারি নি? আমাদের শ্রমিকেরা ত' স্বচ্ছন্দে তাদের সংসার চালাবার মত উপার্জ্জন করতে পারে। অম্‌নি কারুকে কিছু দেওয়া একান্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব ব'লেই আমার মনে হয়।

মানুষকে ভিক্ষা দিয়ে সাহায্য করার মত পণ্ডশ্রম আর হ'তে পারে না। আমাদের শ্রমিকদের আমরা তেমন ভাবে কিছুই দিইনে। তারা যা কিছু পায়, তাদের উপার্জ্জনের অধিকারে। মানুষ তার নিজের অভাব তার পরিশ্রমজাত উপার্জ্জন দিয়ে পূরণ করবে; এইটেই সর্ব্বোত্তম পন্থা।

দানধর্ম্মের মহিমা-প্রচারকেরা আমাদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন, যেমন ওস্তাদ-মোটর-গাড়ি-নির্ম্মাতারাও দিয়ে থাকেন; তাঁরা বলেন, আমাদের কাজের পদ্ধতিটাই বদলে দিতে হবে; কিন্তু আমাদের রক্ষা, যে আমাদের কারখানায় অমন ওস্তাদ একেবারে দুর্লভ! আমরা কারিকর আর মানুষ নিয়ে কারখানা চালাই। গত ছ'মাসের মধ্যে আমাদের কাজও উৎকৃষ্ট হয়েছে—আর তা' বেশ অগ্রসর হ'য়েছে। কিছু কিছু কাজ বাইরে থেকে

ক'রে আন্‌তে হ'তো; কল-কব্জা বসিয়ে সেটা এখন কারখানার মধ্যেই ক'রে নেওয়া চল্‌ছে।

আমাদের কর্ম্মকুশলতা যে বেড়েছে তার কারণ আমাদের কাজের ক্ষিপ্রকারিতাও নয়, আর নূতন যন্ত্রপাতিও নয়। এই কর্ম্মকুশলতার উদ্ভব হয়, মনের একটি নিশ্চিন্ত-স্বাধীন, নিরুদ্বেগের অবস্থা থেকে। মানুষের দুর্ভাবনার আদি-কারণ, অল্প আয়—তার অবশ্যম্ভাবী ফল : অনশন-ক্লিষ্ট পরিবার, কদর্য্য স্থানে বাস—এবং সকলের সেরা উদ্বেগ, পিছনে মহাজনের হাঙরের মত সর্ব্বগ্রাসী মুখ-বিবর! আরো একটা নিরন্তর অস্বস্তির কারণ—এই গেল, এই গেল, চাক্‌রিটা বুঝি গেল ..এই ভাবনায় শ্রমিকের মন জর্জ্জর হ'য়ে যায়!

আমি কোন মানুষকে অজ্ঞ কি নীরেট বোকা ব'লে মনে করিনে, আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা নেই! কোন-না-কোন বিষয়ে প্রতি মানুষের বুদ্ধি ভালই চলে। প্রতি কাজের উপযুক্ত মানুষ আছেই; আবার, প্রতি মানুষের উপযোগী কাজ পাওয়া যাবেই। প্রত্যেকেরই বিশেষ কোন শক্তি আছে—আমরা তার উপযুক্ত কাজ বেছে দিয়ে তাহাকে খুসী করি, সুখী করার চেষ্টা করি! আর তেমন যোগাযোগে কাজও চলে সুন্দর ভাবে। যাকে অক্ষম ব'লে মনে করা হয়—তার নিহিত শক্তি আছেই আছে—সেটাকে বার করতে পারাটা একটা বড় কৃতিত্ব!

বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সম্যক্ নির্দ্দেশে ঠিক হাতিয়ারের সাহায্যে একটা কারখানায়, একজন সাধারণ শ্রমিক তার বুদ্ধির অর্দ্ধেকও খরচ না ক'রে, ভাল ক'রেই তার সংসার চালাবার মত যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারে; আর, তার জন্যে তাকে আট ঘণ্টার বেশী কিছুতেই খাট্‌তে হবে না।

শ্রমিকদের অল্প পারিশ্রমিক দেওয়ার পদ্ধতির মধ্যে দুটো গলদ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথম একই কারখানায় বহুবিধ জিনিষ তৈরী ক'রে নেওয়ার অতি-বৃদ্ধি। কিন্তু কোন কারখানাই তত বড় হওয়া সম্ভব নয়, আর তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও দুরূহ—যাতে একটার বেশী দু-রকম জিনিষ হ'তে পারে। এই গোলযোগে কেবল অপব্যয়ের সৃষ্টি হয়। একটা জিনিষ সম্পূর্ণ সুন্দর ক'রে তৈরী করার চেষ্টাই একটা কারখানার পক্ষে যথেষ্ট।

দ্বিতীয়টি :—যাকে আমরা বলি Wall-Street পদ্ধতি। এটা একটা অপব্যয়ের আকর। মূলধন কারুরই অসীম হ'তে পারে না, তার একটা শেষ আছেই—একটা জিনিষ নিখুঁত করতে বহু অর্থই লেগে যায়—তার ওপর যদি কর্তৃপক্ষের দল হন অজ্ঞ—আর তাঁদের আত্মীয়দের মোটা মাইনে পাইয়ে দেওয়ার লোভ থাকে তো গরীব শ্রমিকদের আয়কে সংকোচ করতে হয়। এটা করলেই, ক্ষতি তখন হু হু ক'রে বেড়ে যেতে থাকে।

এ উপায়ে কাজ করলে মোটের মাথায় দেশের ক্ষতি, দশের ক্ষতি। যারা এ সব কারখানায় কাজ করে—তারা কাজের মর্য্যাদা না বোঝায় কাজের লোক মোটেই দাঁড়ায় না; তাই মনে স্ফূর্ত্তি পায় না—আর শেষ পর্য্যন্ত মানুষ হিসেবেও তারা কোন দিক দিয়ে ভাল হ'তে পারে না।

আমাদের কারখানার গেটে একদিন তিন হাজার শ্রমিক অল্প-হারে কাজ নেবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল; কিন্তু আমরা তাদের পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়ে দিয়ে কাজের ঘণ্টা কমিয়েই দিয়ে—ডেকে নিয়েছিলুম।

যদি একজন অমিত-ধনী তাঁর একটা খেয়ালের বশে এসে একদিন, আমার হাতে আমার বহুবৎসরের উপার্জ্জনের মোট টাকাটা গুঁজে দিয়ে আমার এই কারখানাটা নেবার প্রস্তাব করেন ত' আমি বেশ বল্‌তে পারি যে আমি তা থেকে বড় একটা বেশী লাভবান হব না। কেন না, সে ক্ষেত্রে আমাকে এই চল্‌তি কাজ ত্যাগ ক'রেই চ'লে যেতে হবে, বেরিয়ে গিয়ে আমি মোটা সুদে, বড় জোর—সে টাকাটা লাগিয়ে দিতে পারি; কিন্তু তাতে আমার সুবিধা কি? কত টাকাই বা মানুষে খায়, কতই বা তার কাজে লাগে? মরলে সঙ্গে একটি কড়িও যাবে না! এখানে আমার উপযোগী সব রকমের কাজই আছে।—

আমি চাই যে, আমাদের শ্রমিকেরা আরো বেশী পারিশ্রমিকের জন্য দাবী করে। তারা যদি আরো ভাল ভাবে থাক্‌তে চায় তো—তার দাবী না করলে পাবে কেন?

দাননীতিবাগীশের দল বলেন যে, শ্রমিকদের অল্পব্যয়ে জীবন-ধারণ করতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু একজন কিছুতেই পূর্ণদক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারে না, যদি সে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে সকালে এসে কাজে যোগ দিতে না পারে। বাড়ী ভাড়ার চিন্তা আর মহাজনের তাগিদে ভারাক্রান্ত মনের মানুষ কিছুতে ঠিক ক'রে কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

আমাদের কারখানায় অল্প-ব্যয়ে জীবন-ধারণ করার শিক্ষা দেবার জন্য ভিক্ষাবলম্বী বিজ্ঞ কেউ নেই। আমাদের কার্য্য-পরিদর্শকেরা কি ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারা যায় সেই শিক্ষাই শ্রমিকদের দিয়ে থাকে। এই পরিদর্শকেরা আমাদের কারখানার মানুষ। তাই তারা আমাদের আদর্শটা কি তা জানে, বোঝে। আমাদের আদর্শ কল কব্জা তৈরি ক'রে মোটর নির্ম্মাণ করা আর সেই সঙ্গে একদল কর্ম্মঠ, সুস্থ সবল সুখী মানুষ গ'ড়ে তোলা।

জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য আমি দশ সেণ্টও খরচ করতে রাজি নই। পরন্তু আমি একটি সুখী পরিবার চাই, যেখানে তাদের মার চতুর্দ্দিকে একদল সুস্থ ছেলে মেয়ে আনন্দ কলরবে খেলছে!

আমি দেশের প্রতি ঘরে ঘরে এক একটা ক'রে পড়ার জন্যে টেবিল আর এক আলমারি বই দিতে পারলে বেশী সুখী হব।

রুষ প্রভৃতি অন্যান্য বহু বিদেশ থেকে বিদেশী শ্রমিক এসে আমাদের কারখানায় কাজ নিচ্চে। তারা নিজেদের স্বাস্থ্য এবং সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অল্প-হারে আর কোথাও কাজ করতে যাবে না, বোধ হয়। তাদের আবার পেয়াদের মাইনেতে কাজ করতে রাজি করতে কি আর কেউ পারবে?

এই বিদেশীদের ইংরেজী শিখিয়ে, কি ক'রে সুখে থাক্‌তে হয় তার তালিম দিয়ে আমরা তৈরী ক'রে নিই। তাদের ভাষা অন্য হ'লেও তারা মানুষ ঠিক আমাদের মতই, বরং আমাদের চেয়ে তারা আরো বেশী শিখতে চায়, আমাদের চেয়ে হয়তো তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও বড়। তারাও একদিন কাজের মধ্যে দিয়ে বড় হ'য়ে উঠে' দেশপ্রেমিক এবং আদর্শ নাগরিক হ'য়ে উঠ্‌বে।

অভাব-পীড়িত মানুষই অসুস্থ হয় বেশী। তাদের পরিবার ভেঙ্গে যায়,—আর হাসপাতালের চিকিৎসাও কোন ফল হয় না। চিকিৎসার সঙ্গে যদি অন্নের সংস্থান—পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নেওয়ার আশা থাকে আর সেই সঙ্গে এর জন্য যদি কারুর কাছে কোন সংকোচ না থাকে ত' তবেই চিকিৎসায় ঠিক ফল হয়।

আরিজোন স্বাস্থ্যাবাস থেকেও আমাদের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আন্‌তে হয়েচে; সেখানে তারা ভাল থাক্‌ছিল না। ফিরে এসে তারা ওজনে, গায়ের জোরে বেড়ে, সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছে। স্বাস্থ্যাবাসে মানুষ আরো যেন অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। সেখানে কেবল অসুখেরই কথা; কেননা তা ছাড়া আর কোন বিষয়ের কথা হবে? কিই বা করবে তারা সেখানে? নিয়মিত কাজ করতে না পেলে মনে সুখ থাকে না। তারা যেন আমাদের কারখানার সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। কাজের মধ্যে আবার ফিরে আস্‌তে পাবে শুন্‌লেই যেন তারা অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠে।

দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার মত আয়—আমাদের দেহ মনকে সুস্থ এবং সুখী রাখে।

আমি এতেই বিশ্বাস করি। এ হ'লে ভিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়ার লেঠাই চুকে যায়।"

—ডেলি হেরাল্‌ড্‌

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নূতন মাপকাঠি

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

জীবন সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে ইহা একটি স্থানু সামগ্রী। ইহার যে গতি আছে তা' বুঝি শুধু কায়িক হিসাবে কিন্তু ইহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যা পরিণতি তা শুধু একটা বাহিরের ছাঁচে ঢালাই করা মাত্র। তাই জীবনের আদর্শ ব'লে বুঝি আমরা একটা ছাঁচ—কোন প্রেরণা নয়, জীবন তাই আমাদের কাছে গড়বার জিনিষ, ফোটাবার জিনিষ নয়। জীবনের পরিণতির পক্ষে তাই আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় গুণ পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা—প্রেম নয়, বীর্য্য নয়। এই যে জীবনের সনাতন আদর্শ তা' আমাদিগকে সার্থকতার দিকে ততটা নিয়ে যায় নি যতটা ব্যর্থতা থেকে আমাদিগকে বাঁচিয়েছে। এক দিকে ইহা যেমন মানুষকে উচ্ছৃঙ্খলতা হ'তে আগ্‌লে রেখেছে, অপর দিকে তেমনি শৃঙ্খলার একান্ত-পীড়নে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকে খর্ব্ব করেছে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্যের চিন্তা-ধারায় ইহাই নূতন বাণী। এই সাহিত্য বল্‌ছে যে তোমাদের যে ভাল-মন্দের মাপকাঠি তা'র কোন মূল্য নেই, কারণ

সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ
কে রেখেছে মত আঁটিয়া ?

সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি বাইরে নয়—সেখানে তার নিরপেক্ষ পরিমাণ কোথায়! বাইরের সংস্কারের মাপ-কাঠিতে লোকের ভাল-মন্দ বিচার করলে চলবে কেন? নবীন সাহিত্য বলেন যে বাইরের সংস্কারে ঢালাই করা যে জীবনের পরিণতি তা', যতই নিরাপদ হোক, অত্যন্ত কৃত্রিম। ব্যক্তিই হচ্ছে জীবনের চরম পরিণাম। কাজেই যা জীবনকে ব্যক্তির পথে, বিকাশের পথে নিয়ে যায় তাই সত্য—সমাজের হিসাবে তা ভালই হোক কিম্বা মন্দই হোক; আর যা সমাজের হিসাবে ভাল হ'য়েও এই ব্যক্তির পথে বাধা দেয় তাই মিথ্যা। তাই নবীন সাহিত্যের বাণী হচ্ছে এই যে ভাল-মন্দের মাপকাঠি হচ্ছে অন্তরের গভীর অনুভূতিতে—ব্যক্তিত্বের প্রেরণায়। আধুনিক সাহিত্যিকগণ এইটি বিশেষ ক'রে দেখাতে চান যে বাহ্য আচারের সহিত আমাদের অন্তরের কোন যোগ নেই ব'লে অন্ধভাবে আমরা যে আচার পালন করি তা' আমাদের যথার্থ পরিণতির পথে বাধা দেয়, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে। নীতি তাই আমাদের কাছে "চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।" নবীন সাহিত্য এমন কি এও বলে, যা'কে আমরা বলি দুর্নীতি তা বাস্তবিকই সভ্যতারই একটি অঙ্গ (what we call sin is really an element of civilisation.—Oscar Wilde)। ব্রাউনিং তাঁহার একটি কবিতায় দেখিয়েছেন যে যা'কে আমরা বল্‌ছি অন্যায়, উচ্চতর নীতির হিসাবে তাহাই ন্যায়। কবিতাটি একটি প্রেমের কাহিনী। ইতালীর কোন সহরে এক Duke ছিলেন, তিনি রোজ শোভাযাত্রা ক'রে গৃহে ফিরতেন। ফেরবার পথে তাঁর এক রমণীর বাতায়নতল দিয়ে যেতে হ'ত। বাতায়ন হ'তে রমণী Dukeকে দেখলেন, পথ হ'তে Dukeও রমণীকে দেখলেন—দেখে উভয়ের প্রাণের প্রদীপ জ্ব'লে উঠল। রোজই একে অপরের বাড়ী যাবেন ভাবতেন—কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে কোন দিনই যাওয়া হ'ত না। এইরূপে দিনে দিনে বছরের পর বছর কেটে গেল—অবশেষে উভয়েই দেখিলেন যে জীবনে যৌবনের বাতাস কখন ব'য়ে গেছে এবং কেশে বার্দ্ধক্যের স্পষ্ট রেখা এসে দেখা দিয়েছে। কবি বলেন, এখানে নায়ক-নায়িকা বীর্য্যহীনতার দোষে দোষী। জীবনে অন্তরের গভীরতম সত্যকে বরণ ক'রে নেবার যে বীর্য্য চাই, তা Duke কিম্বা রমণীর কারো ছিল না—ফলে উভয়েই জীবনের যথার্থ পরিণতিকে পঙ্গু করেছেন।

এই যে নূতন মাপকাঠি তা যেন নৈতিক x'ray। এর সৃষ্টি বাহ্য আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরে গিয়ে পৌঁছোয়। তাই সমাজের সংস্কারে যা'কে চিরদিন হীন ব'লে জানিয়েছে নবীন সাহিত্য তা'তে দেখিয়েছেন হয়ত পবিত্রতার ম্লান-রশ্মি। আবার অনেক সময় আপাত-শোভন সামাজিক আচারের অন্তরালে নূতন সাহিত্য দেখিয়েছেন আন্তরিক নিষ্ঠার একান্ত অভাব। বলা বাহুল্য নবীন আদর্শ যেমন অন্তরের প্রেরণাকে ভাল-মন্দের একমাত্র মাপকাঠি ব'লে প্রচার করেছে, তেমনি প্রবৃত্তি মাত্রকে সত্য ব'লে স্বীকার করেছে। অন্তরের অনুভূতি বীর্য্যের সহিত কার্য্যে পরিণত করাই পুণ্য আর আস্থাহীন ভাবে গতানুগতিকের অনুসরণ করাই পাপ। আচার যেখানে বাহিরের অভ্যাস মাত্র সেখানে নীতির কোন প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। আচরণকে নৈতিক করতে হ'লে অন্তরের প্রাচুর্য্যে তাকে অভিষিক্ত করতে হবে। তাই "ঘরে বাইরের" নিখিলেশ যখন দেখলেন যে বিমলার সঙ্গে তাঁর যোগ শুধু বাহ্য আচরণের ফল মাত্র—অন্তরের কোন কোন একান্ত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—তখন তিনি বিমলাকে বললেন, "ওগো আমি তোমায় বাহির থেকে পে'তে চাই।" ইহা সত্য যে বিমলার বাহির থেকে আসার পথে বহু বিঘ্ন ছিল কিন্তু যখন এলেন তখনিই যথার্থ আসা হ'ল, তার পূর্ব্বে নয়।

অনেকে বলবেন এই নবীন সাহিত্যের মধ্যে নবীনত্ব কোথায়? সমাজ-বিধানের সঙ্গে মানব-মনের দ্বন্দ্ব—এ ত কল্পকলায় এক চিরন্তন উপাদান। কিন্তু নবীন সাহিত্যিক কল্পনাকে একান্ত জাগ্রত ক'রে সামাজিক সংস্কারের ক্ষুদ্রতা দেখাবার চেষ্টা করেন নি। কোন ট্র্যাজেডি রচনা কর'তে তাঁর কোন চেষ্টা নেই, তিনি শুধু জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে মনুষ্যত্বের খাঁটি বস্তুটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বর্ত্তমান সাহিত্যিক sophist, তাঁর চিন্তাধারার বিশেষত্ব বস্তু-সন্ধিৎসা। সমাজবিজ্ঞানে তিনি অধীত—তিনি জানেন ব্যবহারিক নীতি-বাদ যুগ-ধর্ম্মী মাত্র। তাই তিনি ক্রমাগতই সংস্কারের আবরণ উন্মোচন ক'রে খাঁটি মনের পরখ করবার জন্য ব্যস্ত। কল্প-পন্থী সাহিত্যিক যেমন কল্পনার উচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে সামাজিক বিধানের ক্ষুদ্রতা ও অসারতা দেখান, বর্ত্তমান সাহিত্যিক তা করেন না। বর্ত্তমান সাহিত্যিক ভাবুক নন—নৈতিক surgeon। বহু রোগীর উপর অস্ত্র-চালনা ক'রে এক নূতন Anatomy বা Theory of moralsর সৃষ্টি করেছেন। এতে যে সনাতন নীতির ভিত্তি জীর্ণ করা হয়েছে তা নয়। একটা নূতন নীতি-বাদ রচনা করা হয়েছে। Kantian rationalism ও Victorian social pruderyর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে এই নবীন সাহিত্য বলছে, তোমার বাহ্য আচার-সর্ব্বস্ব নীতিবাদ একান্ত অসার—নৈতিক দুর্নীতি বিচার করবে ত দেখ অন্তরের একাগ্রতা—কোন কাজ নীতির কোন প্রশ্নই হ'তে পারে না—নৈতিক হচ্ছে মনের একটা বিশিষ্ট attitude। নীতির কোন type নেই কারণ জীবনের যে প্রেরণা তা' অশান্ত, অস্থির, বিচিত্র; বাহিরের কোন কাঠামোর মধ্যে দেখলেই একে ব্যর্থ করা হ'ল। এক কথায় জীবন যেন জল-ধর্ম্মী প্রদীপ, জীবনদীপে তেল যোগানই বাঁচা—দীপ-পাত্র তৈরী করা নয়। চারিদিকে কাঁচের বেড়া দিয়ে জীবন-শিখা অব্যাহত রাখা যায় বটে, কিন্তু তা'তে রশ্মির চির-ম্লানিমা ঘোচে না।

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

সত্য ও মিথ্যা

শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর ঠাকুর

বাইবেলে আছে—

Do not see the nakedness of your father.

Do not see the nakedness of your mother.

বোধহয় অসভ্য মানুষের পক্ষেও এ হেন উপদেশের প্রয়োজন ছিল না। ব্যাপারটি যেমন অসামাজিক তেমন অভব্য এবং সে হেতু মনুষ্য সমাজের আদিকাল হইতে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু বাইবেল ধৃত বচনের যে অর্থই থাক কেবলমাত্র বহিরঙ্গের দিক হইতে নহে অন্তরের দিক দিয়াও মানুষের সঙ্কোচের অন্ত নাই। দেহের নগ্নতার সঙ্গে সঙ্গেই মনের, চরিত্রের নগ্নতাও তাহাদের কাছে বীভৎস বলিয়া মনে হয়, জুগুপ্সা জাগায়। পূর্ব্বপুরুষের জীবন ও চরিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া সম্যক ভাবে দেখিবার স্পৃহা তাই স্বতঃই কাহারও মনে জাগে না। মানুষের কৌতূহলের এ এক অদ্ভুত পরীক্ষা। কৌতূহলী বলিয়াই মানুষ সভ্য, কিন্তু সে সীমা টানিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার সংযমের শেষ নাই।

কিন্তু সকলেরই সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। মানুষের আবশ্যক ও অনাবশ্যক বহু সংযমের মত কৌতূহলেরও বাঁধ ভাঙ্গে। পরখ করিয়া বিচার করিয়া দেখিবার তাহার অসীম আগ্রহ জাগে। তাই কয়লার গাড়ীর ঘোড়া যেমন খনকের টানে খনির স্তরে স্তরে ফেরে, অতীতের সুড়ঙ্গ-পথে সত্যসন্ধ বাস্তব-রসিকেরও চলা-ফেরার শেষ নাই।

খনি খুঁড়িয়া সত্যের মণি হয়ত বেশী মিলে নাই, কিন্তু বাস্তবের কয়লা উঠিয়াছে রাশীকৃত। এ বিষয়ে জ্ঞান যে অনেক বাড়িয়াছে তাহা নয় কিন্তু খবর মিলিয়াছে বিস্তর। এবং মণি বলিয়া যাহা বাজারে চলিতেছিল তাহার মধ্যে

ডিকেন্স শেষ বয়সে

যে অনেক মেকী একথা আর গোপন নাই। মুখোস খুলিয়াছে, নূতন চূণ বালির আবরণের নীচে পুরাণো ইটের পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

য়ুরোপে এই মুখোস খোলার খেলা চলিয়াছে ; ভিক্টোরিয়া গ্লাডষ্টোন, ডষ্টয়ভস্কি টলষ্টয় নেলসন নেপোলিয়ন ছোট বড় সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ, প্রভৃতির জীবন লইয়া আলোচনা ও সমালোচনায় সেখানকার আকাশ বাতাস তাতিয়া উঠিয়াছে।

এইবার Dickens-এর পালা। John Forster সাহেব তাঁহার পরম ভক্ত। তৎকৃত জীবনীতে উক্ত সাহিত্যিকের যে গৌরবময় জীবনের চিত্র দিয়াছেন এবং মুগ্ধ পাঠকেরা

ডিকেন্স পত্নী কেট্
যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে

এতদিন যে চরিত্রকে অকলঙ্ক জ্ঞানে পূজা দিয়াছে Bechhofer Roberts তাঁহার This Side Idolatry উপন্যাসে সে অবাস্তব গৌরবের লূতাতন্তু ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি যে সে কার্য্যে সফলকাম তাহার প্রমাণ সারা দেশ সে পুস্তক পাঠ করিয়াছে, এবং তাহার প্রতিবাদ যে কিছু দিন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া সে দেশের সাহিত্যাকাশ মথিত করিয়াছিল সাময়িক পত্রে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই।

Forster সাহেবের পুস্তকপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, ডিকেন্সকে তাহারা যেমন দেখিতে চাহিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহারা বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু সত্যই কি ডিকেন্সের স্বভাব তাই ছিল ? ভাবুক ডিকেন্স, দরদী ডিকেন্সের যে মনের পরিচয় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে মেলে—Forster অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে যে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করে নিত্যকার জীবনে আপন জনের কাছে, ডিকেন্সের কি সেই একমাত্র পরিচয় ? Roberts সাহেব নিজেই এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে আদৌ তাহা নহে। আত্মম্ভরি, স্বার্থপর, অভব্য ও নিতান্ত বেদরদী একটি সাংসারিক জীবই বারে বারে এতদিনের পরিচিত ডিকেন্সের খোলসের মধ্য হইতে পাঠকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ডিকেন্সের এ রূপ অনেকের কাছে অপরিচিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিবারও উপায় নাই, এ সম্বন্ধে ভক্তের অবিশ্বাস অগ্রাহ্য। কারণ এবিষয়ের অনুসন্ধানে Roberts যত্নের ত্রুটি করেন নাই। ডিকেন্সের সৃষ্টি ও সমগ্র রচনা তাঁহার অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সমস্তই তিনি মনোযোগ দিয়া দেখিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠে, জীবনী না লিখিয়া তিনি উপন্যাসের আশ্রয় লইলেন কেন? সন্দেহ জমিবার ইহাই তো ছিদ্র। কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, অপ্রকাশিত কাগজ পত্র হইতে অংশোদ্ধার আইনবিরুদ্ধ,—সুতরাং সরলভাবে উদ্ধার না করিয়া কথোপকথনচ্ছলে তিনি মর্ম্মকথা সবই ব্যবহার করিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্যই তাঁহার এ কৌশল। সত্য হয়ত তাহাতে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার অপলাপ হয় নাই বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

ডিকেন্সের বিরুদ্ধে Roberts এর সব চেয়ে দারুণ অপবাদ যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবহেলা করিতেন, অপমান করিতেও তাঁর দ্বিধা হয় নাই। বিবাহিত জীবনের প্রথম পনের বৎসরের মধ্যেই পর পর দশটি সন্তান প্রসব করিয়া দেহে মনে জীর্ণা Kate যেদিন বিগতযৌবনা, ডিকেন্সের সেদিন তাহার প্রতি অনাদরের আর সীমা রহিল না। নিত্য

বিরোধ তাঁহাদের সাংসারিক জীবনের অঙ্গ হইল এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান মনোমালিন্যের ফলে বাইশ বৎসর বিবাহিত জীবনের পর যখন পরস্পর ভিন্ন আশ্রয় অবলম্বন করিলেন, সকল সম্বন্ধই ছিন্ন হইল, জনসমাজে আত্মদোষ ক্ষালনের অভিপ্রায়ে ডিকেন্স যাহা করিলেন তাহা অভিনব, অবধানযোগ্য। তিনি অকুন্ঠিত চিত্তে এক পত্র প্রচার করিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী সন্তানপালনে অত্যন্ত উদাসীনা এবং মনোবিকারবশে তিনি স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন!

স্বামী স্ত্রীর শেষ বিরোধের দৃশ্যটি Roberts নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছেন :—

"I, Charles, am weary of hearing you prate of cant and humbug and hypocrisy. Is there a meaner cant than your empty catchwords? You're the hypocrite, you who boast your contempt for money and break faith with every publisher. You who preach charity and pillory your parents and your friends in your books. You who rant of duty and faithfulness and desert me for a painted actress . . . Haven't I watched you year after year?

"Selfish, grasping, vulgar, vain, you nag me perpetually for extravagance, and lavish gifts on every toady. You play off your friends one against the other, and cast them aside when they've served your purpose . . . You live in a fool's paradise of sycophants, with Georgina—poor simpleton—at its head."

"Kate, you're out of your mind," retorts Charles. "You've always neglected the children, you've been moody, hysterical, impossible."

THIS MUST BE THE END

"I've been too busy bearing you children to have time to neglect them. Can you guess what it's meant to me, year after year, to be waiting another child, and then another and another? I neglect the children? I? Charles, I can endure this life no longer. This must be the end."

শ্রীমতী ডিকেন্সের উক্তির মধ্যে যে "রং-মাখা অভিনেত্রী"র উল্লেখ আছে তাঁর নাম এলেন টারনান। ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল একথা গোপন নাই। ডিকেন্স যে ব্যভিচারী, অন্তত প্রচলিত অর্থে,

মারিয়া বিড্‌নেল্‌

Roberts একথা কোথাও বলেন নাই; কিন্তু চপলা অল্পবয়সী মেয়েদের উপর ডিকেন্সের যে বিশেষ আসক্তি ছিল একথা সত্য।

Roberts এর কাহিনী পড়িলে সত্যই মনে হয় নারী সম্বন্ধে ডিকেন্সের যে দুর্ব্বলতা ছিল কেবল তাহা নয়, তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে। কেবল মাত্র নারী বলিয়াই নহে, কোনো নারী দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ডিকেন্সের মোহের অন্ত থাকিত না—যতদিন তাহাকে আপনার করিয়া না পাইতেন ততদিন ভিতরে বাইরে তাহার আরতি চলিত,

কিন্তু করতলগত হইলে সামান্য মনোযোগেরও অবসর বুঝি মিলিত না।

শিল্পী Hogarth এর কন্যা Kate যখন কুমারী তখন তাহাকে ধর্ম্মপত্নীত্বে বরণ করিবার কি আগ্রহ; কিন্তু বিবাহান্তে মোহ টুটিতে বিলম্ব ঘটে নাই। তখন অর্চ্চনা চলিল শ্যালিকা Maryর। Maryর অকাল মৃত্যুতে সে শূন্য সিংহাসন অধিকার করিল তাহার ছোট বোন Georgina। ডিকেন্সের স্নেহ-প্রীতি-মুগ্ধা Georgina প্রতিদান দিতে ত্রুটি করে নাই—স্বামী স্ত্রীর বিরোধের পর

ডিকেন্স-শ্যালিকা মেরি

Georgina বড় বোন Kateএর নিন্দা প্রচারেও কুন্ঠিত হয় নাই; তাই দেখি Georginaর স্তবে ডিকেন্স মুখর—

"You are the noblest woman who ever trod this earth of ours. You light up its darkness. God bless you, Georgy, for your love for the worse than motherless. Your sacrifice shall live for ever on their lips and mine."

আর একটি নারী দূরস্থিত গ্রহের মত ডিকেন্সের জীবনাকাশে দুইবার আলো ফেলিয়াছিলেন—তিনি Maria Beadnall। প্রথম যৌবনে ডিকেন্স মারিয়াকে ভাল-বাসিয়াছিলেন। ডিকেন্স তখন আদালতের সামান্য রিপোর্টার আর মারিয়া সম্পন্ন মহাজনের সুন্দরী রঙ্গময়ী আদরিণী কন্যা। হয়ত উভয়পক্ষ হইতে প্রণয়ারতির অভাব ছিল না, কিন্তু মহাজন ছিলেন এ মিলনের প্রতিবন্ধক। কাজেই বিবাহ হইল না, পরস্পরের কাছ হইতে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত উভয়ে ভিন্ন পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

হয়ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বহু নারীসঙ্গেও ডিকেন্স মারিয়াকে ভুলিতে পারেন নাই—স্মৃতির পূজা চলিতেছিল। David Copperfield এর Dora এবং Barnaby Rudge এর Dolly Varden অনেকের মতে এই বাস্তব মারিয়ারই স্মৃতি-চিত্র।

অর্থ-সম্পদ-সুখের মধ্যেও প্রথম যৌবনের ভক্ত পূজারীর কথা বোধ করি মাঝে মাঝে মারিয়ার মনে জাগিত। অধিকন্তু ডিকেন্স আর সেদিনের সামান্য রিপোর্টার নহেন —ধনে মানে দেশে বিদেশে পূজ্য। অর্থশালী ভদ্রলোকের স্ত্রী-হিসাবে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাপন করিয়া অকস্মাৎ মারিয়া ডিকেন্সকে স্মরণ করিলেন। মারিয়ার স্বামী Mr. Winter তখনও জীবিত। মারিয়া ডিকেন্সকে এক পত্র লিখিলেন—অদৃষ্ট দেবতার পরিহাসপ্রিয়তার অপূর্ব্ব নিদর্শনরূপে পত্র আসিল বুঝি সময় বুঝিয়া। Kate ও ডিকেন্সের মনোমালিন্য তখন চরমে উঠিয়াছে। Georginaর সঙ্গে ডিকেন্সের আর মন ভরে না। এ সময় আসিল মারিয়ার পত্র, অতীত দিনের প্রথম যৌবনের সমস্ত রোমান্সের স্মৃতি বহন করিয়া—ব্যর্থ প্রণয়ের অচির সার্থকতার সকল সম্ভাবনা লইয়া। ডিকেন্স কোন দ্বিধা করিলেন না—অদৃষ্টের এ অযাচিত কৃপা কি অবহেলা করা চলে? শূন্য মন ভরাইবার অভিপ্রায়ে ডিকেন্স পুরাতন প্রণয়িনীর স্তবে মন দিলেন। প্রাচীন প্রেমের নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

তখন দুজনের মধ্যে সাগর ব্যবধান। চিঠি পত্র চলিতে লাগিল। মধ্যবয়সী পরস্ত্রী ও পুত্রকলত্রযুক্ত পিতার প্রেম-নিবেদনের অবিবেচনা পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিল —সে এক বিপর্য্যয় পরিহাস! ডিকেন্স লিখিলেন—নিষ্ঠুরাকে তিনি মন হইতে কোনো দিন বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই... এবং আজও হাসিমুখে তাঁর জন্য প্রাণ দিতে কোন বাধা নাই।

উভয়ের দেখা হইল—ভ্রষ্ট লগ্নে তখন চাঁদ নিভিয়াছে, বসন্ত বহু দিন গত। মানসলোকে যে ছিল আলোক-প্রতিমা, যৌবনস্বপ্নে যে ছিল প্রেয়সী—বয়সের ব্যবধানে যে দিন ডিকেন্স তাহাকে দেখিলেন, মোহ টুটিতে সময় লাগিল না। কুমারী মারিয়া আজ বিপুলশরীরা গৃহিণী। প্রথম দর্শনই শেষ দর্শনে পরিণত হইল। কিন্তু নষ্ট-স্বপ্ন প্রেমিকের ক্ষোভ প্রকাশ পাইল অভব্য পুরুষের অপমান-চেষ্টায়—চতুর সাহিত্যিকের বিদ্রূপাত্মক চরিত্র-চিত্রণে।

এই মারিয়া-ডিকেন্স মিলন-কাহিনী Little Dorit উপন্যাসে অমর হইয়া গেল। Flora Finching মারিয়ারই ব্যঙ্গ চিত্র। মারিয়ার মেদস্ফীত স্থূল দেহ, রুজ পাউডারে ঢাকা মুখ, মধ্যবয়সে খস্‌খসে লাল সিল্কের পোষাক, রং-মাখা চুল ও কৃত্রিম ফুলের অপূর্ব্ব সজ্জা এবং অনর্গল অবান্তর প্রগল্‌ভতা অপর কেহ সহ্য করিতে পারিত কিনা জানি না, ডিকেন্স পারেন নাই। দ্রুত পলায়ন করিয়াছিলেন।

মুগ্ধা মারিয়া কিন্তু কিছুই বুঝে নাই। ডিকেন্সের সঙ্গে বার বার দেখা করিবার জন্য তার কি ব্যাকুলতা! ভগ্নাশ ডিকেন্স এ কল্পনার ক্ষোভ মিটাইলেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও কঠোর প্রত্যাখ্যানে।

বিচিত্র, এই প্রত্যাখ্যান ও ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনের অভব্যতা ডিকেন্স-জীবনীকারগণের বিশেষ বিরক্তি উৎপাদন করে নাই। সাফাই হিসাবে নব্যলেখক Straus বলিয়াছেন, ব্যবহার ভব্য হয় নাই বটে, কিন্তু এ প্রলোভন ছাড়া কি সহজ?

না, সত্যই ডিকেন্স প্রলোভন ত্যাগ করিবার সাধনা কোনদিনই করেন নাই। এ সম্বন্ধে কোন বিষয়েই তাঁহার কোন সীমারেখা ছিল না বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের চরিত্র-গত ত্রুটি সাহিত্যে অমর করিতে তাঁহার দ্বিতীয় মেলা ভার। নিত্য জীবনেও এর প্রকাশ যেমনই অসার তেমনি অভব্য, কিন্তু ডিকেন্স সে সুযোগও ছাড়িতেন না। শোনা যায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপকালে নারীর সে অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্থূল রঙ্গ করিতেও তাঁহার ভব্যতায় বাধিত না।

কবি ডিকেন্স, মরমী ডিকেন্স, দরদী ডিকেন্সের যে চিত্র তাঁহার রচনা পাঠে এবং Forster জীবনীতে প্রতিভাত হয় তাহা কি মিথ্যা? Roberts-অঙ্কিত চিঠি পত্র রচনা ঘটনায় প্রমাণিত চতুর চটুল কপট ডিকেন্স-চরিত্রই কি

ডিকেন্স-শ্যালিকা জর্জ্জিনা

সত্য? এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে বিস্তর এবং মীমাংসকের গবেষণায় হয় ত কান পাতা দায় হইবে। কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্ত মীমাংসা ছাপাইয়া এই কথাই বারে বারে বাজিয়া উঠে যে চরিত্র হিসাবে দেবতা বা সামান্য মানব যাহাই হউন না কেন, ডিকেন্সের শিল্প-সৃষ্টি তাঁহার চারিদিকে যে দীপ্তি বিস্তার করিয়াছে তাহা কোনদিনই অম্লান হইবে না। দেবতা বলিয়া যাহারা তাঁহাকে পূজা দিয়াছে সত্য প্রকাশে তাহাদের ক্ষোভ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ জানিয়া তাঁহার দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিতে তাহাদের বাধিবে কি?

হয়ত বাধিবে না। অথচ বিচিত্র এই যে, ডিকেন্সের মুখের উপর চাপান মুখোস খুলিয়া লইবার অপরাধে রবার্টসকে অনেকেই ক্ষমা করিবে না। রবার্টস আর যাহাই করুন ডিকেন্সকে অমানুষ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করেন নাই—সংসারের আর দশজনের মত সহজ মানুষ বলিয়া পরিচয়

দিয়াছেন কিন্তু অপরাধ যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে সে শুধু এই চেষ্টাতেই—সংসারের আর দশজনের মত নহেন বলিয়াই যাহারা ডিকেন্স-চরিত্রের পূজা করিত—যাহারা জানিয়াও না-জানার ভাণ করিত, তাহাদের এ ভাণ করিবার কোন অবকাশ তিনি দেন নাই। রবার্টসের অপরাধ তিনি লোককে বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া নহে, তাহাদের আত্ম-বঞ্চনার সুযোগ রাখেন নাই—মুখোস খুলিয়াছেন বলিয়া। এ নগ্নীকরণ অভব্যতা। এত দিনের প্রসংশিত ভব্যতার এ অসম্মান কি ক্ষমা করা সহজ?

লাচাক গিরিপথ

শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসু

ইয়ারকন্দি খচ্চর-চালক—তুলাভরা জামার লম্বা আস্তিন দস্তানার কাজ করিয়া থাকে

লাচাক ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে চীনা তুর্কিস্থানের পাদদেশে অবস্থিত। উচ্চ চূড়া সমন্বিত কারাকোরাম পর্ব্বতমালা ইহার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দুরতিক্রম্য পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়াই হিন্দুস্থান হইতে চীন দেশে যাইবার অতি দুর্গম পথ সর্পিল গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। ভারত হইতে চীনা তুর্কিস্থানের ইহাই প্রকৃষ্ট বাণিজ্য পথ। এই পথ বাহিয়া গোবী মরুভূমি পর্য্যন্ত যাতায়াত করা যায়, কিন্তু ৯০ মাইল দীর্ঘ পথের যে অংশ লাচাকের রাজধানী "লে" এবং "সায়ক" নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করিয়া চীন হইতে রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গম। "লে" র দক্ষিণে আরও তিনটি গিরিপথ আছে; তাহাদের উচ্চতাও নিতান্ত অল্প নহে, একটি ১১,৫০০ এবং অপর দুইটি ১৩,০০০ হাজার ফুট।

ইয়ারকন্দ হইতে যে পথ সায়ক নদীতীর বাহিয়া "লে"র বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই পথে দুইটি গিরিপথ অতিক্রম করিতে হয়। ইহাদের একটি কারাকোরম পর্ব্বতস্থ "সাসেরলা" গিরিপথ এবং অপরটি সায়ক ও সিন্ধুনদ মধ্যবর্ত্তী লাচাক পর্ব্বতস্থ "খারডংলা"—উভয় গিরিপথই চিরতুষারাবৃত গ্লেশিয়ার অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই গিরিপথ দিয়া যাইতে যাইতে চতুর্দ্দিকেই জীব জন্তুর কঙ্কাল ও মাঝে মাঝে মৃত ব্যক্তির কবর পথ-পরিচয়ের চিহ্নস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা ছাড়া সঠিক পথ-নির্দ্দেশের জন্য অন্য কোন চিহ্ন নাই।

মালবাহী জন্তুগুলিকে 'খারডংলা' গিরিপথের শেষ একশত গজ এই প্রকার টানাটানি করিয়া উঠাইতে হয়

'সেসার' গিরিপথ—১৭,৬০০ ফুট উচ্চ

'সাসের' গিরিপথের দৃশ্য—প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়

তুর্কিস্থান হইতে ফেল্ট, রাগ ও চীনদেশ হইতে চা রেশম এবং ভারতবর্ষ ও ম্যানচাষ্টারের দিয়াশলাই, কেরোসিন তেল, সুতি কাপড় জামা ও ল্যাম্প ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য লইয়া মালবাহী খচ্চর ও ইয়াক এই দুর্গম গিরিপথ দিয়া গমনাগমন করে। বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকমাস এই পথ দিয়া বাণিজ্যসম্ভার লইয়া যাতায়াত সম্ভব। শীত কালে রাস্তা একেবারেই বন্ধ থাকে।

বহুযুগ হইতে লাচাকী তিব্বতীয়েরা ইয়াক ও খচ্চরের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য লইয়া এই দুরতিক্রম্য গিরিপথে যাতায়াত করিতেছে। লাচাকীরা অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ও অত্যন্ত
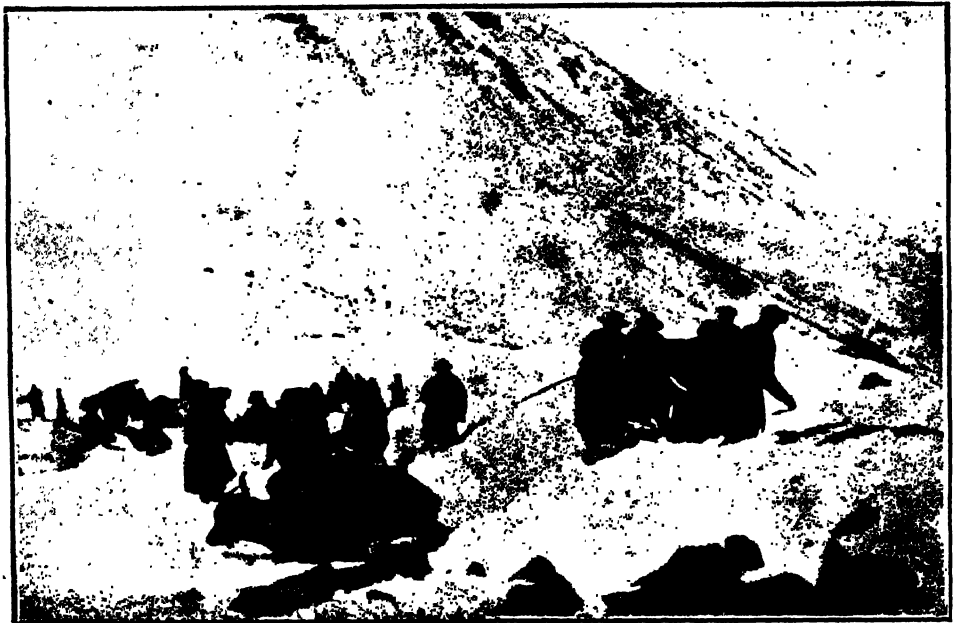
ইয়াকগুলি বরফের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ায় মালপত্র নামান হইতেছে

দরিদ্র বলিয়াই এই শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে। পোষাকের মধ্যে উলের কিম্বা তুলাভরা জামা, পায়জামা ও চামড়ার জুতাই একমাত্র সম্বল। তুষার হইতে মাথা ও চোখ রক্ষা করিবার জন্য টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। পথ চলিতে চলিতে প্রায়ই মালবাহী ইয়াক ও খচ্চরগুলি বরফের মাল নিজেদের বহন করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না।

এই তুষারাবৃত দুর্গম গিরিপথ যে শুধু বাণিজ্যের প্রধান রাস্তা স্বরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নহে; প্রতি বৎসর এই রাস্তা ধরিয়া সুদূর গোবী ও টাকলামাকান মরুভূমির

ঝড়ের সময় বংরোচং গ্লেশিয়ারের দৃশ্য

মধ্যে ডুবিয়া যায়, তখন উহাদিগকে বরফের কবর হইতে উদ্ধার করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ছয় সাত জনে মিলিয়া দুই তিন ঘণ্টা টানাটানি করিয়া কোন ক্রমে উহাদিগকে সেই স্থান হইতে উদ্ধার করে। স্থানবিশেষে সময় সময় খচ্চর ও ইয়াকগুলি এমন ভাবেই বরফের মধ্যে আটকাইয়া যায় যে তখন প্রান্তস্থিত খোটান, কেরিয়া হোমি, তুর্ফান হইতে বহু তীর্থযাত্রী মুসলমান নরনারী মক্কায় হজ করিবার জন্য যাতায়াত করিয়া থাকে। পথটি এতই বিপদসঙ্কুল যে এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অনেকেই পথে প্রাণত্যাগ করে।

ষ্টেট্ রেলওয়ে ম্যাগাজিনের সৌজন্যে

৩৪

পরদিনই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। এমন কি, বাড়ির চাকর-বাকরদেরও জানতে বাকি রইল না যে, 'ছবি-ওয়ালা বাবু' শুধু কমলার ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হয় নি, কমলাকে বিবাহ ক'রে তবে নিরস্ত হবে। পদ্মমুখী দু-তিন দিন দ্বিজনাথ এবং কমলার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইলেন না, মুখ ভার ক'রে রইলেন; কিন্তু ক্রমশঃ বিবেচনার কাছে চিত্তাবেগকে পরাভূত ক'রে তিনি মনকে হাল্কা ক'রে নিলেন। এমন কি, শৈলজা পর্য্যন্ত ঘটনার অলঙ্ঘনীয়তাকে মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়ে বিনয়ের সহিত অল্প অল্প কৌতুক-পরিহাস আরম্ভ ক'রে দিলে। শুধু শোভার মনে কথাটা কাঁটার মত বিঁধে রইল—সেখান থেকে সহজে তা উৎপাটিত হ'ল না;—কিন্তু ফুলের মধ্যে কীটের মত সে কথা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রইল একটা বাহ্য ঔদাসীন্যের আবরণে।

সকালে চা-পানের পর নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণে না গিয়ে দ্বিজনাথ বেলা দশটা পর্য্যন্ত ব'সে বিমলাকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ যে কার্য্য আদালতে কিছুদিন থেকে পরিত্যাগ করেছেন বিমলার চিঠিতে বিনয়ের পক্ষ অবলম্বন ক'রে সেই ওকালতি চূড়ান্তভাবে করলেন। পরিশেষে লিখলেন, "সন্তোষের মত সৎপাত্রকে পরিত্যাগ ক'রে বিনয়ের হাতে কমলাকে অর্পণ আমি অবিবেচনায় করি নি,—আমার প্রতি এ বিশ্বাসটুকু রেখে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ো। কমলার বিবাহে কমলার সুখই যদি আমাদের প্রধান কাম্য হয় তা হ'লে কমলার অভিরুচি অনুযায়ী কাজ ক'রে আমি ভুল করি নি। কমলা নিজে যে কোনো ভুল করে নি তা তুমি এখানে এসে বিনয়কে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে।" অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে বিনয়ের সহিত কমলার বিবাহ দেবেন, অতএব আর বিলম্ব না ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন করবার জন্য দ্বিজনাথ বিমলাকে তাগিদ দিলেন।

বৈকালে সুকুমাদের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে তিনি সকলের নিকট শুভ সংবাদ ব্যক্ত ক'রে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ ক'রে সুকুমার ও বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। অতঃপর প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দুই বন্ধুর নিমন্ত্রণ হ'তে লাগল,—সন্ধ্যার পূর্ব্বে মোটর এসে হাজির হয়,—সুকুমার একদিন যায় ত' দু-দিন ওজর-আপত্তি ক'রে কাটিয়ে দেয়। বিনয় তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলে, "ভুল করছ বন্ধু,—নিমন্ত্রণগুলি থেকে তুমি নিজেকেও বঞ্চিত করছ,—আমারও তাতে কোনো সুবিধে না হ'য়ে অসুবিধেই হচ্চে। তুমি থাক্‌লে তবু তোমাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের অবস্থান বোঝাবার ছল ক'রে দ্বিজনাথ বাবুর উঠে যাবার সুবিধে হয়—কিন্তু তুমি না থাক্‌লে ধ্রুব-তারার মত অচল হ'য়ে তিনি ব'সে থাক্‌তে বাধ্য হন।" বিনয়ের কথা শুনে সুকুমার হেসে ওঠে; বলে, "কিন্তু তুমি বুঝছ না বিনু। কাল আমাকে কৃত্তিকা

দখিয়েছেন—আজ গেলে হয় ত' রোহিনী দেখাবেন। কিন্তু রোজ রোজ গেলে শেষে একদিন যখন হস্তা দেখিয়ে দেবেন—তখন আর অনুতাপের সীমা থাকবে না। একটা নিমন্ত্রণও বাদ দোবো না সঙ্কল্প করলে শেষকালে একটা নিমন্ত্রণও পাব না।" মাথা নেড়ে বিনয় বলে, "নক্ষত্র পকরণ জান না? কৃত্তিকার অনেক পরে হস্তা; তার আগেই অশ্লেষা মঘা একটা কোনো শুভ নক্ষত্র মাথায় ক'রে আমি কল্‌কাতা রওনা হব।" সুকুমারের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটে ওঠে; বলে, "আমি না-হয় নক্ষত্র প্রকরণ জানিনে, কিন্তু তুমিও তারকা প্রকরণ জান না বিনু। আকাশের সমস্ত নক্ষত্র দেখা আমার শেষ হ'য়ে যাবে—কিন্তু কমলার দুটি চোখের নীলিমায় যে দুটি তারা আছে তা দেখা তোমার শেষ হবে না। অশ্লেষা মঘার কথা কি বল্‌ছ? কত অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা রেবতী কেটে যাবে, তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না।"

কথাটা যে এমন ক'রে বলা চলে না, তা নয়; কারণ কমলার প্রতি বিনয়ের আকর্ষণ বেড়ে চলেছিল গুণ বৃদ্ধি হারে। আজ যা, কাল তার দ্বিগুণ,—পরশু চতুর্গুণ। সন্ধ্যার সময়ে গাড়ি আস্‌তে বিলম্ব হ'লে উদ্বেগে সে যেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত, গাড়ি আসার পর আনন্দের চঞ্চলতা তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম প্রকাশ পেত না। সুকুমার পরিহাস করত, শৈলজা বিদ্রূপ করত; তদুত্তরে গাড়ি আসবার পূর্ব্বে বিনয়ের চক্ষে দেখা দিত ভ্রুকুটি, গাড়ি আস্‌বার পরে মুখে দেখা দিত হাসি। সুকুমার বল্‌ত, "ভায়া, কমলা-মিষ্টান্নটি যত উপাদেয়ই হ'ক একেবারে বেমালুম পরিপাক কোরো না—কিছু বাকি রেখো—ভবিষ্যতে কাজে লাগ্‌বে।" শৈলজা বল্‌ত, "আমি তার চেয়েও গুরুতর বিপদ থেকে আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি ঠাকুরপো। কমলা-মিষ্টান্নটিই যেন আপনাকে বেমালুম পরিপাক না করে—কিছু নিজের বাকি রাখবেন—ভবিষ্যতে বাতে একেবারে অকেজো না হ'য়ে যান।" বিনয় কোনো তর্ক না তুলে মৃদু হাস্যের দ্বারা সুকুমারের রঙ্গ এবং শৈলজার রঙ্গ উভয়ই পরিপাক করত। সুতরাং সুকুমারের কথার মধ্যে অবিবেচনার কথা বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে সকালে চা খাওয়ার পর যখন বিনয় বল্‌লে, "আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা চল্‌লাম সুকুমার।" তখন সুকুমার বিস্মিত হ'য়ে ক্ষণকাল বিনয়ের মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল; তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "হঠাৎ?"

বিনয় বল্‌লে, "মাস দুই আগে যে দিন এসেছিলাম সেদিনও ত' হঠাৎ এসেছিলাম—বিচার-বিবেচনা ক'রে আসিনি।"

শৈলজা শুনে বল্‌লে, "ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন না কি ঠাকুরপো?"

বিনয় বল্‌লে, "সত্যিই ভয় পেয়ে। যা ভয় আপনি দেখালেন! পাছে কমলা আমাকে বেমালুম পরিপাক ক'রে ফেলে তাই পালাচ্ছি।"

"বাকি কিছু কি রেখেচে?"

বিনয়ের মুখে হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "কেন, আমার অবস্থা কি ঠিক সুকুমারের মত হয়েচে ব'লে আপনার মনে হচ্ছে?"

বিনয়ের কথা শুনে সুকুমার হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে "ঢিল মারতে গিয়ে পাট্‌কেল্ খেতে হ'ল শৈল। এখন কি উত্তর দেবে দাও।"

শৈলজা আরক্ত মুখে বল্‌লে, "আমি ত' আর কমলার মত উপাদেয় বস্তু নই যে, ঠাকুরপোর মত তোমার অবস্থা হবে।"

সুকুমার সহাস্যমুখে বল্‌লে, "এ তোমার বিনয়ের কথা হ'ল শৈল। ও-বিষয়ে তোমরা কেউ কারুর চেয়ে কম নও। প্রত্যেক গোখ্‌রো সাপ বোধ হয় নিজেদের মধ্যে দীনতা প্রকাশ ক'রে বলে, আমার আর এমন কি বিষ আছে!"

কপট কোপ ক'রে শৈল বল্‌লে, "দেখে ত' তোমাকে একটুও মনে হয় না যে, একবিন্দুও তোমাকে পরিপাক করেছি। তুমি ঠিক আস্তটিই আছ।"

সুকুমার বল্‌লে, "দেখে ত' মনে হবার কথা নয়। তোমাদের পরিপাক ঠিক গজের পরিপাকের মত,—কৎবেলের খোলাটি ঠিক থাকে, কিন্তু ভিতরের পদার্থটি একেবারে নিঃশেষে পরিপাক কর।"

বিনয় হাসতে লাগ্‌ল, বল্‌লে, "সুকুমার বল্‌তে চায় আপনারা আমাদের একেবারে অপদার্থ ক'রে ছেড়ে দেন। অতএব এ অবস্থায় যদি কিছু পদার্থ এখনো বাকি থাকে তা নিয়ে স'রে পড়াই উচিত।"

সুকুমার বল্‌লে, "আমার কিন্তু মনে হয় ভীরুর মত পালিয়ে না গিয়ে বীরপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করা উচিত। আর কিছুদিন থেকে যাও। নিতান্ত যদি দরকার মনে কর, বিয়ের আগে মাস খানেক অদর্শনের দ্বারা প্রেমটাকে আবার একটু ঝালিয়ে নিয়ো।"

শৈলজা বল্‌লে, "আর কিছুদিন থেকে গেলে অন্ততঃ বল্‌তে পারবেন অপদার্থ হ'তে কিছু সময় লেগেছিল।"

বিনয় কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত না ক'রে বেলা বারোটার মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে নিল। সন্ধ্যার সময়ে সুকুমারের অন্যত্র একটু কাজ ছিল, সুতরাং স্থির হ'ল সে রাত্রি এগারোটার সময়ে বিনয়ের দ্রব্যাদি নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হবে—সন্ধ্যাবেলা দ্বিজনাথের মোটর এলে বিনয় একা কমলাদের বাড়ি যাবে।

মোটর যখন এল সুকুমার বাড়ি ছিল না। গিরিবালার নিকট বিদায় নিয়ে এসে বিনয় শৈলজাকে বল্‌লে, "অনেক দিনের বাসা তুলে চল্লাম বৌদি,—ত্রুটি অপরাধ অনেক হয়েচে, ক্ষমা করবেন।"

প্রণাম করবার জন্যে শোভা এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, সাম্‌নে এসে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে বিনয় বল্‌লে, "তোমার স্নেহ-যত্নের কথা কখনো ভুলব না শোভা,—চিরদিন মনে থাকবে।"

কোনো কথা না ব'লে ক্ষণকাল নতনেত্রে দাঁড়িয়ে থেকে শোভা ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

শোভা প্রস্থান করলে বিষণ্ণমুখে শৈলজা বল্‌লে, "আপনি আর কমলা সুখী হ'ন ঠাকুরপো, একান্ত মনে তা কামনা করি,—কিন্তু শোভার জন্যে আমার মনে একটুও সুখ নেই। এখনও ও সাম্‌লাতে পারে নি—আপনি চ'লে যাবেন শুনে পর্য্যন্ত ওর মুখে কথা নেই, মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে!—অথচ এখন ত আর কোনো—" কথাটা শেষ না ক'রে সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত ক'রে বল্‌লে, "যাক্ সে সব কথা—আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন—ওর জন্যে একটি ভাল পাত্রের সন্ধান করবেন ত ঠাকুরপো। এখান থেকে খোঁজ-তল্লাস করা কী যে মুস্কিল!"

পাংশু মুখে বিনয় বল্‌লে, "করব।"

শৈলজা বল্‌লে, "আমি ফস্তুদাদাকে বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম।"

বিনয়ের মুখ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; সাগ্রহে বল্‌লে, "কি বল্লেন তিনি?"

একটু চিন্তা ক'রে শৈলজা বল্‌লে, "বল্লেন বিশেষ কিছুই না—নিজেকে বাজে জিনিস ব'লে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, শোভাকে তাঁর বিয়ে করলে নিতান্তই যোগ-বিয়োগের অঙ্ক কষা হবে।"

নতনেত্রে অন্যমনস্ক-ভাবে কি একটু চিন্তা ক'রে বিনয় বল্‌লে, "চল্লুম বৌদি।"

শৈলজা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "এসো। যা বল্‌লাম মনে রেখো।"

মনে সে-টা এতই রইল যে সারা পথ এক মুহূর্ত্তের জন্য বিনয় তার হাত থেকে মুক্তি পেলে না। গাড়ি এসে বারান্দার সম্মুখে থাম্‌তে কমলা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল; বিনয় নিকটে এসে দাঁড়াতে বল্‌লে, "বাবা যদুনাথ বাবুর অসুখ শুনে দেখ্‌তে গেছেন। বেশি দূরে বাড়ি নয়, লেডিস পার্কের কাছে; ডাকতে পাঠাব কি?"

বিনয় বল্‌লে, "ব্যস্ত করবার দরকার নেই; কতই বা তাঁর দেরি হবে।"

যথারীতি বাগানের ভিতর চার পাঁচ খানা চেয়ার মণ্ডলাকারে রাখা ছিল—উভয়ে গিয়ে দুখানা অধিকার ক'রে বস্‌ল।

"সুকুমার বাবু এলেন না?"

বিনয় বল্‌লে, "রাত্রি এগারটার সময় আমার জিনিসপত্র নিয়ে সে ষ্টেশনে যাবে। আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি কমলা।"

কমলার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল; উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে, "আজ? এত শীঘ্র যাবার ত কোনো কথা ছিল না।"

"না, ছিল না,—কিন্তু যাওয়া দরকার হয়েচে। কতকগুলো অর্ডার এসে রয়েছে—সেগুলোর কাজ শীঘ্র আরম্ভ না করলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। তা ছাড়া পারি থেকে একজন আমার পরিচিত নামজাদা আর্টিষ্ট্ কলকাতায় এসেছেন—তিনি তিন চার দিনের মধ্যে চ'লে যাবেন। তার সঙ্গে দেখা না হ'লে শুধু আমিই দুঃখিত হব না, তিনিও হবেন।"

বিনয়ের মুখে একটা বিমর্ষ মলিন ভাবের অস্তিত্ব কমলা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিল; জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার শরীর কি আজ তেমন ভাল নেই?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বিনয় বল্লে, "শরীর ভাল আছে, কিন্তু মনটা তেমন ভাল নেই। রিজ-এর ওপর গিয়ে একটু বস্‌বে কমলা? অবশ্য যদি কোনো অসুবিধে বা আপত্তি না থাকে।"

"না, আপত্তি কিসের?—চলুন যাই।" ব'লে কমলা উঠে দাঁড়াল। গেটের পাশে জীবনের ঘর, জীবন ঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে ব'সে ছিল, কমলা ও বিনয় নিকটে এলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কমলা বল্লে, "জীবন, বাবা এসে খোঁজ করলে বোলো আমরা পশ্চিম দিকের ঢালে বেড়াতে গেছি।"

সাগ্রহে মাথা নেড়ে বিনীতভাবে জীবন বল্লে, "যে-আজ্ঞে দিদিমণি!" তারপর দু পা এগিয়ে এসে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে, "দিদিমণি, সায়েব আমাকে ব'লে গেছ্‌লেন জা—জামাইবাবু এলে তাঁকে খবর দিতে। দোবো কি?"

কমলার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদুস্বরে 'দরকার নেই' ব'লে সে অগ্রসর হ'ল।

গেটের বাইরে এসেই বিনয় সকৌতূহলে কমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ও জামাইবাবু কাকে বল্লে?"

প্রশ্ন শুনে কমলার হাস্য রোধ করা কঠিন হ'ল—কোনো রকমে মুখ ফিরিয়ে হাসি চেপে সে মনে মনে বল্লে, 'এক ছবি-আঁকা ছাড়া যে আর কিছুই বোঝেনা দেখে।' প্রকাশ্যে বল্লে, "আপনার কাকে মনে হয়?"

"বোধ হয় আমাকে,—কিন্তু ও-রা কি এরই মধ্যে সব জান্‌তে পেরেছে?"

"সে কথা ফেরবার সময়ে ও-কেই জিজ্ঞাসা করবেন।"

কমলা পরিহাস করছে বুঝ্‌তে পেরে বিনয়ের মুখে অপ্রতিভতার সলজ্জ হাস্য দেখা দিলে।

বাড়ীর পাশ দিয়েই রিজ-এ যাবার পথ, বাড়ির সীমা অতিক্রম করলেই রিজ্। রিজ্-এর এক দিকে বৈদ্যনাথ যাবার রেল-লাইন,—অপর দিকে নিম্ন অধিত্যকায় ই, আই আর কোম্পানীর মেন্ লাইন। একটা দীর্ঘ মাল-গাড়ি ঘন-কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গারণ করতে করতে বিকট ঘজো-ঘজো শব্দ ক'রে মন্থরগতি সরীসৃপের মত কলিকাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গিরি-গাত্রে একটু নেমে গেলে কয়েকটা আতা গাছের অন্তরালে একটা শিলাখণ্ড আছে; তথায় উপবেশন করলে সম্মুখের দৃশ্য প্রমুক্ত থাকে, অথচ পিছন দিক্ দিয়ে সহসা দেখা যায় না। এ ব্যবস্থাটি লোক-চক্ষু-অন্তরালকামীদের পক্ষে লোভনীয়। কমলা ও বিনয় তথায় উপস্থিত হ'য়ে সেই শিলাসনের উপর পাশাপাশি উপবেশন করল।

সন্ধ্যার ঘনায়মান ধূসরতার মধ্যে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের অস্পষ্ট আকৃতি দেখা যাচ্ছিল—তার শিখর দেশে শরৎকালের নির্ম্মল আকাশে মাজা-ঘষা চক্‌চকে দু-তিনটি তারা। চতুর্দ্দিক জনশূন্য নীরব—অপস্রিয়মান মালগাড়ীর বিলীয়মান শব্দ সে নীরবতাকে যেন পরিস্ফুট ক'রে তুল্‌ছিল। ডিগ্‌রিয়ার পাদদেশে ছোট ছোট পল্লীগুলিতে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্ব'লে উঠেচে। উভয়ে পাশাপাশি ব'সে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে বহুক্ষণ সম্মুখের উদার উন্মুক্ত দৃশ্যের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। তারপর সহসা এক সময়ে বিনয় কমলার দক্ষিণ হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে, "কমলা, কি কষ্ট তা জান?"

চমকিত হ'য়ে বিনয়ের দিকে চেয়ে দেখে কমলা বল্লে, "না।"

"আমাদের মিলনের মধ্যে দুটি প্রাণীর বিচ্ছেদ-ব্যথা বাসা বেঁধে আছে তা বোধ হয় জান না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদুকণ্ঠে কমলা বল্লে, "জানি।"

"শোভার কথাও জান?"

"জানি।"

"একজনকে তুমি অসুখী করেছ, আর একজনকে করেছি আমি।"

ত্রস্ত হ'য়ে উঠে কমলা বল্লে, "তাই কি আজ হঠাৎ চ'লে যাচ্ছেন?"

"তাই যাচ্ছিনে; যাচ্ছি যে কারণ তোমাকে বল্লাম সেই কারণে; কিন্তু ও কারণেই যাওয়া উচিত ছিল আরো অনেক আগে।"

"কেন?"

"তা হ'লে দুঃখ দেওয়ার পাপ থেকে আর একটু বেশি পরিত্রাণ পেতাম।"

এই সামান্য কথার মধ্যে দুঃখ, অভিমান অথবা অপমানের কি কারণ কোথায় লুক্কায়িত ছিল বলা কঠিন, কিন্তু কমলার চক্ষু হ'তে এক রাশ অশ্রু বিনয়ের দুই হাতের উপর ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়ল।

চকিত হ'য়ে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় বল্লে, "তুমি কাঁদছ কমলা?—তোমার মনে কষ্ট হ'তে পারে আমি ত' এমন কোনো কথা বলিনি!"

কমলা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে বল্লে, "না, কাঁদি নি।"

"কাঁদো নি? কই দেখি কেমন কাঁদোনি, একবার উঠে দাঁড়াও ত।" ব'লে বিনয় উঠে দাঁড়াল, তারপর কমলা উঠে দাঁড়ালে তার মুখের দিকে ঝুঁকে দেখ্লে সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে কমলার আনত সিক্ত চক্ষু দুটি চক্‌চক্ করছে। ক্ষণকাল অপলক চক্ষে বিনয় কমলার সেই অপূর্ব্ব সুষমা-মণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বাম হাত দিয়ে কমলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দক্ষিণ হাত কমলার মাথার পিছন দিকে রেখে সন্তর্পণে কমলার মুখের উপর একটি চুম্বন অঙ্কিত ক'রে দিলে। লজ্জায় পুলকে অননুভূত-পূর্ব্ব অনুভূতির প্রকোপে কমলার দেহ থর থর ক'রে কাঁপ্তে লাগ্ল, তার অবসন্ন মস্তক বিনয়ের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল। বিনয় সযত্নে কমলার অবশ দেহ নিজ দেহের উপর ধ'রে রাখ্লে, তারপর কিছুক্ষণ পরে কমলা একটু সুস্থ হ'লে বল্লে, "এখন বাড়ি যেতে পারবে কমলা? বাবা বোধহয় এতক্ষণ ফিরে এসেছেন। পারবে?"

কমলা মৃদুস্বরে বল্লে, "পারব।"

তখন কমলার বাহু নিজ বাহুর মধ্যে গ্রহণ ক'রে বিনয় ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

(ক্রমশঃ)

প্রসঙ্গ-কথা

রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ
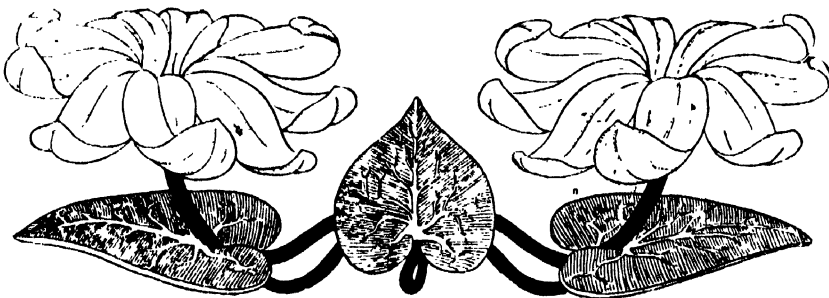
বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য—আধুনিক সাহিত্যের মতে জীবনের বাস্তবতার মধ্যে সুখের কোনো স্থান নেই, সুখ শুধু কল্পনা-বিলাস, 'যে যত দুঃখের দৈন্যের নৈরাশ্যের ছবি অঙ্কিত করে মনে হয় সে-ই তত সত্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার সৃষ্টিই বস্তুতান্ত্রিক, বাস্তব, realistic।' এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদের আরম্ভ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গানে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।' স্থানান্তরে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুঃখের উপাসনা কোথা হইতে আসিল? এটি ত ভারতের বিশিষ্টতা নহে। ভারতের সাহিত্যে অনেক দুঃখ বেদনার বর্ণনা আছে, অনেক করুণ রস আছে, কিন্তু এই ভাবে দুঃখকেই শুভ বলিয়া, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভগবানের প্রেম বলিয়া, আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া কোথাও বরণ করা হয় নাই।"

এই কথা পড়বামাত্র মনে পড়ল রূপ গোস্বামীর সুমধুর একটি শ্লোক, 'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥' বিরহ-মিলনের মধ্যে বিরহকেই বরণ করি, তার মিলনকে নয়; মিলনে একা তাকে লাভ করি, কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তার রূপে ভ'রে ওঠে। সাধারণ মতে মিলন সুখের অবস্থা এবং বিরহ দুঃখের, কিন্তু চার শ বৎসর পূর্ব্বের কবি মিলনকে উপেক্ষা ক'রে বিরহকে বরণ করেছিলেন।

প্রাচীন ভারত যে কেবলমাত্র সুখ সৌন্দর্য্য ঋদ্ধি ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করেছিল আর কিছুর করেনি, তা মনে হয় না। অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী লক্ষ্মী মূর্ত্তির সহিত করালবদনা কালী মূর্ত্তির পূজা এ দেশে এখনো চলিত আছে। রুদ্র দিগম্বর, তাঁর অঙ্গে ভস্ম, মাথায় জটা, কণ্ঠে বিষধর সর্প। খর্ব্ব স্থূলতনু গজেন্দ্রবদন গণেশ হিন্দুর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা দেবতা। 'ঋদ্ধিশ্চিত্ত-বিকারিণী' এ ভারতেরই বাণী। চণ্ডীতে দেখ্‌তে পাই, 'অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ'—অতি সুন্দরী এবং অতি ভীষণকে প্রণাম করি। যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা শুধু তাঁকেই প্রণাম করিনে, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা তাঁকেও প্রণাম করি।

কিন্তু এ ত গেল কথাটার গৌণ দিক; আসল কথা হচ্চে রবীন্দ্রনাথ 'দুঃখের কবি' কি-না। এর প্রমাণার্থে অনিলবাবু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি গানের অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক গান আছে যার দ্বারা ঠিক বিপরীতটাই প্রমাণ হয়; যথা—

> অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।
> নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।
>
> ৪র্থ সংস্করণ, ৩ পৃঃ
>
> দিকে দিকে আজি টুটিল সকল বন্ধ
> মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
> জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া। ৭ পৃঃ
>
> *　*　*
>
> এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত
> এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
> এস এস হে বিচিত্র বিধানে। ৮ পৃঃ
>
> *　*　*
>
> আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান। ১০ পৃঃ
>
> *　*　*
>
> জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে
> সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে। ১৯ পৃঃ

গীতাঞ্জলিতে ১৭৮ পৃষ্ঠা আছে, তার মধ্যে ১৯ পৃষ্ঠার ভিতরই এতগুলি গান পাওয়া গেল যাতে কবি আনন্দের উপাসনা করেছেন। অনিলবাবুর প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য

যা,—অর্থাৎ 'জীবন সংগ্রামে যাহারা পরাজিত লাঞ্ছিত, প্রাণশক্তি যাহাদের ক্ষীণ সুপ্ত, তাহারা পুরাতন অবলম্বন হারাইয়া চারিদিকে শুধুই অন্ধকার দেখিতেছে। বাংলা দেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যে আমরা ইহারই পরিচয় পাইতেছি।'—এই যে তাঁর দুঃখবাদের তত্ত্ব, সেই দুঃখবাদের আরম্ভ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে এ কথা বলা চলে ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আনন্দের যে অক্ষয় উৎস আছে তার কাছে দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হয়; তিনি বলেন, 'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানব জীবন।' —হাতে তাঁর বাঁশি, মুখে তাঁর গান, পায়ে তাঁর নৃত্য। সুখ দুঃখ কিছুই তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে না,—তাই তিনি 'গানে গানে গেঁথে বেড়ান প্রাণের কান্না-হাসি।' তাই তিনি বলেন,

গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী যে দেখি!
এ কি মিলন-চঞ্চলতা?
বিরহ-ব্যথা একি?
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে
ধরিতে যারে না পারে তারে
স্বপনে দেখিছে কি?

সুতরাং আনন্দের চেয়ে দুঃখের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। শুধু সুখ দুঃখের বিষয়েই নয়, এ কথার যথার্থতা অন্যদিকেও আমরা দেখ্‌তে পাই। আষাঢ় মাসে তিনি বলেন, "বেদনার ধারা দুর্দ্দাম দিশাহারা দুখ-দুর্দ্দিনে দুই কূল তার ছাপে।" আবার ফাগুন মাসে বলেন, "হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান ভরা ধন! বৎসরের শেষে শুধু একবার মর্ত্ত্যে মূর্ত্তি ধরো ভুবন-মোহন নব বরবেশে।" রবীন্দ্রনাথকে শুধু বর্ষার কবি বল্‌লে ভুল বলা হয় এই কারণ যে, বসন্তের প্রতি তাঁর একটুও ঔদাসীন্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদে পাশ্চাত্য প্রভাব অনুভব ক'রে অনিল বাবু বলেছেন, 'পাশ্চাত্যের মানুষ রাজসিক', 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে সর্ব্বত্র আমরা এই রাজসিক প্রকৃতিরই পরিচয় পাই। সংঘর্ষই জীবন সংঘর্ষই আনন্দ, Tragedyর রসই জীবনের রস।' কিন্তু যে কবি বলেন,

সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।

তাঁর সম্বন্ধে এ কথা বলা ঠিক চলে কি? ঢেউ খাওয়া নিশ্চয়ই জীবনের সংঘর্ষ—কিন্তু তার প্রতি কবির আসক্তি কই? তিনি চান তার হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে পরমা শান্তির মধ্যে নিমজ্জন। এ প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির ১৫৩ সংখ্যা গান—"প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে? সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে আমার তবে।" এবং অন্যান্য অনেক গান উল্লেখ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট। আনন্দের প্রতি তাঁর অনুরাগের শেষ নেই, শান্তির জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। দিবসের কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে তিনি তাঁর বাঁশি বাজান—কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হ'লেই রজনীর প্রগাঢ় শান্তির জন্য উদ্যত হ'য়ে বলেন, 'এবার তবে গভীর ক'রে ফেল গো মোরে ঢাকি অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে।'

অনিল বাবু বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে সেই কোমল খ্রীষ্টানি ভাব যাহার বশে কেহ এক গালে চড় মারিলে তাহার দিকে অপর গালটি ফিরাইয়া দিয়া বলিতে হয়, 'আরো আঘাত সইবে আমার সইবে আমারো।" কিন্তু তা যদি থাকে তা হ'লে আরো কত অধিক মাত্রায় সেই ভাব আছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে যে ধর্ম্মের অনুগামীরা মার খেয়ে বলে, 'মেরেছ কলসীর কানা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?'

অনিল বাবু তাঁর প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য সম্বন্ধে যে কথা তুলেছেন গুরুত্বের হিসাবে তার বিস্তৃত এবং উপযুক্ত আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা আশা করি তদ্বিষয়ে অনুযোগের কোন কারণ থাক্‌বে না।

—————

সম্পাদক

নানাকথা

শিল্পী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন এ-আর-সি-এ

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউস্ অলঙ্করণের জন্য ভারতবর্ষ হইতে যে চার জন শিল্পী * নির্ব্বাচিত হইয়া বিলাত যাইতেছেন তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌ সরকারী কলা শিক্ষালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন এ, আর, সি, এ মহাশয় অন্যতম। শক্তিমান শিল্পী ললিতমোহন এই গৌরবকর কার্য্যের পথে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহার বিদেশ যাত্রাকালে আমরা ঐকান্তিক চিত্তে কামনা করিতেছি, তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং দক্ষতার দ্বারা এই কার্য্যে প্রভূত যশ এবং প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া তিনি ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করুন। এই উপলক্ষে যুক্তপ্রদেশের তাঁহার শিল্পী ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়া নিম্নে তাহা মুদ্রিত করিলাম।

শ্রীহিরন্ময় রায়চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন সেন, শ্রীবীরেশ্বর সেন, শ্রীঅসিতকুমার হালদার

"হে ললিতকলাভিজ্ঞ ললিতমোহন, তোমার শিল্প-প্রতিভা এতদিন স্বদেশবাসীদের নিকট গোপন ছিল। কিন্তু বহ্নি যেরূপ ভস্মাচ্ছাদিত বেশিদিন থাকতে পারে না, একটু ইন্ধন পেলেই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে, তেমনি তোমার যশরশ্মি আজ সমস্ত ভারতে বিকীর্ণ হ'ল! আজ এই বিমল প্রভাতে কলাদেবীর বরপুত্রকে বরণ করবার জন্যে সকল ভারতের শিল্পীদের তরফ থেকে আমরা সম্বর্দ্ধনা করচি যে তোমার তুলিকা অক্ষয় ও জয়যুক্ত হউক। তুমি আজ সুদূর পাশ্চাত্যে যে ভারত চারু শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্চ, তা' প্রাচ্যের জয়গাথার মত যুগে যুগে তোমার দেশেরই গৌরব সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারে আজ ঘোষণা করুক। তোমার সহযাত্রী অন্যান্য বঙ্গীয় শিল্পীত্রয়ও তোমারই সঙ্গে একযোগে আজ আমাদের সাদর সম্ভাষণের ভাগ গ্রহণ করুন। তোমাকে আমরা কয়েকজন মাত্র আজ নিকটে পেয়েচি সুদূর ভবিষ্যতে তোমার পরিচয় পাবে যুগে-যুগে দেশ বিদেশের লোকেরা বৃটিশ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত "ভারত গৃহে" তোমার অঙ্কিত চিত্রকলায়।

* (১) শ্রীললিতমোহন সেন (২) শ্রীরণদাচরণ উকিল
(৩) শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ম্মন (৪) শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী

আমাদের তরফ থেকে ভালবাসা, অন্তরীক্ষ থেকে দেবতাদের আশীর্ব্বাদ তোমার এই মহৎ শিল্প-যজ্ঞ-উদ্‌যাপনে উৎসাহিত করুক এই আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

তোমার গুণ-মুগ্ধ

যুক্তপ্রদেশের প্রবাসী শিল্পী ভ্রাতৃবৃন্দ

আগামী সংখ্যার বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন মহাশয়ের চিত্র-কলা-পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার লিখিত একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ শ্রমিকদলের মুখপত্র 'নিউ লিডার' সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভোট গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তদনুসারে তিনটি তালিকা প্রস্তুত হয়। তাহা হইতে নিম্নলিখিত পাঁচ জন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবরূপে বরেণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। যথা,—মহাত্মা গান্ধি, বার্ণার্ড শ, আইনষ্টাইন্, প্রফেসার সগ্‌মাণ্ড ও চার্লি চ্যাপ্‌লিন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনি বেশান্তের নাম একটি তালিকাতে যথাক্রমে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে ভারতবাসী স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা ভারতের গৌরবের কথা।

রবীন্দ্র-পরিষদে রবীন্দ্রনাথ

বিগত ২রা ভাদ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ দিয়াছেন। অভিভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, সাহিত্যের ধারা যখন ঠিক মত চলে না তখনই সাহিত্যের স্বরূপ এবং তত্ত্ব লইয়া প্রখরভাবে আলোচনা চলে। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে—সাহিত্যের রসোপলব্ধি নাই, মতামতের জন্য সকলে ব্যগ্র। কিন্তু মতামতের ভিতর দিয়া সাহিত্যকে জানা যায় না। পূর্ব্বে সাহিত্যের জন্য যে ব্যগ্রতা এবং ঐকান্তিকতা দেখা যাইত বর্ত্তমান কালে তাহার একান্ত অভাব। এখন গভীর রসোপলব্ধির জন্য চিত্তকে নিবিষ্ট করার আগ্রহ ও আনন্দ নাই। আছে কেবল মাদকতার সন্ধানে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিরানন্দ পরিভ্রমণ। সাহিত্যে আদি রসের প্রাধান্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাচীন কালের চিত্রাদিতে আদিরসের সন্ধান পাওয়া যায় না মানব চিত্ত তরুণ অবস্থায় যে রসের দ্বারা অভিভূত হয় তাহা আদি রস নয়। প্রকৃত সাহিত্যের মূলে আছে নব নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি এবং তৎপ্রসূত আনন্দ। মনের Economics আছে—বায়বাহুল্য সে সহ্য করে না। সুতরাং বাংলা দেশের তারুণ্যের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে মানুষ চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিবে না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৯০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সেনেট এই উদার দান কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই টাকা হইতে ২৫,০০০৲ টাকা তিনটি বিভিন্ন রসায়ন সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে প্রদান করিয়া বাকি টাকা মূলধন স্বরূপ জমা রাখিবেন যাহার সুদ হইতে রাসায়নিক গবেষণার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে মাসিক দুই শত টাকার একটি বৃত্তি স্থাপিত হইবে।

এই দানের কৌতূহলোদ্দীপক একটু কাহিনী আছে। গত ১৯২২ সালে রায় মহাশয়ের ষাট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু সেনেটের অনুরোধক্রমে তিনি এই সর্ত্তে কার্য্যে বাহাল থাকিতে স্বীকৃত হন যে, অতঃপর তাঁহার মাসিক ১০০০৲ টাকা করিয়া বেতন তিনি গ্রহণ করিবেন না, তাহা মাসে মাসে সঞ্চিত হইয়া পরে রসায়ন বিভাগের উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইবে। সেই ব্যবস্থানুযায়ী এই ৯০,০০০ টাকার উৎপত্তি এবং গতি।

যে অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা এবং দানশীলতার দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্রের নিঃস্বার্থ পবিত্র জীবন ভাস্বর, ৯০,০০০৲ টাকার এই দান তাহারই একটি ছটা মাত্র। শুধু এই দানটিতে তিনি দেশের নিকট হইতে যে শ্রদ্ধা লাভ করিতেন তাহার শতগুণ শ্রদ্ধা তিনি ইতিপূর্ব্বেই অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.
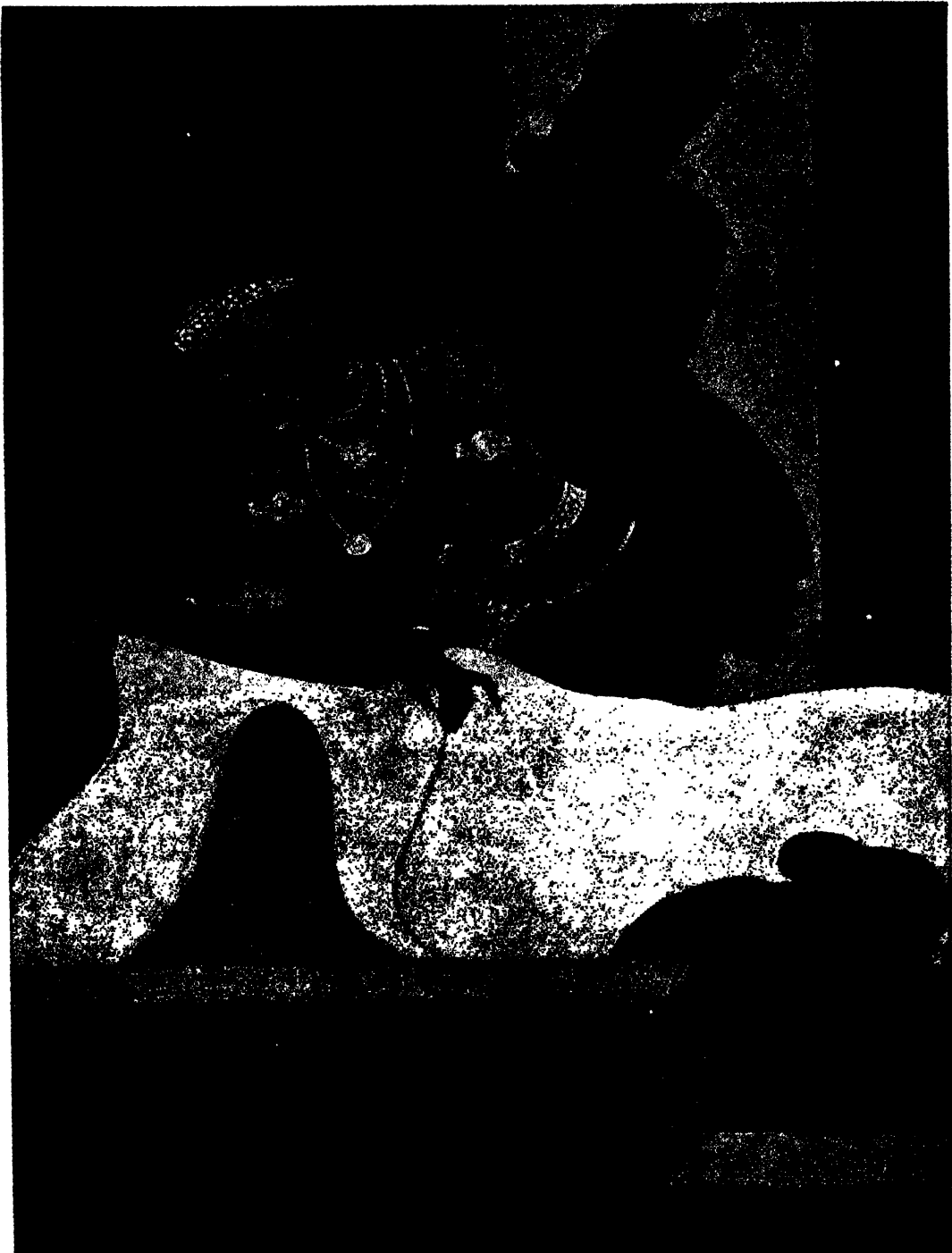
সিদ্ধার্থের মৃত্যু-দর্শন

আশ্বিন, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

তৃতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৩৬	চতুর্থ সংখ্যা

শারদোৎসব

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করত, তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হ'ত। কিন্তু মানুষের জন্ম ত কেবল লোকালয় নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জেগে উঠ্‌ছে। বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চল্‌চে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান ক'রে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নি সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন ক'রে বাজে, ইংরেজি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ "Three years she grew" নামক কবিতায় অপূর্ব্ব সুন্দর ক'রে বলেচেন। প্রকৃতির সহিত আবাধ মিলনে "লুসি"র দেহমন কি অপরূপ সৌন্দর্য্যে গ'ড়ে উঠ্‌বে তারি বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি লিখচেন:—

প্রকৃতির নির্ব্বাক ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাই এই বালিকার মধ্যে নিঃশ্বসিত হবে। ভাসমান মেঘ সকলের মহিমা তারি জন্য, এবং তারি জন্য উইলো বৃক্ষের অবনম্রতা; ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটি শ্রী তার কাছে প্রকাশিত তারি নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গীতে এই কুমারীর দেহখানি গ'ড়ে তুলবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হবে তার ভালবাসার ধন; আর, যে-সকল নিভৃতনিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হ'য়ে নেচে চলে সেইখানে কান পেতে থাকৃতে থাকৃতে কলধ্বনির মাধুর্য্যটি তার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হ'তে থাকবে।

পূর্ব্বেই বলেচি ফুল ফল ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টি-কার্য্য কেবল মাত্র এক মহলা; মানুষ যদি তার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তার পক্ষে বড় লাভ নয়। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘট্‌চে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ

যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হ'য়ে ওঠে। তখন আমরা আকাশ বাতাস গাছপালা পশু পক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার করা কখনই নিষ্ফল নয়। কারণ পূর্ব্বেই বলেচি—সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র, তখন তা না থাকারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি ;—চিত্তের দ্বার রুদ্ধ ক'রে রাখলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় প'রে চারিদিক হ'তে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জেগে ওঠে তাহলে মানুষ সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করবার জন্ত আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার ক'রে নিয়েচি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে ? লক্ষেশ্বর,—সেই বণিক আপনার স্বার্থ নিয়ে টাকা উপার্জ্জন নিয়ে সকলকে সন্দেহ ক'রে ভয় ক'রে ঈর্ষ্যা ক'রে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন ক'রে বেড়াচ্চে। এই উৎসবের পুরোহিত কে ? সেই রাজা,—যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলতে বার হয়েচেন ; লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জ্জন দেয় ব'লেই লাভ সহজ হ'য়ে সুন্দর হ'য়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই যে সুন্দরকে খোঁজবার কথা বলা হল, সে কি ? সে কোথায় ? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা সৌখীন পদার্থ ? এই কথারি উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রয়েচে।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে ব'সে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করচে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেম ঋণ পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের, সৌন্দর্য্যটি দেখতে পেলেন। তাঁর তখনি মনে হল শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণ-শোধের সৌন্দর্য্য। শরতে এই যে নদী ভ'রে উঠল কূলে কূলে, এই যে ক্ষেত ভ'রে উঠল শস্তের ভারে, এর মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই :—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পেয়েছে সেইটেকে বাইরে নানারূপে নানা রসে শোধ ক'রে দিচ্চে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভেতরের ঋণ বাইরে ভাল ক'রে শোধ করা হয় ; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য্য।

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নি ? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যায় অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করতে থাকে, তখনি দেবতা তার মধ্য হ'তে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকেই নূতন আকারে ফিরে পান, আর তখনি কি তার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না ? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটিয়ে উঠতে থাকে, ততই কি তা সুন্দর তা উজ্জ্বল হয় না ? বাধা কোথায় কাটে না ? যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্য্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে দেবতা হ'য়ে উঠতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়ে থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় ব'লে মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগিয়ে একেবারে ফুঁকে দিতে চায়,—তাকে যে অমৃত দেওয়া হয়েছিল যে অমৃতের উপলব্ধিতে সে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করতে পারে, দুঃখকে গলার হার ক'রে নেয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই অমৃতকে তখন সে শোধ ক'রে দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানব প্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য্য ; আনন্দরূপমমৃতং।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই ঋণ-শোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হ'তে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়,—

কর্ম্মকে এড়িয়ে তপস্যায় ফাঁকি দিয়ে পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলেছেন, "তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌চ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্চ।"

এই নিয়ে সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্ত্তা হয়েচে নাচে তা উদ্ধৃত করলাম :—

"সন্ন্যাসী। আমি অনেকদিন ভেবেচি জগৎ এমন সুন্দর কেন? আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করচে। বড় সহজে করচে না, নিজের সমস্ত দিয়ে করচে। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য্য।

ঠাকুরদাদা। একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি ঢেলে দিচ্চেন আর একদিকে কঠিন দুঃখে তার শোধ চলচে, এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন সমান থেকে যাচ্চে, মিলন সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌চে।

সন্ন্যাসী। যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণ শোধে ঢিল পড়চে সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই একপক্ষে কম প'ড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পূরো হ'তে পারে না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী মর্ত্ত্যলোকে দুঃখিনী বেশেই আসেন। তাঁর সেই তপস্বিনীরূপেই ভগবান্ মুগ্ধ। শত দুঃখের দলে তাঁর পদ্ম সংসারে ফুটেচে।"

লক্ষ্মী সৌন্দর্য্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা ক'রে শিবকে পেয়েছিলেন, মর্ত্ত্যলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সঙ্গে মিলন লাভ করেন। যে মানুষ বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নেই তপস্যা নেই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নেই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তার প্রভুর নিকট হ'তে প্রেম পেয়েছিল, ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করচে। দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তা-ই কুশ্রীতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

১৯

সেদিন যে জেনেরল ইলেক্‌সন হ'য়ে গেল সেটা সম্ভবত ইতিহাসের বিষয়; কিন্তু এত নিঃশব্দে ঘট্‌ল যে আমাদের কারুর বিয়েতেও ওর বেশী ধূমধাম হয়। শুন্‌লুম লণ্ডনে না হ'লেও মফঃস্বলে বেশ ধূমধাম হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাত্রীর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ ক'রে দিই :—

"আমি লেবার্‌কেই ভোট দিলুম, কারণ প্রথমত আমি সোশ্যালিষ্ট্‌, দ্বিতীয়ত আমাদের এ অঞ্চলে নির্ব্বাচনটা যাদের নিয়ে তাদের একজনের ছিল যৌবন, মগজ ও উৎসাহ, অন্যজনের জরা, জেদ ও অসামর্থ্য। তবু কিন্তু খুবই আশ্চর্য্য হলুম শুনে যে, H—নির্ব্বাচিত হয়েছেন; কেননা এই অঞ্চলটা সেই থেকেই কন্‌জারভেটিভ্‌দের একচেটে হ'য়ে এসেছে যেদিন নোআ তাঁর আর্ক্‌ থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র গোটা কয়েক ভোটের আধিক্যে H—জিতে গেলেন। আমার ঘরের কাছেই একটা নির্ব্বাচন স্থলী। শুক্রবারের রাত্রি পৌনে তিনটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় যারা ফলাফল জান্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল তাদের অতি উদ্দাম আনন্দধ্বনি শুনে। যেই আমার চেতনা ফির্‌লো, চটি পায়ে দিলুম ও ড্রেসিং গাউন্‌ গায়ে দিলুম, আর দৌড়ে গিয়ে ঢুক্‌লুম মায়ের ঘরে—সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মা'কে বিরক্ত ক'রে জানালা খুল্‌লুম, মাথা বাড়িয়ে দিলুম, একজন অচেনা পথিককে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'কে জিৎলো?' খবরটা শুনে পরম উল্লাসে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।" *

মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগ্‌লো। মাসখানেক আগে থেকে এখানে ওখানে বক্তৃতা চল্‌ছিল, ঘরে ঘরে নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুল্‌ছিল, এবং কাগজে কলমে খুবই বাণ বর্ষণ হচ্ছিল। কার কোন পক্ষে ভোট তা এক রকম জানাই ছিল, এক ফ্ল্যাপারদের ছাড়া। ফ্ল্যাপারদের ভজাবার জন্যে তিন গোসাঞি-ই বিলক্ষণ চেষ্টা করেছিলেন। তিন জনের মধ্যে সব চেয়ে পালোয়ানী চেহারা যাঁর, সব চেয়ে লম্বা গোঁফ যাঁর, সব চেয়ে অপরীক্ষিত যিনি, তিনিই প্রধান মন্ত্রী হলেন। কিন্তু কই এ নিয়ে তো হুলস্থূল বাধ্‌লো না? এর কারণ যেই মন্ত্রীদল গঠন করুক জনসাধারণের বড় বেশী আসে যায় না, রাষ্ট্র যেমন চল্‌ছিল তেমনি চলে। দোকান বাজার থিয়েটার সিনেমা ডাকঘর রেল—কোথাও কোনো পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট নয়। আমার ঘরের কাছে যে সব মজুর কাজ করছে তাদের একজন গান ধরেছে—কাবুলীতে গান গায় ("শ্রীকান্ত") সেও যেমন অবিশ্রান্ত ইংরেজেতে গান গায় এও তেমনি অপূর্ব্ব। আমরাই এবার দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা, আমাদের র‍্যাম্‌জে

* H—টি হচ্ছে আর্থার খুড়োর এক ছেলে—খুড়োর আরেক ছেলে আরেক জায়গায় জিতেছেন। খুড়োর নাম তো জানে বিশ্ব সর্ব্ব জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি বল্‌বো না।

সর্দারকে রাজা দেশের সর্দার করেছেন, এই ভেবে তার যদি গান পেয়ে থাকে তবে ধন্য বলতে হবে। নইলে এমন সুন্দর মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনটাতে কি কেবল পাখীই গান গাইতো, মানুষ তার পাল্টা গাইত না?

ইংরেজ মজুর শ্রেণীর লোকেরা খুব শিষ্ট—তারা হল্লা কর্‌তে দাঙ্গা কর্‌তে শান্তিভঙ্গ কর্‌তে জানে না। তবে চিরদিন যে তারা এত সুবোধ বালক ছিল ইতিহাসে কিম্বা জনশ্রুতিতে ওকথা বলে না। ক্রমে ক্রমে ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রভৃতির দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ হবার পর থেকে ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার কর্‌বার পর থেকে তারাই হয়েছে দেশের সব চেয়ে আইন্-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনাস্থা যদি কেউ দেখায় তো সে বড়লোক মোটরওয়ালা কিম্বা নাইট্‌ক্লাব্‌ওয়ালী। মোটের উপর ইংরেজ মাত্রেই অত্যন্ত আইন্-বশ। পুলিশকে বাধা দেবার কথা তো কেউ ভাব্‌তেই পারে না, পুলিশকে সাহায্য কর্‌বার জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিশের উপরে খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিশও যার পর নাই ভদ্র হ'য়ে উঠেছে। আগে এতটা ছিল না, তার প্রমাণ আছে। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংলণ্ড দেশটি ছোট ও সব ক'টি ইংরেজ রক্ত সম্বন্ধে এক হওয়ায় আইন অমান্য কর্‌তেও মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না, হ'লেও তেমন মানুষের সঙ্গী জোটে না, ধরা পড়াও তার পক্ষে সোজা। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা ইংলণ্ডে ক্রাইম্ ক'মে আস্‌ছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা—এ দুটোকে আমাদের দেশে ক্রাইম বলে না, এ দুটোর বিচার কর্‌তে এদের আদালতের অনেক সময় যায়। দ্বি-বিবাহ বেশ বাড়্‌ছে ব'লেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে লোকমত হু হু ক'রে বদ্‌লাচ্ছে বল্‌তে হবে। কেন না দ্বি-বিবাহকারীকে বিচারক নাম মাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই সর্ত্তে যে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না ও প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে। যে দেশে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী সে দেশে এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভালো। দুয়ো সুয়ো দুটিকে নিয়ে একসঙ্গে ঘর করাটা নিতান্ত প্রাচ্য প্রথা, তাঁ'তে পাশ্চাত্যদের সংস্কারে বাধে।

ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তাই। অথচ আইন সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রতিদিনই বলাবলি কর্‌ছে যে, "অমুক আইনটা এত অযৌক্তিক যে সবাই ঐ আইন ভাঙ্‌ছে, আর পুলিশ নিজেও যখন বোঝে ওটা অযৌক্তিক তখন অপরাধটা দেখেও দেখ্‌ছে না। এমনি ক'রে একটা আইন ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে সব আইন ভাঙ্‌তে মানুষ প্রশ্রয় পাচ্ছে। অতএব অমুক আইনটা বদ্‌লানো দরকার, তুলে দেওয়া দরকার।" আচার সম্বন্ধে আমরাও যদি প্রতিদিন এমনি বলাবলি কর্‌তুম তবে আচার-মাত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত ঔদাস্য এবং অশিক্ষিত সাধারণের একান্ত আসক্তি দেখা যেতো না। ইংরেজ সমাজের মাথা হচ্ছে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট।* নিকটে যে আমাদের দেশে পার্লামেণ্ট জাতীয় কিছু গ'ড়ে উঠ্‌বে ও আমাদের অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত শাসন কর্‌বে এমন আশা করা শক্ত। হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক না হ'য়ে সামাজিক হ'য়ে থাক্‌তো তবে হয় তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্ত্তি পেতো। আগে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতের নিজস্ব আচার নিয়মক সভা ছিল এখন সমগ্র হিন্দু সমাজের তেমনি কোন সভা কেন হয় না, যে সভায় প্রত্যেক জাতের প্রতিনিধি ব'সে সকল জাতের সাধারণ আচার নির্দ্দেশ কর্‌বেন? এই সভার অধীনে সামাজিক আদালত থাকে না কেন, যে আদালতে অনাচারের প্রতীকার হয়? গ্রাম্য স্থবিরদের অত্যাচার থেকে সমাজকে উদ্ধার ক'রে ন্যায়সঙ্গত আচারের প্রতি মানুষকে সশ্রদ্ধ করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় কি?

ভারতীয় চরিত্রের মূলকথা যেমন সমন্বয়, ইংরেজ চরিত্রের মূলকথা বিনিময়। ইংরেজ কঞ্জুষ নয়, কিন্তু হিসাবি। একটা পেনীরও হিসাব রাখে—নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে নিলে নিজের স্ত্রীকে ফেরৎ দেয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হওয়া ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব, তার খাদ্য

* কেউ তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি না, শ্যালী কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি না - পার্লামেণ্ট্ এ সম্বন্ধে বিধান দেয়। আগে ছিল চার্চের এলাকা। এখন চার্চের অধীনে আদালত নেই।

আন্‌তে হয় বিদেশ থেকে, বিদেশকে দিয়ে আস্‌তে হয় পরিধেয় বা অন্য কিছু। এম্‌নি ক'রে তার বিনিময়বোধ পাকা হয়েছে, বণিকসুলভ বৃত্তিগুলি পোক্ত হয়েছে। ফরাসী দোকানদার ও ইংরেজ দোকানদার দুইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় ইংরেজ দোকানদার কঞ্জুষ নয়, ঠকায়ও না, ভদ্রও, কিন্তু দোকানদারের বেশী নয়, মানুষ নয়। ফরাসী দোকানদার দোষে গুণে উল্টো। ইংরেজকে নেপোলিয়ন দোকানদার ব'লে সেই যে প্রশংসাপত্রটা দিয়েছিলেন সেটার মর্ম্ম এমন নয় যে ইংরেজ ঠকায়, সেটার মর্ম্ম ইংরেজ বিনিময়শীল। গ্রাহককে খুসি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে, কিন্তু দেনা পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না। আত্মীয়তার জন্যে ক্লাব আছে খেলা-ক্ষেত্র আছে। দোকানে শুধু প্রয়োজন-বিনিময়। আমার ঘরের অনতিদূরে স্বামী স্ত্রীর দুটো আলাদা দোকান, দুই আলাদা তহবিল, এক জনের কাছে আরেকজন সওদা করলে তক্ষুনি বিল্ লিখে দেয়। এদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার কেন গ'ড়ে উঠ্‌লো না? পরিবারও কেন ভেঙে গেল? যে কারণে বার্টার থেকে আধুনিক এক্‌সচেঞ্জ অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই কারণে স্বামী স্ত্রীর দুই উপার্জ্জন দুই তহবিল হয়েছে। সন্তানের জন্যে দু'পক্ষ চাঁদা দেবে, কথা চল্‌ছে। তারপর সন্তানরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করলে মা-বাবার কাছ থেকে মাইনে পাবে এমন কথাও শোনা যায়। এক কথায়, যার যতটুকু যোগ্যতা সেটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এবং দু'পক্ষের যোগ্যতার ভগ্নাংশ টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় করতে হবে। আমরা ওটা হৃদয়ের মধ্যস্থতায় ক'রে থাকি ব'লে আমরা এখনো বার্টারের যুগে আছি, আমরা "সভ্য" হ'য়ে উঠি নি। সভ্যতার লক্ষণ ভগ্নাংশ-ভাগ, চুলচেরা বিচার। অতি সূক্ষ্ম ন্যায়। এদেশের ভিক্ষুক যে দেশলাই বেচ্‌বার ভাণ ক'রে পয়সা চায় এও বিনিময়শীলতার বিকার। কিছু না দিয়ে শুধু নিলে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যায়—ওটা একটা ক্রাইম। আইনের চোখে ভিখারী হচ্ছে আসামী!

জগতের অন্তত একটা জাতির এই গুণটি চরিত্রগত হওয়ায় জগতের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও কত লাভ হয়েছে ভাবী কাল তা খতিয়ে দেখ্‌বেই। ইংরেজ যত দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে তত দেশকে এক সূত্রেও বেঁধেছে, ঐক্য দিয়েছে। মৌমাছি যেমন ফুলদের মধু নেয় তেমনি মিলন ঘটায়। মধুটা ঘটকালীর মজুরী। তা' ছাড়া, মৌমাছিরও তো অন্নদায় আছে। ফুলেরা চাঁদা ক'রে তাকে না খেতে দিলে সে বাঁচে কি ক'রে?

নানা কারণে ইংরেজ এখনো বহুকাল বাঁচ্‌বে। প্রথমত মৌমাছির কাজ এখনো শেষ হয় নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক প্রকার লীগ্ অব্ নেশন্‌স্‌ই বটে। নূতন লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ যতদিন না শৈশব অতিক্রম ক'রে আন্তর্জ্জাতিক ঘটকালীর দায়িত্ব নেয় ততদিন সে দায়িত্ব ব্রিটিশ্, ফ্রেঞ্চ ও ডাচ্ লীগ্ অব্ নেশন্‌স্‌গুলোরই থাকবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী ভাষা ক্রমশ সার্ব্বভৌম ভাষা হ'য়ে ওঠায় পৃথিবীর সবাইকেই ইংলণ্ডে এসে ও ভাষায় নিপুণতা লাভ ক'রে যেতে হবে কিম্বা ইংলণ্ড থেকে লোক নিয়ে নিজের দেশে ও ভাষায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। কিছুকাল আগে যখন ফরাসী ছিল বিশ্বভাষা তখন বিশ্ব ছিল ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত। এখন বিশ্বের সীমানা বেড়ে বেশ গোল-গালটি হয়েছে—এখন কাফ্রীর সঙ্গে কাশ্মীরীকে কথা কইতে হবে ইংরাজীতে। "Talkies"-এর দৌরাত্ম্যে ইংরেজী ভাষার ছিরি যেমনি হোক প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ভাষা শিক্ষা-রাজধানী প্যারিস্ থেকে উঠে এসে লণ্ডনে ও লণ্ডনের চতুঃপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হলো ব'লে। এদিকে কিন্তু বিশ্বের বাণিজ্য-রাজধানী নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিলো ও যন্ত্রশিল্প-রাজধানী বার্লিনে। বার্লিন এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। তার লোক সংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ। একা বার্লিন শহরেই একশ তেরটা মাটির উপরের রেল ষ্টেশন ও একাত্তরটা মাটির নীচের রেল ষ্টেশন আছে।* এরোপ্লেনের রাস্তা আছে আঠারটা (গ্রীষ্মকালে), ও সাতটা (শীতকালে।) এখন থেকে প্যারিস্ হবে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদ-রাজধানী। এবং জেনেভা রাজনীতি-রাজধানী।

* এ ছাড়া আধা-উপরে আধা নীচের রেল ষ্টেশন উনচল্লিশটা।

বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়ানো—এক দেশের অভিজ্ঞতা আরেক দেশে পৌঁছে দেওয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অষ্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ঈজিপ্টের। ইংরেজ জাতিকে বিধাতা ঘরছাড়া ক'রে সৃষ্টি করেছেন, এরা চ'রে বেড়ায়, খুঁটিতে বাঁধা থেকে জাবর কাটতে জানে না। এই কারণে ইংরেজের সেই সব কোমল বৃত্তিগুলি নেই যা আমাদের আছে, (অনেকটা) ফরাসীদের আছে। কোলের ছেলেকে ভারতবর্ষ থেকে কিম্বা হং কং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়, বয়স্ক ছেলের বিয়ের পরে এক শহরে থেকেও কদাচ দেখ্‌তে আসে—এমন মা-বাবা একমাত্র ইংলণ্ডেই সম্ভব। আমাদের যেমন মামা-মামী মাসী-মেসো কাকা-কাকী ও পিসে-পিসীতে ঘর সংসার জমজমাট, এদের তেমন নয়; গার্হস্থ্য বৃত্তিগুলি এদের ভোঁতা। হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কাজ নষ্ট হয় যে! বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড় ব'লে মানে।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রেমের কবিতা ইংরেজী ভাষায় যত ও যত রকম ও যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালী কবি কোনো দিন সর্ব্বস্ব পণ ক'রে ভালোও বাসেন নি, ভালোবাসার কবিতাও লেখেন নি। গদ্য কবিদের মধ্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজীতে প্রেমিক কবির সংখ্যা হয় না। দ্বিতীয়ত love কথাটার সংজ্ঞা কি তা কোনো ইংরেজ জানে না; তবু বিবাহ কর্‌বার আগে love কর্‌তে হবে এ কথা অন্য কোনো সমাজ এতটা জোরের সঙ্গে বলেছে ব'লে আমার মনে হয় না। আমাদের সমাজে ওটা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ—আমাদের বিবাহ ব্রহ্মচর্য্যের পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কর্‌বার তোরণ। ধর্ম্মের পরে কাম, তার আগে নয়। ফরাসীরা যদিও প্রেমের নামে গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠে ও আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরদের মতো সহস্রবিধ প্রেমের লক্ষণ আওড়ায় তবু ও প্রেম মস্তিষ্কজাত (cerebrale) ও বচনবহুল। ওরা মাথা দিয়ে অনুভব করে ও কথা দিয়ে তন্ন তন্ন করে; কিন্তু বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের বোবা আকুতি ইংরেজরাই বোঝে। Love-making ও love এক জিনিষ নয়। প্রথমটার চর্চ্চা প্যারিসের একচেটে হ'তে পারে, কেননা প্যারিসের লোকের হাতে কাজ নেই; দ্বিতীয়টা ইংরেজের মতো অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌-প্রকৃতি কাজের মানুষদের জীবনে অপ্রত্যাশিত রূপে এসে বহু বৎসরের কাজ একদিনে নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

চরম প্রকাশ। এই প্রকাশেই হচ্ছে হ্যামলেটের সৌন্দর্য্য। শেক্‌সপীয়ারের অনেক আইডিয়া ইতিহাস থেকে নেওয়া। সুধু আইডিয়া নিয়েই যদি আলোচনা করা যায় তা হ'লে শেক্‌সপীয়ার যে সুধু মৌলিক ন'ন—তা নয়, তিনি অপহারক। কিন্তু আমরা শেক্‌সপীয়ারকে তা বলি না, বলি আর্টের মহারথী; স্রষ্টা। Formএর জন্যই তাঁর মহত্ব। এর জন্যই আমরা হ্যামলেটের চেয়েও বড় বলি শেক্‌সপীয়ারকে। বিধাতা যদি কেবল ইচ্ছাই করতেন, তা হ'লে কেউ তাঁকে স্রষ্টা বলত না। তিনি সৃজনও করলেন। শুধু স ঐক্ষ্যৎ নয়—স অসৃজৎ। এই সৃজনের মূলে রয়েছে রূপ—form.

তা হ'লে আমরা বলতে পারি যে আর্টের অর্থই হচ্ছে এই রূপসৃষ্টি। এমন সৃষ্টির উপাদান ভিন্ন ভিন্ন আর্টে আলাদা এবং এই উপাদানগুলির মূল্য সৃষ্টির মতনই অসাধারণ; তার সমকক্ষ। কবির উপাদান ভাষা এবং ছন্দ। ড্রামার উপাদান ত্রিবিধ: কথা, অভিনয় এবং ষ্টেজ। ক্রমানুসারে, ড্রামার স্রষ্টা তিন জন; নাটককার, অভিনেতা এবং ষ্টেজের কর্ত্তা—Producer। প্রাচীন যুগে নাটকারেরই মহত্ব ছিল সবার চেয়ে বেশী, আজকাল তিন-জনেরই সমান। আমি 'ড্রামাটিষ্টের উপাদান' না লিখে 'ড্রামার উপাদান' লিখলাম এই জন্য। কথা নিয়েই ড্রামা হয় না; নাটককারই সব নয়।

২

নাটক সম্বন্ধে ভাবলে সর্ব্বপ্রথম মনে হয় আমাদের দেশে ট্র্যাজাডির অভাব। আমি কালিদাস ভবভূতি থেকে আরম্ভ ক'রে ডি, এল রায় রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভাবি—ট্র্যাজাডির অস্তিত্ব পাই না।

কালিদাসের শকুন্তলা করুণরসে পরিপূর্ণ। সুন্দর এই রচনা। কিন্তু এর সৌন্দর্য্য কোমল। ট্র্যাজাডির প্রকৃত বিকাশ হয় অধিকাংশ পুরুষের চরিত্র নিয়ে। কারণ, ট্র্যাজাডির জন্য যে ভীষণ নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন হয়, নারীর মধ্যে তা সম্ভব নয়। নারীর সব সময়েই একটা না একটা অবলম্বন থাকেই। শকুন্তলা দুষ্মন্তের বিস্মৃতির জন্য বিদগ্ধা, কিন্তু তবু তার কাছে রয়েছে তার শিশু—সান্ত্বনার প্রতীক্ রূপে। নারীর চরিত্রে বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাবাতও নেই; এবং এ বিদ্রোহের অভিব্যক্তিই হচ্ছে ট্র্যাজাডির একটা প্রধান অংশ। অন্ততঃ এই দুটি কারণে শকুন্তলায় ট্র্যাজাডির কোন চিহ্ন নেই। কালিদাসের emphasis দুষ্মন্তের উপর নয়, শকুন্তলার উপর। কালি-দাসের প্রতিভা বিলক্ষণ। সেই পুরাতন যুগেও তিনি রচনা-বিধির যা পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। কিন্তু জীবনের ট্র্যাজাডি দেখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। শকুন্তলা ট্র্যাজাডির কাছেও যায় নি। কাছে গিয়েছে ভবভূতির উত্তররাম।

ভবভূতি সম্বন্ধে আমার অভিমত একটু অদ্ভুত ব'লে মনে হবে। ভবভূতির রচনায়—উত্তররামচরিতে—ট্র্যাজাডির সব ভাবই বর্ত্তমান। এঁর emphasis সীতার উপর নয়, রামের উপর। রামের চরিত্র গভীর; তাঁর দুঃখ ব্যাপক এবং নির্ম্মল; তাঁর শক্তি প্রচুর। শকুন্তলার মতন, তাঁর চরিত্র আমাদের মনে করুণার ভাব জাগায় না—(করুণার মধ্যে দয়ার ভাব রয়েছে) জাগায় শ্রদ্ধা। রাম শক্তিশালী; নিজের অপরিসীম দুঃখ বহন করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। দুঃখের অনুভূতিতে তিনি একা, কিন্তু দুর্ব্বল ন'ন। তাৎপর্য্য এই যে, রাম এক মস্ত ট্র্যাজিক ক্যারাক্টর; তবু উত্তররাম ট্র্যাজাডি নয়। এই নাটকের শেষের দিকে ভবভূতি সাহিত্যের সংস্কার রক্ষা করবার জন্য দিলেন মিলন করিয়ে। লোক হয় ত খুসী হ'ল; কিন্তু ট্র্যাজাডি হ'ল নষ্ট। এই সুখান্তক শেষ করবার যে উদ্দেশ্য, তার বিষয়েই আমার অভিমত অদ্ভুত বলছিলাম।

আমাদের পুরাতন আধ্যাত্মিক স্পেশালিষ্টরা ট্র্যাজাডির বিরুদ্ধে কতগুলো নিয়মের সৃজন করেছিলেন, এ কথা আমি জানি। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। ভবভূতির প্রতিভা এমন প্রখর যে আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না যে, শুধু লোককে খুসী করবার জন্য, কিংবা সাহিত্যের তৎকালীন নিয়ম পালনের জন্য, তিনি সুখান্তক মিলন করিয়ে দিলেন। প্রতিভার একটা গুণ হচ্ছে এই যে সে সৃষ্টির জন্য নিয়ম ভঙ্গ করে। ভবভূতি তা পারতেন; তাঁর ব্যক্তিত্ব (personality) যে খুব প্রবল তা তাঁর রচনায় দেখা যায়। ব্যক্তিত্ব প্রবল না হ'লে ট্র্যাজাডির

যথার্থ অনুভূতি হওয়া কঠিন। তবে ভবভূতি এমন ক'রে তাঁর নাটকের শেষ করলেন কেন? আমার মতে, তিনি সাধারণ লোকরুচির প্রতি বিদ্রূপ করবার জন্যই সুখান্তক শেষ করলেন।

শেক্‌সপীয়ারের As You Like It নামক ড্রামার আলোচনা করবার সময় বর্ণর্ড শ এই কথা বলেছেন: "When Shakespeare was forced to write popular plays to save his theatre from ruin, he did it *mutinously* calling the plays, "As *You* like it, Much Ado About Nothing." আমার মনে হয়, উত্তররাম লিখবার সময় ভবভূতির মনে এই mutinyর ভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি সাধারণ লোকের রুচিকে অবজ্ঞা ক'রেই, বিদ্রূপের জন্য, তাঁর নাটকের সুখান্তক শেষ ক'রে দিলেন। তিনি হয়ত এই রকম ভেবেছিলেন: "যদি এত বড় ট্র্যাজাডির মূল্য দু এক কথায় তোমাদের জন্য নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, তোমরা যদি সামান্য একটা বাক্য কিংবা ঘটনার জন্য এই এত গভীর এবং ব্যাপক দুঃখ ভুলে যেতে পার—তা হ'লে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি দিচ্ছি তোমাদের ভুলিয়ে। কিন্তু মনে রেখো যে, এই ভুলে যাওয়াই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি।" সুতরাং যখন রাম কাতর হ'য়ে "হা দেবি! হা দেবি!" ক'রে চীৎকার করেন, তখন ভবভূতি অলক্ষিতে হাসেন এবং বলেন, "ঘাবড়ে যেয়ো না! এই শোন লক্ষ্মণ কি বলছে।" লক্ষ্মণ মুরুব্বির মতন রামকে বুঝিয়ে দেন—"নাটকমিদং।"

এইটা যদি ঠিক হয় তা হ'লে ভবভূতি আজকালকার সুখান্তক শেষ লেখকেদের গুরু কিংবা prototype ন'ন। তাঁর সুখান্তক শেষ সাধারণ লোকের জন্য এক blind; রসিক জন তাকে বাদ দিয়ে উত্তররামচরিতের ট্র্যাজিক গুণে মুগ্ধ।

সে যাই হ'ক, প্রাচীন সময়ে ট্র্যাজাডির বিকাশ না
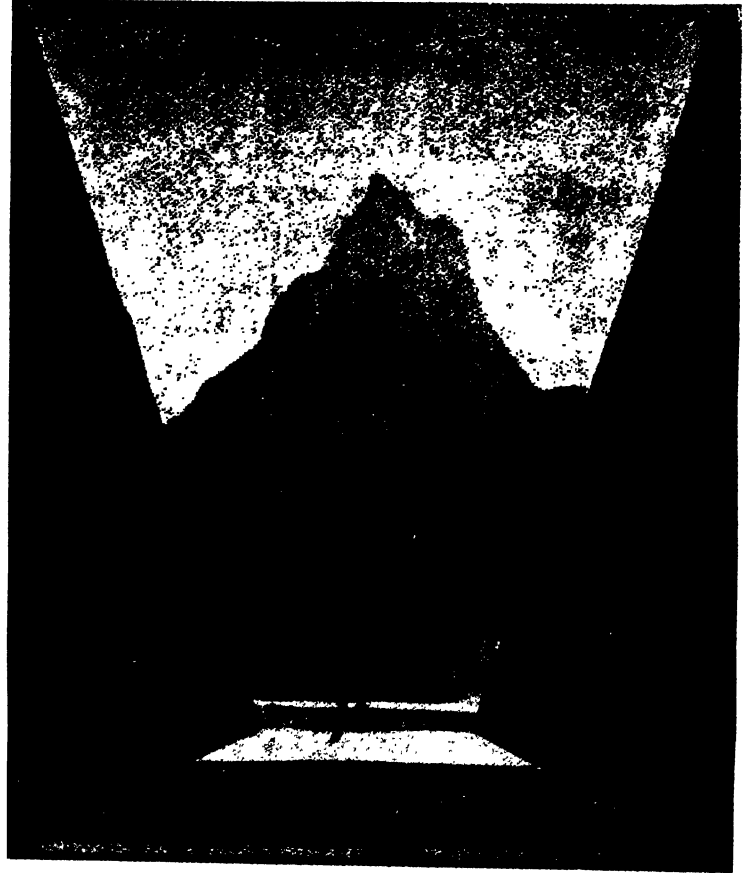
Fantastic setting এ একটি নমুনার ইব্‌সেনের Peer Gynt এর জন্য

হওয়ার প্রধান কারণ ছিল আমাদের অন্ধ নীতির অত্যাচার। বড় একটা চরিত্র সমাজে জন্ম নিত না। সকলের আত্মা আজকালকার জিনিষের মতন mass production এর নিয়মেই ফুটে উঠত। তারপর, যদি দু একজন বড় হতেন এবং তাঁদের জীবনে দেখা যেত এক গভীর দুঃখের প্রকাশ, তবে আমাদের নীতিজ্ঞ পণ্ডিতরা বলতেন—"কর্ম্মফল!

যদি এই জন্মের নয় ত পূর্ব্বজন্মের।" এই পেটেন্ট থিওরিই ছিল আমাদের যা-কিছু। জগতের কোন রহস্যই আমাদের কাছে অজানা থাকত না; সবই যেন সোজা। রহস্যবোধই হচ্ছে আর্টের প্রথম কথা। আর্টিষ্টের মনে যখন "কেন কেন, কেন"র প্রশ্ন জাগে তখন সে সমস্ত সৃষ্টির রহস্যে যোগ দেয়। সৃষ্টিতে এই প্রশ্নের চেয়ে বড় রহস্য আর নেই। আর্টিষ্ট অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে কেবল তার প্রতিধ্বনি করে তার রচনায়। আমাদের দেশে প্রাচীন সময়ে প্রথমতঃ কেউ কিছু জিজ্ঞেসই করত না। যদিই বা রহস্যবোধের প্রেরণায় দু একজন এই "কেন"র প্রতিধ্বনি করতেন তা হ'লে সহস্রাধিক বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ নরনারী চীৎকার ক'রে বলত, "ওহে মূঢ়! কেন এই প্রশ্ন! এ যে কর্ম্মফল—ভাগ্য!" এমন ক্ষেত্রে আর্টের সৃষ্টি বড় বেশী হয় না। আমাদের দেশেও হ'ল না।

কিন্তু আধুনিক যুগের এ অবস্থা নয়। এখন আমরা স্বাধীন; অন্ততঃ মনে। তবু আজকালকার দিনে একটাও ট্র্যাজাডি লেখা হয় নি কেন? আমাদের সাধনা কি এত বাহ্য? আমাদের রুচি কি এতই স্থূল? সমস্ত জাতির রুচির বিকাশ হয় একজনের প্রতিভায়। আজকালই যে দেশে গান্ধির মতন ট্র্যাজিক ক্যার‍্যাক্টারের জন্ম হয়, সেই দেশে রমা রলাঁর মতন ট্র্যাজাডির স্রষ্টার জন্ম হয় না কেন? আমি উত্তর দেব না; জানি না ব'লে। তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে ডি, এল রায়ের একটাও নাটক ট্র্যাজাডি নয়; রবীন্দ্রনাথেরও নয়। আমি শাজাহাঁ পরপারে ইত্যাদি ভুলিনি; রক্তকরবীও আমার মনে আছে।

এইবার প্রশ্ন অনিবার্য্য—ট্র্যাজাডির বিশেষ গুণ কি?

৩

গ্রীকদের যুগে ট্র্যাজাডির রূপ এবং অর্থ বড়ই স্থূল ছিল। অরিষ্টাটল তাঁর Poeticsএ লিখেছেন যে ট্র্যাজাডি হচ্ছে "an action that through pity and fear effects the proper purgation of these emotions." এই purgationএর জন্যই গ্রীক নাটককারের emphasis ছিল নীতির বিজয়ের উপর। অর্থাৎ একজন পাপীকে দুঃখ সহ্য করতেই হবে। তা ছাড়া ট্র্যাজাডির মূলে থাকত একজন বড়লোক। বড়লোকের অর্থ রাজা কিংবা যোদ্ধা; এবং actionএর অর্থ যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা। সন্তাপের অনুভূতিই দুঃখের মূল—ট্র্যাজাডি। বলা বাহুল্য, গ্রীকদের সময়ে ট্র্যাজাডির প্রকাশ স্থূল ছিল এবং রচনাবিধি চমৎকার হ'লেও actionএর ভাবটা ছিল বড়ই প্রাথমিক।

রিনেসাঁর পর, মানুষের জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি নব নব রূপে জাগ্রত হ'ল। লিয়ারের রচনায় শেক্‌সপীয়ার প্রমাণ ক'রে-দিলেন যে, ট্র্যাজাডির জন্য যুদ্ধ-হত্যা আবশ্যক নয়; তার বীজ মানুষের মনোভাবে নিহিত এবং সেইখানে তার বিকাশ। লিয়ারের সমস্ত ট্র্যাজাডিই মনোভাবের। এই মতাবলম্বে গেটে লিখলেন ফষ্ট।

অতি-আধুনিক যুগে এই সংস্কারের উৎকর্ষ দেখা যায়। শেক্‌সপীয়ারের পর য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রতিভাশালী লেখকরা বরাবরই আর্টের নানা ক্ষেত্রে ট্র্যাজাডির বিকাশ সূক্ষ্মরূপে করবার চেষ্টা করেছেন। এখন শুধু নাটকেই নয়, কথা সাহিত্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। আজকাল-কার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজাডি রলাঁর জাঁ ক্রিস্তাফ। এরই সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমি বোঝাবার চেষ্টা করব ট্র্যাজাডির বিশেষ গুণ কি?

ক্রিস্তাফ একজন রাজা, বাহিরের নয়, মনের। তার হৃদয় যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র; সংসারের শত শত অসত্যের সঙ্গে তার যুদ্ধ। তার চিরবিদ্রোহী আত্মার কাছে সে নিজেই অপরিচিত। সে মহান্। তার বন্ধু নেই, বান্ধবী নেই। সে একা। জীবনের কত মুহূর্ত্তে কত প্রণয়; কত সুখ, কত ব্যথা। তার হৃদয়ের মাঝে বিরাটের সুর সব সময়েই eternal passion, eternal painএর ভাব জাগায়। সে মরে আবার বাঁচে। একটা মৃত্যুর মধ্যে অপর জন্মের বীজ। তার জরা নেই; সে চিরকুমার। পাপের পঙ্ক দিয়ে যায়, তবু সে নিষ্পাপ। কেউ তাকে বোঝে না। কেউ তাকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসে না; সে যে ভালবাসার বার। সে কাঁদে এবং হাসে। প্রতিদিনের জীবনেই সে নিজেকে খুঁজে নেয়; আবার হারিয়ে ফেলে। ভীষণ অশান্তিতে তার মস্তক ছিন্ন; শত শত ঘা তার বুকে। সে সমস্ত সংসারকে

আপন ক'রে নিতে চায়; সংসার তাকে বোঝে না। শান্ত হ'য়ে আসে ক্রিস্তাফ। তার জীবনশক্তির ভাণ্ডার রিক্ত। সে হেরে যায়, কিন্তু হেরে যাওয়াই তার একমাত্র বিজয়। তার মৃত্যু জন্মের প্রতীক! অনন্ত জীবনের ভৈরবস্তব!

এই সুন্দর রচনার ভিতর দিয়ে যে রস-ধারাটি প্রবাহিত তার নাম magnitude of suffering। এই হচ্ছে ট্র্যাজাডির আসল গুণ। এটা অনুভব করবার জিনিষ; ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে না। লিয়ারের মধ্যে এই গুণ আছে; হ্যামলেটের অথেলোর মধ্যেও। কিন্তু এরা সকলে বাইরের দিক দিয়ে বড়লোক। ক্রিস্তাফ বাইরের দিক দিয়ে নগণ্য। ক্রিস্তাফের ট্র্যাজাডি অন্তরের।

আমাদের দেশে একটিও রচনা এমন নেই যাতে এই magnitude of suffering আছে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর রাজা এক অদ্ভুত সৃষ্টি; কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট। তা ছাড়া, তার দুঃখ বহুধা নয়; শত শত মৃত্যুর পথ দিয়ে তার যাত্রা হয় নি। তবে, রক্তকরবীর আলোচনা ট্র্যাজাডির standard নিয়ে করা যায় না। আমি এর সম্বন্ধে দু এক কথা লিখলাম এই জন্য যে অনেকে তাকে একটা ট্র্যাজাডিই ভাবেন—সূক্ষ্ম প্রকারের।

৪

জাঁ-ক্রিস্তাফের মতন চরিত্র সব সময়ে সৃষ্ট হয় না। রমা রলাঁর অন্য রচনাগুলি (অন্ততঃ নাটকগুলি) তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি জাঁ-ক্রিস্তাফের standard আর কোথাও রাখতে পারলেন না; না রাখাই ভাল। আমার বিষয় হচ্ছে ড্রামা এবং প্রতিপাদ্য হচ্ছে নাটকে আমাদের দেশে ট্র্যাজাডি নেই। ট্র্যাজাডির একটা বিশেষ গুণ নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার বলি, ড্রামার অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ অভিনয়ে এবং ষ্টেজে—আমরা এখনও মধ্যযুগে।

Realistic setting-এর একটি নমুনা—ডিকেন্সের Pickwick-এর জন্য
Producer: Basil Dean, London.

আমাদের দেশের অভিনয় সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন অভিনেতাকে দোষ না দিয়ে আমি দোষ দিই নাটককারকে। যে অভিনেতা "রঘুবীরের" বিশেষণের পর বিশেষণের রেসিটেশন্ করে সে কখনও রক্তকরবীর রাজার একটাও বাক্য বল্‌তে পারবে কি?

যে প্রতিদিন "দ্রুতবেগে প্রবেশ" এবং "ছুটিয়া প্রস্থান" করে, সে সংযমের ভিতর দিয়ে তার শক্তি প্রকাশ করবে কি ক'রে?

আমাদের দেশের নাটককার ভাবেন—"আমিই স্রষ্টা। অভিনেতা আমার অধীন। আমার যা ইচ্ছা তার তা-ই কর্ত্তব্য।" তাঁর ধারণা ষ্টেজ একটা রঙ্গমঞ্চ; অভিনেতা সজীব পুতুল; অভিনয়—after all একটা তামাসা। য়ুরোপের কিন্তু সব কথাই আলাদা।

মায়ার পূর্ব্বরঙ্গ

প্রথমতঃ, এখানে ষ্টেজকে এখন সকলে বাস্তব ভাবে। তার অর্থ এই যে, ষ্টেজ বাস্তবিক জীবনেরই চিত্রপট—একটা ঘর যার fourth wall (যবনিকা) দর্শকের জন্য তুলে নেওয়া হয়। দর্শকরা যেন চুরি ক'রে জীবনের দৃশ্য দেখেন। এর ফলে অভিনয়ের মধ্যে বাস্তবতা এসেছে এবং দর্শকের মধ্যে এসেছে ড্রামার প্রতি শ্রদ্ধা। আলোকিত হয় শুধু ষ্টেজ; দর্শকরা সকলে অন্ধকারে থাকেন। তা ছাড়া একটা সুন্দর অভিনয়ের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যের স্থলে (ভুল উচ্চারণের সহিত) কেউ encore encore চীৎকার করেন না।

অভিনেতা চায় অবসর। নাটককারের একটা কার্য্য হচ্ছে অভিনেতার জন্য অবসর গড়া। কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে an understanding of mutual values। আমরা এর মূল্য বুঝি না। নাটককার ভাবেন কথাই সব; অভিনেতা ভাবেন, কথায় কি আছে, অর্থ ত ফুটাই আমি। আবার Producer এ সব নিয়ে মাথা ঘামান না; আমাদের দেশে Producer নেই, আছেন ম্যানেজার। তার কর্ত্তব্য সাধারণ লোকের নাড়ীর উপর হাত রাখা; এ বিষয়ে তিনি দক্ষ।

নাটককার অভিনেতাকে কেমন অবসর দেয় তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় Galsworthyর Justiceএ (তৃতীয় অঙ্কে—তৃতীয় দৃশ্যে)—যেখানে সমস্ত দৃশ্যে একটাও কথা নেই। সমস্ত দৃশ্যের ব্যঞ্জনা শুধু অভিনেতার উপর নির্ভর করে। কেউ এইটাকে expressionism, symbolism ইত্যাদি ভাববেন না। এই গুলো হচ্ছে আর্টের শত্রু। যে জিনিষটা যতই মহৎ, তা ততই সরল। Expressionism সরলতা নষ্ট ক'রে যা গ'ড়ে তোলে তা আর্ট নয়, আর্টের বিদ্রূপ। কৌতুকই তার মূল; কামারের বিদ্যা তার উপাদান। জার্ম্মানরাই আজকাল এই expressionismএর সব চেয়ে বড় উপাসক।

Producerএর কাজ হচ্ছে নাটককার এবং অভিনেতার সহায়তা করা—বাস্তবিক দৃশ্য প্রস্তুত ক'রে। দৃশ্যের অর্থ আমাদের দেশে এখনও বেশীর ভাগ অবাস্তব scene গুলি। য়ুরোপের ষ্টেজে তা নয়। এখানে ষ্টেজের রচনায় Producerও ড্রামার আর্টে সহায়তা করে। আজকালকার ষ্টেজে আলোছায়ার পরিচালনায় নাটকের অনেকটা

অর্থ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই পরিচালনায় Producerএর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্প্রতি লণ্ডনের সেভয় থিয়েটারে Journey's End ব'লে যে নাটক চল্‌ছে তাতে তিন অঙ্ক এবং ছয় দৃশ্য। কিন্তু setting একই। সমস্ত action গত মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে। কখন রাত কখন দিন, কখন সন্ধ্যা এবং কখন প্রভাত। এই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যঞ্জনা নাটককার করতে পারে না,—সে শুধু কথা লিখে দেয়—অভিনেতাও করে না, করে Producer। তা ছাড়া একটা নাটকের যে রকম theme ঠিক সেই রকম atmosphere গ'ড়ে তোলা অনেকটা Producerএরই কাজ। Producerএর মূল্য ঠিক কোন জায়গায় এর একটা উদাহরণ দিলাম অতি-আধুনিক একটা ফরাসী নাটক থেকে। নাটককারের সিনেরিও এই:

"ক্রমশঃ সব অন্ধকার হ'য়ে যায়। বীণার ধ্বনি এবং হিন্দুর স্বর আস্তে আস্তে বিলীন হ'য়ে যায় দূরে—বহুদূরে। তারপর সব শান্তি—দু এক মিনিটের জন্য। আবার আলোর প্রকাশ হয়—ক্রমশঃ এবং পূর্ণ।" একেই বলে Producerএর জন্য অবসর গ'ড়ে তোলা, অবশ্য জোর ক'রে নয়, আর্টের জন্যই।

সেকভের অনেক নাটকে এই রকম উদাহরণ পাওয়া যায়। Cherry Orchardএ প্রথম দৃশ্য এবং শেষ দৃশ্যের মধ্যে করুণ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেয় Producerএর আর্ট। ইবসেনের কয়েকটি নাটকের সিনেরিও এই: Evening during the scene। এর অর্থ-প্রকাশ Producerই করে।

৫

অভিনয় যতই সুন্দর হ'ক না কেন তার বাস্তবিকতা নির্ভর করে নাটকের উপর। আমাদের নাটকগুলো সবই অবাস্তব। প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং কথাগুলো বিশেষণে ভরা; শোকের উচ্ছ্বাসও বংশীর সঙ্গে গান।* যেখানে চুপ ক'রে থাকা স্বাভাবিক সেখানে আমরা জোরে কথা বলি; যেখানে গতির দ্বারা ভাবের নিদর্শন হওয়া উচিত সেখানে গান করি। এইটে আমার মতে জড়বাদ।

ড্রামা হচ্ছে জীবনের প্রতিমূর্ত্তি। জীবনে ত সব জিনিষেরই মূল্য আছে। আমাদের ঘরে একটা বাক্স থাকে তার সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব। সকলেই আমাদের নীরব আত্মীয়—যাকে আমরা নিষ্প্রাণ ভাবি তার চেতনা জাগে আমাদের গভীর অনুভূতির সময়ে। তখন সব জিনিষই আমাদের কাছে এক একটা ভাবের প্রতীক। দ্বার খোলে এবং বন্ধ হয়, খাঁচার পাখী কখনও গান গায়, কখনও চেঁচায়। এই সব ছোট ছোট জিনিষগুলোর মূল্য বড় হ'য়ে ওঠে নাটককারের রচনায়। মানুষের মনের ভাবগুলি ব্যাপ্ত হয় দৃশ্যে; দৃশ্য সহায়তা করে atmosphere সৃষ্টি করতে। নাটককারের সাধনা বড়ই কঠিন। তাকে অনেক লোক বাদ দিতে হয়, শব্দরচনার চাতুর্য্যই তার একমাত্র কার্য্য নয়। এই সম্বন্ধে Galsworthyর মত এই:

"The aim of the dramatist to employ naturalistic technique is obviously to create such an illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through an experience of his own, to think and talk and move with the people he sees thinking, talking and moving with him. A false phrase, a single word out of tune or time will destroy the illusion...... We want no more bastard dramas, no more attempts to dress out the simple dignity of every day life in the peacock feathers of false lyricism; no more straw-stuffed heroes and heroines," (Theoretical Writings.)

এই সম্বন্ধে রমাঁরলাঁ আরও প্রবল ভাবে লিখেছেন:

Adieu, les psychologies compliquées, les subtiles rosseries, les obscures symbolismes, tout cet art de salons on d' aclôves! Il serait dépaysé, ennuyeux, ridicule chez nous. (p. 125)

—Le Théâtre Nouveau.

* হিন্দীর একটা নাটকে শ্মশানে ব'সে মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে রাণী বেহাগের আলাপ হারমোনিয়মের সহিত করেন।

কিন্তু গল্‌সোয়ার্দ্দি এবং শ'র চেয়েও প্রবল পরিণত মত মেটারলিঙ্কের :

"There is a tragic element in the life of everyday that is far more real, far more penetrating and far more akin to the true self that is in us than in the tragedy that lies in

চিত্রকারের কল্পনা—মায়া সম্বন্ধে

great adventures. It goes beyond the eternal conflict of duty and passion. Its province is rather to reveal to us how truly wonderful is the mere art of living ; to hush the discourse of reason and sentiment, so that above the tumult may be heard, the solemn, uninterrupted whisperings of man and his destiny."

অতি-আধুনিক ট্র্যাজাডির রচনা এই নিয়ে। আমাদের জীবন, সাধারণ মানুষ, সাধারণ কথা, সাধারণ দৃশ্য—এদের মধ্যেই সত্য ; সত্যের মধ্যেই শিব এবং সুন্দর ! জীবনের বাহিরে যাবার দরকার নেই। সাধারণকে ত্যাগ ক'রে লাভ কি ?

এইবার আমি একটা ভাল ট্র্যাজাডির বর্ণনা করি। নাটকের নাম "মায়া।" প্যারিসে এর অভিনয় দেখে আমার মনে যে ভাব জাগ্রত হয় তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত না ক'রে আর একজনের সহায়তা নিলাম :

"L'ame s'ennoblit dans le Voisinage des mystérs insondables ; elle puise dans ce travail d'exploration avec be sentiment de sa petitesse, celui de sa grandeur."

৬

মায়া একটা বড় আইডিয়ার অভিব্যক্তি। আইডিয়া এই যে বেশ্যার জীবনে প্রতিদিন "disincarnation progressive" চলেছে। বেশ্যার নিজের কোন অস্তিত্ব নেই—সে পুরুষের ইচ্ছার ছায়া। তার পথের আরম্ভেই তার শেষ। নাটককার কোন সামাজিক সমস্যার কাছেও যায় না। জীবনের একটা অসুন্দর অংশে সে দেখে সুন্দরের লীলা এবং সেই-টা প্রকাশ করে তার রচনায়। বলা বাহুল্য ফরাসী জাতির নৈতিকবল খুবই বেশী, তা না হ'লে স্বামী-স্ত্রী বেশ্যার নাম শুনলেই চটতেন, এবং একসঙ্গে নাটক দেখতে যেতেন না।

নাটকারম্ভে প্রাক্‌কথন দ্বারা নাটককার তার সৌন্দর্য্য-বোধ দেখিয়ে দেয়, এবং তার আইডিয়ার আভাসও দেয়। তার পর সে প্রমাণ করতে প্রস্তুত হয় যে 'আমি যে সৌন্দর্য্য দেখেছি সেটা অসুন্দরের মধ্যে নিহিত হ'লেও সত্য।'

সমস্ত নাটকের দৃশ্য একই ঘরে। ঘর মাঝে'যোর এক বেশ্যার, যার নাম বেলা। ঘরে কোন বিশেষ সাজসজ্জা নেই; সবই সাধারণ।

প্রথমতঃ আসে একজন নাবিক। সে চায় রাতের আশ্রয়; পায়। ভোরবেলায় সে আবার চ'লে যায়—সমুদ্রের যাত্রী সে। তার পর সাধারণ জীবন। বেলা হাসে, গল্প করে; জান্‌লায় ব'সে সেলাই করে এবং বলে, "এই ঘরে একটা ফাঁক এবং এইখানটা।" ইত্যাদি। সবই সাধারণ। আবার রাত্রি। এইবার আসে একজন বৃদ্ধ শ্রমজীবী। হাতে তার কয়েক মুদ্রা। সে গোণে; মুদ্রা কম। তার মুখে কথা নেই। রক্তমাংসের এই বৃদ্ধ তার কামপিপাসায় কত দীন! করুণ ভাবে সে তাকায় বেলার দিকে; বেলা একটু হাসে, আর দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়। ক্ষমার মূর্ত্তি সে।

এই রকম ক'রে অনেকে আসে, দিনের বেলায়, রাত্রে—সব সময়েই। চিত্রকর এসে চিত্র এঁকে চ'লে যায়—নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতন। একজন নরওয়ের লোক এসে কত গল্প করে; বলে—"আমাদের দেশে কত নদী, কত পাহাড়, কত পাখী, কত শিশু।" শিশুর নাম শুনে বেলা একটা ফল দেয় তাকে এবং বলে—"এইটা কাউকে দিয়ে দিও।" লোকটা ফল নেয় না। বেলার দানে সে লজ্জিত।

একজন আহত যোদ্ধা এসে কাঁদে; বলে, সে কত দুর্ভাগ্য! বেলাও কাঁদে, আবার হাসে—পুরুষটাকে হাসাবার জন্য। তার পর একজন নিরাশ প্রেমিক এসে রূপ বর্ণনা করে তার প্রিয়ার। তার পকেটে চুরি করা একটা বড় রুমাল—তার প্রিয়ারই; পুরুষটা বড়ই অশান্ত; তার নিজের জন্য কোন ভাবনা নেই। তার ছেঁড়া বস্ত্র সেলাই ক'রে দেয় বেলা; এবং তাকে জল খেতে দেয়। কিন্তু তবু পুরুষটি অশান্ত; কোলে মুখ গুঁজে হাঁফায়। চুপি চুপি বেলা তার পকেট থেকে রুমালটা বার ক'রে নেয় এবং অন্য ঘরে গিয়ে সেইটে দেয় তার গায়ে। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে আসে—সুন্দর তার মূর্ত্তি। পুরুষ তাকে দেখে, মুগ্ধ হ'য়ে যায়—শ্রদ্ধায়। তার পর সে লুটিয়ে পড়ে এই নারীর চরণতলে আর বলে—"প্রিয়া আমার।" বেলা করুণ স্বরে তারই শব্দের প্রতিধ্বনি করে।

আবার দিন, আবার রাত, আসে আর যায়। সর্ব্বশেষে আসে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ।* তার মাথায় পাগড়ি, কানে কুণ্ডল, চোখে তেজ। তার কথায় কিসের যেন মাদকতা। তার সঙ্গে আসে একজন বীণাবাদক—বীণা হাতে ক'রে। যখন এই দুজন আসে তখন বেলা অনুপস্থিত। গোধূলির বেলা তখন। দুজনেই চুপ ক'রে বসে। তার পর বীণাবাদক জিজ্ঞেস করে—"সে যে আসে না?" হিন্দু জবাব দেয়—"থাম, থাম!" দুজনেই কত কল্পনা করে, কত করুণ ভাবে গ'ড়ে তোলে তাদের মানসপ্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি!

মায়ার একমাত্র দৃশ্য—বেলার ঘর

* হিন্দুব্রাহ্মণ—বেলা-মায়া—বাংলা দেশ প'ড়ে কেউ ভাববেন না যে আমি নিজের তরফ থেকে এই সব adapt ক'রে দিচ্ছি। এই গুলো সব মূল ফরাসীতে।

Melville Cooper, Alexander Field, George Zucco এবং Maurice Evans

Reginal Smith, Maurice Evans এবং Coline Clive শেষ অঙ্কে

Melville Cooper এবং ক্যাপ্টেন্ ষ্ট্যান্‌হোপের ভূমিকায় কলিন্ ক্লাইভ্

কলিন্ ক্লাইভ্ এবং Pr. Mason-এর ভূমিকায় Alexander Field.

Journey's End-এর কয়েকটি দৃশ্য—মধ্যস্থলে—Captain Stanhope-এর ভূমিকায় কলিন্ ক্লাইভ্

আবার জিজ্ঞেস করে বীণাবাদক—"সে দেখতে কেমন?" হিন্দু কখনও বেলাকে দেখেনি, তার ঘরেই এর আগে প্রবেশ করেনি। তবু সে জবাব দেয়, "দেখতে? আমি তাকে দেখেছি! বাংলা দেশের নদীর বুকে নৌকোর উপর রাতের অন্ধকারে তার চুলগুলো উড়তে থাকে! আহা!" চোখ বুজে সে নিজের কল্পনায় ব্যস্ত। হঠাৎ বাহিরে চেঁচামেচি ছুটাছুটি! হিন্দু দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়। আবার শান্তি। হিন্দু এসে ব'সে পড়ে। বীণাবাদক দেয় তার আঙ্গুল বুলিয়ে বীণার উপর। মত্ত সুরে ঘরটা যেন ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। তার পর বাহিরে ছায়ার মতন একটা মূর্ত্তি এসে দাঁড়ায়—বেলার কণ্ঠে সে বলে—"দ্বার খোলোনা? কে ভিতরে? এ যে আমার ঘর!" দুজনেই চুপচাপ! বীণাবাদক জিজ্ঞেস করে, "এই কি সে?" হিন্দু বড়ই নর্ভাস, তার মানসপ্রিয়ার প্রতিমা যে ভাঙে! হিন্দু বলে—"না! না! সে অপর একজন। এ নয়!" 'বেলার ছায়ামূর্ত্তি কাঁপে। আবার দ্বারে করাঘাত—"ওগো দ্বার খোলো!" গোধূলির করুণ আভা রাত্রে মিশে যায়—ষ্টেজ ক্রমশঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে—সম্পূর্ণ অন্ধকারে। বাহিরে বেলা; ভিতরে এই দুজন পুরুষ—বড়ই নিঃসঙ্গ এবং করুণ। হিন্দু একটু ভাবে। তারপর চীৎকার ক'রে উঠে—"এই যে সে! এই যে সে! এই দেখ—তার উদ্বেলিত বক্ষঃস্থল! তার পদ্মলোচন! আঃ! যখন এ নূতন করে—তখন, তখন সে অপ্সরা! অপ্সরা! অপ্সরা!!"

ষ্টেজ এখন অন্ধকারে। হিন্দুর স্বর শোনা যায় দূরে। তার পর সব শান্তি। আমরা ভাবি, কে এ নারী? সকলে এসে নিজেরই প্রতিমা গ'ড়ে নেয় এর মধ্যে! কি করুণ এর জীবন! কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে পারি না। আবার আলোকিত হয় ষ্টেজ—প্রথম দৃশ্যের মতন। সেই ঘর, সেই সাজসজ্জা, সেই নারী, জানলায় বসে সেলাই করে এবং সেই সুরে, সেই কথা বলে—"এই ঘরে একটা ফাঁক—" মাত্র তিন চার কথার পরেই যবনিকা। ড্রামার শেষ হয়।

শ্রীঅষ্টাবক্র
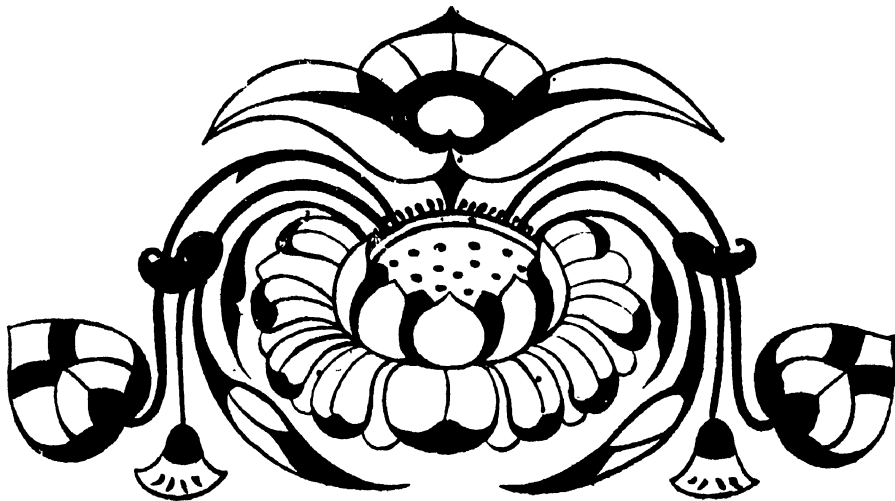
মেঘ ও রৌদ্র

(একাঙ্ক নাটক)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ

পাত্র পাত্রী পরিচয়

স্বামী করুণানন্দ	...	...	বিজয়গড়ের গোপীনাথজী মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত।
ব্রহ্মচারী সত্যব্রত	...	...	ঐ মন্দিরের পূজারি ; অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ যুবা।
অনঙ্গলেখা	...	...	বিজয়গড়ের সুপ্রসিদ্ধা নর্ত্তকী ; অপূর্ব্বরূপযৌবনশালিনী, বিদুষী, সুগায়িকা।
মঞ্জরী ...	..	...	অনঙ্গলেখার দাসী।
মাধবী	...	...	গোপীনাথ-মন্দিরের পরিচারিকা ; বিধবা যুবতী।

বৈষ্ণব ভিখারী।

প্রথম দৃশ্য

অনঙ্গলেখার সুসজ্জিত কক্ষ

কাল—প্রভাত

অনঙ্গলেখা

(জানালা খুলিয়া) আজকের প্রভাতে কী এ সর্ব্বহারা নিঃস্ব মূর্ত্তি ! যেন এর বুকের মধ্যে ব'সে এক উদাসী সুন্দরী শুষ্কমুখে করুণচোখে ভৈরবী রাগিণী গাইচে। কি আশ্চর্য্য ! এই আকাশ-জোড়া আলো এক নিমিষে নিবে এল ! এক রাত্রের ঝড়ো-হাওয়ায় সুখনীড়ের সমস্ত বন্ধন শিথিল হ'য়ে গেল ! জীবনের চোখ-ঝলসানো পর্দ্দাখানি কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে উড়ে গেল ! আজ জীর্ণতার মলিন মূর্ত্তি চারিদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, শূন্যতার বুকফাটা চাপা আওয়াজ কানে আস্ছে, জীবন-পাত্রের সমস্ত রস একেবারে তিক্ত হ'য়ে গেছে। (পায়চারি করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে) পূজারি ঠাকুরের সেই ঢলঢল সুকুমার মুখখানি এখনও যেন চোখের উপর ভাস্ছে ! জীবনে কত সুন্দর পুরুষ দেখেছি, কিন্তু অমনটি ত কখনো দেখিনি। কি সুন্দর চোখ দু'টি ! কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে যেন মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়তে হয়। কি সুন্দর ওষ্ঠাধর ! রক্তকমলের পাপড়ি দুটি কে যেন নিপুণ হাতে উল্টে রেখেছে—তার ওপর একটা দৃঢ়তা ও প্রসন্নতার ছা[illegible] প'ড়ে তাকে আরো মধুর করেছে। দেহখানি যেন কো[illegible]

শিল্পীর বহু সাধনায় তৈরী—তাতে একটা জ্যোতির্ম্ময় লাবণ্যের ঢেউ খেলে গিয়ে তাকে পরমসুন্দর করেছে। এ কী রূপ! এ রূপ ত কোনো পুরুষের মধ্যে দেখিনি—একে যে বুকের নিরালা কোণে একান্ত নিজের ব'লে পেতে ইচ্ছে করে।—একে দেখাতে ইচ্ছে করে না—দেখতে ইচ্ছে করে। (ক্লান্ত ভাবে একটা আসনে বসিয়া) রঙ্গমঞ্চের পোষাক প'রে, উজ্জ্বল আলোর সাম্‌নে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে অভিনয় করতে করতে, এতদিন কোথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম—এই প্রথম আজ নিজে স্বরূপ দেখতে পেয়ে শিউরে উঠছি! কে আমি? হায় নারী, কোথায় তোর স্থান! দেহের ব্যবসা ক'রে প্রাণের সন্ধান পাস্‌নি!—তোর নারীত্বের অপরূপ রূপ তোর চোখে পড়েনি!

(মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী

মন্ত্রী কুমার সেন আপ্‌নার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

অনঙ্গলেখা

বল্‌ গে, দেখা হবে না।

(মঞ্জরী অনঙ্গলেখার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

অনঙ্গলেখা

কি দাঁড়িয়ে রৈলি যে? যা না—

(মঞ্জরী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)

অনঙ্গলেখা

কত হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, কত বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস কত কাতর নিবেদন দেখে কৌতুক-হাসি হেসেছি,—তখনো বুঝিনি যে বুকের মধ্যে একজন তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে! একবার পুরাণ-পাঠকের মুখে সাবিত্রীর গল্প শুনেছিলাম,—এক দরিদ্র, কাঠুরে স্বামীর জন্য ও-রকম বাড়াবাড়ি কর্ত্তে শুনে কি হাসিই না এসেছিল! ওঃ, তখন বুঝিনি যে ঘাটে ঘাটে তরী বেয়ে বেড়ান ত নারীর কাজ নয়—তাকে যে এক মহাতীর্থের ঘাটে নৌকো বাঁধতে হবে;—তা'তেই তার নারীত্ব, তার বিশেষত্ব, তার শ্রেষ্ঠত্ব। নারীর কাজ শুধু ভোলাবার নয় ভোলবার, নেবার নয় দেবার, আনন্দ পাবার নয়, কষ্ট সহ্য করবার—তাতেই যে তার চরম সার্থকতা!

(মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী

মন্ত্রী জান্‌তে চান যে, গোপীনাথজীর মন্দিরে কাল দোলের নাচ-গানের শেষ দিকে হঠাৎ যে আপনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন—সে অসুখটা ভাল হয়েছে কি না, আর......

অনঙ্গলেখা

যা,—যা বল্‌ গে, হয়েছে।

(প্রস্থান)

অনঙ্গলেখা

কী মূর্ত্তি কাল দেখ্‌লাম! যেন কোন দেবকুমার স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন; মন্দিরের ক্ষীণোজ্জ্বল দীপশিখা তার মুখের উপর কম্পমান আলো ফেল্‌ছিল, আর এক একবার আমার কীর্ত্তন শুনে ভাবগদগদমুখে বিগ্রহের দিকে তাকাচ্ছিল—আমার মনে হচ্ছিল, যেন রহস্যের আবরণে ঢাকা কোন এক মহান সত্যের অগ্নিরূপ ক্ষণে ক্ষণে চোখের সাম্‌নে প্রকাশ হচ্ছে! সজ্জিত মণ্ডপের সহস্র দর্শকের মধ্য থেকে ওকে যেন চিনে নেওয়া যায়। কী পবিত্র! কী নিষ্পাপ! কী সুন্দর! আজ আমার মনে হচ্ছে, ঐ ত আমার দেবতা, ঐ ত আমার যথাসর্ব্বস্ব,—ওর পায়ে শেষ প্রণামে লুটিয়ে পড়বার জন্যই যেন আমি এত বড় হয়েছি। হে আমার প্রেমের ঠাকুর, হে আমার তরুণ তাপস,—আঁধার রাতের ঝড় জলের মধ্যে তুমি এক কোণে আত্মগোপন ক'রে ছিলে—আজ প্রভাতের অরুণালোকে আমার হাতের মালা-চন্দন নেবার জন্য আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। আজ তোমার মুখের অভয় আলোকে বুঝছি যে, দুর্য্যোগময়ী রাত্রির সারা প্রহরই তোমায় ভেবেছি, তাই, আমার সাধনার মূর্ত্তি ধ'রে আজ প্রভাতে তুমি আমার অভিনন্দন নিতে ও বর দিতে এসেছ। (উঠিয়া চিন্তাকুলভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিল, তারপর হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল) তিনি যদি পায়ে স্থান না দেন—পাপিষ্ঠা ব'লে তাড়িয়ে দেন,—আর তিনি আমায় নেবেনই বা কেন? আমি যে কুলটা—সমাজের অস্পৃশ্যা—উঃ। (ক্রন্দন)—

না যাব—তবুও যাব—শুধু দূরে দূরে থেকে কিছুমাত্র সেবার অধিকার নেব; আমি ত আর কিছু চাইনে, তিনি যে ব্রহ্মচারী—আমি পতিতা—

(মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী

রাজ-অমাত্য বিশ্বরূপ সেন এসে বল্‌ছেন যে, আজ দোল-উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে নাচ-গান করতে হবে—

অনঙ্গলেখা

যা যা, বল্‌ গে অনঙ্গলেখা মরেছে—তার নাচ-গান জন্মের মত ফুরিয়েছে!

(অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ অনঙ্গলেখার মুখের দিকে তাকাইয়া)

বার বার—

অনঙ্গলেখা

যা, পালা, আর জ্বালাস্‌নে—

(মঞ্জরী একটা সন্দেহের দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল)

অনঙ্গলেখা

আর না—আর মানুষের সংস্রবে যেতে ইচ্ছে করে না। চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, হলাহলের জ্বালা! পালাব—পালাব—লোকালয় ছেড়ে, দূরে বহুদূরে চ'লে যাব। এক একবার মনে হচ্ছে, শুধু তাকে নিয়ে চ'লে যাই—সংসারের বাইরে, নিভৃত, নির্জ্জন এক স্থানে। বনের এক প্রান্তে, পাহাড়ের পাদদেশে এক কুটীর বাঁধব,—নিজের হাতে রান্না ক'রে তাকে খাইয়ে দিনান্তে তার পাতে প্রসাদ পাব,—শত অকথিত আনন্দে সর্ব্বদা তাকে ঘিরে রাখব,—শত সেবায় তাকে নিজের বুকের মধ্যে পেয়ে নারীজন্ম সার্থক করব, জ্যোৎস্নারাত্রে পাহাড়ের এক প্রান্তে কপোতীর মত তার মুখের কাছে মুখ রেখে প্রেমের প্রলাপ গুঞ্জন করব, সমস্ত বিশ্ব লুপ্ত হ'য়ে যাবে—শুধু আমি আর সে। এ কি! আমি কি পাগল হ'য়ে গেলাম? আর সে আশা জীবনে মিটবে না। (কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল; বিছানায় কিছুক্ষণ উপুড় হইয়া প'ড়িয়া থাকার পর উঠিয়া গলার বহুমূল্য হার ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল, হাতের হীরকবলয় খুলিয়া ফেলিল।) কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়—এ বেশে কিছুতেই নয়, সব ছেড়ে দীনহীনা ভিখারিণীর বেশে যেতে হবে। ভিক্ষা! ভিক্ষা! কৃপাভিক্ষা মাত্র!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোপীনাথজীর মন্দির

কাল—সন্ধ্যা

[ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হইতেছে; মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিচিত্র আধারে বহু বর্ণের আলো জ্বলিতেছে; মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের উভয়পার্শ্বে উচ্চ দীপাধারে রৌপ্যপ্রদীপে গন্ধতৈল পুড়িতেছে, ধূপ-ধুনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত; কাঁসরের বাজনার সহিত নহবতের বাঁশী বাজিতেছে]

(সামান্যবেশে অনঙ্গলেখার প্রবেশ)

অনঙ্গলেখা

এ কি! এ কোথায় এলাম? পা কাঁপে কেন? মাথা ঘুরছে।

[আরতি শেষ হইল; একে একে ভক্তগণ প্রাঙ্গণের ধূলায় ধূসরিত হইয়া গৃহে ফিরিল; সত্যব্রত ব্রহ্মচারী স্তবপাঠান্তে বাহির হইয়া আসিল—অনঙ্গলেখা ধীরে ধীরে যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।]

সত্যব্রত

কে তুমি?

অনঙ্গলেখা

আমি এই নগরের একজন নগণ্য অধিবাসিনী।

সত্যব্রত

কি দরকার তোমার?

অনঙ্গলেখা

বিশেষ কিছুই নয়,—তবে আপনার সাথে একটা কথা আছে।

সত্যব্রত

(বিস্মিত হইয়া) আমার সাথে! আমার সাথে তোমার কি কথা?

অনঙ্গলেখা

আপনাকে সেবা-কর্‌বার একটু অধিকার চাই।

সত্যব্রত

(একবার মুখের দিকে চাহিয়া) আমার সেবা তুমি কি করবে? আমি ব্রহ্মচারী মানুষ,—আমি পরের কোন সেবা ত নেই না। তারপর তুমি স্ত্রীলোক, সু…

অনঙ্গলেখা

শুধু আপনার বাইরের সুবিধা-অসুবিধার ওপর একটু নজর রাখ্‌বার অধিকার,—আপনার সামান্য প্রয়োজন জোগাব মাত্র। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার যদি না দেন, মন্দিরের বাহির মার্জ্জনা কর্‌ব—পত্র-পুষ্প সংগ্রহ কর্‌ব…

সত্যব্রত

আমি ব্রহ্মচারী, কোন স্ত্রীলোক আমাকে সেবা করে এটা আমি চাইনে। বিশেষতঃ গুরুদেব করুণানন্দের বিনা-অনুমতিতে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কাজ আমি কর্ত্তে পার্‌ব না। মন্দিরের কোন কাজের ভার দেওয়ার আমার অধিকার নেই, তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস্ ক'রে দেখ্‌তে পার; আর যদি কিছু অর্থভিক্ষার প্রয়োজন হয়—তা-ও তাঁর কাছে জানাতে পার।

অনঙ্গলেখা

দয়া ক'রে একটু স্থান এখানে আমায় দিন্—একটুমাত্র স্থান। আপনার ব্রহ্মচর্য্যের কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না, আপনার কাছ থেকে দূরে দূরে থাক্‌ব,—শুধু আপনার পা ধোবার জল, খড়ম এগিয়ে দেব—আপনার বস্ত্র গেরুয়া-রংএ রঙিয়ে দেব—নিজ হাতে আপনার শয্যা পেতে দেব…

সত্যব্রত

(ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া) না,—না—তা হবে না—তা হ'তে পারে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

অনঙ্গলেখা

(পায়ের উপর পড়িয়া) আমায় পায়ে রাখুন, একটু স্থান আমায় দিন—শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াব…

সত্যব্রত

কি আপদ! যাঃ, যাঃ—দূর হ'য়ে যা।

(প্রস্থান)

অনঙ্গলেখা

(কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া) বেশ হয়েছে! খুব হয়েছে! যেমন গিয়েছিলাম, তার উপযুক্ত ফল পেয়েছি! বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলাম! পঙ্গু হ'য়ে গিরি লঙ্ঘন কর্ত্তে গিয়েছিলাম! তা হবে কেন? এ দুরাশা সফল হবে কেন? ছিঃ! ছিঃ! কী নিদারুণ লজ্জা! আমার মাটির সাথে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! হতভাগিনী নারী কি উদ্দেশ্যে তুই গিয়েছিলি? (পথে যাইতে যাইতে) উঃ! কোথায় নেমে এসেছি! এ কোন্ অজানিত দেশ! কেন এলাম? কোন্ আকর্ষণ আমাকে এখানে টেনে আন্‌ল? কোন্ উন্মত্ততা, কোন্ নির্ব্বুদ্ধিতা আমাকে মুহূর্ত্তে স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে মাটির ধূলোর উপর ফেলে দিল! জীবনে এই প্রথম অপমানের আঘাত পেলাম,—এই প্রথম প্রার্থনা ক'রে বিতাড়িত হলাম,—এই প্রথম আমার আকাঙ্ক্ষার রক্ত-গোলাপকে আমারই সাম্‌নে কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হ'ল,—ওঃ, কী অধঃপতন! যার সামান্য একটু ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌বার অধিকার পেলে কত লোক ধন্য হ'য়ে যেতো—যার এক চাহনিতে শত শত যুবকের বক্ষরক্ত উদ্দামবেগে নেচে উঠ্‌ত—যার দেহের বিন্দু-মাত্র স্পর্শের জন্য কত রাজা, মহারাজা লালায়িত হ'ত,—আজ সেই অনঙ্গলেখা, একজন সামান্য সন্ন্যাসী-যুবকের কাছে সামান্য একটু অধিকার প্রার্থনা ক'রে বিতাড়িত হ'ল! কী পরিবর্ত্তন! (ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ) অনঙ্গলেখা, এখনো মরিস্‌নি! এখনো তোর শক্তির বিন্দুমাত্র অপচয় ঘটেনি; আর কেন? আর নয়…দুঃস্বপ্ন—একটা দুঃস্বপ্ন—নিদ্রা-জাগরণের মাঝে একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন ঘ'টে গেল…যাক্… আবার এ বুকের শত জ্বালাময়ী নাগিনী গর্জ্জে' উঠুক—আবার চোখে প্রলয়-মেঘের বিদ্যুৎ চমকিত হোক—আবার জিহ্বায় ঐন্দ্রজালিকের সম্মোহন-মন্ত্র আশ্রয় করুক—ধ্বংস——শুধু ধ্বংস—শুধু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে চাই। ভুল যদি কিছু ক'রে থাকি—তবে এই তার প্রতীকার।

[রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। ঠাকুরের শয়ন দিয়া ব্রহ্মচারী সত্যব্রত মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চরাচর প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে।

আকাশে-বাতাসে বসন্ত-নিশার বিহ্বলতা। তরুশাখে দু'একবার কোকিল ডাকিয়া উঠিতেছে। চারিদিক নির্জ্জন।]

(অপূর্ব্ববেশে সজ্জিতা অনঙ্গলেখা সত্যব্রতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।)

সত্যব্রত

কে?

অনঙ্গলেখা

আমি—(অপাঙ্গদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিল।)

সত্যব্রত

(চমকিত হইয়া) নর্ত্তকী অনঙ্গলেখা না?—তুমিই না দোল-পূর্ণিমার দিন এখানে নাচ-গান করেছিলে?

অনঙ্গলেখা

হাঁ প্রিয়তম।

সত্যব্রত

এখানে কেন?

অনঙ্গলেখা

তোমার জন্যে প্রিয়তম, শুধু তোমার জন্যে! সেদিন কি ক্ষণে তোমায় দেখেছিলাম, সেই অবধি তোমারই ধ্যানে আত্মহারা হ'য়ে আছি—তুমি আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগরণের চিন্তা, আশার লক্ষ্য হ'য়ে সারাক্ষণ বিরাজ কর্‌ছ। শুধু এক চিন্তা···

সত্যব্রত

কী বলছ তুমি নারী!

অনঙ্গলেখা

প্রিয়তম, প্রিয়তম, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, তোমায় কত ভালবেসেছি! সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ভালবেসেছি! এ ভালবাসা প্রভাতসূর্য্যের মত দীপ্ত, অতল সমুদ্রের মত গভীর, কলস্বরা তরঙ্গিণীর মত বেগময়ী;—তোমায় আমার জীবনের রাজা করব, এই হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে, তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে তোমায় সেবা করব,—তুমি হবে আমার জীবনের গৌরব-কিরীট—অমূল্য সম্পদ!

সত্যব্রত

তুমি কার কাছে এ সব কথা বল্‌ছ জান?

অনঙ্গলেখা

জানি প্রিয়তম, তপস্বীর দুঃখজীবনে সে সুখের স্বাদ পাওনি,—সে সুখের সন্ধান পেলে কঠোরতার প্রেতমূর্ত্তিকে এক মুহূর্ত্তে বিদায় ক'রে দিতে। এস, সে সুখের অমৃত-সমুদ্রে তোমায় নিশিদিন ডুবিয়ে রাখ্‌ব—জীবনে যা' আশা করতে পারনি—তা' সফল হবে;—কোন চিন্তা নেই, কোন ভয় নেই—মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের কোন সাধ্য নেই যে তোমায় কেশাগ্র স্পর্শ করে—রাজার কোন শক্তি নেই যে তার শাসনদণ্ড তোমার মাথার উপর তোলে—রাজ্যের কারও কোন স্পর্দ্ধা হবেনা যে আমাদের সুখস্রোতে বাধা দেয়; আমার এক তর্জ্জনী-হেলনে এ রাজ্যের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে,—না হয় তোমায় নিয়ে লোকালয় ছেড়ে সুদূর—

সত্যব্রত

দূর হ পাপিষ্ঠা!

(প্রস্থানোদ্যত)

অনঙ্গলেখা

প্রিয়তম, প্রিয়তম, যেয়োনা, যেয়োনা—তোমায় না পেলে আমি বাঁচ্‌বনা—তোমার পায়ের তলায়ই আমি আত্মহত্যা করব...(ছুটিয়া যাইয়া ব্রহ্মচারীকে আলিঙ্গন করিল।)

সত্যব্রত

রাক্ষসী! ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! (সবলে অনঙ্গলেখার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মচারী অনঙ্গলেখাকে পদাঘাত করিল। শেষে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। দূরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য

সত্যব্রতের শয়নকক্ষ

কাল—রাত্রি দ্বিপ্রহর

সত্যব্রত ক্লান্তভাবে শয্যায় উপবিষ্ট

সত্যব্রত

ওঃ! সমস্ত শরীরে যেন একটা জ্বালা বোধ হচ্ছে! —বুকের স্পন্দন এখনও থামেনি, মাথাটা এখনও ঝিম্‌ঝিম্

কর্‌ছে—সারা দেহের উপর দিয়ে যেন একটা ভূমিকম্প চ'লে গেছে! (চিন্তা করিয়া কিছুক্ষণ পরে) এমন বোধ হচ্ছে কেন? শরীরের ওপর দিয়ে যেন একটা মধুর আলস্যের মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছে!—না, না—কিছুতেই না—এ দুর্ব্বলতা আমি দমন করব—এ চাঞ্চল্যকে আমি মন থেকে দূর করব,—কালই সেই নূতন-শেখা আসনটা অভ্যাস কর্‌ব, ছিঃ! (শয়ন করিল; কিছুক্ষণ ঘুমের বৃথা চেষ্টা করিয়া অন্যমনস্কভাবে) ওষ্ঠযুগলে কিসের একটা মৃদুস্পর্শ যেন এখনও লেগে আছে! শরীরে একটা শিহরণের বিলীয়মান আবেশ যেন এখনো যায়নি! (হঠাৎ চমকিত হইয়া) এ কি! আমি ব্রহ্মচারী,—এ কি চিন্তা আমার! কিছুতেই না, এ অশান্ত মনকে এখনই সংযত করতে হবে। (উঠিয়া দ্রুতবেগে পায়চারি করিতে লাগিল) ঘরে অসহ্য গরম,—সমস্ত শরীরে ঘামের একটা স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। (বাহিরে আসিয়া) আঃ! স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। কী সুন্দর রাত্রি! আজকার এই রাত্রিটি যেন অসীম সৌন্দর্য্য-সায়রে পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি শতদলের মত, বর্ণে, রূপে, গন্ধে টলমল কর্‌ছে! বাতাসের কি প্রাণারাম স্পর্শ! সৌন্দর্য্যস্নাত গাছের মাথাগুলি ধীরে ধীরে কাঁপ্‌ছে,—জ্যোৎস্নাহত কোকিলের চোখে এখনো ঘুম আসেনি,—কি এক সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে ধরণী শিথিল, বিবশ—আকাশ বিস্ময়মৌন—চরাচর সুমিষ্ট তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন,...রাত্রির এমন সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির এমন আনন্দতৃপ্ত ভাব ত জীবনে কখনো দেখিনি! আজ... (দূরে একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল—ক্রমে তাহা নিকটে আসিতে লাগিল) কে, মাধবী?

মাধবী

হাঁ।

সত্যব্রত

তুমি এখন এখানে?

মাধবী

রোজই ত আমি এমন সময় গুরুদেবের ঘর থেকে আসি,—তিনি এই সময়েই আমাকে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দেন। আপনাকে ত কোনোদিন দেখিনি, আপনি আজ এখানে যে?

সত্যব্রত

(একটু গম্ভীরভাবে) ঘরে বড্ড গরম—তাই বাইরে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাতটিও বেশ সুন্দর...

মাধবী

(সহাস্যে) ব্রহ্মচারী মানুষেরও সৌন্দর্য্যবোধ আছে দেখ্‌ছি!

সত্যব্রত

(মাধবীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া) সৌন্দর্য্যবোধ আর কার না থাকে...

মাধবী

এতদিন ত তার বিন্দুমাত্র প্রমাণও পাইনি, তাই বল্‌ছি...আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কি কেউ নেই?

সত্যব্রত

একথা জিজ্ঞেস কর্‌ছ কেন বল ত?

মাধবী

তা না হ'লে, কি ক'রে এই বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'তে পারলেন! এ বয়সে কি বৈরাগ্য এতই সহজ!—এ কি আপনার প্রাণ থেকে আস্‌ছে?

সত্যব্রত

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে) তা নয় জানি; তবে কি জান—ধর্ম্মজীবন যাপন করাই আমার উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য-সাধনেরই চেষ্টা কর্‌ছি। আচ্ছা, তুমি এখানে কেন আছ বল ত?

মাধবী

(হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) আমি! আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি বাল-বিধবা, তিন কুলে আমার কেউ নেই। এ জীবন ত চিরকালের মত ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,—তাই কোনমতে এটাকে কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি মাত্র। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন কথাই এর মধ্যে নেই। দুপুর রাত পর্য্যন্ত গুরুদেব যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন,—তার কতক বুঝি কতক বুঝিনা—ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসে, তবুও ধৈর্য্য ও আগ্রহের সাথে শুনে যাই। মনে করি যেন খুব একটা মহৎ কাজ কর্‌ছি,—আর মনের এই ভাবই নিষ্ঠাকে আরো প্রবল করে, দৃঢ় করে;—কিন্তু কী যে মহৎ কাজ

কর্‌ছি, তা'ত এ ক'বছরে বুঝ্‌তে পারলাম না,... আপনার কাজের কোন ফল আপনি বুঝ্‌তে পারছেন কি ?

সত্যব্রত

(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে) বিশেষ আর কি-ইবা বুঝি। স্বামীজীর উপদেশ মত কাজ ক'রে যাই, মন্ত্র প্রাণায়াম ঠিক মত অভ্যাস করি—আর মনে করি কোন মহত্তর জীবনের ভিত্তিস্থাপন করছি।

মাধবী

আমার মনে হয়, এই নির্জ্জন আশ্রমে দিনরাত প'ড়ে থেকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কসরৎ না ক'রে, যদি সেবাব্রত নিয়ে বিপুল জনসমাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, তা হ'লে বোধ হয় জীবন্ত মানুষের স্পর্শ পেতাম, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের তরঙ্গে আন্দোলিত হ'য়ে এই মানুষ-হৃদয় শান্তি পেত, আনন্দ পেত, আর...(দূরে একটা ক্ষীণ পদশব্দ শোনা গেল) আচ্ছা, আমি এখন আসি, আপনি শোন্‌গে।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

সত্যব্রত

মাধবী, মাধবী, (মাধবী একবার ফিরিয়া চাহিল) না, না, যাও, যাও। (চিন্তাকুল ভাবে পায়চারি করিতে করিতে) মাধবী ঠিক বলেছে—কী যে করছি, বুঝ্‌তে পারছি না। এই তিন বছরের সাধনার লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে আজ বোধহয় লাভের ঘরে একটা প্রকাণ্ড শূন্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না! তবুও ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক একপথে চ'লে যাচ্ছি। কি উদ্দেশ্য, কোন্ স্বার্থের জন্য, কোন্ আশায়, চোখ-কান বন্ধ ক'রে এই রুদ্ধগৃহে প'ড়ে আছি—একথা যদি নিজের মনকে জিজ্ঞেস্ করি, তবে বোধহয় তার কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তবুও দিক্‌-ভ্রান্তের মত আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটছি। আজ বোধ হচ্ছে, সে আলোও নিভে গেছে,—এখন পদতলে পঙ্কিল জলাভূমি, আর চারিদিকে অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার। আর নয়, আর নয়, এখন পথ চাই, বেরোবার পথ চাই। (চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে একটা লাফ দিয়া) বাস্! তাই ঠিক—যাব—নিশ্চয়ই যাব...মুক্ত,—মুক্ত—আজ আমি মুক্ত; আজ গুটিপোকা তার নিজের রচিত রুদ্ধগৃহ চূর্ণ ক'রে বাইরে বেরিয়েছে, বন্দী আজ কারা-প্রাচীর ভেঙে উন্মুক্ত রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে; কী মূর্খ আমি! নিজের হাতে জীবনকে এতদিন তিলে তিলে হত্যা করেছি! (উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন) ওঃ! আজ পৃথিবী কি সুন্দর! আকাশ কি গাঢ় নীল! জীবন কি মধুময়! কী অবারিত আনন্দের ঢেউ চারিদিকে উথ্‌লে উঠ্‌ছে! পঁচিশ বৎসরের জীবনে আজ এই প্রথম যৌবন অনুভব কর্‌ছি! কী উন্মাদকর স্পর্শ নারীর! সেই সোনার কাঠির স্পর্শে আমার মৃত যৌবন আজ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে! (আর কিছুক্ষণ নীরবে পায়চারি করিয়া হঠাৎ) অনঙ্গ-লেখা! অনঙ্গলেখা! এই অমৃতের বার্ত্তা—এই জাগরণের বাণী, তুমিই প্রথম আমার দ্বারে বহন ক'রে নিয়ে এসেছ! মূর্খ আমি, তোমার গলায় পুরস্কার-মালা দেবার পরিবর্ত্তে তোমায় পদাঘাত ক'রে দূর করেছি! আজ অমূল্য উপ-হারে তোমায় ভূষিত করব, বহুমূল্য রত্ন তোমার কণ্ঠে ঝুলাব,—তোমার রূপ ও প্রেম ছাড়া এ জলতরঙ্গ কেউ রোধ করতে পারবে না—ভুল যদি কিছু ক'রে থাকি, তবে ষোল-আনা তা' শুধরে নেব।

চতুর্থ দৃশ্য

অনঙ্গলেখার শয়নকক্ষ

কাল—এক প্রহর

[অনঙ্গলেখার চোখ-মুখ পাণ্ডুর, বেশ-বাস বিপর্য্যস্ত, কেশ-দাম উচ্ছৃঙ্খল; শিশিরমথিত পদ্মের মত অনঙ্গলেখা শ্রীহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া আছে]

অনঙ্গলেখা

এবার,—এবার সব শেষ হয়েছে! হতভাগিনী নারী, তোর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়েছে! সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে! সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হয়েছে! এবার তোর প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিস! রূপ! রূপ! রূপের প্রশংসা,

জীবনের প্রশংসা, নৃত্য-গীতের প্রশংসার একটা বিরাট অসত্য-আবরণে সংসার এতদিন আমায় অন্ধকার রেখেছিল! জীবনটা যে কী মর্ম্মভেদী মিথ্যার আবরণে ঢাকা পড়েছিল এতদিন তা বুঝ্‌তে পারিনি! আজ সংসারে কোথায় স্থান?...

(নীচে একজন বৈষ্ণব ভিখারী গান ধরিল)

বঁধুয়া কি আর কহিব আমি,
জীবনে, মরণে, জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।

(অনঙ্গলেখা তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল—পরে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল)

অনঙ্গলেখা

বোষ্টম ঠাকুর! বাস্তবিকই কি তাঁকে সব দান করা যায়? তিনি কি পাপিষ্ঠার দান গ্রহণ করেন?

বৈষ্ণব

কেন যাবে না মা! তাঁকেই ত সব দেওয়া যায়,—মানুষের ধন, মান, প্রাণ, যৌবন, ইহকাল, পরকাল—সবই ত তাঁকে দেবার জন্যে। তাঁকে দেওয়াই ত মানুষের নিত্য-কালের ধর্ম্ম। তিনিই যে একমাত্র ভোক্তা মা,—তাঁর কাছে, ধনী, নির্ধন, সুন্দর, কুৎসিত, পাপী, পুণ্যবান—এ সকলের কোন ভেদ নেই। তিনি চান শুধু প্রেম—সব-ভুলানো, সব-ছাড়ানো প্রেম। তিনি যে প্রেমের চির-ভিখারী—চির-তৃষার্ত্ত। মা, তিনিই মানুষের একমাত্র ভালবাসার পাত্র। সংসারের ভালবাসা ত দু'দিনের, সারহীন, লালসা-বিকৃত, জ্বালাময়;—শুধু সেই একস্থানে সমস্ত ভালবাসার তৃপ্তি, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণ, সমস্ত কামনার পরি-সমাপ্তি। তাই অনন্ত প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা বল্‌ছেন,—কুল, ধর্ম্ম, জাতি, মান, সব ত্যাগ ক'রে তোমার আশ্রয় নিলাম, হে প্রিয়তম, হে দয়িত, হে আমার যথাসর্ব্বস্ব, তুমি আমার জীবন, মরণ, ইহকাল, পরকাল ব্যেপে একান্তভাবে বিরাজ কর, তুমি ছাড়া নিতান্ত আপনার জন আর আমার কেউ নেই...

অনঙ্গলেখা

অ্যাঁ! (কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল ও শরীর কাঁপিতে লাগিল) তবে—তবে তিনি আমাকে পায়ে স্থান দেবেন—অস্পৃশ্যা, কুলটা ব'লে তাড়িয়ে দেবেন না?...বোষ্টম ঠাকুর! আজ আমায় কি শুনালেন! কী সংবাদ আমায় এনে দিলেন!

(কম্পিত কণ্ঠ ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল; অনঙ্গলেখা দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল ও একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া বৈষ্ণবের হাতে দিল।)

বৈষ্ণব

(চমকিত হইয়া) একি! না মা, স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা করা আমাদের রীতি নয়, আমায় একমুঠি চা'ল দিন।

অনঙ্গলেখা

না, না—আপনার নিতে হবে, আপনার নিতে হবে—আমায় বিমুখ করতে পারবেন না—আজকার দিনে আমার অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।

(বৈষ্ণব মৃদু হাসিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা, লইয়া অপরগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল)

অনঙ্গলেখা

(অন্যমনস্কভাবে) আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখ্‌তে পাচ্ছি। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দূরতম জ্যোতিষ্কের একটা সূক্ষ্ম কম্পমান আলো আজ পথের উপর পড়েছে! তা' হ'লে জীবন ব্যর্থ নয়! এই বাঁধন-হারা আবেগ তা' হ'লে নিরর্থক নয়! হে আমার আলো, আরো পূর্ণ হও, আরো উজ্জ্বল হও, তোমারই সাহায্যে যেন দুর্গম, বন্ধুর পথ চল্‌তে পারি!

(মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী

গোপীনাথজীর মন্দিরের ব্রহ্মচারী ঠাকুর আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

অনঙ্গলেখা

(চমকিয়া উঠিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল,—পরে বলিল) আচ্ছা, নিয়ে এস।

(মঞ্জরী চলিয়া গেল)

অনঙ্গলেখা

(উত্তেজিত হইয়া) মঞ্জরী ! মঞ্জরী ! না,—না, এনে কাজ নেই—কাজ নেই—যেতে ব'লে দে (সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া) যাঃ, চ'লে গেছে ! (ফিরিয়া আসিয়া) ভগবান, হৃদয়ে বল দাও, আজকার পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হ'তে পারি।

(সত্যব্রত ব্রহ্মচারীর প্রবেশ)

সত্যব্রত

অনঙ্গলেখা, সেদিন নিতান্ত ভুল ক'রে তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। মূর্খের মত তোমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে, আমি অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি। আমায় ক্ষমা করো অনঙ্গলেখা...

অনঙ্গলেখা

আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন, যে নির্লজ্জতার, যে পাপের অভিনয় আপনার কাছে ক'রে এসেছি, তা' মনে হ'লে এখনও শিউরে উঠি। আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, পিশাচী আমি, আপনার পায়ে যা অপরাধ করেছি, তার মার্জ্জনা কোনো দিন মিল্‌বে কিনা জানি না...আমিই আজ আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাচ্ছি, দয়া ক'রে এই পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা কর্‌বেন—আর যত অপরাধ করেছি, সব ভুলে যাবেন।

সত্যব্রত

ক্ষমা ! তোমায় ক্ষমা কর্‌ব ! অনঙ্গলেখা, তুমি আমার চোখের বাঁধন খুলে দিয়েছ ! তুমি আমায় অন্ধকূপ থেকে মুক্ত করেছ ! তুমি আমায় এক অসীম সৌন্দর্য্যের দেশে হাতে ধ'রে পৌছে দিয়েছে ! এতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম, তোমার স্পর্শে আমি আজ আমার মধ্যে জেগে উঠেছি ; আমার বিরাট ব্যর্থতার, বিপুল শূন্যতার মরুভূমিতে তুমি সার্থকতার ধারা বহিয়েছ। তোমার মত নারীরত্নকে অবহেলা ক'রে আমি যে ভুল করেছি—তা' এখন বেশ বুঝতে পারছি। আজ সে ভুল শোধ্‌রাতে তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছি, আশা করি তার সুযোগ দেবে।

অনঙ্গলেখা

আর আমার অপরাধের বোঝা ভারী কর্‌বেন না—যা করেছি তার জন্যেই অনুতাপে জ্ব'লে-পুড়ে মর্‌ছি। আপনি আমার অন্তরের সাথে ক্ষমা করুন আর সব ভুলে যান।

সত্যব্রত

ভুলে যাব ? অনঙ্গলেখা, সেই রাত্রি থেকে এখন পর্য্যন্তও আমি প্রকৃতিস্থ হ'তে পার্‌লাম না,—তোমার চিন্তায় সারাক্ষণ ডুবে আছি—এখন ভিতরে-বাহিরে কেবল তুমি—পৃথিবীময় শুধু তোমাকে দেখ্‌ছি ...

অনঙ্গলেখা

(একবার কাঁপিয়া উঠিল, তারপর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল) আর আমায় শাস্তি দেবেন না...

সত্যব্রত

অনঙ্গলেখা, তুমি কি বল্‌ছ, আমি বুঝতে পার্‌ছি না। যদি আমার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তার চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে,—এ বুক চিরে যদি তোমায় দেখাতে পারতাম, তবে বুঝতে পার্‌তে ! একটা ভুলের জন্য আমায় আর দণ্ড দিও না...

অনঙ্গলেখা

আপনার পায়ে ধরি, আপনি আর ও কথা তুল্‌বেন না...

সত্যব্রত

তোমায় না পেলে আমি উন্মাদ হ'য়ে যাব—আত্মহত্যা কর্‌ব। যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ, তুমিই তা' না নেবালে, আর নিব্‌বে না অনঙ্গলেখা, তুমি অত নিষ্ঠুর হ'য়ো না—আমার কথা শোন—আমায় রক্ষা করো...

অনঙ্গলেখা

ব্রহ্মচারী ঠাকুর ! যে অনঙ্গলেখা আপনার কাছে প্রেম-ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল, তা'কে যে আমার জীবনের মধ্যে আজ স্পষ্টভাবে ধর্‌তে পার্‌ছিনে—তাই আপনার কথার যে কী উত্তর দেব তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। আজ এক নূতন জগতের সিংহদ্বার দূরে দেখ্‌তে পাচ্ছি, নূতন আশায় বুক ভ'রে উঠেছে—জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়নি ব'লে আনন্দ-অশ্রুতে চোখ ভিজে আস্‌ছে। নিন্দায়, কুৎসায়, ঘৃণায় সংসার বজ্রাহত তরুর মত জীবনকে দগ্ধ ক'রে দিলেও, এমন

একজন আছেন, যাঁর প্রসন্নদৃষ্টির আলোকবন্যায় সমস্ত গ্লানি ধুয়ে যাবে, সমস্ত কালিমা মুছে যাবে। আমি সেই পরম-দয়ালের আভাস পেয়েছি। আর নয়—তাঁরই পায়ে জীবন-যৌবন সমস্ত স'পে দেব; তিনি পাপীর দান ব'লে অগ্রাহ্য কর্‌বেন না। তাঁরই ভালবাসার অধিকার নিয়ে জীবন সার্থক কর্‌ব, সে ভালবাসায় আলো আছে, কালি নেই, মধু আছে, হুল নেই, সুগন্ধ আছে, কাঁটা নেই, আরম্ভ আছে, শেষ নেই। আপনিই আমাকে এ জগতের দ্বার দেখিয়ে দিয়েছেন। আপনিই আমার গুরুদেব—আর আপনার পদাঘাতই আমার মন্ত্র। প্রণাম কর্‌ছি গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের এই পথ থেকে যেন কোনদিন ভ্রষ্ট না হই।

সত্যব্রত

উঃ! নিষ্ঠুর! কি বল্‌ছ তুমি! কি বল্‌ছ তুমি! অনঙ্গলেখা, প্রিয়তমে, আমায় বঞ্চিত ক'রো না…

(জড়াইয়া ধরিতে গেল)

অনঙ্গলেখা

(সরিয়া গিয়া) ছিঃ! ছিঃ! কি বল্‌ছেন আপনি! কে আমি? একজন সামান্য বেশ্যা—দেহ-বিক্রয় যা'র ব্যবসা, মিথ্যা নিয়ে যা'র কারবার, তা'র এক হীন ছলনায় ভুলে, আপনার অমূল্য মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন! আপনাকে এত নীচে নাম্‌তে দেখে যে আমার বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে। এ পাপীয়সীর কথা ভুলে যান—সে জঘন্য ছলকলাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস কর্‌বেন না—আপনার নিষ্পাপ জীবন কোন কালিমায় কলঙ্কিত কর্‌বেন না। আপনি আমার চোখে চিরকাল দেবতা হ'য়ে থাকুন, শুধু এই আমার প্রার্থনা…

সত্যব্রত

ওঃ! কী প্রতারণা! রাক্ষসী! সয়তানী!…

(দ্রুতপদে নামিয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

গোপীনাথজী-মন্দিরের প্রাঙ্গণ

কাল—প্রভাত

[করুণানন্দ স্বামী গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছিলেন, মুণ্ডিত-মস্তক, নিরাভরণা অনঙ্গলেখা দীনবেশে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল]

অনঙ্গলেখা

বাবা!

করুণানন্দ

কি মা!

অনঙ্গলেখা

এই মন্দিরে দয়া ক'রে আমাকে একটু স্থান দেবেন?

করুণানন্দ

আমাকে আর তোমার স্থান ক'রে দিতে হবে না মা, তোমার স্থান তুমি নিজেই ক'রে নিতে পার্‌বে। জলস্রোত যখন দুই পারের বন্ধনে আটক প'ড়ে যায়, তখনই নদী-গর্ভের আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে তাকে চল্‌তে হয়, কিন্তু প্লাবনে যখন পারের বাঁধন মুক্ত হয়, তখন নিজের বেগে সে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পথ ক'রে নেয়—কারো নির্দ্দেশে সে তখন চলে না।

অনঙ্গলেখা

বাবা, আমি অস্পৃশ্যা, পতিতা—গোপীনাথজী কি আমাকে পায়ে রাখবেন?

করুণানন্দ

আমি সবই জানি মা, সংসার পাতিত্যের বিধান দিলেই কি লোক প্রকৃত পতিত হয়? পাতিত্যের মাপকাঠি ঠিক করা বড় কঠিন—বড় জটিল। গোপীনাথজীই ত তোমাকে ডেকেছেন মা, না হ'লে তুমি এমন ক'রে কি এখানে আস্‌তে পার্‌তে? তোমাকে পতিত জান্‌লে, তিনি কখনই ডাক্‌তেন না। তিনি বড় শক্ত জহুরী মা,—খাঁটি, ঝুঁটা চিন্‌তে তাঁর মত দ্বিতীয় লোক আর নেই। তুমি এস, মন্দিরের সমস্ত ভার তোমার হাতে স'পে দেব—তুমিই সমস্ত

কাজ করবে,—আর আমিও শেষের ক'টা দিন নিজের হাতে গোপীনাথজীর সেবাতেই কাটিয়ে দেব;—আমরা দুজন ছাড়া এ আশ্রমে আর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হবে না।

অনঙ্গলেখা

আমি!

করুণানন্দ

হাঁ মা, তুমিই মন্দিরের সব কাজ করবে। বোধ হয় শুনেছ, সত্যব্রত মাধবীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, ঐ সঙ্গে তা'রা মন্দিরের বহু অর্থও চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে।

(অনঙ্গলেখা মুখ নত করিয়া রহিল)

করুণানন্দ

আমি দেখ্‌লাম মা, কোন ত্যাগই শিক্ষা দেওয়া যায় না,—সে ফুলের মত আপনিই ফুটে ওঠে। নিজের ভেতর থেকে বৈরাগ্যের উদ্ভব না হ'লে, বাইরের শত চেষ্টাতেও তাকে জন্ম দেওয়া যায় না। মানুষ এই জিনিষটা ভাল রকম বুঝতে পারে না, তারপর যেদিন ভুল ভাঙ্গে, সেদিন ঐ কথাগুলির অস্তিত্বে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করে।—এ কথা আজ আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি। ধর্ম্মশিক্ষার পদ্ধতিগুলিই আজ আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড ভুল ব'লে বোধ হচ্ছে। যত বড় আড়ম্বরই করুন না কেন, কোন মুনি, কোন শাস্ত্রকার, কোন সংহিতাকারই নিয়ম ক'রে সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারেন নি—একদিন তার অসম্পূর্ণতাটা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম্ম শিক্ষার জিনিষ নয় উপলব্ধির জিনিষ; সে আপনিই জন্মায়, তাকে জন্মানর দরকারটা একেবারেই কৃত্রিম। যার প্রাণে প্রবল বর্ষা নামে, সে তোমারই মত এম্‌নি ক'রে সব ছেড়ে ছুটে বেরোয় মা! আর তাদের প্রাণে তিলে তিলে জলসিঞ্চন ক'রে বন্যা আন্‌বার আয়োজন কর্ত্তে হয় না। বর্ষণ যে আকাশের জিনিষ, সে যে খাল-বিলের জিনিষ নয়—এ কথাটা অনেকেই বোঝে না; এটা না বুঝায় যে সংসারে কত অনর্থের সৃষ্টি হয়, তা' আর তোমাকে কি বল্‌ব!

অনঙ্গলেখা

বাবা!

করুণানন্দ

(অন্যমনস্কভাবে) তোমার হাতেই আজ গোপীনাথজীর সমস্ত ভার দিলাম, তুমিই আজ প্রকৃত সেবার অধিকারী।

অনঙ্গলেখা

বাবা! (কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল) তা' হ'লে এই হতভাগিনীর সামান্য সাধটুকু পূর্ণ করুন! (বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখণ্ড কাগজ খুলিয়া করুণানন্দের হাতে দিল)

করুণানন্দ

কি এ!

অনঙ্গলেখা

আমার সমস্ত সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, বাড়ী-ঘর সমস্তই আমি গোপীনাথজীর সেবার জন্য উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি—এ সেই উৎসর্গ-পত্রখানি।

করুণানন্দ

(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) আজ মেঘ ও রৌদ্রের অপরূপ খেলার মধ্যে এক মহান সত্যের রূপ দেখ্‌তে পেলাম! এ যে একাধারে স্বর্গ-নরক, আলো-আঁধার, জীবন-মরণ! কারো প্রখর আলোকদীপ্ত জীবনাকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল আর কারো জীবনাকাশে গাঢ় অন্ধকারের আবরণ ঘুচিয়ে লোহিত সূর্য্য উদিত হ'ল! আবার প্রত্যেকের জীবনের মধ্যেই একটা মেঘ ও রৌদ্রের খেলা! জীবনের আকাশ ত এমনিই পরিবর্ত্তনশীল।

যবনিকা পতন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পদানন্দ

শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র বি-এ

প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীর সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। অনুরক্ত সাহিত্য-সেবীগণের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল নিত্য-নূতন প্রাচীন পদাবলী আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময় ও পুলকে অভিভূত হইতে হয়—আমাদের মাতৃভাষায় পদাবলী-সাহিত্যের বিপুলতার কথা উপলব্ধি করিয়া গৌরব-বোধে প্রবুদ্ধ হইতে হয়।

এই পদাবলী-সাহিত্যের এক একটি পদ, এক একটি সমুজ্জ্বল রত্ন-কণিকা। এই সকল রত্ন-কণিকা, শীতের ক্ষেত্রে ধান্য-মুষ্টির ন্যায়, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ছিল। তখন কত কত মণিকারের আবির্ভাব হইল; এই সকল রসজ্ঞ মণিকারগণ ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ভাস্বর মণিকণিকা-গুলিকে অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসন ও পর্য্যায়-সম্মত যথা-যোগ্য ভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া যে অপূর্ব্ব সাত-নর, শত-নর বা সহস্র নর মণিমালা গ্রথিত করিয়া বঙ্গবাণীর শ্রীমন্দির সুসজ্জিত করিলেন, তাহার তুলনা নাই।

এই সকল পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ মধ্যে—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (বা হরিবল্লভ, বা বল্লভ দাস) সঙ্কলিত—'ক্ষণদা গীত চিন্তামণি', বৈষ্ণব দাস (বা গোকুলানন্দ সেন) সঙ্কলিত সমধিক প্রচারিত—'পদকল্পতরু', ঘনশ্যাম (বা নরহরি চক্রবর্ত্তী) সঙ্কলিত 'গীত চন্দ্রোদয়', রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদামৃত সমুদ্র', গৌরসুন্দর দাস সঙ্কলিত 'কীর্ত্তনানন্দ' এবং 'পদকল্পলতিকা' প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত', নিমানন্দ দাস সঙ্কলিত 'পদরসসার', ও কমলাকান্ত দাস সঙ্কলিত 'পদরত্নাকর'—এই কয়খানি প্রাচীন সংগ্রহ-পুস্তকের সন্ধান মাত্র পাওয়া গিয়াছে—এখনও মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। বাবা মনোহর দাস আউল সঙ্কলিত 'পদ-সমুদ্র' নামক এক বিরাট পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের নামই প্রচারিত হইয়াছে—আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহা চক্ষে দেখিতে পান নাই—বা, কোন সাহিত্য-সেবী এতকাল মধ্যে এই পুস্তকের দুই একখানি পত্রেরও সন্ধান, বা কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই পুস্তকের উল্লেখ প্রাপ্ত হন নাই। অধুনা সঙ্কলিত ও মুদ্রিত পদ-সংগ্রহ গ্রন্থমধ্যে এই কয়খানি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে—৺ অক্ষয় চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত-'প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ', ৺ জগবন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত 'শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী', শ্রীরবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত 'পদরত্নাবলী' প্রভৃতি।

প্রথমোল্লিখিত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত, এখনও কত কত নিত্য নূতন প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে—লোকলোচনের অন্তরালে এইরূপ গ্রন্থ কত যে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার ধারণা করা যায় না। আমাদের 'রতন'-লাইব্রেরীতে (বীরভূম), এইরূপ বহু অপ্রকাশিত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই স্থলে আমরা মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি—রাধামুকুন্দ দাস সঙ্কলিত 'মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ', 'পদমেরু', 'পদসুধানিধি', 'পদানন্দ', 'কীর্ত্তন পদাবলী', চণ্ডীদাসের 'একষট্টি পদ', 'বাষট্টি পদ' ও সমগ্র পদাবলী, গোবিন্দ দাসের 'পদাবলী', বলরাম দাসের 'পদাবলী' ও 'একান্নপদ', জ্ঞান দাসের 'পদাবলী', জগদানন্দ-পদাবলী বাসু ঘোষ-পদাবলী, নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা-পদাবলী, তরুণীরমণ, ভূপতিনাথ, সারঙ্গ দাস, চন্দ্রসখী, বীরবল্লভ, ধনঞ্জয় দাস প্রভৃতির পদাবলী, এবং বাসকসজ্জা-পদাবলী, মানভঞ্জন-পদাবলী, নৌকাখণ্ড, গোষ্ঠলীলা-পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ।

এ-যাবৎ যে-সকল পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের পর্য্যায়ানুমত সজ্জিত বা গ্রথিত হইয়াছে। বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র—"ভক্তি রসামৃত সিন্ধু," "উজ্জ্বলনীলমণি" প্রভৃতি অতি দুরূহ-গ্রন্থ—এই গ্রন্থাবলীর অনুশাসন সম্মত পদাবলী সুসজ্জিত

করা বিশেষ জ্ঞান ও সাধনা-সাপেক্ষ হইলেও, প্রায় সকল প্রাচীন সঙ্কলন-কর্ত্তাই, এবিষয়ে যথেষ্ট প্রবেশাধিকার ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বাসু ঘোষ, নরোত্তম ঠাকুর, জগদানন্দ, তরুণীরমণ, শশীশেখর, চন্দ্রসখী প্রভৃতি বহু প্রাচীন পদকর্ত্তার পদাবলীর স্বতন্ত্রভাবে প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থও দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু, এই সকল গ্রন্থে কেবলমাত্র এক একজন মহাজন-রচিত পদাবলী সংগৃহীত রহিলেও, এই সকল পদাবলী পূর্ব্বোক্ত রূপ রসপর্য্যায়ানুসারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ, শশীশেখর প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র পদকর্ত্তার পদাবলী স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইলেও, এখনও গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা প্রাচীন পদকর্ত্তার সমগ্র রচনাবলী একত্র প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে, এক একজন কবির এইরূপ সমগ্র রচনা-সম্বলিত সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিলে এইরূপভাবে সঙ্কলিত পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের অভাব হইবে না।

এই দুই প্রকারের পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন পুঁথি মধ্যে 'বাসকসজ্জা' 'পূর্ব্বরাগ', 'কলহান্তরিতা', 'মানভঞ্জন', 'গোষ্ঠলীলা' ইত্যাদি বিষয় বিভাগানুযায়ী সজ্জিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংগ্রহ-গ্রন্থও পরিলক্ষিত হয়। এ-গুলিকে কিন্তু প্রথমোক্ত সংগ্রহ গ্রন্থের অংশমাত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আমাদের 'রতন'-লাইব্রেরীতে 'পদানন্দ' নামক একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহের পুঁথি আছে (পুঁথি সংখ্যা—২৮১০)। এই গ্রন্থখানি পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে সজ্জিত হইয়াছে। এ-যাবৎ যত প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছি, সকলগুলিই রসপর্য্যায় অনুসারে সুসজ্জিত—এই 'পদানন্দ' গ্রন্থখানি কিন্তু সেরূপ ভাবে নহে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রাচীন পদাবলীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য সঙ্কলয়িতা (তিনি কুত্রাপি নিজ নামোল্লেখ করেন নাই) একাদশ জন খ্যাতনামা প্রাচীন পদকর্ত্তার এবং কতকগুলি অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার ২৬৬টি পদ গ্রথিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। পুঁথিটির আকার ৫৫ পৃষ্ঠা মাত্র।

'পদানন্দ'-গ্রন্থে কেবল মাত্র খ্যাতনামা পদকর্ত্তার পদাবলীই সংগৃহীত হইয়াছে এই নিমিত্ত এই গ্রন্থে আমরা কোন নূতন পদকর্ত্তার সংবাদ প্রাপ্ত হই না। সঙ্কলনকর্ত্তা আত্মগোপন করিয়াছেন তবে তিনি যে পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষ ভাবে লব্ধ-প্রবিষ্ট ও রসজ্ঞ ছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এই 'পদানন্দ' গ্রন্থখানি মোট ৩৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয়বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মাত্র কয়েকটি অধ্যায়ের নামোল্লেখ করিতেছি—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভুর জন্মলীলা। গৌরচন্দ্র শেষ হইলে পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, শ্রীরাধিকার জন্মলালা, বাল্যলীলা আরব্ধ, ফলাহারী উপাখ্যান, কৌমার-লীলা, বদনে ব্রহ্মাণ্ড, বাৎসল্য লীলা, গোষ্ঠলীলা, ব্রহ্মমোহন, দেবগোষ্ঠ, যাবধ-মিলন, অন্নভিক্ষা, গোবর্দ্ধন ও অন্নকূট, পুলিন-ভোজন, কালীদহে ঝাঁপ, শ্রীরাধার বিলাপ, শ্রীচৈতন্য প্রভুর অভিষেক ও স্নান-যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও শ্রীমতীর অভিষেক।

'পদানন্দ'-গ্রন্থের বিষয়-সূচীর এই আংশিক পরিচয় হইতে উপলব্ধি হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাল্যলীলা বর্ণন জন্যই সঙ্কলয়িতা এই গ্রন্থ সংগৃহীত করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর রসপর্য্যায়ের পদগুলির সংগ্রহ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন জন্য, উপাখ্যানচ্ছলে তিনি পয়ারাদি ছন্দে গ্রন্থ রচনা না করিয়া কেবলমাত্র খ্যাতনামা সিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের পদাবলী যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটি ধারাবাহিক বাল্য-কাহিনী ভক্তগণসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আবার, সঙ্কীর্ত্তনের প্রথামত তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোদেশে 'গৌরচন্দ্র' সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্য-লীলাবিষয়ক গ্রন্থখানি, গায়কগণের পক্ষে সর্ব্ববিধ রূপে উপযোগী করিয়াই সঙ্কলিত হইয়াছে।

মাধব দাস বা কৃষ্ণদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলবিষয়ক পুঁথিগুলি গীত হইবার জন্য রচিত। তাহাতে মাত্র একজন কবির রচনায় সহিত শ্রোতৃবর্গের

পরিচয় সংঘটিত হইত। কিন্তু আলোচ্য 'পদানন্দ'-গ্রন্থে, শ্রোতৃবর্গের তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে লাভবান হইবার সুযোগ রহিয়াছে। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ে বিশেষ খ্যাতনামা যত যত কবি পদ-রচনা করিয়াছেন, সঙ্কলয়িতা তৎসমুদয় হইতে মনোমত পদগুলি বাছিয়া লইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ও ভাবুক শ্রোতৃবর্গের, পদকর্ত্তাগণের বহু সাধনালব্ধ সুন্দর সুন্দর পদ উপভোগ করিবার অবসর প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন এবং নিজেও ধন্য হইয়াছেন।

কেবলমাত্র বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদাবলী গ্রথিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাল-লীলা বর্ণনের প্রয়াস হিসাবে এই পদ-সংগ্রহখানি সমাদরযোগ্য। এ ভাবের সংগ্রহপুস্তকমধ্যে এই 'পদানন্দ' গ্রন্থখানিই, প্রথম সাধারণ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইল। গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও প্রচারযোগ্য সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ হইতে আমরা মাত্র একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই পদটি 'পদকল্পতরু' গ্রন্থেও সঙ্কলিত হইয়াছে—

রাগিণী-সারঙ্গ ; তালোচিত

সবহু মিলিত যমুনা তীর
বৈঠলি তহি তরুর ছায়
নবীন নীরদ-বরণ জ্যোতি
উরে বিলম্বিত কদম্ব মাল
কুন্দ কলিক কলিত চূড়ে
কটীতটে কিয়ে পীত বসন
হসিত ললিত বদন-ইন্দু
লোল নয়ন কমল যুগল
নগর উজোর যেছন চন্দ
লুব্ধ হেরি চরণ চরণ ঘেরি
অরুণ অধরে পূরত বেণু
সহজে সুন্দর বিরহে ভোর
শুনি শুনি গোপী হরণ বোল
রহি রহি রহি চমকি উঠত
অনেক যতনে চেতন পাই
ফেরি হেরত বেরি বেরি
দাস প্রসাদ করত আশ
শুনি তিরপিত বচন সুখ

অঞ্জলি পুরিয়া পীয়ত নীর
বিহরে নন্দ-নন্দনা।
নাসার নলকে ঝলকে মতি
ভালে তিলক চন্দনা॥
মন্দ পবনে বরিহা উড়ে
তাহে শোভিত কঙ্কণা।
অলপে উপজে ঘরম বিন্দু
তাহে ললিত অঞ্জনা॥
চকোর নিকর লাগল ধন্দ
সঘনে করত চুম্বনা।
সুণাঞে ঘেরত সবহু ধেনু
দূরে বরজ-অঙ্গনা॥
ভাবে অবশ চিত বিভোর
থরহি ধরত কম্পনা।
চললি যাঁহা সুন্দরী রাই
ঐছন মন রঞ্জনা॥
অমিয়া অধিক মধুর ভাষ
তাপনিকর ভঞ্জনা॥ (১৮১)

শ্রীগৌরীহর মিত্র
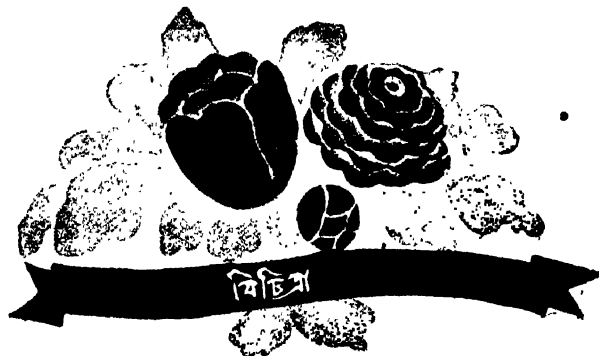
ছুটির দিন

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির এম-এ

কলকাতায় হেমন্ত-শেষের অপরাহ্ন। কলেজগুলির পূজোর ছুটি ফুরিয়ে এলেও কলকাতা তখন প্রায় ছাত্রশূন্য। বেশীর ভাগই ছুটিতে হয় বাড়ী নয় বেড়াতে গেছে; কেবল আমাদের মতন যে হতভাগ্যেরা পরীক্ষার আসন্নতায় শঙ্কিত, তারাই বাইরের সকল প্রলোভন সত্বেও কলকাতার মাটি আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে রয়েছি। জিজ্ঞেস করলে হয় তো সবাই অকুণ্ঠিত চিত্তে উত্তর দিতাম যে পরীক্ষার পড়া করতেই রয়েছি, কিন্তু সত্যি সত্যি পড়া যে কতদূর হ'ত, সে কথা আজ না বলাই ভাল। তবে পরীক্ষায় আমাদের ফল দেখে অনেকে হয় তো কিছু কিছু অনুমান করেছিল। বাড়ী থেকে সবাই প্রায় চিঠি পেতাম—বেশী পড়াশোনা ক'রে শরীর যেন নষ্ট না ক'রে ফেলি; কিন্তু মায়ের সুসন্তানরা কি মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে? সকালে নয়টা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে, তারপরে দুপুর বেলা হল্লা করায়, আর বিকেলের শেষের দিকে গড়ের মাঠের ধারের সরু রাঙা সুরকীর পথ দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্য্যন্ত হেঁটে আসায় শারীরিক উপকার হ'লেও হ'তে পারে; কিন্তু পরীক্ষা পাশের যে তাতে বিশেষ সুবিধা হয় একথা হলপ ক'রে বল্লেও বোধ হয় অভিভাবক সম্প্রদায় স্বীকার করবেন না। তারপরে খেয়ে দেয়ে রাত্তির বারটা পর্য্যন্ত তাণ্ডব তর্ক—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, টুর্গেনিভ, চেকফ, লরেন্স, গলসওয়ার্দ্দি থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্বজগতের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক সকল সমস্যারই সেখানে সমাধান হ'ত—অবশ্য সমাধানে যে কারু সঙ্গে কারুর মত মিলত তা নয়, কিন্তু নিজের মতে নিজেই যখন সন্তুষ্ট হওয়া যায়, তখন তার চেয়ে বেশী আর কি চাই?

সেদিন সকাল বেলা যার ঘরে আড্ডা বসবার কথা সে তখনো ঘুমোচ্ছিল। তখন প্রায় দশটা বাজে, কলকাতার পথে গাড়ীর শব্দ আর একটা চামড়ার কলের অশ্রান্ত ঘর্ঘরে ঘুমোনো হয় তো অসম্ভব, কিন্তু তবু পাতলা রেজাইখানি টেনে সন্তর্পণে নাক কান ঢেকে আলো ও কোলাহল থেকে আত্মরক্ষা ক'রে যে ছেলেটি ঘুমোবার ভাণ করে প'ড়ে ছিল, তার পিতৃমাতৃদত্ত ব্রাহ্মণ-সুলভ নামটি ঘুচে গিয়ে আপাততঃ কেবলমাত্র টুলুতেই দাঁড়িয়েছিল। আর সত্যিই পাতলা শ্যামবরণ ছোট্টখাট মানুষটিকে লম্বা-চৌড়া সংস্কৃত-নামের চেয়ে টুলুতেই মানাতো বেশী। চুল আজকালকার ছেলেদের মতন ক'রে কাটা, নাকটা তিলফুলের সঙ্গে তো তুলনীয় নয়ই, বরং বোধ হয় বাঙালীর পক্ষেও একটু বেশী চাপা, আর বেশভূষায় কলেজের ছেলেদের সতর্ক অমনোযোগিতা। এক কথায় বলতে গেলে তাকে পাঁচজনার মধ্যে একজন ব'লেই মনে হয়, কেবল খানিকটা কথা বল্লে সন্দেহ হয় যে হতাশ প্রেম বা অজীর্ণ রোগ,--যে কারণেই হোক প্রথম যৌবনেই ছেলেটি পৃথিবী সম্বন্ধে সকল মায়ামরীচিকা হারিয়ে বসেছে। কাল রাত্তিরে বারোটার পরে Ben Jonson পড়বার ঘন্টা খানেক বৃথা চেষ্টা ক'রে আমাদের ও নিজের ওপর বিষম চ'টে সারারাত্তির ঘুমোতে পারেনি—তাই এখন সকাল বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাদের সঙ্গ যে বিষবৎ পরিহার্য্য এ কথাটা ভাল ক'রে উপলব্ধি করছে।

আমি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম—কই, চা করনি এখনো? এই,—টুলু।

যেন গভীর ঘুম থেকে উঠ্‌ছে, এমনি ভাণ ক'রে পাশ ফিরে আলস্যজড়িত বিরক্ত স্বরে সে বল্ল, আবার সকাল বেলা এসেছো জ্বালাতে? কাল তো রাত্তির বারটা পর্য্যন্ত তোমাদের জ্বালায় ঘুমোতে পারি নি, এখন যে একটু ঘুমোবো তারও উপায় নেই।

আমি টেবিলের উপরে পাতাখোলা Ben Jonson ও গলা মোমের স্তূপের দিকে চেয়ে বল্লাম, তা আমরা না হয়

রাত বারোটা পর্য্যন্তই ছিলাম, কিন্তু বুড়ো জনসন তো তারপরও তোমায় ছাড়েনি। কত রাত্তির জেগেছো বল তো? তাই তো আমরা বলি যে পরীক্ষার নাম ক'রে টুলু বাড়ী গেল না—আর এখানে সারাদিন নিদ্রা! তা হ'লে পড়ে কখন?

ঈষৎ ক্ষীণ কণ্ঠে সে উত্তর দিল—তা পড়ব না, পড়্‌তেই তো ছুটিতে রয়েছি। তবু তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে এতদিন যদি কিছু হ'ল! আজই আমি হষ্টেল ছাড়ছি, আর নইলে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পড়ব। তোমরা আমার ঘরে কেউ আর এসো না।

আমি জোরে হেসে উঠ্‌লাম। কতবার যে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞা সে করেছে, কত্‌বার যে তার ঘরে আমাদের আসতে সে নিষেধ করেছে, তার হিসাব রাখতে বোধ হয় স্বয়ং চিত্রগুপ্ত ভুল করতেন,—কিন্তু আবার কোথাও একটু গল্পের আভাস পেলে সে-ই প্রথমে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর মজলিশ যখন ভেঙ্গে যায়, তখনো শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে রয়েছে সেও শ্রীমান টুলু।

আমার হাসিতে একটু অপ্রস্তুত হ'য়েই সে বল্ল, না, না, আমি কি সত্যি তাই বলছি, তবে সব সময়ে যদি এমন ক'রে পড়বার ব্যাঘাত কর, তবে যে এবার পরীক্ষায় থার্ডক্লাশও পাব না! নিজে না হয় ফার্ষ্ট পেয়ে ব'সে আছ—কিন্তু তাই ব'লে আমার পড়ার ক্ষতি কর কেন? একটু রেহাই দাও, দোহাই তোমাদের। কাল থেকে যদি বেলা বারোটার আগে কেউ আমার ঘরে ঢোকে, তবে তাকে আমি খুন করব।

এমন সময় প্রাচীন ভারত ঘরে ঢুকল। ঐতিহাসিকের ভয় পাবার কারণ নেই, সময়ের স্রোত যে চিরদিন সামনের দিকে চলে, অন্ততঃ পিছে ফিরে আসে না, দর্শনের ছাত্র না হ'লেও এটুকু আমার মোটাবুদ্ধিতেও বুঝি। প্রাচীন ভারত কোন অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি বা অতীত কোন সভ্যতার প্রাণপুরুষ নয়, নেহাৎ আমাদেরই মতো বা তার চেয়েও বেশী রক্তমাংসের সশরীরী জীব। আরো বেশী পরিচয়, ভারত-শাসনযন্ত্রের লৌহ-কাটামোকে সুদৃঢ়তর করবার সাধনায় সে এখন আত্মস্থ সাধক। বলিষ্ঠ গড়ন, দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, তার ওপরে দিনরাত্রি ব্যায়াম আর শরীর-চর্চ্চা ক'রেও তার ধারণা যে দিন দিন সে শুকিয়ে যাচ্ছে—ওজন বেশী হ'লে বলে মাপবার যন্ত্রটা নিশ্চয় ভুল। গায়ের রঙ ফরসা আর মুখে চোখে একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব।

প্রাচীন ভারত সংস্কৃতের ছাত্র না হ'লেও দিনরাত্রি সংস্কৃত পড়ত আর আমাদের কাছে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতো ব'লে আমরা তার নাম দিয়েছিলাম—প্রাচীন ভারত। হয় তো এ নামকরণের আরো একটা কারণ ছিল—দু'হাজার বছর আগে এ দেশে যা কিছু সভ্যতা ও দর্শন হয়েছে, তার পরেও যে পৃথিবী খানিকটা এগিয়ে গেছে এ কথা সে স্বীকার করতে চাইত না—আমরাও তার প্রাচীন-ভারত-প্রীতি দেখে তার নাম দিলাম প্রাচীন ভারত। সেও চ'টে মাঝে মাঝে আমাদের এ রকম নামকরণ করতে চাইত, কিন্তু ও রকম পণ্ডিত-গোছের ভালমানুষদের রহস্য-জ্ঞান সাধারণতঃ একটু কম থাকে, তাই আমাদের সকলের মিলিত ঠাট্টার বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারত না। আমরা তাকে খেপালে সে চ'টে আমাদের নাস্তিক, দেশদ্রোহী ব'লে গাল দিলেও শেষে নিজেই এসে আবার ক্ষমা চাইত।

প্রাচীন ভারত ঘরে ঢুকেই বল্ল,—কাকে খুন করবেন শেখর বাবু?

আমি নিরীহ ভদ্রলোক সেজে বল্লাম—দেখো সারা রাত জেগে Ben Jonson পড়েছে—শরীরের উপর যদি একটু দৃষ্টি থাকে! বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছে দেখে আমি জাগাতে এসেছিলাম, তাতে উল্টে বলে আমাকে খুন করবে! ধন্য ছেলে কিন্তু তুমি, সারা রাত্রি Ben Jonson পড়া! আমার তো পড়তে বসলেই ইচ্ছে করে জনসনকে সাম্‌নে পেলে মোটা মোটা বইগুলো তার মাথায় ছুঁড়ে মারি।

কোথায় গেল টুলুর ক্লান্তি, কোথায় গেল তার নিদ্রা! লাফিয়ে উঠে ব'সে পরম উৎসাহে বল্ল, ঠিক বলেছ! যা লিখেছে তার যদি কোন মাথামুণ্ডু থাকে। হয় ভাঁড়ামি, নয় অবোধ্য পণ্ডিতামি, আর রুচির কথা, সে আজকার দিনে

না বলাই ভাল। Universityরও যদি একটু আক্কেল থাকে—এত বই থাকতে বল্লে কিনা Alchemsit পড়তে!

প্রাচীন ভারতের University-ভুক্ত সমস্ত মান্যব্যক্তির ওপরেই অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সম্মানাস্পদকে সম্মান করলেও যে তাকে ঠাট্টা করা চলে এ কথা সে বুঝত না, কিন্তু তাই ব'লে নিজেদের মধ্যে যখন তখন তাকে গাল দিতে আমরা ছাড়ব কেন? বাইরের কেউ এসে আমাদের Universityর নিন্দা ক'রে যাবে সে আস্পর্দ্ধা না সইলেও আমরা তাকে নিন্দা করতে বাদ দিতাম না—বিশেষ ক'রে যখনই পরীক্ষা ঘনিয়ে আসত!

প্রাচীন ভারত তাই একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েই বল্ল,—তা University কি আর না ভেবে চিন্তেই পাঠ্য ঠিক করেছে, না Universityর কর্ত্তাদের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কম? ইংরেজি সাহিত্যে M. A. পড়বেন, অথচ ইংরেজি সাহিত্যিকদের লেখা পড়বেন না, সে কেমন ক'রে হবে? Ben Jonson তো কত বড় ইংরেজ নাট্যকার—ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা করতে হ'লে তাঁর সঙ্গেও পরিচয় কর্ত্তে হবে বই কি।

একটু তর্কের খাতিরে তর্ক করতে আমার ইচ্ছে হ'ল, বল্লাম—সেই তো আমার আপত্তি। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করতে হ'লে যে ইংরেজ সাহিত্যিকদের লেখা পড়তে হবে সে কে না জানে? কিন্তু আমাদের পাঠ্য তো সে রকম ক'রে ঠিক হয় না! এখান থেকে ওখান থেকে বেছে দু একজন বিশেষ লোকের বিশেষ বই পাঠ্য করা হয়েছে—কিন্তু সে কখানি বই পড়লে বাকী ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কি আপনা থেকেই হবে?

প্রাচীন ভারত বল্ল—University তো আর তোমাকে সেগুলো পড়তে মানা করেনি।

আমি বল্লাম—তা একরকম করেছে বই কি? পাঠ্য করা এবং সেই পাঠ্য বই থেকে খুঁটি-নাটি প্রশ্ন দেওয়া মানেই যে সেগুলো এতটা খুঁটিয়ে পড়তে হবে যে আর কিছু পড়বার সময় কই? Shakespeare একটি শব্দে i'র ফোঁটা দিয়েছিলেন কি না, সে কথা স্মরণ ক'রে রাখলে যে জগতের বা আমার বিশেষ কোন উপকার হবে তাও তো মনে হয় না!

প্রাচীন ভারত বল্ল—Shakespeare ঠিক কি বলেছিলেন সে কথা বুঝতে হ'লে কিন্তু সে বিচার ছাড়া চলবে না—i'র ফোঁটার জন্য যে সমস্ত অর্থ বদলে যেতে পারে মানো না?

দেখলাম এরি মধ্যে টুলু আবার রেজাইখানার তলায় অন্তর্দ্ধান হবার উপক্রম করছে—আমাদের তর্কের সুযোগে যদি আর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। আমি রেজাই ধ'রে টান দিতেই সে উঠে ব'সে দুহাত জোড় ক'রে বল্ল,—কেন জ্বালাচ্ছ ভাই? তোমাদের পায়ে পড়ি একটু ঘুমোতে দাও।

আমি বল্লাম—আজ না তোমার চা করবার পালা? গোঁসাই আর অতিকা এখনই আসছে। আর প্রাচীন ভারত তো সামনে দাঁড়িয়ে।

বলাবাহুল্য প্রাচীন ভারত চা খায় না।

কি হে, চায়ের কতদূর—বলতে বলতে গোঁসাই ঘরে ঢুকল।

গোঁসাই দর্শনের ছাত্র এবং তর্ক করতে একটু বেশী রকম ভালবাসে। সকল প্রশ্নেরই মূল কথা খোঁজা তার স্বভাব, এবং এই গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার প্রয়াসে প্রায় সকল তর্কেরই অবসান হ'ত যেখানে, তার সঙ্গে প্রথম যে কথা নিয়ে তর্ক উঠেছিল তার তো কোন সম্বন্ধ থাকতোই না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুর সঙ্গেই তার কোন সম্বন্ধ থাকতো কিনা সন্দেহ! কোথাও তর্কের গন্ধে ফুলের গন্ধে মৌমাছির মত ঠিক গিয়ে জোটে কিনা জানিনে, তবে তর্ক কোথাও একবার সুরু করলে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে আনা যে কী দুরূহ ব্যাপার সেটা বহুবার রাত্তিরে লেট্ ফাইন দিয়ে দিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। সন্ধ্যার পর কোথাও সে তর্ক করতে বসলেই আমরা বলতাম, গোঁসাই, আমরা কিন্তু উঠ্‌লাম!

গোঁসাইজীর দিকে তাকালে প্রথমে তার নাকখানিই চোখে পড়ে। শ্যামবরণ দোহারা গড়ন, মাথায় খাটো না হ'লেও খুব লম্বা নয়, আর একরাশ এলোমেলো চুল বল্লে বোধ হয় বিশেষ কোন ছবি মনে আসে না; কিন্তু লম্বাটে গড়নের মুখখানিতে প্রশস্ত কপালের তলায় বক্র নাসিকা

উদ্যত খড়্গের মত পাতলা ঠোঁট দুখানির উপর ঝুলে রয়েছে, এ যেই দেখেছে সেই গোঁসাইজীর আর যাই ভুলুক, নাকখানির কথা সহজে ভুলতে পারবে না। চোখ দুটি ছোট হ'লেও তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, আর সর্ব্বদাই চঞ্চল—যেন প্রতিপক্ষের যুক্তিতে ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছে আর যেখানেই কোন দুর্ব্বলতার সন্ধান পাবে, তীরের মত সেখানে গিয়ে বিঁধে পড়বে।

গোঁসাই চা জিনিষটাকে তর্কের মতনই ভালবাসত। মাঝে মাঝে বলতো যে, ভাল চা তৈরী করতে পারে আর তার সঙ্গে তর্ক ক'রে ক্লান্ত না হয়—এমন একটি স্ত্রী পেলে সে যে-দেশের যে-জাতির এবং যে-বয়সেরই হোক না কেন, গোঁসাইর জীবনে আর কোন কাম্য থাকত না। চা সম্বন্ধে আমারও একটু দুর্ব্বলতা ছিল, কিন্তু গোঁসাই আসবার পর থেকে আমার চা-খোর দুর্নাম ঘুচে যায়। সেই কৃতজ্ঞতায় তাকে অনেক সময় নিজে চা ক'রে খাইয়েছি—আমার মত আল্‌সে লোকের বোধ হয় কৃতজ্ঞতার এর চেয়ে বড় পরিচয় আর নেই।

বিছানায় লম্বমান টুলুর দিকে তাকিয়ে গোঁসাই একটু হতাশ স্বরেই বল্ল—তা' হ'লে চা-টা এখনো হয়নি শেখরবাবু?

আমি বল্লাম—এ কথাটা আবিষ্কার করতে যে দার্শনিকের এতক্ষণ লাগল সেও আমার পক্ষে আবিষ্কার। কারণ ভিন্ন নাকি কিছুই হয় না, কাজেই টুলু বিছানায় শুয়ে থাকলে যে চা-টা আপনি থেকেই তৈরী হ'য়ে থাকবে না, এটা কি খুব আশ্চর্য্য?

টুলু এবার উঠে ব'সে একটু লজ্জিত ভাবেই বল্ল—না, না, বসুন গোঁসাইজী। চা, এক্ষুনি হ'য়ে যাবে, কিন্তু খাবার তো কিছুই নেই।

আমি বল্লাম—যখন খাবারওলা এসেছিল তখন স্বপ্নে তুমি হয় তো Anglo-Saxon শব্দরূপ মুখস্থ করছিলে—খাবারওলা তো আর অন্তর্যামী নয়, সে কেমন ক'রে জানবে কি চাই আমাদের।

গোঁসাই চায়ের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল—বিশেষত টুলু চা-টা বেশ ভালই করত, তাই বল্ল—সে ভার আমার। আমি রমেশকে ব'লে এসেছি, সে বল্ল যে হানিফকে দিয়ে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবে। এই হানিফ, এই ঘরে।

বলতে বলতেই একথালা গরম জিলিপি নিয়ে হানিফের প্রবেশ। বলা বাহুল্য রমেশ এবং হানিফ দুজনেই হষ্টেলের চাকর। হষ্টেলে ঠাকুর বদলাতো, চাকর বদলাতো, মাঝে কিছুদিন এক মগ বাবুর্চ্চি ছিল, সেও চ'লে গেলো; বৎসরের পর বৎসর নূতন ছেলের দল আসতো আর চ'লে যেতো, কিন্তু রমেশ আর হানিফ যেন দালানের ইটকোঠামাটির সামিল হ'য়ে গিয়েছিল—যতদিন হষ্টেল থাকবে, ততদিন যেন তারা হষ্টেলের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। হানিফ বেহারী মুসলমান, কিন্তু আমাদের ওখানে প্রায় সাত আট বৎসর আছে ব'লে বাংলা বেশ ভাল বুঝতে পারে, তবে বলতে গেলে আমরা যেমন হিন্দি বলতাম তার চেয়ে বিশেষ বলতে পারত না। তার কালো লুঙ্গি আর বহু পুরাতন কোর্ত্তা দেখে অনেক সদ্য-আগত হিন্দু ছেলে প্রথমে ভয় পেতো বটে, কিন্তু শেষে আবার তারাই ওকে খাটাতো বেশী—আর খাটতে ওর আপত্তিও ছিল না। তৈলচিক্কণ সযত্নবিন্যস্ত চুল এবং বিকশিতদন্ত হাসি আমাদের অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে বকলেও যখনও দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকত, আমাদের বিশেষ গায়ে লাগতো না।

টুলু তখন ষ্টোভ ধরাচ্ছে, বল্ল—হানিফ, এক কেট্‌লি জল দিয়ে যাও তো।

২

অতিকা ঘরে ব'সে পড়ছিল। অতিকা নামধারিনী কোন তরুণীর যে ছেলেদের হষ্টেলে বাস করা সম্ভবপর নয় সে কথা না বল্লেও চলে, তবু পাছে কারু সন্দেহ হয় তাই স্পষ্ট ক'রেই বলছি যে সে আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজেরই ছাত্র; গণিতজ্ঞ ব'লে ছাত্র এবং প্রফেসর সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল ব'লে বোধ হয় অঙ্কেই একবার ফেল্ ক'রে সবাইকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিল। হষ্টেলের কয়েকটি ছেলে তার নামের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন ক'রে "হাতিখোর" করবার চেষ্টা করলেও ক্ষীণ সুকুমার তনুখানিতে হাতীর চেয়ে লতিকার সঙ্গে বেশী মিল থাকাতে তার ঐ নামই

বাহাল হ'য়ে গিয়েছিল—কাঙ্গালীলাল কিন্তু তবু হাল ছাড়েনি। সে তাকেই বদলে ওকে অম্বিকা রাক্ষসী ব'লে ডাকত।

অতিকা বাঙালী এবং মুসলমান; যদিও সে কথা শুনে একবার ট্রেনে একটি ছেলে ওকে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাঙালী হ'লে আবার সে মুসলমান কেমন ক'রে হ'তে পারে? তবু সে বাঙালী মুসলমান; কিন্তু ভগবান মুসলমানও নন, হিন্দুও নন, তাই তার গায়ে হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্বের কোন ছাপ মেরে দেন নি। অতিকাকে দেখে তা বোঝা যেত না, এবং খানিকক্ষণ কথা বল্লে সে যে একজন আধুনিক কেবল এই কথাটাই স্পষ্ট বোঝা যেতো। প্রাচীন ভারতবর্ষ বা আরবের চেয়ে, সৌভাগ্যক্রমেই হোক আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক্ আজকালকার ছেলেদের বোধ হয় ইয়োরোপের সঙ্গেই সম্বন্ধ বেশী এবং তারা মতের মিল খুঁজে পায়—শঙ্করাচার্য্যের সাথে অথবা ঈমাম গাজ্জালীর সাথে তত নয়—যত Bertrand Russel এবং Watson'র সাথে। ফ্রয়েডকে তারা অস্বীকার করলেও বুঝতে পারে; মনু বা হানিফাকে যখন স্বীকার করে, সে না বুঝেই করে।

অতিকা পড়ছিল, গোঁসাইর গলার আওয়াজে বই বন্ধ ক'রে টুলুর ঘরে যেখানে তুমুল আলোচনা চলছে সেখানে এসে দরজার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়াল।

আলোচনার বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। গোঁসাই বলছিল—ধর্ম্ম জিনিষটাই মানুষের মনের একটা কুসংস্কার—Freud'র কথায় infantile neurosis of the human mind—যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম থাকবে, ততদিন মতভেদও থাকবে, হিন্দু-মুসলমানও পরস্পরের মাথা ফাটাবে।

প্রাচীন ভারত বল্ল—ধর্ম্ম কুসংস্কার এটা আমি মানতে বাধ্য নই। ফ্রয়েড ব'লে গেছেন ব'লেই সে কথা বেদবাক্য ব'লে মানতে হবে নাকি? আর তা ছাড়া তুমি তো জান যে ফ্রয়েডের মত সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি।

গোঁসাই উত্তর দিল—ফ্রয়েডের কথা মান আর নাই মান এ কথাটা তো মানতে হবে যে, ধর্ম্ম মানুষের বুদ্ধিগত ব্যাপার নয়। ওর জন্ম মানুষের আবেগে এবং সেখানেই ওর বৃদ্ধি। মানুষের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির মিল হ'তে পারে, কারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা গ্রহণ করি তার সম্বন্ধবিচারের ফলেই আমরা তাকে গ্রহণ করি। সে সম্বন্ধবিচারের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগা গৌণ ব্যাপার, কিন্তু আবেগের থেকে যা আমরা গ্রহণ করি, ভাল লাগে ব'লেই তাকে গ্রহণ করি—বুদ্ধি তাকে অগ্রহণীয় বললেও তাকে পেতে চাই। আর ভাল লাগা না লাগাটা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে বিভিন্ন হ'তে পারে—হ'য়ে থাকেও।

দরজার কাছ থেকে অতিকা বল্ল—ধর্ম্মটা বুদ্ধিগত না আবেগমূলক সে তর্ক আজ না হয় থাক গোঁসাই। এটা আমরা দেখছি যে, হিন্দু মুসলমান এ দেশে রয়েছে এবং যতদূর ভাবা যায় চিরদিন থাকবে। তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, হঠাৎ লোপ করা তোমার আমার কারু পক্ষেই সম্ভবপর নয়, কিন্তু তাই ব'লে কি বলতে চাও যে, যতদিন তাদের ধর্ম্ম আলাদা থাকবে তারা কাটাকাটি ক'রে মরুক—আমরা প্রতিকারের কোন চেষ্টাও করব না?

এতক্ষণ অতিকাকে কেউ লক্ষ্য করেনি—এবার টুলু বল্ল, কই তুমি চা খেলে না?

ভেতরে এসে ব'সে অতিকা বল্ল—রায় সাহেব বেঁচে থাক্, আমার চা খাওয়ার ভাবনা কি? কিন্তু সে কথা যাক্, তুমি কি বল প্রাচীন ভারত?

প্রাচীন ভারত সায় দিল—আমিও তাই বলি, কিন্তু আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈষম্য দাঙ্গার কারণ। যারা মারামারি করে তারা সাধারণতঃ গুণ্ডাশ্রেণীরই লোক, এবং তাদের ধর্ম্ম-প্রবণতা যে খুব বেশী সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না।

গোঁসাই বল্ল—কিন্তু তবু দাঙ্গা তো হয়, এবং যখন হয়, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ব'লেই হয়। গুণ্ডাই হোক আর ভদ্রলোকই হোক, মুসলমানের সঙ্গেই তো হিন্দু মারামারি করে, হিন্দুর সঙ্গে তো নয়। মুসলমানের বেলায়ও তো তাই।

প্রাচীন ভারত কথাটা স্বীকার করল না, বল্ল—সে বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। হিন্দু গুণ্ডার সঙ্গে হিন্দু গুণ্ডার মারামারি হ'ল ঝগড়া, মুসলমান গুণ্ডাদের বেলায়ও তাই, আর হিন্দু-মুসলমান গুণ্ডাদের মারামারি হবে দাঙ্গা। এ নামকরণের তো আমি কোন

সার্থকতা দেখিনে—বরং তা থেকেই দাঙ্গা সুরু হ'তে পারে। গুণ্ডায় গুণ্ডায় যখন মারামারি তখন হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের উচিত সে মারামারি থামাবার চেষ্টা করা, গুণ্ডাদের শাসন করা। তা না ক'রে আমাদের কাগজওয়ালা লিখবেন—হিন্দুর সর্ব্বস্ব গেল, মুসলমানের অস্তিত্ব বিপন্ন। দাঙ্গা না মিটিয়ে আরো খেপিয়ে না তুললে যে কাগজ বিকবে না।

অতিকা বল্ল—কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় পরীক্ষা ব'লে আমরা কলকাতায় ছিলাম মনে আছে তো? চিৎপুরের কাছে যে জুতোর দোকানটা লুট হ'ল, সেটা লুট করেছিল হিন্দু-মুসলমান মিলেই, পুলিশ যখন এল তখন পুলিশের সাথে মারামারি করলও হিন্দু-মুসলমান; শেষে পালাবার সময় একসাথে পালালোও তারাই। তারপর ধর না সেদিনের কথা বোম্বাইতে। শ্রমিক সমস্যা থেকে যে মারামারি সুরু হ'ল, সেটা শেষে গিয়ে দাঁড়াল সত্যি সত্যি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায়। আমাদের নেতাদের যে তাতেও চোখ ফোটে না এটাই আশ্চর্য্য।

গোঁসাই কথাটা স্বীকার ক'রে নিয়ে বল্ল—মানলাম দাঙ্গাটা সাধারণতঃ গুণ্ডাদের মারামারি। কিন্তু তবু যখন হয়, তখন হিন্দু-মুসলমান ব'লেই হয়—এবং শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র গুণ্ডাদের মধ্যেই বন্ধ থাকে না। গত দাঙ্গার পরে ছাত্রদের মধ্যেও যে কতটা সাম্প্রদায়িকতা বেড়েছে লক্ষ্য করনি?

অতিকা বল্ল—সে কথা আমি স্বীকার করি। দাঙ্গা যদি সত্যি সত্যি কেবল গুণ্ডাদেরই মারামারি হ'ত তবে তাতে এত ভয় বা দুঃখের কারণ থাকত না—কিন্তু আজ যে সমস্ত দেশের মন বিষিয়ে উঠছে। প্রায় হাজার বছর হ'ল হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থেকেও আজো যেন পৃথিবীর দূরতম জাতির মত পরস্পরের কাছে অজ্ঞাত র'য়ে গেছে। দেখো বাংলা সাহিত্যের কথা আমরা বলি, বাংলায় যে কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্য বা পরিমাণও তো কম নয়, তবু একখানি বইয়ের নাম করতে পারো যেখানে হিন্দু-মুসলমানের জীবনের ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠেছে? রোমান্সের কথা এখন বাদ দাও, বঙ্কিম বাবুর সাহিত্যপ্রতিভা স্বীকার ক'রেও মুসলমান কোনদিন "আনন্দমঠ"কে আদর ক'রে গ্রহণ করতে পারবে না—তুমি হ'লেও পারতে না। রবীন্দ্রনাথই বল, শরৎচন্দ্রই বল, সমস্ত বাংলা সাহিত্য প'ড়ে ফেলেও একবারও কি মনে হয় যে বাংলা দেশে মুসলমান ব'লে একটা সম্প্রদায় আছে এবং তারা সংখ্যায় প্রায় আড়াই কোটি? মুসলমান খানসামা আরদালী জোলা বা নৌকোর মাঝি সাহিত্যে পেতে পারো, কিন্তু বাংলা দেশে কি তা ছাড়া মুসলমান নেই? বাংলা দেশের ভদ্র মুসলমান কি সাহিত্যিকদের চোখে পড়ে না?

গোঁসাই বল্ল—কিন্তু সেজন্য দায়ী কে? মুসলমানের দৃষ্টি পশ্চিমে, উর্দ্দু তার মাতৃভাষা—আপদে বিপদে পর্য্যন্ত হিন্দুপ্রতিবেশীর সঙ্গে তার সহানুভূতি কই?

অতিকা উত্তর দিল—এ কথাটা তুমি সত্যি বিশ্বাস কর না তর্কের খাতিরে বল্লে? তুমি হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব দেখোনি? না, যখন সদ্ভাব দেখা যায় সেটা একান্ত অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ব'লে মনে কর? তুমি এ কথাটা ভুললে কি ক'রে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাউকে ভাল ক'রে চিনি না, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সে হিন্দু বা মুসলমান। যে পরিচিত, বন্ধু, তার হিন্দু-মুসলমান পরিচয় মনে থাকে না। পঞ্চানন বা আইয়ুব তখন আর হিন্দু বা মুসলমান নয়—তখন পঞ্চানন কেবলমাত্র পঞ্চানন। আইয়ুব আইয়ুব।

গোঁসাই বল্ল—পঞ্চানন বা আইয়ুব কটা পাওয়া যায়?

প্রাচীন ভারত আপত্তি করল—এটা তোমায় অন্যায় কথা। হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব এরকম অনেক দেখা যায় এবং সাধারণতঃ দেখবে যে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাথেই ধার্ম্মিক মুসলমানের বন্ধুত্ব। হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গাটা যে ধর্ম্ম থেকে নয়, তার এর চেয়ে সহজ প্রমাণ আর কি হ'তে পারে? মুসলমানের কোরাণে—আমি অবশ্য অনুবাদই পড়েছি—কোথাও হিন্দুকে মারতে লেখেনি আর হিন্দুর শাস্ত্রে তো মুসলমানের উল্লেখই নেই।

আমি হেসে উঠ্‌লাম, বল্লাম—তা যদি বল তবে কোরাণেও কোথাও হিন্দু কথাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু হিন্দু-মুসলমান মারামারি তো নিত্যই করছে।

আর তুমি যে বল্লে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সঙ্গে ধার্ম্মিক মুসলমানের বন্ধুত্ব—ওটাও যে কতদূর বাস্তব কে জানে? তবে হিন্দু-জমিদারের সঙ্গে মুসলমান জমিদারের, এবং হিন্দু ডেপুটীর সঙ্গে মুসলমান ডেপুটীর বন্ধুত্ব হয় বটে—সেটাও খানিকটা আর্থিক জাত কিনা!

অতিকা বল্ল—গোঁসাইর কথা আমি খানিকটা মানি যে, ধর্ম্মের গোঁড়ামি এ সব দাঙ্গার মূলে—যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে—কিন্তু কেন এ গোঁড়ামি? ছেলে বেলা থেকে হিন্দু শোনে মুসলমান মোচরমান, অস্পৃশ্য,—মুসলমান শোনে হিন্দু কাফের, বেইমান! সেই যে ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের প্রতি একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব মনে গেঁথে গেল, সারা জীবনেও তা' আর ঘোচে না। বড় হ'লে অবশ্য সংসারে অনেক সময় পাশাপাশি থাকতে হয়, তখন বাইরে ভদ্রতার মুখোস দিয়ে মনের ঘৃণাকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘৃণা তেমনি থেকে যায়! আমি অনেকবার দেখেছি, একটা মজলিশে ব'সে পাঁচ সাত জন হিন্দু-মুসলমান কথা বল্‌ছে—যেই একদল উঠে গেল, অমনি অন্যদল তাদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলো প্রয়োগ করল সেগুলি খুব সুরুচিসঙ্গত নয়।

গোঁসাই বল্ল—সেটা আমিও দেখছি, অথচ এ ঘৃণার কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা ক'রেও কোনদিন পারিনি। আজ তো হিন্দু-মুসলমান দুজনের অবস্থাই সমান—দুজনেরই সভ্যতা পশ্চিমের সভ্যতার পায়ের তলায় প'ড়ে রয়েছে—তবু কিসের এত গর্ব্ব? ধর এই খাওয়া নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপার! বামুন হ'লে যত নোংরা যত ব্যারামেই হোক না কেন তার খাওয়া চলবে, আর—মুসলমান তো তবু হিন্দু সমাজের বাইরে—হিন্দুসমাজের মধ্যেই কায়স্থবৈদ্যের ছোঁওয়া খাবেনা! আজকার দিনে জাতের সার্থকতাই বা কি?

প্রাচীন ভারত আপত্তি ক'রে বল্ল—ছোঁওয়া না খেলেই যে ঘৃণা প্রকাশ হয় তা আমি মানি নে। কতজনে তো বামুনের ছোঁওয়াও খায় না—স্বপাক রেঁধে খায়, কিন্তু তাই ব'লে কি তারা বামুনকে ঘৃণা করে? আচারের খুঁটিনাটি বিচারে যে ঘৃণা আছে আমার তা মনে হয় না।

অতিকা বাধা দিল, বল্ল—তোমার মনে হোক আর না হোক কথাটা সত্যি। প্রত্যেককে প্রত্যেকের ছোঁওয়া খেতে কেউ বলছে না—বলতে পারে না, কিন্তু তাই ব'লে খেতে বাধা থাকবে কেন? নোংরা ব'লে যদি কোন বিশেষ লোকের ছোঁওয়া খাইনে, সে আলাদা কথা; কিন্তু তাই ব'লে একটা লোক জাতে চাঁড়াল বা মেথর ব'লে তার হাতের ছোঁওয়া খাব না কেন? তুমি যে বলছ এ না খাওয়ার কারণ ঘৃণা নয় তাও আমি মানি না। হয়তো সাক্ষাৎভাবে consciously ঘৃণা নয়, কিন্তু বহুদিন থেকে মনের কোণে একটা ধারণা জ'মে রয়েছে যে একটা জাত অপবিত্র—তার স্পর্শ অশুচি—তাই না তথাকথিত নীচ জাতির ছোঁওয়া অখাদ্য। এ অহঙ্কার অলঙ্কার নয়, সেটা মানুষের অপমান।

গোঁসাই যোগ দিল—যে যাই বলুক এ ছোঁয়াছুঁয়ির মূলে যে অন্ধ গোঁড়ামি সে কথা অস্বীকার করা চলে না। আর মানুষ হ'য়ে মানুষের এত বড় অপমান আমরা প্রতিনিয়ত করি ব'লেই তো আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা। যখন শুনি যে ও লোকটা সদাচারী ব্রাহ্মণ—বামুন ছাড়া কারু ছোঁওয়া ভুলেও মুখে তোলে না—কথাটা অবশ্য প্রশংসা ক'রেই বলা হয়, কিন্তু আমার ইচ্ছে করে যে চাঁড়ালের সাথে তাকে এক পংক্তিতে বসিয়ে তাকে চাঁড়ালের ছোঁওয়া খাওয়াই। কিসের এত ওর ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব!

অতিকা হাস্‌ল, বল্ল—তোমার মত কুলীন বামুনের মুখেই এ কথা সাজে। তোমরাই সব চেয়ে বেশী অপরাধ করেছ এ বিষয়ে এবং এর প্রতিকার করতে হবেও তোমাদেরই। কিন্তু ঠাট্টা ছেড়ে সত্যি বলছি যে, এ খাওয়ার ছোঁয়াছুঁয়ি মানুষকে যে কি আঘাত করে সে তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না। আমার তো অনেক সময় মনে হয় যে, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে যদি সকলের মধ্যে জলচল হয় তবে দেশের সম্প্রদায়-সমস্যার অনেকখানি তাতেই মিটবে। এখানে যেমন হষ্টেলে হিন্দু-মুসলমান একসাথে আছি, তেমনি ক'রে সামাজিক কাজকর্ম্মেও এক হ'তে হবে। ধর টুলুর বিয়েতে গেলে আমাকে তোমাকে আলাদা জায়গায় না বসিয়ে একই সাথে বসাবে এবং প্রকাশ্যভাবে।

আমি হেসে উঠ্‌লাম, বল্লাম—হ্যাঁ প্রকাশ্যভাবে। তা নইলে আমিও তো এক হিন্দুমিশনের সঙ্গে হিন্দুতীর্থে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ ক'রে এলাম গত ছুটিতে! মিশনের সন্ন্যাসীদের আবার জাত কি? তাই বোধ হয় স্বামিজী ইচ্ছে ক'রেই আমার ওপর জলের ভার দিয়েছিলেন—আমিও উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবক হ'তে গেছি, খেয়াল করিনি; কিন্তু ফিরে এলে যেদিন স্বামিজী হেসে বল্লেন, তুমি মুসলমান জানলে তোমার তো মাথা ফাটাতোই আর আমারও সন্ন্যাসাগিরি চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিত, তখন হাসলেও সেটা আমায় আঘাত কম করেনি।

গোঁসাই হো হো ক'রে হেসে উঠল, থিয়েটারী ঢংয়ে বল্লে—তবে রে পাষণ্ড মুসলমান, এমনি করিয়াই তুই ধর্ম্মপ্রাণ কত হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিলি!

অতিকা ও প্রাচীন ভারত তার কথায় আরো হেসে উঠ্‌ল। টুলু তর্কের মধ্যে সবাই তার প্রতি অমনোযোগী হয়েছে দেখে শুয়ে পড়েছিল—সেও উঠে হাসিতে যোগ দিল।

গোঁসাই একটু গম্ভীর হ'তে চেষ্টা ক'রে বল্ল—কিন্তু কেবলমাত্র জলচল করলেই চলবে না—হিন্দু-মুসলমানের গোল মেটাবার সহজ পন্থা তাদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন। আকবরের চেষ্টা যে তখন সফল হয়নি এটাই বোধ হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

অতিকা বল্ল—হিন্দু-মুসলমান বিবাহ সম্বন্ধে আমার একটি শুধু আপত্তি আছে তা নইলে আমিও গোঁসাইর সাথে একমত।

গোঁসাই সাগ্রহে বল্ল—কি সে আপত্তিটা শুনি!

কিন্তু এমন সময় রমেশ ঘরে ঢুকে বল্ল—খেতে আসুন বাবু, রান্না কখন হ'য়ে আছে, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আর আমরা সব ব'সে আছি কোন সময় থেকে।

তখন সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হ'ল—অতিকার আপত্তি তখন শোনা হ'ল না।

হুমায়ুন কবির

অভিনায়ক অক্ষর

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

জীবনের অভিনয়ে যে নায়ক সাজিয়া প্রবেশ করিতেছে তাহার কাহিনী শেষ করিয়া সে পটান্তরালে ক্ষণিক অদৃশ্য হইতেছে, আবার রঙ্গশালায় নূতন রঙের নূতন রূপের মুখস পরিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইতেছে। এ জীবন-নাট্যের উৎপত্তি কোথায় কে বলিবে? এপারে রঙ্গালয় ওপারে Green-room—সাজঘর, রঙশালা। এখানে মানুস কেহ রাজা সাজিয়া কেহ ভিখারী সাজিয়া কেহ অমিততেজা যোদ্ধৃবেশে কেহ বা কাপুরুষোচিত ভীতিবিহ্বলতায় স্ব স্ব রূপ ধরিয়া ফিরিতেছে। যে দিন ডাক আসিবে সেদিন বহুবেশী নটেরা পরপারে সাজঘরে যাইয়া জড় হইবে। নাটকে যেমন পাঠ শেষ হইয়া গেলে অভিনেতারা সাজঘরে আপন আপন পোষাক খুলিয়া ফেলে, জীবনের অভিনয়ও তেমনি শেষ হইলে ওপারের রঙ্গ-শালায় যাইয়া এ জন্মের রূপাভরণাদি উন্মোচন করিতে হয়। নূতন নাটকের প্রারম্ভে যেমন আবার নূতন করিয়া নটদের সাজের ঘটা পড়িয়া যায়, নূতন জীবনের প্রারম্ভেও তেমনি নূতন নূতন নামরূপের ছড়াছড়ি হয়। বিষয়টি খুব জটিল হইলেও ইহার সহজ সংস্করণ প্রায় প্রতিদিন বড় বড় সহরের রঙ্গালয়ে হইতেছে। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ সত্যিকার নটের কাহিনী পড়িলে ইহাকে উপলব্ধি করিতে তেমন কিছু বেগ না পাইবারই কথা।

বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে একটি সূত্র আছে—অপি চৈবমেকে; ইহার গোবিন্দ-ভাষ্য এইরূপ :—"যথা অভিনেতা নটঃ স্বস্থিতান্ ভাবান্ প্রকটয়ন্ বহুধা-ভাবতোঽপি একং স্বস্মিন্ন বিমুঞ্চতি।" অভিনেতার বহুশঃ রূপান্তর ঘটিলেও ঐ সব নব নব ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে আপনার খাঁটিরূপের পরিবর্ত্তন ঘটে না। যিনি নাটকে শিবাজীর পাঠ লইয়া মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের পত্তনে তাতিয়া উঠিয়াছেন তাঁহার ভিতরের 'আমি'তে শিবাজীর কিছুমাত্র 'ছাপ' নাই—তিনি নিজে যা তাহাই; সেই জন্য অভিনয়ের "বুদ্ধ" "রামচন্দ্র" সাজা যত সহজ ভিতরের 'আমি'টাকে সেই ধাপে ফেলা তত কঠিন। কাগজে পড়িয়াছিলাম যখন ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ডের মৃত্যু হয় তখন তাহার সমগ্র অভিনয়-ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছিল যে, সারা তাহার এক জীবনে কত হাজার বার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, হাজার হাজার বার গোলা খাইয়া প্রাণ হারাইয়াছে! ঘটনাটি নাটকীয়, তাই আমরা থ খাইয়া যাই না—ও নাটুকে ব্যাপার—পার্ট লইয়া ষ্টেজে পার্টের খাতিরে মরা সে আর বেশী কথা কি! ইহার সত্যিকার কারণ : বেদান্তের সেই "স্বস্মিন্ন বিমুঞ্চতি", যে মরে সে ত আর সত্যিকার নিজে নয় সে হইতেছে তাহার 'পার্টের' মৃত্যু! কাজেই আমরা শিহরিয়া উঠি না—কিন্তু ইহা যে আমাদেরই জীবননাট্যের একটি সহজ সুলভ চিত্তাকর্ষক সংস্করণ সে দিকে আমাদের খেয়াল কই?

আমাদের ভিতরে অ-মৃত পুরুষ রাখিয়া জন্মে জন্মে আমাদের নামরূপের নূতন নূতন পার্টটি যে সারা বার্ণহার্ডের ন্যায় কতবার মরিতেছে এবং নাটক করিতে যাইয়া নাটুকে মৃত্যুতে যদিচ আমরা তিলমাত্রও বিক্ষুব্ধ হই না, কিন্তু দেহ ধরিয়া ইহার মৃত্যুতে কত না আশঙ্কিত কত না সন্তাপিত হইতেছি! ইহার কারণ কি? নাটকের পার্টের সহিত আমরা কখনো এক হই না—আমাদের আমিত্ব, পার্ট হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু দেহের নব নব নামরূপ লইয়া আমরা যে জীবনের অভিনয়ে আসিয়া জন্মে জন্মে নূতন পার্ট লইয়া দাঁড়াই, উহা হইতে আমরা যে একচুলও পৃথক্ সে কথা আমাদের মনের ত্রিসীমানায় নাই। নামরূপের পার্ট করিতে ভিতরে যে এক অভিনায়ক আছেন সে কথা ত আমরা ভাবিতে চাই না—পার্টের সহিত আমরা পাক খাইয়া এক হইয়া যাই, এতদ্ভিন্ন আমাদের যে কোন সত্তা

আছে সে কথা ভাবিতে চাই কই? তাই সারা বার্ণহার্ডের ন্যায় আমরা হাজার হাজার বার মরিতেছি, মরিব।

কখন যে নামরূপের নাটুকে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে ইহার কিনারা নাই। বুদ্ধদেবের মুখে শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি কি সুন্দর স্ফুট হইয়াছে—"The earliest point is not revealed of the faring on, running on of beings cloaked by ignorance (Avidya) tied by craving." কিন্তু এই নাটুকে অভিনয়ে সারা বার্ণহার্ডের ন্যায় এক এক জন যে কত হাজার লাখবার মরিয়াছে, কত কান্না কাঁদিয়াছে, শ্রীবুদ্ধের মুখে সে উক্তিটি কি করুণ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়াছে, ভিক্ষুগণ সহস্র সহস্র জন্মে দুঃখের দাহে যে অশ্রুজল ফেলিয়াছে, উহার একত্রীভূত পরিমাণ বেশী না চতুঃসমুদ্রের জল বেশী!" উত্তর দিতেছেন—"Truly the flood of tears is greater." জন্মে জন্মে নামরূপের অভিনয়ে আসিতে মানুষকে যে হাড়ের খুঁটিযুক্ত কাঠামে আসিতে হয় সে রাশি রাশি অস্থির পরিমাণ বেশী না বিপুল পর্ব্বতের আকার বেশী? হাড়ের স্তূপই বড় বলিয়া বুদ্ধদেব নির্দ্ধারণ করিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে কেন এমনটি হয়? মানুষ কেন নিজের স্ব-রূপ ভুলিয়া পার্টের সহিত অভিন্নতা পাতাইয়া বসে? ইহার কারণ এক কথায় তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম। ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত তাহার স্বরূপের নাম অ-ক্ষর আর ইন্দ্রিয়গ্রামবিভূষিত যে নূতন সংসারটি জমিয়া উঠিল সেইটিরই নাম ক্ষর। জীব ইন্দ্রিয়জালের মধ্যে একেবারে গুটাইয়া যাইয়া তাহার ইন্দ্রিয়াতীত রূপটিকে বিস্মরণ ঘটাইল, আর অমনি তাহার অপরিসীম সত্তা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়া ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা পড়িয়া গেল—ফলে হইল এই, তাহার আত্ম-বিস্মরণ ঘটিল এবং যাহা সে নয় তাহাতেই তাহার সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল! পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহার আলোচনা হইয়াছে।

যখন এমনটি ঘটিল তখন না বলিয়া উপায় কি যে, জীব ইন্দ্রিয়ের সীমা চিহ্নিত করিয়া এক গণ্ডী আঁকিয়া লইল—thus far and no further—ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি যতদূর যায় ততদূরই তাহার সত্তা, তদতিরিক্ত নহে। সংযুক্তনিকায়ের "নগর" ভাষণটিতে বুদ্ধদেব এই গণ্ডীকে কত না অপূর্ব্ব বাগ্‌বিলাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—"ভিক্ষুগণ! যখনো আমি 'বুদ্ধ' হইতে পারি নাই তখন কেবলি আমার মনে প্রশ্ন উঠিত—জন্মায়ই বা কি মরেই বা কি?...নামরূপের সহিত যে চৈতন্য অভিন্ন—সে আমিত্ব-সত্তা নামরূপের অতীত কোনও কিছুতে পৌঁছিতে পারে না—নামরূপকে অতিক্রম করা তাহার সাধ্য নয়, নামরূপের গণ্ডী পর্য্যন্ত যাইয়াই তাহার চৈতন্য পিছনে হটিয়া আইসে। এই গণ্ডীর মধ্যেই মানুষ জন্মে-মরে-ঝরে, আবার এই গণ্ডী লইয়াই পুনর্জন্ম লাভ করে।" বুদ্ধদেব গণ্ডীর সীমারেখা টানিয়া ইহার মধ্যে নামরূপের কামরূপী লীলাতাণ্ডবেরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতেছেন—নামরূপের মধ্যেই কামকূপ—ইহার মধ্যে জীব-চৈতন্য যখন মগ্ন হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব আমিত্ব-সত্তার উদ্ভব ঘটিল। এই আমিত্ব-সত্তাই দেহ-বিয়োগে মরে এবং দেহাগমে জন্মে, পুনঃ পুনঃ ক্ষরিত হয় বলিয়াই ইহা ক্ষর এবং কখনো ক্ষরণ হয় না বলিয়া আত্মস্বরূপ অ-ক্ষর।

প্রশ্ন উঠিতে পারে আমিত্ব-সত্তার আবার মরণ কিরূপ? না সেও আছে। দেহ যেমন মরে আমিত্বও তেমনি মরে। কথাটি একটু পরিষ্কার করা ভাল। বাহিরে আমিত্ব কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত—নিজের শরীরের উপর, 'আমি' বলিতে শরীরকে বাদ দিয়া কিছু বুঝায় না, কিন্তু 'আমি' জ্ঞান কি কেবল বাহিরেই আছে? তাহা কেন হইবে, আমিত্বটি মনের মধ্যেও। সুতরাং দেখা যায় বাহিরে নামরূপের একটি অবিকল ফটোগ্রাফ আমাদের মনের মধ্যেও আজীবন সঞ্চিত আছে। রাবণের মনের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ফটো থাকিতে পারে না, কারণ রাবণের দুর্দ্দর্শ আমিত্ব-বোধটি কখনো রাবণের শরীরে নয়, পরন্তু তাহারই মনে। তাই সাংখ্য বলিয়াছেন "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ।" যাহার বাহিরে যে আকার সেই আকারই তাহার মনে,—অহমাকারকে সর্ব্বস্ব করিয়া তোলাই প্রত্যুত অহঙ্কার। অহঙ্কার শব্দটি শরীরাত্মক কিন্তু ক্রিয়া মনের। ক্ষর-অহঙ্কার লইয়া জীব জীবনের পাড়ি দেয়, অক্ষর-পুরুষকে সে কখনো স্বীকার করে না। এই অহঙ্কারের কেন মৃত্যু ঘটিবে না? জীবের যতবার 'অহম্' এই আকারের রূপ পরিবর্ত্তন হইবে

ততবারই অহঙ্কারের মৃত্যু ঘটিবে। যে এ জন্মে বিশ্ব বিজয়ী নেপোলিয়নের ন্যায় মহাবীর যদি কর্ম্মবশে পুনর্জন্মে তাহাকে রুগ্ন অশক্ত দুর্ব্বল রিক্তহস্ত হইয়া জন্মাইতে হয় তবে জুলিয়স সীজরের সেই veni vidi vici রূপ দৃপ্ত অহঙ্কার তাহার আমিত্ব-চৈতন্যে থাকিবে কি ?

আমিত্ব-চৈতন্যই নাটুকে অভিনয়ের নট। ইহা যতক্ষণ অহমাকারের খোলসে আবদ্ধ থাকিবে অক্ষর-পুরুষের সন্ধান ততক্ষণ মিলিবে না। সমুদ্রের ভাসমান ঢেউএ ঝিনুকের খোসায় বদ্ধ জলবিন্দুর যে অবস্থা, দেহের খোসায় আবদ্ধ আমিত্ব-চৈতন্যেরও সে অবস্থা ; ইহা শুনিতে শুনিতে কবীরের কথা মনে পড়ে—"পানিমে মীন পিয়াসীরে"...চারিদিকে জলে থাকিয়া মাছের জলতৃষ্ণা যেরূপ, অক্ষরের মহার্ণবে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও জীবের অক্ষররাহিত্যও তেমনি বিসদৃশ! ঝিনুকের খোসা না ডিঙাইলে জল-বিন্দুর সমুদ্র-সন্ধান অসম্ভব, তেমনি 'আমিত্বের' Chinese wall না ভাঙ্গিলে অক্ষরের তল্লাস অসুলভ। আমিত্ব ভাঙা সহজ নয়, কঠোপনিষদ্ কহিতেছেন—পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্ম্মুখী করিয়া শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য ইহারা বহির্জগৎকে আঁকড়াইয়া থাকিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অন্তর্ম্মুখী হইয়া অন্তর্জগতের সন্ধান পাইতে চায় না। অন্তর্ম্মুখী না হইলে আমিত্ব-ভাঙার কোন পন্থাও নাই। ঘোড়া যেমন সম্মুখগতিতে কখনো সারথির দর্শন লাভ করিতে পারেনা, ইন্দ্রিয়ও তেমনি সম্মুখদৃষ্টিতে অক্ষর আত্মনের দর্শন পাইবে না। দেখিবার জন্য মুখ ফিরান দরকার।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—"আবৃত্তচক্ষু" হওয়া প্রয়োজন। নামরূপাত্মক জগৎকে ইন্দ্রিয়বোধ হইতে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ইন্দ্রিয়শক্তিকে অমৃত অক্ষর-দর্শনে নিয়োজিত করিলে তাঁহাকে দেখা যাইবেই। বিষয়টি সহজ নয়—স্বভাব-সুলভতাকে উপেক্ষা করা কখনো অনায়াসলভ্য নহে। আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে ইহার যোগ্য উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন —নদীর স্রোতকে বিপরীতগামী করা যেমন—"নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃ প্রবর্ত্তনমিব"—ধীর সাধক তেমনি ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ম্মুখিতা সাধন করিয়া সেই অক্ষর-পুরুষকে দর্শন করেন।

ইন্দ্রিয়গ্রামের স্বভাবই এই—ইহারা আত্ম-বিমুখ এবং স্বয়ম্প্রধান। মন জানে বহির্জগৎ জানিলেই তাহার কাজ চুকিল—চক্ষু বাহিরের বস্তুনিচয় দেখিলেই চক্ষু তার সমাপ্তি পাইল, শ্রুতি শব্দজগৎ লইয়া আপনাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, নাসিকা পদার্থ-গন্ধ ভর করিয়া তৃপ্ত। এইরূপে ইন্দ্রিয়-রাজ মন বহির্জগৎ লইয়া আপনার 'আমিত্ব'কে ভরপুর করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার অতীত যে অমৃতসত্তা তাহার আছে সে কথা ত মনে জাগে না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি মনই প্রত্যুত অক্ষরের প্রতিহারী।

কিন্তু যে মন দৌত্যে বৃত হইয়াছে সে ত দৌবারিক হইয়াও গৃহস্বামীর কথা ভুলিয়া বসিয়াছে। তাহার সহিত ভিতরের গৃহপতির সম্বন্ধ সে ত একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, সে যে কখনো তাহার মধ্যেই শেষ নহে সে কথা ত ভাবিবার সুযোগ হয় না! সূর্য্যকিরণ যদি ধরণী স্পর্শ করিয়া মনে করিত এ ধরালোককে আমিই আলো দিতেছি, আমিই আলোর মূলাধার, আমাতেই আলোর ভাণ্ডার— তবে কি ইহা কখনো স্বীকৃত হইত? সূর্য্যকিরণ যে নিজের মধ্যে কখনো শেষ নহে পরন্তু সূর্য্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত, সূর্য্য হইতে রশ্মিরূপে বিচ্ছুরিত সে কথাও সকলের বিদিত, মনও যে তেমনি অক্ষর-পুরুষের রশ্মিরূপে দেহ-লোক স্পর্শ করিতেছে মাত্র পরন্তু স্বয়ম্‌সমাপ্ত নহে সে কথা ত তেমন সুপরিচিত নহে। এ তত্ত্বটি দর্শনশাস্ত্রের দ্বারোদ্ঘাটন স্বরূপ। ইহা সুন্দররূপে আয়ত্ত না হইলে দর্শনমণ্ডপের দুয়ারই খুলিবে না এবং দুয়ার না খুলিলে অক্ষর-ঠাকুরদর্শনই বা হয় কিরূপে?

কেনোপনিষদ্ দেহের দীপস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছেন :

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুঃ......................॥

সকল ইন্দ্রিয়ের মূলাধার সেই অক্ষর, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে লিখিতেছেন—"অস্তি কিমপি

বিদ্বদ্‌বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বোত্তরতমং কুটস্থমভরেমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি,—তৎসামর্থ্যনিমিত্তম্।" ক্ষর ও অক্ষর প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি "কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" এখানে কুটস্থ অক্ষর অমর অজ একজনের উল্লেখ পাইতেছি। তিনি না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি লোপ পাইবে। এই চৈতন্যময় পুরুষ থাকায় "স্ববিষয়ব্যঞ্জনসামর্থ্যং শ্রোত্রস্য", তিনি কি ভাবে আছেন?—"চৈতন্যে হি আত্মজ্যোতিষি নিত্যেঽ সংহতে সর্ব্বান্তরে সতি'—এভাবে তিনি থাকায় ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাঁহার অভাব হইলে সকল ইন্দ্রিয়দীপাবলি নিভিয়া যাইবে।

যিনি অন্তরালে থাকিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ণধার, যাঁহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা স্ব স্ব শক্তি লাভ করিতেছে তাঁহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কিরূপ? ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ের সংস্থান উক্ত হইয়াছে—

যদিদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে হৃদয়ম্. হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা। হৃদয় অর্থে হৃদয়-পুণ্ডরীক বা হার্দ্দব্রহ্ম, অষ্টম অধ্যায়েও মন্ত্র আছে "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" হৃদয়-পদ্মে প্রাণসকল প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ প্রাণসকল কূটস্থ অজরামৃত অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে ছান্দোগ্য এ তত্ত্বটিকে আরও বিশদভাবে বুঝাইতেছেন :

তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ, স যোঽস্য প্রাঙ্‌সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ...

হৃদ্‌ব্রহ্মে পাঁচটি দেব-ছিদ্র আছে। শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর অপূর্ব্ব কবিত্বময় ভাষা রচনা করিয়াছেন: "পঞ্চ-সংখ্যকা দেবানাম্ সুষয়ো দেবসুষয়ঃ—স্বর্গলোকপ্রাপ্তিদ্বার-চ্ছিদ্রানি...তস্য স্বর্গলোকভবনস্য হৃদয়স্যাস্য যঃ প্রাঙ্‌সুষিঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য প্রাগ্‌গতং যচ্ছিদ্রং দ্বারং, সঃ প্রাণঃ।" পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা যেরূপ মনকে অক্ষরের প্রতিহারীরূপে দেখিয়াছি বর্ত্তমানে সেই অক্ষরের মন সহ পাঁচ দ্বারীর উল্লেখ পাইতেছি, বিস্তৃত উপনিষদের আখ্যানটিকে ছোট করিয়া এখানে সঙ্ক্ষেপ করিতেছি: "অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং, অথ চ অস্য প্রত্যঙ্‌সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্, অথ যোঽস্য উদঙ্‌সুষিঃ স সমানস্তমনঃ, অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ...। একে একে আমরা কেনোপনিষদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আধার অক্ষর-পুরুষকে পাইতেছি, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কিরণলেখার ন্যায় এই পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকাশমান হইয়াছে। গৃহের গবাক্ষ বা দ্বার যেমন গৃহেরই অভিন্ন অংশবিশেষ, এই সকল পঞ্চসুষিও তেমনি স্বর্গলোক-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। অতঃপর শ্রুতিতে আখ্যানটিকে এইভাবে সমাপ্ত করা হইয়াছে—

তে বা এতে পঞ্চব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ।

পঞ্চসুষিকে এখানে দ্বারপালে পরিণত করিয়া অক্ষরপ্রাপ্তির উপায় ইঙ্গিতে বলা হইল, আচার্য্য শঙ্কর কবিত্বময় ভাষ্যে ইহাকে সহজবোধ্য করিয়া তুলিতেছেন—"তে বা এতে ব্রহ্মণো হার্দ্দস্য পুরুষা রাজপুরুষা ইব দ্বারস্থাঃ স্বর্গস্য হার্দ্দস্য লোকস্য দ্বারপাঃ দ্বারপালাঃ।" ইহারা দ্বারী সত্য, কিন্তু ইহারা সংসার-সুরা পান করিয়া নেশায় একেবারে চুর হইয়া আছে, তাই ইহারা "এতৈর্হি চক্ষুশ্রোত্রবাঙ্‌মনপ্রাণৈঃ বহির্মুখপ্রবৃত্তৈ র্ব্রহ্মণো হার্দ্দস্য প্রাপ্তিদ্বারানি নিরুদ্ধানি," বহির্মুখী হইয়া বিপরীত কার্য্য করিতেছে, কোথায় ইহারা অক্ষর-পুরুষের দ্বারী হইয়া দর্শনার্থীকে সেই ব্রহ্ম-সমীপে পৌঁছাইবে, না ইহারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া দর্শককে দূরে রাখিতেছে! "আবৃত্তচক্ষুঃ" প্রসঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখিতা বিধান পাইয়াছি। এখানেও সেই কথা। যে দ্বারী আমাকে ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যাইবে তাহাকে কিরূপে বশে আনিতে হইবে? শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন, না, উপায় আছে। সংসারে দেখা যায় রাজার সহিত সাক্ষাৎকামী, রাজ-দ্বারীকে বশীভূত করিয়া রাজ-দর্শন লাভ করে, এক্ষেত্রেও তেমনি। "স য এতান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ উপাস্তে উপাসনয়া বশীকরোতি, স রাজপালানিব উপাসনেন বশীকৃত্য তৈঃ অনিবারিতঃ প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং রাজানমিব হার্দ্দং ব্রহ্ম।" দ্বার-রক্ষীকে স্তবস্তুতিদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রাজার দর্শনলাভ যেমন সম্ভব, ঠিক তেমনি উপাসনা দ্বারা অক্ষরের প্রতিহারিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া দ্বারোন্মোচন করিতে হয়। এ উপাসনা অর্থ পতঞ্জলির দ্বিতীয় সূত্রে দেওয়া হইয়াছে—যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ, নামরূপের কামকূপে স্বর্গ-দ্বারী পঞ্চেন্দ্রিয় চুব্

খাইয়া সংসারনেশায় জাঁকিয়া বসিয়াছে—এ মোহ ভাঙানই উপাসনা। যখন কামলালসা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ইহারা নেশার অবসানে জাগ্রত হইয়া উঠিবে তখন ইহাদিগের সাহায্যে অনায়াসে গৃহ-পতির দর্শন মিলিবে। নেশা না টুটিলে কে কবে ঠিক্ ঠিক্ কাজ করিতে পারে?

মুণ্ডকোপনিষদের ৩৩।১ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন—"অরূপং সৎ অক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে?" নীরূপ অক্ষরকে জানিবার উপায় কি? "বাগাদি উপাধিভিঃ জলতি ভ্রাজতি...শব্দাদীন্ উপলভমানবদব ভাসতে দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্ম্মৈঃ আবির্ভূতং সল্লক্ষ্যতে হৃদি প্রাণিনাম।" ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পঞ্চসুষির আধার হৃদয়ের উল্লেখ পাইয়াছি—এই হৃদ্‌বিহারী ব্রহ্মের অস্তিত্ব দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞানাদি দ্বারা উপলব্ধি হয়। বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি উজ্জ্বল হন। সূর্য্য যেমন আপন কিরণচ্ছটায় উজ্জ্বল হন, অক্ষরও তেমনি কিরণ-স্বরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উজ্জ্বল হন। সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণে যে একত্ব, অক্ষর ও ইন্দ্রিয়ে সেই অভিন্নত্ব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধনির্ণয়ই দর্শনশাস্ত্রের দ্বারোদ্ঘাটন স্বরূপ। এ পর্য্যন্ত যতটুকু আলোচনা করা গেল তাহাতে ইহারা যে রশ্মিস্বরূপ তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। বৃহদারণ্যকে এ কথা এমনি পরিষ্কার রূপে ভাঙিয়া বলা হইয়াছে তাহাতে আর কোন গোল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্য তাঁহার কিরণ লইয়া যেমন জগতের সর্ব্ব ঠাঁই ভরিয়া থাকেন, অক্ষরও তেমনি আপন সত্তায় দেহ-জগৎ ভরিয়া রহিয়াছেন—

স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যা যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ। একটি ক্ষুরের খাপে ক্ষুরটি যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, বাহির হইতে ধরা যায় না তেমনি দেহের খাপের মধ্যেও অক্ষর বর্ত্তমান, অথচ দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে বুঝিবার পথ আছে, তিনি আত্ম-গোপন করিয়া থাকিলেও অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল। কিরূপ?

প্রাণন্ এব প্রাণো নাম ভবতি, বদন বাক্, পশ্যংশ্চক্ষুঃ, শৃণ্বৎ শ্রোত্রং, মন্যানো মনঃ।

এই সকল ক্রিয়া তিনি সম্পাদন করেন বলিয়া ইহারা প্রত্যুত তাঁহার ক্রিয়ারই নাম—"তানি অস্য এতানি কর্ম্মনামানি এব।" সুতরাং মূলাধার তাঁহাকে না জানিয়া যাহারা ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানে—"স যোঽত একৈকম্ উপাস্তে ন স বেদ"—তাহারা প্রত্যুত যথাযথ জানে না। সূর্য্য হইতে পৃথক্ করিয়া কিরণসমূহকে জানায় যে অজ্ঞতা তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাদিগকে জানায়ও সেই অজ্ঞতা। সূর্য্যের সত্তা, পৃথক্ পৃথক্ কিরণ যেমন প্রচার করিতে ছুটে, তেমনি তাঁহার একার সত্তাই পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় ব্যক্ত করিতেছে—

অকৃৎস্নো হি এষঃ অত একৈকেন ভবতি।

অক্ষর, সূর্য্যের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা উৎপাদন করিয়াছেন।

তবে উপাসনা করিবার পথ কি? যদি অক্ষর-আত্মার রশ্মিরাশি ইহারা হইয়া থাকে তবে কাহাকে ধ্যান করিতে হইবে?

আত্মা ইতি এব উপাসীত।

সেই অক্ষর আত্মাকেই মনন কর। কেন? শ্রুতি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

অত্র (আত্মনি) হি এতে সর্ব্বে একং ভবন্তি।

বিশেষ বিশেষ নামধারী এই সকল ইন্দ্রিয় আত্মাতে এক হইয়া যায়, যেমন সূর্য্যকিরণ সূর্য্যে মিশিয়া এক হয়। সূর্য্যোপসনায় বিভিন্ন কিরণকে উপাসনা করার বিধি নাই, সূর্য্যকে ধ্যান করিলেই সূর্য্যার্ঘ্য সমাপ্ত হইল। সূর্য্যকিরণের প্রতি চক্ষু রাখিয়া ক্রমে দৃষ্টি সূর্য্যে পৌঁছান যায়, সেইরূপ দেহস্থ ইন্দ্রিয়-রশ্মির প্রতি "আবৃতচক্ষুঃ" হইয়া ক্রমে সেই আত্ম-সূর্য্যের দর্শন লাভ হয়। বৃহদারণ্যক ইন্দ্রিয়ের পিছু পিছু যাইয়া সেই অক্ষরকে খুঁজিয়া বাহির করার একটি অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন—

যথা হ বৈ পদেন (পদচিহ্নেন অন্বেষমানঃ পশুম্) অনুবিন্দেৎ (লভেত)। গুহার বাহিরে পদচিহ্ন দেখিয়া, উহাদের অনুসরণে যেমন ক্রমে গুহাহিত পশুকে পাওয়া যায় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে করিতে "তং দুর্দর্শং গুহাহিতং" অক্ষর ব্রহ্মকে পাওয়া যাইবে।

নীরূপ অক্ষর ইন্দ্রিয়ের আলো জ্বালিয়া, আপনার যে পরিচয়-পত্র আলোর ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছেন সে পাঠোদ্ধার করিতে জীব চায় কই ? কস্তুরী মৃগের ন্যায় মৃগনাভি-সম রূপরসগন্ধে বিহ্বল হইয়া, মানুষ নামরূপের কামকূপে আত্মহারা হইতেছে। জন্মে জন্মে নটের বেশে কত না অভিনয় চলিতেছে কিন্তু মৃগনাভির গোলাপী নেশা টুটিতেছে না। মৃগনাভি হইতে "আবৃত্তচক্ষুঃ" না হইলে অভিনায়ক অক্ষরকে দেখিবার সুযোগ কই ?

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বরণ

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ

বহে ঝিরিঝির মৃদুল বাতাস
আজিকে ভোরে,
আল্পনা আঁকা হিজলের ফুলে
কুটীর-দোরে।
আবীর-রঙের ঝরা ফুলে ফুলে
ঢেকে গেছে ধূলি পথতরুমূলে,
তারি 'পরে ফেলি' চরণ দু'খানি
এসো গো ধীরে,
উষসী যেমন—শান্ত শোভন
মেঘের শিরে।

আঁধার রাত্রি পার হ'য়ে এলো
আলোক-পাখী
আকাশ চিরিয়া চলিছে জ্যোতির
রশ্মি আঁকি'।
যেতে যেতে এই কুটীরের ছায়
আলো-মুঠা তব ফেলে যাবে পায়,
সিঁথায় ঝরিবে কনক-কিরণ
পাতার ফাঁকে,
চাহিয়া রহিবে মুখ-পানে উষা
মুগ্ধ আঁখে।

আসিবে, অমনি হাসিয়া উঠিবে
আঙিনাখানি
লক্ষ্মীর পদ-পরশে আপনা
ধন্য মানি'।
দৈন্য কোথায় লুকাবে পলকে
স্বর্গ-মহিমা ফুটিবে অলখে,
দেবীর মতন আসিবে হাসিয়া
দীনের ঘরে,
উছলিবে আলো কুটীরের গা'য়,
আঙিনা 'পরে।

তোমারি লাগিয়া কানন-কুসুমে
ফুটেছে হাসি,
তারায়-তারায় বেজেছে নিশীথে
আলোর বাঁশী।
তোমারি শান্ত চরণভঙ্গে,
সন্ধ্যার মেঘ হেসেছে রঙ্গে,
চরণপরশে কাঁপে তৃণদল,
শিহরে সুখে।
এসো দেবি আজ শান্ত নয়নে
সহাস-মুখে।

১৮

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্ব্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনাটাই সমীচীন মনে হয় না। দু একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমতঃ তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, জমি জমা কিছুই আর নাই। দ্বিতীয়তঃ সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে সে ঘাটে, পথে, বৌ-ঝিদের সম্মুখে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে; নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়ামুখের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাঁহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরী হইবে না— এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া নির্ব্বোধ সর্ব্বজয়া কতভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে। এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহারই মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল, দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্ম্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্য্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুদের সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন। সর্ব্বজয়া অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল। দিন দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী কাশীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ীর কাহারা কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হল্‌দে রঙের বাড়ীটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ী আছে, সেই ধরণের খুব বড় বাড়ী। সকলের

পছনে পিছনে সর্ব্বজয়া ছেলেকে লইয়া সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে ঢুকিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে—যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ীর গিন্নি সর্ব্বজয়ার সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটাসোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—থাক্, থাক্, এসো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এই—এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে, কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ী বুঝি কাশীতেই? না?—তবে—বুঝি

সকলের কৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন হইতে সর্ব্বজয়া চুক্তিমত রান্নার কাজে ভর্ত্তি হইল। সে একা রাঁধুনী নয়, চার পাঁচজন আছে। তিন চারটা রান্নাঘর। আঁশ, নিরামিশ, দুধের ঘর, রুটীর ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলাদা ঘর। ঝি চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়ীটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও একটু পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি চাকর বামুনের রাজত্ব। বাড়ীর মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান মাত্র, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়ীতে বড় একটা থাকেন না।

সর্ব্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্ব্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভাল রাঁধিতে পারে। সে বলিল নিরামিষ তরকারী রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামুনী মোক্ষদা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—বাবুদের রান্না তুমি করবে? তা হোলেই তো চিত্তির! পরে পাঁচিঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুন্‌চিস্ ও পাঁচি, শোন্ ইনি বল্‌চেন নাকি বাবুদের তরকারী রাঁধবেন! কি নাম গা তোমার? ভুলে যাই—মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে সর্ব্বজয়া সেদিন সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দুএকদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারী রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপির ফ্রিটার্স বলিয়া একটা যে তরকারী আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিনী সর্ব্বজয়াকে মাস দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। হাল্‌কা কাজ দেওয়া, খোঁজ খবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এভাবের অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তি বড় একটা থাকে না—অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ তরকারী লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাইরে কোথায় লইয়া যায়—সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র।

রান্নার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া সর্ব্বজয়া অবাক্ হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ডকারখানার কোনো দিন তাহার স্বপ্নেও ধারণা ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে,—দু'বেলায় তিন সের ক'রে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল ঘিএর খরচ!...পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছোট্ট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সরু চা'লের ভাত রান্নার বড় ডেক্‌চিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বামুনীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসীমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধর্‌বে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা কাৎ করিয়া ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনি ফোস্কা উঠিয়া গেল। গৃহিনী সেইদিনই তাহাকে রুটীর ঘরে বদ্‌লি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্য্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

১৯

সর্ব্বজয়া ছেলেকে লইয়া নীচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নীচু, আর মেজে এত স্যাঁতসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময়

এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে কাশীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। দেয়ালের নীচের দিকটা নোনা-ধরা, রাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখেচো মা, ঠিক যেন পুরোনো চা'লের কি কিসের গন্ধ বল দিকি ?...নীচের এ ঘরগুলা কর্ত্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বেড়াইয়া দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা, দরজা। জানালায় সব কাচ বসানো। ঘরে ঘরে গদী-আঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝক্‌ঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায় এত ঝক্‌ঝক্ করে। অপুদের বাড়ী যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ঐ রকম, কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভাল, পুরু, ও প্রায় নতুন কার্পেট মেজেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে অপুর সমস্ত চেহারা খানা তাহাতে দেখা যায়। সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায় ? জুড়ে জুড়ে করেচে বোধ হয়—

সকলের খাওয়া দাওয়া সারা হইলে সর্ব্বজয়া দুপুরে নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু দুপুরে ঘরে আসে। তাহার মা তাহাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহু রাত্রে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুরটার জন্য তার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। দোর ঠেলিয়া বাম্‌নী ঘরে ঢুকিল। সর্ব্বজয়া বলিল—আসুন, মাসীমা বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বাম্‌নী মাসী বাবুদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। কাজেই তাহাকে খাতির করিয়া বসাইল। বাম্‌নী মাসীর মুখ ভারী ভারী। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখ্‌লে তো আজ কাণ্ডখানা বড় বৌমার ? বলি কি দোষটা···তুমি তো বরাবরই রুটীর ঘরে ছিলে ? মাছ ঝি এসে চুপ্‌ড়ীতে ক'রে রেখে গেল আমি ভাবলাম বাঁধা কপিতে বুঝি...কি রকম অপমানটা দেখ্‌লে তো একবার ? পোলোয়ার মাছ তো সে কথা ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালে তো হোত ? সদু ঝি ও কি কম বদ্‌মায়েসের ধাড়ী নাকি ?...গিন্নীর পেয়ারের ঝি কিনা ? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা ক'রে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি ?

গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসী বলে, যাই জল খাবারের ময়দা মাখি গে—চারটে বাজলো—

মাসী চলিয়া গেলে অপু মায়ের কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস্ দুপুরে বল্ তো ?...

অপু হাসিয়া বলিল—ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজ্‌চে মা—শুন্‌ছিলাম—ঐ বাঁরান্দাটা থেকে—

সর্ব্বজয়া খুসি হইল।

—হ্যাঁরে তোদের সঙ্গে বাবুদের ছেলেদের ভাব সাব হয় নি ?···তোকে ডেকে বসায় ?···

—খু-উ-উব !···

অপু এটা মিথ্যা কথা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহারা তাহাকে বলিবে নীচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নীচে নামিবার সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বক্‌লে না ? কেন বক্‌বে ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে ? এরা ভাল লোক খুব—

এ বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা নাই তাহারা উহাকে আমলই দেয় না। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, অন্তু ইহারা একটা চৌকা পিঁড়ির মত তক্তা সাম্‌নে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটী চালিয়া এক রকম-খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ব্যারাম খেলা—সে খানিকটা দূরে

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলাটা দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুন-বিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখের প্রথমে বড় বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব কুটুম্বিনীদের আগমন সুরু হইল। সকলেই বড় লোকের ঘরের মেয়ে ও বড় ঘরের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি চাকর আসিয়াছে। নীচের তালার দালান বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারা রাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্ব্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নী বলিলেন—ও অপূর্ব্বর মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক্, নানান্ জায়গা থেকে তত্ত্ব আস্‌চে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের কুটীর ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফল ফুলুরী যা দেখ্‌বে পচ্‌বার মত, সদুঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়তো রেখে দিও, জল খাবারের সময় নিয়ে আস্‌বে বাম্‌নী মাসী—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঝি বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্ব্বজয়া গুণিয়া তাহার সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো ষোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবুও একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্ব্বজয়া খাবার বাম্‌নী মাসীর হাতে দিতে দিতে ভাবে—এই এত ভালমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্যে কিছু—আহা বাছা আমার সরকারদের খাবার ঘরের কোনটায় কাঁচু মাঁচু হ'য়ে ব'সে দুটো ভাত খায়, না দিতে পারি পাতে দুখানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারী, না এক হাতা দুধ—তথ্‌খুনি ঐ সদু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়া সহরের অন্য একটু বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল। বাহিরের উঠানে নিমন্ত্রিতের দলে ভরিয়া গিয়াছে। সারা উঠানটাতে সতরঞ্চি পাতা, এক কোণে চওড়া জরি পাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির ঝালর-দোলানা নীল সাটিনের চাঁদোয়া, দুপাশে কিংখাবের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো। চারিপাশে বরযাত্রগণের চেয়ার ও কৌচ্।

অপু এ সমস্ত বিশেষ কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক। মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে। দামী বেনারসী শাড়ী পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোট বাবুর মেয়ে অরুণা কাহাকে ডাকিয়া বাইরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ীর ভিতর আনিতে বলিতেছে।

বিবাহের দিন দুই পরে সখের থিয়েটার উপলক্ষে আবার খুব হৈ হৈ। উঠানের এক কোণে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও অর্কিডে ষ্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো। পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা ষ্টেজের মধ্যে খাটানো হইল। এ কয়দিনের ব্যাপারে তো একেই অপুর তাক্ লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটি কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতুহলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই ভাল জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সাম্‌নের দিকে সন্ধ্যা হইতেই বসিয়া রহিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীর দারোয়ানেরা জরির উর্দ্দী পরিয়া আসরের বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপ্‌সিন্ উঠিবার আর বেশী দেরী নাই, বাড়ীর গোমস্তা গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নীচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না।

তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো, এখানে বাবুরা বস্‌বেন—ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নামতা পড়ার সুরে বলিল—আমি সন্ধে থেকে এইখানটায় ব'সে আছি, পেছনে যে সব ভর্ত্তি, কোথায় যাবো?...তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনী দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর না কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোক্‌রা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সাম্‌নে—বাবুরা বস্‌বেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা এসেচেন মুখের কাছে বস্‌তে! কোথায় যাবো ওঁকে ব'লে দ্যাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার—যা এখান থেকে যা, ওই থামটামের কাছে বস্‌গে যা কোথাও—

পিছন হইতে দু'একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন—কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ—কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজার বাবু, এই জ্যাঠা ছোক্‌রা বাবুদের এখানে এসে ব'সে আছে, একেবারে সাম্‌নে—চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসাবার জায়গা নেই—উঠ্‌তে বল্‌চি, আবার মুখোমুখি তর্ক?

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—দাওনা দুই থাপ্পড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মত আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলেরই চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনি এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোনো জায়গায় ছুটিয়া পলায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল ভয়ে, অপমানে, লজ্জায়. তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দ্দাগুলিতে হঠাৎ বেথাপ্পা গোছের—কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল ...কিন্তু চারিধারে চাকর বাকর, ওপরের বারান্দায় টিনের আড়ালে মেয়েরা ঝি রাঁধুনীরাও নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে সে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা। তাহার পর বার বার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহাকে সম্ভবতঃ কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে?

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈ হৈ—কোনোদিকে তাহার খেয়াল রহিল না। ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পাণদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পাণ বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ওপরের চিকে ঘেরা বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল ওদিকে মা নাই তো? মা একথা না জানিতে পারে! কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলেও ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

২০

পরের বাড়ী নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মত থাকা সর্ব্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হোক্, দুঃখে হোক্, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিনী ছিল।...দরিদ্র সংসারের রাজরাণী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ীর গৃহিনী, বৌ-রাণীদের চেয়ে কম কার্য্যকরী ছিল না। এ যেন সর্ব্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্ব্বদা মন যুগিয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পাণ থেকে চূণ না খসে! ছোটর ছোট তস্য ছোট!...এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে—কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্ব্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমায় খাটার মূল্য দিতেছে বলিয়া সমানে সমানে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়া লইতে হইবেই।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি? ..বাহিরে যাইবার সুবিধা কৈ? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?...

চিরকাল এই রকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ওই বাম্‌নী মাসীর মত?...চিরদিন...চিরদিন?

সে তাহা হইলে মরিয়া যাইবে। কিন্তু উপায় কি? অপুর মুখে দুটো অন্ন তো দিতে হইবে?...

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ। সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিতা মহিলাদের গাড়ী পিছনের গেটে আসিতে সুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতালার বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্ব্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতালার বারান্দার উঠিবার মুখে বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচ্‌কি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া, কেহ ধীর, কেহ ক্ষিপ্র, কেহ সুন্দর, অপূর্ব্ব গতি-ভঙ্গিতে, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নীচের বারান্দার একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরণের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুণ সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভাল লাগিতেছিল এ বাড়ীর বড় মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক একবার নামিয়া আসিতেছে, নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মণি-দি? একেবারে রাত আটটা কোরে? বকুল-বাগানের বৌদি এলেন না? অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ী সাজিয়ে ব'সে আছি বেলা ছয়টা থেকে... বেরুনো তো সোজা নয় ভাই,...সব তৈরী না হোলে তো... জানোই তো সব—

সুজাতা কাঞ্চনফুল রংএর দামি চায়না ক্রেপের হাত-কাটা জামার ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আবদারের ধরণে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল—মা বল্‌ছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সাম্‌নের মাসে যাবেন কল্‌কাতা,—বুধবারে মা গেছ্‌লেন যে—ঠিক কিছু হোল?

সিঁড়ির ওপরের ধাপে মেজ বৌ-রাণী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশী, বোধ হয় ত্রিশের উপর, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোনো বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপা-রংএর চওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ীর প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ব্রূচ্‌ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গম্ভীর—এই বয়সেও দুধে-আল্‌তা রংএর আভা অপূর্ব্ব।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির উপরই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে? এই দেখুন না, একবার আস্‌বো আস্‌বো ক'রে...কাল ওঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অব্‌ধি—

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপু ইঁহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ভাইএর মৃত্যুর পর ইনি সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামী পুষ্পাসারের মৃদু, মন-মাতানো সৌরভ, বীণার ঝঙ্কারের মত—সুকণ্ঠের সুর ও ঐন্দ্রজালিক হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে?...

মেজ বৌ-রাণী অনেকক্ষণ হইতেই দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে কে একজন অপরিচিত, ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড়লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকেন। দুধাপ নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—খোকা, এস উঠে?... দাঁড়িয়ে কেন?...তুমি কোত্থেকে আস্‌চ?...

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রাণী

ডাকিতেছেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরেই রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিতেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বৌ-রাণী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোত্থেকে আস্‌চ খোকা?...

অতিকষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ঐ—আমার মা—এই বাড়ী থাকেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুনীর ছেলে—একথা শুনিয়া এখনি হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে?···

মেজ বৌ-রাণী কিন্তু সে সব কিছুই করিলেন না—তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন—এ বাড়ী থাকেন তোমার মা?... কে বল তো...কি করেন?···কতদিন তোমরা এসেচ?...

অপু গলা ভাঙ্গা কথায় আবোলতাবোল ভাবে ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রাণী বোধ হয় ইহাদের কথা তিনি এবার আসিয়া শুনিয়াছেন—বলিলেন—ও তোমরা কাশী থেকে এসেচ বুঝি?...কি নাম তোমার?...তাহার সুন্দর, ডাগর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—এস না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?...ওপরে এস···

অপু চোরের মত—বৌ-রাণীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে মেয়েদের বড় মজলিস—সারা বারান্দাটা কার্পেট মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচকড়ার টবে গোলাপ গাছ এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গ্যানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পরে অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি-আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু'একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিয়া একটি গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গলা ভারী সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটিও দেখিতে তত ভাল নয়। মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারী সুন্দর মেয়ে, মায়ের মত সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি!

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

তাহার পর খাওয়ার স্থানে সকলের ডাক পড়িল। অপু নীচে নামিয়া যাইতেছিল, বৌ-রাণী তাহাকে ডাকিয়া দালানের এক ধারে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানা কলার পাতা আনিয়া সম্মুখে পাতিয়া দিয়া বলিলেন—ছেলেমানুষ, এইখানে বোসো। পরে তিনি অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

সকলের খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে, এমন সময় নীচে এক হৈ চৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

সদু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি!...কাণ্ড দ্যাখো...হি হি···বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে···হিহি···। দুই তিনজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েচে রে? কি?

—ঐ ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোত্থেকে...লুচি ভাজতে গিয়েচে...রুটীর ঘরের সামনে ঘর ক'রে দেয়, খাবার ঘরের উঠোনে ব'সে লুচি ভাজ্‌চে, বলে আসি বাইরে থাকি··· হুঁকোর মধ্যে···হিহি...কি নিয়ে যাচ্চে পুরে চুরি করে···প্রায় আধসেরের ওপর···গোমস্তা মশায় ধরেচে···রামনিহোর সিং মার বা দিচ্চে...চুলের ঝুঁটি না ধ'রে—

সর্ব্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই মণ মাছ ভাজার ভার তার একার উপর—সকাল আট্‌টা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ ত্রিশ বছরের পাতলা, ময়লা রংএর, ময়লা কাপড় পরা বামুনের ছেলেকে দু তিনজনে মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, অল্পকার কার্য্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে

হুঁকাটি একদিকে ছিট্‌কাইয়া ঘি টুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—কাছা মারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতরে ঘৃত পাওয়া যে একটা খুব স্বাভাবিক এবং নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভুনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে সে অস্ফুটস্বরে বাবা রে বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধ হয় বা রক্তও বাহির হইল।

সর্ব্বজয়া ক্ষেমিঝিকে জিজ্ঞেস করিল—কি হয়েচে ক্ষেমি-মাসি?...আহা ওরকম ক'রে মারে?...বামুনের ছেলে...

ক্ষেমি বলিল—মারবে না! হাড় গুঁড়ো ক'রে ছাড়্‌বে.. মারার হয়েছে কি এখনো...পুলিশে দেবে...বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা...

উপরে সকলের খাওয়ানো হইয়া গেলে অপুও খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। মাকে বলিবার মত একটা কথা সে পাইয়াছে!...মেজবৌ-রাণী তাহাকে আর কোন কথা বলিবেন আশা করিয়া সে তাঁহার সাম্‌নে—যেখানে তিনি দাঁড়াইয়া সকলকে বিদায়ে আপ্যায়িত করিতেছিলেন—সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু মেজ বৌ-রাণীর নজর তাহার উপর আর পড়িলই না।

২১

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজবৌরাণীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না? তোমার নাম কি,—ত্রিপু না কি?

অপু বলিল—অপু ব'লে মা ডাকে—ভাল নাম শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার রায়...

সে একটু অবাক্ হইল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল কি সুন্দর মুখ! রাণুদি, অতসী-দি, অমলা-দি,—সকলেই দেখিতে ভাল বটে, কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভাল কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ী আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বেকার ধারণা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজ বৌ-রাণীর মত সুন্দরী কোনো মেয়ের কল্পনাও সে করে নাই। লীলাও মায়ের মত সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মেয়েদের মজ্‌লিসে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কবিতা সে ভাল শোনে নাই।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ী? সেবার এসে তো দেখিনি?

—আমরা ফাগুনমাসে—এইচি, এই ফাগুনমাসে—

—কোত্থেকে এসেচ তোমরা?

—কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখেনে মারা গেলেন কিনা?—তাই—

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে! খুসিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল।

লীলা বলিল—চল্, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি, মাষ্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েচে—এস—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল—বারে, বল্‌চি তো চল, তুমি তো ভারী লাজুক?—এস—তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?...

ঘর বেশী বড় নয় কিন্তু বেশ সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিলের দুপাশে দুখানা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবি-ওয়ালা ক্যালেণ্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার কোলে একটা ছোট টাইমপিস্ ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চার পাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার এ্যাটাসি কেস্ খুলিয়া বলিল—এই ছাখো আমার জলছবি, মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েচেন, ভাগ শিখ্‌লে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না?

—তুমি জানো ? ভাগ কষেচ ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কবে !...

এই ভঙ্গিতে অপুর সুন্দর মুখ আরো ভারী সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বল্‌তে পারো তো ? পরে সে অপুর ঠোঁটের নীচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি ? তিল ? বেশ দেখায় তোমার মুখ, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত ? তেরো ? আমার এগারো—তোমার চেয়ে দু বছরের ছোটো—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে, সেই একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা ?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিচি—

—বলো দিকি ?

লীলার গলার সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোনো মেয়ের এ পর্য্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে
তাকে খাট পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে ?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাশুরায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারী মজার কথা জানো তো ? এমন হাসাতে পার তুমি !...

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আর আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বল্‌বো ? আমি আরও জানি—পরে সে তাহার ডাগর চোখ দুটি কড়ি-কাঠের দিকে তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে :—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা,
নিষ্কর্ম্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বুএর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখ্‌তে চারি চালের ঠাট্‌টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝ্‌তে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার যোগাড় করিল। বলিল,—দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা এ্যাটাসি কেস্‌টা হইতে একটা কলম বাহির করিয়া বলিল—বলো দিকি ?

অপু আবার বলিতে সুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক্ হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো লিখ্‌চো কেমন ক'রে ?

লীলা বলিল—এ তো ফাউণ্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না ?

অপুর হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না ?

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভ'রে নিতে হয়—এই ছাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ, বেশ তো !...দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক্ হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিত-মুখে বলিল—না আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন ?

—উহুঁ—

—কেন ?

—নাঃ।

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল—নাও না ?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নোবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত ? বাস্ !...আর ফেরত দিতে পার্‌বে না ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে ?

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বক্‌বে ? ফাউণ্টেন পেন দেবার জন্যে ? কেউ বক্‌বে না, আমি মাকে বল্‌বো অপূর্ব্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছ থেকে আর একটা

নোবো—বাবার ফটো দেখ্‌বে?...ওই যে ক্যালেণ্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আরও দু'তিন খানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে কয়েকখানা বই বাহির করিয়া বলিল—মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েচেন—তুমি কোন স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিন কতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কাশীতে পড়্‌তাম, এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল যেন না পড়িয়া সে খুব একটা বাহাদুরী করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি। অপু বলিল—বইখানা পড়্‌তে দেবে একবারটি? লীলা বলিল—নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আল্‌মারিতে, এনে দোবো, পোড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আন্‌বো?

লীলা বলিল—চলো তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিসের ওয়াড়, আল্‌নায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসিহাসি মুখে দেখাইয়া গর্ব্বের সুরে বলিল—আমার লেখা, এই ছাখো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিন খানা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে থানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ তো হয়েচে, আমি এথানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো—

অপুর ভারী লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল,—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

—নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ী—কাশীতে তো মোটে বছর খানেক হ'ল আমরা—

এমন সময় ছোট মোক্ষদা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে ব'সে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাষ্টার বাবু ব'সে ব'সে হয়রাণ, আমি ওপর নীচে সব ঘরে খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এই এঁদো-পড়া কুঠুরিতে—এস এস—

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্চি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল—তা বস্‌বার কি এই জায়গা নাকি? বলে আমাদেরই তা মাথা ধরে তাই কি এই আস্তাবলের খোট্টা মিন্সেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয় না ধোয়? উঁ-হুঁ-হুঁ কি গন্ধ আস্‌চে ছাখো—এস দিদিমণি, শিগ্‌গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়্‌বো না যা বল্‌গে যা—কে তোকে বলেচে এখানে বক্‌বক্‌ কর্‌তে? যা মাকে বল্‌গে যা—

ছোট মোক্ষদা থর্‌ থর্‌ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল—তোমার মা বক্‌বেন না? কেন ওকে ওরকম বল্লে?

পরদিন দুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেজেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয়? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু কোঁচার খুটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল—সকালবেলা পড়্‌তে আসোনি? আমি তো পড়ার ঘর টর সব খুঁজে দেখি কেউ কোথাও নেই—

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল—মাকে প'ড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজে প'ড়ে দেখ্‌লেন। অপুর সারা গা খুসিতে কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচও বোধ হইল। মেজ বৌ-রাণী তাহার লেখা পড়িয়াছেন!

লীলা বলিল—এসো আমার পড়ার ঘরে, 'সখা-সাথী' বাঁধানো এনে রেখেচি তোমার জন্যে—

অপু আল্‌নার দিকে চাহিল। তাহার ভাল কাপড়-খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে, সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গিতে।

লীলা মিনতির সুরে বলিল—এস এস—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

—বাবা! কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি না বল্লে আর হাঁ হ'বার যো নেই বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন? কি হয়েচে বলো—না বল্‌তেই হবে—বলো ঠিক—

অপু আল্‌নার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আল্‌নার কাছে গিয়া হাত দিয়া দেখিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েচে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউন্টেন পেনে লিখ্‌চো? কেমন, বেশ লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দু'জনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুইজনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বইএর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মত চিকণ নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা সির্ সির্ করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও মনে ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এস দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেল—হাতে ক'রে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ—

রূপোর ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ। লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস্—

ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। হঠাৎ এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্দেকটা—

অপু লজ্জিত সুরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারি খোসামোদ কত্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষী ছেলে—

অপু সলজ্জ হাসিয়া বলিল—ইঃ লক্ষী ছেলে! ভারি ইয়ে কিনা? উনি আবার—

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপরের দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকী দুধটুকু শেষ করিয়াই সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্টি দুধ না?

—আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে বুঝি পরের এঁটো?

—আমার ইচ্ছে—একটুখানি থামিয়া কহিল—তুমি বল্লে জলছবি তুল্‌তে জানো, ছাই জানো, দাও তো আজ আমার ক'খানা জলছবি তুলে?

জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি সর্ব্বজয়া চাহিয়া চিন্তিয়া কোনো রকমে অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ী, ঠাকুর দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বাম্‌নী মাসী নাড়ু ভাজিতে সাহায্য করিল, দু'এক-জন রাঁধুনী বামুন ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বীরু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্চি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে, অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া পুরাণো বইগুলা ও লীলার দেওয়া বাধানো 'মুকুল' পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল—বাঃ বেশ তো তুমি? ব'লে গেলে সোমবারে আস্‌বো কল্‌কাতা থেকে, কত সোমবার হ'য়ে গেল—ফিরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আসবো কি ক'রে? স্কুলে ভর্ত্তি হয়েচি, বাবা দিয়েচেন ভর্ত্তি ক'রে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কল্‌কাতার বাড়ীতেই থাক্‌বো কিনা? এখন ক'দিন ছুটি আছে তাই মার সঙ্গে এলাম—আবার বুধবার যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাক্‌বে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হ'লে আবার আস্‌বো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুঁজে থাকো তো একটু?

অপু বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপু চক্ষু বুঁজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল লাল দেশী ধুতি চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবী। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েচেন—কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে—

ধুতি চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবীটা যে দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা, এ বাড়ীতে পা দিবার পূর্ব্বে অপু চক্ষেও কখনো দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদ্‌লে গিয়েচে, আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নূতন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়েরও পৈতে হোল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখিয়া বলিল—দ্যাখো তো কেমন ফুল গাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

খানিকটা পরে অপু বলিল—আমি এট্টু শুই গে মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও, আমি একটা মন্তর জানি মাথা ধরা সারাবার—দেখি? পরে সে দুহাতের আঙুল দিয়া কপাল এমন ভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—উঃ বড় সুড়্‌সুড়ি লাগ্‌চে!...লীলা হাসিয়া বলিল—আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভাল না? সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে। বর্ষাকাল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইঁহাদের বাড়ী, সেখান হইতে কিছু দূরে গিয়া বাঁ ধারে ছোট্ট গলির মধ্যে একতালা বাড়ীতে স্কুল। জন পাঁচেক মাষ্টার, ভাঙ্গা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেল-কালি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরাণো ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আস্‌বাব। স্কুলের সাম্‌নেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ীর চুণ বালির কাজ বিরহিত নগ্ন ইটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ্ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড় করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী

ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়া যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না, সহরের এই সব ইট-সিমেণ্টের কাণ্ড-কারখানায় তাহার হাঁপ ধরে, কেমন যেন দম আট্‌কাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশী নাই, দু'একটা এখানে ওখানে। সুরকীর পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ীর মাঝখানের ফাঁকে আবর্জ্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। একতালা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরাণো চটের পর্দ্দা। ঘরের মেজে উঠান হইতে এক বিঘতের বেশী উঁচু নয়, কাজেই আর্দ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই এক সঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সব শুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশী। এখানে ইট সিমেণ্টে আর মার্ব্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্য্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্য রকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয়, এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ী চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কৈ? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মত! কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া না, গান গাওয়া যায় না, ভয় করে।

এক একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়া খাতাঞ্চি একটা লোহার শিক বসানো খাঁচার মত ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে। রাশীকৃত খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা। ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সাম্‌নে করিয়া বুড়া সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট্ তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরীশ গোমস্তা জমা সেরেস্তায় বসে। নীচু তক্তপোষের উপর ময়লা চাদর পাতা—চারিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্চিখানার মত অত অন্ধকার নয়, দু'তিনটা বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোষের নীচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুহুরি হাঁকিয়া বলে—ওহে রামদয়াল দেখো তো, গত তৌজিতে বাস্তুকর খাতে কত খরচ লেখা আছে?...তখনই কি জানি কেন অপুর মনে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়া উঠে।

সকালবেলা অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ীর ছেলেরা চেয়ার-গাড়ীটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়ীটা নূতন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডা-লাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদী, বড় বড় চাকা—ঝক্-ঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল্ তো একবার আমাদের—

এই গাড়ীটা আসিয়া অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুসি হইয়া বলিল—ঠেল্‌চি, আমায় এটু চড়্‌তে দেবেন তো?...

রমেন বলিল—আচ্ছা হবে, ঠেল্ তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা—থাক্ আর নয়—পরে গাড়ী লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া দেখিয়া অপু বলিল—আমি এটু চড়্‌বো না?

রমেন বলিল—আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশী চড়্‌লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ও বেলা—

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—বা, আপনি যে বল্লেন আমাকে একবার চড়তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেললাম—বেশ তো? সেদিনও ওইরকম চড়ালেন না শেষকালে—।

রমেন বলিল—ঠেল্‌লি কেন তুই, না ঠেল্‌লেই পাত্তিস্—যা—কে বলেচে তোকে চড়্‌তে দেবে? গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে না?

সে বলিল—কেন আপনিও বল্লেন, ওই সন্তুও তো বল্লে—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্তু বলিল—ফু-র্-র্-র্,—বক দেখেচ?

কোথাও কিছু না হঠাৎ বড় বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা আমরা চড়াবো না আমাদের খুসি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা—এদিকে আসিস্ কেন খেল্‌তে?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুণই হউক বা সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপের জন্যই হউক—অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল—সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানার বড়বাবু সকালবেলা কাছারি করিতেছিলেন তিনি সদলবলে নীচে নামিয়া আসিলেন। দশদিক হইতে দশঘটি জল...বাতাস...জলপটি...হৈ হৈ কাণ্ড।

গোলমাল একটু কমিলে বড় বাবু বলিলেন—কৈ কে মেরেচে দেখি? রামনিহোর সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড় বাবুর সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া দিল। বড় বাবু বলিলেন—এ কে? ওই সেই কাশীর বামুনঠাকুরুণের ছেলে না?...

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভারী বদ্-ছোক্‌রা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সেবার থিয়েটারের দিন, বসেচে একেবারে সকলের মুখের সাম্‌নে। বাবুদের জায়গায় স’রে বস্‌তে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ওই শেঠেদের বাড়ীর মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আস্‌চে—এই বয়েসেই তৈরী—

বড় বাবু রমেনকে বলিলেন—সকালে আজ তোদের মাষ্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ? ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্ত্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—ওই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিগ্যেস্ করুন বরং সন্তুকে—আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরেজি ম্যাগাজিনগুলোর ছবি দেখ্‌তে চায়—সেদিন আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে কি একটা নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ছিল—

গিরীশ সরকার বলিল—দেখুন সখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড় বাবু বলিলেন—স’রে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেচ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্ব্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড় বাবু কথা শেষ না করিতে দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়েস কত আর তোমার বয়েস কত জান?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলিয়া চলিত যে টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্য্যে সে অপুর জেঠামশায় নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে টেবু ও বাড়ীর সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তাহার অপরাধ। কিন্তু উঠান ভরা লোকারণ্যের কৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবুও—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড় বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—ষ্টুপিড্ ডেঁপো ছোক্‌রা কোথাকার—কে তোমাকে ব'লে দিয়েচে এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশ্‌তে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এস—এস—

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অপু কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও তাঁহার পুনর্ব্বার উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনো ইহার পূর্ব্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়,—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে নিজের কতকটা অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জন্য হাত দুখানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ্ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে এ স্পর্দ্ধা আর না হয় বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্য বেত হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত, বোধ হয় এ বেতটা খুব দামী।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো ধাড়ী বয়াটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্চি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধ'রে তক্ষুনি এখান থেকে বিদায় ক'রে দেবো—পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আন্‌লেন, ভাব্‌লাম জাতের মেয়ে থাকুক্—দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে—উনি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীরেনবাবু বলিলেন—ও সব ওই রকমই হ'য়ে থাকে—এর পর কোকেন খাবে—মার বাক্স ভাঙ্‌বে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ীর মধ্যে সব কথা গিয়া পৌঁছায় না, অপুর মার খাওয়ার কথাটা কিন্তু সর্ব্বজয়া শুনিল। একটু ভাল করিয়াই শুনিল। গৃহিনী বলিলেন—ওরকম যদি দুরন্ত ছেলে হয় তা হ'লে বাছা—ইত্যাদি। কুটীর ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুলে গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনো মাকে বলেও না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্ব্বজয়ার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইবার পর বাতাসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইয়া উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া গেল। মনের নিরুদ্ধ আবেগ সহজ দুঃখের কোঠায় নামিতেই নিঃশব্দ কান্নার বেগে ভাঙিয়া সে বারান্দার সাম্‌নের লোহার চৌবাচ্চাটার পাশে বসিয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—ঠাকুর, যা শাস্তি দেবার হয় আমার ওপর দিয়ে দাও ঠাকুর, ওকে কেন? পরের দোরে দুটো ভাতের জন্যে প'ড়ে থাকি, তাই কি অম্‌নি খাই, উদয়াস্ত খেটে খেটে মুখে রক্ত ওঠে, তবে দুমুঠো ভাত হয়, তার ওপর আবার এই শাস্তি ঠাকুর?

সকালে সকালে অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের ফুটবল খেলায় অপুকে রেফ্‌রী হইতে হইবে। অপু ভারী খুসি হইল, ফুটবল খেলা সে এ সহরে আসিবার পূর্ব্বে কোনদিন দেখে নাই, সে খুব ভাল খেলা করিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলায় রেফ্‌রী হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হুইসল্‌টা বাড়ী থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে প'ড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথাটা মনে উঠিল। আজ.. সারা দিনটাই সে সে কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরীশ সরকারের সাম্‌নে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌ-রাণীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার হঠাৎ সখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই এক পয়সার বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভাল লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না।. তাহার মনে হইয়াছিল—দূর! এ না

কিনে এক পয়সায় ছোলা ভাজা কিনলে বেশ হোত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়! কিন্তু গিরীশ সরকার না জানিয়া শুনিয়া তাহাকে যা তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নাই? থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। তাহার মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্যই তো সে ওবেলা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল।

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সঙ্গে কথা কহিতে দিবে?

বাড়ী ফিরিতে দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুসি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতলার জানালার নীচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব ভাল বোঝা যায় না কিন্তু সুরটি ভারী চমৎকার, শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের কাছটাতে যেন কেমন করিয়া উঠিল, কান যেন গরম হইয়া উঠিল—ভাল, নূতন সুর শুনিলেই এরকম তাহার হয়—স্কুল, খেলা, রেফ্রী-গিরি, ওবেলার মার খাওয়া মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে মনটা আপনা আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই তখন তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারের উলু খড়ের মাঠে ছোট ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল চারা, তাহাদের পিছনে কতদূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুল চারা যেন আঁকা, শুকনা ডালে কি পাখী বসিয়া থাকিত, সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, সেই ব-হু-উ-দূরের দেশটা—কোন্ দেশ তাহার জানা নাই, মাত্র মনের খুসিতে সেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে তার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-ভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে—অপূ—উ-উ-উ—উ—

মন খুসিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়—যা-আ-আ-ই-ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে? সে বলিল—ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাপ্ ইস্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস্ এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে গিয়ে বকেচে?

--নাঃ ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে, তাই বড় বাবু ডেকে বল্‌ছিলেন কি হয়েচে তাই—

—বকে টকে নি তো?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাব্‌চি, চল এখেন থেকে চ'লে যাবি? সে আশ্চর্য্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল—কোথায় মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তা চলো, আমি সেখেনে ঠাকুর পুজো করবো—পৈতেটা তো হ'য়ে গিয়েচে—নিজেদের দেশ, বেশ হবে—

সর্ব্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাব্‌চি আজ দু'বচ্ছর। সেখেনে যাবি বল্‌চিস্, কি আর আছে বল দিকি সেখেনে? এক বাড়ীখানা, তাও আজ তিন বছর বর্ষার জল পাচ্চে, তার কিছু কি আর আছে এ্যাদ্দিন? মান্ধাতা আমলের পুরোণো বাড়ী—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গুঁজ্‌বার জায়গাটুকুও তো নেই—শত্তুর হাসাতে যাওয়া—

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল---একটা কাজ কল্লে হয়, চল বরং—আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ী চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের সেই বন্ধুও সেবার বলিয়াছিল। সে যদি কোনো যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মার বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে।

উঃ কি গরম! রান্নাবাড়ীর নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠিতেছে, কার্ণিসের গায়ে রোদ...ঘরের

ভেতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার...আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দি বুলি বলিতেছে...পাথর বাঁধানো মেজেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্ খট্ আওয়াজ...ড্রেনের সেই গন্ধটা...

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর ?

এতদিন সেখানে তাহাদের ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা কাঁটার ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

আজ কত দিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই—তি-ন বৎসর ! কতকাল !

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারী পুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েরের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়া ভিটার মিষ্ট লেবু ফুলের গন্ধে সজ্‌নে তলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি ? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর পিছনে শিরীষ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক ? মাঠের মধ্যে রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য্য অস্ত যাওয়া ? ঠাকুর-ঝি পুকুরের সেই বটগাছটা যেখানে ঝাঁকড়া চুল দস্যুর মত দিগন্তের মধ্যে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—সেখানে ?

খানিক পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না।...জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে—দিদির সেই কাঁচপোকাটা যেখানে উড়িত—সেখানে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।..ক্রমে আরও দিন চলিয়া যাইবে, সারা বাড়ী জঙ্গলে ঢাকিয়া ফেলিবে, কেহ কোনো দিন সেদিক মাড়াইবে না, কেহ কোনোদিন পা দিবে না সে ভিটায়। ওড়কলমী ফুল ফুটিয়া আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, বনের ধারে সেই অপূর্ব্ব বৈকালগুলি মিছামিছি নামিবে, হলুদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

মায়ের হাতের যত্নে পোঁতা লেবুগাছটা কোথায় কোন্ জঙ্গলে চাপা পড়িয়া যাইবে, কেহ সন্ধানও জানিবে না কোনো দিন।

ভাবিতে ভাবিতে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে।

তাহার মাথাটা এমন ধরিয়াছে কেন ? যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল—এখন একটু শুয়ে নি, এর পর উঠে খেলার মাঠে যাবো—মোটে তিনটে বেজেচে—এখন বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই বারবার তাহার মনে আসিতে লাগিল। একথাটা এতদিন এভাবে কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে নিশ্চিন্দিপুর সব সময়েই অস্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত, এ সবের শেষে যেন তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের জন্য। যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই। তা বালক বলিয়াই হোক্ বা তেমন বোধশোধ নাই বলিয়াই হোক্।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে বিশেষ করিয়া মায়ের ও বড় বাবুর কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই বিদেশ, এই গিরীশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা—না হয় মায়ে ছেলে হাত ধরিয়া, ছন্নছাড়া, পথে পথে চিরকাল—এরাই কায়েম হইতে আসিয়াছে। যা চলিয়া গিয়াছে—তা গিয়াছে।

আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ার ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল একই কি কথা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই···সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে...খুব, খুব মাটির ভিতর···নীচের দিকে কে যেন টানিতেছে...বেশ আরাম...মাথা ধরা নাই...বেশ আরাম।···

উঃ কি রোদটাই ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে ! নীলমণি জেঠাদের বেলগাছটায় বেল এখনো পাকে নাই। দিদির যা কাণ্ড—

এত রদ্দুরে চড়ুই ভাতি? সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে এত রদ্দুরে চড়ুই ভাতি?

রাণুদি কাণের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রাণুদি অভিমান-ভরা ছলছলে ডাগর চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের চলে না যে? রাণু-দি না লীলা?

হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য বাজাইতেছে... কেমন চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিন্‌বো বাবা—একটা পয়সা দ্বাও?...

তাহার বাবা বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েচে, তোর গল্পটা ছাপিয়ে এনে আমায় দেখ্‌তে দিস্ খোকা?

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথক ঠাকুরের মত।

তাহাদের মাঝের পাড়া ইষ্টিশন। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে মা-ঝে-র-পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবীটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যা-তারা উঠিয়াছে। নিমফুলের গন্ধে-ভরা বাতাসটা।

খড়মের বউল নয় টেলিগ্রাফের কল। সে বোকা কিনা—সে বুঝি আর জানে না?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হ্যাঁরে ওঠ্, বেলা যে আর নেই, বল্‌লি যে কোথায় খেল্‌তে যাবো তা গেলি কৈ? অবেলায় প'ড়ে প'ড়ে কি ঘুমটাই দিলি? দেবো তোর সেই বাঁশিটা বের ক'রে?

সে মায়ের ডাকে ধড়্‌মড়্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু বিছানার উপর বসিতে পারিল না, তখনি কে যেন তাহার ভারী বোঝা মাথাটা ধরিয়া শাসনের ভাবে পুনরায় শোয়াইয়া দিল। তাহার মা বলিল—আবার শুলি যে? পরে কাছে আসিয়া বলিল—তোর চোখ মুখ অমন কেন? দেখি—এ কি, তোর যে বড্ড জ্বর হয়েচে—গা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্চে!...

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না···সে চলিয়াছে চলিয়াছে···চলিয়াছে সে আর মা···এ পথে তো একা কখনো আসে নাই? পথ সে চিনিতে পারিতেছে না...ও কাস্তে হাতে কাকা, শুন্‌চো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু ব'লে দ্বাও না আমাদের?—যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশবনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হ'য়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চ'লে গেল সামনে, সামনে শুধুই সাম্‌নে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, দূর ছেড়ে সুদূরের দিকে...দিন রাত্রি পার হ'য়ে, জন্ম মরণ পার হ'য়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হ'য়ে চ'লে যায়...তোমাদের মর্ম্মর স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, বিশ্বের পর বিশ্ব চূর্ণ পাথর হ'য়ে খনির অন্ধকারে চাপা পড়ে পথ আমার তখনও ফুরায় না...চলে... চলে...এগিয়েই চলে...অনন্তের অনাহত, অনির্ব্বাণ সঙ্গীত—তোমার হারানো শৈশবের বীণার মত কালের বুকে বাজ্‌তে থাকে...অনন্তদিন ধ'রে...চিরযুগ ধ'রে···

সে বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!...

চল এগিয়ে যাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাপ্ত

শিল্পী ললিতমোহন সেন এ, আর, সি, এ (লণ্ডন)

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

শিল্পকলা কখন কার হাতে ফলবার সুযোগ পায় তা বলা বড়ই শক্ত—এর জাতি-বিচার নেই স্থান-বিচার নেই। ইউরোপে গোঁগা নির্ব্বাসনে বাস ক'রেও শিল্পচর্চ্চা ক'রে যশস্বী হয়েছেন আবার ধনী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ বাঙলার পটুয়াদের পথপ্রদর্শক হ'য়ে রইলেন।

আমরা এখানে যে শিল্পীর নাম উল্লেখ করচি ইনি শান্তিপুরে নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর হাতে
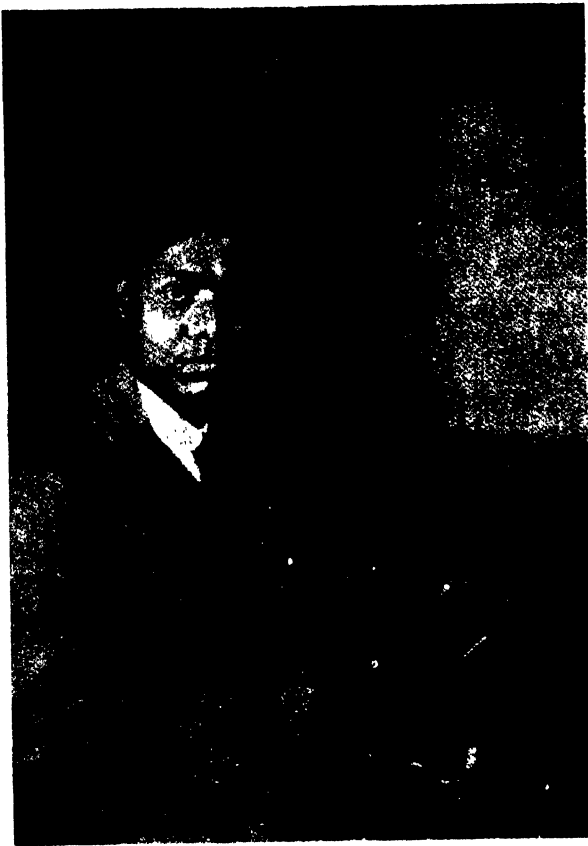
শিল্পী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন

তুলি উঠবে কি কলম উঠবে তা' তখন কেউই অনুমান করতে পারে নি। কিন্তু বিধাতা তাঁর ললাটে আঁক টেনেচেন আঁকনেরই, সুতরাং তিনি শৈশবেই পাঁজির পাতায় ছবি পড়ার খাতায় এঁকে এঁকে তিরস্কৃত হয়েছেন অনেক—অবশ্য তখনকার কালে ও-অবস্থায় পড়াশুনা ছেড়ে ছবি আঁকায় পুরস্কারের আশা খুব কমই ছিল।

শৈশবে সোনার বাঙলায় যে তাঁর পক্ষে সোনাই ফলেছিল তা নয় তাঁর পেটে পিলে লিভার দুটি কুফল ম্যালেরিয়ার যা হ'য়ে থাকে তাই ফলেছিল, সুতরাং হাওয়া বদলের জন্য তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। ১৯১২ সালে তিনি তাঁর দাদার নিকট লক্ষ্ণৌ আসেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস এণ্ড ক্রাফট্‌সে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। সেখানকার তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ন্যাট হার্ড সাহেব তাঁকে অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দেন এবং তাঁর দক্ষতা ও কর্ম্মপটুতায় মুগ্ধ হন। ললিতবাবু শিক্ষাকালে কি এখনই বা কি কখনও কাজ না ক'রে থাকতে পারেন না—তাঁর শিল্পানুরাগ আদর্শ-স্থানীয়। ন্যাট হার্ড তাঁর কাজে খুসি হ'য়ে ডবল প্রমোশন দেন এবং তিনি বিশেষত্ব দেখিয়ে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। সুদূর পশ্চিমে একজন বাঙালী ছাত্রের পক্ষে কৃতিত্ব দেখানো কম গৌরবের বিষয় নয়। তিনি চিত্র-বিদ্যার দুদিকই শিক্ষা করেছিলেন। ব্যবসা বিজ্ঞাপন ইত্যাদির উপযোগী চিত্রকলা এবং চারুশিল্প। তাঁর ব্যবসা ও বিজ্ঞাপনের শিল্পচর্চ্চার ফলে হার্ড সাহেব গভর্মেণ্টের দ্বারা একটি বিশেষ ক্লাস (Drawing for reproduction) খুলে তাঁকেই তার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

এই অধ্যাপকের কাজে যখন ললিতবাবু নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি ভারতের নানান শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্রকলা পাঠিয়ে সুখ্যাতি ও প্রথম স্থানীয় পদক প্রভৃতি অর্জ্জন করেছিলেন। সিমলা শৈলের বিশেষ প্রদর্শনীতে Lal Chand & Sonsএর তিনটি উচ্চ পারিতোষিকের মধ্যে একটি তিনি লাভ করেছিলেন।

দেব-সেবা

[চিত্রটি দৈর্ঘ্যে এগারো ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে চার ফুট। এই চিত্রটি পাঠিয়ে ইনি ইণ্ডিয়া-হাউস-অলঙ্করণের জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন।]

সুরের হাওয়া

[কাঠ-খোদাই ছবি]

ললিতবাবুর মধ্যে দেশী বিলাতি শিল্পের দ্বন্দ্ব নেই। তিনি মাঝে মাঝে মাসিক, পত্রিকাদিতে প্রকাশিত দেশী ছবি অঙ্কনের ধারায়ও ছবি আঁকতেন এবং প্রদর্শনীতে

গ্রামের ধারে

[কাঠ-খোদাই]

দিতেন। সম্প্রতি তাঁর স্কুলে দুজন দেশী ধরণের আঁকিয়ে শিল্পী আসায় তাঁর দেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ দ্বিগুণ বেড়েচে এবং ঠিক দেশী ধরণের আঁকার প্রণালীও অতি সহজে তিন বৎসরের মধ্যেই আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেচেন। তাঁর আঁকা বাদশার একটি ছবি দি ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েচে। উত্তর ভারতের ভূতপূর্ব্ব লাট Sir Harcourt Butler তাঁর আঁকা দেশী ধরণের ছবি দেখে মুগ্ধ হন এবং কিনেছিলেন।

১৯২৪ সালে গভর্মেণ্ট বৃত্তি লাভ ক'রে তিনি ইংলণ্ডে চিত্রকলা শেখবার জন্যে যান। বিলাতে রয়েল কলেজ অব্ আর্টসেই তিনি ভর্ত্তি হন এবং Diploma of Associateship লাভ করেন। আমাদের যতদূর জানা আছে এই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ইনিই চতুর্থ। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, মিঃ শর্ম্মা, মুকুল দে এবং পরেই ললিত বাবু। ইনি রয়েল কলেজে চিত্রকলা ছাড়াও Wood Engravingএ অনুরাগ থাকায় শিক্ষা করেন এবং তার দরুণ বিশেষ diploma পান। সেখানে তিনি etching বিশেষভাবে শিক্ষা করেন। কলেজে শিক্ষাকালে তাঁর কাঠের উৎকীর্ণ ব্লকের ছাপা দুই খানি ছবি Victoria Albert Musuemএর Print Roomএ সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা যত্ন ক'রে রেখে দিয়েচেন। একখানি মহাত্মা গান্ধীজীর মূর্ত্তি অপরটি পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের। বিলাতে Royal College of Art Sketch Club Exhibitionএ Federation of British Industries-এর সব চেয়ে ভাল পুরস্কারটি তিনি লাভ করেন। এ ছবিটি ছিল বড় ক'রে আঁকা দেওয়ালের বিজ্ঞাপন poster। এইরূপ poster বিজ্ঞাপন আঁকতে ইনি সিদ্ধহস্ত।

ইনি British Musuemএর কর্ত্তৃপক্ষ Mr. Lawrence

নাচের ছাঁদ

[কাঠ-খোদাই]

কাশ্মীর [বিজ্ঞাপনের চিত্র]

Bynion কর্ত্তৃক বাগগুহার চিত্রাবলী দ্বিতীয়বার নকল করবার জন্যে আদেশ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং লক্ষ্ণৌ গভমেণ্ট আর্ট স্কুলে একটি ভাল কাজের সুযোগ হওয়ায় সে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই চ'লে এসেছিলেন। লক্ষ্ণৌ ফিরে আসার দিনে Drawing Teacher Training Classএর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি লাহোরে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত হয়েছেন এবং বিলাতে India House decorationএর জন্যও নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এখন তাঁর হাতে দেশের ও দশের আরো অনেক দায়িত্বভার পড়লো। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি তাঁর নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন করুন কায়মনোবাক্যে আমাদের এই প্রার্থনা।

আমরা তাঁর সংসর্গে তাঁর হৃদয়ের মহৎ পরিচয় লাভ করেচি; তাতে তাঁর স্বাভাবিক ও গভীর শিল্পানুরাগ এবং শিল্পী হৃদয়ের অনাড়ম্বর আনন্দটি তাঁকে সদাসর্ব্বদা শুভ-শান্তির দিকেই নিয়ে যাবে এই আমাদের আন্তরিক ধারণা।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আগমনী

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর

সাঙ্গ হল কান্নাকাটি,
শাওন হল দূর,
আজ প্রভাতের আলোয় বাজে
আগমনীর সুর।
ফুলের হাসি উছ্‌লে পড়ে
পাতায় পাতায় মুক্তা ঝরে,
বাতাস বহে ছন্দ-অধীর
গন্ধ-সুমধুর॥

ডাঙায়-জলে ঢেউখেলে যায়
নীল সবুজের বান,
কে-ই বা জানে কোন অজানায়
কার টানে ধায় প্রাণ!
নবীন ধানে বসুন্ধরা
নবান্নেরি পুলক ভরা,
সংসারে আর নাই রে অভাব
সব রসে ভরপুর॥
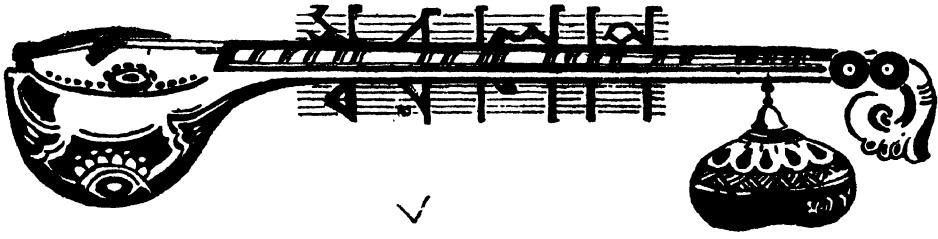
কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে
ভাবনা ভাসে পুব বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে।

লাগ্‌লো যে-দোল বনের মাঝে,
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে-বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হ'ল অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II পা -ক্ষা র্সা র্সনা । ধা -া পা -া I সা -রা গা -া । গা -া গা -া I
কো • ন্ পু রা • ত ন প্রা • ণে র্ টা • নে •

I -া -া গরা গা । মা -া মা -া I -া -া মগা মা । পা -া পা -া I
• • ছু টে ছে • ম ন্ • • ছু টে ছে • ম ন্

I -া -া -া -া । পমা -পা ধা -া I ধা -নধা ধপা -ক্ষা । পা -মা -র্সা র্সনা ।
• • মা • টি র্ পা • নে • কো • ন্ পু

I ধা -া পা -া । সা -রা গা -া I গা -া গা -া । -া -া -া -া I
রা ॰ ত ন্ প্রা ॰ ণে র্ টা ॰ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -ক্ষা -ধা ধা । ধা -া ধা -পা I -র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
চো ॰ খ্ ডু বে ॰ যা ॰ য় ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা -া I র্সা -না -র্রা র্রা । র্রা -া র্রা -র্সা I
ন ॰ বী ন্ ঘা ॰ সে ॰ ভা ॰ ব্ না ভা ॰ সে ॰

I -র্গা -া -া -া । -র্রা -া -র্সা -া I র্সা -র্গা -া র্গা । র্গর্রা -া র্সা -না I
॰ ॰ পূ ॰ ব্ বা তা ॰ সে ॰

I -ধনা -া -া -া । -ধা -া -পা -া I পর্গা -া র্গা র্গা । র্রা -া র্সা -া I
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ম ল্ লা র তা ন্ প্রা ॰

I না র্রা র্সা -া । না -া ধা -া I ধপা -র্সা না -া । ধা -া পা -া I
ব ন জা ॰ গা য়্ ম ॰ নে র্ ম ॰ ধ্যে ॰ শ্রা ॰

I পক্ষা ধা পা -ক্ষা । গা -া -া -া I সা -রা -গা -ক্ষা । -পা -ধা না -র্সা II
ব ণ গা ॰ নে ॰ ॰ ॰ গা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ নে ॰

II সা -রা গা রা । সা -া -া -া I সা -রা গা গা । গা -মা মরা -গা I
লা গ্ ল যে দো ল্ ॰ ॰ ব ॰ নে র মা ॰ ঝে ॰

I সা -রা গা রা । সা -া -া -া I গা -পা পা পক্ষা । ধপা -া -ক্ষগা -ক্ষা I
লা গ্ ল যে দো ল্ ॰ ॰ অ ঙ্ গে সে মো ॰ ॰ ॰ র্

I পা -না নধা পক্ষা । গা -া -া ক্ষা I গা -পা পা পক্ষা । ধপা -া -ক্ষগা -ক্ষা I
দে য়্ দো লা যে ০ ০ ০ অ ঙ্ গে সে মো ০ ০০ র্

I পা -না নধা পক্ষা । গা -া -া -া I সা -রা গা রা । সা -া -া -া I
দে য়্ দো লা যে ০ ০ ০ লা গ্ ল যে দো ল্ ০ ০

I পা ক্ষপা পগা -া । পা -ক্ষা ধা -পা I ধা -র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া I
যে ০০ বা ০ নী ০ ও ই ধা ০ নে র ক্ষে ০ তে ০

I র্সা -া র্সনা র্রা । র্রা -া র্রা -র্সা I -র্সর্গা -া -া -া । র্রা -া র্সা -া I
আ ০ কু ল হ ০ ল ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্গা র্গা -া । র্গর্রা -া র্সা -া I র্সা -র্গা র্গা -া । র্গর্রা -া র্সা -া I
অ ঙ্ কু ০ রে ০ তে ০ আ জ্ এ ই মে ০ ঘে র্

I র্সনা -া র্রা র্সা । র্সনা -া ধা -পা I পা -র্সা -া না । ধা -া পা -া I
শ্যা ০ ম ল মা ০ য়া য়্ সে ০ ই বা নী ০ মো র্

I পা -ক্ষা ধপা ক্ষা । গক্ষা -া গা -া I সা -রা- গা- ক্ষা । -পা -ধা না -র্সা I
সু ০ রে ০ আ ০ নে ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ নে ০

I পা -ক্ষা -র্সা র্সনা । ধা -া পা -া I সা -রা গা -া । গা -া গা -া II
কো ০ ন্ পু রা ০ ত ন্ প্রা ০ ণে র্ টা ০ নে ০

চিতোর

আশ্বিন, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আবিষ্কার

শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তখন সন্ধ্যা, যেদিন প্রথমে
ধরা দিলে মায়াবিনি !
দু'টি কালো চোখ, প্রদোষ-আলোক—
অমৃত-নির্ঝরিণী !
তুমি সন্ধ্যার প্রথম তারাটি
যেন নেমে এলে, শিহরিল মাটি,
লাবণ্যলীলাললিত-তনিমা—
চিরযুগ-সঙ্গিনী,
হৃদয়ে জ্বালিলে স্নেহদীপশিখা
মনে হ'ল চিনি চিনি !

ডাকিলাম তোমা সেই ডাক-নামে
পুরা-পরিচিত ভাষা,
চিনিয়া হাসিলে, আঁকিলে নয়নে
অপরূপ জিজ্ঞাসা !
অস্ফুট বাণী ভীরু উন্মুখ,
ঠোঁটের কিনারে চুমাটি লাজুক,
ধূলার ধরায় ক্ষণভঙ্গুর
আবার বাঁধিবে বাসা ?
আকাশ-পাথারে পাখা মেলে তাই
আমার উদাস আশা !

যদি কোনোদিন চলে' যাও তুমি
দূর হ'তে আরো দূরে,
বিস্মরণের পারে, সখি, মনে
পড়িবে না বন্ধুরে ?
ঘন পরশের নিগূঢ় বেদনা
আনিবে না প্রাণে নূতন কামনা ?
বাঁধিবে না কি গো আঁধারের বীণা
নব প্রভাতের সুরে ?
পথ চিনে' আসি লইবে ডাকিয়া
বিস্মৃত বন্ধুরে !

এনেছ অমিয় মৃদু স্নেহ-সেবা
করতলে কল্যাণী,
যুগে যুগে তুমি জানি মোর বাহু-
বন্ধন-সন্ধানী !
তুমি সাথে আছ, পড়ে' আছে পথ,
আকাশ-অসীম মোর মনোরথ—
অনাবিষ্কৃত ভবিষ্যতের
দ্বারে মোরা কর হানি !
শুনিছ না তুমি কালের ওপারে
মহামিলনের বাণী !
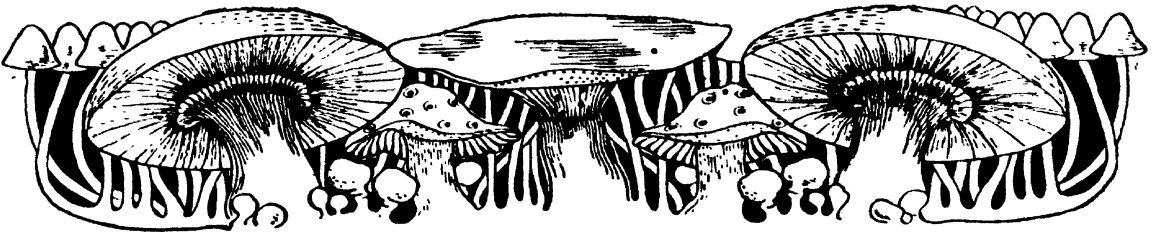
হরিমতির স্বপ্ন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচ্ছেদ— এক

১

হরিমতির মেজাজটা ছিল একটু মজার রকমের। যখন রাগ নেই তখন যেন গঙ্গাজল, কল্-কল্ ছল্-ছল্ ক'রে ব'য়ে চলেছে! আবার বেঁক্‌লো তো বেঁক্‌লো; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও সাধ্য কি তাকে সোজা করে!

তাই বোধহয়, রাজীবলোচন—হাতীর চালে চলতো। কাঁধের মাহুত যদি বলে, চল্, তো চলি; যদি বলে, "ধৎ" তো দাঁড়াই; যদি বলে "বিরিঃ" তো শুঁড় উঁচু ক'রে সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ করি।

ঝগড়া করতে হরিমতির যেমন একটুও ভয় ছিল না, বাধা-দ্বিধা ছিল না, তেমনি ছিল রাজীবের ভয়। রাজীব যমের বাড়ী যেতেও পারে; কিন্তু······তেমন বিপদের সম্ভাবনা হ'লে সে আড়্‌চোখে চেয়ে একেবারে বাইরে গিয়ে তামাকের ধোঁয়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার ক'রে ব'সে থাক্‌তো।

২

কিন্তু সেদিন তাতেও নিস্তার হ'লো না। হরিমতি এই পুকুরের পাঁকের মত ঠাণ্ডা মানুষটিকে রেহাই দিতে পারলে, দিত; কিন্তু যেখেনে শাস্ত্র বল্‌ছে সেখেনে? তাই হরিমতি বাইরে পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে এসে বল্লে, বুজেছ?

হরিমতির সহস্র কথার একই উত্তর, হুঁ, হুঁ, হুঁ··· ·····

তাই হরিমতি ক্ষেপে উঠে বল্লে, হুঁ ছাড়া কি আর কোন কথা তোমার মা-বাপ শেখায় নি?

এবার হুঁ বল্লেই প্রলয়, তাই রাজীব তার ওই অনাহত প্রণব-ধ্বনিকে সংহত ক'রে—একেবারে চুপ।

মা-বাপ জল-জ্যান্ত বিরাজ করছেন; তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারি পাশ করতেও অনেক কিছু শিখতে হয়েছিল কিন্তু······

রাজীব মনে মনে হাসে। সে হাসি, ছোট দুটি চোখে প্রকাশও হ'য়ে পড়ে।

৩

ব্যাপারটা তবে বলি।

হরিমতির সব থেকেও—কিছুই ছিল না। সুখ! মানুষ আর কতদিন ক'রতে চায়? দম্পতির আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে যদি সাত রংএর রামধনুটা তার হাসি কান্না, বায়না, সুখ অসুখ দিয়ে—দুজনকে আঁকড়ে না থাকে তো দুজনে এলিয়ে আল্‌গা হ'য়ে পড়তে থাকে যে! ছেলের নানান্ জ্বালা—তবুও দুধে দাঁতের হাসি নইলে দম্পতির জীবনটা বিস্বাদ, বাসি হ'য়ে যায়!

নিজের গায়ে তাগা-মাদুলি বেঁধে আর তিল স্থান ছিল না হরিমতির; গাছের ডালেও ইট-পাথর বাঁধার অবধি ছিল না। কিন্তু এবারের ব্যবস্থাটা একটু বিচিত্র। এখেনে কেউ কখন ব্যর্থমনোরথ হয়নি। মুস্কিলের মধ্যে সেই অজ পাড়াগাঁয়ের পচা মন্দিরে স্বামী-স্ত্রীতে সাতদিন বাস করতে হবে।

ছুটি নেই, ছুটি নেই; বেশ, এই বারোদিন পুজোর ছুটি তো আছে, চল এবার?

৪

ম্যালেরিয়ার ফুল-শয্যায়, দুর্লভ বারোদিনের সাতদিন বাড়ি ছেড়ে শ্রীমতীর সঙ্গে বাস করতে যাওয়ার মধ্যে হয়তো অনেকখানি কাব্য ছিল; কেন না, বিপদের বুকের

মধ্যে মানুষ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসাটাকে চিরদিনই রোমান্স মনে ক'রে এসেছে, কিন্তু রাজীব ছিল অত্যন্ত 'ভেতো'। ঐ দোষ, অতিরিক্ত অঙ্ক আর বিজ্ঞানচর্চ্চার।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে রাজী হ'তে হ'লো। হরিমতি বল্লে, এই সহরের গাড়ী ঘোড়া ট্রাম-মোটরের কচ-কচিতে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠে......এক তো ম্যালেরিয়ার ভয়! তা মশারি নেব, কুইনেন নেব, গরম জলে নাইবো...... কিছু হবে না, কোন ভয় নেই......আমি বলছি তোমায়...

এ মধুর অথচ ভয়ঙ্কর আমিটির দিকে চেয়ে রাজীব বল্লে, আচ্ছা, তাই হোক্।......আগে না তে-রাত্তিরের কথা শুনেছিলাম?

হরিমতি বল্লে, পরে খবর নিয়ে জেনেছি......বেদ ওল্টায় তো ও ওলটায় না।

পরিচ্ছেদ—দুই

১

ইষ্টিশান থেকে পাঁচ ক্রোশ গরুর গাড়ীতে যেতেই দু জনের দেহ জখম হ'য়ে গেল।

হরিমতির মনে আশা ছিল, বিশ্বাস ছিল; তাই সে কষ্টটা তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে গাড়ীর ওপর ব'সে রইলো। কিন্তু রাজীব কোনমতে প্রাণে বেঁচে রইলো।

সেকালে রাণীদের ছেলে না হ'লে রাজা হেঁটেয়-কাঁটা ওপরে-কাঁটার ব্যবস্থা করতেন। আবার নূতন রাণী আস্তো।

কিন্তু সেকাল আর নেই; রাজীব আর তার পরটুকু ভাবতে পারে না—তারপর সে যেন ভাব্‌তে চায়—এ কি পরিবর্ত্তন?

শেষে ভেবে দেখে যে, মূলটা কিন্তু একই আছে... ছেলে চাই—নইলে সব বৃথা হয়—রাজার রাজ্য যায়... আর আমার? যায় বুঝি এই পৈতৃক প্রাণটা।

হরিমতি ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে বলে, আচ্ছা ঘুমুতে পার তুমি...

রাজীব কাৎ হ'য়ে বলে, তুমিও শোওনা একটু......

নাঃ থাক্‌গে, কি মনে করবে ঐ গাড়োয়ান টা......

সে কথা শুনে রাজীবের মনের এক কোণে অর্দ্ধ-মৃত পুরুষটি যেন একটু আরাম পায়—যা হোক, সে মনে করে, এতটুকু খাতির আছে পুরুষের?

২

ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রেই হরিমতি গিয়েছিল। কুইনিনের তরল গুঁড়ো এবং বড়ি, সকল প্রকার-ভেদ। মশারি; তার ওপর জল গরমের জন্য সঙ্গে একটা চাকর। বৃদ্ধ, যেমন কর্ম্মঠ তেমনি মালিকদের ওপর তার অচলা ভক্তি। থাকবার বাসাও চলন-সই, কিন্তু গোল দাঁড়াল অন্যত্র।

পুরাতন জীর্ণ বুদ্ধ-মন্দিরের মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধকে শালুর কাপড় পরিয়ে, মাথায় সিন্দুর দিয়ে, একদম জাগ্রত ক'রে রাখা হয়েছে। ততোধিক জাগ্রত মা-ষষ্ঠীর সেবায়ৎটি।

মহিপালের আমোলের পুকুরটি প'চে পঙ্কজের মাতৃভূমি হ'য়ে আছে এবং দিক আলো ক'রে লক্ষ লক্ষ লাল পদ্মও তাতে ফুটে! শোভার শেষ নেই আর!

কিন্তু রাজীব যখন শুন্‌লে যে নিত্য প্রাতে ঐ পুকুরে সাত ডুব দিয়ে স্ত্রীপুরুষে সাতটি ক'রে পদ্ম দিয়ে মার পুজো কর্‌লে মনস্কামনা পূর্ণ হবেই হবে—তখন তার আজন্মের বিজ্ঞানের বিদ্যে সাঁজারুর মত বিদ্রোহের কাঁটা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো! কি সর্ব্বনাশ! এ তো মৃত্যুকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেওয়া।

হরিমতি কিন্তু বিজ্ঞানের তুচ্ছ কথা কানে তুলতে চায় না। বলে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু বিধাতার হাতে; যদি তাতে মানুষের কোন হাত থাক্‌তো ডাক্তারেরা মরে কেন?

বিধাতার কথা রাজীব কেবল মুখেই মান্‌তো, মনে মনে সে জান্‌তো যে, মানুষের বুদ্ধিটার মধ্যে দিয়ে বিধাতা সব চেয়ে বেশী কাজ করেন। যেমন লোহার মধ্যে দিয়েই বিদ্যুৎ সব চেয়ে ভাল চলে। তবুও হরিমতির সঙ্গে সে পেরে উঠ্‌বে না জেনে, নতি স্বীকার ক'রে সাত ডুব দিয়ে, মা-

পায়ের কাছে রক্ত কমল নিবেদন করলে। পূজার মন্ত্র তার কানেও গেল না।

সন্ধ্যে বেলায় কেমন যেন একটু গা শির্ শির্ করে, রাজীব বলে ওগো, লক্ষণ ভাল নয়, আমায় দুটো কুইনেনের গুলি দাও, তুমি খাও, আর এ বেচারী বুদ্ধুকে দাও ; ওর জন্যে মশারি কি এনেছো ?

কুইনেনের শিশি এগিয়ে দিয়ে হরিমতি বলে, অত ভয় আমার নেই ; আর কবে কোন চাকর, মশারি খাটিয়ে শুয়েছিল ? কথা শুনলে রাগে সর্ব্বোশরীর জ্বালা করে।

রাজীব আর কথা কয় না।

৩

সাতদিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। হরিমতি বলে, দেখ্‌লে, দেখ্‌লে তো ? তোমার ওসব বাজে ভয়···

রাজীব মুখে বলে হুঁ ; মন তার বলে, দেখার অনেক বাকি, দশ দিন কাটুক আগে।

গরুর গাড়িতে চ'ড়ে রওনা হবার আগেই বুদ্ধুর গোঁ-গোঁ ক'রে জ্বর এলো। কি কাঁপুনি !—সেই সঙ্গে অন্যায় বমি !

যাওয়া তো বন্ধ কর্‌তেই হলো। রাজীব নির্ব্বাক। কেবল হরিমতি, জ্বরের কারণটা নিশ্চয় ক'রে জেনে বড় বড় বকুনি ঝাড়তে লাগ্‌লো। সেই দিনই জানি, যে হত-ভাগাটা একটা বিপদ ডেকে আন্‌বে···গোঁড়া নেবু কি মানুষে খায় ? দেখ না, গরুতে পর্য্যন্ত মুখ দিতে চায় না !

বুদ্ধু কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বলে, আমি তো খাইনি মা, বামুন মাজার লেগে আন্‌ছিনু···

তুমি আবার খাওনি, ওরে আমার সাধু !

৪

গোঁড়া নেবুর সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে জ্বর, পরের দিন সকালে হরিমতিকে দুর্জ্জয় প্রতাপে আক্রমণ করলে। বেলা বারোটা না বাজ্‌তেই তার চৈতন্য লোপ হ'য়ে গেল।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর শেষ-বেলায় সেবায়েৎ ঠাকুর এক ডাক্তার ডেকে আন্‌লে। অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে নেবে ডাক্তার হরিমতির মাথায় ষ্টেথোস্কোপ্ বসিয়ে বল্লে, আসল মাল্-ওয়ারি জ্বর, কুলিয়াইন দিতে হবে।

ডাক্তারের রোগ-পরীক্ষা আর চিকিৎসার ব্যবস্থা শুনে রাজীবের আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ অবস্থায়, গরুর গাড়ির কথা উঠ্‌তেই পারে না। পাল্কী ?

সেবায়েৎ ঠাকুর হাসে, একি কোল্‌কাতা ?···অর্থাৎ, এখেনে মানুষের অসুখ হ'লেই মৃত্যু···তবে সবই মা-ষষ্ঠীর ইচ্ছে !

বুদ্ধুর জ্বর ছেড়েছিল। হরিমতির জ্বর ১০৯'এ উঠে তার মাথার ঘি গলিয়ে দিয়ে দেহকে হিম ক'রে দিয়ে গেল। সে খোকার স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে—কোজাগর পূর্ণিমার আলোর উৎসবের মধ্যে লাল পদ্মের মত চোখ দুটি বন্ধ ক'রে, সকল বাসনা-কামনার অতীত হ'য়ে গেল।

রাজীবের চোখে পূর্ণিমার আলো অন্ধকার ঠেক্‌লো। পৃথিবীর কঠিন মাটিও যেন পায়ের তলায় বাষ্প হ'য়ে গেল।

পরিচ্ছেদ—তিন

১

রাজীব আবার মা-বাপের কোলে ফিরে এলো ; কিন্তু প্রাণের মধ্যে হরিমতির শূন্যতা আর কিছুতেই ভ'রে উঠে না। হরিমতির তাড়না ছিল, তেজ ছিল, প্রখরতাও ছিল, কিন্তু এ সবকে স্নিগ্ধ মধুর ক'রে তোলার জন্যে যে একখানি তাজা প্রাণ নিয়ত চঞ্চল হ'য়ে ফিরতো—সে চ'লে গেলেও তাকে কি ভোলা যায় ?

মাথা নেড়ে রাজীব বলে, যায় না, যায় না ; দু চোখ জলে ভ'রে এলে, পৃথিবীকে আব্‌ছায়ার মধ্যে দেখতেই যেন সব চেয়ে তার ভাল লাগে !

দুঃখের শীতের কোয়াসা এমনি ক'রেই কাটে ; কিন্তু চিরদিন কিছু শীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকে না। রাজীব সে কথা বোঝে ; তাই আবার নড়ে-চড়ে ; বুদ্ধ

তার পেছনে পেছনে যা কিছু ক'রে ফেরে তাতে অতীত দিনের আবেশ থাকে, ধ্বনিত সুরের রেশ তবুও যেন পাওয়া যায় ; কিন্তু বাকি সবই বেসুরো বেতালা !

২

দেয়ালে হরিমতির ছবিখানি ঝুলে আছে। যেমনি সে ভালবাসতো তেমনি ক'রে পটোকে ফরমাশ ক'রে ক'রে রাজীব তার গায়ে গায়ে জড়োয়া গয়না বসিয়ে দিয়েছে ; তার সেই সাঁচ্চা কাজের নীল শাড়িখানার মধ্যে দেহখানি সোনার রংএর শিখার মত উজ্জল ; মুখে সেই সব পেয়েও কিছু পাইনির অতৃপ্তি ; চোখে সেই খোকা আসার স্বপ্ন দেখার জড়িমার ঘোর !

রাজীব বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখে আর ভাবে। মনে মনে বলে, ও স্বপ্ন তোমার আর মিটল না…অত ভক্তি, অত নিষ্ঠা, অত আকাঙ্ক্ষা…সবই কি মিছে হ'য়ে গেল ?

ছবি হাসতে জানে নাকি ? উঠে ব'সে রাজীব দেখে—নাঃ ওটা আলোর ভ্রান্তি !

৩

মা এসে ঘরে ঢুকে বসলেন। বাবা পাইচারি করছেন, দালানে। রাজীব যেন মনে মনে জানে, সে-কিসের চক্রান্ত চলেছে এ বুড়ো বুড়ীর মধ্যে ! তাঁরা ঐ উদাস চোখের স্বপ্নকে বৃথা হ'তে দেবেন না।

বাবা, রাজীব !

কি মা ?

বংশে যে বাতি দেবার কেউ রইল না !

ছেলে উত্তরে কি বলে শোনার জন্য কর্ত্তা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন নিস্পন্দ প্রতীক্ষায়।

রাজীব মৌন।

* * *

রাজীব দালানে অধীর হ'য়ে এদিক ওদিক করছে—পাশের ঘরে প্রসূতির কাতর ধ্বনি !

মা ছুটে এসে বল্লেন, কর্ত্তা কোথায় ? কোথায় গেলেন তিনি ? বাবা, একটি সোনার চাঁদ হয়েছে।

রাজীব কপালের ঘাম মুছে মাথা তুলতেই হরিমতির ছবির ওপর চোখ পড়্লো—এ কি !

সেদিন আর ভুল হয়নি, রাজীব স্পষ্ট দেখতে পেলে প্রসন্ন হাসিতে সে মুখ পূর্ণ।

যদি স্বপ্ন সত্য হয় তো মুখে অতৃপ্তির দাগ তো মুছে যাবেই ; চোখের ভাব-জড়িমা কেটে গিয়ে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌বেই !

ছবি তো আর বেশী কিছু বলতে পারে না !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রিটিশ

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়
কর্ত্তৃক প্রেরিত

সাতটি দেশের সাতটি সুন্দর মুখ

রাশিয়ান্

আমেরিকান্

স্প্যানিশ্

ইটালিয়ান্

ফ্রেঞ্চ

জার্ম্মান

ফ্রান্সের নব মনোভাব *

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-য়্যাট্-ল

আমি সম্প্রতি New Era নামক মাদ্রাজ হ'তে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধের নাম Future of Civilization. বলা বাহুল্য যে এ নাম আমার দত্ত নয়—এ নাম দিয়েছেন New Erar সম্পাদক। ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার পেশা নয়। তবে সম্পাদক মহাশয় যদি উক্ত প্রবন্ধের নাম দিতেন Future of over-Civilization, এবং তার পরে একটি প্রমাণসই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসিয়ে দিতেন, তা হ'লে আমার আপত্তির বিশেষ কোন কারণ থাক্‌ত না। বাংলায় একটা কথা আছে—"ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা লো সই"—ইউরোপ সম্বন্ধে আমার মনোভাব কতকটা ঐ গোছের।

উক্ত প্রবন্ধে আর পাঁচ কথার মধ্যে আমি এই কথা বলি যে,

We Indians to-day hanker after a To-morrow which would be a facsimile copy of Europe's Today....Situated as we are we cannot conceive of any other future. In the result, we fail to realise that Europe's Today will be its Yesterday by the time we reach the desired goal.

আমাদের আদর্শ আগামী কল্য ইউরোপের গতকল্য হবে। কথাটা কতকটা বীরবলী গোছের শোনায়। অর্থাৎ ওর ভিতর যা আছে তার নাম শ্লেষ, আর নেই কোন সত্য। আমি কিন্তু কথাটা রসিকতাচ্ছলে বলিনি, কেননা আমার ধারণা যে ইউরোপীয় সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তারিখে থেমে যায় নি। এখনও তা চলচে এবং পুরোদমে চলছে। যে জাতির অন্তরে জীবনীশক্তি আছে সে জাত যুগে যুগে জীবনে ও মনে নব কলেবর ধারণ করবে। এক মৃত ছাড়া কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আর ইউরোপ যে জীবন্ত তার প্রমাণ আমরা হাড়েমাসে পাচ্ছি? ইউরোপের মনের কাঁটা যে টলমল করছে এর স্পষ্ট পরিচয় পাই আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে। কি উপন্যাস কি কবিতা সকলেরই ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন সুর কানে পড়ে, আর সে সুর হচ্ছে সন্দেহের সুর, উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের প্রতি অসন্তোষ ও অবজ্ঞার সুর। যেন ফ্রান্সের লোক এবিষয়ে সচেতন হয়েছে যে নব সভ্যতার সোজা ও বাঁধা পথে তেড়ে চল্‌তে গিয়ে, তারা মনুষ্যত্বের কোন কোন অংশ হারিয়ে বসেছে। এবং তার ফলে সভ্য মানবের চিত্ত দীন ও চরিত্রহীন হ'য়ে পড়েছে। ইউরোপে যে ধনরত্ন প্রভূত পরিমাণে আছে তা আমরা সকলেই জানি। বাঙলায় একটা মনবাদ আছে যে "নিজের বুদ্ধি ও পরের ধন পৃথিবীতে কেউ কম দেখে না"। সম্ভবতঃ সেই কারণে আমরা ইউরোপের ঐশ্বর্য্য একটু বড় ক'রে দেখি। এবং সে ঐশ্বর্য্যলাভের লোভই হচ্ছে আমাদের নব ideality। সে যাই হোক ইউরোপীয়েরা বলে যে তাদের সুখও নেই শান্তিও নেই। এই কারণে তারা যে বর্ত্তমানে শান্তির জন্য লালায়িত তা ত সকলেই জানেন। এখন মনের সুখ কি ক'রে তারা ফিরে পাবে তার সন্ধানও অনেকে করছে। অনেকের ধারণা যে সব সত্য তারা হারিয়ে ফেলেছে তার পুনরুদ্ধার করতে পারলেই তারা আবার জীবনে ও মনে সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবে। যে মনোভাবকে মানুষে একবার মিথ্যে ব'লে পরিহার করেছে; সেই মনোভাবকে আবার সার সত্য ব'লে অঙ্গীকার করার নাম বোধ হয় reaction। কিন্তু ও নামে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই কারণ re-actionও একরকম action, অপর পক্ষে in-actionই মানবজাতির নাশের মূল; সে মানসিক in-actionএর নাম ইভলিউশানই দেও আর progressই দেও তাতে কিছু আসে যায় না। মানব-

* ভারত-রোমক সমিতির অধিবেশনে পঠিত

সমাজ রেলের গাড়ী নয় যে একরোখে একটানা গিয়ে সভ্যতার terminusয়ে পৌঁছবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে জাতির প্রাণ আছে তারা এগুতেও জানে পিছুতেও জানে। ইউরোপের মন এখন কোন্ স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে চলতে চেষ্টা কর্‌ছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। আমি আজকে বিশেষ ক'রে নব ফরাসী-মনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। কারণ এ সমিতির সকলেই ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। অতএব যদি বলি যে ফরাসী সাহিত্যের প্রধান গুণ হচ্ছে তার স্পষ্টভাষিতা তাহ'লে কেউ তার প্রতিবাদ করবেন না। ফরাসী জাতির মনের ভাবও স্পষ্ট তাদের মুখের কথাও স্পষ্ট এবং মনোরাজ্যে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক। সুতরাং ও জাতির মনের ও মতের যখন যা পরিবর্ত্তন হয় তখন তা তাদের সাহিত্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ফরাসী জাতি আধ আধ ভাষী নয়। এর ফলে, ইউরোপে যখন যে ভাব জন্ম গ্রহণ করে তা স্পষ্টরূপ লাভ করে ফরাসী সাহিত্যে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অতি স্বল্প পরিচয়ের ফলে আমার পক্ষে ফরাসী জাতির নব মনোভাবের পরিচয় দিতে যাওয়া এক হিসেবে ঔদ্ধত্য মাত্র। পৃথিবীর কোন দেশেই সকল লোকের দেহের চেহারাও এক নয়, মনের চেহারাও এক নয়। ফলে সকলের মন ঠিক দিলেও তার ফলে এক মত বেরয় না। মনোজগতে তিল কুড়িয়ে তাল করা যায় না। সত্যকথা বলতে গেলে অধিকাংশ লোকের নিজস্ব মত ব'লে কোনও পদার্থ নেই। যে সকল মতামত পরের কাছ থেকে প'ড়ে পাওয়া তাই তাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করবার জন্য যথেষ্ট। বেশির ভাগ লোক যদি মেষজাতীয় না হ'ত ত সমাজ ব'লে কোন জিনিষ জন্মাত না। আর যে স্বল্পসংখ্যক লোকের নিজস্ব মতামত আছে তাদের মতামত বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। কারণ অতি বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরাও নিজের চরিত্র ও নৈসর্গিক প্রবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব মত গ'ড়ে তোলেন। অবশ্য পৃথিবীতে দু-শ্রেণীর লোক আছে যারা সকলকেই নিজ মতাবলম্বী করা তাঁদের কর্ত্তব্য মনে করেন। একদল হচ্ছেন ধর্ম্মাচার্য্য আর এক দল হচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য্য। কারণ উভয়েরি বিশ্বাস যে জগতের মূল সত্য তাঁদের করায়ত্ত। এবং তাঁদের কথা বেদবাক্য ব'লে মানলেই মানবজাতি উদ্ধার হ'য়ে যাবে। ইউরোপের অধিবাসীরা সেকালে এই ধর্ম্ম যাজকদের বশীভূত ছিল এবং একালে এই বিজ্ঞানাচার্য্যদের বশীভূত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর লোকই সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করে। এবং যেহেতু বিজ্ঞান একালে সর্ব্বশক্তিমান সে কারণ বৈজ্ঞানিক-দেরও সর্ব্বজ্ঞ ব'লে মানা অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে যে স্বল্পসংখ্যক লোক মনোজগতে স্বাধীনতা চায় তারাই কলমের জোরে জাতির মনের মোড় ফেরায়। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যিকদের মতামত উপেক্ষণীয় নয়। এই শ্রেণীর লোকের মনোভাবকে আমি ফ্রান্সের নব মনোভাব আখ্যা দিয়েছি। এই স্বল্পসংখ্যক লোকদের যে মনোভাবের পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায় তার থেকে এ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ফরাসী জাতির ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

সম্প্রতি La Renaissance Religieuse নামক একখানি ফরাসী পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছে। সেই পুস্তকের সাহায্যেই এই নূতন মনোভাবটি যে কি তার সন্ধান নেবার চেষ্টা করব। এই বইখানিতে প্রায় বিশজন লেখকের বিশটি প্রবন্ধ আছে। এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই দার্শনিক হিসেবে, নভেলিষ্ট হিসেবে, প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতনামা লেখক। এঁদের অবশ্য সকলের ধর্ম্মমত এক নয় কেন না এঁদের মধ্যে কেউ Catholic, কেউ Protestant, কেউ ইহুদি কেউ আবার Orientalist। কিন্তু এক বিষয়ে সকলের মনের গতি একই দিকে। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিকে সকলেই পিঠ ফিরিয়েছেন। Laicismeএর বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। Laicismeএর ভাল বাঙলা কি? ঐহিকতা? কিন্তু ঐহিকতার অর্থ কি? আমার বিশ্বাস সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বক্ষ্যমান কথা কটির ভিতর তার পুরো অর্থ পাওয়া যায়।

"যাঁহারা লৌকিক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া নীতি ও কাম শাস্ত্রানুসারে কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, পারলৌকিক অর্থ স্বীকার করেন না, সেই সকল

চার্ব্বাক মতানুবর্ত্তীরাই এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন এই নিমিত্তই চার্ব্বাক মতের 'লোকায়ত' এই অপর নামটি সার্থক হইয়াছে।"

বর্ত্তমান ইউরোপের লোকায়ত মত যে একই মত একটি ফরাসী লেখকের কথা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি laicesmeএর বক্ষ্যমান পরিচয় দিয়েছেন—

Laicesme হচ্ছে একটি বিশেষ systeme doctrinal et conceptual, de plus en plus repandue chez toutes les nations de l'ancien et du nouveau monde. আর এ নতুন doctrine কি? La religion de la science, la religion du progres, la mystique des droits du proletariat, la mystique de s'emancipation des peuples, et en general la religiont de l'humanite. বলা বাহুল্য এ সবই হচ্ছে নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের, politics এবং economics সাধনার মন্ত্রতন্ত্র।

ফ্রান্সের এই নব চিন্তার ধারার দুটি মুখ আছে। প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অনাস্থা, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের সত্যের প্রতি আস্থা। প্রথম মনোভাবটি negative, দ্বিতীয়টি positive, আজকে আমি এই negative মনোভাবেরই পরিচয় দেব; কারণ positive দিকটির পরিচয় দিতে হ'লে, intuition, mysticism প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করতে হয়। সে বিচার সকলের সহ্য হবে না; বিশেষতঃ অবৈজ্ঞানিক এবং অদার্শনিক বক্তার মুখে শুনলে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকেরা সকলে একমত নন্। একমত যে নন্ তাতেই প্রমাণ হয় যে বহু লোকে ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করছেন, এবং সে চিন্তা স্বাধীন চিন্তা, কোনও বাঁধাধরা মতের পুনরুল্লেখ মাত্র নয়। খ্যাতনামা নভেলিষ্ট Ramon Fernandez intuition শব্দের যে ব্যাখ্যা করছেন, Bergsonর intuitionর অর্থ অবশ্য তা নয়। Fernandezএর মতে intellect জানে আর intuition চেনে। এ দুয়ের প্রভেদ যে কি তা বুঝলেন? কিন্তু উভয়ের মিল এই জায়গায় যে উভয়ের মতেই intellect সত্যের জ্ঞানলাভের একমাত্র যন্ত্র নয়। অপর পক্ষে তাঁদের negative মনোভাবের যথেষ্ট মিল আছে। সকলেই একই কথা বলছেন অবশ্য বিভিন্ন ভাষায়। সুতরাং তাঁদের একজনের মতামত আপনাদের শোনাব—তার থেকেই আপনারা এই নূতন মনোভাবের সন্ধান পাবেন। আমি এমন একটি লেখকের কথা আপনাদের শোনাতে চাই যাঁর কথা অতি স্পষ্ট এবং যাঁর মনে কোনও কিন্তু কিন্তু নেই। এও হয় ও-ও হয় এমন কথা বলায় সম্ভবতঃ সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু সে কথার পিছনে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং যে লেখার অন্তর থেকে লেখক ফুটে না ওঠেন সে কথা লোকের মনে বসে না।

আমি এস্থানে যাঁর মতের পরিচয় দেব তাঁর নাম Pant Archambaut। ইনি কে আমি জানিনে, কিন্তু লেখা প'ড়ে মনে হয়, লেখক একজন অধ্যাপক; এবং সম্ভবতঃ দর্শন শাস্ত্রের। তিনি লিখেছেন, "গত দশ বিশ বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মমনোভাব scientisme নামক মনোভাবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, এবং অতি শীঘ্রই যে তা socilogisme নামক শাস্ত্রেরও মূল উচ্ছেদ করবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।" এই সব মত যে আসলে অমূলক তাই প্রমাণ করা আমাদের দেশের নব চিন্তার nagative অংশ।

"Scientisme একদম বাতিল হয়ে গিয়েছে। Scientisme বলতে কি বোঝায়? সেই মত, যে মতানুসারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই মানুষের একমাত্র জ্ঞান, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরা যে সকল postulates এবং hypothesesএর উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গ'ড়ে তুলেছেন, postulateএর hypothesisকে ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস করা, আর যে সত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা না যায় সে সত্যকে মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার করা, এবং যা বিজ্ঞানের বহির্ভূত তাকেই অলীক সাব্যস্ত করা, ফলে quality, personality, liberty, morality প্রভৃতি মানবধর্ম্মকে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা।

"সকলেই মানেন এইমত Renan, Taine এবং Berthelotএর প্রসঙ্গে গত শতাব্দীতে লোকের মনের উপর

কিরূপ একাধিপত্য লাভ করেছিল। কিন্তু উক্ত মতের গোড়া আলগা ক'রে দিয়েছে ধর্ম্মযাজকেরা নয় পরবর্ত্তী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা। একদিকে Bontroux এবং Bergsonএর ন্যায় দার্শনিক অপর পক্ষে, Poincare, Duhern, Milhand, Le Roy প্রভৃতি গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের জগৎপূজ্য গুরুরা।"

Archambautএর এ কথা যদি সত্য হয়---আর এ কথা যে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই অন্ততঃ তার মনে যিনি Bergsonএর Creative Evolution এবং Poincare'র Science et Hypothesis নামক গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে সুপরিচিত—তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে scientismeএর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে সমাজের মনকে মুক্তি দিয়েছে Science। Religion scienceএর সঙ্গে কিছুদিন লড়েছিল বটে কিন্তু সে যুদ্ধে religionএর সম্পূর্ণ হার হয়েছিল। খৃষ্টধর্ম্মের পুরোহিতের দলের পক্ষে বাইবেল হাতে বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই ইংরাজের বিরুদ্ধে তিতু মিয়ার লড়ায়ের মত হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু সম্প্রতি Einstein দেশের মধ্যে কান ঢুকিয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের সাজান তাস যেরকম ভেস্তে দিয়েছেন তাতে ক'রে সে তাসের সাহায্যে আর ধর্ম্মকে হেলায় বাজিমাৎ করা চলে না।

Bergson এবং Poincarè প্রভৃতির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতামত যে আমাদের মত অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক লোকের নিকট সত্য ব'লে গ্রাহ্য হয়েছে শুধু তাই নয়। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক মহলেও এঁদের মতামত বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি নষ্ট করেছে। এ বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করবার একমাত্র চাবি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় এ জ্ঞান বহু বৈজ্ঞানিকেরও হয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের Figaro নামক দৈনিক পত্রে Academio des science, এর সভ্যবৃন্দ এবিষয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা যায় যে এযুগের বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সকলেই একমত যে যে Science এবং religion উভয়েই সমান সত্য, কারণ সত্যে পৌছবার মনোজগতে দুটি পথ আছে একটি বিজ্ঞানের পথ অপরটি ধর্ম্মের পথ। এর একটির দোহাই দিয়ে অপরটি বন্ধ করবার চেষ্টাই আহম্মকি। আমাদের দেশের ভাষায় ব্যবহারিক সত্যের দোহাই দিয়ে অনুভব-নিবদ্ধ সত্যকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই scientismeএর বাধামুক্ত হ'য়ে ফরাসীমন আবার ধর্ম্মের পথে মনকে অগ্রসর করবার জন্য ব্রতী হয়েছে। এ ব্রত যার খুসি সেই উদ্যাপন করতে পারে। কেউ তাকে আর মুর্খ বলবে না। এর থেকে কেউ যেন মনে করেন না যে ফ্রান্সের লোক এখন পাঁচবক্ত নমাজ করতে ব'সে গিয়েছে। মানুষের প্রকৃতি এ নয় চিন্তার ধারার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনের ধারা বদলে যায়। বিশেষতঃ সেই সকল লোকের scietisme যাদেঁর মগ্ন চৈতন্যে থিতিয়ে বসেছে। পৃথিবীর আজকের দিনে যে political ও economic অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ক'রে ইউরোপের কোন জাতির পক্ষেই মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া একেবারে অসাধ্য। বিজ্ঞান ইউরোপের হাতে যে আলাদিনের প্রদীপ দিয়েছে সে প্রদীপ যে তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে ইউরোপের লোক এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। এবং সে প্রদীপের আলোয় তাদের জীবনের সুপথ দেখাবে। Scientisme বাতিল হ'তে পারে কিন্তু scienceএর উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। Science যেমন মানুষের অশেষ উপকার করেছে তেমনি তার ঐকান্তিক চর্চ্চার কতকগুলো কুফলও ফলেছে—যথা, সামাজিক জীবনে industrialism এর আতিশয্য ও ধনীর নব feudalism ইত্যাদি এবং মানসিক জীবনে ঐহিকতা। Science রক্ষা ক'রে তার এই সব কুফল কি ক'রে দূর করা যায়—এই হচ্ছে ইউরোপের একালের প্রধান সমস্যা। তাই কেউ সমাজকে ঢেলে সাজাতে চান, কেউ আবার মনকে মুক্তি দিতে চান। জীবন মনকে তৈরি করে কিম্বা মন জীবনকে তৈরী করে তা আমি বল্‌তে পারি নে। তবে একথা সত্য যে কোনও জাতির মন যখন বদলায় তখন তার সভ্যতা যে নবরূপ ধারণ করবে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই কারণেই আমি আপনাদের কাছে ফ্রান্সের নব মনোভাবের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছি। ইউরোপীয় সভ্যতা যে ঠিক কি রূপ ধারণ করবে বলা অসম্ভব, কিন্তু তার বর্ত্তমান রূপ যে থাকবে না এ কথা সাহস ক'রে বলা যায়।

যদি বলেন যে জনকতক লেখকের মন থেকে জাতীয় মনের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহ'লে আমার উত্তর একথা ঠিক। Conservatism মানুষের মজ্জাগত। Religious conservatism গত শতাব্দীতেও চ'লে যায় নি এবং scientific conservatives বর্ত্তমান ফ্রান্সে প্রবল পক্ষ নয়। কোনও ফরাসী Bertrand Russellএর ন্যায় die-hard লেখকের সাক্ষাৎ আমি এযুগের ফরাসী সাহিত্যে পাইনি।

আমরা যাকে নতুন মনোভাব বলি তা অবশ্য পুরোনো মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভিন্ন নয়। ক্ষণিক বিজ্ঞান যেমন মনের ধর্ম্ম নয়, ক্ষণিক জীবনও তেমনি প্রাণের ধর্ম্ম নয়। মানুষ দেহমনে ক্ষণে মরে ক্ষণে বাঁচে এমন কথা পাগলের প্রলাপ মাত্র। মানুষের দেহ যেমন যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করে অথচ চিরজীবন তার একটা পুরোনো-কাঠামো থেকে যায়, মানুষের মনও তেমনি যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করে কিন্তু তার অন্তরে একটা বিশিষ্ট কাঠামো থেকে যায়। আমরা বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে মানুষ মাত্রেই স্বভাবতই কতক বিষয়ে সমধর্ম্মী। এ বিশ্বাস যাঁর নেই, তাঁর মুখে "মানবজাতি" কথাটা নিরর্থক।

তেমনি আবার বিভিন্ন জাতির ও মনেরও অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে। সব জাতির মন একই পথে একই চালে চলে না। এ জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য প্রতি জাতির ইতিহাস দায়ী। মানুষের মন একেবারে সাদা কাগজ নয়, যে যার যা খুসি সেই তার উপরে নূতন রচনা করবে। ও কাগজের উপরে জাতির ইতিহাস অনেক কথা নিয়ে নিয়েছে যে একেবারে মুছে ফেলা যায় না। এই সত্যটি উপেক্ষা ক'রেই গত শতাব্দী ইউরোপের মনের নব রচনা করতে বসেছিল। ফলে আজকার ইউরোপের মনে যে, তার যুগ সঞ্চিত ধর্ম্মভাব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সে মনোভাব জাতির অন্তরে কখনই মরে নি সুধু ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছিল, এখন হয়ত আবার পুনর্জ্জীবিত হ'য়ে উঠছে। আমাদের দেশেও পুরাকালে নানারকম বাহ্যধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং সে ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় মেধাতিথি ব'লে গিয়েছেন যে—"বাহ্যধর্ম্মাস্তু সর্ব্বে মূর্খদুঃশীল-পুরুষ-প্রবর্ত্তিতাঃ কিয়ন্তং কালং লব্ধাবসরাস্বপি পুনরন্তধাস্যন্তে। নহি ব্যামোহো যুগ সহস্রানুবর্ত্তী ভবন্তি"। অবশ্য ইউরোপে আজকের দিনে কেউ মেধাতিথির মত কটু কথা বলবেন না। তাঁরা এই পর্য্যন্ত বলতে প্রস্তুত—নহি ব্যামোহো যুগসহস্রানুবর্ত্তী ভবন্তি। Scientismeএর ব্যামোহ কাটিয়ে উঠলে ফরাসী-মন, ফরাসী-মনই থাকবে জার্ম্মান-মন হবে না।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বাহ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের হাতে বৈদিক-ধর্ম্ম যেমন বৈদান্তিক ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল আমার বিশ্বাস ইউরোপের এই নব-ধার্ম্মিকদের হাতে খৃষ্টান ধর্ম্মও নব-রূপে ধারণ করবে। বৈদান্তিক দর্শনের বিশেষত্ব এই যে তার অন্তরে গোটা বৌদ্ধ দর্শন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস ফ্রান্সের এই নূতন ধর্ম্ম-মনোভাব, scienceএর সকল সত্যই অঙ্গীকার করবে। এ অনুমানের কারণ কি তা বলছি।

Jacques Chevalier নামক জনৈক যুগপৎ দার্শনিক এবং নিষ্ঠাবান Catholic বলেছেন যে St. Thomasএর দর্শনে আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তার প্রথম কারণ তিনি scienceএর কিছুই জানতেন না, দ্বিতীয়তঃ গত ছ' শ' বৎসরের ভিতর ইউরোপে যে দার্শনিক চিন্তার স্রোত ব'য়ে গিয়েছে তা উপেক্ষা করা শুধু মুর্খতা নয় অসম্ভব। ইউরোপের এই নিকট অতীত আমাদের মনের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে যে সে পরিবর্ত্তন অস্বীকার ক'রে আমরা কোন সত্যেকই সাক্ষাৎ লাভ করব না। St. Thomas যদি আজকের দিনে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং বর্ত্তমানের সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর নূতন দর্শন গ'ড়ে তুলতেন তাহ'লেই তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও তার মীমাংসা আমাদের কাছে গ্রাহ্য হ'ত। আমাদের নূতন ধর্ম্মভাব কোনও অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয়ে প্রাণ ধারণ করতে পারবে না। ভগবানে বিশ্বাস তখনই আমাদের অটল হবে—যখন আমরা লজিকের ভিত্তির উপর সে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। এ হচ্ছে খাঁটি ফরাসী মনের কথা, কারণ ফরাসীরা হচ্ছে মূলতঃ নৈয়ায়িকের জাত। বাণভট্ট আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের ঠাট্টা ক'রে বলেছেন যে তারা সব ঈশ্বর-

প্রামাণিক। সুতরাং ফরাসী জাতের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত হ'লে তারাও যে ঈশ্বর-প্রমাণিক হ'য়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে বৈদান্তিকরা এ কথা শুনে হেসে বল্‌বে বহুত আচ্ছা। তোমরাও ফরাসীদের দলের লোক। তবে কথা হচ্ছে এই যে—ঈশ্বর প্রমাণের বিষয় নন্। যা স্বতসিদ্ধ তার আবার প্রমাণ কি? আর বৈদান্তিক সকল দেশেই এসেছে, কেননা বেদান্ত একটা শাস্ত্র নয়, ও একরকম বিদ্যা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে প্রতি জাতির মনের একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক আছে। ফরাসী জাতির মনকে Descartes যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথেই ফরাসীমন অদ্যাবধি চ'লে আসছে এবং সে পথেই সহজে চলতে পারে। সে পথ হচ্ছে আলোর পথ। ছায়ার পথে ফরাসীমন যুক্তি ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না। এই কারণেই ফরাসী পদ্য-সাহিত্য এত দরিদ্র এবং ফরাসী গদ্য-সাহিত্য এত ঐশ্বর্য্যবান। আমরা যাকে scientific philosophy বলি তার প্রবর্ত্তক Descartes, Newton নন্। Descartes বলেছিলেন "Give me matter and motion and I will build the universe." যাকে scientific philosophy বলে তা এই বিশ্ব গ'ড়ে তোলবার নব-দর্শন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে এই নূতন দর্শন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে গ'ড়ে উঠেছিল সেও ফরাসীদেরই হাতে। Scientismeএর খণ্ডন যে ফ্রান্সের গ্রাহ্য হয়েছে তার কারণ নূতন Science এই তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অপর পক্ষে এক দলের লেখক যে St. Thomasএর দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে তার কারণ St. Thomas আর কিছু না হন চমৎকার logician। তিনি religionকে scienceএ পরিণত করেছিলেন।

কি করে religion ও science উভয়ই রক্ষা করা যায়, এই হচ্ছে বর্ত্তমান ফরাসী মনের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে অনেকে Pascalএর মীমাংসার উপরই নির্ভর করছেন। Pascal বলেছেন যে কেবলমাত্র reason-এর উপর নির্ভর করে সকল সত্যের সে সাক্ষাৎ পায় না; অপর পক্ষে যে কেবলমাত্র unreason এর উপর নির্ভর করে সে সকল মিথ্যারই সাক্ষাৎলাভ করে।

ফলে ফরাসীমন unreasonকে বরণ করতে প্রস্তুত নয়, reasonএরনাগালের বাইরেও যে সত্য আছে সেই সত্যেরই তারা সন্ধান করছে।

Scienceএর কোনও ভিত্তি নেই, বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গণিতশাস্ত্রীদের মনগড়া একটা কল্পপুরী, এ কথায় ফরাসীমন সায় দেয় না। Descartes, Geometryকে Algebraয় রূপান্তরিত করেছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর এ কীর্ত্তি 'অপূর্ব্ব' সুতরাং যে গণিৎ Descartes গড়েছেন সে গণিতের সাহায্যে Science যে ভানুমতীর বাজি দেখিয়েছে তার অন্তরে যে কোনও reality নেই এ কথা ফ্রান্সের বিশ্বস্ত Catholicও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। তাই Archambault বলেছেন—

Scienceএর মূলে যে কতকগুলি postulate মাত্র আছে এ কথা শুনে অনেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে scienceএ একটা ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি মাত্র। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। Meyerson দেখিয়ে দিয়েছেন যে Science-এর অন্তরেও ধ্রুবসত্য আছে। Meyerson হচ্ছেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তাঁর দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, থাকলেও তাঁর কথা বোঝা আমার সাধ্যের অতীত। তবে তাঁর শিষ্য Andre Metz নাকি এক কথায় Meyersonএর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন। Metz লিখেছেন Meyersonএর সিদ্ধান্তের সঙ্গে Pascalএর সিদ্ধান্তের কোনও প্রভেদ নেই। মানুষ সৃষ্টির গোড়ার কথাও জানে না শেষ কথাও জানে না জানে শুধু ইতিমধ্যের কথা। এ সব কি গীতার একটি শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নয়?

"অব্যক্তাদীনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব এব কা পরিদেবনা"

মানবমনের যে শক্তি এ ব্যক্তমধ্যের জ্ঞান লাভ করে সেই শক্তিই বৈজ্ঞানিক মনের একমাত্র শক্তি, এবং যে শক্তির সাহায্যে অব্যক্তের সন্ধান পায় সেই শক্তির উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব science religionএর হন্তারক নয়।

বর্ত্তমান ফরাসী মনীষীদের এ সব কথা শুনে মনে হয় যে—তাঁদের নূতন মনোভাব আসলে তাঁদের পূর্ব্ব-

মনোভাব। অর্থাৎ Descartes আশ্রয় ছাড়লে তাঁরা Pascalএর ক্রোড়ে আশ্রয় নেন্। আর Descartes এবং Pascal মনোজগতে একই জাতের লোক, এ দুয়ের কেউ Unreasonকে আসন দিতে প্রস্তুত নন্।

আমি এ প্রবন্ধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতামতের উল্লেখ করিতে বাধ্য হয়েছি। আমি যে স্বেচ্ছায় ও গুরুতর বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি তার কারণ আমি জানি যে সে আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। তবে যে দর্শন বিজ্ঞানের একেবারে পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি, তার কারণ ফ্রান্সের মন গত তিনশত বৎসরের দর্শন বিজ্ঞানই গ'ড়ে তুলেছে। ফ্রান্সের নতুন মনোভাব এই বিজ্ঞানশাসিত মন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোনও সত্যের সন্ধান করা ফরাসীমনের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে মনে যদি স্থান দিতে হয় ত তা করতে হবে বিজ্ঞানের অবিরোধে—এই হচ্ছে ফরাসীমনের আসল কথা। অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হ'লে বিজ্ঞানের সিঁড়ি ভাঙতে হবে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে where ignorance is bliss it is folly to be wise. আমাদের দেশে বহু ধার্ম্মিক লোক এ কথায় সায় দেবেন কিন্তু আমার বিশ্বাস ফরাসীদেশে যাঁরা মনের কারবার করেন তাঁরা এ মতকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করবেন না।

আর এক কথা। একটি বিশেষ মনোভাবকে আমি এ প্রবন্ধে বরাবর religious বলছি। কিন্তু যে পুস্তক অবলম্বনে আমি এ প্রবন্ধ রচনা করছি সে পুস্তকে কোন কোন লোক বলেছেন যে যদি religious শব্দের পরিবর্ত্তে spiritual শব্দ ব্যবহার করা যায় তা'হ'লেই বর্ত্তমান মনোভাবের স্বরূপ ঠিক বোঝা যায়। যথার্থ religious লোক যে spiritual নন্ এমন কথা কেউ বলেন না। কিন্তু বহুলোক spirituual হ'য়েও, religious না হ'তে পারে। কারণ religious শব্দের সকল দেশেই একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ আছে এবং সে অর্থে religious হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে "আমি বিশ্বাস করি" "আর আমি বিশ্বাস করিনে" এই দুই উক্তিই সমান মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। কারণ এ বিশ্বাস, অবিশ্বাস দুইটি spiritual স্বাধীনতার পরিচায়ক। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে মনকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিয়ে রাখা নাকি কাপুরুষের ধর্ম্ম। ফ্রান্সের এই নূতন মনোভাবের ফরাসীজীবনের উপর কোনও প্রভাব হয়েছে কি না জানিনে কিন্তু আধুনিক ফরাসী-সাহিত্য এ প্রভাবমুক্ত নয়।

যদি চল্লিশ বৎসর পিছু হ'টে যাওয়া যায় ত দেখা যাবে যে সে কালের সাহিত্যের উপর Scientismeএর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। Zola প্রমুখ naturalist লেখকেরা religion of scienceএর গোঁড়া ভক্ত; আর Anatole France হচ্ছেন যে scientif scepticismএর পূর্ণ অবতার।

কিন্তু সে দেশের হাল্ সাহিত্যের ভিতরে একটি নূতন সুর কানে পড়ে। এ সুরের নাম spiritiual ছাড়া আর কি দেব জানিনে। এ সুর অবশ্য অতি ক্ষীণ; তবুও কান এড়িয়ে যায় না। ফ্রান্সে যাঁদের neo-romantics বলে তাঁদের রচিত সাহিত্যে এই spiritual সুর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। কিন্তু Proustএর মত লেখক, যাঁর লেখায় কোন রকম ফিলজফির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁর লেখা পড়্তে আমার মনে হয় যে তাঁর লেখার ভিতর থেকে Bergson উঁকি ঝুঁকি মারছে, এমন কি তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও। আর তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নভেলে যে কটি অপূর্ব্ব সুন্দর কথা বলেছেন তা যে intuition-লব্ধ সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। Intuition মানলেই mysticism মান্‌তে হয়। Mysticism কথার বাঙলা প্রতিশব্দ আমি জানিনে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন যে "তুমি অতিবাদী হও আর লোকে যদি বলে তুমি অতিবাদী তার উত্তরে বলো যে হাঁ আমি অতিবাদী।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) এই "অতি"বস্তুটির সাক্ষাৎ science তার গণ্ডীর মধ্যে পায় না, অতএব তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে science ন্যায়ত বাধ্য। আমার মনে হয় যে Bergson এই অতিবাদকে মুক্তি দিয়েছেন। কথাটা খুব স্পষ্ট হ'ল না কেননা "অতিকে" পূর্ণ আলোকে আনা যায় না অথচ অনেকের মন তার সাক্ষাৎ পায়। ফ্রান্সের নব মনোভাবের অন্তরে আছে মনোজগতে নূতন মুক্তির আনন্দ। অবশ্য এর উল্টো

মনোভাবও সে দেশের সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশি আছে কিন্তু সে চলতি মনোভাব—তার অন্তরে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। ইউরোপের মনের গতি নূতন দিকে যাচ্ছে আমার এ অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহ'লে ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতার To-morrow যে ইউরোপীয় সভ্যতার Yesterday হ'য়ে যাবে এ আশঙ্কা সহজেই মনে উদয় হয়। না ভেবে চিন্তে ইউরোপীয় সভ্যতার পিছনে ছুটলে আমাদের হয়ত যুগে যুগে মনকে ডিগবাজি খাওয়াতে হবে। আর মনের ঘুঁটি বার বার কাচলে সভ্যতার খেলায় বেশি এগোনো যায় না।

আমি বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের নবভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সত্য কথা এই যে সমগ্র ইউরোপে এ চিন্তার ধারা এখন উজান ভাবে বইছে। Whitehead Eddington, Haldane, Macdougal প্রভৃতি বিলাতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা একই সুর ভাঁজছেন কেউ মিঠে সুরে কেউ আবার চড়া আওয়াজে। বৈজ্ঞানিক সতর্কতার হাত থেকে প্রায় সকলেই মুক্তিলাভ করেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এইরকম পাঁচজন বৈজ্ঞানিক মিলে ইংলণ্ডের লোকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বদ্ধ মনের দুয়োর খুলে দিচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে আমি যে নব-মনোভাবের কথা বলছি সে গতযুদ্ধের shell-shock ধাক্কায় ইউরোপের মনের সাময়িক বিকার মাত্র, তাহ'লে তাঁর কথার কোনও প্রতিবাদ করব না। কারণ যাঁদের ধারণা যে পৃথিবীর সকল প্রকার জীব জন্তুর মধ্যে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং মানব সভ্যতার মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব ঐসব সভ্যতা অনুসরণ করা আমাদের চরম আদর্শ; তাঁদের এবম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানের উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যাতীত। আর তা ছাড়া বিলেতি সভ্যতার মহোৎসবের চিরকাল দর্শক হ'য়ে থাকা আমাদের কারও মনোমত নয়। তবে ও আদর্শ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ক'রে আমাদের মনের চেহারা আমরা সম্পূর্ণ বদলে দেখতে পারব কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস গত এক'শ' বৎসরের শিক্ষা দীক্ষার ফলে, আমাদের দেহেরও রঙ ফিরে যায়নি, মনেরও নয়, যা বদলে গিয়েছে সে হচ্ছে আমাদের বাক্য। আমরা সবাই আজ ইউরোপীয় চলতি বুলি বলতে শিখেছি। আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপত্র আমাদের সামাজিক জীবন ও আমাদের মানসিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। এর কারণ ইউরোপীয় ভাবের স্পর্শে আমাদের মন গরম হয় বটে কিন্তু তাতে বলক ওঠে না।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে—La-Renaissance Religieuse নামক পুস্তকের লেখকদের মধ্যে দুই একজন Orientalist আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, Paul-Masson-Oursel। এখন তাঁর দুচারটি মন্তব্য উল্লেখ ক'রে আমি এ প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর মতে ইউরোপের সভ্যতা এসিয়ার স্কন্ধে ভর ক'রে কোনও সুফলপ্রসূ হয় নি। "কারণ আমরা যে সে দেশে শুধু রেলের গাড়ী ও টেলিফোন রপ্তানি করেছি তাই নয় কতকগুলি মারাত্মক ismও রপ্তানি করেছি যথা—Capitalism, industrialism, alcoholisme, nationalisme এবং সেই সঙ্গে আমাদের spiritiual দৈন্য এবং moral বিশৃঙ্খলতা"—এর ফলে নাকি এসিয়াবাসীর মনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিই প্রবল হয়েছে। Oursel আরও বলেন যে "আমরা Orientalistরা এসিয়ার অতীতকে উদ্ধার করেছি এবং সে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান এসিয়াবাসীদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছি; কিন্তু সে অতীতের প্রতি আমাদের যে কোনরূপ ভক্তি নেই সে সত্য এসিয়াবাসীরা ধ'রে ফেলেছে।" ফলে এ বিষয়ে তারা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা একটা Asiatic problemএর সৃষ্টি করেছে মাত্র। Oursel বলেন, ইউরোপ এসিয়াতে তার science পাঠাক, কিন্তু তার মনোভাবের যেন আর রপ্তানি না করে। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ'তে পারে সে বিষয়ে তিনি নীরব। তিনি আশা করেন যে relativity যখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে তখন জীবনেও স্বীকৃত হবে। সকল সভ্যতাই তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা রক্ষা করবে, কেউ অপর সভ্যতার মনের অধীন হবে না। অর্থাৎ মনোজগতেও ঐ Einsteinই আমাদের আক্কেল দেবে। আমাদের সাহেব হওয়াটাও Orientalistও বিপজ্জনক মনে করেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কাম্য

—গল্প— —শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল

অসাধারণ এতটুকু নয়।

অর্থাৎ সামান্য বেতনের একটি কেরাণীর ঔরসে, রুগ্ন বিকল এক কৃশাঙ্গিনীর গর্ভে, নিকৃষ্ট জীর্ণ একখানি ঘরের অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারে ;

এবং দারিদ্র্যের বীভৎস নগ্নতার মধ্যে,—নিরানব্বই জন বাঙালী যেমন ক'রে জন্মায় !

না পেল আদর, না যত্ন। কেঁদে-ককিয়ে এক পল্‌তে দুধ, দিনের পর দিন সর্দ্দি-কাশিতে ভুগে হয়ত একটি জামা, নিতান্ত সঙ্গীন রোগে হয়ত বা এক পান্ ওষুধ। অযথা প্রহার এবং অকারণ গালাগাল আশ্রয় ক'রে, আত্মীয় স্বজনের নির্ম্মম অনাদর এবং সকরুণ উপেক্ষা পাথেয় নিয়ে নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া ভাবেই বড় হ'ল।

লেখাপড়া ?—সে এক তামাসার ইতিহাস। দুবেলা ঘরে যেন ডাকাত পড়াপড়ি। পাড়ার লোক জ'মে যেত। জোর ক'রে পড়া মুখস্ত করাবার নামে গোঁয়ার কেরাণী বাপের সে কি প্রচণ্ড তাড়না ! আপিসে লোকটার নিত্য লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়া সেই পাঁচ বছরের ছোট শিশুটিকে মুখবুজে সহ্য করতে হতো। চোখের জল ফেলবার হুকুম ছিল না !

রুষ্টা স্বরস্বতী সেবায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে তার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। আজও সে চিহ্নগুলি মিলোয়নি।

সমবয়সীদের কাছে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে পেয়েছে নিদারুণ অবহেলা, সরলতার বিনিময়ে পেয়েছে দয়াহীন বিদ্রূপ, উপকারের বদলে অকারণ অপমান এবং ঔদাসীন্যের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর অপবাদ। পরের কাছে গম্ভীর উপদেশ এবং বিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যস্ত হ'য়ে কোনো-রকমে অর্থহীন জীবনটি টেনে টেনে বেড়াচ্ছে।

ইহকালের স্বর্গ ধর্ম্ম এবং পরমং তপ পিতৃদেবতা অত্যন্ত সুসময়ে দেহরক্ষা করলেন অর্থাৎ দেউলিয়া হবার ঠিক পূর্ব্বাহ্নে। কিন্তু তাঁর জীবনের সমস্ত দুষ্কৃতি চাপিয়ে গেলেন এর ঘাড়ে। রুগ্না মুমূর্ষু স্ত্রী, অনূঢ়া কন্যা ও চিরস্থায়ী দারিদ্র্য !

অবিবাহিত বয়স্থা ভগ্নিটি হঠাৎ কে জানে একদিন কেমন ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। আজও তার সন্ধান মেলেনি। কোথায় গেছে, কেন গেছে, তা শুধু সেই জানে !

সেই থেকেই জীবন ব'য়ে চলেছে। মানুষের স্বাভাবিক উচ্চাশাগুলি সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের পথে চল্‌তে চল্‌তে কেটে-ছেঁটে একেবারে নির্ম্মূল ক'রে দিতে হয়েছে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম হ'য়ে যাওয়াটাই যেন সেই জীবনের পরম পরিণতি। চরম নগণ্যতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে মধুর মিথ্যা স্বপ্নগুলিকেও পথের ধুলার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে। সচ্চরিত্রই বলতে হবে বৈ কি। আঘাত করলে কাপুরুষের মত শুধু মৃদু হাসে, আকণ্ঠ বেদনায় ছাপিয়ে উঠলে চোখ মুখ বুজে ব'সে থাকে, উপবাস-ক্লিষ্ট মনে বিধাতার বিরুদ্ধে গ্লানি জ'মে ওঠে না,—এ কি কম কথা !

লোকের পাল্লায় প'ড়ে চটকলের কাজে ধর্ম্মঘট করলে বটে কিন্তু পুনরায় আর বাহাল হ'তে হ'ল না। সে অনেক কথা। পরে কিছুদিন ডাকঘরের পিওনগিরি করে। হঠাৎ কৌতূহলবশে একদিন সেখানকার একটি অভিজাত বংশীয়া মহিলার একখানি পত্র খুলে পড়তে গিয়ে কি রকম ভাবে না জানি ধরা পড়ে। ফলে চাকরি যায়। তারপর দিনকয়েক রেলওয়েতে কুলি সর্দ্দারের একটা কাজ পায়। কাজটা বেশ মনোমত। কিন্তু একদা গভীর রাত্রির অন্ধকারে একখানা ট্রেন ছুটে চলতে চলতে কেমন ক'রে লাইন থেকে ছিট্‌কে খাদে গিয়ে পড়ে। অনেক যাত্রী মারা যায়। ধর পাকড়ের সঙ্গে সেও বাদ গেল না।

একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের পর সে যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে যেন আর চেনাই যায় না।

অপমানের সঙ্গে দুর্বোধ্য একটা ব্যাধিতে মাটির দিকে মাথাটা নুয়ে পড়েছে। কপালে পাটের পর পাট; চোখের কোণে কালি। অবসাদ আর অসহায়তা মুখের রেখায় রেখায় দাগ কেটে বসেছে। না আছে কোনো উদ্বেগ, না চঞ্চলতা। নিজেকে নিয়ে কি করবে, কোন্ পথে চলবে—এ চিন্তা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে; কেমন ক'রে বাঁচবে—এই হ'য়েছে সব চেয়ে বড় কাম্য।

অথচ বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সেই জীবনের পক্ষে সব চেয়ে কষ্টকর। একটানা সেই একঘেয়ে পুরাতন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা মানে যেন মরণের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা!

বিবাহের ইতিহাস বড় করুণ। সে এক কোন্ গাঁয়ের পথে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। যজমানি ব্রাহ্মণটি ছিল একঘরে। অতি কৌশলে তাকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়ে একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণ তাঁর সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তার মালা বদল করিয়ে দেন্। অচেনা অজানা দুটি নরনারীর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভব হলো না। মেয়েটিও তার এই নিরীহ গোবেচারি স্বামীটিকে সহ্য করতে পারে নি। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে একদিন বললে—তুমি দূর হবে ত হও নৈলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে তোমাকে ফাঁসাবো।

ফলে সেইদিনই সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়।

•

সত্যি সত্যিই নিরুদ্দেশ! না খোঁজ না খবর,—কিছুই না। এই জন-জটিলতার ভেতর থেকে তার নিজের খেইটাই শুধু যেন হারিয়ে গেছে।

মরণ-পথ-যাত্রী পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা পুত্রের পথের দিকে চেয়ে রইল। চোখ দুটোতে আগেই ছানি প'ড়ে গেছে, উদ্বেগ-আকুলতা সে দৃষ্টিতে আর দেখা যায় না। কেবল কাঁপতে কাঁপতে উঠে এক একবার বাইরে যায়, অন্ধদৃষ্টি তুলে এদিক ওদিক তাকায়—নাম ধ'রে ডাকে—আবার ফিরে এসে বসে।

তারপর চুপি চুপি একদিন নিঃশব্দ পদে মরণ এসে তার শেষ পাওনা নিয়ে চ'লে গেল!

•

বহুদিন পরে বিহারের একটি ক্ষুদ্র শহরের ক্ষুদ্রতর একটি ইষ্টিশানে তাকে পুনরায় দেখা গেল। রোগপাণ্ডুর দুর্ব্বল দেহ, অবসাদক্লিষ্ট। কয়েকদিন আগে হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়েছে। মুখের ওপর সমস্ত কপাল জুড়ে একটি কাটার দাগ। ওই বড় ক্ষতচিহ্নটিই যেন মুখখানার বিশেষত্ব!

প্যাসেঞ্জার গাড়ী মাত্র দুমিনিট দাঁড়ায়। একখানি টিকিট কিনে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠে সে মুড়ি সুড়ি দিয়ে এক কোণে আড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

বাইরে অন্ধকার রাত্রি; একটু আগে চাঁদ ডুবে গেছে। তারায় তারায় সমস্ত আকাশটা ছেয়ে আছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে একটি শাদা পথের আভাস তখনও স্পষ্ট জেগে রয়েছে। গাড়ীর গতির শব্দটা তার কানের মধ্যে কখন্ যে মিলিয়ে গিয়েছে তা বলা যায় না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে তার মনে হলো সত্যিই সে স্বপ্ন দেখছে। তার এই তুচ্ছ ব্যর্থ ও বিকলাঙ্গ জীবন কেমন ক'রে সহসা যেন সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠেছে। কে যেন তার চারিদিক পরিব্যাপ্ত ক'রে বীণানিন্দিত কণ্ঠে গান গাইতে সুরু করেছে। ঘুমের ঘোরে সকল দিকের ফাঁকিই আজ অকস্মাৎ কেমন ক'রে যেন তার ভরাট হ'য়ে ওঠে।

আচম্‌কা এক সময় জেগে উঠে সে চারিদিক চেয়ে দেখলে। সাঁ সাঁ ক'রে একটানা পথে ট্রেন ছুটে চলেছে। আর, ও হরি—বীণার তান ত নয়, একটি মেয়ে কলকণ্ঠে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা বলছে। একটু আগে গাড়ীতে উঠেছে মনে হ'ল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক'রে মনে হয়, বিধাতা নির্জ্জনে অতি যত্নেই এই সুন্দরীটিকে সৃষ্টি করেছিলেন।

এমনিই ত মনে হয়! নৈলে সেই আদি-অন্তহীন রূপের আর কোনো বর্ণনাই নেই। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন তার চঞ্চলতা ঠিক্‌রে পড়ছে। মুখরতাও তার বহুমুখী,—কোথাও

যেন তার বাধা নেই, বিচ্ছেদ নেই, থামবার অবকাশও যেন নেই!

সকাল হ'য়ে গেল। সমস্ত দিগন্ত ভ'রে প্রভাতের আরক্ত আভাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

নির্লজ্জের মত মেয়েটির চোখে চোখে সে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকায়। সে দৃষ্টির কি কোনো অর্থ নেই বলতে হবে? ভাষাও কি নেই তার?

চোখ দুটি তার বড় বড় কিন্তু কালো নয়। ফিকে সবুজ তৃণক্ষেত্রের সঙ্গে তার যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষের তীক্ষ্ণ একান্ত দৃষ্টিতে ঘা খেয়ে মেয়েটির মুখরতা থেমে আসে। টেনে টেনে তখন হাসতে থাকে, থেমে থেমে কথা বলে। মাঝে মাঝে যেন লজ্জায় কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে।

তার পর ঠিক একটি নাটকীয় ব্যাপার ঘ'টে গেল।—

কাছে এসে ম্লান হেসে মেয়েটি বললে—প্রথমে চিনতে পারি নি। এ কি তোমার হয়েছে দীনদা?

কথা বলতে দীনুর একটু সময় লাগলো। পরে বললে—মনে পড়েছে, হাঁ তুমিই বটে! নৈলে অমন চোখ তোমার ছাড়া আর কারো—আচ্ছা, মাধবী নাম ছিল—না?

মাধবী হাসলে। বললে—ওই বেঞ্চিতে এসো, উনি ব'সে আছেন; চেনো না বোধ হয় ওঁকে? সত্যি অনেকদিন পরে আমাদের দেখা হ'য়ে গেল, না দীনদা? সাত আট বছরের কম কখনই নয়। কি বল?

নিতান্ত ছেলেমানুষের মত দীনু বললে—ঠিক হয়েছে! তোমার গলা শুনেই তখন আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো মাধবী! এবার মনে পড়েছে।

স্বামীটি ভারি ভদ্রলোক। একটু ভারিক্কে বয়স হয়েছে, এই যা। হেসে আদর ক'রে পাশে বসালেন।

বললেন—বড় আনন্দের কথা, মাধবী যদি দাদা বলে আপনাকে তবে আমার আনন্দই ত সব চেয়ে বেশি!

পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এবার জেগে উঠে বসলো। দীনু বললে—চিনতে পেরেছি—তোমারই মেয়ে! মুখখানি দেখলে তোমাকেই মনে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরেই একটু হাসল। তারপর কুশল প্রশ্নের পালা শেষ হ'তে মাধবী বললে—মাথায় তুমি বড়টি হয়েছ দীন্দা, কিন্তু এদিকে তেমনি ছিপ্‌ছিপে—আচ্ছা কপাল তোমার অমন কেটে গেল কি ক'রে?

দীনু বললে—আমি কিছুই জানতাম না। ভিড়ের মধ্যে মারধোর চলছিল...ওই দিক দিয়ে আসছিলাম, কেমন ক'রে একটা ইঁট এসে লাগলো···তারপর হাঁসপাতালে—

মাধবী বললে—একে তুমি ভালমানুষ, তার ওপর,—একটু চালাক হও দীন্দা, নৈলে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না! তোমাকে ত চিনি!

কি একটা ইষ্টিশানে এসে গাড়ী থাম্‌লো। স্বামীটি চা খেতে নেমে গেলেন।

মাধবী বললে—কাজকর্ম্ম কিছু করছো? রোজগার না করলে ত আজকাল –

দীনু যেন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। রোজগারের জন্য তাকে অনেক দুঃখই সইতে হয়েছিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—করতাম; কিন্তু বুঝলে মাধবী, এই বড়লোকগুলো আমাদের ভারি কষ্ট দেয়! আমরা কিছু বুঝি না, আমরা গরীব···না হয় আমরা অনেক পাপ করেছি, হয়ত কারো কোনো উপকার করতে পারি না—তা ব'লে তুমিই বল না, এ কি ভাল?

এতকাল ধ'রে তার জীবনে যেন বলবার মত এই কয়টি কথাই জ'মে উঠেছে।

জানালার বাইরে একদৃষ্টে চেয়ে মাধবী শুধু বললে—সেদিন যেমনটি ছিলে, আজও তুমি তেমনি আছো দীন্দা। এতটুকু তোমার বদল হয়নি!

দীনু বললে—আমি কোনোদিন কথা বলতে পাই না, তোমার কাছে আজ কেবলই,—আমার একটি কথাও শোনবার লোক নেই মাধবী।

মাধবী বললে—বিয়ে হয়েছে তোমার?

বিয়ে! হুঁ-উ—কিন্তু, দেখ ওটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না মাধবী! অনেকবারই ভেবে দেখেছি কিন্তু সত্যি বলছি, কিছুই আমার মাথায় আসে না।

বউ কোথায় এখন?

নেই!—একটু ভেবে আবার সে বললে—আমাকে সে সইতে পারলো না; তাড়িয়ে দিল একদিন! তা হোক

মাধবী, আমাকে সইতে পারে নি, তা ব'লে--না, তার কোন দোষ নেই!

মাধবী বললে—তবে? এ আবার কি বল্‌ছ?

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে দীনু বললে—তা ব'লে আমারও কোনো দোষ ছিল না, বুঝলে? কারো দোষ আমি দিতে পারিনে মাধবী।

স্বামীটি আবার উঠে এসে তাঁর ছোট মেয়েটির পাশে বসলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গার্ডের বাঁশী বেজে ট্রেণ ছাড়লো।

মাধবী বললে—কিছুই বুঝলাম না দীন্‌দা। যাই হোক, জল খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে আবার!

স্বামীটির বোধ হয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি; তিনি আবার মুড়ি সুড়ি দিয়ে চোখ বুজলেন। মেয়েটি মায়ের কাছে স'রে এসে বসলো।

খাবার বার ক'রে একখানা রেকাবের ওপর মাধবী সেগুলি সাজাতে লাগলো। দীনু বললে—আচ্ছা তোমাদের যে বাড়ীটায় আমরা ভাড়া ছিলাম সেটা কি এখনও —কিন্তু সত্যি বলছি মাধবী, কোনো মেয়ে হাতে ক'রে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে, তেমন খাবার আমি আজও খাই নি। লোকে শুনলে বোধ হয় হাসে—না?

মাধবী বললে—যত্ন করবার এটা উপযুক্ত জায়গাই বটে। তা সে যাই হোক, এবার কিন্তু কল্‌কাতায় গিয়ে আমার ওখানে যেও। পরে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে চুপি চুপি আবার বললে—উনি সত্যিই খুব ভাল লোক। বলতে গেলে ঠিক মাটির মানুষ! ওঁর বয়েস একটু বেশি, সাধারণের চেয়ে হয়ত একটুখানি,—কিন্তু যে ওঁকে জানে, ওঁকে নিয়ে যে ঘর করেছে, সেই বোঝে উনি আমাদের চেয়ে কত দিক দিয়ে বড়—কতখানি মহৎ!

স্বামীর প্রশংসায় তার টকটকে মুখখানি যেমনি দীপ্ত তেমনি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। গভীর শ্রদ্ধায় তার দিকে চেয়ে দীনু বললে—আমিও সেই কথা বলছিলাম; আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল মাধবী।

নিজের কথাগুলি তখনও মাধবীর মনে গুঞ্জন করছিল। একটু থেমে হঠাৎ আবার বললে—না, বাড়িয়ে আমি বলি না, তা ছাড়া স্বামীর সম্বন্ধে,—আর বাড়িয়ে ব'লে আমার লাভই বা কি!

ছোট মেয়েটি অপার বিস্ময় নিয়ে এতক্ষণ এই নবাগত লোকটির দিকে তাকাচ্ছিল। খাবারগুলি শেষ ক'রে জল খেয়ে তার দিকে চেয়ে দীনু বললে—তোমার বিয়েতে আবার নেমন্তন্ন খাবো, কেমন খুকু?

খুকু সলজ্জভাবে মায়ের কাঁধের পাশে মুখ লুকিয়ে রইল।

ঠোঁট উল্‌টে মাধবী বললে—বিয়ে কি আর হবে! কালো-কুৎসিত মেয়েকে নেবে কে?

কালো!—দীনু অবাক্ হ'য়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে শুধু বললে—তোমরা কালো?—মাধবী, অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে! তুমি কেবলই আমার কাছে এসে নিজেকে কালো বলতে! অথচ তোমার মতন রূপ আমি জীবনেও কোনোদিন—সত্যি বলছি, সুন্দরী মেয়ে কোথাও দেখলে আমি তোমারই কথা ভাবতাম! তারপর এই আট বছর ধ'রে কতদিন খুঁজলাম কিন্তু কোথাও তোমাকে—

মাধবী তার নির্ব্বোধ মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ ঝড়ের মত খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। বললে—এবার কিন্তু না হেসে থাকতে পারলাম না; মেয়েমানুষের বিয়ে হয়ে গেলে তাকে কি আবার কেউ খোঁজে! তুমি ত বেশ লোক দীন্‌দা?

বোকার মত দীনু বাইরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তাইত! এই করুণ নির্বুদ্ধিতার কথা তার মাথায় ত কোনোদিন আসেনি! পরে ঘাড় ফিরিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত সে বললে—এ কথা আমি জানতাম না মাধবী, খুঁজলে যে দোষ হয় তা আমার জানা ছিল না।

হাসির রেশ মাধবীর মুখের ওপর থেকে তখনও স'রে যায় নি। বললে—খুঁজতেও নেই, এমন কি তার কথা ভাবতেও নেই! এবার মনে থাকবে?

কি ভেবে দীনু বললে—আচ্ছা, তবে যে তুমি ডেকে এখন আমার সঙ্গে কথা কইলে, এ নিয়ম বুঝি আছে?—কিন্তু ধর যদি মনে মনে তোমাকে ভাবি তাহলে,—আর এই যে তুমি এখন কি ভাবচ তা কি আমি জানি?

একটু হেসে মাধবী চুপ ক'রে গেল। আর যাই হোক এ সরলতার কোনো প্রতিবাদ নেই।

হাবড়ার ইষ্টিশানে ততক্ষণে গাড়ী এসে গেছে।

তা ব'লে জীবন-সংগ্রাম তাকে রেহাই দিল না। উদ্দেশ্যহীন কি একটা আশা নিয়ে বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতই তাকে এখানে ওখানে উড়ে বেড়াতে হয়। নিজস্ব কোনো প্রতিষ্ঠিত মতামত নেই, অর্থহীন কোনো মিথ্যা স্বপ্নও মাথার মধ্যে আর ঘোরে না! না আছে জিজ্ঞাসু কোনো কৌতূহল; নিজের কোনো কিছু শক্তি আছে কি না,—এ সমস্ত নিতান্তই তার কাছে কুহেলিকাময়। চিন্তা! তাও ত নেই! সংসার যেন তার চোখে কেমন দুর্বোধ্য জটিলতায় ভরা। মাঝে মাঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে সে তাকায় কিন্তু কোনো অর্থই তার মনে আসে না।

মাধবী? হাঁ মাধবীকে মনে পড়ে। শরতের আকাশকে দেখে তার চোখদুটির কথাই ভাবতে হয়। সর্ব্বাঙ্গে যেন তার সূর্য্যাস্ত-শোভা। সবুজ তৃণক্ষেত্র বাতাসে দুলে উঠলে তার দেহখানিকে মনে পড়ে। মাঝে মাঝে দীনুর সমস্ত অন্তর তার হাসি মুখখানির চারিপাশে মক্ষিকার মত গুঞ্জন ক'রে বেড়ায়। কিশোর বয়সের বান্ধবীটির প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় তার চোখে জল এসে পড়ে। মাধবী চমৎকার!

রাত্রে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে নিজের ভিতর কি একটা জটিল আন্দোলন অনুভব করে। কতকগুলি অন্যায় দুরাশা ছায়ামূর্ত্তি ধ'রে তার চোখের সুমুখে এসে চক্রান্ত করতে থাকে।

চোখ বুজে ভাবে—মাধবী! এই মেয়েটিকে সে একেবারে ভুলেই গিছলো বলতে হবে। কিন্তু সেদিন অকস্মাৎ তাকে দেখে মূক মন যেন মুখর হ'য়ে উঠেছিল। এই মেয়েটির কাছে সহানুভূতির ইঙ্গিত পেয়ে তার জীবনের বস্তুহীন রসহীন অসংলগ্ন ঘটনাগুলি কেমন ক'রে বেদনায় ভ'রে উঠেছিল তা কি সে নিজেই জানতে পেরেছে! মাধবীর নীল দুটি চোখের ছায়ায় শুধু যে আলো আছে তা নয়, মানুষের দীনতার কারুণ্যও সেখানে লুকিয়ে রয়েছে।

সকালের আলোয় এ সব কথা ধোঁয়ার মত আবার মিলিয়ে যায়।—

পথে নেমে হঠাৎ কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বোকার মত পিছন থেকে ডাক দিয়ে বলে—হীরালাল যে, ভাল ত?

বহুদিন পরে হীরালাল তাকে পথে দেখতে পেয়ে একটু বিস্মিত হয়; বিজ্ঞের মত ঠোঁটের পাশে একটু হাসি টেনে বলে—বারে দীনু, এমন ক'রে ডেকে কথা কইতে আবার কবে শিখ্‌লি? কি করিস্ আজকাল?

এই ভাই, যদি কাজ এবার একটা কিছু পাই তবে—

ও, তা যাবে যা হোক একটা জুটে! তবে চাকরীর বাজার আজকাল,—আচ্ছা আসি রে; একবার আমায় ব্যাঙ্কে যেতে হবে।—ব'লে সে তার ছেঁড়া পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি বিড়ি নিয়ে ধরাতে ধরাতে চ'লে যায়।

কিছুদূর গিয়ে আবার আর একজন। পিছন থেকেই ডাকে বটে।

হরিদাস, চিন্‌তে পারো?—ওঃ না না, ভুল হ'য়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না। হরিদাস ঠিক আপনারই মতন—

ভুরু কুঁচ্‌কে একবার তাকিয়ে লোকটা কি ভেবে চ'লে যায়।

পথে চলতে চলতে ভাবে তাকে কেন্দ্র ক'রেই যেন এই অফুরন্ত জীবন-প্রবাহ ব'য়ে চলেছে। অগণন বিচিত্র চরিত্র। কারোকে বাদ দিলে চলবে না! স্নেহ যে করে তাকেও চাই, ঘৃণা কিম্বা অবহেলা যে করে তাকেও প্রয়োজন!

ভাবতেই ভাল লাগে; শহরের প্রশস্ত রাজপথে চল্‌তে চল্‌তে নিজেকে মূল্যবান মনে করায় যেন অপরিসীম তৃপ্তি আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে মাধবী বললে—কড়া নাড়া শুনেই বুঝতে পেরেছি। মনে ক'রে এলে তবে?

দীনু বললে—বাঃ আসতে ত হবেই, তোমার যখন আবার দেখা পেয়েছি তখন—

মাধবীর মুখে চোখে যেন রক্ত জ'মে উঠলো। এদিক ওদিক চেয়ে বললে—এসব ছেলেমানুষী কথা যেন ওঁদের কাছে ফস্ ক'রে ব'লে ফেল না বাপু।—এসো।

ভেতরে পা বাড়িয়ে দীনু বললে—উটি কে? নির্ম্মলা ব'লে মনে হচ্ছে যেন?

মাধবীর ইঙ্গিতে একটি লজ্জানতা কিশোরী স'রে এসে হেঁট হ'য়ে দীনুর পায়ের ধূলো নিতেই—

থাক্ থাক্, ওইখান থেকেই—আমার এই নোংরা পায়ের ধূলো, তা ছাড়া বুঝলে মাধবী, আমার পায়ের ধূলোরও দাম নেই, আশীর্ব্বাদেরও না।—আচ্ছা, সেই নির্ম্মলা এত বড় হ'ল?

মাধবী ঘরের কাছে এসে বললে—দিন যাচ্ছে বছর যাচ্ছে, বড় হ'তে আর দোষ কি বল!

বিস্ময়ের ঘোর তখনও দীনুর কাটেনি। বললে—তাই ত! আর ক'বছর বাদে বোধ হয় ছেলেপুলেও হ'য়ে যাবে?

একটি প্রবল হাসির আবেগ চেপে মাধবী মুখ ফিরিয়ে নিল।

নির্ম্মলা ঠিক তেমনি নিঃশব্দে চ'লে গেল। সেইদিকে চেয়ে মাধবী বললে—সেদিন সাত বছরের নির্ম্মলাকে মধ্যস্থ রেখে আমাদের কথাবার্ত্তা চলতো—মনে আছে দীনদা?

মুখের দিকে চেয়ে দীনু বললে—তুমি কিন্তু ভারি দুষ্টু ছিলে।

মাধবী বললে—আমার দুষ্টুমিটাই বুঝি মনে আছে?

এ এক প্রকারের তিরস্কার এ কথা দীনু বোঝে। বললে—তোমার মুখ থেকে সব কথাই ভাল লাগে মাধবী. কেন বল ত?

কথার কোনো মাথামুণ্ড নেই!

কিন্তু মাথামুণ্ড ছাড়া আর যদি কিছু থাকে ত তার জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত।

ঘর থেকে বাইরে গিয়ে মাধবী দাঁড়ায়। এমনি অনাবশ্যক বেরিয়ে আসার কারণ কি সে নিজেই বোঝে। বলে—নির্ম্মলা, শুনে যা। দীনুদাকে বোধ হয় চিনতে পারিসনি? ও তোকে কতদিন কাঁধে ক'রে বেড়িয়ে এনেছে।—খাবারের ব্যবস্থা কর্ ভাই ততক্ষণ,—উনি কোথায়? শহরে গেছেন বুঝি?

ঘাড় নেড়ে নির্ম্মলা শুধু সম্মতি জানিয়ে দিল।

ঘরে এসে একটা চৌকির ওপর ব'সে প'ড়ে মাধবী বললে—মা ম'রে গেলেন, দাদা নিলেন বিদেশে চাকরি,—নির্ম্মলাকে তাই আমিই এনে রাখলাম!

ঘরের ভেতর চারিদিক চেয়ে চেয়ে দীনু বলতে লাগলো—ভুলেই গিছলাম তোমার কাছে আসছি। কাল রাতে অনেক কথা তোমায় বলবো ব'লে গুছিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু এখানে এসেই—তা ছাড়া আর একটা কথা ভাবছি মাধবী। এতকাল পরে দেখা হ'য়ে কথার পর আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

মাধবী বললে—তুমি থাকো কোথায়?

দীনু হেসে বললে—এ বেশ কথা তোমার! থাকবার জায়গা প্রায়ই আমাকে জোগাড় ক'রে নিতে হয় যে! মাধবী, আমার এই আট বছর কেমন ক'রে কেটে গেছে তা শুনলে তুমি হয়ত—

ছোট মেয়েটি এবার ঘরে ঢুকে মার কাছে এসে দাঁড়ালো। দীনু তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললে,—খুকুমণি, যাবে আমার সঙ্গে?

হাসতে হাসতে মাধবী বললে—কান টানলেই মাথা যায় দীনদা; মেয়ে নিয়ে যাওয়া মানে মেয়ের মাও সেই সঙ্গে—

হাতটা বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দীনুও হেসে বললে—নেই, নেই—ভাঙা ঘরের চাল ছাওয়া নেই, মাটির দেওয়াল কবে পড়ে! চাল-ডালের দানাটিও—হুঁ হুঁ, নিয়ে গিয়ে রাখবো কেমন ক'রে?

আর মেয়ে নিয়ে গেলে বুঝি খাওয়াতেও হয় না, থাকবার জায়গা দিতেও হয় না!

তা হোক, একে আমি কাঁধে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে পারি, কিন্তু তোমাকে—না না মাধবী, আমার ঘরে গিয়ে তুমি কষ্ট সইবে, সে আমি ভাবতেই পারি না!

মাধবী তাকে বাধা দিয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠলো।—আমার যাবার কথা তুমি বুঝি সত্যি ব'লে ভাবছিলে?

তোমার বোকামির জ্বালায় কি করি বল ত দীনদা? আমি যে লোকের বাড়ীর বউ একথা ভুলতে তোমার এক মিনিটও লাগে না দেখছি। আচ্ছা পাগল তুমি ত?

না তা আমি ভুলিনি, আমি বলছিলাম যে—আচ্ছা বন্ধুর বাড়ীতে যদি বন্ধু গিয়ে ওঠে তা হ'লে—

তা হ'লে বন্ধুত্বটি কেমন হয় দীনদা? বাইরের একটা লোকের সঙ্গে ঘরের বউয়ের বন্ধুত্ব—এ ত' আর অরাজক নয়!—মাধবী আর একবার হাসবার চেষ্টা ক'রে নীরব হ'য়ে গেল।

কাতর কণ্ঠে দীনু শুধু একবার বললে—আমি যা বলতে চাইছি, কিন্তু তুমি তা ঠিক বুঝলে না মাধবী।

মাধবী আর কোনো কথা কইল না। চুপ ক'রে সে যেন নিজের প্রতিই নিঃশব্দে চেয়ে রইল। প্রকাশ ক'রে না বললে এ নিঃশব্দতার কি কোনো বর্ণনা আছে!

ঘরের মধ্যে এর আগেই একটু একটু অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল। এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে টুলের উপর একটি আলো রেখে কোনো কথা না ক'য়ে নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে চ'লে গেল। যেমন আসা ঠিক তেমনিই চ'লে যাওয়া! এমন কোনো চিহ্নই সে রেখে গেল না যাতে এতটুকুও তাকে বোঝা যায়।

পীড়াদায়ক একটা নীরবতা অনুভব ক'রে দীনু হঠাৎ বললে—মতিবাবু এলেন বুঝি? পায়ের শব্দ হ'ল না কার?

স্বামীর নাম শুনেই মাধবী যেন সজাগ হ'য়ে উঠলো। বললে—এলেন? জানি আমি একদণ্ড উনি কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন না! কই? এলেন না ত?

পায়ের শব্দ কারো নয়। দীনু শুধু একটুখানি বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলেছিল মাত্র। মাধবী কিন্তু বলতে লাগলো—ননদের বাড়ী আজ যাবার কথা ছিল; যেতে কি চান্! ধ'রে বেঁধে জোর ক'রে তবে পাঠিয়েছি। লোকটি এই রকমই বুঝলে দীনদা? স্বামীর কথা বলতে গেলে লজ্জা করে কিন্তু আমি বলতে পারি একশোটার মধ্যে একটা মেয়েও আমার মতন এমন সুখে থাকতে পায় না। ওর বয়েস হয়েছে, সংসারী লোক—আর এই ধর আমরা যা চাই—আমোদ আহ্লাদ উনি বিশেষ ভালবাসেন না; তা হোক, স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে খেয়ে প'রে ভালভাবে থাকাই কি এখনকার মেয়েদের পক্ষে কম?

দীনু বললে—তুমি কিন্তু তাই ভালবাসতে মাধবী। গোলমাল যেখানে নেই সেখানে তুমি যেতে না। আর দুষ্টুমি না করলে বেশ মনে আছে তুমি ঘুমোতেই পারতে না। সে ত' আর বেশিদিনের কথা নয়! একটু থেমে আবার বললে—তোমার হাসির শব্দ ঘর দোর ছড়িয়ে শোনা যেত!

মাধবী বললে—বাঁচতে গেলে অনেক জিনিসই ছাড়তে হয় দীনদা! তা ব'লে ওঁকে আমি ছোট করতে পারবো না। কি না করেছেন আমার জন্যে! পাছে অসুবিধেয় পড়ি এ জন্যে ভাঁড়ারের জিনিস পত্তর আগে থাকতে এনে রাখেন, জামা, কাপড়, হাতখরচ—কিছুই চাইতে হয় না! লোককে আদর আপ্যায়িত,—আর অমন পরোপকারী লোক আজকাল ত চোখেই পড়ে না। এদিকে এমন কেউ নেই যে ওঁর কাছে সাহায্য পায়নি। নির্ম্মলা আমার এখানে থেকেই ত মানুষ হলো!

আলোর দিকে চেয়ে দীনু ব'সে রইল। পরম শ্রদ্ধাভরে মাধবীর কথা শুনতে শুনতেও তার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঘ'টে যাচ্ছে।

মাধবী আবার বলতে লাগলো—স্বামীর সঙ্গে যা হোক একটা বনিবনা না করলে আজকাল মেয়েদের আর বাঁচবার কোনো উপায় নেই—বুঝলে দীনদা?

দীনদা ত সবই বোঝে! কথা বলা আর না-বলা তার কাছে দুইই সমান।

মাধবী কিন্তু নিজের খেয়ালেই ব'লে যায়।—লোকের চোখে যখন অভাব আমার কিছুই নেই তখন মিথ্যে জিনিসের জন্যে দাবি জানিয়ে,—আর তা লোকে শুনবেই বা কেন?

একটি থালায় কতকগুলি খাবার আর জল এনে রেখে নির্ম্মলা চ'লে গেল।

সেইদিকে চেয়ে দীনু হঠাৎ বললে—বাঃ, ভারি শান্ত মেয়ে কিন্তু। তোমার বোন ব'লে মনেই হয় না।

মাধবী চট্ ক'রে ব'লে বসলো—অমনি একটি বৌ তোমার হ'লে কেমন হয় ?

হঠাৎ সজাগ হ'য়ে অপার বিস্ময়ে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দীনু বললে—ধোৎ ! একবার বিয়ে হ'য়ে গেলে কি আবার—আজ কিন্তু আমি চললাম মাধবী।

খেয়ে যাও ওগুলো ? বা রে !

খাবারে দীনুর রুচি চ'লে গিয়েছিল। তবু বসে প'ড়ে কোনোরকমে সে নাকে মুখে গুঁজতে লাগলো।

খেয়ে কিন্তু পালালে হবে না ! তোমার নিজের কথাই বল শুনি। আগাগোড়া না বললে দেবো না কিন্তু।

খেতে খেতেই দীনুর আত্মকাহিনী সুরু হ'ল।

শেষ যখন হ'ল, ঘরের ভেতরটা যেন শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

একটু পরেই দীনু উঠে দাঁড়ালো। আলোয় দেখতে পেলে মাধবীর চোখে জল ভ'রে উঠেছে। বিদায়ের আগে একটুখানি কাছে স'রে এসে সে বললে—আবার যদি এ পথে কোনোদিন আসি, আর নৈলে—

কাতর চক্ষু দুটি তুলে মাধবী শুধু বললে—বেঁচে সুখ নেই দীনদা !

দীনু নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। এল বটে কিন্তু মাঝপথে আবার তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। আলোটা দূরে রেখে গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হ'য়ে নির্ম্মলা পুনরায় একটি প্রণাম করলে ; তারপর উঠে আবার চ'লে গেল।

নিরর্থক একটি প্রণাম ! তার কোন ভূমিকাও নেই, যুক্তিও কি ছিল কিছু ?

দীনুর আত্মকথার প্রতি এ কি তার সশ্রদ্ধ সহানুভূতি ? অবশ পা দুটো টেনে টেনে দীনু বেরিয়ে চ'লে গেল।

বলেছে—বেঁচে সুখ নেই ! লক্ষ প্রশ্ন তুলে ওই কথাটা তার দিকে যেন ধেয়ে আসে। কানের মধ্যে কেবলই গুন্‌গুন্ করে। দীনুর মনে হয় এই কথাটির বয়স নাই, ইতিহাস নাই,—অনন্তকাল ধ'রে মানুষের অন্তর-লোক ওই কথাটির দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলচে। অচেতন মনোবৃত্তির মধ্যে এই কথাটি বাসা বেঁধে দীনুকেই কি স্থির হ'য়ে কোথাও থাকতে দিয়েছে ? বিদেশে, বিপথে, জনতার অরণ্য-মধ্যে, বিক্ষোভ-বেদনার স্রোতে স্রোতে তাকে চিরকাল নিরুদ্দেশ করেছে ! ওই কথাটি কি তাকে ভিখারিই করেনি !

কিন্তু মাধবী কেন বললে—বেঁচে সুখ নেই !

সুখ যদি নেই তবে বাঁচবার অধিকার কি দীনুরই এত বড় ! নাকি মানুষের এই মরুভূমির মাঝখানে ওই কথাটার বোঝা টেনে টেনেই তাকে চিরদিন বেড়াতে হবে !

তাই যদি হয় ত মাধবীর চিন্তা আজ ভিতর-বাহিরের সকল দৃষ্টিকে এমন ক'রে ছেয়ে আছে কেন !

মাধবী ! সত্য-মিথ্যায় অপরূপ হ'য়ে জড়িয়ে আছে এই মাধবী ! মাধবী তার কণ্ঠে দিল ভাষা, হৃদয়ে ছিল সঙ্গীত, পায়ে পায়ে এনে দিয়েছে পথ চলবার একটি ছন্দ !

জীবনের আর একটি নূতন রূপের সঙ্গে দীনুর যেন মুখোমুখি দেখা হয়।

মাধবীর সেই মুক্তাফলের মত অশ্রুবিন্দু দুটি চূর্ণীকৃত হ'য়ে রাত্রির আকাশে তারা হ'য়ে ছড়িয়ে থাকে। দক্ষিণের হাওয়ায় তার নীল বসনাঞ্চল ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। মাধবীর মৃদু নিশ্বাস রজনীগন্ধার উপবনকে দোলা দিয়ে যায়।

পড়ো একটা জমির ধারে ব'সে দীনু ভাবতে থাকে। ভাবে মাধবীর দেখা পাওয়াই যে তার পক্ষে অনেক বড় কথা। এতদিন পর্য্যন্ত কোথাও কোনোদিন সে সত্যকারের একটি নারীর দেখা পায়নি ! যেমন ক'রেই হোক, মাধবীর হাতে মমতার অর্ঘ্য-ডালা দেখে তার মনে হয়েছে, মরণই একমাত্র সত্য নয়— কিম্বা কাম্যও নয় ; আনন্দহীন মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের একমাত্র পাপ !

আবার উঠে দীনু লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। বিচ্ছিন্নতা থেকে স'রে গিয়ে জনতার সঙ্গে এক হ'য়ে মিলিয়ে যেতেই তার কেমন যেন ভাল লাগে।

সকলের মাঝখানে বেঁচে তাকে থাকতেই হবে! এই মূক, মৌন, পঙ্গু, বেদনাময় জীবনের প্রদীপটির মুখে অনির্ব্বাণ আনন্দের শিখাটি জ্বালিয়ে রাখাই ত তার মত পতিত সন্তানের একমাত্র কাজ!

ইতিমধ্যে আরও দু' একদিন গিয়েছিল বটে। যায় যখন তখন একেবারে 'রাজবেশ! জীর্ণ শতছিন্ন জামা কাপড়গুলি তার দেহটিতেই যেন একচেটে অধিকার সাব্যস্ত ক'রে থাকে। তা হোক,—দীনুর যেন প্রতিদিনই উৎসব লেগে আছে।

হয়ত এমনই হয়। যেখানে থাকে খানা-ডোবা, যেখানে আবর্জ্জনা, ক্লেদঘন স্তূপীকৃত গ্লানির বোঝা যেখানে,—আকাশ থেকে জ্যোৎস্নালোক এসে তাদের সুন্দর ক'রে তোলে!

সেদিন যেতেই মতিবাবু বললেন—বেশ বেশ, মানুষের কুটুম এলে-গেলে! খাওয়া-দাওয়া ক'রে তবে যেও। আমার আবার—বুঝলে হে, ওই যে তোমার উত্তরপাড়ায় নূতন পুল বাঁধা হচ্ছে,—সুর্‌কি চালানির ঠিকা নিতে হয়েছে। লোকের সঙ্গে আর ভদ্রতা রাখতে দিচ্ছে না। আর তুমি ত এখন ঘরের লোক, সবই মানিয়ে নিতে পারবে।

হেল্‌তে দুল্‌তে পান চিবোতে চিবোতে নাদুস নুদুস মানুষটি বেরিয়ে চ'লে যান্।

মাধবীকে দেখে এক নিঃশ্বাসে গল্ গল্ ক'রে দীনু কথা ব'লে যায়—বাঁচলাম মাধবী, তোমাদের দেখা পেয়ে আমার খুব লাভ হয়েছে কিন্তু। আর এই ধর, আমি ত বোবা নই আমিও ত গুছিয়ে গুছিয়ে অনেক কথা বলতে পারি! নৈলে তোমাকে দেখে অবধি—

মাধবীও বললে—আমিও বাঁচলাম, তোমার মুখে হাসি দেখা ভাগ্যের কথা।

বোকার মত দীনু বললে—তাই ত! আর এই দেখো, ভেতরে ভেতরে দম্ আটকে থাকা কি ভাল? মাধবী, সত্যি বলছি, তোমার সঙ্গে আবার যদি দেখা না হতো, তাহ'লে আমার নিজেকেই নিজের এত ভাল লাগতো না!

মাধবীকে একটু উপদেশ দিতেও ছাড়ে না। বলে—বেঁচে সত্যিই সুখ আছে। তা না হ'লে তোমার দেখা পেতাম কি ক'রে! আর ধর, এই যে আমরা আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেড়াই, এ সব কি একেবারে পাগলামি? ম'লেই ত ছাই হ'য়ে যেতে হবে মাধবী!

কথায় কথায় সে আবার দার্শনিক তত্ত্ব সুরু ক'রে দেয়। চুপ ক'রে থাকা ছাড়া মাধবীর আর উপায় কি! সরল উদার বিশ্বাসে নিতান্ত শিশুর মত দীনু তার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—মাধবী, তুমি আমাকে মানুষ ক'রে দিলে এ কথা ভুলতে পারবো না। আমি যে অনেক দুঃখ পেয়েছি তাও তুমি আমায় শেখালে! তা হোক, ভগবান আমাদের অন্যায় দুঃখ দিয়েছেন দিন্, তার বদলে আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে,—ও কি খুকুমণি, মাথায় ময়ূরের পালক পরেছ, বেশ দেখতে হয়েছে কিন্তু, আর নির্ম্মলা? তার বুঝি কেবল কাজ আর কাজ!—মাধবী, তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবচো, না?

মাধবী বললে—মেয়েমানুষের নিজের কথা ভাবতে গেলে কি আর চলে দীনদা?

ফোঁস ক'রে একটি নিশ্বাস ফেলে দীনু বললে—সত্যিই ত! ভাল মেয়েদের লক্ষণই ওই। তুমি কিন্তু অমন ক'রে একদিকে চেয়ে থাকলে আমার চোখে জল আসে, তা বলচি।

মাধবী ম্লান হাসি হেসে কি যে একটি জবাব দিল, বোঝাই গেল না।

দীনু হঠাৎ বললে—চোখের জল, হাই হুতোশ, হাঁ ক'রে চেয়ে কি দুঃখ পেয়েছি তার কথা ভাবা—এ সব আর তেমন তোমার গিয়ে, বুঝলে না? দুঃখ বললেই দুঃখ বেড়ে যায়! তার চেয়ে বরং—আর তা ছাড়া আমাদের সকলেরই বিয়ে করা উচিত, নৈলে এত বড় সংসারটা—তুমিই বল না মাধবী?

মাধবী বললে—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আমি ত আগেই বলেছি যে—

কি আশ্চর্য্য, এসব কি আমার নিজের কথা! সবই ত তোমার!

সেদিন মাধবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন দীনু বেরিয়ে এল, রাত তখন অনেক। রাস্তা দিককার ঘরের সুমুখের জান্‌লাটা খোলাই ছিল; খড়্‌খড়ির ফাঁকে নজর পড়তেই সে দেখলো, মুখের কাছে আলোটি জেলে রেখে নির্ম্মলা ঠাণ্ডা মেঝের উপরেই উপুড় হ'য়ে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। অবারিত অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে সে কি ভাবছিল কে জানে, কিন্তু জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি তার আলোয় চক্ চক্ কচ্ছিল।

ধীরে ধীরে দীনু সেখান থেকে স'রে গেল।

আশপাশের নোংরা জায়গাগুলো রাতদিনই হতশ্রী হ'য়ে থাকে। যে যার পরস্পরের ওপর পরিষ্কার করবার ভার চাপিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিনগুলি কাটিয়ে যায়।

দীনু সেগুলি মুক্ত ক'রে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে তুললে। বাঁ দিকে একটুখানি অনাবশ্যক পরিত্যক্ত জমি প'ড়ে ছিল, সেদিন দুপুর বেলায় সে-জায়গাটার মাটি কেটে সে দু'একটা ফুলগাছের চারা বসাতে লাগলো।

কোনো বিক্ষোভ-দাহন, কোনো গ্লানি-ব্যর্থতা এখন আর তার মধ্যে নেই। এই জীবনেই তার জন্মান্তর সুরু হ'য়ে গেছে। সে নিজেই এখন নিজের স্রষ্টা। গত জন্মের বেদনাকে সে এ জন্মের আনন্দে রূপান্তরিত করেছে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠলো এবং মুখ ফিরিয়ে যা দেখলে তাতে অকস্মাৎ তার বাক্‌রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

ছোট মেয়েটির হাত ধ'রে মাধবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসচে। পিছন থেকে নির্ম্মলা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

মাধবী বললে—গুন্ গুন্ ক'রে গান গাচ্ছিলে শুনছিলাম। তুমি যে গাইতে পারো তা কে জান্‌তো বল!

অস্ফুট অবরুদ্ধ কণ্ঠে দীনু শুধু বললে—এলে তোমরা, কিন্তু তোমাদের বসাবার জায়গা ত নেই মাধবী!

জায়গা দিতে হয় না দীনদা, জায়গা ক'রে নিতে হয়! —নির্ম্মলা, ভেতরে আয় ভাই—বসি গে। দীনদা হয় ত সত্যিই আমাদের বস্‌তে বল্‌বে না!

ছোট মেয়েটির হাত ধ'রে ভেতরে গিয়ে মাধবী বলতে লাগলো—চমৎকার! ঘর ত নয় একেবারে বাসর-ঘর। দীনুদা, তুমি সত্যিই সৌখীন!

জড়ের মত নিশ্চল হ'য়ে দীনু দাঁড়িয়ে রইল। মাধবীরা যে তার ঘরে আসতে পারে,—এ যেন কাঙালের ঘরে অকস্মাৎ রাণীর আনাগোনা সুরু হ'য়ে গেল!

চঞ্চলপদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে মাধবী আবার বললে—তোমার মেয়েলি ভাবের নিন্দে যে করবে সে সত্যিই ভুল করবে! তোমার ভেতরটা মেয়ে কিন্তু মাথাটা তোমার নির্জ্জলা পুরুষের মাথা!—আচ্ছা, আমরা কেন এলাম তা ত কই একটিবারও জিজ্ঞেস করলে না!

তোমরা কি পর? দীনু বললে।

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে মাধবী বললে—একেবারে ঘরের লোক, না?—শোনো বলি, এদিকে এসো। ও কি, চললে যে! না না, তা হোক, তোমার মাটি-মাখা হাত নিয়েই এসো। নির্ম্মলা, আয় ভাই, লজ্জা কি!

দীনু একেবারে দিশাহারা হ'য়ে কাছে এসে দাঁড়াল। পা দুটো তার থর থর কচ্ছিল।

মাধবী তার একটি হাত নিয়ে নির্ম্মলার হাতখানি তার মধ্যে রাখলে। বললে—এর চেয়ে বড় আশ্রয় নির্ম্মলার আর নেই! দীনদা, তোমার কিছুই নেই তবু যা আছে তা হয়ত রাজার ঘরেও খুঁজে পাওয়া যায় না! নির্ম্মলার ভার তুমি নাও!

দীনুর অবশ ঠাণ্ডা হাতখানার কাঁপুনি আর থামে না। বললে—কিন্তু মাধবী—

থাক্ বুঝতে পেরেছি। নির্ম্মলা তোমাকে চিনেছে! তুমি স্বামী হবে এ তার ভাগ্যের কথা!

কিছুক্ষণ পরে হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে নির্ম্মলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথা যেন আর দীনুর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না। অতিকষ্টে মৃদু কণ্ঠে শুধু বলল—একটা যেন ঝড় হ'য়ে গেল মাধবী।

মাধবী শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করলে কিন্তু হাসির বদলে দুইটি চোখ ফেটে তার অশ্রু গড়িয়ে এল।

যাই হোক, সেদিনকার সেই জীর্ণ গৃহখানির আনন্দ ও বেদনার উৎসব—মনে হলো যেন উদ্ধায়িত সঙ্গীতের মত আকাশের দিকে ছুটে চলেছে।

বছরও বুঝি শেষ হ'য়ে যায়!

কেমন ক'রে না জানি এক একটি গভীর রাত্রে দীপু জেগে ওঠে। বুকের মধ্যে একটি পোকা যেন বাসা বেঁধেছে; মাঝে মাঝে কুরে' কুরে' সে জাগিয়ে দেয়।

ধীরে ধীরে সে উঠে বসে। শিয়রের মৃত্তিকা-দীপটি নিবে গেছে। ঘরের একধারে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

পাশেই নির্ম্মলা! নিদ্রিত,—মুখে চোখে কমনীয় একটি শান্তি স্থির হ'য়ে আছে। সুকোমল দুটি বাহুলতা একান্ত নির্ভরশীল! সমস্ত দেহখানি ঘিরে নিশীথ রাত্রির একটি মায়া ঘনিয়ে ওঠে!

মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে দুটি আঙুল দিয়ে দীপু তাকে স্পর্শ করতে যায়; কিন্তু ভয় করে। প্রশান্ত নিশ্চিন্ত নিদ্রাটি তার ভাঙাতে কেমন যেন বাধে।

উঠে গিয়ে জান্‌লার কাছে সে দাঁড়ায়। দূরে মৃদু বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে নারিকেল গাছগুলি মর্ম্মরিত হ'য়ে নিবিড় রাত্রিকে অভিভূত ক'রে তোলে। চোখের চারিদিকে জল-স্থল-আকাশ পরিব্যাপ্ত ক'রে জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ প্লাবন যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে—।

কেবল তারই হাতের বসানো দুটি রজনীগন্ধার চারা ফুলের ভারে অবনত হ'য়ে মাতালের মত এদিক ওদিক দোলা খায়।

মনে হ'ল, এ ছাড়া মানুষের আর কি কাম্য থাকতে পারে!

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বিভ্রান্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমার গানের পাশে,
ফুল ফুটেছে সকাল হ'তে
না জানি কোন্ আশে!
সবাই বলে, হে মোর সাথী, তুলে নে তোর গানে,
গন্ধ দেব হৃদয়কোষে, রঙ্ ফলাব প্রাণে,—
আমি কারেও চাব না,
বুকের হাসি ফুরিয়ে দিয়ে
মন হারাব না।

আমার মনের পাশে,
কত প্রাণের জুটেছে সাধ
না জানি কি আশে!
সবাই বলে, নে রে তুলে আমার জীবনধারা,
আমি রে তোর পথের সোনা, আমি রে পথহারা,-
আমি কারেও চাব না,
চোখের আলো নিবিয়ে দিয়ে
পথ হারাব না।

বিদেশীয়া

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

হারাকিরি *

(জাপানী হাসির কবিতা)

করতে গেলাম "হারাকিরি" (দারিদ্র্যেরই তরে)
বিজন দীঘির ঘাটে,
হঠাৎ দেখি পিছন ফিরি (দূরে দিগন্তরে)
সূর্য্য বসে পাটে।
অস্তগামী রক্তান্-রবি (স্নিগ্ধ জ্যোতি ভরা)
পড়্‌তে নয়ন কোণে
প্রিয়ার রাঙা মুখের ছবি (চিত্ত পাগল-করা)
উঠ্‌লো জেগে মনে।
হায় রে—
দুখের কথা বোলোনা হে বোলোনা
ওহো আমার মরা হোলোনা আর হোলোনা।

নিন্দুক

(পারস্য)

অন্নাহারা হই যদি
বলিবে নিন্দুক,
"—কঞ্জুষের ধাড়ি ব্যাটা
ভরিছে সিন্দুক।"
খাব যদি উদরেতে
ধরিবে যেটুক্—
নিন্দুক বলিবে—"ব্যাটা
বেজায় পেটুক্।"—

নাস্তিক

(আফ্‌গানিস্থান্)

নাস্তিক নর ডাকে না খোদায়
মানে নাক' ভগবান,
বলে—"যত পীর ফকির মোল্লা,
ভণ্ড ও বে-ইমান্—।"
হাসি পায় হো হো, সেই নাস্তিক
বিপন্ন হ'লে প্রাণ—
জুড়ি দুই কর ফুকারিয়া ওঠে
বাঁচাও শক্তিমান,
(তখন) চক্ষের জলে ধন্য সে হয়
ধুয়ে যায় অভিমান।

নামের মূল্য

(ইটালী)

ঐ যে ঝাড়ের গোলাপটারে
যা' খুসি নাম দাও না তারে
বর্ণ এবং গন্ধভারে
রইবে তেমন ফুল্ল ভাই,
এই দুনিয়ায় মূল্য গুণের,
নামের কোনো মূল্য নাই

প্রিয়ার মুখ

(বোগ্‌দাদ্)

শিশির-ভেজা তাজা গোলাপ
এমন অতুল ফুল্ কোথায় ?
অশ্রু-ধোয়া প্রিয়ার মুখের
এই দুনিয়ায় তুল্ কোথায় ?

চরকার গান

(সাঁওতাল পরগণা)

সবাই মিলে চরকা কাটি—
সুতো বেরোয় চটক্‌দার—
সবার চেয়ে ভালো সুতো
শাশুরী আর মাঐমা'র।
ঠান্‌দি ব'সে সঙ্গোপনে
কাট্‌ছে সুতো আপন মনে
অবাক্-কাণ্ড, তার সে সুতো
সবার চেয়ে চমৎকার।

---

* হৃৎপিণ্ডে ছুরি বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করার নাম "হারাকিরি"।

লাল্টু

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ভৈরব বিয়ে করেছে আজ বছর পাঁচেক—আর তাকে চিতায় তুলে দিয়েছে, সেও বছর তিনেক। বাব্লার অযত্নরক্ষিত চিতাচিহ্ন বর্ষারৌদ্রের রীতিমত দাপটে ধুয়ে মুছে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। কিন্তু ভৈরবের মনের মাঝে যে চিতা সেদিন জ্বলতে সুরু হয়েছে সে আজও তেমনি অমলিন জ্বালাময়। ভৈরবের মাঝে মাঝে এ যেন বড় অসহ্য বোধ হয়। অত ছোট বাব্লা এত বড় মায়াবী—এ তথ্য সে বেঁচে থাকতে কোনদিন আবিষ্কার করতে পারে নি। নিজের অস্তিত্ব প্রচারের জন্য যে পরিচয় বাব্লাকে দিতে হতো তাতে সে ভৈরবের চোখে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল কিন্তু আজ সে অস্তিত্বের বালাই ঘুচে গেছে, পরিচয়ের বাড়াবাড়ি নেই—সব লুপ্ত হ'য়ে যেটুকু আছে সেইটেই হয়ত মানুষের সত্য পরিচয়। বাব্লার পক্ষে ত নিশ্চয়ই। বাব্লার ললাটের সিঁদুর বিন্দু যেমন অক্ষয়, ভৈরবের মনের মাঝে তার সত্য পরিচয়ও তেমনি অক্ষয় হ'য়ে গেঁথে গেছে।—

ছোট্ট পাহাড়ের গা ঘেঁষে সূর্য্য ডুবে যায়।—

ভৈরব সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। এক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এই যাঃ—

তার ছোট বোন কনক বলে, দাদা, যাও না একটু এদিক সেদিক ঘুরে এস'। কি যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘাপ্‌টি মেরে ঘরে ব'সে থাক'। বন্ধু বান্ধবরাও কি সব ম'রে ভূত হ'য়ে গেল? তারাও যে আর ডাকতে আসে না। বলি, থিয়েটারের পার্টিটাও কি উঠে গেছে?

ভৈরব বলে, না, সবই ত তেমন আছে।

কনক অতি সহজ ভাবেই বলে, আবার সেই সবের তত্ত্বাবধান একটু কর দিকি।

ভৈরব একটু হাসে। তারপরে বলে, পঁচিশ বছর আমার অমন করেই কেটেছে, আর পঁচিশটা বছর যদি তেমন ক'রে না কাটে তবে সে দোষ কি আমার?

—না, না, দোষের কথা হচ্ছে না। তখনও ত বলেছি, এ সব বাজে জিনিষ নিয়ে কি যে দিন কাটাও—আর এখন আবার বল্‌চি, সেই সবই আবার ধর; এম্‌নি অদ্ভুতই আমাদের বলার রীতি। দোষ তাদেরই যারা বলে। কিন্তু জলের মাছ ডাঙায় ভাল দেখায়, দাদা?

ভৈরবের সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে যায়,—তাইত অমন সখের হুইলের ছিপ্‌টি অব্যবহারে হয়ত বা নষ্টই হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলে, কনক আমার ছিপ্‌টি আছে ত? না, বাব্লা কাউকে দান করে' বসে আছে? রূপদীঘিতে আজকাল নাকি খুব বড় বড় মাছ গাঁথা পড়ছে। কাল ছিপ্‌টা নিয়ে একবার ব'সে দেখলে হয় কিন্তু।

কনক বলে, বেশ ত। আমি চার টার সব ঠিক ক'রে রাখব—বল বসবে?

—আচ্ছা, ঠিক ক'রে রাখিস্। ব'লে ভৈরব আসন্ন সন্ধ্যায় লাল কাঁকরের উঁচু নীচু রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

কনক স্বস্তি অনুভব করে।

•

লাল্টু কনকের স্বামী। কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া একমাথা চুল। মাথাটা তাই মস্ত দেখায় কিন্তু ছিল্‌বিলে এম্‌নি রোগা লম্বা যে গা-পায়ের সঙ্গে মাথাটা মোটেই খাপ খায় নি।

হঠাৎ দরজাটা ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, তুই পই পই ক'রে বারণ ক'রে এলি কনক—তবু ত এলাম।

পারিনা ভাই। একলা থাকতে কি ভাল লাগে ছাই, না ভালও দেখায়?

কনক দাদার সামনে স্বামীকে প্রবেশ করতে দেখেই ঘোমটা টেনে স'রে দাঁড়ায়। তারপরে স্বামীর মুখের কথা শুনে লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যায়। ইচ্ছে হয়, ছুটে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরে, কিন্তু তাই কি পারা যায়! একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

লালটু পলায়নতৎপর কনকের দিকে একবার চেয়ে নিয়েই ভৈরবের পায়ের কাছে এসে ধপ্ ক'রে মাটিতে ব'সে প'ড়ে বলে, কনককে নিয়ে যেতেই আসা কিন্তু আমার। কোন বাধা আমি শুনব না।

ভৈরবের সমস্ত মন আনন্দে ভ'রে ওঠে; বলে, সে আর বেশী কথা কি! বাধা ত ওর কিছুই নেই।

লালটু ভারী খুসি হ'য়েই বলে, তোমার যে দাদা কি ধনুকভাঙ্গা পণ—আরে না, না···কি না বলে, হ্যাঁ, ভীষ্মের পণ। এইবার একটা ভাল মেয়ে দেখে শুনে বিয়ে ক'রে ফেল দাদা। কেন যে,—এই কনক—অবশ্য ভগবান না করেন—যদি একদিন মারাই যায় তবে কি আমি চিরকুমার হ'য়ে বসে থাকব নাকি? সে আমি পারব না, তা তোমাদের মুখের সামনেই ব'লে রাখচি।

ভৈরব উচ্চ হাস্য ক'রে বলে, ও কনক,—শোন্, আমাদের লালটুর কথা শোন্। তুই মারা গেলে ও নাকি চিরকুমার থাকতে পারবে না।

লালটু সহসা রাগতঃ কণ্ঠে ব'লে ওঠে, যাও; কথায় অত ভুল ধর কেন বল ত? চিরকুমার বলিচি না হয় ভুলই হয়েছে। তা অত ঠার কেন? আমরা যে গোমুখ্খু পাড়াগেঁয়ে মানুষ সে ত সবাই জানে।

ভৈরব হেসে বলে, লালটু, সে কথা আমি বলিনি। আর পাড়াগেঁয়ে তোমার মত গোমুখ্খু মানুষদের আমি শ্রদ্ধা করি, তা জান বোধ হয়?

—তা খুব জানি। কনককে ত তাই বলি যে, দাদা আমায় এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে আর তুই তার মার পেটের বোন হ'য়ে কিনা আমাকে আমল দিতে চাস্ না। অবশ্য ছেলেমানুষ, বোঝে সোঝেও কম—

ভৈরব বিপুল বেগে হেসে ওঠে। কনক হাসি কান্না দু'টোরই সীমা অতিক্রম ক'রে ফেলে এতক্ষণে।

লালটু ভৈরবের হাসির ঘায়ে কিছু বিব্রত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বলে, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ বাপু, মনে আর মুখে এক। ফস্ ফস ক'রে যা মুখে আসে ব'লে যাই। তোমরা হ'লে সহুরে লোক—হাসবেই ত।—

ভৈরব মামা বাড়ী থেকেই মানুষ। আর লালটুর সঙ্গে পরিচয় তার সেই অতি শৈশবেই। দু'জনে এক পাঠশালায় পড়ত। ভৈরবের সেদিনের রুদ্র নেশার সঙ্গী ছিল লালটু। তখন কনকের সঙ্গে তার বিয়ের কথা কেউ ভাবতেও পারেনি।

লালটুর লেখাপড়া বেশী দূর এগোয়নি কিন্তু কনকের সঙ্গে তার বিয়ের কথা যেদিন উঠে পড়ল সেদিন ভৈরব আর সকলের চেয়ে যে বেশী খুসি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভৈরবের মাসীমা আপত্তি তুললেন, অমন রূপে গুণে লক্ষ্মীকে আমার একটা মুখ্খুর হাতে তুলে দিতে ইচ্ছে হয় না। ও ওর মর্ম্মই বুঝবে না।

ভৈরব সেদিন জিদ্ ক'রে মাসীমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেঁয়ো মুখ্খু ছেলেটার হাতেই কনককে নিতান্ত নির্ভয়ে সঁপে দিয়েছিল।

লালটু তাই মাঝে মাঝে বলে, দাদা, তোমার সেদিনকার ঋণ আমি শুধতে পারব না কোনদিন।

ভৈরব আস্তে একটা ধমক দিয়ে বলে, আঃ, কি যে যা তা বলিস্ লালটু। কনকের মুখ চোখ কেমন লাল্‌চে হ'য়ে উঠ্‌ছে দেখছিস না।

কনক রাগে লালটুর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকে ব্যঙ্গ ক'রে রান্না ঘরের দিকে চ'লে যায়। মনে মনে বলে, আঃ, কি যে বুদ্ধি ওর!

···কিন্তু এত বড় লজ্জার কথায়ও অন্তরে তার খুসি ঘনায়।

পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে। কনককে ডেকে ভৈরব বলে, কনক, আজ ওরা

অনেক ক'রে ব'লে গেছে। যাই একবার থিয়েটার পার্টি থেকে ঘুরে আসি। যদি একটু রাত হয়, কিছু ভাবিস্‌নে যেন আবার।

কনক আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বলে, বেশ ত, যাও না সেথা একবার।

ভৈরব লাল্‌টুকে লক্ষ্য ক'রে বলে, কাল বুধবার—কনকের জন্মদিন, পরশু বৃহস্পতিবার, তার পরের দিনটাও নাকি ভাল না, তবে শনিবারই—কিন্তু না, সেদিনও ত যাওয়া হ'তে পারে না, এই রবিবারের আগে ত তোদের তবে কোনমতেই যাওয়া হ'তে পারে না দেখ্‌ছি।

কনক বলে, সে দেখা যাবে। এখন তুমি ঘুরে এসো।

ভৈরব বলে, আচ্ছা, কাল না হয় তা ঠিক করা যাবে, কেমন লাল্‌টু?

লাল্‌টু বলে, একটু তাড়াতাড়ি হ'লেই ভাল হয় দাদা। ক্ষেতে মুনিষ লাগিয়ে এসেছি, বেটারা অসাক্ষাতে যা কাজ করছে তা ত বুঝতেই পাচ্ছি।

ভৈরব লাল্‌টুর হাত ধ'রে বলে, চল, একটু 'রিহার্শেল' দিয়ে আসা যাক্‌।

লাল্‌টু বলে, চল, কিন্তু কনক একলাটি থাকবে যে—

ভৈরবের ভারি হাসি পায়, বলে, এত ভয় যদি তবে ব'সে পাহারা দে।

লাল্‌টু বলে, ভয় কি আমার—আচ্ছা চল।

দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে গেলে কনক দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে দিয়ে মনে মনে বলে, রবিবার যাওয়া হ'তেই পারে না। ও থাকলে দাদার মনটাও খুসি থাকে। যেমন ক'রে হোক্‌ ওকে রাখতেই হবে।

আর ওকে রাখা যে কত সহজ তা কনক ভাল ক'রেই জানে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে লাল্‌টু বেশ গর্ব্বের সঙ্গেই বলে, আঃ, এই এখানকার থিয়েটার পার্টি! কী ভাগ্যিস্‌ দাদা ছিল, নইলে ওরা করত থিয়েটার! হ্যাঁ, দাদা যা বলে—একেবারে 'ফাষ্ট কেলাস', আর সব ওঁচা—একেবারে যাকে বলে গিয়ে 'র' মাল। অবশ্য অর্জ্জুনের পার্ট ত আর শোনা হয়নি, তার নাকি জ্বর হয়েছে। সবাই বললে, লাল্‌টু বল না হে, তোমাকে দিয়েই আজকের কাজটা সেরে নেওয়া যাক। আমি—পাড়াগেঁয়ে মানুষ হ'তে পারি, থিয়েটার না ক'রে থাকতে পারি কিন্তু ভয় পাব তা ব'লে, সে পাত্রই নই। ব্যস্‌, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ব'লে যাওয়া গেল। সবাই বাহবা দিলে। বললে, ওকে দিয়েই 'পার্টটা' করাতে হবে। আমাকে ধ'রে রাখবার জন্যে সবাই দাদাকে সে কি ধরাধরি।

এইবার ভাবনাযুক্ত কণ্ঠে বলে, মহা মুস্কিলে পড়া গেল যে কনক। কি করি বল না? দিন পনর কি আমার এখানে ব'সে থাকা চলে? ক্ষেতের কাজে কত ক্ষতি হ'য়ে যাবে বল ত?

ক্ষণিক নীরব থেকে আবার বলে, তা একটু ক্ষতি যদি হয়ত হোক্‌ তবু থিয়েটারটা মাটি হ'তে দেওয়া ঠিক না, কি বল?

কনক কোনমতেই হাসি চাপতে পারে না, বলে, না কোনো মতেই ঠিক না।

এমন সময় ভৈরব পাশের ঘর থেকে ডাকে, কনক, একবার শুনে যা।

কনক কাছে এসে দাঁড়ালে ভৈরব বলে, কনি, তোদের ত তা'হ'লে যাওয়া হবে না। লাল্‌টুটা এমন আহাম্মক,—সবাই ধরেছে ব'লে কি কাজের ক্ষতি ক'রে থিয়েটার করবার জন্যে থাকতে হবে? কিন্তু ও ভারী চমৎকার বলে ত। তবু ওর কিন্তু উচিত ছিল 'পারব না' ব'লে আসা। এই সড়্‌ গড়্‌ করতে করতেও ত পনরটা দিন কেটে যাবে।

কনক বলে, আমার ত সবই জানা আছে দাদা,—ক্ষতি যদি হয়ই ত খুব সামান্যই হবে। সেজন্য কোন ভাবনা নেই তোমার।

ভৈরব বলে, তবে ত ভালই। তোদের রাখতে পারলে আমি যেন বাঁচি।

পরদিন কনক তার ঠাকুরপো পল্টুকে চিঠি লিখে দেয়,—মাঠে কাজ হচ্ছে, মুনিষরা যাতে ফাঁকি না দেয় সেদিকেও একটু নজর রেখো। অবশ্য পড়ার ক্ষতি যাতে না হয়। আমাদের আসতে একটু দেরী হতেও পারে।

চিঠির উত্তরে পল্টু লেখে, আমার পরীক্ষা এসে গেছে। মুনিষদের কাজ দেখবার সময় আমার নেই, গরজও নেই।—

এমন সব অনেক রাগের কথা। সর্ব্বশেষে কেমন নরম সুরে লেখে, আমার একলা থাকতে ভাল লাগে না, ভারি কষ্ট হয়। সবই ত তুমি জান বৌদি। তবু তুমি দেরী করবে কেন?

কনক চিঠি প'ড়ে মনে মনে হাসে। সে জানে পল্টু তার স্নেহের আদেশ অমান্য করতে পারবে না।

লাল্টুর খাওয়া নাওয়া চুলোয় গেছে। দিবারাত্র 'পার্ট' মুখস্ত করে।

কনক বিরক্ত হ'য়ে বলে, বলি, আমাকে এই বুঝি নিতে আসা তোমার?

লাল্টু বইয়ের ওপর থেকে মুখ তুলে বলে, আঃ, যাও, বিরক্ত করো না এখন। দেখছ না 'পার্ট' মুখস্থ করছি! আচ্ছা, ধর ত বইটা একবার—কেমন না হড়্-গড়্ ক'রে ব'লে যেতে পারি।

বইটা কনকের হাতে গুঁজে দিয়ে লাল্টু উঠে দাঁড়িয়ে এমন ভাবব্যঞ্জনা সুরু করে যে কনক অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বইটা তার গায়ের ওপরেই ছুঁড়ে মেরে শেষকালে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

লাল্টু মহা অপ্রস্তুতের মত একটু হাসে। কিন্তু তার সমস্ত উৎসাহ কনক যেন দু'পায়ে দ'লে চ'লে যায়।

থিয়েটারের দিন যত ঘনিয়ে আসে, কনকের দুর্ভাবনা তত বাড়ে। লাল্টু থিয়েটার নিয়ে বেশ মেতে আছে, ভৈরবকেও প্রায় মাতিয়ে তুলেছে। এমন ক'রে যে কটা দিন কাটে,—তাই যেন তার পরম লাভ।

ওদিকে পল্টুর চিঠি প্রায়ই আসে।

কনক ভেবে পায় না, এই তিনজনের দাবী সে একলা কেমন ক'রে মেটাবে।

ভৈরব আর লাল্টু 'রিহার্শেল' দিয়ে যত রাত্রেই বাড়ী ফিরুক কনক তখনও জেগে ব'সে থাকে। তার এই এক ভাবনা কিন্তু সমাধানও সে ক'রে উঠতে পারে না।

বাড়ী ফিরতেই লাল্টু বলে, এবার দেখিয়ে ছেড়ে দেব যে হ্যাঁ, পাড়াগেঁয়ে মুখ্খু মানুষেরও আর্ট জ্ঞান আছে। মুখের কথায় আদ্দেক, আর বাকী আদ্দেক ত 'পস্চারেই' মেরে দেব। অবশ্য দাদাকে ছাপিয়ে যাওয়া বড় চারটি্ খানি কথা না,—ওর যে গলাটাই ঈশ্বরদত্ত কিনা। ঐখানেই ত ভগবান মেরে রেখেচেন আমাকে, নইলে—

কনক বাধা দিয়ে বলে, নইলে কি যে করতে সে আর শুনে আমার কাজ নেই। এখন যাচ্ছ কবে তাই শুনি?

—যেদিন বলবে সেদিনই। অবশ্য থিয়েটারটা না হ'য়ে গেলে আর যাই কেমন ক'রে?

—কিন্তু গেলেই ত আর হলো না, দাদারও একটা বন্দোবস্ত ক'রে যাওয়া ত আমার উচিত? আমি গেলে পর দাদার যা হাল হবে সে ত বুঝতেই পাচ্ছি। না হবে সময়ে খাওয়া, না হবে নাওয়া। আবার যদি এখন জ্বরে প'ড়ে যায়?

লাল্টু চিন্তান্বিত হ'য়ে বলে, তা তুমি কি করতে বল? আর একটা বিয়ে করানো দাদাকে কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমি সে কথা আর তুলতেও পারব না। বাপ্‌রে, সেদিন আমাকে যে অপমানটা করেছে। বলে কিনা, তুমি যা শিখিয়ে দাও আমি তাই বলি। কেন, আমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই নাকি? পাড়াগেঁয়ে লোক ব'লে কি ঘাস খাই যে এটাও বুঝি না, বউ ম'রে গেলে কষ্ট না পেয়ে আর একটা বিয়ে করাই ভাল।

কনক মুখ টিপে হেসে বলে, তবে ত ভারী অপমান করেছে।

—হ্যাঁ, তা করেছে বই কি!

—এত বড় বুদ্ধিমানকে ?

—যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা—আর ঠাট্টা। ব'লে লাল্টু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অভিনয় শেষে—

দশজনে দশরকম বলে। মোটের উপর কিন্তু লাল্টু পাড়াগেঁয়ে লোকের মধ্যে যে আর্ট-জ্ঞান থাকতে কোন বাধা নেই তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে।

ভৈরবের আবার কাজ ফুরিয়েছে।—

পাহাড়ের ধূসর গায়ের ওপর চোখ পেতে ব'সে থাকতেই তার ভাল লাগে। আবার তেম্‌নি ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে।

বাব্‌লা যেন তার ও পথ দিয়েই চ'লে গেছে।

কনক বলে, দাদা, আমাদের আজকালই ত একদিন যেতে হবে।

—তা বেশ, আবার শিগ্‌গিরই আসতে চেষ্টা করিস। আমি লাল্টুকেও ব'লে দেব'খন।

কনক কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, দাদা, আমার কাছে তোমাকে একটা প্রতিশ্রুতি করতে হবে। বল, এবার আর অনিয়ম করবে না, শরীরের ওপর যত্ন নেবে। ছিমতীর মাকে ব'লে যাব সেই তোমার রান্নাবান্না ক'রে দেবে, তাকে মাসে দু'টো ক'রে টাকা দিলেই চলবে। আমি খবর নেব, যদি এদিক ওদিক একটু হয় আমি সেই দণ্ডেই কিন্তু আবার চ'লে আসব।

ভৈরব অন্যমনস্কভাবে বলে, না কনক, এবার দেখিস্ তুই—কিছুতেই আর অনিয়ম হবে না।

কনক বলে, মনে থাকে যেন।

আবার বাড়ীটা শূন্য খাঁ খাঁ মনে হয়—

পাহাড়ের গায়ে শুধু তার নির্ভুল হাতছানি। সেই বেশ—মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে।

দিনান্তের শেষ চাহনি বড় করুণ।—

শ্রীমতীর মা তাকে বারান্দায় তখন চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে বলে, দাদবাবু, একবার উঠে দু'পা ঘুরে এসো দিকিন্।

ভৈরব উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ শ্রীমতীর মা, কনক গিয়ে কোন চিঠি লেখেনি, না ?

—বাঃ, ঐ যে দিলুম সেদিনে তোমার হাতে।

—ও, হ্যাঁ, পেয়েছি বটে !

বাড়ীর কাছে পাহাড়ের নাম গন্ধ নেই। দূরে—বহু দূরেও নীল আকাশের পাশ বেয়ে মেঘ নামার মত পাহাড়ের অস্পষ্ট মূর্ত্তি চোখে পড়ে না।

কনক তাই ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়ে সেখানে ব'সে ব'সেই ভাবে, বাব্‌লার কথা, বেশী ক'রে তার দাদার কথা।

লাল্টু ফিক্ ক'রে হেসে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে কনকের মাথার খোঁপাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বলে, কি ভাবছ ব'সে, বল না ?

—ভাব্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু।

—আমি ব'লে দিতে পারি, কি ভাবছ তুমি। নিশ্চয় তোমার দাদার কথা। হ্যাঁ বাপু, অত শত ভাবনার কি দরকার ? আর একটা বিয়ে করালেই ত পার ?

—পারলে করাতাম বই কি !

লাল্টু কি যেন ভাবে, তারপরে হঠাৎ কনককে মুক্তি দিয়ে বলে, আমি সব বুঝি। তোমার দাদার ওপর আর কারও অধিকার জন্মায় এ তুমি চাও না।

কনক তেম্‌নি কঠিন কণ্ঠেই জবাব দেয়, চাই-ই ত না।

—আচ্ছা ! লাল্টু সচেষ্ট পদশব্দে কক্ষ ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়।

দু'জনে এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি হয়। কনক রাগারাগি ক'রে পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে বারো মাইল দূরে দাদার বাড়ীতে চ'লে আসে।

পল্টু পরের দিনই আবার বাড়ী ফেরে। লাল্টু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে পল্টা, তোর বৌদি কি ব'লে দিলে, সব ঠিক ঠিক বল ত ?

পল্টু সসঙ্কোচে বলে, বললেন, নতুন বৌদিকে আমারই মত ভক্তি শ্রদ্ধা করো পল্টু।

—এ-ই! লাল্টু হো হো ক'রে অকারণে হাসে। বুকে তার ভারি ব্যথা।

দিন দুই ছট্‌ফট্‌ করে। একদিন কাউকে—এমন কি, পল্টুকেও না জানিয়ে ভৈরবের বাড়ী চ'লে আসে।

কনকের ভারী হাসি পায় ওর মুখের দিকে চেয়ে। বলে, বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলে বুঝি?

—না, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কেন, আর একটা বিয়ে করবে না?

—পাগল!...লাল্টু কনকের একটা হাত চেপে ধ'রে বলে, মাইরি, আর কাউকে ভালই লাগে না।

কনক তার বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে বলে, নইলে করতে বুঝি?—

ভৈরব পাশের ঘর থেকে সবই শুনতে পায়। হাসে—

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পতিব্রতা

(গাথা)

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যতই সুধান গাঁয়ের হাকিমগণ—
ততই নারী মুখটি নামায়, জলে ভরা ডাগর দু'নয়ন,
শিশুটিরে ততই জোরে আঁকড়ে ধরে বুকে,—
জবাব কিন্তু দেয় না কিছুই মুখে।

পঞ্চায়েতের প্রপঞ্চেতে সেদিন গ্রামে তাই
স্থির হ'ল সে দুঃখিনীরে এ গ্রাম হ'তে তাড়িয়ে দেওয়াই চাই;
কারণ তাতে গ্রামের বড়ই ক্ষতি—
ওর দৃষ্টান্তে পাছে সবাই শ্রদ্ধা হারায় সতীত্বেরি প্রতি।

বিচারকদের বিচার হ'ল শেষ—
দণ্ড নিল নারী, দৃষ্টি-নির্নিমেষ,—
—দাও তাড়িয়ে, ঘোল ঢেলে ওর মুড়িয়ে মাথার কেশ।

সমাজ-পতি স্বামীরে তার বল্‌লে চারু-লতা
—"দোহাই, স্বামি, শুনোনাক' এদের কারু কথা।
এরা সবাই মিথ্যা কথার ছলে
পতিহীনা দরিদ্র সে ব'লে,
কর্‌তে চাহে কলঙ্কিত—ব্যর্থ-কামী
যত পশুর দল
ক্ষুব্ধ নহে তা'তে সেতো, আছেই অচঞ্চল।
কেবল স্বামীর ভিটের মায়াই তা'কে
গাঁয়ের সাথে বেঁধেছে তার মনটি শত পাকে।
এ চক্রান্তে ভুল্‌বেও যে তুমি,
ভাব্‌তে সেটা, পায়ের তলে মোর
যাচ্ছে স'রে ভূমি।"

বিজ্ঞ-ভাবে কইল পতি—"চারু,
আমি গাঁয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা, ভাবো, এমন সাধ্যি আছে কারু
আমায় ঠকায় মিছে কথা ব'লে আমার পাশে ?
তোমার কথা শুনে আমার হাসিই কেবল আসে !
বিশেষ ভেবে দেখেছি তো আমি,
কেমন ক'রে দিন চলে ওর, নেইক' যখন জমিদারী
তেজারতী স্বামী ?
এটা ছাড়া, সন্দ করেন শিরোমণি প্রভু,
যে-সে লোক তো তিনি নহেন,
তাঁর কথা কি ঠেল্‌তে পারি কভু ?"

"কেবল কথা ? সন্দ মাত্র ? এই কি নারীর দাম ?
সত্যি হোক্ কি মিথ্যেই হোক্, হ'লেই হ'ল নাম ?
অম্‌নি নারী ভাঙে কাচের বাসন,
শূন্য ক'রে গৃহের দর্প-আসন,
নির্ব্বাসনের দণ্ড নিয়ে আস্তাকুঁড়ে যাবেন দেবী
এই কি সমাজ-শাসন ?
বৃথাই অনুযোগ—
জবাব দিলেন হেসে স্বামী—"মহাপাতক ব্যভিচারের
করুক্ ফল ভোগ।"

পাঁচ বছরের মাঝে—
দেখ্‌ল চারু কতই ব্যাপার গাঁয়ের এ সমাজে,
ধর্ম্ম-ধ্বজী সমাজপতি কথায় এবং কাজে।
কিন্তু তা'তে মন তার ত দেয় না কোনো সাড়া,
নিজের কথাই করে সদাই একলা নিজের মনে তোলাপাড়া।
স্বামী থাকেন গৃহান্তরে প্রণয়িনীর সহ,
চারু থাকে একলা ঘরে, কাঁদে কেবল কাঁদে অহরহ।

বাজ ডেকেছে সেদিন গাঁয়ের পথে
বের হওয়া তো যায় না কোনোই মতে ;
কাজেই নিরুপায়

স্বামী এলেন আস্তে আস্তে, শুতে চারুর ঘরে বিছানায়।
যা' ক'রে হোক্ রাত কাটাতে হ'বে—
অধৈর্য্য ও অশোয়াস্তি—তাঁহার দেহে চক্ষে কণ্ঠরবে।
এতদিনের পরে
স্বামীরে আজ আস্‌তে দেখে হঠাৎ নিজের ঘরে
আচম্বিতে শয্যারি একধারে,
শুয়ে ছিল, ধড়্‌মড়িয়ে উঠ্‌ল চারু দাঁড়িয়ে একেবারে।

কইল স্বামী শুষ্ক গলায়—"উঠ্‌চ কেন ? শোও,
একি হ'ল ? যাচ্ছ কোথা ? থোও, বালিশ থোও,
ভাব্‌লাম ব'সে সন্ধ্যাকালে চারুরে মোর আজ
দেখ্‌ব অনেক দিনের পরে, থাক্‌গে প'ড়ে
অন্য সকল কাজ।"—
শেষ না হ'তে স্বামীর সমাদর
চারু এসে কর্‌ল দখল খিল্ লাগিয়ে তারই পাশের ঘর।
অবাক্ এবং ক্রুদ্ধ হ'য়ে পতি
ভাব্‌তে ভাব্‌তে উঠ্‌ল রেগে স্ত্রীর এ কাজে অতি।
এ কি অসভ্যতা ?
এ রাত্তিরে অন্য ঘরে খিল এঁটে এ কেমন রসিকতা ?
ধাক্কা মেরে দোরে
লাগ্‌ল পতি কর্‌তে শাসন পত্নীরে সজোরে,
পাতিব্রত্যে সন্দ তাঁহার উঠ্‌ল হঠাৎ জেগে।

অশ্রু-চাপা ভারী গলায় কইল চারু রেগে—
"পুরুষ যদি সন্দ শুধু ক'রে
নিরপরাধ নারীরে এক তাড়ায় গলায় ধ'রে,
নারী তবে পার্‌বেনাক' কেন
তোমার মত ব্যভিচারী হেন
স্বামীর সঙ্গ এড়িয়ে এমন চলা ?
হোক্ নাকো স্ত্রী যতই সে অবলা !
পরের পুরুষ এখন তুমি, পতিব্রতার পরপুরুষের ছোঁয়া
লাগতে যে নেই—অটুট শুধু থাকুক হাতের নোয়া।"

প্রলোভন

নরউইজিয়ান লেখিকা—জোহানা উড্

অনুবাদক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"আজ সকালে মিঃ চার্লস রবার্ট-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল ; সে তোমাকে তার নমস্কার জানাতে বলেছে—"

ইভানা তার স্বামীকে চায়ের বাটিটা এগিয়ে দেবার সময় তিনি খবরের কাগজখানির ওপর থেকে মুখ তুলে এই কথাগুলি বলেন।

উদাস নয়ন ছুটি তুলে ইভানা বাড়ির সুমুখের ফুল-বাগিচার দিকে তাকায়—বিচিত্রবর্ণ ফুলের স্তবকের ওপর অস্তরবির রক্ত-রশ্মি প'ড়ে তাদের চার পাশে রঙের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল সৃজন করেছে—

"ওঃ ! তিনি এখন এই শহরেই আছেন, না ?" সে বলে।

—"তিনি এখানে অনেকদিন যাবৎই আছেন ; তবে থাকেন পূর্ব্বাঞ্চলে এবং তাঁর কাজও অনেক। বার-লাইব্রেরীতে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। মাত্র আজকে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় জানলুম যে তাঁরও আদত বাড়ি ফ্রিস-ল্যাণ্ডে ; এবং তোমাদের মধ্যে ছেলে বেলায় চেনা-পরিচয় ছিল।"

—"হ্যাঁ···ছিল···আমাদের এক গ্রামেই বাড়ি! ওর বাপ পুরুতগিরি করত। রবার্ট কি বিয়ে করেছে ?"

—"না, এখনও করেনি ; তবে তার বয়স এখনো পেরোয় নি—। ভদ্রলোক এরই মধ্যে ওকালতিতে বেশ পসার ক'রে ফেলেছে।"

—"সে আমার চেয়ে দু বছরের বড় ;" ইভানা নিজের মনে বলে—"তার বয়স এখন ত্রিশের কম নয়।"

—"ওই রকমই হবে। আচ্ছা ; আমি এখন চল্লুম—রাত্রে বোধ করি আর ফিরতে পারবো না···"

"এখন চল্লুম—রাত্রে ফিরতে পারবো না···"তাদের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বছর ধ'রে এমনি ধরণের প্রীতিলেশহীন শুষ্ক বিদায়-বাণী ইভানা নিত্যই শুনে আসছে···

তার প্রতি স্বামীর এই ঔদাসীন্য এখন তার সহ্য হ'য়ে গেছে···স্বামীকে ভালবাসার মিথ্যা অভিনয়ের দ্বারা সে এখন আর ভুলিয়ে রাখতে চায় না···

একটা রিক্ত নগ্ন উদার অবসন্নতা তার অন্তর জুড়ে বসেছে—

ধীরে ধীরে ছেলে মেয়েদের জন্য খাবারগুলো সাজিয়ে রাখে—আনমনা হ'য়ে···

চঞ্চল, ক্ষিপ্রগতিতে তার স্মৃতি ছুটে যায়—সুদূর অতীতের পানে—

আজকের এই প্রসার-প্রতিপত্তিশালী রবার্ট তখন ছিল একজন বিশ্রী, আধুনিক-সভ্যতা-জ্ঞানহীন গেঁয়ো যুবা—সদা-সর্ব্বদা ইভানার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াত—সময়ে অসময়ে তার প্রেম-নিবেদনে ইভানাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলত—

ইভানা তার এই আদব-কায়দা-হীন, অশিক্ষিত প্রেমাকাঙ্ক্ষীর ব্যবহার দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ত—

'রব্'কে ভাল লাগলেও তাকে নিজের প্রেমাস্পদের আসনে বসাবার কল্পনা ইভানা কোনদিন করে নি···

তাই তার ভাব-প্রবণ উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে তীব্র ব্যঙ্গ-হাস্যে তাকে অপ্রতিভ ক'রে তুলত।···

তারপর সহসা তাদের জীবনে এল—বিরাট বিপুল পরিবর্ত্তন—

রবার্ট য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে চ'লে গেল ; ইভানার বিবাহ হ'য়ে গেল ; বাল্য-বয়সের হাসি-কৌতুক-ভরা দিনগুলো স্মৃতির কোঠায় সঞ্চিত হ'য়ে রইল···।

আজ দশ বছর তার বিবাহ হয়েছে ; কিন্তু এই দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে যথার্থ ভালবাসার আস্বাদ একটি দিনের জন্যেও সে পায় নি—

ছোট বেলার অনবদ্য চঞ্চল দিনগুলো···তারি মাঝে, খেলার সাথী রবার্টকে আজ বারে বারে মনে পড়ে !

ইভানার কাছে খেলায় স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার ক'রে রবার্ট বিষাদ-মাখা ডাগর চোখ দুটি মেলে তার পানে তাকিয়ে থাকতো ;—সে দুটি চোখের ভিতরে ব্যর্থ ভালবাসার নিগূঢ় ব্যথার আঁধার ঘনিয়ে উঠ্‌তো ।

গর্ব্বিতা বিজয়িনী বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি দিয়ে তার উত্তর প্রদান করত !

তার সেই হৃদয়-হীনতা স্মরণ ক'রে আজ সহসা ইভানা অন্তরের মধ্যে একটা কোমল আর্দ্র বেদনা অনুভব করলে ।

ছেলে মেয়েদের কলকণ্ঠে তার চিন্তার মায়াজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়—

কলরব করতে করতে তারা ঘরে ঢোকে—

টেডি, এমা—

কেউ মার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ; কেউ পিঠের ওপর উঠে কচি হাত দুখানি দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে—

ইভানার আনন্দ-বৈচিত্র্য-হীন রুক্ষ জীবনে স্বর্গের অনিন্দ্য কমনীয়তা আনে এরা ।···

মাকে ঘিরে তাদের বই নিয়ে বসে—কেউ পড়া মুখস্থ বলে ; কেউ মানে জিজ্ঞেস করে ।

ইভানার চোখে অতীতের ছবিটা ম্লান হ'তে ম্লানতর হ'য়ে শেষে লুপ্ত হ'য়ে যায় !

শীতের সকাল—

শহরের চওড়া রাস্তার ওপর প্রাতঃসূর্য্যের মিঠে আলো ছড়িয়ে পড়েছে—

সেই রোদে পিঠ রেখে ভিখারী কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা করছে ।

খবরের কাগজ-ওলা তারস্বরে বিদেশী-তার ঘোষণা করছে ।

দুধারে ফুট-পাথের ওপর দিয়ে মানুষের গড্ডলিকা-প্রবাহ সুরু হ'য়ে গেছে—

এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ইভানা তার স্বামীর সঙ্গে বাড়ী ফিরছে—

খানিকটা এসে তার স্বামী বল্লে—"আমার এখানে এক মক্কেলের সঙ্গে একটু জরুরী কাজ আছে ! তোমার একা বাড়ি যেতে কোন অসুবিধে হবে—?"

—"কিছুমাত্র না ।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাস্তার ওপারে ভিড়ের মধ্যে একজন অগ্রগামী পথিকের ওপর ইভানার দৃষ্টি পড়ল ।

সঙ্গে সঙ্গে পথিকের দৃষ্টির সহিত তার দৃষ্টির সংঘাত হচ্ছে ; এবং পরক্ষণেই ইভানা আকর্ণ রক্তিম হ'য়ে উঠে তার চোখ নামিয়ে নিলে ।

তারপর যখন পথিক রাস্তা পার হ'য়ে এসে তাদের পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথার টুপি নামিয়ে অভিবাদন জানালেন তখন ইভানা তার প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে মাথা নুইয়ে উত্তর দিলে ।

পথিকের গভীর দৃষ্টি ইভানার মর্ম্মের নিম্নতম স্তর অবধি চ'লে গেল ।

সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট, বেদনা-হত শান্ত চোখ দুটি,—ইভানা তাদের ভাল ক'রেই চেনে !

তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে পথিক আর একবার ইভানার দিকে তাকিয়ে পা চালিয়ে দিলেন ।

তার স্বামী বল্লে—"রবার্ট লোকটি খুব ভদ্র ! আদব কায়দা ও বেশ দুরস্ত ।"

অন্যমনস্কের মত ইভানা কি উত্তর দিল বোঝা গেল না ।

—"কাগজে দেখলুম রবার্ট একটা খুব বড় মামলা করতে য়্যামাষ্টারডাম যাচ্ছে...লোকটার খুব ভাল বরাত··· আচ্ছা চল্লুম···"

পথের বাঁকে তার স্বামী অদৃশ্য হ'য়ে যায়!

ইভানা আনমনা হ'য়ে চলে—তার সমস্ত সত্তা তখন কি এক অজানা স্বপ্নে মগ্ন হ'য়ে গেছে—

...যদি তার সঙ্গে দেখা হ'ত তাহ'লে ইভানা তার সঙ্গে কত কথাই না বলত! ··· নিজেদের গ্রামের কথা...ছোট বেলার কথা...তখনকার বন্ধু-বান্ধবের কথা...আরও কত কি!

ইভানার ক্ষিপ্র পদক্ষেপ শ্লথ হ'য়ে আসে—

ক্রমে, গলির মোড়ে তাদের বাগানের পরিচিত ছোট গেটটি দেখা যায়—

তার পিছনে দাঁড়িয়ে আধ-ফুটন্ত ক্রিসান্থিমামগুলো মাথা নাড়ছে...

সহসা, পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ইভানা চম্‌কে ওঠে—স্বপ্ন টুটে যায়!

চোখ তুলে দেখে—সামনে দাঁড়িয়ে রবার্ট!

ইভানার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সারা দেহে একটা শিহরণ ব'য়ে যায়—মুখ লাল হ'য়ে ওঠে—বুকের রক্ত তাল পাকায়!

পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে বলে—"কেমন আছ রব?"—

অন্য কোন নামে ইভানা তাকে সম্বোধন করতে পারে না।

ইভানার ডান হাতখানি রবার্ট-এর ডান-হাতের মধ্যে মিলিত হয়—; ওই তপ্ত শক্তিমান হাতখানি ইভানার কত পরিচিত!

"তোমাকে কি ইভা ব'লে সম্বোধন করতে পারি আজো?" রবার্ট বল্লে।

"হ্যাঁ...পারো।" ইভানা অন্তরের মধ্যে একটা ক্ষীণ বেদনা অনুভব করে!

হাসির অন্তরালে মনের ভাব গোপন ক'রে রবার্ট বল্লে—"আজ এক বছর ধ'রে এই শহরেই আছি; দেখা হ'ল এতদিন পরে!"

ইভানা হেসে উত্তর দিল—"তা বটে! কিন্তু তুমি তোমার মাম্‌লা-মকদ্দমা নিয়ে থাক পুবে; আর আমি আমার সংসার নিয়ে থাকি পশ্চিমে; সুতরাং..."

হাসি-গল্পের ভিতর দিয়ে কথাবার্ত্তা সহজভাবে অগ্রসর হ'ল।

ইভানা বল্লে "জান রব্? প্রথমে আমি তোমাকে চিনতেই পারি নি, তুমি এত বদ্‌লে গেছ!"

রবার্ট ইভানার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বল্লে—"বাইরের পরিবর্ত্তন যত বড়ই হোক, অন্তরের মধ্যে আজও কোন পরিবর্ত্তন হয় নি ইভা!"

ইভানা মাটির দিকে চেয়ে থাকে—

সারা অন্তর কি এক আব্‌ছা আনন্দে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়!—জয়ের আনন্দ?

—"আজকাল বিকেলের দিকে বেড়াতে-টেড়াতে বেরোও?"

—"হ্যাঁ; বেরোই ছেলেদের সঙ্গে···"

ওঃ, তাই না কি! বটে! ছেলে-মেয়ে কটি?

রবার্টের কথায় যেন বিস্ময়ের সুর!

—"একটি ছেলে, একটি মেয়ে"...নতমুখী ইভানা উত্তর দেয়। চুপচাপ।...

গাড়ি ছোটে। হকার হাঁকে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-বাড়ির দিকে দৌড়য়—

কিন্তু এ দুটি নর-নারী স্পন্দিত অন্তরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে—তাদের দৃষ্টি পায়ের তলায় তুষারাচ্ছন্ন মাটির ওপর নিবদ্ধ ক'রে!

অবশেষে, ইভানা বলে—"শুন্‌লুম, তুমি নাকি বিদেশ যাচ্ছ?"

"এখনো ঠিক হয় নি। প্রথমে মনে করেছিলুম—যাব। এখন কিন্তু, ঠিক বলতে পারি না ইভা।"

কোন উত্তর আসে না···।

—"তুমি আজকাল 'স্কেট্' করতে যাওনা ইভানা?"

—"যাই কখনো-সখনো!"

কণ্ঠস্বরে অনুরোধের সুর মিশিয়ে, রবার্ট বলে—"আজ সন্ধ্যের সময় আসবে? আজ সেখানে মস্ত মেলা! কত

ঃ উই উড়বে ; চীনে লণ্ঠন জ্বলবে ; বল-নাচ হবে— কত শত আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আসবে ?"

ইভানা চোখ তুলে চাইতে পারে না...

পুরুষের দুই চোখের আহ্বান-ভরা উদ্দীপ্ত চাহনি—নারী তার দুর্ব্বল অন্তর দিয়ে প্রত্যাখান করতে পারে না...!

ইতঃস্তত কোরে সে উত্তর দেয়—"ঠিক বলতে পারি না, আমি..."

—"কেন পার না ইভা"—রবার্ট তার কোমল হাতখানা আবার নিজের মধ্যে টেনে নিলে—"তুমি কি আমায় ভয় কর ? অবিশ্বাস কর ?"

ইভানা চুপ কোরে থাকে—তার সমস্ত মুখে রক্ত-গোলাপের ছাপ জড়িয়ে যায়...!

রবার্ট তার কম্পিত কোমল হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বল্লে—"এস, এস, আজ সন্ধ্যায় আমায় নিরাশ কর না ইভা..."

মাথাটা হেলিয়ে রবার্ট চলে যায়—

ইভানার অন্তরের ওপর এক দুর্জ্জয় প্রভাব রেখে যায় ...দুর্নিবার তার আকর্ষণ !

ঘরের প্রকাণ্ড আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে ইভানা সাজ গোজ করছে।

তার উদ্বেল অন্তর উত্তেজনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে...

তার মনে হচ্ছে—যেন তার সুমুখে এক নূতন জীবনের সিংহ-দ্বার উন্মুক্ত হোয়ে গেছে···

এতদিন ধ'রে জীবনে সে কি পেয়েছে ?—অনাদর, অবহেলা, এবং হয়ত ঘৃণা !

সে তার স্বামীর সংসারের বিশ্বস্ত দাসী—জীবনে এর বেশী মর্য্যাদা সে আর কবে পেয়েছে...? জীবনে তার ভোগ নেই, আনন্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই—আছে শুধু নীরস কঠোর কর্ত্তব্য...!

আয়নার মধ্যে নিজের শেষ-যৌবন-ভার অবনত সুঠাম দেহের প্রতি ইভানা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—

আজকের সন্ধ্যার জন্য তার সারা প্রাণ তৃষিত হয়ে উঠেছে—!

সে আজ জীবনকে উপভোগ করবে—! এতে কিসের দোষ···? দুজনে মিলে নিভৃতে ব'সে দুটো কথা কইবে ; খানিক-ক্ষণ 'স্কেট' করবে.. এতে দোষটা কি ? অপরাধই বা কিসের ?

সে তার এই নিরানন্দ কর্কশ জীবনে একটু-খানি কাব্যের আমেজ বুলিয়ে নিতে চায়...

তার ক্লিষ্ট অস্তিত্বের মাঝে ক্ষণিকের আনন্দশিহরণ আনতে চায়...

গরম কোটটা প'রে পিঠের ওপর পশমের 'স্কার্ফ'-খানা ঠিক ক'রে নিয়ে ইভানা চুলগুলো আর একবার গুছিয়ে নেয়—

পাউডারের পাফ্‌টা আর একবার গালের ওপর বুলিয়ে দেয়...

রুমালে আর একবার গন্ধ ঢালে।

সহসা, সশব্দে ঘরের দরজা খুলে যায় ; এবং চঞ্চল-চরণে টেডি ঘরে ঢোকে—ইভানার জীবনের প্রথম স্বর্ণ-রশ্মি !

—"মা, তুমি এখানে ! ও, তুমি বুঝি বেরুবে ?"

"হ্যাঁ, টেডি।"

নিমেষ-হারা নয়নে ইভানা তাকে দেখে—কি সরল দীপ্ত শ্রী বালকের চোখে মুখে !

—"তুমি বুঝি এতক্ষণ খেলা করছিলে ?"

—হ্যাঁ মা। কি মজা ! জান মা—আবার সবাই আজকে হ্যারিকে খ্যাপাচ্ছিল ;—হ্যারিকে তুমি তো জান ; সেই যে ও-পাড়ায় থাকে—

হ্যাঁ ; ইভানা তাকে জানে। তার মাকেও সে জানতো—আজ এক বছর হল হতভাগিনী স্বামী-পুত্রকে ফেলে এক অপরিচিতের সঙ্গে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছে !

টেডি বলে—"আজকে আবার হ্যারিকে তার মার নামে কি-সব ব'লে তারা রাগাচ্ছিল···"

—"ওরা সবাই বড্ড দুষ্টু, তুমি ওদের সঙ্গে মিশো না"—ইভানার কণ্ঠস্বর কাঁপে !

—"কিন্তু ওরা আমায় কিছু বলে না মা। তুমি ওদের আচার খেতে দাও ব'লে—ওরা তোমায় খুব ভালবাসে।"

সহসা ইভানা ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নেয়—চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়ে তোলে।

খানিক পরে টেডি বলে—"তুমি কোথায় যাবে মা?"

"কোথাও যাব না বাবা"—ইভানা কোট খুলে ফেলে; তার মুখটা সাদা হ'য়ে গেছে; পেলব ঠোঁটদুটি পরস্পর সন্নিবদ্ধ হ'য়ে কি এক দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করছে।

অন্তরের মধ্যে দারুণ সংগ্রাম শেষ হ'য়ে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা স্নিগ্ধ শ্রান্তি তার সারা অঙ্গে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়!

টেডি উৎফুল্ল হ'য়ে বলে—"যাবে না কোথাও? ওঃ, কি মজা! তা হ'লে মা কালকের সেই রাজকন্যার গল্পটা আ... রাত্রে শেষ করতে হবে! আমি এমাকে ডেকে নি... আসি; এখুনি বলবে তো? অনেক বড় গল্প কিনা!"

ইভানা কৌচের ওপর ব'সে বলে—"যাও মাণিক এমাকে ডেকে নিয়ে এস..."

চঞ্চল বালক মুহূর্ত্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়—

ইভানা তার ক্ষিপ্র-চঞ্চল গমন-পথের দিকে মুগ্ধ নে... তাকিয়ে থাকে—

একটা অনির্ব্বচনীয় আত্ম-তৃপ্তির আভায় তার সমস্ত মু... উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে!!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অর্ঘ্য

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

আমার বাণী ছড়িয়েছিল ধূলোয় ধূলোময়
তোমার দ্বারে আজকে তাহার ঘটুক পরিচয়॥

সেদিন আলোর রক্তধারা নামল বনচ্ছায়ে,
ভাসিয়ে দিয়েছিলেম তরী গন্ধে ভোলা বায়ে।
দুই ধারেতে তীর দেখা যায় বাব্‌লা গাছের সারি,
উজান ঠেলে একলা আমি দিয়েছিলেম পাড়ি।
সে দিন সে যে জলের তালে আমার বুকের বাণী
বিভোল হ'য়ে করতেছিল ব্যাকুল কানাকানি।
কুঞ্জশাখে পক্ষী ডাকে পুষ্প পড়ে ঝরি,
আকুল জলে নৃত্য চলে, চিত্ত উঠে ভরি।
বাঁশের ঝোপে দূরের থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার রোলে
স্তব্ধ বনের হৃদয়খানি মুগ্ধ ক'রে তোলে।
আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে ঢেউয়ের মাঝে মাঝে,
আমার ছোট ভেলার পাশে জলের ধ্বনি বাজে।
সেই ভেলাতে ভাসিয়ে মোরে বহু দূরের পথে
আকুল হিয়ার অর্ঘ্য ব'য়ে এলেম কোন মতে।
আজকে এ যে ভোরের আলোয় দূরের থেকে এ বি...
তীরের কোলে স্নিগ্ধ তোমার কুটীর-ছায়া দেখি।
নদীর পাশে শুকন ঘাসে সিক্ত ধূলা মাখি
স্নানের কালে তোমার পায়ের চিহ্ন গেছ রাখি।
সেই চরণের চিহ্নখানি হ'য়ে আলোকময়
মুগ্ধ আমার অক্ষিপুটে বদ্ধ হ'য়ে রয়।
সে অর্ঘ্যেরে হস্তে ল'য়ে আকুল স্রোতে ভাসি।
তোমার গৃহ দ্বারের পাশে পৌঁছিনু আজ আসি।
ওগো আমার প্রিয়,
সেই আমারি বেদনখানি করুণ হাতে নিও॥

অগ্রগামী

শ্রীযুক্ত অভিনব গুপ্ত

১

সাহিত্যিকের পক্ষে আত্মানুকরণও একটা প্রকাণ্ড অপরাধ। প্রকাশে যাহার বৈচিত্র্য নাই, প্রতিভার প্রভা তাহার ধীরে ধীরে নিভিয়া আসে। পদচিহ্নহীন দুর্গম পথের অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের দুর্দ্দম বেগ সম্বরণ করিয়া যে আপনার পূর্ব্বার্জ্জিত ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাটুকুকেই কেন্দ্র করিয়া কেবল বৃত্তাকারে ঘুরিয়া মরে,—সে আর্টিষ্ট হিসাবে জীবন্মৃত; নিজের পরিমিত নিশ্বাসটুকু লইয়াই তাহার কারবার,—সযত্নে আপনার ঘুঁটিটি আগ্‌লাইয়া চলা-ই তাহার সাধনা!

আত্মানুকরণ করিয়া যে আত্মরক্ষা, সে হইতেছে কারাগারে বসিয়া বন্দীর আত্মরক্ষার মত,—সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলে বন্দী, সীমাবদ্ধ ভাবের স্থবিরতায় রুদ্ধবেগ। সত্যিকারের স্রষ্টা বা আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে একটা উন্মুক্ত উদার প্রবাহ থাকে,—মুক্তির বিপুল অজস্রতা, প্রেরণার প্রবল প্রাচুর্য্য! একটিমাত্র সূর্য্য হইলেই আমাদের চলিত,—কিন্তু তিমিরমণ্ডিত আকাশে কোটি কোটি স্ফুটজ্যোতি তারকার সার্থকতা কোথায়?—প্রয়োজনে নিশ্চয়ই নয়, প্রকাশের প্রাচুর্য্য-লীলায়।

প্রকাশের স্পষ্টতা পাওয়ার অর্থ প্রকাশের পরিপূর্ণতা পাওয়ার অর্থ—প্রকাশের পৌনঃপুন্যঃ নয়। রূপকে ব্যক্ততর করা ভাবকে বিস্তৃততর করা—নির্দ্দিষ্টতার সীমা হইতে কল্পনাকে অজস্র বিচিত্রতায় প্রসারিত করিয়া দেওয়াই সত্যিকারের প্রতিভাবানের লক্ষণ। আপনার সীমা মানিয়া লওয়া অর্থ আপনাকে ঘিরিয়া কৃত্রিম সীমা-রচনা করা নহে, আপনাকে জানা অর্থ আপনাকে খর্ব্ব করিয়া লওয়া নহে। কুঁড়ির মধ্যে রূপের একটি সীমা আছে, তাই বলিয়া তাহার একটি বিকশিতদল সম্পূর্ণ পুষ্পে এবং পুষ্প হইতে পুনরায় একটি রসসমৃদ্ধ ফলে পরিণত না হইবার কোন হেতু নাই,—বরং সেই সুসঙ্গত পরিণতির মধ্যেই তাহার সৌন্দর্য্যের সাফল্য। ফল-ও অবশ্য পাকিবে; কিন্তু তাহার সেই পক্কতার অন্তরালেই অনাগত ভাবী বীজের সুপুষ্টতা রহিয়াছে।

২

বাঙ্‌লা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে প্রকাশের অজস্র বৈচিত্র্য আর কাহারো মধ্যে পাই বলিয়া মনে হয় না। শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে কয়েকটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের কতকগুলি পরস্পরের অপরিষ্কার ছায়া মাত্র—একটি বিশেষ মত বা ভাবের প্রতিনিধি—অবস্থাভেদে তাহাদের পোষাক বা চেহারার যা একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এবং সে অবস্থাগুলিও তাঁহার উপন্যাসে বৈচিত্র্যবহুল নয়। 'Intellectual' স্ত্রীলোকের ছবি আঁকিতে গিয়া তিনি একটি ভাবকেই বিভিন্ন আকারে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন,—সেই ভাবের বহুব্যঞ্জনা নাই; sex-সম্বন্ধেও তাঁহার একটি মাত্র সিদ্ধান্ত,—তাহাকেই তিনি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাব্যস্ত করিতে চান্, নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা তাঁহার কল্পনাকে ব্যাকুল করে নাই—একটি পুরা-পরিচিত পথ ধরিয়াই তিনি আনাগোনা করিতেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রে শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একটি বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন একথা মানিতে কাহারো আপত্তি হইবে না। কিন্তু তাঁহার কবিতায় একটি ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি আছে,—প্রত্যেকটি কবিতায় একই ভঙ্গী ও একই ভাবের প্রকাশ চলিয়াছে,—যতীন্দ্রনাথ কুড়ি-অক্ষরযুক্ত লাইন্ ছাড়া অন্য কোনও ছন্দ রচনা করিলেন না; আর কোনও ছন্দ-বন্ধনের মধ্যে তাঁহার কবিতা সাবলীলতা পাইল না; একটি বিশেষ ভঙ্গীকেই তিনি আঁকড়াইয়া রহিলেন।

মোট কথা, প্রতিভাও অনুশীলনের অপেক্ষা করে,—প্রতিভাকে বর্দ্ধিতশিখা অগ্নির মত প্রধাবিত করিয়া দেওয়া চাই। একটি ভঙ্গী-সৃষ্টিতে সার্থক হইলে চিরকাল ধরিয়া বারে বারে তাহারই একঘেয়ে প্রকাশ চলিলে সন্দেহ হয় যে সেই প্রতিভাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে; একান্তভাবে নিজেকেই অনুকরণ করিয়া চলিলে মৌলিকতার মহিমা-হ্রাস ঘটে। মনে হয় সেই একঘেয়েমির স্তূপান্তরালে প্রতিভার সমাধি হইয়াছে।

৩

কাল স্পিট্লারের এই উক্তির সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সায় আছে যে, যাহার কবিখ্যাতি একটিমাত্র রচনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত সে স্রষ্টা-হিসাবে অতি নিম্নস্তরের কবি। শুধু সনেট্ লিখিয়াই শেইক্সপীয়র অবিনশ্বর গৌরবের অধিকারী হয়ত হইতেন,কিন্তু সেই শেইক্সপীয়র তুলনায় নিশ্চয়ই অতিশয় ছোট ও ম্লান হইয়া থাকিতেন। নোবেল প্রাইজ পাইবার পক্ষে গীতাঞ্জলিই যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হইবার পক্ষে একা গীতাঞ্জলির মূল্য অতি সামান্য।

কীট্সের অকালমৃত্যু না ঘটিলে তিনি শেইক্সপীয়রের চেয়েও নাকি বড় কবি হইতেন,—তাহা হইলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না। আমরা শেইক্সপীয়রের চেয়ে বড় কবি চাহি না, আমরা যৌবনাবেগোচ্ছল স্বপ্নাতুর কীট্স্‌কেই চাহিয়াছি। *Rowley Poems*-এর উপর চ্যাটারটনের অপমৃত্যুই কি একটি স্নেহ-সুকোমল মায়াবিস্তার করে নাই? নহিলে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ঐ কবিতাগুলি কি ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের গৌরবভূষণ?

সৃষ্টির সার্থকতা শুধু সৌন্দর্য্যে নয়, সৌন্দর্য্যের প্রচুরতায়। এই প্রাচুর্য্যের সঙ্গে যখন চাতুর্য্য মিলিত হয় তখনই সৃষ্টি একটি অনশ্বর মহিমালাভ করে। টমাস্ গ্রে'র খ্যাতি অত্যন্ত নিম্নদরের খ্যাতি,—গ্রে প্রতিভাশালী কবি হইলে এক 'Elegy' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নব নব সৃষ্টি-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতেন।

৪

কোন বিশেষ একটি উপন্যাস লিখিয়া কোন লেখক কৃতকার্য্য হইলে—অর্থাৎ তাহার মূল্য প্রশংসায় ও অর্থে ধার্য্য হইলে— সেই কৃতকার্য্যতাই অনেক সময়ে লেখকের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। সেই প্রশংসা ও অর্থের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ঔপন্যাসিক পরবর্ত্তী উপন্যাসে সেই প্রথম পুস্তকেরই পুনরাবৃত্তি করিতে বসেন; নিজের প্রভাব দ্বারা নিজেকে ক্লিষ্ট করিয়া কল্পনাকে স্থবির করিয়া তোলেন। প্রতিভার এইখানেই অপমৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেশের ঔপন্যাসিকদের এই দোষটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। একবার যে-ষ্টাইল্ যে-টেক্‌নিক্ অবতারণা করিয়াছেন তাহা হইতে প্রায়ই আর নড়চড় নাই,—প্রত্যেকটি বিভিন্ন পুস্তকে লেখকের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখিতে পাইনা বলিয়া নৈরাশ্য আসে। গোরা ও অমিত রায়ের মত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চরিত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর কয়টি আছে? রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত 'গোরা'র পরে 'শেষরক্ষা' লিখিবার মত প্রতিভা কি সহজলভ্য?

গল্‌সোয়ার্দির *Forsyte Saga*-র কথা মনে পড়িল। পরমবিস্ময়কর বিচিত্র চিত্র! লণ্ডনের সেই peg-top ট্রাউজার ও ক্রিনোলিন্-এর যুগ হইতে সুরু করিয়া মোটর ও বুয়োর যুদ্ধ এবং শেষে এরোপ্লেন ও লেবার্ গভর্ণমেণ্টের যুগ! কল্পনার এই প্রসার ও সবলতা বাঙ্‌লা-সাহিত্যে কবে আসিবে? আর্টিষ্ট-হিসাবে এইচ্, জি, ওয়েল্‌সের বহু দোষ সত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও অজস্রতার প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিস্থাপন করিতে হয়। তিনি আজি পর্য্যন্তও নব নব আবিষ্কারের আশায় নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিয়া চলিয়াছেন *Kipps* হইতে *The King who was a King* পর্য্যন্ত।

আমাদের সাহিত্যেও নানা রকমের ভাব ও ভঙ্গী লইয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। পাথেয় যাহার কম পথও তাহার দীর্ঘ নয়,—যাত্রার আনন্দও তাহার সেই অনুপাতে অচিরস্থায়ী।

৫

অন্যান্য ক্ষেত্রে "consistency"-র যত মূল্যই থাক না কেন সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে তার কোন সার্থকতা নাই।

পূর্ব্বোক্তির সঙ্গে পরবর্ত্তী রচনার সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে গেলে রচনা হীনবল হইয়া পড়ে, স্রোত বন্দী হইয়া হ্রদে পরিণত হয়। একটি রঙিন চশ্‌মা পরিয়া নীল আকাশকে হলুদে করিয়া দেখিয়াছি বলিয়া চশ্‌মা খুলিয়া সাদা চোখে আকাশকে অভিনন্দিত করিব না আর্টিষ্টের এ মত-কাঠিন্যের কোন সম্মান নাই,—নানা দিক হইতে দেখিবার গভীর ও সুদূর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করাই তাহার তপস্যা।

নেপ্‌ল্‌স্-এর কাছে বসিয়া বেদনার গান লিখিতে লিখিতে শেলি বন্দী প্রমেথিউসের হাহাকার শুনিলেন;—আবার সেই শেলিরই অমরসৃষ্টি Beatrice Cenci। বার্ণার্ড শ' চিরকাল প্রশ্ন ও ঠাট্টা করিয়া আসিয়াছেন—এঞ্জিন ও ডাইনামো হইতে সুরু করিয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতি;—তাঁহার নাটকে আমরা একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের তীব্রতা পাইয়া চমকিত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার অধুনাতন নাটক *Saint Joan* পড়িতে পড়িতে মনে হইল বার্ণার্ড শ' তাঁহার পুরাতন নাটকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলেন নাই, অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। *Saint Joan* এ একটি সুস্নিগ্ধ মনুষ্যপ্রীতি পাইয়া মুগ্ধ হইলাম।

৬

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে একটি প্রবল জিজ্ঞাসা আসিয়াছে;—সেই জিজ্ঞাসা স্বাস্থ্যকর। বুক ভরিয়া নিশ্বাস চাই বলিয়া বাতাসের জন্য রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত, কখনো বা চূর্ণ করিতে হইতেছে। ভিক্টোরীয় যুগের মন্ত্রোচ্চারণ বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত সত্য হইয়া নাই,—তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। "The thirst to know why this was and this was not···why people had to suffer?...why—a thousand things?" গল্‌সোয়ার্দ্দির এই বাণী অধুনাতন সাহিত্যের মর্ম্মবাণী।

উপন্যাস-রচনার রীতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন জেম্‌স্ জয়েস্, কবিতায় প্রকাশভঙ্গী নিয়া সিট্‌ওয়েল-দ্বয় বিচিত্র পরখ্ করিতেছেন,—লিটন্ ষ্ট্রেচি নূতন ধারায় জীবনী রচনা করিতে বসিয়াছেন। পুরাতন ও চিরাচরিত বলিয়াই কোনো প্রথার প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও যদি কোনো জিজ্ঞাসা আসিয়া থাকে তবে তাহা ঐশ্বর্য্যসূচক শুভ লক্ষণ বলিয়াই স্বীকার করি।

শ্রীঅভিনব গুপ্ত

বৈকুণ্ঠে বিচার

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ

পরশু আমার বন্ধু ঘোষ সাহেবের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ে বাড়ী লোকে লোকারণ্য। আমি যখন সেখানে উপস্থিত হ'লাম, তখন বিয়ে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। বিবাহ শেষে পুরুত মশাই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লেন, "তোমাদের ইহলোকের এ মধুর মিলন পরলোকেও অক্ষয় হ'ক!"

আমি এ কথা শুনে অতি কষ্টে চুপ ক'রে রইলুম। পাত্রীটি কুমারী নন—তিনি হচ্ছেন আমারই অন্যতম স্বর্গীয় বন্ধু মিষ্টার সরকারের প্রিয়তমা সদ্যবিধবা পত্নী মণিমালা। দেখছি এই সুন্দরী বিদুষী আমার বন্ধুদের উদ্ধার করবার জন্যেই জন্ম গ্রহণ করেছেন। মিষ্টার সরকারের পর মিষ্টার ঘোষ,—এর চেয়ে সোজা এ জগতে আর কি হ'তে পারে? প্রথম যখন স'রে পড়লেন—তখন দ্বিতীয় সেই স্থান অধিকার ক'রে বসলেন।

বিয়ে বাড়িতে ভোজনাদি সারতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। বাড়ী ফিরে এসে শোবার জোগাড় করতে লাগ্‌লুম—কিন্তু একটা চিন্তা মনের ভিতর অবিরত ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—'কি ক'রে পরলোকে এই সুন্দরী তাঁর এ জন্মের দুটি স্বামীকে নিয়ে মানিয়ে চল্‌বেন।'

*　　*　　*

বৈকুণ্ঠের রেলওয়ে ষ্টেশন। চারিদিকে হৈ-হৈ শব্দ। যাত্রীদের আনাগোনার আর বিরাম নেই। গাড়ীর পর গাড়ী ভর্ত্তি ক'রে লোক আস্‌ছে—যেন নদীর স্রোত চলেছে। ষ্টেশন মাষ্টার—দুর্ব্বাসা মুনি। তাঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা হ'ল। তিনি আমাকে বৈকুণ্ঠের ব্যাপার বোঝাতে লাগলেন।...হঠাৎ প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে বিধবার বেশে বন্ধু-পত্নী মণিমালাকে নামতে দেখে বিস্ময়ে চম্‌কে উঠ্‌লুম।

ট্রেণ থেকে নেমে ব্যস্তসমস্তভাবে চারদিকে চেয়ে সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ কোন্ দিকে?"

এমন সময়ে 'টিকেট কালেক্টর' নারদ মুনি এসে উপস্থিত; তিনি বল্লেন, "আপনার টিকিট?"

"এই যে মশাই।"

বন্ধু-পত্নী তাঁর টিকিট দেখাতেই নারদ মুনি বল্‌লেন, "ঠিক আছে! যান্ এ দিকে—বৈকুণ্ঠে যাবার এই পথ।"—তিনি সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন।

কি জানি কেন তাঁকে অনুসরণ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার মনে হঠাৎ জেগে উঠ্‌ল। হয়ত ঘোষ সাহেব মারা গেছেন। দেখা যাক দুটি স্বামী নিয়ে আমার বন্ধু-পত্নী কি করেন।

দুর্ব্বাসা মুনির নিকটে বৈকুণ্ঠে যাবার অনুমতি চাওয়াতে তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। তবে তাঁকে এ কথাও বললুম যে শুধু যাবার নয়, ফিরে আসার অনুমতি-টুকুও দিতে হ'বে। যে কটা দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে পারা যায়—সে কটা দিনই ভাল—মরবার পরত বৈকুণ্ঠেই চিরকাল থাক্‌তে হবে।

মুনি মশাই তাঁর পাকা দাড়ি নেড়ে হেসে বল্‌লেন—"সে বিষয়ে কোন চিন্তার কারণ নেই, আপনি সহজে ফিরে আস্‌তে পারবেন।"—ব'লে তিনি নারদ মুনির কাছে গিয়ে আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "এঁকে মশাই চিনে রাখুন, ইনি একবার ভিতরে বেড়িয়ে আস্‌তে চান, এখনি ফিরবেন।"

নারদ মুনি মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন!

বৈকুণ্ঠে গিয়ে হাজির হলুম। সরকার সাহেব ও ঘোষ সাহেব দুজন-ই ব্যাকুল আগ্রহে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—হঠাৎ তাঁদের স্ত্রীকে তার মধ্যে দেখে দুজনেই উৎসাহে দৌড়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন।

সরকার সাহেব তাঁর ডান হাতখানি ধ'রে ব'লে উঠ্‌লেন—"মণি, প্রিয়তমে।"

ঘোষ সাহেব তার বাঁ হাতখানি ধ'রে একপাশে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—"মালা, প্রাণেশ্বরী!"

মণিমালা লেখা পড়া জানা বিদুষী রমণী—এ সব বিষয়ে তাঁর বিবেচনা বুদ্ধি খুব বেশী। সে জন্য প্রথম স্বামী তাঁকে যে নামে ডাকৃতেন, দ্বিতীয় স্বামীকে সে নামে তিনি ডাকৃতে দেন নি।

যাক্। দুজনের মধ্যে কেহই ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, রীতিমত 'টাগ্‌ অফ্‌ ওয়ার' আরম্ভ হ'য়ে গেল।

"মণি!"

"মালা!"

"আমি তোমার প্রথম স্বামী।"

"আমি দ্বিতীয়—"

"আমার ন্যায্য অধিকারে না বল্‌বার কারুর ক্ষমতা নেই।"

"আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিন্—কেন মশাই বিরক্ত করছেন!"

"আপনার সঙ্গে ত কথা হচ্চে না, আপনি চুপ করুন না, আমি ত আপনাকে চিনি না।"

এ কি রকম কথা,—তাঁরা দুজন পরস্পরকে চেনেন না!—অথচ তাঁরা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁরা যে পরম বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয় স্বামী ঘোষ সাহেবকে সর্ব্বদাই সরকারের বাড়িতে দেখ্‌তে পাওয়া যেত। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌ত—যাক্ সে সব কথা! তাদের কথা কেই বা বিশ্বাস করে!

ঝগড়া এদিকে ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকারও সপ্তমে উঠ্‌ল। বৈকুণ্ঠের জীবন সুখের বটে—কিন্তু বড় একঘেয়ে—তাই সেখানে একটা কিছু ব্যাপার ঘট্‌লে পাড়াগাঁয়ের মত খুব হৈ চৈ প'ড়ে যায়। ঝগড়ার আওয়াজে বৈকুণ্ঠবাসীরা সব দৌড়ে এল—কেউ প্রথম স্বামীর, আর কেউ বা দ্বিতীয়ের পক্ষ নিলে। মণিমালা কিন্তু একেবারে চুপচাপ—মুখে একটা রা নেই। ইতিমধ্যে তিনি তাঁদের দুজনেরই হাত ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কারুরই কথার উত্তর দিলেন না।

দুর্ব্বাসা মুনি আমার পিছনে বৈকুণ্ঠে এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"এরূপ ব্যাপার এখানে হ'লে আপনারা কি করেন—কারণ পৃথিবীতে একজন স্ত্রীলোকের দুটি স্বামী থাকা ত আর অসম্ভব নয়।"

"তা নয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এইটুকুই নূতনত্ব যে দুজন স্বামীই তাঁদের স্ত্রীকে দাবী করছে। সাধারণত এক স্ত্রীর দুজন স্বামী থাক্‌লে স্বামীরা তার উপর কোন অধিকারের দাবী করে না।"

"কিন্তু বিপরীত ক্ষেত্রে—যখন দুই রমণীর এক স্বামী হয়?"

"ও, সে ত আলাদা ব্যাপার! মেয়েরা সব জায়গায় সর্ব্বদাই স্বামীকে পেতে চেষ্টা করে। এ বৈকুণ্ঠে এসেও তারা বিয়ের জন্যে পাগল।"

হঠাৎ একটা কলরব ওঠায় মুনির কথায় বাধা পড়ল। ভগবান বিষ্ণু সে সময় সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি ঘটনাক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সংক্ষেপে তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানানো হলো। বিষ্ণু ঠাকুর বল্লেন—"আঃ, এতে আর গোলযোগের কারণ কি আছে। এই রমণী ঈশ্বরে ভক্তিবশত বৈকুণ্ঠে আস্‌তে পেরেছেন। ইনি অনন্ত সুখের অধিকারিণী হবেন। ইনিই এঁদের দুজনের মধ্যে একজনকে পছন্দ ক'রে নিন।"

ঘোষ সাহেব বল্লেন—"তা যেন হলো, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা কি হবে?"

ভগবান বল্লেন—"তাতে আর কি—বৈকুণ্ঠে অনেক বে-ওয়ারিশ স্ত্রীলোক আছে—তাদের একজনকে দেওয়া যাবে।—ওগো বাছা, আর দেরী ক'রে কাজ কি—এই বেলা পছন্দ ক'রে নাও। আমার হাতে অনেক কাজ—আমার দাঁড়াবার সময় নেই।"

মণিমালা তার দুই স্বামীর মাঝখানে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর বন্ধুযুগল তাঁর মন পাবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন।

* * *

ঘোষ সাহেব বল্‌লেন, "থাক না মশাই, এসব পুরাণো বাজে কথায় কাজ কি?—"

"না—না, মশাই, থাক না নয়, আমার স্ত্রীর প্রতি আমার অটুট ভালবাসা অগাধ বিশ্বাসের কথা বলতে হবে

বৈ কি। কত লোক এসে আপনার সম্বন্ধে আমাকে কত কথা বলেছে—'ওর ওপরে নজর রেখো হে, তোমায় ও ভালবাসে বন্ধু হিসাবে, কিন্তু তার চেয়ে ভালবাসে ও তোমার বৌকে—' কিন্তু এসব বাজে কথায় কোন দিনই কান দিই নি।"

"এ বিষয়ে আমিও কম নই। দেখুন মশাই, যখন আপনার পরে আমি এঁর স্বামী হলুম, তখনও লোকে এ রকম কথা বলতে ছাড়ে নি—তারা আমার প্রিয় বন্ধু মিত্তির সাহেবের সম্বন্ধে ঐ রকম বলত। কি অসম্ভব কথা বলুন দেখি!"

হঠাৎ শ্রীমতীর মুখের উপর নজর পড়াতে দেখলুম—মিত্তির সাহেবের নামোল্লেখে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন।

ঘোষ সাহেব কিছু লক্ষ্য না ক'রেই মণিমালাকে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"গত মহাযুদ্ধে ইরাকে গিয়ে মিত্তির সাহেব মারা পড়লে সে অপ্রত্যাশিত সংবাদে তুমি যেরূপ শোকে বিহ্বল হয়েছিলে—তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমি একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছিলুম—তাতে লেখা ছিল—"

ভগবান বিষ্ণু অধীরভাবে বলে উঠ্‌লেন, "মিত্তির সাহেব আবার কে? তিনি কি ৩ নং স্বামী? আমার যে সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে!"

ঘোষ সাহেব বল্লেন, "মিত্তির সাহেব কেউ না। দেখুন ঠাকুর! একটা কথা আমার নিবেদন করবার আছে। আমাদের বিয়ের দিনে পুরুত ঠাকুর আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেছিলেন যে—স্বর্গেও আমাদের চিরমিলন হবে।"

এ কথা শুনে প্রথম স্বামী সরকার সাহেব ব'লে উঠ্‌লেন, "ঠাকুর, আমারও বিয়ের সময় পুরুত ঠাকুর ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন।"

ভগবান বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"ভারী গোলমাল ক'রে তুল্লে দেখছি। যত মূর্খ পুরুতের দল না বুঝে কাজ করবে আর এইরকম গোলযোগ বাধবে। তা বাছা, তুমিই ঠিক কর।"

এতক্ষণে শ্রীমতীর মুখে ভাষা জুটল। ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে উচ্ছ্বাসের সহিত ব'লে উঠ্‌লেন—"ঠাকুর, আপনি এ অভাগিনীর প্রতি অনেক কৃপা করেছেন, আপনি অনুগ্রহ ক'রে মিত্তির সাহেবের কাছে যেতে আমাকে অনুমতি করুন—উনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমাকে ইসারা ক'রে ডাকৃছেন।"

আমি ঘাড় ফেরাতেই দূরে একখানা মেঘের আড়ালে মিত্তির সাহেবকে ইসারা করতে দেখলুম। আবার আরও একজন—এ যে গুরুতর ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌ল দেখ্‌চি!

ঠাকুর সদয় হ'য়ে বল্‌লেন, "এ কথা এতক্ষণ বলনি কেন? তা হলে সব গোল ত মিটে গেল। আশীর্ব্বাদ করি তুমি মিত্তির সাহেবকে নিয়ে অনন্ত সুখভোগ কর। তুমি খুব ধার্ম্মিকা রমণী। বৈকুণ্ঠে তোমার স্থান হওয়া উচিত।"

হঠাৎ ঘুম ভেঙে চম্‌কে উঠ্‌লুম।

শ্রীধীরেন্ দত্ত

ফরাসী গল্প অবলম্বনে

মেজ-দি

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্ত বি-এ

অনেক তর্ক বিতর্কের পর দার্জ্জিলিঙ্ যাওয়াই ঠিক হ'ল।

বন্ধুবর প্রমথ বল্লে—আমার সময় নেই, নইলে আমিও তোমার সঙ্গে দিন কয়েক শৈলবাস ক'রে আসতুম। ভাবনা চিন্তাগুলো আর মনের কোণে জমিয়ে রেখো না ; কবিতা কয়েকমাস না হয় না-ই লিখলে।

মেজ-দা তার বিরাট বপু দুলিয়ে বল্লে—পৌঁছেই একটা তার ক'রে দেবে—আর climate suit না করলে তক্ষুনি জানাবে।

ছোড়দা তবু একটু আপত্তি ক'রে বল্লে—আমার মতে ওয়ালটেয়ার গেলেই ভাল হ'ত। সমুদ্রের হাওয়াটাই ওর সব চেয়ে বেশী উপকারী।

কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্ যাওয়ার পক্ষে আমি খুব বেশী রকম ঝুঁকে পড়েছি দেখে বড়-দা বল্লেন—ওর যখন দার্জ্জিলিঙ্ যাবার ঝোঁক হয়েছে তখন আমার মতে দার্জ্জিলিঙ্ যাওয়াই ভাল। সমুদ্রের হাওয়ার চাইতে এখন মনের ভাল লাগাই ভাল।

ছোড়দার তবু আপত্তি, বল্লে—তুমি বুঝছো না—সমুদ্রের হাওয়াতে ozone থাকে।

তারপর যখন ডাক্তারেরও অভিমত পাওয়া গেল, তখন ছোড়দার মুখ একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। ছোট বেলা থেকেই ছোড়দার সঙ্গে আমার কেমন বনতো না। ছোড়দা ভাল অঙ্ক জানতো—কিন্তু কোন দিনও একটা অঙ্ক আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। আমার গায়ে বেশী জোর ছিল ব'লেই শুধু ছোড়দা আমার সঙ্গে ভিড়তো না। যাক্ সে সব কথা।

যাবার দিন যখন বড়-দা বহু আয়াসে বিছানাটাকে হোল্ডলের ভিতর বন্দী করবার ব্যবস্থা করছিলেন—আমি সকলের অলক্ষ্যে রেক্সিনে বাঁধানো কবিতার খাতাখানা স্যুটকেসের একেবারে তলায় সঙ্গোপনে রেখে দিলাম। কেউ টের পায় নি ভেবে এদিক ওদিক চাইতেই দেখি প্রমথ ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে। আমি ইসারায় ওকে বারণ ক'রে দিলাম কাউকে কোন কথা বলতে।

প্রমথ আমার কথা রাখল, অথচ রাখলও না। আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বল্লে—এ তোমার ভারী অন্যায়। এই জিনিষটা করতে ডাক্তারের একেবারে বারণ—আর তুমি কিনা সে কথা গ্রাহ্যের ভেতরই আন্‌ছো না।

আমি বল্লাম—তুমি বড় গোল করছো। সত্যি বলছি কবিতা আমি আজকাল আর লিখি না এবং লিখবারও কোন ইচ্ছা নেই—শুধু ওই খাতাটি না হ'লে আমার চলে না—ও আমার জীবনের সাথী যেন।

প্রমথ চুপ ক'রে গেল।

ট্রেন্ চল্‌তে সুরু করল। ওরা রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানালো। যতক্ষণ দেখা গেল আমি চেয়ে রইলুম। আজ ওদের ছেড়ে যেতে মনে একটু কষ্ট হচ্ছিল হয়ত।

ট্রেনের গতি ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘণ্টায় পঞ্চাল্লিশ মাইল কি তারও বেশী—যেন বাতাস, ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও ছুটতে চায়।

কি যেন ভাবছিলাম। বাইরের আকাশে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। গাছ-পালাগুলোও যেন হু হু ক'রে উর্দ্ধ-শ্বাসে ট্রেনের সাথে ছুটে চলেছে। ট্রেনে চড়লেই নিশ্চল পৃথিবীও চলতে সুরু করে। একটা পাখী ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে চলেছে। পারবে না হয়ত, তবু বিরতি নেই।

একটা ষ্টেশনে বিরাট দৈত্যটা হাঁপ ছাড়ল। আমার সমস্ত ভাবনার জাল গুলিয়ে গেল। দার্জ্জিলিঙএর কথা ভাবছিলাম হয় ত, আর ভাবছিলাম মেজ-দির কথা।

মেজ-দির সঙ্গে দেখা হবে আবার কত দীর্ঘকাল পরে—মনে হয় দীর্ঘ শতাব্দী পরে মেজ-দির সঙ্গে দেখা করতে চ'লেছি। মেজ-দি দার্জ্জিলিঙে থাকে।

ওকে মেজ-দি ব'লে ডাকতুম,তার একমাত্র কারণ ওদের বাড়ীর সকলেই ওকে মেজ-দি ব'লে ডাক্‌ত—বাড়ীর ঠাকুর চাকর পর্য্যন্ত। তাই আলাপ হওয়া অবধি আমিও ওই ডাক্‌টি পছন্দ ক'রে নিয়েছিলাম। মেজ-দি তাতে খুব চ'টে উঠত, একটু গর্ব্বও হয়ত অনুভব করত।

ভালবাসার দাবীতে একদিন আমি হয়ত ওর অন্তরের খুবই নিকট আত্মীয় ছিলাম—সে অনেক দিনের কথা। তখন জীবনটা ঠিক হয়ত চিনে উঠতে পারি নি, তাই বোধ হয় এত সহজে ওকে ভালবাসতে পেরেছিলাম। এতদিনে সে সব কথা ভুলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল। যদিও ভুলতে পারি নি তবু আজ দশ বছর বাদে সে কথা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। একদিন প্রথম ফাল্গুনের মত আমার যৌবন প্রীতিতে, আনন্দে এবং গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল, ওই টুকুই আজ যথেষ্ট মনে করি।

একটি স্নিগ্ধ উদাস দুপুরে আমাদের চিরবিচ্ছেদ হয়—যা সচরাচর হ'য়ে থাকে। কলেজে প্রক্সি দেবার বন্দোবস্ত ক'রে হঠাৎ ওদের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লাম। ও ব'সে ব'সে কি সেলাই করছিল—ব্লাউজ না ফ্রক। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—কথা তো বল্লেই না—একবার মুখ তুলেও চেয়ে দেখলে না। ঘাড় গুঁজে সমানে কল চালিয়ে চলেছে।

জিজ্ঞেস করলুম—এর অর্থ কি?

সে আমার চোখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

আমি হেসে বল্লাম—যাক্ আমি এসেছি এ খবরটা যখন তোমার মনের মধ্যে পৌচেছে তখন আর ভাবনা নেই।

সে মুখ না তুলেই বল্লে—কলেজ কামাই করাটা আমি পছন্দ করি না।

ওর গম্ভীর মুখের কথার ধরন দেখে আমি ব্যাপারটা কিছুই অনুমান করতে পারলাম না;—মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে বল্লাম—তুমি কি তাহ'লে বলতে চাও যে তোমাদের বাড়ীতে আমার আসবার আর কোন দরকার নেই?

কথাটা ওকে আঘাত দেবার জন্যই বলেছিলাম, কিন্তু হিমাচলের গাম্ভীর্য্য ওর মুখ থেকে গেল না। সেলাইএর কলটা চালাতে চালাতে বল্লে—আমার এই কাজটা খুব জরুরী—আমায় যদি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজ করতে দাও তাহ'লে বাধিত হই।...

বল্লাম—আমাকেও ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতে হবে—সময়ও বেশী নেই কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার।

দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলাম। মনে হ'ল সে যেন একবার আমাকে ডাক্‌ল। বাতাসের শব্দ মনে ক'রেই সে ডাকে কান দিলাম না।

তারপর একমাস পরে শুভ বিবাহের রঙীন চিঠি পেলাম। লেখার বিয়ে—আমার মেজ-দির বিয়ে—আমার তাই নেমন্তন্ন। জীবনে এর চাইতে বড় tragedy আর কি হ'তে পারে আমার তা জানা নেই। দর্শন শাস্ত্রে অনন্তকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, মহা তর্ক হয়;—কেউ বলে অনন্ত আছে—কেউ বলে নেই—কারো কথাই পরিষ্কার বোঝা যায় না। কিন্তু সেদিন আমি আমার বুকে অনন্তকে অনুভব করেছিলাম অনন্ত ব্যথার মধ্যে। দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলেছিলাম হয়ত।

তারপর পুরো একটি বছর কেটে গেল। মেজ-দির কোন খবর আমি রাখিনি—পাইও নি। একদিন হঠাৎ মুকুল বল্লে—মেজ-দি কাল এসেছে—তোমাকে আজ পাকড়াও ক'রে নিয়ে যেতে বলেছে। সিনেমার পথে চলেছিলাম, যাওয়া আর হ'ল না। মুকুলকে বল্লাম—তা হ'লে চল তোমাদের বাড়ীতেই আজ আড্ডা দেওয়া যাবে।

এক বছর পরে সেই প্রথম দেখা—কিন্তু সে দেখা হবার কোন অর্থ নেই। এই একটি বছরে মেজ-দি বিশ্রী রকমে মোটা হ'য়ে গেছে—যা কল্পনা পর্য্যন্ত করা যায় না। বিয়ের আগে ছিল তন্বী-কিশোরী—কিন্তু বিয়ের পরই যেন একেবারে বার্দ্ধক্যে ডবল প্রমোশন। বল্লাম—বিয়ে ক'রে তো তুমি বেশ আরামে আছো দেখা যাচ্ছে।

মেজদি হাসল—সেই এক বছর আগের পুরোনো হাসি। ওই জিনিষটা বদলায় নি—কিন্তু না বদলালেও মেজ-দি দার্জ্জিলিঙ থেকে একঝুড়ি উপদেশ নিয়ে এসেছে যা ...ই

হাসি দিয়েও নরম বা কোমল করা যায় না।

কালের পরিণতি!

মেজ-দি বল্লে—আমার সৌভাগ্য বলতে হবে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'ল। আমি তো ভেবেছিলাম আর কোনদিন দেখাই হবে না।

আমিও হেসে বলেছিলাম—ঠিক এই কথা আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু আসলে আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলো সব সময়ে ঠিক সত্যি হয় না।

তারপর মেজ-দির উপদেশের বন্যা ছুটল—আমি মুকুল এবং মুকুলের ছোট ভাই অনুকূল কেউ বাদ গেল না। আমাদের পাঞ্জাবীর ঝুল কেন ছোট হ'ল, আমাদের বিশেষ ক'রে আমার মাথার চুল কেন লম্বা হ'ল, খদ্দর কেন পরি না, সিগারেট কেন খাই ইত্যাদি খুঁটি নাটি বিষয়ে মেজ-দি তার এক বছরের অর্জ্জিত মুরুব্বিয়ানা আমাদের জানিয়ে দিল। তা ছাড়া বক্তৃতা দেবার বেশ একটা কৌশল মেজ-দি কি ক'রে জানি আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। আমি মেজ-দির কথা শুনে হেসে বলেছিলাম—কংগ্রেস তোমাদের মত গুটি কয়েক বক্তাকে কায়েমী করলে বেশ সুবুদ্ধির পরিচয় দিত।

মেজ-দি বল্লে—ঠাট্টা করো না—জানো এখন আমার status অনেক বেড়ে গেছে।

বলেছিলাম—সে আর জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে তুমি মেজ-দিই—ঠিক এক বছর আগেকার মত।

কিন্তু মেজ-দির কোন ভাবান্তর নেই। নারী-চরিত্রই হয়ত এই রকম হবে—বিয়ে হ'য়ে গেলেই তারা একেবারে পর হ'য়ে যায়, নতুন আত্মীয়তা সুরু হয় এবং পুরাণো আত্মীয়তার কোন দাবী থাকে না। এক বছর আগেকার মেজ-দিকে যদি বা ভালোবেসেছিলাম কিন্তু এই এক বছর পরের মেজ-দিকে ভালবাসবার কোন আকর্ষণ পেলাম না।

তারপর হঠাৎ একদিন মেজ-দির নেমন্তন্ন এল। চিঠি বলা চলে না, ওটাকে স্লিপ বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। এক টুকরো যেমন তেমন কাগজের উপর গুটি কয়েক কথা লাল পেন্সিল দিয়ে লেখা—কাল আমার জন্মদিন, তোমার আসা চাই-ই।

যাব ব'লেই ঠিক করলাম, কারণ না যাওয়াটা খুব বেশী রকম ছেলেমানুষী হবে। তা ছাড়া না যাবার কোন রকম ওজুহাত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার ওপর ওর ভ্রাতা রত্নটি বেজায় বিভীষণ, সব কথা ফেঁাস ক'রে দিলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

কিছু উপহার দেবার কথাও মনে হয়েছিল, কিন্তু ওদিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করলাম না। কারণ পকেটে রূপচাঁদের কিছু অভাব অনুভব করছিলাম; তা ছাড়া যাকে নিয়ে স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করেছিলাম একদিন আজ তাকে দেবার মত আমারই বা এমন কি আছে। কথাটা খুব sentimental হয়েছিল হয়ত, কিন্তু সেদিন ঠিক এই রকম ভাবেই মনের সঙ্গে বোঝা পড়া চলেছিল। আজ যদিও বুঝতে পারছি sentiment জিনিষটা ছিল ওজুহাত, রূপচাঁদের অভাবই ছিল আসল কথা—কিন্তু সেদিন আমার চোখ কান নাক মুখ দেখে এরকম সন্দেহ প্রকাশ করতে কেউ সাহস পায়নি। সেদিন তাই পেট ভ'রে খেয়ে তো নিলামই—এদিকে ট্যাকের পয়সাও বাঁচিয়ে নিলাম—উপহার না দিয়ে।

তারপর আবার যাবার পালা ঘনিয়ে এল। পৃথিবীতে মাত্র দুটি নিয়ম সনাতন, একটি আসা আর একটি যাওয়া। আমার মনে হয় আর কোন নিয়ম এতখানি সনাতনত্ব লাভ করতে পারেনি, কোনদিন পারবেও না হয়ত। একদিন মেজ-দি ডেকে বল্লে—তোমার কাছে কোনদিন কিছু চাইনি, তুমি ও নিজে থেকে কিছু দাওনি আমাকে। আজ আমার একটা কথা রাখতেই হবে তোমাকে।

কথাটা কি ধরনের হবে বুঝতে না পেরে বল্লাম—তোমার সব কথাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি—কেবল চুল কেটে ফেলা আর পাঞ্জাবীর ঝুল লম্বা করা, এই দুটি ছাড়া।

মেজ-দি তার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে না পেরে হেসে ফেল্লে, বল্লে—আমার কথাটা একেবারে অন্য ধরনের।

তখন বল্লাম—তা হ'লে ব'লেই ফেল, শুনে শ্রবণেন্দ্রিয় সার্থক করি।

মেজ-দি বল্লে—শুধু শুনলে হবে না—কথাটা রাখা চাই। একটা মোটা খাতা ভর্ত্তি ক'রে কবিতা লিখে দিতে হবে—সব গুলো তোমার নিজের কবিতা হওয়া চাই।

আমি চুপ ক'রে রইলাম—এ কি যাবার সময় মেজ-দির ছলনা—না অন্য কিছু তাই ভাবছিলাম হয়ত।

মেজ-দি বল্লে—কি, মুখে কথা নেই যে।

আমি হেসে বল্লাম—বেশ, দোব লিখে।

মেজ-দি হেসে বল্লে—আর যতদিন না দাও—ততদিন তোমার এই কবিতার খাতাখানা আমার কাছে রইল—ওটা লিখে দিলেই এটা ফেরত পাবে।

একটা পাতলা খাতা মেজ-দি তার ট্রাঙ্কে বন্ধ ক'রে রাখল। আমি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না মেজ-দি এ খাতাটা পেল কেমন ক'রে। অবশেষে মনে পড়ল খাতাটা কদিন থেকে মুকুলের কাছে ছিল। মুকুলটা ইডিয়ট্‌!

যাবার দিন ষ্টেশনে দেখা হ'ল। ইচ্ছে ক'রেই গিয়েছিলাম, মেজ-দিকে শেষ বারের মত দেখবার জন্য। মেজ-দি সেখানেও বল্লে—আমার কাজটা মনে থাকে যেন।

গাড়ী ছাড়বার শেষ ঘণ্টা আর গার্ডের হুইশেল একসঙ্গে বেজে উঠল। মেজ-দি যেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আর বলা হ'ল না। আমিও হয়ত অনেক কথা বলব ভেবে ষ্টেশনে গিয়েছিলাম কিন্তু কিছুই বলা হ'য়ে ওঠেনি, সময়ের অভাবে নয়, গলার স্বরের অভাবে।

তারপর দীর্ঘ দশটি বছর কেটে গেল। মেজ-দির কথা আমি রাখিনি ইচ্ছে ক'রেই। খাতাটা যদিও কবিতায় বোঝাই হ'য়ে উঠেছিল তবু ওটা মেজ-দিকে দেওয়া হয়নি। এই দীর্ঘ দশ বছর মেজ-দির কোন খবর রাখিনি। মুকুল বিলেত যাবার পর ওদের সঙ্গে আমার প্রায় সমস্তটুকু আত্মীয়তাই ছিন্ন হ'য়ে গেছে। আমিও তাই কোন দিন চিঠি লিখে বা অন্য কোন রকমে খবর দিয়ে মেজ-দির মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করিনি, কোনদিন ভুলেও জানাইনি যে অশোক ব'লে একটি ছেলে আজো বেঁচে আছে।

আজ দশ বছর বাদে মেজ-দির সঙ্গে হয়ত আবার দেখা হবে—সে হয়ত আজো আমাকে ভুলে যায়নি—হয়ত সে খাতাখানার দাবী করবে। খাতাখানা মেজ-দিকে দেবো ব'লেই নিয়ে যাচ্ছি, কারণ ওই খাতাখানা বারে বারে আমাকে মেজ-দির কথা মনে করিয়ে দেয়।

*   *   *

শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত বড় লাইন হওয়ায় দার্জ্জিলিঙ্‌ যাত্রীদের ভারী সুবিধা হ'য়ে গেছে। শান্তাহারে আর আজকাল গাড়ী বদল করতে হয় না। শিলিগুড়ি যথেষ্ট বাসও রয়েছে দেখলাম, এবং বাসে গেলে ট্রেনের চাইতে কয়েক ঘণ্টা আগে যাওয়া যায় তাও জানতুম। কিন্তু তবু বাস ছেড়ে ট্রেনেই চড়লুম। এই পথটাকে সহজে ফুরুতে দিতে ইচ্ছে করছিল না। পথ চলায় যে অপরিসীম একটি আনন্দ পাওয়া যায় তা জীবনে এই প্রথম উপভোগ করছিলাম। কে জানে দার্জ্জিলিঙ গিয়ে হয়ত শুনবো মেজ-দিরা বহুদিন চ'লে গেছে, কিম্বা হয়ত মেজ-দি আমাকে চিনেই উঠতে পারবে না—কিম্বা এমন একটা কিছু ঘটবে যা সচরাচর কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীতে দুর্ঘটনাগুলো আজকাল এত সুলভ হ'য়ে উঠেছে যে কোন কিছুর ওপর স্থির বিশ্বাস আর রাখা যায় না। তা ছাড়া মেজ-দির কাছ থেকে মুক্তি নিয়েই বা আমি করব কি ?

মেজ-দির সঙ্গে দেখা হ'ল। মেজ-দির চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হ'লেও তাকে বেশ চিনতে পারা গেল এবং মনে মনে যা আশঙ্কা করেছিলাম যে মেজ-দি হয়ত আমাকে চিনতেই পারবে না তাও ঠিক হ'ল না। মেজ-দিও আমাকে চিনে নিল। বল্লে—এতদিন পরে যে তোমার মেজ-দির কথা মনে পড়ল তা আমার অসীম পুণ্যফলে বলতে হবে।

আমি হেসে বল্লাম—তোমার অসীম পুণ্যফলে হ'তে পারে, কিন্তু এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমি কোনদিন চাইনি।

মেজ-দির বিধবার বেশ।

মেজ-দি ম্লান হেসে বল্লে—তা আর কি করবে বল—সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু এই সব নিয়েই তো মানুষের জীবন। তোমার শরীরও তো বেশ খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে।

আমি হেসে বল্লাম—শরীরটা যদি সব সময়েই ভাল থাকতো তা হ'লে মানুষের জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠতো। সব সময়ে শরীর ভালো থাকে না ব'লেই তো যেখানে সেখানে স্বাস্থ্যান্বেষীর দল ঘুরে বেড়ায়—তা না হ'লে সিমলা, ওয়ালটেয়ার রাঁচি দার্জ্জিলিঙ্, শিলং প্রভৃতি জায়গাগুলির কদর একেবারে কমে যেতো।

মেজদি বল্লে—ভাগ্যিস্ তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল তাই তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তোমরা ভাব মেয়েদের বিয়ে হ'য়ে গেলে তারা একেবারে পর হ'য়ে যায়।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। খাতাটার কথা তুলবো কি না মনে ভাবছিলাম, মেজ-দি নিজেই সে কথা তুললে, বল্লে—আজকাল আর কবিতা লিখছো না বুঝি।

বল্লাম—মাঝে মাঝে এখনো লিখি, বিশেষত তোমার কাজটা তো আজো শেষ ক'রে উঠতে পারি নি।

মেজ-দি দুঃখের হাসি হেসে বল্লে—আমার কি আর সে সব দিন আছে—সে কবে চুকে গেছে। তোমাকে অনর্থক এতদিন চিন্তায় রেখেছি,—তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম, কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বাস্থ্যচর্চ্চা করতে পার।

এর নাম জীবন। মানুষ দুঃখটাকে কেন একা একা ভোগ করতে চায় সেই কথা ভাবি।...

দুদিন বাদে কলকাতায় টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম—দার্জ্জিলিঙ্ সুট করছে না, ডাক্তারেরা শিলঙ্-এর কথা বলছে—পাইনের হাওয়া নাকি উপকারী।

যাবার সময় মেজ-দির সঙ্গে আর দেখা করলাম না। কিন্তু তাকে আজো ভুলতে পারিনি।

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

অগষ্টস্ জন্

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে

য়ুরোপের শিল্পে বছর পঞ্চাশ ধ'রে 'ইস্‌ম্'এর স্রোত চলেছে। মানে ও মোনে থেকে এই উনিশ শো উনত্রিশ অবধি উনপঞ্চাশীর লীলার শেষ নেই। অবশ্য এর অনেকের মধ্যেই বস্তু আছে। কিন্তু একথা সত্য যে, 'ইস্‌ম্' মুক্তির বাধা।

অগষ্টস্ জন্

অগষ্টস্ জন্ তাঁর প্রাণের প্রাচুর্য্যে সে বাধা স্বচ্ছন্দে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাই অনেকটা সঠিক ভাবে বলা চলে যে, প্রিমিটিভ্ থেকে করো পর্য্যন্ত সব শিল্প বৈশিষ্ট্যের ধারা অগষ্টস্ জন্ নামক একটি প্রবল প্রাণপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সার্থক ভাবে মিলিত হয়েছে।

অগষ্টস্ জনের স্বভাব এক সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব। তিনি ভালো বাস্‌তে পারেন। এবং যে শিল্পসৃষ্টি তাঁর ভালো লাগে, তার বৈশিষ্ট্য তাঁর মন আপন ক'রে নেয়। ভাসা ভাসা ভাবে, বাংলাদেশের সমালোচকের মতো দেখ্‌লে তাই মনে হতে পারে যে তিনি বহুরূপী। কিন্তু অগষ্টস্ জনের ব্যক্তিত্ব শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যের ওপরে। অন্যের অলঙ্কার তাঁর গায়ে ভার হয় না, অলঙ্কারই হ'য়ে যায়।

অগষ্টস্ জনের এই ব্যক্তিত্ব তাঁর সবেতেই ছাপ দেয়। তাই অগষ্টস্ জন্ মানুষের সঙ্গে অগষ্টস্ জন্ শিল্পীর মিল আছে। জীবনে নাকি তিনি মোটেই শিল্পীজনোচিত হবার চেষ্টা করেন না। তিনি নাকি কথা বলেন স্বাভাবিক গলায়, হাসেন উচ্চৈঃস্বরে। জামা কাপড়ের কোথায় কতখানি কুঞ্চিত হ'ল, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না।

জীবনে যে কারণে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক, শিল্পেও তাঁর সেই প্রবল প্রাণশক্তি তাঁর শিল্পকে শিল্পের জগতে বিশেষ স্থান দিয়েছে।

এবং এই কারণেই তিনি কখনো ভালো পোর্ট্রেট্ আঁক্‌তে পারেন নি। পোর্ট্রেট্ আঁক্‌তে হ'লে যে আত্মলুপ্তি দরকার, সে দৃষ্টিসর্ব্বস্বতা সার্জেণ্টের মতো জনের নেই। অবশ্য বার্ণার্ড শ'র বা ষ্ট্রেটস্‌মানের ছবিতে আমরা তাঁদেরও দেখি, কিন্তু অগষ্টস্ জনও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেন।

এবং অগষ্টস্ জনের প্রাণের উচ্ছলতা তাই সার্জেন্টের মতো সোসাইটিতে তৃপ্তি পায় না। তাই তাঁর চিত্রে জিপ্‌সির বারম্বার আবির্ভাব। এবং গিটানো ও গিটানাদের চিত্রে তাঁর প্রতিভা মুক্তি পায়। জিপ্‌সির সঙ্গে তাঁর স্বভাবেরও মিল আছে—তাদের অবাধগতি জীবনযাত্রা, তাদের খুসিমতো স্বচ্ছন্দতা অগষ্টস্ জনের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়।

কিন্তু জিপ্‌সির স্বাধীনতাই জনের ব্যক্তিত্ব নয়। তাঁর মধ্যে মিষ্টিকের ভাবধারার প্রবাহও আছে। আর দৃশ্য বস্তুতে তাঁর অপরিসীম আনন্দ। এবং সেইখানেই তাঁর পেন্টার হিসেবে কৃতিত্ব। মাংসলতায় রুবেন্‌স্ যে রকম আনন্দ পেতেন, রঙের আনন্দে জনও সেই রকম মুগ্ধ। সেইজন্যে জনের ছবি সাক্ষাৎ পরিচয় ছাড়া ভালো লাগতে পারে না। সমালোচকের ভাষায় রঙের আভাসও আসে না।

জন যে শুধু জিপ্‌সির অনুরাগী নন, তিনি যে মিষ্টিক্, তা তাঁর 'Symphonie Espagnole' নামে ছবিখানিই প্রমাণ করে। এ ছবিটির ইন্দ্রধনুর মতো আশ্চর্য্য বর্ণ-লাবণ্য। কি এক ভাবরসে বিচলিত, বিহ্বল অথচ সংযত এবং নগ্ননারীদেহের দ্বারা সুষমা-মণ্ডিত এ চিত্রটি সাদাসিধা জিপ্‌সি ছাড়াও জনের প্রতিভার যে কি রকম প্রকাশ, তার উদাহরণ।

কিন্তু এই স্পেনীয় সঙ্গীতের চিত্রের সৌকুমার্য্য ও সূক্ষ্মতা অগষ্টস্ জন সাধারণত প্রকাশ করেন না। কোনো সমালোচকের ভাষায়, তাঁর শক্তি দেখে মনে হয় 'the front of Jove himself'। এবং এই আদিম দেবতার সঙ্গে উপমায় গভীরতা আছে। জনের চিত্রে আদিম শিল্পীদের মতো সরলতার প্রাধান্য আছে। তুলির এক এক দীর্ঘ টানে তিনি অনেকখানি প্রকাশ করেন। খুঁটিনাটির দিকে তাঁর স্বভাবত দৃষ্টি থাকে না। নিজের ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত আবেগ তাঁকে আর সে দৃষ্টি রাখবার সময় দেয় না।

অগষ্টস্ জনের ছবিতে—বিশেষত মানবমূর্ত্তির ক্ষেত্রে এই সরলতার জন্যে তাঁর ছবি অনেকের ভালো লাগে না। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রমাণ স্বরূপে নাকি, লণ্ডনের সমাজে Johnish মানবী দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ অগষ্টস্ জন শিল্পে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করেন নি, জীবন তাঁর ছবিকে অনুকরণ করছে।

বেদেনী

এই আদিম শিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যও 'ইস্‌ম্'-শূন্যতার জন্যে মনে হ'তে পারে যে জন পুরাতনসর্ব্বস্ব। সে ধারণা ভুল। প্লেটনের সঙ্গে জনের তুলনাই হতে পারে না। তাঁর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হচ্ছে যে তিনি অগষ্টস্-জন-সর্ব্বস্ব।

আধুনিক বা পুরাতন কিছুতেই তাঁর বিতৃষ্ণা নেই। ভালো লাগা নিয়ে কথা। ভালো লাগলেই তা জনের সঙ্গে মিশে গেল।

'রবিন্' ছবিটিতে যে সরলতা ও সরসতা আছে হয়ত সে বস্তু ইটালির গোড়াকার শিল্পীদের ছিল। কিন্তু রবিনের যে জীবন্ততা, যে বিশেষ দৃষ্টি, সে আধুনিক। সে ছবির সঙ্গে অতীতের কোন ছবির কোন বিশেষত্বের অতি দূর সাদৃশ্য আছে, সেকথা চাপা প'ড়ে যায়।

পঁচিশ বছর ধ'রে অগষ্টস্ জন ছবি আঁক্‌ছেন এবং অজস্র ছবি আঁক্‌ছেন। বর্ত্তমানের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তিনি। কিন্তু এ কথা বলা চলে, যে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি একটু কম স্পষ্ট হ'লেই ভালো। Tremendous gusto খুব ভালো জিনিষ
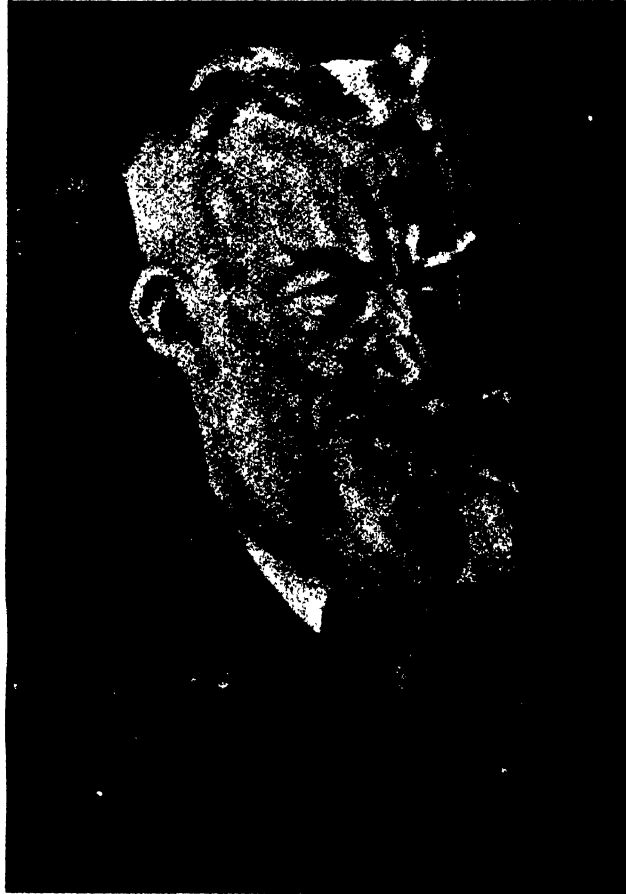
বার্ণাড্ শ'

আধুনিক বিষয়বস্তু—বিগত যুদ্ধের একটি দৃশ্য নিয়ে পুরাতন শিল্পীদের মতো অগষ্টস্ জনের এক সুবিপুল ছবি আছে। তাতে আশ্চর্য্য বলশালিতা, বিষয়ের ওপর দখল, এবং বিপুল ছবি আঁকবার সুসমঞ্জস ক্ষমতা ইত্যাদিতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অগষ্টস জনের এ বিষয়ে সর্ব্বদা মাত্রাজ্ঞান থাকে না। কারণ তাঁর হাত তাঁর মনের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আশ্চর্য্য দ্রুত তাঁর হাত। সময়ে সময়ে দ্রুতগামী প্রবলতাই তাঁর ছবিতে প্রধান হয়ে' ওঠে।

সক্রেটিসের বিচার

শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সরকার

ইতিহাসে দেখা যায় যে চিন্তা-জগতে যে-মনীষী ব্যক্তি-গণের নিজস্ব চিন্তা যুগপ্রবাহের চেতনার ধারাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে—এতদূর অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছে যে সে-যুগের মানুষ সে-চিন্তার প্রবল ধারাকে আপনাদের হৃদয়ে কিছুতেই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি—তাঁদের সকলকেই লাঞ্ছনা ও বাধা সহ্য করতে হয়েছে। যাঁরা তাঁদের তথ্যের প্রমাণ হাতে-কলমে দিতে পেরেছিলেন তাঁরা অল্পে নিস্তার পেয়েছেন; কিন্তু যাঁদের চিন্তা কেবল দর্শনক্ষেত্রেই সুপ্রকাশ হয়েছিল তাঁদের বিড়ম্বনার আর সীমা ছিল না। ভবিষ্যৎ তাঁদের সকলকেই কিন্তু জয়মাল্য দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছে। কালের ক্রমোন্নতিতে তাদের কাছে অতীতের সে দুরূহ তথ্য আর দুরূহ ব'লে বোধ হয়নি, প্রমাণ চেয়ে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়ায় নি—এতই সহজ বোধ হয়েছে সে তথ্য। বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে নিউটন থেকে আরম্ভ ক'রে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পর্য্যন্ত সকলকেই সম-সাময়িক বিরোধ-আলোচনাকে জয় করতে হয়েছে। শেলি, বায়রণ, ব্রাউনিং, সকলের সম্মুখে এ বিরাট বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সৃষ্টির দিক্ দিয়ে হয়ত কিছু ক্ষতি এতে হয়েছে কিন্তু এতেই তাঁদের মনীষা দ্বিগুণ ব'লে আপনার পথ ক'রে নিয়েছে, —উৎসাহ তাঁদের অত্যুগ্র হ'য়ে উঠেছে।

আধুনিক সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বার্ণার্ড শ'কে ইউরোপ অল্প মুক্তি দেয় নি। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে এমনি ভ্রান্ত ধারণা ও প্রচলিত ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে নিত্য-কালের সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার প্রয়াসে এক জগৎ-বরেণ্য দার্শনিককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তিনি মহাত্মা সক্রেটিস্। আমাদের এ স্ব-তন্ত্রের যুগ সে প্রাচীন যুগের মত অত কঠোর ও নির্ম্মম নয়। সত্যের খাতিরে এখন আর কাউকে প্রাণদণ্ড দিতে হয় না যদিও অর্থ ও সম্মান উৎসর্গ করতে হয় বড় কম নয়।

সক্রেটিস্‌কে তাঁর যুগের বার্ণার্ড শ' বলা যেতে পারে। রাজ্যের দেবতাদিগকে অস্বীকার ক'রে প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং সমসাময়িক গ্রীক যুবকদের ধর্ম্মবিশ্বাস দূষিত করার অভিযোগে সক্রেটিসের বিচার এবং প্রাণদণ্ড হয়। এই বিচার করেছিলেন এথেন্সের আইন এবং বিচার-সভা। সে কালের ইতিহাসে এরূপ বিচারের দৃষ্টান্ত সুবিরল

রবিন্
——অগষ্টস্ জন্——

ছিল না। সম্প্রতি-প্রকাশিত সক্রেটিস্ সম্বন্ধে পুস্তকে এডওয়ার্ড বিয়ারষ্টাট্ তাঁর বিচারের একটা চমৎকার [illegible] দিয়েছেন।

সক্রেটিস্ গ্রাক্‌দেবতাদিগকে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু তার পরিবর্ত্তে নূতন কোনও দেবতার সৃষ্টি করেন

বিচারকালে তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রত্যাহার ক'রে নাস্তিকতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। বন্ধু ও আপনার

ষ্ট্রেস্‌মান্

—অগষ্টস্ জন্—

শিষ্যগণকে রাজ্যের কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে শেখালেও তিনি রাষ্ট্রের ও সমাজের অনুশাসনকে পালন করতে উপদেশ দিতেন, এইখানেই তাঁর শিক্ষার একটা মহত্ত্বের লক্ষণ দেখা যেত। তাঁর নিজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হবার পর যথেষ্ট সময় ছিল এবং একটু ইচ্ছা করলেই অনায়াসে তিনি গ্রীস্ ত্যাগ ক'রে নিরাপদ হ'তে পারতেন। তাঁর বন্ধুরা সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সক্রেটিস্ তা হ'তে দেননি, সমাজের দিকে চেয়ে তিনি রাষ্ট্রের ও গ্রীক্ আইনের আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

সক্রেটিসের বিচার একজন বিচারকের সম্মুখে হয়নি, কোনও জুরি বা ভার-প্রাপ্ত বিচার-সভার নিকট হয়নি। তাঁর বিচার হয়েছিল পাঁচ শ এক-জন নাগরিকের সম্মুখে। সেটাকে বিচার-সভা না ব'লে একটা ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্তপ্রায় জনসঙ্ঘ বললে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। অভিযোগ জ্ঞাপন করবার জন্যে সে বিচারে কোনও 'সরকারী উকীলের' প্রয়োজন হয়নি। গ্রীক্‌দেশের সে-সময়কার আইনে ছিল যে একজন নাগরিক অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে কিন্তু অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোক্তাকে

আইন অনুসারে বিপুল অর্থদণ্ড দিতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তিন জন নাগরিক—এ্যানিটাস্, মেলিটাস্ ও লাইকন্। যথা সময়ে বিচারের রায় বাহির হ'ল—"সক্রেটিস্‌কে হেমলকের বিষ পান ক'রে প্রাণ দিতে হবে।"

সক্রেটিসের উক্তি ও তাঁর শিক্ষা,—তাঁর সমসাময়িক সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, কারণ সে-সমাজ তখনও সেই চিরপ্রচলিত প্রাচীন পথকেই আশ্রয় ক'রেছিল; নিজস্ব কোনও প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হবার সাহস তার ছিল না। সুতরাং বিষপানে মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা যে তাঁর হয়েছিল এইটাই সৌভাগ্যের কারণ ব'লে মনে করতে হবে, কারণ পনের শ বছর পরে জন্মালে হয়ত আরও নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরভাবে তাঁকে হত্যা করার আদেশ হ'ত। বাস্তবিক সভ্যতার গতি কি বিচিত্র ও অভাবনীয়!

সক্রেটিস্ যে-ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে বীরের মতন মরণকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন তা' দেখে শত্রু-মিত্র সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিল। কয়েদখানায় তাঁকে আনা হ'লে প্রধান প্রহরী তাঁকে বলেছিল, "হে মানবগুরু! এ বধ্য-ভূমিতে তোমার মত শ্রেষ্ঠ মানবের চরণধূলি কখনও পড়ে নি। অন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের যেরূপ ক্রুদ্ধ হ'য়ে হেমলকের রস পান করতে আজ্ঞা ক'রে থাকি, তোমাকে সে-ভাবে আদেশ করতে পারব না। তোমার আত্মার কল্যাণ হোক্, এই আমার কামনা।"—বল্‌তে বলতে সে চোখের জল মুছে সে-স্থান ত্যাগ করলে। কত লোককে সে মর্‌তে দেখেছে,—সে অন্তিম দৃশ্য তাকে বিচলিত করে নি। কিন্তু সক্রেটিসের বেলায় তার চোখের জল আর কোনও বাধাই মানল না।

মৃদু হেসে সক্রেটিস স্থিরভাবে বিষপাত্র আন্‌তে বললেন। বিষপাত্র এলে রাজকর্ম্মচারী ও বিরুদ্ধ দলের লোকদের লক্ষ্য ক'রে হেসে বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমার এই অন্তিম-যাত্রা যেন শুভ হয়, এই প্রার্থনা জানিয়ে কোনও দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে এই বিষপাত্র উৎসর্গ করলে কেমন হয়?" সকলেই নির্ব্বাক। তেমনি হাসতে হাসতে তিনি এক চুমুকে বিষপাত্র নিঃশেষ করলেন। হেমলক-রসের কাজ হ'তে বেশী দেরী হ'ল না, হাসিটিও অম্লান হ'য়ে রইল মৃত্যুর শিয়রে দীপশিখার মত।

সত্যের ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য মৃত্যুহীন প্রাণ দান ক'রে আজ তিনি অমৃত-লোকবাসী হয়েছেন।

উল্কার সমাধি

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে চোখ রাখিলে উল্কাপাত দেখিতে পাওয়া যায় না এমন রাত্রি খুব কমই আসে। বহিশূ্ন্যের এই সকল রহস্যময় বস্তুপিণ্ড দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের আদৌ ঘটিয়া উঠিত না, যদি না তাহারা পৃথিবীর আকর্ষণের শক্তির মধ্যে আসিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। আমাদের বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষণে যেমন ইহারা জ্বলিয়া উঠে, অমনি আমাদের চোখে পড়ে। দিনমানেও অগণিত উল্কা নানাদিকে পড়িতেছে কিন্তু সূর্য্যের আলোকে ইহাদের অগ্নিপুষ্প অদৃশ্য থাকিয়া যায়, যদিও খুব বড় উল্কা হইলে কখনো কখনো দেখা গিয়া থাকে।

উল্কাপিণ্ডের অধিকাংশই বায়ুমণ্ডলের পর্দ্দার মধ্য দিয়া আসিবার সময় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, পৃথিবীতে যাহা পড়ে তাহা প্রায়ই বৃহত্তর পিণ্ডটার একটা ভস্মাবশিষ্ট ছোট টুক্‌রা মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উল্কাপিণ্ডের

বেশীর ভাগই লৌহ, অনেকস্থলে নিকেল মিশ্রিত লৌহ। পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মূল পদার্থগুলির সাতাশটি উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে নাই, এমন কোন মূল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে একটা উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছিল, উহাতে কৃষ্ণবর্ণ হীরকের সমশ্রেণীভুক্ত কার্ব্বণক্রষ্টাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

আরিজোনার মরুভূমির উল্কাকুণ্ডের এক অংশ
(ভিতর দিকে ঢালুর প্রস্তরচূর্ণ দেখা যাইতেছে
সরু দাগটি খননকারীগণের উঠিবার নামিবার পথ)

আমেরিকার অন্তর্গত আরিজোনার মরুপ্রদেশে একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের সমাধি-গহ্বর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরিজোনার যে মরুভূমিতে এই উল্কাকুণ্ড বিদ্যমান তাহার দৃশ্যও অতি অদ্ভুত। এই মরুর অধিকাংশই প্রস্তরময় এবং ঐ সকল প্রস্তর আবার ঘন বেগুনী বা লাল রংএর, এইজন্য ইংরাজিতে এই অংশকে Painted Desert বা রং চং করা মরুভূমি বলে। কাপ্তেন ষ্টিভেন্স্ ও লেফ্ট্যানাণ্ট ম্যাক্রেডি নামক যুক্তরাজ্যের বিমান বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী সম্প্রতি বিমানপোতে করিয়া এই স্থান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন—তাঁহারা বলেন যে আকাশ হইতে দেখিলে উল্কাকুণ্ডটি ঠিক দেখায় যেন কোন বৃহৎ কামানের গোলা মাটিতে পড়িয়া পড়িয়া গহ্বরটির সৃষ্টি করিয়াছে। উপর হইতে গহ্বরটির দৃশ্য হইয়াছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, চারিপাশের বেগুনী ও লাল রংয়ের বালুকাপ্রস্তরের মধ্যে উল্কাকুণ্ডের প্রান্তস্থ শ্বেতবর্ণ চূর্ণপ্রস্তরের বর্ণবৈপরীত্য দৃষ্টিকে বড় মুগ্ধ করে। এই স্থান অতি দুর্গম মরুভূমির মধ্যে বলিয়া ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্থ লোকজনের ভিড় এখানে খুব কম। নিকটতম ষ্টেশন উইন্স্লো এখান হইতে কুড়ি মাইল দূরে, তাহা ছাড়া মরুভূমির এই অংশে জল পাওয়া যায় না বলিয়া নিছক আমোদ যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাদের দল এখানে বড় একটা ঘেঁসিতে চায় না।

উল্কাকুণ্ডটি প্রায় ৫৭০ ফুট গভীর। বিশাল উল্কাপিণ্ডটা যে সময়ে এখানে পড়িয়াছিল, তখন তাহার সংঘর্ষণে মাটির উপরকারের ও অভ্যন্তরের অনেক ছোট বড় প্রস্তর চূর্ণীকৃত হইয়া কুণ্ডের ধারে ধারে নানা আকারের স্তূপের সৃষ্টি করিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে এই স্তূপের উচ্চতা ১৫০ শত ফুট, কোনও স্থানে আরও কম। বাহিরদিকের ঢালু ধার বহিয়া উঠিয়া কুণ্ডটির প্রান্তে দাঁড়াইলে ও গভীর গর্ত্তের দিকে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটি ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ব্যোমপথগামী কোনো ক্রুদ্ধ দৈত্য যেন বিশাল প্রস্তরখণ্ডটাকে কোন্‌কালে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল পৃথিবীর বুকে, কোন্ খেয়ালে কেহ জানে না, নির্জ্জন মরুভূমির মধ্যে তার ক্ষতচিহ্ন এখনও সেইরূপই স্পষ্ট।

রূপই গভীর, কতকাল কাটিয়া গিয়াছে সে দাগ তবুও মিলাইয়া যায় নাই। কুণ্ডের ভিতর দিকের ঢালু ভারী উঁচু নীচু, স্থানে স্থানে খাড়াই খুব বেশী, তাহা ছাড়া বড় বড় পাথরের স্তূপ এখানে ওখানে এমন ভাবে অবস্থিত যে কুণ্ডটার তলদেশে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত বড় উল্কাকুণ্ড আবিষ্কৃত হয় নাই। এপর্য্যন্ত এমন কোনো উল্কা দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাহা পৃথিবী-পৃষ্ঠে এগারো ফুটের বেশী গর্ত্ত করিয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই, শেষরাত্রিতে উত্তর সাইবিরিয়ার একস্থানের গিয়াছে। এই স্থানে অরণ্যের মধ্যে নানা ছোট বড় উল্কার গহ্বর তিনি দেখিতে পান, কিন্তু ইহার কোনোটিই অরিজোনা মরুভূমির এই উল্কাকুণ্ডের মত বিশাল আয়তনের নহে।

কুণ্ডটির বিশালতা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে, ইহার চারিদিকে একবার ভ্রমণ করা আবশ্যক। বেড়ের পরিধি পূরা তিন মাইল। কুণ্ডের ব্যাস ৪২০০ ফুট, এক মাইলের ৪/৫ ভাগ। চারিদিকের মাটি ও পাথর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা সহজেই বোঝা যায় যে কোনো বৃহৎ
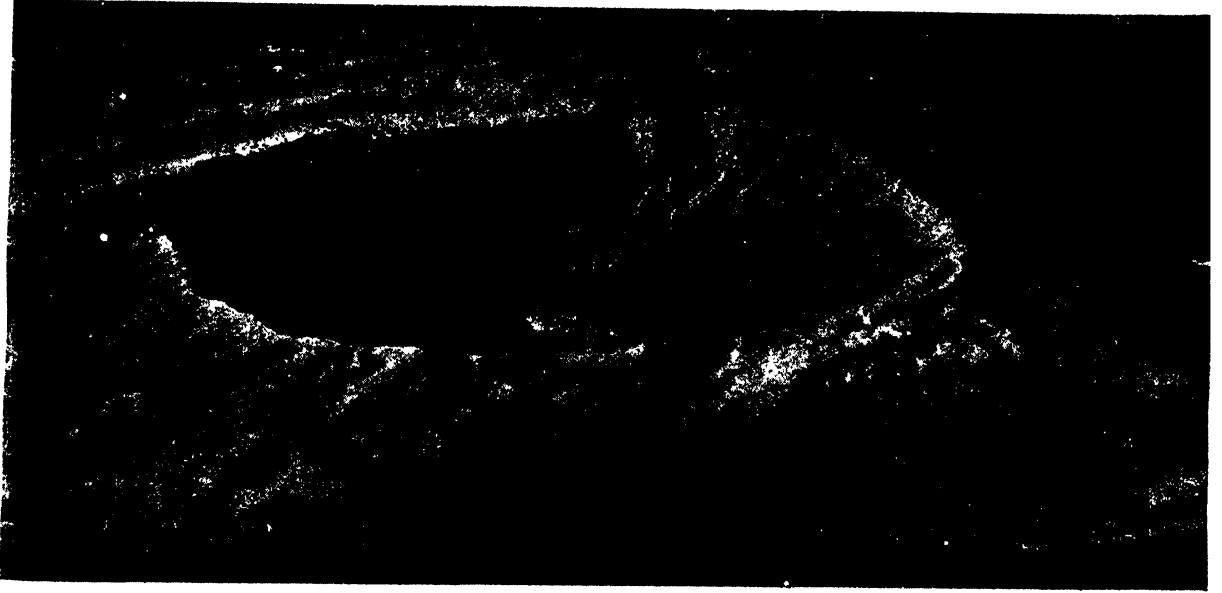
আরিজোনার উল্কাকুণ্ড—বিমান পোত হইতে লওয়া ফটোগ্রাফ্
(ছবির বামপার্শ্বে কুণ্ডের ধারের কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুগুলি বহু টন ওজন বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড)

অধিবাসীগণ একটি সুবৃহৎ অগ্নিপিণ্ডকে আকাশপথে ধাবিত হইতে দেখে এবং অল্পক্ষণ পরেই বজ্রধ্বনির মত আওয়াজ শুনিতে পায়। বৎসর দুই হইল জনৈক রুসীয় বৈজ্ঞানিক উত্তর সাইবিরিয়ার এনিসিস্ক জেলায় গভীর পাইন অরণ্যের মধ্য এই উল্কাপিণ্ডের পতনস্থান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। চারিধারের ত্রিশ মাইল ব্যাপী স্থানের মধ্যে কোথাও একটি গাছও মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই, যেন ভীষণ ঝড়ের বেগে সমুদয় একেবারে শিকড়শুদ্ধ উপড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া বস্তু পড়িবার ভারে নিকটবর্ত্তী সমুদয় বস্তু চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডের বাহিরের দিকে ঢালু শুধু এই চূর্ণীকৃত চূণা পাথর ও বেলে পাথরের স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বেলে পাথর ভূমিপৃষ্ঠ হইতে তিনশত ফুট নিম্নে একস্থানে ছিল, উল্কাপতনের ভীমসংঘাতে অত নিম্নস্তরের প্রস্তররাশিকেও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া চতুর্দ্দিকের প্রায় ছয়মাইল স্থানের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। চূর্ণ প্রস্তর বাদে অনেক বড় বড় প্রস্তরখণ্ডও ভিতর ও বাহিরের ঢালুর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত

অবস্থায় আছে (১নং ছবি দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বাপেক্ষা বড় খণ্ডটির ওজন প্রায় ৭০০০ হাজার টন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই উল্কাটি পতনের সংঘাতে প্রায় কুড়ি কোটী

(উল্কাকুণ্ডের এই অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণা বিশিষ্ট উল্কার টুক্‌রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে)

বালু ও প্রস্তরকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। সমগ্র পানামা খালটি খনন করিতে যতটা মাটি ও পাথর কাটিতে হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই উল্কাপ্রবর তাহার এক-চতুর্থাংশ মাটি ও পাথর মরুভূমির এই অংশ হইতে খুঁড়িয়া ফেলিয়াছে ! কল্পনা করা যাক্ এই বৃহৎ ব্যাপার কিরূপে ঘটিয়াছিল। লৌহ ও নিকেলের একটা বিশাল পিণ্ড (খুব সম্ভবতঃ সেটা কোনো নির্ব্বাপিত ধূমকেতুর একটা টুক্‌রা মাত্র) সূর্য্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ কিরূপে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়ে ও তৎক্ষণাৎ নিজ কক্ষচ্যুত হইয়া ভীমবেগে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে সেকেণ্ডে ২৫ হইতে ৩০ মাইল বেগে ঢুকিয়া পড়িতেই ভীষণ সংঘর্ষণের ফলে জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবীর বায়ুস্তর প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিল এই আগন্তুক দৈত্যের গতিরোধ করিবার জন্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। পিণ্ডটিও তো নিতান্ত এতটুকু নয়, কমবেশী তিনশত হইতে পাঁচশত ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, ওজনেও অন্ততঃ দশলক্ষ টন।

হঠাৎ একটা তীব্র আলোকে চারিধার আলোকিত হইয়া উঠিল, ভীষণ ভূমিকম্পে যেন সমগ্র মরুভূমিটা ও চারিধারের পাহাড়-গুলা যেন দুলিয়া উঠিল, ধূলা, বালি ও পাথরের গুঁড়ায় আকাশ অন্ধকার হইয়া গেল, কিসের একটা ভয়ানক ঝাপ্‌টা অনুভূত হইল, তাহার পর কিছুক্ষণ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। অনেকক্ষণ পরে যখন আকাশ পুনরায় পরিষ্কার হইল, তখন তৃণহীন মরুভূমির

উল্কাকুণ্ডের বাহিরের দিকে ঢালু
(সম্মুখস্থ শাদা রংএর জমির সবটাই বেলে পাথরের গুঁড়ার স্তূপ মাত্র)

রিবার
ক্কাকুণ্ডটি
ন করা
অগ্রসর হ
দেখা হ
বালি
সন্ধান
ন খ
আট্
ষ্টাতেও
নাই।

পবিত্র জিনিষ, তাহাদের বিশেষ বিশেষ পালপার্ব্বণে বালক বালিকারা আসিয়া এই শ্বেতচূর্ণ কুড়াইয়া লইয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন কুণ্ডটি অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোনো একদিন সেই বিশাল লৌহপিণ্ডটি এই নির্জ্জন মরুবক্ষে প্রোথিত হইয়া যায়, কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এতদিন পরে লোকে তাহার সন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

আরিজোনা মরুভূমির এই উল্কাকুণ্ডটির প্রকৃতি চন্দ্রমণ্ডলস্থ গহ্বরগুলির অনুরূপ। চন্দ্রের যে অংশ সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার গহ্বর গণনা করা গিয়াছে। তবে চন্দ্রমণ্ডলের অনেক গহ্বরই এই উল্কাকুণ্ডটির অপেক্ষা অনেক বড়। আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে চন্দ্রমণ্ডলের গহ্বরগুলিও উল্কাপতনের ফলে সৃষ্ট।
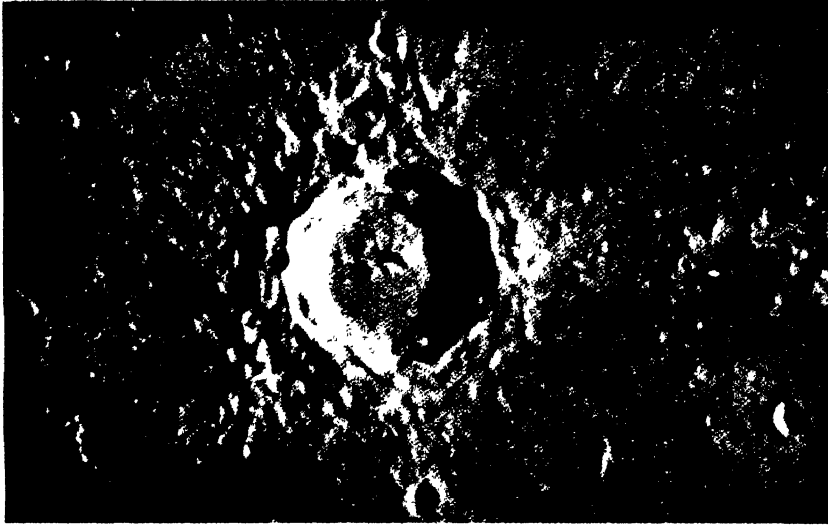
চন্দ্রমণ্ডলের এক অংশ (১০০-ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যোগে যেরূপ দেখা যায়)
সম্মুখের বৃহৎ গহ্বরটির নাম কোপার্নিকাস, ইহার ব্যাস ৫৫ মাইল।
পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে চন্দ্রমণ্ডলের এই সকল গহ্বরও
উল্কাপতনের ফলে সৃষ্ট।

ক্রীড়নক

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রি হইয়া গেল, সমস্ত বাড়ি-ঘর হলধরবাবুরাই কিনিয়া লইলেন, ধারটা ছিল উঁহাদের কাছেই। সীতানাথ হালদার ও তার স্ত্রী একমাত্র ছেলেটির হাত ধরিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিল।

সীতানাথ কিছু রোজগা'র করিতে না পারিলেও তাহার বাবা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতেই তাহার সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত,—কিন্তু সীতানাথের একদিন যে কেন হঠাৎ একটু মদ চাখিবার সখ্ হইল, তাহার পর হইতে মাথা আর সে ঠিক রাখিতে পারিল না। হাতে নগদ যাহা ছিল তাহা ফুঁকিয়া দিতে এক বৎসরও লাগিল না, সামান্য যা তেজারতি করিয়া আয় হইত তাহাও ঘুচিয়া গেল। সীতানাথ ধার করিতে বসিল, স্থাবর সম্পত্তি বেশ কিছু আছে, অতএব সীতানাথ সঙ্গতিপন্ন ও ঋণশোধে সমর্থ না হইলেও তাহাকে অনায়াসে বাধ্য করা যাইবে—এই আশ্বাসে হলধরবাবু সীতানাথের হাতে কাঁচা টাকা গুঁজিয়া দিয়া-দিয়া হাণ্ড্‌নোট্ লইতে লাগিলেন। ব্যাপারটা কালক্রমে কি আকার ধারণ করিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিন বৎসরের মধ্যে হলধরবাবু নালিশ ঠুকিয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে ডিক্রি হইয়া গেল।—অবশেষে হলধরবাবু সীতানাথের বৈঠকখানায় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মুখে সট্‌কা টানিতে লাগিলেন।

বাড়িখানি দেখিতে বেশ, দক্ষিণের দুর্দ্দমনীয় নদীটা চর ভাঙিতে ভাঙিতে এখন শ্রান্ত হইয়া বাড়ির বাগানের সিঁড়ির কাছে লুটাইয়া যেন জিরাইয়া লইতেছে। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় সীতানাথের চোখে জল আসিল,—দেওয়ালের প্রতিটি ইট বুকের পাঁজরের মত আপনার মনে হইতে লাগিল—এই বাড়ির ঘরে ঘরে প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া বাতি জ্বলিয়াছে, নিজের হাতে আজ সব নিবাইয়া দিতে হইল! এই বাড়িতে কত জন্ম, কত বিবাহ, কত মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাব,—সমস্ত স্মৃতি [illegible] হইতে উপ্‌ড়াইয়া তুলিয়া ফেলিয়া এই সীমাশূন্য নিরালোক ভবিষ্যতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে—সীতানাথের দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। যে আইন তাহাকে গৃহহীন করিয়াছে তাহারই করুণায় স্ত্রীর হাতের সোনা-বাঁধানো শাঁখাটি রক্ষা পাইয়াছে—তাহার উপর আইন হস্তক্ষেপ করে নাই। স্ত্রীর মণিবন্ধের ঐ স্বর্ণ-শাঁখাটিই সীতানাথের জীবনের অত্যাসন্ন প্রলয়ান্ধকারে ক্ষীণ নক্ষত্রালোক!

সীতানাথ স্ত্রী ও পুত্রকে হাঁটাইয়াই ষ্টেশনে লইয়া আসিল। হাল্‌দার বাড়ির বৌ রাস্তায় বাহির হইয়া কঠিন মৃত্তিকার উপর তাহার পদ্মকমলকলি স্থাপন করিবে বছর কুড়ি আগে এই কল্পনা পাগলেও করিতে পারিত না,—লোকসাধারণ এই ঘটনা হইতে কত যে নীতিমূলক মন্তব্যে উপনীত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বল্পাবগুণ্ঠিতা বধূটি সকলের অনতি-ব্যক্ত বিদ্রূপ ও করুণা সহ্য করিয়াই স্বামীর অনুগামিনী হইল,—মধ্যাহ্নের সূর্য্য অনন্ত চক্ষু মেলিয়া বধূটিকে দেখিতে লাগিলেন। পেছনে হালদার-বাড়ি পড়িয়া রহিল,—সেই বাড়িরই একটি অল্পালোকিত গৃহকোণে যেদিন সীতানাথের বাসরশয্যার পার্শ্বে শয়ানা সঙ্কোচভীতা নববধূটি প্রিয়তমের প্রথম স্পর্শটির প্রতীক্ষা করিতেছিল তখন কে জানিত তাহাকে একদিন রুক্ষ রাজপথেই কালাতিপাত করিতে হইবে!

ষ্টেশন মাষ্টারটিও অল্প অল্প মদ খাইতেন, সেই সম্পর্কে এক তাস খেলার আড্ডায় সীতানাথের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল,—আপাতত সেইখানে গিয়া-ই উঠা যাক্। এক রাত্রি আর কোন্ থাকিতে না দিবে! চাহিয়া চিন্তিয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিলে স্ত্রী-পুত্র নিয়া কাশী চলিয়া

যাইবে, সেখানে বিশ্বেশ্বর কিছু একটা জুটাইয়া দিবেন। দুঃখের প্রথম প্রাবল্যে গৃহহীন নিরাশ্রয় আজন্ম-নাস্তিক সীতানাথ মনে মনে এত বড় একটা বিশ্বাস পোষণ করিতে লজ্জানুভব করিল না। কিন্তু, ব্যাপারটা অবশ্য এইরূপ পরিণতি লাভ করিল না। ষ্টেশন মাষ্টারটি অবশ্য সীতানাথ ও তাহার স্ত্রী-পুত্রকে তাঁহার গৃহে স্থান দিলেন,—শুধু তাই নয়, এমন আদর অভ্যর্থনা করিলেন যে সীতানাথ মুগ্ধ হইয়া গেল,—হলধরবাবু ছাড়াও যে পৃথিবীতে অন্য ধাঁজের মানুষ আছে এ কথা বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ষ্টেশনে মাষ্টারের স্ত্রী সীতানাথের স্ত্রী কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাকে স্নান করাইয়া সীমন্তে সিন্দুর আঁকিয়া দিল, নিজের একখানি শাড়ি পরাইল ও তাহাদেরই ঘর ছাড়িয়া দিয়া সেখানে সীতানাথ ও কমলার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিল। সীতানাথের ছেলে নয় দশ বছরের প্রফুল্ল সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট্ খেলায় মাতিয়া গেছে,—ও যে কালক্রমে হব্‌স্-এর মত ক্রিকেটার্ হইয়া ভারতবর্ষে ক্রিকেট্-খেলার নূতন ইতিহাস রচনা করিবে তাহা নিয়াই উহার স্ফূর্ত্তির শেষ নাই।···সারা বিকাল বেলাটা একা একা ষ্টেশনে বসিয়া প্রফুল্ল ট্রেনের অবিরাম যাওয়া-আসা দেখিতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন,—সব গাড়ি থামেও না,—তবু ট্রেনের জানালায় প্রতিটি যাত্রীর মুখ তাহার ভাল লাগে,—কতদূর না জানি তাহারা চলিয়াছে,—প্রফুল্ল বসিয়া বসিয়া ট্রেনের চাকা গুনিতে চেষ্টা করে, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কালো হইয়া আসিতে থাকিলে ও একটি একটি করিয়া তারা গুনিয়া গুনিয়া ক্লান্ত হইয়া আকাশের অসীমতার আর কিনারা করিতে পারে না। দূরগামী ট্রেনটাকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি দিয়া অনুসরণ করে,—এমনি একটি দ্রুতগতিশীল সুদূর-প্রসারিত জীবনের জন্য প্রফুল্ল যেন অবচেতন ভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে।

বিকালের দিকে সহরে বাহির হইয়া সীতানাথ দুঃখের কথা বলিয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিল। তাহাতে তাহাদের কাশী যাওয়ার ভাড়াটা উঠিতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া তাহার দিনের সমস্ত সাধু সঙ্কল্প মুছিয়া দিল,—সীতানাথ সেই টাকা লইয়া শুঁড়ির দোকানে গিয়া ঢুকিল। তাহার যতদূর মনে পড়ে ইদানি একটি সন্ধ্যাও তাহার শুকনা যায় নাই, হাতে টাকা আসিলেই রূপাটা গলাইয়া গিলিয়া না লইলে তাহার স্বস্তি ছিল না; স্ত্রী পুত্রের কথা একবারো ভাবিল না ইহা হয়ত সত্য নয়, ভাবিলেও কিছু গ্রাহ্য করিল না, ইহার পর কি করিবে কোথায় যাইবে কে জানে, এখন ত সাধ্যমত আনন্দ করিয়া লই—উহার মনোভাব কতকটা এই ধরনের। ষ্টেশন-মাষ্টারের কোয়ার্টারে যখন সীতানাথ ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভাত লইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের বধূটি ও কমলা তখনো বাতি জ্বালিয়া বসিয়া আছে। বাড়ি ঢুকিয়া মাতাল সীতানাথ যে কাণ্ড সুরু করিল তাহা দেখিয়া নিদ্রোত্থিত প্রফুল্লর পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল। ষ্টেশন মাষ্টার অতীব ভদ্রলোক, এততেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না; সকাল হইলেই তিনি নিজের স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়া টাকা জোগাড় করিয়া সীতানাথ ও তাহার স্ত্রী-পুত্রকে এক ট্রেনে উঠাইয়া দিলেন,—প্রফুল্লর সানন্দ কলরব ডুবাইয়া ট্রেন বাঁশি বাজাইল।

দিনের আলোর প্রাখর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সীতানাথের অনুশোচনাও তীব্রতর হইতে লাগিল। কহিল—এততে আমার শিক্ষা হ'ল না, কমলা। আমি কি ক[illegible] বলতে পার ?

কাল রাত্রে সীতানাথের অভদ্র ও বর্ব্বরোচিত ব্যবহা[illegible] কমলার চেয়ে আর কে বেশি পীড়িত হইয়াছিল? সী[illegible] মত সে সতী হইলেও তাহার বাক্যোচ্চারণ মাত্র ম[illegible] বসুন্ধরা দ্বিধা হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেন নচেৎ সম্ভব হইলে কাল সে সেইক্ষণেই স্বচ্ছন্দে মরিয়া যা[illegible] পারিত। বিতাড়িত হইয়া যাহাদের ঘরে আসিয়া এত আ[illegible] ও সেবা এত দাক্ষিণ্য ও প্রীতি পাওয়া গেল তাহাদিগ[illegible] নির্লজ্জ অপমান—এ কমলা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পা[illegible] না। কাল রাত্রে সে আর ঘুমায় নাই, শ্মশানচারিনী মা-ক[illegible] কাছে প্রতি মুহূর্ত্তে সে তাহার নিজের মৃত্যু কামনা করিয়া[illegible] তাই, স্বামীর এই কথার উত্তরে কমলা কণ্ঠস্বর রুক্ষ ক[illegible] করিল —কি আর করবে? আমার গলার উপর পা[illegible] গলাটা চ্যাপ্‌টা ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড় আর কি!

মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছিলাম। বলিতে বলিতে কমলা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গলায় পা চাপিয়া গলাটা ধরিয়া ঠিক চ্যাপ্‌টা করিয়া না দিলেও কাশীতে গাড়ি আসিয়া থামিলে সীতানাথ গাড়ি হইতে আর নামিল না। ব্যাপারটা এইরূপ: মাঝের এক ষ্টেশনে গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় হইলে সীতানাথ কমলা ও প্রফুল্লকে মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া শিখাইয়া দিল যে তাহারা যেন কাশী আসিলেই সীতানাথের জন্য অযথা দেরি না করিয়াই নামিয়া পড়ে। উহাদের কাশীতেই যেন নামাইয়া দেওয়া হয়—গাড়ির অন্যান্য কয়েকটি মহিলাকেও সীতানাথ এই অনুরোধ জানাইয়া আসিল।...কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, ক্রমশঃ ভিড় সরিয়া গিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম এখন একেবারে ফাঁকা হইয়া গেছে,—তবু সীতানাথের দেখা নাই। কমলা চোখে অন্ধকার দেখিল,—প্রফুল্ল অস্থির হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিয়া বাবাকে যে পাওয়া যাইতেছে না এই সংবাদই শঙ্কিত শুষ্ক মুখে মাকে জানাইতেছে,—কি উপায় হইবে, কোথায় গিয়া কাহার দুয়ারে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। তবে কি সীতানাথ ইচ্ছা করিয়াই গাড়ি হইতে অবতরণ করে নাই? সীতানাথ কি এত বড় পাষণ্ড যে তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেছে?

ঠিক তাহাই। রাত্রে গাড়িতে অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এই ভাবনাটা বিদ্যুৎ-বিকাশের মত সীতানাথের মনে প্রতিভাত হইয়াছিল। রামচন্দ্র যদি সামান্য প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতা ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানকে এত সহজে ত্যাগ করিতে পারেন তবে সীতানাথ যে কেন তাহার মুক্তি ও অনায়াসজীবনযাপনের জন্য স্ত্রী-পুত্র ছাড়িতে পারিবে না তাহার কি হেতু আছে? সংসারে কেহ কারো নয়,—মনে মনে এই বৈরাগ্যমূলক নীতি-বচন আওড়াইয়া সীতানাথ নিজের আচরণকে সমর্থন করিতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল। ভাবিল—আমি ত' ভেসে পড়ি, বিশ্বেশ্বর তাঁর পায়ের তলায় হতভাগীকে নিশ্চয়ই স্থান দিবেন। বিশ্বেশ্বর আমার প্রতি যা নিষ্ঠুরতা করেছেন তার তুলনায় এ কিছুই নয়।—ট্রেনে বসিয়া এই সব চিন্তা করিতে করিতেই সীতানাথ কাশী পার হইয়া গেল, একবার জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল আগে প্রফুল্ল ও পরে কমলা নামিতেছে; দেখিয়া পরম স্বস্তি অনুভব করিয়া পকেট হইতে নস্য বাহির করিয়া দুই নাসারন্ধ্রে বহুলপরিমাণে গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

*

কমলা তাহার হাতের শাঁখা বেচিয়া মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিয়া বিধবা সাজিল, এবং এই বৈধব্যের বিজ্ঞাপনে একটি ভদ্র বাড়িতে রাঁধুনির কাজ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল; প্রফুল্লও এই বাড়িতেই দুই বেলায় দুই মুঠা ভাত পায়,—রাত্রে মেঝের উপর মার পা'শেই ঘুমায়,—আর সমস্ত দিন কাশীর অলিতে-গলিতে তাহার পলাতক বাবাকে অনুসন্ধান করে। সীতানাথ আর ফিরিয়া আসিবে না এ কথা কমলা মনে মনে বিশ্বাস করিলেও মুখ ফুটিয়া বলে না বলিয়া প্রফুল্লও তাহার আশা ছাড়ে না,—মন্দিরে, গঙ্গার ঘাটে, পথে-বিপথে সব খানেই সে তাহার বাবার পদধ্বনি শুনিবার আশায় কান পাতিয়া থাকে।

ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে পাড়ার পাঁচজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কমলা প্রফুল্লকে এক প্রবাসী বাঙালি জমিদারের কাছে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিল। ভদ্রলোকটি নিঃসন্তান, পোষ্য লইবেন,—এবং একটি সৎ ব্রাহ্মণের সুযোগ্য ছেলে পাইলে তিনি বিনিময়ে কিছু অর্থ দিতেও প্রতিশ্রুত আছেন। পিতা সৎ ব্রাহ্মণ কি না তাহার অবশ্য প্রমাণ দেওয়া গেল না,—পিতা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন ইহাই হয় ত তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার চরম নিদর্শন—তাহা ছাড়া প্রফুল্ল নিজে সুদর্শন, বিনয়ী, সুচারু-স্বভাব,—ভদ্রলোকটির পছন্দ হইয়া গেল। প্রফুল্ল এখন আর ছেলেমানুষ নয়, তাই তাহাকে জমিদার বাবুর বাড়ি পাঠাইতে হইলে কমলাকেও একটু চাতুরী করিতে হইবে। প্রফুল্লর ভালর জন্যই কমলা উহাকে পোষ্য দিতেছে,—নহিলে এমনি ভাবে থাকিলে প্রফুল্লও অক্লেশে পিতার অনুবর্ত্তী হইবে—প্রফুল্লর সেই পরিণাম ভাবিলে কমলা

য়া উঠে। কমলা না হয় আপন সন্তানের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইবে, তবু প্রফুল্ল সত্যিকারের মানুষ র সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে বড় হইয়া উঠুক,—র কল্যাণের জন্য ইহার চেয়ে বড় কামনা করা ার পক্ষে আজ অসম্ভব।

ক দিন কমলা প্রফুল্লকে বলিল—তোমার লেখাপড়া হচ্ছে না, সারা দিন রোদ্দুরে টো টো—চেহারাও খারাপ হ'য়ে গেছে—আমি একজন ভদ্রলোক ঠিক ছি, তিনি তোমাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দেবেন, সেখানেই খাবে শোবে,—আর সকালবেলা এসে আমার সঙ্গে ার দেখা করে' যাবে—কেমন ?

প্রফুল্লর কাছে এই প্রস্তাবটা মন্দ লাগিল না, কেননা র্বদা কাছে থাকিলে কি হইবে এই বাড়ির খাওয়া র কাছে বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে র দরুণ তাহার সর্দ্দি কিছুতেই কমিতেছে না, লেখা- ইস্তফা দিয়া সে দিনে দিনে একেবারে খোট্টা হইয়া তছে !

কমলা আরও বলিল—তার পর তুমি বড় হ'লেই মানুষ আমাদের দুঃখ ঘুচ্‌বে,—আমরা তখন নিজের বাড়ি থাক্‌ব। এই বলিয়া কমলা প্রফুল্লকে আশীর্ব্বাদ তে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রফুল্ল মায়ের পদধূলি য় লইয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে টাঙ্গায় গিয়া উঠিল।

নূতন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত দিন াত্রি প্রফুল্লর যে কী অপরিসীম আনন্দের মধ্য দিয়া ল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমস্ত দিনে রাত্রে র মা'র কথা একবারো মনে পড়িল না,—তাহাদের ার-বাড়িতেও এমন রান্না কোনদিন হয় নাই, যে শরীর ক আগে একটা নোংরা বাড়ির ভিজা এঁদো মেঝের শুইয়া ছিল তাহার উপর যে কত দামী দামী জামা ড় চড়িয়াছে তাহা দেখিয়া প্রফুল্লর তাক্ লাগিয়া গেল,— ছেঁড়া ময়লা কাপড় খানার কথা সে একেবারে ভুলিয়া ়। গদি-আঁটা খাটের উপর শুইয়া তাহার ত' ঘুমই তেছিল না,—এত বড় খাটটায় দুই পা প্রসারিত য়া দিতে যেন তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল ; মাথার কাছে বসিয়া দাসী হাওয়া করিতেছে,—যতক্ষণ তাহার ঘুম না আসিবে ততক্ষণ সে পাখা থামাইবে না, দরকার হইলে সে তাহার পা-ও টিপিয়া দিতে পারে—তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ আছে। জমিদারের স্ত্রী এক দিনেই তাহাকে এত আদর করিয়াছেন যে প্রফুল্লর মনে হইতেছিল সে যেন এত দিন ভুল করিয়াই কমলাকে মা বলিয়াছে।

কিন্তু সকাল হইতেই প্রফুল্ল কমলাকে দেখিতে ছুটিল—সকালবেলা দেখা করিবার জন্য মা বলিয়া দিয়াছেন। কাল মেঝের উপর একা একা ঘুমাইতে মার না জানি কী কষ্ট হইয়াছে ! প্রফুল্ল ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে চাকর, দাসী ও পিছনে জমিদারবাবু পর্য্যন্ত চলিলেন। মা'র বাসস্থানের কাছে আসিতেই প্রফুল্ল আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠানে ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ির কর্ত্রী বাহির হইয়া প্রফুল্লকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, কান্নার মধ্য দিয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহা সংক্ষেপে এই : কাল রাত্রে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া দশ ঘণ্টার মধ্যেই কমলা গতাসু হইয়াছে। প্রফুল্লকে খবর ত দেওয়া হয়-ই নাই, এমন কি মুখাগ্নি না করিয়াই তাহার মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিয়া প্রফুল্ল প্রথমে স্তম্ভিত ও হতবাক্ হইয়া রহিল,—পরে মা—গো বলিয়া এমন চীৎকার দিয়া উঠিল যে পাশের ঘরে উপবিষ্টা কমলার বুকটা যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

এমন একটা অমানুষিক মিথ্যা ছলনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা একটু বুঝাইয়া বলি। পোষ্য নেওয়ার পর কমলার সঙ্গে প্রফুল্লর কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে ইহা জমিদার-গৃহিণীর আদৌ অভিপ্রেত নয় ; তাহা ছাড়া প্রফুল্ল চিরজীবনের জন্য কমলার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে শুনিলে হয়ত সে মোটেই রাজি হইবে না, মুঠিতে মা'র আঁচল ধরিয়া থাকিবে, সন্তানের প্রতি সুগভীর স্নেহে কমলা তাই বিশ্বাস করিয়াছিল। তাই মৃত্যু কমলাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে—এই রূপ একটা প্রতিকারহীন বিচ্ছেদের সংবাদ শুনাইলে অসহায় প্রফুল্ল তাহার মাকে বিস্মৃতির সমুদ্রে সহজেই ডালি দিতে পারিবে—এই জন্যই এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সন্তান-কণ্ঠের আর্ত্তধ্বনি শুনিয়া

কমলা প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেও প্রফুল্লকে বেশিক্ষণ কাঁদিতে দেওয়া হইল না, মোটরে করিয়া তাহাকে বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইল। জমিদারগৃহিণী তাহাকে বুকে করিয়া শান্ত করিলেন, বলিলেন—আজ থেকে আমিই তোমার মা, এস, তোমার জন্য আজ ক্ষীরের পিঠে ক'রে রেখেছি,—ও হেমন্তি, দাদাবাবুর সেই মখ্‌মলের নতুন পোষাকটি নিয়ে আয় ত!

রোজ সকালে কমলা পথে আসিয়া একটু দাঁড়ায়,—যদি প্রফুল্ল ভুলক্রমে আসিয়া পড়ে তবে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইতে না পারিলেও একবার দূর হইতে দেখিয়া লইবে, কিন্তু প্রফুল্ল আর আসে কই? জমিদারবাবুদের সঙ্গে প্রফুল্ল কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

এই গল্পে কমলার জীবনের পরিণতি লিপিবদ্ধ করিতে বসি নাই। যাহাদের খুসি ভাবিতে পার কমলা সন্তান-শোকে ধীরে ধীরে দেহক্ষয় করিল, যাহারা একটা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হইলে খুসি হও তাহারা কমলাকে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ভক্তি-বিনতা পূজারিণীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়ো,—আর যাহারা নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন নির্লজ্জ সংসারের রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছ তাহারা ইহাই ভাবিয়ো যে, কমলা অবনত মনুষ্যের জনতায় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে,—সন্তানের শোকমাধুর্য্য তাহার জীবন হইতে কখন অপসৃত হইয়া গেল কে জানে,—দেহ-পণ্যবীথিতে তাহাকে দেখিতে পাইবে! যাহার যাহা ইচ্ছা ভাবিয়া লইয়ো, গল্পের পক্ষে তার প্রয়োজন নাই।

সীতানাথ সত্যই সন্ন্যাসী হইল কি না, না গেরুয়ার বদলে শুধু গাঁজার কলিকাটাই আঁক্‌ড়াইয়া ধরিল—এ সবে কিছু আসে যায় না।

ইহার পরে প্রায় তেরো চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে,—প্রফুল্ল এখন দীর্ঘায়তদেহ কান্তিমান্ যুবাপুরুষ—রূপনগরের জমিদারের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আজকাল প্রফুল্লর প্রতাপ ও শক্তিমত্তা দেখিয়া কে বলিবে সে একদিন কাশীর পচা বাড়ির রান্নাঘরের মেঝেয় শুইয়া নিদ্রার আ ধনা করিয়াছে? কে বলিবে সে একদিন কাশীর প্ল্যাট্ফ বাবাকে খুঁজিয়া না পাইয়া নিজেকে একান্ত নিঃস্ব ভা ট্রেনের তলায় মাথাটা গলাইয়া দিতে চাহিয়াছিল! অ প্রফুল্লকে দেখিবে এস,—সে আজ বিলাস ও ক্ষমত সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া কালসমুদ্রকে আজ্ঞা দিবার অহঙ্ক পোষণ করিতেছে—প্রফুল্লকে দেখিলে কমলা পর্য্যন্ত স হইত!

কিন্তু ভাগ্যের চাকার মোড় ফিরিল, প্রায় প্রৌঢ় সীমায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতে জমিদারগৃহিণী একটি পু সন্তান প্রসব করিলেন। প্রফুল্লর মুখ শুকাইয়া এতটু হইয়া গেল,—আইনের কি একটা দুর্বোধ্য প্যাঁচে জমি বাবুর পোষ্যত্বগ্রহণটা একেবারে নাকচ হইয়া গেল—রা ঐ আফিস্-অভিমুখী কেরাণীটির সঙ্গে প্রফুল্লর আর কো প্রভেদ রহিল না। প্রফুল্ল ইহার জন্য একেবারেই প্র ছিল না, অপ্রত্যাশিত ঘটনার তলায় পড়িয়া এব নিষ্পেষিত হইয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে উন্নিদ্র অব পায়চারি করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক এই নবজাত শিশুকে খুন করিতে হইবে। কিন্তু ক লেখার মত হত্যা করাও সাধনার বিষয়; প্রতিজ্ঞা ও তা পরিপালনের মধ্যে আকাশ ও মাটির ব্যবধান রহিয়াছে।

তাই নবজাতশিশুকে আর খুন করা হইল না, তা জন্যই সোনার সিংহাসন! জমিদারগৃহিণী প্রফুল্লকে সোজা বলিয়া দিলেন—পথ দেখ। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেদনা ল অপমানিত প্রফুল্ল পরিচিত আবাস ত্যাগ করিয়া আ পথে আসিল। একটা সদ্যোজাত শিশুর কাছে তা এই পরাভব কত দূর কদর্য্য কত দূর দুর্ব্বিষহ। তবুও তাহাকে এমনি নিশ্চেষ্ট এমনি নিরাবলম্ব হইয়া থাকি হইবে। ঘৃণায় লজ্জায় তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হ কিন্তু আত্মহত্যা করিবার মত কঠোর কাজ পৃথিবীতে করি আর কিছু নাই।

স্বভাবতই প্রফুল্ল ত্যজ্য হইল। আজ পথে ব হইয়া আসিয়া এতদিন পরে মা'র কথা মনে পড়িল,—মা আর বাঁচিয়া নাই—বাবা কোথায় বিবাগী হইয়া গে

ক জানে,—আজিকার এই সীমাহীন দুঃখে এতদিনে অকৃতজ্ঞ প্রফুল্ল যেন তাহার অন্তর্হিত পিতা-মাতার দুঃখকে স্পর্শ করিল, বুঝি বা উপলব্ধি করিল। কিন্তু কোথায় আজ সে ফিরিয়া যাইবে? যে জীবন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আসিয়াছে তাহারই দিকে অস্পষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখে জল আসিল,—মনে পড়িল তাহার শৈশব,—একদিন তাহাদের সত্যিকারের বাড়ি হইতে সে বাবা-মা'র হাত ধরিয়া এই পথেরই পার খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল! সেই বাড়িই ত তাহার সত্যিকারের স্বর্গ, তাহার প্রপিতামহের প্রথম স্বপ্ন! কিন্তু হায়, সেই স্বর্গ আজ অন্যের কবলিত, সেখানেও প্রফুল্লর প্রবেশাধিকার নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বব্যাপী এই প্রবঞ্চনা ও ছলনার বিরুদ্ধে প্রফুল্ল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—তাহার রাগ গিয়া পড়িল হলধরবাবুর উপর যিনি তাহার শৈশবস্বপ্ন কাড়িয়া লইয়াছেন, যিনি উহাকে অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতের মহাসমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া পারে দাঁড়াইয়া আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ করিতেছেন—মুহূর্ত্তমধ্যে প্রফুল্ল একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। সেই দিনই—হাঁ, আর দেরি করিল না—সেই দিনই প্রফুল্ল তাহাদের দেশের সত্যিকারের বাড়ির দিকে রওনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই সহর এই চৌদ্দ বৎসরে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। হালদার-বাড়ি না বলিয়া হলধরবাবুর বাড়ি বলিতেই লোকে তাহাকে তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়িটা দেখাইয়া দিল। বাড়িটার চেহারা একেবারে নূতন হইয়া গিয়াছে মনে হইল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রফুল্লর দেহের রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল—এই বাড়ি সে অধিকার করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার অসহায়তা ও অসামর্থ্যের পরিমাণ চলে না, তাই বাড়িটার দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু ভিজিয়া আসিল।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, এত বড় বাড়িতে হলধরবাবু একা থাকেন। বার্দ্ধক্যের প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন, চুলে ধীরে ধীরে পাক ধরিতেছে—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। সহরে তাঁহাদের আরো বাড়ি আছে, সেখানে তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ সংসার নির্ব্বাহ করে—এই নির্জ্জন বাড়িটিতে বসিয়াই তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত বীণ্‌এ আলাপ করেন। অগাধ বিত্ত,—উইল করিয়া কাহাকে দিয়া যাইবেন ঠিক নাই—অনেক দান-ধ্যান করিয়াছেন,—তৎসত্ত্বেও লোকটি অসম্ভব রকমের বিলাসী। একা নিজেরই জন্য তিন চারটি চাকর, তিনখানি মোটর গাড়ি,—আর ঘর-দোর কি চমৎকার সাজানো, কি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি—দেখিলে তাক লাগিয়া যায়; এত সব তিনি কাহার জন্য সংগ্রহ করিতেছেন! সংসারের এই বিলাস-জড়ত্বের মধ্যে বাঁধা পড়িয়াও হলধরবাবু জনকরাজার মতই বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন,—সাধুসন্ন্যাসীর সেবায় তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, তিনি তাঁহার গৃহে কত যে পশুপক্ষী প্রতিপালন করেন তাহার শ্রেণী বিভাগ করিয়া গুনিয়া শেষ করা যায় না। মধ্য রাত্রে হলধরবাবু যখন বীণ্ ফেলিয়া বাগানে আসিয়া ধীরে ধীরে প্রদচারণা করিতে করিতে রাত্রির দীর্ঘ নিশ্বাসের মতই অস্ফুটকণ্ঠে গান গাহেন তখন বিছানায় জাগিয়া উঠিয়া প্রফুল্লরও মনে হয় যেন নিশীথ-আকাশের একটি বেদনার বাণী মর্ত্ত্যতলে নামিয়া আসিয়াছে! ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্ল তাহার ঘৃণা ভুলিয়া যায়, অনশনক্লিষ্টা মা'র কথা মনে পড়ে।

প্রফুল্ল হলধরবাবুর কাছে সোজাসুজি এক চাকুরি চাহিয়া বসিল। হলধর বাবু প্রফুল্লর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ধরনের চাই?

বিনয়হাস্য করিয়া প্রফুল্ল বলিল—যা আপনি দেন, আপনার হয় ত' একটি প্রাইভেট্ সেক্রেটারির দরকার আছে—

হলধরবাবু প্রফুল্লর হাবভাব চালচলন ও চেহারা দেখিয়া প্রথম দর্শনেই ভারি প্রীত হইয়াছিলেন, উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন—আমার হয় ত' দরকার আছে,—তা আমিই

জানি না। বেশ, আজ থেকে তুমিই আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। কাজ? দাঁড়াও, দু'দিন পরে ভেবে দেখ্‌ব। বলিয়া হলধর বাবু, দাঁড়াইয়া প্রফুল্লর দুইটি চক্ষু দেখিতে লাগিলেন,—উহাতে যেন কাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে,—না, তাহা নয়—হলধরবাবুর বক্ষপঞ্জর কাঁপাইয়া এক দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল।

হলধর বাবু পুনরায় বলিলেন—একটা মনমত ঘর বেছে নাও গে, চাকর ব্যাটাদের বল সব গুছিয়ে গাছিয়ে দেবে। আর একটা ফর্দ্দ কর আপাতত যা তোমার লাগবে, ম্যানেজার বাবুকে ব'লে বিকেলে কিনে কেটে আনাব 'খন। হাঁ তোমাকে একটা মাইনে ঠিক ক'রে দিতে হবে। বাড়িতে কেউ আছে? কেউ নেই? এমন সুন্দর চেহারা—বিয়ে করনি, বল কি হে—শেইক্‌স্‌পীয়রের প্রথম সনেটটা পড়েছ? কেন, প্রেম করেছ বুঝি?—যাক্ গে, খালি হাত-খরচ,—ধর, এখন দেড় শ টাকা পাবে। তারপর বিয়ে কর্‌লে—আচ্ছা, আচ্ছা এখন যাও!

আবেগে হলধরবাবুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি প্রফুল্লকে বিদায় দিয়া তিনি সময়ানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম করিয়া বীণ্ লইয়া বসিলেন। তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া বারিধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—দেয়ালে একটি অর্দ্ধস্ফুটযৌবনা-কিশোরীর ফটোর দিকে চাহিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে গান গাহিতে লাগিলেন।

প্রফুল্ল প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল,—যতই সম্ভারসমৃদ্ধ ঘরগুলি দেখে ততই তাহার মাতার রোগপাণ্ডুর ব্যথাবিবর্ণ মুখখানির কথা মনে করিয়া তাহার দেহের রক্ত তপ্ততর হইতে থাকে। ঘরগুলির অবস্থান তাহার ভাল মনে নাই বটে কিন্তু অবশিষ্ট বংশধরটির জন্যই বোধহয় এই বৃহৎ বাড়িতে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ আনন্দ-নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—এইখানে বসিয়া তাহার বৃদ্ধ ঠাকুমা পাকা চুলের সিঁথিতে সিন্দুর মাখিতেন; এই খানেই হয় ত তাহার মা একদিন গাঢ়াবগুণ্ঠা হইয়া কুণ্ঠিত পদে প্রথম আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—দুটি চোখ ব্রীড়াবনত, সুকুমার দেহে কৈশোর-লাবণ্য! সেই দিন প্রফুল্ল কোথায় ছিল,—হয় ত' তারার দেশে, মৃত্যুর ওপারে—মাতার যৌবন-স্বপ্নে, প্রথম কবি-কল্পনায়! প্রতি ঘর যেন প্রফুল্লর পানে বিদ্রূপ করিয়া তাকায়, প্রতিটি [illegible] যেন মা'র মৃত্যুকলঙ্কিত দেহের মত মলিন ও অপবিত্র ম[illegible] হয়, তাহাকে যেন সব কিছু রুদ্ধস্বরে শাসন করে, [illegible] দেখায়, ভীরু কুলাঙ্গার বলিয়া তাহাকে নীরবে ব্যঙ্গ করে অচঞ্চল সামগ্রীর মধ্যেও যে প্রাণ আছে ইহা আবিষ্কা[র] করিয়া প্রফুল্ল সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হই[য়া] পায়চারি করিতে থাকে।

সকাল বেলা চা খাইবার সময় হলধরবাবু প্রফুল্লকে নিজের টেবিলে ডাকিয়া লন্,—তাহার সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত সহজ পরিচয়ের ভাষায় গল্প করিতে থাকেন,—বৃদ্ধের রসিকতা ভারি স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ,—তবুও প্রফুল্ল হলধর বাবুকে ক্ষমা করিতে পারে না। প্রফুল্লর হাতে একটি খুব দামি টার্কিশ সিগারেট দিয়া হলধরবাবু স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিয়া চলেন—তুমি ত বামুন, না প্রফুল্ল? একটি মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে?—ভারি দুঃখী, দেয়ালে ঐ যে ফটো দেখছ, তাঁরি মেয়ে; দেয়ালের ছবি অবশ্যি অমনি চিরকিশোরীই আছে,—কেন না, শুন্‌বে ইতিহাস?

প্রফুল্ল প্রস্তুত হইয়া লইল, হলধরবাবু বলিতে লাগিলেন—ব্যাপারটা ভারি সোজা, মামুলি—তোমাকে বল্‌তে আমার ভালই লাগ্‌বে। শুন্‌তে তোমার ইচ্ছে নেই?—আচ্ছা, খুব সংক্ষেপে সার্‌ছি। ঐ মেয়েটিকে আমি ভালবাস্‌তাম,—তুমি হেসো না প্রফুল্ল; মেয়েটির অবশ্য অন্যত্র বিয়ে হ'য়ে গেল, এতেও হাসবার কারণ নেই। ভাব্‌লাম, সমাজ সংসার আইন কানুন সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত ক'রে সরোজিনীকে আমার ছিনিয়ে নিতেই হবে,—না হয় ডাকাতিই কর্‌ব। এবার তোমাকে হাসতে অনুমতি দিচ্ছি প্রফুল্ল, সরোজ কিন্তু আমার এই মতলোব কার্য্যে পরিণত হবার আগেই অকালে একটি মেয়ে প্রসব ক'রে মারা গেল। সেই মেয়েটির কথাই তোমাকে বল্‌ছিলাম, বিয়ে কর্‌বে তাকে? মেয়েটি এখন একেবারে অনাথা,—ইচ্ছে করে আমার বাড়িতে ওকে এনে রাখি, কিন্তু কোনো সুযোগ মেলে নি তার—তুমি যদি রাজি হও, তা হ'লে চেষ্টা কর্‌তে পারি প্রফুল্ল। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের দিয়ে যাব।

লোকটার প্রতি প্রফুল্লর বিজাতীয় ঘৃণা হইল,—অবশ্য এই ঘৃণার ঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন,—প্রফুল্ল আর সম্পত্তির কাঙাল নহে, সে এখন বিপদের সহচর, দুর্ঘটনার বন্ধু,—সে প্রতিশোধ লইতে বাহির হইয়াছে, বিবাহ করিয়া কুড়েমি করা তাহার পোষাইবে না। তবু মুখে হাসি টানিয়া প্রফুল্ল কহিল—বিবাহের জন্য এখনো প্রস্তুত হই নি—

হলধরবাবু অভ্যাসমত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—সেই প্রস্তুত করাবার ভার আমি নিলাম প্রফুল্ল, যদি সম্ভব হয় সরোজের মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করি—দুনিয়ায় অর্থ থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা যায়—

প্রফুল্ল কহিল—কিন্তু জানেন, আমি ভাগ্যের 'ভিক্‌টিম্‌',—সম্ভব হবে না।

—তবু দেখি না চেষ্টা করে'। বাপ তার ভীষণ একগুঁয়ে জানি, কিন্তু অবস্থা তার এমনি হয়েছে যে এত সহজে এত সমৃদ্ধির অধিকারিনী করে' মেয়েকে পাঠাতে পার্‌ছে দেখে হয়ত আর আপত্তি কর্‌বে না। জীবনে যে ক'টা দিন বাঁচি, সরোজের মেয়ে—আমার মানসকন্যাকে স্নেহসিক্ত করে' যাব,—আমার এই পোড়া বুকটায় কত যে স্নেহ সঞ্চিত হ'য়ে আছে তার একবার পরিচয় দিতে চাই প্রফুল্ল। মৃত্যুর পর কোথায় ভেসে যাব কে জানে,—হয় ত নিশ্বাসের সঙ্গেই লুপ্ত হ'য়ে যেতে হবে—তবু যদি পারি এই বাকি জীবনেই দু'টি দিন আবার অতীতের স্নেহছায়ায় বসে' জিরিয়ে নিতাম,—তুমি রাজি আছ ত প্রফুল্ল?

প্রফুল্লর তখন স্বীকার না করা ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু রাত্রে নিজের ঘরে বসিয়া সে সঙ্কল্প করিয়া বসিল হলধর-বাবুকে সে খুন করিবে। বৃদ্ধের চাতুরীতে সে আত্মবিস্মৃত হইবে না, সম্পত্তি সে পদাঘাত করিয়া দূরে সরাইয়া দিবে, একদিন এর চেয়ে সহস্রগুণ বেশি বিত্তের অধিকারী হইতে-হইতে সে ভাগ্য কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত হইল—সে তাহার নিদারুণ প্রতিশোধ নিবে বৈ কি। সে জানে শেষ পর্য্যন্ত এই লোভও তাহার কপালে স্থায়ী হইবে না,—এই খবর একদিন অবশ্য হলধরবাবুই আসিয়া দিলেন: মেয়ের বাপ সরোজের স্বামী কিছুতেই রাজী হ'ল না, আমাকে ব্যাটা ভারি ঘেন্না করে—তার বৌকে ভালবেসেছিলাম বলে'। আরে, সে কি আমার অপরাধ? বলিয়াই আবার সেই হাসি! তাহার অর্থ, প্রফুল্লর এ সম্পত্তি পাইবার আর তিলার্দ্ধ আশা নাই। সে তাহা চাহেও নাই, সে তাহার পরিবর্ত্তে এই হলধরবাবুর জীবন লইবে—যে তাহাদের সুখের সংসার ছারখার করিয়া এখন সেই সম্পত্তিই দান করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে!

সত্য কথা বলিতে কি, প্রফুল্ল এক ছোরা কিনিয়া আনিল ও মধ্য রাত্রে খোলা দরজা দিয়া হলধরবাবুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড অট্টালিকায় আর একটি প্রাণীরও নিশ্বাস শোনা যাইতেছে না,—প্রফুল্লর আবির্ভাবের পর পূর্ব্বতন ম্যানেজার বরখাস্ত হইয়াছেন,—চাকর বাকররা এ পাড়ায়ই একেবারে নাই—ছোরা বসাইয়া দিলে আশু ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কিসের একটা অস্ফুট শব্দে হলধরবাবু জাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—কে, প্রফুল্ল?

প্রফুল্লর মুখ শুকাইয়া গেল, তবু জিহ্বা দিয়া ঠোঁট দুইটা চাটিয়া নিয়া কহিল—হ্যাঁ, আমি। সেই গল্পের বইটা নিতে এসেছিলাম, কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না—

বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মশারি তুলিতে তুলিতে হলধরবাবু কহিলেন—শুয়ে শুয়ে আমিও ঘুমের তপস্যা করছিলাম, চোখের জলে সব ঘুম ধুয়ে ধুয়ে যায় প্রফুল্ল। এত রাত্রে কি ছাই গল্পের বই পড়বে, তার চেয়ে আমি বাঁশ্‌টা বাজাই—তুমি কাছে ব'সে থাক্‌লে ভারি ভালো লাগবে।

খুন করিতে আসিয়া অগত্যা প্রফুল্লকে বাজনা শুনিতে হইল। রাত্রি ফুরাইয়া আসিল তবু প্রফুল্ল তন্ময় হইয়া বাঁশের আলাপ শুনিতেছে দেখিয়া হলধরবাবু খুসি-ই হইলেন,—কিন্তু ভোর হইতে না হইতেই কাপড়ের তলায় ছোরাটা লুকাইয়া প্রফুল্ল কখন যে অদৃশ্য হইয়া গেল হলধরবাবু আর টের পাইলেন না।

পরের রাত্রেও প্রফুল্ল ছোরা লইয়া পুনরায় হলধরবাবুর ঘরে ঢুকিল। হলধর বাবু দরজা জানালা খোলা রাখিয়াই ঘুমান্‌,—চুরিকে তিনি ভয় করেন না—বরং চোরের দেখা পাইলে তাহাকে হয়ত তাহার প্রয়োজনাতিরিক্তই দান করিয়া বসিতেন। কিন্তু সেদিনো প্রফুল্লর খুন করা হইল না।

আকাশ হইতে জ্যোৎস্না হলধরবাবুর বিছানায় ঝরিয়া পড়িতেছে,—কিন্তু ব্যাপারটা তাহা নয়,—মশারির কোণ হইতে একটা দড়ি মেঝের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল; সেই দড়িটা দেখিয়াই প্রফুল্ল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সেই দড়িটা যেন কিসের একটা রূপকে রূপান্তরিত হইয়া প্রফুল্লর মনে ভীতিসঞ্চার করিতেছে। প্রফুল্ল হলধরবাবুর মশারি আর না তুলিয়া একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল:

হলধরবাবুকে খুন করা যে উচিত সে বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ নাই। খুন করার কি যে কারণ তাহা প্রফুল্ল নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছে তাহাতে অবশ্য তাহার বিবেক সম্পূর্ণ সায় দেয় নাই—ধরা যাইতে পারে, এই হলধরবাবুই এক পক্ষে তাহার মা'র মৃত্যু ও বাবার নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী; ধরা যাইতে পারে যে প্রফুল্ল পূর্ব্বতন জমিদারের বিত্ত হইতে শেষকালে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া সে এখন সমস্ত বিত্তবানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিম্বা,ধরা যাইতে পারে যে সে-মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ হইলে সে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত (যদিও সে তাহা বিশ্বাস করে নাই) এবং সে-বিবাহ হইল না। (ব্যাপারটা আগাগোড়া হলধরবাবুরই কোন নূতন চক্রান্ত কি না কে জানে? কিন্তু প্রফুল্লর পূর্ব্বপুরুষপরিচয় ত হলধরবাবু জানেন না।) কোন একটা কারণই প্রফুল্লর মনোমত হইল না। তবু সে হলধরবাবুকে খুন করিবে, কেননা খুন করা অতি সহজ, খুন করিতে প্রফুল্লর অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।—প্রফুল্লর রক্ত মাথায় চড়িয়া টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার খুন করার উদ্দেশ্য কি? হলধরবাবুর সম্পত্তি পাইবার জন্য?—মোটেই নয়। এই বাড়িতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য? আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কতকটা তাহাই। কিন্তু বাড়ি ঘর দোর লইয়াই বা সে কী করিবে? কাহার জন্য তাহার গৃহ? বিবাহ করিবে? সে ত কুঁড়ে ঘরের ভিখারীও করে, তাহার জন্য আবার এত ঢং কিসের? মনের গহন অন্ধকার হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া প্রফুল্ল একটাও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। শেষকালে ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে, যেহেতু ভাগ্য তাহাকে বিনা কারণে উৎপীড়িত করিয়াছে, সেও তেমনি কোন কারণ বা উদ্দেশ্যের প্রশ্ন না তুলিয়া হলধরবাবুকে হত্যা করিবে,—হলধরবাবু মহৎ কি নীচ, অমায়িক কি কুটিল, পীড়ক কি স্নেহশীল সে বিষয় নিয়া সে মোটেই মাথা ঘামাইবে না।

আচ্ছা, খুন না হয় করিল; কিন্তু তাহার পর? হ্যাঁ, তাহার পর? তাহার পর সে কি কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছে? মন্দ কি,না হয় তাহার ফাঁসি হইবে,—বেশ কয়েকদিন ধরিয়া একটা রোমহর্ষণকারী মোকদ্দমা চলিবে—তাহার পর না হয় সে ফাঁসির দড়ি গলায় লট্‌কাইয়া ঝুলিয়া পড়িবে—মরিতে প্রফুল্ল একটুও ভয় করে না। এমন কি, মোকদ্দমার কোনো এক অসতর্ক ফাঁক দিয়া প্রফুল্ল মুক্তিও পাইতে পারে। হ্যাঁ, মুক্তিও ত পাইতে পারে, প্রফুল্লই যে মারিয়াছে তাহা সপ্রমাণ যে হইবে-ই এমন কোনো আইনের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম আছে বলিয়া ত প্রফুল্লর মনে হইল না। হ্যাঁ, একটু চালাকি করিয়া খুন করিলে প্রফুল্ল হয় ত' ছাড়া-ও পাইতে পারে। ঠিক তাই, প্রফুল্লর হাত-তালি দিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল। অন্যের প্রাণ লইয়াছে বলিয়া সব সময়েই যে ঘাতককে বিনিময়ে প্রাণ-উৎসর্গ করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে এমন নিয়ম থাকিলে মোটা পেনালকোড্‌টাই সঙ্কুচিত হইয়া আসিত। হ্যাঁ, এমন ভাবে হলধরবাবুকে হত্যা করিতে হইবে যাহাতে প্রফুল্লকে সহজে কেহই দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবে না।

খুট্ করিয়া কি একটা শব্দ হইতেই হলধরবাবু জাগিয়া উঠিলেন। ঘরে লোক দেখিতে পাইয়া চক্ষু কচ্‌লাইয়া ভাল করিয়া ঠাহর করিলেন। খুসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া কহিলেন—কে, প্রফুল্ল? এখানে চুপ করে' বসে' আছ?

প্রফুল্ল স্বাভাবিক সুরে কহিল—আপনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা কর্‌ছিলাম—আপনার বীণ্ শুন্‌তে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

আনন্দে বিহ্বল হইয়া হলধরবাবু পার্শ্বশয়ান বীণ্‌টি তুলিয়া লইয়া ভক্তিবিনত হইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সম্মুখস্থ নদীর উপরে রাতের অন্ধকার পাত্‌লা হইয়া আসিতেছে—রঙের সঙ্গে সুরেরও যে একটা সূক্ষ্ম সঙ্গতি

আছে—তাহা হলধরবাবুর বীণ্ ও তরলতিমির নদীর দিকে চাহিয়া প্রফুল্লর মনে হইল। বাজ্না শুনিবার এক ফাঁকে প্রফুল্ল যে কখন আবার সরিয়া গেছে প্রগাঢ় তন্ময়তায় হলধরবাবুর আর তাহার দিশা হইল না।

যাই হোক্, এরকম করিলে যে চলিবে না প্রফুল্ল তাহা বুঝিল। তাই একদিন ব্যস্ত হইয়া প্রফুল্ল আসিয়া হলধরবাবুকে বলিল—চাকর বাকরগুলোর একটাও কথা শুন্‌ছে না, এদের নিয়ে আর পারা গেল না—

হলধরবাবু স্লিপিং সুট-এ আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, দাড়ি কামানো বন্ধ না করিয়াই বলিলেন—তাই নাকি প্রফুল্ল? ব্যাটাদের তাড়িয়ে দাও তা হ'লে। এ সব আর আমাকে জিজ্ঞেস করতে আস কেন? তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর্‌বে। ব্যাটাদের তা হ'লে ভারি তেল বেড়েছে, না? দাও সবাইর মাইনে চুকিয়ে—

হঠাৎ অকারণে বরখাস্ত হইয়া চাকর বাকরগুলো একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কিন্তু প্রফুল্লকে ডিঙাইয়া খোদ কর্ত্তার সম্মুখীন হওয়া ইহাদের সাধ্যাতীত—আগের ম্যানেজার বাবু থাকিলে হইত। বিনা প্রতিবাদে তাহারা তল্পিতল্পা গুটাইয়া বিমর্ষ মুখে এই বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এইবার বাড়িটা একদম্ ফাঁকা হইয়া গেছে। খুন করিতে হইবে অথচ ধরা পড়িবে না, মনের এতটা সুস্থতা দরকার, কয়দিন ধরিয়া ভারি সংযতচিত্তে প্রফুল্ল তাহাই আয়ত্ত করিয়া লইল। রোজ শনিবার হলধরবাবু ট্রেনে করিয়া কলিকাতা যান, আবার সোমবার ফিরিয়া আসেন,—কলিকাতার প্রায় মাইল চল্লিশ দূরে এই বাড়ি,—কোন কোন্ দিন্ ইচ্ছা হইলে হলধরবাবু মোটরে করিয়াই বেড়াইয়া আসেন; প্রফুল্লই মোটর চালায়। এই শনিবারেও হলধরবাবু কলিকাতা যাইবেন,—এবং বড় মোটরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার এই কথা প্রফুল্ল বলিলে হলধরবাবু ট্রেনে যাইতেই স্বীকৃত হইলেন। প্রফুল্ল সকাল হইতেই হলধরবাবুর জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতেছে। হলধরবাবু বলিলেন—দু'দিনের জন্য যাচ্ছি, এত কি সব দিচ্ছ প্রফুল্ল? আমার আরামের জন্য তোমাকে এত হয়রান্ হ'তে হবে না। ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার মত তোমার গাড়িটার দম আছে ত'?

হলধরবাবু টেবিলে খাইতে বসিলেন, রাঁধুনে ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে প্রফুল্লই রান্না করিয়াছে, পরিবেষণ-ও সেই করিতে লাগিল। হলধরবাবু বলিলেন—তুমি যে চমৎকার রেঁধেছ, প্রফুল্ল,—বহুদিন যে এমন রান্না খাইনি। প্রফুল্ল, দিনে দিনে তোমার গুণে আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি খেয়ে নিয়েছ ত? একটা ত প্রায় বাজে! আজকাল গাড়ির নতুন টাইমিং হয়েছে বুঝি—দুটো কুড়ি? আচ্ছা, তুমিও বোস—দুজনে একসঙ্গে খাই।

প্রফুল্ল অল্প একটু হাসিয়া বলিল—আপনি খেয়ে নিন্, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেই আমি খেয়ে নেব'খন।

হলধরবাবু মাংসের বাটিটা মুখে তুলিয়া প্রায় অর্দ্ধেক ঝোল্‌টা চুমুক দিয়া খাইতেছেন হঠাৎ প্রফুল্ল দুই বলিষ্ঠ হাত দিয়া হলধরবাবুর গলাটা টিপিয়া ধরিল। হলধরবাবুর হাত হইতে বাটিটা মেঝের উপর পড়িয়া গেল—কিন্তু সে শব্দ শুনিবার জন্য আশে-পাশে কেহই উপস্থিত ছিল না। প্রফুল্ল হলধরবাবুকে একটিও শব্দ করিতে দিল না, সমস্ত দেহের শক্তি দুই হাতের দশটা আঙুলের মধ্যে আনিয়া হলধরবাবুর নিশ্বাস একেবারে বন্ধ করিয়া দিল,—হলধরবাবু চেয়ারে ঢলিয়া পড়িলেন, মুখগহ্বর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া আসিল। দেহ এখনো একেবারে হিম হইয়া যায় নাই, তাই প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি সুট্‌কেস্ হইতে একটা ক্ষুর বাহির করিয়া হলধরবাবুর গলাটা পোঁচাইয়া পোঁচাইয়া অতি ধীরে ধীরে কাটিতে বসিল—অনেকগুলি কালো রক্ত বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু একটি ফোঁটাও যাহাতে জামায় না লাগে তাঁহার জন্য প্রফুল্ল অতি সাবধান হইয়া বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়াছে। এইবারে হলধরবাবু একদম্ শেষ হইয়া গেলেন। প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হইয়া মৃতদেহটাকে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া বাল্‌তি করিয়া জল আনিয়া মেঝেটা

পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। আপাতত হলধরবাবুর শবটাকে ভাঁড়ার ঘরে চাবি-বন্ধ করিয়া প্রফুল্ল মোটরে হলধরবাবুর বেডিং স্যুটকেশ ইত্যাদি লইয়া পরম প্রশান্তমনে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইল। মোটরটা রাস্তার একটু দূরে রাখিয়া প্রফুল্ল অভ্যাসমত হলধরবাবুর জন্য একখানা ফার্ষ্ট ক্লাশের রিটার্ণ টিকিট কিনিল। টিকিট-মাষ্টারকে বলিল—অত মাইল হাঁকাবার আর আমার সময় হ'ল না, তাই কর্ত্তা এবার ট্রেনেই যাচ্ছেন।

টিকিট-মাষ্টার বলিলেন—কল্‌কাতায় যান কেন? বেড়াতে?

প্রফুল্ল টিকিটটা পরীক্ষা করিয়া লইতে-লইতে কহিল—তাঁর পূর্ব্বজন্মের কোন্ একটি মেয়ে আছে তাকেই তত্ত্বাবধান করতে যান্ হয় ত'। সন্ন্যাসী লোক—সবাইকে দান আর সেবা করে'ই জীবন কাটাচ্ছেন—মহাপুরুষ!

গাড়ি ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি স্যুটকেস ও বেডিং লইয়া দৌড়িয়া নির্দ্দিষ্ট কামরাতে আনিয়া স্থাপন করিল,—বলা বাহুল্য সেই গাড়িতে একটিও লোক নাই; প্রফুল্ল প্ল্যাটফর্ম্মের দিকের জান্‌লা খুলিয়া তাহার মধ্য দিয়া মুখটা ঘরের ভিতর এতটা বাড়াইয়া দিল যে বাহির হইতে তদবস্থায় তাহাকে দেখিলেই সহজে মনে হইবে প্রফুল্ল ভিতরে কাহার সঙ্গে যেন কথোপকথনে ব্যাপৃত আছে। হঠাৎ প্রফুল্ল ছুটিয়া গিয়া একটা ডাব কিনিয়া আনিল, আসিবার সময় পাড়ার গণেশ উকিলের সঙ্গে দেখা—তিনি ইণ্টার ক্লাশে যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রফুল্ল নিজে থেকেই বলিল—খেয়ে দেয়ে কর্ত্তার আবার একটা ডাব না হ'লে চলে না,—বুড়ো মানুষ!

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। প্রফুল্ল জান্‌লার উপর হাত রাখিয়া ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল,—যেন কামরায় উপবিষ্ট হলধরবাবুর সঙ্গে সে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেলে প্রফুল্ল যথারীতি পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

একদম ফাঁকা বাড়ি,—আশে পাশের শূন্য মাঠ রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতেছে। প্রফুল্ল বেশ পেট ভরিয়া খাইয়া সেই দিনের খবরের কাগজ লইয়া একটা সোফায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল—তাহার মানসিক স্বাস্থ্য হারাইলে চলিবে কেন? সন্ধ্যায় পাড়ার ভদ্রলোকেরা সমাগত হইলে তাঁহাদের সঙ্গে প্রফুল্ল যথারীতি তাস খেলিল, ও হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়াই তাহার মনের সঙ্কীর্য্যমান আশঙ্কাকে লঘু করিয়া লইল। রাত্রি গভীরতর হইলে যখন অন্ধকারের মুহূর্ত্তের অস্ফুট পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, প্রফুল্ল ধীরে ধীরে সেই ঘরের তালা খুলিয়া ভেতরে ঢুকিল। লণ্ঠনটা কমাইয়া দিয়া প্রফুল্ল মৃতদেহটাকে একটা থলের মধ্যে পুরিয়া সদর বন্ধ করিয়া নদীতীরে চলিয়া আসিল। কোথাও একটা জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, প্রফুল্ল থলে খুলিয়া দেহটাকে নদীস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল পরক্ষণে মনে হইল আকাশের অসীম নীরবতা যেন খুনীর দৃঢ়-মুষ্টির মতই প্রফুল্লর বুক চাপিয়া ধরিয়াছে, সে কিছুতেই ছাড়া পাইতেছে না,—নদীতীরে প্রফুল্ল উদ্ভ্রান্তের মত পায়চারি করে ও চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া আকাশের উদ্যত শাসনের প্রতিবাদ করিতে চায়।

পরের দিন অর্থাৎ রবিবার প্রফুল্ল একটা রাঁধুনে বামুন ও দুইটা চাকর ধরিয়া আনিল। রাত্রে তাহার শুইবার ঘরের সংলগ্ন বারান্দাটাতে চাকর দুইটাকে শোয়াইল,—নতুবা কিছুতেই তাহার ঘুম আসিবে না। কিন্তু চক্ষু বুজিলেই তাহার মনে হয় হলধরবাবু তার শিয়রে বসিয়া মাথার চুলে ধীরে ধীরে আঙুল বুলাইতেছেন, কিম্বা হলধরবাবুরই প্রতিনিধিরূপে চাকরটাই প্রতিশোধ লইতে ঘরে ঢুকিতেছে। ঘুম আর হয় না, বারান্দায় চেয়ার টানিয়া পা দিয়া চাকরটার জীবন্ত দেহ স্পর্শ করিয়া প্রফুল্ল চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে।

সোমবার সকালে হলধরবাবুর ফিরিবার কথা। প্রফুল্ল চাকর দিয়া তাঁহার ঘর ফিট্‌ফাট্ করিয়া রাখিল, সকাল-সকাল রান্না করাইল, টেবিল গুছাইয়া এই দুই দিনের চিঠিপত্রগুলি পেপার-ওয়েইটে চাপা দিয়া রাখিল—পাড়ার ভদ্রলোকেরা সমাগত হইলে তাহাদের সঙ্গে ট্রেন লেইট্ করার গল্প করিতে ছাড়িল না। কিন্তু দুপুর গড়াইয়া গেল, তিনটা-দশের গাড়িতেও তিনি ফিরিলেন না। প্রফুল্ল চিন্তিত হইয়া কলিকাতায় টেলিফোন করিয়া দিল, সেখান হইতে

উত্তর আসিল যে কলিকাতায় এই সপ্তাহে যে তিনি কেন আসিলেন না তাহা ভাবিয়া তাহাদের বিস্ময়ের অবধি নাই। হলধরবাবুর অন্যান্য আত্মীয়বর্গের কানে এই কথা উঠিল এবং তাহাদেরই পরামর্শানুসারে প্রফুল্ল কলিকাতা চলিয়া গেল। কলিকাতায় যাইবার প্রাক্কালে প্রফুল্ল কতবার যে চাকরকে দিয়া হলধরবাবুর ঘরের মেঝেটা ধোয়াইয়াছে—কিছুতেই যেন পরিষ্কার হয় না, তবু যেন মনে মনে প্রফুল্ল তাহাতে রক্তের দাগ দেখিতে পায়—কালো রক্ত!

কলিকাতায় দিন দুই গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে থাকিয়া খুব স্ফূর্তিতে কাটাইয়া মুখ চোখ ফের বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া প্রফুল্ল বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেই বাড়ি এখন হলধরবাবুর সেজ ভাই অধিকার করিয়াছেন। দুই চোখে জল নিয়া প্রফুল্ল কহিল—হাসপাতাল থেকে যত জায়গা ছিল সব খুঁজে দেখেছি, কোথাও নেই। সবাই বলিল—আহা, ছোঁড়াটার বড্ড লেগেছে, ভারি ভালবাস্‌ত ওকে! কেহ বলিল—হলধরবাবুর প্রাণে এক উদাসী বৈরাগী বাসা বেঁধে ছিল, সে-ই তাঁকে ঘরছাড়া করে' নিলে।

তবু, রোজ ষ্টেশনে গিয়া প্রফুল্ল গাড়ি দেখিবার ওজুহাতে বসিয়া বসিয়া সিগারেট ফোঁকে,—রোজ হলধরবাবুর টেবিল পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে মনে মনে হাসি সম্বরণ করিতে পারে না। প্রফুল্ল এখান হইতে কয়েকদিনের জন্য ঘুরিয়া আসিতে চাহিল, হলধরবাবুকে পশ্চিমভারতে একবার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে,—কেহই আপত্তি করিল না, বরং প্রফুল্লর প্রভুভক্তি সবাইর কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়া মনে হইল।

এই রাত্রি কাটিলেই বাহির হইতে পারিবে ভাবিয়া প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাত্রে চোখ একটু লাগিয়া আসিয়াছে, অমনি দরজার খিল খোলার শব্দে প্রফুল্ল চমকিয়া চাহিয়া দেখিল হলধরবাবু ঘরে ঢুকিয়াছেন ও তাহারই শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। প্রফুল্ল স্পষ্টকণ্ঠে চীৎকার দিয়া উঠিতে পারিল না, কে যেন তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে!

হলধরবাবু বিছানার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিলেন; প্রশান্ত শুভ্র হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল ভরিয়া গিয়াছে, তিনি প্রফুল্লর হাত স্পর্শ করিবার জন্য তাঁহার হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিলেন—তুমি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন, প্রফুল্ল? আমি তোমার কোন অনিষ্টই করতে আসিনি।

তবু প্রফুল্ল কথা কয় না। হলধরবাবু প্রফুল্লকে যেন প্রবোধ দিতেছেন এমনি সুরে কহিতে লাগিলেন—আমাকে মেরে ফেলে তোমার অনুতাপ বা ভয় কিছুরই কারণ ঘটেনি প্রফুল্ল। জীবনে আমার এত বড় উপকার আর কেউ করেনি। আমাকে যে আত্মহত্যা ক'রে মরতে হয় নি সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, প্রফুল্ল। তুমি আমাকে দেখে এত সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন? চেয়ে দেখ দেখি—

সহসা, মনে হইল, হলধরবাবু প্রৌঢ়ত্বের খোলস ফেলিয়া দিয়া যুবক সাজিয়াছেন ও তাঁহার চেয়ারের পেছনকার কাঠটা ধরিয়া কে একটি তরুণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে দেখাইয়া হলধরবাবু কহিলেন—একে চিন্‌তে পাচ্ছ না প্রফুল্ল? ইনি হচ্ছেন সরোজিনী—তোমার অসীম করুণায় মৃত্যুর ওপারে গিয়ে এঁর দেখা পেলাম। (সরোজের দিকে চাহিয়া) আর ইনি হচ্ছেন প্রফুল্ল,—আমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু!

সরোজিনী দুইটি হাত তুলিয়া প্রফুল্লকে নমস্কার করিল, কহিল—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম—

প্রফুল্ল যেন বহু চেষ্টা করিয়া কহিতে পারিল—বসুন। চা খাবেন?

মেয়েটি সলজ্জ একটু হাসিয়া বারণ করিল। শাড়িটা গুছাইয়া নিয়া প্রফুল্লরই শয্যাপ্রান্তে কুণ্ঠিত হইয়া বসিল।

হলধরবাবু বলিলেন—মৃত্যুর ওপারে তোমাদের পৃথিবীর কোনো আইন-কানুনই খাটল না প্রফুল্ল,—সেখানে সরোজ আমারই জন্য প্রতীক্ষা করে' ছিল এতদিন—সেখানকার নিয়মে সে আমার, একান্ত করে' আমার। তোমাকে এই সুসংবাদটা না দিয়ে কি করে' পারি বল? আজ একটা উৎসব করলে হয় না? আমার বীণ্‌টা নিয়ে এস না প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল বীণ্ আনিতে বিছানা হইতে নামিতেছে, সরোজ বাধা দিয়া কহিল—ঘরে বসে' কি? চল নদীর ধারে যাই।

—তাই বেশ। বলিয়া হলধরবাবু অগ্রসর হইলেন। সরোজের মুখে স্বর্গের নূতন আইন-কানুনের খবর শুনিতে শুনিতে প্রফুল্লও তাহাদের অনুসরণ করিল।

নদীর পারে আসিয়া হলধরবাবু কহিলেন—এই নদীর পারেই প্রথম আমরা পরস্পরের হৃদয় আবিষ্কার করে-ছিলাম, না সরোজ? তুমি সেদিনকার মত একটি গান গাইবে?

সরোজ দু এক পদ গাহিয়াই বলিল—এস, নদীতে নাইতে নামি এস। বলিতে বলিতেই হলধরবাবু নদীতে নামিয়া সাঁতার কাটিতে লাগিলেন। সরোজিনীও তাহার দুই বাহু অনাবৃত করিয়া জলে নামিয়া আসিল,—জলে নামিয়া তীরস্থিত প্রফুল্লর দিকে দুই বাহু বিস্তারিত করিয়া দিয়া কহিল—এস প্রফুল্ল, নাইবে এস। এস আমরা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে খেলা করি।

প্রফুল্লর শীত করিতেছিল বটে, তবু নদীতে নামিয়া আসিল। রাত্রির নদী উহার চোখে ভারি ভাল লাগিতেছে সরোজ বলিল—আমার হাত ধর প্রফুল্ল, চল নদীর ঐ পারে সাঁতরে যাই,—সেখানেই আমাদের উৎসব হবে।

প্রফুল্ল সরোজের হাত ধরিল,—কিন্তু মধ্য নদীতে আসিয়া সরোজ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া হলধরবাবুর মতই কোথায় যে তলাইয়া গেল কে জানে!

পর দিন দেখা গেল প্রফুল্লর মৃতদেহটা নদীর উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নির্ঝর ও সাগর

(ভিক্টর হুগো)

কুমারী মমতা মিত্র

পাষাণের বাধা টুটি ছুটে আসে চলে
নির্ঝর সাগরে দিতে শেষ বারিবিন্দু;
"কি চাও? কেন গো তুমি ভাস আঁখিজলে!"
আর্ত্ত নাবিকের ভীতি—গর্জ্জি ডাকে সিন্ধু।

"আমার মাঝারে হের কত ঝড় ত্রাস,
অনন্ত আকাশ মিশে মোর যাত্রাপথে;
কি কাজে লাগিবে তুমি! এ কি পরিহাস,
অনুতম পরমাণু, এ বিশাল স্রোতে!"

ঝরণা ঝলকি উঠি মৃদু হেসে বলে
"যশ নাই, এনে দিই বিনা গরজনে
হে বিরাট, নাই যাহা নাই তব জলে,
সেই পিপাসার বারি তৃষাতুর জনে।"

প্রতীক্ষায়

(হাইন)

কুমারী মমতা মিত্র

তখনো ফোটেনি ঊষা, শুধানু জাগিয়া
"সে আমার আসিবে কি আজ!"
দিনশেষে ক্লান্তকায় ভাবি ক্ষুব্ধ হিয়া
"কই এলো, বিফল যে সাজ!"

রাত্রি এলো ল'য়ে মোর অন্তরবেদন,
থাকি শুয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষায়;
দিনের দুরাশা রচে কী মায়া স্বপন
শুধুই ছলিতে মোরে হায়!

ব্যায়ামবীর উপেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত বি-এ

আজ যাঁহার পরিচয় দিতে বসিয়াছি, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের ঘটনাটি বিচিত্র, সুতরাং প্রথমেই সেটির উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এইরূপ বিচিত্র উপায়ে আমার অনেকগুলিই বন্ধু সংগৃহীত হইয়াছে। অন্য একটি ঘটনার কথা আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত 'দোলের ছুটি' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহার সহিত প্রথম-আলাপ হয় এইভাবে :—

সে এক সূর্য্যকরোজ্জ্বল শীতের দ্বিপ্রহর—আমার কয়েকটি আত্মীয়-আত্মীয়াকে বিগত "কংগ্রেস্ এক্‌জিবিশন্"

পূর্ণাবয়ব

দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতেছি। স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর যে কক্ষটিতে ব্যায়ামবীরগণের আলোকচিত্র ও ব্যায়াম করিবার যন্ত্রপাতি সংরক্ষিত ছিল ক্রমে আমরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কক্ষগাত্র-বিলম্বিত অম্বুবাবু, ভীমভবানী প্রভৃতি

'বাইসেপস্ পেশী

ব্যায়ামবীরগণের আলোকচিত্র ও তাঁহারা যে 'বার্‌বেল্', মুগুর প্রভৃতি লইয়া ব্যায়াম করিতেন, সেইগুলির কথা আমার আত্মীয়-আত্মীয়াদের বুঝাইয়া দিতেছিলাম। এই সময়, ভীমভবানী যে প্রকাণ্ড বার্‌বেলটি লইয়া ব্যায়াম করিতেন তাহা হাতে ধরিয়া বলিতেছিলাম যে তিনি যেটা লইয়া অতি সহজে ব্যায়াম করিতেন, আমরা হয়ত সেটা মাটি হইতে তুলিতেই পারিব না; ও এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে মাটি হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতে-

ছিলাম। এমন সময় কক্ষের দ্বারদেশ হইতে কে যেন বলিলেন, "ওটা ছোঁবেন না মশায়, পায়ে-টায়ে ফেলে শেষে একটা কাণ্ড বাধাবেন?" শরীরটা নিতান্ত দুর্ব্বল নয়—কথাটা গিয়া গর্ব্বে আঘাত করিল, বিশেষ এতগুলি

পার্শ্বদৃশ্য

আত্মীয়-পরিচিতের সমক্ষে! একরকম রোখের মাথাতেই বলিতে হইবে, আমি সেই নিষেধ-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া একহাতে বারবেলটাকে যখন হাঁটু পর্য্যন্ত তুলিয়া নামাইয়া দিলাম তখন পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক আমাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন। যিনি আমায় ডাকিলেন তাঁহার ব্যায়াম-বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহের আলোকচিত্র সেই কক্ষ-গাত্রে বিলম্বিত ছিল। বলিলাম, "আপনারই ছবি না ওই টাঙ্গানো রয়েছে?" সস্মিত হাস্যে সেই প্রিয়দর্শন যুবক সমর্থন-সূচক মস্তক-সঞ্চালন করিলেন। ইনিই কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিয়োজিত খিদিরপুর পার্কের Physical Director, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর চলিল শক্তিপরীক্ষা ও পেশীপরীক্ষার পালা। উপসংহারে তিনি আমার নাম ও ঠিকানা এবং আমি কোথাকার Physical Instructor, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যখন সবিনয় নিবেদন করিলাম যে আমি কোথাওকার Physical Instructor নহি তখন তিনি একটু বিস্মিতই হইলেন। ঠিকানা দিতেই তিনি বলিলেন যে পরবর্ত্তী রবিবারে তিনি আমার নিকট আসিবেন। তখন কথাটা বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু যথাসময়ে যখন তিনি আসিয়া হাজির হইলেন, তখন তাঁহার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইলাম।

ইঁহার পরিপুষ্ট পেশীগুলির আলোক-চিত্র দেখিয়া সম্যক বুঝা যায়না যে ইঁহার শরীর কত সুন্দর ও প্রত্যেক পেশী

'রেক্টাস্ এ্যাবডোমিনি' পেশী

কিরূপ সুগঠিত। পেশীর নৃত্য, পেশী-প্রদর্শন প্রভৃতিতে ইনি যেরূপ সুদক্ষ তেমনি লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, যুযুৎসু, সাঁতার, বক্সিং, নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম প্রভৃতিতেও ইনি সুনিপুণ। শরীর-যন্ত্র, তাহাদের অবস্থান, প্রক্রিয়া ও কোন্‌টার উন্নতির জন্য কি ব্যায়াম করিতে হয় এ সব ইনি

যে ভালরূপেই জানেন তাহা বলা বাহুল্য। কারণ প্রত্যহ শত শত লোককে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শরীরগঠনবিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই ইঁহার কার্য্য।

১৯২৭ খৃঃ অঃ যশোর এক্সিবিশনে, নারায়ণগঞ্জ যুবক-সম্মিলনে, আশুতোষ কলেজ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ও অন্যান্য বহু স্থানে ইনি বহুবার muscle control, muscle dancing প্রভৃতি দেখাইয়াছেন। সেদিনও মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে আসামবন্যাপ্লাবনের সাহায্যকল্পে যে উৎসবায়োজন হইয়াছিল, তাহাতে ইনি বক্সিং ও muscle control দেখাইয়া

বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহু

দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যই ইঁহার abdominal muscle control এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও latissimus dorsi muscle এমন সুপুষ্ট যে আমি, কি ছবিতে কি সত্যকার মনুষ্যমূর্ত্তিতে ঐরূপ অল্পই দেখিয়াছি। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ চিত্র দুইটি প্রবন্ধের সহিত প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

ক্যাপ্টেন্ পি, কে, গুপ্ত মহাশয়ের My System of Physical Culture পুস্তকখানিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, কলিকাতায় যে All India Championship weight lifting competition হইয়াছিল তাহাতে উপেন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পেশীগঠনের প্রথম পুরস্কার স্বরূপ একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

ইঁহার দেহ যেরূপ সুস্থ সবল ও সুন্দর, ইঁহার মনটিও সেইরূপ। এই অল্পদিনের আলাপে আমি ইঁহার অন্যান্য বহুগুণাবলীর পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ লোক আমাদের সমাজে যত বাড়িবে ততই সমাজের প্রভূত লাভ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এরূপ লোকেরা সর্ব্বতোভাবে উৎসাহের যোগ্য।

উপসংহারে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি প্রবন্ধটি শেষ করিব। ইনি আমাকে হঠাৎ কয়েকদিন পূর্ব্বে গোটাকতক যুযুৎসুর কৌশল শিখাইয়াছিলেন। আমি এ বিষয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই আগ্রহশীল। কিন্তু জানিতাম না যে খেলার ছলে যাহা ইনি শিখাইয়াছিলেন একদিন তাহা আমার প্রাণরক্ষার সহায়তা করিবে। একদিন রাত্রে কোন এক নির্জ্জন গলির মধ্যে একটি গুণ্ডা, ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে আসিয়া আমার নিকট একটি সিকির ভাঙ্গানি চাহিল; আমি কোনপ্রকার সন্দেহ না করিয়া যখন ব্যাগ খুলিলাম তখন সে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত দ্রব্যটি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া সরকারী রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাইতে উপদেশ দিল। আমি কিন্তু সুবোধ শিশুর মত তাহার বাধ্য হইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করায় সে তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ছোরা বাহির করিল। আমি ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যুযুৎসুর সামান্য একটি কৌশলে সে যাত্রা আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পুস্তক সমালোচনা

যোগাযোগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ২।০; বাঁধাই ২৸০। প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে যখন বিচিত্রায় প্রকাশ হইতেছিল তখন বিচিত্রার পাঠকগণ পরবর্ত্তী কিস্তি পড়িবার জন্য মাসের পর মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট এ পুস্তকের পরিচয় দিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই। বিচিত্রায় যাহারা যোগাযোগ পাঠ করেন নাই পুস্তকাকারে এই উপন্যাস পাঠ করিবার তাঁহাদের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

যোগাযোগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে সবুজ পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার বারো বৎসর পরে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে বিচিত্রায় যোগাযোগ প্রকাশিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিণততর প্রতিভার সৃষ্টি এই যোগাযোগে উচ্চ স্তরের সাহিত্যিক উৎকর্ষ বর্ত্তমান। একটি প্রাচীন বনেদী বংশের অভিজাত্যের উদারতায় এবং উচ্চাদর্শের কমনীয়তায় বর্দ্ধিত কুমুদিনীর সহিত আত্মপ্রশ্রয়ী মদোন্মত্ত ব্যবসায়ী রাজা বাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের যোগ এবং সংঘর্ষের কাহিনী যেমন করুণ তেমনি কৌতুকাবহ। কঠোর প্রতিশোধ-পরায়ণ মধুসূদনের সংসারে তাহার স্ত্রী হইয়া কুমুদিনীর জীবন-যাপন ঠিক যেন দেহের কারাগারে মুক্তি-কামী আত্মার বিক্ষোভ। মধুসূদনের স্থূলতাকে জয় করিবার জন্য কুমুদিনীর আত্মজয়ের অদ্ভুত ইতিবৃত্ত বাংলা সাহিত্যে নূতন সম্পদ।

বইখানির ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

যাত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য, দুই টাকা। প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি" এবং "জাভা-যাত্রীর পত্র" একত্র করিয়া যাত্রী নাম দিয়া এ বইখানি প্রকাশিত করা হইয়াছে। কবির জাভায় অবস্থানকালে জাভা-যাত্রীর পত্র ধারাবাহিক ভাবে বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এ বইখানির যাত্রী নাম সার্থক হইয়াছে প্রধানত এই জন্য যে, ইহার মধ্যে যাত্রীর পরিচয় আমরা যতটা পাই যাত্রার পরিচয় সে হিসাবে কিছুই পাই না; বিশেষত "পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি" অংশে। কিন্তু সে জন্য মনের মধ্যে কোনো প্রকার ক্ষোভ উপস্থিত হয় না; সাগরের গভীর কল্লোল, প্রকৃতির দৃশ্যবৈচিত্র্য সমস্ত পরাস্ত হয় যাত্রীর কথা বলিবার জাদুবিদ্যার কাছে। রসুন চৌকির আসরে বিদেশ একটা স্থায়ী সুর ধরিয়া থাকে মাত্র, কবির সানাইয়ে বাজে সমাজ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য-তত্ত্ব এবং আরো বহুবিধ তত্ত্বের রাগ-রাগিণী! কবির দেহ যখন বিদেশে যাত্রা করিয়াছিল, চিত্ত যাত্রা করিয়াছিল চিন্তার দেশে; যাত্রী সেই দেশের অপূর্ব্ব কাহিনী।

বইখানির ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

তারুণ্য

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সহানুভূতিতেই হউক অথবা মত-বৈরূপ্যেই হউক, পাঠকের চিত্ত অধিকার করিবার যথেষ্ট বস্তু এই বইখানির মধ্যে আছে। সংস্কার এবং আচারের কঠিন রজ্জুতে আবদ্ধ সুতরাং গতিশক্তিরহিত বৃদ্ধ ভারতবর্ষের স্থবিরতার বিরুদ্ধে তারুণ্যের এত প্রবল আক্রমণ পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন কি-না সহসা মনে পড়ে না। শুধু ভারতবর্ষের কেন,

সাধারণ ভাবে বৃদ্ধত্বের বিরুদ্ধে যৌবনের এই তীব্র নিন্দাবাদ পাঠ করিলে যাহাদের চুলে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের চিত্ত যে নৈরাশ্যে তিমিরাচ্ছন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বৃদ্ধ হচ্চে ভূতের চেয়ে ভয়াবহ' 'মরার বাড়া গাল নেই, কিন্তু মরার বাড়া দুর্গতি আছে, সে দুর্গতি জরা'—এ-সকল কথা অপ্রিয় হইলেও সত্য, সুতরাং এ-সকল কথায় ক্ষুব্ধ হইলেও প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই।

এই বইখানির সাতটি নিবন্ধেরই মধ্যে একটি সবল, সুস্থ, সংস্কারবিমুক্ত তরুণ মনের অগ্রগতির এমন সুন্দর ছন্দানুসরণ আছে, যাহাতে বিগত-বীর্য্য জরার মধ্যেও উল্লাসের সঞ্চার করে, মরাকে সে আর বিনাশ বলিয়া মনে করে না, সদ্য-বিকসিত পুষ্পের হিল্লোলিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঝরাকে সে একটি অন্তবিহীন চক্রের স্থলবিশেষ বলিয়া বুঝিতে পারে। এই সবল মন পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু কামনা করে না এবং বিলোপ-কালে উত্তর পুরুষকে নিজের সঞ্চয় দান করিয়া যাইবার কোনো দায়িত্ব আছে বলিয়াও সে ভাবে না। পূর্ব্বের প্রতি তাহার নির্ভর নাই, পশ্চাতেরও সে ভরসা নহে। সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করিয়া সে তাহার নিজ কালের স্রষ্টা হইবে। সৃষ্টির শেষ নাই, সেই জন্য উদ্যমেরও শেষ নাই, প্রত্যেক কাল তাহার সৃষ্টি করিবার শক্তি অনুসারে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

চিন্তাশীলতায় এবং চিন্তা উদ্রিক্ত করিবার সক্ষমতায় এ বইখানি গৌরবান্বিত; ভাষার লালিত্যে এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর সরসতায় সুখপাঠ্য।

বইখানির ছাপা বাঁধাই মনোরম;—কিন্তু অনবধানতা বশত বইখানিতে, বিশেষত শেষের দিকে, অনেকগুলি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে আশা করি প্রকাশকেরা সে ক্রটি-সংশোধন করিয়া লইবেন।

টুটা-ফুটা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম, সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছয়টি গল্প একত্র করিয়া এখানি একটি গল্প-পুস্তক। প্রত্যেকটি গল্প রস-সম্পন্নতায় এবং প্রকাশ-নৈপুণ্যে মূল্যবান। 'সন্ধ্যারাগ' এবং 'দুইবার রাজা' গল্প দুটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। গল্প লিখিবার সাধারণ যে ধারা, এ গল্পগুলি তাহা হইতে পৃথক ভঙ্গীতে লিখিত; মনের গভীর এবং গোপন তত্ত্বগুলি লইয়াই এ গল্পগুলির কারবার, অথচ মনস্তত্ত্বের দৌরাত্ম্যে গল্পগুলি কণ্টকিত নহে। সাহিত্য-রসিকেরা এ গল্পের বইখানি পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন।

নারীর কেশ

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীঅবনীনাথ বসু এম-এ, বি-এল —দি বুক্ ষ্টল্ পি ৮১, রসারোড ভবানীপুর কলিকাতা।

এই গল্পের বইটিতে সবশুদ্ধ আঠারোটি গল্প আছে, তন্মধ্যে ছয়টির উপাদান বিদেশী গল্প হইতে গৃহীত। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। প্রায় সব গল্পগুলিতেই লেখকের গল্প লিখিবার উচ্চ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুললিত ভাষার একটানা স্রোতে গল্পগুলির গতি কোনেখানে বাধা পায় নাই। বাংলা কথা-সাহিত্যে লেখক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

বইখানি রেশমী কাপড়ে বাঁধানো এবং প্রচ্ছদের উপর নারীর কেশের একটি পরিকল্পনা-চিত্র সন্নিবিষ্ট।

ছোটদের চিড়িয়াখানা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক—কে, চৌধুরী; সিটিবুক্ সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু সংখ্যক জীব জন্তুর কথায় পূর্ণ এই সচিত্র বইখানি ছেলেদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আলোচিত জীবসমূহের তাহাদের আহার গঠন প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত করায় এই পুস্তক পাঠে ছেলেরা শুধু আনন্দই নয় প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভও করিবে। আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে

'ই বইখানি ছেলেদের হস্তে আসিলে তাহাদের চিড়িয়া-খানা দেখিবার সার্থকতা বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বইখানির ছাপা, ছবি এবং বাঁধাই প্রশংসার্হ।

জানোয়ারের কাণ্ড

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক—শ্রীকেশব চন্দ্র চৌধুরী, সিটিবুক্ সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শিশু-সাহিত্যের এখানি আর একটি উৎকৃষ্ট সচিত্র পুস্তক। জন্তু-জানোয়ারদের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপের যে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীগুলি এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা শুধু বালক-চিত্তকেই নয়, অভিভাবক-চিত্তকেও প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। এ বইখানিরও ছাপা, ছবি এবং বাঁধাই ভাল।

পাগলামির পুঁথি

শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার– এম, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স, কলিকাতা।

বিষ্ণুপুরের বামুন, বর্দ্ধমানের বুড়ি, তমলুকের তেলি, রাজসাহীর রাজা—এই রকম ৬২ স্থানে ৬২টি ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া ৬২টি ছোট ছোট হাস্যোদ্দীপক কবিতা এবং ৬২টি কৌতুকপ্রদ চিত্র। ছবিগুলি দেখিবার এবং কবিতাগুলি পড়িবার সময়ে মুখে একটা নীরব হাসির রেখা লাগিয়াই থাকে। এ পুস্তকটিতে অধিকার কাহাদের বেশি হওয়া উচিত—ছেলেমেয়েদের, অথবা তাহাদের অভিভাবক-গণের তাহা ঠিক করা কঠিন। উভয় পক্ষেরই পক্ষে এ পুস্তকটি উপভোগ্য।

সাজসজ্জার তুলনায় দাম কম।

স্বামীর পত্র

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম-এ প্রণীত। প্রথম ভাগ। মূল্য ১॥০ টাকা। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বর্ত্তমান খণ্ডে শিক্ষা বিষয়ে উনিশটি, স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে দশটি এবং চরিত্র-গঠন বিষয়ে তেইশটি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রাকারে এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে নারীগণ উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন যে, ক্রমশঃ আরও তিনটি ভাগ প্রকাশিত হইবে। আশা করি সে পুস্তকগুলিও বর্ত্তমান খণ্ডের মত প্রয়োজনীয় হইবে।

পুস্তকটির আকার এবং বাঁধাই ইত্যাদির হিসাবে দাম কম।

চিকিৎসা-সঙ্কট

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক নাটিকায় রূপান্তরিত। মূল্য ।৵০ আনা। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীপরশুরামের চিকিৎসা-সঙ্কট নামক বিখ্যাত গল্পে কয়েকটি গান এবং কিছু কথা সংযোজিত করিয়া শিল্পী যতীন্দ্রকুমার অভিনয়ের উপযোগী একটি নাটিকা তৈয়ার করিয়াছেন। কলমের চেয়ে তুলিটাই বেশি চালান বলিয়া পাঠক সাধারণের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন যে, যতীন্দ্রনাথ শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্র-শিল্পীই নহেন, তিনি একজন ক্ষমতাবান সাহিত্যিকও। পরশুরাম ও নারদের (যতীন্দ্রনাথের) যোগ বাংলা সাহিত্যে মণি-কাঞ্চনের যোগ;—কথায় এবং চিত্রে না হইলেও এ নাটিকাটিতেও সে যোগ রক্ষিত হইয়াছে। নাটিকাটি অভিনয়ে এবং সাধারণ পাঠে উভয়তই উপভোগ্য হইয়াছে।

খোসরোজ

শ্রীযুক্ত গোলাম মোস্তাফা বি-এ, বি-টি প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এ খানি গোলাম মোস্তাফা সাহেবের নূতন কবিতার বই। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্' 'কোরবাণী' 'আল্ হেলাল্' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের খুব ভাল লাগিল। কবিতাগুলি অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ক। জাতি এবং ধর্ম্মের অভিমান অতিক্রম পূর্ব্বক এই শ্রেণীর রচনাকে যথার্থ কাব্য-মহলের অন্তর্গত করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয়

করা কঠিন কথা। সাম্প্রদায়িকতা কাব্যের সার্ব্বজনীনতার পরিপন্থী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কবির সহৃদয়তাগুণে প্রায় সর্ব্বত্রই সে বিপদ হইতে কবিতাগুলি রক্ষা পাইয়াছে।

পুস্তকখানির বাঁধাই এবং ছাপা প্রশংসার যোগ্য।

সমুদ্র গুপ্ত

শ্রীঅমল চন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুপ্তবংশের দ্বিতীয় নরপতি সমুদ্র গুপ্তের রাজ্য-বিস্তার করিবার কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা একটি কাব্য পুস্তক। বইখানির আখ্যান বস্তু উনিশটি সর্গে বিভক্ত এবং পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্যে বিন্যস্ত। ভাষার লালিত্যে বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে, এবং নাটক না হইলেও বইখানিতে নাটকীয় ক্ষমতার পরিচয়ের অভাব নাই। ছন্দের উপর লেখকের সাধারণ অধিকারে থাকিলেও, পয়ার এবং আরও দুই চারিটি ছন্দ ছাড়া বাংলা ভাষার যাবতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রার সমান গণ্য করিবার যে রীতি চলিয়াছে তাহার প্রতি তিনি সর্ব্বত্র দৃষ্টি রাখেন নাই, সে জন্ম কোনো কোনো স্থলে কাব্যের পদগুলি শ্রুতিকটু হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৩২ পৃষ্ঠার এই পদগুলি বলা যাইতে পারে—

'কত যে কঠোর কত যে কোমল
কত যে ভীষণ পেষণ ক্লেশ,
কত যে বিচিত্র, ভেবে দেখ দত্তা,
নাহি আদি তার নাহি তো শেষ।'

ইহার তৃতীয় পংক্তিটি 'কত বিচিত্র, ভেবেছ দত্তা?' করিলে সে দোষটুকু হইত না। অথচ ঠিক ইহার পরবর্ত্তী দুই লাইন 'দুঃখের মাঝে বিদ্যুৎসম সঞ্চারি মেঘে চমকি চলে' সে দোষ হইতে মুক্ত।

বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ প্রশংসার যোগ্য।

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত বি-এস্ সি প্রণীত। মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থান—যুগবার্ত্তা পাব্লিশিং হাউস, ৪ নং ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা।

এই অল্পমূল্যের পুস্তকটিতে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা এবং ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রচলনের যুগে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগনিবারণের জন্য মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে বিজ্ঞান-সম্মত উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের নির্ব্বাচন একান্ত আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে সতর্ক না হইলে জাতীয় স্বাস্থ্য ক্রমশই অবনতির দিকে যাইবে। অথচ কৌতুক এই যে, অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের জন্য যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহা নহে; বরং বিপরীত। সমালোচ্য বইটির ভূমিকায় পাওয়া যায়—বাংলার ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক হেল্থ্ ডাঃ সি, এ, বেণ্টলি এম-বি, ডি-পি-এইচ্ ডি-টি-এম-এইচ, সি-আই-ই বলেন, "সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ আহার্য্য ক্রয়ের জন্য যে অর্থব্যয় করেন তদনুপাতে পুষ্টিকর খাদ্য পান না, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম অর্থব্যয় করিয়া অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করে এবং সুস্থ ও সবল থাকে।"

উপস্থিত বাংলাদেশে বেরি বেরি এবং অন্যান্য রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে এইরূপ পুস্তকের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কন্যার প্রতি উপদেশ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৩৮ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট।

গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্গত ছাব্বিশটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সদুপদেশ। লেখক বয়সে প্রাচীন হইলেও অনেক স্থলে সংস্কারমুক্ত এবং কাল-ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান। এ পুস্তকটি পাঠ করিয়া মেয়েরা উপকার পাইবেন সন্দেহ নাই।

বসুধারা

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

এখানি কবিতা পুস্তক; চল্লিশটি বিবিধ বিষয়ে কবিতা এ বইখানিতে স্থান পাইয়াছে। বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত আটখানি রঙিন্ ছবির দ্বারা পুস্তকটি অলঙ্কৃত।

এ কবিতা গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আমরা সত্যই তৃপ্ত হইয়াছি। ছন্দে, মিলে, শব্দ-সম্পদে, রস-মাধুর্য্যে অধিকাংশ কবিতা ঝল্‌মল্ করিতেছে। অনুপ্রাসের মত অপ্রচলিত অলঙ্কারও কবির সুরুচি-বোধের প্রভাবে তাহার স্থূলতা হারাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি:—'এ কি অনুরাগ নিবিড় সোহাগ নিবেদিয়া দিলে তুমি, এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষে মোরে নিঃস্ব করিলে চুমি!' এখানে ভাব এবং ব্যঞ্জনার অব্যাহততার জন্য অনুপ্রাসের গ্লানি ঢাকা পড়িয়াছে। কয়েকটি কবিতার আর্ত্ত করুণ সুর হৃদয়কে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে।

বইখানির প্রচ্ছদ এবং প্রচ্ছদের উপরকার পরিকল্পনা ভাল হইয়াছে।

কহ্লার

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য এণ্ড্ সন্স্। ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

এখানি একটি কবিতা পুস্তক—চল্লিশটি বিভিন্ন বিষয়ক কবিতায় গ্রথিত। কবিতাগুলির মধ্যে একটি তরল মিষ্ট সুরের ধ্বনি পাওয়া যায়—অধিকাংশ কবিতা পাঠ করিয়া পাঠক তৃপ্ত হইবেন। চল্লিশটি কবিতার মধ্যে পাঁচটি ছাড়া বাকি সবগুলি প্রবাসী, ভারতী, মানসী-মর্ম্মবাণী, নারায়ণ উপাসনায় প্রকাশিত হইয়াছিল,—সুতরাং এ কবিতাগুলির গুণগ্রহণ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও হইয়াছে।

বার্ষিক শিশুসাথী—১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ধর, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গল্পে, কবিতায়, নানাবিধ প্রবন্ধে, চিত্রে, হেঁয়ালি-ধাঁধায় এই নববার্ষিকটি ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভৌতিক ছবি ও তাহার মুখোস ছেলেদের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। তাহারা অবিরত ভৌতিক ছবিগুলির উপর মুখোস টানিয়া দিতেছে, এবং অদৃশ্য চিত্রের প্রকাশে যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় লাভ করিতেছে।

কুন্তলীন পুরস্কার—১৩৩৬

প্রকাশক—শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নয়জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রচিত নয়টি গল্প রঙিন কালিতে ছাপানো একটি মনোরম পুস্তিকা। পূজার উপহার সামগ্রীর মধ্যে এই বইখানিও একটি স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। ব্যবসায়ের আসরেও বৎসর বৎসর সৎ-সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রকাশক হিতেন্দ্র বাবু সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

দ্রষ্টব্য—বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রার ৬১৯ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে সক্রেটিসের বিচার প্রবন্ধটির নাম ছাপা এবং আরম্ভ করা লইয়া মুদ্রণ বিষয়ে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধটি ৬১৯ পৃষ্ঠা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার কোনো অংশই ছাপিতে ছাড়িয়া যায় নাই।

ইঙ্গিত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শোন কথা হে সুন্দরী
শোন আমার যুক্তি সরল,
প্রেমটা নহে কেবল সুধা
কিঞ্চিৎ তার আছে গরল।
ফুলের পাশে যেমন কাঁটা ;
ফলের মাঝে যেমন বিচি,
ঠিক তেমনি প্রণয়-গীতে
কতক আছে কিচিমিচি !

এ জগতে এমন ধারা
অনেক হতভাগ্য আছে
কাঁটার আঘাত খেয়ে যারা
ফুল ফেলিয়া আসে গাছে।
কেউ বা এমন ভাগ্যবন্ত
যাহার আছে পঞ্চমালী
নিত্য প্রাতে যোগায় যারা
পঞ্চফুলের পূর্ণ ডালি !

তোমার কপাল নয়ক তেমন
তোমার প্রণয় নয়ক সুধা
খাদ্য তোমার নাইক ঘরে
পেটে কিন্তু তীব্র ক্ষুধা !

প্রথম মনে হয় যে জগৎ
চল্‌ছে দিব্যি সহজ ভাবে
অভীষ্ট ঠিক পাবে হাতে
যেমন তুমি হাত বাড়াবে।
কিন্তু যদি একটু তুমি
তলিয়ে ঢোক সংসারেতে,
অবাক হ'য়ে দেখবে খাবার
থাকলেই সে পায় না খেতে !

খাদ্য থাকার চেয়ে জেনো
খাদ্য খাবার বরাত আগে
পুকুর যাহার সে খায় কাঁটা
মুণ্ড পড়ে পরের ভাগে।

সকল দিকেই দেখ্‌তে পাবে
জগতের এই বক্র নীতি ;
প্রেম বল বা প্রণয় বল
তাহারো এই কঠিন রীতি।

নইলে তুমি যাহার তরে
মরছ ঘুরে নিশিদিনই
তোমায় ছেড়ে করলে কেন
অপর কে সে প্রণয়িনী ?
তুমি যারে বাস্‌ছ ভাল
সেও যদি তোমায় বাসে,
তা হ'লে ত কঠিন ব্যাপার
অতি সহজ হ'য়ে আসে !

তা হ'লে ত' শুভ্র যাহা
সদাই তাহা সাদা থাকে
সরল যাহা কভু তাহা
জড়ায় নাক জটিল পাকে !

সলিল থাকে সদাই তরল
কঠিন কভু হয় না শীতে,

মেঘ কখন আসে নাক
শুক্ল-পক্ষ রজনীতে।

সুরে বাঁধা বীণার তন্ত্রী
বেসুরাতে যায় না নেমে,
তরুণী সে অর্দ্ধ-পথে
সলজ্জিত যায় না থেমে।

এমন ধারা অনেক ব্যাপার
হ'তে পারত সহজ অতি
কিন্তু জেনো হে কল্যাণী,
সংসারে নেই সরল গতি।

তা' না হ'লে এতক্ষণে
বুঝ্‌তে আমার মনের ব্যথা
কেনই এত তর্ক, এবং
কেনই এত তত্ত্বকথা!

ঘুরছে ধরা অন্ধ প্রেমে
অবিশ্রান্ত রবির পাশে
তার তরে যে ইন্দু মরে
হয়ত তাহা জানে না সে!
তেমনি হয়ত' তোমার প্রেমে
কোন প্রেমিক-শুক্রতারা
দিবানিশি মুগ্ধ আঁখি
সদাই আছে আত্মহারা!

কে সে প্রেমিক কোথায় থাকে
কতক আমার জানা আছে,
ভদ্রলোকের নাম ক'রে আর
কাজ নেই ক' তোমার কাছে।
শোন কথা হে সুন্দরী
শোনো আমার যুক্তি সরল,
তোমারো প্রেম নয় ক' সুধা,
আমার কিন্তু পূর্ণ গরল!

নানা কথা

সাহিত্য-বিচার

গত ৫-ই আশ্বিন প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের বিচার' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহতে তিনি বলেন, 'আমরা (সাহিত্যিকরা) হলাম আসামী। সাহিত্যের বিচারকের দ্বারা আমরা পীড়িত।' রসবোধের যোগ্যতার দ্বারা সমালোচকের অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। অনেক সমালোচকই 'ভালো লাগ না' বলিয়া-ই সাহিত্যসৃষ্টিকে বাতিল করিয়া দিতে চান্। যুক্তি বিচার বা রসোপলব্ধির চেষ্টা না করিয়া একমাত্র ব্যক্তিগত মতই সমালোচনার স্বরূপ নহে। সাহিত্যের বিচার উপলক্ষে কাল, দেশ, সমাজ, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয় লইয়া বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। আম্রের বিচার যেমন তাহার আস্বাদে তেমনি সাহিত্যের বিচার তাহার রসভোগে, বিশ্লেষণে নয়। এবং কবিতার সার্থক বিচার করিতে গেলে সমালোচককেও কবিধর্ম্মী হইতে হইবে। এই সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন বাংলা-দেশের মাসিক সাহিত্য পত্রে যে-সব সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহা প্রকৃত রসবিচারপরিচায়ক নহে। অনেকক্ষেত্রে অক্ষমের স্পর্দ্ধাই সমালোচনার নাম গ্রহণ করে।

কিন্তু তাহার চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার হয় যখন বোধহীন সমালোচক 'ভালো লাগিল না' বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া অবান্তর গুণবিচার আরম্ভ করেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক দিক দিয়া সাহিত্য বিচার করেন, রসের ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয়। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কবিতা রাজসিক বলিয়া স্বল্পমূল্য প্রমাণ করিতে চান্। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সত্বগুণ থাকিলেই সাহিত্য হয় না,—সৃষ্টির সমগ্রতা নিয়াই তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচরণীয়! তাই তুলনামূলক সমালোচনা যে ব্যর্থ তাহার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন যে সাহিত্যে চরিত্রের বিশুদ্ধতা বা সাত্বিকার সার্থকতা অল্প। নৈতিক উচ্চতায় সাহিত্যের চারিত্রিক সাফল্য নির্ণীত হয় না। এই জন্য কবির কাছে রাজসিক কর্ণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বেশী মূল্যবান।

৺যতীন্দ্রনাথ দাস

মৃত্যু সাধারণত মানুষের সত্তা এবং স্মৃতিরে বিলোপ ঘটায়; কিন্তু কদাচিৎ কখনো এই নিয়মের ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেও দেখা যায়,—অর্থাৎ মৃত্যু মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে, অমর করে। গত ২৮শে ভাদ্র যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে ঠিক সেই ব্যাপার ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথকে কয় জনই বা জানিত? তিনি কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী ছিলেন, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি কংগ্রেস-সমাজে পরিচিত ছিলেন এবং বাহিরের দু-দশ জনও তাঁহাকে হয় ত' জানিত; কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে জানিল যখন তিনি বিচারাধীন রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি জেলকর্ত্তৃপক্ষের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহার পর জগৎ তাঁহাকে জানিল যখন তিনি তাঁহার সঙ্কল্পে অটল থাকিয়া সুনিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিলেন, জীবন-উৎসর্গ করিলেন।

এই জীবন যে মানুষের কত প্রিয় বস্তু তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ বোধ হয় যমরাজকে আহ্বান করিয়া সম্মুখে পাইলে কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিয়া স্থান ত্যাগ করিতেই অনুরোধ করে। অনপনেয় রোগে জীবন্মৃত হইয়া থাকিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, জরায় জীর্ণ স্থবির হইয়াও জীবন-রক্ষার জন্য তাহার উদ্বেগের সীমা থাকে না। পঁচিশ বছর বয়সের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনার মধ্যে সেই অতিপ্রিয় বস্তু জীবনকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হস্তে তুলিয়া দেওয়ার মহত্ত্ব ঠিক ওজন করিয়া ধারণা করাও কঠিন।

এই মৃত্যু আকস্মিক উত্তেজনার আত্মহত্যা নয়;—পরার্থে, পরহিতোদ্দেশে ইহা সুদীর্ঘ ৬৩ দিন ধরিয়া পলে পলে আত্ম-বিলোপ। এ মৃত্যু মানুষের স্মৃতিকে অবিনশ্বর করে, বন্ধু অবন্ধু, আত্মীয় অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে এ মৃত্যুর সম্মুখে শ্রদ্ধায় সকলেরই মস্তক অবনত হয়। আমরা যতীন্দ্রনাথের বিরাট আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় ৬৩ দিন উপবাসের পর যতীন্দ্রনাথ লাহোর জেলে দেহত্যাগ করেন। গত ১৪ই জুন লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় বন্দী করিয়া তাঁহাকে লাহোরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এ সকল কথা সকলেই অবগত আছেন।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataklanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

বিপন্না

কার্ত্তিক, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মনীষী দে

তৃতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৩৬ | পঞ্চম সংখ্যা

কলাবিদ্যা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতার যুগ। এ, হয় গায়ের জোরে, নয় সম্মোহনের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে বশ করচে। এ সভ্যতা পৃথিবীর যে জাতিকে স্পর্শ করচে তারই আকৃতি ও প্রকৃতি হ'তে নিজের বিশেষত্ব ঘুচে যাচ্চে। জাপান যখন য়ুরোপের বিদ্যালয় হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করল তখন হ'তে তার বেশভূষা তার জীবনযাত্রার বাহ্যরূপেরও পরিবর্ত্তন হ'তে আরম্ভ করল। যুদ্ধপ্রণালী ব্যবসায়প্রণালী আজ পৃথিবীতে সকল দেশেই একাকার হচ্চে; এতে আশ্চর্য্য নেই, কেননা ও-দুটো যন্ত্রমাত্র, এবং যন্ত্রের রূপ সকল দেশে একই রকম হবে বই কি। কিন্তু মানুষের মন ত যন্ত্র নয়; মানুষের বেশভূষায়, গৃহসজ্জায়, আচার ব্যবহারে তার মানসিক প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশ করে। কালে কালে তার পরিবর্ত্তনও ঘটে, এক জাতি অন্য জাতির কাছ হ'তে এ সকল জিনিষও কিছু কিছু ধার নেয়,—কিন্তু সে সমস্তই সে আপনার ক'রে নেয়,—মোটের উপর তার কাঠামোটা ঠিক থাকে।

কিন্তু আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের নিজের মনের সঙ্গে তার নিজের তৈরি কলের সাংঘাতিক লড়াই বেধে গেচে। মানুষের ব্যবহার্য্য দ্রব্যে তার মনের স্বাক্ষর কোথাও আর দেখবার জো নেই, সর্ব্বত্রই কলের ছাপ। এই কলের সন্ততিগণের মধ্যে কোথাও আর রূপভেদ নেই। সুলভতা এবং সুবিধার প্রলোভনে মানুষ এ স্বীকার ক'রে নিয়েচে—সেই প্রলোভনে মানুষ নিজের মনের কর্ত্তৃত্বকে নিজের সৃষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করচে। এ-কে সুবিধার তুচ্ছ মজুরী নিয়ে কলের দাসত্ব করা ছাড়া আর কি বল্‌ব? পরদেহজীবী পরাশ্রিত (parasite) জীব যেমন স্বাধীন উদ্যমশক্তি হারায়, কলাশ্রিত মানুষ তেমনি মনের রুচিস্বাতন্ত্র্য হারাচ্চে, তার নিত্যব্যবহারের সামগ্রীতে তার আপন সৌন্দর্য্যবোধকে প্রয়োগ কর্‌বার স্বাভাবিক উদ্যম নির্জ্জীব অলস হ'য়ে যাচ্চে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার সেই রুচিস্বাতন্ত্র্যনাশক মরু হাওয়া ভারতবর্ষীয় শিল্পগুলিকে সবই প্রায় নষ্ট করেচে। বহু যুগের অভ্যাসে যে নৈপুণ্য উৎকর্ষলাভ করে, একবার নষ্ট হ'লে ফরমাস দিয়ে মূল্য দিয়ে

যে নৈপুণ্যকে আর ফিরে পাবার রাস্তা নেই, মানুষের সেই দুর্ল্লভ সামগ্রী আমরা প্রায় হারিয়ে বসেচি। পাখীর পালকের লোভে কিম্বা স্বাভাবিক হিংস্র প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে য়ুরোপীয়েরা পৃথিবী হ'তে সুন্দর দেখ্‌তে কত পাখী প্রায় নির্ব্বংশ করচে। এই পাখীগুলি প্রকৃতির বহুযুগের সৃষ্টিসাধনার ধন, এরা মর্‌লে কোনোকালেই আর এদের ফিরিয়ে পাব না। মানুষের সৃষ্টিসাধনার শিল্পগুলিও এমনি বহু তপস্যার ফল, তাও এমনি সুকুমার; য়ুরোপ তাদের বধ ক'রে সমস্ত মানুষকে শাস্তি দিচ্চে, লোকালয়ের যা শ্রী তাকে চিরনির্ব্বাসিত করচে।

যা হ'ক, যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলের কাছে মানুষের রুচির পরাভব সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ঘট্‌চে সেখানে ভারতবর্ষ নিষ্কৃতি পাবে এমন আশা করি নে। যেখানে পণ্যের হাট সেখানে বাণিজ্যলক্ষ্মীর হাতে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর, কলের হাতে কলার অপমান বর্ত্তমান যুগের ললাটে লেখা আছে।

মানুষ আপন অন্তরতম ইচ্ছাকে ভালবাসাকে শুধু কেবল আপন ব্যবহারের দ্রব্যের মধ্যেই প্রকাশ করে তা নয়, তার সঙ্গীত তার চিত্রকলা এই প্রকাশের প্রধান বাহন। এর দ্বারাই দেশ আপন অন্তরের আবেগকে বাহিরে রূপ দান করে এবং তাকে চিরন্তন ক'রে উত্তর কালের হাতে সমর্পণ ক'রে যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিষ জাতিবিশেষে যার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারভেদ নেই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাদের প্রমাণ কর্‌বার প্রণালী সর্ব্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিচার এক নিয়মে হবে আর ইংলণ্ডের অন্য নিয়মে হবে, এ হ'তেই পারে না। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হবে, এও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিচ্ছে তা সর্ব্বত্র এক হবেই।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাক্‌বেই; আর থাকাই শ্রেয়। এ-কে নষ্ট করা আত্মহত্যা করারই সামিল। এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যা-দানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নেই। স্থান থাকার যে গুরুতর প্রয়োজন আছে সে বোধ পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হতে চ'লে গেচে।

এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশের বিদ্যা অভাবের অনুচর। ইংরেজি শিখ্‌লে চাকরী হবে বা রাজসম্মানের সুযোগ ঘটবে, দরিদ্রের এই মনোরথ আমাদের দেশের বিদ্যাকে চালনা করচে। পাছে সেই লক্ষ্যসাধন হ'তে লেশমাত্র চিত্তবিক্ষেপ হয় এই ভাবনায় আমাদের দেশের লোক ব্যাকুল। এই লক্ষ্য-সাধনের কাছে দেশের সমস্ত মহত্তর কল্যাণকে বলিদান করতে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই।

ইংরেজ ত ভাষা ভুগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখ্‌চে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখ্‌চে। এই সকল ললিত কলা শিক্ষা দ্বারা তার পৌরুষ খর্ব্ব হচ্চে এমন প্রমাণ হয় না। সঙ্গীতনিপুণ ব'লে জার্ম্মানজাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চ্চায় পিছপাও, একথা কে বল্‌বে ? বস্তুত আনন্দপ্রকাশ জীবনী-শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মেরে দিলে জাতির জীবনী-শক্তিকেই ক্ষীণ ক'রে দেওয়া হয়। যে লোক কাঠের কারবার নিয়ে আছে সে মনে কর্‌তে পারে গাছের পক্ষে ফুল ফল পাতাগুলো সৌখীনতা মাত্র, ওরা শক্তির অপব্যয়, আসল সারবান জিনিষ হচ্চে গাছের কাষ্ঠ অংশ। একথা ভুলে যায় যে, উদ্ভিদরাজ্য হ'তে ফুল যদি বিলুপ্ত হয় তবে কাঠও লতার সহমরণে যাবে। তেমনি যে জাতি আনন্দ কর্‌তে ভোলে সে জাতি কাজ করতেও ভোলে। জাপানী কাজ করতে নিরলস, প্রাণ দিতে নির্ভীক, কিন্তু চেরি ফুল ফোটার সৌন্দর্য্যসম্ভোগ নিয়ে দেশের ছেলে-বুড়ো সকলেই উৎসব করে এবং চিত্রকলার পরম মুল্য বোঝে না এমন মূঢ় সে দেশে কেউ নেই। আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্য্যভোগকে তারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর ব'লে জানে। এ কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। এতে আমাদের প্রকৃত কর্ম্মশক্তিকেই দুর্ব্বল কর্‌চে।

আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে এই যে দারিদ্র্য তার লক্ষণ ও ফল আমাদের শান্তিনিকেতনের বালকদের মধ্যেও দেখ্‌তে পাই। এখানকার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শেখাবার ভাল ব্যবস্থাই আছে। ছেলেদের অনেকেরই গান গাইবার ছবি আঁক্‌বার স্বাভাবিক শক্তি থাকে। যতদিন তারা নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন তাদের গান গাওয়া বা ছবি আঁকা শেখানো শক্ত হয় না; এতে তারা আনন্দই বোধ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠ্‌বামাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য তারা বুঝ্‌তে পারে, তার অন্তর্নিহিত দীনতা তাদের আক্রমণ করে। তখন হ'তে পরীক্ষার পড়ার বাইরের এই সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের মন বেঁকে বসে। অন্য বিদ্যার প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা জন্মে। এর কারণ সমস্ত সমাজের মধ্যে যে শিক্ষাগুলির প্রতি ঔদাসীন্য আছে, একটু বয়স হ'লে ছাত্রদের মনেও সেই সব শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হয়। এ কেবল আমাদের এই হতভাগ্য দেশের অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যেরই লক্ষণ।

বাল্যকাল হ'তেই আমাদের ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপে কলাবিদ্যার সংস্রব হ'তে দূরে থাকেন। এতে দেশের যে কত বড় ক্ষতি হচ্চে তা অনুভব কর্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। কিছুদিন হ'তে য়ুরোপের চিত্রকলার নকল ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের একদল চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলার অনুসরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচেন। তাঁদের এই চেষ্টা য়ুরোপীয় গুণীদের নিকট সমাদর পেয়েচে, আর তাঁদের অনেকে বিদেশে রসজ্ঞদের নিকটে খ্যাতি পেয়েচেন। কিন্তু আমাদের দেশে এতকাল পর্য্যন্ত তাঁরা কিরূপ অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপ সইচেন তা জানা আছে। এর একমাত্র কারণ, আমাদের নিজের দেশের চিত্রকলা ব'লে কোনো

পদার্থ আছে এ আমাদের জানাই নেই—সে চিত্রকলার মর্য্যাদা বোঝ্‌বার মত কোনো শিক্ষাই হয় নি। য়ুরোপের নিকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্রের শস্তা নমুনা ছাড়া আর কিছু আমরা দেখ্‌তে পাই নে; আর সেখানকার ভাল ছবিও যেমন দেখি নে তেমনি সেখানকার ছবির বিচার আলোচনাও আমরা শুন্‌তে পাই নে। সুতরাং য়ুরোপীয় চিত্রেরও উৎকর্ষ যাচাই কর্‌বার উপায় আমাদের হাতে নেই।

আর সঙ্গীতের দুর্গতির কথা একবার ভেবে দেখা যাক্‌। কন্সর্ট ব'লে যে কাংস্য-ক্রেঙ্কার-ঝঙ্কৃত অত্যাচারকে আমরা পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীত ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েচি তার মত বর্ব্বরতা আর কিছুই নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ এতে ত নেইই, তার পরে একে যদি আমরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের নকল ব'লে কল্পনা করি তবে সেও একটা অতি অন্যায় লাইবেল। বিবাহসভায় ও শোভাযাত্রায় ব্যাণ্ডের সঙ্গে শানাইয়ের ধাক্কা লাগিয়ে দিয়ে সঙ্গীতের যে মহামারী ব্যাপার বাধিয়ে দেওয়াকে উৎসবের অঙ্গ ব'লে আমরা মনে করি সে কি কোনোমতেই সম্ভবপর হ'ত যদি সঙ্গীতকলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দরদ থাক্‌ত?

দেশের উদ্বোধনের কথা আমরা আজকাল সর্ব্বদাই ব'লে থাকি। মনে করি সেই উদ্বোধন কেবল রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনসভায়। অর্থাৎ কেবল অভাবের ক্রন্দনে, দরিদ্রের প্রার্থনায়। এই আমাদের মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমরা ভুলে গিয়েচি, যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেইখানেই দেশের আপন গৌরব প্রসুপ্ত আছে। সেই সম্পদ যতই উদ্‌ঘাটিত হবে আমাদের গৌরবের ততই উদ্বোধন হবে। আমাদের নব উদ্বোধনের উৎসব বিলাতী গোরার বাদ্যে অথবা দেশী সঙ্গীতের হাড়গোড় ভাঙা একটা বিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্পন্ন হবে না। আর আমাদের দেশের নির্ব্বাসিত লক্ষ্মীকে নূতন আবাহন কালে মন্দিরের দ্বারে যে আল্‌পনা আঁক্‌তে হবে তার ডিজাইন কি জর্ম্মানি হ'তে সংগ্রহ ক'রে আন্‌ব?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঙ্গলিক

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

তোমাদের তরে মিলনের গান গাই,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ;
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
প্রিয়-বাহুলীনা অয়ি তনু তনুলতা,
কানে কানে মৃদু সোহাগ-কূজন-রতা,
তোমারে নেহারি' কী যে আনন্দ পাই,
ওগো নব বধূ, কেমনে জানাব কত!
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।

তোমাদের বুকে চিরমন্দার ফোটে,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ;
শরৎ-শেফালি ঝরে হাসিঝরা ঠোঁটে,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
আঁখিতে আঁখিতে চপলা পড়েছে ধরা,
চরণধূলায় মরণে মিলায় জরা,
করকঙ্কণে বীণা ঝঙ্কারি' ওঠে,
বক্ষস্তবক বসন্ত-অবনত ;
মলয়গন্ধি সুরা তোমাদের ঠোঁটে,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।

তোমাদের কেহ লক্ষ্মী লভিলে রণে,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ;
তোমাদের কেহ দু'মুঠা ভরিলে ধনে,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
তোমাদের কেহ বাণীরে মানায়ে বশ
শ্বেতচন্দনে ললাটে আঁকিলে যশ,
তোমাদের কেহ ঘরে ডাকি' জনে জনে
আপনা বিলায়ে দিলে দধীচির মতো ;
কোনো তথাগত একাকী চলিলে বনে,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।

তোমরা ধন্য, তোমরা সফল, ভাই,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ;
সবার গর্ব্বে সকলের জয় গাই,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
পারি'নি নিজের কুঁড়িটিরে ফুটাইতে,
পরাভব শোক নিশসিছে মোর চিতে,
হে বন্ধু, মম কিছু নাই, কিছু নাই,
হে বন্ধু, আমি বন্ধ্যাতা-লাজে নত ;
তোমাদের সুখে সুখী হয়ে উঠি তাই,
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত সতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দেশের এক শ্রেণীর লোকের এই অভিযোগ যে, তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গান লইয়াই আছেন, দেশের কাজে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। আর, তাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপারেই নিঃশেষ হইয়া যায়, স্বদেশের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি যদি কেবল তাহা লইয়াই থাকিতেন তাহা হইলেও কোনো ক্ষোভের কারণ দেখি না--কারণ কবির কাজই তাই! আর কবি একান্তভাবে কোনো বিশেষ দেশের নয়, তিনি বিশ্বের।—যেখানে ভাগ্যক্রমে জন্মিয়াছেন, ভূগোলের বেড়ায় যেইখানে যে তাঁহাকে আট্‌কা পড়িয়া থাকিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ওকথা বলিয়া নাকি পার পাওয়া যায় না। এ যুগে একজনের কাছে, বিশেষত জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যদি অসামান্য হন, তবে তাঁহার কাছে আমরা সব বিষয়ে সব কিছু দাবী করিয়া বসি,—তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে চাই। তা অবশ্য খুব কম লোকের জীবনে পাওয়া যায়। তবে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্তরে স্তরে এমন একটি পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে; আমাদের যা কিছু ন্যায়-সঙ্গত দাবী-দাওয়া তাঁহার জীবনের কাছে পেশ করিলে হতাশ হইয়া ফিরিতে হয় না।

আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা কি? দেশ সম্বন্ধে কিছু যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে বোধ করি এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়—তাহা শিক্ষা সমস্যা।

সে সমস্যার সমাধান না হইলে জাতীয় উন্নতি হওয়া কখনো সম্ভব নয়। বুঝিয়া পড়িয়াও দেশের পুরাতন এবং নূতন নেতারা এ সম্বন্ধে তেমন সচেষ্ট নন, কারণ ইহাতে উত্তেজনা নাই, সুলভ খ্যাতির মোহ নাই। যে কোনো স্বাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান লোক চক্ষুর অন্তরালে, ধৈর্য্যশীল নীরব সাধনায় ধীরে ধীরে বহুযত্নে গড়িয়া তুলিতে হয়।

আজ কবির বিশ্বভারতী তাঁর দেশবিদেশ-জোড়া খ্যাতিতে সকলের চোখে পড়িতেছে, কিন্তু যে চারাগাছের পরিণতি এই বনস্পতি সেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের খোঁজ বেশী লোক রাখে না।

বিশ্বভারতীর কথা বলিতে হইলে "শান্তিনিকেতনের" কথা একটু বলা আবশ্যক। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা-পূর্ণ মোহ কাটাইয়া কবি যেদিন 'ফুট-লাইটের' সামনে থেকে সরিয়া দাঁড়াইলেন, সেদিন বঞ্চিত দেশবাসীর লাঞ্ছনার আঘাত কবিকে কম বাজে নাই। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলেন দেশের যথার্থ কল্যাণের পথ ইহা নহে। নিয়ত আত্মত্যাগের দ্বারা কোনো কিছু গড়িয়া তোলার সত্য সাধনা ইহার ভিতর নাই।

সেই স্বদেশ উদ্ধার-সাধনায় অন্তঃসার-হীনতা উপলব্ধি করিয়া কবি তখনকার কোনো একটি স্বদেশী সভায় গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া নির্ভীকভাবে তাঁর মতামত একটি গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন।

> "আমায় গাহিতে বোলো না বোলো না,
> এযে শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা
> শুধু মিছে কথা ছলনা।"

দেশের প্রকৃত উন্নতি এই আত্মছলনার ভিতর নাই। সত্যনিষ্ঠ কবি তাই সেদিন এমন অক্লেশে দলপতিত্বের মোহকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন;—সেদিন তিনি লিখিয়াছিলেন,

> "বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
> কাজের পথে আমি ত আর নাই॥
> এগিয়ে সবে যাওনা দলে দলে,
> জয়মাল্য লওনা তুলে গলে,
> আমি এখন বনচ্ছায়া তলে

অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিওনা ভাই।"

সত্যকার দেশ সেবা যে কোন দিক দিয়া করা দরকার, কিসের দ্বারা যে দেশকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, কবির দিব্যদৃষ্টি তাহা সহজেই দেখিতে পাইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের মনের অন্ধকার ঘোচান সকলের আগে চাই, এবং—

"অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
না মানে বাহুর আক্রমণ,
একটি প্রদীপশিখা সম্মুখে আনিলে
অমনি সে করে পলায়ন।"

তাই তাহার জন্য প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষা নামে দেশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহাতে সত্যকার শিক্ষা কিছুই হয় না—অনেক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। অকারণ বইয়ের বোঝার চাপে কত স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা, কত সুকুমার শিশু-মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়ে, তাহার খোঁজ কে রাখে? যে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে না, সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখে, সরকারী স্কুলের প্রাণহীন কলের সেই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে সুকুমার শিশুচিত্তকে রক্ষা করিয়া যাহাতে সমস্ত বাধা-বিমুক্তভাবে আনন্দের সঙ্গে তাহাদের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ ঘটিতে পারে এমন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কবি ব্যক্তিগত ত্যাগের দ্বারা বহুযত্নে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাঁহার সেই নীরব সাধনার অনুষ্ঠানটিই শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। তাঁহার এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

I tried my best to develop in the children of my school the freshness of their feeling for Nature, and a sensitiveness of soal in their relationship with their human surroundings, with the help of literature, festive ceremonials and also the religious teaching which enjoins us to come to the nearer presence of the world through the soal, thus to gain it more than can be measured—like gaining an instrument, not merely by having it, but by producing music upon it. I prepared for my children a real home-coming into this world. Among other subjects learnt in the open air under the shade of trees they had their music and picture-makings; they had their dramatic performances, activities that were the expressions of Life.

A Poet's School.

সব সভ্য দেশেই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি দেশবাসীর অর্থসাহায্যে পুষ্টিলাভ করে। কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনে দেশের ধনী লোকদের কাছে বিশেষ কিছু উৎসাহ বা অর্থ সাহায্য পান নাই—ব্যক্তিগত ত্যাগের দ্বারাই এই সাধনাকে তিনি সফল করিয়া তুলিয়াছেন। উপরন্তু তাঁহাকে অনেক নিন্দাবাদ ও বিরোধী সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে।—কিন্তু দেশের প্রতি অপরিমিত ভালবাসাই তাঁহাকে আদর্শচ্যুত করে নাই।

কবির জীবনে সাধারণতঃ দুটি দিক দেখিতে পাওয়া যায়, একটি কর্ম্মের দিক, আর একটি স্বপ্নের দিক। তাঁর স্বপ্নের নীহারিকাই কর্ম্মে সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়—অনাদি স্রষ্টার অনুসরণ করিয়াই কবির জীবন। নীহারিকার সবটাই যেমন সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায় নাই—তেমনি স্বপ্নের সবটুকু যে কর্ম্মে সফল হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না। কারণ স্বপ্নে আমরা সম্পূর্ণকে পাই, কিন্তু কর্ম্মে খণ্ডতাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তাই কবিকে বুঝিতে হইলে আমাদের তাঁর বিরাট আদর্শের দিকে প্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বাস্তবে তাহা কতখানি সফলতার মূর্ত্তি লইয়াছে দাঁড়িপাল্লায় তাহা জুকিয়া লইতে গেলে সম্পূর্ণতাকে পাওয়া ঘটিয়া ওঠে না—খণ্ডতা আমাদের মনকে ব্যথা দেয়।

তাজমহলের স্বপ্ন দেখিতে এবং তাহা সফল করিতে শা-জাহান মনভাণ্ডার এবং ধনভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন,—বাস্তবে তাহা কতখানি সফলতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কেবল সেইটুকুই শা-জাহানের সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় বা মহত্ত্বের মাপকাঠি নয়, সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা অনেক বড়। তাই কবি শা-জাহানকে বলিয়াছেন,—

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

"বিশ্বভারতীর" কবি রবীন্দ্রনাথকেও আমরা এই কথা বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারি।

মনে হয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের "নালন্দ" প্রমুখ বিদ্যাপীঠই কবির মনে "বিশ্বভারতী" রচনায় প্রেরণা জাগাইয়াছে। বৌদ্ধভারতে "নালন্দা" বিদ্যাপীঠ একসময়ে সমগ্র এশিয়ার ভাবের আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল। সুদূর চীন হইতে শিক্ষার্থী আসিত ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারে ভিক্ষুর বেশে। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন জাতীয় অবরুদ্ধ ধর্ম্মজীবনে মুক্তির প্লাবন আনিয়াছিল, তেমনি শিক্ষায়, ত্যাগে, প্রেমে, কর্ম্মে সকলের সহিত মিলিয়া জীবনকে সার্থক করিবার প্রেরণাও জাগাইয়াছিল। আমাদের দেশে জীবনের যতকিছু ব্যাপার সবই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া। নালন্দা বিশ্ববিদ্যাপীঠের ভিত্তিও ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের উপর। নালন্দার বিদ্যাপীঠের উপর একদিন এশিয়ার সমগ্র জিজ্ঞাসু সুধীমণ্ডলী মিলিত হইয়াছিলেন।

বিশ্বজগৎকে তার পরম সম্পদ, তার অমৃত মন্ত্র বিলাইবার ভার সেদিনকার প্রবুদ্ধ ভারত গ্রহণ করিয়াছিল। *নালন্দার শিক্ষামন্ত্র প্রাচীন ভারতের সেই নবযুগ সভ্যতার* শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নানাজাতি, নানাধর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীঘেরা খণ্ডিত ভারত সেদিন এক মহান ভাবপ্লাবনের বন্যায়,

"বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার, সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে
আনত শিরে
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।"

আমার বিশ্বাস "প্রবাসী"তে প্রথম প্রকাশিত এবং "গীতাঞ্জলি"তে সংগৃহীত কবির এই অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাটির ভিতর আজিকার "বিশ্বভারতীর" আইডিয়ার বীজ গুপ্ত ছিল।

এই "বিশ্বভারতীতে" পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির সুধী মণ্ডলী তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে।
এই ভারতের মহা মানবের
সাগরতীরে।

ইহাই কবির "বিশ্বভারতী" রচনার উদ্দেশ্য। আজিকার পৃথিবীতে যখন স্বার্থগত বিরোধে সকল জাতি হিংসা-কণ্টকিত, ভারতের ধন-ভাণ্ডার যখন পৃথিবীর সকল জাতি শোষণ-রত—তখন যে সম্পদের বিনাশ নাই, ভারতের সেই পরম সম্পদের দ্বার উদার কবি নিজের হাতে জগতের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিশ্ববাসীকে "বিশ্বভারতীতে" ভাবের ভোজে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কবির যা' জীবনের কাজ বিশ্বপ্রেমের সেই মিলন-মন্ত্রই তিনি সেখানে প্রচার করেন। কারণ একদিন যে ভারত সমগ্র এশিয়াবাসীকে, অর্দ্ধ পৃথিবীকে আত্মার দুর্ভিক্ষের বিনাশ হইতে বাঁচাইতে "নালন্দা"য় শিক্ষা-সত্র খুলিয়াছিল, আজ কি সেই ভারত *তার অধ্যাত্ম সাধনার গুপ্ত সম্পদ জগতকে দান করিবে না?* কৃপণের ধনের মত নিজেও ব্যবহার করিবে না, পরকেও ব্যবহার করিতে দিবে না? সেদিন যাহা অর্দ্ধ পৃথিবীর সমস্যা ছিল, আজ যে তাহা সমগ্র পৃথিবার সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেদিনকার মত আজও ভারতকে জগতের এই আত্মার দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইবে। "বিশ্বভারতী"র মহত ব্রতই তাই।

আদর্শের প্রতি পরম শ্রদ্ধা কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত—তাহা কেবল তাঁহার মানসিক উপভোগে পর্য্যবসিত হয় না, জীবনের কাজের ভিতর দিয়া উপলব্ধির প্রয়াস দেখা যায়।

আমার এক ব্যঙ্গপ্রিয় বন্ধু একবার রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের এ নিঃস্বদেশে আবার "বিশ্বভারতী" কেন?"

কতকটা অনুপ্রাসের জন্য কতকটা পুরাতন বন্ধুতা বজায় রাখিতে হাসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মন তাহাতে একেবারেই সাড়া দেয় নাই। কেবলমাত্র বস্তুর নিঃস্বতাই

কি আমাদের জগতের সকল জাতির কাছে চিরদিন দীন করিয়া রাখিবে? পেটের ভাতই আগের জিনিষ অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু হৃদয়ের পিপাসা, আত্মার ক্ষুধাকে বড় বলিয়া স্বীকার না করিলে মনুষ্যত্বের অপমান করা হয় যে! কেন ভুলিয়া যাই, একদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা দেহের দারিদ্র্যকে মানিয়া লইয়া আত্মার ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল। মহৎ ভাবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, তাহাকে উপহাসের আঘাত দেওয়া আমাদের জাতীয় ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে উদারতার অভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে বা অনুসরণ করিতে না পারি, তাহাকে সম্মান করিব না কেন?

ভাবের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন স্বার্থবন্ধনমুক্ত হইয়া মিলিতে পারে, এমন আর কিছুতে নহে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষার মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণেই তার ধর্ম্ম ও সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইত। রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" পরিকল্পনার ভিতরে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার উদার মূল তত্ত্বটির উপলব্ধি-চেষ্টা দেখিতে পাই।

মানুষ যখন কলে ফেলিয়া জিনিষ তৈয়ারি করে, তখন সেই জিনিষ প্রাণহীন কলের মতনই প্রাণহীন হয়। বিধাতা কোনো এক বিশেষ ছাঁচে ফেলিয়া সব মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই—তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রাণের বৈচিত্র্যে ভরিয়া। তাই রুচিভেদে মানুষ সত্যকে বিচিত্র মত ও বিভিন্ন পথের সাহায্যে উপলব্ধি করে—"বিশ্বভারতী"র আদর্শ, এই বিচিত্র মতে বিভিন্ন পথগামী চিরন্তন সত্যের উদ্দেশে ধাবমান মানুষের চেষ্টাকে শ্রদ্ধা করিতে বলে।

এই উদারতা, এই মুক্তি আমাদের প্রাচীন ভারতেরই জিনিষ—সিন্ধুতীর-সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পত্তি।—"বিশ্বভারতী"র প্রতিদিনকার কর্ম্মে এবং সাধনায় তাহা রূপ লইতেছে দেখিতে পাই।—কোনো বিশেষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাই এর মূল কারণ।

তাই "বিশ্বভারতী"র ছাত্রের মধ্যে কাষায়বস্ত্রধারী মুণ্ডিতশীর্ষ সিংহলী বৌদ্ধ, চীনের লম্বিতবেণী বিরলগুম্ফ কিমানো-পরিহিত চীনেম্যান, খঞ্জননয়ন শিষ্টাচারী সহাস্য জাপানী, সিল্কের লুঙ্গী-পরিহিত খাঁটো কোর্ত্তা-শোভিত সৌখীন বার্ম্মীজ, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর প্রতি মমতাময় জৈন, এবং ভারতে আজিও যাঁরা অবিমিশ্র আর্য্য রক্তের গর্ব্ব করিতে পারেন সেই গুজরাটি এবং এই প্রাচীন ভারতবর্ষ একদিন যাঁহাদেরই ছিল, যাঁহারা স্থাপত্য শিল্প এবং সভ্যতায় একদিন ভারতের মাথা ছিলেন, দক্ষিণ ভারতের সেই প্রাচীন অন্ধ্রজাতির বর্ত্তমান বংশধরদের অনেকেরই দেখা পাই। বিশ্বের জাতিবৈচিত্র্যের মিলন এখানে ঘটিয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ছাত্র এবং শিক্ষকও শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠতার আত্মাভিমানের গণ্ডী কাটাইয়া এই "বিশ্বভারতী"তে "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" আসিয়া মিলিয়াছেন খৃষ্টান অধ্যাপক ও ছাত্রের সংখ্যাও বিশেষ কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" বিশ্বের সকল জাতির মহামিলন-ভূমি। এই "শ্রীক্ষেত্রের" ব্যবস্থা শুধু মানসিক ভোজের জন্য করা হয় নাই—সাধারণ ভোজনাগারের নিয়মও তাই। চৈনিক, জাপানী, মাদ্রাজী, গুজরাটি, বার্ম্মীজ, বাঙালী, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল দেশ ও জাতির মানসিক পংক্তি-ভোজনের মত—এক টেবিলে খাইতে কাহারও আপত্তি দেখা যায় না।

হিন্দু সমাজের বহু শতাব্দীব্যাপী সামাজিক দাসত্বের পর এ এক অপূর্ব্ব মুক্তির দৃশ্য। এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি সম্পূর্ণ আপনা হইতে হইয়াছে। কবির ব্যক্তিত্বই এ জন্য দায়ী।

"বিশ্বভারতীর" ছাত্রী-সংখ্যাও কম নয়—সুকুমার শিল্পকলা ও সঙ্গীত তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষার বিষয়। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও দিতে পারেন—তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে—এবং সেজন্য উপযুক্ত অধ্যাপকও নিযুক্ত আছেন। উদার আকাশের নীচে, উন্মুক্ত মাঠের কোলে প্রকৃতির শুশ্রূষা-নিকেতনে শরীর মনের স্বাস্থ্য সকলেরই অক্ষুণ্ণ থাকে। বদ্ধ গাড়ীতে চড়িয়া, বদ্ধ বাড়ীতে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থায় আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনতার আনন্দ

হইতে বঞ্চিত হন, এবং আবদ্ধতার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁহাদের দেহমনের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিতে পারে না। কিন্তু "বিশ্বভারতী"র মেয়েরা স্বাধীনতার আনন্দ পূর্ণভাবে ভোগ করেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কালের আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের এমনভাবে লেখা-পড়া, শিল্পকার্য্য এবং সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার শিল্পকলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

"বিশ্বভারতী"র ছাত্র এবং ছাত্রীরা এক পরিবারের ভাই বোনের মত অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শোভনভাবে পরস্পরের সহিত মেলামেশা করেন। আমাদের দেশে Co-educationএর এ প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ নূতন এবং এ দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী। এই অনুষ্ঠানটির সরল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কেমন করিয়া তরুণ জীবনকে সহজভাবে পরিপূর্ণতার পথে লইয়া যায়—রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহার সন্ধান পাইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সভ্যতার ভিত্তির মধ্যে যে একটি ঐক্য-বন্ধন আছে—আপাতমতভেদের সর্ব্বপ্রকার অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়া সেই যোগসূত্রকে আবিষ্কার করা "বিশ্বভারতী"র কাজ। এই আত্মীয়তার যোগকে সাধন করা, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধকে স্থাপন করা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য।

প্রাচ্য দেশের জীবন ও চিন্তার ভিতরকার এই সর্ব্ব-সমন্বয়ের ভাবটি দ্বারা পশ্চিম জগৎকে অনুভাবিত করাও কবির "বিশ্বভারতী" স্থাপনের আর একটি গোড়ার কথা।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত অশ্রু-প্রবাহের মত যে বিরাট লবণাক্ত ব্যবধান আছে, তাহার উপর বস্তুজগতে সম্ভব না হোক ভাবজগতেও সেতু-স্থাপনের চেষ্টা এই "বিশ্বভারতী"তে কাজ করিতেছে।

জাতীয় স্বার্থসচেষ্ট, উপকরণবহুল আধুনিক সভ্যতার দুর্দ্দশা নিবারণের পথ আবিষ্কার করাও এই চেষ্টার মধ্যে আছে—এবং তার মুক্তিও এই ভারতের ভাব ও বাণীর দ্বারা হইবে বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন। এই বিশ্ব-শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা ভারতীয় ভাব ও চিন্তার আদান প্রদান দ্বারা সম্ভব; ইহার দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে। ইংরেজ কবি রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং বলিয়াছেন, "East is East and West is West, Never the twain shall meet." বিশ্বপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন,

"I refuse to think that the twin spirits of the East and the West, the Mary and Martha, can never meet to make perfect the realisation of truth. And inspite of our material poverty and the antagonism of time I wait patiently for this meeting." "A Poet's School."

হিন্দু বৌদ্ধ-জৈন-মুসলমান, তেলেগু-খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব জাতি সমন্বয়ে ধর্ম্ম, সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্য দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ভাব ও চিন্তার দ্বারা যে মহামিলন-ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে সকল জাতির সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতিনিয়ত গড়িয়া উঠিতেছে তাহাই বিশ্বভারতী।

বিশ্বের জিজ্ঞাসু ছাত্রেরা এখানে সশ্রদ্ধ মনে মিলিত হইয়া ভাব ও চিন্তার আদান প্রদানে পৃথিবীকে পরিপূর্ণতার পথে আরো অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে হইলে সরলভাবে জীবনযাপন করিতে হয়—এখানে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিদ্যার্থীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশেরই বড় বড় আচার্য্যদের সাহচর্য্য এবং উপদেশ লাভ করিয়া নিজেদের গড়িয়া তোলেন। ছোট বড় সকল প্রকার জাতি-বিদ্বেষ হইতে তাঁহারা মুক্ত—বৈচিত্র্যের মধ্যে বহুর মধ্যে যিনি এক তাঁহারি আরাধনা তাঁহারা করিয়া থাকেন।

দেশকে রবীন্দ্রনাথ কি দিয়াছেন, এ প্রশ্ন যদি কেহ করে তবে তাহাকে বলা যায়, তিনি আপনাকে দিয়াছেন—তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার দেশ-সেবা ক্ষণিক আন্দোলনের ঝড়ে কোনো কিছুকে ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করে না, তাহা নীরব সাধনায় বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যে আপনার পরিপূর্ণতাকে প্রকাশ করে। কবির কাছে আমরা তাহাই প্রত্যাশা করি, কারণ কবির দানের বিশেষত্বই তাই।

একদিন কবি গাহিয়াছিলেন,

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

কবি আপনার দেশকে কিংবা জাতিকে ভূগোলের দ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেখেন না,—দেশপ্রেমের গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে পীড়া দেয়, তাহাতে বিশ্বমায়ের অঞ্চলস্পর্শ পান বলিয়াই কবির কাছে তাহা সত্য—তাহার অস্তিত্ব সার্থক। কবির দেখা পরিপূর্ণতার ছবি দেখা,—বাস্তবে কেবল আমরা খণ্ডতাকে দেখি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবের জীবন, কাব্যের জীবন সকলের কাছেই পরিচিত এবং প্রশংসিত। এ ছাড়া তাঁর এক কর্ম্মের জীবন দেশহিতের সহিত বিশ্বহিতকে যুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। লোকচক্ষুর অগোচরে এক নির্জ্জন প্রান্তরের পারে তিনি সেই সাধনা সেই নীরব কর্ম্মে রত ছিলেন। আজ হঠাৎ সেই বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্য পরিপূর্ণতাভরে আবরণমুক্ত হইয়া বিশ্ববাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—কবির চিরজীবনের সাধনা "বিশ্বভারতী।" শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যাহা কোরক ছিল সেই সাধনাই পূর্ণবিকশিত অমর পুষ্পের মত "বিশ্বভারতী"তে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কাহারো কাহারো কাছে এমন প্রশ্নও শুনিতে হয় গান্ধীজির স্বরাজ আর কবি রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" দুটিই একজাতীয় utopian জিনিষ।—এদের অর্থ কি বলিতে পারেন?

আমি খানিক ভাবি, তার পর মৃদু হাসিয়া শুধাই, "আপনার কি মনে হয়?"

তিনিও হাসিয়া বলেন, "পাল্টা প্রশ্ন করা প্রশ্ন এড়ানোর একটা কৌশল!"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "তবু!"

তিনি বলেন, "ভারতকে বিশ্বের মধ্যে দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষাই 'বিশ্বভারতী'!"

আমি বলি—"Non-co-operationএর একটা প্রতিবন্দি না হ'লে?—অবশ্য ভাবিগত নয়, অর্থগত।"

তিনি বলেন,—"আমার মনে হয় ভাবগত।"

আমি মৃদু হাসি, বলি, "ভারতীর একটা বিশ্বরূপ দেখবার আকাঙ্ক্ষাও হ'তে পারে।"

তিনি সাগ্রহে শুধান, "তাই নাকি মশায়!"

আমি হাসিয়া বলি, "দুই-ই সম্ভব। কারণ বড় কবিদের কবিতা একটি মাত্র অর্থের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, ব্যক্তিবিশেষে তার রূপ বিচিত্র।"

কবি রবীন্দ্রনাথ মিলন-যজ্ঞের পুরোহিত, বিশ্বমৈত্রীর উপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁর সাধনার সার্থকতা প্রেমে—সর্ব্বপ্রকার co-operationএর উপরই তা' নির্ভর করে। এবং চিন্তা ও ভাবজগতে যেমন স্বার্থশূন্য অনাবিল প্রেমে মিলন ঘটিতে পারে এমন আর কিছুতে নয়।

রবীন্দ্রনাথ যতগুলি অমর কাব্য রচনা করিয়াছেন, যেগুলি বিশ্বজগতে চিরন্তন প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে, আমার মনে হয় "বিশ্বভারতী"র প্রতিষ্ঠানটি তাহার অন্যতম। "বিশ্বভারতী" তাঁহার চিরজীবনের সাধনার ফল—কবির হঠাৎ খেয়াল নয়। ইহাই তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কাজ। দেশবাসীকে—না, বিশ্ববাসীকে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। রবি অস্তমিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে যদি ইহার অবসান হয় তবুও মনে রাখিতে হইবে কাব্যের স্থায়িত্ব তাহার মহত্ত্বের একমাত্র নিদর্শন নয়।

"বিশ্বভারতী"কে সঙ্গীতে সরস করিয়া তুলিয়াছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নন্দলাল বসু ইহার চিত্রে বৈচিত্র্য আনিয়াছেন। ক্ষিতিমোহন সেন মধ্য-যুগের ভারতীয় সাধকদের রসের সাধনার গবেষণায় রত—জিজ্ঞাসু ছাত্রদের তিনি আনন্দের সহিত সেই রসভোজে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রাচীন পালিভাষা ও উপনিষদের গভীরতায় ডুবিয়া অনেক মণি-রত্ন তুলিয়া উৎসুক ছাত্রদের উপহার দেন। আরো অনেক স্বদেশী ও বিদেশী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাবের ও চিন্তার আদান প্রদানে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত গড়িয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতী"র ভাবময় মূর্ত্তি দিয়াছেন এবং তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছেন; কিন্তু তার বিচিত্র

সৌধরাজিতে, উজ্জ্বল বিজলী বাতিতে, পুষ্পবনের প্রাচুর্য্যে, বস্তুদেহের সৌষ্ঠবময় গঠনে যে রূপবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার শিল্পী কবিপুত্র রূপদক্ষ রথীন্দ্রনাথ।

"কলাভবন" "শ্রীভবন," "উত্তরায়ণ" "পাঠাগার" "সিংহভবন" প্রভৃতি সৌধগুলি স্থাপত্যশিল্পের ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে চিরকাল "বিশ্বভারতী"র প্রতিষ্ঠানটিকে শোভাময় করিয়া রাখিবে। রথীন্দ্রনাথের নামের স্মৃতিও চিরদিন "বিশ্বভারতী"র সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে। "বিশ্বভারতী"র ব্যবস্থা-পরিচালনায় তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ তাঁর কর্ম্মনিপুণতায় প্রতিষ্ঠানের বিপুল ব্যাপারটি সুচারু ভাবে চলিতে সাহায্য করিতেছে। "বিশ্বভারতী"র তত্ত্বাবধানে সুরুলে "শ্রীনিকেতন" নামে এক কৃষিশিক্ষা বিভাগ আছে, তিনি সেখানকার কার্য্য-পরিচালক। এখানে ছাত্রদের কৃষিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আশে-পাশের গ্রামের ছেলেদের বিনাব্যয়ে তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ, চর্ম্মকারবৃত্তি, কর্ম্মকারবৃত্তি এবং আমেরিকার নূতন উদ্ভাবিত Project methodএ সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখানকার গ্রামের উন্নতির কাজ করিবার আদর্শ মত যাহাতে একদল যুবক তৈরি হইয়া ওঠে এবং তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীতে সর্ব্ববিধ মঙ্গলকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতে পারে এইজন্য তিনি নিজব্যয়ে জনকয়েক ছেলেকে তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন। তাঁহার স্ত্রী সহধর্ম্মিনী প্রতিমাদেবী তাঁহার সর্ব্ববিধ মঙ্গলকর্ম্মে যোগ দেন, এবং সাধ্যমত সাহায্য করেন। ভারতবর্ষের কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য এই মহিয়সী মহিলা প্রতিদিন কার্য্যক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ দেন, এবং নানাভাবে উৎসাহিত করেন। এছাড়া "বিশ্বভারতী"র শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের তত্ত্বাবধান তিনি নিজে করিয়া থাকেন।

"বিশ্বভারতী"র চিন্ময় রূপের মত এই মৃন্ময় রূপও দেশ বিদেশের সকলেরই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের সহিত এইরূপ অক্লান্ত উৎসাহ কাজ করিলেই বন্ধ্যা মরুভূমিকে ফলে ফুলে সুবিচিত্র অমরাবতীতে পরিণত করা যায়—এবং একমাত্র মানুষের চেষ্টা দ্বারাই তা' সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ এবং কর্ম্মপটুতায় এই কয়েক বৎসরের ভিতর "শান্তিনিকেতনে"র যে বস্তুগত উন্নতি হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যে আগেকার "শান্তিনিকেতন"কে দেখে নাই সে তাঁহার দান সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারিবে না। বহুদিনের পর পরিবর্ত্তন প্রথম দেখিলে চমক লাগিয়া যায়। সেদিনকার লোকবিরল বিজন মরুভূমিতে ফলে ফুলে সুবিচিত্র, ভারতের বৈশিষ্ট্যভরা বিবিধ স্থাপত্যশিল্পে পূর্ণ সৌধরাজিতে সজ্জিত, বিজলী বাতিতে উদ্ভাসিত এ এক বিচিত্র রবীন্দ্র-নগর! বোলপুরের একদা জনহীন প্রান্তরে সর্ব্ববিষয়ে এ এক অপূর্ব্ব "ওয়েসিস্"—ভবিষ্যৎ বিশ্ববাসীর কবি-তীর্থ-ভূমি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যসাধনায় ওতঃপ্রোত "শান্তিনিকেতন।" এখানে এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া, কবিগুরুর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, এই মিলন-মন্ত্র, এই আবাহনগীতি আমরাও যেন গাহিতে পারি:—

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস, এস আজ, তুমি ইংরাজ
এস, এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ-নীরে
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে!

শ্রীসতীশ রায়

যোগ-ধর্ম্মের যুক্তি

শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

সমাজ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ নামক একটি প্রবন্ধে সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং আশ্রমবাসকে কেবল সমাজের দিক থেকে বুঝতে ইতি-পূর্ব্বে চেষ্টা কোরেছি। আমার বক্তব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমি এক সর্ব্বজনপরিচিত ভদ্রলোকের নাম করি। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, তিনি সমাজের একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ অসম্পূর্ণ রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ কোরেছেন। তাঁকে বক্তব্যের দৃষ্টান্তস্থল করবার অন্য একটি কারণও ছিল। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে যে তিনজন যুবাবয়সেই সংসার ত্যাগ কোরেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও দু একজন ধর্ম্মের তাড়নায় সংসার ও সমাজবিদ্বেষী হয়েছেন। গত কয়েক বৎসরে অন্য যাঁরা আশ্রমবাসী হয়েছেন তাঁদের জীবনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও, তাঁদের জীবনীর সঙ্গে আছে। আমার নিজের মনেও যোগধর্ম্মের বংশগত ছাপ পড়েছে। তাই নিজের অভিজ্ঞতাকে মূল কোরে বর্ত্তমান সমাজের যুবকদের আশ্রমাভিমুখিনতাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার কোরতে উদ্যত হই। সে সমালোচনায় বিশেষ কোন ব্যক্তি বা আশ্রমের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয় নি। প্রবন্ধটি পুনরায় প'ড়ে মনে হ'ল যে, তার অন্যান্য দোষের মধ্যে একটি বিশেষ দোষ এই যে, যুক্তি তর্কের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভ উঁকি দিচ্ছে। আমি চেষ্টা কোরলাম নিজের মনোভাব পরিষ্কার করতে ও সাজাতে, কিন্তু ফল এই হ'ল যে আমার প্রাঙ্গণের জঞ্জাল একটি বিশেষ কোন আশ্রমের প্রাঙ্গণে উড়ে পড়ল। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? নিজের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতেই হবে, অথচ হাওয়ার গতিকে খাতির কোরে কাজ কোরতে হবে। সেই জন্য এই প্রবন্ধে আমি সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হব সঙ্কল্প করেছি। যদি আমার চেষ্টা সত্ত্বেও, আমার অলক্ষ্যে আমার মনের জঞ্জাল কোন আশ্রমে গিয়ে পড়ে, তা হ'লে আশা করি আশ্রমের পবিত্র হাওয়ায় সে জঞ্জাল আপনা হ'তেই উড়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নিজেদের নাম পর্য্যন্ত বদলে দেন—সংসার থেকে একেবারে বিচ্যুত হয়েছেন ভাববার সুবিধার জন্য। এই পরিবর্ত্তনের যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তার মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহ'লে একটি সাংসারিক মানুষের আবোল-তাবোলের জন্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কেহই আমার প্রবন্ধ প'ড়ে ক্ষুব্ধ হবেন না আশা করা যায়।

আশ্রম সমাজের বীজক্ষেত্র আমি পূর্ব্বেই স্বীকার কোরেছি। আশ্রম সমাজের শক্তিকেন্দ্র এবং সংস্কার-গৃহ হওয়াও উচিত আমার না লেখা অন্যায় হ'য়েছে। নানা কারণে মানুষের শক্তি ক্ষুন্ন হয়। শক্তির ক্ষতিপূরণার্থে প্রত্যেক মানুষকে কিছুকালের জন্য অবসর নিতে হয়, দৈনন্দিন কর্ম্ম থেকে নিরস্ত হ'তে হয়। কিন্তু চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করাও যা, আর সামাজিক মৃত্যুও তা। বলা যেতে পারে যে সামাজিক মৃত্যু সত্যকারের ধর্ম্মের পক্ষে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মোক্ষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাঁরা এই তর্ক তোলেন, যদি তাঁদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় অন্য ধরণের কিন্তু মূলতঃ সেই মামুলী সমাজ-প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা থাকে, তাহ'লে সেই আচার-ব্যবহারের সামাজিক ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত নয়; যদি দেখি তাঁদের ব্যবহারে বৈরাগ্যের পার্থিব হেতু ও সমাজের প্রতি ঘৃণার সামাজিক কারণগুলি বিষাক্ত জীবাণুর মতন গোপনে প্রবেশ কোরেছে তাহ'লে তাঁদের অসঙ্গতি দেখাবার অধিকার আমাদের আছে; যদি সন্ন্যাসীদের সামাজিক মৃত্যু কোন নব জীবনের প্রবেশদ্বার প্রমাণিত না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আশ্রমকে সন্দেহের চক্ষে দেখলে পাপ হবে না নিশ্চয়। যাঁরা সংসারের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে বনবাসী হ'লেন, তাঁদের কথা একেবারে ভিন্ন হ'লেও খানিকটা বোঝা যায়—অর্থাৎ

তাঁদের নিকট আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না। এই ধরণের সন্ন্যাসী নিজের জপতপ নিয়ে নিজের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত—কোন আশ্রম স্থাপনই করেন না—যেমন পওহারী বাবা ও ত্রৈলঙ্গস্বামী। সকলে মিলে যোগ কোরব জপতপ কোরব আশ্রমের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য চেষ্টা কোরব, ভিন্ন আশ্রমের প্রতি কটাক্ষপাত কোরব, সমালোচনায় বিচলিত হব—অর্থাৎ পুরাতন পরিত্যক্ত সমাজের নিতান্ত সাধারণ মনোভাবগুলি লুপ্ত হবেনা—তা হ'লে সমাজ পরিত্যাগ কোরে বেশী কি লাভ হ'ল! যে লাভটুকু হ'ল সেটি পয়সা দিয়ে কেনা যায়। পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামীর ব্যবহার আলোচনা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই—কিন্তু সাধারণ আশ্রমবাসীদের ব্যবহার সকলেরই আলোচ্য হ'তে পারে।

এ-ত গেল আশ্রম-বাসের বিপদ—যেটি পরে চোখে পড়ে। আদিতে যে প্রবৃত্তি থাকে তার সামাজিক ব্যাখ্যা আমি কোরেছি। এই প্রবন্ধে আমি একটি তথাকথিত শুদ্ধ ধর্ম্মভাবের আলোচনা কোরব। ন্যায়তঃ এই শুদ্ধভাবের কোন নাম দেওয়া যায় না। যে প্রেরণা অনুভূতিসাপেক্ষ তার কি নাম হতে পারে? যে ভাব সাধারণের গোচরাতীত তাকে ভাষার গণ্ডীতে আবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। তাকে গোড়া থেকেই অব্যক্ত বলা ভাল। ইংরাজী শিক্ষিতরা এই প্রেরণা-মূলক দর্শনকে mysticism বলেন। একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক আমাকে বোলেছেন যে mysticism'এর কোন যথার্থ সংস্কৃত প্রতিশব্দ না থাকার কারণ, এই দর্শন হিন্দুশাস্ত্র-না-জানা ইংরাজী শিক্ষিতের দ্বারাই আবিষ্কৃত। আর একজন পণ্ডিত একে যোগ ধর্ম্ম কিম্বা যোগজ-প্রত্যক্ষবাদ বোল্লেই চলবে বোলেছেন। সেইজন্য প্রবন্ধের নাম 'যোগ-ধর্ম্মের যুক্তি' দিয়েছি। যোগ যুক্তির অতিরিক্ত হ'তে পারে—কিন্তু যোগ-ধর্ম্ম আযৌক্তিক হ'লে লোকে গ্রহণ করবে কেন? ধর্ম্মের তত্ত্ব যেকালে গুহায় নিহিত, তখন mysticismকে গুহ্য-ধর্ম্ম এবং যোগ-ধর্ম্মের প্রেরণাকে গুহ্যবৃত্তি বলা যেতেও পারে।

এখন দেখা যাক্ mystic কি বলেন?

ভিন্ন দেশের ভিন্ন মিষ্টিকদের ভাষা ভিন্ন হ'লেও তাঁদের মূল বক্তব্যে বোধ হয় বেশী পার্থক্য নেই। বলা বাহুল্য যে mysticism বোলতে ভৌতিক শক্তিতে, occult powers-এ বিশ্বাস, কিম্বা মরমী কবির রচনা-পদ্ধতি, কিম্বা মানব-মনের স্বাভাবিক গহনা-গতি, love of mysteries নির্দ্দেশ করছি না। তবে এ কথা ঠিক যে গুহ্য-ধর্ম্মে কিম্বা যোগ-ধর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। এই কয়টি বোধ হয় মিষ্টিকদের মোট কথা।

(১) এই ব্যবহারিক, সাধারণ ইন্দ্রিয়-গম্য, পরিমেয় জগৎ এবং অনুমান, উপমান ও শব্দসিদ্ধ নিশ্চয়ের হেতু ভিন্ন অন্য একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণসাপেক্ষ জগৎ ও নিশ্চয়ের হেতু আছে;

(২) সেই জগৎই একমাত্র সত্য এবং সেই প্রমাণই নিশ্চিত; অন্য জগৎ অ-সত্য, অন্য প্রমাণ অবান্তর।

(৩) সেই জগতের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির জন্য একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হবে। ইন্দ্রিয়টির একটি নাম বোধি।

(১) এমন কেউ মূর্খ নেই যে পরিণামের সংখ্যাকে pointer-readingsকে, মাপকাঠিকে, প্রমেয় বস্তু মনে করে। চাঁদের আলোকে candle-powerএ মাপা এক তাঁদের দ্বারাই সম্ভব যাঁরা ঘরের বাতিকে চাঁদ মনে করেন। গোটাকয়েক জিনিষ আছে যার মাপ সংখ্যার দ্বারা অসম্ভব, যেমন সৌন্দর্য্যজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান। এই জ্ঞান কিম্বা অনুভূতিকে নিয়ে সংখ্যা-মূলক বিজ্ঞান তৈরী করা বোধ হয় যায় না। কিন্তু এই কথা বোল্লেই শেষ কথা বলা হ'ল না। কোন একটি গান শুনে আমাদের বড় ভাল লাগল। কতখানি ভাল লাগল মাপবার উপায় নেই; কিন্তু এ কথা ঠিক যে যদি গায়কের স্বরগুলি শ্রুতি থেকে ভেসে ভেসে বেড়াত তা হ'লে ভাল লাগত না। শ্রুতি শুধু সংখ্যা নয় জানি, শ্রুতির সংখ্যা হয়ত মিষ্ট গলা থেকেই নেওয়া, কিম্বা তারের শব্দ থেকে নেওয়া; যে গলা কিম্বা তারের আওয়াজ থেকে শ্রুতি

নেওয়া হয়েছিল সে আওয়াজ যখন শুনতে পাচ্ছি না, আপাততঃ নতুন গলার আওয়াজ শুনেই ভাল লাগছে, তখন এই আনন্দ উপভোগের একটি স্থির সমর্থন রয়েছে। এ সমর্থন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা সুনিশ্চিত। কেন না শ্রুতির সমর্থনে ব্যক্তিগত ভুলের সম্ভাবনা কম। জীবনকেও মাপা যায় না—কিন্তু যাঁরা এ কথা ভাল রকমই জানেন তাঁরাও জীবন শেষ হবার সম্ভাবনা আছে সন্দেহ কোরলেই ডাক্তার ডেকে হৃদয়ের স্পন্দন ও নাড়ীর গতি মাপতে দেন।

আমি বলি যতদুর পারি সব অভিজ্ঞতাকে কঠোর ভাবে পরীক্ষা কোরব। পরীক্ষা সংখ্যাস্থিত হ'লে সব চেয়ে ভাল হয়, কিন্তু না হ'লেও চলে। সংখ্যামূলক পরীক্ষার দ্বারা যাচিয়ে নেবার প্রয়াসে অনেক লাভ হয়—ক্ষতি যা হয় পূর্ব্বে উল্লেখ কোরেছি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান কিম্বা ধর্ম্মজ্ঞানের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে না। লাভের কথা এখন লিখছি—গোড়াতেই বাজে জিনিষ বাদ পড়ে—যেমন intelligence-testএ হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা কেবল ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা ধরা পড়লেও প্রতিভা আবিষ্কৃত না হ'লেও—যারা বোকা ও হাঁদা তারা প্রথমেই ধরা পড়ে, এবং তাদের মধ্যে প্রতিভা আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। দ্বিতীয়তঃ পরিমাণের চেষ্টাতে বিচার-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়—কেননা অঙ্কের শাসন অত্যন্ত কঠোর। তৃতীয়তঃ,—এইটাই সব চেয়ে দরকারী কথা—অঙ্কের অগ্নি-পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হ'লে বোঝা যায় কোন অভিজ্ঞতা অঙ্কের অতিরিক্ত।

সংখ্যাস্থিত পরীক্ষা না হ'লেও পরীক্ষা সম্ভব। অঙ্ক শাস্ত্রের ইতিহাসে অনেক কঙ্কাল দেখা যায়। ইয়ুক্লিডের জ্যামিতি শুধু এক প্রকার ক্ষেত্রের জ্যামিতি দাঁড়িয়েছে। পরিমাণ করা প্রধানতঃ চোখের কাজ। এমন কিছু বাঁধা ধরা নিয়ম নেই যে, বিজ্ঞান শুধু চক্ষু-লব্ধ অভিজ্ঞতাতেই আবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতাও বিজ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে। শুধু তাই নয়, এমন বিজ্ঞানও বিজ্ঞান বোলে পরিগণিত হ'তে পারে যেটি সংখ্যার উপর সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত নয়, যেমন রসায়ণ-বিজ্ঞান ও জীবতত্ব। এ দুটি বিজ্ঞানের কতটুকু অংশ অঙ্ক-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে? বিজ্ঞান যে কেবল পরিমাণ কোরতেই ব্যস্ত সব বৈজ্ঞানিক তা বলেন না। আমি মাত্র দুই জনের নামোল্লেখ করছি—একজন ফ্রান্সিস্ বেকন, অন্যজন আইনষ্টাইন। শেষোক্ত ব্যক্তিটি বোলছেন—The object of *all science*, whether natural science or *psychology*, is to *co-ordinate* our experiences, and to bring them into a *logical* system.' Italics কথাগুলির ওপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্য কথা এই যে mathematical physicistই পৃথিবীর একমাত্র বৈজ্ঞানিক নন্। কিন্তু তাই বোলে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানকে অগ্রাহ্য কোরলে চলবে না। তাকে বরণ কোরে নিতে হবে। দান এই—একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা কল্পনা করা যায়, এবং সেই অভিজ্ঞতার জগতে আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতামূলক অঙ্ক-শাস্ত্রের সঙ্কেতকে খাটান ও বিস্তার করান যেতে পারে!

(২) এই mystic জগৎই সত্য এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণই নিশ্চিত। প্রথমেই দেখা যাক, কাল্পনিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট-জগতের প্রতি বৈজ্ঞানিকের কি মনোভাব। "...but it must not be regarded as telling us anything more than is warranted by our original sense-data. If it suggests more it has been introduced somewhere in the logical development, in the language of the analysis, or in the initial abstractions on which the analysis is based. The suggestion may be fruitful, as every imaginative effort may be, but it has to be tested on its merits before it can become a fact of science."—এই উক্তিটি mathematical physicist, বিশেষ কোরে আইনষ্টাইনের সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল লেখকের। এই উক্তিটি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও খাটে, আবার মিষ্টিসিজম্ সম্বন্ধেও খাটে।

Mystic জগতের অস্তিত্ব মানলেও, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রয়োজন মানলেও, সেই জগৎ এবং সেই জ্ঞান একমাত্র সত্য ও সুনিশ্চিত, অন্য জগৎ ও প্রমাণ অবান্তর কি কোরে প্রমাণিত হয়? ন্যায়ের রীতিতে প্রমাণিত হয় না বটে, কিন্তু কি কোরে মানুষের মনে প্রমাণিত হ'তে পারে তার আভাস

দেওয়া যেতে পারে। আদিম-সমাজে ইন্দ্রজালের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। ভয় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ভোজ-বিদ্যার প্রয়োজন ছিল। ঐন্দ্রজালিকের অতিপ্রাকৃত বিদ্যা তাকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কোরে তোলে। দার্শনিক মিষ্টিক্ সেই ঐন্দ্রজালিকের বংশধর। মধ্যযুগের পুরোহিত সম্প্রদায় যা কোরে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য স্বর্গরাজ্যের মহিমা প্রচার কোরতেন, স্বর্গরাজ্যকে একমাত্র রাজ্য এবং এই জগৎকে হেয় প্রচার কোরতেন, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও স্বার্থ সন্ধানের ধারা হয়ত মিষ্টিক-দার্শনিকের মনে অলক্ষিত ভাবে এখনও কাজ কোরছে।

দ্বিতীয় আভাষ ইঙ্গিত করছি। প্রত্যেক জ্ঞানার্জ্জনের এক একটি ইতিহাস আছে। সব জ্ঞান-সঞ্চয়ের প্রথম এক অবস্থায় আহৃত তথ্য নিষ্কর্ষণ কোরে মনঃকল্পিত বাচ্য স্থির কোরতে হয়। বাচ্যগুলি অবশ্য নিরালম্ব। সেগুলি যেন সিঁড়ির এক একটি ধাপ—ধাপ না হ'লে ওঠাও যায় না, আবার চিরকাল ধাপে বোসে থাকলে জ্ঞানও বাড়ে না। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞানের ইতিহাসেই বোধ হয় দেখা যে, মানুষ আরামের জন্য বাচ্যকে সত্তা বোলে ভুল কোরছে—বাচ্যকে ছাড়তে মন আর চাইছে না। মনে এমন একটি গাঁট পড়েছে যে ছাড়ান দুষ্কর। তুলনা বদলে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক বাচ্যটি যেন উপদেবতা হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেক উপদেবতার একটি পুরোহিত জোটে—এই পুরোহিত জ্ঞান-বুদ্ধির প্রধান শত্রু। এতদিন পদার্থ-বিজ্ঞানে Substance, Force, সৌন্দর্য্যতত্ত্বে Beauty, অর্থশাস্ত্রে Utility, নীতিশাস্ত্রে Good, প্রভৃতি অনেক গাঁট ছিল—অনেক উপদেবতা ছিল, এখনও নব্য মনোবিজ্ঞানে Libido, সমাজতত্ত্বে Group-mind জীবতত্ত্বে Entelechy. Mneme জুটছে। দর্শনেও ঐ প্রকার বাচ্য, গাঁট, উপদেবতা আছে। সব চেয়ে অপকারী দেবতার নাম ঐশী-শক্তি যার প্রধান পুরোহিত mystic। ঐশী-শক্তির দাপটে আমাদের সব শক্তি পঙ্গু হয়েছে। বুদ্ধির দিক থেকে, অভিব্যক্তির দিক থেকে, আত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিক থেকে ঐশী-শক্তি যখন একটি ধাপ, সুবিধামূলক বাচ্য সন্দেহ করি, তখন বাচ্যকে সত্তা মনে করা পুরোহিতের নিতান্ত স্বাভাবিক কর্ম্ম মনে হয়। সকলেই জানেন, যে প্রত্যেক পুরোহিত তাঁর ব্যবহৃত মন্ত্রকে স্বর্গ রাজ্যের একমাত্র চাবি মনে করেন। চাবি যখন একটি, তখন সে চাবি দিয়ে যে জগতের দ্বার খোলা যায়, সেইটিই একমাত্র স্বর্গ প্রমাণিত হ'তে বিলম্ব হয় না।

ব্যাপারখানি বিশদ কোরে লিখছি। আমরা প্রত্যেকেই কখনও স্বার্থপর, কখনও পরার্থপর—কখনও বা আমাদের আপন-পর জ্ঞানই থাকে না। একই ব্যবহারে স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা মেশান থাকতে পারে। আডাম স্মিথ এই ব্যবহারগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত কোরতে চেষ্টা করলেন—তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি একটি সাধারণ গুণনীয়ক বেছে নিলেন। যাঁর যেমন উদ্দেশ্য, সিদ্ধি তাঁর সেই রকমের। অমনি একজন econominc being তৈরী হ'ল, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক ব্যবহারে এই মন-গড়া মানুষটি পিছন থেকে অলক্ষ্যে কাজ করে প্রমাণিত হ'ল। সব মানুষই economic being, economic জগৎই একমাত্র জগৎ, মানুষের অন্যান্য ব্যবহার economic motiveএর বিকাশ মাত্র এক নিঃশ্বাসে প্রমাণিত হ'য়ে গেল। মনের কোথায় ফাঁকি হ'ল দেখাচ্ছি। একটি সাধারণ গুণনীয়ক মানুষের আকার নিয়েছে; একটি বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-নির্দ্দিষ্ট সাধারণ গুণ পিছনে গিয়ে এত শক্তিশালী হয়েছে যে সেটি সত্তার, সমগ্রতার ওপর কড়া প্রভুত্ব কোরছে—তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়ে দিচ্ছে। ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত একটি abstract name of one factor শক্তিমান হ'য়ে গুহ্য উপায়ে এমন কাজ আরম্ভ কোরে দিল যে, আর সত্তার একত্ব, নিজত্ব, বৈশিষ্ট্য রইল না। কি কোরে আডাম স্মিথ এই যাদুমন্ত্র শিখলেন তা সেই ভগবানই জানেন যিনি মিষ্টিকের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং মিষ্টিকের সেবাতেই পরিপুষ্ট। ফ্রয়েডও ঐ উপায়ে কাম-শাস্ত্র লিখেছেন। ফ্রয়েডের কাম প্রবৃত্তি। মিষ্টিকের ঐশী-শক্তি সমাজতত্ত্ববিদের হট্টমন মনের একই জুয়াচুরী।

মোদ্দা কথা এই যে hypothesis কিম্বা fictionকে সত্য বোলে ভুল কোরতে আমরা সকলেই প্রস্তুত, কেননা তাই মনে কোরলে মনের টান-টান ভাবটি কেটে যায়—মনের

ছিলে আল্‌গা হ'য়ে যায়। আমরাও স্বপ্ন দেখে বাঁচি। ফাঁকি দিতে আমরা সকলেই ব্যগ্র, কেননা ফাঁকিতে আরাম পাওয়া যায়। তার ওপর যদি বিহার জোটে, তাহ'লে সোনায় সোহাগা! এক সঙ্গে ফাঁকি দিতে পারলেই সভ্যারাম!

(৩) হয়ত আমি আডাম স্মিথ, ফ্রয়েডকে যা বুঝেছি, মিষ্টিককেও তাই বুঝেছি। বুঝতে পারি নি তার কারণ কি? গুহ্য-ধর্ম্ম বুঝি না তার কারণ মিষ্টিক বোলচেন যে আমার বোধি বোলে কোন নূতন ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হয় নি। আডাম স্মিথ বুঝতেও কি economic sense, ফ্রয়েড বুঝতেও কি sex-sense চাই না? কিন্তু সকলের গলদ ত একই। বিশিষ্ট উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সত্তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে, সেই টুক্‌রো থেকে একটি বাচ্য তৈরী কোরে সত্তার স্কন্ধে চাপান হয়েছে। গলদ যখন এক, তখন গলদ বার করবার জন্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই—সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই কাজ চলে—জোর না হয় সে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরলেই চলে। গলদ বার করা ছাড়া অবশ্য বোঝবার অন্য দিক আছে। তা থাকলেও বিপদ এই যে—অভিজ্ঞতার যতগুলি শ্রেণী ততগুলি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। একটি ছোট ছেলের সাধারণতঃ পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, সে আবার যদি হিন্দু হয়, তা হ'লে শাস্ত্রানুসারে তার আরো গোটাকয়েক ইন্দ্রিয় থাকতে বাধ্য, না হ'লে হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মক সমাজের জাতি-বিচার, অবতার-বাদ, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি লক্ষণগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন কোরতে পারবে না—আর তাই যদি না পারে তা হ'লে ছেলেটি যবনের বংশে জন্মগ্রহণ কোরেছে প্রমাণিত হ'ল, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা সনাতন-ধর্ম্ম বিদ্যালয়ে চাকরী পাবার আশা রইল না—এক কথায় সে উচ্ছন্ন গেল। ছেলেটির বাবা যদি আবার তাকে কোন ভাল বিদ্যালয়ে পাঠান তা হ'লে চোদ্দ বৎসরেই তাকে আট দশটি বিষয় আয়ত্ত কোরতে হবে। অতএব প্রত্যেক হিন্দু বালকের কম কোরে কুড়ি পাঁচশটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় থাকা চাই—নচেৎ সে হিন্দুও হবে না, মানুষও হবে না। যোগী হ'তে গেলে আরো একটি চাই। বাস্তবিক পক্ষে কি আমাদের অতগুলি ইন্দ্রিয় আছে? সেই জন্য বলি যে, যতগুলি অভিজ্ঞতা আছে ততগুলি ইন্দ্রিয় না মেনে—এই সাধারণ বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরলে কি ক্ষতি হয়? সাধারণ বুদ্ধি-লব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে শুদ্ধ কোরলে, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরলে সত্তাকে বোঝবার জন্য তাকে খণ্ড খণ্ড করবার দরকারও থাকে না। মনোবিজ্ঞানেও ত gestalt এসেছে, জীবতত্ত্বে sicence of organisation এসেছে, পদার্থ বিজ্ঞানেও entorpy প্রবেশ কোরছে। অবশ্য এগুলিও পরে বাচ্য হবে—প্রত্যেকে উপদেবতার আবার পুরোহিত প্রতিষ্ঠিত হবে—প্রত্যেক পুরোহিত আবার জ্ঞান বুদ্ধিতে বাধা দেবে। কিন্তু বিজ্ঞানে পৌরহিত্য কিম্বা ভূতের উপদ্রব ক্ষণস্থায়ী।

কেন আমি সহজে, প্রথমেই, না মাথা ঘামিয়ে কোন অসাধারণ অতিপ্রাকৃত, গুপ্ত, রহস্যময় যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ কোরব? ইংরাজী শিক্ষিত মিষ্টিক অবশ্য মাথা ঘামানোকে খারাপ কাজ বলেন না—অন্য মিষ্টিক বলেন কিন্তু। "বিশ্বাসে মিলিবে ইত্যাদি, তর্কে বহুদূর।" কিন্তু প্রায় সব মিষ্টিকই বলেন যে, সর্ব্ব সাধারণেরই মধ্যে এমন একটি ইন্দ্রিয় আছে যেটি লোচন খুললেই জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন থাকবে না—অতএব প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হচ্ছে জ্ঞানালোচনা করার চেয়ে তৃতীয় লোচন খোলার প্রয়াস করা। যদি এই নতুন ইন্দ্রিয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তা হ'লে প্রত্যেক মানুষের সংসার, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি অনুযায়ী এই ইন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ কোরবে। সেই বৈশিষ্ট্যের যা বিপদ তাই আবার ফিরে এল। যদি এই গুহ্য ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপারে সাধারণত্বের ছাপ থাকে তা হ'লে সেটি গুহ্য ইন্দ্রিয়ের বশে যে অভিজ্ঞতা জন্মায় তার সহজ গ্রহণীয়-তাতেই আছে। অর্থাৎ বোধির বৈশিষ্ট্য মানলে গুহ্য-ধর্ম্মের অভিজ্ঞতাকে সহজ ও সরল মনে হয়। তাকে বোঝবার জন্য নতুন কোরে খাটতে হয় না, তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন বিচার-বুদ্ধি অনুমোদিত প্রমাণের অপেক্ষা কোরতে হয় না। অপেক্ষা না কোরলেই সব সহজ মনে হয়। সবই যেন স্বতঃপ্রণোদিত এবং স্বতঃ-প্রমাণিত ঠেকে। আমি ধর্ম্ম কেন, কোন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই এই ধরণের সস্তায় কিস্তি সারা পছন্দ করি না।

যোগের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান শুনেছি একেবারেই অনুভূতি-সাপেক্ষ। আমি অনুভূতিকে অতি সন্দেহের চোখে দেখি।

এক কারণ এই যে, সকল স্ত্রীলোকদেরই অনুভূতি আছে; সকল স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি থাকে না। তাঁদের নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ যদি শিক্ষার দীক্ষার অভাব হয়, তা হ'লে তাঁদের না শিক্ষা দিয়ে আমরা ভালই কোরেছি বোলতে হবে—কেননা তাঁদের যখন সহজ অনুভূতি আছে তখন আর কিছুর দরকার নেই—শিক্ষার ফলে বরঞ্চ অনুভূতির এনামেল উঠে যেতে পারে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে আবার যাঁরা বুদ্ধিমতী তাঁরা অনেকেই কোন নৈর্ব্যক্তিক কাজে বুদ্ধিকে নিয়োজিত কোরতে পারেন না। তাঁদের অনুভূতি যদি থাকে, তাহ'লেও সে অনুভূতি কোন ব্যক্তিগত গুণসম্পর্কীয়। কিন্তু যোগের অনুভূতি যদি এই ধরণের হয়, তা হ'লে একটি মানুষ কিম্বা মানুষের মতন দেবতাকে গুরু কোরতে হয়। গুরুবাদ কিন্তু ধাতে সয় না এই বিপদ। এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি আমাদের একটি সত্য কথা বলবার সাহস থাকে। স্ত্রীলোকদের বাস্তবিক কোন অনুভূতি নেই—যদি থাকত তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারতেন যে তাঁদের অনুভূতিটি আমাদের দেওয়া সাড়ী, গহনা, গ্রামোফোনের মতনই উপহার মাত্র। তাঁদেরকে নিয়ে ঘর কোরতে হয়, তাঁদের দিয়ে কাজ করাতে হয়—নিতান্ত নিরীহ ও শান্তিময় উপায়ে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বুদ্ধিমতীদের আছে। তাই তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য, সংসার শান্তিময় করবার জন্য, তাঁদেরকে আমরা খোসামোদ করি। সেই জন্য তাঁদের একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় দিয়েছি, এবং তাঁদের বুঝিয়েছি—নানা উপায়ে—বিশেষতঃ কবিতা লিখে—যে, এই অনুভূতির মতন জিনিষ আর নেই—এটি বুদ্ধির চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম, ঢের কার্য্যকরী, বেশী সুনিশ্চিত—অতএব বুদ্ধি যদি কম থাকে—কিম্বা নাই থাকে—তা হ'লেও তাঁরা আমাদের প্রিয় বস্তু। স্ত্রীলোকদের সহজানুভূতি উপহার পাওয়ার অন্য উপায়ও আছে। এই ধরণের অনুভূতির সঙ্গে সত্য অনুভূতি যদি থাকেও তবে তার পার্থক্য কোথায় ধরা শক্ত। তর্ক উঠতে পারে যে, মেয়েদের অনুভূতি নেই বোলে mysticএর অনুভূতি নেই প্রমাণ হয় না। উত্তর এই—সমস্যা mysticএর কি আছে কি নেই—তা নয়, সমস্যা এই, প্রশ্ন এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি গুপ্ত ইন্দ্রিয় আছে কি নেই; মিষ্টিক বলেন আছে—আমার সন্দেহ—নেই। শুধু তাই নয়—আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সাধারণ স্ত্রীলোকদের যেমন কোন intuition নেই, সেটি আমাদের উপহার মাত্র, এবং যদি থাকে তার প্রভাবে ও তাড়নায় বিপথগামী হ'তে হয়, তেমনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর কথিত সহজানুভূতি আমাদের মন-ভোলান উপহার হ'তে পারে। সেই উপহার-সামগ্রীকে যাচাই কোরে নেওয়া পুরুষোচিত ব্যবহার। (সহজানুভূতি-বিশ্বাসী পুরুষ মেয়েদের তরফদারী কোরতে গিয়ে, আশা করি, নিজের পুরুষালী দাম্ভিকতা এবং মনের মেয়েলী গঠন দেখাবেন না।)

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তাড়নায় হাজার হাজার ভুলের মধ্যে হয়ত একটি সত্য বোঝা গেল। সে সত্যের মূল্যও আমাদের গ্রহণ ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। আমি Paul Valeryর Introduction to the Method of Leonardo Vinci থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। "Our revelations are only happenings of a certain kind and it is *still* necessary to interpret events which occur in the domain of knowledge...It is always necessary."

"Even the happiest of our intuitions are results that are *inexact*; *through excess* as *compared with our normal understanding, through deficiency* when considered in relation to the *infinity* of lesser things and particular cases which they seem to bring within our grasp. Our personal merit, which is what we strive after, consists less in submitting to them than in seizing them, and in seizing them less than in sifting them." আর্টেও intuition সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন। "The intuitive element, then, is far from giving their quality to works of art. Take away the artist's work and your intuition is *no more than a spiritual accident, lost among the statistics of the local life*

of the brain. Its true value does not arise from the *mystery of its orgin*, nor form the *supposed depths* out of which we *like to think* it has emerged, nor even from the *delighted surprise* it comes in ourselves; but because it meets our *wants* and, in short, because of the *considered use* to which we can put it, because, that is to say, of its *utility* to the whole personality." *Italics* অংশগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সহজানুভূতি সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হ'ল—তাই আমার নিজের কথাগুলি একত্রে সাজিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

আমি সাধারণ বিচারবুদ্ধির potentiality যথেষ্ট আছে স্বীকার করি। সেইজন্য অসাধারণ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব মানতে সহজে রাজি নই। তথাকথিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই বিচার বুদ্ধির মার্জ্জিত-সংস্করণ। বুদ্ধি যখন মার্জ্জিত হ'ল, তখনই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হয়। বুদ্ধি যখন পরিমার্জ্জিত হ'ল তখনকার অভিজ্ঞতাই সহজ, সরল, প্রত্যক্ষ মনে হয়; কিন্তু সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পূর্ব্বাবস্থা, ধারা, রীতি, নীতি মোটেই সোজা নয়, ন্যায়ের দ্বারা আবদ্ধ। মার্জ্জিত বুদ্ধি লব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য খুব বেশী, তবে অন্য ধরণের অভিজ্ঞতার মূল্য অপেক্ষা বেশী কি কম জানি না। অন্যান্য অভিজ্ঞতার জন্য যে ধরণের সতর্কতার প্রয়োজন এই অভিজ্ঞতার জন্য সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন কোরতে হবে। এতদিন প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে কত না আলোচনা হ'ল—কালকার মত আজ বাতিল হ'ল—পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের, জীবতত্ত্বের সম্পাদ্যগুলি পরিত্যক্ত হ'ল কিম্বা রূপান্তরিত হ'ল —কিন্তু এই mystic world ও mystic sense সম্বন্ধে অসভ্য অবস্থায় মানুষের মনে যা ভয়, যা ধোঁয়া ছিল তাই র'য়ে গেল। এখন আমাদের এই ভয় ও ধোঁয়া দূর করবার সময় এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নামে যে সব অতিরিক্ত দাবী করা হ'ত, আজ ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে mysticismএর নামে এই দাবী হয় অনুমোদন করেন,না হয় পেস্ করেন। কিন্তু আজ অনেক বৈজ্ঞানিক একমাত্র সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বিনয়ী হয়েছেন। বিনয় এতদূর গড়িয়েছে যতদূর যাওয়া হয়ত বুদ্ধির আদেশাতিরিক্ত। এই সব বৈষ্ণবী, যোগী বৈজ্ঞানিকের বিনয়োক্তি উদ্ধৃত কোরে আমাদের দেশের অন্ধকার-বিলাসী, গুহাবাসী স্বদেশভক্ত বৃদ্ধ ও যুবকের দল অত্যন্ত আত্মতৃপ্ত হ'য়ে উঠেছেন। তার চেয়ে ঐ বিদেশী বিনয়ী বৈজ্ঞানিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেদের বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে যাচিয়ে নিলে অনেক কাজ হ'ত।

মোদ্দা কথা এই—এমন অভিজ্ঞতা আছে যার উপলব্ধি একমাত্র মার্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের শাসন ভিন্নও বুদ্ধি মার্জ্জিত করা সম্ভব। সে মার্জ্জনা-পদ্ধতি খুব কঠোর হওয়া চাই। ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা না অর্জ্জন কোরলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার থেকে প্রমাণ হয় না যে,সেই অভিজ্ঞতাই একমাত্র সত্য, এবং সেই অভিজ্ঞতাই অন্য অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ করে—কিম্বা তার মূল্য নির্দ্ধারণ করে। মাথার ওপর টালার চৌবাচ্চার মতন একটা Libido, Universal spiritual life, ঐশী শক্তি, Selfish Ego, Group-mind, Over-soul, Mind-stuff মানতে হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি নল মনে কোরতে হয়। আমি কেবলমাত্র নল হ'তে গররাজী—তা ভগবানেরই হোক আর সমাজমনেরই হোক্। আমিই আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু। টালার কর্ত্তাদের হাতে আত্মসমর্পণ কোরতে হয়—নিকটে নদী নেই বোলে। কিন্তু মানুষের জীবন একটি স্রোতস্বিনী। নদী সমুদ্রে পড়ে, সমুদ্রের লোনা জলও বুকে টেনে নেয়। নদীতে জোয়ার ভাঁটা সবই আছে। নদীতে অবগাহন কোরলে পুণ্য হয়—কলতলায় নাইলে সত্যই জাত যায়। জীবনের বৈচিত্র্য মানলে সব বিজ্ঞানের, সব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে স্বীকার কোরতে হয়। বোধি যদি মার্জ্জিত বুদ্ধিই হয়, তা হ'লে অবশ্য তার প্রাধান্য মানলেই অন্য ইন্দ্রিয়কে অগ্রাহ্য করবার প্রয়োজন থাকে না।

এই সাধারণ বুদ্ধি, যেটি ব্যবহারিক্ জগতে খাটে, যার দ্বারা ভালমন্দ বিচার করা যায়, যার দ্বারা ভাল কবিতা, গান, ছবি উপভোগ করা যায়, যেটি বৈজ্ঞানিকরা খাটাতে

চান্, তাকে সম্প্রসারণ ও মার্জ্জিত কোরলে কোথায় গিয়ে পৌছান যায় লিওনার্ডোর জীবনে বেশ দেখা যায়। এই পরিমার্জ্জনকে পল ভ্যালেরি 'a process of perpetual exhaustion, of detachment without rest or exclusion from everything that comes before it whatever the thing may be' বোলেছেন। বুদ্ধির দ্বারা যেখানে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উপনীত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা কোরতে গিয়ে ভ্যালেরি এই সব ভাষা ব্যবহার কোরেছেন :—যেখানে "itself and X, both of them abstracted from everything, implicated in everything, implicating everything, equal and con-substantial"..."the point of pure being," যেখানে "there is no act of genius which would not be less than the art of being. He is the I" ইত্যাদি। এ অবস্থা কি কোন মিষ্টিকের বাঞ্ছিত অবস্থা হ'তে ভিন্ন? সকলেই জানেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারাই লিওনার্দো এই অবস্থায় এসেছিলেন।

এই লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন একদেশদর্শী মিষ্টিকের জীবন অপেক্ষা আমার কাছে বেশী মূল্যবান। এ জীবনে বিজ্ঞান আছে—সাধারণ বুদ্ধির স্ফুরণ আছে—অতিপ্রাকৃত mystic senseএর বদলে মার্জ্জিত বুদ্ধিলব্ধ নতুন অভিজ্ঞতা আছে—এবং এক কাম ভিন্ন (ফ্রয়েডের মতের বিপক্ষেই এ কথা লিখছি) অন্যান্য অভিজ্ঞতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে। 'এই আন্তরিক সাম্যের তিনি একটি "deep note of existence"এ যে-হাতে ঘা দিয়েছিলেন, সেই হাতে মনা লিসার ছবি, আমার বিস্তর কলকব্জার নক্সাও এঁকেছিলেন। তিনি সেই হাতে ঘোড়ার খুর পর্য্যন্ত বেঁকাতে পারতেন। তাঁর প্রতিভা সাধারণ বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরেই তাকে অতিক্রম কোরেছিল, এবং সাধারণের বোধগম্য উপায়ে বিকসিত হয়েছিল। লিওনার্দোর সব ছিল—ছিল না শুধু মনের আলস্য। তাঁর মন্ত্র ছিল Obstniate Rigour—এই মন্ত্র কয়জন mystic জপ করেন? আমার মতে সকলের এই মন্ত্র জপ করবার সময় এসেছে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে।

হয়ত আমার প্রবন্ধের নাম "যোগ-ধর্ম্মের যুক্তি" ঠিক নয়। Mysticism আর যোগ-ধর্ম্ম এক বস্তু না হ'তে পারে। কিন্তু এই প্রবন্ধে যদি কোথাও যোগ কথাটি উল্লেখ কোরে থাকি, তা হ'লে mysticismএর অর্থেই ব্যবহার কোরেছি। যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানি না—যা জানি তাও বই প'ড়ে। তাতে যোগীর মতে কিছুই জানা যায় না। আমার লেখার ভেতর যদি কোন শ্লেষ ও অশ্রদ্ধাসূচক ভাব ফুটে থাকে তাহ'লে সেটি আমার জনান্তিকে। প্রবন্ধটি লিখেছি কেবল আমার নিজের মত সাজাবার জন্য—এমন কি পরকে গালাগালি দেবার জন্যও নয়। আশা করি পাঠকবৃন্দ (আমার প্রবন্ধের কোন পাঠিকা নেই) আমার বক্তব্যটি শুনে আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা কোরবেন।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মানুষ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৭)

ত্যাগ ? কেন ? বুঝি নাক' কোন্ প্রয়োজনে।
যে করে করুক। আমি কিন্তু জানি মনে—
নিত্য নব অফুরন্ত সুধাভাণ্ড-মাঝে
নিবসি সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করি কিবা কাজে ?
ক্ষুধাতুর উপবাসী রাখি দেহ মন
বিশ্বের সমস্ত সুখে ফিরাব নয়ন ?
জানি না চিনি না কভু দেখিনি যাহারে
বিনা পরিচয়ে তাজি কেমনে তাহারে ?
তার চেয়ে কর ভোগ, সম্ভোগ প্রচুর,
পরিপূর্ণ পানপাত্র হাতে, করি দূর
সব বাধা অন্তরায়, কর সুরাপান
মত্ততা-বিবশ শ্রান্তি দিবে সত্যজ্ঞান।
ভোগ-সত্র মহোৎসব এই ধরণীর
ফেনায়িত এই মদ্য, এ শুধু ভোগীর।

(১৮)

অকৃতজ্ঞ তুমি নর, করিছ বর্জ্জন
সৃষ্টির এ শ্রেষ্ঠদান কামিনী-কাঞ্চন।
বাতুল কল্পনা তব, ব্যর্থ করি দিতে
চাহ এ বিশ্বের ধারা ? এই পৃথিবীতে
যার গর্ভ-রথে চড়ি তব আগমন,
যার অঙ্কে যার স্তন্যে প্রাণ-সঞ্জীবন,
তার কাছে তব ঋণ কিছু কিগো নাহ ?
সে ধার শুধিতে হবে, ভুলিও না ভাই।
মানুষের মাঝে আর রমণীর কাছে
দিন দিন এই ঋণ শুধু বাড়িয়াছে—
সব শোধ হবে শুধু সৃষ্টিতে তোমার,
হয় না তা' ত্যাগ কভু, ভোগে লীলা তার।
কাঞ্চন সৃষ্টির অস্থি মেদ মজ্জা বসা,
কামিনী—প্রাণ ও রূপ রাগ নিত্য-যোষা।

(১৯)

রুদ্ধ করি প্রাণ-বায়ু, বদ্ধ করি হাত,
বধির অন্ধ ও মূক হ'য়ে দিবারাত—
অস্বীকার করিবারে হবে সব ভোগ
তবে নাকি পাবে নর মোক্ষমুক্তি যোগ ?
চির নিশি দিন জলে অবগাহি র'বে
গায়ে না লাগিবে জল—কেমনে সম্ভবে ?
কামনার সার্থকতা মুক্তির পুলক
তোমার ত্যাগের মূলে সহস্র কীলক !
দাও, বন্ধু, ছাড়ি অশ্বে বল্গা তার খুলি,
ক্ষুরশব্দে প্রকম্পিয়া, উড়াইয়া ধূলি,
ছুটুক সে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্তান্তরে—
নির্বাধ মুক্তির হর্ষে মহানন্দ ভরে।
পরিপূর্ণ ভোগ বিশ্বে মুক্তির নিদান ;
ত্যাগে মুক্তি ? অসম্ভব, অলীক বিধান।

(২০)

ভয় ? কেন ? কারে ভয় ? কিসের বা ভয় ?
ভয়—ক্লৈব্য জাড্য আর দাসত্বের জয়।
দুর্ব্বলের সহচর, অক্ষমের সাথী,
বাঁধে সে যে পিছে নিত্য, দিনে করি রাতি।
লূতা-তন্তু-জাল সম দেহ বিস্তারিয়া
ভয় চায় বন্ধনের কবলে আনিয়া
সবলে মারিতে টিপে। শাস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে
নিষেধ সংহিতাবিধি বিবিধ বাধাতে
পথ রুধি মানুষের রয়েছে বন্ধন
রাষ্ট্রে ও সমাজে শত শত চিরন্তন ;
ছিঁড়ে ছুঁড়ে ছেড়ে ভেঙে বিভীষিকা সব
দাঁড়াও স্বাধীন মুক্ত গৌরবে মানব।
মানুষ বিশ্বের গর্ব্ব, তার এত ভয় ?
ভুলো না মানুষ তুমি অমর অক্ষয় !

জ্যোৎস্নালোকে

০
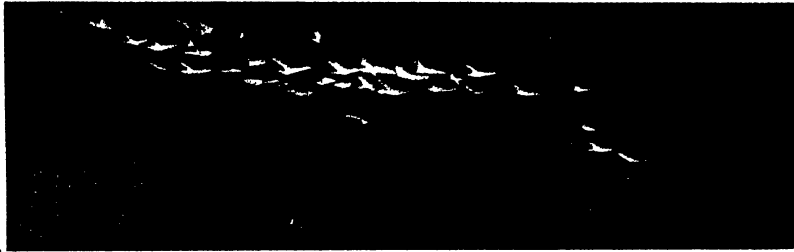
উজান টান

শূলপাণি

প্রণতি

শ্রীমনীষী দে

পদ্মা-বক্ষে

বার্ সহর
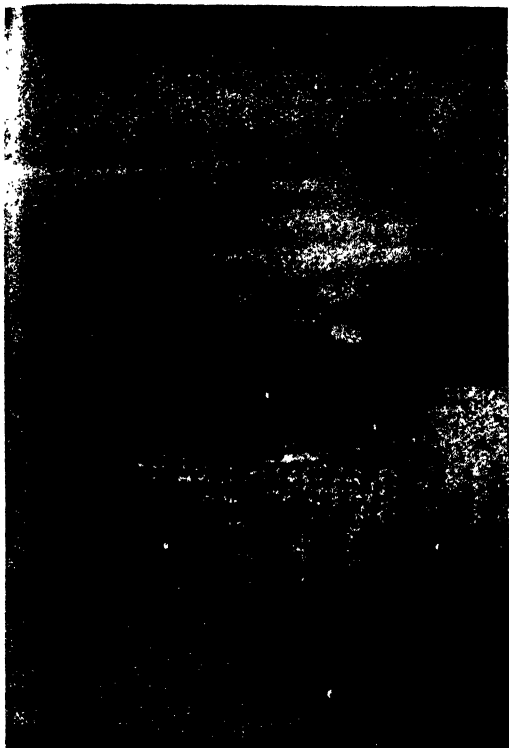
শ্রীমনীষী দে

জননী

শিল্পী শ্রীযুক্ত মনীষী দে

এ সংখ্যা বিচিত্রা-চিত্রশালার নয়টি চিত্রই প্রতিভাশালী শিল্পী শ্রীমান মনীষী দের অঙ্কিত।

বিচিত্রার নিয়মিত পাঠকবর্গের নিকট মনীষী বাবুর পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাঁহার অনেকগুলি চিত্রের রঙিন এবং এক-রঙা প্রতিলিপি সময়ে সময়ে বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, যেগুলির প্রত্যেকটি সাধারণে এবং মর্ম্মজ্ঞদের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। মনীষী বাবুর বয়স অল্প, সাধারণের নিকট পরিচয়ও তাঁহার অল্প দিনের কিন্তু এই অচির কালের কারবারেই তিনি বাঙ্‌লা দেশের শক্তিশালী তরুণ শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার উচ্চ স্তরের প্রতিভা এবং শিল্প-নৈপুণ্যের বলে তিনি সম্পূর্ণভাবে এই স্থান অধিকার করিবার যোগ্য।

শুধু কল্পনার লীলা-ক্ষেত্র লইয়াই ইঁহার কারবার নহে, commercial art-এর ফলদ প্রান্তরেও ইঁহার গতিবিধি আছে। অর্থাৎ গোলাপের চাষের অবসরকালে ইনি ধানের চাষও করিয়া থাকেন।

একথা বলিলে যদি অবিনয়ের অপরাধ না ঘটে তাহা হইলে এ কথা বলিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিতে পারি যে, প্রধানত বিচিত্রার মধ্য দিয়াই সাধারণের সহিত তাঁহার পরিচয় সাধিত হইয়াছে।

মনীষীবাবু উপস্থিত কিছুদিন ভারতবর্ষের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইয়া পরে জাপান যাইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শিল্প-সাধনার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রে হিউমার

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী এম-এ

বাংলায় লেখা হচ্চে প্রবন্ধ, কিন্তু সে প্রবন্ধের নামেই একটা ইংরেজী শব্দ দেখে আজকার ন্যাশন্যালজিমের দিনে যদি কেউ তেড়ে আসেন তো তাঁর কাছে নিজের দীনতা আমি অকপটে স্বীকার করব যে, হিউমারের বাংলা প্রতি-শব্দ আমি খুঁজে পাই নি। 'হাস্যরস' কথাটা আমার মনে অবশ্যি একবার জেগেছিল, কিন্তু তক্ষুনি মনে হল Humour বলতে ঠিক যা আমরা বুঝি, 'হাস্যরস' বলতে ঠিক তা বোঝায় না। হাস্যরস শুধু আমাদের সহজ বুদ্ধিকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঠোঁট চিরে হাসিই বার করে। Humourও হাসির রেখা ঠোঁটের কোণায় ফোটায় বটে, কিন্তু তার কারবার আমাদের অনুভূতি আর কল্পনা নিয়েই বেশী। হাস্যরসের বিনুনীর টানা আর পড়েন দুটোতেই হাসির মাল মস্‌লা, কিন্তু হিউমারের সূক্ষ্ম পর্দ্দা বুনতে টানায় যদি দেয়া হয় হাসি তো পড়েনে দিতে হয় অশ্রু। দুনিয়ায় আজগুবি অসমঞ্জস কিছু দেখলেই আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সেই অসামঞ্জস্যের চিত্র যখন আমাদের নানাবিধ অনুভূতিকে যুগপৎ নাড়া দিয়ে সক্রিয় ক'রে তোলে, তাই হয় তখন হিউমার। হাস্যরস যদি হয় শরতের রৌদ্র-করোজ্জ্বল প্রভাত, তো হিউমার হোলো এক পশ্‌লা বৃষ্টির পর রোদে-ছাওয়া সন্ধ্যা। হিউমারের ব্যঞ্জনা যদি অন্যকোনো বাংলা শব্দে না পাওয়া যায়, এবং ও শব্দটাকে চুরি করলে ইংরেজরা যখন আমাদের নামে মামলা করবে না, তখন ওটা ভাষার মধ্যে বেমালুম হজম ক'রে ফেল্লে এক জাতিপাত ছাড়া অন্য কোনো আশঙ্কার কারণ নেই।

হিউমারের সম্পর্কীয় বিচারে লেখকদের তিন ভাগে ভাগ করা চল্‌তে পারে। প্রথমতঃ হচ্চেন তাঁরা, যাঁরা জগতের যতই কেন গুরুতর ঘটনা হোক না তার পশ্চাতে একটু হাস্যরসের প্রক্ষেপ দেখ্‌তে পান। এ জাতীয় উচ্চশ্রেণীর আর্টিষ্ট বড় বেশি দেখা যায় না। আমরা সম্মানের জয়গান চিরকাল গেয়ে এসেছি। Shakespeare এর শঠ-চূড়ামণি Falstaff যখন বলচেন, "What is honour? a word. What is that word, 'honour'? air. Who hath it? He that died o' Wednesday. Doth he feel it?—No. Doth he hear it? No.... Therefore I'll none of it. Honour is a mere scutcheon and so ends my catechism." তখন আমরা এই জাতীয় আর্টিষ্টকে পাচ্চি। তার পর Falstaff গেলেন মারা। যে মানুষটি বেঁচে থাকতে মদ আর মেয়ে মানুষ, চুরি আর প্রবঞ্চনা নিয়েও আমাদের হাসাতে হাসাতে জীবন কাটিয়েচে তারই মৃত্যু সম্বন্ধে একজন নষ্ট চরিত্রা নারী —সেই Henry IV এর সরাইখানার hostess বলচে, "Nay, sure, he is not in hell: he's in Arthur's bosom, if ever man went to Arthur's bosom. A' made a finer end and went away an it had been any chirstom child...for after I saw him famble with the sheets and play with flowers and smile upon his fingers' ends and I knew there was but one way; for his nose was as sharp as a pen and a' babbled of green fields." প'ড়ে আমাদের হাসতে গিয়ে চোখের কোণায় জল আসে। ওষ্ঠপ্রান্তের সে হাসির রেখা মৃত্যুর বিভীষিকা কমিয়ে দেয় তো বটেই, আরো একটা দুঃসাধ্য সাধন করে। লম্পট-শিরোমণি Falstaff-এর জন্যও প্রাণে সহানুভূতি স্বতঃ-উৎসারিত হয়, মনে ভাবি "Judge not O that ye be judged."

দ্বিতীয় দলের রসিক হচ্চেন তাঁরা, যাঁরা জীবনের কতক ঘটনাকে হিউমারিষ্টের চক্ষে দেখতে পারেন, সবটাকে দেখেন না। দুনিয়ার অনেক ট্রাজেডি তাঁদের কাছে "too deep for tears।" আমাদের শরৎচন্দ্র তাঁদেরই একজন।

শরৎচন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে মীরাট সাহিত্য পরিষদে পঠিত। ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৬।

তৃতীয় দল হচ্চে যাঁরা শুষ্কং কাষ্ঠং। জোর ক'রে হাসতে গেলে তাঁদের মুখ লম্বা হয়ে যায়। তাঁরা জানেন শুধু গম্ভীর হয়ে উপদেষ্টার আসন অলঙ্কৃত করতে।

হাস্যরস ও করুণরস উভয়বিধ শিল্পের জন্যই আর্টিষ্টের তীক্ষ্ণ সজাগ অনুভূতি চাই। হাসি কান্না এক অনুভূতিরই দুইটা অভিব্যক্তি। একথা কিন্তু ঠিক যে, শরৎচন্দ্রের অনুভূতি মানব সমাজের দুঃখবেদনার জন্য বেশী ভাগই কেঁদেচে, যতনা তিনি হেসেচেন তার বোকামি আর অসামঞ্জস্য দেখে। আর যখনও তিনি হেসেচেন, সে হাসির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুর্গতি দেখে এক চক্ষু বক্র হাসি হেসেচে তো আর এক চক্ষু কেঁদেচে। বর্ম্মাগামী জাহাজের ডাক্তার বাবু একটু 'স্বদেশী'। কয়েকটি খালাসিকে এক ইংরেজ যুবক উত্তম মধ্যম দিতে তিনি তাদের হয়ে সাহেবের প্রতিবাদ করলেন। তারপর, "হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, "Look Doctor, there are your contrymen; you ought to be proud of them."

চাহিয়া দেখি কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া লোকগুলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। ডাক্তার লজ্জায় ক্ষোভে কালো হইলেন। অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাসচিস্ যে!"

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, "তুমি ডাক্তার বাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ্জ ক'রে হাসতেছি মোরা?"

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তার বাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, 'উঃ'।"

স্থানে স্থানে শরৎচন্দ্র সত্যদ্রষ্টার মত মানবমনের অন্তর্নিহিত তথ্যটি হিউমারের আলোকরশ্মিপাতে আবিষ্কার ক'রে ফেলেন। ইন্দ্রনাথ ডানপিঠে ছেলে। অন্ধকার রাত্রে শ্রীকান্তকে নিয়ে মাছ চুরির অভিযানে ছোট্ট ডিঙ্গিতে সে চলেছে। হঠাৎ জলে থম থম 'ছপাৎ' 'ছপাৎ' শব্দ শুনে শ্রীকান্ত শুধোলে, ও কি?

ইন্দ্রনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে জবাব দিলে, "কিছু না, সাপ।" তারপর শ্রীকান্তর ভয় দেখে সহজ স্বরে বল্লে, "আর কামড়ালেই বা কি করব, মরতে তো একদিন হবেই ভাই।" বস্তুটা কিছুই না মাত্র বিষধর সাপ, এবং অতটুকু ছেলের মুখে মরতে যে একদিন হবেই দার্শনিক ছাঁদে এ তথ্যের উক্তি, দুই-ই আমাদের হাসায়, এবং যুগপৎ অন্ধকার গৃহকোণে আলোক সম্পাতের মতো জানিয়েও দেয় বটে কি বস্তু দিয়ে ঐ কিশোরটির অন্তরখানি গড়া।

হাস্যরসের ভেতর দিয়ে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি যেমন শরৎ বাবুতে পাই, তেমনি স্বচ্ছ সাবলীল আনন্দ-প্রবাহের সৃষ্টিও তাঁর লেখায় যথেষ্ট দেখি। নন্দ মিস্ত্রীর রক্ষিতা—না, বরংচ এই বল্লেই ঠিক হবে টগরের রক্ষিত নন্দ মিস্ত্রী টগরকে পরিবার ব'লে পরিচয় দিতেই তেলে বেগুনে জ্বলে টগর বল্ছে, "জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, হলুম কৈবর্ত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারুর বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে তবু জাত জন্ম খোয়াবে না—তা জানো?"

এখানে তো তবু আমাদের সমাজের হাঁড়ি ও জাতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ওপর কটাক্ষ আছে, যদিও সে কটাক্ষে জ্বালা নেই। কিন্তু নিছক বল্বার মজাদার ভঙ্গীতে সময় সময় তিনি যে হাসির স্রোত বওয়ান তা কেবল শরৎ বাবুতেই সম্ভবে। বর্ম্মাযাত্রী জাহাজে ঐকতান সঙ্গীত সুরু হয়েচে। "কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত যত প্রকারের সুরব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে। এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা তাহা সেইখানে দাঁড়াইয়াই সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম।"

প্রহসনোচিত অবস্থা বিপর্য্যয় হেতু যে সস্তা হাসি, তা শরৎ-সাহিত্যে বড় দেখা যায় না। গিরিশ বাবুর প্রফুল্লের মধ্যে সেই বিয়ে পাগ্লা বুড়োর বিবাহ-বিভ্রাট নিয়ে যা হাসি তা নিছক তার অবস্থার অসঙ্গতি দেখে; অথবা খাসদখলের নায়িকার পুনর্বিবাহ হয় হয় এমন সময় তার স্বামীর পুন-

রূপস্থিতিকালে হাস্যরসের সৃষ্টিও situation-এর অদ্ভুতত্বে। এইরূপ স্থূল ফার্সের কতকটা আভাস দীনুভট্চাযের সন্দেশ ও মিহিদানা খাবার দৃশ্যে পাই। দু'খানা সন্দেশ ও মিহিদানা খেয়েও দিনু রমেশকে বলুচেন, "বল্লে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড় ভালো বাসি···" 'রমেশের কথাটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না।' কিন্তু এই farcical situationএর পর্দ্দার আড়ালে দীনু ভট্চাযের জন্য যে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হচ্ছিল তার পরিচয় আমরা পর পরিচ্ছেদে পাই। বর্ম্মা প্রবাসী 'ছোট বাবু' রংপুরে তামাক কেনবার অছিলায় বর্ম্মী স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে বাংলায় ফিরচেন, সেই সময়কার ষ্টেশন ঘাটের situation-টিও আংশিকত farcical হ'লেও তার নীচে ফল্গু-ধারার মতো যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার স্রোত ব'য়ে চলেছে তাতে ওই হাস্যরস প্রথম শ্রেণীর humourএ রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে।

বাক্‌চাতুর্য্য হেতু যে হাস্যরসের সৃষ্টি, যাকে আমরা wit বলি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যাতে সিদ্ধহস্ত, শরৎ চন্দ্রের আঁকা চরিত্রগুলি কথোপকথনকালে তাতেও কম কৃতিত্ব দেখায় নি। উদাহরণ স্বরূপ—দত্তায় বিজয়া ও নরেনের কথাবার্ত্তা, স্থানে স্থানে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কথা, দিবাকর কিরণময়ীর হাস্যপরিহাস-সরস কত কঠিন বিষয়ের আলোচনা যাতে ঐ পরিহাস সন্দেশের মধ্যে পেস্তাবাদামের দানার মতো মেঠাইঃ এর সুস্বাদ দশ গুণ বাড়িয়ে দিয়েচে।

যে হাসি হাস্‌তে গিয়ে আমাদের অন্তর যুগপৎ একটা অনির্দ্দেশ বিভীষিকা বা আশঙ্কায় ভ'রে যায়, ইংরাজীতে আমরা যাকে বলি 'grim humour', তেম্‌নি হাস্য রসের সৃষ্টি শরৎবাবুতে দুই এক স্থানে অল্পবিস্তর পাই বটে, কিন্তু বেশী পাই নে। ছিপের বাঁটের আঘাতে পারুর ললাট জখম হয়েচে। পার্ব্বতী মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে বল্লে, 'দেবদা, করলে কি!' শান্তস্বরে দেবদাস জবাব দেয়, 'বেশী কিছু নয়, সামান্য খানিকটা কেটে গেছে মাত্র'; আবার যাবার সময় মাত্র এই ব'লেই চ'লে যেতে চায়, "ছিঃ, অমন করে না পারু। শেষ বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম। অমন সোনার মুখ আর্সিতে মাঝে মাঝে দেখবে তো?" তারপর খড়্দিদিতে সুরেন্দ্র তার বড়দিদি মাধবীর নামেরই কত সম্মান দিচ্চে দেখে সুরেন্দ্রের স্ত্রী শান্তি একটু ঈর্ষায় পু'ড়ে বলে, "নামেতেই এই"! তারপর যখন শান্তি স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, ঠাকুর দেবতার শুধু নামও সে সম্মান করে, তখন সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর দেবতার নাম নাই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি যদি একটি কাজ করতে পার।"

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "কি কাজ?"

দেওয়ালের গায়ে সুরেন্দ্রনাথের একটা ছবি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ছবিটা যদি—"

"কি?"

"চারজন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীতীরে পোড়াতে পার।"

এই পরিহাস পড়তে পড়তে আমাদের অন্তর আতঙ্কে শিউরে ওঠে; যেন আভাস পাই সে দিনের আর বেশী দেরী নেই যেদিন সুরেন্দ্রনাথকে সত্যিই শান্তি শ্মশানে ব্রাহ্মণ দিয়ে পুড়িয়ে আস্‌বে।

অবশ্য ম্যাক্‌বেথে Knocking at the gatesএ, বা Hardy-র Jude the Obscureএ Sue-র বড় ছেলেটা যখন আর ভাইগুলাকে লট্‌কে মেরে নিজেও মাত্র সাত বছর বয়সে ফাঁসী লাগিয়ে মরবার সময় লিখে রেখে যায়, "Done because we are too menny", এর আঘাত আমাদের প্রায় মুহ্যমান করে ফেলে, এবং সে রকম shock শরৎ বাবু আমাদের দেন না। কিন্তু আমাদের এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় দেখেছি প্রায় সকল প্রকার হিউমারেরই সমাবেশ তাঁর লেখায় অল্পবিস্তর আছে; এবং প্রায় সব সময়ই আমরা দেখ্‌তে পাই যে, সাবলীল হাস্যধারার অন্তরালে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিদ্রব প্রাণখানি নিরন্তর উপক্রুত মানুষ, সমাজ ও তাঁর দেশবাসীর জন্য চোখের জল ফেলচে। আজ শরৎ চন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে তাঁর এই দরদী অন্তরকে নমস্কার জানাই। কামনা করি তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবী হোন।

শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী

শারদোৎসব

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী

১

প্রস্তাবনা

আগমনীর সুর লেগেছে
এবার গানে—
আমার গানে !
বাদল দিনের ঝঞ্ঝা টুটে
শরৎ এবার ফুটল ধানে !
এবার শুধুই আবাহনে
ঢেউ খেলে যায় শিউলি বনে,—
পদ্মদলের দোল পবনে
হাতছানি দেয় কাহার পানে !
এবার শুধু স্বাগত গান
হর্ষতরল শিশির-পাতে,
এবার শুধু আশার আলো
আমার মুক্ত জানালাতে ;
ঘোর রজনী ওই ঘুরে যায়,
পূব-গগনে গোলাপ সাজায় !
নহবতে কে ওই বাজায়
এবার সানাই তরুণ-তানে ?
আগমনীর সুর লেগেছে
এবার গানে—
আমার গানে !

এবার তরীর ফুলেচে পাল—
কী অনুকূল বইছে হাওয়া !
এবার ত আর হাল ছাড়া নয়—
নয়ত স্রোতের প্রসাদ চাওয়া ;

এবার শুধু শ্যামার শিষে
উমার আশীষ রইবে মিশে,
এবার তীরে ভিড়্‌বে তরী
সব আকুতির অবসানে !
আগমনীর সুর লেগেছে
এবার গানে—
আমার গানে !

২

শারদমেঘের গান

তোমাদের শারদমেলায়
তুলা-মেঘ রইনু দূরে—
নীলিমার রঙীন্ খেলায়
পবনের পরীর পুরে ;
ও বনের শিউলিগুলি !—
তোমাদের যাই নি ভুলি',—
দিতে জল ধাই আকুলি'—
গাহি গান রিক্ত সুরে।
শরতের প্রভাত-বেলায়
ফুটেছ পদ্মরাশি,—
চিরদিন এমনি হেলায়
ফুটে থাক্ মুখে হাসি !

তোমাদের সব বেদনা
মধুপে দেয় চেতনা ;
আমি দিই শিশিরকণা—
দরদীর নেত্র ঝুরে।
তোমাদের শারদমেলায়
তুলা-মেঘ রইনু দূরে !

বিজলীর বেগ যদি বয়
গোপনে হিয়ার পুরে,

পরাণে টান যদি রয়—
যে থাকে থাকৃনা দূরে!
তোমাদের এ উৎসবে
প্রীতি তার র'বেই র'বে—
গীতি তার স্মৃতির রবে
নাচাবে মন-ময়ূরে!
তোমাদের শারদমেলায়
তূলা-মেঘ রইমু দূরে!

৩

ভ্রমরের গান

মউবনে গুঞ্জন,—
চঞ্চল যৌবন,
ঊর্ম্মির কম্পনে
আমরাও উন্মন!

শিহরিত শিউলিতে
ঝর ঝর চৌদল,
ঘরে ফিরে কলসীতে
জল ভরে বউদল,
কন্‌কন্ বেজে ওঠে
ছলভরে কঙ্কণ!
আমরাও উন্মন!

সরসীর নীরে নীরে
কমলের সৌরভ,
সরসীর তীরে তীরে
ভামিনীর গৌরব,
কুঞ্চিত কেশদাম
শিথিলিত বন্ধন!
অলিকুল উন্মন!

ওই শোন মদকল
কলরব হংসের,
ওই হের ঝলমল
কর্ণাবতংসের,
এই লও অ-বাদল
পবনের চুম্বন!
আমরা ভ্রমরদল—
আমরাও উন্মন!

নদ নদী থই থই—
নির্ম্মল জলভার,
ভরা পালে তরী ওই
চলে বেগে আপনার,
অমলিন জ্যোৎস্নায়
স্নান করে ঝাউবন!
আমরাও উন্মন!

শরতের উৎসবে
চঞ্চল যৌবন,
আমরাও অলি সবে
তুলি সেথা গুঞ্জন,—
নৃত্যের মঞ্চের
অধিকারী খঞ্জন!
আমরাও উন্মন!

ভারতীয় যৌবন-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভিত্তি

শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী

পৃথিবীর পথ বাহিয়া যৌবন-রথ বিজয়যাত্রা করিয়াছে; দিকে দিকে মুক্তি-ভিখারী মানবাত্মা প্রশ্ন করিতেছে, "মুক্তি কোন পথে?" যৌবন আজ সে চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর দিবে। তাই বার্দ্ধক্য আজ যখন জীবনের সমস্যা-সংঘাতে ক্লিষ্ট, যৌবন তখন সে সমস্যাগুলিকে সত্য-দ্রষ্টার চোখ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। যুগবাণী আজ তাই যৌবনবাণী।

ভারতবর্ষেরও আত্মচৈতন্য আজ যৌবনের সাড়ায় জাগিতেছে। যুগান্ত-ব্যাপী পরবশতায় সৃজনী-চৈতন্য ব্যাহত হইয়া গিয়াছে, সত্য মিথ্যার পূজা উপচার হইয়াছে। জাতীয় জীবনের এ অন্ধকারের মধ্যে যৌবন আজ আলোর রেখা লইয়া উপস্থিত হইবে। ভারতের যৌবন আজ কর্ম্মবাদে দীক্ষা লইতেছে; চতুর্দ্দিকে এ কর্ম্মবাদের সাড়া; কিন্তু মনে হয়, এ প্রাণহীনের সাড়া নাস্তিক্য,—প্রাণবানের সাড়া চৈতন্য নয়। যৌবন-জীবনে আজ যে আগন্তুক শক্তি প্লাবন ঘটাইতেছে তাহা জীবনের অন্তরোদ্ভূত কর্ম্মবাদ নয়—এ বাইরের নাস্তিক্য-বাদের স্পন্দন। ইহা সৃজন করে না—বৈষম্য আনে। পাশ্চাত্য কর্ম্মবাদের এই যে বিকাশ, ইহা ভারতীয় জীবনের সূক্ষ্মধারার সহিত প্রাণ-শক্তির মিলন ঘটাইতে পারে নাই; সেই জন্য ভারতীয় যৌবন-আন্দোলনের জমার খাতায় শূন্য পড়িতেছে। এ যৌবন-আন্দোলনের পশ্চাতে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির অভাব, সৃজনী শক্তির অভাব, বোধ হয় বা খাঁটি কর্ম্মবাদেরও অভাব। তাই যৌবনের প্রাণ-শক্তির উৎস সন্ধান করিতে হইবে।

ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখি যে, যে আন্দোলন জাতীয় ইতিহাস ও সৃষ্টির মধ্য হইতে জীবনের রস সন্ধান করিতে পারে না মৃত্যু তাহার অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যের বস্তু-প্রাণ আমাদের ব্রাহ্মণ্য-প্রাণের সহিত খাপ খাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভা বাদ দিয়া বস্তু-প্রতিভাকে আদর্শের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছি। ফলে এ দুই বিরোধী আদর্শের সংঘাতে সৃজনী-চেতনা পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে যে, এ বস্তু-বিলাসের দিনে শুধু ভাব-বিলাসী হইলেই চলিবে না, কঠোর কর্ম্মবাদ ছাড়া পৃথিবীর কঠোরতর সংগ্রামে জয়-লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু সে কঠোর কর্ম্মবাদকে স্বকীয় সভ্যতা ও সৃষ্টির সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হইবে। পাশ্চাত্যের যাহা-কিছু নির্ব্বিচারে ভারতীয় হট্ট-মনে আমদানী করিলে চলিবে না;—তাহা কোলাহল সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সত্য বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না।

চতুর্দ্দিকের বিপর্য্যস্ত কোলাহলের মধ্যে যখন শুধু ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি ও টল্‌স্টয়ের নাম শুনি, মনে হয় ভারতের যৌবন আজ ইউরোপের ইতিহাস মন্থন করিয়া আপন আদর্শ খুঁজিতেছে। পিছনে তাকাইয়া স্বদেশের ইতিহাস আজ তাহার মানব-বাদের দুরপনেয় অহঙ্কার মিটাইতে পারিতেছে না। কর্ম্ম-শক্তি আজ আত্মস্থ নাই—তাই শুধু ব্যর্থতা ও বিরোধ।

১

ভারতের ইতিহাসে কি যৌবন-শক্তির স্থান নাই? যুবক-শক্তি ভারত ইতিহাসে যেরূপ স্রষ্টার ও দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কোন ইতিহাসে সেরূপ করে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে যৌবন শুধু হয়তো কর্ম্মীরূপেই দেখা দিয়াছে, কিন্তু ভারত-ইতিহাসে যৌবন একধারে কর্ম্মী, সত্যদ্রষ্টা, বিদ্রোহী ও অহিংসাপন্থী প্রেমিক।

সুদূর বৈদিক যুগ হইতে বৈষ্ণবীয় যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে যুবক-শক্তির সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। অতীত ভারতের যুবক ভাববিলাসী, কর্ম্মকুণ্ঠ নয়; সে বীর্য্যবান ও কর্ম্মিষ্ঠ। বেদে যৌবন সৃজনী-শক্তির ও

পৌরুষের প্রতীক্। প্রাকৃতিক যাহা কিছু অপূর্ব্ব তাহাই বৈদিক যুগে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। সূর্য্য, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, মেঘ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল। ইন্দ্র বৈদিক যুগের যৌবন-শক্তির ও পৌরুষের প্রতীক্ দেবতা। তিনি আর্য্যজাতীয় পূজারিগণকে যুদ্ধে রক্ষা করিতেন ও যাহারা পূজা করে না তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেন। (১ম মণ্ডল, ১৩০; ৮ সূক্ত) বৈদিক সূক্তে আছে—"হে ইন্দ্র, রক্তবর্ণা এই পিশাচিগণকে বধ কর ও সিংহনাদ কর। এই সব রাক্ষসকে ধ্বংস কর।"

"হে ইন্দ্র, ঋষিগণ এখনও তোমার ক্ষমতার জয়গান করেন। তুমি যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য বহু দুরাচারের প্রাণ বধ করিয়াছ, যাহারা দেবতার পূজা করে না তুমি তাহাদের নগরগুলির ধ্বংস সাধন করিয়াছ।" (১ম মণ্ডল ১৭৪।৭।৮)

"অনু ও দ্রহ্যুর অধীন ৬৬৬৬৬ সংখ্যক সৈন্যগণ, যাহারা পশুলোভী ও রাজা সুদামের বিরোধী, তাহারা তোমা কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।"

ইন্দ্র পতিতের বন্ধু—বিপদেও তিনি কখনো তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাস-প্রবণতা হারাইতেন না। তাঁহার বন্ধু সুশ্রবা যখন ৬০৯৯ সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র শুধু রথচক্র লইয়াই শত্রু আক্রমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজা কাক্ষীবান এক যজ্ঞ করেন, সেখানে ইন্দ্র ও কাক্ষীবান সোমরস পান করিয়া মাতাল হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তখন যৌবনের ব্যাখ্যা করেন, "বয়স কিছুই নয়, মনই যৌবন আনে।" সরমা পনীশদের নিকট ইন্দ্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে বলিয়াছিল, "আমি ইন্দ্রের সংবাদ-বাহিকা, পৃথিবীতে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী কাহাকেও তো দেখি না, তিনি সর্ব্ববিজয়ী, নদীও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে না।" ইন্দ্র বৈদিক দেবতাদের মধ্যে দৃপ্ত ও পৌরুষশালী ছিলেন; আকাশ ও পৃথিবী শত্রু দমনের দণ্ড করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করেন। (৩য় মণ্ডল ১।৪৯) জন্মের পরেই বীর-শিশু মাতা অদিতির নিকট আহার চাহেন। মাতার বুকে সোমরস দেখিয়া মার দুধ পান করিবার পূর্ব্বেই সোমরস পান করেন। (৩য় ২।৩।৪৮)

ইন্দ্র যেরূপ পৌরুষের প্রতীক্, বরুণ সেইরূপ ন্যায় পরায়ণতার প্রতীক্। ঋক্ বেদের প্রথম মণ্ডল ২৪ সূক্তে পাই, "হে বরুন, শতসহস্র ভেষজরাশি তোমার, তোমার ন্যায়প্রবণতা অসীম হউক। অন্যায়কে দূর করিয়া আমাদিগকে কৃত পাপ হইতে রক্ষা কর।"

"হে বরুণ, আমরা মরণ-শীল জীব। যদিও আমরা দেবতার বিরুদ্ধে বহু পাপ করিয়াছি ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমাকে অবহেলা করিয়াছি—আমাদিগকে পাপের নিমিত্ত ধ্বংস করিও না।" (৭।৮৯)

অগ্নিও বৈদিক যুগে দেবতারূপে পূজিত হইতেন, কারণ অগ্নি ভিন্ন কোনরূপ যজ্ঞ সম্ভব হয় না। অগ্নিকে দেবতাগণের মধ্যে "যবিষ্ঠ" বলা হইত; কারণ অরণি ঘসিয়া প্রত্যেকবার নূতন করিয়া আগুন জ্বালাইতে হয়। এই জন্য আগুনের এক বৈদিক নাম "প্রমন্থ"। এই অগ্নির নিকট দেবতাগণ বীর্য্যবান ও তেজস্বী সন্তান প্রার্থনা করিতেন। ঋক্‌বেদের ৫ম মণ্ডল ২৩ সূক্তে শত্রুজয়ী সন্তান প্রার্থনা করা হইয়াছে। বেদের দেবতাগণ যেরূপ বীর্য্যবন্ত ও পৌরুষবন্ত ছিলেন তাঁহাদের প্রার্থনাও সেইরূপ তেজপূর্ণ ও দৃপ্ত ছিল। বৈদিক প্রার্থনায় যে সুস্পষ্ট দাবী ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রার্থনাগুলিকে এক অপূর্ব্ব শক্তি-সম্পদে দৃপ্ত করিয়াছে। দেবতার কাছে বৈদিক আর্য্যগণ দাবী করিবার ক্ষমতা রাখিত—তাই ভিখারী-সুলভ প্রবৃত্তি তাঁহাদের প্রার্থনাকে কোমল কান্তিময় করে নাই। বৈদিক প্রার্থনাতে বীরত্ব ও শূরত্ব যাচ্ঞা করা হইত; বরুণের নিকট বীরপুত্র প্রার্থনা করা হইয়াছে—"বিদধে সুবীরাঃ", (২।১২৮), আকাশের নিকট বলা হইয়াছে,—"দদাতু বীরং", "যতো বীরঃ কর্ম্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ"—এই বলিয়া অগ্নিকে বোধন করা হইয়াছে।

বৈদিক দেবতার ও তাঁহাদের প্রার্থনার সে যৌবন-দৃপ্তি ভারতীয় যুবক-শক্তিকে পথপ্রদর্শন করুক্।

বেদে যৌবন-শক্তিকে দৃপ্তি ও ওজ-সম্পদে প্রাণবান্ দেখিয়াছি; উপনিষদে ও ব্রাহ্মণে তাহার সে রূপ আর নাই। উপনিষদে ও ব্রাহ্মণে যৌবন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। সত্যের

জন্য উন্মুখ যৌবন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ হেলায় ত্যাগ করিয়াছে। মুক্তিভিখারী, সংসারত্যাগী ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী বৃদ্ধের নিকট উপনিষদের অমূল্য তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই; সত্যসন্ধানী যুবকের অপরূপ ত্যাগবৃত্তির নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যৌবন তাই শক্তিসম্পদে শুধু দৃপ্ত নয়, সত্য-সন্ধানেও আকুল। আর্য্য-দর্শনের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব কঠোপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারও শ্রোতা একমাত্র যুবক। রাজা ঔদ্দালকি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন, যে যাহা চায় রাজা মুঠি ভরিয়া তাহাই দিতেছেন। ছেলে নচিকেতাও রাজার সম্পত্তি, সে ধরিয়া পড়িল,—তাহাকেও দান করিতে হইবে। পিতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে যমকে দান করিলাম।" নচিকেতা যমের নিকট যাইয়া উপস্থিত। যম তখন বাড়ি ছিলেন না, তাই বালক তিন দিন উপবাস করিয়া যমের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। যম বাড়ি ফিরিয়া ব্রাহ্মণপুত্রকে উপবাসী দেখিয়া পাপক্ষালনের জন্য তাহার যে-কোনো প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বালক তিনটি বর প্রার্থনা করিল। প্রথমটি পিতার ক্রোধ উপশম করিবার জন্য, দ্বিতীয়টি অগ্নির তত্ত্ব জানিবার জন্য; তৃতীয় বর শুনিয়া যম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন—বালক জীবনের তত্ত্ব জানিতে চায়। যম অনেক চেষ্টা করিলেন, বলিলেন,—"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ, বহূন্ পশূন্, হস্তিহিরণ্যমশ্বান্ ভূর্ম্মেমহদায়তনং বৃণীষ, স্বয়ঞ্চ শারদোযাবদিচ্ছসি।" কিন্তু তত্ত্ব-পিপাসু তরুণ অবিচলিত ভাবে বলিল,—"ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যোঃ"। বাধ্য হইয়া যম এ সত্যদ্রষ্টার নিকট [illegible]নের মহাতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিলেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও দেখিতে পাই যে ব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব তরুণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, কারণ সে তরুণ-চিত্তকে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বই বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল—পার্থিব তত্ত্ব নয়। সত্য জিজ্ঞাসু ভৃগু পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে চাহিল; বরুণ উত্তর দিলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" ভৃগু তপস্যা আরম্ভ করিয়া পরপর অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিল। তপস্যান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইল—"আনন্দং ব্রহ্মেতি। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" যাহারা মনে করেন তরুণের ধর্ম্ম সহজ ও সরস, সত্যের কঠোর-রূপ সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই, ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে তাহারা দেখিবেন যে, সত্যের রূপ বানপ্রস্থী বৃদ্ধের নিকট প্রথম উদ্ঘাটিত হয় নাই—হইয়াছে তরুণের অনুপম চিত্তের জিজ্ঞাসু-বৃত্তির নিকট। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তরুণের কর্ত্তব্যের স্বরূপ-বর্ণনা করা হইয়াছে,—"সত্যবাদী হও, কর্ত্তব্যপরায়ণ হও, বেদ অবহেলা করিও না। সত্য ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইও না।" শ্বেত যজুর্ব্বেদে (২২) সুন্দর আচার ব্যবহারের প্রশংসা করা হইয়াছে—"আমাদের যুবকগণের সুন্দর আচার হউক"—ইহাই তরুণের নিকট শ্বেতযজুর্ব্বেদের একটি বাণী।

২

বেদ উপনিষদের তটরেখা বাহিয়া অগ্রসর হইলেই যে ধর্ম্ম-বিপ্লব আমাদের চোখে পড়ে তাহার পশ্চাতে ছিল তরুণ-মনের সত্য-সন্ধানী ব্যাকুলতা। উপনিষদের সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণ মানুষের মনের পিপাসা মিটাইতে পারে নাই, তাই তরুণ গৌতমবুদ্ধ প্রাণের বাণী লইয়া ভারত-ইতিহাসে আবির্ভূত হইলেন। বেদ-উপনিষদের তত্ত্ব প্রাণের জগৎ ছাড়িয়া বাহিরের আচারের জগতে চলিয়া আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-শক্তি মানুষের স্বাভাবিক আত্ম-বিকাশ চেষ্টাকে বাধা দিয়া এক দুরপনেয় জাতি-বিভাগের সৃষ্টি করিল। "শাশ্বত" ও "অপৌরুষেয়" বেদকে ব্রাহ্মণগণ অপর জাতির নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিল। ধর্ম্মজগতের এই স্বাধিকার-প্রমত্ততার বিরুদ্ধে তাই বিদ্রোহ ঘনাইয়া আসিল। তরুণ বুদ্ধ সে বিপ্লবের বাহক হইয়া ভারতে এক গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। বিশবৎসর বয়সের সময় গৌতমবুদ্ধ রাজ-সংসারের পরিপূর্ণ ভোগ-সম্ভার ছাড়িয়া মুক্তির সন্ধানে বাহির হইলেন। কোনো ব্যক্তিগত দুঃখ, কোনো শোক

বা অভাব তাঁহার তরুণ-মনকে বাহিরের ডাকে সচকিত করে নাই। তিনি ভোগের মধ্যে থাকিয়া ত্যাগকেই শুধু বরণ করিয়া লইলেন। তরুণের এ নিস্পৃহ ত্যাগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধের জরাগ্রস্থ বৈরাগ্যের চেয়েও আধ্যাত্মিক সম্পদে গরীয়ান্। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবতার ধর্ম্ম—ইহার ব্যবহারিক নীতিবাদের ভিত্তি ছিল সার্ব্বজনীন ত্যাগধর্ম্ম ও অহিংসাবাদ। অন্তরজগতই ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্ম-ভূমি; তাহা যেমন সরল, তেমনি উদার; তাহার মধ্যে উপনিষদের কঠোর ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ছিল না, এই জন্যই সাধারণ-মনকে এই ধর্ম্মের সরল-চিন্তাপ্রণালী আবিষ্ট করিয়া তুলিল। তরুণ,বিপ্লবী বুদ্ধ তাই গণ-মনকে এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বন্ধনে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সামাজিক জীবনেও তরুণ বুদ্ধ সমতা আনয়ন করিয়া জাতিভেদের দুরূহ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিলেন। ভারতের যৌবন-শক্তিই তাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল। বশেথ সুত্ত, অশ্বলায়ন সুত্ত ও মহিম নিকায়ে বুদ্ধ একাধিকবার বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণকে যেরূপ শ্রদ্ধা করেন, বৌদ্ধ শ্রমণকেও তেমনি শ্রদ্ধা করেন; এবং ব্রাহ্মণকে যে শ্রদ্ধা করেন তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের জন্য নয়, তাঁহার শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য। বুদ্ধ কিরূপে নীচ ও পতিতের ত্রাতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা থেরগাথার একটি উপাখ্যানে আমরা পাই;—মালী সুনীতকে তিনি শ্রমণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহার সদাচারের জন্য।

বুদ্ধের এই গণ-ধর্ম্মের পশ্চাতে গণ-তন্ত্রের গঠন-ভঙ্গী ছিল ও এই গণ-তান্ত্রিকতা তাঁহার ধর্ম্ম ও সংঘকে পরিচালিত করিয়াছে। এই সংঘের মধ্যে শ্রমণ, ভিক্ষুনী, সাধারণ নর ও নারী যোগদান করিতে পারিত। বচ্ছগোত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ নিয়মকে প্রশংসা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, তাহার মধ্যে কোনরূপ জীবনের স্তর বিভাগ নাই। এই গণ-তান্ত্রিক গঠন-ভঙ্গী বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সময়ে আমরা লক্ষ্য করি, কারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে যখনই যে সংস্কারের প্রয়োজন হইত তখনই ধর্ম্ম সভা আহ্বান করিয়া সংস্কার সাধন করা হইত। চারিটি বিভিন্ন সভায় এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। চুল্ল ভগ্‌গ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই সভার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী গণ-তন্ত্র-সম্মত কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শুধু ধর্ম্মজগতেই নয়, রাষ্ট্রজগতেও তরুণ বুদ্ধ গণবাদের জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে "ষোলশ-মহাজন পদ" বুদ্ধের সময় উত্তর ভারতকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার মধ্যে লিচ্ছবী প্রভৃতি জাতি যে গণ-তন্ত্রী ছিল ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। মহা-পরিনির্ব্বাণ সুত্রে গৌতমবুদ্ধের মুখে আমরা যে বাণী পাইয়াছি তাহাতে লিচ্ছবিগণের রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আমরা জানিতে পারি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহাদিগকে "রাজশব্দোপজীবিনঃ" বলা হইয়াছে; অন্যত্র তাহাদিগকে "গণরাজনঃ" বলা হইয়াছে। ইহাদের বিচার-প্রণালীতেও যে গণ-তান্ত্রিক নিয়মপ্রণালী ছিল তাহা মনে হইলে বিজ্ঞান-সম্মত বর্ত্তমান বিচার-প্রণালীও অন্তঃসার শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানবতার জয় ঘোষণা করিবার জন্য এই যে গণ-ধর্ম্ম ও গণ-তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে যে তরুণ-মনের আদর্শ-প্রবণ কর্ম্মবাদ ছিল তাহা এই পরম মিথ্যাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছে যে, তরুণ কর্ম্মবিমুখ নয় ও তাহার সৃজনীশক্তি ভাবসম্পদে বার্দ্ধক্যকেও লজ্জা দিতে পারে। গৌতমবুদ্ধের মধ্যে বিপ্লবী-তরুণ স্রষ্টারূপে দেখা দিয়াছে।

৩

ভারতের বিসর্পিত-গতি ভাবধারাকে উজান বহাইয়া যিনি তাহার উপর ক্ষাত্র-ধর্ম্মের প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—আজ এ দুর্দ্দিনে সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম ভারতীয় তরুণ ভুলিয়া গিয়াছে। কর্ম্মবাদের প্রথম নীতি যিনি বৈরাগ্য ক্লিষ্ট পার্থের নিকট প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, আজ এ গর্জ্জমান জাতীয়-জীবনের দ্বন্দ্বকোলাহল ভেদ করিয়া সে বাণী আমাদের কানে পৌঁছায় না। কিন্তু ভারতের অসংখ্য দেবতার মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী মহামানব এক চির-তরুণ শ্রীকৃষ্ণ।[১]

[১] শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের জন্য শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকার" নিকট ঋণী।

বৈক্লব্যপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছেন। অর্জ্জুন যুদ্ধের হিংস্রতায় ক্লিষ্ট হইয়া অস্ত্রত্যাগ করেন নাই, তিনি যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল জ্ঞাতিনাশে শঙ্কিত হইয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ—"কর্ম্মে মানুষের অধিকার, ফলে নহে"—এই কর্ম্মবাদ প্রচার করিলেন। বৈষ্ণবী মায়ায় হৃতশক্তি অর্জ্জুনকে কর্ম্মের বাণী শুনাইয়া কৃষ্ণ বুঝাইলেন যে, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনার্থ সাংসারিক মায়া মমতার ভয় করা অনার্য্য বৃত্তি। সত্য যেখানে পাইতে হইবে সেখানে বন্ধন ভয় বিচার করিলে চলিবে না—কারণ ইহা মধ্যমভাব। স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণদান—উত্তম ভাব, কিন্তু ফলের ভয়ে ধর্ম্মত্যাগ—অধমভাব। সত্য ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে হইবে—ইহাই তরুণ শ্রীকৃষ্ণের বাণী। রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণ হইতেও চরিত্রের উৎকর্ষে আরও বিশাল। ভারতবর্ষে অসপত্ন রাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি যে ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"একধর্ম্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।" এই সার্ব্বভৌম রাজ্য স্থাপনের পথে কুরুবংশ ছিল তাঁহার প্রধান বাধা, সুতরাং সে বংশের ধ্বংস সাধনই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু যখন সে সার্ব্বভৌম রাজ্য স্থাপিত হইল তখন নিজ সখা অর্জ্জুনকে তিনি সিংহাসনে বসান নাই, ন্যায়বীর যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন দান করিয়া তিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শক্তি যদি শুধু মিত্রশক্তির সাহায্যের উপরই নির্ভর করে, তবে তাঁহার পতন অদূরবর্ত্তী; সুতরাং এক মহা বিপ্লব আনিয়া সমস্ত শত্রুগণের ক্ষমতাহরণ করিতে হইবে, ইহাই ছিল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কূট রাজনৈতিক চাল। এই জন্যই তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া একাধিকবার তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ভূরিশ্রবা, শিশুপাল ও যযাতি প্রভৃতি তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী ও অনাচারী বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিল। যে মহা বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছিলেন, তাহাকে সার্থক করিতে হইলে ভেদনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন; কিন্তু সেই বিপ্লবের সমস্ত শক্তি হৃত হয় যদি অর্জ্জুন অস্ত্রত্যাগ করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি হিংস্র যুদ্ধ-বৃত্তির পরিপোষক? "যুধ্যস্ব"—ইহা কি রক্তমোক্ষণ-প্রয়াসী ভৈরবের হিংস্র অনুজ্ঞা? শ্রীধরাচার্য্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। "যুধ্যস্ব" ইহা "নহি অত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে।" অর্জ্জুনের বৈক্লব্য দূর করিয়া তাহাকে আরব্ধ কার্য্য-সম্পাদনে প্রণোদিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কূটনীতি ও পার্থসখা রূপ পাশা পাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তরুণের নিকট সে পার্থসখা রূপই কান্ত ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে, এ সখ্যভাব কোনদিন তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কৃষ্ণ পার্থের নিকট পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকট; তিনি গোপীদিগকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন, দ্বারাবতীতে উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন—কিন্তু অর্জ্জুনকে তিনি কর্ম্মবাদে দীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সম-সাময়িক অনেকের সহিত কৃষ্ণ নানারূপে দেখা দিয়াছেন, কিন্তু পার্থসখা রূপে তাঁহার তরুণ জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য রূপময় হইয়া দেখা দিয়াছে, এবং তাঁহারই নিকট তিনি সত্যের দৃপ্তরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন; কারণ অর্জ্জুন,—"ভক্তোঽসি মে সখা।" ভক্তের মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে সখার মধ্যে তাহা নাই, সুতরাং কৃষ্ণ পার্থ-সখা, সখা বলিয়াই তিনি মধুর এবং মধুর বলিয়াই সে সখ্য তরুণের নিকট উপভোগ্য। এই তরুণ সখার মধ্যেও আবার কর্ম্মযোগীর গম্ভীর রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গীতায় সেই কর্ম্মবাদ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই তরুণ আজ গীতাকে জীবনবেদরূপে পাইয়াছে। তরুণ শুধু ভাবের পশারী নয়, কঠোর কর্ম্মব্রত তাহার জীবন-সত্ত্বাকে সৃষ্টি সম্পদে ও কার্য্যে মহিমময় করিয়া তোলে। তরুণ শ্রীকৃষ্ণ সে কর্ম্মের স্বরূপ শাশ্বত তরুণের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। শুধু কর্ম্মদ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়—ইহাই গীতোক্ত বাণী। সন্ন্যাসধর্ম্ম শুধু পার্থিব নানা শক্তির নিকট পরাজয়ই বুঝায়, ইহা বিজিতের মনোবৃত্তি—বিজেতার নয়। এই নিমিত্তই গীতায় সন্ন্যাসকে উচ্চস্থান না দিয়া নিছক কর্ম্মবাদকেই উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে ও নীতিমূলক মায়াবাদকে এড়াইয়া জীবনের বিকৃত সমস্যাগুলিকে সোজাভাবে জয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গীতার কর্ম্মবাদ তাই শক্তিবাদেরই নামান্তর।

গীতার মতে কর্ম্মের পরিণতি—নৈষ্কর্ম্ম্যে। যাহারা পৃথিবীর নানা সমস্যা সমাধান করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য একমাত্র কর্ম্মপথই সমস্ত সমস্যা মিটাইতে পারে। কৃষ্ণ মানুষের অসম্পূর্ণতা জানিতেন, তাহাদের উপর রিপুর অত্যাচারও বুঝিতেন, তাই বলিতেছেন, "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং।" কর্ম্মবাদ আর্য্যবৃত্তি, আর অর্জ্জুনের বৈক্লব্য "অনার্য্যজুষ্টম্"। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মবাদের লক্ষ্য ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাই ক্ষত্রিয়ের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য, কারণ, "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।" ২।৩১ "চেৎ ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি পাপমবাপ্স্যসি।" ধর্ম্মের জন্য, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্". ২।৩৭ তরুণ শুধু কর্ম্ম লইয়াই থাকিবে না, তাহাকে বুদ্ধিজীবীও হইতে হইবে। গীতায় আছে—"মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ।" অন্ধভাবে অন্যের গৃহীত মতগুলি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিলেই চলিবে না, বুদ্ধি দিয়া তাহাদের সত্যাসত্য ও প্রয়োজন-অপ্রয়োজনীয়তা বিচার করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ"—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য"; তাই বুদ্ধিবৃত্তি চালিত কর্ম্মবাদই শ্রীকৃষ্ণের বাণী। কথা হইতেছে দর্শনের সুক্ষ্ম তত্ত্ব বাদ দিয়া তরুণের নিকট কর্ম্ম কি? সুপ্ত মানবাত্মাকে যুগ সঞ্চিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ করানই কি কর্ম্ম? শ্রীকৃষ্ণ অনেক স্থলেই নানারূপে কর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি লোক-সেবাকে কর্ম্ম-সংজ্ঞা দিয়াছেন, আর তরুণ চিরদিনই সেবাধর্ম্মী। "লোক সংগ্রহম্" অর্থাৎ মানুষকে স্বধর্ম্মে উৎসাহিত করাও একপ্রকার কর্ম্ম, সর্ব্বভূতের সহিত সমত্ব-বোধ ও তাহাদের হিত-সাধনও এক প্রকার কর্ম্ম। একস্থলে তিনি নিজকে "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" (৫।২৯) বলিয়াছেন, নিজকে "সর্ব্বভূতস্থিতং" (৬।৩১) বলিয়া মানুষের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এই কঠোর কর্ম্মবাদের পশ্চাতে যে লীলা-চঞ্চল প্রেম-প্রবণ মানুষটি আছেন ভাগবতে তাহার প্রমাণ আমরা পাই। তরুণের যে চির-প্রেমিক মূর্ত্তি, কৃষ্ণের মধ্যে তাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; গীতায় ভগবানের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাগবতে মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা প্রকট হইয়াছে। বৃন্দাবনে তরুণ কৃষ্ণ অধ্যাত্ম গরিমায় গরীয়ান্, মথুরা ও দ্বারকায় তিনি মহান্; কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তিনি শুধুই মানুষ। কুরুক্ষেত্রে তিনি সখা, মথুরা ও দ্বারকায় তিনি শাসক, কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি চিরপ্রেমিক। প্রেমিক-রূপে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ভাগবতের পাঁচটি অধ্যায়ে—যেখানে তিনি রাসলীলা করিতেছেন। সেইখানে চির-যৌবনের আনন্দঘন রসমূর্ত্তি কৃষ্ণরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। গোপিগণ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে কারণ,

"অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।" জ্ঞানদাস

একাদশ বর্ষীয় কৃষ্ণ যখন মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বৃন্দাবনের গোপীগণ সেই সময়

"হে নাথ, হে রমানাথ, ব্রজনাথ আর্ত্তিনাশন।
মগ্নম্ উদ্ধার গোবিন্দ—"

বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। এই আত্মহারা প্রেমের প্রতিদানরূপে তরুণ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পারেন নাই; কারণ

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হইতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কিন্তু বৃন্দাবনের তরুণী গোপিকাগণ যখন কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্ত তখনও কৃষ্ণ তাহাদিগকে স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেন। "আমার নাম উচ্চারণই যথেষ্ট"—এই বলিয়া তিনি গোপীদিগকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাদের উদ্দাম প্রেম কৃষ্ণছাড়া কিছুই জানিত না, তাই গোপিকাগণের উদ্দাম প্রেমের নিকট তরুণ শ্রীকৃষ্ণের শান্ত সমাহিত প্রেম উজ্জ্বল ও মহৎ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিকরূপে, কর্ম্মযোগীরূপে, সখারূপে ও প্রেমিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের নব নব প্রতিভা নব নব বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে; সে বাণী যুগান্ত পরেও কালের উদ্বেল সিন্ধুপার হইয়া আমাদের মনোজগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে তরুণ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে মানব ও অতিমানব একীভূত হইয়া

গিয়াছে। কিন্তু সে যুগের আর একটি চরিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও মনে হয় যেন আমাদেরই সহিত একপ্রাণে আবদ্ধ।' ইহা শ্রীরাম চরিত্র। (১) রামচন্দ্র আমাদের আপনার, কারণ তাঁহার মধ্যে ভগবান অতিমানবীয় গুণ লইয়া রূপ পরিগ্রহ করেন নাই; তিনি দোষগুণমণ্ডিত মানুষ, কিন্তু সে ক্ষুদ্র দোষগুলিই তাঁহাকে সমগ্র মনুষ্য-জাতির সহিত এক সূক্ষ্ম মমত্বসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনিও তরুণ; তরুণের নিকট তিনিও মনুষ্যোচিত বাণী লইয়া আসিয়াছেন, অতিমানবীয় ধর্ম্মবাদ নয়। আদিকাণ্ডে বাল্মিকী যখন নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কাহাকে আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন?" নারদ উত্তর দিয়াছিলেন, "দেবতার মধ্যে জানিনা, কিন্তু যে নরচন্দ্রমার মধ্যে সে রূপ প্রকট তাঁহাকে জানি।" রামায়ণ সে নরচন্দ্রমারই কাহিনী। রামচন্দ্রে তরুণ বীর্য্যবান্ ও সমর্থবাহু; সে অনার্য্য জয় করিতে পারে, আবার বনে ইঙ্গুদীফল খাইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে। তিনি "মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশ" "মহাভুজঃ," তাঁহার "ভুজং পরিঘসঙ্কাশ।" তিনি "গূঢ়জত্রু" ও "সমঃসমবিভক্তাঙ্গ।" কিন্তু এ শূরোচিত দৈহিক সামর্থ্যের অন্তঃস্থলে যে প্রাণ তাহা আকাশের মত বিরাট,—সাগরের মত গভীর, কেহ কটু কথা কহিলে তিনি, "নোত্তরং প্রতিপদ্যতে," তিনি ক্ষমাশীল, "ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া।" পৌরজনের সহিত দেখা হইলেই তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করেন; ভবিষ্যৎ যৌবরাজ্যের লোভ তাঁহাকে অবিনয়ী করিতে পারে নাই। সাধারণ যুবক হইলে হয়তো অহঙ্কার তাঁহার মস্তককে আকাশস্পর্শী করিয়া তুলিত; কিন্তু তিনি আদর্শ পুরুষ, তাই তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চ মস্তিষ্ক বিনয়ে নমিত হইত,—গর্ব্বে নয়। ত্যাগশীলতায় তরুণ রামচন্দ্র মানবীয় ক্ষুদ্রত্বের বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তাঁহার অভিষেক-উৎসবে অযোধ্যা যখন হাস্যময়ী, তখনি তাঁহাকে নিদারুণ বনবাসাজ্ঞা শুনিতে হইল। কিন্তু অতিমানব রামচন্দ্র তখন মানুষের ক্ষুদ্রত্বের সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন; অবিচলিত স্থৈর্য্যের সহিত বলিলেন, আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনগামী হইব।

তাঁহার বৈষ্ণবোচিত ত্যাগপ্রবৃত্তি বুঝিতে পারি তখনি যখন শুনি, "নাহমর্থপরো দেবী লোকমাবস্তুমুৎসহে," তখনি বুঝিতে পারি তাঁহার চিত্তের বিশালত্ব যখন কৈকেয়ীর পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনি, "উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম।" তাঁহার সাগরোচিত গাম্ভীর্য্য শত বিপদেও অটুট থাকিত, একটি কটু-ভাষণও সে চিত্ত-স্থৈর্য্য টলাইতে পারে নাই। সামাজিক সমতা সাধনেও যুবক রামচন্দ্র তরুণোচিত উদারতা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। অনার্য্য বানর জাতি তাঁহার মিত্র, সে মিত্রতা কখনো সামাজিক পদগরিমায় বা রাজোচিত অহমিকায় ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যখন সুগ্রীব কম্পিত কণ্ঠে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, রামচন্দ্র তখন হস্ত বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন, "সংপ্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা।" তেমনি করিয়া অনার্য্য গুহকচণ্ডাল ও হনুমান তাঁহার বন্ধুপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। এমনি করিয়া ভারত ইতিহাসে তরুণ জাতিধর্ম্মের বৈষম্য ভাঙ্গিয়া মানবতার ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

৪

বৌদ্ধ এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের পর আবার ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লব সুরু হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইহার সংঘধর্ম্ম ক্রমশঃ নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। বাহিরের সভ্যতার সংঘাতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি নড়িয়া উঠিল। এদিকে শক, হুণ, দ্রাবিড় প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আপনাদিগকে মিশাইয়া ফেলিল, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে ভবিষ্য প্রয়োজন অনুযায়ী উদার করিয়া তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এই সমস্যা সমাধান করিল। বৌদ্ধ মহাযানীরা বুদ্ধকে ভগবান রূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, নব্য হিন্দুরাও তেমনি অবতার-বাদ দ্বারা ভগবানের নানা রূপ বাহির করিয়া দেখিল। যখন এই রূপ নাস্তিক্যবুদ্ধি হিন্দুধর্ম্মের টুঁটি চাপিয়া ধরিবার

(১) ডাঃ দীনেশচন্দ্রের "রামায়ণী কথা" দ্রষ্টব্য।

উপক্রম করিল তখনই মীমাংসা-বাদের আরম্ভ। সাংখ্যের নিষ্ক্রিয়বাদ ও মরণোন্মুখ বুদ্ধধর্ম্ম—কিছুই হিন্দুমনকে সঞ্জীবিত করিতে পারিল না। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক বীরাচার, কুলাচার প্রভৃতি মত এবং অঘোরপন্থী ও কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে নানারূপ বীভৎস অনাদরের সৃষ্টি করিল। নব্য হিন্দুধর্ম্মও এদিকে নানারূপ কর্ম্মকাণ্ডে জড়িত হইয়া জড়ত্ব পাইতে লাগিল। এ বিরাট ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় সমাজ ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আবার তরুণের জয়যাত্রা সুরু হইল। আজ বার্দ্ধক্যভারাবনত গতানুগতিকপন্থী নয়, তরুণ শঙ্করাচার্য্য এ বিপ্লবের বিষ গলাধঃকরণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন ও কঠোর হস্তে এ সামাজিক বিপ্লব শাসন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তরুণ আবার যুগবাণীর উদ্গাতা হইয়া ইতিহাসে আবির্ভূত হইল। শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত মতে মোট বত্রিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিরাট হিন্দুধর্ম্মের সমগ্র-রূপ আয়ত্ত করিয়া দেখিলেন ও দেশ বিদেশে প্রখ্যাত-নামা পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিলেন। অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি করিয়া তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির একত্ব প্রমাণ করিলেন। ব্রহ্ম সমুদ্র—জীব বুদ্বুদ, ব্রহ্ম সমষ্টি—জীব ব্যষ্টি। কিন্তু অনন্তের অংশ যেরূপ অনন্ত—জীবও তাই অনন্ত। জীব মায়ায় অন্ধ বলিয়া নিজকে সসীম মনে করে, সে মায়ার অপসরণ হইলেই সে ব্রহ্মের চিদানন্দরূপে বিলীন হইয়া যাইবে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের এক মহা অশুভ মুহূর্ত্তে তরুণ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ধ্বংসের মুখ হইতে হিন্দু-ধর্ম্মকে রক্ষা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের পরে সভ্যতার যে যুগ তাহা মুসলমান যুগ। সে যুগেও মরুসভ্যতা ও আরণ্যক সভ্যতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সমাধানের চেষ্টা ধর্ম্মাচার্য্যগণ করিয়াছেন এবং সেই প্রচেষ্টার মূলে ছিল ভগবানের একক সত্ত্বায় বিশ্বাস ও জাতিভেদ অস্বীকার। ইস্‌লামের সংস্রবে আসিয়া এই মতবাদ নানারূপে পল্লবিত হইয়া এই দুই প্রতিঘাতী সভ্যতাকে মিলনের ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে প্রয়াস পাইল। এই নবধর্ম্মের অন্যতম স্রষ্টারূপে আমরা পাই তরুণ শ্রীচৈতন্যকে—যিনি বাংলাকে এক ভাববিলাসী মনোবাদে দীক্ষিত করিয়াছেন। চৈতন্যের মধ্যে বাংলার শাশ্বত মূর্ত্তি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাংলার শ্যামায়মান রূপবিলাস, বাংলার নদ-নদীর সৃজনী-সম্পদ আর বাংলার আকাশে বাতাসে কবিকুলের অফুরন্ত গীত-লহরী—সব শ্রীচৈতন্যে এক অপূর্ব্ব ভাবমূর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে যৌবন সেই কাল সূচিত করে যখন চিত্ত মনকে ছাপাইয়া উঠে। নিজকে সর্ব্বতোভাবে বিলাইয়া দিয়া নিজকে রিক্ত করাই যৌবনের ধর্ম্ম। যৌবন যখন আপনাকে দান করে তখন সে বাহিরের কোন বাধা বন্ধন মানে না। এই ধীর অথচ পরমবিশ্বাসী আত্মদান বৈষ্ণব ধর্ম্মে নানারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির ভাষায় যৌবন—"পন্থ বিপন্থ না মানে।" শ্রীচৈতন্য তরুণ প্রেম-পশারী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন লীলাকে যথোচিত ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মধ্যলীলা অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পূর্ণ যৌবনের লীলাই সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্পদে গৌরবান্বিত। চব্বিশ বৎসর বয়সেই শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেম বিলাইতে আরম্ভ করেন,

"চব্বিশ বছরে ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ প্রেম নামে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

চৈতন্য জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে আচণ্ডালে প্রেমদান করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে তাঁহার বাণীর মধ্যে শুষ্ক দর্শন তত্ত্বের চুলচেরা বিচার বুদ্ধি ছিল না; প্রেমভক্তি রস দ্বারাই তিনি ভগবানের আবাহন উপদেশ দিতেন। সমগ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই প্রেমধর্ম্মই সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রেমধর্ম্ম ভারত ইতিহাসের নূতন কথা নয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে,

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হইতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

* * *

হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণ নামে প্রেম উপজয়ে॥"

অন্ত্যলীলাতে আমরা পাই,

"প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

অন্যত্র আমরা দেখি,

"প্রেমবিন্দু কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।"

* * * *

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হইয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রেমের ব্যাখ্যায় আছে,

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফল।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুল॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এমন স্থান কমই আছে যেখানে প্রেমের গুণ বর্ণনা করা হয় নাই। প্রেম যৌবনের ধর্ম্ম; আরাধ্যকে পাইবার জন্য তরুণ সেবক হইয়া দেখা দেয় নাই, সে প্রেমিকরূপে প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে। এই প্রেমধর্ম্মের জন্য চৈতন্য বেদ-বাদকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি মানুষের অন্তর-দ্বারে হানা দিতেন মধুরভাব লইয়া, কারণ "মধুরে সব ভাব সমাহার," এই জন্য মাধুর্য্য-রস-মণ্ডিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর নিকটেই মুক্তির বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শঙ্কর-পন্থী সন্ন্যাসিগণ যেরূপ নিজের মুক্তির জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন, শ্রীচৈতন্য তাহা করেন নাই, তিনি বিশ্বমানবের মুক্তি-ভিখারী, শুধু নিজের নয়। এই জন্যই তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, "বিলাইলা যারে তারে না করি বিচার"। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে যে শূদ্র রামানন্দ রায় চৈতন্যকে প্রণাম করিতে আসিয়া বলিলেন—

"মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ ভয়।
মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥" শ্রীচৈঃ চঃ

কিন্তু চৈতন্যদেব রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন,

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।
নমস্কার কৈল রায় প্রভু আলিঙ্গন॥ শ্রীচৈঃ চঃ

জাতি বিচার না করিয়া তিনি হরিদাসকেও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন;

"হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥" শ্রীচৈঃ চঃ

সনাতনের সহিতও তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে,—

"দূর হৈতে দণ্ড প্রণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধ ভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞে গেলা॥
সনাতন পাছে ভাজে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈলা আলিঙ্গন॥" শ্রীচৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণেতর জাতি দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন।

"ভক্তি তত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনে প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারায় নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারায় ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজের প্রেম রস লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের লীলা॥" শ্রীচৈঃ চঃ

আর এক স্থলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে,

"যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যেরূপ যুবক, ইহার প্রচারকগণ সবাই সেইরূপ যুবক। নিত্যানন্দ গোস্বামী গৌড়দেশে ও রূপ সনাতন বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবাস ও গদাধরও বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারে ইঁহাদের ন্যায় দিকে দিকে প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি অর্থাৎ "কৈশোর যৌবন দুহুঁ মিলি গেল"—এই কালকে বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। এই সময় শরীর এবং মন পার্থিব-পঙ্কে ক্লেদময় হইয়া উঠে না, এই সময়ে চিৎ-শক্তি মনকে চাপিয়া রাখে। বৈষ্ণব দর্শনে আছে ভগবান সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই বিভিন্ন রূপের সমন্বয়। ভগবান এই বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন শক্তির মধ্য দিয়া স্বপ্রকাশ। এই বিভিন্ন শক্তি-ভেদকে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বলা হইয়াছে। ভগবান আছেন এবং তজ্জন্য সৃষ্টিও আছে ইহা যে শক্তির প্রকাশ তাহা "সন্ধিনী" শক্তি, যে শক্তিতে অনন্ত জ্ঞান তাহা "সম্বিৎ", আর যে শক্তিতে ভগবান আনন্দময়, তাহাই "হ্লাদিনী শক্তি"।

আনন্দ তথা হ্লাদিনী শক্তি চিৎধর্ম্মের প্রকাশ এবং এই হ্লাদিনী শক্তিকেই বৈষ্ণবধর্ম্মে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত বয়স অপেক্ষা যৌবনই চিৎ সম্পদে ধনী এবং তাহার সে শক্তিকেই বৈষ্ণবদর্শনে আধ্যাত্মিক সম্পদ বড় করা হইয়াছে; বোধ হয় এই জন্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বাংলাকে অপূর্ব্ব ভাব-বিলাসে বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। চৈতন্যের মধ্যে কিন্তু শুধু ভাব-বিলাসই নাই, প্রয়োজন হইলে তিনি কঠোরও হইতে পারেন—ইহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, কাজী যখন চৈতন্যের শিষ্যগণের সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দেন, তিনি তখন রাগে অধীর হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

"ঘরে গিয়া সবলোক করে সঙ্কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন॥
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যা কালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তাঁহার নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করায় তিনি এরূপ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন যে,

"কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥"

চৈতন্য-চরিত্রের এই দৃঢ়তা ছোট হরিদাসের সহিত ব্যবহারেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাধবী দেবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়া ছোট হরিদাস "প্রকৃতি সম্ভাষণ" পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। শিষ্যগণ হরিদাসের জন্য বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেও তিনি অটল রহিলেন, কারণ "প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে।" শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ যৌবনের ধর্ম্ম, কারণ যুক্তিদ্বারা সে ধর্ম্মের অন্তর স্পর্শ করা যায় না। এইজন্য শ্রীচৈতন্য কখনও যুক্তিবাদ গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন নাই, সর্ব্বদাই প্রেম এবং বিশ্বাসবাদ প্রচার করিতেন। যুক্তিবাদ ও বিশ্লেষণ-প্রবণতা কখনও তরুণের ধর্ম্ম নহে, তরুণ বোঝে অটল বিশ্বাস; কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলিয়াছেন,

"বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ তর্কে হবে বিপরীত॥

হরিদাস গোপাল চক্রবর্ত্তীকে "তার তর্কনিষ্ঠ মন" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। এই বিশ্বাসপ্রবণতাই বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ধর্ম্মের প্রাণ। এইরূপে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে যৌবন-শক্তি নানারূপে দেখা দিয়াছে। তরুণের কর্ম্মকুণ্ঠ ভাব-বিলাস, আপনাকে বিলাইয়া দিবার প্রবৃত্তি, এবং সামাজিক এবং বাহ্য সমস্ত ভেদাভেদ দূর করিয়া এক অখণ্ড মিলনে মানুষকে একত্রীভূত করিবার চেষ্টা—সমস্তই পরিস্ফুটরূপে শ্রীচৈতন্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; সেই জন্য শ্রীচৈতন্য যৌবনের আদর্শ ও তাঁহার ভাব-বিলাস তরুণের ধর্ম্ম।

৫

বাহিরের সমস্ত কাজ-অকাজের মধ্যে ভারতের তরুণ আজ ঘরের পানে তাকাইতে পারিতেছে না। দৃষ্টি তার সাতসমুদ্রের পারে, তাই মহাসমুদ্রের ওপার হইতে বাহিরের ডাক আসিয়া পৌঁছিতেছে। আত্মস্থ "স্ব" আজ হারাইয়া ফেলিয়া পরের ভিক্ষা-ভূষণ টানিয়া ঐশ্বর্য্যের সমারোহ করিতেছি। দেশের কৃষ্টিকে না চিনিয়া সৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি; ভুলিয়া গিয়াছি দেশের সাধনা ও সভ্যতাকে না চিনিলে দেশের শুধু-মাটিকে ভালবাসা যায় না, তাই দেশের সাধনা হইতে মর্ম্মবাণী খুঁজিয়া লইতে হইবে। অতীতের পানে তাকাইতে হইবে--ভবিষ্যৎকে চিনিবার জন্য।

শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী

মধ্য-এশিয়ায় হিন্দু রাজত্ব

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
["হেমচন্দ্র বসু মল্লিক" অধ্যাপক, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্]
ও
শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী বি-এ

স্যর অরেল ষ্টাইন্‌এর Sandburied Ruins of Khotan প্রকাশিত হইলে আমরা জানিতে পারিলাম যে কত বড় সভ্যতা বালু-সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। তার পর যখন তাঁহার Ancient Khotan প্রকাশিত হইল—তখন দেখিলাম হিন্দু-ভারতের কতখানি গৌরব আমাদের অজ্ঞাত ছিল। বৃহত্তর ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের এই উপাদান রাশি এখনো ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় রহিয়াছে। গ্রীসের নগর সমূহের ক্ষুদ্রতম উপনিবেশের ইতিহাস আজও আমাদিগকে মুগ্ধ করে; ইজিয়ান সাগরের পর পারে উপনিবেশ, ইতালিতে উপনিবেশ—কত বিচিত্র ব্যাখ্যান কত বিচিত্র কাহিনী ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীনতম এই উপনিবেশের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট অজ্ঞাত; কত বড় দুর্ভাগ্য যে ভারতবাসী আজও ভারত-ইতিহাস উদ্ধারে তেমন ভাবে বদ্ধপরিকর হন নাই।

মধ্য-এশিয়ার একাংশে তাক লামাকান মরুভূমি; ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি পর্ব্বত শ্রেণী বেড়িয়া আছে; তাহারই মাঝে তারিম নদী। এ নদীর কোনো শেষ নাই; মহাসাগরে মিলিয়া সে তাহার সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই; এ নদী মরুপথে ধারা হারাইয়াছে। এই তারিম নদীই বহু মরুদ্যানের প্রাণ-স্বরূপ। খোটানও এককালে তারিমের জল-ধারায় পুষ্ট ছিল,—তাহারই জলে খোটানের সন্নিকটস্থ ক্ষেত্রে জল সেচন হইত। বৃষ্টি সে-দেশে নাই বলিলেই চলে,—তুষারগলা জলধারা তাহার নদীকে পূর্ণ করে, তাহার মরুদ্যানকে প্রাণবান করে।

খোটান একটি মরুদ্যান। চীন হইতে মধ্য-এশিয়া আসিতে যে-দুইটি পথ আছে—তাহার মাঝে মাঝে পড়ে এমনধারা অনেকগুলি মরুদ্যান। খোটানের চীনা নাম চু-স-তন-ন; সংস্কৃতে খোটানের নাম কুস্তন। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শব্দের অর্থও করিলেন ভাল—অর্থাৎ 'কু' বা পৃথিবীর স্তন; ব্যাখ্যা হইল চারিদিকের পাহাড় ও

গরুড়—মধ্য-এশিয়ার শিল্পীর পরিকল্পনা
প্রাচীর গাত্রের ছবি

ঢিবিগুলি স্তনের ন্যায়। চীনা নাম চু'-স-তন-ন সংস্কৃত কুস্তনেরই রূপান্তর। এ ছাড়া যু-থিএন, কু'তন নামও চীনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় খোটানকে লি-যুল বলে। 'যুল' অর্থ দেশ।

চীনা ইতিহাসের হান যুগে সম্রাট্ বু (খৃঃ পূঃ ৪০-৮৭) যখন রাজত্ব করিতেছিল—চীনের সহিত খোটানের রাজ-

দীপ লইয়া ভক্তিভরে পূজায় উপস্থিত। কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। প্রাচীর গাত্রে এই ছবিটি খুবই বড় ছিল। বেশ হিন্দু; মুখ চীনা।

নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন হয় সেই সময়ে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ ভারত আসিবার পথে খোটানে বাস করেন; সেই সময়ে তিনি ঐ দেশ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিব্বতী ইতিবৃত্ত হইতে আমরা খোটানের অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। তিব্বতী কিম্বদন্তী খোটানের ইতিহাসকে ভারত-ইতিহাসের সহিত যুক্ত করিয়াছে। উক্ত কিম্বদন্তী অনুসারে কুস্তন বা সলন মহারাজ অশোকের এক রাণীর পুত্র; তাঁহাকে নাকি বৈশ্রবণ চীন মহারাজের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান; এই কুমারই কালে খোটানের রাজা হন। তিব্বতীরা বলেন যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৩৪ বৎসর পরে; একেবারে নিখুঁত সন! হুয়েন্‌সাঙও প্রায় অনুরূপ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক খোটান বাস কালে স্থানীয় পুরাণাদি হইতে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি লিখিয়া গেছেন যে, মহারাজ অশোকের পত্নী তাঁহার প্রিয় পুত্র কুণালকে তক্ষশিলাবাসীদের সাহায্যে অন্ধ করিয়া দেন। সম্রাটের রাগ গিয়া পড়িল অধিবাসীদের উপর; সুতরাং নগরের বড় বড় বাসিন্দাকে তিনি নির্ব্বাসনে পাঠাইলেন। নির্ব্বাসিত লোকেরা খোটানের মরুস্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। সে-উপনিবেশ স্থাপন গ্রীক-উপনিবেশ গঠন হইতে কোনো অংশে হীন নহে; ভৌগোলিক দিক হইতে এই স্থান-নির্ব্বাচন ঔপনিবেশিকদের খুবই বুদ্ধির পরিচায়ক। কারণ যাহাই হৌক, খোটানে হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বসবাস করিতে সুরু করে; তাহার প্রমাণ খোটান ও তন্নিকটবর্ত্তী হিন্দু উপনিবেশ, যেখানে এককালে প্রাকৃত ভাষা ও খরোষ্ঠিলিপি প্রচলিত ছিল।

কাঠের আসন। এই অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

সে সম্বন্ধে গত প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। খোটানে বৈশ্রবণ বা কুবেরের আধিপত্য হিন্দু ভারতের প্রভাবের পরিচায়ক। হিমালয়ের প্রবাদগত এই দেবতা কেমন করিয়া খোটানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়।

আধুনিক চীনা ছবি। পুরাতন পাটায় আঁকা।

চীনা হান জাতির ইতিবৃত্তে আছে যে সম্রাট্ কুঙাং-বুর সময়ে (২৫-৫৭ খৃঃ অঃ) সো-চে বা ইয়রখণ্ডের রাজা খোটানের রাজা যু-লিকে পরাভূত করিয়া সামান্য রাজায় পরিণত করেন। ইতিহাসে মাত্র এই ঘটনাটি আছে। যু-লিন বা য়ি-উ-ল (কুস্তনের পুত্র) এই নাম দুটি না তিব্বতী, না চীনা; প্রকৃত পক্ষে ইহা খোটানী নামের বিকৃত চীনা উচ্চারণ। হানদিগের ইতিবৃত্তেই একস্থানে রহিয়াছে যে ৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে Hiu-mo-pa নামক এক খোটানবাসী সৈনাধ্যক্ষ বিদ্রোহী হইয়া নিজেকে খোটানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তদনুসারে তাঁহাকেই খোটান রাজ্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করা হয়। তিব্বতী ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, বিজয় সম্ভব তাঁহার পর রাজা হন। বিজয় সম্ভবের পর পরে পরে অনেক খোটানী রাজার নাম রহিয়াছে—প্রত্যেকেরই নামের সহিত 'সম্ভব' উপাধিটি যুক্ত। Sten Konow বলেন যে প্রথম খোটানী রাজার নাম খোটানি ভাষায় রহিয়াছে Hampho; সংস্কৃতে তাহার উচ্চারণ হয় 'সম্ভব'। তাঁহার মতে চীনা নাম Hiu-mo-pa খোটানী Hamphoরই রূপান্তর। অতএব 'সম্ভব' ও Hiu-mo-pa একই ব্যক্তি। খোটানের প্রথম রাজার উপাধিই ছিল 'সম্ভব'।

এই Hiu-mo-paর রাজত্বকালের পঞ্চমবর্ষে খোটানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। আর্য্য বৈরোচন হইলেন তথাকার গুরু; তিনি তথাকার অধিবাসীদিগের জন্য লিপি আবিষ্কার করেন। এই লিপি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হইবার পরেই তথাকার রাজদিগের নাম সংস্কৃত ধরণের হয়, বস্তুত সভ্যতার বিস্তার তখন হইতেই আরম্ভ হয়। বিজয় সম্ভবের পর এগার জন রাজা হন। অষ্টম রাজা বিজয় বীর্য্যের একজন ভারতীয় গুরু ছিলেন, তাঁহার নাম বুদ্ধ দূত। তাঁহার আদেশানুসারে একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। এই রাজা গোশৃঙ্গ পর্বতেও একটি

বিহার নির্মাণ করেন। পুণ্যেশ্বরী নামক এক চীনা রাজকুমারীকে ইনি বিবাহ করেন। (পুণ্যেশ্বরী নামটি চীনা নামের সংস্কৃত অনুবাদ)। এই রাজকুমারীই খোটানে চীনা রেশমের প্রচলন করেন।

রাজা বিজয় বীর্য্য ভারত হইতে ভিক্ষু সঙ্ঘঘোষকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইয়া তাঁহাকে তাঁহার কল্যাণমিত্র (মন্ত্রী) করিয়া লন। এই বিজয় বীর্য্য কয়েকটি চৈত্যও নির্মাণ করেন।

পরবর্ত্তী রাজাদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ তেমন কিছু পাওয়া যায় না; তবে এইটুকু জানা যায় যে তখন ক্রমাগত বাহির হইতে শত্রুগণের আক্রমণ চলিতেছিল। পশ্চিমা তুর্কীগণ যখন তখন আসিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল। বিজয়সংগ্রাম নামক রাজা ৬৩০ হইতে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তুর্কীদের সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দেন। বিজয়সংগ্রামের পর বিজয়সিংহ রাজা হন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি নিজ পুত্রকে চীনে পাঠাইয়া চীনের বশ্যতা
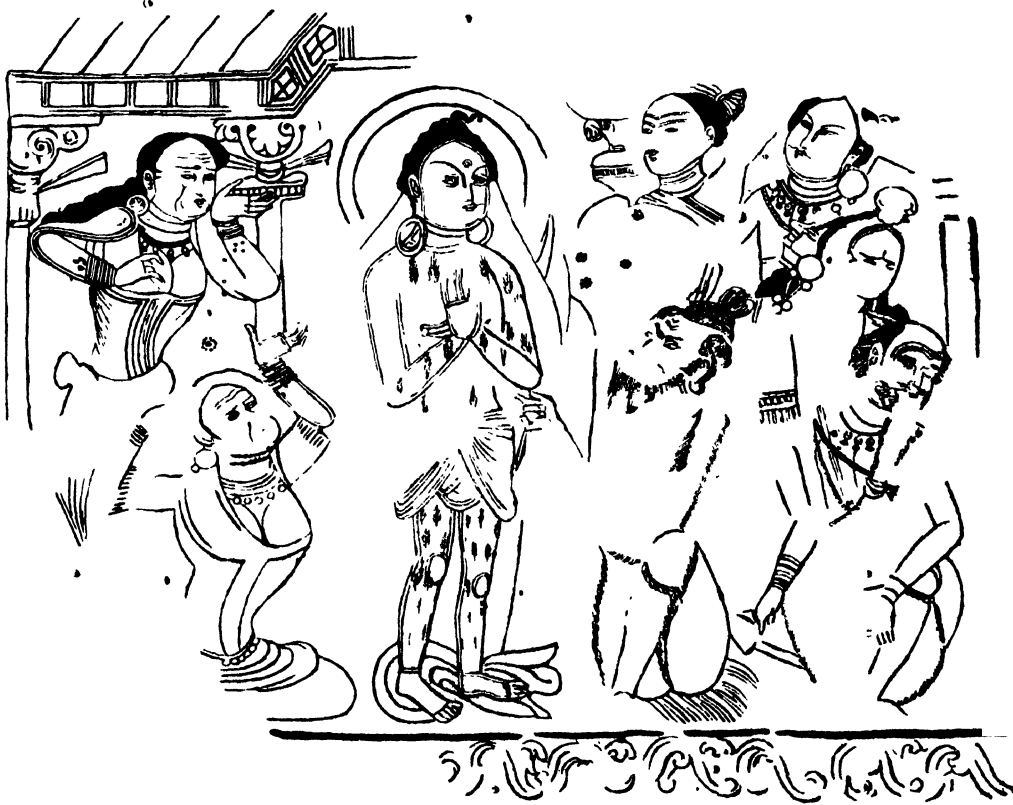
বোধিসত্ত্ব ও ব্রাহ্মণগণ। দাড়িওয়ালা ও মাথায় ঝুঁটি ব্রাহ্মণের ছবি। এরূপ একাধিক আছে।

এই রাজার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারতে যান; দ্বিতীয় পুত্র বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া ভারতে যাত্রা করেন। তৃতীয় পুত্রের নাম বিজয়ধর্ম, ইনিই পিতার পর রাজা হন। বিজয়বীর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন ভারত হইতে ফিরেন, তখন সানন্তসিদ্ধি নামক ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এই ভিক্ষু লি-য়ুলে সর্বাস্তিবাদ প্রচার করেন।

স্বীকার করিয়া লন। তখন হইতে খোটান চীনেরই অধীনস্থ দেশ বিশেষ বলিয়া গণ্য হয়। ইহার পরেও বিজয়সিংহ নিজে তাঙ সম্রাটের নিকট যাইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়া লন। সম্ভবত হুয়েন সাঙ্ ভারত হইতে ফিরিবার পথে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই রাজত্বকালে খোটানে যান।

বিজয়সিংহের পর আর তিনজন রাজার রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। তাহার পর

আর একটি মঠের দৃশ্য। পুঁথি রাখিবার আধারটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার।

বিজয় কীর্ত্তির রাজত্বকালে খোটান তিব্বতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তিব্বতীরা আজকাল এশিয়ার ইতিহাসে নগণ্য, তাহাদের মূঢ়তা প্রবাদগত, কিন্তু এককালে মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ইঁহাদের শক্তি বলে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হইত। তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মবল যে এককালে খুব প্রবল ছিল তাহার প্রমাণ মঙ্গল জাতির উপর তাহাদের প্রভাব। এই পার্বত্য জাতিকে রোধ করিতে পারে এমন শক্তি তখন কাহারও ছিল না। এশিয়ার ইতিহাস আমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া আমরা এই মহাদেশের ইতিহাস খুবই কম জানি। এই সময়ে যেমন তিব্বতীরা দক্ষিণে প্রবল ছিল তেমনি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তুর্কীরা উত্তরে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই তুর্কীরাও খোটান আক্রমণ করে। এই তুর্কীদের কথা আমরা পরে বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিব, কারণ প্রাচীন তুর্কী ভাষায় বিস্তর বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। খোটানের রাজা বিজয়সংগ্রাম চীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও সেখানেই মারা যান। তাঁর পুত্র বিজয়বিক্রম নাবালক; মন্ত্রী অ-ম-ল-কে-মেগ (অমর?) বার বৎসর রাজ্য-শাসন করেন। তাঁহার সময়ে খোটানে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ নির্মিত হয়। রাজার কল্যাণমিত্র অর্হৎ দেবেন্দ্রের জন্য বিশেষভাবে একটি বিহার নির্মিত হইয়াছিল; কল্যাণমিত্রেরা সাধারণত ভারতীয় হইতেন।

এদিকে খোটানের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে থাকে; স্তূপ ও বিহারের জন্য রাজা ও রাজমন্ত্রীরা যেরূপ ব্যয় করিতেন বোধ হয় রাজ্যরক্ষা ও শাসনের জন্য সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন বোধ করিতেন না। ফলে চীন ক্রমশই খোটানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল, এমন কি একদিন সে রাজাকে চীনা মন্ত্রী গ্রহণ করিতেও বাধ্য করিল। চীনা মন্ত্রীর কি ধর্ম ছিল জানি না তবে তিনি রাজা বিজয় ধর্মের ইচ্ছায় মৈত্রেয়ের নামে এক

নক্ষত্র

বিহার নির্মাণ করেন। বিজয়বোহন নামে রাজার নাম ইহার পরে পাই। ষ্টাইন খোটানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিশ-বহন নামে রাজার অনেক লেখা পাইয়াছিলেন।

খোটানে চীনা প্রভাব অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ছিল। তারপর ৭৯০ অব্দ হইতে তীব্বতীরা প্রবল হইয়া উঠিল; তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে এমন শক্তি তখন মধ্য-

নক্ষত্র

এশিয়ায় কাহারও ছিল না। লিয়ার নিকটস্থ সহরে ও এন্দ্রেতে বহু তিব্বতী লেখ পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় দেড় শত বৎসর তিব্বতীরা এইখানে প্রবল ছিল—কারণ এই সময়ে চীনা ইতিহাসে খোটানের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না।

চীনা সম্রাটের সভায় ৯৩৮ অব্দে খোটান হইতে প্রথম দূত আসে। দশম শতাব্দীতে খুব কম করিয়া দশবার খোটান হইতে দূত চীনের কাছে উপস্থিত হয়। এই দূত পাঠাইবার কারণ মুসলমান আক্রমণ। দশম শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধজগত ইসলামের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার মত আধ্যাত্মিকশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি উভয়ই হারাইয়াছিল। বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি অতি-প্রাকৃত কোনো ঐশ্বরিকশক্তি স্বীকার করেন নাই—কোনো ধর্ম্মগ্রন্থকে প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন নাই—কিন্তু কালে লোকে এক ঈশ্বরের স্থানে সহস্র
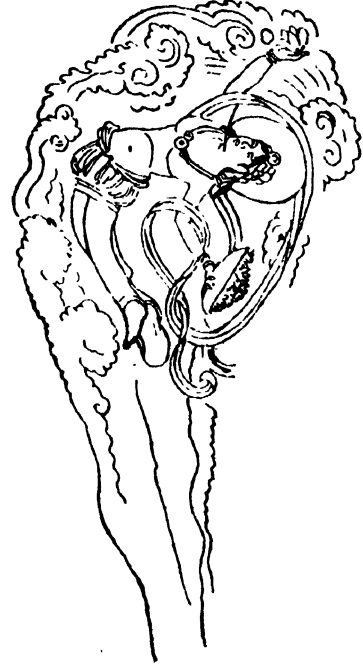
অপ্সরা

কোনো বৌদ্ধ দেবতা

বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দেবদেবী বসাইয়া মন্ত্রে তন্ত্রে ধর্ম্মকে গ্লানিতে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। কালে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম অত্যন্ত মূঢ় সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। সে মূঢ়তার অন্ত ছিল না। ধর্ম্মের মূঢ়তা রাষ্ট্রক্ষেত্রেও জাতিকে নপুংসক করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর যখন ইসলামের স্বচ্ছ নিরাভরণ ধর্ম্ম মধ্য-এশিয়ায় আসিল, তখন আবর্জ্জনাপূর্ণ ধর্ম্ম আপনা হইতে দূর হইল। তরবারির সাহায্যে কখনো কোনো ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। নিজের পাপভরে সে নিজেই

খোটানের অধিবাসীরা স্বভাবত ধার্মিক; এখন সেখানে বহু মসজিদ ও পীরের স্থান আছে। এই লোকেরা যখন বৌদ্ধ ছিল তখনো তাহারা রাজায় প্রজায় কেহই ধর্ম-কর্মে শৈথিল্য দেখায় নাই। খোটান ও খোটানের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার চৈত্য স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বহন করিতেছে। এই সব ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু-খোটান সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায়। খোটান ও তাহার চারিপার্শ্বে বড় বড় ৬৮টী, মাঝারি ৯৫টি, ছোট ১৪৮টি বিহার
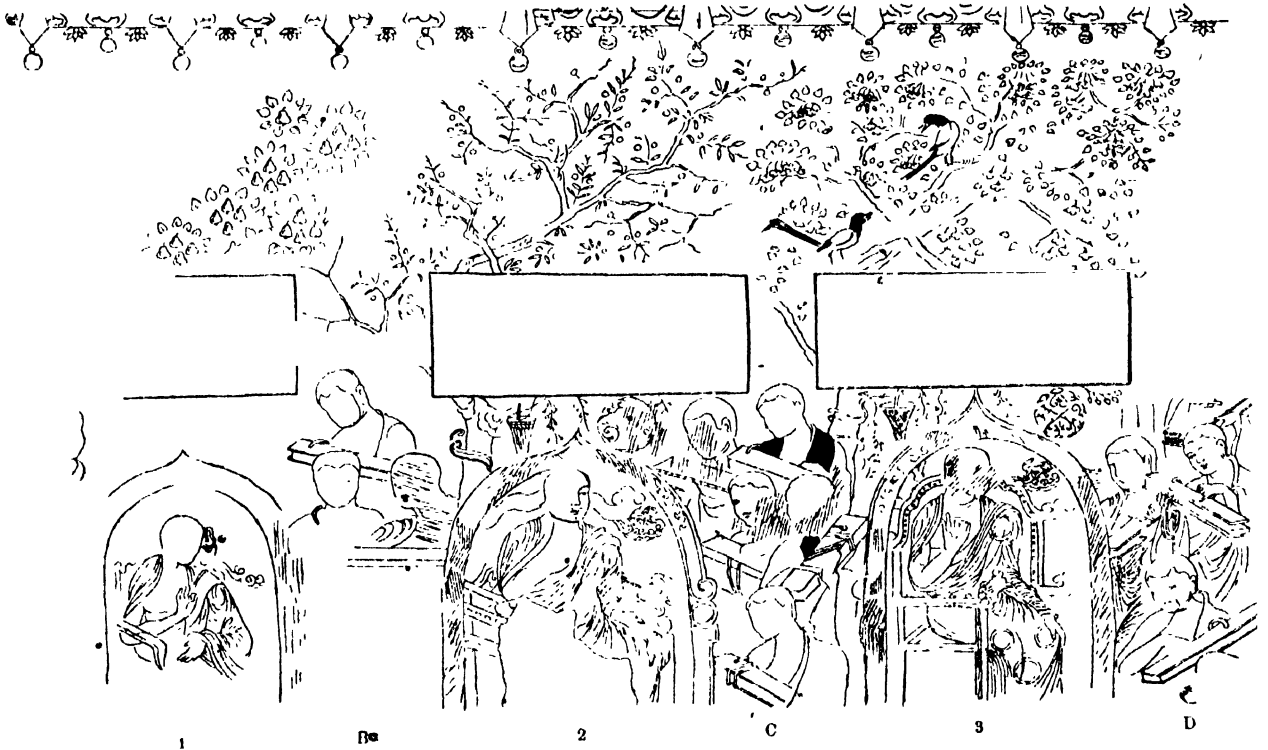
মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পাঠে রত। অধ্যাপকগণ চেয়ারে উপবিষ্ট। প্রাচীর গাত্রের ছবি।
মঠে পাঠরত ছাত্রদের একটি বিস্তৃত চিত্র।

ভাঙ্গিয়া পড়িল; মধ্য-এশিয়ায় বুদ্ধের ধর্ম্ম লোপ পাইল। হিন্দুসভ্যতা লুপ্ত হইল, সংস্কৃত ভাষা, ব্রাহ্মী লিপি সবই লোপ পাইল। তাহার স্থানে মহম্মদের ধর্ম আসিল, আরবী ভাষা, লিপি, সাহিত্য, সভ্যতা আসিল। দশমশতকের শেষ-দিকে হিন্দুসভ্যতা মধ্য-এশিয়ায় লুপ্ত হইল।

ছিল; অন্যান্য মন্দিরের সংখ্যা ৩৬৮৮। এক সময়ে খোটানের সঙ্ঘে দশ হাজার ভিক্ষু ভিক্ষুণী বাস করিত। ভারতবর্ষ হইতে অনেক অর্হৎ খোটানে গিয়াছিলেন; কয়েকজনের নাম আমরা করিয়াছি; রাজারা অনেক সময়ে তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে বিহার নির্মাণ করিয়াও

দিতেন। ভারতীয় অর্হৎগণের মধ্যে নারীও ছিলেন।

খোটানের ইতিহাসের প্রধান উপাদান তিব্বতী ও চীনা বই। তিব্বতী বইগুলি তেঞ্জুরের মধ্যে আছে; তিনখানি আছে ৯৪এর খণ্ডে। প্রথমখানির তিব্বতী নাম গ্র-ছোম-প গে-হুন-ফল-সী লুং তন-প অর্থাৎ অর্হৎ সঙ্ঘবর্দ্ধন ব্যাকরণ। বইখানি তেঞ্জুরের আট পাতা। দ্বিতীয়খানি লি-ফুল লুং তন-প অর্থাৎ লি-ফুল (খোটান) ব্যাকরণ। বইখানি মাত্র পুরাণের মত করিয়া বইগুলি লিখিত; খোটানে ধর্ম কিরূপভাবে লোপ পাইল, তাহার ইতিহাস ইহা হইতে পাওয়া যায়।

লি-ফুলের ইতিবৃত্ত বইখানি আর্য্য চন্দ্রগর্ভে ও দেবী অমলপ্রভার অনুরোধক্রমে লিখিত হয়। সঙ্ঘবর্দ্ধন ব্যাকরণ প্রথম বিজয়সম্ভব রাজার সময়ে লিখিত। ইহাতে আছে কেমন করিয়া ভারত হইতে আর্য্যেরা খোটানের রাজাদের দ্বারা আহূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, কেমন করিয়া

মধ্যএশিয়ায় হিন্দু জ্যোতিষ গিয়াছিল। প্রাচীর গাত্রে ২৭টি নক্ষত্র বিচিত্রভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নক্ষত্রদের এরূপ পরিকল্পনা আর কোথায় ত আছে বলিয়া জানি না।

ছয় পাতা। প্রথমের পরেই এই বইখানি তেঞ্জুরে আছে। তৃতীয় বই হইতেছে লি-ফুল লো-গ্যা-প বা খোটানের ইতিবৃত্ত; বইখানিতে আঠার পাতা আছে; তেঞ্জুরের এখানি তৃতীয় গ্রন্থ। এ ছাড়া গোশৃঙ্গ ব্যাকরণ নামে আর একখানি বইতে (তিব্বতী) খোটানের প্রধান গোশৃঙ্গ বিহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া খোটানের পুরাণ অনেকখানি বিবৃত হইয়াছে। উপরি উক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিব্বতী বই দুখানি পণ্ডিত-প্রবর টমাস্ (F. W. Thomas, formerly Librarian of the India Office.) অনুবাদ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বিহার মন্দির নির্ম্মিত হয় ও কিভাবে সঙ্ঘ প্রচারিত হয় ইত্যাদি। গোশৃঙ্গ ব্যাকরণ বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণীরূপে লিখিত; খোটানের বহু বিহার ও মূর্ত্তির ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়।

চীনা ইতিহাসে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসম্বন্ধে অনেক ইতিহাস লিখিত আছে। এই সব মালমশলা বিস্তর; তবে সেগুলি অধিকাংশই হইতেছে চীনের সহিত খোটানের সম্বন্ধের ইতিহাস। আবেল রেমুসা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান যুগে ষ্টাইনের আবিষ্ক্রিয়ার পর এ বিষয়ে পণ্ডিতদের

দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত খ্যাভান্ লেভি ও পেলিও এই ইতিহাস উদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য

নক্ষত্র

করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিত টমাসের নিকট সুধীজগত বিশেষভাবে ঋণী; নরওয়ের অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ষ্টেন কোনো (ইনি ১৯০৬ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন লেখ পাঠক ছিলেন; ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে আসেন।) খোটানের রাজাদের তারিখ ও তদ্দেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর অধ্যাপক লুডার্স লয়মান-এর নিকট খোটানের সাহিত্য বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। খোটানের সাহিত্যকে আমরা শক সাহিত্য বলিব, কারণ এখানকার অধিবাসীরা শকজাতীয়। এই শক সাহিত্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু সাহিত্য সম্ভূত; ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের ভাষা, ভারতের বিধি, ভারতের বিজ্ঞান খোটানবাসীদিগকে বহুশত বৎসর প্রাণ দিয়াছিল। তারপর যেদিন ভারতের চিত্তধারার নূতন চিন্তাস্রোত বন্ধ হইল--সেদিন হইতে সে বাহিরকে হারাইল—সেদিন সে অন্তরকেও বোধহয় হারাইয়াছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীসুধাময়ী দেবী

স্রোতের ফুল

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ওপারের ফুল লেগেছি গো এসে
এপারে তোমার কূলে,—
বিদেশী মালিনী, তুমি মোরে হেসে
লবেনা কি করে তুলে?
তোমার কানন-কুটীরের তলে
মধুমালতীর শত বীথি জ্বলে,
সন্ধ্যামালতী এসেছি যে ভেসে
গত রাতে ঝ'রে ভুলে!

যে মালা গাঁথিছ, পারো না আমায়
নিতে সে মালায় গেঁথে,—
রূপসী রাজার-ঝিয়ারী তোমায়
মন্দ কহিবে এতে?
স্রোতে-ভেসে-আসা, ফেন-বিমলিন,
ঝরা বাসি-ফুল,—তবু এত দীন?
প্রণয়-ব্যথায় রাঙা হিয়া—হায়,
তুমি পরো বেণী-মূলে!

প্রতিষ্ঠাহীন

—গল্প—

শ্রীমতী প্রভাবতী সরস্বতী

গ্রামের কবিরাজ, সোজা কথায় লোকে ডাকে "কবরেজ মশাই।"

কবিরাজ মশায়ের দেশ—অনেক দেশ অনেক নদ নদী পার হইয়া যাইতে হয় সেই খুব বড় নদী মেঘনার ধারে—এমনই একটা গ্রামে।

অনেক কাল হইতে কবিরাজ মশাই এ দেশে আছেন। লোকের নাড়ী টিপিয়া সহজেই রোগ ধরিতে পারেন, তাঁহার অগ্নিবর্দ্ধক বটি, কল্যাণ বটি, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ নাকি একেবারে অব্যর্থ।

কবিরাজ মহাশয় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত এই গ্রামের একটি লোক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংসারে আপনার বলিতে ছিল একটি মেয়ে, সে তাঁহার নিজের মেয়ে নয়। এখানকারই একটি নিঃসহায় পরিবারে মেয়েটি জন্ম লইয়াছিল, বিধবা মা মরিবার সময় আর কাহাকেও না পাইয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে তাহার ভার দিয়া গিয়াছিল।

মেয়েটিকে পাইয়া একদিক দিয়া বৃদ্ধ যেমন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন অপর দিকে তেমনি ভার বোধ করিতেছিলেন। চিরমুক্ত জীবনে এ যেন একটা বন্ধন, কোথাও গিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে একটা দিন কাটান মুস্কিল, মনে হয় বাড়ীতে মেয়েটা একলা আছে।

বাড়ী তো বাড়ী, একখানা খড়ের ঘর, বেড়ার দেয়াল তাহাতে মাটি লেপা। মেয়েটি আসার আগে ঘরখানি কবিরাজেরই ছিল, সে আসার পরে তাহাকে ঘর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে বারাণ্ডাটুকু আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

মুক্ত জীবনে প্রথমে এ বোঝা বড় দুঃসহ বলিয়াই ঠেকিত। সংসারের কাজগুলো কবিরাজের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। প্রথম আসিয়া মেয়েটি নীরবে দুইটি চোখ মেলিয়া বৃদ্ধের হাতের কাজগুলি দেখিয়া যাইত, কিন্তু ক্রমশঃ কবিরাজ যে কাজ করিতে যান তাহাতেই বাধা পড়িতে লাগিল।

প্রথম প্রথম দারুণ অস্বস্তি বোধ হইত। প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর ধরিয়া তিনি নিজের কাজ নিজেই করিয়া আসিয়াছেন, এই ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ তাঁহার সব অধিকার হরণ করিয়া বসিল। এখন সবই সহিয়া গিয়াছে। এখন মনে হয় রমা যদি না থাকে তাঁহার জীবনটাই ছন্নছাড়া হইয়া যাইবে। পরিষ্কার, ঝরঝরে ঘরের পানে উঠানের পানে তাকাইয়া নিজের আগেকার কথা মনে করিয়া তিনি লজ্জিত হইয়া উঠেন।

মেয়েটি বিধবা। পাঁচ বছর বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিল, সাত বছরেই বিধবা হয়। তাহার বয়স এখন পনের বৎসর হইলেও বাল্যের চপলতা তাহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাহার ঔৎসুক্যে, অস্থিরতায়, চাঞ্চল্যে কবিরাজ মহাশয় কখনও বিরক্ত, কখনও খুসি হন। তাঁহাকে যেমন বোঝা ভার, এই মেয়েটিকেও ঠিক তেমনি।

২

ভজহরি মণ্ডল আসিয়া ডাকিল, "কবরেজ মশাই—"

কবিরাজ তখন আফিংয়ের নেশার উপর তামাক টানিতে টানিতে ঝিমাইতেছিলেন। বাষট্টি বৎসরের গ্রীষ্ম শীত তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটু আফিংয়ের নেশা না করিলে দেহটাকে বহন করিতে পারা যায় না।

"কে, ভজহরি না কি?"

ভজহরি উত্তর দিল, "হ্যাঁ কর্ত্তা।"

কবিরাজ বারাণ্ডা হইতে নীচে নামিতে নামিতে বলিলেন, "রোদে চল ভজহরি, বেজায় শীত—নড়তে পারছি নে। এই তুমি এসে ডাকলে তাই, নচেৎ—"

উঠানের খানিকটা জায়গায় বেশ রৌদ্র ছিল, উভয়ে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একখানা তক্তা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া কবিরাজ বলিলেন, "বোস ভজহরি কোন কথাবার্ত্তা আছে বুঝি?"

ভজহরি শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "ছেলেটার অসুখ তো মোটে ছাড়ছেই না মশাই, ওষুধ খাওয়ানোরও তো বিরাম নেই।"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কবিরাজ বলিলেন, "এই তো পরশু মোটে জ্বর হয়েছে, তিন দিনেই কি জ্বর সারে মোড়ল? অনুপান কি ছিল বল তো?"

ভজহরি মনে করিয়া বলিল, "শিউলি পাতার রস মধু সকালে, দুপুরে পানের আর আদার রস—"

বাধা দিয়া কবিরাজ বলিলেন, "হয়েছে, মনে পড়েছে, তোমায় আর কিছু বলতে হবে না। দেখো দুদিনে জ্বর আপনি পালাবে। সাদা জ্বর বইতো নয়। ও আর দেখতে হবে না—যা ওষুধ দিয়েছি ওইতেই সারবে।"

ভজহরি একটু থামিয়া একটা ঢোক গিলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ওষুধটা বদলে দিলে হতো না কবরেজ মশাই?"

বিস্ময়ে দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কবিরাজ বলিলেন, "ওষুধ বদলে,—কেন বল দেখি? ও ওষুধগুলোয় বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

হাত কচলাইয়া নিরুপায়ভাবে ভজহরি আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তাই কি বলতে পারি কবরেজ মশাই, আপনার ওষুধ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী—যাকে বলে ডাকলে সাড়া দেয়, আপনার ওষুধ ঠিক তাই। তবে কেষ্টর মা বলছিল ব'লেই কথাটা ব'লে ফেললুম। কিছু মনে করবেন না যেন কবরেজ মশাই, চাষাভুষো মানুষ আমরা, বেফাঁসে অনেক কথা বেরিয়ে পড়ে।"

শান্ত হাসি হাসিয়া কবিরাজ বলিলেন, "আরে না না, আমি কি সে কথা ধরি, না বলি? আমি ও সব কিছু ধরি নে ভজহরি। আচ্ছা, ওই ওষুধই চালাও তো, তারপর কাল নাগাদ দেখব কি হয়?

ভজহরি চলিয়া গেল।

রমা ঘাট হইতে ফিরিয়া কাপড় দুখানা উঠানে বাঁশের উপর মেলিয়া দিতে দিতে বলিল, "বুঝলে বাবা, ঘাটে অনেক কথা শুনে এলুম।"

নিশ্চিন্তভাবে তামাক টানিতে টানিতে কবিরাজ বলিলেন, "ঘাটে পথে অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যায় রমা, সব কথায় কি কান দিতে গেলে চলে? বিশেষ করে তোদের মেয়ে জাতটা—"

রাগ করিয়া রমা বলিল, "ওই তো বাবা, ওরাই তো লাখো কথা শোনায়। বলে কি যে ওষুধে নাকি ফল দেয় না—কতকগুলো গাছ-গাছড়ার শেকড় আর পাতা, আর কিছু নেই। ও পাড়ার পদোপিসি কত কথাই না শুনোলে, আমার যেন কান্না পেতে লাগল।"

"ওষুধে ফল দেয় না, অ্যাঁ, তারা এ কথা বললে—?" বৃদ্ধ অবাক হইয়া রমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

রমা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "বললে তো বাবা। অনেকেই তার কথায় সায় দিয়ে গেল। বললে, তোমার ওষুধে আর ফল দেয় না, তুমি লোককে কতকগুলো যা'তা খেতে দাও।"

"তারা বললে আমার ওষুধে ফল দেয় না? সত্যি তারা একথা বললে?"

বৃদ্ধের প্রাণে বজ্রাঘাতের মতই ব্যথা বাজিয়াছিল। লোকে তাঁহার ঔষধের নিন্দা করিতেছে, স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছে তাঁহার ঔষধ কিছুই নহে, এ কথা কেমন করিয়া সহ্য হয়?

ও পাড়ার পদোকে তিনিই সম্প্রতি কঠিন ব্যাধি হইতে আরাম করিয়াছেন। এই তো সেদিনে পথে দেখা হইতে সে কত প্রকারেই না কৃতজ্ঞতা জানাইল, দশজনের সম্মুখে স্পষ্ট বলিল কবিরাজ মহাশয় না থাকিলে সে বাঁচিত না,—আজ সে সেই মুখে কেমন করিয়া বলিল কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ কিছুই না?

এই গ্রামের মধ্যে এমন কোন লোক নাই যে তাঁহার ঔষধ ব্যবহার না করিয়াছে, তাঁহাকে না কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। আজ তাহারা সে কথা ভুলিয়া গিয়া বলিবে তিনি কিছুই না, তাঁহার ঔষধে ফল দেয় না!

না, এ কথা সত্য নহে, রমা কি শুনিতে কি শুনিয়া আসিয়াছে। কিম্বা হয় তো উহাকে ক্ষেপাইবার জন্য উহারা একথা বলিয়াছে।

সরল বৃদ্ধের মনে এ চিন্তা জাগিতেই তিনি রমার পানে তাকাইয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝলি রমা, ওরা তোকে ক্ষেপাবার জন্যেই কথাগুলো বলেছে। পাগলি তুই তাই শুনে সত্যি ব'লে ভেবেছিস।"

কিন্তু রমা তথাপি গর্জ্জিতে লাগিল।

৩

হরিশ চক্রবর্ত্তীর ছেলে নলিনাক্ষ মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করিয়া গ্রামে আসিয়া বসিয়াছিল। সে একটি ডাক্তারখানা খুলিয়াছে, ঔষধপত্র দিবার জন্য কম্পাউণ্ডার আছে।

গ্রামের লোক অবাক্ হইয়া গেল। ডাক্তার নামটার সহিত তাহাদের পরিচয় থাকিলেও এ জীবটিকে তাহারা কখনও চোখে দেখে নাই। চারিদিককার গ্রামের লোকেরা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া এই তরুণ ডাক্তারটিকে দেখিতে লাগিল।

প্রথমত ডাক্তারের পোষাক পরিচ্ছদ অশিক্ষিত গ্রাম-বাসীর চোখে একেবারেই অভিনব। তাহার পর তাহার জ্বর দেখিবার যন্ত্র, বুক দেখিবার কল—সে একেবারে আশ্চর্য্য ব্যাপার। কলটা বগলে দিবা মাত্র জ্বর দেখা যায়, বৃথা একঘণ্টা নাড়ী টিপিবার দরকার হয় না। বুকে যাহাই হোক না—নল দিয়া সবই শোনা যায়।

এ সব আশ্চর্য্য নয় ত কি? জ্বর চিরকাল অনুমানেই বুঝা যাইত, এখন তা রূপ ধরিয়া চোখে ফুটিয়া ওঠে। বুকে যাই কেন থাক না, কান পাতিয়া তা শোনা যায়।

যাহারা একেবারেই অজ্ঞ তাহারা বুক দেখাইতে ভয় পায়; কি জানি, যদি কাহারো মনের কথা ডাক্তার জানিয়া ফেলে! বিচিত্র কি?

অচিরে ডাক্তার একটি ছোট খাট দেবতার মত হইয়া উঠিয়া পূজা পাইতে লাগিল। পথ দিয়া সে চলিলে পথে লোক নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করে।

সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য তাহার ঔষধ। যদিও ঔষধে তিক্ত, ঝাঁজ, কষায় সব রকম স্বাদই থাকে, তথাপি আশ্চর্য্য যে রোগী ভুগে না, দুদিনেই সারিয়া উঠে।

নলিন লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কুড়াইতে কুড়াইতে বৃদ্ধ কবিরাজকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না।

দেশের লোক নিরক্ষর হইলেও হৃদয়হীন নহে, ছোট লোকদের মধ্যেও যে জ্ঞানটুকু ছিল এই শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানের মধ্যে তাহা ছিল না। দেশের লোক সরল-প্রকৃতি বৃদ্ধ কবিরাজকে জানিতে দিল না যে, তাহারা নলিন ডাক্তারকে ডাকে, তাহার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হয়, কবিরাজের ঔষধ নর্দ্দামায় আশ্রয় লাভ করে। আরাম হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহারা ব্যক্ত করে কবিরাজ মহাশয় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, তাঁহার ঔষধ খাইয়াই তাহারা এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।

সরলপ্রাণ বৃদ্ধ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। বাড়া ফিরিয়াই রমাকে ডাকিয়া সে কথা শুনাইতেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন, "বুঝলি রমা, তুই যে বলিস আর কবিরাজি ক'রে দরকার নেই,—কিন্তু ওরা কি আমায় ছাড়বে রে? একটা দিন হাত গুটিয়ে বসি, দেখ ওদের মধ্যে কান্নাকাটি প'ড়ে যাবে।"

কিন্তু রমা সবই জানিত। লোকে যে এমন করিয়া এই সরলপ্রাণ বৃদ্ধকে প্রতারণা করে ইহাতে তাহার বুকে ব্যথা বাজিত বড় কম নয়; বৃদ্ধের আত্মপ্রশংসা শুনিতে শুনিতে তাহার দুটি চোখ আচম্‌কা জলে ভরিয়া উঠিত, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সরিয়া পড়িত।

সে দিন রমা আর কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই, তাই সে কবিরাজের মুখের উপরই বলিয়া দিয়াছিল উহারা কবিরাজি ঔষধকে এতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি করে না,

নেহাৎ কবিরাজের প্রাণে ব্যথা বাজিবে বলিয়াই তাহারা তাঁহাকে ডাকে, ঔষধও লয়।

সে দিন পথে চলিতে হঠাৎ নলিনাক্ষের সহিত কবিরাজের দেখা হইয়া গেল। নলিনাক্ষ পীতাম্বর দাসের বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল, সঙ্গে পীতাম্বরের ছেলে।

কবিরাজের হাতের রোগী, তাই তিনি না ডাকিতেই প্রতিদিন রোগী দেখিতে যান। পরীক্ষান্তে ঔষধের বাক্স খুলিয়া ঔষধ দিয়া অনুপান ঠিক করিয়া দেন।

নলিন ডাক্তার পীতাম্বরের বাড়ী হইতেই যে বাহির হইল সে দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না; তিনি পীতাম্বরের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে ফণে, তোর বাপ কেমন আছে রে? সেই যে ওষুধটা দিয়েছিলুম তাতে কাশি একটু নরম পড়েছে কি?"

ফণে সভয়ে সঙ্কোচে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, একটু নরম পড়েছে।"

উৎসাহিত হইয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "দেখলি, তখনই না বললুম—এই ওষুধ একমাত্রা পেটে পড়লে আধ-ঘণ্টার মধ্যে উপকার দেবে? আমার কথা ঠিক খাটল তো—দেখলি? ওকি যে-সে ওষুধ রে, তৈরী করতে পাক্কা সাতটি দিন দেরী পড়ে। যাক, ফল যে হয়েছে এই যথেষ্ট।"

উৎসাহে গর্ব্বে তাঁহার মুখখানা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নলিন ডাক্তার খানিক হাঁ করিয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিল; বলিল, "রেখে দিন মশাই আপনার ওষুধের গপ্প, কতকগুলো যা-তা খাইয়ে রোগীর পরমায়ু আপনারাই শেষ ক'রে দেন। ও ওষুধে যদি ফল হতো তাহ'লে আর ভাবনা থাকত না।"

কবিরাজ মহাশয়ের চোখ দুইটি ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল, এমনভাবে তাঁহার ঔষধের নিন্দা করিতে কেহই পারে নাই। উত্তেজনার আধিক্যে তিনি খানিকক্ষণ কথা বলিতে পারিলেন না।

ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ফণে তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, আপনি যান কবরেজ মশাই, বাবাকে একবার দেখে আসুন গিয়ে। চলুন ডাক্তার বাবু, বেলা হ'য়ে উঠল, এখানে অনর্থক আর দেরী ক'রে কি হবে?

মৃদু হাসিয়া নলিন ডাক্তার ফণের সহিত চলিয়া গেল। কবিরাজের সকল উৎসাহ আনন্দ যেন নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, চট করিয়া মনে হইল নলিন এইমাত্র পীতাম্বরের বাড়ী হইতেই বাহির হইয়াছে, সম্ভব সে পীতাম্বরকে দেখিতেই আসিয়াছিল।

একটি বালক আসিয়া ডাকিল, "জ্যেঠা আপনাকে ডাকছেন, ভেতরে চলুন।"

কবিরাজের মনে রমার কথা জাগিয়া উঠিল। রমা বলিয়াছিল, "ওরা ডাক্তারকেই দেখায় বাবা, তোমায় শুধু সং সাজাবার জন্যেই ডাকে; বিশ্বাস না হয় তুমি পরীক্ষা করো—দেখতে পাবে।"

শুষ্কমুখে কবিরাজ বলিলেন, "ওবেলা আসবো অখন তোর জ্যেঠাকে বলে দে গিয়ে।"

সে দিন আর রোগী দেখা হইল না, ঔষধের বাক্সটা বগলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কবিরাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

সত্যই কি দেশের লোকের কাছে তাঁহার দরকার মিটিয়া গিয়াছে?

৪

"কবরেজ মশাই—অ কবরেজ মশাই—" বাহির হইতে কালু মণ্ডলের আহ্বান আসিবা মাত্র কবিরাজ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। বিকৃত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিলেন, "মরিনি—চুলো ছেড়েও যাই নি, এখানেই আছি—কি দরকার?"

কালু মণ্ডল ভিতরে প্রবেশ করিল; তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিনয়ের সুরে বলিল, "আজ চারদিন ও পাড়া মুখে যান নি, ছেলেটা কেমন রইল সে খোঁজটাও নিলেন না—"

বাধা দিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "না গেলেই বা; তাতে ক্ষতি তোমাদের তো নেই বাপু, ক্ষতি আমারই। তবে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?"

অধিকতর বিনয়ের সঙ্গে কালুমণ্ডল বলিল, "আজ্ঞে আপনার হাতের রোগী—"

অধীর ভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া কবিরাজ বলিলেন, "আমার হাতের রোগী, না, নলিন ডাক্তারের হাতের রোগী?

দেখ,—মিছে কথা বলো না মোড়ল, ধর্ম্মে সইবে না। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, দিন রাত্তির হচ্ছে—”

অতিরিক্ত ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ কালু মণ্ডল কথাই বলিতে পারিল না। মনে মনে একটু সামলাইয়া লইয়া সে বলিতে গেল, “সে কথা ঠিক নয় কবিরাজ মশাই, সে দিন—”

বাধা দিয়া কবিরাজ বলিলেন, “আর কথা দিয়ে চিঁড়ে ভিজানোর দরকার নেই বাপু, সোজা পথ দেখ। আমাকেও একটা সোজা জবাব দিয়ে যাও যে, তোমরা এখন আর আমায় চাও না, এখন নলিন ডাক্তারকে চাও। সে চাইবারই কথা, আমি এখন বুড়ো হয়েছি, বয়েস তিন কুড়ি পার হ'য়ে গেছে, আমার ওষুধে কি একালের রোগ আরাম হ'তে পারে? ছিল বটে সে কাল,—যে কালে ডাক্তার এদেশে আসে নি, কবিরাজরাই নাড়ী টিপে রোগ চিনত। এখন ডাক্তার এসেছে, কত সব যন্ত্র এনেছে, রোগ সারুক না সারুক, খানিক রোগীকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই রোগীর যন্ত্রণা দূর হয়। দূর হোক মরুক গিয়ে, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি সোজা কথায় বলছি বাপু, তোমরা মর আর বাঁচ, আমায় আর পাচ্ছ না।”

কালু মণ্ডল আস্তে আস্তে বিদায় হইল।

৪

রমাকে ডাকিয়া শুষ্কমুখে জোর করিয়া একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া কবিরাজ বলিলেন, “ওকে বিদেয় ক'রে দিলুম রমা। হ্যাঁ, সত্যি বল দেখি, এ রকম জোচ্চুরী কখনও সহ্য হয়? ওষুধ খাবে একজনের, আর ডাক্‌তে আস্‌বে আমাকে? দেশের লোকগুলো কি রকম দেখেছিস রমা, ওই যাকে ব'লে মুখে মধু বুকে বিষ—ঠিক তাই। ঘুণাক্ষরে একটি দিন জানতে পারি নি ওরা তলে তলে এ রকম জোচ্চুরী করছে।”

তাঁহার সাদা চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে রমা বলিল, “আমার মোটেই সহ্য হয় না বাবা। কেন, তোমার ওষুধগুলো কি ফেলনা, ও গুলো কি কিছুই নয়?”

ক্ষীণ কণ্ঠে কবিরাজ বলিলেন, “বল দেখি মা, তুই-ই একবার সে কথা বল দেখি, আমার ওষুধগুলো কি মিথ্যে? ওরে, কোথায় ছিল তোদের ডাক্তার, চিরটাকাল যে এই ওষুধই খেয়ে এলি,—এতেই তো বেঁচে আছিস,—আজ সেই ওষুধ হল এত তুচ্ছ, এত হেয়?”

বৃদ্ধের চোখের জল বুঝি উছলাইয়া পড়ে।

রমা প্রবোধ দিল, “তুমি অত ভাবছ কেন বাবা, ডাক্তার ক'দিন টিকে থাকে তাই দেখ না? এই গাঁয়ের লোকদের যেদিন কেঁদে ছুটে আসতে হবে তোমার কাছে, আমি কাউকে ঢুকতে দেব না, এক পান ওষুধ দেব না। না—কক্ষণো দেব না, সে আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।”

কবে সে দিন আসিবে, সে দিনের শান্তির প্রত্যাশায় রমা ব্যগ্রভাবে ভবিষ্যতের পানে চাহিল। কিন্তু হায় রে, কুহকী ভবিষ্যৎ!

কবিরাজ সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, “না না, তাই কি হ'তে পারে রমা, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হবে যে।”

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া রমা বলিল, “লঘু পাপ বই কি, এই যে তোমাকে চিনেও এমন ভাবে অপমান করা, একে তুমি হয় তো কিছু না ব'লে উড়িয়ে দিতে পারো বাবা, আমি কিছুতেই পারব না, এ আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি।”

বৃদ্ধ সস্নেহে তাহার পানে তাকাইয়া বলিলেন, “তুই অত ভাবছিস কেন রমা,—যদি নেহাৎই বুঝি কেউ আমায় ডাকলে না, তুই কি ভাবিস আমি এখানে থাকব? আমার নিজের দেশ ঘর আছে—যদিও আমার আপনার জন কেউ নেই তবু দেশের লোকজন তো আছে, সেখানে চ'লে যাব।”

রমা সজল চোখের দৃষ্টি একবার তাঁহার মুখের উপর ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না সে কোথায় থাকিবে, তাহাকে কাহার নিকটে রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন?

৫

আর কেহই ডাকে না। তথাপি ঔষধ প্রস্তুত চলিতেছে। রমা রাগ করিয়া বলে, “আর কেন বাবা, মিথ্যে এ কেবল ভূতের ব্যাগার খাটা?”

শান্ত হাসিয়া কবিরাজ বলেন, "ভূতের ব্যাগার? তাই না হয় হ'ল রমা! না হয় ভূতের ব্যাগারই খাটছি ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেই।"

ঔষধ জমিয়া রাশীকৃত হইতে লাগিল, বৃদ্ধের তথাপি ছুটি নাই।

গ্রামের লোক মনে করিল বৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, নহিলে জানিয়া শুনিয়া আবার ঔষধ তৈরী কে করে।

ঔষধ বিক্রয় হয় না, দিন এদিকে চলে না। একটি নয়, ছুটি লোক,—কেমন করিয়া দিন কাটে। নলিন ডাক্তারের উপার্জ্জন দিন দিন বাড়িয়া চলে; পথে ঘাটে কবিরাজের সহিত যখন দেখা হয়, ডাক্তার ঝম্ ঝম্ করিয়া পকেটের টাকা বাজাইয়া যায়।

শিক্ষিত ডাক্তার লোকের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল কবিরাজের ঔষধ ঔষধই নহে, যা তা জিনিস দিয়া তৈরী।

মাস তিনেক যাইতে না যাইতে কবিরাজ বলিয়া কেহ যে গ্রামে আছে যাহার উপর একদিন তাহাদের জন্ম-মৃত্যু নির্ভর করিত, সে কথা লোকে যেন ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গেল।

আজ পাশ দিয়া লোকেরা ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়, কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। ইহাদের এই ইচ্ছাকৃত অবহেলা বড় কঠিন হইয়াই কবিরাজের প্রাণে বাজে।

বিস্ময়ে তিনি দেখিতেছিলেন—এই ত' সংসার,—ইহারই মোহে মানুষ নিজেকে ভুলিয়া যায়, গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া উঠে। সম্মুখে আলোর পানে লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিয়া চলে, আলোর পিছনে যে নিবিড় অন্ধকার অপেক্ষা করিয়া আছে, সে কথা ভুলিয়া থাকে।

অতি কষ্টে কোন রকমে দিন যায়। এত কষ্ট সহ্য করাও কঠিন!

কবিরাজ অনেক ভাবিয়া রমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বুঝলি রমা, ভাবছি একবার দেশে যাব। অনেক কাল দেশ ছাড়া, আজ প্রায় চল্লিশ বছর হ'ল।"

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ছবি, বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ করিতে পারেন না।

দেশের সে ঘরখানা আজ কি আর আছে? নদীর ঝড়ে হয় তো তাহার জীর্ণ চালাখানা উড়িয়া গিয়াছে, দেয়াল হয়তো মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, কোন কালে সেখানে যে একখানা ঘর ছিল তাহার প্রমাণ আজ হয় ত কিছুই নাই।

তখন যাহারা বর্ত্তমান ছিল আজ তাহাদের মধ্যে হয় তো কেহ আছে, কেহ নাই; যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই মত জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, চলিতে তাহাদের পা কাঁপে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ—সহজে লোক চিনিতে পারে না। পুরাতনকে বিদায় দিয়া, দেশের বুকে নূতন জাগিয়াছে, সেই নূতনের মাঝে তাঁহার স্থান হইবে কি?

নাই হোক—তবু সে দেশ, তবু সে জন্মভূমি। সেখানে কোনদিন তিনি আদর যত্ন পান নাই, তাই সেখানকার অবহেলাও প্রাণে সহিবে, কিন্তু এখানে থাকিয়া ইহাদের এই অবহেলা তিনি সহিতে পারিবেন না। যেরূপেই হোক—এখান হইতে চলিয়া যাওয়া চাই-ই।

কিন্তু রমা,—এ মেয়েটিকে তিনি দিয়া যাইবেন কোথায়, কে ইহার ভার লইবে?

বুদ্ধিমতী রমা তাঁহার মনের ভাব বুঝিল। সেদিন তিনি যখন বিছানায় শুইয়া পড়িয়া রমার ভবিষ্যৎই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন, সে তখন তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "আমার জন্যে তোমায় এতটুকু ভাবতে হবে না বাবা, ভগবান আমার উপায় ঠিক ক'রে দেবেন।"

কবিরাজ বলিলেন, "কি উপায় করবেন আমি তাই ভেবে পাই নে রমা। মনে ভাবছি দেশে চ'লে যাব—এতদিন চ'লে যেতেও তো পারতুম, কেবল তোর জন্যেই যেতে পারছি নে। তোর মা তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমি তোকে দিই কোথায়?"

রমা শান্তভাবে বলিল, "আমার জন্যে এখানে আটকে থেকে যে এমনি ক'রে লোকের অবহেলা সইবে তা আমি হ'তে দেব না বাবা। আমিও কয়দিন ধ'রে তাই ভাবছি, উপায়ও ঠিক করেছি। রাম চাটুর্য্যের বউ আমার জেঠাইমা হন, আমি তাঁকে বলেছি, তিনি আমায় রাখতে রাজি হয়েছেন।"

কবিরাজের মুখখানা আশু/মুক্তির সম্ভাবনায় দৃপ্ত হইয়া উঠিল। একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "সত্যি তিনি তোকে নেবেন? কই, আগে তো তোর ভার তিনি নিতে চান নি?"

রমা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আগে যে ছেলেমানুষ ছিলুম বাবা, কাজ করতে পারব না ব'লে নিতে চান নি। এখন তিনি আমায় রাঁধুনি রাখতে চান—শুধু নয়।"

কবিরাজের মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল, বালিসের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া রাখিয়া অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। "না, আমার যাওয়া হবে না রমা, আমি দেশে যাব না।"

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, "না বাবা, যখন যাবেন মনে করেছেন তখন চ'লে যান, এখানে থেকে আপনার মন ও শরীর দুই-ই ভেঙ্গে গেছে। আমার জন্যে কিছু ভাববেন না বাবা, আমি বেশ থাকতে পারব। দুবেলা রান্না বই তো নয়, ও তো মেয়েদেরই কাজ, ওতে একটুও কষ্ট হবে না।"

কবিরাজ চুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন।

৬

কবিরাজের যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।

তাহার দু চার দিন পূর্ব্ব হইতেই রমা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বাধ্য হইয়াই আগে তাহাকে কাজে লাগিতে হইল, কর্ত্রীর জেদ।

দিনের মধ্যে দুই একবার মাত্র সে আসিতে পায়। তা-ও সকাল বিকালের দিকে নয়, দ্বিপ্রহরে।

কবিরাজের মনে হইতেছিল এই দুদিনেই রমা যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উপায় কি, উপায় তো নাই।

যাই যাই করিয়াও যাওয়া যেন আর ঘটিয়া উঠিতেছে না। এই গ্রামের মায়া কাটানো যে এত শক্ত তাহা তো তিনি আগে ভাবেন নাই।

হায় চল্লিশ বৎসরের পরিচিত—

দুপুরে রমা আসিয়া তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া দেয়। তিনি কিছুই লইয়া যাইতে চান না,—এত জিনিস লইয়া যাইবেন কিরূপে? রমাকে বলেন, "বেশী কিছু দিস নে রমা, ও ছোট বাক্সটার মধ্যে যা ধরে তাই দে, আর বেশী পুঁটলী করিস নে।"

রমা ক্ষিপ্রহস্তে গুছাইতে গুছাইতে উত্তর দেয়, "না বাবা, পুঁটলী বেশী কিছু হবে না, একটা মাত্র হবে—নইলে এত জিনিস—"

কবিরাজ আর্দ্রকণ্ঠে বলেন, "ওষুধগুলো তোরই কাছে থাক রমা, আমি ওগুলো আর নিয়ে কি করব। যদি কখনও কেউ চায়—"

বলিতে বলিতে থামিয়া যান, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া আবার বলেন, "হ্যাঁ, কোনদিন না কোনদিন কারও দরকারেও তো লাগতে পারে। ওই দেখলি নে, সেদিন রাতে নলিন ডাক্তার কোথায় ডাকে গিয়েছিল, ভিখু মোড়লের ছেলেটা ওলাউঠায় তখুনি যায় আর কি। দু মোড়া ওষুধ খাইয়ে তখনকার মত রোগটা থম্‌থমা খেয়েছিল তো বটে, তারপরে সকালে না হয় নলিন ডাক্তার এসে দেখলে। অমনি কখন না কখনও কারও দরকারে পড়বে, তখন দিস—। ওরা মানুক বা নাই মানুক, তবু তো উপকার পাবে।"

কথাগুলো শুনিতে শুনিতে রমার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে, বৃদ্ধ তাহা দেখিতে পান না।

এমনই করিয়া যাওয়ার নির্দ্দিষ্ট দিন ঘনাইয়া আসিল।

সে দিন সকাল বেলায়—

আকাশ পূর্ব্বদিন হইতে মেঘে ঢাকা, শেষ রাত্রে খুব খানিক বৃষ্টি হইয়া পথের ধূলা ভিজিয়া গিয়াছে।

আকাশের পানে চাহিয়া কবিরাজের মনে হইতেছিল আকাশের নিবিড় কালো মেঘ যেমন খানিকটা বৃষ্টি ঢালিয়া কতকটা পাতলা হইয়া গিয়াছে, তিনিও তেমনি খানিকটা কাঁদিয়া নিজেকে হাল্কা করিয়া ফেলেন।

ভোরের সময় রমা পাঁচ মিনিটের জন্য আসিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার অবকাশ তাহার নাই, পরের বাড়ীর কাজ—তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে।

বেলা একটু বাড়িয়া উঠিতে কবিরাজ একবার বাজারে গেলেন। এখানে সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়, আজ শেষ একবার সকলের সহিত দেখাশুনা করিতে চান; তাহারা চাহিয়া দেখুক বা নাই দেখুক, কথা বলুক বা নাই বলুক তাঁহার তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আজ তাঁহার মনে অভিমান নাই, লজ্জা সঙ্কোচ নাই।

বাজারে যাইবার পথে ভিখু মণ্ডলের বাড়ী, পথ হইতে ভিখুকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরের ট্রেনখানা ধরিয়ে দিতে হবে ভিখু, একটু সময় থাকতে থাকতে গাড়ীখানা নিয়ে এসো।"

পশ্চাতে নলিন ডাক্তারের ব্যঙ্গোক্তি শুনা গেল, "কোথা হ'তে রোগী দেখবার ডাক্ এল কবিরাজ মশাই?"

মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কবিরাজ বলিলেন, "কোথাও না বাবা, আজ এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব, তাই ভিখুকে গাড়ীর কথা ব'লে দিচ্ছি।"

হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া নলিন বলিল, "চ'লে যাচ্ছেন? কেন?"

কবিরাজ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তেমনই হাসি মুখে বলিলেন, "জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে এল বাবা, এখন নিজের জন্মভূমিতে গিয়ে মরি, মেঘনার তীরে দেহখানার সৎকার হ'লেই ভাল।"

নলিন শুধু চাহিয়া রহিল; হঠাৎ তাহার অন্তরটা কে যেন মোচড় দিয়া ধরিল, সে আর কথা বলিতে পারিল না।

পুকুরে জল আনিতে আসিয়া রমা লুকাইয়া আবার আসিল, বৃদ্ধকে শেষ প্রণাম করিতে গিয়া আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া হঠাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া কবিরাজ রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "রমা—"

রমা কান্নাভরা স্বরে বলিল, "আর আসবে না বাবা? আর একটি বারের জন্যও আসবে না?"

কবিরাজ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "এ দেহ নিয়ে একবার গেলে আর কি ফিরবার আশা করতে পারি মা? আর তুই তো সবই জানিস্ রমা, আবার কি আমায় এখানে ফিরে আসতে বলিস?"

বিকৃত কণ্ঠে রমা বলিল, "ভুল ভাবছিলুম বাবা; না— তোমায় আর এখানে আসতে হবে না, তোমার এই যাত্রাই শেষ যাত্রা হোক।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কবিরাজ বলিলেন, "আজ দেখছিস তো রমা, আমায় বিদায় দিতে কেউ আসেনি, কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করলে না কেন যাচ্ছি—কোথায় যাচ্ছি। আজ ভাবছি রমা—উৎসবের শেষে দীনহীন বেশে চলে যাওয়ার চেয়ে উৎসবের মাঝে খুব বড় হয়েই আমি যেতে পারতুম যদি তখন তুই আমার মনে এ সত্যকে জাগিয়ে দিতিস।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আর দেরি করিসনে রমা—বাড়ী যা, এর পরে তিরস্কার সইতে হবে! আমার জন্যে কিছু ভাবিসনে মা, ভগবান আমার উপায় ক'রে দেবেন।"

চোখ মুছিতে মুছিতে রমা চলিয়া গেল।

বেলা এগারটার সময় ভিখু গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিল। কবিরাজের সব প্রস্তুতই ছিল, বিলম্ব না করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল।

সেই পুরাতন পথ ঘাট, সেই পুরাতন গাছপালা সবই পুরাতন—চল্লিশ বৎসরের পুরাতন। দিন যায় শুধু স্মৃতিটাই জাগিয়া থাকে।

ওই সেই প্রকাণ্ড বড় বট গাছটা, অসংখ্য শিকড় বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন দিন নাই এখানে যেদিন তিনি না আসিয়াছেন।

পথে দুটি চারটি লোক চলিতেছে, রাখাল বালক মাঠে গরু লইয়া যাইতেছে, দুই চারটি পল্লীবধূ পুষ্করিণীতে জল ভরিতে আসিয়াছে সবাই আছে—সবই রহিল, কেবল তিনিই থাকিবেন না।

গাড়ী চলিল। দৃষ্টি পড়িল পথের ধারে একটা ঝোপের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা একটি মেয়ের দিকে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মুখ চোখ আরক্ত—স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধন করিতে করিতে এই গাড়ীখানির শব্দ শুনিতে পাইয়া রন্ধন ফেলিয়া লাঞ্ছনা অবমাননার ভয় উপেক্ষা করিয়া শেষ একটি

বারের জন্য সে দেখিতে আসিয়াছে। অশ্রুজলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা, তথাপি সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল।

বৃদ্ধ উপুড় হইয়া পড়িলেন। দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিলেন—না না, আর তিনি দেখিবেন না, আর না—

যখন তিনি মুখ তুলিলেন তখন গ্রাম অনেক পিছনে পড়িয়াছে, মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ীর পিছন দিয়া তিনি শ্রান্ত নেত্রে তাকাইয়া দেখিলেন, গ্রামের নারিকেল গাছগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে। গ্রাম বহু পিছনে পড়িয়াছে, আর দেখা যায় না।

অশ্রুজলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী

ভস্মের জন্ম কথা

শ্রীমতী লীলা দেবী

কাজল পরিনু, মুছিয়া গেলো তা
নয়ন লোরে ;
আঁচল ভরিনু, খসিয়া ঝরিল
ভাবের ঘোরে।
ভূষণ যত না হারাইল পথে
নিল্ল যে হরি ;
অলকা-তিলকা শুকাইল মুখে
পড়িল ঝরি'।
ফল ফুল দীপ ধূপ চন্দন
থালায় ভরা
কেঁপে গেলো প'ড়ে পথ ধূলি পরে
ভরিল ধরা।
আপন আবেগে আপনি চুমিনু
আপন দেহ,
দেখার আগে যে দেখিবার বাড়া
হরষ সেহ।

ভাবের অবেগে পুলকের বেগে
উঠিনু জ্ব'লে,
যা ছিল আমার তোমায় দেবার
হৃদয় তলে
জ্বলিয়া উঠিল বনে বনে তাহা
তরুতে তৃণে,
পাতায় পাতায় কুসুমে লতায়
নিশীথে দিনে।
আকাশে বাতাসে সাগরে সরিতে
ভরিল সে যে,
বিশ্বের অণু পরমাণু মাঝে
উঠিল বেজে।
জ্বলিয়া উঠিনু ধূপের মত যে
মরিনু পুড়ে,
ছাই হ'য়ে আজ মিলাই শূন্যে
বাতাসে উড়ে।

বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় বি-এ

অতীত থেকে বর্ত্তমানকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে তার অসম্পূর্ণ ও আংশিক রূপটাই চোখে পড়ে, তাই বর্ত্তমানের কথা আরম্ভ করার পূর্ব্বে, প্রাচীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের আদিম ইতিহাসের মত তার প্রাচীন সঙ্গীতের কথাও নির্ভর কচ্চে বেশীর ভাগ প্রবচন ও কিংবদন্তীর উপর; তার অসময়ের ত কোন ইতিহাস নেই সুসময়েরও প্রাঞ্জল ও ধারাবাহিক কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। গ্রন্থাদি থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা গুছিয়ে বললে সঙ্গীতের পরিণতির সামান্য আভাস দেওয়া হবে, কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হবার যো নেই।

একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে আমাদের সঙ্গীত প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি মোটেই অনড় ও অচল হ'য়ে নেই। কালের ও রুচির প্রভাবে এতই পরিবর্ত্তন এসেচে যে, প্রাচীন রাগাদি শুদ্ধভাবে গাইতে বসলে শুনে সুখী হওয়ার চেয়ে গায়ককে বর্ব্বর আখ্যা দেওয়ার কথাই মনে হবে। স্থানে স্থানে এমনিই বদলে গিয়েচে যে, পুরাতনের অস্তিত্ব খুঁজে বার করা কঠিন। তাই ব'লে অতীত উপহাসের বস্তু নয়। আমাদের আধুনিক সঙ্গীতেও ভবিষ্যতে বহু পরিবর্ত্তন আসবে এবং তখন যে বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রত্নতত্ত্বের অঙ্গীভূত হবে না এ কথা কে বলবে। "Scales, Modes and their Modulations have undergone multifarious changes, not merely among uncultivated or savage people, but even in those periods of the world's history and among those nations where the noblest flower of human culture have expanded. The system of Scales, Modes does not rest solely upon inalterable natural laws, but is also, at least partly, the result of aesthetical principles, which have already changed and will still further change with the progressive development of humanity." Sensations of Tones—Helmholtz-p 235. সেইজন্য বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী গানের আলোচনায় বিগত সঙ্গীত-পদ্ধতি ও রাগাদির স্থান বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক গায়কের কাছে তার বিশেষ কোন প্রয়োজন ও মূল্য আছে ব'লে মনে হয় না।

আমাদের সঙ্গীতে স্বরগুলি একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, একের পর অন্যটি গীত হয়। আরব, পারস্য, চীন, ভারত প্রভৃতি প্রাচ্যের সমস্ত জাতিরই সঙ্গীত এই ধরণের, এবং সেইজন্যে একে Homophonic music বলা হয়েচে। পাশ্চাত্যেও মধ্যযুগের পূর্ব্বে এইপ্রকার সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, পরে তথায় কয়েকটি স্বর সুসঙ্গত ভাবে যুগপৎ ব্যবহার করা (Harmony) উদ্ভাবিত হয়। আমাদের বীণা, সেতার, তানপুরার সুর বাঁধার নিয়ম দেখে মনে হ'তে পারে যে, আমাদের মধ্যেও অল্পবিস্তর হার্ম্মনির প্রচলন ছিল, কিন্তু ষড়জ, পঞ্চম, গান্ধার ও তার ষড়জের মধ্যে সহজ সম্বন্ধগুলি জগতে প্রায় সকল জাতি Pythagoras এর (প্রায় ২৫০০ বছর) সময় থেকে জেনে আসচে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হার্ম্মনি বলতে পাশ্চাত্যেরা যা বোঝেন সে পথে আমাদের সঙ্গীত কখনও চলেনি। তাই ব'লে এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের অনুকম্পার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বলচি না যে সুদুর ভবিষ্যতে কোনকালে আমাদের সঙ্গীতে হার্ম্মনির বিকাশ হবে না, কিন্তু যদি নাও হয় তাহ'লে "one part music, considered independently and unaccompanied by words, is too poor in forms and changes, to develop any of the greater and richer forms of art"

Sensations of Tones p. 237; এ কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবার কোন হেতু নেই। Melody যে কত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে পারে সেটা য়ুরোপীয়েরা এখনও ঠিক ধরতে পারেন নি, কারণ সে ভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ তাঁদের কারুর ঘটেনি, তবুও এর সৌন্দর্য্য একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। "The essential basis of Music is Melody. Harmony has become to western Europeans during the last three centuries an essential, and to our present taste, indispensable means of strengthening melodic relations; but finely developed music existed for thousands of years and still exists in Ultra-European nations without any harmony at all." Sensations of Tones, p vii.

সামবেদ ও পঞ্চম শতাব্দীর 'ভরত নাট্যশাস্ত্রের' সময় গান কি রকম ছিল বলা অসম্ভব, এবং স্বর, তাল, শ্রুতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ দেব দেবী গন্ধর্ব্ব কিন্নর ইত্যাদি অবান্তর কথায় পূর্ণ। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর'। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং তিনি সঙ্গীতের অতিপ্রাকৃত অংশকে 'মার্গ সঙ্গীত' নাম দিয়ে আলাদা ক'রে রাখলেন এবং তদানীন্তন দেশজ প্রচলিত পদ্ধতিকে 'দেশী' নামে অভিহিত করলেন, এবং একথাও বলে গেলেন যে, দৈবী গীতের সঙ্গে দেশী গানের প্রভেদ হ'লে যেন প্রচলিতের মর্য্যাদা থাকে এবং শাস্ত্রকে সেইভাবে ব্যাখ্যা ক'রে নিলেই চলবে। শাস্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধার কারণে তার সঙ্গে সর্ব্বত্র প্রচলিত রীতির খাপ খাওয়াতে গিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা শাস্ত্রকে প্রায় স্থিতি-স্থাপক ক'রে তুলেচেন এবং অতীন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষকে মেলাতে গিয়ে যে জটিলতা এসে পড়ল তাতে সত্য এমনিই বিকৃত হ'য়ে পড়ল যে, তার উদ্ধার করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। অথচ দুইয়ের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, তার পরিচয় রত্নাকরের উল্লিখিত উক্তিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের লেখায় পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও রত্নাকর এ রকম দুরূহ সঙ্কেতে লিখে গেলেন যে, আজ পর্য্যন্ত 'শ্রুতি', 'গ্রাম', 'মূর্চ্ছনা" প্রভৃতি নিয়ে মতভেদের অবধি নেই এবং তার কোন সর্ব্বজন অনুমোদিত সমাধানও পাওয়া যাচ্চে না। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতিসূত্রসারে' এবং পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর গ্রন্থগুলিতে বহুবার এ দুর্ব্বোধ্যতার উল্লেখ ক'রে গিয়েচেন।

একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রত্নাকরের 'স্কেল' ('মূর্চ্ছনা' বা শুদ্ধ 'স্কেল') নিয়ে। সঙ্গীতে শুদ্ধ স্কেলের বিচার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তা না হ'লে রাগাদির স্বরূপ বা উদ্ভব কিছুই বোঝা যাবে না। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী শুদ্ধ 'স্কেল' হচ্চে হারমোনিয়ামের 'সি স্কেল' (C Scale)। সাদা চাবিগুলি যথাক্রমে শুদ্ধ স, রি, গ, ম, প, ধ, নি এবং কাল চাবিগুলি যথাক্রমে কোমল রি, কোমল গ, কড়ি বা তীব্র মধ্যম, কোমল ধ, কোমল নি। (হারমোনিয়ামের অবতারণা কেবল বিষয়টাকে বিশদ করবার অভিপ্রায়ে, নইলে হারমোনিয়ামে আমাদের সব স্বরস্থানগুলি যথাযথ স্থাপন করা যায় না।) শার্ঙ্গদেব এই ১২টা সুরের অন্যভাবে সন্নিবেশ করলেন। তিনি সেইস্থানে ২২টা শ্রুতি এনে যথাক্রমে ৪র্থ, ৭ম, ৯ম, ১৩শ, ১৭শ, ২০শ, ২২শ শ্রুতিতে স, রি, গ, ম, প, ধ, নি স্থাপন করলেন। একটা সেতারের এক সপ্তকের মধ্যে যদি ২২টা ঘাট লাগান যায়, তাহ'লে প্রত্যেকটা এক একটা শ্রুতি হবে এবং স্কেলটা সহজেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এত সরল নয়, কারণ এক শ্রুতি থেকে পর শ্রুতির অবস্থান আমরা সমান ধরে নির্চ্চি, কিন্তু এ কথা ধ'রে নেবার কোন হেতু নেই, কারণ রত্নাকরে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কিছু লেখা নেই। জগতে প্রাচীন সঙ্গীতে অসমান শ্রুতির প্রচলন ছিল— "But although in certain of the less usual Greek Scales and in modern Oriental Music, cases occur where some particular small intervals have been divided on the principle of equal graduations, yet there seems at no time or place to have been a system of Music in which melodies constantly moved in equal degrees of pitch, but smaller and larger intervals have alwa-

been mixed in the musical Scales that must appear entirely arbitrary and irregular until the relationship of compound tones is taken into consideration." Sensations of Tone. P. 363. পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা সকলে ২২টা শ্রুতি গ্রহণ ক'রে তাঁদের স্বরগুলির অবস্থান ঠিক রত্নাকরের মত দিয়েছেন, অথচ তাঁদের প্রায় সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন স্কেল তৈরি হয়েচে। সুতরাং শ্রুতিদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব অসমান ছিল অথচ কি পরিমাণে পার্থক্য ছিল তা কেউ ব'লে গেলেন না। ব্যাপারটার এই অর্থ হয় যে, সকলে নিজ নিজ প্রচলিত 'স্কেলে' শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য প্রাচীন শ্রুতিদের আরোপ ক'রে গেলেন। তাঁরা ভাবেন নি যে পরে অসুবিধা হ'তে পারে, সেই জন্য স্কেলের অন্য কোন আলাদা নির্দ্দেশ দিয়ে যান নি। রত্নাকর ও তাঁর পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের সময়ে কোন গোলমাল হ'ল না, কারণ তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী স্কেল নিয়ে মাথা ঘামান নি এবং সেকালকার লোকেদেরও প্রচলিত স্কেল বুঝতে কষ্ট হয় নি; কিন্তু আমাদের পক্ষে তা নিতান্ত কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল। নানা কারণে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে অনুমান করেন এই সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একই স্কেল প্রচলিত ছিল ও প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থকার ব্যাঙ্কটমখীর শুদ্ধ স্কেল দাক্ষিণাত্যে এখনও প্রচলিত আছে। সেই স্কেল আমাদের বর্ত্তমান 'স্কেলে' রূপান্তরিত করলে এই রকম দাঁড়ায় সা, কোঃ রি, রি, ম, প, কোঃ ধ,ধ,সা। কোন সঙ্গীতজ্ঞ যদি এই স্কেলটা গাইতে চেষ্টা করেন ত বুঝবেন কি দুরূহ ব্যাপার। 'শ্রুতি' নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই, যদিও শ্রুতিগুলি পর পর গাওয়া অসাধারণ সুরজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। এ'ত শুধু শ্রুতির সঙ্গে স্কেলের সম্বন্ধ। শ্রুতির সঙ্গে গ্রাম এবং তার সঙ্গে রাগ রাগিণীর সম্বন্ধ জটিলতর বিষয়।

রত্নাকরের পরে যে সব গ্রন্থকার এলেন—লোচন (১৫শঃ), অহোবল (১৬ শঃ), হৃদয় নারায়ণ (১৭ শঃ) শ্রীনিবাস (১৮শঃ) তাঁরা ১২ শ্রুতির উল্লেখ করলেও সৌভাগ্যবশতঃ রাগাদির বর্ণনায় ১২ স্বরের ব্যবহার ক'রে গেলেন। তাঁদের পুস্তক বোঝা যায় পদ্ধতি ধীরে ধীরে সরল হ'তে আরম্ভ করে তাঁরা উত্তর ভারতের অধিবাসী হলেও কেউ সমগ্র উত্তর ভারতের সঙ্গীত পদ্ধতির কথা লিখে যেতে পারেন নি, দেশ কালের অবস্থা তার উপযোগী ছিল না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হয়েচে, সুতরাং তাঁদের পদ্ধতি প্রাদেশিক ব'লে অনুমান করলে অন্যায় হয় না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে এ প্রবন্ধে উত্তর ভারতের সঙ্গীতই বোঝাবে, নইলে দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত প্রাণপণে তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেচে। আবহমান কাল একভাবে টিঁকে থাকার সার্থকতা হয়ত আছে, তবে সুখের বিষয় বর্ত্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ সঙ্গীতের ধারা ধীরে ধীরে মিশ্রিত হচ্ছে এবং কয়েকজন খ্যাতনামা গায়কের ক্ষেত্রে তা ক্রমেই স্ফুট হ'য়ে আসচে। যাক্, স্বরস্থান নির্ব্বাচন শ্রীনিবাস বীণার তারের দৈর্ঘ্যের সাহায্যে ক'রে গেলেন। তাঁর নিয়মানুসারে জানা যায় তাঁর শুদ্ধ 'স্কেল' আমাদের কাফী ঠাট ছিল ছিল অর্থাৎ স,রি, কোঃ গ, ম, প, ধ, কোঃ নি, সা। এই স্কেল সামান্য বদলে বর্ত্তমানে আমাদের শুদ্ধ 'স্কেল' বা বিলাবল ঠাটে পরিণত হয়েচে এবং আধুনিক পদ্ধতি এই স্কেলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রত্নাকরের সময় থেকে এই পাঁচশ বছর অন্য এক সঙ্গীতের ধারা অলক্ষ্যে হিন্দুসঙ্গীতের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল তার প্রচ্ছন্ন শক্তি সম্বন্ধে প্রথমে কেউ সচেতন না হ'লেও কিছুদিন পরে তাকে অস্বীকার করবার উপায় রইল না। আমি মুসলমানদের কথা বলচি। তাঁরা এদেশে এসে হিন্দুসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, খুব সম্ভব দূর অতীতে এই দুই ধারার মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল। আরবীয় সঙ্গীতে ২৪ শ্রুতির প্রয়োগ ও পরে ১২টা স্বরের ব্যবহার এবং পারস্য সঙ্গীতে ১২টা মুকামটের (আমাদের 'ঠাট' বা 'মেলে'র ন্যায়) সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। তাঁরা কিন্তু সঙ্গীতের ব্যাকরণের উপর তত নজর দিলেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির প্রতি দৃষ্টি না রেখে সমগ্রের রূপটাই তাঁদের চোখে পড়ল এবং তাঁদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায় শিল্পীসুলভ মনোভাবে রাগাদির রূপ অনেক পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল এবং সুমিষ্ট গাইবার ঢং বা চাল হিন্দু সঙ্গীতে নূতনত্ব নিয়ে এল। মুসলমানী স্থাপত্যের সম্বন্ধেও মোটামুটি এই কথাই বলা যায়। প্রাচীনের প্রতি যাঁর

অহৈতুক শ্রদ্ধা আছে, তাঁর হয়ত এ কথা শুনে আঘাত লাগবে, কিন্তু যে-কোন নিরপেক্ষ সঙ্গীতানুরাগী স্বীকার করবেন যে হিন্দু সঙ্গীত যাবনিক সৌষ্ঠবে, রসোৎকর্ষে অভিনব 'চালে' সমৃদ্ধই হ'য়ে উঠেচে। বন্ধন, নিয়মকানুন শিথিল হ'ল, কিন্তু তার বদলে সে রসসৃষ্টির দিক দিয়ে যা লাভ করল তাকে তুচ্ছ করা চলে না।

এই সব প্রভাব, পরিবর্ত্তন নিয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করল। শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি সঙ্গীতের দিকে গেল এবং স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌, সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তাতে শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করলেন কিন্তু উপাদান বড়ই বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ছড়িয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন ক'রে নষ্ট-প্রায় গ্রন্থগুলির অনেকগুলির উদ্ধার ক'রে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এঁদের মধ্যে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সফলকাম হয়েচেন। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত-কলেজে এসে যখন পণ্ডিতজীর সঙ্গে পরিচয় হয়, সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক এই মারাঠী ব্রাহ্মণের সৌম্য, গৌরবর্ণ আকৃতি আকৃষ্ট করেছিল। তারপর তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের দরুণ তাকে আরও ভাল লেগেছিল। গোঁজামিল দিয়ে বুঝোবার চেষ্টা তিনি কোথাও করেন নি, যতদূর পেরেচেন শাস্ত্রের সমর্থন গ্রহণ করেচেন, কিন্তু যেখানে পারেন নি সরলভাবে অক্ষমতা স্বীকার করেচেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শৃঙ্খলবদ্ধ স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রমাণ তাঁর প্রত্যেক বইতে রয়েচে। "My object is to reduce, if possible, the whole thing to a tangible system, for I feel convinced that our educated classes will never take kindly to the subject unless they have something definite and intelligible before them." Correspondence with Thakur Nabab Ali. এই বৃহত্তর correspondence সঙ্গীত কলেজের লাইব্রেরীতে পড়লে এই কথা বার বার মনে হয়। লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ উদ্ধার ক'রে, গায়কদের সঙ্গে শাস্ত্র ও প্রচলিত সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তিনি যে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করেচেন, তা মারাঠী ভাষায় চারিখণ্ড সঙ্গীত-পদ্ধতিতে প্রকাশ করেচেন। এ ছাড়া চারিখণ্ড ক্রমিক পুস্তকে প্রায় দেড় হাজার প্রসিদ্ধ ঘরোয়ানার ধ্রুপদ, খেয়াল, তরানা, স্বরমালিকা, ধামার, ঠুংরী, স্বরচিত লক্ষণগীত প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেচেন এবং বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতির সারাংশ তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ 'লক্ষ্যসংগীতে' বিধিবদ্ধ ক'রে গিয়েচেন। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবার ইচ্ছে আছে, কারণ প্রচলিত পদ্ধতির এবং তার রাগাদির বর্ণনা এত সুন্দরভাবে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতজীর কথা শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায় (১৫৩—১৬৯ পৃঃ) বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ ক'রে গিয়েচেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এই প্রচেষ্টায় ভবিষ্যৎ জ্ঞানলিপ্সুদের সঙ্গীতশাস্ত্রে পথ অনেক সরল ও সুগম হ'য়ে আসবে। আমার প্রবন্ধের অনেক স্থান তাঁর মতামতের কাছে বিশেষ ঋণী।

চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকার মতানুযায়ী ৭২টি ঠাট গ্রহণ ক'রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তার থেকে রাগোৎপাদক দশটি ঠাটের উপর আপন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই দশটি 'ঠাটে' (বা 'মেলে') তিনি প্রচলিত রাগাদির উৎপত্তি নির্দ্দেশ কল্লেন। ঠাট বা মেল প্রণালী পণ্ডিতজীর আবিষ্কার নয়, প্রায় সকল গ্রন্থকার ঠাটের কথা লিখেচেন। তিনি কেবল তাদের সুসংস্কৃত এবং ঠাটের সংখ্যাকে নির্দ্দিষ্ট করেচেন। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী বা হনুমন্ত মত ব'লে যে আর একটা মত এদেশে আছে, তার স্বপক্ষে দুএকটা গ্রন্থ ছাড়া কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি এবং দেখা যায় যে, এ সকল রাগ অনুরূপে তখন গাওয়া হ'ত। কিন্তু এই সব সবিস্তার আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমানে ঠাট পদ্ধতি পশ্চিমে গায়কদের নিকট ও সঙ্গীত-সম্মিলনীতে প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হচ্ছে।

পদ্ধতির কথা রেখে এখন গানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, হিন্দুস্থানী গান এখন মোটামুটি ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা; গজল এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। ধামার, চতুরঙ্গ, তরানা ইত্যাদি এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করলে বাহুল্য-দোষের সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ প্রায় পাঁচশ বছর থেকে গাওয়া হচ্ছে এবং প্রাচীন সঙ্গীতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সব চেয়ে

অধিক। প্রাচীন গ্রন্থে ধ্রুপদের ন্যায় 'প্রবন্ধ', 'বস্তু', 'রূপক' প্রভৃতি গান ছিল। প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বকে তাদের ধাতু বলা হ'ত। সে সব গাইবার সময় বহু নিয়ম রক্ষা ক'রে চলতে হ'ত। নির্দ্দিষ্ট স্বর থেকে আরম্ভ করতে হ'ত (গ্রহ), নির্দ্দিষ্ট স্বরে শেষ করতে হ'ত (ন্যাস, অপন্যাস); স্বর বিশেষের ব্যবহার বেশী ছিল (অংশ, বাদী), 'রাগালাপে' রাগের বর্ণনা করতে হ'ত, 'রূপকালাপে' আমাদের বর্ত্তমান আলাপের মত কোন কথাহীন বস্তু ছিল। আজকাল এ সকল কোথাও দেখা যায় না, তবে বর্ত্তমান ধ্রুপদে এদের অনেক কিছু সংস্কৃত হ'য়ে এসেচে। ধ্রুপদ সাধারণতঃ স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগে বিভক্ত এবং চৌতাল সুলফাঁক তীব্রা ব্রহ্ম রুদ্র ইত্যাদি তালে গীত হয়। অধিকাংশ ধ্রুপদ ধর্ম্মমূলক ও হিন্দীভাষায় লেখা।

আকবর বাদশাহের সভায় তানসেন ধ্রুপদ গাইতেন এবং শোনা যায় তিনি বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তারপর নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজু, চিন্তামণি মিশ্র ইত্যাদির ধ্রুপদ এখনও শোনা যায়। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ধ্রুপদ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল, কিন্তু খেয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমেই পশ্চাতে প'ড়ে যাচ্চে। ইদানীং খেয়াল ধ্রুপদের সৌন্দর্য্যটুকু আত্মসাৎ ক'রে নেওয়াতে লোকে ধ্রুপদ শুনতে তত আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ধ্রুপদে এমন কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় যাতে রসসঞ্চারের পদে পদে ব্যাঘাত ঘটে। সুমিষ্ট তান ছোট ছোট কারুকার্য্যের অভাবে শীঘ্রই একঘেয়ে বোধ হয় এবং এটা আধুনিক রুচির বিরোধী, সুতরাং ভয় হয় যে ধ্রুপদের বৃদ্ধাবস্থা এসেচে এবং শীঘ্রই তার লোপের দিন ঘনিয়ে আসচে। সঙ্গীতশিক্ষার্থীর কাছে তার উপযোগিতা থাকলেও শিল্পীর অন্তর এই নীরস গীতে আর সাড়া দেয় না। সর্ব্বত্র ধ্রুপদীর সংখ্যা ভয়াবহ-রূপে কমতে সুরু হয়েচে। বাঙ্গলাদেশ এককালে ধ্রুপদকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বাঙ্গলার তরুণদল প্রায় সকলেই এখন খেয়াল ও ঠুংরীর প্রতি মনোনিবেশ করেচেন।

খেয়ালের বয়স প্রায় ধ্রুপদের সমান হ'লেও প্রথমে সভ্য-সমাজে তার আদর ছিল না। ধ্রুপদী খেয়ালীকে নিতান্ত করুণার চক্ষে দেখতেন এবং তাঁকে খেয়াল গাইতে অনুরোধ করলে অপমানিত বোধ করতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সদারংগ, অদারংগ ইত্যাদি খেয়ালীর নাম শোনা যায় এবং গত দেড়শ বছরের মধ্যে খেয়াল আশ্চর্য্য-রূপে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেচে। এর কথা বিস্তৃতভাবে শ্রীঅমিয় নাথ সান্যাল 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত তাঁর 'খেয়াল' প্রবন্ধে আলোচনা করেচেন।

খেয়াল তার নামানুযায়ী স্বাধীনতা এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। ধ্রুপদের শান্ত সংহত সৌন্দর্য্য, তার আলাপ, গমক ও মিড় ত সে নিলই, তার উপর তানের দিক থেকে সে অফুরন্ত বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেচে। গোয়ালিয়রে বর্ত্তমানে খেয়াল বড় ও ছোট পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়। বড় খেয়াল অনেকটা ধ্রুপদের মত আরম্ভ হয়,—বিলম্বিত আলাপ, আলাপানুযায়ী তান ধীরে ধীরে দ্রুত হয়। এ সাধারণতঃ তিলবাড়া (ঢিমা তেতালা), ঝুমরা ও আড়াচৌতালে গাওয়া হয়। ছোট খেয়ালের গতি দ্রুত ও চঞ্চল, জলদ তেতালায় গীত হয়। কোন রাগ গাইতে হ'লে তার বড় ও ছোট খেয়াল পর পর গাওয়ার প্রণালী পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোয়ালিয়র ও লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত-কলেজে প্রচলিত করেচেন। কিন্তু মনে হয় পশ্চিমে খেয়াল ক্রমেই চঞ্চল হ'য়ে আসচে, খুব সম্ভব শ্রোতার অধীরতার জন্য।

সঙ্গীতে ঠুংরীর স্থান নিয়ে এতদিন দ্বন্দ্ব চলছিল, এখন বড় বড় ধ্রুপদী খেয়ালীরা ঠুংরী গাইতে আরম্ভ করায় তার আভিজাত্য স্বীকৃত হ'য়ে আসচে। সাধারণতঃ খাম্বাজ, কাফী, পিলু, ঝিঁঝিট, ভৈরবী ইত্যাদি রাগে খেয়ালের বদলে ঠুংরীই গাওয়া হয় এবং পঞ্জাবী, দীপচন্দী, যৎ, দাদরা, ইত্যাদি তাল ব্যবহার হয়।

ওস্তাদী গান ছাড়া প্রত্যেক দেশে সাধারণের মধ্যে অন্য প্রকার গানের ব্যবহার আছে। যুক্তপ্রদেশের শাওন, কাজরী, হোলী, রাজপুতানার মাড়, গুজরাটের গরবা, বাঙ্গলাদেশের বাউল, ভাটিয়াল, কীর্ত্তন ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এইসব গীতে রাগাদির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয় নি এবং সর্ব্বত্রই এইপ্রকার গীতে মিষ্ট সুর, ছন্দ ও কথার মাধুর্য্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েচে। মনে হয় যুক্তপ্রদেশের এই শ্রেণীর

গান যখন ওস্তাদ ও বাইজীরা গ্রাতে নিয়েচেন, তাঁরা রাগ, সুর, তালকে সংস্কৃত ক'রে তাকে বর্ত্তমান ঠুংরীতে পরিণত করেচেন; কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, ঠুংরীর প্রাণ হচ্চে তার মিষ্ট তাল, সাবলীল গতি এবং তাতে কথা বসানর একটি মধুর ও বিশিষ্ট ভঙ্গী, এবং সেহেতু এর আবেদন জনসাধারণের কাছে খেয়ালের চেয়ে এত স্বাভাবিক হবার অবকাশ পেয়েচে। অমিয় বাবুর কাছে একবার শুনেছিলাম কোন গায়ককে ঠুংরী গাইতে বলবার সময় রাগিণীর ফরমাস না ক'রে গানটার নাম করা উচিত। তাঁর মতে ঠুংরী গানগুলির কথা সুরের সঙ্গে এরকম সুসঙ্গতভাবে নিবদ্ধ যে গায়ক তার নড়চড় করলে রসহানির সম্ভাবনা। কথাটি ভাল লেগেছিল। ঠুংরী খেয়ালের মত গভীর বা বিচিত্র হতে পারে নি, এবং একাদিক্রমে ঠুংরী শুনলে পুনরাবৃত্তিদোষে ক্লান্তি বোধ হয়; কিন্তু সে যে এক স্বতন্ত্র ও অভিনব রস সৃজন করেচে একথা অস্বীকার করা চলে না। গায়কেরা অনেক সময় খেয়ালের তামাদি দিয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। বাংলা গানে ধীরে ধীরে ঠুংরী গানের ব্যবহার আরম্ভ হয়েচে। শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, দিলীপকুমার রায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে উৎসাহী। তবে ঠুংরীর spirit বা মেজাজ বাংলা গান এখনও পায় নি। কেন পায় নি বলা শক্ত, হয়ত স্বরবর্ণের উচ্চারণগত বৈষম্য আছে বা সুদীর্ঘ পরিচয় বা চেষ্টার অভাব আছে। তবে বাঙ্গলা গান যে অনেক শোভা, সমৃদ্ধি লাভ করেচে এ কথা বলা চলে।

ঠুংরী যে সব রাগে গীত হয়, টপ্পা সেই সব রাগে নিজেকে ব্যক্ত করেচে; কিন্তু গাইবার প্রণালী একেবারে স্বতন্ত্র। টপ্পার সৃষ্টি সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে, অন্ততঃ কথা দেখে তাই মনে হয়। টপ্পায় এক বিশিষ্ট প্রকারের তাল ও চাল ব্যবহার হয়। বাঙ্গলাদেশ যে টপ্পাকে কতখানি নিজস্ব ক'রে নিয়েছিল, নিধুবাবুর টপ্পাগুলিই তার প্রমাণ; তবে মনে হয় স্থানীয় প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গে টপ্পা সামান্য মিশ্রিত হ'য়ে যায়। বর্ত্তমানে ঠুংরী গজলই বেশী শোনা যায়; ভাল টপ্পা-গায়ক ক্রমশঃ বিরল হ'য়ে পড়চে।

খেয়ালে কথার মূল্য নেই বল্লেই হয়; ঠুংরীতে সুরে অর্থসঙ্গতি সামান্য রক্ষা করতে হয়; কিন্তু গজলে কথা এরকম প্রাধান্য লাভ করেচে যে, সুর নির্ব্বিবাদে তার সিংহাসন ছেড়ে দিয়েচে। গজলকে মোটামুটি সুরে আবৃত্তি বলা চলে; বেশীর ভাগ উর্দ্দু বা পারস্য ভাষায় লেখা এবং সাধারণতঃ পস্তু ও দীপচন্দী তালে গাওয়া হয়। বাঙ্গলা ভাষায় বহুল পরিমাণে গজল আমদানি করেচেন কাজী নজরুল ইসলাম। গজলের কথার হালকা ও চপল গতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েচে, তাঁর সুর নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ও উপযুক্ত কথার সমাবেশ তাঁর গজলকে বাঙ্গলা-গানে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়েচে। বাঙ্গলা গানের অপরাপর ষ্টাইলের পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

সঙ্গীতের ধারায় ধীরে ধীরে কয়েকটি প্রভাব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠচে। সাধারণের সঙ্গীত সম্বন্ধে দাবী এতদিন নেপথ্যে মূক ছিল, আজ সে ভাষা পেয়েচে; তাঁরা তাঁদের দাবী দাওয়া নিয়ে শিল্পকলার অঙ্গনে উপস্থিত হয়েচেন। সঙ্গীত এতদিন অনাদৃত ও উপেক্ষিত হ'য়ে অন্তরালে ছিল, তাতে তাঁদের সানুরাগ কৌতূহল সুখজনক ও বাঞ্ছনীয়। ওস্তাদরা নিরঙ্কুশভাবে এতদিন বিহার ক'রে এসেচেন, তাঁদের বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী, উৎকট কসরৎ, তানালাপে অপরিমিত সময় ক্ষেপণ, সঙ্গতিজ্ঞানের অভাব যদি তাতে সংযত হয় ত কারুর তাতে আপত্তি থাকবে না। আর এর ফলে ওস্তাদী গান ছাড়া ঠুংরী, টপ্পা ইত্যাদি ক্ষুদ্র সঙ্গীতে গায়কেরা ক্রমেই মনোযোগী হচ্চেন এবং গেয়ে ক্রমেই বুঝতে পাচ্চেন যে খেয়াল গায়কের সভাতেও ঠুংরী প্রভৃতি হালকা চালের গানে রসসৃজনের অবকাশ আছে। জীবনে বিস্তৃতি এসেচে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাকে অবহেলা করা চলে না, তা হ'লে উচ্চসঙ্গীত তার সমস্ত সম্পদসম্ভার নিয়েও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হবে।

কিন্তু এর আর একটা দিক আছে, যার দিকে চাইলে মন ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। সঙ্গত দাবী এক প্রবুদ্ধ জনমতের দ্বারাই সৃষ্ট হ'তে পারে। আমাদের উচ্চসঙ্গীতের প্রতি সাধারণের তাচ্ছিল্য হয়ত অজ্ঞানতাপ্রসূত, তাহ'লেও তার সমর্থন করা যায় না। দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত নিয়ে

পরিহাস করতে পারি, কিন্তু দক্ষিণীদের মধ্যে তার প্রতি শ্রদ্ধার অবধি নেই। উত্তর ভারতে এ জিনিষটার একান্ত অভাব। বাঙ্গলার বাইরে উচ্চসঙ্গীতের বোধশক্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও শোচনীয়। পশ্চিমে গায়কসম্প্রদায় উচ্চশ্রেণীর হ'তে পারেন, কিন্তু সমজদার শ্রোতার সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যে দিন দিন অল্প হ'য়ে আসচে। লক্ষ্ণৌতে সে দিন এক 'রইসে'র বাড়ী এখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়ালীর গান হচ্ছিল। ঠুংরী আর গজলে ক্লান্ত হ'য়ে গায়ক মধ্যরাত্রিতে মালকোষ ধরেচেন, আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনচি, অমনি হুকুম এল যে গান থামিয়ে দেওয়া হ'ক, কারণ শ্রোতারা বুঝতে পাচ্চেন না। ঠুংরী গজলের মূল্য নেই তা বলচি না, তাই ব'লে খেয়ালীকে উপর্য্যুপরি তাই গাইতে হবে এটাকে নিছক অত্যাচার ছাড়া কিছু বলা চলে না। উক্ত গায়ক একদিন আক্ষেপ ক'রে বলছিলেন, "পূর্ব্বে ঠুংরী আমি গাইতাম না, এখন ঠুংরী আর গজলের কেবল ফরমাস হয়।" শুধু যে এ দেশে এ রকম হয়েচে তা নয়, সুদূর য়ুরোপ ও আমেরিকায় সঙ্গীতের এই অবস্থা। সেখানে Jazz ব'লে শব্দবহুল সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েচে, যার মধ্যে সুরের চেয়ে যন্ত্রের খচমচির প্রাদুর্ভাবই বেশী। সে দিন একটি প্রবাসী বন্ধু বিলাত থেকে Jazz সম্বন্ধে আমায় একটি পত্র লিখেছিলেন, তিনি সেখানে একটি classical musicianএর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করতেন। একদিন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়েছিল।

One day I happened to ask him, "Herr Professor, what do you think of this Jazz madness ?"

The Professor smiled. He was turning over almost reverently the leaves of a very valuable book which contained in the manuscript an overture by Wagner. "I can only say that it shows how unmusical the English nation is," he said, "Over on the continent we still have our Wagner and Brahms but the English and the Americans no longer want music, all they want is noise."

"But don't you think," I suggested, "that there must be some merit in the sort of music which 'Everybody' seems to be wanting ?"

"No," he said resolutely, "most emphatically not. This 'Everybody' you speak of is a very foolish person. He has no taste, no emotions and no sense of beauty in him. He wants Jazz because he wants noise. The primitive instinct is once more rife in him and then nine people out of ten scarcely know what they want ; they want Jazz because every one else is wanting Jazz."

"Down in London," he continued, "it is the law of the herd. One man hangs a ridiculous golliwog on the back window of his car and everybody must do so the next day. One man speaks evil of classical music and it is fashionable to talk with disrespect about great masters like Beethoven, Bach or Wagner."

"Tell me, Herr Professor," I said, "what is this essential difference between the two musics —that is, if one can call Jazz music in any sense."

"It would indeed require a very great stretch of imagination to do so,—the difference is obvious from the very first. Real music is born— and not manufactured. It is born just as a child is born—naked, limp and formless—in the mind of a master. Then it takes shape and materialises,—it is nursed and grows mature. It wants the food of genius to keep it alive, but it owes nothing to public approbation or

disapproval. Indeed like all great thoughts it is hissed to begin with, but it goes out into the wicked world and storms mankind—then they fall on their knees and worship it—for mark me, the crowd is always like that—between its uproarious disapproval and passionate worship there is the thinnest of distinction. What more can you have? There is no taste, no culture, no discrimination—only a meaningless following of stupid conventions."

"They say," I interrupted, "that some of the greatest composers on the continent are secretly helping to evolve Jazz music."

The Professor was clearly ruffled, a rush of blood came to his cheeks. "It is the greatest tragedy of the modern world," he said, "that art cannot flourish without prostituting herself to the vile tastes of mankind. What will you have? We artists have to live."

উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ একই ব্যক্তির পক্ষে Beethoven-এর সঙ্গে Jazz ভাল লাগা সর্ব্বস্থানে অসম্ভব না হ'তে পারে, তাই ব'লে তাকে শুধু Jazz বাজাতে ও তৈরি করতে হবে এটা সীমাতিরিক্ত। সর্ব্বত্র ওস্তাদী পন্থীদের এই যে অভিযোগ উপস্থিত হয়েচে, তার মূলে সত্য আছে কিন্তু সমাধান কোথায় কে ব'লে দেবে? বলশেভিক যুগের সূচনায় উচ্চশ্রেণীর আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীতের প্রতি এই রকম বিজাতীয় ক্রোধ রাশিয়াতে দেখা গেল। সেখানে রব উঠল, "ভেঙ্গে ফেল বুর্জোয়াদের শিল্প-সাহিত্য।" এই অজুহাত হ'ল যে, "সাধারণে সে সব বুঝতে পারে না।" বুঝতে না পারলে বিনষ্ট ক'রে ফেলতে হবে এ প্রবৃত্তির ও নীতির অনুসরণ করতে মানুষের দ্বিধা হয় না। Tolstoy তাঁর What is Art-এ এই নীতি প্রচার ক'রে গেলেন; কিন্তু যা বললেন তাতে বিশ্বপ্রেমিকের পরিচয় পাওয়া যায়, সত্যান্বেষীর নয়। যাক্, তারপর খুব সম্ভব রাশিয়ার সুবুদ্ধি হয়েচে। উচ্চ সঙ্গীত যে কোনকালেই সর্ব্বসাধারণের কাছে আদর পাবে এ আশা সুদূরপরাহত এবং এ নিয়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও বিপ্লব অনন্তকাল চলেচে সে কথা নতুন ক'রে তুলে কোন লাভ নেই।

একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করলে গানে একটা renaissance বা নবযুগের আবির্ভাব হবে। কথাটা পুরোপুরি স্বীকার ক'রে নিতে খটকা লাগে। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে জগতের কোথাও শিল্পকলার উৎকর্ষ বা অভ্যুদয় দৃষ্ট হচ্চে না। শিক্ষা বলতে যা বুঝি তাতে জীবনের রসসৃষ্টিতে অন্তরায় এসে পড়েচে। শিক্ষা বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করতে পারে, বিস্তৃতি, সঙ্গতিজ্ঞান দিতে পারে, কিন্তু আর্টের মর্ম্মস্থানে পৌঁছে দিতে পারে না। প্রতিমা হয়ত গড়তে পারে কিন্তু প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। তারপর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আজীবন সাধনার একটা গুরুতর অংশ আছে সেটা আমরা ভুলে যাই। ভাল গাইয়েকে কি পরিমাণে নিবিষ্টচিত্ত হ'তে হয় এবং একটা রাগকে দশটা সমধর্ম্মী রাগের হাত থেকে বাঁচিয়ে গাইতে যে অখণ্ড কেন্দ্রীভূত মনোযোগের প্রয়োজন রয়েচে সেটা ভাল ক'রে বোঝা দরকার। ওস্তাদদের শত দোষ থাক, এ যুগেও যে তাঁরা সাধনার দিকটা অক্ষুণ্ণ রাখেন তার জন্য শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না। কিন্তু শিক্ষিত জনসাধারণ উদাসীন হওয়াতে গায়কদের সাধনার দিক ক্রমেই হ্রাস পাচ্চে। পূর্ব্বে গায়কদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজরাজড়ারা, তাঁরা যে খুব বোদ্ধা ছিলেন তা নয়, তবু গায়কদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না। এখন সাধারণে সেই প্রভুত্ব অন্যভাবে দাবী করায় জটিলতা এসে পড়েচে। অতীতের সবই ভাল ছিল, এ মনোভাব আমার নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে। সে দিন একজন উচ্চশিক্ষিত ও খ্যাতনামা গায়কের সঙ্গে উচ্চসঙ্গীতজ্ঞের দুরবস্থার কথা হচ্ছিল। তিনি ব্যথিত হ'য়ে বললেন, "Oh! no! no! we are not suffering. It is dear art that suffers." শিল্পীর পক্ষে হয়ত অভাব দারিদ্র প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল, কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে, যাকে অতিক্রম করা কোন প্রতিভারই সাধ্য নয়।

কাউকে দোষী করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি—আমরা যে যুগে গ'ড়ে উঠচি এ তারই ধর্ম্ম। অবসরের অভাবে, গতির উন্মাদনায়, কর্ম্মকোলাহলে কত সৌন্দর্য্য যে প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পিষ্ট, বিবর্ণ হ'য়ে জীবন থেকে ধীরে ধীরে নির্ব্বাসিত হ'য়ে যাচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য ত কই করি না। উপার্জ্জন উৎপাদনের হুড়োহুড়ি বেধে গিয়েচে, যেন মনুষ্যত্ব শুধু আহারে, মোটরে, বৈদ্যুতিক সাজসজ্জায় পর্য্যবসিত। তবে মানুষের বোধ হয় একটা অস্ফুট চেতনা আছে যে তার প্রাণ অন্নময় হ'লেও অন্নের জন্য প্রাণপণ করায় তার হৃদয় ভ'রে ওঠেনা। তা না হ'লে সংসারের এতদিনে জুটমিলের বা কলকাতার বড়বাজারের চেহারা হ'ত। বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের তথা-কথিত চরমোৎকর্ষে ইদানীং শঙ্কিত হচ্চেন। Eddington সম্প্রতি ছোট একখানা পুস্তিকায় লিখচেন, যেদিন তাঁর কাছে আর্ট বা প্রকৃতি প্রাণহীন হ'য়ে পড়বে, সে দিন তিনি যথার্থই ভীত হবেন। গত জুলাই-র Hibbert Journal-এ একজন বৈজ্ঞানিকের কয়েকটা কথা ভারি সুন্দর লেগেছিল।

"The ideals of the counting house and the market-place rule and select in every department of human effort. The more expensive forms of art, architecture, sculpture, drama and painting must meet the taste and win the comprehension of the successful financier.

* * * *

Science, applied to economic ends, is good and admirable in so far as it makes life easier and richer in possibilities for us all, but the perversion of scientific effort to exclusively economic ends would constitute the last and worst crime of commercialism.

* * * *

We must protect, if possible, from the blighting effects of commercialism, until the economic order of society had run its day and joined its predecessors among the discarded social instruments of the past. We need a great revival of disinterested ideals to hearten humanity to efforts which commercialism can never call forth. We would substitute a pure and an impersonal aspiration for which men will joyfully sacrifice themselves."—T. Brailsford Robertson.

রবীন্দ্রনাথ সেদিন আক্ষেপ ক'রে লিখেচেন, "বিজ্ঞানের বলে আজ আমরা সম্পদলাভ ক'রে চলেছি—কিন্তু যা পাচ্ছিনে সে যে বড়ো ভয়ানক, তাতেই আমরা মরচি—"

কিন্তু এ সব গেল ব্যক্তিগত বেদনা ক্ষোভের কথা, এবং তাও নিতান্ত মুষ্টিমেয় লোকের। মানুষ উচ্চশ্রেণীর আর্টে যদি বীতস্পৃহ হ'য়ে পড়ে তবে কয়েকজন ব্যথা পাবেন, প্রতিবাদও হয়ত করবেন, কিন্তু রোধ করতে পারবেন না। সংসারের গতিচক্র বেদনার মুখাপেক্ষা করে না, হৃদয়ের দাবী তার কাছে বাহুল্য মাত্র এবং 'সেন্টিমেণ্ট' দুর্ব্বলতা বা বুদ্ধিহীনতার নামান্তর। এমন দিন যদি আসে যে, Radio এবং Talkies-পরিবেষিত মার্কামারা আর্ট, ওজোন দরে ও mass-production নিয়মানুসারে সরবরাহ হয়, তখন অতীতের গরিমা নিয়ে শিল্পী হয় অস্তমিত হবেন, না হয় প্রাণের দায়ে সহযোগিতা করবেন। কিন্তু ভবিষ্যতের সকল পথই অজানিত ইঙ্গিতে আকীর্ণ, তাই সেই অনাগত রহস্যময়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে প্রবন্ধ শেষ হ'ল।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

শেফালি

—উপন্যাস—

—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

৯

সকাল বেলা খোকাকে আমার কোলে দিয়া শেফালি বলিল, "দিদি সুকুয়াটা আজ পালিয়েচে।"

"পালিয়েচে? জ্বালালে আর কি," বলিয়া আমি রান্না-ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম।

শেফালি বলিল, "কাল্‌কের এঁটোকাঁটা কিছুই ধোয়নি—ঘরটাত ধুয়ে রাখে নি—ভারী শয়তানী শিখেছে এখন!"

শেফালি তাড়াতাড়ি কাজে চলিল, আমি একটু ভদ্রতা করিয়া বলিলাম, "দাঁড়াও আমিও আস্‌ছি। খোকাটাকে ঠাকুরপোর কোলে চড়িয়ে দিয়ে আসি।"

শেফালি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি এসে কি কর্ব্বে? আমি ওসব একলাই পারব।"

"পারবে ত জানি। এত কাজ একা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমার ব'সে থাকাই ত অন্যায়।"

"অন্যায় আবার কি! সবাই কাজ কল্ল ত খোকনকে নেবে কে? ঠাকুরপো কতক্ষণ রাখবে? কাঁদিয়ে টাঁদিয়ে দিয়ে যাবে এখন!"

ঠাকুরপো তখন বাহিরের ঘরে যাইতেছিল, কথাটা তাহার কানে যাওয়াতে সে আমার ও শেফালির মাঝখানে আসিয়া বলিল, "আমার নিন্দে হচ্ছে—বটে! কবে আমি তোমাদের খোকনকে কাঁদিয়ে টাঁদিয়ে দিয়েছি? বড় যে সল্লা হচ্ছে দুজনে মিলে!"

বলিলাম, "আঁহা সল্লা আবার কি? সুকুয়াটা আজ আবার পালিয়েচে, শেফালি একা সব কর্ত্তে চল্ল, আমায় কিছু ধর্‌তে দেবে না;—বলে খোকা তোমার কাছে থাক্‌বে না।"

"অতিবুদ্ধি সব সময়ই জেতে না!" বলিয়া শেফালি ঠাকুরপোর দিকে চাহিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "শেফালি কিন্তু খাটতে খুব দড়।"

"গুণোবাচ্যা শত্রোরপি—আপনার ঔদার্য্য-গুণ আছে একথাটা স্বীকার কর্ত্তেই হবে!"

ঠাকুরপো হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, আমি খোকাকে লইয়া উপরে আমার ঘরে গেলাম।

শেফালি দিন রাত খাটে—আরাম বিরাম অবকাশ নিরবকাশ কিছুর দিকেই গ্রাহ্য করে না; বলে, বসিয়া থাকিলে তাহাকে বাতে ধরিবে। লোকের কাছে বলিলে লোকে ইহার ভিতর কিছুই অসম্ভব বা অতিরিক্ত দেখিতে পায় না—কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই,—বসন্তের সঞ্চারিণী লতার মত, অনবদ্য সৌষ্ঠব-শ্রী-সমন্বিত স্নাত্রে বা পরাঙ্গপোর মর্ম্মর-প্রতিমার মত লঘু সুঠাম নিখুঁৎ নিটোল এই তনুলতা—ইহার ভিতর ব্যাধির বাসা কোন্ খানে! কোনো কারণ নাই, বাধ্যবাধকতা নাই, লাভ নাই, লোভও নাই—সম্ভবতঃ পুণ্যও নাই,—তবু এ মেয়ে এমন করিয়া খাটিয়া মরে কেন? আর শুধুই কি এ যত্ন? যথার্থ মনের টান না থাকিলে মানুষ কি কখনও এমন সর্ব্ব-ব্যাপক দৃষ্টি ও সর্ব্বংসহা ধৈর্য্য লাভ করিতে পারে? তাহাকে আমার বলিয়াও দিতে হয় না—আমি কি চাই না চাই—কি ভালবাসি না বাসি। কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সে আমার তৃপ্তি সাধনে তৎপর; ইহা যদি কাপট্য হয়—তবে আন্তরিকতা আর কাহাকে বলিব!

বাদ্‌লা দিন, জানালা দিয়া হুহু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে আসিতেছিল। খোকাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতে উঠিলাম। খোকার যদি কোনও রকমে ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়—তাহা হইলে শেফালি আমার অপটুত্ব ও অমনোযোগিতার দোষ দিবে সবার আগে।

ঠাকুরপো আছেন অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট—নালিশ রুজু হইতে না হইতে অকাতরে রায় দিয়া বসিবেন, "আপনি খোকার মা হওয়ার উপযুক্ত নন,—সুতরাং আপনার মা হওয়াটা নাকচ ক'রে দিয়ে সে পদটা বৌঠানকে দেওয়া গেল।" কি যে ঠাকুরপোর কথার শ্রী—যা মনে আসে তাই বলিয়া বসে!

ভাবিতে ভাবিতে নীচের দিকে চাহিলাম,—শেফালি রাজ্যের বাসি বাসন বাহির করিয়া কলতলায় মাজিতে বসিয়াছে। খোঁপা খুলিয়া পিঠের উপর চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাসন মাজার সঙ্গে সঙ্গে লালা-চঞ্চল কালো ভুজঙ্গিনীর মত সে গাঢ়-কৃষ্ণ তরঙ্গিত কেশদাম হিল্লোলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, ঝাঁপাইয়া মুখের উপর নামিয়া পড়িতেছে। আমি নিষ্পলক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমি চম্পকবরণা গৌরী—শেফালি নব কিসলয়োজ্জ্বল শ্যামা—তবু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সে আমার চেয়ে সহস্রগুণে সুন্দরী। তাহাকে দেখিলে কবি বলিতে পারে—

"করবী ভয়ে চামরী রহল গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে,
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে।
ভুজ ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহুঁ,
কর ভয়ে কিসলয় কাঁপে—"

সুতরাং 'ঐ ছন পরতাপে' তাঁহার পুরুষের হৃদয় তাহার কাছে যদি নত হয়—তবে দোষ দিব কাহাকে!

দীপশিখার মত আলো-করা, পূর্ণিমার মত কুহকময়, —নব প্রভাতের মত তরুণ-মোহমন্ত্র এই রূপকে "দূরে রহ" বলিয়া কে উপহাস করিতে পারে! আমি যে নারী—আমিই কি তাহার কোনও প্রভাব অনুভব করি নাই? পদ্ম-কোরকের মত লালিমা-বিমণ্ডিত ধনু-মধ্যবৎ-বঙ্কিম বিভঙ্গিম ঐ দুটি ওষ্ঠ-পুট আমার হৃদয়ের কাছে কি কোনো আমন্ত্রণ পাঠ করে নাই? নিবিড়-কৃষ্ণ পক্ষ্ম-ছায়ায় দুটি চকিত-চঞ্চল কমল-নয়নের ছল ছল দৃষ্টি কি আমার মনের কাছে কোনো আহ্বান প্রেরণ করে নাই?

রূপ না-কি রজ্জুর মতন। কিন্তু কথাটা ভুল। দড়িতে ফাঁস লাগাইয়া গলায় দিয়া টানিলে তবে মানুষ মরে—দড়ি আপনি কাহারও গলায় ত জড়াইয়া যায় না। কিন্তু রূপ সহসা উদ্যত-ফণা ফণীর মত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিষ-দংশনে মানুষের বধ-সাধন করে।

পথের ধারে একা পথিক নিশ্চিন্ত মনে চলে, সহসা অদৃশ্য কোন্ তরুতল হইতে কাল ভুজঙ্গম তাহাকে তাড়া করে—প্রাণপণে দৌড়াইয়াও সে তাহার কবল হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারে না, যে দিকে যায় সাপ ফণা মেলিয়া পিছনে পিছনে সেই দিকে ছোটে!

এ ত গেল সাধারণ সাপ—সহসা দৃষ্টিপথে পড়িলে মানুষ যাহাকে ছেঁচিয়া মারিয়া ফেলে—ধরিবার জন্য উপায় খোঁজে না। কিন্তু শেফালি 'মণিনা ভূষিতঃ' ভয়ঙ্কর সর্প। তাহার অক্লান্ত সেবা, নিরলস যত্ন, অকুণ্ঠিত কর্ম্মতৎপরতা, অটল ধৈর্য্য, নিরবচ্ছিন্ন পরসুখ-প্রচেষ্টা—অতুলন ও অসাধারণ গুণরাশি মণির মত তাহার ফণার উপরে জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া যাহার মন মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করে—সে কি করিয়া আত্মস্থ থাকে!

আমার শোওয়ার ঘরের নীচে ওঁর বসিবার ঘর। সেখানে দরজা বন্ধ করার শব্দ হইল; অনুমানে বুঝিলাম, উনি বাড়ীর ভিতর আসিতেছেন; জানালার খড়খড়ি দিয়া আমি নীচের দিকে চাহিয়া রহিলাম। উনি আসিলেন,—খালি পায়ে ধীরে সন্তর্পণে দ্বিধা-জড়িত পদক্ষেপে—তাহার পর নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাসন ধোয়া শেষ করিয়া দুই হাতে বাসনের পাঁজা ধরিয়া শেফালি চলিতে গিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িল। উনি ছিলেন শেফালির পিছনের দিকে, কাজেই শেফালি তাঁহাকে দেখে নাই—কিন্তু উনি যে শেফালিকে দেখিয়া তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিলাম। উভয়ের মুখই আমি দেখিতে পাইতেছিলাম, মৌন ঔৎসুক্যের গোপন বহ্নিতে তাঁহার চক্ষু জলদর্চ্চি-দীপের মত প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে

চক্ষু সম্মিলিত হইতেই শেফালি বিবর্ণ মুখে থমকিয়া পিছু হটিল—তাহার থর-কম্পিত হস্ত হইতে বাসনের পাঁজা স্খলিত হইয়া সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল, তিনি নিনিমেষ নয়নে কুণ্ঠিত লজ্জা-বিহ্বল চলৎ-শক্তি-হীন শেফালির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি সে চাহনি! বুভুক্ষায় ক্লিষ্ট, বেদনায় দীপ্ত, বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত এ কি চাহনি! একটা প্রচণ্ড ঈর্ষা, একটা তীব্র জ্বালা, একটা রুদ্র রোষ আমার সমস্ত হৃদয় দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিতে লাগিল।

আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে ঠাকুরপোর ঘর—বাসন পড়ার শব্দ শুনিয়া ঠাকুরপো তাহার ঘরের জানালা হইতে মাথা বাড়াইয়া চকিতে অপসৃত হইয়া গেল। তাহার কুণ্ঠিত ত্বরিত ভাবটুকু আমাকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিল যে, ঠাকুরপো মুখে আমাকে যাহাই বলুক না কেন, সে নিজে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে খুব বেশী অজ্ঞ নহে।

কতক্ষণ আমি চিন্তামগ্ন হইয়াছিলাম বলিতে পারি না, তাঁহার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল; উনি বলিতেছিলেন, "আমি আজ ভাত খাব না—তাই বল্‌তে এসেছি।"

বলিলাম, "ঝী চাকর নেই ব'লে ভাত খাবে না?"

"আমি না খেলে বুঝি আর হাঁড়ি চড়্‌বে না! তা নয়, দেশবন্ধুর মৃত্যু বাসরে—"

"সে আবার কবে থেকে সুরু? এই ত সেদিন বঙ্গের আরেক জ্যোতিষ্ক আশুতোষ মুখার্জ্জি বঙ্গ অন্ধকার ক'রে গেলেন—তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ত উপবাস কর নি!"

"ঐ তোমাদের দোষ। নতুন একটা কাজ কর্ত্তে গেলেই তোমরা খড়্গ-হস্ত হ'য়ে ওঠ! যে হেতু এ কাজটা আমি কাল করি নি সেই হেতু আজও কর্ব্ব না—এ কি সুযুক্তি হ'ল!"

"কে তোমায় কি কুযুক্তি দিচ্ছে! ব্রতাচরণ ক'রে উপবাস কর্ব্বে, সে ত পুণ্য কর্ম্ম। অর্দ্ধভাগিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি, আমাকে ত তোমার অর্দ্ধেক ভাগ দেওয়া উচিত ছিল!"

"অর্দ্ধেক ভাগ কিসের? পুণ্যের না উপবাসের?"

"দুয়েরই। দাবী ছাড়্‌ব কেন?"

"ওঃ, দাবী!"

"জিনিসটা অতি বিশ্রী?"

"না।"

"না? এই লোহার জিঞ্জির বিশ্রী নয়?"

বলিতে বলিতে আমার চক্ষু বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া আসিল, আমি চক্ষু নত করিলাম। উনি অন্যদিকে চাহিয়াছিলেন—সুতরাং তাহা লক্ষ্য করিলেন না; বলিলেন, "জিঞ্জির ত নয়। জীবনে যা সব চেয়ে খাঁটি ও সত্যকার জিনিস—তাকে ও নাম দেওয়া যায় না।"

আমি তাঁহার মুখের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলাম, আমার কপোল বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"পাগল না কি তুমি? ছিঃ!" বলিয়া আমাকে বুকের ভিতর টানিয়া নিলেন।

বলিলাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব—খাঁটি উত্তর দেবে?"

"জিজ্ঞাসা কর্ব্বে তুমি যত ছাই-ভস্ম, আমি তার কি উত্তর দেব!"

অভয় দিয়া বলিলাম, "না, সে সব কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্ব না। সত্যি বল ত, ভালবাস আমায়?"

"এতদিন পরে এ কি প্রশ্ন সুরো।"

অর্দ্ধেক হাসি অর্দ্ধেক কান্নার ভিতর আমি বলিলাম, "শুধু কি আজকার এ প্রশ্ন? এ প্রশ্ন যুগ-যুগান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের, নিখিল কালের, অক্ষয়—অনাদি—অনন্ত এ প্রশ্ন। মরণের শেষ মুহূর্ত্তেও এ প্রশ্ন আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ব্ব—আর তুমি উত্তর দেবে।"

"আচ্ছা দেব।"

"খাঁটি উত্তর কিন্তু—"

বেদনা-দিগ্ধ হাস্যে বলিলেন, "আচ্ছা।" যে কান্না আমার চোখে অশ্রু হইয়া ঝরিতেছিল, সেই কান্না তাঁহার মুখে হাসি হইয়া ফুটিল।

১০

দেখিতে দেখিতে ঠাকুরপোর রাঁচি যাওয়ার দিন আসিয়া পড়িল। রওনা হইতে হইবে রাত্রিতে, শেফালি

বিকাল বেলা ঠাকুরপোর ট্রাঙ্কে জিনিষ-পত্র সব ভরিতে লাগিল। ঠাকুরপো বসিয়া বসিয়া দেখে—আর এটা ওটা বলে।

অপরাহ্নের স্বর্ণ-বর্ণ রৌদ্র ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল, দেয়ালের পাশে চাঁপা ফুলের পুষ্প-পীত শাখা সে আলো লাগিয়া জ্বলিতে লাগিল। নীচ হইতে এক ঝাঁক পতঙ্গ কনকাঞ্চিত রক্তপাখা নাচাইয়া জানালার কাছ পর্য্যন্ত উড়িয়া আসিল। বকুলের নিরবচ্ছিন্ন পল্লবের ভিতর হইতে একটা পাখী ডাকিল—অতি করুণ কোমল স্বর।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওটা কি পাখী ডাকছে?"

ঠাকুরপো হাসিয়া বলিল, "যে পাখী-ই ডাকুক্—ও কপোত-কূজন নয়।"

"যাও," বলিয়া আমি মুখ ফিরাইলাম।

শেফালি বলিল, "ও বোধ হয় ঘুঘু। ওর ডাক আমার কাছে বেশ লাগে।"

ঠাকুরপো ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বল্লেই হোল ঘুঘু, দেখেচেন কোনও দিন?"

শেফালি বলিল, "চেহারা দেখি নি বটে—কিন্তু ডাক শুনেছি। আরেকদিন—আরেক জন বল্লে—ঐ ঘুঘু।"

"আমি যদি বলি, এই শেলির স্কাইলার্ক, বা কীট্সের নাইটিঙ্গেল?"

আমি বলিলাম, "বল্লেই হ'ল আর কি! এটা কি শেলির জন্মদেশ?"

"নাই বা হোল শেলির জন্মদেশ, নাই বা হোল ও স্কাইলার্ক নাইটিঙ্গেল—হ'য়েও থাকে যদি ও ময়না টিয়ে তোতা, ডাহুক টিট্টিভ যাহোক্ একটা কিছু—তবু আমি ভেবে নেব এ সেই অপূর্ব্ব স্বর-সুধার পাগল-করা উদাস-করা আকুল-করা লোকান্তরের সেই পাখীটি—যে কবির গানের আসনের উপরে একদিন পাখা মেলে বসেছিল।"

"তোমার কবিত্ব-গঙ্গায় জোয়ার ডাক্‌ল কোন্ চন্দ্রের আলোতে?"

"বলি যদি—দুদিক্ থেকে দুজনে কোলাহল তুলবেন।"

আমি শুধু বলিলাম, "আহা!"

"যেতে হবে আর দেরী নাই—তাই শুধু মনে হচ্চে এখন। মনে হয় একটু কাঁদি—তাও পার্‌ছিনে—সেই কান্নাটা মনকে মথিত ক'রে কবিত্ব হ'য়ে উঠ্‌ছে। কি ক'রে সেখানে দিন কাটাবো? একটুও কিছু ভাল লাগ্‌বে না!"

"যা কম্‌প্লিমেণ্ট্ দিলে বাধিত হ'লুম। কিন্তু আমরা দুজন এখানে—কার ভাগে কতটা দিলে ঠিক্ ক'রে দাও।"

"সমান ভাগ! আমার কাছে অবিচার নেই! অর্দ্ধেক আপনি, আর অর্দ্ধেক উনি।"

"আর বাড়ীর কর্ত্তা?"

"বৌঠান ভারী জ্বালান্। যত কূটপ্রশ্ন আপনি তুল্‌তে পারেন! রাখুন ও সব এখন। বিদেশ যাচ্ছি—এবার সময় থাক্‌তে বলুন—কার জন্য কি আন্‌বো সেখান থেকে! বড় বৌঠানের বোধ হয় পায়রার ডিমের মত এক ছড়া মুক্তোর হার পছন্দ হবে—"

এমন সময় 'হিরণ' বলিয়া উনি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আমি দরজার ও-পিঠে পর্দ্দার আড়ালে, সুতরাং আমাকে উনি দেখিতে পাইলেন না। আমি পর্দ্দার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

ঘরের একটি মাত্র দরজা, সেই দরজার উপর উনি দাঁড়াইয়া। শেফালি তাঁহাকে দেখিয়া ত্রস্তে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরপো অকারণ ব্যস্ততা দেখাইয়া তাহার গোছানো চিঠির তাড়া খুলিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া আবার গুছাইতে লাগিল।

কি বলিতে আসিয়াছিলেন জানিনা, বোধ হয় তাঁহারও সে খেয়াল ছিল না, ম্লান-মৌন দৃষ্টিতে শেফালির দিকে আত্ম-বিস্মৃত ভাবে চাহিয়া রহিলেন। একটা তীব্র চীৎকার আমার কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল, আমি শক্ত করিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিলাম।

ঘরের ভিতর তিন জন প্রাণী, তিনজনই নির্ব্বাক, সেই অশোভনত্বটুকু অনুভব করিয়া উনি কপাট ছাড়িয়া ঠাকুরপোর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন; শেফালি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, "আজিই তবে যাচ্ছিস্?"

ঠাকুরপো উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ যাই আজই, আবার কবে দিন ভাল পড়ে না পড়ে—সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি!"

সাম্‌নেই ঠাকুরপোর বিছানা বাঁধা ছিল, তিনি তাহার উপর বসিয়া বলিলেন, "আজ না হয় না গেলি, আর দুটো দিন থেকে যা।"

"কাকাকে লিখে দিয়েছি ষ্টেশনে লোক রাখতে, না গেলে তাঁরাও ত চিন্তিত হবেন।"

ঠাকুরপো টেবিলের উপর হইতে টাইম্-টেব্‌ল, ধোবা বাড়ীর কয়েক খানা কাপড়, ও নূতন-কেনা গেঞ্জির বাক্স ট্রাঙ্কের ভিতর ভরিল, ও লাগেজের জন্য মনোযোগ সহকারে লেবেল্ লিখিতে লাগিল।

সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঠাকুরপোর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "তুই আজ যেতে পারবি না হিরণ—তোর থাক্‌তে হবে।"

একটা অসম্বরণীয় আকৃতিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। ঠাকুরপো সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ যেতে আপনার যদি এত আপত্তি থেকে থাকে তবে না হয় না-ই গেলাম।"

কতকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া উনি বলিলেন, "তোকে একটা কথা বলব।"

লেবেলের কাগজ ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া ঠাকুরপো বলিল, "বলুন।"

"এখানে নয়—বাইরে চল্।"

কি কথা উনি বলিতে যাইতেছেন তাহা ভাবিয়া ঠাকুরপো খানিকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরে যাওয়ার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "চলুন তবে।"

বাহুর ভিতর বাহু নিবদ্ধ করিয়া দুই ভাই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি নিস্পন্দ হইয়া যেখানে ছিলাম সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ
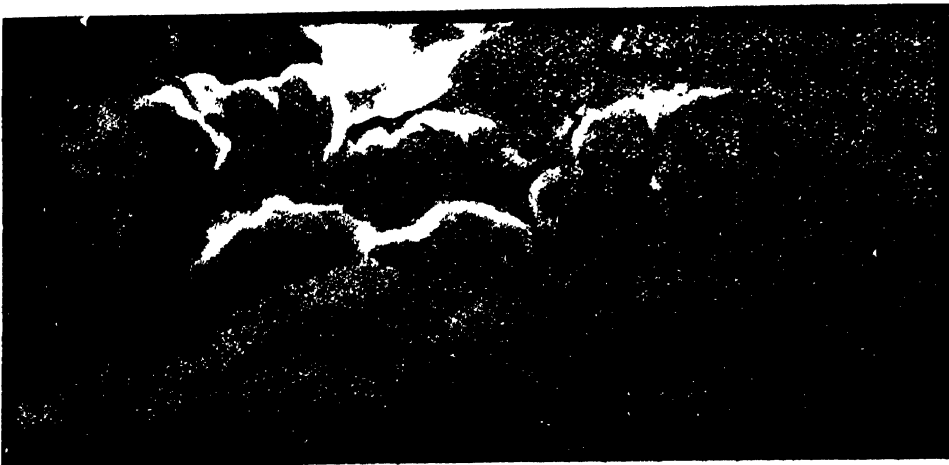
আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

আলোচনা

শ্রীমতী আশাবতী দেবী

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদের জন্মদাতা এই নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে শ্রীঅনিলবরণ রায় আর কিছু না হোক্ কিছু অভিনব মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই—রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী, আবার সেই দুঃখও তাঁর ব্যক্তিগত ভাববিলাস, শরৎচন্দ্রের মত সমাজের দুঃখ বুক পাতিয়া গ্রহণ করা নয়। তাঁর কাব্যের প্রকৃতি রাজসিক, এবং যদিও রাজসিকতা সাধন-পথের দ্বিতীয় স্তর, তবুও সেই স্তরের ঊর্দ্ধে যে পরমাশান্তির অবস্থা সে স্তরের বার্ত্তা তাঁর কাব্যে নাই। রাজসিকতা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয়—কিন্তু তাঁহার রাজসিকতাও আবার মৃত্যুসুরের খেলা। রায় মহাশয় দেশকর্ম্মী; সেজন্য কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মন্তব্যগুলি কিছু একদেশদর্শী হয়েছে। দুঃখবাদী কথাটি একবার ব'লে ফেলে তিনি প্রমাণস্বরূপ কবির কর্ম্মের জীবনের আনন্দের গানগুলিকে রাজসিক পর্য্যায়ে ফেলে, সেই নিত্য-চঞ্চল প্রাণ-প্রবাহের ধারাকে তিনি কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের রাজসিক প্রকৃতির সংঘর্ষপ্রিয়তা বলেছেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে এই অভিযোগের উত্তর সুন্দর ভাবেই দিয়েছেন ও এই বিষয়ে আরো আলোচনা করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর আশা আনন্দ ও শান্তির, এবং প্রকৃতি সাত্ত্বিক এই আমাদের বিশ্বাস।

অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দোষ গুণ বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যতদূর জানি এ সাহিত্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের নাগপাশ কাটিয়ে মৌলিক ভাবের রচনার জন্য দাবী ক'রে থাকেন। এ যদি সত্য হয়, তবে রবীন্দ্র-নাথই আধুনিক অস্বাস্থ্যকর দুঃখবাদের জন্মদাতা, এ কথা বলা চলে কি?

"আরো আঘাত সইবে আমার" এবং "নিঠুর এই করেছ ভালো" এই দুটি গানকে অনিলবাবু রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব'লে ধরেছেন। "ভগবান যত বেদনা, যত দুঃখ দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না, তিনি আরো চান।" আমাদের বিবেচনায় ইহাকে দুঃখবাদ বলা চলে না; দুঃখের অতীত যে আনন্দলোক আছে সেই লোকের আশ্বাসে দুঃখেও কাতর না হওয়া এবং আত্মার সবলতায় বিশ্বাস করা, সুতরাং প্রকৃত আনন্দবাদ ইহাই।

অনিলবাবু বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যে অন্তর্গূঢ় আত্মা রহিয়াছে, তাহা আরও গভীর পূর্ণ আনন্দ চায়। সে আনন্দ রিক্ততার নহে, তাহাই পূর্ণ আনন্দ। তাহা মৃত্যুর শান্তি নহে, তাহাতেই জীবনের সকল শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ও সমন্বয়।" সত্য কথা; এও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের সন্ধানই আমাদের দিয়েছেন। "আনন্দ হইতে এই জীবগণের জন্ম, আনন্দে বসতি ও আনন্দেই মহা প্রয়াণ"—উপনিষদের এ মহাবাক্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের মেরুদণ্ড। কিন্তু দুঃখকে অস্বীকার ক'রে এ আনন্দ লাভ করা যায় না। দুঃখের উপরে উঠতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখ সেই জন্যই স্থান পেয়েছে। অন্য দুঃখের কথা থাক্, এমন একটা দুঃখের কথা বলি যা স্বাধীন পরাধীন সকল লোককেই বোধ হয় পেতে হয়—প্রিয়জনের মৃত্যুশোক। সেই শোকে এই সান্ত্বনা থাকে যে ভগবান আঘাত দিয়ে নিজের স্পর্শ মনে এনে দিচ্ছেন, আঘাতের দহনজ্বালা নিভে গেলে তাঁর আনন্দরূপই মনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জ্ঞান যখন হয় তখনই জীব শান্তি পায় ও "আরো আঘাত" সহ্য করবার প্রয়োজন হ'লে সে শক্তি পায় ও "নিঠুর করেছ ভালো" এমন কথা বলবারও ক্ষমতা হয়। এ কথা মনে রাখা দরকার যে কবি নানাদিক থেকে জীবনকে দেখেন, সেইজন্য

কখনো তিনি আনন্দে আত্মহারা, কখনো দুঃখে মুহ্যমান—এ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সে হিসাবে তো রবীন্দ্রকাব্যে নৈরাশ্যের কথা কোথাও নেই। তিনি দুঃখকে ভাববিলাস করেছেন একথা বলা অবিচার হয়—দুঃখের মধ্যেও আনন্দময় ভগবান তাঁর অন্তরাত্মার সম্মুখে।

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান;
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্ব্বনাশ।" (পূরবী. ১৯০ পৃঃ)

এই বাণী কি রাজসিক না সাত্ত্বিক, দুঃখবাদীর না আনন্দবাদীর সে বিচারের ভার পাঠকদিগের উপর।

"দুঃখকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই তিনি বরণ করিয়াছেন"—সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকই এরূপ করে, রাজসিক প্রকৃতির লোকে অসহিষ্ণু হয়। যে সাত্ত্বিকতার আনন্দকে অনিলবাবু ভারতবর্ষের আদর্শ বল্‌তে চেয়েছেন, সে সাত্ত্বিকতার স্বরূপ তবে কি? সুখ ও দুঃখ দুইই ভগবানের লীলা এবং সুখে দুঃখে অবিচলিত প্রসন্নতাই তো ভারতীয় আদর্শ। দুঃখে অবিচলিত থাকা যায় না যদি দুঃখকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব'লে মেনে নিতে না পারা যায়। এই মেনে নিতে পারিলেই অন্তরে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায়।

"দুঃখ না থাকিলে জীবন শূন্য, আস্বাদহীন, দুঃখের আনন্দই তীব্র আনন্দ—রবীন্দ্রনাথ শুধু সেই আনন্দেরই মর্ম্ম বোঝেন" অনিলবাবুর এ মন্তব্যটি নিতান্তই অবিচার। অস্বাস্থ্যকর দুঃখের উপাসনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুর এই যদি সত্যই অনিলবাবুর মত হয় তবে তাঁকে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ নাহোক নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলিই আর একবার ভাল ক'রে প'ড়ে দেখ্‌তে বলি। দুঃখভোগ ছাড়া মুক্তি নেই এই যদি কবির মত হ'ত তবে তিনি লিখতেন না—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।—নৈবেদ্য

"দুঃখের গান"গুলির পাশেই তাঁর আনন্দের গানগুলি সাজিয়ে দেখ্‌লে এ বিষয়ে ভুল ধারণা আর থাকে না। সমগ্র গানগুলি উদ্ধৃত করবার স্থানাভাব, পাঠকগণ সকলেই নিজ নিজ বই খুলে দেখে নেবেন। সম্পাদক মহাশয় যেগুলি উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি আমি আর করলাম না।

"তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে" - নৈবেদ্য
আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো
আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো মিলালো।—গীতাঞ্জলি
"নদী পারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি" গীতাঞ্জলি
যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেই খানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।—গীতাঞ্জলি
ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান
হে আমার নাথ এইতো তোমার দান।—গীতাঞ্জলি
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।—গীতাঞ্জলি
গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর।
হেথায় তিনি কোল পেতেছেন—গীতাঞ্জলি
এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে, তব আনন্দ মহা সঙ্গীতে বাজে।—গীতাঞ্জলি
জননী তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজিকে অরুণ কিরণ রূপে—গীতাঞ্জলি
আকাশতলে উঠ্‌ল ফুটে আলোর শতদল—গীতাঞ্জলি

আনন্দ কথাটি না থাকলেই যদি গান আনন্দের না হয় তবে অবশ্য বক্তব্য আর কিছু থাকতে পারে না।

"যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে"

এই দুটি ছত্র অনিলবাবু দুঃখবাদের প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন—কিন্তু আরম্ভের লাইনগুলি তুলে দিলেই প্রতীয়মান হবে যে এটি দুঃখের গান নয়:—

"যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হ'য়ে তরুলতায় ঘাসে
যে আনন্দে দুই পাগলের মত
জীবন মরণ বেড়ায় ভুবন ঘিরে।" —গীতাঞ্জলি

"আরো আঘাত" গানটিতে একটি ছত্র আছে—"মৃদু-সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরোনা"—সুতরাং অনিলবাবুর মতে ইহা রাজসিকতা। যে জাতির মধ্যে যতটা ভাল উপাদান থাকে, সে জাতি ততই বিরুদ্ধ সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে। এ যুগে ভারতবর্ষে এই ভাবেরও প্রয়োজন আছে একথা তিনি স্বীকার করেন—কিন্তু কেবলমাত্র এই ভাবকেই চরম আদর্শ ব'লে ধরে রাখা, উর্দ্ধগতিতে যাবার চেষ্টা না করা তিনি ভারতীয় পরাশান্তির আদর্শচ্যুতি মনে করেন। আমাদের মনে হয় এই উর্দ্ধতম অবস্থার দিকে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্টই দৃষ্টি আছে।

"মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।"—গীতাঞ্জলি

বা

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় বলে, ধুলায় ধুলায় লুটিয়া—
তেমনি সহজে আনন্দে হরসিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত
পূজা শতদল আপনি সে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া।—নৈবেদ্য
"আঁধারে আবৃত ঘনসংশয়"—নৈবেদ্য ;
"আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে"—গান

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা" গানটি বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচন করেছে ব'লে এতদিন জানতাম। জাতীয় উন্নতির বিঘ্ন ঘটতে পারে এ মনোভাব থেকে সেটা জানা ছিল না। আমি যেন বিপদে না পড়ি এ প্রার্থনা করা বিফল, কারণ সুখের পাশে দুঃখ, দুঃখের পাশে সুখ, এই ভাবেই জীবন। কিন্তু বিপদে পড়লে যেন সে বিপদ হ'তে উদ্ধার পাবার মত জীবনীশক্তি আমার থাকে। এ প্রার্থনা কি দুর্ব্বলতার লক্ষণ? না, ভারতীয় আদর্শের বিরোধী? যদি বিরোধীই হয়, তবু এ মনোভাব আমাদের জাতির কল্যাণজনকই হবে। মানুষের আত্মা যে গভীর পূর্ণ অখণ্ড আনন্দ চায় সে আনন্দ লাভ করতে হ'লে দুঃখ বিপদে অভিভূত না হবার মত ক্ষমতা থাকা দরকার। তাতে এই বুঝায় না যে দুঃখই আমার প্রিয়। বস্তুতঃ আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ও সুখ দুইটির উপরই সমান জোর দিয়েছেন।

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
সে যে ঘেরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমার পতাকা শিরে বয়। গীতালি

তাঁর কাব্য প'ড়ে আমরা এই বুঝেচি যে অন্যের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ সমস্তই তিনি নিজের মনে প্রাণে অনুভব করেন, নিজেকে ব্যথিত পীড়িতদের স্থানে দাঁড় করিয়ে তাদের মনোভাব তিনি অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কখনো নিজের, কখনো বা অপরের সুখ দুঃখের তরঙ্গ তাঁর গানে ফুটেছে বটে, এবং তমোভাব কাটিয়ে উঠবার জন্য যে রাজসিক ভাবের প্রয়োজন, তাও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট আছে বটে, তবু সেইটুকুতেই তিনি তৃপ্ত নন। সাত্ত্বিকতা ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রেমবশতঃ যে পরমা শান্তি পবিত্রতার ভাব তা সর্ব্বদাই তাঁর লেখায় অন্তর্গূঢ় ভাবে থাকে। অতি চপল চটুল ছন্দের কবিতাতেও এ ভাবের আভাস আছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই মর্ম্মার্থ যাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়নি, তাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের রস গ্রহণ করতে পারবেন না। নিগূঢ় রস ও suggestiveness-এই তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। নৈবেদ্যর "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমিই নীড়," কবিতাটি এই প্রসঙ্গে পড়তে পাঠকদের অনুরোধ করি। আরও :—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর—
তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধ সম,
হে বিশ্বমোহন নাথ— নৈবেদ্য

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জ্জনধামে। —নৈবেদ্য
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ। —নৈবেদ্য

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ও পরমাশান্তির রূপ কি অনবদ্য ভাবেই এই কয় ছত্রে বিকশিত হয়েছে—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে,
যতদূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।

দর্শনের pleasureবাদ যেমন, কর্ত্তব্যবাদেরই নামান্তর, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদও তেমনি প্রকৃতপক্ষে আনন্দবাদই। দুঃখকে জয় ক'রে—তাকে আনন্দে রূপান্তরিত করা এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত অহৈতুক আনন্দ এ দুইই তাঁর ছত্রে ছত্রে প্রকাশ। বস্তুতঃ আনন্দের উজ্জ্বল বার্ত্তাই তিনি দেশকে এতদিন ধ'রে শুনিয়ে আসছেন। জাগো, জীর্ণ বিশ্বাস, সংস্কার ছেড়ে এসে, দেখ ভগবানের হাতের দান এই ধরণী কি সুন্দর। দুঃখে মুহ্যমান হোয়োনা—দুঃখ তো দুদিনের, তোমরা কি ধাতুর তৈরী সেটুকু পরীক্ষা করবার জন্য এই ব্যবস্থা। আর ধরণীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে জীবে ও ঈশ্বরে যে নিগূঢ় যোগ সেটি পাছে বিস্মৃত হও সেজন্য দুঃখ দিয়ে চেতনাকে মগ্নাবস্থা থেকে জাগাতে হয়। এই তাঁর কাব্যের মর্ম্মকথা।

"ওগো মরণ এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা"—শেষ কথাটির বোধ হয় অনিলবাবু একমাত্র শ্রেষ্ঠ এই অর্থ করেছেন মরণই যেন দুঃখক্লিষ্ট আত্মার আশ্রয় যেখানে সে শান্তি পায়। তিনি বলেছেন "দুঃখ দ্বন্দ্ব মৃত্যুর মধ্যেই যে একটা রাজসিক আনন্দ আছে—যে আনন্দের নেশায় বিভোর হইয়া রবীন্দ্রনাথ মরণকেই বলিয়াছেন 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' ভারতীয় সাহিত্য সে আনন্দকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই।" এই কবিতটি আমাদের ভাষায় একটি অতুলনীয় সম্পদ্। রবীন্দ্রনাথ রাজসিক আনন্দে বিভোর হইয়া মরণকে সুন্দর বলেছেন এ ব্যাখ্যা ঠিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। আত্মা অমর। এই জীবনের অন্তেই সে আত্মা ঈশ্বরে বিলীন হয়, না আরও নব নব জন্ম লাভ ক'রে তারপরে সে পরিপূর্ণতা লাভ করে, জ্ঞানীঋষি কেহই তা আজ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারেন নি। তবে এটুকু সকলেই বলেন যে এজীবনের অন্তেই পরিপূর্ণতা লাভ না হ'লেও দেহ ধূলিতে মিশাবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অবসান হয় না। "Dust thou art, to dust returneth was not spoken of the soul". রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় স্নেহ প্রেম ভক্তিতে সমুজ্জ্বল বিচিত্র এই যে মানবজীবন, মরণেই যদি সব শেষ হ'য়ে যেত, তবে সৃষ্টির কোনো অর্থই থাকৃত না। তাই আমরা বিশ্বাস করি আত্মা পূর্ণতা লাভের জন্য অজানিত পথে যাত্রা করে। এ বিশ্বাস থাকলে মরণকে ভীষণ মনে হয় না, প্রাণের হতাশার স্থানে আশা আসে, মরণকে উজ্জ্বল মধুর রূপে, পূর্ণতার দিকে এই জীবনের সব চেয়ে বড় পাদক্ষেপ রূপে, দেখতে শিখি। সমগ্র জীবন ভোর পূর্ণতা লাভ করার যে চেষ্টা, এই মরণে তার শেষ নয়, চর্ম্মচক্ষে যতটা দেখা যায় তাতে মরণকে পূর্ণতার শেষ পার্থিব রূপ বলা যেতে পারে। কারণ তার পরের কোনও অবস্থাই আর আমাদের জ্ঞাত নেই। কি আছে জানিনা বটে তবু মনে ভরসা আছে যে মৃত্যুর পরেও পরিপূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হ'তে থাকৃব। জীবন শূন্য হ'লেই মরণও বিরাট শূন্য বোধ হয়। কিন্তু যার জীবন পূর্ণ সে মৃত্যুকেও পূর্ণই মনে করে। এখানে মনে রাখা দরকার মৃত্যু কেবলমাত্র এই পার্থিব জীবনের শেষ অবস্থা, আত্মার পরিণতির কোন্ অবস্থা তা কেহই বলতে পারেন না। আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবিষয়ক কবিতাগুলি কাব্য শিল্প ও আধ্যাত্মিকতা সকল দিক থেকেই অতুলনীয়। এ অমূল্য সম্পদের ভাব সাত্ত্বিক, রাজসিক নয়। পরাশান্তির আভাস পেয়ে কবি বলেছেন—

"বেণুপল্লব মর্ম্মর-রব সনে, মিলাই যেনগো সোণার গোধূলি ক্ষণে
—পূরবী

আর

"নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।" —উৎসর্গ

অনিলবাবু বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথও এই রাজসিকতার প্রেরণায় বলেন, পথই আমার ঘর। 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' ইহাই তাঁহার প্রাণের কথা।" এতে আপত্তি করবার মাত্র এইটুকু যে রাজসিকতার প্রেরণাই যদি এই মনোভাব হয়, তবে যে রাজসিকতা সাত্ত্বিকতার দিকে চিন্তাকে নিয়ে যায় এ সেই রাজসিকতা। যে পরমাশান্তি, আনন্দরূপ বা ভূমার দর্শন ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ, তাঁর দিকেই এজীবনের যাত্রা, তাই "পথই ঘর"। সাত্ত্বিক মনোভাবে কি গতি নিষিদ্ধ? ঈশ্বরদর্শন করতলগত আমলকবৎ নয়। দেহাবদ্ধ আত্মা অনন্তের কথা একেবারে ভুলিতে পারেনা, আত্মা বন্ধন ছিন্ন ক'রে পরমাত্মায় লীন হ'তে চায়। এই অভাব দূর করবার জন্য উপাসনা, যোগ প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। প্রকৃত সাত্ত্বিক ঈশ্বর দর্শন করতে চান, সেজন্য চঞ্চল হন, কিন্তু এও জানেন দেহকে, সংসারকে ত্যাগ করলেই অনন্তকে পাওয়া যায় না—যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহের মধ্যে সানন্দে থেকেই তাঁকে পেতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সাধনার এই গতি ও স্থিতি দুই ভাবই পরিস্ফুট। যাক্, গতির কথা বলছিলাম। এই যে অনন্তের জন্য প্রাণে আকুলতা এর জন্যই সাধকের "পথ চাওয়াতেই আনন্দ"। জার্ম্মাণ গল্প বর্ণিত বালিকার ব্যাকুলতা ও সাধকের ব্যাকুলতাতে কিছু পার্থক্য আছে। একজন জীবনকে বিস্তৃতরূপে দেখবার জন্য আকুল, অন্য জন পরমাত্মার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল। সাধক সুদূরের পিয়াসী এই কারণে যে, তিনি জানেন ভূমাকে পাবার চেষ্টা এ জীবনে শেষ হয় না। তাই পথ চলতেই সাধকের আনন্দ, স্থিতিতে নয়। তাঁর লক্ষ্য পথের শেষে প্রতিষ্ঠিত, মধ্যে মধ্যে চকিতে আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ভূমা কোনও দিন আত্মপ্রকাশ করবেন কি না, বা কবে করবেন তা জীবের অজ্ঞাত, তাই চলা বিরামহীন। এই অগ্রসর হওয়ার আনন্দই ভূমানন্দ পরাশান্তি—আত্মার স্বরূপকে জানা। এর বেশী পার্থিব জ্ঞানের গোচর নয়। এই গতি আর চঞ্চলতা এক নয়। সুস্থ জীবন মাত্রই গতিশীল—উদ্দাম গতিই অসুস্থতার লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গতির নিগূঢ় অর্থই এই। বদ্ধ জল অস্বাস্থ্যকর আর স্রোতের জল নির্ম্মল। 'ভূমাকে জানিতে পারিয়াছি' আর 'ভূমাকে পাইয়াছি' এ দুইয়ে পার্থক্য আছে। তমসঃ পরস্তাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে প্রাচীন ঋষিরা জান্‌তে পেরেছিলেন; কিন্তু ভূমাকে পেয়েছি এ অহঙ্কার আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ। জানাতে আনন্দ ও গতি—পাওয়া মনে করাতে অহঙ্কার ও মৃত্যু। তিনি আছেন এ জ্ঞান যখন হোলো, তখনি তাঁকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্‌ল ও নব নব সত্যের আলোক প্রবেশ করতে দেবার জন্যে মন উন্মুক্ত রইল—এই গতি। পরমাশান্তি সীমাবদ্ধ কোনো বস্তু নয়, মনের একটি অবস্থা। এ অবস্থায় আদর্শ কি ব'লে ছটফট ক'রে বেড়াতে হয় না তাই আনন্দময়—লক্ষ্য স্থির হয়েছে, তাই প্রাণে দ্বন্দ্ব নেই। পরিপূর্ণ আনন্দ অন্তরে নিয়ে এখনো কিন্তু চল্‌তে হবে। রবীন্দ্রসাহিত্যে গতির অর্থ পাপ পুণ্যের সংঘর্ষ নয়—পুণ্যপথেই নব নব যাত্রা।

খৃষ্টধর্ম্মের অনুতাপ দুঃখভোগ আর রবীন্দ্রনাথের দুঃখবরণ ঠিক এক নয়। খৃষ্টান বলেন, পাপেই মানুষের জন্ম, দুঃখভোগ ক'রে তবে আত্মা মুক্তি পায়। রবীন্দ্রনাথ সে ভাবে পাপের জন্য অনুতাপ করার কথা বলেন না, এই অভিযোগই বরং অনেকে করেছেন। উপনিষদের ধর্ম্মে তিনি পরিপুষ্ট, তাই তিনি মনে করেন পাপ নয়, পুণ্যই মানুষের সহজাত সংস্কার। আত্মার অমরত্বে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস।

"জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ ভয় পাথারে হে প্রভু,
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে।

খৃষ্টধর্ম্মে প্রেম ও ত্যাগের আদর্শ যেমন আছে অবিশ্বাসীর প্রতি ঘৃণাও তেমনি আছে। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমধারা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্ব্বিচারে প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মৃদুতা ও প্রেম মূলতঃ বৈষ্ণব শিক্ষারই ধারা মনে করা অসঙ্গত নয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব যদি থাকে তাঁহার মধ্যে, তাতেও লজ্জিত হবার কিছু নেই, গৌরব বোধ করবার যথেষ্ট আছে, কারণ ভারতবর্ষ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মহাতীর্থ। কবে বিস্মৃত দিনে এ পুণ্যভূমিতে বেদ উপনিষদ গীতার মহাবাণী সকল উচ্চারিত হ'য়েছিল। ভূমা নাকি অনন্ত, তাই বারে বারে নিজেকে তিনি যে কালে যে ভাবে প্রয়োজন সেকালে নিজেকে সেই অংশতঃ প্রকাশ করেন; তাই বুদ্ধের নির্ব্বাণ তত্ত্ব, খৃষ্টের প্রেম করুণা ও অনুতাপবাদ, চৈতন্যের ভক্তিধারা, শঙ্করের যুক্তিপ্রবলধর্ম্ম,মহম্মদের বর্ম্মধারী ধর্ম্ম এক এক যুগে আবির্ভূত হয়েছে। পরাশান্তি ভারতবর্ষের আদর্শ মনোভাব—ভূমা ভারতবর্ষের লক্ষ্য—জগতের সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় না হ'লে এ আদর্শ পূর্ণ হবে কি ক'রে? তাই চিরদিনই ভারতবর্ষ সকলধর্ম্মকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারার বৈশিষ্ট্য যে উদারতা তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের কোনও বৈশিষ্ট্য যদি তাঁর মধ্যে থাকে, সে ধারা ভারতীয় নয় একথা বলা ভুল। তিনি পৃথিবীর জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রচনার বৈচিত্র্যও সেজন্য অত্যন্ত বেশী। কাজেই তাঁর মূলগত ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ও সহানুভূতি না থাক্‌লে তাঁর রচনা পাঠ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। রচনার বাহ্যরূপ ভিন্ন আর কিছুর আস্বাদ যদি আমরা না পাই, সে আমাদেরি দুর্ভাগ্য।

অনিলবাবুও স্বীকার করেছেন "শরীরের ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধ-সংযত ভোগের মধ্য দিয়া অর্থ ও কামের ভিতর দিয়া মোক্ষ বা অধ্যাত্ম জীবনের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়, ইহাই ভারতের প্রকৃত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহারও আভাস আমরা পাই। বস্তুতঃ তাঁহার লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় আদর্শেরই প্রভাব মিশ্রিত ভাবে রহিয়াছে।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ভারতীয় ধারার বিরোধী নয় একথা আগেই বলেছি। আর দুই তিনটি বিষয়ের উত্তর দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব।

"রবীন্দ্রনাথের দুঃখ অনেকটা, তাঁর ব্যক্তিগত ভাববিলাস।" রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁদের পরিবারের আভিজাত্যও বহুদিনের। সর্ব্বোপরি তিনি ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারী। এই সকল কারণে তিনি জন্মতঃ সাধারণের চেয়ে পৃথক্। তাঁর এই অতি সূক্ষ্ম সুকুমার স্বাতন্ত্র্য তাঁর স্বকল্পিত বা স্বেচ্ছানুমোদিত ভঙ্গী (pose) নয়, এ একেবারেই সহজাত। তাঁর লিপিরীতির বৈশিষ্ট্যেও এই পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান। এজন্য তাঁর রচনার প্রতিকূল সমালোচনা করবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর রচনায় বস্তুতন্ত্রতার অভাব এই বহুপুরাতন অভিযোগই "ভাববিলাস" কথাটির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর সহজাত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যে তিনি মানুষের দুঃখ বুক পেতে নিয়েছেন ও তাঁর মৈত্রী বিশ্বজনের প্রতি প্রবাহিত আমাদের কাছে ইহাই বিস্ময়কর বোধ হয়। "শরৎচন্দ্রের বেদনার অনুভূতিতে কোনও ভুল নাই; তাঁহার মত সমাজের দুঃখ বুক পাতিয়া লইতে আমরা কাহাকেও দেখি নাই"।—আমরাও শরৎচন্দ্রকে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ব'লে মানি ও তাঁর অনুরাগী। তুলনায় সমালোচনা ক'রে শরৎচন্দ্রকে হীন করবার ইচ্ছাও আমাদের বিন্দুমাত্রও নেই। কিন্তু "জাতির সমাজের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী তাঁহার (রবীন্দ্র-নাথের) লেখায় কোথায়ও সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই" এ মন্তব্য একেবারে বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে পারা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ কবি—কাব্যেই তাঁর প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ। আমাদের কাছে তাঁর গদ্য-রচনার স্থানও অতি উচ্চে। কিন্তু ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ—কাজেই তাঁর গদ্যরচনা যদি কারও ভাল না লাগে তবে সেজন্য ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঘটনা বা বর্ণনাবহুল নয়। কিন্তু গূঢ় অন্তর্দ্দৃষ্টি ও বেদনাবোধ তাঁর যথেষ্টই আছে। তিনি ইঙ্গিতে যতটা প্রকাশ করতে পারেন, অনেকে তাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করেন। যে উদারতা মানুষকে সমালোচনা করে

না, কিন্তু অন্যের দুঃখ বেদনা নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে সেই উদারতার প্রথম পথ-প্রদর্শক তিনিই। সামাজিক নীতির তুলাদণ্ড দিয়ে তিনি কোথাও মানুষকে বিচার করেন নি। এজন্য অনেক নিন্দা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। সেণ্ট ফ্রান্সিসের অঙ্গের ক্রুশচিহ্নের মত এই বেদনাবোধই তাঁর দুঃখের গানগুলি ফুটিয়ে তুলেছে। "গল্পগুচ্ছ"গুলি এখন হাতের কাছে নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত গল্পে ও উপন্যাসে যত কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই বীজ গল্পগুচ্ছের মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি—কাজেই তাঁর বেদনাবোধ কবিতার স্বল্প-পরিসরের মধ্যে প্রকাশিত, আর এই কবিপ্রকৃতির জন্যই তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে সংযমও অত্যন্ত অধিক এবং অনেক বিষয়ের ইঙ্গিত ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন। এই জন্যই তাঁর লেখা "কুহেলিকাময়", বস্তুতন্ত্রহীন এই রকম অনুযোগ অনেক দিন থেকেই চ'লে আসছে। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক ও সংসারে তাঁকে সংগ্রামও করতে হয়েছে ব'লে শুনেছি। তাঁর রচনায় বাস্তব জীবনও খুবই যথাযথ ভাবে ফুটেছে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই নৌকাডুবি চোখের বালি গোরা প্রভৃতি উপন্যাসের রচনাভঙ্গী আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এবং মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ব'লে গুরুর ব্যর্থ অনুকরণ না ক'রে নিজস্ব সুন্দর সৃষ্টি দিয়ে বাংলাভাষাকে ধন্য করেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের রচনার সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়—বেদনাবোধ কথাটির উপরেই আমি জোর দিতে চাই। "গৃহদাহের" সমস্যা সংযম ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে "ঘরেবাইরে"তে অনেক আগেই আলোচিত হ'য়ে গিয়েছে। "দত্তা"র বিজয়া ব্রাহ্মের ঘরে জন্মেও নরেনকে হিন্দুমতে বিবাহ করেছিল ও ব্রাহ্ম প্রচারক দয়াল সেই বিবাহে সাহায্য করতে সঙ্কোচ করেন নি। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে জন্মলাভ ক'রেও রবীন্দ্রনাথ তার বহুপূর্ব্বেই "গোরা"তে বিনয়ললিতার মিলন ঐ ভাবে দিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মপিতা পরেশ কন্যার সেই বিবাহে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য" চণ্ডীদাসের এই কথা রবীন্দ্রনাথের ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রাহ্মসমাজেই হোক আর হিন্দুসমাজেই হোক যে কালে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতির স্থানে স্থানে অনাবশ্যক কঠোরতা উগ্রতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সেকালের সাহিত্যক্ষেত্রে ওরূপ করা ফ্যাসানে দাঁড়ায় নাই, বস্তুতঃ তাঁর রচনাতেই প্রথম এ ভাব প্রকাশ পায়। আজকের দিনে সকলেই ঐ ভাবে লিখ্‌তে চায়, না লিখলেই লজ্জা, এই একটা ধারণা যেন জন্মে গেছে। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক বেদনাবোধের সঙ্গেই "চোখের বালি"র বিনোদিনীকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিরণময়ী ও বিনোদিনীর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে অথচ "চোখের বালি"র রচনাকাল কতদিন পূর্ব্বে। যেখানে সমাজের অত্যাচার অত্যাচার ব'লেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিন্দিত, সেখানে সহানুভূতি সকল হৃদয়বান লোকেই করে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে যেখানে সবল পক্ষের ব্যবহারে বাহ্যিক নিষ্ঠুরতা নেই সেখানেও দুর্ব্বলপক্ষ কি মর্ম্মান্তিক পীড়িত হ'তে পারে তা অনুভব করা যায় না। "পলাতকা"র কয়েকটি কবিতা "স্ত্রীর পত্র" নামক গল্প ও "যোগাযোগ" উপন্যাসে কুমুর সমস্যা উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। "পলাতকা"র একটি কবিতাতে আছে এক নারী মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গৃহকর্ম্মের অবকাশহীন কর্ম্মচক্র থেকে ছুটি পেয়ে জীবনটা যে কেবল "রাঁধার পরে খাওয়া ও খাওয়ার পরে রাঁধা" ছাড়াও আর কিছু এই তত্ত্ব আবিষ্কার করল। মৃত্যুশয্যাশায়িতা নারী বলছে—

> মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী
> মধুর মরণ ওগো আমার অনন্ত ভিখারী
> দাও খুলে দাও দ্বার,
> ব্যর্থ বাইশ বছর থেকে পার করে দাও কালের পারাবার।

হিন্দুসমাজে কন্যার বিবাহ-বিভীষিকা "শুভা" নামক বোবা মেয়েটির গল্পে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যতই "কুহলিকাময়" হোক্, তাঁর ছোট গল্পগুলিতে প্রখর আলোকের অভাব নেই। গল্পলেখক হিসাবে সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে কেবল মোপাসাঁ তাঁর সঙ্গে আসন পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আমার মনে হয় বোধ হয় এখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। "মেঘ

ও রৌদ্রে" এই ভাবই থানিকটা আছে, যদিও শশিভূষণের সঙ্গে দেবদাসের কিছুই মিল নাই। গিরবালার বৈধব্যের শান্ত সংযতমূর্ত্তি সামাজিক আদর্শ ও শিল্পকলার আদর্শ দুই দিক থেকেই সুন্দর, আর দেবদাসের মৃত্যুসংবাদে পার্ব্বতীর ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক মানুষের ব্যবহার বলিয়া অতি সুন্দর।

"রবীন্দ্রকাব্যের রাজসিকতা মৃদুসুরের খেলা" এও কিছু নূতন অভিযোগ নয়। তাঁর কাব্যে বীররস নেই একথা শুনে আমরা অভ্যস্ত। আমাদের পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার থিয়েটারের অভিনয়ের মত লম্ফঝম্ফ ও প্রচণ্ড হুঙ্কারই যদি বীররসের আদর্শ হয় তবে নিশ্চয়ই তাঁর রচনা "মৃদুস্বরের খেলা।" অন্যদিকে সমস্ত রচনাটির অন্তর্নিহিত ভাব যদি সতেজ ও সবল হ'লে সে রচনা বীররসের অন্তর্গত হয় তবে সে ভাব তাঁর রচনায় যথেষ্টই আছে। হেমচন্দ্রের ভারতভিক্ষা, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম, দ্বিজেন্দ্রলালের আমার দেশ ভারতবর্ষ আবার তোরা মানুষ হ প্রভৃতি কবিতা বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও স্বদেশপ্রেমিক ও তাঁর জনগণমন-অধিনায়ক, ভুবনমনোমোহিনী, একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, একলা চল রে, হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগ রে ধীরে ও নৈবেদ্যের ভারতবিষয়ক কবিতাগুলিতেও ওজস্বিতা যথেষ্ট আছে। শিবাজী উৎসব ও ঈশানের পুঞ্জমেঘ যাঁর লেখনীনিঃসৃত তাঁর রচনাকে "মৃদুসুরের খেলা" বলা ঠিক চলে না। সংহত শক্তির সংযত প্রকাশ তাঁর কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য পড়লে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন রচনার মূলনিহিত ঐক্যের সৌন্দর্য্যে মন অভিভূত হয়।

আধুনিক সাহিত্যের অস্বাস্থ্যকর দুঃখবাদে দেশের প্রবীণ সাহিত্যরথীরা বিচলিত নন অনিলবাবু ইহা প্রমাণ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র গুপ্তের "বিনোদিনী" পুস্তকের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য কয়েকজন সাহিত্যিকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। "ছোট গল্পের রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।" এটুকু তো অনিলবাবু নিজেও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সহজে কাহাকেও উপদেষ্টা হিসাবে উপদেশ দেন না। জগদীশচন্দ্রের গল্প লিখবার শক্তি আছে সেইটুকু তিনি স্বীকার করেছেন। আধুনিক একদেশদর্শী সাহিত্যের সমালোচনা তিনি স্থানান্তরে করেছেন। ঐ দুটি প্রশংসার ছত্রে এই প্রমাণ হয় না যে দুঃখবাদ তাঁর প্রিয়। জগদীশ বাবুর যদি সত্যই মৌলিক প্রতিভা থাকে তবে তিনি নিজের মনের মত গল্পই লিখবেন, এবং তার ফল যে খুব ক্ষতিজনক হবে তা মনে হয় না। তবে যদি অক্ষম লেখকগণ তাঁর অনুকরণে লেখেন তবে সেটা নিশ্চয়ই আপত্তিজনক। পো শেকভ প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লেখকের ছোট গল্প এই রকম বিভীষিকাময়। মোপাসাঁর গল্পেও বিভীষিকা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সব পাশ্চাত্য লেখকেরা স্বদেশের খুব ক্ষতি করেছেন মনে হয় না। বাঙ্গালী জাতিকে একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে করা কি ঠিক? অশুভবাদ, কামবাদ সাহিত্যে প্রচলিত হয়েছে ব'লে গড্ডলিকা প্রবাহের মত সকলে ঐ আদর্শ মানবে এ রকম হয় না। আধুনিক সাহিত্যের যে গল্প কবিতা ও উপন্যাস সত্যই মৌলিক সৃষ্টি সেগুলি বেঁচে থাকবে ও আবর্জ্জনার মত তার অনুকরণ যতই জমুক, কিছুকাল পরে সেগুলির খোঁজও লোকে করবে না। এখনো আরো কিছুদিন না গেলে এই সব উদীয়মান লেখকদের ঠিক সমালোচনা করা যাবে না। এ বিষয়ে আর কিছু বলার আবশ্যক নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ অস্বাস্থ্যকর সাহিত্যের সৃষ্টি করেন নি এইটুকুই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্য একবার যদি মনকে যথার্থভাবে স্পর্শ করতে পারে তবে আনন্দলোকের আভাস পাবার মত অঞ্জন নয়নে পরা হ'য়ে যায়। যে শিক্ষা যে আনন্দময় বার্ত্তা আজ আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথকে রাজসিক দুঃখবাদী ও ভাববিলাসী ব'লে ধারণা হ'লে সে শিক্ষার অন্তরায় হবে। গান্ধি অরবিন্দপ্রমুখ দেশনেতাদের বাণী অথবা রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মনেতাদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর মূলতঃ কোনও ভীষণ অসামঞ্জস্য নেই। সাত্ত্বিকতাকেও একটা pose করা উচিত নয়, কৃত্রিম সাত্ত্বিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কুফল দেখতে হ'লে আমাদের বিদেশে যেতে হবে না।

"রবীন্দ্রনাথের গানগুলি অন্তরের সঙ্গে গাহিলে বেদনার দানে ও নয়নজলেই আমাদের জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে"—এ আশঙ্কা অমূলক। আমাদের যুবকেরা "নৈবেদ্য"খানি খুলিয়া ভারতবিষয়ক চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি মন দিয়া পাঠ করুন। ভারতবর্ষ কি ছিলেন, কি হয়েছেন ও কি হ'তে পারেন তা সমস্তই ঐ কবিতাগুলির মধ্যে আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতি সম্ভব হ'তে পারবে না যতদিন না সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। গভীর সমবেদনা ও দোষ স্বীকার করবার মত মহানুভবতা, আবার সেই সঙ্গেই আশার বাণী ঐ কবিতাগুলিতে পাবেন। আর গভীর ভগবদ্ভক্তি তো তাঁর ছত্রে ছত্রে। যুবকগণের উপরে তাঁরও গভীর ভালবাসা ও আশা। সেজন্য তরুণের জয়গান করেছেন। জাতীয় উন্নতির জন্য দেশের সকল মহাপুরুষের বাণী ও আদর্শ অল্পবিস্তর নিতে হবে—সেই সকল পথনির্দ্দেষ্টা মহাপুরুষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও অন্যতম। "আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে"—সবল শক্তিমান লোকই স্বেচ্ছায় মাথা নত করতে পারে, দুর্ব্বল লোক বাধ্য হয়ে ধূলায় লুটায়। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনই শক্তির উৎস—

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী
দাঁড়াব তোমারি সমুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সমুখে।

তিনি সকল ভয়ের বরাভয়—

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর দুঃখপাশ মোচন কর হে
প্রভু তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ
ধূলিপতিত দুর্ব্বল চিত করহ জাগরূক।—ধর্ম্মসঙ্গীত

অস্পৃশ্য-আন্দোলন হবার আগে, আজ প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেশবাসীর মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করেছিলেন:—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে—
—গীতাঞ্জলি ২০শে আষাঢ় ১৩১৭

স্বজাতির দোষও তিনি যেমন দেখিয়েছেন—আশার বাণীও তেমনি শুনিয়েছেন:—

দুঃসহ বাধা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহা মানবের সাগরতীরে। গীতাঞ্জলি

সকলজাতির মধ্যে কর্ম্মদ্বারা নিজের স্থান ক'রে নিতে বলেছেন—

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ?

ধর্ম্মোপদেষ্টার মত প্রতিপদে নিষেধবিধান ক'রে, জীবনকে পঙ্গু না ক'রে আত্মার স্বাভাবিক পুণ্যপ্রবলতার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়ে তিনি মানুষের জীবনকে সতেজ সবলোন্নত দেবদারু বৃক্ষের মত করবার মূলমন্ত্র দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক্‌রাও দেহে মনে পূর্ণ সামঞ্জস্যকে আদর্শ করেছিল, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিকে যথার্থ স্থান দেয়নি ব'লে সে সভ্যতা অচিরে দৈহিক পূর্ণতামাত্র সাধনে পর্য্যবসিত হ'য়ে ক্রমে ধ্বংসের পথে চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেহে মনে—ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ভগবদ্ভক্তি তাঁর জাগরণ, চাঞ্চল্য গতি কর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষাকে মঙ্গলের পথে চালিত করবে এ বিশ্বাস করা কি অযৌক্তিক? তিনি তো অন্ধ নিয়তির অমোঘ দণ্ড হিসাবে দুঃখকে বরণ করেননি, দুঃখের অতীত আনন্দলোকে বিশ্বাসবশতঃ দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর চোখে জগৎ আনন্দেরই সমধিক লীলাস্থল—"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে"—কিংবা "ও তার অন্ত নাই গো নাই যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।" কিন্তু সব গতির উদ্দেশ্য সেই পরমাগতি—

গতি আমার শেষে
ঠেকে যেথায় এসে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার;
যেথা আমার গান
হয়গো অবসান
সেথা গানের নীরব পারাবার।—গীতালি

শ্রীআশাবতী দেবী

নেশা

• —গল্প—

—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এ

১

স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব হয় না এরূপ অপবাদ আছে; অপবাদ বহু যুগের। কিন্তু কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করিল ঊষা ও তার বন্ধু ছবি। দু'জনেই নব্য শিক্ষিতা, দু'জনেই সুন্দরী তরুণী, উভয়েরই জন্ম সম্ভ্রান্ত বংশে। ছেলে বেলা হইতেই তারা এক সঙ্গে লেখাপড়া করিয়াছে, এক স্কুল, এক ক্লাস। জীবনের প্রথমটা তাদের চলিতেছিল একই ছন্দে, একই তালে। প্রথম বিভাগে আই, এ পাশ করার পর ঊষার বিবাহ হইল। সে আজ সাত আট বছরের কথা। ছবি এর মধ্যে এম, এ পাশ করিয়াছে, এখনও তার বিবাহ হয় নাই। ধনী মাতামহের বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সে। পাত্র অনেক জুটিয়াছিল, কিন্তু মাতামহের পছন্দ হইলে নাতনীর পছন্দ হয় না, নাতনীর পছন্দের সঙ্গে মাতামহের পছন্দ মেলে না।

ঊষার স্বামী গোবিন্দ ব্যারিষ্টারী করে, সুন্দর চেহারা, সাত আট বছরের মধ্যে প্রাকৃটিস্‌ও তার বেশ জমিয়াছে। সে প্রথমে গোপনে একটু মদ খাইত। অভ্যাসটার সূত্রপাত হয় পেগে। পেগ হইতে পাঁইট্, পাঁইট্ হইতে আজকাল বোতলে উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম সে ঊষাকে প্রবোধ দিত, "একটু বিয়ার খেয়েছি, ও'তে দু'পারসেণ্ট য়্যাল্‌কহল্।" শেষে গন্ধের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ারের দোহাই বন্ধ হইয়া গেল। অনেকেই জানিত তার স্বামী মদ খায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঊষা নিজের মুখ দিয়া এ কথা কাহাকেও বলে নাই। এ যে বলা চলে না। মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠে; স্বামীর সঙ্গে নিজকে অপমানিত করা হয়।

গোবিন্দ খুব বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলে ঊষা একজনকে মাত্র তার দুঃখের কথা বলিয়াছিল, সে তার বাল্যবন্ধু ছবি। সমব্যথীকে ব্যথা জানাইলে মন অনেকটা হাল্‌কা হয়। ছবি তার ব্যথা বুঝিবে বৈকি?

ছবি প্রথমে আশ্বাস দিত যে কুসংসর্গে পড়িয়া এরূপ হইয়াছে, কিছুদিন পরে ঠিক হইয়া যাইবে। তার পর যখন দেখিল যে নেশাটা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে তখন ঊষার সঙ্গে পরামর্শ আরম্ভ করিল কি করিয়া গোবিন্দকে এই কুপথ হইতে ফিরান যায়।

একদিন ঊষা তার সামনে কাঁদিয়া ফেলিল। গত রাত্রে নেশার ঝোঁকে গোবিন্দ তার গায়ে হাত তুলিয়াছিল। ছবি বলিল—"এ যে বস্তিকেও ছাড়িয়ে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছি।" তার শিক্ষাভিমানে কে যেন তীব্র কষাঘাত করিল। ঊষাও শিক্ষিতা মেয়ে, স্বামী তার উচ্চশিক্ষিত, হাইকোর্টের ভাল ব্যারিষ্টার। এ সব সমাজ যদি এই কদর্য্যতার হাত এড়াইতে না পারে তাহা হইলে শিক্ষার সমস্ত যত্ন চেষ্টাটাই নিরর্থক, টিয়াপাখীর হরিনামের মত।

ছবি বলিল—"আমার উপর তুমি নির্ভর কর ভাই, আমি তোমার স্বামীর নেশা কাটিয়ে দিচ্ছি।"

ঊষার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, সে বলিল—"তা হ'লে তোমার কেনা হ'য়ে থাক্‌ব আজীবন।"

ছবি হাসিয়া বলিল—"সেটা আর বেশী কি, সে ত অনেক দিনই হয়েছ।"

তারপর দুজনে অনেকক্ষণ বসিয়া পরামর্শ করিল কি ভাবে কেমন করিয়া গোবিন্দকে মদ ছাড়াইবে, আড়ালে থাকিয়া ঊষা ছবিকে কতখানি সাহায্য করিবে ইত্যাদি অনেক কথা।

২

ছুটির দিনে গোবিন্দ সমস্ত দিনই একটু একটু মদ খায়, আর হাতে কাজ না থাকিলে চুরুট মুখে দিয়া ইংরাজি গানের তালে শিষ দেয়। সে শিষ দিতেছিল—

"Oh, its a windy night to-night." উষা বলিল—"আজ যে চাতে নেমন্তন্ন আছে। ছবি তোমাকে আর আমাকে চাতে বলেছে। চার পরে টেনিস্।"

গোবিন্দ বলিল—"হঠাৎ এ খেয়াল কেন ?"

উষা বলিল—"আমি তার ছেলেবেলার বন্ধু।"

গোবিন্দ বলিল—"আর আমি তোমার স্বামী, তাই এই নেমন্তন্ন? কোন ব্যাচিলারকে বল্লেই ত' হ'ত ভাল।"

বৈকালে উষার মাথা ধরিল। গোবিন্দ বলিল—"তা হ'লে আমারও গিয়ে কাজ নেই।"

উষা বলিল—"বাঃ, তাকি হয়? দুজনেই না গেলে সে আরও দুঃখিত হ'বে।"

গোবিন্দ বলিল—"পরে ক্ষমা চাইলেই হবে।"

উষা বলিল—"না আজই যাও।"

এইরূপ কথা কাটাকাটি করিয়া গোবিন্দ শেষে একা যাইতে সম্মত হইল।

ছবিদের বালীগঞ্জের বাড়ীখানি সাহেবী ধরণের। গাড়ী বারান্দার থাম ও কার্ণিশ আইভি লতায় মোড়া। টেনিসের উপর সবুজ ঘাসের শোভা, মনে হয় যেন কে পুরু গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে। চারিধারের মাঠে ফুল ও লতায় ঘেরা কতকগুলি বাওয়ার। একপাশে একটি কাঁচের ঘরে সযত্ন-রক্ষিত নানাদেশের গাছপালা। লনে চা'র টেবিল পাতা হইয়াছে, বেতের টেবিল। বেতেরই তিন খানি চেয়ার। লালপেড়ে গরদের সাড়ী পরিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া ছবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত "ময়মনসিংহের গীতিকা" পড়িতেছে। তার গায়ে ফিকে লাল রংয়ের ব্লাউজ, পায়ে সাদা টেনিশ সু। ছবির দোহারা গড়ন। চুলগুলি সোনালী রংয়ের, চোখ দুটি একটু ধূসর। অতিরিক্ত লেখা পড়া করিবার ফলে শরীর শীর্ণ হয় নাই; যৌবনের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের শোভা প্রত্যেক অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া রহিয়াছে। দুধে আলতায় গোলা রং, স্নিগ্ধ সুঠাম গড়ন, কোমল অথচ পরিপুষ্ট বাহুযুগল। তার সমস্ত চেহারার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল দৃপ্ত শ্রী, একটি তাজা গোলাপ ফুলের মত। তার মাতামহ অনাদি বাবু তখনও লনে আসেন নাই। ঘরে বসিয়া শট্‌কায়ে অম্বুরী তামাক টানিতেছিলেন।

গোবিন্দ আসিল টেনিসের পোষাক পরিয়া, পমেটম্ মাখা বিলাতী ধরণে ছাঁটা চুলগুলি পিছনের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে, মুখে গোল্ড্‌টিপ্‌ড্‌ সিগারেট্, হাতে দামী র‍্যাকেট্। তাকে দেখিয়া ছবি বলিল—"উষা আসেনি?"

গোবিন্দ বলিল—"না, তার শরীর ভাল না।"

"কি হ'ল?"

"মামুলী ছুতো, মাথা ধরা।"

"আপনার বিশ্বাস সে নেমন্তন্ন এড়াবার জন্যই এরূপ করেছে?"

গোবিন্দ বলিল—"অতটা সাহস নেই বলবার।"

"থাকলে বলতেন?"

"বোধ হয়।"

লনে মোটরের হর্ণ শুনিয়া অনাদিবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। বৃদ্ধের পরণে একটি ট্রাউজার, মুখে বর্ম্মা। তিনি বলিলেন—"হ্যালো গোবিন্, good afternoon."

গোবিন্দ উত্তর করিল—"Good afternoon."

কুশল প্রশ্নাদির পর এক কাপ করিয়া চা খাইয়া তিন জনে খেলিতে আরম্ভ করিলেন। একদিকে অনাদিবাবু আর ছবি, আর একদিকে গোবিন্দ।

গোবিন্দ ভাল খেলিত। সে প্রথমে সার্ভিস্ বল মারিল। সে একখানা সুকঠিন মার। ছবি ক্ষিপ্র হস্তে বল্‌টা ফিরাইয়া দিল। সত্যকার খেলা হইতে লাগিল ছবি ও গোবিন্দের মধ্যে। বল মারিবার জন্য অনাদিবাবু প্রথম হইতেই বলের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইতে ছিলেন। কিন্তু প্রায় বলই ছবি তাঁর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গোবিন্দকে ফিরাইয়া দিতেছিল।

অনাদিবাবু বলিলেন—"বুড়োর কাছ থেকে পৃথিবীটাই আস্তে আস্তে স'রে যাচ্ছে! বল সরবেই। তোমার তার জন্য অতটা চেষ্টা করতে হবে না, ছবি!" বলিয়াই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। পরের বলটা ছবি ছাড়িয়া দিল। সে একটা শক্ত মার। খানিকটা পিছনে হটিয়া বলটা অনাদিবাবু বেশ কৃতিত্বের সহিত মারিলেন। বৃদ্ধের মন খুসিতে ভরিয়া উঠিল। এক সময় তিনি নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন।

আরও খানিকক্ষণ খেলা চলিল। তারপর অনাদিবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আরম্ভ হইল দুজনের খেলা।

গোবিন্দ খেলিত খুব ভালই, কিন্তু হারিতে লাগিল। ছবির মত সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে ঘরোয়া খেলায় যে তার পৌরুষের চেয়ে হারার আনন্দ বেশী। তা' ছাড়া তার সোনালী রংয়ের চুলগুলি অস্তগামী সূর্য্যের রঙ্গিন রশ্মিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল; গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত শরীরটা দুলিতেছিল বল মারিবার নাচের তালে তালে। হারিবার পক্ষে গোবিন্দের আর কোনো বাধা ছিল না। খেলার পর উভয়ে হ্যাণ্ড্‌সেক্ করিয়া চায়ের টেবিলে বসিল। ছবি বেয়ারাকে বলিল চা'র জল আনিতে। তারপর চলিল হাইটির পালা।

ধনী বাঙ্গালী সাহেবী খাবার পছন্দ করে, কিন্তু সঙ্গে সন্দেশের কথাও ভোলে না। সেদিন ছবির চা'টা একটু গুরুতর রকমের হইল—মাংসের স্যাণ্ড্‌উইচ্, cheese এর কেক্, চিংড়ীর কচুরী, ভীমনাগের সন্দেশ, বৃহস্পতির পান্তুয়া ইত্যাদি।

চা'র টেবিলে অনেক বিষয়ের আলোচনা হইল চরকা, খদ্দর, বলসেভিক্ রাসিয়া, রবীন্দ্রনাথের দর্শন, বাচ্চাই সাকো আর চ্যাংকাইসেক। অনাদিবাবু ছিলেন চরমপন্থী। তিনি বলিলেন—"বাক্‌যুদ্ধ আর সুতার লড়ায়ে স্বরাজ হবে না। দুটা একটা পটকাকে ভয় করবার ছেলেও ইংরেজ নয়। চাই mass consciousness."

ছবি বলিল—"চরকা mass consciousness জাগাবার পক্ষে খুব উপযোগী।" অনাদিবাবু বলিলেন—"চরকা কাটলে আর্থিক সমস্যার কিছু সমাধান হ'তে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোবৃত্তি থেকে দাসভাব যে লোপ পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওটা হচ্ছে economic সংস্কার, যেমন ছুঁৎ মার্গ পরিহার হচ্ছে সামাজিক সংস্কার মাত্র। স্বাধীন ভারতের সামাজিক ভিত্তি পাকা করবার পক্ষে ওগুলি উপযোগী বটে কিন্তু স্বরাজ অর্জ্জন করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে দেশ থেকে দাসভাব লোপ ক'রে দেওয়া।"

ছবি বলিল—"কি ক'রে তুমি তা' করতে চাও?"

অনাদিবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন—"কর্ম্মীদের বেরিয়ে পড়তে হবে, প্রচার কার্য্যে লাগতে হবে। দরদ দিয়ে কুলী মজুরকে বুকে টেনে নিতে হবে, চাষীকে বলতে হবে, "ভাই ওঠো দেখো, জাগো।" তাদের বোঝাতে হবে যে বেঁচে থাকার পক্ষে স্বরাজ দরকারী। স্বরাজে তোমার স্বার্থ, তাদের স্বার্থ সমান।"

গোবিন্দ বলিল—"আপনি কি মনে করেন তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর লোকদের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে? বাকি শুধু কুলী মজুররাই?"

অনাদিবাবু বলিলেন—"না, তাও নয়। যে দেশে একটা সরকারী চাকুরী খালি হ'লে হাজার হাজার ভদ্রলোক প্রার্থী জোটে, যেখানে স্বদেশীওলাদের দমন করার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি উকীল পাওয়া যায়, যারা কলেজ ও ছাত্র-জীবনের স্বাদেশিকতার সীমা পার হ'য়েই সাহেবের কাছে your honour ব'লে দাঁড়ায়, তারা স্বরাজ চায় আত্মদানের মধ্য দিয়ে নয়, আত্মবিস্মৃতির দরজা দিয়ে।"

আলোচনা অনেকক্ষণ চলিল। উৎসাহী বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর নাতনী ও যুবক গোবিন্দ সমান তালে চলিতে পারিতেছিল না। গোবিন্দ বলিল—"হাওড়ার মক্কেল আসবার কথা আছে, consultation হবে।"

অনাদিবাবু বলিলেন—আর একদিন এসো। নাত্‌নীকে আনা চাই কিন্তু।"

দু'জনে গোবিন্দের মোটর পর্য্যন্ত গেলেন। তাঁদের সঙ্গে হ্যাণ্ড্‌সেক্ করিয়া গোবিন্দ গাড়ীতে উঠিল। সে Bar-এর দিকে গাড়ী ছুটাইল। হাওড়ার মক্কেল আধঘণ্টা অপেক্ষা করিতে পারে।

৩

এক সপ্তাহ পরের কথা। সেদিন উষা অনাদিবাবু ও ছবিকে চাতে বলিয়াছিল। অনাদি বাবুর সেদিন একটা স্বদেশী সভা ছিল, ছবি আসিয়াছিল একা।

চা খাওয়ার পর গোবিন্দ তাকে বালীগঞ্জে পৌছাইয়া দিয়া Barএ চলিয়া গেল। প্রথম খাইল ক' পেগ হুইস্কি,

তারপর চলিল দু'চার রকম মদের পাঞ্চ্। এ পাঞ্চের ফলে মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, চোখের সামনের আলোকগুলি একটু কাঁপিতে লাগিল, তার মনে হইল ছবির কথা। নেশায় মানুষের একাগ্রতা বাড়ে। তার একাগ্র মনে ফুটিয়া উঠিল ছবির রূপের ছটা।

সে টেলিফোনে ছবিকে ডাকিল। ছবি জিজ্ঞাসা করিল—"কি খবর ?"

গোবিন্দ বলিল—"বড্ড দেখতে ইচ্ছে কচ্ছে তোমাকে।"

ছবি বলিল—"কেন ?"

গোবিন্দ উত্তর করিল—"তুমি বড্ড সুন্দর কিনা।"

ছবি টেলিফোনের ওদিক হইতেই গোবিন্দের অবস্থা বুঝিয়াছিল। তার উপর আবার সে ঊষাকে কথা দিয়াছে তার স্বামীকে সুপথে আনিবে। গোবিন্দের ভঙ্গীটা ভাল না লাগিলেও সে কোনও প্রতিবাদ করিল না।

গোবিন্দ বলিল—"চুপ ক'রে রইলে যে ?" ছবি উত্তর করিল—"আচ্ছা আসুন।"

অনাদি বাবু তখনও নিমন্ত্রণ হইতে ফিরেন নাই। ছবি বাড়ীতে একাই আছে। মেজের উপর পিঁড়েয় বসিয়া লুচি বেলিতে বেলিতে ডাইনিং রুমেই সে গোবিন্দের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। আলোচনার ধারাটা গেল সেদিন সাহিত্যের দিকে। গোবিন্দ সাহিত্যের কিছু খবর রাখিত আর ছবি ছিল সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্রী। আমাদের সাহিত্যে বর্ত্তমানে রাসিয়া, নরওয়ে, সুইডেনের ভাবধারা ছড়াইয়া পড়িতেছে। একটা যুগ-পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

গোবিন্দ বলিল—"যাঁরা কাছ থেকে সকলে রসের খোরাক পান সেই রবীন্দ্রনাথ" এই ভাবধারার বিরোধী।"

ছবি বলিল—"সাহিত্যের খোলা দরজা দিয়ে এগুলি এসে পড়বেই। আটকান চলবে না। আবর্জ্জনা এই তরুণ সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু তাকে বিচার করতে হবে তার সম্পদ দিয়ে, তার নোংরামী দিয়ে নয়।"

গোবিন্দ বলিল—"তাই ব'লে মানুষের প্রবৃত্তির ছবিগুলিকে নগ্ন ভাবে দেখান সমর্থনযোগ্য নয়।" ছবি বলিল—"কুৎসিত চিরদিনই কুৎসিত, তার স্থান নেই সাহিত্যে। কিন্তু আমরা খরগোসের মতন চোখ বুজে নিজেদের সামাজিক ব্যাধিরূপী বিপদগুলিকে, মানুষের মনের পচা ঘাগুলিকে দেখতে চাই না। এই আমাদের দুর্ব্বলতা।"

গোবিন্দ বলিল—"তার অর্থ ?"

ছবি উত্তর করিল—"গলদ সব দেশে সব সমাজে আছে। আমাদের দোষ আমরা চোখ বুজে থাকি, সত্যকে অস্বীকার করি। ধরুন যেমন আমরা বুঝি ও জানি যে প্রবৃত্তির তাড়না বিধবাদের আছে। তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তোর জনই ভাল কিন্তু প্রায় পঁচিশ জনের প্রবৃত্তিকে আমরা দেখেও দেখি না। তাঁদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করি না। ধামা চাপা দিতে চাই। নতুন সাহিত্যিকদের গুণ এই যে তারা মানুষের মনের ছবিকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছেন।"

গোবিন্দ বলিল—"কিন্তু কতগুলি কুৎসিত ছবি দেখানই সমাজসংস্কার নয়।"

ছবি বলিল—"তা হ'বে না কেন ? কুৎসিতকে দেখান আর সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—তার মধ্য দিয়েই সমাজ গ'ড়ে উঠে। গলদ এই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিক দিয়ে এদের কৃতিত্ব কম হ'তে পারে। অনেক শক্তিহীন লেখক নতুন কিছু ক'রে নাম অর্জ্জন করার মোহে যা তা লেখে। কতকগুলি ফুট্‌কি ও অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বক্তব্য শেষ করাকেই এরা মনে করে উঁচু দরের আর্ট। এদের প্রায় সকলেরই কথাগুলি ধোঁয়াটে, ছবিগুলি প্রাণহীন। কিন্তু এই আন্দোলনটা ভবিষ্যতে সুফলপ্রসূ হবে যখন এদের আবর্জ্জনাগুলি বাদ গিয়ে এই স্কুলের সত্যকার শক্তিমান লেখকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।"

গোবিন্দ বলিল—"তুমি এই আন্দোলনটাকে তা হ'লে পছন্দ কর ? তোমার অভিযোগ এদের মধ্যে শক্তির অভাব।"

ছবি বলিল—"সকলের নয়, কারও কারও উঁচুদরের শক্তি আছে লিখবার।"

গোবিন্দ বলিল—"কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে ন্যুট-হামসুনের সমাজ আর আমাদের সমাজ এক নয়।"

ছবি বলিল—"তা বটে, কিন্তু সে দেশের শ্রমিক আর আমাদের শ্রমিক, তাদের capitalist আর আমাদের capitalist

নরওয়ের তরুণ আর বাংলার তরুণ, এদের মধ্যে সত্যকার একটা নাড়ীর যোগ আছে। আর এদের নিয়েই জীবিত সাহিত্য! অতএব একটা মিলনের জায়গা এদের আছে।”

গোবিন্দ বলিল—“কিন্তু পার্থক্যকেও একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না।”

ছবি বলিল—“আপনারা পার্থক্যটাকেই বড় ক'রে দেখেন তাই চোখে অতটা লাগে।”

আলোচনা করিতে করিতে রাত অনেক হইয়া গেল। গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—“রাত হ'য়ে গেছে।”

ছবি বলিল—“হ্যাঁ, রাত হ'য়ে গেল। দাদা এখনও এলেন না।” গোবিন্দ দু'পা অগ্রসর হইতেই ছবি বলিল—“একটা কথা বলব? রাখবেন?”

গোবিন্দ বলিল—“আমি আইনের ব্যবসা করি। সাদা কাগজে সই করা আমাদের পক্ষে কি সম্ভব?”

ছবি হাসিয়া বলিল—“আপনারা কি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন না? বন্ধুত্বের কি কোনও মূল্য নেই?”

গোবিন্দ বলিল—“বল দেখি ব্যাপারখানা কি?”

ছবি বলিল—“বলুন কথা রাখবেন?”

তার কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল একটা দরদ, একটা দাবীর জোর। স্ত্রীলোক যখন এই জোর লইয়া কথা বলে তখন পুরুষের সাধ্য কি যে সে দাবীকে অস্বীকার করে? গোবিন্দ বলিল—“বেশ বল।”

ছবি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—“মদ আপনাকে ছাড়তে হবে।”

গোবিন্দ জিনিষটা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ অনুরোধ পালন করা যে তার পক্ষে অসম্ভব। ছবি তার সুন্দর গ্রীবা তুলিয়া বলিল—“কথা বলছেন না যে?”

গোবিন্দ যন্ত্রচালিতের মত বলিল—“আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব।”

ছবি বলিল—“তাই যথেষ্ট। আপনার কাছে এইটুকুই আমি চাই।”

গোবিন্দ হাত দু'খানা বাড়াইয়া ছবির হাত দু'খানা ধরিয়া বলিল—“বল, তুমি আমায় সহায়তা করবে?”

গোবিন্দ ছবির হাত দু'খানা জোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল। তার মুঠার মধ্যে ছবির হাত পদ্মের পাপড়ির মত নরম হইয়া উঠিল। সে অনুভব করিল ছবির হাতের কোমল কম্পন, চাহিয়া দেখিল তার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখের তারা কাঁপিতেছে। ছবি মুখ নীচু করিল।

গোবিন্দ বলিল—“আমি তোমায় কথা দিয়ে যাচ্ছি ছবি, মদ আমি ছাড়ব।” ছবি তার মুখের দিকে চাহিল। গোবিন্দ বলিল—“রাত হ'য়ে গেছে, Good night.”

ছবি বলিল—“Yes, good night.”

গোবিন্দ মোটর চালাইতে চালাইতে ভাবিতেছিল—ভুল করেছি কথা দিয়ে, পারব না, মদ ছাড়তে পারব না। আবার মনে হইল না, না ছবির কাছে কথা দিয়েছি, ছাড়তেই হবে।

৪

তারপর দু'তিন দিন গোবিন্দ মদ খাইল না। সন্ধ্যা হইলেই মদের জন্য আকুল হইয়া উঠিত, তাই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিয়া, ইংরাজি নাটক পড়িয়া সময়টা কাটাইয়া দিত। একদিন যতীশের কাছে কথাটা খুলিয়া বলিল। তার সঙ্গে গোবিন্দ বরাবর এক সঙ্গে পড়িয়াছে, দুজনে খুব বন্ধুত্ব, বর্ত্তমানে এক ক্লাসের ইয়ার।

যতীশ বলিল—“ওসব অনুরোধের কোনই মূল্য নেই। আমি স্ত্রীলোকের কথায় সব পারি ঐটে ছাড়া।”

গোবিন্দ বলিল—“কেউ হয় ত' বা ওটাও পারে।”

যতীশ বলিল—“বাজে আইডিয়ালিজ্‌ম্ ছেড়ে দাও। ও তোমার tomfoolery! দেখ; বেইমানী সব জিনিষে করতে পারে, কিন্তু মদ কখনও পারে না। একজন স্ত্রীলোকের কথায় এই রকম একটা বন্ধুকে ছেড়ে দেবে?”

গোবিন্দ বলিল—“তাকে যদি দেখতে?”

যতীশ বলিল—“স্কুলের ছেলের মত sentimentalism করছ, লজ্জা করে না? হ'তে পারে সে সুন্দরী, কিন্তু তাই ব'লে কি মাথা কিনে নিয়েছে না কি?

যতীশ পীড়াপীড়ি করায় সেই রাত্রে গোবিন্দ মদ খাইল এবং তিন দিন মদ না খাওয়ায় মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত হইয়া গেল। নেশার ঝোঁকে ছবির উদ্দেশ্যে যতীশকে বলিল—সে কি মনে করে আমি তার কথায় উঠ্‌ব বস্‌ব। All bosh !"

যতীশ বলিল—"এই ত পুরুষের কথা !"

পরদিন উষা টেলিফোনে বলিল—"হেরে গেলে ছবি।"

ছবি জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে ?"

উষা বলিল—"কাল আবার মদ খেয়েছিলেন।"

ছবি বলিল—"দুদিন একদিন খাবেন বৈকি ? একেবারে কি অভ্যেস ছাড়া যায়! তবে আস্তে আস্তে ছাড়তে হবেই ওঁকে, দেখে নিও।"

উষা বলিল—"আমি তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি কিন্তু।"

ছবি হাসিয়া বলিল—"নিশ্চিন্তই থাক। আমি নেশা ওঁর ছাড়িয়ে আন্‌ছি।"

আজকাল অনাদি বাবুর সঙ্গে গোবিন্দের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছে। গোবিন্দ বলে ভাবের আদান প্রদানের অমন মানুষ নাকি তার সমবয়সীদের মধ্যে নাই।

ক'দিন ছবি প্রাণ খুলিয়া মিশিতেছে না। গোবিন্দের উৎসুক চোখ দুটি ঘুরিয়া বেড়ায় তার সঙ্গে সঙ্গে। অনাদি বাবুর সঙ্গে আলোচনা ততক্ষণই মিষ্টি লাগে যতক্ষণ ছবিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তার কণ্ঠস্বরের একটা রেশ কানে বাজে।

গোবিন্দ একদিন তাকে বলিল—"তোমার ব্যবহারটা আগের মতন নেই।"

ছবি বলিল—"কই, আমি কি অন্যায় ব্যবহার করেছি ?"

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুস্কিল। ছবি কিছুই অন্যায় ব্যবহার করে নাই। কিন্তু অন্যায় ব্যবহার না করা আর ভাল ব্যবহার করার মধ্যে ব্যবধানটা অন্তরের অনুভূতির জিনিষ। ইহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না।

উভয়ের ব্যবধানটা আরও কয়েকদিন চলিতে লাগিল। কিন্তু শেষটায় হার হইল গোবিন্দেরই। সে একদিন বলিল—"অতটা কাছে টেনে নিয়ে আবার দূরে চ'লে গেলে ছবি ?"

ছবি বলিল—"দূর ক'রে দিয়েছেন আপনি।" কণ্ঠস্বরে তার রুদ্ধ অভিমানের স্পন্দন।

গোবিন্দ তার হাত ধরিয়া বলিল—"ক্ষমা কর। ও জিনিষ আর ছোঁবনা।"

ছবি বলিল—"ঠিক বলছেন ?"

গোবিন্দ দৃঢ় স্বরে বলিল—"নিশ্চয়।"

৫

গোবিন্দ উদীয়মান ব্যারিষ্টার, বুদ্ধিমান যুবক, সুন্দর তার চেহারা। তাকে মদ ছাড়াইয়া ছবি মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল। পুরুষের উপর জয়...এতখানি জয়ে নারীর আত্মপ্রসাদ খুবই স্বাভাবিক। গোবিন্দের উপর এতটা অধিকার খাটাইয়া ছবির মনে তার প্রতি একটা মমতাও জন্মিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়াছে উষার প্রতি অনুকম্পা-মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভাব। এত অপদার্থ সে যে নিজের স্বামীকে মদ ছাড়াইতে পারিল না।

অবিবাহিতা এই যুবতী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের গলদ কোথায় তাহা জানে না। সে যদি গোবিন্দের স্ত্রী হইত তাহা হইলে উষা যত সহজে মদ ছাড়াইতে পারিত ছবি তাহা পারিত না। হিন্দু স্বামীর কাছে স্ত্রী মুঠার মধ্যে পাওয়া আমলকীর মত।

উষাও বুদ্ধিমতী, তাই ছবির মনোভাব তার কাছে ধরা পড়িয়াছে। তবে ছবির কাছে তার কৃতজ্ঞতাও অনেক। মাতালের পরিবারে কতকগুলা অশান্তি আছে, সে অশান্তিগুলা আজকাল উষাকে ভোগ করিতে হয় না। তবে তার মনের কোণে একটা কাল মেঘের ছায়াও পড়িয়াছে।

সত্যসত্যই তাকে ছবির কাছে এতখানি ছোট হইতে হইল! স্বামীর সম্বন্ধে পরের সহায়তা লওয়ার হীনতা তখনই বড় হইয়া প্রকাশ পাইল যখন মাথার উপরের বিপদটা কাটিয়া গিয়াছে। হিসাব-নিকাশের গোলমাল লইয়াই তার মনের এই দৈন্য।

উষা আজকাল তার সংসার লইয়া ক্রমেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। তাকে হিসাব রাখিতে হয়, সব বন্দোবস্ত করিতে হয়, খুঁটিনাটি ছোট ছোট জিনিষের দিকে মন দিতে হয়। কাজের চাপে মনের দৈন্য কিছু চাপা পড়ে। গোবিন্দ তার উপর সংসারটা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। খুঁটিনাটির হিসাব সে লইত না, লইতে জানিত না। সে ধারে ধীরে উষার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে, তাই বাহিরের ব্যবহার যতটা সম্ভব মোলায়েম করিয়া তুলিল।

আজকাল প্রায় প্রত্যহই গোবিন্দের সঙ্গে ছবির দেখা হয়। গোবিন্দ রোজই বালীগঞ্জে আসে। বিশেষ কারণে না আসিতে পারিলে বার-লাইব্রেরী হইতে টেলিফোন করে। অনাদিবাবুর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব এতটা জমিয়া উঠিয়াছে যে, গোবিন্দ না আসিলে বৃদ্ধের ভাল লাগে না।

ছবি প্রথম প্রথম মনে করিত যে, গোবিন্দের সঙ্গে বেশী মেশামিশি করিলে উষার প্রতি অন্যায় করা হইবে। কিন্তু মেশামিশি বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কর্ত্তব্যবোধটা কর্পূরের মত উড়িয়া গেল।

ছবি বলিল—"আগে চেষ্টা করলে পাওয়া যেত।"

গোবিন্দ বলিল—"আমি বুঝতে পারিনি যে এত শীগ্‌গীরই বিক্রি হ'য়ে যাবে। যা হ'ক নাচ আমি তোমায় দেখাবই।"

টিকিট জুটিল। সেইদিনই বৈকালে গোবিন্দ ডবল দাম দিয়া দু'খানা টিকিট কিনিল। ছবির হাতে টিকিট দেওয়ার সময় গোবিন্দ বলিল—"একাগ্রতা থাকলে মানুষের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন।"

ছবি জিজ্ঞাসা করিল—"টিকিট পেলেন কেমন ক'রে?"

"এক মাড়োয়াড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

"কেন, সে যাবে না?"

"অনেকগুলি বেশী কিনেছিল ডবল দামে বিক্রি করবার জন্য।"

"সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কি দরকার ছিল ডবল দামে টিকিট কিনবার?"

মুখে একথা বলিলেও ছবি মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতেছিল যে গোবিন্দ তার জন্য ডবল দামে টিকিট কিনিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল না যে উষার যাওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে। আজকাল তাদের মধ্যে উষার আলোচনাই বন্ধ।

এম্পায়ারে আনা পাভ্‌লোভার নাচ। সমস্ত কলিকাতা উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। টিকিট বেচিবার জন্য রাস্তায় প্লাকার্ড দিতে হয় নাই। খবরের কাগজে ক'দিন এই সংবাদটা বাহির হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আসন রিজার্ভ হইয়া গেল। প্রতিভার সার্থকতা এইখানে।

গোবিন্দের বিশেষ আগ্রহ ছিল আনা পাভ্‌লোভার নাচ দেখিবার। যার প্রত্যেক চরণসম্পাতে আর্ট ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তার নাচ একা দেখিয়া তৃপ্তি নাই, ছবিকেও দেখাইতে হইবে এই গোবিন্দের ইচ্ছা। কিন্তু সে টিকিট পাইল না।

নানা বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ। সমবেত ধনী ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের পুঞ্জীভূত দ্বিধাহীন আনন্দরাশি, এসেন্স আতরের সুরভি, পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য। এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দুজনেরই মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নাচের সমস্ত সময়টা ছবির বাঁ হাতখানি ছিল গোবিন্দের ডান হাতের মধ্যে। হাতের কম্পনের মধ্যে এ ওর কাছে বার বার ধরা দিতে লাগিল। নাচ দেখার পরে তারা দুজনে ষ্ট্রাণ্ডে বেড়াইল।

রাত তখন বারটা। চাঁদের আলো গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় ডগায়, গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিজের

রূপালি আভা ছড়াইয়া দিয়াছে—আর দিয়াছিল এই যুবক যুবতীর মনের উপর।

গোবিন্দ বলিল—“আর আমাকে আপনি বললে চলবে না। তুমি বলতে হবে।”

ছবি বলিল—“আপনি বড্ড বেশী চান।”

গোবিন্দ বলিল—“বল, তুমি বড্ড বেশী চাও।”

ছবি বলিল—“আচ্ছা, তুমি—।”

৭

ছবি বাগানে ফুলগাছে জল দিতেছে, পরণে তার একখানা লাল কলকা-পেড়ে কাপড়, হাতে একটা টিনের ঝাঁঝরীওয়াল টব। তার পরিশ্রান্ত কপালের ঘামের উপর সূর্য্যের আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

লনে একখানা ট্যাক্সি থামিল। ট্যাক্সি হইতে নামিল উষা। মুখখানি তার ম্লান, শুষ্ক, চোখ দুটি বিষণ্ণ। ছবি তার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—“এসো ভাই, কি খবর?”

উষা বলিল—“এলুম একবার দেখা করতে।” তারপর দুজনে আবার নীরব। অনেকদিন হইতেই গোবিন্দ ও ছবির হাবভাব উষা লক্ষ্য করিতেছিল। সেদিনকার নাচে যাওয়ার কথাও তার কানে গিয়াছে। একদিন সে ছবির কাছে আসিয়াছিল স্বামীকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে। আর আজ? প্রাণের অন্তঃস্থল খুলিয়া দেখাইতে তার রমণীত্বে ব্যথা লাগে। তবু সে আসিয়াছে তার ন্যস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে।

খানিকক্ষণ পরে উষা বলিল—“তোমায় ধন্যবাদ ভাই। অত বড় নেশা ওঁর ছাড়ালে।” ছবি কোন উত্তর করিল না। সে অপেক্ষা করিতেছিল আর কিছুর জন্য। তারপর ছবি উষাকে নানারকম গাছ পালা দেখাইতে লাগিল কবে কোনটা পুতিয়াছে, কোনটায় কিরূপ ফুল হয়। উষা সবই শুনিতেছিল কিন্তু ফুল-গাছের ইতিহাস না বলিয়া ছবি যদি মোপলাদের কাহিনী তার কাছে বলিত তাহা হইলেও পার্থক্য কিছু হইত না।

ছবির কথার মধ্যে হঠাৎ বাধা দিয়া তার হাত দুখানা ধরিয়া উষা বলিল—“ভাই এবার ওঁকে ফিরিয়ে দাও।” ছবি আঙ্গুল দিয়া নীচের ঠোঁট নাড়িতে লাগিল। উষা বলিল—“ওঃ বুঝেছি তুমি ওঁকে—।” কথাটা শেষ হইল না।

ছবি এবার নাক চোখ বুজিয়া কোন রকমে বলিল—“ওঁর একটা নেশার দরকার। এ নেশা কাটলে আবার মদ ধরবেন।”

উষার ইচ্ছা ছিল যে বলে এ নেশার চেয়ে তাও যে ভাল, এটা যে আরও তীব্র আরও কষ্টদায়ক। কিন্তু ভাবিল, স্ত্রীত্বের অভিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বিকাইয়া লাভ কি? অধিকতর পরাজয় বরণ করিয়াও স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই উষা ধীরে ধীরে ট্যাক্সির দিকে চলিল। ছবির কাছে সে বিদায় নিল না। ছবিও বিদায় দিবার জন্য এক পা নড়িল না, মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিল না।

তখন দুজনেরই মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। জয়ীর নাই জয়ের আনন্দ, ত্যাগের ও সামর্থ্যের অভাব; আর পরাজিতের শক্তি নাই সে পরাজয়কে হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইতে পারে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন
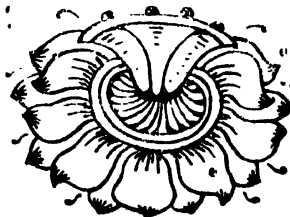
যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল্, বি-সি-এস

প্রথম খণ্ড—সাগরে

প্রথম স্তবক

উপকূলের অরণ্য

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ। মে মাস বিগত প্রায়। ফ্রান্সের ব্রিটেনী প্রদেশে সাণ্টারে প্রেরিত প্যারিসীয় সেনাদলের একদল ভেণ্ডি অঞ্চলের ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। অভিপ্রায়, বনভূমির সবিশেষ অবস্থা নির্ণয়।

দারুণ সমর সেনাদলের অধিকাংশকেই গ্রাস করিয়াছে। এই পল্টনে ইদানীং তিন শতের অধিক সৈন্য ছিল না। আর্গোনে, জেমার্পে ও ভামি যুদ্ধের পরিণামে প্যারিসের প্রথম রেজিমেণ্টে ছয় শত ভলাণ্টিয়ারের মধ্যে সাতাশ জন, দ্বিতীয় রেজিমেণ্টে তেত্রিশ এবং তৃতীয় রেজিমেণ্টে সাতান্ন জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। চারিদিকে তখন বিরোধের মহামারী।

প্যারিস্ হইতে ভেণ্ডিতে প্রেরিত প্রত্যেক রেজিমেণ্টে নয় শত বার জন সৈন্য এবং তিনটি কামান ছিল। এই সেনাদলের সংগঠন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ২৫শে এপ্রিল কমিউনের * (Commune মিউনিসিপ্যালিটি) সদস্য লুবিনের রিপোর্টে ভেণ্ডিতে ভলাণ্টিয়ার সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়; আর ১লা মে তারিখেই সাণ্টারের ব্যবস্থায় হাজার সৈন্য ও ত্রিশটি তোপ ও একদল গোলন্দাজ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইল। দ্রুত গঠিত হইলেও এই সব রেজিমেণ্ট এমন সুগঠিত হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান সময়েও তাহারা আদর্শরূপে গণ্য।

২৮শে এপ্রিল প্যারিসের কমিউন সাণ্টারের ভলাণ্টিয়ার-দিগকে এই সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত-বাক্যে বিদায়াভিনন্দন করে:—"ক্ষমা করিবে না, দয়া দেখাবে না।" মে মাসের শেষ ভাগে প্যারিস্ হইতে প্রস্থিত এই দ্বাদশ সহস্রের মধ্যে আট সহস্র আর জীবিত ছিল না।

অরণ্যে নিযুক্ত সেনাদল চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের বিশেষ কোন ত্বরা দেখা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ যাবৎ তাহারা কুচ্ করিয়াছে। বেলা কত হইয়াছে বলা কঠিন। অসংখ্য তরুলতার ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া সূর্য্য-রশ্মি সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। অরণ্য প্রদেশ যেন প্রদোষ তিমিরে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন।

এই অরণ্যের কাহিনী বড়ই ভীতিজনক। ইহার গহন বনেই ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়া বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ইহার তমসাবৃত নিভৃত গর্ভ হইতেই ক্রুরকর্ম্মা খঞ্জ মুস্কেটনের আবির্ভাব। এখানকার নরহত্যার তালিকা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এমন ভয়সঙ্কুল স্থান বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

সৈন্যগণ সতর্ক পদবিক্ষেপে অরণ্য অতিক্রম করিতেছিল। তাহাদের দুই পার্শ্বে বৃক্ষশাখা ও শিশিরসিক্ত পত্রাবলীর কম্পমান প্রাচীর; বনস্থলীর ঘনশ্যাম ছায়া দুই একটি সৌরকর রেখায় কচিৎ বিদীর্ণ। গহ্বর গর্ত্তাদি ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; ভূমিতল শ্যামল তৃণ-শষ্পে মখমলমণ্ডিত; মাথার উপর পাখীর কিচিমিচি। ধীরে ধীরে ঝোপঝাড়

---

* প্রাচীন কাল হইতে ফ্রান্স কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে আইন কানুন, আচার ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের ছিল। দেশাত্ম-বোধের এই অন্তরায় দুর করিয়া সমগ্র দেশে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে আবে সাইয়ের প্রচেষ্টায় পুরাতন প্রদেশ বিভাগের পরিবর্ত্তে ফ্রান্স কতকগুলি 'ডিপার্টমেণ্টে', প্রতি ডিপার্টমেণ্ট কতকগুলি 'ডিষ্ট্রিক্টে,' এবং প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট কতকগুলি 'কমিউনে' বিভক্ত হয়, এবং ইহাদের মধ্যে আইন ও অধিকারের সাম্য স্থাপিত হয়। ইহাদের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাচন প্রথানুসারে গঠিত একটি মন্ত্রণা সভা ও একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সমর্পিত হয়।

সরাইয়া এক পা, দুই পা করিয়া সেনাদল নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে—শান্তির সময়ে—এই বনে পাখী শিকারের জন্য বহু শিকারীর সমাগম হইত। এখন সেখানে মানুষ শিকার চলিতেছে।

ওক্, বীচ, ভূর্জ্জ—এই সব গাছের জঙ্গল। ভূপৃষ্ঠ সমতল,—পুরু শেওলা ও ঘাসে আবৃত বলিয়া পদশব্দ শোনা যায় না। পথ নাই, পথের দুই একটি ক্ষীণ রেখা মাত্র এখানে ওখানে চোখে পড়ে; কিন্তু সেগুলি আবার অদূরবর্ত্তী ঝোপ ঝাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দশ হাত দূরের লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কখনও কখনও দুই একটা বক ও সারস উড়িয়া যাইতেছিল। নিকটেই জলাভূমি আছে বোঝা যায়।

সেনাদল যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে লাগিল। কতকটা উদ্বিগ্ন—যাহার সন্ধানে তাহারা চলিয়াছে পাছে তাহাই সম্মুখে পড়ে, যেন এই আশঙ্কায় সশঙ্ক।

কোনো কোনো স্থানে তাহারা অচির-পরিত্যক্ত শিবির সন্নিবেশের চিহ্নসকল দেখিতে পাইল:—দগ্ধ ভূপৃষ্ঠ, বিমর্দ্দিত তৃণগুল্ম, আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত ছিন্ন বৃক্ষ-শাখা, পত্রপল্লবে রক্তবিন্দু। এখানে রন্ধন করা হইয়াছিল, ওখানে প্রার্থনার বেদী, অনতিদূরে আহতের ক্ষতবন্ধনের চিহ্ন। কিন্তু জনমানব নাই। কোথায় তাহারা? হয়তো বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। হয়তো বা খুব নিকটেই বন্দুক হস্তে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কাননভূমি মনুষ্যপরিত্যক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছিল। সেনাদল অধিকতর সতর্কভাবে চলিতে লাগিল। বিজন বন—কাজেই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আশঙ্কা তাহাতেই আরও বর্দ্ধিত হইল। অরণ্যটির বড় বদ্নাম। অতর্কিত আক্রমণ অসম্ভব নহে।

ত্রিশজন পদাতিক সৈন্য একজন সার্জেণ্টের নেতৃত্বে প্রধান দলের অনেকটা আগে আগে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য যাইতেছিল। পল্টনের পানীয়-সরবরাহিকাও তাহাদের সঙ্গে ছিল। এই সকল মেয়েমানুষ ইচ্ছা করিয়াই অগ্রগামী গার্ডদের সাথী হয়। তাহাতে যেমন বিপদাশঙ্কা, তেমনি আবার যাহা যাহা ঘটে সব দেখিবার সুযোগও আছে। কৌতূহলই অনেক সময় সাহসিকতার নিদান।

শিকারীগণ তাহাদের শিকারের গোপনাবাসের সন্ধান পাইলে যেমন চমকিয়া উঠে, সহসা এই অগ্রগামী সৈনিকগণ তেমনি চমকিয়া উঠিল একটা ঝোপের ভিতর হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। ডালপালাগুলিও যেন নড়িতেছে। সৈনিকগণ পরস্পর সঙ্কেত-বিনিময় করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে ঝোপটি ঘিরিয়া ফেলা হইল। সঙীনের সারি চারিদিকে বৃত্তাকারে উদগ্র হইয়া রহিল। সন্দেহের স্থানে নিবিদ্ধ-দৃষ্টি সৈনিকগণ স্ব-স্ব বন্দুকের ঘোড়ায় অঙ্গুলি রাখিয়া সার্জেণ্টের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পানীয়-সরবরাহিকা কিন্তু সাহস করিয়া ঝোপের ভিতর চাহিয়া দেখিল, এবং যে মুহূর্ত্তে সার্জেণ্ট হুকুম দিবে "গুলি চালাও," সেই মুহূর্ত্তে সে বলিয়া উঠিল, "থামো"!

সৈনিকগণের দিকে ফিরিয়া রমণী বলিল, "ভাই সব, বন্দুক ছুঁড়িও না।"

তারপর সে ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল; সৈনিকগণ অনুবর্ত্তী হইল।

সত্যই ঝোপের ভিতর লোক ছিল। ঝোপের অভ্যন্তরে শাখা প্রশাখার অন্তরালে খানিকটা পরিষ্কৃত স্থান। সেখানে এক রমণী একটি স্তন্যপানরত শিশুকে কোলে লইয়া শষ্পাবৃত ভূমিতলে বসিয়া আছে; আর দুইটি নিদ্রিত শিশুর সুন্দর মুখ তাহার জানুর উপরে ন্যস্ত।

পানীয়-সরবরাহিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কি করছ?"

রমণী মাথা তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রথমা ক্রুদ্ধস্বরে পুনরায় বলিল, "তুমি কি পাগল যে এমন জায়গায় এসে ব'সে আছ? আর একটু হ'লে বন্দুকের গুলিতে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গিয়েছিলে আর কি!"

তারপর সৈনিকদের অভিমুখে ফিরিয়া বলিল, "এ একজন মেয়েমানুষ।"

জনৈক পদাতিক বলিল, "তা' তো দেখাই যাচ্ছে।"

পানীয়-সরবরাহকারিণী বলিতে লাগিল, "কি বোকামি!—প্রাণটা দেবার জন্যে বনে আসা।"

রমণী ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া স্বপ্নমুগ্ধার ন্যায় এই-সব বন্দুক, তরবারী, সঙীন ও কঠোর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শিশু দুইটি জাগিয়া কান্না আরম্ভ করিল।

প্রথমটি বলিয়া উঠিল, "আমার খিদে পেয়েচে।"

দ্বিতীয়টি বলিল, "আমার ভয় করচে।"

কোলের শিশুটি তখনও স্তন্যপানে রত। পানীয়-সরবরাহিকা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আসল কাজটি কিন্তু তুমিই হাসিল্ ক'রে নিচ্চ।"

ভয়ে মা'র মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। সার্জেণ্ট তাহাকে বলিল, "ভয় নেই; আমরা লাল পল্টনের লোক।"

রমণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে ফ্যাল্ ফাল্ করিয়া সার্জেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গোঁফজোড়া, ভ্রূযুগ এবং জ্বলন্ত অঙ্গার তুল্য চক্ষুদুইটি ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পাইতেছিল না।

সার্জেণ্ট আবার বলিল, "মাদাম, তুমি কে?"

রমণী ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। রমণী কৃশাঙ্গী, যুবতী, মলিনছিন্নবস্ত্র পরিহিতা। তাহার অঙ্গে ব্রিটেনী প্রদেশীয় কৃষকরমণীদিগের ব্যবহার্য্য পশ্‌মি ঢিলা বহিরাবরণ ও মস্তকাবরণ। তাহার বক্ষস্থল পশুসুলভ ঔদাসীন্যে অনাবৃত। পদদ্বয় পাদুকাবিহীন—রক্তাপ্লুত।

"ভিকিরী হ'বে", সার্জেণ্ট বলিল।

পানীয়-সরবরাহিকা রমণীজনোচিত মিষ্টস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি বাছা?"

রমণী কোনোরূপে অস্পষ্টস্বরে বলিল, "মিচেল্ ফ্লেচার্ড"।

কোলের ঘুমন্ত শিশুটির মাথায় হাত বুলাইয়া প্রথমা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাচ্চাটির কত বয়স?"

সে যেন বুঝিতে পারিল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এ কতদিনের হয়েচে, তাই জিজ্ঞেস্ করচি।"

শিশুটির মাতা তখন বলিল, "ও বুঝেচি—আঠারো মাস"।

"এ তো তা' হ'লে বড় হয়েচে, আর বুকের দুধ খাওয়া এর উচিত নয়, একে মাই ছাড়িয়ে দাও, আমরা সুপ্ দিব।"

মা'র মন যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। অন্য শিশু দুইটি ইতিপূর্ব্বেই জাগিয়াছিল, তাহাদের ভয় তত হয় নাই যত হইয়াছিল কৌতূহল। সৈনিকদিগের পোষাকে যে পালক ছিল, তাহারা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল।

মাতা বলিল, "এদের বড় খিদে পেয়েচে—আমারও আর বুকে দুধ নেই।"

সার্জেণ্ট বলিল, "আমরা এদের কিছু খাবার দিচ্চি; তোমাকেও দোবো, কিন্তু আমাদের কথা শেষ হয়নি। আগে বল, তোমার রাজনৈতিক মত কি?"

রমণী শুধু চাহিয়া রহিল—কোনো জবাব দিল না।

"আমার প্রশ্ন শুন্‌তে পেলে কি?"

রমণী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আমাকে খুব অল্পবয়সেই কুমারী মঠে * রাখা হয়েছিল—কিন্তু আমার বিয়ে হয়েচে, আমি কুমারী নই। সেখানে মঠের সিষ্টাররা আমাকে ফরাসী ভাষা শিখিয়েছিল। গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে—কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি, জুতো পরার আর সময় হয়নি।"

"আমি জিজ্ঞেস করচি, তোমার রাজনৈতিক মত কি?"

"আমি এর মানে বুঝ্‌তে পারচি না।"

সার্জেণ্ট বলিল, "দেখ, অনেক মেয়ে-গোয়েন্দা ও তো আছে। গোয়েন্দাদিগকে আমরা গুলি ক'রে মারি। বল, সোজা জবাব দাও, তুমি গোয়েন্দা নও তো? কোন্ দেশের লোক তুমি?"

"আমি জানি না,"—রমণী বলিয়া উঠিল।

"কি? তুমি তোমার নিজের দেশ জান না?"

* সংসারত্যাগিনী ধর্ম্মচর্চ্চানিরতা নারীগণের আশ্রম। তাহারা সাধারণতঃ "সিষ্টার" (ভগিনী) নামে অভিহিত হয়।

"আমার দেশ! ও, হ্যাঁ, তা আমি জানি।"

"ভাল, কোথায় সেটা?"

"আজ্ঞে গ্রামে সিস্‌কয়নার্ডের গোলাবাড়ী।"

এইবার সার্জেণ্ট হতভম্ব হইল। একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল;—"তুমি বল্‌চ—?"

"সিস্‌কয়নার্ড।"

"সে-টা তো একটা দেশ নয়।"

"সেই তো আমার দেশ।"

একটু ভাবিয়া রমণী পুনরায় বলিল, "বুঝেচি, মশায়। আপনি ফ্রান্সের লোক; আমি ব্রিটেনীর।"

"ভাল?"

"এই দুই জায়গা এক অঞ্চল নয়।"

"কিন্তু দুইটি একই দেশ।"

রমণী সুধু বলিল, "আমি সিস্‌কয়নার্ডের লোক।"

সার্জেণ্ট প্রত্যুত্তরে বলিল, "তাই যেন হ'ল; তোমার আপনার লোকেরা সব সেখানকারই অধিবাসী?"

"হাঁ।"

"তারা কি করে?"

"তারা সকলেই মরে' গেচে, আমার বলতে আমার আর কেউ নেই।"

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল, "কি আপদ! লোকের আত্মীয়কুটুম্বও তো থাকে। তুমি কে? বল।"

রমণী হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল।

পানীয়-সরবরাহিকা দেখিল এই সময় তাহার কিছু বলা উচিত। খুকীর গা চাপ্‌ড়াইয়া এবং অন্য শিশুদুইটির গাল টিপিয়া দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "খুকীকে কি ব'লে ডাক?"

মা উত্তর দিল—"জর্জ্জেট।"

"আর সকলের বড় ছেলেটিকে? এতো বেশ বড় সড় হয়েচে—ছোট্ট সয়তানটি!"

"রেণিজিন্।"

"আর ছোটটি—এও তো বেশ মর্দ্দ হয়ে উঠেচে—মুখটি বেশ গোলগাল।"

"গ্রোস্‌এলেন্।"

"সুন্দর ছেলে মেয়ে—এর মধ্যেই এদের বেশ ভারিক্কি দেখাচ্চে।"

সার্জেণ্ট তাহার জেরা ছাড়িতে পারিল না।

"এখন বল, মাদাম, তোমার বাড়ী আছে কি-না।"

"বাড়ী আমার ছিল।"

"কোথায়?"

"আজ্ঞে গ্রামে।"

"বাড়ী ছেড়ে এসেছ কেন?"

"জ্বালিয়ে দিয়েছে।"

"কা'রা?"

"জানিনে—লড়াই হচ্ছে।"

"কোত্থেকে তুমি আস্‌ছ?"

"সেখান থেকে।"

"যাবে কোথায়?"

"জানিনে।"

"কাজের কথা বল। তুমি কে?"

"জানিনে।"

"তুমি কে, তা' তুমি জানো না?"

"আমরা পালিয়ে এসেছি।"

"তুমি কোন্ পক্ষের লোক?"

"জানিনে।"

তুমি "ব্লু" * (নীলদল) কি "হোয়াইট্‌" * (শাদাদল)—কা'দের সাথে আছ?"

"আমি আমার ছেলেদের সাথে।"

সার্জেণ্ট থামিল।

পানীয়-সরবরাহিকা বলিল, "আমার কোনো ছেলেপিলে নেই।"

সার্জেণ্ট পুনরায় আরম্ভ করিল, "কিন্তু তোমার পিতামাতা? তাদের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমার নাম রাডুব্; আমি একজন সার্জেণ্ট; চার্চ্চমিডি ষ্ট্রীটে আমার বাড়ী। আমার বাপ-মাও সেখানকার লোক ছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে আমি সব বল্‌তে পারি। তুমিও তোমার পিতামাতার কথা আমাদের বল। তা'রা কে ছিলেন?"

* "ব্লু"—সাধারণতন্ত্রের দল; হোয়াইট—রাজপক্ষীয়।

"তাদের নাম—ফ্লেচার্ড, এই মাত্র জানি।"

"বেশ্, বুঝ্লাম তাদের নাম ফ্লেচার্ড। কিন্তু লোকের একটা ব্যবসা থাকে তো? তোমার এই ফ্লেচার্ডরা—তারা কর্‌তো কি?"

"তারা মজুরি ক'রে দিন গুজরান্ করত। আমার বাবা ছিলেন রুগ্ন, আর জমিদার—তা'র জমিদার—এই আমাদের জমিদার—তা'কে যা মার দিয়েছিল; সেজন্য বাবা কোনো কাজ কর্‌তে পার্‌ত না। তা বাবাকে তারা খুব সহজেই রেহাই দিয়েছিল বল্‌তে হবে। মুনিবের বেড় থেকে বাবা একটা খরগোস চুরি করেছিল,—এর জন্যে বাবার প্রাণদণ্ড হ'তে পার্‌ত, কিন্তু মুনিব দয়া ক'রে শুধু একশো ঘা কোড়া মেরে বাবাকে ছেড়ে দেয়। তা'তেই বাবা বাকি জীবনের মত খোঁড়া হ'য়ে রইল।"

"তার পর?"

"আমার ঠাকুরদা ছিল হ্যুগ্‌নট্। পাদ্রী তাকে জেলে পাঠায়—আমি তখন খুব ছোট।"

"তার পর?"

"আমার সোয়ামীর বাপ চোরাই নিমকের ব্যবসা করত। রাজার হুকুমে তার ফাঁসি হয়।"

"আর তোমার স্বামী? সে কি করত?"

"ইদানীং সে লড়াই কর্‌ছিল।"

"কোন্ পক্ষে?"

"রাজার পক্ষে।"

"পরে?"

"আমাদের জমিদারের পক্ষে।"

"তার পরে?"

"পাদ্রীর পক্ষে।"

একজন পদাতিক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "জানোয়ারের দল!"

রমণী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। পানীয়-সরবরাহকারিণী একটু মোলায়েম ভাবে বলিল, "মাদাম্, দেখ্‌চ আমরা প্যারিসের লোক।"

রমণী হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "হা ঈশ্বর, হা প্রভু।"

সার্জেণ্ট চেঁচাইয়া উঠিল, "আর কুসংস্কারপূর্ণ উক্তি কর্‌তে হবে না!"

পানীয়-সরবরাহিকা রমণীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বড় ছেলেটিকে কোলে টানিয়া লইল। শিশুটি কোনো আপত্তি জানাইল না, চুপ করিয়া রহিল। ছেলেপিলেদের স্বভাবই এই—সহজেই বিশ্বাস করে, আবার অবিশ্বাসও করে সহজে। এর কোন বাহ্য কারণ দেখা যায় না—অন্তর হইতে কোন্ কল্যাণকামী দেবতা যেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়।

পানীয়-সরবরাহকারিণী বলিল, "বাছা, তোমার ছেলে-মেয়েগুলো তো দেখ্‌তে বেশ! এদের বয়স আমি অনুমান করতে পারি। বড়টি চার বছরের—তার ভাইটি তিন। মাইখেকো মেয়েটি তো বড় লোভী—ও রাক্ষুসী! তোর মাকে কি খেয়ে ফেল্‌বি, থাম্ না। দেখ বাছা, তোমার কিছু ভয় নেই। আমার মতো তুমিও এই সেনাদলে জুটে পড়। আমার নাম—হুজার্ড—এটা ডাক-নাম। তা, আমার আসল নাম মাম্‌জেল্ বাইকর্‌ণো থেকে এটাই আমি বেশী পছন্দ করি। আমার কাজ হচ্ছে, মদ যোগানো—যখন সৈনিকেরা বন্দুক আর তলোয়ার চালিয়ে লড়াই করে। তোমার পা আর আমার পা দেখ্‌চি এক মাপেরই; আমার এক জোড়া জুতো তোমাকে দিব। জানো, ১০ই আগষ্ট আমি প্যারিসে ছিলাম। আরে বাপ্‌রে! কি কাণ্ডই না হ'য়ে গেল! গিলোটিনে ষোড়শ লুইর হত্যাকাণ্ড দেখ্‌লাম। তা'কে তারা লুই ক্যাপেট্ বলে। তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা'কে তারা বধ কল্লে। আহা, ভাবো দেখি একবার, এই ১৩ই জানুয়ারীও সে তা'র পরিবার-বর্গ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌ছিল! তা'রা যখন জোর করে তা'কে নাগর-দোলায় (গিলোটিন্‌কে তা'রা তাই বলে) চড়িয়ে দিলে, তখন তা'র কোটও ছিল না, জুতোও ছিল না; কেবল একটা সার্ট, একটা তুলাভরা ওয়েষ্টকোট আর ধূসর রঙের পাঁতলুন ও মোজা পরা ছিল। আমি এই সবই দেখেছি। সবুজ রঙের একটা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীতে তা'কে নিয়ে আসে। দেখ, তুমি আমাদের সঙ্গে চ'লে এস। এই সেপাইরা লোক ভাল। তুমি হবে পানীয়-সরবরাহকারিণী নং ২।

কাজটা আমি তোমায় শিখিয়ে দোব—খুবই সোজা—সুরাপাত্র এবং একটা হাত-ঘণ্টা তোমার কাছে থাকবে। চ'লে যাবে যেখানে খুব গোলমাল বেধে উঠেছে—সেপাইরা গুলি চালাচ্ছে—কামান গ'র্জ্জে উঠ্‌চে, আর চেঁচিয়ে বল্‌বে—"মদ চাই কা'র, বাছারা?" এই মাত্র, কঠিন কিছুই নয়—যে চায় তাকেই আমি পানীয় দেই—তা সে 'শাদাই' হোক কিম্বা 'নীলই' হোক, যদিও আমি নিজে 'নীল' দলে। তেষ্টা সকল আহতেরই পায়—মর্‌বার সময় আর মতভেদ থাকে না। আমার ত মনে হয় এই মুমূর্ষুদের পরস্পর আলিঙ্গন করা উচিত। লড়াই করাটা কি বোকামি! চ'লে এস আমাদের সঙ্গে। আমি যদি মারা যাই, আমার পদ তুমি পাবে। আমার চেহারাটা বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু আমার স্বভাব ভাল, আমি সাহসীও খুব। ভয় পেয়ো না।"

পানীয়-সরবরাহিকা থামিলে রমণী অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাদের প্রতিবেশিনীর নাম মেরী জিয়েনী, আর আমাদের চাকরাণীর নাম ছিল মেরী ক্লড্।"

ইতিমধ্যে সার্জ্জেণ্ট্ পদাতিককে ভৎর্সনা করিতেছিল, "চুপ কর। তুমি মাদামকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। মহিলাদের সাম্‌নে গাল মন্দ দিতে নাই।"

"তা হোক। কিন্তু এ তো একেবারে কসাইএর কারবার! জমিদার এদের শ্বশুরের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়, পাদ্রী এদের ঠাকুরদাকে জেলে পোরে, রাজা এদের বাপকে ফাঁসিতে চড়ায়; আর এরা আবার সেই জমিদার, পাদ্রী এবং রাজার জন্যই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে লড়াই ক'রে নিজেরাই জবাই হয়!"

সার্জ্জেণ্ট্ বলিল, "চুপ্ চুপ্।"

পদাতিক প্রত্যুত্তরে বলিল, "মুখ বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারি বটে সার্জ্জেণ্ট, কিন্তু মনতো মানে না। কেন যে এর মত সুন্দরী রমণীর জীবন একটা বদ্‌মাস দস্যুর জন্য বিপদাপন্ন হচ্চে—"

সার্জ্জেণ্ট ধমক দিয়া বলিল, "জমাদার, এটা প্যারিসের ক্লাব নয়, বাগ্মিতার প্রয়োজন নেই।" তার পর রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর মাদাম, তোমার স্বামী কি কর্‌চে?"

"সে আর কি করবে? তা'কে তা'রা মেরে ফেলেচে।"

"কোথায়?"

"ঝোপের মধ্যে।"

"কখন?"

"আজ তিন দিন হ'ল।"

"কে তা'কে মার্‌লে?

"জানি নে।"

"সে কি? তোমার স্বামীকে কে মার্‌লে তা' তুমি জানো না?"

"না।"

"নীলদলের লোক, কি শাদা দলের?"

"গুলিতে মারা যায়।"

"তিন দিন হ'ল?"

"হ্যাঁ!"

"কোন্ দিকে?"

"আর্ণির দিকে। আমার স্বামী প'ড়ে গেল—এই আর কি!"

"তার পর থেকে তুমি কি করচ?"

"ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।"

"কোথা নিয়ে যাচ্চ?"

"যেদিকে চোখ যায়।"

"ঘুমাও কোথায়?"

"মাটিতে।"

"খাও কি?"

"কিছুই না।"

সার্জ্জেণ্ট মিলিটারী ধরণে গোঁফ উঁচাইয়া বলিল, "কিছুই না?"

"এই গাছের পাতা, মূল টুল—এই সব আর কি?"

"তা হ'লে কিছু না খাওয়াই হ'ল!"

বড় ছেলেটি এই কথাটা যেন বুঝিতে পারিল। সে বলিয়া উঠিল, "আমার খিদে পেয়েচে।"

সার্জ্জেণ্ট্ তাহার পকেট্ হইতে এক টুক্‌রা রসদের রুটি বাহির করিয়া মা'র হাতে দিল। মা সেইটুকু ভাঙিয়া দুই টুক্‌রা করিয়া দুই ছেলেকে দিল। তাহারা আগ্রহের সহিত খাইতে লাগিল।

সার্জেণ্ট বক্ বক্ করিতে লাগিল, "দেখ্‌চে, নিজের জন্যে কিছুই রাখ্‌ল না।"

একজন সৈনিক বলিল, "কারণ, তা'র খিদে পায় নি।"

সার্জেণ্ট বলিল, "কারণ, সে মা।"

কথোপকথনে বাধা পড়িল।

একটি ছেলে বলিল, "আমি জল খাব।"

অপরটিও তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "আমিও জল খাব।"

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "এই হতভাগা জঙ্গলে ঝর্ণা টর্ণা কিছু নেই না-কি?"

পানীয়-সরবরাহকারিণী তাহার কোমরবন্ধে ঝুলানো একটা পেয়ালা লইয়া তাহাতে তাহার পাত্র হইতে খানিকটা ঢালিল, এবং ছেলেদিগকে এক এক চুমুক খাইতে দিল।

বড় ছেলেটি পান করিয়া মুখ বিকৃত করিল। দ্বিতীয়টি চুমুক দিয়াই ফেলিয়া দিল।

"জিনিষটা ভালই"—পানীয়-সরবরাহিকা বলিল।

"পুরাণো মাল বুঝি?" সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল।

"হাঁ খুব সেরা মাল। এরা চাষা লোক তার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে!"

সার্জেণ্ট তাহার কথার জের টানিয়া রমণীকে বলিল, "তা হ'লে, মাদাম্, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?"

"তার উপায় তো কিছুই নাই!"

"মাঠ পার হ'য়ে যে দিকে চোখ যায় চলে যাবে?"

"যথাশক্তি, দৌড়ি, তার পর হাঁটি, তার পর পড়ে যাই।"

"আহা, বেচারা!" পানীয়-সরবরাহিকা বলিল।

রমণী ধীরে ধীরে কষ্টে বলিল, "লোকেরা লড়াই কচ্চে, আমাদের চারদিকে গুলি চালাচ্চে। কি তা'রা চায় জানিনে। এইমাত্র বুঝ্‌লেম, তারা আমার স্বামীকে হত্যা করেচে।"

সার্জেণ্ট তাহার বন্দুকের গোড়ালী ধপ্ করিয়া মাটিতে রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "কি পাশবিকতা—কি জহ্লাদে কাণ্ড এই যুদ্ধ!"

রমণী বলিল, "কাল রাত্তিরে আমরা একটা গাছের খোলার ভিতর ঘুমিয়েছিলাম।"

"চারজনেই?"

"চারজনেই।"

"ঘুমিয়েছিলে?"

"ঘুমিয়েছিলাম।"

"তাহ'লে তোমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে হ'য়েছিল!"

পানীয়-সরবরাহিকা বিস্ময়ে বলিল, "একটি গাছের খোলের ভিতরে ঘুমিয়েছিলে—তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে!"

সার্জেণ্ট্ বলিল, "আর যখন ছেলেরা বাবা, মা বলে কেঁদে উঠ্‌ছিল, তখন সেখান দিয়ে কোন পথিক গেলে তা'র কি অদ্ভুতই না ঠেক্‌ত—কিচ্ছু তো দেখ্‌তে পেত না।"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভাগ্যি, এ গরমের দিন।"

রমণী নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৌন হইয়া রহিল—নিজের দুর্দ্দশায় যেন সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সৈন্যগণ নীরবে এই দুঃস্থ পরিবারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটি বিধবা—তিনটি অনাথ শিশু। পলায়িত—নির্ব্বাসিত—নিরাশ্রয়। দিগন্তে যুদ্ধের গুরু গুরু ধ্বনি; অন্তরে ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়না—কিন্তু আহার শুধু বনের তৃণ-গুল্ম; মাথার উপর আকাশ ভিন্ন দ্বিতীয় আচ্ছাদন নাই!

সার্জেণ্ট রমণীর নিকট যাইয়া স্তন্যপানরত শিশুটির দিকে তাকাইল। খুকী মাতৃ-স্তন ছাড়িয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া নিজের সুনীল চোখ-দুটি দিয়া সৈনিকের ভয়ঙ্কর লোমশ মুখের দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া রহিল, আর একটু একটু হাসিতে লাগিল।

সার্জেণ্ট সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, বড় এক ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া গোঁফের প্রান্তে আসিয়া মুক্তাবিন্দুর মতো ঝল্‌মল্ করিতেছে। গলা পরিষ্কার করিয়া সার্জেণ্ট বলিল, "ভাই সকল, আমাদের রেজিমেণ্ট্‌কে এখন পিতৃস্থানীয় হ'তে হবে। তোমরা রাজি আছ কি? এই তিনটি ছেলেপিলেকে আমরা পোষ্যরূপে গ্রহণ করব।"

সৈনিকগণ উল্লাসে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "সাধারণ তন্ত্রের জয় হোক!"

"তা হ'লে এই ঠিক হ'ল।" মাতা এবং শিশুদের মাথার উপর দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া সার্জেণ্ট বলিল, "দেখ, দেখ, লাল পল্টনের সন্ততি!"

পানীয়-সরবরাহকারিণী আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল। তারপর সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হতভাগিনী বিধবাকে ব্যগ্রভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ছোট মেয়েটিকে এখনই কেমন দুষ্টু দুষ্টু দেখাচ্ছে।"

"সাধারণ তন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক" সৈনিকগণ পুনরায় জয়ধ্বনি করিল। তারপর সার্জেণ্ট রমণীকে বলিল, "এস, দেশ-ভগ্নী।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

এই উপন্যাসটি ভিক্টর হুগো প্রণীত
সুবিখ্যাত নাইণ্টি থ্রি উপন্যাসের অনুবাদ

সন্ধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম গগনে কোন্ নক্ষত্র বধূর
নীলাম্বরী প্রান্ত বহি পড়েছে সিঁদুর
প্রসাধন কালে; ত্রস্ত বধূ ব্যস্ত করে
ঝাড়িছে অঞ্চল খানি সঙ্কিত অন্তরে।
রক্তিম আভাসটুকু তাই পুনরায়
গাঢ় নীলে ফুটে ওঠে নীলাম্বরী গায়।
নয়নপল্লবে নিদ্রা আবেশের সম,—
ধীরে ধীরে ধরা বক্ষে জমে সান্ধ্য তম,
পল্লীর বিজন কুঞ্জে ঝিল্লীর ঝঙ্কার,
করিছে ঝিঁঝিট্ সুরে আহ্বান নিদ্রার।
নিরাশার মাঝে ক্ষীণ আশা সম রাজে
ক্ষুদ্র গৃহদীপ গুলি অন্ধকার মাঝে;
তিমির গুণ্ঠন তলে স্মিত হাস্য প্রায়
ওঠে ক্ষীণ চন্দ্র দূর গগনের গায়।
সাঙ্গ হ'ল দিবসের কর্ম্ম কোলাহল,
সন্ধ্যা দিল ধরাবক্ষে টানিয়া অঞ্চল।

প্রিয়া

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম্-এ

সহসা প্রভাতে আজ হেরিনু প্রিয়ারে।
মনে হল কত দিন দেখি নাই তারে
আপন হৃদয় মাঝে। খেয়ালের ভরে
দেখিলাম চাহি আজ সমস্ত অন্তরে
প্রেয়সীর মুখপানে; নির্ব্বাক নীরবে
রহিনু বসিয়া,—মনে হল,—যেন কবে
যুগান্তের সেই পূর্ব্ব প্রথম প্রভাতে
পেয়েছিনু তারে। সেই হতে তারি সাথে
সুখে দুঃখে করিয়াছি ঘর; প্রতিদিন
কত কাছে পেয়েছি তাহারে; নিদ্রাহীন
কত রাত্রি কাটায়েছি এই প্রিয়া সনে
কত সমারোহে। তবু আজ ভাবি মনে,
কোন্ সে রহস্যময়া চির সঙ্গোপনে
রেখেছে প্রিয়ারে ঢাকি রহস্য-বেষ্টনে!

প্রক্ষিপ্ত

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

বর্ম্মা

ওহে শর্ম্মা! আমি গীতার একটা ব্যাখ্যা লিখেছি। তা'তে নতুন কথা আছে। ছাপালে চলবে কি না বলতো?

দাস

ছাপুন না। চলবে না কেন! গীতা সম্বন্ধে কত নতুন তত্ত্ব লেখা যায় তা'র কি কিছু ইয়ত্তা আছে? গীতা হ'চ্ছে আমাদের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অধ্যাত্মের স্বর্ণখনি।

বর্ম্মা

প্রাচীনের কথা জানিনে। উনবিংশ শতাব্দীর আগে গীতাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র সালসা ছিল কি না বলতে পারি নে। আর আমি যে ব্যাখ্যা লিখেছি তা'তে অধ্যাত্মের নামগন্ধ নেই।

দাস

নেই!! নেই যদি, তবে ছাপাতে চাচ্ছেন কেন?

শর্ম্মা

আহা, নেই ব'লেই তো নতুন! তাই ছাপাতে চাই। আচ্ছা, বর্ম্মা! তুমি হঠাৎ এ কাজ করলে কেন? তুমি তো আদিপর্ব্বে সরকারের দরবারী হ'য়ে, সভাপর্ব্বে ভারতস্বাধীন ক'রে জেলে যাও নি যে, বনপর্ব্বে গীতার ব্যাখ্যা লিখতে হ'বে। আর কী-ই বা লিখেছ?—শুনি।

বর্ম্মা

আমার ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, "গীত" শব্দের অর্থ গান। আকারান্ত করলেই স্ত্রীলিঙ্গে হয় 'গীতা'—অর্থ একই। পুরুষের নামের শেষে 'া'কার দিলে মানের কোন তফাৎ হয় না, কিন্তু মেয়েদের নাম হয় এ তো আমরা দেখছি। যেমন 'অনিল' 'অনিলা', 'সুনীল' সুনীলা'। মাসিকপত্র এবং পুস্তকের নামেও যে আকারন্ত ক'রে পত্রিকা ও পুস্তিকাতে পরিণত করাই শিষ্ট রীতি তা'র প্রমাণ—'বিচিত্রা', 'গীতিকা', 'কথিকা' ইত্যাদি।

এখন 'গীতা'র অর্থ যদি হয় গান, তাহ'লে প্রশ্ন ওঠে "গীতা" কিসের গান? আমি বলেছি, খোসা বাদ দিলে গীতা হচ্ছে রণগীতি।

দাস

খোসা আবার কোন্‌টা?

বর্ম্মা

ঐখানেই আমার ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব।

শর্ম্মা

মৌলিক কথারই টীকা প্রয়োজন। অতএব...

বর্ম্মা

এটা নেহাৎ সোজা কথা। আঠারো অধ্যায় গীতার সমস্তটাই একজনের লেখা নয়।

দাস

কয়জনের?

বর্ম্মা

আগে শোন। গীতার আরম্ভ সৈন্যসমাবেশ বর্ণনায়। রথারূঢ় ধনুর্ব্বাণধারী অর্জ্জুন হঠাৎ ধনুক বাণ ফেলে দিয়ে গোঁ ধরলেন 'যুদ্ধ করব না'।—যেমন ছেলেরা প্রাইভেট টিউটারের কাছে আব্দার করে, 'মাষ্টার মশায়, আজ আর পড়ব না'। অমনি শ্রীকৃষ্ণ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "পার্থ! এ কি অনার্য্যজনোচিত কথা তোমার মুখে! যুদ্ধ তোমাকে করতেই হ'বে। কেন করবে না?" অর্জ্জুন বললেন, "হত্যা মহাপাপ।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ছোঃ, মারেই বা কে, আর মরেই বা কে! পুরোণো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন একখানা পরা বৈ ত নয়! আর মরলেই বা কি? মরলে স্বর্গে যাবে, আর জিতলে রাজা হবে, পৃথিবীর ধনরত্ন সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে। 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ'। এই গেল দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত। তা'র পরেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোক, "'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কার-

ভাব যার নেই, 'হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে' সে হত্যা ক'রেও হত্যা করে না। 'মরিয়া না মরে রাম' তো বটেই; সঙ্গে সঙ্গে 'মারিয়া না মারে রাম'ও বটে! অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, তা'কে প্রকৃত-নিয়োজিত কর্ম্ম করতেই হ'বে।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥" ১৮।৪৭

আর অর্জ্জুন নিজে যদি নাও করতে চান তো অর্জ্জুনের ঘাড় করবে। "কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ১৮।৬০ আর এই কর্ম্ম অর্থে যে রণকর্ম্ম সে বিষয়ে সন্দেহো নাস্তি, কারণ সঞ্জয় এই পার্থবাসুদেব সংবাদের বিশ্লেষণ দিয়েছেন 'লোমহর্ষণং', "সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণং"।

এখন আমার ব্যাখ্যার সার কথা হচ্ছে এই যে, প্রথম দেড় অধ্যায় ও শেষের পৌনে অধ্যায় ছাড়া গীতার বাদবাকী পৌনে ষোল অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত।

দাস

Marvellous! এ আপনি ছাপাতে চান না! আশ্চর্য্য!

শর্ম্মা

মৌলিক বটে! তবে এর সঙ্গে মৌলির সম্পর্ক আছে কিনা...

বর্ম্মা

কেন থাকবে না? আসন্ন যুদ্ধকালে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় বললেন, আর অর্জ্জুন তাই অবহিতচিত্তে শুনলেন, এ অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ঘটনাবলীর রিপোর্ট দেবার সময় সন্ন্যাসযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ আদি যাবতীয় অধ্যাত্ম, বিশ্বরূপদর্শন ও অর্জ্জুনের স্তুতি ইত্যাদি সমস্ত আউড়ে গেলেন, এ হ'চ্ছে ততোধিক অসম্ভব।

শর্ম্মা

যুদ্ধক্ষেত্র, সঞ্জয় ও সব তো নেহাৎ খোসা হে!

বর্ম্মা

না খোসা নয়। গীতা তো আর আপ্তবাক্য নয়। গীতা লেখা, কাজেই সম্ভব অসম্ভব দেখতে হবে। লোক তথা দেবমাত্রেরই ধর্ম্ম হ'চ্ছে পরকে বলা, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ আমার মত অনুসরণ কর। গীতাতেও তা' বলা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সর্ব্বধর্ম্মের আলোচনা কেন করা হয়েছে? মামেকং শরণং ব্রজই যদি হয়, তাহ'লে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ—"এই তো চরম যুক্তি, এ তথ্যের পর আর তত্ত্বকথার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আগে যখন 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' অদ্বৈত ভূমিকা এবং শেষে 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ' এবং 'করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ' নরমে গরমে দ্বৈত উপসংহার আছেই। আর মাঝে যে পৌনে ষোল অধ্যায় তা'র মস্ত মস্ত তত্ত্বেরও তো নির্য্যাস হচ্ছে, তৃতীয় অধ্যায়ের 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি, এবং একাদশ অধ্যায়ের 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"—অর্থাৎ প্রথম ও শেষ সওয়া দুই আনার পুনরাবৃত্তি। এরকম পুনরাবৃত্তি যে মূলের বিবৃদ্ধি মাত্র, অতএব প্রক্ষিপ্ত, এ তো জলের মতো সোজা। অতএব, দাঁড়াল এই গীতার অন্তরস্থ পৌনে ষোল আনা খোসা।

দাস

ভিতরে আর খোসা কেন, বীচি বলুন।

শর্ম্মা

বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি!

বর্ম্মা

বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি তো আর নতুন নয়। মহাভারতের 'ভারত' মূল এবং 'মহা'টা প্রক্ষিপ্ত—এতো পণ্ডিত-সমাজের কথা। গীতার কথাটা আমি বলছি, তাই হাসছ!

দাস

মহাভারত যে একজনের লেখা নয়, এটা কিন্তু ঠিক্। যে আঠারো পর্ব্ব, বাপ্! একজনে লিখতে পারে, এ ভাবাই যায় না।

শর্ম্মা

রবিবাবু একা যত লিখেছেন এত যে একজনে লিখতে পারে আমার নাতি ভেবে উঠতে পারে না।

দাস

বা ! মনে ছিল না তাই, মনে করিয়ে দিলে ; আপনার নাতি কেন, আমিও যে ভেবে পাইনে।

বর্ম্মা

কিন্তু মহাভারতে যে যথাতথা উপাখ্যানের ঝাড়, সে অসঙ্গতিগুলি !—তা'রও কি একটা ব্যাখ্যা করেছ না কি শর্ম্মা ?

দাস

হাঁ, হাঁ ! সেগুলো ? তা'র পর কুমারসম্ভবের শেষার্দ্ধ, ইত্যাদি? লিখনভঙ্গী দ্বারা যেগুলি প্রক্ষিপ্ত ব'লে সাবাস্ত হয়েছে ?

শর্ম্মা

কাঁচা পাকা লেখা একসঙ্গে থাকলে পাকা হাতের লেখাটাই আসল এবং দুর্ব্বল অংশটা প্রক্ষিপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করলে লেখকের উপর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়,—সাহিত্যিক যুক্তির আভাসও দেখা যায় না। একশ' বছর পর যদি কেউ ব'লে 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব্ব শরৎবাবুর রচিত, ৩য় পর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত, তাহ'লে সেই কথাই শিরোধার্য্য করবে ?

দাস

তা' করব কেন ? সত্য তো আর উল্টায় না।

বর্ম্মা

একশ' বছর পর শিরোধার্য্য করবার জন্যে আমাদের শির এখানে থাকবে না।

শর্ম্মা

আচ্ছা, একশ' বছর পরে না হ'ল, আগেই হোক্।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বধ হ'ল, নবম সর্গে তা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে গ্রন্থ শেষ হ'ল। মাঝে সপ্তম ও অষ্টম সর্গ কাব্যহিসাবে কী সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে ? ঘটনার দিকেই অত্যাবশ্যক কি? সপ্তম সর্গে আছে 'দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি' অষ্টম সর্গে হায় ! হায় ! আর কাব্যসৌন্দর্য্যের নমুনায় উক্ত দুই সর্গে যে দুর্ব্বলতার নিদর্শন মেলে মেঘনাদ বধের অন্যকোন সর্গে তা' পাওয়া ভার। সপ্তম সর্গের আরম্ভ দেখ,

"উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্নভাবে,
চাহিলা মহীর পানে।"

অনুপ্রাসের শ্রুতিমোহন বিনুনী যে কাব্যের রূপদান করছে সেই কাব্যেরই এই কয় পংক্তি শুধু "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব" স্মরণ করিয়ে দেয়, তার অতিরিক্ত কিছুই নয়।

ঐ সর্গেই আবার দেখ,

"প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে। ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি।"

হাঁটু শুধু হস্তীরই ভাঙেনি। অষ্টম সর্গ সপ্তম অপেক্ষা কতক সবল। অন্য কিছুর অভাবে 'সু' দ্বারা পাদপূরণ প্রায় সমস্ত সর্গেই আছে। কিন্তু অষ্টম সর্গের চার পংক্তিতে এই ব্যাপারটি যেমন ঘনীভূত হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

"সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন-মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বসন্ত-সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাহিছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চ স্বরে।"

এখন যদি বলি, ও দুই সর্গ মাইকেলের কলম থেকে বেরোয়নি, পরন্তু প্রক্ষিপ্ত, তাহ'লে ?

দাস

তা হ'লে তা' মানব না, কারণ আমরা জানি ও প্রক্ষিপ্ত হ'তে পারে না। একালের আর সেকালের বিচার কি এক মাপকাঠিতে হ'তে পারে ?

বর্ম্মা

আমিও বলি একাল ও সেকাল দুইকালের আলোচনা দুইভাবে করতে হ'বে। যা আমরা জানি তার বিচার করতে হবে তথ্যের মাপকাঠিতে, আর অতীতের যা আমরা জানিনে তার বিচার করতে প্রয়োজন হয় বিজ্ঞানের। প্রক্ষিপ্তবাদ তথ্য নয়। 'প্রক্ষিপ্ত' বিজ্ঞান। পূর্ব্বাপর যার সামঞ্জস্য নেই তাই প্রক্ষিপ্ত। সত্যিই যদি প্রক্ষিপ্ত না

হয় তা'তেই বা কি আসে যায়? গবেষণার কি মূল্য নেই? লজিক্ কি বৃথা?

শর্ম্মা

নহে, নহে, নহে!

দাস

নিশ্চয় নয়।

শর্ম্মা

লজিক্ বৃথা নয়। পূর্ব্বাপর যার সামঞ্জস্য নেই তাই প্রক্ষিপ্ত। বর্ত্তমান বাঙালীর জীবনটাই প্রক্ষিপ্ত!

বর্ম্মা

ওটা আবার তুমি...

দাস

নিশ্চয় নয়।

বর্ম্মা

ওটা আবার তুমি আর একটা ভুল করছ। 'অপর' অর্থাৎ ভবিষ্যৎ না দেখে শুধু 'পূর্ব্ব' দেখে বর্ত্তমানকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না। ভবিষ্যৎ জানা যায় প্রজ্ঞান দ্বারা।

দাস

প্রজ্ঞান আবার কি?

শর্ম্মা

আমি দেখেছি বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য থাকবে না।

দাস

কোথায়?

শর্ম্মা

বর্ত্তমানের ক্ষিপ্ততায়।

বর্ম্মা

আমি দেখেছি অতীতের সাথে বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য আছে।

দাস

কিসে?

বর্ম্মা

অতীতের ক্ষিপ্ততায়।

শর্ম্মা

অর্থাৎ বর্ত্তমানের প্রক্ষিপ্তে।

দাস

তাহ'লে আমিও দেখছি, অতীত ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য আছে।

বর্ম্মা

হাঁ, সনাতন ক্ষিপ্ততায়।

শর্ম্মা

না, অপভাষা ব্যবহার ক'রো না, বলো অধুনাতন প্রক্ষিপ্তে।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৩৬

স্বর

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

[চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে]

সমস্যা

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সোপেনহর যা' বলেছেন, অটো ওয়েনিন্‌জার, লুডোভিসি যা' বলেছেন, কাইসারলিং যা' বলেছেন, এঁদের আগে পরে আরও যাঁরা দেশবিদেশের সবাই মেয়েদের সম্বন্ধে যা' কিছু এবং 'যা ইচ্ছে' বলেছেন, এঁদের সমসাময়িকরা যা' বলেছেন, সব জড় করলে একখানা অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত বিশেষ হয় বোধ হয়; এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সে সংগ্রহটা কম কৌতূহলজনক কম জ্ঞানপ্রদ হয় না। অথচ একালে সেকালে মেয়েরা এরকম ক'রে কোনো পক্ষেই—না স্বপক্ষে না বিপক্ষে—কিছুই বলেন নি; সম্ভবতঃ তাও এইজন্যে যে, বলবার মতন কিছু পাওয়া যায় নি—কিম্বা বলবার যোগ্যতাই নেই।

কিন্তু যোগ্যতা থাক না থাক, নিজেদের কথা উঠলে নিজেরা কিছু না বল্‌তে পারার মতন 'বালাই' আর নেই। অন্যে তাতে যা' ইচ্ছে বলবার সুযোগ পায়। এইজন্যে অনেক সময় অসাধারণকে সাধারণের পর্য্যায়ে নেওয়া হয়, 'ব্যতিক্রম'কে নিয়ম মনে করা হয়, আর ক্রমশঃ তা' বলার গুণেই প্রামাণ্য-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াতে থাকে।

সংস্কার আমাদের কতখানি গড়েছে, আর শুধু আমরা কি,—সেটা আমরা নিজেরা জানি না-ই শুধু নয়—অনেক সময় ধারণা করাও শক্ত হয়। একবার এক তরুণদলের এই ধরণের আলোচনাতে একজন গুরুজন বলেন, 'মানুষের সাড়ে পনের আনাই তো সংস্কার, সংস্কারকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতেই পারবে না।' তাঁর কথাটি অনেককে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। পুরুষ কি নিয়ে জন্মায়, আর কি হ'য়ে দাঁড়ায়—পারিপার্শ্বিকের, আবেষ্টনের, সংস্কারের—নানারকমের প্রভাবে—একটা বাদ দিয়ে অন্যটা বলাও যায় না; আর বল্লেও সবদিক দিয়ে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

মেয়েদের স্বভাব প্রকৃতি সংস্কারও এ নিয়ম ছাড়িয়ে গ'ড়ে ওঠে না। আর নিতান্ত শিশু ছাড়া, বন্য বর্ব্বর সভ্য শিক্ষিত সব মানুষেরই সংস্কার আছে; সুতরাং সংস্কারমুক্ত স্বভাব আদিতে কি ছিল,—লজ্জা, নীতি, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা অসংস্কৃত মনে থাকে কি না, এ সব সভ্য সমাজেরই গুণ কি না, ঠিক ক'রে বলা শক্তই। প্রকৃত মানুষ বল্‌তে আমরা যা বুঝি 'প্রাকৃত' মানুষ যে তা নয় এতে বোধ হয় সন্দেহ নেই। যাই হোক, প্রাকৃত মানুষ কিরকম হয় আমরা জানি না, এবং সংস্কারমুক্ত প্রাকৃত নারীও আমরা দেখিনি। সম্ভবতঃ যাঁরা মেয়েদের সত্যিকারের স্বভাব কি নির্ণয় করেন, তারপর রকম রকম সংজ্ঞা আখ্যায় ভূষিত করেন, তাঁদেরও সে সৌভাগ্য হয়নি। তখন সমগ্রভাবে সারা পৃথিবীর স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে স্বভাবে যেটা নেই বা দেখা যায় না, সেইটেই যে সত্যিকারের তাদের স্বভাব ছিল আর আছে, তা বলাও যেমন শক্ত মেনে নেওয়া তেম্‌নি কঠিন। নিদান অনুসরণ ক'রে অনেক সময় অন্য প্রাণীর স্বভাব থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সিদ্ধান্ত করা হয়; সেটাও ভাববার কথা। প্রাকৃতিক জগতে আসক্তি আছে, মায়া আছে; সংস্কার নেই। প্রকৃতির নিয়ম শুধু জীবন-প্রবাহ;—আসক্তি মায়াও ক্ষণিক, স্থায়ী নয়;—আজ পর্য্যন্ত হয়ওনি। (আর এই প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসারে যুক্তি বিচার তাহ'লে শুধু মেয়েদেরই উপর প্রয়োগ করা চলেনা।)

এই সংস্কারের মূলে, এক কথায় স্বভাবে, মনের অজানা কোণে মেয়েরা যে কি এবং তার কি দোষগুণ আছে, যাঁরা বলেছেন এমন দু'চারজনের কথাই আমি অবশ্য যা' দেখেছি সংক্ষেপে বল্‌ব। যাঁরা এইসব লেখকের কথা উদ্ধৃত করেছেন বা সমর্থন করেন—মেয়েদের তাঁদের কাছে নিবেদন স্বরূপ দিলাম।

সোপেনহর বলেছেন, মেয়েদের শারীরিক গড়ন লক্ষ্য ক'রে দেখলেই বোঝা যায় তারা না-বেশী মানসিকতার উপযুক্ত, না-বেশী শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করতে সক্ষম।

সেই নিয়মে তারা জীবনের ঋণ সন্তান ধারণ ও পালনের কষ্টে সহিষ্ণুতায়, ত্যাগস্বীকারে, এবং পুরুষের কাছে অবনমিত থেকে তাদের প্রফুল্ল সহিষ্ণু সাহচর্য্য দিয়ে শোধ করতে বাধ্য; ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দিক দিয়ে তার কোন উপযোগিতা নেই। প্রচণ্ড দুঃখ,আনন্দ, গৌরব কোনো কিছুই তার জন্য নয়।—তারা মিথ্যাচারিণী, coquette, বঞ্চনা-কারিণী, 'they have no sense of justice,' বিচার-বিবেচনা-জ্ঞানহীন। তারা শিশু আর মানুষের মধ্যবর্ত্তিনী প্রাণী। তাদের দুর্ভাগার প্রতি দয়া সেও বিবেচনা-বুদ্ধি-যুক্তিহীনতার জন্য। বর্ত্তমানকে বড় ক'রে দেখা অদূরদর্শিতা, জন্তু জগতের মতন—সেও ঐ যুক্তিহীনতারই জন্য। ঐ বিচার-যুক্তি-বিবেচনাহীনতার জন্য তাদের একটা সহজ চতুরতা আছে আর মিথ্যাভাষণেও অসংশোধনীয় প্রবণতা আছে। নখী, দন্তী, শৃঙ্গী ইত্যাদির মতন প্রকৃতিদেবী নারীকেও আত্মরক্ষা করতে পারার জন্য কপটতা গুণটি দিয়েছেন। এই জন্য সত্যপরায়ণা নারী দেখতে পাওয়া যায় না। এই মূল কপটতা থেকেই অবিশ্বস্ততা, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা-পরায়ণতা ইত্যাদি দোষ জন্মেছে।

উত্তরাধিকারেও নারীদের দাবী থাকা উচিত নয়, কেননা তারা উপার্জ্জন করে না। তা ছাড়া, বিষয় পরিচালনার বুদ্ধিও তাদের নেই। স্পার্টানদের পতনের অনেকখানি কারণ বোধ হয়—মেয়েদের অধিক অধিকার দেওয়া,—যৌতুক দেওয়া, সম্পত্তি দেওয়া এবং প্রচুর স্বাধীনতা দান করা। পরিণাম তাদের ভাল হয় নি। ফ্রান্সএর অদৃষ্টে ও কি আছে বলা যায় না। (On Women—Essays of Schopenhauer.)

Otto Weininger বলেছেন, 'মেয়েরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর; এক—মা, অন্য—ভালভাবে বল্লে মোহিনী বা মনোরঞ্জিনী। মাতৃপ্রকৃতির নারীতে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিক; অন্য শ্রেণীতে ঔদার্য্য,বুদ্ধিমত্তা,সদয়তা, সহৃদয়তা ইত্যাদি দোষ স্বাভাবিক। ঐ শেষের শ্রেণীরা মা বা স্ত্রী হ'লেও মার instinct-হীন, মার বিকৃতি।' এঁর মতে 'মাতৃপ্রকৃতির প্রধান লক্ষণ অপরের সন্তানকে হিংসা করা, পীড়ন করা, আপনার সন্তানের স্বার্থের জন্য; অপর প্রকৃতির মেয়েদের প্রধান লক্ষণ অপরের শিশুতে দয়া দাক্ষিণ্য মায়া রাখা ইত্যাদি। চরিত্রের উৎকর্ষ, refinement, মাধুর্য্য ইত্যাদি যা কিছু শেষের শ্রেণীর একটা লক্ষণ। সোপেনহরের মতানুযায়ী,এঁরও মত দুশ্রেণী নিয়েই, মেয়েরা মোটের উপর লজ্জাসম্ভ্রমশালীনতাহীন, অসত্যপরায়ণ, সত্যাসত্যজ্ঞান-হীন। মেয়েদের আত্মা নেই, soulless ইত্যাদি।

(Sex and Character.)

Weininger বলেছেন, 'মেয়েরা অন্তঃসারশূন্য, non-moral; শীলতা জ্ঞানহীন, নীতির ধার ধারে না, সঙ্কীর্ণ অনুকরণপরায়ণ, vain, অবিশ্বস্ত, মিথ্যা সত্য বিবেচনা-হীন ইত্যাদি। (এককথায় আগের দুজন যা' বলেছেন তাই তিনিও বলেছেন, বলবার ধরণটা ভিন্ন, 'ভালর জন্য বলছি' ভাব। বইটার নাম দিয়েছেন Vindication।) যাঁরা স্ত্রীজাতিকে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, ভক্তি করেছেন, অনেক কাজে স্ত্রীলোকের প্রেরণা পেয়েছেন, যেমনভাবেই হোক, কবি জ্ঞানী দার্শনিক ধার্ম্মিক যে জীবনেই হোক, তাঁদের অনেককে এই Vindicationএর পরিশিষ্টে স্মরণ করা হয়েছে।

(Women—A Vindication)

কাইসারলিং যে বই-এ মেয়েদের সম্বন্ধে এইসব "স্ত্রীজাতির নীতি, ধর্ম্ম, লজ্জা প্রভৃতির কোনো স্বাভাবিক সংস্কার নেই (নারীর মূল্য পরিশিষ্ট 'গ' বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৬) তারা গড্ডলিকা-প্রবাহবিশেষ, দেখাদেখি সব পারে, খেলো-স্বভাব, অনুকরণপরায়ণ, ফ্যাসনের জন্য সব কিছু পারে, তাদের নীতিপরায়ণতা তাদের অভ্যাসের দোষ, স্বভাবের সংস্কারের ফল নয় গুণ নয় ইত্যাদি তথ্য বলেছেন সে বই দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি; বিচিত্রার পাতাতেই শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র এবং শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্ধৃত মতামতই আমাদের চোখে পড়েছে।

মেয়েদের বিরুদ্ধে যাঁরা চরমভাবে ব'লে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এইকজন বোধহয় খুব খ্যাতনামা। টলষ্টয়,নীট্‌শেও সোপেনহরের মতন অনেক কথা বলেছেন। "She requires a master." দাবিয়ে রাখবার জন্য—নিট্‌শে বলেছেন। টলষ্টয় তাঁর কথা সাহিত্যে তাদের লঘু,(Gospel of Superman)

বাচাল, হ্রীহীন, vain, fickle ইত্যাদি দেখিয়েছেন। ওঁরও ধারণা মেয়েদের নিতান্ত অন্তঃপুরের ছোটখাট বিষয়ে ছাড়া কোনো কিছুতে উপযোগিতা নেই...। তাঁর Social Evil and their Remedyতে এই বিষয়ে খানকতক চিঠি আর প্রবন্ধ আছে যাতে বোঝা যায়, তাঁর ঠিক মতটায় নয়, মনটায় স্ত্রীজাতির ওপর শ্রদ্ধা নেই, অবজ্ঞা আর সন্দেহই বেশী।

আমাদের পুরাণকার শাস্ত্রকারেরা এইরকম ভাবের মতামতও যে দেন নি তা নয়। নারীদের সম্পর্কে অপরপক্ষে ঐ পুরাণকার শাস্ত্রকারেরাই শক্তি, শ্রী, দীপ্তি লক্ষ্মী, শোভা, সেবা, প্রভা ইত্যাদি নানারকম ভাবের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

এতো গেল একপক্ষের কথা। অপরপক্ষেও যাঁরা বলেছেন তাঁরা কম পূজ্য মনীষী ন'ন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের রচনায় নারীচিত্রের অভাব নেই। শুধু কল্পনায়, গল্পে, সমস্যামূলক সৃষ্টিতে সবেতেই এঁরা মেয়েদের দেখিয়েছেন মানুষের সমগ্রতা দিয়েই; সীমা এঁকে কোনো রেখা মাঝখানে টেনে দিয়ে তাকে 'পুরুষের চেয়ে কম', মাত্র 'জীবধাত্রী', দুর্ব্বল, লঘু ইত্যাদি ব'লে পৃথক ক'রে দেখান নি। বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' নামের প্রবন্ধাবলীতে মেয়েদের যে একটুও উপেক্ষা ক'রে যান নি তাই দেখা যায়।

এই পক্ষে হ্যাভেলক এলিস এত বিস্তৃত, গভীর, সব দেশ কাল নিয়ে, আবেষ্টন ঐতিহ্যের প্রভাব, বংশানুক্রম, প্রকৃতির প্রভাব, সমস্ত পৃথিবীর বর্ব্বর ও সভ্যজাতি সব খুঁটিয়ে, প্রত্যেক দেশের মনোভাবের অপক্ষপাত সমালোচনা ক'রে, সংস্কার স্বভাবকে পৃথক ক'রে দেখে, যা বলেছেন, তা থেকে শুধু এইটুকু আমার দরকার, "নারী স্বভাবতঃ একনিষ্ঠ, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি,...পুরুষের দূরদর্শিতা তাকে কাছের বিষয়ে অন্ধ ক'রে রাখে, মেয়েদের তৎপরতা সেই সব বিষয়ে তাকে রক্ষা করে।" এঁর মতে বর্ব্বর নারী বন্য নারী নিজ জাতীয় পুরুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী, তৎপর। "সে পুরুষ নয়, তাই পুরুষের চেয়ে কমও নয় বেশীও নয়।" (সাইকলজি অভ সেক্স—পরিশিষ্ট)। লজ্জাশীলতার অভাবই যে নারীচরিত্রের বিশিষ্টতা সেটা তাঁর পুস্তকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ওঁর ধারণা মানুষের সকলেরই লজ্জা আছে।

সোপেনহর বলেছেন, 'নারী স্বভাবতঃ একনিষ্ঠ স্থায়ী প্রেমিক। পুরুষের প্রণয় কালে ক'মে যায়, অন্য রমণীতে আকৃষ্ট হয়, মেয়েদের পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সচ্চরিত্রা নারী যত সুলভ, পুরুষ সেই অনুপাতে দুর্লভ।' এঁর এ মত কম মূল্যের নয় নিশ্চয়।

Ludoviciও বলেছেন 'নারী একনিষ্ঠ।'

('বিচিত্রা' বৈশাখ ১৩৩৬)

মনে হচ্ছে কিসে পড়েছিলাম, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ধারণা সভ্যতার, লজ্জার, শীলতার (morality) ইতিহাসে মেয়েদের প্রভাব বড় কম নয়; এমনকি তাদের ভিত্তিস্বরূপ বলা চলে।

উল্লিখিত অভিমতগুলিতে দেখা যাচ্ছে অনেকের মত, মেয়েরা বিবেক-বুদ্ধি, নীতিবিচার, শীলতাবোধ, লজ্জাসম্ভ্রম-জ্ঞান সত্যাসত্য বিচারের ধার ধারেন না। ওঁদের ধাতুতেও জিনিষ নেই। তাঁরা লঘুপ্রকৃতি, বাচাল, অকৃতজ্ঞ, জন্ম-সংস্কারে coquette, অনুদার, বুদ্ধিহীন, অনুকরণপরায়ণ ইত্যাদি। এক কথায়, সংস্কারে স্বভাবে মানুষের যা' গুণ থাকে, জন্মায়,—মেয়েদের তা' থাকলেও 'মূলেই' সেটা নেই। স্বভাবতও তাঁদের কিছু নেই, সংস্কারতও কিছু গ'ড়ে ওঠে নি। সংক্ষেপে—নিয়ম, নিষ্ঠা, নীতি তাঁরা মেনে চলেন শুধু 'ভয়ে ভক্তিতে'। অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের উপদেশের মতে 'নিত্য তাহা অভ্যাস' ক'রেই তাঁরা নীতিবর্জ্জিত না হয়ে সংসারধর্ম্ম পালন করছেন। সেটা তাঁদের অভ্যাসের দোষ, স্বভাবের গুণ নয়। সবশুদ্ধ এই মত।

অন্যপক্ষে ঐ সব মতবাদীরা এ বিষয়ে সকলে প্রায় একমত যে, মেয়েরা by nature monogamic একনিষ্ঠ, বা এক-পরায়ণা।

আমাদের সমস্যা এই—

(১) যদি মেয়েরা non-moral, শীলতার instinct অবধি তাদের নেই (প্রাকৃতিক নিয়মে তাই ব'লে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে), পক্ষান্তরে তারা স্বভাবতঃই (monogamic) একনিষ্ঠ (পণ্ডিতেরা বলেছেন),—তাহ'লে আসলে তারা

কি? কোন্ নিয়মে তাদের নীতিপরায়ণতা অপরায়ণতা বিচার করা হবে? অভ্যাসের মানে তাহ'লে কি হয়?, যে স্বভাবতঃই নিষ্ঠাপরায়ণ তাকে কি অভ্যাস করতে হয়,—না স্বতঃই প্রবণতা থাকে? এবং মতগুলো পরস্পরকে খণ্ডন করছে কিনা?

(২) নীতিজ্ঞানহীন হ'য়েই যারা সহজে, স্বচ্ছন্দে, পরিপূর্ণ প্রেমে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়—নীতির সমস্ত বিধান মেনে চলে, আর অনেকে যারা মেনে চলে না ও তার জন্য দণ্ডিতও হয়;—তারপরেও চিহ্নিত হ'য়ে প'ড়ে থাকে,—সম্ভবতঃ সমাজের সেবাও ক'রে থাকে;—এই দু শ্রেণীর নারীর স্বভাববিচারের মানদণ্ড কি? যদি নীতিজ্ঞান না থাকলে নেই বলা যায়, তবে থাকলে তা মেনেই বা নেওয়া কেন হবে না?

তাদের 'মূলে নেই নীতি' স্বভাবের উপর নির্ভর ক'রেই—তাদের উপর নীতি-পালনের ভার ষোল আনা দেওয়া হয়। এবং এই Morality পালনের গুরুভারের দিকটা থাকে তাদের পাল্লাতেই। আর কোনো instinct সংস্কার অবধি না থাকা সত্ত্বেও—তারা সেটাকে সহজে, স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে পালন করে। এবং স্থানভ্রষ্ট হলে, আশ্রয়-চ্যুত সমাজ-চ্যুতও হয়। সমস্যা এই, এ দু-শ্রেণীকে এক বিশেষণে এক সংজ্ঞায় শুধু একজাতীয়া ব'লেই অলঙ্কৃত করা যায় কি?

(৩) শিশুর কাণ্ডজ্ঞান নেই, সংস্কার নেই, অপরাধও ধর্ত্তব্য হয় না। যে জন্মগত সংস্কারে (non-moral) শীলতাজ্ঞানহীন, অনীতি-পরায়ণ, এমন কি ও-সকল বিষয়ে ধারণাবিহীন তার দ্বারা সেই (ক) নীতি-পালনের প্রত্যাশা, (খ) নীতিভ্রষ্ট হলে গুরুদণ্ড-বিধান, ধিক্কার, ত্যাগ, (গ) আবার সমাজের সেবায় তার উপযোগিতা আছে ব'লে ধারণা এবং তার সেবা গ্রহণ, কোন্ নীতি অনুসারে উচিত? যার অপরাধের সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই, দুর্নীতি-সুনীতি জ্ঞানে শিশুর মত যে সংস্কারমুক্ত;—অথচ তা' পালন করে থাকে; সদসদ্জ্ঞানহীন হ'লেও সততার সতীত্বের মর্য্যাদা রাখে—তাকে তার যা' প্রাপ্য সম্মান তাও দেওয়া হয় না, আবার 'ভীরু অভ্যাসমাত্রপালিকা' খ্যাতি-টাও তার লাভ হয়। এ অবস্থা একটি রহস্যের মতই মনে হয়।

(৪) বাহুবল, দৈর্ঘ্য প্রস্থ, তন্নিমিত্ত জয়-পরাজয়, অধীনতা-স্বাধীনতা ইত্যাদি নরনারীর সম্বন্ধের ভিত্তির মধ্যে নেই। সমস্ত পৃথিবী জয় ক'রে এসেও মানুষের চিত্ত 'একটি প্রেমের পায়ে দিনশেষে নতশির' হ'তে না পেলে সব ব্যর্থ মিছে মনে করে। নারীর চিত্তও পূর্ণতা, প্রাচুর্য্য, আনন্দ, সমৃদ্ধি, সমস্যার মাঝ থেকেও সেই বন্ধন ও আত্মসমর্পণের লোভ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না, জীবনই শূন্য রয়ে যায়। আর নখী, দন্তী, শৃঙ্গী প্রভৃতির মতন—নারী পুরুষের জাত আলাদা নয়,—ঠিক ছুটে পালাবার মতন—বা শাস্ত্রোল্লিখিত ব্যবধানে থাকার মতন; এক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষে সবচেয়ে বড় জিনিষ পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ হওয়া। এবং তাও নির্ব্বিচারে। একের আকর্ষণ পৌরুষে, অন্যের কমনীয়তায়। মুগ্ধতাই শেষকথা। বলশালিতার প্রসঙ্গে বলা যায়—এ পর্য্যন্ত শালপ্রাংশু মহাভুজা কোনো নারী কোনো পুরুষকে পরাস্ত ক'রে হৃদয়-বিজয়িনী হ'ন নি; অপরপক্ষে, কমনীয় সুন্দর কোনো পুরুষও নারীর কাছে প্রশংসিত হন নি।

ক্ষমতা, শক্তিশালিতায় গামা গোবর প্রভৃতি মল্লেরা সাধারণ যুবকদের চেয়ে অনেক পরিমাণে শক্তিশালী। সাধারণের মধ্যেও অল্পাধিক বলিষ্ঠ এবং ক্ষীণবল আছে, মেয়েদের মধ্যেও সে তারতম্য বর্ত্তমান। তাহ'লে যখন দেখা যাচ্ছে, বলশালিতায় সকল মানুষ সমান হয় না, তখন খামকা প্রবল-দুর্ব্বলের কথা ওঠার কোনো অর্থই হয় না। বলের দ্বারা মানুষের কতটুকু জয় করা যায়? নরনারীর সম্বন্ধ তো এ-নিয়ে নয়ই। মানবেতর প্রাণীরও এ-সম্বন্ধ বাহুবলের মধ্য দিয়ে নয়।

স্বভাব বা প্রাকৃতিক বিধান মানুষ কখনো মেনে চলেও নি—চলবেও না। সে চিরকাল মেনে এসেছে নিজেকে, নিজের ইচ্ছাশক্তিকে, বিবেককে,—স্বকে। তাকে সে গড়েছে, ভেঙেছে, মেনে চলেছে, অবজ্ঞা করেছে—এই তার স্বভাব, তার প্রকৃতি। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সে বিষয়ে নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। পুরুষের ego বেশী, নারীর কম। তাই বলে পুরুষের egoর লক্ষ্য স্বার্থপরতা নয়, মেয়েদেরও

ভয় ভক্তি নয়; উদ্দেশ্য লক্ষ্য একই দু'য়ের—প্রেমও ত্যাগ, প্রাকৃতিক জগতের স্বপ্নেও যা নেই,—কখনো থাকবেও না বোধ হয়। এই নিয়ম, নীতি, নিষ্ঠার প্রেরণা মানুষের অন্তর থেকে পাওয়া। তার সুখ দুঃখ আনন্দ দায়িত্বও দুজনের কাঁধে আছে। অথচ সেই বিষয়েরই বিচারশালার সিদ্ধান্তে সেটা পুরুষের হয় সহজাত সংস্কার, -প্রাকৃতিক দর্শন,মানবেতর জন্তুর স্ত্রী-প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে superficial, non moral ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয় মেয়েদের। যদিও moralityর বেশী দায়িত্ব সহজে নেয় ঐ non-moral জাতেই।

রাজপুত্র বুদ্ধ জগতের জন্য সর্ব্বত্যাগ করেন, মায়ের নয়নের মণি শচীদুলাল প্রেমের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, খৃষ্ট প্রেমের জন্য ধর্ম্মের জন্য ক্রুশবিদ্ধ মরণ বরণ করেন। এঁরা সব লোকোত্তর পুরুষ, মহামানব, দেবতা। সতী, উমা, সীতা এঁরা রাজকন্যা, রাণী মীরাবাই, গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা এঁদের ত্যাগ সহিষ্ণুতা প্রেম কোন্ মানদণ্ডে বিচার হবে? মহামানবতার তো কিছুই এঁদের জাতে নেই। কোন সংস্কার এই ত্যাগ এই নিষ্ঠাগভীর মধুর ত্যাগধর্ম্মী প্রেমে সীতা সতী মীরাবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল, মীরাকে বৃন্দাবনের পথে পথে "মেরে গিরিধারী লাল ঔর দুসর ন কোই" ব'লে নিয়ে বেড়িয়েছিল, বিষ্ণুপ্রিয়ার স্তব্ধ মূক বেদনাকে বহন করেছিল? একেই বা কোন পর্য্যায়ে ফেলা যাবে?

যে অজ্ঞাতপিতৃক সন্তানের জননীর কথা সমস্ত পাশ্চাত্য জগতকেও আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছে তিনি 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের মতন 'বিধর্ম্মী' 'অমাবস্যার চাঁদ।' এইটুকুই তাঁর ঠিক সংজ্ঞা। আর ওরকম অমাবস্যার চাঁদ যে নিত্য উদয় হয় না এও সত্য। সম্ভবতঃ তিনি প্রকাশ্যে যা' বলেছেন তা ঠিক তাঁর অন্তরের সত্য নয়।

শ্রীঅষ্টাবক্রের কথার উত্তর আছে। মেয়েরা 'মা' চিরদিন থাকবেন, আছেনও। পুরুষ তার পর্ব্বত প্রমাণ আত্মম্ভরিতায় আড়াল থেকে মাকে দেখতে না পেতে পারে, প্রণাম করতে ভুলে যেতে পারে। সভ্যতা সমাজ সংসার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; সংশয়ের অন্ত নেই। মা, দয়িতা, দুহিতার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক দয়া দাক্ষিণ্যেরও নয়, বিচারেরও নয়। মানুষের পরিচয়ের সোনার কাঠি মানুষের হাতে নেই। প্রত্যেক' আবেষ্টন, মনের তারে প্রতিটি আঘাত, এক এক বারের স্পর্শ তাকে ক্রমাগত নতুন ক'রে তোলে। মেয়েরাও এই মানুষই। সমাজ-বিজ্ঞানে মনো-বিজ্ঞানের এখনো এটা জানা বাকি আছে। অনেক সময় তাঁরা যা' বলেন তা শুনে মেয়েরা 'আত্মবৎ মন্যতে জগত' ব'লে চুপ ক'রে থাকেন। মেয়েদের কথা মেয়েরা জানেন ততটাই, পুরুষ যতটা নিজেকে জানেন। প্রভেদ শুধু ভাবে, প্রকাশের ধরণে।

কবি চণ্ডীদাসের গীতকথা আছে "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার চেয়ে সত্য নাই"। যদি এই মনোভাব নিয়ে, অথবা Havelock Ellisএর মতন মায়ে যেমন সন্তানকে স্নেহ মুগ্ধ ভালবাসায় নিরীক্ষণ করেন তেমনি ক'রে কেউ অভিমত দিতে পারেন তাঁরই চরিত্র বিচারের অধিকার থাকে।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জরু ও জরদা

—শ্রীযুক্ত মোহিত দাশগুপ্ত

কুড়ি বৎসর আগে ডিব্রুগড় সহরে এমন কেউ ছিল না যে সীতাপতি সেনকে না চিন্‌ত। যেখানে বালুবেলাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ব্যাকুল প্রেমিকের বাহুর মত ব্রহ্মপুত্রের স্রোতরেখা বেঁকে গিয়েচে, সেই বাঁকের উপর কাঠ ও কাঁচের বাংলো প্যাটর্ণের বাড়ীটায় সীতাপতি বাস কর্‌তেন। এখনও সে বাড়ীটার অঙ্গন চিনে নেওয়া চলে—যদিও নদীর ধারা বদ্‌লেচে, পাশের ইউক্যালিপ্‌টাস গাছগুলা তেমনি জড়াজড়ি ক'রে এখনও দাঁড়িয়ে আছে; সুরকীর পথটা তৃণ ও আগাছায় ছেয়ে ফেলেচে বটে, কিন্তু দু'ধারে কামিনীফুলের ঝাড়গুলোয় আজও থোকা থোকা সাদা ফুল হেসে ওঠে; গন্ধে মাতাল মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা যায়। আরও খানিকটা এগিয়ে এলে কয়েকটা প্রশ্থিল বিলেতী এল্মগাছের ছাড়া-নিবিড় তলায় ঘাসের রাজত্বের মাঝে হয়ত দু'একটা মার্ব্বেলের ভাঙাচোরা মূর্ত্তি মাথা উঁচিয়ে আছে দেখা যাবে; তারই কাছে লুপ্তপ্রায় সান্‌-ডায়েলটার চাকৃতির উপর খোদাই ক'রে লেখা—

Erected by Mr. S. P. Sen in the year nineteen hundred and three, in sacred and ever-loving memory of his late lamented wife Srimotee Gogontara, who, for the last seven years, served him with her untiring...এখন বিবর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে এসেচে তবুও প'ড়ে নেওয়া চলে।

সীতাপতি লোকটার বাগান করবার ঝোঁক ছিল, মনের মতন বাগান সাজাবার জন্যে অনেক মাল্‌ মসলা সংগ্রহ কর্‌ছিলেন, কিন্তু বাগান শেষ ক'রে বাইরের ফটকে সবুজ বাল্‌ব দিয়ে 'গগনতারা গ্রোভ' লিখে যেতে পারেন নি। নর্ম্মদা নদীর পার থেকে শ্বেত পাথরের স্ল্যাব্‌ চালান আস্‌তে সুরু করেচে, ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় সহরের সকলের নিকট প্রভূত বিস্ময় জন্মিয়ে তিনি কোথায় যে স'রে পড়েচেন আজও কেউ তার যথাযথ ঠিকানা নির্ণয় ক'রে উঠ্‌তে পারে নি।

সীতাপতিবাবু পত্নীর প্রেমকে স্মরণীয় কর্‌বার প্রয়াস প্রচুর করেছিলেন। বাড়ীর নাম দিয়েছিলেন 'তারাবাস'; ফক্স্‌টেরিয়ারের বাচ্চাটার নাম রাখ্‌লেন 'গোগন'; তাঁর বিবাহের কাপড় পোষাক, স্ত্রীর ব্লাউজ, গয়না, হীরা, চীনা-পুতুল, পমেটমের শিশি কাঁচের শো কেসে বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন; প্রত্যেক জিনিসটার ইতিহাস কাগজের টুকরায় ছাপিয়ে পাশে পাশে আট্‌কে দিয়েছিলেন; তবুও কেউ কেউ বলত কল্‌কাতায় নাকি তাঁর আর এক স্ত্রী আছেন এবং সীতাপতি তাঁকে নিয়মিত দেখা দিয়ে আসেন।

যা'হোক এতে তাঁর লব্ধ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং তাঁর অন্তর্দ্ধানে ডিব্রুগড় তরুণ সমাজ বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল, যেহেতু তাঁকে স্মরণ ক'রে গঙ্গেশবাবু, যিনি 'যুবাবান্ধব সঙ্ঘ' ও 'সবুজ সংহতি'র মুখপাত্র, আজ যথেষ্ট শোক প্রকাশ ক'রে থাকেন।

এই অন্তর্দ্ধান রহস্য নিয়ে অনেকে মাথা ঘুলিয়েচে—কেউ বলে, খুনী আসামী, পুলিশের ভয়ে পালিয়েচে; কারও মতে প্রথমার ভূতের এ কারসাজী, আবার দুষ্টলোক রটায় তিনি বুড়ো বয়সে কাঁচা প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেছেন।

সীতাপতির সেতার শুনেচেন অনেকে, তাঁর ভোজ ও টাকাও অনেকে হজম করেচেন জানি, তাঁর সাথে আলাপ কম লোকের হয়নি, কিন্তু তাঁর অতীতের ইতিহাস যেমন কেউ জান্‌ত, না তাঁর মনের নাগাল পাওয়াও তেমনি সকলের সাধ্যাতীত ছিল।

আমি সীতাপতিবাবুকে ভাল রকমেই জানতুম এবং আপনারা বল্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে, আমি তাঁর বর্ত্তমানের খবরও অবগত আছি। শুন্‌লে কেউ বিশ্বাস করবে না জানি, কারণ পঁচাত্তর টাকার প্রতিমার জন্য সাড়ে সাতশ'

টাকার মণ্ডপ আর সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ ক'রে বাতি, ঝাড়, মখ্‌মলের চাঁদোয়া, দামী আস্‌বাব দিয়ে সাজান যাদের স্বভাব নয়, তারা এ ধারণায় আন্‌তে পারে না।

এক টাকায় তিনশ ছাপান্ন দফা উপহার সমেত দাদের মলম বিক্রেতা শ্রী নীতিপূর্ণ বড়ুয়ার মেয়ে যখন উধাও হয় তখন এর চেয়ে ঢের কমই সোরগোল উঠেছিল, কিন্তু সে মেয়েকে যখন খুঁজে নিয়ে আসা হ'লো তখন অনুসন্ধান-কারীরা যে সমুদয় প্রমাণ হাজির করল তা'তে এক সুদীর্ঘ করুণ রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা গ'ড়ে ওঠে। তারপর আরও অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মূলের ঘটনা খুবই লম্বা ও ঘোরপ্যাঁচওয়ালা, যদিও তারা নিতান্ত সামান্য লোক। কাজেই সীতাপতিবাবুর মত বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁকে সমস্ত ডিব্রুগড় এতদিন ধরে 'লাইওনাইজড্' ক'রে এসেচে, তাঁর ব্যাপার লম্বায় অন্ততঃ হবে দশগুণ ও প্যাঁচেও এর দশ বিশ পাক বেশী।

আমি স্বচক্ষে সীতাপতিবাবুকে কালীঘাটে দেখে এসেচি; তিনি তখন চিনির লজেঞ্চস্ ফিরি ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। হাতে একটা জলপূর্ণ টিনের ক্যান্, মাথায় বাক্সভরা লাল, নীল, সব্‌জে লজেঞ্চসের বড়ি, বগলে বাঁশের শলার ডম্বরুর মত একটা ষ্ট্যাণ্ড্, আর একটা ঠোঙায় কতকগুলো কাগজ ছোট ক'রে কাটা। এক পয়সা দিয়ে এক টুক্‌রো কাগজ তুলে নাও, ক্যানের জলে চুবিয়ে তোল, দেখতে পাবে একটা সংখ্যা তাতে ফুটে উঠেচে; যত সংখ্যা ততগুলো লজেঞ্চস্ তোমার প্রাপ্য—সে দুইই উঠুক কি দু'শ, ব্যস্! আপ্‌নারা বিশ্বাস কর্‌বেন?

পুরাণে লেখে, গণদেবের নাকি ছেলেবেলায় টুক্‌টুকে মুখ ছিল, সে মুখটা যদি খ'সে না পড়্‌তো ত কার্ত্তিকের বুকের অমন ছাতি আজ অনেকখানি ব'সে যেত; কিন্তু হাতির মাথা লাগানর পর গণেশের যে বাহুর শালপ্রাংশু হবার আশা ছিল তা' হয়ে উঠ্‌ল থল্‌থলে, পেটে জমল তিন ইঞ্চি পুরু চর্ব্বি, বুদ্ধি হ'ল ভোঁতা; খালি ব'সে ব'সে খস্-খস্ পুঁথি নকল আর শুঁড় দিয়ে কলাবৌয়ের গা চাটা ছাড়া আর কোন উপায়ই রইল না। আমাদের সীতাপতিরও হঠাৎ এমন কিছু বিপর্য্যয় ঘটেচে আর তাতে তাঁর এমনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েচে যে, তাঁকে চিনে ওঠা দুর্ঘট; গায়ে উঠ্‌ত যার মস্‌লিন, তার দেহে চিট চিটে পুরু ছিটের কোট অসহ্য গরমে, পায়ে একহাঁটু ধুলো, চুল ঠোকরান ঠোকরান কাটা, দৈত্যের মত চেহারা ভেঙে চুরে ম্যুক্ত সঙ্কুচিত হয়ে প'ড়েচে, সারা দেহ ব্যেপে যেন অসহনীয় যন্ত্রণা—চেহারা গলার আওয়াজে এতখানি ইতরতা ধরা দেয় যে, এর মাঝ থেকে সেই সুশোভন ভদ্রলোকটীকে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয় একেবারে অসাধ্য; হাতীর দাঁতের সেতার, ইজিপ্টের তামাক, স্বপ্নটুকু পর্য্যন্ত এতে রেখে যায় নি।

হাতের বাড়্‌তি আঙুল আর কানের বিচিত্র গঠনটা লক্ষ্য ক'রে তাঁকে চিনেছিলুম। অনুসরণ ক'রে তাঁর খিদিরপুরের বস্তিবাস পর্য্যন্ত দেখে এসেচি এবং জেনেচি যে তাঁর মাথার বিকৃতি ঘটেচে; কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না; ফিরি করবার সময় পর্য্যন্ত না,—যাঁর ইচ্ছে কেনো, না হয় না কেনো; পয়সা দাও ত ভাল, না দিলেও ক্ষতি নাই। সারাদিন ফিরি ক'রে ফিরে আসেন আর গভীর রাত্রে সকলে তাঁকে চীৎকার কর্‌তে শোনে—

'জরদা! মৃগনাভি ঘটিত আসল কাশ্মিরী জরদা!' তারপর বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠেন, 'ধর্‌লো, রক্ষা করো! ঐ ধর্‌লো!'' এবং পরক্ষণেই বুক ভাঙা হা হা ক'রে কেঁদে ওঠেন।

•

মনস্তত্ত্ববিদ আমি নই, আর্থার কোনানের চেলাও নই, কাজেই কাউকে নিরাশ যদি করি ক্ষমা কর্‌বেন। সরস কথা ব'লে ধন্যবাদ আশা করি না, প্রকৃত ব্যাপার যা তাই বল্‌ব।

জানি না আমার লেখা পঞ্চাননবাবু অথবা ডাঃ ফুকনের হাতে পড়্‌বে কিনা। তাঁরা যদি এ লেখা পড়েন তা হলে বুঝতে পার্‌বেন যে, কুড়ি বছর পূর্ব্বে কেন তাঁরা বন্ধু সীতাপতি সেনের দ্বারা পর পর অপমানিত হন। যা বুঝতে তাঁরা আদৌ পারেন নি, আর যে কারণে ফুকন বলেছিলেন, 'আই য়্যাম্ য়্যাট্ মাই উইট্‌স এণ্ড পোন্‌চু, হোয়াই ছাট্ ল্যাম্ব অব এ ফেলো গ্রাউণ্ড্ এ্যাণ্ড গ্রাউল্ লাইক এ পোক্‌ড আপ্ উল্ফ্...', সে সমস্যা মিট্‌তে পারে।

ডিব্রুগড়ে তাঁর কাঠ, চুন, সুর্‌কীর কারবার ছিল এবং ব্যবসায়ে তিনি বহুৎ টাকা হাত করেছিলেন। এর আগে যখন তিনি বঙ্গের এক ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর স্ত্রী তখন বেঁচে—উজ্জ্বল ছিম্‌ছাম্ মানুষটি, ভারী অমায়িক মধুর স্বভাব, আমাকে ভায়ের মত ভাল বাসতেন।

সীতাপতিদের দাম্পত্য ব্যাপারে মাথা গলাবার কোন প্রয়োজন বা কৌতূহল আমাদের কোন দিন ঘটে নি। সাধারণ দশজন ভদ্রলোক যেমন স্ত্রী নিয়ে ঘর করেন সীতাপতিও তাই কর্‌তেন; কোন দিন বাড়াবাড়িও দেখি নি, ঝগড়াঝাঁটি হ'য়েচে বলেও মনে পড়ে না।

সীতাপতির শ্বশুর পশ্চিমে সদরালা ছিলেন; তাঁর স্ত্রীর ছেলেবেলাটা পশ্চিমে কেটেচে। অল্প বয়েস থেকে তিনি জর্‌দা ধরেছিলেন। ওটা নাকি ওঁদের বংশগত অভ্যাস।

সীতাপতি তখন যা বেতন পেতেন তাতে ঠাট বজায় রেখে স্ত্রীর এই বিলাসিতার প্রশ্রয় দেবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না; তাঁর শ্বশুরই বরাবর জর্‌দা জুটিয়ে আদরের মেয়েটির সখ মিটিয়ে আস্‌ছিলেন।

এরপর সীতাপতির চাক্‌রী যায়; একজন পার্শী যুবতীর সহিত তিনি নাকি গুপ্ত প্রণয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারই প্ররোচনায় ইনি ব্যাঙ্কের কতকগুলো টাকা সরিয়ে ধরা পড়েন। বড় সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ব'লে সে যাত্রা পরিত্রাণ পান, এবং এর পর বঙ্গে ছেড়ে চ'লে আসেন।

এটাকে বাদ দিলে সীতাপতির গোটা জীবনে আর কোন বৈচিত্র্য খুঁজে বার করা যায় না।

এর কিছুদিন পরে সীতাপতির কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই; তাঁর স্ত্রী মর মর, আমাকে দেখতে চেয়েছেন।

আমার বিশেষ কাজ প'ড়ে যাওয়ায় তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

পরে শুন্‌লুম সীতাপতির স্ত্রী মারা গেছেন, সীতাপতিও ব্যবসার দড়াদড়ি দিয়ে লক্ষ্মীকে ঘরের খুঁটায় বেঁধে ফেলেচেন।

স্ত্রীর মৃত্যুতে সীতাপতি খুবই শোক পেলেন, কারণ যথার্থই তিনি প্রেমিক ছিলেন; আর তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তিনি বরাবরই অনুতাপ করে এসেচেন। তাঁরই স্বভাবের দোষে গতাসু গগনতারার হৃদয় ভেঙে পড়ে, এবং তাঁর বিশ্বাস তিনিই পত্নীর এ অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি যতটা আশা করেছিলেন তা পাবার সম্ভাবনা ছিল না ব'লেই তাঁর মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ত, এবং এমনি একটা অশুভ মুহূর্ত্তকে ভর ক'রেই শনি এ পরিবারে ঢুকেছিল।

স্ত্রীর সহিত সীতাপতিও ইদানীং জরদা ধরেছিলেন, তাঁর অবস্থাও ফিরেছিল, কাজেই ভাল ভাল জরদা ঘরে আমদানী হচ্ছিল; ইতিমধ্যে হঠাৎ পত্নীবিয়োগে সীতাপতি বিশেষ মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌লেন এবং শুধু জরদা নয়, স্ত্রী যে-সমস্ত জিনিস খেতে ভালবাসতেন তা বাড়ীর চতুঃসীমানায় আন্‌তে দিতেন না। তাঁর 'স্মৃতি শো কেসে'র মধ্যে কৌটায় ভরা জর্‌দা অনেকেই দেখে থাক্‌বেন।

সীতাপতিবাবু খুবই চাপা লোক, তাঁর অন্তরের কথা কোনদিনের তরে তাঁর মুখে একটা আঁচড় কেটেচে ব'লে মনে হয় নি বাইরে তিনি মজলিসি লোক, বন্ধু বান্ধবের জন্যে অকাতরে টাকা খরচ কর্‌তেন, ছাত্র সমিতির লাইব্রেরীর ঘর তুলে দিয়েছিলেন, ফ্লাড্ রিলিফে মোটা টাকা চাঁদা দিতেন, চাঁদের আলোয় চমৎকার কেদারা আলাপ করেচেন; গল্প শুনিয়েও লোকদের চিত্তবিনোদন ক'রে এসেচেন।

কিন্তু কেউ ভাবে নি যে, ভিতরে তাঁর অগ্নিদাহ চলেচে। তাঁর শোক তাঁকে কেমন সিনিক্যাল্ ক'রে তুলেছিল, এমন কি তাঁর স্ত্রীর স্মৃতি-রক্ষার যে আড়ম্বরটা তাঁর স্বভাব ছাপিয়ে গেছে তাতেও যেন এই নিন্দুকতা দিয়ে তিনি আপনাকে আঘাত কর্‌তে চেয়েছিলেন। সবুজ বাল্‌বের অক্ষর আর সান ডায়ালে শোকোচ্ছ্বাস লেখাটা তাঁর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা কোন দিনই অনুমোদন কর্‌তে পারে নি।

গগন তারার জরদাপ্রিয়তার বাড়াবাড়ি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিছুতেই তাঁর মাথায় এটা ঢুক্‌ত না যে, একজন মহিলা শিক্ষিতা হয়ে কেন খালি জরদা চেখে ও সুর্ত্তি জরদার ক্যাটালগ ঘেঁটে কোথাকার গোধোলিয়ার বদ্রীনারাণ ছেদীলালের নাম প'ড়ে প'ড়ে অবসর কাটিয়ে দেন।

তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে অনেক ভাল বই জমা ছিল। স্ত্রীকে গভর্নেস রেখে দিতেও চেয়েছিলেন, যদিও চাকরীর সময় তাঁর অবস্থাকে ঠিক স্বচ্ছল বলা যেত না; কিন্তু পত্নী তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাতেন না। না ছিল তাঁর গীতবাদ্যের খেয়াল, না ছিল জ্ঞানশিক্ষা, যেগুলো কিনা সীতাপতিকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল; কাজেই পত্নীকে নিয়ে সীতাপতি রীতিমত ক্ষেপে যেতেন। ভার্য্যাচর্য্যায় তাঁর অনেক সময় যেত কিন্তু সবই হ'য়ে দাঁড়াত বৃথা। জরদার কৌটো, স্ফুর্ত্তির ডিবে দূর ক'রে ফেলে দিয়ে দেখেছেন, লুকিয়ে রেখেও দেখেচেন, বকাঝকাও প্রচুর করেচেন কিন্তু ফলোদয় কিছুই হত না; গগনতারার ছিল অসম্ভব ধৈর্য্য ও হাসির মাধুরী—যে হাসির কাছে সীতাপতি বিকিয়েছিলেন আপনাকে। আবার সেই হাসির প্রচণ্ড আঘাতে যখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যেত তখন তিনি বাঘের মত ক্ষেপে যেতেন; কিন্তু সহ্য ক'রে থাকা ছিল এঁদের বংশগত রোগ, কাজেই সীতাপতি সমস্ত দিন স্বাভাবিক ভাবে আপিসের কাজ সেরে প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন, স্ত্রীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তাও কইতেন—কারও সাধ্য ছিল না যে তাঁর অন্তরে কোন বিকার ঘটেচে অনুমান করে।

গগনতারার তাতে কিছু ক্ষতি হোত কিনা বলা দুষ্কর; হয়ত তাঁর প্রয়োজনের গণ্ডীটা ছিল খুবই অপরিসর!

যাক্, সীতাপতির কিন্তু মাঝে মাঝে হাঁপ ধ'রে যেত একঘেয়ে জীবন যাত্রার পাল্লায় প'ড়ে। এমনি কোনো এক নৈরাশ্যের দিনে সিনেমায় তাঁর এক পার্শী তরুণীর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে যায়—যিনি চাইনিজ পটারী, সেভেণ্টিন্থ সেঞ্চুরী ডাচ্ ব্যালাড্ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক ব্যাঙ্কিং প্রব্লেম সম্বন্ধে অনেক কথা ব'লেই সীতাপতিকে চমৎকৃত ক'রে দেন; এবং গান শুনিয়ে ও এচিংয়ের নমুনা দেখিয়ে সীতাপতির চিত্ত বিহ্বল করেন।

এই 'কাল্চার্য়াল কন্কারের' মোহ সীতাপতিকে তাঁর উচ্চ আদর্শ থেকে অনেকখানি নাবিয়ে আনে এবং সীতাপতির মনটা অনুতাপের অগ্ন্যুত্তাপে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে যায়। এখনও সেই ভস্মের তলায় অনুক্ষণ দহন চল্‌চে, একটু ঘাঁটিয়ে দিলে গন্‌গনে আঁচের হল্‌কা বার হয়।

এরই উপর সীতাপতি মন ঘুরিয়ে এনে স্ত্রীর উপর অসম্ভব স্নেহ, প্রীতি ঢাল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। সারং ফেলে স্ত্রীর জরদার কৌটার উপর নিজের হাতে পুষ্পপাতা খোদাই কর্‌তে বস্‌তেন, কিন্তু গগনের মুখের হাসি সেই যে নিভে গেল যেদিন কেলেঙ্কারীর কথাটা তাঁর শুভ্র অন্তরে গিয়ে ঘা দিলে, আর ফুট্‌ল না।

শুধু মরার কয়েক মিনিট আগে তাঁর ঠোঁটে যে অতুল্য শান্ত হাসির আলো ঝল্‌কে উঠেছিল তা নাকি চিতার আগুনের তেজে ঢাকা পড়ে নি।

এধারে যাঁরা সীতাপতিকে দেখেচেন তাঁরাই বল্‌বেন লোকটা শেষকালে যেন কেমনতর হ'য়ে উঠেছিল।

সারা অঘ্রাণ মাসটা রাত্তির থাক্‌তে উঠে শীতের মধ্যে বাড়ীর নীচে বালুচরে শুধু পায়চারি ক'রে ফিরতেন।

এক একদিন ছাদ থেকে দেখেচি ক্ষীণ আলোয় তাঁর দীর্ঘ দেহখানি ছায়ার মত ঘুরচে।

তারপর যা আমি জেনেচি তা বাগানের মার্ব্বেল পাথরের ফোকরের মাঝ থেকে সীতাপতির পুরাণো ডায়ারী উদ্ধার ক'রে ও নিজের অনুমান দিয়ে খানিকটা রচনা ক'রে।

সে দিন নাকি গগনতারার মৃত্যুর দিন—

অনেক বেলায় ঘরে ফিরে সীতাপতি দেখলেন একটা প্যাক্ করা বাক্স তাঁর নামে এসেচে।

তার কেটে, কাগজ কাপড় খড়কুটো সরিয়ে পেলেন টিনের চারপাশ আঁটা একটা বাক্স, একপাশ খুলে ফেলে দেখা গেল তাতে জরদা পোরা। কোত্থেকে এল?

আজ এতকাল পরে জরদা দেখে সীতাপতির চক্ষু সজল হয়ে উঠ্‌ছিল; গগনই যখন গেছে তখন আর…

সীতাপতি ঠাওর করে উঠ্‌তে পারলেন না যে, কে পাঠিয়েচে। পার্শ্বেলের উপর দেখ্‌লেন প্রেরকের নাম অতি অস্পষ্ট, মোহরটাও ধেব্‌ড়ে গেছে। আশ্চর্য্য, লোকটার কাছ থেকে একটা চিঠিও এসে পৌঁছল না।

কে পাঠাতে পারে দিন দুয়েক তারি ভাবনায় কাট্‌ল। সীতাপতির স্বভাবই এরূপ যে, একটা জিনিষের সবটা না জেনে তিনি ক্ষান্ত থাক্‌তে কোনমতেই পারেন না। তাই মনটাকে একবার বার্ম্মার কাঠের আড়ৎ থেকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের

সদাগর অফিস, গোয়ালিয়ারের পাথর বাঁধান রাস্তার মাঝ দিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌লেন।

শান্তিপ্রিয়, বিপ্রদাস, শিবনাথ, রবীন্দ্র···কে ?

সীতাপতির 'স্ত্রী-বিচ্ছেদের কথা বন্ধু বান্ধবের দু'একজন ছাড়া কেহই জান্‌তেন না, যদিও সকলে তাঁর জরদাপ্রিয়তার বিষয় অবগত ছিলেন। বন্ধুপত্নীকে উপহার স্বরূপ কোনো বন্ধু এ পাঠাতে পারেন হয়ত, কিন্তু আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল কারও কাছ থেকে যখন কিছু এলো না, তখন হঠাৎ এ মতি হ'তে যাবে কেন ?

শান্তিপ্রিয় আরাকানে প্রবাসী, তিনি পাঠাতে হ'লে পাঠাতেন বাঁশের তৈরী কাস্কেট, ট্রে, সিল্কের লুঙ্গী অথবা সেগুণ কাঠের উপর সূক্ষ্ম খোদাই কাজওয়ালা প্যাগোডার মডেল।

বিপ্রদাস লোকটা এতকাল অন্যের মাথায় হাত বুলিয়েই এসেচেন, হঠাৎ যে তিনি বন্ধুপত্নীর প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের জন্য জরদা ভেট্ পাঠাবেন এ বিশ্বাস যোগ্য নয়।

রথীন্দ্র লক্ষ্ণৌয়ে ডাক্তার, হয়ত তিনিই,

দিলেন লিখে রথীনের কাছে চিঠি যে, তাঁর জরদার প্যাক্ যথা সময়ে হস্তগত হয়েচে এবং তাঁরা সকলেই এতে খুসী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা জরদা ছেড়ে দিয়েচেন। স্ত্রীর মৃত্যুর কথা লিখ্‌তে কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ল, সে আজ পাঁচ বছর হলো কিনা। দেখা সাক্ষাৎ কারো নেই, ক্বচিৎ চিঠি-পত্তর আসে, সীতাপতি স্ত্রী সম্বন্ধে বাইরে খুবই উদাসীন ভাব দেখাতেন, কাজেই এতবড় ঘটনাটা নিরুল্লেখ রয়ে গেছ্‌ল।

রথীন্দ্র বাস্তবিক পাঠান নি; তিনি ভয়ানক অপ্রস্তুত হলেন। তাইত! এত কাল চুপ ক'রে বসে থাকা ঠিক হয় নি।

নিজে বাজারে গিয়ে বেছে কিন্‌লেন হাতির দাঁতের জিনিষ, পিতলের খেলনা; তারপর ভাল জরদাও খানিকটা কিনে একসঙ্গে প্যাক ক'রে পাঠিয়ে দিলেন।

সঙ্গে এলো একটুক্‌রো চিঠি—

'···তুমি জরদা ছেড়ে দিলেও বৌদি নিশ্চয়ই ছাড়েন নি, কারণ ও নেশা তাঁর রক্তে প্রবহমান। আমার বেশ মনে আছে তিনি আমাকে একদিন কি রকম হয়রান করেছিলেন! সমস্ত বড়বাজার চিৎপুর খুঁজে তাঁর ফরমাশি জরদা আন্‌তে পারি নি, মাঝে থেকে আমার বেনারসী চাদর আর আইভরী-বাঁধান মেহগনীর ছড়িটা হারিয়ে আসি। তাঁর কাছে আমার এ আক্ষেপ জানিয়েও তাঁর মন রাখ্‌তে পারি নি। হাতির দাঁতের বড় কৌটাটা জরদা রাখার জন্য বৌদিকে দিলুম, পিতলের অষ্টদলপদ্মের উপরকার নৃসিংহ মূর্ত্তিটা তাঁর পছন্দ হবে খুবই, আশা করি।...

ব্যাপার দেখে সীতাপতি হতবাক্ হয়ে গেলেন। অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলেন মৃতা পত্নীর জন্য; হৃদয়ে লাগ্‌ল শোকের আঘাত, মাথায় চেপে বসল দুর্দ্দম খেয়াল।

প্রহেলিকার সমাধান করবেন সংকল্প ক'রে ফেল্লেন। বোধ হয় প্রতিযোগী লাইবনিজের আঁক পেলে এত তোড়-জোড়ে নিউটন সাহেবও লাইব্রেরীর দরজা আটকে বস্‌তে পার্‌তেন না।

রাত্রি বেজে গেল বারটা,—একটা—দে-ড়-টা—

রক্তচক্ষু সীতাপতি আকাশ পাতাল ভাবছেনই; ফ্লাস্ক ফ্লাস্ক মদ ওড়াচ্ছেন; চুরুট পোড়াচ্ছেন আর স্মৃতিসমুদ্র মথিত ক'রে চলেছেন।

মদটা সীতাপতি কালে ভদ্রে মজলিসে ব'সে খেতেন, কিন্তু বাড়ীতে সরঞ্জাম মজুত থাকৃত।

সীতাপতির মাথার স্নায়ু চন্ চন্ করতে লাগ্‌ল, বুকও দ্রুত স্পন্দিত হ'তে লাগ্‌ল।

ওদিকে রাত ভোর হয়ে এসেচে, ডিক্যাণ্টারের শেষ অংশটুকুতে চুমুক দিয়ে একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে সীতাপতি বেরিয়ে পড়্‌লেন।

নদীর হিম লাগায় মাথা একটু ঠাণ্ডা হোল—দু'জনের নাম মনে প'ড়ে গেল; এদের একজন নিশ্চয়ই হবে।

পাঁচদিন পরে চিঠির জবাব এলো; তাতে সমস্যার সমাধান ত হোলই না, অধিকন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে খানিকটা ক'রে জরদার চালান এসে সীতাপতির মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলে।

এরপর মস্তিষ্কে রক্তচাপের আধিক্যে সীতাপতি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন এবং তারপরেই ভয়ানক ব্রেন ফিভার প্রকাশ

পায়। ডাক্তার ফুকন্ দেখ্‌লেন, রোগের কারণ ঠাওরালেন কাল কাপড়ের পর্দ্দা, হঠাৎ অতিমাত্রায় মাদক সেবন ও মানসিক অশান্তি—

আসলে শেষেরটাই হচ্ছে হেতু, কিন্তু তাঁর ধরণটার সম্বন্ধে ফুকন্ ছিলেন একেবারে অজ্ঞ, কারণ তাঁর ধারণা—ভাল দেখে বিয়ে করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সীতাপতিবাবু দু'দিনেই একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লেন, কারণ তাঁর ছিল পর্য্যাপ্ত গাঢ় শক্তি। তবে জরদাঘটিত গোলযোগ তাঁর মস্তিষ্কে রয়েই গেল;. রাত্রে হঠাৎ জরদার গন্ধ এসে তাঁর শ্বাসরোধ ক'রে ফেলচে এমনি বোধ হ'ত।

ক্রমে জরদার নাম পর্য্যন্ত শুন্‌লে তিনি অস্থির হ'য়ে পড়্‌তেন; বালুকার উপর লোহা ঘসার শব্দ শোনার মত তার মাথা শির শির ক'রে উঠ্‌ত আর ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠ্‌তেন। তাই যে দিন ফুকন্ এসে উপদেশ দিলেন, 'তাইত, দেখে শুনে একটা বৌ আন, আর বাড়ীর পর্দ্দা গুলো বদ্‌লে ফেল; কতদিন ধ'রে বলচি ডার্ক কলার অপটিক্ নার্ভের উপর পড়া ঠিক নয়, তা ত শুন্‌বে না। কালই ওগুলো খুলে ফেলে হল্‌দে নয় সবুজ বা ফিকা জরদা—' তখন ডাক্তারকে এমন কটু কথা বল্লেন যে, ফুকন্ সাহেব রেগে মেগে বেরিয়ে যান তখনি।

তারপর ঐ কথার উল্লেখ করায় পঞ্চানন বাবু ইংরাজীতে এক তাড়া 'সাট্ আপ-ইউ ব্লাড্‌হপার' খেয়ে ভ্যাবাচাকা।

এরপর একদিন গভীর রাত্রে সীতাপতি নাকে এ্যামোনিয়া-সিক্ত রুমাল জড়িয়ে চোখে কাল গগল্‌স্ এঁটে শো কেসের জরদার ডিবাগুলো আর ডাকে আসা প্যাক্‌গুলো একে একে বাগানের একটা বেদীর টাইল সরিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। একবার নিয়ে গেছলেন নদীর ধারে, কিন্তু কি ভেবে জলে ফেলে দিতে পারেন নি।

তারপর যেমন ভেবেছিলেন স্বস্তিতে দিন কেটে যাবে তা হ'ল না। সীতাপতি গভীর রাত্রে জান্‌লার গরাদ ধ'রে বাগানের সেই বেদীর পানে চেয়ে থাকতেন; মনে হতো কাকে যেন কবর দিয়ে এসেচেন,...তারই চাপা নিঃশ্বাস শুন্‌তেন, ভয়ে গা ছম্ ছম্ করত, জানালা বন্ধ ক'রে দিতেন কিন্তু পরক্ষণে উৎকট গরমে তা খুলে ফেল্‌তেন।

এমনি ভয় ও অশান্তির পাথর সীতাপতির বুকে চেপে বসেছিল।

এক দিন মালীর ছেলেরা খেলা করতে যেয়ে সেই বেদীর টাইল গুলোর একখানা খসিয়ে ফেল্লে, আর তার মধ্য থেকে সুগন্ধি বার হ'তে থাকে। সন্দেহক্রমে মালী টাইল সরিয়ে জরদার কৌটা আর প্যাক্‌গুলো দেখ্‌তে পেল। সে কি ভেবে সব নিয়ে সীতাপতি বাবুর অলক্ষ্যে লাইব্রেরীর টেবিলে রেখে দিয়ে আসে।

সেদিন অনেক রাত্রে নৌভ্রমণ শেষ ক'রে সীতাপতি লাইব্রেরীতে ঢুকে ব্যাপার দেখে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন।

তারপর প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে মনে কর্‌লেন, এ সমস্যা যত কঠিনই হোক না কেন সমাধান করতে হবে।

ঠিক মাথার উপরই গগনতারার ফুল সাইজ পোর্ট্রেট, ব'সে ব'সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সীতাপতির উত্তেজনা বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিনিদ্র নয়নে স্ত্রীর ছবির পানে তাকিয়ে পুরাণো দিনের স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

তাঁর তখন ঠিক সহজ অবস্থা নয়, যা দেখ্‌লেন তাতে নিজেকে হীন ক'রে দেখলেন; গগনতারার সুমধুর হাসিকে তিনি হত্যা করেচেন, তাঁর সে অনুমান ভাবনায় দৃঢ় হয়ে চল্‌ল; মনে মনে অতীতের বহুদূর খুঁজে ফির্‌লেন, কই এমন কোন দিনই ত জীবনে আসে নি যেদিন গগন ভুলেও তাঁকে রূঢ় কথা বলেচেন, তাঁর ওই সুকোমল পদ্মহস্তের স্পর্শ তাঁর কত রোগ যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দিয়েচে, তাঁর বিনম্র সপ্রেম বাক্য তাঁর হৃদয়ে সুধা সিঞ্চন করেচে; আর তিনি শুধু তাঁর অন্যায় খুঁজে ফিরেচেন; আপনার কুব্যবহারে মর্ম্মান্তিক জ্বালা দিয়েচেন, এমন কি তাঁর প্রিয় স্মৃতির পর্য্যন্ত সমাধি দিয়ে এসেছিলেন!

টেবিলের উপরই জরদার প্যাক্‌গুলো পড়েছিল; তাদের ঘ্রাণের বাষ্প ঢুকে মাথা ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, কড়া মদ খেয়ে তখন অবস্থাটা খুবই অস্বাভাবিক—

দেখ্‌লেন, ছবির গগন-তারা তাঁরই গোগন আস্তে আস্তে ক্যান্‌ভাস্ ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্‌চেন।

ওষ্ঠে সেই হাসির অবলেপ, নীলিম নেত্রে ঘনিষ্ঠ প্রেম ঠিক্‌রে উঠ্‌ছে, চূর্ণ কুন্তল উড়ে এসে তার সুডোল কপাল, কপোলের উপর পড়েচে, কিন্তু সমস্ত ছেয়ে যেন কি এক ম্লানিমা বর্ত্তমান—যেন তাঁরই বিরহ প্রিয়ার মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে এল ! এ মূর্ত্তি অনেক দিন দেখেন নি।

সীতাপতি নিঃস্পন্দ নয়নে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ তাঁর পায়ের ধাক্কায় পিতলের ভাস্‌টা প'ড়ে ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ল, তাঁর চমক ভাঙ্‌ল।

সূক্ষ্ম পরদার মত স্বপ্ন উড়ে গেছে; দেখ্‌লেন ক্লকটায় রাত্রি ত্রিযাম ঘোষণা করেচে, জরদার কৌটাগুলো হতে মৃগনাভির উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছে।

তারপর ঘরে এসে অনেক ভাবনা অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সীতাপতি কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লেন।

স্বপ্নে দেখ্‌লেন এক অজানা দেশের মধ্যে চলেছেন; অর্দ্ধস্তিমিত তিমিরে চারিধার ঢাকা। পথ, ঘাট, মাটি সব থেকে কেমন সুরভি উত্থিত হচ্চে, মনে হলো চেনা গন্ধ, মৃগনাভির। তারপর চেয়ে দেখেন উপরে নীচে পাশে সব জরদায় ঢাকা—কোন জায়গায় কালো, কোথাও লাল সোনালী, স্তরে স্তরে জরদার রাজ্য! তারপর চল্‌তে চল্‌তে শুন্‌লেন কার রূপালী হাসি, বড় পরিচিত—কিন্তু মোড় ঘুরে দেখ্‌লেন যাকে, কই তাকে ত চিনে উঠ্‌তে পারলেন না।

কি কদর্য্য—ওষ্ঠ নীলাভ ঝুলে পড়েচে, গাল চুপসে কোটরগত, চক্ষু কট্‌ মট্‌ ক'রে তাঁরি পানে ন্যস্ত।

সীতাপতির দেহ ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌ল, শুন্‌তে পেলেন চারিপাশ হ'তে অসংখ্য প্রেতকণ্ঠ যেন 'ফিস্ ফিস্' আওয়াজে বল্‌চে, 'ঐ ঐ।'

দেখ্‌তে পেলেন সেই চাপা অন্ধকারে কালো কালো কারা যেন তাঁরই দিকে আঙুল তুলেচে। যেন হাজার বিদ্রূপ হাসিতে নিশীথিনীর সর্পিল কেশ-পাশ দুলে উঠ্‌চে।

তারপর মুখ তুলে চাইলেন, কই কিছুই ত নেই—কেবল মরুভূমির দেশ; দিগন্তে অন্ধকার-আলোর লড়াই চলেচে। এমন সময় একান্ত সন্নিকটে দেখ্‌লেন সেই মুখ—সুন্দর কমনীয়, অধরে হাসি জ্বল জ্বল করচে...আস্তে আস্তে তাঁর করতলের উপর সেই পুষ্পপেলব ওষ্ঠ চেপে ধর্‌ল। খানিকক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বল থেকে অকস্মাৎ সীতাপতি অসহ্য ব্যথায় হাত টেনে নিলেন। হাত বেয়ে তখন রক্তের ধারা নেবেছে। কি যন্ত্রণা! তালুতে কে দ্রবাগ্নি লেপে দিয়েচে।

তারপর সীতাপতি যা দেখ্‌লেন তাতে তাঁর রক্ত হিম হ'য়ে এলো। প্রতি ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়চে আর সেই মধুর হাসিতে অদৃশ্য অন্ধকার কেঁপে উঠ্‌চে, আশে পাশের অশরীরিগুলো বিকট ইঙ্গিতে যেন বল্‌চে, ঐ, ঐ।

সীতাপতির মনে হলো এ হাসির শোণিত, তাকিয়ে দেখেন হাত দুখানাও হি হি ক'রে হেসে উঠ্‌চে, আকাশে বাতাসে যেন সেই হাস্যের লহর ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়্‌চে, ভলকা ভল্‌কায় তীক্ষ্ণ মৃগনাভির গন্ধ যেন বাতাসের শ্বাস রোধ ক'রে ফেলতে চাইছে!

আর্ত্তনাদ ক'রে সীতাপতি দৌড় দিলেন। পিছনের তিমির সৈন্যগুলাও সাথে সাথে ছুটে এলো, আর সেই উন্মত্ত মিষ্ট হাসির তরঙ্গ কেবলি কানে আছড়ে পড়্‌ছে।

সীতাপতি ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে এসে জলে হাত ডোবালেন। জল দেখ্‌তে দেখ্‌তে টকটকে রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। এবার দেখ্‌লেন, হাস্যের শোণিত স্রোত বয়ে চলেচে, প্রকাণ্ড পরিসরে।

সীতাপতি উদ্দাম অধীরতা নিয়ে পালাতে যাচ্চেন এমন সময়ে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

সীতাপতি দেখ্‌লেন বড় পরিচিত রেখাগুলো, কিন্তু একা কুৎসিত! ওষ্ঠে সেই পরিচিত হাস্যরেখার আড়ষ্ট বিবর্ণ মৃত্যু-কাতরতা। সীতাপতির মজ্জা পর্য্যন্ত ভয়ে শোকে শুকিয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ খন্‌খনে সে কি হাসির ধুম্! আর হাসির সেই প্রবল ব্যাত্যায় চারিধার হ'তে সূক্ষ্ম জরদার কণা সমুত্থিত হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌ল; মরুভূমির সাইমুম্ ঝড়ে প'ড়ে বালুকণা যেমন প্রমত্ত হয়ে ছুটাছুটি ক'রে ফেরে জরদার দানাগুলো বায়ুচালিত হ'য়ে তেমনি মাতামাতি সুরু ক'রে দিল্; আর মৃগনাভির কি অত্যুগ্র গন্ধ! যেন দুঃস্বপ্নের মত বাতাসের বুকে চেপে বসেচে...

আরও, আরও—জরদার স্তূপের তলে সীতাপতি চাপা পড়েছেন। নিঃশ্বাসে সে কি কষ্ট! আর থেকে থেকে সেই উদ্দাম হাসি!

হঠাৎ কার তীব্র কর্কশ কণ্ঠ সীতাপতিকে বাস্তব রাজ্যে এনে ফেল্ল; দেখেন ব্রহ্মপুত্রের চড়ায় বালুর উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছেন। অঘ্রাণের মুমূর্ষু রাত্রির ক্ষীণ অন্ধকারে দূরের ষ্টীমারখানা দেখা যাচ্ছে, সার্চ্চ লাইটের দীর্ঘ জিহ্বা আকাশ জল লেহন ক'রে চল্‌চে। পাশে তাঁর টেরিয়ারের বাচ্চাটা কি যেন শুঁকে ফিরচে।

এরপর ডাইরীর লেখা নিতান্ত অস্পষ্ট ও জড়িয়ে এসেচে, কিছুই আর উদ্ধার করা যায় না।

নেপোলির ম্যুজিয়ামে পম্পিয়াই নগরের বহ্নিবর্ষণে গন্ধক বাষ্প ও লাভা স্রোতের নীচে প্রোথিত মৃত দেহের দু'একটা রক্ষিত আছে। তারা তখন পলায়নপর, পশ্চাতে ভিসুবিওসের লোলরক্ত জিহ্বা নির্ম্মম সর্প-বাহিনীর মত গর্জ্জে তেড়ে আস্‌চে। তারপর গাঢ় ধূমে নিরুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে তারা গতি হারাল; সেই অন্ধকারে কাতর ভীত পুরজন বহ্নুৎসবের প্রমত্ত আয়োজনের নীচে যে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, তা তাদের মুখে দেহে সহস্র রেখায় বলিচিহ্নে প্রকট হ'য়ে আছে।

সীতাপতির দেহে তাই সেদিন যা দেখেছিলুম তা সেই কালরাত্রির ব্যথাজর্জ্জর মৃত্যুক্লেশের ছবি; এখন তা আর ভুল হবার যো নেই।

সীতাপতির জীবনের এই ট্র্যাজেডির মূলে খুবই সামান্য দুটি জিনিস—মরা জরু ও জড় জরদা।

শ্রীমোহিত দাশগুপ্ত

স্মৃতির বেদন

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার

এখনো সে পথ উজল রয়েছে
শ্যাম তৃণে তার ঢাকে নি বুক,
চরণ চিহ্ন স্মরণে জাগাল
তাহারি হসিত মধুর মুখ।
সেদিন বিদায়ে সেই শেষ বেলা
ঘরে যেতে ফিরে দু'চরণ ফেলা,
আজ উঠে মনে
জেগে ক্ষণে ক্ষণে;—
এই পথে একা
যে দিয়াছে দেখা
তারি চলা সনে গিয়াছে সুখ।

ও পথে নেহারি বিজনে বসিয়া
নানা কথা আজ মনেতে এল।
ওগো তরুলতা, বৃথা এ নাচন,—
লাগেনাক ভাল যে খেলা খেল।
আজিকে বাতাস শুধু ব'য়ে যায়
অঞ্চল তার আর না উড়ায়,—
কাননে কাননে
আপনার মনে,
আপনি হাসিয়া
কভু বা আসিয়া
যে দিত পুলক—চলে সে গেল।

আজি বন মন বিরহে বিধুর
প্রিয়জনে সে যে গিয়াছে ভুলে।
চলে গেছে দূরে, দেখিনা তাহারে
আসিতে তেমন পরাণ কুলে।
করবী সখীর বুক থলো থলো,
পথের কিনারে আজি এই হল ?
সোহাগে তাহার
ফুল তুলি আর
দাঁড়ায়ে ওখানে
মজায়না গানে ;
ঝরে যায় তারা পথের ধূলে।

বেলীর কোরক অঙ্গনে মোর
মোতির মালিকা গাঁথিয়া আছে,
খোঁজে তারা তারে পিয়াসীর মত
পাতার আড়ালে বিরহী সাজে।
জোছনা আসিয়া আঁচল বুলায়,
কানে কানে বায়ু বলে হায় হায়,
চকোর বিধুরে
খুঁজি দূরে দূরে,
একাকী একাকী
পাবে না দেখা কি
পথহারা তারে পথের মাঝে।

কুর্চ্চির শাখা ভরি গেছে ফুলে
ফুলের বিছানা তলায় পাতি,
সুবাস তাহার উড়িয়া বেড়ায়
খুঁজিয়া তাহারে দিবস রাতি।
'আকোর' কুসুম কাঁকরে ঝরিছে,
নিদাঘ আতপে পুড়িয়া মরিছে,
মালা গাঁথিবার
লোক নাহি আর,—
করে নাক কেহ
সে মধুর স্নেহ ;
তোলে না তাহারে পুলকে মাতি

বকুল আজিকে ব্যাকুল বাতাসে
ঝ'রে পড়ে ধীরে উদাসী ছায়ে,
অলক চুমিয়া কপোল পরশি
লুটোপুটি আর নাহি সে গায়ে।
ফোটা ঝরা তার বিজনে বিজনে
বৃথা কাটে কাল প্রণয় বিহনে,
না পেয়ে সে ধনে
বিরহ বেদনে
আজি সে যে পড়ি
যায় গড়া গড়ি
নীরবে মুরছি পথের বাঁয়ে।

পরম ধন

পিলু—দাদ্‌রা
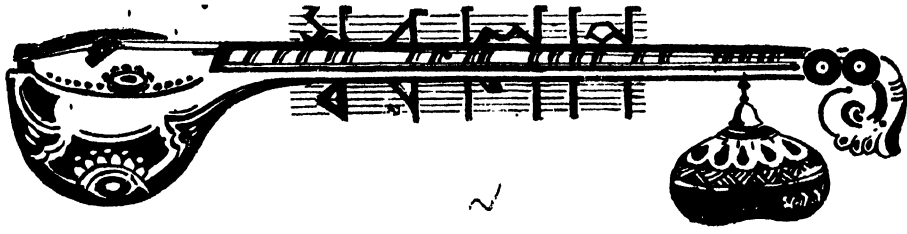
আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই,
দুজন যদি হ'ত আপন,
হ'ত না মোর আপন সবাই।

সবাই যেচে দিত যখন,
গরব ক'রে নিইনি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে
বলত সবাই "নাই গো নাই"।

নিত্য আমি অনিত্যরে,
আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া ক'রে
তাই হে চির তোমারে চাই।

তোমার চরণ পেয়ে হরি,
আজকে আমি হেসে মরি,
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি
হায়রে, কি ধন নাহি চাই!

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

II সা -া সসা । রজ্ঞরা সন্‌া ন্‌া I সা সসা রজ্ঞা । রা জ্ঞরজ্ঞা সা I
রা খ্‌ তে- — য- দি আ প- -ন্‌ ঘ রে — —

I সা -া রা । রা সরা গমা I গা রগা মগা । রা সা -া I
বি - শ্ব ঘ রে — পে তা. -ম্‌ না ঠাঁ ই

I -া -া -া । মা মা জ্ঞা I জ্ঞা -া জ্ঞরা । মজ্ঞরা সন্‌া ন্‌া I
— — — আ মা য় রা খ্‌ তে- — য- দি

I সা সসা রজ্ঞা । রা জ্ঞরজ্ঞা সা I
আ প- -ন্‌ ঘ রে - —

I সা -া রা । রা সরা গমা I গা রগা মগা । রা সা -া I
বি - শ্ব ঘ রে - — পে তা -ম্ না ঠাঁ ই

I { -া -া সা । গা গা গা I মা মা মমধপা । মগা পমা গগা } I
জ ন য দি হ ত — আ- প -ন

I -াঃ রঃ সা । রা রা সরগমা I গা রগা মগা । রা সা -া II
- - হ ত না মো র আ প -ন্ স বা ই

II সা -া রা । মা মা পা I পা -া পা । পমা -পা -া I
(১) নি - ত্য আ মি অ নি - ত্য রে- - -
(২) স বা ই যে চে - দি ত য খ- - ন্
(৩) তো মা র্ চ র ণ পে য়ে হ রি- - -

I মা -া মা । পা পা -া I মা মমা পধপা । মা মা গগা I
(১) আঁ ক্ ড়ে ছি লা ম রু দ্ধ - - ঘ রে -
(২) গ র ব্ ক রে - নি ই - নি- ত খ -
(৩) আ জ্ কে আ মি - হে সে - ম রি -

I -া রসা জ্ঞা । জ্ঞা রা জ্ঞা I রা জ্ঞরা মমা । জ্ঞরা সা সা I
(১) - - কে ড়ে নি লে দ য়া- - - ক রে
(২) - -ন্ প রে আ মায় কা ঙা - -ল্ পে য়ে
(৩) - - কিঁ ছাই নি য়ে ছি লা - -ম্ আ মি

I সা -া রা । রা সরা গমা I গা রগা মগা । রা সা -া IIII
(১) তা ই হে চি র- - তো মা - রে চা ই
(২) ব ল্ ত ধা - -ই না - -ই গো না ই
(৩) হা য় রে কি ধ- - ন চা - হি না ই

বিবিধ সংগ্রহ

কুইন্স কলেজ—অক্সফোর্ড

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত বি-এ

অক্সফোর্ডের কুইন্স্ কলেজ একটি প্রাচীন বিদ্যালয়। ইহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমগ্র হর্ম্ম্যরাজির নির্ম্মাণ-কলা একই সময়কার ও অবিমিশ্র। কলেজ-গৃহ ঐ সময়ের অর্থাৎ 'রেনাসেন্স্' যুগের হইলেও কলেজের স্থাপনা হইয়াছিল আরও পূর্ব্বে। ইহার প্রারম্ভকালের ইতিহাস অতি সামান্য ও আড়ম্বরবিহীন। জন ইগ্‌ল্‌স্‌ফিল্ড্ নামক একজন পাদ্রী তাঁহার পুত্রটিকে স্যর এণ্টনী লুসি নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে পরিচারকের কার্য্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল না অথচ পুত্রটি যাহাতে 'বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়দের সহিত মিশিয়া' তাঁহাদের চালচলন আচার ব্যবহার শিখিতে পারে এ ইচ্ছা প্রবল ছিল। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে জনের পুত্র রবার্ট, স্যর এণ্টনীর আশ্রয়লাভ করেন এবং

লাইব্রেরীর এক অংশ

বই-আলমারির পাশের দৃশ্য

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে স্যর এন্টনী তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন রবার্টের মনে একটি উচ্চাভিলাষ ছিল, সেটি আর কিছুই নহে, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি বিদ্যাগৃহ-স্থাপনা। ইতিমধ্যে জীবনে তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল ও তিনি রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড এর অনুগ্রহ লাভ করিলেন। তৃতীয় এডোয়ার্ড ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে, "তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী রবার্ট ইগ্‌ল্‌স্‌ফিল্ড্‌কে" একটি 'হল্‌'-ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া উহা বিদ্যানিকেতনে পরিণত করিবার অনুমতি দান করেন। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রাণী ফিলিপা অক্সফোর্ডের এই বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ করিলে ইহার বর্ত্তমানরূপ নামকরণ হয়, এবং কলেজটির উত্তরোত্তর বিবিধ উন্নতি হইতে থাকে। 'ইহার স্থাপনার পর রবার্ট ইগ্‌ল্‌স্‌ফিল্ড্‌ আর আট বৎসর জীবিত ছিলেন এবং এই আট বৎসরকাল অক্সফোর্ডে অবস্থান করিয়া তাঁহার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য কলেজের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

১৩৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজা সনন্দদান করিবার পরই রবার্ট ইগ্‌ল্‌স্‌ফিল্ড বহু পরিশ্রম ও চিন্তা করিয়া কলেজের কতকগুলি নিয়ম-কানুন গঠিত করেন। 'নিয়মাবলীর মধ্যে উল্লিখিত ছিল যে "সাধু, সৎ, শান্ত, বিনয়ী, বিবেচক, দরিদ্র, ছাত্র নামের উপযুক্ত ও উন্নতির জন্য ব্যগ্র"
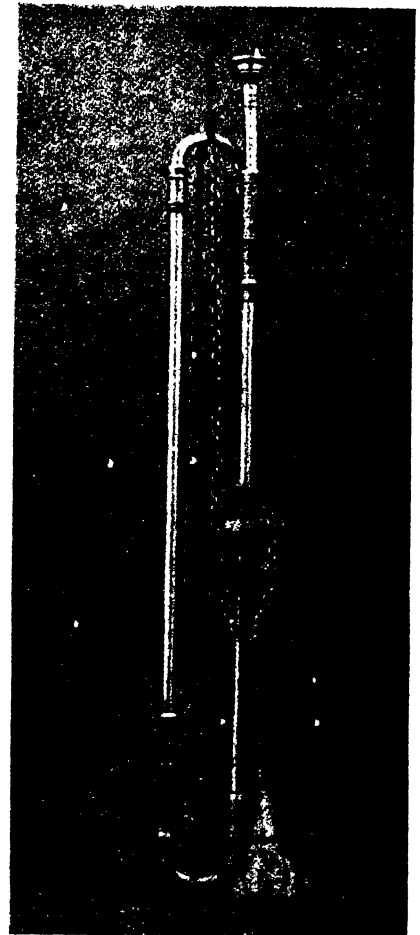
রূপার তূরী

ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে না। প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ইগ্‌ল্‌স্‌ফিল্ডের স্ব-প্রদেশবাসী ও স্বজনাত্মীয়েরা সর্ব্বাধিক সুবিধা লাভ করিবে।... কলেজের মধ্যেই আহার্য্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিবে। কলেজের অধিবাসীরা দিনে দুইবার করিয়া আহারার্থে আহুত হইবে এবং যাহারা অধিবাসী নহে এমন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে প্রত্যহ দ্বারদেশে খাদ্য দান করা হইবে।

প্রতিষ্ঠাতার শিঙ্গা

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলেজের উপর বিস্তর ঝড়-ঝাপট্টা বহিয়া গিয়াছিল। অক্সফোর্ডে সংক্রামক মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি এরূপ ভয়াবহরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে একসময় কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝিবা কলেজ উঠিয়াই যায়! কিন্তু বর্ষান্তে শরতের মত এই দুর্দ্দিনের পর আবার সুদিনের হাস্যচ্ছটায় কলেজের জীবনেতিহাস

কুইন ফিলিপা

উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কলেজগৃহের অট্টালিকা বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিল, কলেজের আয় বৃদ্ধি পাইল, বহু গ্রন্থ সমন্বিত গ্রন্থাগার স্থাপিত হইল। আমরা এই সম্পর্কে কতকগুলি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি এখানে দিলাম।

লাইব্রেরীকক্ষের ছাদের মধ্যখাটাল

সিংহলে হাতী ধরা

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এ

সিংহলে প্রাচীন রাজাদের আমল থেকে হাতী-ধরা রাজকীয় উৎসবের মধ্যে গণ্য ছিল। সে উৎসব অদ্যাবধি চ'লে আস্‌ছে। বিংশ শতাব্দীতে এরূপ ছয় বার হয়েছে। প্রথম ১৯০২ সালে—সেবারে ১০০ হাতী ধরা পড়ে। ১৯০৭ সালে পানামুর (Panamure) নামক স্থানে ৮টা হাতী ধরা পড়ে। ১৯১০ সালে পিল্লা (Pilla) নামক স্থানে ৪০টা, আর ১৯২৪ সালে গল্গামুর (Galgamure) নামক স্থানে ৪২টা হাতী ধরা পড়ে। এ বৎসর গত মার্চ্চ মাসে নিলামপাল্বেয়া (Nelampalwewa) নামক স্থানে যে উৎসব হয় তাতে ১৬টা হাতী ধরা পড়েছে। বর্ত্তমান সময়ে এভাবে বুনো হাতী ধরার বিরুদ্ধে দেশময় যেরূপ আন্দোলন চলছে, অনেকের মনে হয়, এইটিই শেষ হাতী ধরা উৎসব হবে।

আসাম দেশে যেরূপভাবে খেদা ক'রে বুনো হাতী ধরা হয়, এখানেও অনেকটা সেই প্রণালী। যে সমস্ত জঙ্গল হস্তিযূথের বিচরণ ভূমি—বা যে সমস্ত স্থানে তাদের আসবার

বিশেষ সম্ভাবনা, তারই নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে খানিকটা শক্ত কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়—তার উপর গাছপালা লতাপাতা দিয়ে এমন ভাবে সাজান হয় যাতে স্বাভাবিক অরণ্যের অংশ ব'লে হস্তিদলের ভ্রম হয়। তবে এরূপ স্থান যে হস্তিযূথের বিচরণ ভূমির নেহাৎ কাছে করা হয়, তা নয়, পরন্তু ১০।১২ মাইল বা আরো বেশী দূরে হয়ে থাকে। পরে বুনো হাতীরদল যেখানে বিচরণ করে, সেখানে চারিদিক থেকে খেদাকারীরা এরূপভাবে তাদের ঘিরে তাড়াতে থাকে যাতে তারা অন্য দিকে না গিয়ে ফাঁদের দিকে যায়। খেদাকারীরা কণ্টকিত জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ভীষণ রোদ মাথায় ক'রে বুনো হাতীর দলকে খেদাতে থাকে। তাদের যুগপৎ চীৎকারে ও বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ এবং চারিদিক থেকে তাড়না খেতে খেতে হাতীর দল ভয় পেয়ে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হ'য়ে এমনিভাবে পলাতে থাকে যাতে তারা ফাঁদের দিকে যেতে বাধ্য হয়। এই খেদার কাজে অভিজ্ঞ শত শত লোক দিন-রাত সেই বুনো হাতীর দলের উপর নজর রেখে তাদের দূর থেকে খেদিয়ে মন্থর গতিতে এগুতে থাকে। এই খেদার কাজ বিশেষ সতর্কতার সহিত করা দরকার—কারণ একমাত্র এরই উপর অভিযানের সাফল্য নির্ভর করে। এ কাজ যে কতদূর শক্ত তা স্বচক্ষে না দেখলে ধারণা করা যায় না।

সব সময়ে জল সুপ্রাপ্য হয় না—অনেক সময় তাদের নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে ২।৩ মাইল দূরে গিয়ে পানীয় জলের যোগাড় করতে হয়। খেদাকারীদের অভাব সামান্য, তাদের ঘর পাতায় ঘেরা—কিন্তু তারা বুনো হাতী ধরতে যে ফন্দি-ফিকির ক'রে নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে হাতীর দলকে খেদিয়ে নিয়ে যায় তা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। খেদাকারীদের প্রধান ব্যক্তিকে সিংহলী ভাষায় রালি মহাত্মেয় বলা হয়। সে তার অধীনস্থ লোকদের আয়তভাবে সাজিয়ে নেয়—সাধারণত দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল ও প্রস্থে এক মাইল। এই ভাবে হাতীর দলকে ঘিরে গভীর বনপ্রদেশ দিয়ে তারা অগ্রসর হ'তে থাকে। পথ এরূপে পূর্ব্ব থেকে স্থিরীকৃত হয় যাতে তারা নির্দ্দিষ্ট হাতী ধরার খোঁয়াড়ে গিয়ে পড়ে। এমন সব স্থানের ভিতর দিয়ে তাদের খেদানো

দুর্দ্দম্য হাতীর দল সহজে ফাঁদে পা দিতে চায় না

হয়, যাতে তারা পথে প্রচুর আহার ও জল পায়—কারণ পথে বুনো হাতীর দল খাদ্য ও জল না পেলে অন্যদিকে চ'লে যেতে পারে।

খেদানোর পর দুটো পোষা হাতীর মাঝে সুরক্ষিত বুনো হাতী

দিনের বেলায় হাতীর দলকে খেদিয়ে ও সর্ব্বদা সুকৌশলে স্থান পরিবর্ত্তিত ক'রে চার দল খেদাকারী অগ্রসর হ'তে থাকে। দিনের পর দিন ধ'রে এ উদ্দীপনাময় ব্যাপার চলতে থাকে। তাড়াতাড়ি করবার উপায় নেই—করবার চেষ্টা করলে কাজ সফল না হয়ে পণ্ডশ্রম হ'তে পারে। হাতীর দলকে ভুলিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনতে ৫।৬ দিন, কখনও বা আরো বেশি সময় লেগে যায়। অনেক সময় বৃষ্টি হওয়ায় হাঁটুভর কাঁদার উপর দিয়ে যেতে হয়—কতক হাতী ছট্‌কে পড়ে। এদিকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের সন্নিকটে অসংখ্য দর্শকবৃন্দ বহুদূর থেকে এসে দিনের পর দিন অধীর ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কবে যে হাতীর দল এসে পৌছবে তার ত কোন স্থিরতা নেই।

খোঁয়াড়ের মুখ বেশ বিস্তৃত, ইংরাজি V আকারের মত—দুধারের কাঠের বৃতি এমনভাবে গাছপালা দিয়ে ঢাকা যাতে হাতীর দল স্বাভাবিক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নির্ভয়ে নিরাপদ স্থানে পালাচ্ছে ভেবে সেই সুদৃঢ় বেষ্টনীর ভিতর ক্রমশঃ এসে পড়তে পারে; পিছনে অসংখ্য খেদাকারীর ভীষণ চীৎকার ও বন্দুকের আওয়াজে ভীত হয়ে দৌড়তে

খেদাকারী-কর্ত্তৃক তাড়িত হাতীর দলের কাঠের বেড়া ঘেরা স্থানের ভিতরস্থ জলাশয় দিয়ে পলায়ন

দৌড়তে সেই ভীত হস্তিযূথ খোঁয়াড়ের ভিতর আশ্রয় নেয়। প্রাণপণ চেষ্টা করে ভেঙ্গে পালাবার জন্যে; কিন্তু কাঠের বেড়া এমন মজবুত তৈরী ক'রে যে কোন ক্রমেই ভেঙ্গে

মাহুতেরা বুনো হাতীর দলকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে পোষা হাতী নিয়ে ঘেরা স্থানে আসছে ··· দুটো পোষা হাতী বুনো হাতীর দুধারে গিয়ে দাঁড়ায়, আর পোষা হাতীর নীচে থেকে দেশীয় লোকেরা সুকৌশলে বুনো হাতীর পিছনের পায়ে ফাঁস লাগায়।

ভীষণ চীৎকার ক'রে বন্দী হাতীর পলায়নের জন্য বৃথা চেষ্টা

ফেলতে সক্ষম হয় না।

পর দিন থেকে তাদের ফাঁস দিয়ে বাঁধবার বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। এই কার্য্যে পারদর্শী লোক পোষা হাতীর দল নিয়ে খোঁয়াড়ের ভিতর প্রবেশ করে। তারা পোষা হাতীদের এমনভাবে দাঁড় করায় যাতে বুনো হাতীরা নিজের দল মনে ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তদবসরে নিযুক্ত লোকেরা অপূর্ব্ব কৌশলে নিঃশব্দে হাতীর তলায় নেমে নিকটস্থ বুনো হাতীর পদদ্বয় শক্ত চামড়ার ফাঁদে আবদ্ধ করে। মাঝে মাঝে হাতীর দলে বাচ্চা হাতীও এসে পড়ে। সহৃদয় দর্শকের চক্ষে নিরীহ বাচ্চা হাতী ধরা হাতী ধরার এই আনন্দ এবং উত্তেজনা দায়ক অভিনয়ের মধ্যে অতিশয় করুণ দৃশ্য ব'লে ঠেকে।

কিন্তু যখন বেড়া ভাঙ্গতে না পেরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে, তখন, ভীষণ চীৎকার করতে থাকে ও

ব্রিটানির প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-কীর্ত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্রিটানি প্রদেশে আদিম কালের মানুষের হাতের যে বিরাট প্রস্তর কীর্ত্তি সমূহ জনহীন প্রান্তরের বুকে নির্ব্বাক রহস্যের মত কত যুগ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ইতিহাস এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গেল। দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে জাতির কর্ম্মশক্তির নিদর্শন, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। সে যুগের উপযোগী মাপ কাঠিতে বিচার করিতে গেলে বরং, তাহারা সভ্যতার উচ্চ ধাপে আরোহণ করিয়াছিল। এই জাতির শিক্ষা ও সভ্যতা যেরূপই থাকুক, ইহারা চেষ্টা পাইয়াছিল যাহাতে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষেরা তাহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া না যায়। অন্য কোনো আত্মপ্রকাশের কৌশল হয়তো তখন অনাবিষ্কৃত ছিল, তাই তাহারা বিশাল প্রান্তরের সারা জায়গা জুড়িয়া এই সকল বিশাল পাষাণখণ্ডগুলি একটি বিশেষ ভাবে সাজাইয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু এত চেষ্টা এত অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। কে তাহারা বা কি বলিবার চেষ্টা পাইয়াছে, এরূপ ভাবে পাষাণ খণ্ডের পর পাষাণখণ্ড বহিয়া আনিয়া তাহা আজ কে বলিবে!

প্রস্তর খণ্ডের সুদীর্ঘ সারি। প্রবাদ এই যে, এই পাথরগুলি আসলে ছিল সেণ্ট কর্ণেলের প্রতি আক্রমণকারী সৈনিকের দল। সমুদ্রের জন্য পলায়নের পথ বন্ধ হওয়ায় কর্ণেলি সৈনিকদিগকে প্রস্তরে পরিণত করেন। বৎসরের মধ্যে খ্রীষ্টমাসের সময়ে একদিন মধ্যরাত্রে জলপান করিবার জন্য ইহারা স্থানত্যাগ করে। গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস, এই অলৌকিক ঘটনা যে দর্শন করিবে তাহার দুর্ঘটনা ঘটিবে।

মেসোপোটেমিয়ার মরুভূমিতে মরু-বালু-প্রোথিত আসিরিয়া সভ্যতার সকল খুঁটিনাটি খবরই আজ পাওয়া যাইতেছে কারণ তাহার চাবি-কাঠিটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মরুভূমির বালুস্তূপের মধ্য হইতে বাহির করিয়া মরিচা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ব্যবহারে লাগাইতেছেন। আসিরিয়ার তীর-ফলাকার বর্ণমালার পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আসিরিয়ার সভ্যতার ইতিহাস আর কুহেলি-ঘেরা রহস্য নয়, তাহা এখন প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু পাঠানুরাগী ব্যক্তিরই সম্পত্তি। ব্রিটানির এই অজ্ঞাত সভ্যতার সেরূপ কোনো চাবিকাঠি না পাওয়া গেলেও কয়েকজন উৎসাহী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইহারই মধ্যে এগুলি সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে এই তথ্যের অনেক অংশই কল্পনা ও অনুমান বটে, তবুও ইহাদের সাহায্যে আমরা dolmen গুলির সম্বন্ধে একটা আনুমানিক কাহিনীও খাড়া করিতে পারি। মিঃ জে, মিলন্ এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের অন্যতম। প্রধানতঃ ইঁহার ও ইঁহার সহযোগীগণের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে ব্যাপার অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম ফ্রান্সের নানাস্থানে এ ধরণের dolmen থাকিলেও, ব্রিটানি প্রদেশের কার্ণাক নামক স্থানে এগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী আছে, প্রায় তিন শতেরও উপর হইবে। মিঃ মিলনের দ্বারা নানাস্থান হইতে সংগৃহীত প্রস্তরায়ুধ, মৃৎপাত্র ও অলঙ্কার এখন কার্ণাকের মিউজিয়ামে আছে।

তাহারই নাম অনুসারে মিউজিয়ামের নামকরণ হইয়াছে।

মিল্‌নের অনুসন্ধানের ফলে ইহা বেশ সুস্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এই স্থানটিতে উক্ত জাতীয় বীরপুরুষ, রাজা ও নেতাগণ সমাধিস্থ হইতেন এবং পরবর্ত্তী যুগে সেই জাতিরই লোক এইখানে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দিত—কালে বোধ হয় এই স্থানটি তাহাদের একটা তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সলস্‌বেরী প্রান্তরের Stonehenge গুলি যেমন ব্রিটীশ দ্বীপসমূহের প্রাচীন কেল্টিক জাতির সমাধিস্থান ও তীর্থস্থান ছিল—বা তাহা যাহাই থাকুক, কার্ণাকের এই প্রান্তরও ফ্রান্সও পশ্চিম ইউরোপের অবিকল সেইরূপ তীর্থস্থান ছিল। এই প্রাচীন জাতির প্রস্তর কীর্ত্তি সকল এশিয়া হইতে সুরু করিয়া উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও শেষ নরওয়ে সুইডেন পর্য্যন্ত সকল স্থানে নানারূপে বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকারের প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্য দিয়া পরিব্যাপ্ত। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় নয় যে, মধ্য এশিয়া হইতে ভ্রমণ সুরু করিয়া এই জাতি বা তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা ক্রমশঃ আফ্রিকা, তথা হইতে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্পেন ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ভাগ বহিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ও তথা হইতে স্কাণ্ডিনেভিয়ার দিকে প্রয়াণ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই প্রকারে বিস্তৃত হইতে এই সভ্যতার সময় লাগিয়াছিল অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে, সমাধিগহ্বরে প্রাপ্ত অস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি ক্রমশঃ উন্নততর হইতেছে। পূর্ব্বের অস্ত্রগুলি অপেক্ষা পরেরগুলি বেশী পালিশ করা, বেশী মসৃণ, সকল রকমেই উন্নততর শিল্প ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচায়ক। কার্ণাকের কতকগুলি dolmenএর গায়ে সে যুগের দেবদেবী বা বীরপুরুষের মূর্ত্তি খোদাই করার যে চেষ্টা হইয়াছে, সেগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া মিল্‌ন্ ও তাঁহার সহযোগী জাকারি লা রুজিক্ অনুমান করেন যে, যে-সময়ে এই dolmenগুলি কার্ণাকের প্রান্তরে স্থাপিত হইয়াছিল তখন লোহ অথবা অন্য কোনো প্রকারের ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ইঁহারা অনুমান করেন যে, খোদাইগুলির অধিকাংশ কৃষিকর্ম্মের নানা অবস্থার প্রতিরূপ। বলীবর্দ্দ, লাঙ্গল, সূর্য্যালোকপুষ্ট শস্যের শীস্ প্রভৃতি নানারূপ খোদাই দেখিয়া মনে হয় এই জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল এবং কৃষিকর্ম্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

কিন্তু এইজাতি ধাতুর ব্যবহারে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, যদিও ইহার কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে। কালে গল জাতির পরাক্রম ও তাহাদের ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত তরবারি ও বর্শাফলকের বিরুদ্ধে ইহারা দাঁড়াইতে পারে নাই; দেশ তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার যখন রোমানগণ গলজাতির দেশ আক্রমণ করিল, তখন ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রকে রোমানদিগের ইস্পাতের যুদ্ধাস্ত্রের নিকট হার মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোনো নব্য সভ্যতাই দেশের পুরাতন রীতিনীতি সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে একেবারে হটাইয়া দিতে পারে না, কোনো না কোনো

কার্ণাকের প্রস্তর সারি। প্রায় পাঁচ মাইল স্থান অধিকার করিয়া হাজার তিনেক প্রস্তর স্তম্ভ আছে।

আর্ডেভেনের দুইটি প্রাগৈতিহাসিক স্তম্ভ

প্রচ্ছন্নরূপে, দেশকালোপযোগী পরিবর্ত্তিতভাবে তাহা সমাজের কোনো না কোনো স্তরে থাকিয়াই যায়। সব দেশেই এরূপ হইয়াছে, ফ্রান্সেও হইয়াছিল। প্রস্তর পূজার অভ্যাস বহুকাল পর্য্যন্ত লোকে ভুলে নাই, এবং প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা নানাভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। ইহাকে বন্ধ করিবার জন্য খ্রীষ্ট যাজকসম্প্রদায়কে অনুশাসনের পর অনুশাসন জারি করিতে হইয়াছে। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে ইহা ছিল তাহা সে সময়ের জনৈক জেসুইট প্রচারকের গ্রন্থ হইতে আমরা বুঝিতে পারি এবং ব্রিটানির কৃষক ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রস্তর পূজা যে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে, তাহা তাহাদের কতিপয় গ্রাম্য উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে বেশ বোঝা যায়।

কার্ণাকের এই প্রাচীন প্রস্তর কীর্ত্তিগুলি নয় প্রকারের, তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান। (১) Menhir—এগুলি বড় বড় পাথর খাড়া করিয়া পোঁতা (২) Dolmen—এগুলি ঘরের আকার, ছাদে ও দেওয়ালের স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অমসৃণ ও পালিশবিহীন পাথর। (৩) Tumulus—প্রস্তরস্তূপ। (৪) Cromlech—অনেকগুলি খাড়া হিসাবে পোঁতা পাথর বৃত্তাকার বা অর্দ্ধবৃত্তাকার অবস্থায় সাজানো। ইহা ছাড়া আর এক ধরণের ব্যাপার আছে—অনেকগুলি menhir বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সমান্তরাল ভাবে পোঁতা—দেখিতে যেন লড়াইয়ে সিপাহীর সারির মত।

এইগুলির আকৃতি, দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা অতি বিস্ময়কর। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় menhirটি বর্ত্তমান ভূমিকম্পে উপড়াইয়া ফেলিয়াছে—তাহার উচ্চতা ৭০ ফুট এবং ওজন দশহাজার মনেরও উপর। Dolmenগুলির উচ্চতা ১৮ হইতে ২০ ফুট; ছাদের প্রস্তরগুলি অনেক স্থানে ৩।৪ ফুট পুরু। কার্ণাকের প্রস্তরের menhirএর যে সারি আছে তাহা ৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেণ্ট্ মাইকেলের নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তরস্তূপকে দেখিলে মনুষ্যহস্ত গঠিত
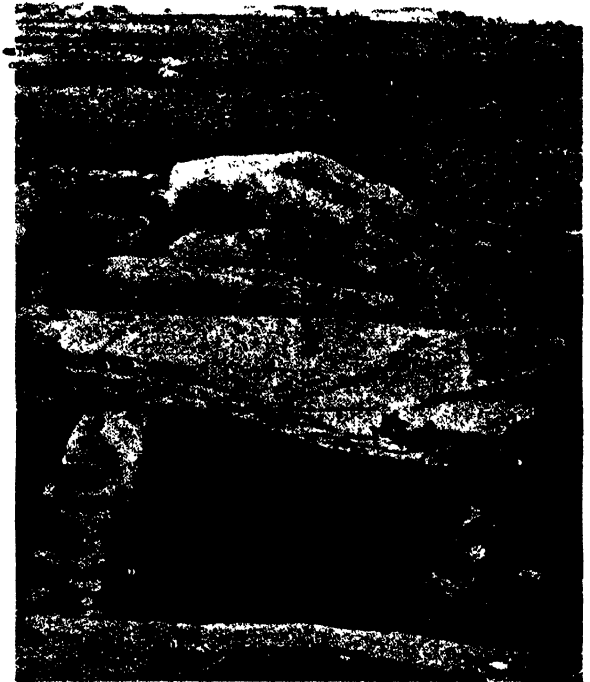
চওড়া পাথর দিয়া আবৃত প্রবেশ-পথ

বলিয়া মনে হয় না—পাহাড় বলিয়া মনে হয়। না জানিলে হঠাৎ ইহা বিশ্বাস করা কঠিন যে ইহা মানুষের হাতে তৈয়ারী। পুরাকালে dolmen গুলির চতুষ্পার্শ্বে এইরূপ ধরণের,তবেইহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র আকৃতির,প্রস্তর বা মৃত্তিকাস্তূপ ছিল। কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্তূপগুলি অধিকাংশ স্থলেই সমাধি —এগুলি খননকালে বহু প্রস্তরায়ুধ ও নরকঙ্কালের টুকরা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ছোট dolmenগুলিতেও অনেক স্থানে প্রস্তরের আধারের মধ্যে কোনো প্রকার জন্তুর হাড়, মানুষের হাড় প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। শেষেরগুলি মনে হয় সমাধিস্থ রাজা বা বীরপুরুষের ভৃত্য ও অনুচরগণের অস্থি—প্রাচীনযুগের রীতি অনুসারে ইহাদিগকে প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া পরজগতে তাঁহার সেবাকার্য্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া নানাপ্রকারের প্রস্তর নির্ম্মিত বর্শাফলক, তীরের অগ্রভাগ, কুঠার, মৃণ্ময় পাত্র, পাথরের হার ও আংটি প্রভৃতিও পাওয়া গিয়াছে। Menhirগুলি যেখানে সারবন্দী ও সমান্তরালভাবে

কার্ণাকের নিকটবর্ত্তী কেরমারিও প্রস্তর মালীর একটি অংশ। গ্রাম্য লোকদের বিশ্বাস একটা বিশেষ রকমের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া এই পাথরের উপর না রাখিলে শষ্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

কার্ণাকের নিকট ব্রিটানির উপকূলে প্রহরী

বসানো আছে সে স্থানটি বোধ হয় দেব পূজার স্থান ছিল। দুইসারির মাঝের পথটি দিয়া সম্ভবতঃ পুরোহিত ও পূজার্থীগণ যাতায়াত করিত। এইরূপ সারবন্দী menhirগুলির পশ্চিম প্রান্তে প্রায় সকল স্থানেই একটি করিয়া cromlech অর্থাৎ বৃত্তাকার বা অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রস্তর সংস্থান আছে; সেখানে বোধহয় পূজার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি নিষ্পন্ন হইত। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ menhir প্রায়ই এই cromlechএর নিকটে অবস্থিত। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে menhir গুলির উচ্চতা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে গিয়াছে।

এই প্রকারের প্রস্তরপূজা ও dolmen প্রস্তুতের সময় সঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন, তবে রুজিক্ ও আঁরি দ্য ক্লুজিও অনুমান করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২০০০

শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ ৪০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সভ্যতার সময়। বড় বড় menhir গুলি এই সময়ের মধ্যেই স্থাপিত হয়, ছোট dolmenগুলির সময় সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১০০ শতাব্দীর কাছাকাছি।

ব্রিটানির পল্লীপ্রান্তের নানা প্রাচীন গল্প ও লোক-সাহিত্য এই গুলিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। এগুলির সম্বন্ধে নানা কুসংস্কারও প্রচলিত আছে, সন্ধ্যার পর একাকী বড় কেহ এপথে হাঁটিতে চায় না। কার্ণাকের অধিবাসীগণ বলে গভীর রাত্রে বিরাটকার menhirগুলির আড়ালে আলেয়ার মত আলো একবার জ্বলিয়া উঠিতে আবার নিবিতে দেখা যায়। কখনো কখনো এগুলির মধ্যে নানাপ্রকার কুস্বর শুনিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্ধকারের মধ্যে কোনো অপরিচিত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ পল্লীরজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে শোনা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন

শ্রীসুধাংশুকুমার শর্ম্মা

অন্ধ যুগে বর্ষ শত আগে,
যেই দিন এ ভারত বিচ্ছিন্ন সন্ধ্যায়,
অজ্ঞতার অন্ধকারে সুপ্ত ছিল নিস্ব বেদনায়;
চিনিতনা আপনারে, জানিত না আপন স্বরূপ,
রিক্ত দৈন্যে অবসন্ন ছিল সংজ্ঞালোপ!
ধিকি ধিকি বক্ষে শুধু প্রজ্জ্বলিত ছিল
অসন্তোষ সন্দেহ সংশয়,
মনে ছিল অহরহ দ্বিধা দ্বন্দ ভয়।
হে রাজা, ঘোষিলে তুমি বিদ্রোহের বাণী।
সেইদিন হে সত্য-সন্ধানী,
অসত্যেরে ছিন্ন করি কঠোর আঘাতে,
বজ্রসম দৃঢ় চিত্ত হতে
উঠেছিল বিপ্লবের গান!
তাই প্রাণে কণ্ঠে গেলে দান
বাঙ্গালীরে নবসূর্য্যকিরণের দীপ্ত আশীর্ব্বাদ
সে শুভ সম্বাদ—
ধীরে ধীরে তীর হ'তে তীরে
সঞ্চারিয়া অপূর্ব্ব চেতনা,
নিমেষে জাগায়ে গেল বিপুল প্রেরণা
বাঙালীর প্রাণ-চক্র ঘিরে।
সেই দিন! সে মুহূর্ত্ত স্মরি'
শ্রদ্ধানত চিত্ত ওঠে ভরি'।
নিজেরে বিলায়েছিলে, তুমি যে সবার!
হে আদি বাংলার ঋষি, করি নমস্কার।

৩৬

বিনয় কল্‌কাতা চ'লে যাওয়ার পর শুধু কমলারই নয়, দ্বিজনাথেরও মন খারাপ হয়ে গেল;—জশিডি আর ভাল লাগেনা, ত্রিকূট ডিগ্‌রিয়ার সে মোহিনী মায়া অন্তর্হিত হয়েচে, পশ্চিমদিকের গিরি-পৃষ্ঠে গিয়ে বসতে ইচ্ছা হয় না,—এমন কি উভয়ের মধ্যে কথোপকথনও আর তেমন জমে না, আরম্ভ হ'য়েই সংক্ষিপ্ত দু চারটা উত্তর প্রত্যুত্তরে শেষ হয়ে যায়; তখন আবার একটা নূতন প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য মনে মনে বিষয়-বস্তুর অন্বেষণ করতে হয়।

বিপদ দেখে দ্বিজনাথ উপনিষদ্‌ খুলে শঙ্কর ভাষ্যে লাল পেন্সিলের দাগ কেটে পড়া আরম্ভ ক'রে দিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাল লাগ্‌ল না; বিশ্বের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যখন উর্ণনাভ এবং তন্তু, পৃথিবী এবং ওষধি, জীবদেহ এবং কেশলোমের দৃষ্টান্ত এসে পড়ল তখন ক্ষণকাল অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা ক'রে পুস্তকখানি মুড়ে রেখে কমলার ঘরের সাম্‌নে এসে ডাক দিলেন, "কমল!"

কমলা তখন একটি রুটিন তৈরী ক'রে উত্তর মেঘ খুলে পড়ছিল—'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং', আর মনে মনে চিত্রকূটকে ত্রিকূট এবং অলকাকে কলিকাতা ব'লে কল্পনা করছিল। দ্বিজনাথের ডাক্‌ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে পর্দ্দা ঠেলে ধ'রে বল্‌লে, "কি বাবা?"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "কিছু করছিলে কি?"

"বিশেষ কিছু না,—একটু পড়ছিলাম।"

"তা হ'লে চল না একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌—শরীরটা তেমন সুবিধে ঠেক্‌চে না।"

কমলার বুঝ্‌তে বিলম্ব হ'ল না যে, এখানে শরীর অর্থে মন। বল্‌লে, "বেশত' তাই চল;—কিন্তু কোন্‌ দিকে যাবে বাবা?"

"তুমিই বল, কোন্‌ দিকে যাওয়া যায়।"

কমলার মনে ত্রিকূট তখনো আধিপত্য বিস্তার ক'রে ছিল; বল্‌লে, "ত্রিকূট গেলে মন্দ হয় না।"

ঘড়ি দেখে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "একটু দেরি হয়ে গেছে,—তা হ'ক, চল ত্রিকূটই যাওয়া যাক্‌;—শীঘ্র তৈরি হয়ে নাও।"

দুম্‌কা যাবার পাকা রাস্তার পাশে ত্রিকূট পর্ব্বতশ্রেণী পথ হ'তে প্রায় দেড় পোয়া দূরে অবস্থিত। পথের অপর দিকে শ্রীশা মৌজা—একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। দ্বিজনাথের মোটর যখন শ্রীশা মৌজার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল তখন বেলা সাড়ে তিনটা। শরতের অপরাহ্ন, পথ পার্শ্ব হ'তে গিরিপাদমূল পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হিল্লোলিত ঘন সবুজ বর্ণের ধান ক্ষেত, তার ভিতর দিয়ে আলের উপরে উপরে পাহাড়ের নিকটে উপস্থিত হবার পথ। ধান ক্ষেতের প্রান্তে লতাপাদপ-মণ্ডিত ঘন নীল বর্ণের ত্রিকূট পাহাড়ের ধ্যান-নিমগ্ন মূর্ত্তি। সূর্য্য তখন পাহাড়ের পশ্চাতে নেবে গেছে, সুতরাং ছায়ালোকের স্নিগ্ধ-নিবিড় সম্পাতে সমস্ত দৃশ্য অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

গাড়ির উপর ব'সে এই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের লীলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কমলা আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে গেল; তারপর হঠাৎ এক সময়ে চেতনা লাভ ক'রে দ্বিজনাথের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বাবা, একটুখানি পাহাড়ে উঠ্‌লে হয় না?"

কমলার এই আগ্রহের সঙ্গে যাদের স্বার্থের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এমন দু-তিনটি গ্রাম্যযুবক নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হ'য়ে এসে দ্বিজনাথকে বল্‌লে, "চলুন না হুজুর, উপরে ত্রিকুটেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে দর্শন করবেন। তা ছাড়া, গুহার মধ্যে একটি বাঙালী বাবা আছেন,—সাধু লোক।"

কমলা দ্বিজনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "গেলে হয় না বাবা? মন্দ কি, দেবদর্শনও হবে।"

দ্বিজনাথ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ ক'রে অবশেষে স্বীকৃত হলেন। পথে দুই এক জায়গায় ঝরণার জলের ধারা অতিক্রম ক'রে যেতে হয়, সুতরাং গাইড্ দুজনের পরামর্শে জুতা খুলে যেতে হ'ল। পাহাড়ের কিয়দ্দুর উঠে ত্রিকুটেশ্বরের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা। মন্দির দর্শন ক'রে কমলা এবং দ্বিজনাথ আরও কিছু উপরে বাঙালী সাধুর গুহায় উপস্থিত হলেন। পর্ব্বতগাত্রে সে গুহা মানুষের সুবিধার জন্য মানুষের চেষ্টায় একটি প্রশস্ত কক্ষের আকার ধারণ করেছে। ঈষৎ-উচ্চ বেদীর উপর শয্যা বিছানো,—তার উপর একটি বাঙালী সাধু ব'সে আছেন। তিনি যে আশ্রমের অধীন সেই আশ্রমের প্রকাশিত ইংরাজি বাঙলা এবং হিন্দি অনেকগুলি পুস্তক প্রদর্শনের জন্য এবং বিক্রয়ার্থে তাঁর সম্মুখে থাক্ থাক্ ক'রে সাজানো। কিছুক্ষণ সাধুর সঙ্গে আলাপের পর খান দুই বই খরিদ ক'রে দ্বিজনাথ কমলাকে নিয়ে গুহার বাইরে এলেন। সেখান থেকে সম্মুখের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে তাঁরা গতিহারা হয়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হ'য়ে রইলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ কিরণে সমস্ত পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা উদ্ভাসিত, বহুদূরস্থিত পর্ব্বতগুলির অস্পষ্ট ধূসর মূর্ত্তি দিক্‌চক্রবালের উপর অঙ্কিত, বনতরু-নিবদ্ধ দিগন্ত-প্রসারিত নিম্ন ভূমির বক্ষে আসন্ন সন্ধ্যার ঘন মায়া আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

ক্ষণকাল প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "চল কমল, এবার নেবে যাওয়া যাক্। অন্ধকার হ'য়ে গেলে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে না।"

কমলা ঠিক যেন কোনো স্বপ্নলোকে বিরাজ করছিল, দ্বিজনাথের কথায় তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে বল্‌লে, "চল বাবা। কিন্তু কী ভালোই যে আজ লাগ্‌ল! মনে হচ্ছে আজ রাতটা এখানেই কাটাই।"

পশ্চাতে সাধু দাঁড়িয়েছিলেন; মৃদু হেসে বল্‌লেন, "সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা নেই মা। আজ রাত্রে আমাকে সহরে যেতে হবে—আজকের রাতের মত আমার আশ্রয় আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি। এমন কি, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য কিছু আহারের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়ে যেতে পারব।"

দ্বিজনাথ পিছন ফিরে সাধুর দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, "সৌভাগ্য গ্রহণ করতে পারার জন্যও একটা স্বতন্ত্র সৌভাগ্য থাকা দরকার। আমাদের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ সে সৌভাগ্য লেখেন নি।"

সাধু আর কিছু না ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

গাড়িতে উঠে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "ফেরবার পথে একবার সুকুমারদের বাড়ি হয়ে গেলে মন্দ হয় না। কি বল কমল?"

কমলা বল্‌লে, "বিশেষ কিছু দরকার যদি না থাকে ত' সোজাসুজি বাড়ি চ'লে গেলে হয়।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "দরকার এমন কিছুই নেই—তবে বিনয় পরশু কলকাতা গেছেন, আজ একখানা চিঠি প্রত্যাশা করছিলাম; ওদের বাড়ি পৌঁছ সংবাদ এসেছে কি-না দেখ্‌তাম।"

কমলা এ কথার উত্তরে আর কিছু না ব'লে নীরবে দক্ষিণ দিকের দ্রুত-অপস্রয়মান ত্রিকুট পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে রইল। সুকুমারদের বাড়ি যাবার কথা ওঠায় শোভার কথা মনে প'ড়েই তার মনে অনিচ্ছার উদয় হয়েছিল। কলহ নেই, বিবাদ নেই, প্রতিযোগিতায় শোভা তার নিকট পরাস্ত, তবু যেন অন্তরের কোন্ নিভৃত স্থানে শোভার সহিত তার বিরোধ। শোভা বাধা দেয় না ব'লেই তাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধে, শোভা পথ ছেড়ে দেয় ব'লেই

সে পথকে নিরাপদ ব'লে মনে হয় না।

মোটারের শব্দ এবং হর্ণ শুনে বেরিয়ে এল শোভা। সুকুমার বাড়ি নেই, তার ঠিকাদারী কাজের ব্যাপারে রেলের একজন বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে মধুপুর গেছে, রাত্রি দশটার গাড়িতে ফিরবে। বিনয়ের চিঠিপত্র আসে নি শুনে দ্বিজনাথ তখনি যাবার জন্য উদ্যত হলেন, কিন্তু শোভা কিছুতেই ছাড়লে না; বল্‌লে, "দাদা বিনুদা নেই ব'লে আপনি যদি না বসেন তা হ'লে আমরা ভারি দুঃখিত হব। তা ছাড়া, ত্রিকূটে উঠেছিলেন, ক্লান্ত হয়েচেন, একটু চা-টা না খেয়ে যাওয়া হবে না।" তারপর শৈলজার উপর দ্বিজনাথের পরিচর্য্যার ভার দিয়ে সে কমলাকে নিয়ে আপনার ঘরে গিয়ে বস্‌ল।

"বিনুদার জন্যে মন কেমন করচে কমলা?"

শোভার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কমলা প্রথমটা কি বল্‌বে ভেবে পেলে না, তারপরই তার মাথায় বুদ্ধি যোগালো; বল্‌লে, "তোমার?"

প্রশ্নের পারম্পর্য্যের হিসাবে উত্তর যে প্রথমে কমলারই দেওয়ার কথা—এ কথা শোভার খেয়াল হ'ল না; একটু বিপন্ন হওয়ার মৃদু হাসি হেসে সে বল্‌লে, "আমার? তা একটু করচে বই কি? অমন মানুষ বাড়ি থেকে চ'লে গেলে কার না মন কেমন করে বল? তোমার করে না?" তারপর নিজের প্রশ্নের অযৌক্তিকতায় হেসে উঠে বল্‌লে, "কি যে বলচি! তোমার ত আরো বেশি করবে।"

কমলা মৃদু হেসে বল্‌লে, "কেন, আমার আরো বেশি কর্‌বে কেন?"

"তোমার সঙ্গে যে বিনুদার বিয়ে হবে।"

"বিয়ে হ'লেই বেশি মন কেমন করে? আর বিয়ে না হ'লে করে না?"

কমলার কথা শুনে শোভার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল ভাই!"

কথোপকথনের মধ্যে কমলা এক সময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমার ছবিটা কি হ'ল শোভা?"

"কোন্ ছবি?"

"যে ছবিটা আঁকছিলেন?"

কমলার এই প্রশ্নের মধ্যে একটা সরস-রকম রহস্যোপভোগের সুযোগ দেখে পুলকিত হ'য়ে শোভা বল্‌লে, "কে আঁক্‌ছিলেন না বল্‌লে বলব কেমন ক'রে?"

শোভার অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে কমলার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "বুঝতে পারছ না?—তোমার বিনুদা।"

চক্ষু-বিস্ফারিত ক'রে শোভা বল্‌লে, "বাপ রে! কি চালাক মেয়ে তুমি! তবু নিজের দিক্ দিয়ে কথাটা বল্‌লে না!"

কমলা সহাস্যমুখে বল্‌লে, "নিজের দিক্ দিয়ে কথাটা কি শুনি? 'উনি', 'তিনি'? তুমি হ'লে 'উনি', 'তিনি' বল্‌তে?"

আরক্তমুখে শোভা বল্‌লে, "কখ্‌খনো না!"

"তবে আমি কেমন ক'রে বল্‌ব বল?"

"তা সত্যি।" ব'লে শোভা হাসতে লাগ্‌ল।

তারপর ক্ষণকাল পরে শোভা বল্‌লে, "বিনুদা যে তোমাকে কত ভালবাসেন তা যদি তুমি জান্‌তে কমলা! আমি আজ তার একটি প্রমাণ পেয়েছি, তুমি যদি কাউকে না বল ত তোমাকে দেখাই।"

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে কমলাকে শোভার সর্ত্তে স্বীকৃত হ'তে হল।

একটা ভাঁজ করা ড্রয়িং পেপার নিয়ে এসে কমলার হাতে দিয়ে শোভা বল্‌লে,যে "অন্যমনস্ক মানুষ বিনুদা, দাদার টাইম্ টেবেলের ভিতর রেখে ভুলে ফেলে গেছেন।"

কাগজটায় দৃষ্টিপাত ক'রে কমলার মুখ আরক্ত এবং চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সমস্ত কাগজ ভ'রে তুলি দিয়ে তার নাম লেখা। কোনোটা লাল, কোনোটা নীল, কোনোটা সবুজ; কোনোটা লম্বা ছাঁদে, কোনোটা খর্ব্বাকারে; কোনোটা মোটা থেকে সরু, কোনোটা বা সরু থেকে মোটা। যে মানুষ একদিন সংযমের কথা আর তত্ত্ব নিয়ে কত কথা বলেছিল, একান্ত অবসরকালে তুলির মুখ দিয়ে এ কি তার উচ্ছ্বাস! অপরিসীম আনন্দে এবং পরিতৃপ্তিতে কমলার অন্তর সিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। কাগজখানা ভাল ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বল্‌লে "তোমার নামও ত' রয়েচে শোভা।"

শোভা বল্‌লে, "হ্যাঁ, তিন জায়গায়। তোমার নাম ক জায়গায় জান ?"

"ক জায়গায় ?"

"তের্ষা ট্র জায়গায়।"

"গুণেছ ?"

"গুণেছি।"

একবার শোভার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তারপর কাগজখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কমলা বল্‌লে, "এটা আমাকে দেবে শোভা ?"

শোভার মুখে একটা দ্বিধার ভাব ফুটে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "চাও ?"

"দিলে নিই।"

একটু ভেবে শোভা বল্‌লে, "তবে নাও।"

কিন্তু মনে মনে কি চিন্তা ক'রে কমলা বল্‌লে, "না, কাজ নেই, তোমার কাছেই থাক্।"

যাবার সময়ে কমলাকে একপাশে টেনে নিয়ে শোভা বল্‌লে, "বিনুদার চিঠির খবর নিতে এসেছিলে, কিন্তু বিনুদার চিঠি তোমারই কাছে আগে আস্‌বে। এলে দেখিয়ো ভাই।" ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

কমলা বল্‌লে, "না, তোমারই কাছে আগে আস্‌বে। তুমি আমাকে দেখিয়ো।"

মাথা নেড়ে শোভা বল্‌লে, "আমাকে আবার বিনুদা আলাদা চিঠি দেবেন কেন ? দাদার চিঠিতে কিম্বা তোমার চিঠিতে হয়ত' একটু আশীর্ব্বাদ জানাবেন। তুমি দেখো কাল তাঁর চিঠি পাবে। কত আদর, কত যত্ন ক'রে কত কথা তোমাকে লিখ্‌বেন।"

শোভার কথা কিন্তু পরদিন প্রাতে সত্যই সফল হ'ল। ডাক নিয়ে এল,—তা'র মধ্যে বিনয়ের দুখানি চিঠি, একখানি দ্বিজনাথের, একখানি কমলার। কমলা তখন বাগানে একটা গাছতলায় চেয়ার নিয়ে ব'সে একখানা বই পড়ছিল। জীবন এসে চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে গেল। নীলাভ খাম, তার উপর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে কমলার নাম ও ঠিকানা লেখা। হস্তাক্ষর ঠিক পরিচিত নয়—কিন্তু টিকিটের উপর কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট-অফিসের ছাপ দেখে একটা প্রত্যাশিত পুলকে মনটা নেচে উঠ্‌ল। একবার কমলা বাড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ; দেখ্‌লে দ্বিজনাথকে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। তারপর ধীরে ধীরে চিঠিখানা বার ক'রে ভাঁজ খুলতে প্রথমেই চোখে পড়্‌ল পত্রাগ্রভাগের সম্বোধন 'প্রিয়তমে'। সমস্ত অন্তরের যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, প্রত্যাশা এই চারটি অক্ষরের ব্যঞ্জনার মধ্যে পরিতৃপ্তি লাভ ক'রে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশে কমলার দেহকে অবশ ক'রে দিলে। কিছুকাল গেল নিজের অপসৃত চেতনাকে ফিরে পেতে। পাতা উল্টে চিঠির নীচে দেখ্‌লে লেখা রয়েচে 'তোমার প্রণয় গর্ব্বিত বিনয়'। মনটা আবার মাদকতায় আচ্ছন্ন হ'তে আরম্ভ করলে। তারপর ধীরে ধীরে চিঠিখানা প'ড়ে শেষ করলে। সুদীর্ঘ চিঠি—তার মধ্যে কত আকুলতা ব্যাকুলতা কত উচ্ছ্বাস আদর! এক জায়গায় লেখা রয়েছে "আমার সমস্ত দেহ মন আত্মা, তুমি অধিকার করেছ কমলা! অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সেই শুভ দিনের প্রত্যাশায় যে দিন বিবাহের শুভ অনুষ্ঠান এই গৃহহীনকে তার গৃহলক্ষ্মী দান করবে। তার পূর্ব্বেই কমলার কমলাসনের ব্যবস্থা করবার চেষ্টায় আছি। বালিগঞ্জের দিকে একটি পরিচ্ছন্ন নূতন বাড়ি বিক্রয়ের জন্য আছে—সেটির দর-দস্তুর ঠিক ক'রে বায়না করবার চেষ্টা করছি।" আর একস্থানে বিনয় লিখেচে—"তোমার প্রতি আমার এই প্রেম শুধু আজকের নয়,—জন্ম-জন্মান্তর থেকে তুমি আমার আপনার—অনাগত অনন্ত ভবিষ্যতেও তুমি আমার একান্ত আপনার থাক্‌বে।"

চিঠিখানা খামের ভিতর পুরে হাতে নিয়ে কমলা বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। আকাশে বাতাসে কি যেন একটা অশ্রুতপূর্ব ছন্দের গুঞ্জন, লতাপাদপে অভিনব আনন্দের মর্ম্মরধ্বনি, অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোক!

দুপুরবেলা ঘরের দোর ভেজিয়ে দিয়ে কমলা বিনয়ের চিঠির উত্তর লিখলে ; পত্রপাঠান্তে উত্তরের জন্য বিনয়ের ঐকান্তিক আবেদন ছিল। চিঠি লিখতে ব'সে অনেক

কথা অনেক সম্বোধনই মনে এল, কিন্তু বেথুন কলেজের থার্ড ইয়ার ক্লাসের এই শিক্ষিতা মেয়েটি অবশেষে চিঠি আরম্ভ করলে 'শ্রীচরণকমলেষু' লিখে এবং শেষ করলে 'তোমার চরণাশ্রিতা কমলা' দিয়ে। প্রণয়ের দুর্ম্মদ কামনা আত্ম-সমর্পণের রিক্ততার মধ্যেই পরিতৃপ্ত লাভ করলে।

দিন চার পাঁচ পরে দ্বিজনাথ যখন কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন সে বিষয়ে কমলার আপত্তি এমন আকার ধারণ করল যে, সেই দিনই তিনি গাড়ি রিজার্ভ করবার জন্য রেল কোম্পানীকে চিঠি লিখলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যুগাবর্ত্তে ভারতের আদর্শ

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি-এ

গীতাকার বলিয়াছেন—

> দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তঃ বঃ।
> পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

অর্থাৎ, (এই যজ্ঞদ্বারা) তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।

পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের সঙ্গে অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতের এই যে যোগাযোগ ইহার আভাস আমরা অন্যত্রও পাই। একটি মাত্র উদাহরণ যোগেই বিষয়টি পাঠকের কাছে পরিস্ফুট হইবে আশা করি। R. W. Trine-এর In Tune with the Infinite বইখানিতে একস্থলে আছে— "There is a divine sequence running throughout the universe. Within and above and below the human will incessantly works the Divine will. To come into harmony with it and thereby with all the higher laws and forces; to come then into league and to work in conjunction with them, in order that they can work in league and in conjunction with us, is to come into the chain of the wonderful sequence. This is the secret of all success.

কথাগুলি পড়িয়া গীতার উক্ত শ্লোকের সঙ্গে ইহার ভাবসঙ্গতি পাঠক অনায়াসেই লক্ষ্য করিবেন। ইহাদ্বারা বোঝা যায় এই, প্রত্যেক তত্ত্বান্বেষীর কাছেই সত্য চিরকাল আপন স্বরূপ খুলিয়া দেখাইয়াছে। ইংরাজ সাধকও জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে মানবীয় ইচ্ছার অতিরিক্ত একটা দৈবী ইচ্ছাশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সে দৈবী বা ভাগবতী ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়া ঊর্দ্ধ জগতের শক্তিসত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্যসূত্রে আসিয়া কাজ করাকেই কর্ম্মজগতে সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—গীতারই মত। ভারতের ঋষিরা জানিতেন এই দেবান্ বা শক্তিসত্ত্ব মানুষের ভিতরেই—তাহার আত্মার মধ্যেই নিহিত আছে। তাঁহারা এই দেবশক্তির কাছে—এই আত্মশক্তির কাছে নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন—পরাপ্রকৃতির কাছে নীচের মনপ্রাণদেহাত্মক অপরা-

প্রকৃতিকে সমর্পণে তুলিয়া ধরিতেন। দেবগণও (পরা-প্রকৃতির শক্তিসমূহ) নামিয়া আসিয়া দেব-ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদের আধার পূর্ণ করিয়া তুলিতেন। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিভূতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাং উপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

এইরূপে সৃষ্টিতে আপনাদের ক্রমবিকাশ পূর্ণ করিয়া এমন একটা বিশাল সভ্যতার সৃষ্টি তাঁহারা করিয়াছিলেন যাহার মহিমার অবধান এখনও সমগ্র পৃথিবীর সম্ভ্রম ও নতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে; যাহার অনুপম সৃষ্টি গীতা আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইতেছে।

বর্ত্তমানে কিন্তু যুগবিপর্য্যয়ে এই সকল তত্ত্বের সারবত্তা সম্বন্ধে বহু মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দিগ্ধচিত্তে হইয়া পড়িয়াছেন। ভিন্ন দেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। রুসিয়া ত দেশ হইতে ভগবানকে নির্ব্বাসন দিবারই সংকল্প করিয়াছে। এদেশেও বলশেভিকভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রুসিয়ার ঈশ্বর বিহীন রাষ্ট্রীয় আদর্শকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইবার মত মনোভাব দেখা যাইতেছে। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য এদেশে শুধু যে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে, এমন নহে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও আদর্শবাদ লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে ভগবান, আধ্যাত্মিকতা, নীতিপ্রবণতা ইত্যাদির দিকে লোকের বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ-সকল বাদ দিলে সাহিত্যও কিছু সুন্দরতর হইয়া গড়িয়া উঠিবে না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাও নিষ্কণ্টক হইবে না। চাই সামঞ্জস্য, যুগোপযোগী সমন্বয়। ভারতপ্রতিভা যে এ সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান করিতে অক্ষম তাহা নয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগ পুরুষেরা প্রতি যুগসন্ধিক্ষণে এই রকম সমন্বয় বিধান করিয়া আসিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ এইরকম একটা সমন্বয় গীতার ভিতর দিয়া আমাদের দিয়াছেন। অর্জ্জুনের মন ঝুঁকিয়াছিল ত্যাগের দিকে, নৈষ্কর্ম্মের দিকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন ভোগে, কর্ম্মে। তবে সে ভোগকে প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলেন ত্যাগেরই উপর। "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—এই বাণী ভারতপ্রতিভার খুব উচ্চ অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ইহাই ভারত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। বলিতে পারি প্রথমটি হইতেছে ত্যাগ, দ্বিতীয়টি ভোগ—প্রথমটি নিজেকে জানা, দ্বিতীয়টি নিজেকে পাওয়া—প্রথমটি ভূমার স্তরে আরোহণ, দ্বিতীয়টি তাহার আস্বাদন।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এই সামঞ্জস্যকে হারাইয়া চিন্তায় আদর্শে একান্তবাদী হইয়া পড়িয়াছি। তাই আধুনিক যুগের মানুষকে আমরা বলিতে শুনি যে আত্মা দেহ মনেরই সৃষ্টি; মহাপুরুষ, অতিমানব প্রভৃতি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের একটা ব্যতিক্রম মাত্র এবং তাঁহাদের বিলুপ্তির মধ্যেই গণমানবের কল্যাণ নিহিত। এবংবিধ মতবাদে উপনীত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে বোঝা যায় এই যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য অধীরতাই আমাদিগকে এইরূপ একান্তবাদী করিয়া তুলিয়াছে। এই অধিকারবোধ জীবমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহাদের মধ্যে মনের বিকাশ নাই সেই পশুজগতেও ইহার ক্রিয়া instinct-এর বশে চলে। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি তাহার হিরণ্ময় প্রতিভাদ্বারা এই অধিকারের, স্বার্থের বোধকে বহুভঙ্গিম, বহুমুখী ধারায় প্রকাশিত করিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ না বুদ্ধির ঐ হিরণ্ময় আবরণখানি সরিয়া গিয়া সত্যের আলোকে মানুষ নিজেকে ও জগতকে দেখিতে পাইতেছে ততক্ষণ উক্ত অধিকার-বোধের স্বার্থবুদ্ধির মধ্যে সীমার খণ্ডতা, দৃষ্টিভঙ্গীর বৈকল্য থাকিয়া যাইতে বাধ্য। চাই এই স্বাধিকার বোধ মানুষের মধ্যে জাগুক তাহার স্ব-ভাব অর্থাৎ স্বরূপের বিরাট চৈতন্য হইতে, ফলত মানুষ জ্ঞানত অজ্ঞানত প্রকৃতির বিবর্ত্তনের ফলে তাহার অন্তর্নিহিত যে সত্যং-ঋতং-বৃহতের, যে বিপুল আত্ম-চেতনার ক্ষেত্র তাহারই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মন প্রাণের সংশয়, আপত্তি বিবর্ত্তনের মুখে আত্মশোধনেরই—প্রকৃতির রূপান্তর গ্রহণেরই চিহ্ন। মানুষকে আজ নূতন করিয়া বলিবার

হয়ত প্রয়োজন আছে যে আত্মাকে, ভূমাকে লাভ করিলে সে নীচের মনপ্রাণকে হারাইবে না; কারণ ঐ ভূমাই, সমগ্রই অন্য সব প্রতিষ্ঠানকে ধারণ করিয়া আছে। মনুষ্যের পক্ষে নিজের বৃহত্তম চৈতন্য ও শক্তি লাভ করা অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, শুভতর কোন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। মানুষ প্রাণ ও মনবুদ্ধির ভূমি হইতে যত প্রকার সৃষ্টি ও সভ্যতার জন্ম দিয়াছে তাহার আত্মার স্তরে উঠিয়া গেলে সে যে আরো বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতর সৃজনশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিবে ইহাই স্বাভাবিক এবং মানবেতিহাসে তাহাই দেখা গিয়াছে। আত্মার যে একটা সহজ অধিকার প্রেরণা আছে ঐ প্রেরণায় যদি নিজদিগকে আজ আমরা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার দারুণ দুঃখকে আত্মার উদার এবং কল্যাণ দৃষ্টি হইতে শুধু দেখিতে নয় তাহার প্রতিবিধান করিতেও আমরা সমর্থ হইব। আজ আমরা উহা অনুভব করিতেছি সাধারণ দ্বন্দ্বময় প্রাণস্তর হইতে। কাজেই দুঃখের বিপুলতায় আমরা ভীত হইয়া পড়িয়াছি। অথচ সে দুঃখ নিবারণের সামর্থ্য প্রাণের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। বর্ত্তমানে কি শিক্ষা-দীক্ষায়, কি সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই ভয়চালিত একটা স্পষ্ট-ভাব, লক্ষিত হইতেছে। ইহা জীবনকে পরিপূর্ণতার পথে না আগাইয়া দিয়া ব্যর্থতার পথে ছাড়িয়া দিতেছে না কি? সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাবীর Bertrand Russel একস্থলে বলিয়াছেন —"No institution inspired by fear can further life. Hope, not fear, is the creative principle in human affairs." কথাটা আজ আমাদের বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আজ বাহির হইতে অধীনতার চাপ আমাদের সুপ্ত আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার প্রেরণা দিক। প্রাণকে যেন আমরা প্রভুর আসনে না বসাই। প্রভু সে চিরকাল আত্মা —ভারতপ্রতিভার এ মহাবাণী যেন আমরা যুগাবর্ত্তে বিস্মৃত না হই। ভারত যদি আজ তাহার আত্মার বাণী বিস্মৃত হইয়া নিজস্ব প্রতিভার আলোক হারাইয়া অন্ধ প্রাণের প্রেরণাকেই আপন অদৃষ্টের নিয়ন্তা করিতে চাহে, তবে তাহার সে সংকল্প কখনো কল্যাণের হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পক্ষান্তরে, বর্ত্তমানে কি স্বদেশে কি বিদেশে যাঁহারা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির স্তর হইতে মানব জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাঁহাদের বাণীর মর্ম্মকথা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই এই যে, মানুষের মনপ্রাণের শক্তি ও সৃষ্টি বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ আদর্শ মানবসমাজের পক্ষে আর যথেষ্ট ও অপরিহার্য্য নয়। মানুষকে আজ মনপ্রাণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্থক নবসৃষ্টির জন্য আত্মার স্তরে আরোহণ করিয়া নবজন্ম লাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপে এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টার আত্মার এই বিশ্ববোধকে নিজের মধ্যে জাগ্রত করিয়া রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান পাইয়াছেন ব্যাপকভাবে এই আধ্যাত্মস্তরে উন্নীত হওয়ারই মধ্যে—"Only the new births within the soul, you and me."

কথা উঠিতে পারে এই আত্মার সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহার কষ্টি-পাথরে অন্য সব প্রয়োজনের বস্তুতে যাচাই করিয়া দেখিবার মত সামর্থ্য সকলের হইতে পারে না। এ যাবৎ অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই ঐ মহান আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে যে বহুর মধ্যে তাহা হইতে পারিবে না এমনও তো কোন কথা নাই। বরং তাহারই আভাস আজ সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে না কি? জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ এই অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিলে জন-সাধারণ যে তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিবে—যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। তবে, সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে এ আদর্শ অধিগম্য করিয়া তুলিবার উপায় কি? উপায় হইতেছে আত্মাকে মনপ্রাণের উপর জয়ী করিয়া তোলা; আত্মার প্রেরণাকে প্রাণের কামনার উপর স্থান দেওয়া; মানুষের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুক্তি ও সিদ্ধির উপায়কে সর্ব্বোচ্চ সত্যের সুরে বাঁধিয়া লওয়া। ইহাই কি ভারতপ্রতিভার বাণী নহে? আমরা যে ভারতমাতাকে মহেশ্বরী-মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী মূর্ত্তিতে বিশ্ববরেণ্যা রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে চাই, তাহার জন্য কি অসীম ধৈর্য্য ও বিপুল সাধনার প্রয়োজন নাই?

* * *

ভারত আবার স্বাধীন হইবে। কিন্তু সে স্বাধীনতা

একটা বিরাট বিশ্বভাবের চেতনা ও ঐশ্বর্য্য লইয়া গড়িয়া উঠিবে। উহাই হইবে ভারতের স্বধর্ম্মের উদ্‌যাপন। যে অজ্ঞানতা ও অবসাদ, ভয় ও দুঃখ দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মত আজ চাপিয়া বসিয়াছে আত্মার অমোঘ "অভীঃ"র আলোকে তাহা বিদীর্ণ করিয়া জ্ঞানের অস্ত্রে অজ্ঞানতার সহস্র নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারতকে উঠিতে হইবে—জগাদ্ধিতায়। ভারতের যোগনিদ্রা সাময়িক, তাহা চিরকালের সমাধি নয়। ভারত স্বাধীন হইবে—আপাতদৃষ্ট ঘটনারাজীর উপর আত্মাকে জয়ী করিয়া তুলিয়া—ভয়কে "অভীঃ"র মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া। আমাদের ঘরের দিকে যদি চোখ ফিরাই তবে দেখিতে পাইব যে, ভারতের অন্যতম যুগপুরুষ বিবেকানন্দের কণ্ঠে সে অভীঃ মন্ত্র বহুপুর্ব্বে বিঘোষিত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, জড় ও চৈতন্যের, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ভারতাত্মা কর্ত্তৃক পুর্ণ হইতে পূর্ণতর সমন্বয়বিধানের দিকে আজ জগতের সোৎসুক দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। মহামতি রম্যা রঁলা আনন্দ-উদ্বেলিত চিত্তে আজ য়ুরোপবাসীকে শুনাইতেছেন—"The West which has been complacently picturing to itself an Orient passive, static, quietist will be surprised to see India surpassing us very soon in the zeal for progress and of activity. If with Rammohan, Vivekananda, and Ghoshe, she retires, at times, into the furthest retreats of her thought, it is only to take a spring and bound forward, further to the front..." ..An Aurobindo Ghoshe is inspired by unshakable faith in the unlimited powers of the soul and in human progress... ...He believes humanity is going to enlarge its domain by the acquisition of a new knowledge, new powers, new capacities, which will lead to as great a revolution in human life as did the physical science in the 19th century.

[মডার্ণ রিভিউ, এপ্রিল, ১৯২৯ দ্রষ্টব্য,]

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

কার্ত্তিকের বিচিত্রা

৪৭নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্ হইতে সুশীল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ৪৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট বিচিত্রা আফিসে তুলিয়া আনা হইল বলিয়া এবার বিচিত্রা প্রকাশে কয়েকদিন বিলম্ব ঘটিয়া গেল। আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে, পূজার এগার দিন ছুটির মধ্যে সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, কিন্তু বড় বড় মেশিন তুলিয়া বসাইতে এবং মোটর কনেক্সন্ প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া ফলে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। আমরা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য গ্রাহক এবং পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অগ্রহায়ণের বিচিত্রা যথারীতি সময়ে বাহির হইবে।

রস-কথা

শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

লেখাপড়ার যে কতদিন হইতে পৃথিবীতে প্রচলন হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সঠিক প্রমাণ দিতে পারে না; কিন্তু পড়াশুনা যে তাহার বহুপূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, দর্শনের চসমা চোখে পরিলেই তাহা আমরা দেখিতে পাই। পুঁথির পাতা দেখিয়া পড়া, আর স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া পড়া, এই দুইয়ের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ নাই; কিন্তু পাঠক ও কথকে কোনই সম্বন্ধ নাই, কারণ রস বিতরণে পাঠকের কৃতিত্ব নাই, কিন্তু কথক সুরসিক না হইলেও পাঠশালার গুরুমহাশয়। লেখাপড়া শিখিবার পূর্ব্বেও আমাদের দেশে শ্রোতা ও কথকের অভাব ছিল না, আর সেকালের কথক ঠাকুরগণও যে যথেষ্টই সুরসিক ছিলেন, তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখ এই যে, তাঁরা বোধহয় লিখিতে জানিতেন না—তাই তাঁহাদের মুখের কথাগুলি অনেক বৎসর পরে অরসিক শ্রোতারা ধরিয়া-বাঁধিয়া পুরাণ বলিয়া খাড়া করিয়াছে। তাহাতে আপনারা পাইবেন সবই ছানা, চিনি, সবই আছে, কিন্তু নাই রসগোল্লা। আবার সেই পুরাণের কথাই কালিদাস, মাঘ ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ আমাদের এমন ভাবে বিতরণ করিয়াছেন যাহা রসে ভরপুর।

রস-সৃষ্টি

সুতরাং লেখাপড়ার যুগ হইতেই যে রস-রচনার উৎপত্তি তাহাতে মতদ্বৈধের উপায় নাই। এখন, লেখা ত অনেক কিছুই হইতেছে, তাহার কোনটি রসকথা আর কোনটি নীরস তত্ত্বকথা, তাহা ধরিবার মাপকাঠি কি? মানুষের মানসিক ক্ষুধানিবৃত্তির প্রচেষ্টাই লেখক ও কথকের বৃত্তি। অবশ্য, অসহ্য ক্ষুধায় অনেক লোকে অখাদ্যও খাইতে পারে বা দুঃসহরোগের যাতনায় ঔষধও সেবন করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুধা না থাকিলেও অমৃত-আস্বাদনে কেহই বিমুখ হ'ন না। রসসাহিত্য ও তত্ত্বকথার প্রভেদও কতকটা তদ্রূপ। কাব্যামৃত পানে জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ এবং আনন্দ উপলব্ধি একত্রে হইয়া থাকে।

রস ও তত্ত্ব

একখানা ভৈষজ্য-তত্ত্ব বা একটি শরীর বিজ্ঞানের প্রবন্ধ-খানিকটা শিক্ষা বিজ্ঞানের নিষ্কসার, অথবা খানিকটা রসায়নের তরলসার সাহিত্য পরিষদের আলমারিতে পোকায় কাটিতে পারে বা তৎতৎ বিদ্যাবিৎগণের কতকটা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু একখানি মহাকাব্য বা একখানা ভাল নাটক কি উপন্যাস সকলেরই মনোরঞ্জক। একখানা দর্শনের গ্রন্থ বা একখানা প্রত্নতত্ত্বের পুঁথি, সাহিত্য হিসাবে যথেষ্টই মূল্যবান, কিন্তু রসরচনা নহে। আবার গ্রন্থ মধ্যে রসের কথা থাকিলেই রস-কথা হইতে পারে না। রসায়ন শাস্ত্রে বা সাহিত্য দর্পণে, কি বাৎসায়ন সূত্রে অনেক রসের কথাই আছে, কিন্তু সেগুলি কাব্য নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে কেবল রসের কথা লইয়াই যৎসামান্য আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু ইহা নীরস ব্যবকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার ভাবের দিক হইতে দেখিলে মনে হয়, রস ও তত্ত্ব যেন পত্নী ও মাতার ন্যায় পাঠকের মনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তত্ত্বকথা অতি তীক্ষ্ণ অতি সুস্পষ্ট, গুরুতর প্রশ্ন এবং তাহার সমাধান স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে—যেন মাতার কঠোর আদেশ ও নীরস উপদেশ। আর রসকথা একেবারে হৃদয়গ্রাহী, যেন পত্নীর সুমধুর প্রেমালাপ।

প্রসঙ্গত ভাব ও রসের যে সাম্য ও বৈষম্য রহিয়াছে তাহারও কিছু আলোচনা আবশ্যক। দর্পণকার বলিলেন,

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাব প্রথম বিক্রিয়া"

ভাব ও রস

—অর্থাৎ Psychology যেটাকে sentiment আর emotion বলিয়াছে ভাবও কতকটা সেই পদার্থ। বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রকৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া মস্তিষ্কে

(আলঙ্কারিক ও দার্শনিকের ভাষায় "চিত্তে") উপস্থাপিত করিলে ভয় বিস্ময়াদি যে প্রথম বিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই ভাব (emotion বা sentiment)। রসও চিত্তকে ভয় বিস্ময়াদি দ্বারা দ্রবীভূত করে— তদ্ভাবে ভাবিত করে বটে, তথাচ ভাব ও রস এক পদার্থ নহে, কারণ ভাবের বাহন পঞ্চ ইন্দ্রিয় আর আধার মন, কিন্তু রসের বাহন স্বয়ং আত্মা। ভাব যদি রস হইত, তাহা হইলে cinema গুলি এক একখানি মহাকাব্য হইয়া যাইত, কারণ "বাক্যরসাত্মকং কাব্যম্", সরস বাক্যই কাব্য।

রসের সংজ্ঞা

এখন বেদরচয়িতা সেই ঋষিদের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলেই বলিয়া আসিতেছেন যে, "রস খেলে নেশা হয়"। বাস্তবিক যে লেখা পাঠককে মাতালের মত টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে, তাহা রস রচনা নহে। শ্রুতি ভগবানকে "রসোবৈসঃ" বলিয়াছেন— বস্তুত রস স্বরূপই ভগবানের স্বরূপ। এই রস যে রচনায় না থাকে তাহা মনুসংহিতা হইতে পারে, বা Kantএর Critique of Pure Reason হইতে পারে, অথবা নগেন্দ্র বাবুর বিশ্বকোষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা রস-রচনা নহে। আলঙ্কারিক রসকে "ব্রহ্মস্বাদ সহোদর" বলিয়াছেন, "প্রাণৈঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ" বলিয়াছেন—যাহা প্রাণকে মাতাইয়া দেয় তাহা অবশ্যই ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। সরস কাব্যালোচনায় অবসাদ নাই, ক্লান্তি নাই, বরং মল্লিনাথের মত পাঠক থাকিলে উহা অধিকতর মনোরম অধিকতর সৌন্দর্য্যময় করিয়া এমন ভাবে সাধারণ পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন যাহা বহুবার আবৃত্তি করিয়াও তৃপ্তি মেটে না।

এইভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য এই দশ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি তাঁহার রস রচনায় পাঠককে মোহিত করিতে পারেন।

শৃঙ্গার

যুবক যুবতীর স্বাভাবিক আকর্ষণকে কলমের সাহায্যে ফোটানই শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য। এই আদিরস-রচনা বিশেষ নৈপুণ্য সাপেক্ষ; সুনিপুণ শিল্পী না হইলে আদিরস-রচনা প্রায়ই অশ্লীলতাদোষদুষ্ট করিয়া ফেলেন। মনোবৈজ্ঞানিক বলেন, পাঠক পাঠিকার জীব-সৃজন শক্তির অনুকূল বয়স না হইলে আদিরস সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্যে শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য যথেষ্টই আছে। রমেশচন্দ্রের "সমাজ" এবং শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দুইপ্রকার শৃঙ্গার রসের উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায়। নায়ক নায়িকার মিলনেই সম্ভোগ এবং বিয়োগ বা বিচ্ছেদেই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

হাস্য

হাস্যরসের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। নির্দ্দোষ হাস্য-রস রচনা বাঙ্গলাসাহিত্যে অলভ্য না হইলেও দুর্লভ (এস্থলে নির্দ্দোষ শব্দ অবশ্য আলঙ্কারিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে)। বাঙ্গলা সাহিত্যে, এমন কি ইংরাজি সাহিত্যেও এই হাস্য রস অন্যরসের সহিত এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, তাহাকে ছাঁকিয়া বাহির করা নিতান্তই দুরূহ। সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত। শ্লেষানুপ্রাণিত হাস্যরস (satire) সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। আর বাঙ্গলায় ঈশ্বরগুপ্ত হইতে অমৃতলাল বসু পর্য্যন্ত (মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ রহিয়া গেলেন) সকলের রচনাতেই ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম, বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রভৃতি ত প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ।

করুণ

মানুষের মনে পরদুঃখকাতরতার যে সূক্ষ্ম তন্ত্রীটি রহিয়াছে, তাহাতে যদি কোন কবি আঘাত করিতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই করুণ রস সৃজনে সমর্থ হন। করুণ রস সুকবি জনের বিশেষ প্রিয়। গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" বা দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" করুণ-রসাত্মক নাটক। নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধও" ঐ পর্য্যায় ভুক্ত হইতে পারে; যদিও বীর ও ভয়ানক রস উহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রৌদ্র

গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে ক্রোধ বা হিংসার আবির্ভাব হইলে বুঝিতে হইবে কবি কাব্যে রৌদ্র রসের অবতারণা করিয়াছেন। "স্বর্ণলতা" উপন্যাসে প্রমদা ও গদাধর চরিত্রে যথেষ্টই রৌদ্ররসের পরিচয় পাওয়া যায়। "পল্লী সমাজের" ভৈরব আচার্য্যও

রৌদ্ররসের উদ্দীপক। বঙ্কিমচন্দ্রের মহম্মদ তকি খাঁ বা লরেন্স ফষ্ট পাঠক মাত্রকেই ক্রোধে উত্তেজিত করিয়া তুলে।

দানে অথবা ধর্ম্মকার্য্যে, দয়াদাক্ষিণ্যে বা যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনে পাঠকের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব, একটা বিরাট মহত্ত্বের সৃষ্টি করিতে পারিলে কবি বীর রস রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" বা রঙ্গলালের "পদ্মিনী" বীর রসাত্মক মহাকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দ, প্রতাপ বা জগৎ সিংহ বীররসেরই নায়ক।

বীর

পাঠকের মনে ভয়-সঞ্চারী রচনা ভয়ানক রসাত্মক কাব্য। হেমচন্দ্রের "নলিনী-বসন্তের" সমুদ্রবর্ণন বা পরী-সুমালীর অনুচরবর্গের অত্যাচার-কাহিনী পাঠক মাত্রেরই ভীতিপ্রদ। শরৎচন্দ্রও "শ্রীকান্তের" স্থানে স্থানে ভয়ানক রসের অবতারণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" বা "রাজসিংহ" বীর রসাত্মক উপন্যাস হইলেও ভয়ানক রসের অসদ্ভাব নাই।

ভয়ানক

মনে ঘৃণা বা তদনুরূপ ভাবের সঞ্চারী রচনা বীভৎস-রস-রচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় যখন এরণ্ডের ত্বক্ শবদাহের গন্ধ প্রভৃতি নক্কারজনক বস্তুগুলি একত্র করিয়া এক কটাহে চড়াইয়াছেন, তখন সুরসিক পাঠক ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া থাকিতে পারে না। মধুসূদনের "মেঘনাদবধের" বা হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহারের" নরক বর্ণনায় কাহার না ঘৃণা বোধ হয়।

বীভৎস

মনে বিস্ময়ের উদ্দীপক ভাবমাত্রই অদ্ভুত রসাত্মক। কোন কোন সমালোচক আবার বলেন যে, যেখানে অন্য কোন রসের সঞ্চার নাই অথচ লেখক পাঠকের মনে একটা স্থায়ী ভাব উৎপাদন করিতেছেন, বুঝিতে হইবে সেইখানে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হইয়াছে।

অদ্ভুত

কোন কোন আলঙ্কারিক শান্ত ও বাৎসল্য রসকে রস আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন। মনে একটা উদাস ভাব যে কাব্য আনিয়া দেয়, তাহাই শান্ত রসাত্মক। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম" বা সরযূবালা দাসগুপ্তার "বসন্ত প্রয়াণ" অথবা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "চিন্তা কণা"গুলি শান্ত রস-রচনার বিশিষ্ট উদাহরণ।

শান্ত ও বাৎসল্য

মাতাপুত্রের স্নেহময় মধুর সম্পর্কটি লেখনী সাহায্যে ফুটাইতে পারিলে পাঠক বাৎসল্য রস আস্বাদন করিতে পারেন। শরৎবাবুর "বিন্দুর ছেলে", "রামের সুমতি" বা "মেজদিদি" এক একখানি উৎকৃষ্ট বাৎসল্য রস রচনা।

আলঙ্কারিকগণ রসাধ্যায়ে আর একটি অতি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কতকগুলি রস পরস্পর বিরোধী, অর্থাৎ একের প্রয়োগে অন্যটির ব্যবহার ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন শৃঙ্গার রসের সহিত বীভৎস বা রৌদ্র মিশ্রিত হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়; তদ্বৎ হাস্যরসের সহিত ভয়ানক বা করুণ রস মিলিত হইলে পাঠক আর কাব্যে হাস্যের উৎস দেখিতে পান না। সুতরাং এগুলি কাব্যের রস দোষ। কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পী এরূপ বিরোধী রসের সাঙ্কর্য্যেও কাব্য মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই, এরূপ উদাহরণও বঙ্গসাহিত্যে বিরল নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক খণ্ডকবিতাগুলিতে বা প্রবীণ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় অথবা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে কি "আত্মকথায়" হাসির অন্তস্থলে অশ্রুর ফল্গুধারা এমনভাবে প্রবাহিত হইয়াছে—হাস্য ও করুণ এমনভাবে মিশিয়াছে যাহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্ল্লভ।

বিরোধী রস

সুতরাং গদ্য লেখক বা পদ্য লেখক, নাটক রচয়িতা অথবা উপন্যাস প্রণেতা, অর্থাৎ কবি মাত্রেরই রস-সৃষ্টিই একমাত্র উপজীব্য একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। বস্তুত রসরচনাই সাহিত্যের প্রাণ, রস-রচনাই সাহিত্যের পরিপুষ্টি; অন্যবিধ রচনা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে, বা তদ্দ্বারা লেখক আত্মপ্রসাদ হইতেও বঞ্চিত না হইতে পারেন; কিন্তু কাব্যের আসন পাইতে পারে না।

শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়

রয়েছে দীপ না আছে শিখা!

শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র

১

আজিকে বসি' মোর বাতায়নে—
সুদূরে আছি চেয়ে আন মনে!
সলাজ শেফালির কুঁড়ীটিরে—
ভ্রমর চুমি যায় ফিরে ফিরে!
ছায়া ও আলোকের লুকোচুরী,—
রচিছে স্বরগের মায়াপুরী!
কপোত কপোতীরা করে কেলি;—
নীরবে হেরি তাই আঁখি মেলি!

২

শ্যামল ধরণীর সীমা শেষে—
সুদূরে নীল নভ গেছে মিশে!
কাশের বনে আজ খোলা হাসি
দোদুল দোলা দিয়ে যায় ভাসি'
মালতী সখী তোর হোল এ'কি?
হরষে লুটোপুটি আজ দেখি!
টুটেছে নভে কালো যবনিকা
অলস লিপি তার গায়ে লিখা!

৩

আজিকে কেন মোর অকারণে—
অতীত সুখ স্মৃতি জাগে মনে!
সেদিনে ছিল যেবা হৃদি পুরে—
কোথা সে আজি হায় কত দূরে!
আমার মত বসি' বাতায়নে
সেকিগো আজি মোরে করে মনে!
জীবনে ছিল সে যে ধ্রুব তারা
আজি সে নাহি তাই দিশেহারা!

৪

গোধূলি আঁধারের আঁখি চুমি'
নীরবে এল ছেয়ে বন ভূমি!
আমারো মনে ওর পড়ে ছায়া,
বিষাদ আঁধারেতে ভরে হিয়া!
সুদূরে আকাশের বুক চিরে—
তারাটি ওটে ফুটি' ধীরে ধীরে।
ও যেন বলে মোরে কত কী যে—
বুঝি না আঁখি জলে ভাসি নিজে!

পুস্তক পরিচয়

A WOMAN OF INDIA.

Being the Life of Saroj Nalini (Founder of the Women's Institute Movement in India). By her husband G. S. Dutt (Indian Civil Service) with a foreward by Rabindra nath Tagore. মূল্য—চার শিলিং ছয় পেন্স। প্রকাশক—Leonard and Virginia Woolf, 52 Travistock Square, London W. C. I

এ বইখানি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় লিখিত তাহার পরলোকগতা পত্নী সরোজ-নলিনীর জীবন-কাহিনী। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলা দেশে, নারী প্রগতির সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্রও সন্ধান রাখেন তাঁহাদের মনে সরোজ নলিনীর স্মৃতি সকলের উপরে জাগরূক। নারী-মঙ্গলের ইতিহাসে ভবিষ্যতে চিরকাল এই মহিমময়ী নারীর কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

নারী জাতির উন্নতি বিধানের গুরুতর পরিশ্রমে সরোজ-নলিনীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং অবশেষে ঐ কারণেই মাত্র সাইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে লিখিত এই সুন্দর জীবন-কাহিনীটি পড়িলে বুঝা যায় কেমন করিয়া শিক্ষা সৎসঙ্গ এবং সহৃদয়তার গুণে ধীরে ধীরে সরোজ-নলিনী মনে প্রথমে স্বদেশপ্রীতি এবং তৎপরে ভারত নারীর সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা জাগিয়া উঠে, অতীতকালের সামাজিক জীবনযাপনের ধারার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বহন করিয়াও কেমন করিয়া তিনি বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের উপযোগী পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার পথ অনুসন্ধান করিয়া লন, কেমন করিয়া তাঁহার স্বকীয় প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ অবলম্বন করিয়া অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি বাহিরে লোক-সাধারণ সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহারই আদর্শে কেমন করিয়া তাঁহার মনে নারী-মঙ্গল সমিতির কর্ত্তব্যপদ্ধতি আকার ধারণ করে।

বাল্যজীবনে সরোজ নলিনী কোনো বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পান নাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাই তিনি উত্তীর্ণ হন নাই। কিন্তু গৃহে আত্মীয়বর্গের নিকট শিক্ষা-লাভের দ্বারা শিক্ষার মহিমা উপলব্ধি করিয়া, এবং নানা দেশ বিদেশে ভ্রমণের ফলে উচ্চশিক্ষিতা নারী জাতির সংসর্গে আসিয়া বঙ্গদেশের নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার মনের মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। প্রচলিত সামাজিক অবস্থায় বাল্য-বিবাহ পদ্ধতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ সহজ নহে জানিয়া বিবাহের পরও মেয়েরা যাহাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সেই চেষ্টারই ফলে বঙ্গদেশ সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই অক্ষয়-কীর্ত্তি বাঙালীর মনে সরোজ নলিনীর স্মৃতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত জাগরূক রাখিবে।

গীতগোবিন্দ

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় অনূদিত। মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক—শ্রীকালিকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১নং নন্দকুমার চৌধুরী লেন কলিকাতা।

এ পুস্তকখানি কবি জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য গীত-গোবিন্দের ছন্দানুবাদ। অনুবাদ বলিলে প্রকৃত পক্ষে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নহে ;—অর্থাৎ, গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভাষানুবাদ নহে, গীতগোবিন্দের গীতগুলির মর্ম্মানুবাদ। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় শক্তিশালী কবি, ভাষা এবং ছন্দের উপর তাঁহার অধিকার প্রভূত, ইচ্ছা করিলে তিনি গীতগুলির ভাষানুবাদ করিতে পারিতেন ; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহা করেন নাই।

অনুবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি মূল প্রবন্ধের অর্থ জ্ঞাপন হয় তাহা হইলে সরল গদ্যে অনুবাদ করাই ভাল, কারণ কবিতায় অনুবাদ করিতে হইলে ছন্দ ও মিলের

অধীনতা স্বীকার করিয়া শব্দ-নিষ্ঠ অনুবাদ করা কঠিন, এবং তদ্বিষয়ে চেষ্টা রাখিতে গিয়া অনুবাদের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করাও সহজ নহে। কিন্তু যেখানে অনুবাদকের প্রধান কারবার রস লইয়া, সেখানে মূল কবিতার শব্দ এবং অলঙ্কারের দাসত্ব করিলে চলিবে না, তাহার স্থূল অংশকে জয় করিতে হইবে। ইক্ষুদণ্ডকে নবমূর্ত্তি দান করিয়া চিনি করিতে হইলে তাহাকে পেষণ করিয়া রস বাহির করিতে হইবে, ছিবড়া শুদ্ধ চূর্ণ করিলে চলিবে না। কালিদাস বাবু তাঁহার অনুবাদে মূলের রস-বস্তুরই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

হয়ত তব চিত অসূয়া নিপীড়িত
তাই কি গেছ দূরে চলিয়া ?
জানিনা কোথা রাই, তুষিতে পারি নাই
'প্রেয়সী ক্ষমা কর' বলিয়া।

* * *

বিলাসরমা তার ফুলশেজ স্মর-শরে
হ'ল শর-শয্যারি তুলা,
তাহাতে শয়ন করি, স'পিছে কঠোর ব্রতে
তব পরিরম্ভের মূল্য।
সুন্দর শোভা সার   বদন কমলে তার
অবিরল ধারা জল ঝরিছে,
হয় তাহে অনুমিত   যেন রাহুচর্ব্বিত
ইন্দুতে সুধাধারা ক্ষরিছে।
কভু নির্জ্জনে ব'সে   মৃগমদে আঁকিছে সে
স্মরের স্বরূপ তব মূরতি,
মকরাঙ্কিত করি   হাতে চূত মঞ্জরী
স'পিয়া করিছে পদে প্রণতি।

* * *

তুমি হ'লে বাম   সাথে সাথে ভানু
বাম হ'য়ে গেল পরপার,
মাধবের মনো-বাসনার সাথে
গাঢ়তর হ'ল আঁধিয়ার।
চখাচখিগুলি বিরহে আকুলি'
বিলাপ করিছে অবিরত,
আমারো কাকুতি তাদেরি মতন,
অভিসার কাল হয় গত।

এরূপ পদ কালিদাস বাবুর অনুবাদে বিরল নহে।

কালিদাস বাবু তাঁহার অনুবাদে প্রধানত বাঙলা ছন্দই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু জয়দেবের ছন্দ এবং শব্দ ঝঙ্কারকে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন দুই স্থলে। প্রথমত সেখানে অর্থ গৌরবের দৈন্যকে ছন্দোহিল্লোলের দ্বারা পূরণ করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে কর্ণের সাহায্যে চিত্তকে ভুলাইতে হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়ত যেখানে মূল কাব্যের আদিরসাত্মক অপরিমিতত্বকে শব্দ কোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে হইয়াছে। এই দুই উদ্দেশ্যেই তিনি সফলতা লাভ করিয়াছেন।

বইখানির বাহ্য সৌষ্ঠব দেখিয়া বুঝা যায় প্রকাশকগণ বইখানির মুদ্রণ ব্যাপারে অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রতি পাতায় সমস্ত পাতা জুড়িয়া ফিকা রঙিন কালিতে বৃন্দাবন-লীলার একখানি করিয়া ছবি মুদ্রিত করিয়া তাহার উপর গীতগুলি ছাপা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চৌদ্দখানি বহু-বর্ণ এবং বারোখানি এক বর্ণ পূর্ণপৃষ্ঠ চিত্র বইখানিতে সংযোজিত হইয়াছে। সমস্ত ছবিগুলি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ছবিগুলির অধিকাংশই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বই খানি মূল্যবান পুরু রঙিন কাগজে মুদ্রিত এবং বাঁধাই মনোরম।

সবদিক দিয়াই বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

স্থির বিদ্যুৎ

রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

জগদানন্দ বাবুর এই বই পড়িয়া বাস্তবিক আনন্দ লাভ করিলাম। সরল ভাষায় এরকম বৈজ্ঞানিক বই সচরাচর নজরে পড়ে না। বাজারে দুই একখানি যা' বই আছে, সেগুলির ভাষা এমন দুর্ব্বোধ্য যে, দেখিলেই মনে হয় যেন কোনো মতে একটা ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক হইতে তরজমা করা হইয়াছে। জগদানন্দ বাবুর বই খুব সহজে কোথাও কিছুতে না আট্‌কাইয়া একবারে সবটা পড়িয়া ফেলিতে পারিয়াছি।

আকাশে বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার সিম্পসনের (Simpson) মতবাদ দিয়াছেন দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। তিনি গতানুগতিক ভাবে সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে যে-টুকু থাকে শুধু সেইটুকু না লিখিয়া আধুনিক মতবাদেরও আলোচনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার বইখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে। পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রনের (Electron) কথা আলোচনা করিয়া খুবই ভাল করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সব আধুনিক গবেষণার ফল আমাদের দেশে আই-এস্-সির জন্য নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকে আজও স্থান পায় নাই।

আমার মতে "বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসে", এই আধ্যায়ে ধন ও ঋণ-বিদ্যুতের পুরাতন মতবাদের কোনও অবতারণা না করিয়া ইলেক্‌ট্রনই হইল বিদ্যুতের পরমাণু এই দিক হইতে বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হইত। দেখিয়াছি যে, পুরাতন মতবাদের কথা একবার বলিলে তাহা ছেলেদের মাথায় এমন প্রবেশ করে যে, নূতন মতবাদ তাহারা সহজে বুঝিতে চায় না।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গঠিত পরিভাষার অধিকাংশই বেশ ভাল হইয়াছে। কেবল দুইটা সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। ইলেক্‌ট্রনের তরজমা "বিদ্যুতিন্" করা হইয়াছে অন্যত্র দেখিয়াছি। কথাটা মন্দ লাগে না। আমি নিজেও এই পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছি। Wireless Telegraphyকে গ্রন্থকার "তারহীন টেলিগ্রাফ্" বলিয়াছেন। একটু যেন কটমটো শুনায়। আজকাল Wirelessএর বদলে "বেতার" কথাটা খুব চলিয়া গিয়াছে। "বেতার টেলিগ্রাফ্" বলিতে আপত্তি কি?

পুস্তকের ছবিগুলির বিভিন্ন অংশ A, B, C, ইত্যাদি ইংরেজি অক্ষর দিয়া গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিলেন কেন? অন্য যে-সব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বাংলা বই আছে, সেগুলিতেও প্রায়ই এই রকম থাকে। সে সব বইয়ে এত অন্য দোষ থাকে যে, সেগুলির তুলনায় এই ত্রুটি নজরে পড়ে না। কিন্তু গ্রন্থকারের এই পুস্তকখানিকে বাংলা বৈজ্ঞানিক পুস্তকের আদর্শ বলা যাইতে পারে। এরূপ পুস্তকের পৃষ্ঠায় নক্সা/ও ছবিতে ইংরেজি হরফ বড় চোখে বাজে। বোধ হয় ইংরেজি বইয়ের ছবি হইতে ব্লক্ করা হইয়াছে বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইংরেজি বইয়ের ছবি না লইয়া স্বাধীনভাবে ছবি আঁকাইয়া তাহা হইতে ব্লক্ করাইলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র
সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা

আচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাও নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের "চুম্বক" ও "স্থির-বিদ্যুৎ" পাঠে আমি যথার্থই খুসি হইয়াছি। এমন সরস ও সরল ভাষায় "চুম্বক ও বিদ্যুতের" জ্ঞাতব্য প্রকৃতি অন্য কোন বাঙ্গালা বইয়ে লেখা নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা পার হইয়া তবে বাঙ্গালীর ছেলে যাহা ইংরেজির সাহায্যে কষ্টে আয়ত্ত করে, এখন তা'র অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা সেগুলিকে সহজে জানিতে পারিবে।

এই রকম বই সব্ স্কুলেই পড়ান উচিত। আশা করি রায় মহাশয় পদার্থ-বিজ্ঞানের এই রকম আরো বই লিখিয়া বাঙ্গালীর জ্ঞান লাভের পথ সুগম করিয়া দিবেন।"

ওমর খৈয়াম

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩৬ সাল ১৬৪ পৃষ্ঠা।

মুসলমান যুগে আমাদের দেশে হিন্দুরাও অনেকে ফার্শী ভাষা জানিতেন ও ফার্শী সাহিত্য পড়িতেন। শেখ সাদী ও হাফেজের কাব্যপিপাসু এদেশেও বড় কম ছিল না। কিন্তু ওমর খৈয়াম তাঁহার নিজের দেশের মত ভারতবর্ষেও বেশী আদৃত হন নাই, যদিও সম্রাট আকবর নিজে তাঁহার রুবাইয়ের খুবই ভক্ত ছিলেন। আজ এতগুলি শতাব্দীর পর ইয়োরোপের দু'শ বছরের

চেষ্টায় দেখা দেখি আমরাও ওমরকে সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি অনুবাদ বাংলায় হইয়াছে।

জগতের কবি-সভায় ওমর তাঁহার নিজস্ব স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার কাব্যের "আধুনিকত্ব আজ পর্য্যন্ত অপরিম্লান।" "জীবনের পথে ওমর খৈয়াম বেপরোয়া পথিক; মৃত্যু ও নির্ব্বাণের প্রতি নির্ভীক তর্জ্জনী হেলন করিয়া জীবনের দান গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন"—এই জন্যই বোধ হয় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তিনি কোন ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই, তাই আজ বিশাল বিশ্বে তাঁহার স্থান হইয়াছে—ইস্‌লামের প্রভাবের মধ্য হইতেই তিনি বিশ্বের গান ও ভূমার সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকায়ত পদের ন্যায় ওমরের কাব্যেও পৃথিবীকে ভোগ করিবার আহ্বান অতি সুস্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু ওমর যে পিয়ালাবিলাসী ছিলেন না তাহা তাঁহার জীবনের অন্যান্য দিকগুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। "এমন কি, দৃশ্যতঃ তাঁহার কাব্যের আকার ঐহিক-ভোগসুখপ্রধান মনে হইলেও, উহা কবির অন্তরের প্রতিচ্ছবি কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়।" "যাঁহারা 'ওমর' বলিতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, মদিরা ও সাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে লোকটা কবি ও ভোগী মাত্র ছিল না,—কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিক।" তাঁহার কবিতার মূল সুর ও আসল রহস্য বুঝিতে হইলে তাঁহার চরিত্র আলোচনা করা দরকার। এতদিন আমরা তাহার সুযোগ পাই নাই। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থে ওমরকে সমানভাবে দেখিবার ও বুঝিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত স্যর যদুনাথ সরকার যাহা বলিয়াছেন আমরাও তাহা স্বীকার করি—"ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায়বিচার করিবার জন্য আমরা লেখকের নিকট ঋণী।"

কিন্তু ওমরকে বোঝা বড় সহজ কাজ নয়। তিনি সেকালের পারস্য দেশ এবং ইস্‌লামধর্ম্মীদের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী ছিলেন। তিনি গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, গ্রীক্ দর্শন ও আরবীয় বিদ্যা প্রভৃতি শুধু যে জানিতেন তাহা নয়, ঐ সব বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। এই সব প্রভাবের যাহা ফল হইবার সম্ভাবনা তাহা তাঁহার চরিত্রে হইয়াছিল, ইহার উপর তিনি সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ছাড়াইয়া উঠিয়া কবিরূপে চিরকালের জন্য মধুচক্র গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থে ওমরকে বুঝাইবার জন্য আরব সভ্যতার বহু বিভাগের যে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। অথচ লেখার গুণে বইখানা মোটেই দুর্বোধ্য বা অরুচিকর হয় নাই। ওমরের কাব্য সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে তাহা খুব সুখপাঠ্য হইয়াছে, মাঝে মাঝে রুবাইয়ের চমৎকার অনুবাদ থাকায় বক্তব্য অতি পরিষ্কার হইয়াছে। কবি ও তাঁহার সমাধির চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ গ্রন্থদ্বারা পারস্য ও ইস্‌লাম সভ্যতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িবে এবং অন্যান্য সভ্যতার সহিত উহাদের কিরূপ আদান প্রদান চলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আর, যাঁহারা শুধু ওমরের কবিতা পড়েন তাঁহাদের এই গ্রন্থ পড়িয়া দেখা দরকার, তাহা না হইলে তাঁহার প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা দেখানো হইবে না।

শ্রীর

যুগান্তরের কথা

শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর গুরুতর অসুস্থতা বশতঃ তাঁহার উপন্যাস 'যুগান্তরের কথা' এ মাসে প্রকাশিত হইল না। ভগবানের কৃপায় উপস্থিত তিনি কিছু ভাল আছেন, সুতরাং আগামী সংখ্যায় তাঁহার উপন্যাস প্রকাশিত হইবে বলিয়া ভরসা করি।

নানা-কথা

শিল্পের স্বাধীনতা

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউস অলঙ্করণের জন্য চার জন বাঙালী শিল্পী (১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন ২। শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকিল ৩। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ম্মণ ও ৪। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী) নির্ব্বাচিত হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন, এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারকে লিখিত পত্রে এবং শ্রীযুক্ত ই, বি, হ্যাভেল মহাশয় রূপকের সম্পাদককে লিখিত পত্রে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেম্‌নি মূল্যবান। ইণ্ডিয়া হাউস ডেকোরেশনের জন্য মোট চার জন শিল্পীর প্রয়োজন ছিল, এবং সমগ্র ভারতের শিল্পীদের প্রতিযোগিতায় যে চার জন অবশেষে বিলাতের রয়াল কলেজ অফ্ আর্টস্-এর প্রিন্সিপাল অধ্যাপক রোটেন্‌ষ্টাইনের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাঙালী, এ কথা বাঙালীর পক্ষে গৌরব করিবার বিষয়। তদ্ভিন্ন, এই বাঙলা দেশ পাশ্চাত্য শিল্পধারার নাগপাশ হইতে ভারত-শিল্পকে উদ্ধার করিয়া জগতের সম্মানের আসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই নির্ব্বাচনের মধ্যে সে কথারও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দুইটি দিক ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ এবং হ্যাভেল সাহেবের মতের সহিত ঐক্য আছে। যে কোন কারণেই হউক শিল্পীকে যদি নিজ আদর্শ এবং কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অপরের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, শিল্পের নিরঙ্কুশ রাজ্যেও যদি স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুযোগ না থাকে ত তদপেক্ষা গ্লানির কথা আর কি হইতে পারে ?

পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য আমরা নীচে রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ এবং হ্যাভেল সাহেবের চিঠিখানি মুদ্রিত করিলাম।

কল্যাণীয়েষু—

অসিত, ...

... ...

আমাদের ছাত্রেরা ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপ-মারা হ'য়ে আসে এ আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। তার ফল হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে সেটার উপরে দাগা দিয়ে দেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোটেন্‌ষ্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আঁস্তাকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য। ব্রিটিশ ইস্কুল মাষ্টারের ছাত্রগিরি তো করচিই—সেই ইস্কুলের বাইরে একটা বড়ো আঙিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটি—সেইখানেই আমাদের ভারতীর দরবার—সেখানে তিনি যার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্য। সাউথ্ কেন্সিংটন স্কুল অফ আর্টসের ফোঁটায় গৌরব নেই—বরঞ্চ তাতে আমাদের সরস্বতীর অমর্য্যাদা করা হয়। এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে, কিন্তু ইতিহাসে চিরদিনের মতো লেখা থাকবে যে তারা ইংরেজ গুরুমশায়ের চেলা—এই ঘোষণায় আমাদের দেশেরই অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিস্ট্ যদি নিজের দৈবীশক্তির অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপরে কখনোই ভারতীর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

রবিদাদা

To the Editor of Rupam.

Sir,

You ask my opinion of the scheme for the decoration of India House, London. I have no doubt that the intention is good, and that under Professor Rothenstein's direction the scheme proposed has some chance of success. But there are so many better ways of helping Indian artists in their own country that I think it is a pity that money should be spent in this way which could be used to much greater advantage in India.

As to the scheme itself, everything depends upon the test of "real ability," which is apparently to be imposed by a departmental committee in India, and I have very little faith in departmental tests of artistic capacity. What exactly is meant by "the teachings of Western art," which Indian artists must absorb before they are considered qualified to decorate India House? There are dozens of schools of Western art, ancient and modern. Are Indian artists not to be allowed a free choice of the school which appeals most to their own artistic consciousness, or must they be strictly drilled to follow an official prescription of art?

A real Indian artist would find himself in perfect followship with Cimabue and Giotto, here at Assisi, but apparently he must submit himself to the teachings of Modern British Academicians if he is to have any chance of recognition at New Delhi. Cimabue and Giotto would have felt quite at home in the Old Delhi. In the new Delhi neither of them would pass the dedartmental test.

So long as art is departmentally starved to death in India, an official banquet in London must always seem rather a mockery, even though the most distinguished European chefs prepare the menu.

Yours faithfully,

E. B. Havell.

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

ডাক্তার শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি লণ্ডন ইউনিভারসিটি হইতে প্রাণীতত্ত্বে D. Sc. উপাধি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ১৯২৪ সালে কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে M. Sc. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯২৬ সালে অগষ্ট মাসে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। লণ্ডন Imperial College-এ Prof. MacBride, F.R.S.-এর নিকট মৌলিক গবেষণা করিয়া এক বৎসরের মধ্যে Diploma of the Membership of the Imperial College (D. I. C.) পান। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্য উপর্য্যুপরি দুইবার Sara Marshall Scholarship পান। ইঁহার আগে কোনও ভারতীয় ছাত্র প্রাণীতত্ত্বে Marshall Scholarship পান নাই, এবং ইউরোপীয় ছাত্রেরাও কেহ দুইবার পান নাই। Marshall Scholarship ১৮৯২ সাল হইতে দেওয়া হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত বৎসর ইঁহাকে Sir Rashbehari Ghosh Travelling Fellowship দেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post Graduate বিভাগে আছেন এবং মৌলিক গবেষণার দ্বারা আশা করি দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

আগামী সরস্বতী পূজার সময়, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৭ই মাঘ, রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া তিনদিন দক্ষিণ-কলিকাতাবাসিগণের উদ্যোগে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইবে। সম্মেলনের সুব্যবস্থার জন্য একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মেলনের এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন মহোদয়গণ যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পি চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীযুক্তা কামিনী রায় অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলির প্রকৃত আলোচনা সম্ভবপর করার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন; সুতরাং আগামী পৌষ মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে যাহাতে প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার অভ্যর্থনা সমিতির হস্তগত হয় এই পত্রের দ্বারা অভ্যর্থনা সমিতি প্রবন্ধাদি লেখকগণকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন। সম্মেলনের সময় সাহিত্যের ও কারু-শিল্পের পরিপোষক একটি প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সম্মেলন সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ ও পত্র ব্যবহার—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড ভবানীপুর ঠিকানায় করিলে হইবে।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা "কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের" কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কারখানা বালিগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং বিস্তৃত জমির উপর আধুনিক করাসী দেশীয় যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত।

ইহাতে সকল প্রকার গায়ে মাখা ও কাপড় কাচা সাবান এবং অন্যান্য প্রসাধনের সামগ্রী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। সুবৃহৎ কটাহে তৈলাদি দ্বারা সাবান প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া পরিশেষে কিরূপে এক একখানি সুদৃশ্য সাবান ছাপিয়া বাহির হইতেছে তাহা কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। সাবানের গঠন ও বাক্সগুলির আকার সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ। এই কারখানা দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তাঁহারই কতিপয় ছাত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। শুনিলাম রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত সাবান বাজারে বাহির করা হয় না। গায়ে মাখা সাবানের নামগুলি দেশী পুষ্পাদির অনুসারে দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক সাবানের যে ফুলে নাম তাহার গন্ধও সেই ফুলের গন্ধের অনুরূপ। এই কারখানার বিশেষজ্ঞরা প্রয়োজন মত গন্ধ মিশাইয়া লন, বিলাতি গন্ধ কিনিয়া ব্যবহার করেন না।

এরূপ সুবৃহৎ দেশী কারবারের আমরা সর্ব্বতোমুখী উন্নতি কামনা করি।

রচনা প্রতিযোগিতা

কলিকাতা যদুনাথ সেন লেনের কুমার লাইব্রেরী এণ্ড্ ফ্রি রীডিং রুমের কর্তৃপক্ষ সাতটি বিভিন্ন বিষয়ের রচনা প্রতিযোগিতার সাতটি পদক দিতে স্থির করিয়া তদ্বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত এবং নিয়মাদি আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

(১) ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিপদক। বিষয়—শরৎচন্দ্রের বস্তুতান্ত্রিকতা। (২) অমৃতলাল বসু স্মৃতি-পদক। বিষয়—রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা (৩) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিপদক। বিষয়—রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার গীতি-নাটক (৪) ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিপদক। বিষয়—বঙ্কিম চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস (৫) দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিপদক। বিষয়—শরৎচন্দ্রের নারী (৬) তিনকড়িবালা স্মৃতিপদক। বিষয়—সত্যেন্দ্র প্রতিভা (৭) সত্যকুমার দত্ত স্মৃতিপদক। বিষয়—রবীন্দ্রনাথের দেশ। (উপরি উক্ত সকল পদকগুলিই স্বর্ণ-মধ্য রৌপ্যপদক)

নিয়মাবলী:—(১) সর্ব্বসাধারণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। (২) প্রত্যেকটি রচনা পৃথক একসার-সাইজ খাতায় লিখিতে হইবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা নিষেধ। (৩) লাইব্রেরীর রচনা প্রতিযোগিতার সব্-কমিটির দ্বারা নিযুক্ত পরীক্ষকগণের মতকে গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইবে। (৪) যে কোন মাসিক বা সংবাদপত্রে পুরস্কৃত রচনাগুলি ছাপাইবার অধিকার লাইব্রেরীর থাকিবে। (৫) পুরস্কৃত রচনাগুলি কোন মতেই লেখকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। (৬) উপযুক্ত ডাক টিকিট না থাকিলে লেখকগণকে অমনোনীত রচনাগুলি ফেরৎ পাঠানো হইবে না। (৭) রচনাগুলি বাংলায় লিখিতে হইবে এবং ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ তারিখের পূর্ব্বে কলিকাতা যদুনাথ সেন লেনস্থ কুমার লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রীডিং-রুমের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বৈদ্যুতিক তার বাতির জুবিলী

যে বৈদ্যুতিক বাতি বর্ত্তমান কালে পথে ঘাটে, গৃহে অফিসে, ট্রামে বাসে, এমন কি জামার বোতামে এবং হাতের আংটিতে জ্বলিতেছে, গত ২১শে অক্টোবর পৃথিবী ব্যাপিয়া তাহার পঞ্চাশ বৎসরের জুবিলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে সর্ব্ব দেশের গবর্মেণ্ট এবং প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি যোগদান করিয়া তার বাতির উদ্ভাবক টমাস আল্‌ভা এডিসনকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইউ-নাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ গবর্মেণ্ট এতদুপলক্ষে যে যাদুকর তিমিরাচ্ছন্ন রজনীকে দিবসে পরিণত করিয়াছেন তাঁহার মূর্ত্তি-অঙ্কিত ডাক-টিকিট বাহির করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাসমাগমে পথের মোড়ের পান-ওয়ালা ইচ্ছা হইবা-মাত্র একটি বোতাম টিপিয়া যে উজ্জ্বল আলোক আজ জ্বালিয়া লইতেছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে তাহার ব্যবস্থা অথবা বৈজ্ঞানিকের মাথায় তাহার কল্পনা ছিল না। ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ২১শে অক্টোবরে এডিসন তাঁহার নিউ জেরসির ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে কাজ করিতে করিতে একটি কাঁচের ফানুষে একটু অঙ্গার-ভূত সুতা প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন তাহা তাপোজ্জ্বল হইয়া চল্লিশ ঘণ্টা কাল শিখা-বিহীন আলোক প্রদান করিল। এই হইতে ভবিষ্যতের ইন্‌ক্যাণ্ডিসেণ্ট্ ল্যাম্পের কল্পনা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেই সময়ের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারকে এডিসনের অভিপ্রেত কাজে খাটানো অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অনেক উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এডিসন তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া কোন্ বস্তু বেশি উজ্জ্বল আলোক দিবে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে তদ্বিষয়ে পরীক্ষায় রত হইলেন। গ্রীষ্মকালে একদিন পাখা লইয়া হাওয়া করিতে করিতে সহসা তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, পাখার ধার হইতে কতকগুলি বাঁশের তন্তু (ফেঁসো) ঝুলিতেছে; টানিয়া দেখিলেন সেগুলি বেশ শক্ত। তখনই একটি বাঁশের সুতাকে অঙ্গারে পরিণত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহা চমৎকার আলোক দিতে সমর্থ এবং দীর্ঘ-কাল স্থায়ী। ইহার পর তিনি ভাল বাঁশের জন্য পৃথিবী-ব্যাপী অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এইরূপে যাহা সূত্রপাত হইয়াছিল, উন্নতির পর উন্নতির ফলে বর্ত্তমানে তাহা অত্যুজ্জ্বল যথেচ্ছব্যবহারের উপযোগী সুলভ তার বাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুখের বিষয় এডিসন এখনও জীবিত আছেন এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত তাঁহার ক্ষারময় তাপোজ্জ্বল সুতার বর্ত্তমান বিস্ময়-জনক পরিণতি দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিতেছেন।

Printed at the Susil Printiug Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

ভিক্ষাপ্রার্থী বুদ্ধ

বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

তৃতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সীমা ও অসীমতা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হ'তে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই সীমাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলা। বিধাতার আনন্দ-বিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বেঁধে তুলচে। কর্ম্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলি স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করচে।

ধর্ম্মও মানুষের মনুষ্যত্বকে তার সত্যসীমার মধ্যে স্ফুটতর ক'রে তোলবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয়, যতই সুব্যক্ত হয় ততই তা সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে; মানুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে—মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হয়ে ওঠে।

ধর্ম্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজ্‌চে, অথচ সেই ধর্ম্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজ্‌চে? এইটেই আশ্চর্য্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখ্‌তে পাই। যা ছোট করে তাই বড় করে, যা পৃথক ক'রে দেয় তাই এক ক'রে আনে, যা বাঁধে তাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করতে থাকে। বস্তুত এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হ'য়ে মিলেচে সেখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাদের বিচ্ছেদ ঘ'টে একটা দিকই প্রবল হয়ে ওঠে সেখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করেনা সেখানে তা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দ্দেশ করেনা সেখানে তা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তা উন্মত্ততা—বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানেনা সেখানে তা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলেচে। কিন্তু আসল কথা এই, অসীম হ'তে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেম্‌নি এ কথাও সত্য, সীমা হ'তে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েচে সে গান কেবলমাত্র সুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না—সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়কে ব্যক্ত করে। গোলাপফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করেচে ব'লেই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ, কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাকে একদিকে বেঁধেচে আর একদিকে ছাড়িয়েচে।

এইজন্যই দেখতে পাই মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করতে শিখলেই তবে চলতে পারে—ভাবনাকে বাঁধতে পারলে

তবেই ভাবতে পারে। সেই কারিকরই সুনিপুণ যে কর্ম্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জেনেচে এবং মেনেচে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পেরেচে যে তাকে সংযত করেচে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে মানুষ পবিত্রচিত্ত অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্যসীমায় বেঁধেচে সেই তাঁকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্ম্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হয়েচে, বলা হয়েচে ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হ'ত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন ক'রে চলতে পারত—কারো কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকত না। কিন্তু সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হচ্চে। এইজন্যই উপনিষদে আছে তিনি তপস্যার দুঃখের দ্বারাই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করেচেন।

কবি কীট্‌স্ বলেচেন, সত্যই সৌন্দর্য্য এবং সৌন্দর্য্যই সত্য। সত্যই সীমা; সত্যই নিয়ম; সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হয়েচে; এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটলে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ ক'রে দেখি তবে মানুষের ধর্ম্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নেই যার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতই মিথ্যা।

কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম মানুষকে বলচে তুমি আপনার সীমাকে পেলেই অসীমকে পাবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হবে। এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলেচেন, ইনিই এর পরমাগতি, ইনিই এর পরমাসম্পৎ, ইনিই এর পরম আশ্রয়, ইনিই এর পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই, একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখী একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তা আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয়কে নইলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরিয়ে দিয়েচে। অমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেচে। এবং সেই ভয়ঙ্করকে বশ করবার জন্যে ভয়গ্রস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র, আচার অনুষ্ঠান, পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হয়েচে। কিন্তু মানুষ যখন তাঁকে অন্তরতর ক'রে জেনেচে তখন তার ভয় ঘুচেচে—এবং মধ্যস্থকে সরিয়ে দিয়ে প্রেমের যোগে তাঁর সঙ্গে মিলতে চেয়েচে।

মানুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্নাম দিয়ে গালি পাড়তে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন ক'রে ও সংসারকে পরিত্যাগ ক'রে অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে সীমা জিনিষটা যেন তার নিজেরই জিনিষ, অতএব মুখে চুণকালী মাখালে সেটা আর কারো গায়ে লাগে না। কিন্তু মানুষ এই সীমাকে কোথা হ'তে পেল? এই সীমার অসীম রহস্য সে কিইবা জানে? তার সাধ্য কি সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে!

মানুষ যখন জানতে পারে সীমাতেই অসীম তখনই মানুষ বুঝতে পারে এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব,—আর যিনি মানুষের ভগবান এই গৌরবেই তাঁরও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করেচেন এবং আপনাকে গ্রহণ করচেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, এম-এ,

Docteur-es-Lettres (Paris).

আমাদের এই ভারত-রোমক সমিতিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা চল্‌ছে ও আজ এ বিষয়ে বল্‌বার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। যদি আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের সম্পূর্ণ বাইরে থাক্‌তাম, তাহ'লে বোধ হয় এ বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'ত। আমরা, আধুনিক ভারতবাসীরা, এই দুই প্রভাবের মধ্যেই বেড়ে উঠেছি, ও প্রত্যেকেই আপনার অজ্ঞাতে এই দুই সভ্যতার বিচার করে' প্রত্যেকটি থেকেই কিছু অর্জ্জন ও কিছু বর্জ্জন করেছি। এই অর্জ্জন বর্জ্জন ক্রিয়াটির মূল তত্ত্বটিকে আজ আমরা যুক্তিতর্কের কষ্টি-পাথরে ক'ষে দেখ্‌তে চাই। আমরা যে এই দুই সভ্যতার প্রভাবের ভিতরই বড় হ'য়েছি তাতে এ বিষয়ে আমাদের একটা বিশেষ যোগ্যতা হ'য়েছে ব'লে আমার মনে হয়। সভ্যতা গ্রহণ ক'রে মানসিক পুষ্টি সাধন কার্য্যটা খাদ্যগ্রহণ করে' শারীরিক পুষ্টি সাধনের মত জটিল ব্যাপার। রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষার দ্বারা খাদ্য বিশ্লেষণ করে' আদর্শ খাদ্যে যে উপাদান যে পরিমাণে থাকা উচিত তা' নির্দ্দেশ করে' দেন। কিন্তু ওজন করে সেই উপাদান গ্রহণ করলেই শরীর রক্ষা হয় না, এ কথা সকলেই জানেন। আজকাল আবার রসায়নের মধ্যে অবাঙ্মানসগোচর অনুভবসিদ্ধ "ভিটামিন্"এর আবির্ভাব হ'য়ে ব্যাপারটা জটিলতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রসায়নের সকল বিশ্লেষণকে বিদ্রূপ করে এমন দুটি বস্তু আছে,—মানুষের জিহ্বা ও মানুষের উদর; আর এই দুইটির কঠিন পরীক্ষায় পাশ না করলে কোন খাদ্যই আমাদের পুষ্টি সাধন করতে পারে না। খাবার বস্তু তাই শুধু পুষ্টিকর হ'লেই চলে না, রসনার তৃপ্তিকর হওয়া চাই ও সুপাচ্য হওয়া চাই; নচেৎ আমাদের অন্তরের রসলোলুপ প্রাণীটি রাসায়নিক উপাদানের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যেও বুভুক্ষু থেকে যায়। কোন সভ্যতার গ্রহণ বা ত্যাগের মধ্যেও এইরূপ অনিবার্য্য একটি বিচারকার্য্য আছে ও ইহা সকল যুক্তিতর্ককে অতিক্রম করে। সাধারণ ভাষায় বল্‌তে গেলে কোন বিদেশী সভ্যতা জাতের ধাতে সওয়া চাই। দুষ্পাচ্য সভ্যতা যতই উত্তম হ'ক, যদি জাতের ধা'তে না সয় ত জোর ক'রে গলাধঃকরণ করলে জাতের স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী, ও বেশী দিন ধরে বেশী জোর করলে জাতির ধ্বংসও হ'তে পারে। তাই বল্‌ছিলাম যে, এই দুই সভ্যতার প্রভাবের বাইরে থেকে বিচার কর্‌লে হয়ত আমাদের যুক্তি ন্যায়ের দোষ বাঁচিয়ে খুব নিখুঁত হ'ত, কিন্তু সে বিচার শুষ্ক নৈয়ায়িকের বিচারই থাক্‌ত। আমরা আমাদের মনের প্রতি শিরায় এই দুই সভ্যতার স্পন্দন অনুভব কর্‌ছি ও সময় সময় তাদের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছি। দিনে দিনে এই দ্বন্দ্ব এতই তীব্র হ'য়ে উঠছে যে, ইহাদের কতটা রক্ষা করা ও কতটা বিসর্জ্জন দেওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল সে মীমাংসা দুনিবার হ'য়ে উঠেছে। আমাদের মত কয়েক শতাব্দী ব্যাপি অভিজ্ঞতার ফলে কতকটা বল্‌তে পারি আমাদের ধা'তে পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা সয়।

পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আস্‌ছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই এই পরিচয় আছে দেখা যায়। কিন্তু এক মাকিদনীয় আলেক্‌জাণ্ডারের অভিযান ব্যতীত প্রাচীনকালে এ পরিচয়ে কখনও ভক্ষ-ভক্ষকের রুদ্র পরিচয় ছিল না। প্রাচ্যের সভ্যতা, শিল্প, জ্ঞানসম্ভার চিরকাল পাশ্চাত্যে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করে এসেছে। কিন্তু যে দিন থেকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জেতা-বিজিতের সম্বন্ধ

[ভারত-রোমক সমিতির (Union Indo-Latine) ১৩৩৬ সালের ১১ই আশ্বিনের (27th September, 1929) অধিবেশনে পঠিত।]

দাঁড়িয়েছে, সেই দিন থেকেই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। যে জাতি বাহুবলে ভারত জয় করেছে তার উন্নতির মূলে যে তার উচ্চতর সভ্যতা আছে এ ধারণা স্বভাবতই বিজেতার মনে উঠে ও বিজিতরাও ক্রমে ইহা সত্য বলে' গ্রহণ করে। আজ কালকার যে কোন ছাত্রকে প্রশ্ন করলেই বোঝা যাবে যে, প্রাচ্য সভ্যতার তুলনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষ তারা বাল্যকাল থেকে স্বতসিদ্ধ বলেই জানে, ও এ বিষয়ে যে, কোন বিচারের প্রয়োজন বা অবসর আছে তা' তারা স্বীকার করতেই প্রস্তুত নয়। ফলে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক্ পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে যা' বোঝে তার অনুকরণ প্রাণপণে করে, ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি যদি এই অনভ্যস্ত ও অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতিশোধ নেয়, ত তারা অনুকরণটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নি বলেই ব্যাঘাতটা ঘটল ব'লে পরম শান্তিতে পরমধামে প্রস্থান করে।

এই তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ এখনও সমান বেগে চলেছে, কিন্তু তা'র ভঙ্গীটা এমনই মারাত্মক রকম বদ্‌লাতে সুরু করেছে যে, অনেক সময় তা'কে অনুকরণ বলে' চেনা দুঃসাধ্য ও যাঁরা অনুকরণ কর্‌ছেন তাঁরাও ভাল করে' বোঝেন না যে অনুকরণ কর্‌ছেন। তাঁদের মনের প্রকৃতিটাই এত পাশ্চাত্য হ'য়ে গেছে (অবশ্য যাকে তাঁরা পাশ্চাত্য বলে' মনে করেন) যে, এই অনুকরটাকে অনুকরণ বলে' বোঝা তাঁদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

যেমন লোকে যা'কে উচ্চতর বলে' মনে করে তা'র অনুকরণ করে, তেমনই যাকে হীন মনে করে তার প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে। পাশ্চাত্য জীবনের অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রাচ্য সভ্যতা ও আদর্শের উপর অশ্রদ্ধাও অবজ্ঞা ক্রমশঃই গভীরতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। প্রাচ্য সভ্যতার আলোচনা ও জ্ঞান ক্রমে লোপ পাচ্ছে। আধুনিক কালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা বা স্বদেশপ্রীতি কতটা পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও কতটা প্রাণের দরদের বস্তু তা' ভবিষ্যতই বলতে পারে। যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ আমরা কর্‌ছি, তা'র বহিরঙ্গটুকুর উপরই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ; ও ইউরোপের বেশভূষা, আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানগুলি অনুকরণ কর্‌তেই আমাদের জাতের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে। একজন সাধারণ লোকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, সকল সাধনা ও সকল সাফল্যের হিসাব নিলে, এই প্রাণহীন অন্ধ অনুকরণে যে কিরূপ ভীষণভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির অপচয় হচ্ছে তা' প্রকট হ'য়ে ওঠে।

অনেকে বল্‌বেন যে, সম্প্রতি সুর ফিরেছে, আমরা স্বদেশী হয়েছি, ও বিদেশী বস্তু, এম্‌নকি তা'র ঔষধপত্রও ত্যাগ ক'রে শাকপাতা খেয়ে কৌপীন পর্‌তে সুরু করেছি। কেহ কেহ যে এইরূপ উৎকটভাবে প্রাচ্যের গৌরব রক্ষা কর্‌তে চান তা' সত্য। কিন্তু আমার কাছে এ ব্যাপারও সমান ভয়াবহ বোধ হয়।

রাক্ষুসে ক্ষুধা ও প্রবল বমনেচ্ছা উভয়ই প্রবল অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা এতই উগ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে নূতন ভোজ্য সাম্‌নে পেয়ে নির্ব্বিচারে সমস্তই গলাধঃকরণ করেছি ও চিরন্তন অভ্যস্ত খাদ্যকে দু' পায়ে দ'লে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি; আর এখন তার প্রতিক্রিয়ার ফলে এই মনোরম নূতন ভোজ্যকে নির্ব্বিচারে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেই পদদলিত পর্য্যুসিত অন্ন খাবার জন্য লালায়িত হয়েছি। এই দৃশ্যের অসীম গ্লানি আমার কাছে দুঃসহ বোধ হয়। পৃথিবীর চোখে, ভবিষ্যৎযুগের চোখে, আমরা আর কতদিন এই ঘৃণিত, লজ্জাকর ও হাস্যকর বিদূষকের অংশ অভিনয় কর্‌ব? যে বীরপুরুষ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর গ্রীষ্মে আপাদকণ্ঠ জামা জোব্বা জড়িয়ে দুষ্পাচ্য মাংস ও দ্রবীভূত অনলে উদর পূর্ণ ক'রে অর্দ্ধোলঙ্গ নারীর কটি বেষ্টন ক'রে নৃত্যাগারে নৃত্যের নামে উৎকট জিম্‌নাষ্টিক কর্‌তে কর্‌তে সন্ন্যাসরোগে ভবলীলা সাঙ্গ কর্‌বেন, আর যে মহাপুরুষ কৌপীনসার ও ফলাহারী হ'য়ে কঙ্কালসার দেহে চরখা হাতে নগরে নগরে প্রাচ্য সভ্যতার অভ্রভেদী মহিমা কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে 'ভাবাবেশে 'ভবলীলা সাঙ্গ কর্‌বেন, এই উভয়েই ভবিষ্যদ্বংশীয়ের চোখে কিরূপ প্রতীয়মান হবেন ভাব্‌তে লজ্জায় মাটির তলে মিশিয়ে যেতে হয়। যদি আমরা আমাদের সভ্যতার আলোচনা শ্রদ্ধার সহিত

সরল ভাবে (শুধু গবেষক ব'লে সুলভ করতালির লোভে নয়) সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে না করতে পারি, যে সকল বিধি ব্যবস্থা অনিষ্টকর মনে করি তা' ত্যাগ না করতে পারি, ও যেগুলি শুভ ব'লে মনে করি তা' দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা না করতে পারি, ত আমাদের ধ্বংস যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। এই সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে আমাদের নূতন বস্তু অর্জ্জন করতে হ'বে। তপোমগ্ন ধূর্জ্জটির মত আত্ম-সমাহিত হ'য়ে ব'সে থাকলে আর চলবে না। বিশ্বজগৎ তা'র বিচিত্র পণ্য নিয়ে আমাদের দ্বারে উপস্থিত,—তা'র সভ্যতা, তা'র দর্শন, তা'র বিজ্ঞান, তা'র সমাজ, তা'র নীতি, তা'র ছলাকলা, তা'র হাবভাব। এ প্রবল অতিথি; সৎকার না পেলে দুর্ব্বাসার মত শাপ দিয়ে চ'লে যাবে না, দ্বার ভেঙে আতিথ্য গ্রহণ করবে ও হয়ত গৃহস্থকে বিদায় ক'রে দেবে। একে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হ'বে ও এর প্রাপ্য আসনে বসাতে হ'বে। আর এ যদি দুষ্প্রাপ্য সম্মানের দাবী করে ত দৃঢ়তার সঙ্গে সরিয়ে দিতে হবে। এই অত্যাদর ও হতাদর উভয়ই দুর্ব্বলতার চিহ্ন। "ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" ভিন্ন ভিন্ন যুগে নব নব সভ্যতার (বা বর্ব্বরতার) বন্যা এসেছে; মনে হ'য়েছে সেই দিগন্তপ্লাবী স্রোতে আমাদের যা' কিছু ছিল সব বুঝি ভেসে গেল, কিন্তু সেই সকল দুর্ব্বার বন্যার প্রথম বেগ মন্দীভূত হ'তে দেখা গেছে যে, ভারত তার দৃঢ়নিবিষ্ট সত্যপ্রতিষ্ঠায় অচল হ'য়ে রয়েছে, নবাহৃত পলিমৃত্তিকার উর্ব্বরতায় সতেজ হ'য়ে ধনধান্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। আজ আমরা কি ভীষণ বিষে সংমূঢ়চেতন হ'য়ে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করছি; আগন্তুক দেখলে কখনও মাথায় তুলে নাচছি, কখনও বা তা'র গায়ে ফুৎকার দিয়ে নিজের কাপড়চোপড়ে আগুন লাগিয়ে উলঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে যাচ্ছি!

এ উন্মত্ততার প্রধান ঔষধ আত্মপ্রত্যয়। কোন বস্তু গ্রহণ করবার আগে সর্ব্বপ্রথমে দেখতে হয়, গ্রহণের কোন প্রয়োজন আছে কি না। অর্থাৎ সে বস্তু বাস্তবিক আমাদের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক কি না, ও যদি আবশ্যকই হয় ত সে অভাব আমরা এতদিন কি ক'রে পূরণ করেছিলাম। অনেক স্থলেই দেখা যাবে যে, সে বস্তু আমাদের ঘরেই আছে;—ঠিক যে ভাবে বাইরে থেকে আসছে সে ভাবে না থাকলেও, যে ভাবে আমাদের তার প্রয়োজন হয় সেই ভাবেই আছে। এই অনুসন্ধানের ফলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে নূতনের পিছনে আর উন্মত্তের মত ছুটব না; হয়ত আমাদের ঘরের বস্তুটিকেই একটু ঘ'সে মেজে নিলেই চলবে, হয়ত বা একটু রূপান্তরিত ক'রে নিতে হ'বে। আর যদি দেখি যে, এই বস্তুটির আমাদের আত্যন্তিক অভাব ছিল ও এর অভাবে আমাদের অনেক কার্য্য অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকত, তখন বুঝেসুঝেই একে গ্রহণ করতে পারব। এই আত্মানুসন্ধানের কার্য্যে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রধান ভরসা। যদি শ্রদ্ধার সহিত সত্যপ্রিয়তার সহিত আমাদের প্রাচীন সভ্যতার আলোচনা হয় ত আমার বিশ্বাস, আমাদের হতাশ হ'তে হ'বে না। এ বিষয়ে আমাদের এখনও মানসিক স্থৈর্য্যের অভাব আছে ব'লে আমার মনে হয়। অতিপ্রীতি বশতঃ হয় আমরা ভাবি আমাদের সবই ছিল ও ঠিক এখনকার মতই ছিল, না হয় আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে ভাবি কিছুই ছিল না। যে মনোভাব নিয়ে ভারতীয় মনীষীগণ চিরকাল সত্যানুসন্ধান করেছেন সেই স্তব্ধ শান্ত সমাহিত চিত্তে, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য আকারকে অগ্রাহ্য ক'রে গভীরতম মূল সত্যের উপর লক্ষ্য স্থির ক'রে এই কাজে অগ্রসর হ'তে হবে।

তারপর এই আগন্তুক পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে বুঝতে হবে। এটি একটি বিরাট কাজ ও এতদিন আমাদের স্বাভাবিক আলস্যবশত একে আমরা অগ্রাহ্য ক'রে এসেছি। এর জাতিকুল, উৎপত্তি, বিস্তৃতি, প্রকৃতি, অভাব, দাবী সকলই নির্ভুলভাবে জানতে হ'বে। আর নিয়তই লক্ষ্য রাখতে হ'বে এর এই রুদ্রমূর্ত্তিতে আমাদের দ্বারে আগমনের কারণই বা কি। এর শক্তির পরিমাণ ও অন্যত্র এর আচরণ কিরূপ তা'ও জানতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতা আজ এমনই মুখোমুখিভাবে দাঁড়িয়েছে যে, এখন পরস্পর পরিচয় না হ'য়ে যায় না, পরিচয়টা ভাল করে' না হ'লে পদে পদে গোল বাধবে। পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের সভ্যতার নাড়ীনক্ষত্র

জান্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছে; পরের মুখে শোনা কথায় নয়, নিজেরা এদেশে এসে আমাদের ভাষা শিখে, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়ে, আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, আলোচনা ক'রে, আমাদের ধাত বুঝতে চেষ্টা করছে। হয়ত সব সময় ঠিক বুঝছে না, কিন্তু যেরূপ কঠোর সাধনা করছে তা'র সিদ্ধি অব্যাহত। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়ে শুধু খান কয়েক ছাত্রপাঠ্য চটি বই ও তর্জ্জমা পড়ে' নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করি। যেখানে মূলের সঙ্গে পরিচয় নাই সেখানে ভুল থাকবেই, আমরাও প্রতিপদে ভুল করছি। এ সব ভুল আমাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠ্‌ছে, কারণ জাত হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে এর উপর। যদি এই সময় আমরা সতর্ক না হই, তাহ'লে কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ ভুলে যাব ও পাশ্চাত্য সভ্যতা না বুঝে তার হাস্যকর অনুকরণ কর্‌তে করতে পৃথিবীর অবজ্ঞা কুড়াতে কুড়াতে আমাদের ঘৃণ্যজীবন অবসান কর্‌ব। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়;—রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রিটনের কথা স্মরণ করুন। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা বুঝ্‌বার পক্ষে ভারত-রোমক সমিতি একটি সামান্য উদ্যোগ মাত্র।

এই আলোচনার প্রথমেই গোটাকয়েক কথা পরিষ্কার ক'রে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে বোধ হয়। প্রথম কথা সভ্যতা নিয়ে;—আমরা কা'কে সভ্যতা বলি ও আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা কতদূর সভ্যতা নামের উপযুক্ত। দ্বিতীয় কথা পাশ্চাত্য নিয়ে: —পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে আমরা কোন কোন্ দেশের সভ্যতার কথা ভাবি ও এই সভ্যতার সঙ্গে আমাদের কতটুকু পরিচয়।

দ্বিতীয় কথাটা প্রথমে একটু বিবেচনা করা যাক্। পশ্চিম দিকে ভারতের রাজকীয় সীমান্ত অতিক্রম কর্‌লেই আমাদের পক্ষে পশ্চিম আরম্ভ হ'ল। কিন্তু পাশ্চাত্য বল্‌লে আমরা বেলুচিস্থান, পারস্য বা তুর্কির কথা ভাবি না। অনেক সময় 'পাশ্চাত্যের প্রতিশব্দ ইউরোপীয় দিই। কিন্তু ইউরোপের ভৌগোলিক সীমান্তের কথাও ঠিক ভাবি না। যে সভ্যতা ইউরোপ থেকে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ছড়িয়ে পড়েছে তাকেও আমরা পাশ্চাত্য বলি। ইউরোপীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকায়ও উপনিবেশ স্থাপন করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বল্‌তে এই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধরি কিনা সে বিষয়ে বোধহয় আমাদের ধারণা তত স্পষ্ট নয়। ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার ও এশিয়ার আর যে সকল অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে (জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকা, বেলজিয়াম কঙ্গো, ফরাসী ইন্দোচায়না প্রভৃতি) এগুলিকে আমরা বাদ দিই ব'লে বোধ হয়। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে সভ্যতা ইউরোপে উদ্ভূত হয়েছে ও যাকে ইংরেজরা তাদের উপনিবেশ গুলিতে বয়ে' নিয়ে গিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা বল্‌তে আমরা সেই সভ্যতার কথাই মনে করি।

তারপর সভ্যতার কথা। আমরা ভাবি আমরাও সভ্য, ইউরোপীয়রাও সভ্য,—আমাদের চেয়ে বেশী সভ্য। এখন দেখা যাক কোন কোন বিষয়ে আমাদের উভয়ের মিল আছে ও কোন বিষয়েই বা ইউরোপীয়দের উৎকর্ষ আছে বলে' আমরা মনে করি। এই উৎকর্ষ অনুসন্ধান কর্‌তে গেলেই হয় ত আমরা কা'কে সভ্যতার চিহ্ন মনে করি তার মূল ধরা যাবে। সাধারণত প্রাকৃত লোকের চোখে ইউরোপীয়রা সভ্য, কারণ তারা নানা ভোগের উপকরণ প্রস্তুত করেছে ও জীবন যাত্রায় নানা বিলাসিতা এনেছে। এই বৈদ্যুতিক আলোক ও বৈদ্যুতিক ব্যজনী, নক্ষত্রগতি স্বয়ংচারিণী মোটরগাড়ী, ভীমবেগ ষ্টীমট্রেণ, সতার ও তারহীন বার্ত্তাবহ এ সকলই সভ্যতার পরিচায়ক ব'লে সাধারণ লোক মনে করে। আমাদের দেশে এ সব ছিল না, অতএব আমাদের সভ্যতা নিম্নশ্রেণীর। যে সব দেশে এ সকল ছিল না তা'দের যদি নিম্নশ্রেণীতে ফেল্‌তে হয় তাহ'লে মিশর, গ্রীস, বা রোম আধুনিক বুলগেরিয়া বা যুগোশ্লাভিয়ার চেয়ে অল্প সভ্য ছিল বল্‌তে হ'বে। একথা কিন্তু কেহই স্বীকার কর্‌বেন না। আর এক কথা, যদি এ সকলই সভ্যতার নিদর্শন হয়, তাহ'লে যে দেশে এ সকলের প্রাচুর্য্য যত অধিক দেখা যাবে সে দেশকেই তত অধিক সভ্য বল্‌তে হ'বে। আমেরিকায় ঘরে ঘরে তারহীন

বার্ত্তাবহ, গড়্‌পড়্‌তা প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের মোটর গাড়ী, ও বিলাসিতার উপকরণের প্রাচুর্য্যে আমেরিকা ইউরোপকে অনেকদিন হারিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমেরিকানরাও বলে না, ইউরোপও বিশ্বাস করে না যে আমেরিকা ইউরোপ অপেক্ষা অধিক সভ্য। আর ইউরোপের মধ্যেও দেশে দেশে এ বিষয়ে কত পার্থক্য। সুইডেনে কলকারখানার সাহায্যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ফ্রান্স অপেক্ষা কত বাড়িয়ে তোলা হ'য়েছে, কিন্তু তবুও সুইডেন ফ্রান্স অপেক্ষা অল্প সভ্য দেশ। অতএব ইহাকে কখনও সভ্যতার মূল সূত্র ধরা যেতে পারে না।

সাধারণ লোকে ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমাদের সভ্যতার চেয়ে উচ্চতর জ্ঞান করে আরও এক কারণে,—ইউরোপীয়রা আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ব'লে। মানুষ চিরকাল শক্তির পূজা ক'রে এসেছে, ও সভ্য মানব যদিও পাশবিক বলকে জ্ঞানত সভ্যতার চিহ্ন ব'লে মনে করে না, কিন্তু এখনও তার মগ্নচৈতন্যের ভিতর এই শক্তিপূজার মোহ রয়ে গেছে। ইউরোপীয়দের এই শক্তি যন্ত্র-সাহায্যে প্রকাশ পায় ব'লে আমরা মনে করি এই যান্ত্রিক শক্তির পূজায় যেন কতকটা গৌরব আছে। ইউরোপীয়রা একটি বিমান পোত থেকে নিমেষে একটি মহানগরী ধ্বংস করতে পারে, বাতাসে বিষাক্ত বাষ্প সঞ্চার ক'রে দিয়ে অসংখ্য লোকের প্রাণ বধ করতে পারে, জলের নীচে অদৃশ্য থেকে ভাসমান তরণীকে নিমেষে ধ্বংস করতে পারে, বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে আরও কত কি ভয়ানক কাজ করতে পারে;—অতএব তারা আমাদের অপেক্ষা সভ্য। গ্রীসের অপেক্ষা রোমের সামরিক শক্তি অনেক অধিক ছিল, কিন্তু কৈ কেহ ত রোমকে গ্রীস অপেক্ষা অধিক সভ্য বলে না। আসিরিয়ার শক্তি বেবিলন বা হিব্রুদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল ও আসিরীয়গণ যুদ্ধ ক'রে অনেক ভয়ানক কাণ্ড ক'রে গেছে, কিন্তু আসিরিয়াকে বেবিলন অপেক্ষা অধিক সভ্য কেহ বলে না। তৈমুরলঙ্গ, নাদির শা, আটিলা প্রভৃতির ধ্বংসের শক্তি অপরিমেয় ছিল, কিন্তু কেহ ত তাদের খুব উচ্চসভ্যতামণ্ডিত মনে করে না। পাশবিক শক্তি ইতিহাসের চক্ষে কখনই সভ্যতার চিহ্ন ব'লে পরিগণিত হয় নাই, সে শক্তি দৈহিক বলেরই হউক বা যান্ত্রিক বলেরই হউক। ভারতবাসীর চোখে ইহা বরং বর্ব্বরতার চিহ্ন বলেই মনে হয়। (ইউরোপের কিন্তু ঠিক এ ধারণা নয়।)

প্রাকৃত জনের চোখে আর একটি বস্তু বিশেষ করে' লাগে,—তা' হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার অর্থশালীতা। ইউরোপীয় জাতেরা সকলেই আমাদের চেয়ে ধনী। আমেরিকা আবার সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সেজন্য শিক্ষিত সমাজে একথাও মাঝে মাঝে উঠে, বুঝি বা আমেরিকা সভ্যতায় ইউরোপকেও ছাপিয়ে গেল। শুধু অর্থশালীতাই যদি সভ্যতার পরিমাপ হত, তাহ'লে প্রাচীন জগতে ফিনিশীয়গণই সব চেয়ে সভ্য ও আধুনিক জগতে ইহুদীরাই সব চেয়ে সভ্য ব'লে পরিগণিত হত। অতএব অর্থশালীতা সভ্যতার লক্ষণ নয় ইহা একরকম ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিছুদিন হ'তে কিন্তু আমাদের দারিদ্র্যের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে, ও আমাদের দেশের বড় বড় মাথাওয়ালা লোকেরা কি করে সহজে শীঘ্র আমরা ধনী হ'য়ে উঠ্‌তে পারি সেই উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেছেন। ফাঁকি দিয়ে বড় কাজ করতে আমাদের মত কেহই মজবুত নয়। উপায়ও তেমনই বেরুচ্ছে,—কেহ বল্‌ছেন, কেবল চর্‌খা কেটে যাও, চরখার ঘেনর্ ঘেনর্ সঙ্গীতে লক্ষ্মী নীলাব্ধিতল থেকে উঠে আসবেন; কেহ বল্‌ছেন, খালি আলু পটলের চাষ করে' যাও, লাঙ্গলদীর্ণ ভূমিতল থেকে সীতার মত লক্ষ্মী উঠে আস্‌বেন; কেহ বল্‌ছেন সঞ্চয়ের কষ্টের প্রয়োজন নাই, বিদেশ থেকে কর্জ্জ করে' বড় বড় কলকারখানা বানিয়ে ফেল, ও যখন হু হু করে মুনফা আস্‌বে তখন কাফেরের কড়ি সুদসুদ্ধ ফেলে দিলেই চল্‌বে; আবার কেউ বা বল্‌তে সুরু করেছেন, ধনীদের মাথা ভেঙ্গে', তাদের লোহার সিন্দুক লুট কর; বল, জাতীয় ধনভাণ্ডার সৃষ্টি করছি; ও কুলী মজুরদের বড় ক'রে তোল, তা'হলে জাতটা দেখতে দেখতে সুখের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে যাবে। ফাঁকি দিয়ে কি করে' বিপুল অর্থ-উপার্জ্জন করা যায় তার আরও কত কি উপায় উদ্ভাবন হচ্ছে তার সংখ্যা নাই। ফাঁকি দিয়েই হ'ক,

আর কঠোর পরিশ্রম ক'রেই হ'ক, বিপুল অর্থশালী হওয়াটা যে নিতান্তই আবশ্যক এ বিষয়ে যেন আর কারুরই সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত জাতটা যদি সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু অর্থোপার্জ্জনে মন দেয় ও অর্থকেই পরমার্থ বলে' ধরে' নেয়, তাহ'লে এই কঠিন সাধনার ফল হয়ত শতাব্দীর পরে ফল্‌বে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য সঙ্গীত ভুলে গিয়ে, আমাদের শিল্প কারু লোপ করে' দিয়ে, আমাদের দর্শন বিজ্ঞানকে পদদলিত ক'রে যে ধনী জাতটি শতাব্দীর সাধনায় গ'ড়ে উঠ্‌বে তা'কে কি ক্রমবিকাশের ধারায় একটি উচ্চতর জাত বলে' আমরা গর্ব্ব অনুভব কর্‌ব? আমার ঘোর সন্দেহ আছে। হয়ত গলিতদেহ Tithonus এর মত আমাদিগকেও কাঁদ্‌তে হ'বে। আমাদের দারিদ্রের উপর এত জোর দেওয়া ও অর্থার্জ্জনকেই সমস্ত জাতিটার লক্ষ্য করে' তোলা খুব শুভ লক্ষণ ব'লে বোধ হয় না। অবশ্য নিতান্ত বিত্তহীন ভিক্ষুকভাবে থাক্‌লে জীবনের কোন স্ফূর্ত্তিই হয় না এ কথা মান্‌তে হবে। স্থূলজীবনের স্থূল অভাবগুলি মেটানই অর্থের প্রধান প্রয়োজন এটা যেন না ভুলে যাই।

সভ্যতার বিশেষ চিহ্ন অনুসন্ধান কর্‌তে গিয়ে অনেকের নিকট কতকগুলি নৈতিক চিহ্নের কথা শোনা যায়,—যথা, সত্যবাদিতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক-নীতি, স্ত্রীলোকের উপর সম্মান, ন্যায়পরতা প্রভৃতি। Clive Ben তাঁর Civilisation নামে গ্রন্থে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা'তে সভ্য মানবদের অপেক্ষা অনেক অসভ্য অর্দ্ধ-উলঙ্গ আদিম মানব সমাজে এই সকল গুণ ভূরি পরিমাণে দেখা যায়। অতএব এগুলিকে সভ্যতার নিদর্শন ধরা যেতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাসা হ'তে পারে তবে কি চিহ্নে বুঝ্‌ব কোন জাত সভ্য কি-না। আমার বোধ হয় একটি মাত্র চিহ্ন থাকতে পারে। যে জাত মানুষের মানসিক অভাব যত মেটাতে পেরেছে, তার মানসিক সুখ যে পরিমাণে বিধান কর্‌তে পেরেছে সেই জাতই তত সভ্য ব'লে গণ্য হয়েছে। অভাবের তাড়নায় মানুষের মনের সকল সুকুমার বৃত্তিই শুকিয়ে যায়, তাই যখন কোন সমাজে জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হয় তখন সে কোন উচ্চ মনোবৃত্তির চালনা করতে পারে না। তাই যে সমাজে অভাব বোধটা যত অধিক তার সভ্যতাও তত অল্প। আমি বলছি, "অভাব বোধ", "অভাব" নয়; কারণ অভাব যখন পীড়া দিতে আরম্ভ করে অভাব বোধ তখনই সে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বহির্জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও ধন-প্রাণের রক্ষা না হ'লে লোক নিরুদ্বিগ্নচিত্তে উচ্চতর বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে না। এই সকল কার্য্যে সেজন্য প্রত্যেকের তথা প্রত্যেক সমাজের কতক পরিমাণ শক্তি ব্যয় হবেই। যদি ইহাতেই সকল শক্তি ব্যয় হয় ও আহুতিদীপ্ত পাবকের মত ইহা সমস্ত ব্যক্তিত্ব গ্রাস ক'রে ফেলে, তাহ'লে সে লোকের বা সে সমাজের সভ্যতার উচ্চতর সোপানে উঠবার কোনকালেও সম্ভাবনা নেই। আধুনিক আমেরিকায় এইরূপ একটা ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে ব'লে অনেকে সন্দেহ করেন। একদিকে আতিশয্য হ'লে আর একদিকে অভাব অপরিহার্য্য। যে সমাজের বা যে ব্যক্তির মাথা ঠাণ্ডা থাকে সে বোঝে কতটুকু শক্তি সে এইদিকে ব্যয় কর্‌তে পারে। শারীরিক অভাব মিটিয়ে সে তার উদ্বৃত্ত শক্তি মানসিক অভাব মিটানয় প্রয়োগ করে। যে সকল প্রশ্ন মানুষ ব'লেই তা'র মনকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করে' এসেছে সেই সকল eternal questionings সকল সভ্য জাতই সমাধান কর্‌বার চেষ্টা করেছে। মানবাত্মার এই অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা, সসীম ইন্দ্রিয়বদ্ধ জগতের চারিদিকে অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধানে পর্য্যটন যে জাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে দেখা যায় তাকেই তত অধিক সভ্য বল্‌তে হ'বে। প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন পারস্য প্রত্যেকেই আপন আপন ভাবে এই অব্যক্তের অভিসারে বেরিয়েছে। আমরা ভারতবাসীরাও এক সময় অতি নির্ভীকভাবে এই পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম, বহু দীর্ঘ শতাব্দী ধরে এই পর্য্যটনে আমাদের কি ঘটেছিল, কি লাভ করেছিলাম, কি ক্ষতি হ'য়েছিল সেই কাহিনীই আমাদের দেশের সভ্যতার ইতিহাস, ভারতের মর্ম্মকথা,—

হর্ষ শিলাদিত্যের, সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয় সে ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিকগণ আমায় ক্ষমা করবেন, যে রাজারাজড়াদের রাজত্বকালের ফ্রেমের ভিতর ভারত সভ্যতার আলেখ্য আছে আমরা সেই ফ্রেমটিকেই আলেখ্য ব'লে ভুল করতে বসেছি; তাই আজ সাল তারিখের নির্ভুলতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাদ বিতণ্ডার আর শেষ নাই।

মানব মন যে অজ্ঞাতের গূঢ় আহ্বানে যুগে যুগে অনির্দ্দিষ্ট পথে অকুতোভয়ে অভিসারে বেরিয়েছে তিনি সত্যও বটেন, সুন্দরও বটেন। যেদিন মনে হ'য়েছে তাঁকে পেয়েছি সেই দিনই মানুষ নির্জ্জনে ব'সে তাঁর মূর্ত্তিটি মর্ম্মরগাত্রে রেখার বেষ্টনে ফুটিয়ে তুল্‌তে, পটফলকে বর্ণের আঁচড়ে ফলিয়ে তুল্‌তে চেয়েছে। বাস্তব জীবনের সহস্র অসুন্দর তুচ্ছতা, সহস্র স্পর্দ্ধিত ক্ষুদ্রতার নাগপাশ থেকে মানুষ চিরকাল পূর্ণ সৌন্দর্য্যের, অনাবিল শান্তির, অনুপম বীরত্বের স্বপ্নদৃষ্টিতে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজেছে। Samothrace-এর বিজয়িনী, মিলোর ভিনাস, রাফায়েল্লোর মাদোন্না, আগ্রার তাজ, ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দিরের তোরণদ্বার মানবাত্মার মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য স্বপ্ন। কালস্রোতের কূলে মানবাত্মার দীর্ঘ পর্য্যটনের এসকল দূরত্বজ্ঞাপক প্রস্তরফলক মাত্র। কত আছে, কত কালের স্রোতে ভেসে গেছে। এই সকল শিল্পসৃষ্টি মানুষকে দৈনন্দিন কর্কশ সঙ্কীর্ণ তুচ্ছতার মাঝে অপরিমেয় সৌন্দর্য্যের শীতল পানীয় যোগায়, মুক্তির বাতাস আনে, উদার আলোকের বন্যায় অভিষিক্ত করে। যে জাত চিরন্তন মানবের জন্য যত অধিক পরিমাণে এই সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে রেখে গিয়েছে তা'কে তত সভ্য বল্‌ব—হ'ক সে জীর্ণচীরধারী দরিদ্র, না থাক তার দেশে বৈদ্যুতিক আলোক; বৈদ্যুতিক ব্যজনী বা বৈদ্যুতিক যান।

মানবজীবনের স্বতঃউত্থিত জটিল প্রশ্নরাজির সমাধান কর্‌তে ও সত্যসুন্দরের উপাসনায় কোনজাত কতদূর সফলতা লাভ করেছে তা' অবশ্য ইতিহাসের দূরদৃষ্টিতেই বোঝা যায়। এ বিষয়ে সফলতার বিচার তাই অতীতের প্রাচীন জাতি সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। কারণ তাদের কার্য্যকলাপের সকল ক্ষণস্থায়ী খুঁটিনাটি কালের স্রোতে ধুয়ে গেছে। শুধু তারা যেখানে জগতের আদি-অন্তের চিন্তায়, মানবের আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস বিষয়ে ও সত্যসুন্দরের উপাসনায় যে সমস্ত উপচার সংগ্রহ ক'রে গিয়েছে, মহাকাল তাহাই সযত্নে বক্ষে ধরে' রেখেছে। তাই অতীত ইতিহাস আলোচনা কর্‌তে গিয়ে পেরিক্লিসের যুগের আথেন্স, নবোন্মেষ-প্রবুদ্ধ ইতালী (Renaissance Italy), চতুর্দ্দশ লুইয়ের যুগের ফ্রান্সকে নিঃসন্দেহ সুসভ্য ব'লে চিনতে আমাদের বিলম্ব হয় না। কিন্তু আধুনিক জাতদের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, তুচ্ছ মহৎ, সকল কাজই আমাদের নিকটবর্ত্তী ব'লে এত বিরাট দেখায় যে, তার ভিতর কোনটি সাঁচ্চা কোনটি ঝুঁটা, কোনটি প্রকৃত সভ্যতাজ্ঞাপক ও কোনটি নয় তা বুঝে নেওয়া একটু দুষ্কর। আধুনিক সব জাতই ত শিল্পচর্চ্চা করে, ছবি আঁকে, সঙ্গীতচর্চ্চা করে, চারুশিল্প ও কারুশিল্পে জীবনকে সুষমামণ্ডিত কর্‌তে চেষ্টা করে, সকলেই ত দর্শন চর্চ্চা করে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে, সাহিত্য সৃষ্টি করে। তার মধ্যে কোনটি দুর্নিবার সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটাবার জন্য সৃষ্ট ও কোনটি ভদ্র জাত বলে' পরিচিত হবার জন্য ফ্যাসানের অনুরোধে সৃষ্ট, তা' কি ক'রে বিচার করা যায়? দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনাতেও কোনটি অকুতোভয় সত্যানুসন্ধান ও কোনটি নূতন কিছু বলে' কেবল লোকের চমক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা তা' নির্ণয় করাও সব সময় সহজ নয়। দারোগা বাবু ঘুষের টাকায় যখন কালীপূজা ক'রে, লাল চেলী প'রে রক্ত চন্দনের ফোঁটা কেটে, "মা" "মা" শব্দে আর্ত্তনাদ করেন তখন তাঁর ভক্তি কৃত্রিম বলে কার সাধ্য। ইউরোপে প্রতি দেশেই শিল্পপ্রদর্শনী হয়, এর ভিতর দারোগাবাবুর কালীপূজা অনেক। এই কৃত্রিম শিল্পোপাসনার জাঁকজমক, হাঁক-ডাকও খুব। দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনাতেও আন্তরিক আগ্রহে সত্যানুসন্ধানের অপেক্ষা ভদ্র ও সভ্য প্রতীয়মান হবার চেষ্টাই অধিক। গাঁটকাটা বড় তামাকের প্রসাদের লোভে যখন বাবাজীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করে তখন সে নিজেই অনেক সময় নিজেকে ভাল ক'রে বোঝে না। প্রশংসার লোভে, ভদ্র হবার লোভে শুধু যে ব্যক্তি বিশেষই কৃত্রিম হাবভাব, কৃত্রিম

ভাববিলাস, ভঙ্গী দেখায় তা নয়,—একটা সারা জাতও এইরূপ কৃত্রিমতা দেখায় ও অনেক সময় নিজেরাই ভাবে যে তারা সৌন্দর্য্যোপাসক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জাত। এই আত্ম-প্রতারণার দ্বারা তারা অনেক সময় পরকেও প্রতারিত করে, যতদিন না মহাকাল এই সকল ঝুঁটো শিল্প ও মেকী দর্শনকে বিস্মৃতির তলে বিলুপ্ত ক'রে দেয়। এরূপ কৃত্রিম ভঙ্গী এই প্রতারণা কিন্তু কখনও চিরকাল চল্‌তে পারে না। জাতের মনের প্রকৃত ভাবটি জীবনের তুচ্ছ কাজে, স্বার্থের ক্ষুদ্রতম সংঘর্ষে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ও তখন এই সভ্যতার মুখোস, শিল্পীর আবরণ ভুজঙ্গনির্ম্মোকের মত খ'সে পড়ে। এইরূপ ভঙ্গী উপাসনার ভাণ, যদি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় ও স্বার্থসংঘর্ষের পরীক্ষায় টিকে থাকে তখন আর বড় কৃত্রিম থাকে না, তখন বুঝতে হবে জগতের স্বভাব বদলেছে, চেষ্টার ফলে, দীর্ঘ উদ্যমের ফলে। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যেখানে ব্যক্তিবিশেষ তথা জাতিবিশেষ দীর্ঘকাল আন্তরিক চেষ্টায় অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আপন স্বভাবের গভীর পরিবর্ত্তন করেছে। কিন্তু সভ্যতা বস্তুটি ধীরে ধীরে একটি জাতির মধ্যে আপনা আপনি গ'ড়ে ওঠে। বাইরের কৃত্রিম শিক্ষার ফলে সভ্যতার একটা চলন সই অনুকরণ হয় মাত্র।

প্রকৃতি সভ্যতা মানবাত্মার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিজাত প্রবণতার স্বাভাবিক সুসমঞ্জস পরিণতি। কোন জাতির মনের এই পরিণতি হয়েছে কি না, তা' তার আচার ব্যবহারে আকার ইঙ্গিতে সহজেই বোঝা যায়। প্রাচীন সভ্য জাতগুলির কার্য্যকলাপ জীবনযাত্রা আলোচনা করলে এইরূপ কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমেই দেখা যায় সভ্যমানব বা সভ্যজাতি পরের মত সম্বন্ধে অসীম উদার, অতি সহিষ্ণু। তারা বোঝে যে যেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে তথ্যনির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করে সেখানে মতদ্বৈধ অনিবার্য্য। মতানৈক্য সম্বন্ধে উদারতা পরমতসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষের মত বোধ হয় আর কোন দেশে ছিল না। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীস বোধ হয় ভারতবর্ষের সমকক্ষ। গ্রীক কৌতুক-নাট্যকার আরিস্তোফেনিস, আথেন্সের যুবামণ্ডলীর নৈতিক মলিনতা আনয়ন করেছেন বলে' সক্রেতিসের নামে অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু আনাতোলের ভোজসভায় উভয়ে একত্র উপস্থিত। প্লাতোর অননুকরণীয় Symposium-এ উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা, যে হাস্য পরিহাস, গভীর তত্ত্বানুশীলনের সঙ্গে রসিকতার যে অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে, তাতে বোধ হয় সক্রেতিস বা আরিস্তোফেনিস এ জন্য মনে পরস্পরের প্রতি বিন্দুমাত্রও শত্রুতা বা বিরাগ পোষণ করতেন না। এঁরা প্রকৃতই সভ্য ছিলেন। আথেন্সের নগরদ্বারে যখন শত্রু সৈন্যের করাঘাত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ও আথিনীয় সৈন্যের উপর নগরীর স্বাধীনতা এমন কি অস্তিত্ব নির্ভর করছে, তখনও নাগরিকগণ সৈনিকগণের কেন্দ্রভ্রষ্টতা ও মুদ্রাদোষ নিয়ে রচিত কৌতুকনাট্য উপভোগ করছে। সৈনিক ও সেনাপতিরাও এই আমোদে যোগ দিচ্ছে। এই স্বতস্ফূর্ত্ত আনন্দভোগ, এই নিছক কৌতুকপ্রিয়তা সভ্য মানবের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত সভ্যতার প্রভাবে জাতীয় চরিত্রের রুক্ষতা, কর্কশতা, অসমতা দূর হয় ও একটি সহজ স্নিগ্ধ সরস কোমলতা আসে। এই কোমলতা অর্থে দুর্ব্বলতা নয়, সভ্যমানবের মন কুসুমের অপেক্ষা কোমল বটে, কিন্তু প্রয়োজন বিশেষে বজ্রাদপি কঠোর হ'তে পারে। এই কঠোরতা পাশবিক কর্কশতা' নয়, নিয়তির মত অমোঘ প্রতিহিংসা লেশবর্জ্জিত অপ্রতিবিধেয়তা। যে ব্যক্তি বা যে জাত স্বার্থ সংঘর্ষে উত্তেজিত হ'য়ে চিত্তস্থৈর্য্য হারিয়ে পাশবিক নিষ্ঠুরতার অভিনয় ক'রে বসে তার সকল বিদ্যা সকল বাহ্য সদাচার সত্ত্বেও সে প্রকৃতপক্ষে সভ্য হয় নি বল্‌তে হবে। কয়জন ব্যক্তি বা কয়টি জাতি সক্রাতিসের মত প্রাচীন আথিনীয়দের মত পরমতসহিষ্ণুতা মনের প্রফুল্ল উদারতা দেখাতে পারে বা সভ্যতার সেই পংক্তিতে আসন গ্রহণ করতে আসতে পারে?

যে সমাজে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করছে সেখানে মতানৈক্য অবশ্যম্ভাবী ও প্রতি সভ্য সমাজেই সেজন্য নানা বিভিন্ন চিন্তার ধারা দেখা যায়। আর যে সমাজে এইরূপ মতের বৈচিত্র্য মনের বহুমুখীনতা নাই সেখানে সভ্যতা বা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চাও বেশী নাই বল্‌তে হবে। পেরিক্লীয় আথেন্স বা নবযুগের ফ্লোরেন্স কত ভিন্ন দল কত ভিন্ন

চিন্তা কেন্দ্র ছিল তা ভাবলে আমাদের দেশের মত-বৈচিত্র্য দেখে হতাশ হবার কিছু আছে ব'লে বোধ হয় না।

কোন বিষয়ে আতিশয্যের অভাব সভ্য সমাজের আর একটি নিদর্শন; সভ্যমানব কখনও অত্যুক্তি করে না; আনন্দে উন্মত্ত হয় না; বিপদে হতাশ হয় না। তার মানসিক বৃত্তিগুলির এরূপ সমভাবে চর্চ্চা হয় যে সকলগুলির মধ্যে একটি সুসমঞ্জস সমতা থাকে, দুঃখ দৈন্যের নিপীড়নে বা আনন্দের উল্লাসে এই সমতা নষ্ট হয় না। মানসিক বৃত্তির সর্ব্বাবয়ব সুঠাম বিকাশ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য মানবের হয় না। চিত্তের বিশেষ উৎকর্ষ না হ'লে চিত্তবৃত্তির সংযম আসে না, আর গভীর সংযম না থাক্‌লে কোন ভাল বা বড় কাজ করা যায় না। অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি বা জাতি তার বহুদিনের সাধনাকে মুহূর্ত্তের মোহে ধ্বংস ক'রে ফেলে। চিত্তবৈকল্য একেবারে ধ্বংসের লীলায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেও সামন্য সামান্য চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ পায়। যখন কোন জাতি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে শিল্পদর্শনের চর্চ্চা করছে, শিল্পদর্শনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইতিহাস ও সমালোচনা গ্রন্থে অদ্ভুত মত সকল জাহির করে' চিন্তা জগতকে উদ্‌ভ্রান্ত করে' তুলছে তখন যদি দেখা যায় যে, তার বর্ণজ্ঞান (Sense of colour) নাই, সে জোরালো ডগ্‌ডগে রঙ ভালবাসে, সঙ্গীতে স্বরমাধুর্য্যে ও তানৈক্য অপেক্ষা উচ্চ শব্দের পক্ষপাতী, বিচার ক্ষেত্রে বিষয়ের একদিকে ঝোঁক দিয়ে যুক্তিতর্কের জাল বুনে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখনই সন্দেহ করা যেতে পারে যে তার মানসিক স্বাস্থ্যের কোথাও গোল আছে, স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্য হারিয়ে কোনদিন একটা আকস্মিক বিপদ ঘটাতে পারে। আর ইতিহাসের সাক্ষ্য আছে যে, ঘটেও তাই। যে জাতের বুদ্ধিমত্তাকে বহুদিন ধ'রে জগতে পূজা ক'রে এসেছে ও বুদ্ধির কুস্তিগিরিকে সভ্যতা ব'লে মনে ক'রে এসেছে, হঠাৎ হয়ত কোন ঘটনায় তার চিত্তের বর্ব্বরতা বেরিয়ে প'ড়ে পৃথিবীতে একটা প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়। সে জন্য মানসিক বৃত্তির স্থৈর্য্য সুসমঞ্জস বিকাশ, মনের সংযম, সভ্যতার একটি প্রধান চিহ্ন ধরা যেতে পারে। যে লোক বা যে জাত যশের খাতিরে শিল্পদর্শন চর্চ্চা করে বা জগতকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে হাততালির লোভ করে তার মতে সংযম কখনও আসে না। অবশ্য এও হ'তে পারে যে কোন জাত বা ব্যক্তি বহুকাল চিত্তসংযম অভ্যাস ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে ও হঠাৎ তার অন্তরের গূঢ়তম গহ্বর থেকে সুপ্ত আদিম পশুটি বের হ'য়ে পড়ে, তখন সে তার যুগসঞ্চিত সাধনার তপোলব্ধ বিভূতি দূরে ফেলে দিয়ে উপহাস ক'রে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে তাণ্ডব নৃত্য সুরু ক'রে দেয়। এই বিংশ শতকে আমাদের দেশের প্রাচীন রীতি নীতি অভ্যাস সংস্কার জ্ঞান গৌরব সমস্তের উপরে নবীন ভারতের অশ্রদ্ধা, অবহেলা, বিদ্রূপ, পরিহাস এইরূপ সুপ্ত পাশবিকতার জাগরণ সূচনা করছে না কে বল্‌তে পারে?

এই অবস্থায় জাতির সম্মান পায় দেশের রাজনীতিবিদেরা ধনী ব্যবসায়ীরা ও যোদ্ধারা, ও সবচেয়ে অবহেলা পায় তার শিল্পীরা, তার দার্শনিকেরা, তার চিন্তাশীল লেখকেরা, তার সাহিত্যসেবীরা। কিন্তু সভ্য মানবের নিকট তারাই চিরকাল সব চেয়ে সম্মান সব চেয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়েছে, যারা তার অন্তর-পুরুষের সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা, পূর্ণতার ক্ষুধা, ভূমার ক্ষুধা মিটিয়ে এসেছে। প্রকৃত সভ্য মানব বোঝে যে তার দেশের রাজনীতিবিদেরা, ধনীরা, যোদ্ধারা যে তৃপ্তি দিতে পারে তা বড় বেশীদিন স্থায়ী নয় বা বড় বেশী গভীর নয়; কিন্তু যে আনন্দের অর্ঘ্য তার শিল্পী দার্শনিক সাহিত্যিকেরা সাজিয়ে দেন তা যুগে যুগে জাতির মনের ক্ষুধা মিটাবে, অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে থাক্‌বে। রবীন্দ্রনাথকে ইতালী যে সম্বর্দ্ধনা করেছিল, তোলস্তই-এর মৃত্যুতে ইউরোপে যে শোকের বন্যা বয়েছিল তা'তে সে সব দেশের সভ্যতার পরিমাণ পাওয়া যায়। তাই যখন দেখি কোন দরিদ্র ছাত্র মৃত কবির কবরের উপর একগাছি শোক প্রকাশক মালা দিয়ে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করছে তখন কোন জাতীয় উৎসবের রাজকীয় সমারোহ অপেক্ষা সেটিকে জাতির সভ্যতার অভ্রান্ত নিদর্শন ব'লে মনে হয়।

সভ্য মানবের মনের উদারতা তার গোষ্ঠি বা দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্ব মানবকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আসে। তাই সভ্যতা ঠিক জাতীয় নয়, সে বিশ্বজনীন। যখন রাজনীতিবিদেরা জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে এমন কাজ করেন যা বিশ্বমানবের অহিতকর

তখন প্রকৃত সভ্য কোন ব্যক্তি তাতে সায় দেয় না, এমন কি উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে ও সেই প্রতিবাদের জন্য সকল দুঃখ বরণ ক'রে নিতে পিছিয়ে আসে না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন, কারাবাস, নির্ব্বাসন এমন কি মৃত্যুও অনেক সময় মূল্য স্বরূপ দিতে হয়। কিন্তু মানবাত্মার গৌরব, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতে মানবের স্বাভাবিক অধিকার সভ্যমানব এতই ভালবাসে যে তা থেকে চ্যুত হ'য়ে জীবন ধারণ করা তার নিকট দুর্ব্বহ ব'লে বোধ হয়। সভ্যতা বিশ্বমানবতাত্মক (cosmopolitan) একথা স্বীকার করতে কিন্তু কোন জাতিই সম্পূর্ণ রাজী নয়।

আর অধিক নিদর্শন বাড়াবার প্রয়োজন নাই। যা বলা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে যে, যদিও আধুনিক সব দেশেই অল্লাধিক শিল্প বিজ্ঞান দর্শন চেষ্টা হচ্ছে এ সকল বাহিরের অনুষ্ঠান দেখে সব সময় প্রকৃত সভ্যতা চিনে নেওয়া যায় না। সভ্যতা একটা মনের অবস্থা, ও এই মানসিক অবস্থা অনেকটা অনুমান করা যায় জাতির কার্য্য-কলাপ দেখে ও তার গুণের আদর (sense of values) দেখে।

এই সকল নিদর্শন দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় সভ্যতা এমন কি অধঃপতিত আধুনিক ভারতের সভ্যতাও যে উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা তা চিনে নিতে বিলম্ব হবে না। আর আমরা যাকে সাধারণত এদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা বলি তা কতদূর সভ্যতা নামের যোগ্য তা বিচার-সাপেক্ষ। প্রকৃত ইউরোপীয় সভ্যতা, ইউরোপ মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সভ্যতার উদ্ভব হ'য়েছে তার কোন কোনটি যে খুব উঁচুদরের সভ্যতা তার সন্দেহ নাই। এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অনুশীলন করতে গেলে এই সকল বিশেষ বিশেষ দেশের বিশেষ বিশেষ যুগের সভ্যতার উপরই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রাকৃত মানবের মনে ইউরোপীয় সভ্যতা বললে যে ধনশালিতা, বিলাসিতা, পাশবিক ক্ষমতা ও কলকারখানাপূর্ণ জটিল জীবন যাত্রার চিত্র ভেসে উঠে, নির্ম্মম হস্তে তাকে সরিয়ে দিতে হ'বে। এই চিত্র তৈরী হ'য়ে উঠেছে এই জন্য যে সাধারণ ভারতবাসী দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে যে সব ইউরোপীয়দের সংসর্গে আসে তারা অধিকাংশই এদেশে এসেছে অর্থোপার্জ্জনের জন্য, আর তারা দেখেছে যে বহুমূল্য বিলাসিতার উপকরণ যোগালেই এদেশে সহজে অর্থোপার্জন হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে মুষ্টিমেয় বিদেশী আপনাদিগকে রক্ষা করবার জন্য বিপুল পাশবিক বলের পরিচয় দিবে ও প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে তাদের ধ্বংসের অস্ত্রগুলি যে কিরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তা দেখাবে। আমরা তখনই ভুল করি যখন তাদের ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি ব'লে গ্রহণ করি। ইউরোপীয় হ'লেই যে ইউরোপীয় সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হ'তে হবে ও ইউরোপীয় সভ্যতা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে হ'বে এমন কিছু কথা নাই। যে বেচারী চামড়ার দালালী করছে বা চটকল চালাচ্ছে তাকে যদি প্লাতো কাণ্টের দার্শনিক মত জিজ্ঞাসা করা যায় তার চেয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর কিছু হ'তে পারে না। উভয় পক্ষেই ব্যাপারটা একটা উৎকট প্রহসন হ'য়ে দাঁড়ায় ও তার অপরিসীম লজ্জা ও দুঃসহ গ্লানি প্রতি সুসভ্য ইউরোপীয় ও ভারতীয় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে।

সেজন্য ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝ্‌তে গেলে আমাদের যেতে হবে তার প্রাচীন উৎসমুখে—প্রাচীন রোমে, প্রাচীন গ্রীসে, হিব্রু জাতির নিকট। রোমক সাম্রাজ্য এক সময় ইউরোপের অধিকাংশ প্রদেশে বিস্তৃত ছিল ও সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশেই রোম আপনার প্রতিভার ছাপ রেখে গিয়েছে। এখনও ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জার্ম্মানিতে বাড়ীর ভিত্তি খনন করতে গেলে, উদ্যান রচনা করতে গেলে, রোমক অট্টালিকা, রোমক স্নানাগার, রোমক রাজ্যরক্ষার ভগ্নাবশেষ প্রতি পদেই ঠেকে। রোমক সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা, সৈন্য সমাবেশ, প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ, আইন আদালতের ব্যবস্থা প্রভৃতি তৎকালীন বর্ব্বর ইউরোপে অদ্ভুত বস্তু ছিল। রোমের প্রতিভা এতই চমকপ্রদ ছিল যে, এখনও ইউরোপে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা রোমক ব্যবস্থারই অল্পবিস্তর অনুকরণ বল্‌লে চলে। কিন্তু রোম ব্যবহারিক জীবনের শৃঙ্খলা-বিধানেই সকল শক্তি নিয়োজিত করেছিল। অন্তরের সৌন্দর্য্যপিপাসা ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষুধা মিটিয়েছিল গ্রীস। রোম্ যখন গ্রীস জয় করলে তখন শিল্প সাহিত্যে বিজিত গ্রীসের শিষ্য হ'য়ে পড়লো ও ধনী রোমকদের বাড়ীতে

বাড়ীতে গ্রীক পণ্ডিতগণ,শিল্পীগণ ক্রীতদাস ভাবে গ্রীক সভ্যতা প্রচার করতে লাগ্‌লো। কিন্তু রোমের ধ্বংসের পর বর্ব্বর মধ্যযুগে ইউরোপ গ্রীস্‌কে চিনতো না, গ্রীকভাষা জান্‌তো না, রোমীয় সাহিত্য ও রোমীয় শিল্প নিয়েই আপনার সঙ্কীর্ণ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করতো। নূতন যুগ আস্‌লো যখন তুর্কগণ কন্‌স্‌তান্তিনোপল অধিকার ক'রে গ্রীক পণ্ডিতগণকে দেশ ছাড়া করলে। তারা প্রাচীন পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়ে এলো ইতালীতে ও ফ্লোরেন্স হ'ল এই নবোন্মেষের উদ্বোধন ক্ষেত্র। আবার গ্রীক ভাষার চর্চ্চা, গ্রীক শিল্পের উদ্ধার হ'ল ও আধুনিক ইউরোপে গ্রীক প্রভাব বিস্তার হল। রোমক প্রতিভার শৃঙ্খলার উপর গ্রীক্‌ প্রতিভার সৌন্দর্য্য-কিরণ পড়ে' এক নূতন জগতের সৃষ্টি হ'ল। ইতিপূর্ব্বেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হিব্রু জাতির আধ্যাত্মিকতা ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। এই হিব্রু প্রভাব কিন্তু বড়ই অপরোক্ষ ভাবে অনেক ব্যবধানের ভিতর দিয়ে অনেক ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছিল। প্রথম যীশু প্রাচীন হিব্রু পরমেশ্বরের ধারণাটাকে অনেক পরিবর্ত্তন ক'রে গিয়েছিলেন। যীশুর পরম পিতা আর হিব্রুদের অসহিষ্ণু নিষ্ঠুর বিচারক জিহোভা এক নন। তিনি প্রেমময় পরম কারুণিক পিতা। যীশুর ধর্ম্ম প্রচার করলেন গ্রীক সেন্ট্‌ পল ও তাতে এমন একটি সূক্ষ্ম গ্রীক প্রতিভার ছাপ দিয়ে গেলেন যা আজও পণ্ডিতগণ দূর ক'রে যীশুর ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি বের করতে প্রয়াস পাচ্ছেন। এই খৃষ্ট-গ্রীক-হিব্রু আধ্যাত্মিকতা প্রচারের কেন্দ্র হ'ল সাম্রাজ্ঞী নগরী রোম, ও রোমীয় প্রতিভা সহজেই তাকে একটা স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করলে ও সম্রাটের আসনে বস্‌লে ধর্ম্মগুরু পোপ। এই সাম্রাজ্যের ঠাট এখনও ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইউরোপের সভ্যতার স্রোত হিব্রু গ্রীক রোম এই ত্রিধারার সঙ্গমে গঠিত। প্রত্যেক ধারাই আপনার বিশেষত্ব নিয়ে এসেছে ও যেরূপ ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এই সম্মিলিত স্রোত প্রবাহিত হয়েছে সেইরূপেই এর বর্ণগন্ধ স্বাদের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে বুঝ্‌তে হ'বে এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রকৃতি, তাদের মর্য্যাদা,তাদের দান। ও তারপরে জান্‌তে হ'বে এই দান কারা কি ভাবে করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি বাদ দিলে ইউরোপে তিনটি মহাজাতি বাস করে—পূর্ব্বে শ্লাভজাতি, উত্তরে ও পশ্চিমে জার্ম্মানিক জাতি ও দক্ষিণে লাতিন জাতি। এদের প্রত্যেকের মনের গঠন ভিন্ন, কার্য্যকলাপের প্রণালী ভিন্ন, জীবনের উপর দরদ ভিন্ন। সেজন্য হিব্রু-গ্রীক-রোমক সভ্যতার সম্মিলিত প্রভাবটিকেও তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে গ্রহণ করেছে। তাই এই তিনটি মহাজাতির সভ্যতার মধ্যে মূলগত সাদৃশ্য থাক্‌লেও সভ্যতার বহিঃপ্রকাশে বেশ বৈচিত্র্য আছে। ইউরোপীয় সভ্যতায় এই বৈচিত্র্য আছে বলেই তা' এত সুসমৃদ্ধ।

অতএব ইউরোপীয় সভ্যতা অনুশীলনের ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে ও প্রত্যেক মহাজাতির বৈশিষ্ট্য ও তার সভ্যতা বিকাশের প্রণালীর অভিনবত্ব অনুশীলন বিস্তর সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বোধ হচ্ছে। আমরা এই বিরাট ক্ষেত্রের সর্ব্বপশ্চিম কোণের একটি ক্ষুদ্র জাতের সংসর্গে এসেছি ও তার সভ্যতার খুব অল্পই দেখ্‌তে পেয়েছি। এই অতি অল্পজ্ঞান, তা-ও অতি ভাসা ভাসা জ্ঞান থেকে যদি সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান হয়েছে মনে করি, তাহ'লে যে আমেরিকান টুরিষ্ট খিদিরপুর ডক দেখে ভারতবর্ষ-ভ্রমণ কাহিনী লেখেন তার মত হাস্যকর ব্যাপার হবে। বিষয়টি বিরাট, উপাদানের জটিলতা বিস্তর, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা আজ রুদ্রমূর্ত্তিতে আমাদের দ্বারে উপস্থিত; আমাদের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের শাস্ত্র সংহিতা প'ড়ে বিদ্রূপ করছে, আমাদের আচার ব্যবহারকে ধিক্কার দিচ্ছে ও এই জরাজীর্ণ কুসংস্কারান্ধ ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে আপনার দেশের মৃতসঞ্জীবনী সভ্যতা সুধাপান করিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চাচ্ছে। এখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ছিন্নকন্থায় আবৃত হ'য়ে ঘুমালে চল্‌বে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইউরোপীয় সভ্যতা অনুশীলন করুন —ধীরভাবে, আন্তরিক আগ্রহে জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টায়। সাধনার গুরুত্ব দেখে' পিছু'লে চল্‌বে না। সিদ্ধিও তেমনই কাম্য হবে।

আমাদের দেশের সভ্যতার অনুশীলন ক'রে ইউরোপীয়েরা এর প্রণালী দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। যদি তাঁদের প্রণালীর কোথাও দোষ থাকে তা সংশোধন করতে হ'বে, প্রয়োজন মত তার পরিবর্ত্তন

করতে হবে, আর লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হ'তে হবে। এই বিরাট কাজে হাত দিতে হবে দল বেঁধে, এক এক দলকে ভার নিতে হবে এক এক অংশের। যিনি এক এক অংশের এক এক ভাগের ভার নেবেন তাঁকে তা'তেই সারা জীবন উৎসর্গ করতে হবে। যিনি হিব্রু সভ্যতার অনুশীলন করবেন তাঁকে জার্ম্মাণ দর্শন চর্চ্চার জন্য টান্‌লে কাজ হবে না। মূল ভাষাগুলি শিখ্‌তে হবে—হিব্রু গ্রীক লাতিন ও তারপর আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলি—ইতালীয় ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, রুশ প্রভৃতি। মূল সভ্যতাগুলির চর্চ্চার পর যে যে জাত সেই সভ্যতা-ত্রিতয় গ্রহণ করল তাদের কিছু পরিচয় পেতে হবে। এইখানে নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষ সাহায্য করতে পারেন। তাঁরা শুধুই কঙ্কালের মাথা মেপে ভিন্ন ভিন্ন জাতের কয়েকটি ক্যাটালগ প্রস্তুত না ক'রে যদি প্রত্যেক জাত নূতন সভ্যতা গ্রহণ করবার কি কি যোগ্যতা নিয়ে এসেছে তার সন্ধান করেন ত ঐতিহাসিক সঙ্কলন ব্যাপারে (historical synthesis) একটি আবশ্যকীয় কাজ করবেন। তারপর দেখ্‌তে হবে এই ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত ইউরোপীয় সভ্যতা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনে কি ভাবে গ'ড়ে উঠেচে ও কি ফল দিয়েছে।

শ্লাভ, জার্ম্মানিক ও লাতিন জাতির দান প্রচুর। ইউরোপীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের যে কক্ষেই প্রবেশ করুন, তার সাহিত্য তার শিল্পকলা, তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, তার চিত্র, তার সঙ্গীত প্রতি বিভাগেই তার প্রতিভার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। আধুনিক ইউরোপ কিন্তু তার মায়া ক্রমেই কাটিয়ে উঠছে ও বলদৃপ্ত অর্থশালী জার্ম্মানিক জাতির প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে। এই জাতি দিয়েছে বিশাল সাম্রাজ্য, প্রবল সামরিক শক্তি, জগদ্ব্যাপী বিপুল বাণিজ্য ও এই গুলি রক্ষা করবায় জন্য অদ্ভুত পরিশ্রম করবার শক্তি, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি। ইউরোপের তৃতীয় মহাজাতি শ্লাভদের এই সবে জাগরণ সুরু হয়েছে ও ভবিষ্যতই বল্‌তে পারে তাঁরা কি করতে পারে ও জগতকে কি দিতে পারে। শিক্ষিত শ্লাভসমাজে যিনিই মিশবার অবকাশ পেয়েছেন তিনিই জানেন যে এ জাতি বুদ্ধিমত্তার শিল্পিসুলভ সৌন্দর্য্যানুভূতিতে মনের সৌকুমার্য্যে ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে কারও অপেক্ষা হীন নয়। আশ্চর্য্য বোধ হয় তাদের গুণের আদরে (sense of values), যার জন্য জার্ম্মাণ জাতি প্রাণপাত করচে, যার জন্য লাতিন জাতি বহু অপেক্ষা করচে এমন বস্তুরও অনেক সময় শ্লাভের চক্ষে কোন মূল্যই নাই। আর যে ধারণার জন্য যে abstractionএর জন্য শ্লাভেরা জীবন বিসর্জ্জন দিবে ও দেশময় রক্তের স্রোত বইয়ে দিতে কুণ্ঠিত হ'বে না তা হয়ত জার্ম্মানিক বা লাতিন জাতির চোখে নিতান্তই আকাশকুসুম। উত্তুঙ্গ হিমাচলের তুষার শ্রুতি-পুষ্ট ব্রহ্মপুত্র নদই বা কেন পূর্ব্ববাহিনী ও সিন্ধুনদই বা কেন পশ্চিমবাহিনী তা ভৌগলিকই বল্‌তে পারেন। ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদই বলতে পারেন শ্লাভজাতির সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য জাতির দৃশ্যতঃ এই বৈষম্য কেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার অনুশীলনের ফল কিন্তু সাধারণ ভারতীয় পাঠকের কাছে তার সহজবোধ্য মাতৃভাষায় পৌছে দিতে হবে, শুধু বড় বড় বিদেশীভাষায় লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না। এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুরুহ গ্রন্থ সুললিত বিদেশীভাষায় রচনা করলে বুদ্ধিবৃত্তির কুস্তাগিরী খুবই দেখান হয়, হয়ত পণ্ডিতসমাজে খ্যাতিও অল্পবিস্তর অর্জ্জন করা যায়। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার অনুশীলন-কার্য্যে যাঁরা হাত দেবেন তাঁদের এই খ্যাতির লোভটি ছেড়ে তবে কাজে নাম্‌তে হ'বে। যদি কাজ সুসম্পন্ন হয় ত খ্যাতি আপনিই আস্‌বে। কাজের প্রথমে একটু কুখ্যাতির একটু গালাগালি সহ্য করবার, একটু অবজ্ঞা উৎপীড়ন সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই নামা উচিৎ। আশু সাফল্যের আশাও করা উচিৎ নয়। কোন ভাল কাজ, কোন বড় কাজ যাদুকরের কুহকদণ্ডের স্পর্শে হয় না, তার জন্য শ্রম চাই, সময় চাই, সহিষ্ণুতা চাই। কিন্তু যখন কার্য্য সম্পন্ন হ'বে তখন সে সফলতার তৃপ্তিও তত অধিক। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যখন, যাঁরা ইউরোপকে, সভ্য ইউরোপকে, প্রকৃত ইউরোপকে তাদের সাম্‌নে এনে দিয়েছেন, তাঁদের কথা মনে করবে তখন কৃতজ্ঞতার গৌরবে তাঁদের মুখ ভ'রে উঠ্‌বে।

ইউরোপীয় সভ্যতার গভীর অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অনুশীলন সমান উদ্যমে, সমান উৎসাহের সহিত করতে হবে, ও এ ক্ষেত্রেও সেই কঠোর

সত্যনিষ্ঠা সেই সকরুণ সমবেদন' দিয়ে কাজ করতে হবে। যখন ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুই বিরাট সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হ'বে তখন ইউরোপের নিকট আমাদের কি গ্রহণ করতে হ'বে ও আমাদের সভ্যতার কোন অংশটা বর্জ্জন করতে হ'বে তা আমরা বিচার ক'রেই চিন্তা ক'রেই করব। এই অর্জ্জন বর্জ্জন ব্যাপারে তখন আর অন্ধ অনুকরণের উন্মাদনা বা মূঢ় ত্যাগের মাদকতা থাকবে না। কারণ এ অর্জ্জন হ'বে সাঙ্গীকরণ, assimilation, যেমন ক'রে সূর্য্য-রশ্মি থেকে চূত প্রবাল তার আতাম্রবর্ণ গ্রহণ করে ও গন্ধরাজ তার শ্বেতশোভা আহরণ করে। যখন আমরা কোন প্রাচীন প্রথা ত্যাগ করবো তখনও তা নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে শীতাগমে বনানীর পত্রমোক্ষের মত স্বাভাবিক ভাবেই করবো। এই দুই সুন্দর প্রাচীন সভ্যতার সম্মেলনে ভারতে যে নূতন সভ্যতার উদ্ভব হ'বে তা ইউরোপের নবো-ন্মেষের (Renaissance) চেয়ে কম বিস্ময়কর হ'বে না ও তার সৌরভে ভারতের আকাশ বাতাস শতাব্দীর পর শতাব্দী আমোদিত থাকবে। আমাদের এই দীনা ভারত-রোমক সমিতি যদি এই মহৎকার্যে একটুকুও সাহায্য ক'রে থাকে ত এর জন্ম বৃথা হবে না।

আর একটি কথা ব'লে আজ আমি বিদায় নেব। ইউরোপীয় সভ্যতা জানতে গেলে তাকে বিশ্লেষণ করতে হ'বে বলেছি, কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রে জানা ও প্রকৃত উপলব্ধি করা এক বস্তু নয়। এ পর্যন্ত কোন রাসায়নিক আমের আস্বাদের, গোলাপের সুগন্ধের বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছেন কি? কোনো জাতের সভ্যতা তার জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ বিকাশ, তৈরী করা কাপড় চোপড়ের মত জাত তা বাইরে থেকে কিনে এনে পরে না, তা তার দেহের কান্তির মত, শরীরের সৌষ্ঠবের মত আপনি জীবনীশক্তির প্রেরণায় সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে। কোন সভ্যতার মধ্যে আজন্ম বেড়ে উঠতে হয়, প্রাণ দিয়ে তার স্পন্দন অনুভব করতে হয়, কল্পনা দিয়ে তার অমূর্ত্ত স্বপ্নগুলিকে এঁকে নিতে হয়, তবে সে সভ্যতার বেদনা বোঝা যায়, তার মর্ম্মকথা শুনতে পাওয়া যায়। শুধু পরিশ্রম ক'রে, শুধু বুদ্ধি দিয়ে, শুধু বিশ্লেষণ ক'রে কখনও তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। বুদ্ধি এখানে ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে, পরিশ্রম এখানে আপন ব্যর্থতায় কুণ্ঠিত হয়। কোন জাতি তার হৃদয়ের এই অন্তরতম আনন্দময় কোষেই তার সূক্ষ্মতম বীজ সংগোপনে নিগূঢ় ক'রে রেখেছে। যে শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে বিচারে জ্ঞানে বিশ্বাসে কার্য্যে কল্পনায় কতকটা ইউরোপীয় হ'তে পেরেছে সে ই ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মকথা শুনতে পেয়েছে। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, ইউরোপীয় হ'য়ে যাব না, হ'তে পারবো না (ইউরোপীয় হওয়াটা আমাদের পক্ষে শুভ কিনা সে স্বতন্ত্র কথা), ইউরোপীয়ের অল্পাধিক অক্ষম অনুকরণেই থেকে যাবো। কার্তেজীর দর্শনের কল্পনাবর্জ্জিত ঋজুতা, তিৎসিয়ানোর চিত্রের বিলোল সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের মে মাসে নবপুষ্পোদ্গমের বিপুল সৌন্দর্য্যোচ্ছাস ও সুইস হেমন্তের শ্লথবৃন্ত গলিতপত্রের পরিপক্ক বর্ণসম্ভার আমাদের কাছে কতকটা বুদ্ধিগম্য বস্তুই থেকে যাবে, অনুভূতিসিদ্ধ আনন্দ হবে না; কারণ ইউরোপের জলস্থল আকাশের আলোকের আবেষ্টনে আশা আকাঙ্ক্ষায় বিকশিত, স্নেহ মমতায় স্পন্দিত বিবেক ও বিশ্বাসে গঠিত যে ইউরোপীয় মনটি বেড়ে উঠেছে তা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতার অনুশীলন সম্পূর্ণ সফল হবে না ব'লে দুঃখ করবার কিছুই নেই, কারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা ও সমালোচনা দিয়ে অনুভব করা ব্যতীত আর বেশী কিছু ত ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দিতে পারে না। আর ইউরোপীয় সভ্যতার গ্রহণ করবার যা' কিছু তা এই ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন মহাপুরুষ অলৌকিক প্রতিভা বলে ও অক্লান্ত কল্পনার রথে চ'ড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে তার সুপ্তা রাজকন্যাটিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন ত তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা। প্রয়াস করবার প্রথমেই সাফল্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা থাকলে হতাশ হ'তে হয় না। তাই একথা তুললাম। এই পরিধির ভিতরই যদি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যের উপর দৃষ্টি রেখে কাজে অগ্রসর হই ত যে লাভ হবে, যে আনন্দ যে তৃপ্তি যে সন্তোষে হৃদয় ভরে উঠবে, যে সত্যের সাক্ষাতে আত্মার কৈবল্য সাধন হবে তাতে আমাদের জাতীয় জীবন সুসমৃদ্ধ ও সুষমামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

যাবার বেলায়

শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র এম্-এ

প্রথম দৃশ্য

[ফ্রান্সের একটা গ্রাম—এত ছোট যে পরন্তু একটা কলমের দরকার হলে আজকেই জানাতে হয় একমাত্র দোকানের বুড়িকে। সে দেয় কলম আনিয়ে শহর থেকে। চারিপাশে ছোট ছোট পাহাড়। তাদের কোলে মাত্র কয়েকটা বাড়ী। সব চেয়ে ভাল বাড়ী জমিদারের; বাড়ির নাম "শাতো দ' জেএর্।" এই বাড়ির মধ্যে একটা কক্ষ—প্রাচীন আসবাবে পরিপূর্ণ। একটা চেয়ারের উপর একজন ভারতীয় যুবক; তার সামনে এক ফরাসী মেয়ে তার মার সহিত একটা সোফায়। বেলা দ্বিপ্রহর। লাঞ্চের পর কাফে শেষ করা হচ্ছে]

মেয়ে

মা, তোমার কাফে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মা

যাক্। আমি ঘুমোই একটু। (ভারতীয় যুবকের প্রতি) অবশ্যি আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

ভারতীয় যুবক

মোটেই নয়। আমাদের দেশে খাবার পর সকলেই ঘুমোয়।

মেয়ে

এমন ঘুমকে ফরাসী ভাষায় কি বলে?

ভারতীয় যুবক

সায়েস্টা।

(মা এবং মেয়ে হাসে)

মেয়ে

ওগো মশায়! সি-এ-স্তা। বুঝলে?

ভারতীয় যুবক

আমি ইংরেজী ভাষার নিয়মানুসারে বলছিলাম।

মেয়ে

তোমায় ইংরেজী ভাষা খুব ভাল লাগে?

ভারতীয় যুবক

—লাগে। তবে ফরাসীর মত নয়।

মেয়ে

তবু তুমি ফরাসী ভাল ক'রে শিখছ না কেন? প্রতিদিন আমি—

ভারতীয় যুবক

বুঝলে না—ভাল ক'রে শিখলেই তার নূতনত্ব নষ্ট হয়ে যাবে—

মেয়ে

—বাড়বে। আজ থেকে তুমি ডিনার টেবিলে আমার সঙ্গে ভাষার আলোচনা আরম্ভ ক'রে দাও।

ভারতীয় যুবক

সকলে হাসবে।

মেয়ে

কেউ হাসবে না। শুনতে পাবেই বা কে?

ভারতীয় যুবক

তোমার মা।

মেয়ে

মা খুসিই হবে। জান ত আমার মা একটুকুও ইংরেজী বুঝতে পারে না, অথচ তোমার সঙ্গে আলাপ করবার তার খুবই ইচ্ছে।

ভারতীয় যুবক

আমি ফরাসী বলি না বুঝি?

মেয়ে

তোমার ফরাসী আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।

ভারতীয় যুবক

স্পষ্ট! বলতে আমার বাধে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, নারীর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে আমি রাজী নই।

ফরাসী মেয়ে

তুমিই না সে দিন বল্‌ছিলে যে তোমার জীবনের সঙ্গে তোমার দেশের পুরাকালের এক নারীর উক্তি—কি নাম তাঁর—ম—মৈত্রেয়ী ? না ?

ভারতীয় যুবক

(নীরব)

ফরাসী মেয়ে

বল্‌ছ না যে !......কি ভাব্‌ছ ?

ভারতীয় যুবক

ভাব্‌ছি, আবার গোঁফ্‌ রাখিলে হয়।

ফরাসী মেয়ে

হাসালে ! তাই যদি ভাব্‌ছত' রাখ্‌ছ না কেন ?

ভারতীয় যুবক

দিন কয়েকের জন্যে বিশ্রী দেখাবে যে—

ফরাসী মেয়ে

ইস্‌......তুমি চেহারার জন্য এতই......

ভারতীয় যুবক

নিশ্চয়ই......

ফরাসী মেয়ে

কখনও নয়। আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তুমি চেহারার জন্য একটুকুও ভাবো না—শরীরের জন্যও নয়।

ভারতীয় যুবক

দেখ্‌ছ ত এত সবল—

ফরাসী মেয়ে

আবার তোমার মুখ অমন হ'ল কেন ! এত করুণ দেখায় এমন অবস্থায় তোমাকে—

ভারতীয় যুবক

—আমি যে মাতৃহারা !

ফরাসী মেয়ে

আঃ ! বোলো না।

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা, বলব না।

(নীরবে অবস্থান)

ফরাসী মেয়ে

কথা কও, কিছু বল।

ভারতীয় যুবক

তুমিই বল কিছু।

ফরাসী মেয়ে

আজ রাত্তিরে যাবে আমার সঙ্গে পাহাড়ের উপর ? যেখানে খ্রীস্তের একটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে ?

ভারতীয় যুবক

আমি খ্রীস্ত মানি না।

ফরাসী মেয়ে

বেশ ত তুমি জ্যোৎস্না রাতের দৃশ্য দেখবে

ভারতীয় যুবক

আমি কবি নই।

ফরাসী মেয়ে

তাই ব'লে কি সুন্দরকে উপেক্ষা করতে আছে ?

ভারতীয় যুবক

আমার অসুন্দরই ভাল লাগে সুন্দরের চেয়ে।

ফরাসী মেয়ে

যেমন—

ভারতীয় যুবক

অন্ধকার রাতের বিশ্রী মুখ; শিশুর চীৎকার—মার মৃত্যুর পর—

ফরাসী মেয়ে

এ সবের মধ্যে ত সুন্দরও রয়েছে।

ভারতীয় যুবক

তুমি আমায় শেষ করতে দাও নি—

ফরাসী মেয়ে

তা হ'লে ব'লে যাও—শুনি।

ভারতীয় যুবক

থাক্, আর বলব না।

ফরাসী মেয়ে

নিতান্ত ছেলে মানুষ তুমি !

ভারতীয় যুবক

আমি, না তুমি ?......তুমি ব'স। আমি একটু বেড়িয়ে আসি......একলাই।......না......আমার লিষ্ট শুনে তুমি হয়ত চীৎকার ক'রে উঠবে।

ফরাসী মেয়ে

পাগল! তুমি যত সাপের নাম জান সব ব'লে যেতে পার, আমার একটুও ভয় করবে না।

ভারতীয় যুবক

সাপই তোমার কাছে সব চেয়ে অসুন্দর, না?

ফরাসী মেয়ে

আচ্ছা বেশ!......বাঘ, ভাল্লুক, ভূত—যদিও আমি বিশ্বাস করি না......শেয়ালের চীৎকার......আর আর মনে পড়ছে না। এইবার তুমি বল।

ভারতীয় যুবক

তোমার লিষ্ট শেষ?

ফরাসী মেয়ে

এক রকম।

ভারতীয় যুবক

আমি বলব না।

ফরাসী মেয়ে

এর আগে এমন ক'রে আমার কথা অবহেলা কেউ করে নি।

ভারতীয় যুবক

পরেও করবে না।

ফরাসী মেয়ে

তুমি আমায় এতই ছোট ভাব?

ভারতীয় যুবক,

কিসে বুঝলে?

ফরাসী মেয়ে

প্রথম প্রথম কতই না হাসাতে আমাদের—

ভারতীয় যুবক

তুমি হাসতে চাও—সকলের মতন?

ফরাসী মেয়ে

না। কিন্তু চাই তোমার কাছ থেকে একটু সম্মান।

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা, পাবে।

(ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান)

ফরাসী মেয়ে

তোমার লিষ্টটা দাও শেষ ক'রে।

ভারতীয় যুবক

দিচ্ছি তবে।......দেখ, আজকাল আমার কাছে সব চেয়ে সুন্দর একটা জিনিষ লাগে—সেটা বোধ হয় সব চেয়েই অসুন্দর সকলের কাছে।

ফরাসী মেয়ে

(উৎসুক হ'য়ে) কি জিনিষ?

ভারতীয় যুবক

থাম! উতলা হ'য়ো না। বলছি,......তার কোনও রূপ নেই, অথচ সে অপরূপ—নিরুপম।

ফরাসী মেয়ে

সুন্দর!! কি সেই জিনিষ?

ভারতীয় যুবক

ভ্রষ্ট স্বপ্ন।

ফসাসী মেয়ে

বুঝ্‌তে পারলাম না।

ভারতীয় যুবক

ভয় পাবে না ত—?

ফরাসী মেয়ে

না......(উৎসুক হয়ে তার কাছে দাঁড়ায়) বল।

ভারতীয় যুবক

এক নারীর মূর্ত্তি—

ফরাসী মেয়ে

(জোরে) নারীর মূর্ত্তি......অসুন্দর? বল কি? কার ....বল কার? (অতীব উৎসুক)

ভারতীয় যুবক

(ধীরে ধীরে) বে-শ্যা-র।

(চীৎকার ক'রে ফরাসী মেয়ে ব'সে পড়ে; মা জেগে উঠে তারদিকে অগ্রসর হয়, ভারতীয় যুবক অগ্রসর হয় বাহিরের দিকে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটা ছোট পাহাড়। ক্রসের উপর খ্রীষ্টের মূর্ত্তি: তারই নীচে ভারতীয় যুবক এবং ফরাসী মেয়ে। বেলা—গোধূলি। দূরে সবুজ ক্ষেত এবং আরও দূরে একটি ফরাসী যুবকের অস্পষ্ট মূর্ত্তি]

ভারতীয় যুবক

(দুই হাতের মধ্যে তার মুখ) কেন শুনলে এ কথা—?

ফরাসী মেয়ে

(ভীত ব্যস্ত স্বরে)—তুমি কাঁদছ ?

ভারতীয় যুবক

চুপ কর,......আর ও কথা বোল না।

ফরাসী মেয়ে

দাও না তোমার হাতটা আমায়—

ভারতীয় যুবক

চুপ কর!

(ক্ষণকাল নীরব)

ফরাসী মেয়ে

তুমি মহান!

ভারতীয় যুবক

সে কথাত অনেকেই বলেছে।

ফরাসী মেয়ে

তুমি সুন্দর!

ভারতীয় যুবক

(মুখ তুলে তার দিকে তাকায়)

ফরাসী মেয়ে

দাও তোমার হাতটা।

ভারতীয় যুবক

নাও।

[মেয়ে এক হাতে ভারতীয় যুবকের চোখ মুছে দেয় এবং অপর হাতে তার হাত তুলে নেয়। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে ব'সে থাকে]

ফরাসী মেয়ে

তোমার চোখ ওরকম করছে কেন?......না......হাসো না গো—আমার—!

ভারতীয় যুবক

আবার তুমি আমায়—

ফরাসী মেয়ে

আচ্ছা, না!......শুনছ?

ভারতীয় যুবক

কি?

ফরাসী মেয়ে

আমার চোখ যা বলছে?

ভারতীয় যুবক

—বুঝতে পারছি না।

ফরাসী মেয়ে

আমি আশা করেছিলাম—

ভারতীয় যুবক

কি?

ফরাসী মেয়ে

তোমায় পাব ব'লে—

ভারতীয় যুবক

(নীরব)

ফরাসী মেয়ে

তোমায় পাব না। চাই আমি এমন মানুষ যাকে গ'ড়ে তুলব আমার মনের মতন—। তুমি গড়া—শিশু নও গো তুমি। তুমি স্রষ্টা।

ভারতীয় যুবক

(হাতটা সরিয়ে নেয়)

ফরাসী মেয়ে

তুমি আমার পাওয়ার বাইরে—

ভারতীয় যুবক

এইবার বুঝতে পারলে ত?

ফরাসী মেয়ে

বুঝে কি হয়েছি জান?

ভারতীয় যুবক

দুঃখিত?

ফরাসী মেয়ে

না।

ভারতীয় যুবক

খুসি?

ফরাসী মেয়ে

না!

ভারতীয় যুবক

তবে?

ফরাসী মেয়ে

(একটু জোরে) উৎফুল্ল! জান ত কি ব'লে ডাকলে তুমি আমায় একটু আগে? সেই স্মৃতি আমার—

ভারতীয় যুবক

আমি ভুলে গেছি।

(কিছুকাল নীরব)

ফরাসী মেয়ে

তুমি কি খুঁজ্‌ছ?

ভারতীয় যুবক

যা পাচ্ছি না।

ফরাসী মেয়ে

তুমি পাবে। আমি জানি তুমি পাবে।

ভারতীয় যুবক

(উৎসুকভাবে) আমার জীবনে এই কথা তুমিই প্রথম বল্‌লে।

ফরাসী মেয়ে

আমি জানি।......আর সকলে বুঝ্‌তে পারে না—

ভারতীয় যুবক

আর যারা বোঝে তারা পাগল ভেবে আমায়—

ফরাসী মেয়ে

আঃ। বোল না!

(নীরবে অবস্থান)

ভারতীয় যুবক

ওই দেখ দূরে কৃষক তার ঘোড়ার উপর চ'ড়ে বাড়ী ফির্‌ছে!

ফরাসী মেয়ে

থাম!

ভারতীয় যুবক

একি? এবার তোমার পালা না কি? (একটু হাসে)

ফরাসী মেয়ে

(গম্ভীর স্বরে) দাও ত তোমার হাত!

ভারতীয় যুবক

(হেসে) তারপর?

ফরাসী মেয়ে

আমি যদি তোমার মাকে মা বলি তবে আমায় কি বল্‌বে তুমি?

ভারতীয় যুবক

বোন্‌।

ফরাসী মেয়ে

কাছে এসো। তাকাও আমার দিকে......ওকি? ভয় করছে?

ভারতীয় যুবক

না......এই যে!

ফরাসী মেয়ে

আর আমি ছেলেমানুষ নই। নামে চীৎকার করেছিলাম না? এই নিজেই বলছি এবার—বেশ্যা—বেশ্যা—বেশ্যা—

ভারতীয় যুবক

হ'ল কি তোমার?

ফরাসী মেয়ে

বল—আর তুমি বেশ্যার কথা বলবে না—যাবে না কখনও—

ভারতীয় যুবক

আমি যাইনি কখনও—

ফরাসী মেয়ে

(মুগ্ধভাবে) তা জানি—ওগো তা জানি। বল যাবে না কখনও?

ভারতীয় যুবক

যাব না।

ফরাসী মেয়ে

আর মনে রাখ্‌বে আমার কথা তোমার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে। বল......! বল......!

ভারতীয় যুবক

রাখ্‌ব।

(ক্ষণিক বিরাম)

ফরাসী মেয়ে

বড় ভাইকে কি বলে তোমার ভাষায়।

ভারতীয় যুবক

দাদা।

ফরাসী মেয়ে

বাঃ! এই কথা ফরাসী ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আমি জানি ইংরেজ "দ" কে বলে "ড"। নয় কি?

ভারতীয় যুবক

তাই।

ফরাসী মেয়ে

কাছে এসো! (ভারতীয় যুবক কাছে এলে ফরাসী মেয়ে তার কপাল চুম্বন ক'রে বলে—) দাদা!

তৃতীয় দৃশ্য

[ডিনার টেবিলের পাশে ভারতীয় যুবক ফরাসী মেয়ে এবং তার মা। রাত্রিকাল]

ভারতীয় যুবক

তোমার গল্প শুনে আমি মোটেই হাসতে পারলাম না। এইবার আমি যা বলছি শোন।

ফরাসী মেয়ে

বল।

ভারতীয় যুবক

একজন ফরাসী যাচ্ছিল লণ্ডনে। রাস্তায় একজন ইংরেজ তাকে লণ্ডনের মহিমা শোনাতে আরম্ভ করে বুলোনে এবং শেষ করে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে—

ফরাসী মেয়ে

এ কি হ'ল? এর মধ্যে হাস্যরস কোথায়?

ভারতীয় যুবক

থাম, আগে শোন।......ফরাসী একটা কথাই সব সময়ে ভাবছিল, যা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

ফরাসী মেয়ে

কি কথা?

ভারতীয় যুবক

কথা এই যে, ইংরেজ তাকে বলেছিল, "The sun never sets on the capital of the British Empire." বেচারি ফরাসী ভাবলে —"আমার প্যারিসে যখন সূর্য্যাস্ত হয়, তখন লণ্ডনে হবে না কেন?"

ফরাসী মেয়ে

তারপর?

ভারতীয় যুবক

তারপর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে দুপুর বেলায় পৌঁছে সে দেখ্‌লে যে সূর্য্য আকাশে নেই, পৃথিবীতে কুয়াসা—

ফরাসী মেয়ে

(উৎসুক ভাবে) তারপর?

ভারতীয় যুবক

তারপর ফরাসী ছুটে গিয়ে সেই ইংরেজকে ধরলে প্লাটফরমের শেষে আর বল্লে, "You say to me —The sun never sets on the capital of the British Empire. I understand now—He never rise."

(ফরাসী মেয়ে গল্পটা হেসে হেসে তার মাকে ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে দেয়)

ভারতীয় যুবক

আর দেখ, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না যে,ইংরেজরা তোমাদের দাসত্বে এত বদ্ধ কেন?

ফরাসী মেয়ে

সে কি? আমাদের দাসত্বে?

ভারতীয় যুবক

তার মানে ইংরেজরা তোমাদের গুরু মনে করে— তোমাদের তারা দাস।

ফরাসী মেয়ে

কি রকম?

ভারতীয় যুবক

এই ধর ঝোল! ঝোল কে তারা কখনও soup বলে কি?

ফরাসী মেয়ে

(উৎসুক ভাবে) কি বলে তবে?

ভারতীয় যুবক

বলে Consomme Russe এবং উচ্চারণ ভুল করে।

ফরাসী মেয়ে

আর কি বলে?

ভারতীয় যুবক

আর তারা বরফের ফরাসী নাম জানে না বোধ হয়, তাই তোমাদের glaceকে বলে ices de luxe,—যেটা ইংরেজীও নয়, ফরাসীও নয়।

(ফরাসী মেয়ে হেসে আবার মাকে বুঝিয়ে দেয় ফরাসী ভাষায়। মা হাসে)

মা

আপনি কালই চলে যাবেন?

ফরাসী মেয়ে

হ্যাঁ মা! ওঁর এখন লণ্ডনে দরকার।

ভারতীয় যুবক

(মাকে) কাল বিকেলে—তিনটার ট্রেনে।

মা

বড়ই ভাল লাগত আমার আপনাকে।

ভারতীয় যুবক

ধন্যবাদ। (মেয়ের প্রতি) দেখ, তোমার মাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও যে আমি তাঁকে মা বলেই জেনেছি এই কয়দিন।

[ফরাসী মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি উৎসুক হয়ে অনেক কথা ব'লে দেয় তার মাকে]

মা

(ভারতীয়ের প্রতি) ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! (একটু বিশেষভাবে পরিতুষ্ট)

ফরাসী মেয়ে

তুমি কাফে থাবে না যখন, চল একটু বেড়িয়ে আশা যাক্।

ভারতীয় যুবক

চল।

মা

বেশি দূর যেয়ো না।

ফরাসী মেয়ে

একটু বেশি দূরই যাব মা! জানত......কাল চলে যাচ্ছে! (সুর একটু উদাস)

চতুর্থ দৃশ্য

[ছোট পাড়াগেঁয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম। একটি মেয়ে এককালে ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক এবং গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা। একটু আগেই ভারতীয় যুবকের সই সে তার autograph-এর খাতায় লিখিয়ে নিয়েছে এবং ভারতীয় যুবক কয়েকটা ভারতবর্ষের ষ্টাম্প পাঠাবে ব'লে বলেছে যে, ট্রেন এলে যতক্ষণ না তার অনুমতি পায় সিগ্‌ন্যাল দেবে না। গ্রামের ছেলেরা এসেছে ট্রেণ দেখতে এবং ডাকে চিঠি দিতে। এক কোণে ভারতীয় যুবক এবং ফরাসী মেয়ে—মা একটু দূরে।]

ভারতীয় যুবক

তোমার চোখে জল!

ফরাসী মেয়ে

বাজে বোকো না!

ভারতীয় যুবক

এই দেখ্‌লে! এত জোরে কথা বল্‌লে যে, আমার হাতের উপর গেল প'ড়ে। আস্তে বল্লে না হয় থাকতো মিনিট দুয়েক তোমার চোখেই।

ফরাসী মেয়ে

(খুব আস্তে) আমার চোখের চেয়েও ভাল স্থান পেয়েছে তোমার বুকে।

ভারতীয় যুবক

আমার বুকে? বল কি?

ফরাসী মেয়ে

উঃ! কি আশ্চর্য্য লোক তুমি গো? এখনও সত্যি কথা বলবে না! আমি দেখ্‌লাম তুমি আমাব চোখের জল বুকে মুছে নিলে!

ভারতীয় যুবক

দেখ, দেখ, ছেলেটির চুল কি সুন্দর!

ফরাসী মেয়ে

দাও কথাটা ঘুরিয়ে! এই ত তোমার একমাত্র রীতি!

ভারতীয় যুবক

আর তোমার?

ফরাসী মেয়ে

থাম! একটা কথা ব'লে যাও!

ভারতীয় যুবক

কি?

ফরাসী মেয়ে

তোমার যদি মেয়ে হয় ত তার নাম রাখবে রাণী?

ভারতীয় যুবক

আবার হাসালে! আমি বিয়েই করব না!

ফরাসী মেয়ে

যদি কর—

ভারতীয় যুবক

আর পাঁচ মিনিট বাকি—

ফরাসী মেয়ে

(নিরুত্তরে রইল)

ভারতীয় যুবক

বলবে না আর কিছু ?

ফরাসী মেয়ে

(গম্ভীর ভাবে) তুমি একদিন এইখানে আমার চুলে মুখ গুঁজে মুগ্ধ হয়ে ডেকেছিলে আমার নাম !.........

ভারতীয় যুবক

এই ট্রেন আসবার সিগ্‌ন্যাল দিচ্ছে।

ফরাসী মেয়ে

কাকে ভুলোতে চাও গো ! আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি তোমার মনটি কাঁদচে—

ভারতীয় যুবক

আশ্চর্য্য দৃষ্টি ত তোমার !

ফরাসী মেয়ে

(হেসে) দাদা......

ভারতীয় যুবক

......বল।

ফরাসী মেয়ে

বল, তোমার মেয়ের নাম রাখবে রাণী !

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা, যদিই মেয়ে হয় আমার, তাহ'লে রাণী নামটাই বা রাখ্‌ব কেন ?

ফরাসী মেয়ে

আমার খুব ভাল লাগে এই নাম।

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা তাই—রাখব।

ফরাসী মেয়ে

ভাই আমার।......তুমি যাচ্ছ প্যারিসে—কিন্তু মনে রেখো—

ভারতীয় যুবক

কেন বার বার অপমান করছ আমায় ?—

ফরাসী মেয়ে

ক্ষমা কর! কিন্তু বল আর একবার। সত্যই তুমি অসুন্দরেরই মধ্যে আর সুন্দরকে জোর ক'রে খুঁজ্‌বে না ?

ভারতীয় যুবক

না।

ফরাসী মেয়ে

তোমার মার সঙ্গেই আমাকে মনে রাখ্‌বে।

ভারতীয় যুবক

হ্যাঁ।

ফরাসী মেয়ে

দুঃখকে বরণ ক'রেও ধৈর্য্য হারাবে না ?

ভারতীয় যুবক

চেষ্টা করব না হারাতে।

ফরাসী মেয়ে

আর একদিন এক জনের হ'য়ে তা'কে ধন্য ক'রে তোমার জীবনের রিক্ত অংশ পূর্ণ করবে ?

ভারতীয় যুবক

[নীরব]

ফরাসী মেয়ে

ওগো, বল নে ?

ভারতীয় যুবক

বল্‌তে পারি নে।

ফরাসী মেয়ে

না, না, লক্ষ্মীটি বল ! দিচ্ছ ত আমায়—ভাল ক'রেই দাও। গৌরবময় প্রতিজ্ঞার দান—আর ত কিছুই চাচ্ছি নে—(রুদ্ধকণ্ঠ)

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা, বল কি বলতে চাও।

ফরাসী মেয়ে

তুমি একদিন একজনের হ'য়ে—

ভারতীয় যুবক

আমি সবদিনই যে সকলের—

(দূরে ট্রেনের শব্দ)

ফরাসী মেয়ে

এই ট্রেন এসে পড়ল! আর তুমি শেষে দিলে আমার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ ক'রে! তাই ভাল—

ভারতীয় যুবক

কেন, আমি কি করলাম?

ফরাসী মেয়ে

এই যে শেষ প্রতিজ্ঞা—

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা,—স্বীকৃত হ'লাম।

ফরাসী মেয়ে

দা……দা!

[ট্রেন এসে পড়ল। ভারতীয় যুবক একটা কামরা দখল ক'রে বসে। মা এসে সেই কামরার দিকে তাকায়, মেয়ে তাকায় মার দিকে—ছলছল চোখে। ছেলেরা অজানা পথিকের সঙ্গে আলাপ করে; তাদের হাসায়, গ্রামের গল্প বলে। গার্ড গল্প জুড়ে দেয় ষ্টেশনের মেয়ের সঙ্গে]

ভারতীয় যুবক

(ট্রেন থেকে মুখ বার ক'রে) আমার একটা কথা রাখবে কি?

ফরাসী মেয়ে

[রুদ্ধকণ্ঠে] রাখব!

ভারতীয় যুবক

তুমি কেঁদোনা।

ফরাসী মেয়ে

(কান্নার সুরে) আচ্ছা!

ভারতীয় যুবক

(কাতর সুরে) বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে!

ফরাসী মেয়ে

(দৃঢ়স্বরে) না! তুমি ওরকম কোরো না। যাও—সুন্দরের সন্ধানে—সত্যের সন্ধানে—ঠিক যেমন বল্‌ছিলে সেদিন।

ভারতীয় যুবক

আচ্ছা!

[ষ্টেশনের মেয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রে যায় এবং তারপর দেয় 'সিগ্‌ন্যাল। ট্রেন সিটি দেবার দু মিনিট পরে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। ছেলেরা রুমাল দেখায় অচেনা লোকদের]

ফরাসী মেয়ে

[হঠাৎ উচ্চ সগর্ব্ব কণ্ঠে] কিন্তু……কিন্তু……যদি আমি সেদিন পাহাড়ের উপর নিজের হাতে তোমার চোখ মুছে তোমার কপালে চুমু না দিতুম—

ভারতীয় যুবক

(প্রতিধ্বনির সুরে) তাহ'লে ত আজ কখনই আমি এমন ক'রে সুন্দরের দিকে অগ্রসর হ'তে পারতাম না।

ফরাসী মেয়ে

(চীৎকার ক'রে) বল্লে গো—বল্লে তুমি—যাবার বেলায়!

শ্রীঅষ্টাবক্র

বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্য-সাহিত্যে দেশাত্মবোধের বাণী

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে, নানা কারণে, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারিগণ ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলনে ও সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তখন উহার বিলক্ষণ প্রয়োজনও ছিল। অনেকের ধারণা এই যে, এই সকল ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, স্বদেশের যাহা কিছু তাহাই তাঁহারা পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিতেন, এক কথায় 'স্বদেশী' ভাব বাঙ্গালীর মনে সম্প্রতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। স্বদেশপ্রেম মানবের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, এবং সকল যুগে, সকল দেশে, সকল সমাজেই মানব স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছে ও দিতেছে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

> "কে আছে এমন মানব সমাজে,
> হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
> *   *   হেরি স্বদেশ
> না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে
> প্রেম-ভক্তি-মোহ-অনুরাগ-ভরে
> এই জন্মভূমি—আমার দেশ।"

যখন ইঙ্গ-বঙ্গের অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ভারতবর্ষের অতীত-গৌরব কাহিনী স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন:—

> "স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
> ভূষিত ললাটে তব; অস্তে গেছে চলি
> সেদিন তোমার, হায়, সেই দিন—যবে
> দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
> কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
> গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।"*

তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী যে স্বদেশকে বিস্মৃত হইবেন ইহা অসম্ভব। বলা বাহুল্য যে বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্য-সাহিত্যে অর্থাৎ বাঙ্গালী-রচিত ইংরেজী কাব্যাদিতে স্বদেশপ্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্যসাহিত্যে দেশাত্মবোধের বাণী কি ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে মনঃস্থ করিয়াছি।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

এই স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় সাহিত্য বলিয়া কোনও সাহিত্যের অস্তিত্ব আছে কি? জাতীয় জীবনের সহিত সাহিত্য ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং কোনও দেশবাসীর পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় রচিত

* ৮ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদ

সাহিত্য স্থায়ী হইতে পারে না। বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের অন্যতম সেবক সুধীশ্রেষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ যথার্থ ই বলিয়াছিলেন যে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাশালী গদ্য-লেখক, শশীচন্দ্র দত্ত ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের ন্যায় ইংরেজী কাব্য-লেখক স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিলেন কই? 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের আদর আছে,—সাহিত্য বলিয়া নহে, ঐতিহাসিক ও প্রাত্নতত্ত্বিক তথ্যের জন্য। লালবিহারী দের গ্রন্থও পঠিত হয়—এ দেশের সামাজিক জীবনের পরিচয় লাভের জন্য।

কিন্তু জাতির মানসিক উন্নতিসাধনে যদি সাহিত্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় সাহিত্য তাঁহার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। উহা স্থায়ী হউক বা না হউক, উহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নাই এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে উহার স্থান নাই, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণও উহাকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু এই বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা যে ভাব ও চিন্তার ধারায় দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শৈশবে উহার উপর আপনার অনপনেয় প্রভাবরেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। কেবল বাংলাসাহিত্য কেন, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের উপরেও উহার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যদি এই সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল বাংলা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিয়া কেহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও প্রমাদপূর্ণ হইবে। কারণ আধুনিক বাংলাসাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের নিকট ততদূর ঋণী নহে, যত ঋণী সে বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের নিকট। যদি বঙ্গ-ইঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে অনভিজ্ঞ কেহ বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, "তুমিও ঈশ্বর গুপ্ত আমিও ঈশ্বর গুপ্ত" ইত্যাদি প্রলাপবাণী সম্বলিত "সংবাদ প্রভাকরের" পর কিরূপে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় সম্বলিত ওজোগর্ভ "সোমপ্রকাশ" পত্রের উদ্ভব হইল। কিন্তু এই বিস্ময় তিরোহিত হইয়া যায় যখন আমরা দেখি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের হিন্দুপেট্রিয়টে'র প্রতিধ্বনি স্বরূপ উক্ত পত্র বাঙ্গালী সমাজে দেশাত্মবোধের প্রচার করিয়াছিল। আধুনিক সময়েও হয়ত 'লিবার্টি' বা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্র যে ভাব ও চিন্তাধারার জন্ম দিতেছেন, তাহাই বাংলা সংবাদ পত্রগুলিতে মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যদি ইংরেজী ভাষায় লিখিত উক্ত সংবাদপত্রগুলি কেহ না পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি হয়ত অনুবাদককে মৌলিক প্রবন্ধ-লেখকের সম্মান প্রদর্শন করিয়া বসিবেন। 'সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, বাঙ্গালী-রচিত ইংরেজী সাহিত্যের স্থায়িত্ব থাকুক বা না থাকুক, উহার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের নিকট উহা উপেক্ষণীয় নহে, পরন্তু সযত্নে আলোচনার যোগ্য।

আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কবির কাব্যের প্রচার কতদূর বিস্তৃত ছিল? কয়জন ব্যক্তি তাহা পড়িয়াছেন? যদি উহার প্রচার অতি সামান্যই হইয়া থাকে, তবে কিরূপে আমরা বিশ্বাস করিব যে, ঐ সকল কাব্য বাংলা সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এস্থলে স্মর্ত্তব্য এই যে, কবির এমন গান থাকিতে পারে যাহা কেবল একজনেরই প্রাণে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু সেই একজনই একটি যুগের সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন! যেমন একটি দীপশলাকা হইতে উদ্ভূত অগ্নি একটি মহানগরীকে জ্বালাইয়া দিতে পারে, তেমনি একজন সাধক একটি স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা পাইয়া বহু হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারেন।

যাহা হউক আর দীর্ঘ ভূমিকা না করিয়া আমাদের প্রস্তাবের অবতারণা করা যাউক। 'বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখিত হইয়া থাকে। কাশীপ্রসাদই (১৮০৯-১৮৫৩) প্রথম বাঙ্গালী,—যিনি ইংরেজী কবিতা লিখিয়া অপূর্ব্ব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হরেস্ হেম্যান

উইলসন, হেন্‌রি মেরিডিথ পার্কার, রবার্ট হ্যাল্ডেন র‍্যাট্রে, হেন্‌রি টরেন্স, রেভারেণ্ড ডাক্তার আডাম্‌, কাপ্তেন ডি-এল-রিচার্ডসন, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, কুমারী এমা রবার্টস প্রভৃতি বিদেশীয় বাণী-সন্তান তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বিদ্যোৎসাহী লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ও তাঁহার বিদুষী ভগিনী মাননীয়া কুমারী এমিলি ইডেন তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'Shair and other Poems' নামে তিনি যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহার মঙ্গলাচরণেই তাঁহার স্বদেশ প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

"প্রিয় মোর স্বদেশের বীণা।
সুমধুর সঙ্গীত যাঁহার,
একবার দেহ মোরে ওগো।
মুগ্ধকর সঙ্গীতের সুধা
প্রতিভার বরপুত্র কত
সুখ-সুপ্ত মাধুরী তোমার
যদিও বিগত সেই দিন,
ক্ষুদ্র শক্তি এই করে যদি
ভারতের অতীত গৌরব।
আজি হায় হয়েছে নীরব!
স্পর্শিতে তোমার স্বর্ণ-তার,
অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত যা'র।
তাহাদের মোহন পরশে
জাগাইয়া তুলিত হরষে;
ব্যর্থ নহে এ প্রয়াস মম,
জাগি উঠে স্বর ক্ষীণতম।"

বঙ্গ-ইঙ্গ সাহিত্যের এই প্রথম কবি, যাঁহার একটি ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়া কাপ্তেন ডি-এল্-রিচার্ডসন একদা তাঁহার স্বদেশবাসীর দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলেন, "ভাবিয়া দেখ, এরূপ কবিতা বিদেশীয় ভাষায় নহে, তোমাদের স্বদেশীয় ভাষায় তোমরা লিখিতে পার কি না?"—দেশাত্মবোধের আরও অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন।

একটি কবিতার বর্ত্তমান অক্ষম লেখককৃত ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

ভারতবর্ষ

জানো কি সে দেশ যথায় সবিতা উজ্জ্বলতম কিরণ বসে?
জানো কি সে দেশ যথায় সন্ধ্যা জ্যোৎস্নার মাঝে মিলায় হসে?
যথায় তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গ রাজার গর্ব্বে তুলিয়া শির,
চুমিছে উজল উদার আকাশ শূন্যের মাঝে দাঁড়ায়ে স্থির।
যথায় পিপুল, বাবুলের, আর সুরভি চন্দন তরুর রাজি,
খেলিছে হরষে, মলয়ের সাথে, অপরূপ রূপ-গরবে সাজি।
খেলিছে হরষে,—মনে হয় যেন, ক্ষুদ্র সরলা বালিকা যত,
অন্তর যার হরষের খনি, হৃদয় স্বচ্ছ মুকুতা-মত।
যথা সুবিশাল প্রবাহিনী কত গর্ব্বে উছলি উছলি চলে,
প্রতিবিম্বিত করিয়া বক্ষে সূর্য্য-আলোক-কিরণ-দলে।
যথায় গোলাপ বেল যুঁই আদি অযুত অযুত কুসুম ফুটি'
সৌরভে তা'র দিক্‌ আমোদিত করিছে অযুত হৃদয় লুটি',
যথায় প্রকৃতি হন আবির্ভূতা উজ্জ্বলতম শোভন বেশে,
মানব-রচিত বিধিগুলি বিনা সবই যথা সুখ আনিছে হেসে,
সে যে আমাদের আলোকের দেশ, সে প্রাচীন দেশ জাননা তুমি?
জগত-বিশ্রুত হয়েছিল যা'র বিভবের কথা, সুফলা ভূমি!
দেবতাগণের প্রিয় লীলাস্থল, চিরপূজনীয়া জনম-ভূমি
তা'দের, যাহারা অপূর্ব্ব বীরত্ব-কীর্ত্তি রাখিয়া রয়েছে ঘুমি'!
এই সেই দেশ, যথা উজলিলা জ্ঞানের জ্যোতিতে ভারতী, বিশ্ব;
এই সেই দেশ, নানা শিল্প মাঝে যথায় কমলা হ'ন অদৃশ্য;

রাজনারায়ণ দত্ত

এই সেই দেশ, আজি বা অতীতে, তাহার সমান কাহার নাম?
যশের উচ্চ শৈল শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল ভারতধাম!
ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! চিরপ্রিয় মোর জনমভূমি!
ভাগ্যচক্রে কত না দুঃখ কত অপমান সহেছ তুমি!
গৌরব পতাকা কোথা আজি'তব ভূমিলুণ্ঠিত হয়েছে হায়!
কোথা সে উদ্যম, কোথা সে জীবন, কি আছে তোমার আজি ধরায়?
কেবা আছে হেথা তোমার গুস্তে পালিত হইয়া রহিবে স্থির,
তোমার দুঃখ নিরখি' নয়নে নাহি বিসর্জ্জিয়া নয়ন-নীর?

* * * *

ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভাগ্যাকাশ তব যদি আঁধার,
যদিও তোমার গিয়াছে সকলি যদিও কিছুই নাহিক আর,

তথাপি হয়ত, দূর ভবিষ্যে, কখন উজ্জ্বল গরিমালোক
উদ্ভাসিবে তব কনক কিরীট বিদূরিত করি' সকল শোক
অতল জলধি হইতে যেমতি উদিলা কমলা জগত-পূজ্যা.
বহুকালব্যাপী নিদ্রার পরে উঠিতেছে আশা ত্যজিয়া শয্যা,
কহিছে গোপনে অস্ফুট স্বরে,আসিবে সেদিন—আসিবে দিন.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত.

যেদিন তোমার দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে যাবে তুমি হবে স্বাধীন।
সকল জাতির আসনের মাঝে গৌরবময় আসন লবে,
উজ্জ্বলতম যশের মুকুট, সম্মান পূজা তোমার হ'বে!
এই শুধু দুখ,পাব না হেরিতে আমার জীবনে সে শুভদিন,
জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হ'বে, যেদিন তুমি গো হবে স্বাধীন।
হয়ত কহিবে সংশয়বাদী, এ শুধু স্বপন নাহিক আন,
তথাপি, তথাপি, স্বপনেই আমি সাদরে হৃদয়ে দিব গো স্থান,
কারণ,সে যে গো,- হোক্ না স্বপন,—লয়ে আসে হৃদে আশা নবীন,
পিতৃ-পুরুষের পদাঙ্কপূত আমারি দেশের সুখের দিন।

রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সতীর্থ, সুবর্ণবণিক সমাজের অলঙ্কার, 'Osmyn', 'Henrique & Rosina' প্রভৃতি কাব্যের প্রতিভাশালী রচয়িতা রাজনারায়ণ দত্তের (১৮১৪-৮৯) কাব্যাদিতেও স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়:—

"কিন্তু হায়, বৃথা অহঙ্কার,
সে গৌরব আজি অপগত.
দলিত হয়েছে গর্ব্ব তব,
মেঘাচ্ছন্ন ললাট তোমার!
কত জাতি করি পরাজিত,
আজি তব হায়, মাথা নত,
দাসত্বের কলঙ্ক-মণ্ডিত.
ডুবে আছ দুঃখের মাঝার,-
হে সুন্দরি দেশমাতঃ,
কোথা তব দীপ্তি গরিমার।"

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ইংরাজী কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সের রচনায় তাঁহার যে গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, কৈশোরে রচিত ইংরেজী কবিতাগুলিতেও সেই স্বদেশপ্রেম ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান আছে। তাঁহার কৈশোরাবস্থায় রচিত 'পুরুরাজ' শীর্ষক গাথার শেষ অনুচ্ছেদটি আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিবে:—

কোথা হায়! কোথা আজি, পুরু-বীরমণি,
কোথা সেই যোদ্ধৃগণ দেশগত প্রাণ!
বীররক্ত-পরিপূর্ণ যা'দের ধমনী
স্বাধীনতা-তরে রক্ত করিত প্রদান।
মৃত্যুশঙ্কা করিত না যা'দের হৃদয়,
ঘৃণিত দাসত্বে শুধু একমাত্র ভয়।
কোথা তুমি স্বাধীনতা! আছিলে অতীতে
ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-স্বরূপিণী।
ললাট তাঁহার যবে ভাসিত জ্যোতিঃতে
উজলিয়া চারিদিক, গরিমাশালিনি!
উপমা সে গরিমার শুধু হিমাচলে
অভ্রভেদী চূড়া যা'র করিছে চুম্বন
উচ্চ সিংহাসনাসীন নীল মেঘদলে,
সৌরকরোজ্জ্বলা! হায়, যেন সে স্বপন—

নদীবক্ষ সূর্য্যরশ্মি যথা উদ্ভাসিত
করি' প্রদোষেতে হায়, হয় অন্তর্হিত,
মহিমা তোমার আজি চির-অস্তমিত।
যে মুকুট শোভা পেত ললাটে তোমার
আজি তাহা ভূলুণ্ঠিত, শত্রু-পদানত,—
মুকুতা হীরক আদি, রত্নখনি আর
সমুজ্জ্বল সুবর্ণের, পরহস্তগত।
বিজয়ীর নহে তৃপ্ত ঐশ্বর্য্য পিপাসা
সর্ব্বগ্রাস করিয়াও মিটে নাই তৃষা।
রয়েছ দাঁড়ায়ে যেন তরু উচ্চ শির
ফল পুষ্প পত্রহীন অতি দীনবেশে
প্রতি বাত্যা দেয় দোল করিয়া অস্থির,
পবন হিল্লোলে নিত্য চঞ্চল, অধীর
সবার ঘৃণার পাত্রী মরণেরও শেষে।

মাইকেল মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী কাব্য Captive Ladie-তেও তাঁহার দেশপ্রেমোদ্দীপনী বাণী শুনিতে পাই। আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব উক্ত কাব্যের যে বঙ্গানুবাদ * করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"কিন্তু আমি ভাবি কেন এত যোদ্ধা বীর
বন্দী সম রহে এই আঁধার ভবনে ?
কেন বা আরোহি' অশ্বে, সাহায্যে অসির
দলিবারে নাহি যায় দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জনে ?
রক্ষিতে দুর্ব্বলে, মাতি' শত্রু সহ রণে।

শুনিতেছি বহুদূর পশ্চিম হইতে,
সমর প্রবাহ অতি ভীষণ আকারে,
আসিতেছে বন্যা সম এদেশ গ্রাসিতে,
যবন দলিছে পদে হিন্দু-দেবতারে।

'আমরা কি ভীরুসম রহিব বসিয়া;
বীরের উচিত ধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন,
মলিন শশাঙ্ক পানে রহিব চাহিয়া,
না করিব রণক্ষেত্রে যশঃ উপার্জ্জন ?"

* "অবরুদ্ধা"। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'ক্যাপটিভ লেডী' নামক ইংরেজী গ্রন্থ হইতে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র দত্তের খুল্লতাত স্বনামধন্য মনীষী শশীচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুরের (১৮২৪-৮৫) "My Native Land" শীর্ষক কবিতাটি কবির আন্তরিকতায় ও স্বদেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যে অতুলনীয়। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—
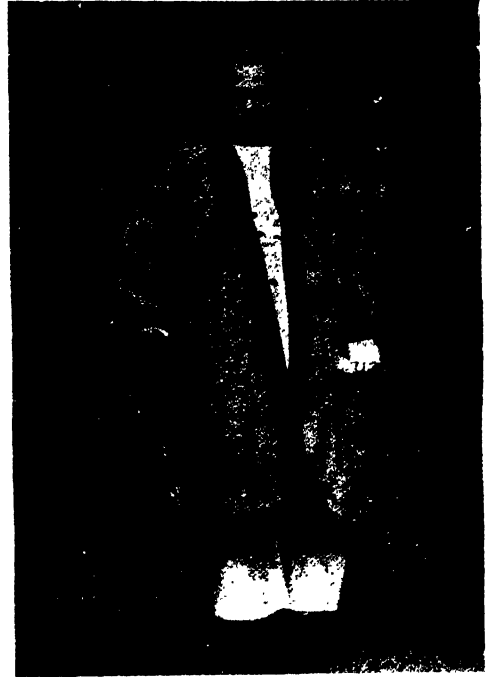
রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

স্বদেশ

তবুও স্বদেশ। তুই প্রীতি-প্রদায়িনা,
নেহারি সৌন্দর্য্য তোর সিন্ধুতট পরে,
তব তরুলতা, তব প্রবাহিণী
উচ্ছ্বসিত ক'রে হৃদয়-তটিনী,
গৌরব যদিও তোর গেছে চির তরে।
পরাধীন দেশ মোর! অতীতে তোমায়
করিয়াছে অপমান কত অত্যাচারী!
মহিমা মুকুট লুটায় ধূলায়,
তবুও তবুও, নাহি জানি হায়,
কেন এ আনন্দ তোর নামটি উচ্চারি'।

তোমার মন্দির আজি নিস্তব্ধ, নির্জ্জন,
একদিন দেবগণ রাজিত যথায়,
বিষাদে বহিছে স্রোতস্বিনীগণ,
জলদেবীগণ না দেয় দর্শন,
শঙ্খধ্বনি তাহাদের নাহি শুনা যায়।

পত্র-পুষ্প-সুশোভিত উদ্যানে কাননে,
কবির উৎসাহ গীত ঝঙ্কারে না আর,
বিচিত্র প্রসূন ফুটে উপবনে,
কিন্তু সে অতীত কেবলি স্মরণে,
ফিরিবে না কভু সেই দিন গরিমার;

উচ্ছ্বসিত হয় তবু এ হৃদয় মোর,
তোমার কানন হেরি, সমুদ্র-সৈকত,
অজ্ঞাতে হৃদয়ে আসে চিন্তা ঘোর,
অব্যক্ত বেদনা, দীর্ঘশ্বাস, তোর
মহিমার দিন স্মরি, শুভ দিন গত!

অতীত গৌরব হয় উদয় হৃদয়ে,
যার গর্ব্বে মাতি' যবে ভারত সন্তান,
আস্ফালিত দলিয়া শত্রু সৈন্য চয়ে,
সিন্ধুতট পথে জয়ধ্বজা ল'য়ে,
গাহিত জগত তাহাদের যশোগান।

আনন্দে উঠিত জ্বলি' রমণী-নয়ন,
স্পন্দিত হইত বক্ষ, উঠিত কাঁপিয়া,
অগ্রসরি' বীরে করিত বরণ,
চারু পুষ্পমালা, বিচিত্র ভূষণ,
ম্লান হ'ত তার পুণ্য-মাধুরী হেরিয়া।

পরাধীন দেশ মোর! কোথা আজি তব
অতুল ঐশ্বর্য্য আর অতীত গরিমা!
পাঠানের দর্প, মোগল-গরব
বিনাশ করিয়া সকল বিভব,
এঁকেছে ললাটে তব কলঙ্ক-কালিমা!

স্বাতন্ত্র্যের পুণ্যতীর্থ! আজি বিলুণ্ঠিত
হা ধিক্! দাসত্বে তব সন্তানের শির,
সাহসী নির্ভীক বীর তিরোহিত
পুণ্য কীর্ত্তিস্তম্ভ আজি অন্তর্হিত,
গৌরব-মুকুট কোথা আজি ধরণীর?

তবু প্রভাকর আজ(ও) করে আলোকিতা,
কিরণ-সম্পাতে তার তব গিরিমালা,
কত শত পুণ্য স্মৃতি বিজড়িতা
তীর্থক্ষেত্র চুমি' নদী প্রবাহিতা
অধীর পবন করে তার সাথে খেলা।

আজ (ও) কত শত দেবী নারী মূর্ত্তি ধরি'
ভ্রমিছে তোমার শত প্রবাহিণী-তীরে,
হেরি ভগ্ন-চূড় মন্দির তোরি,
অতীতের সেই পুণ্য-কীর্ত্তি স্মরি',
দেবতার শত লীলা আছে যথা ঘিরে!

* * * *

দুঃখিনী হ'লেও তুমি, স্বদেশ আমার!
তব তরে প্রাণ মোর হইবে ব্যথিত,
দুর্ভাগিনী মাতঃ হৃদয়ে তোমার
বিঁধেছে যে শেল, বেদনা তাহার
অনুক্ষণ হৃদি মোর করে সন্তাপিত।

ভাল না বাসিয়া তোমা' রহিব কেমনে?
ভ্রমি যবে সুরভিত-কাননে তোমার,
ইচ্ছা হয় শুধু ভুলে যাই মনে,
মধুর স্বদেশ প্রেমে, সংকীর্ত্তনে,
তোমার গৌরব-রবি উদিবে না আর।

'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক **গিরিশচন্দ্র ঘোষ** (১৮২৯-৬৯) স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক প্রস্তাবাদির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৈশোরে ইংরেজী কবিতা রচনা করিতেন এ সংবাদ অনেকে অবগত নহেন। 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে আমরা জ্ঞাত হই যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তদীয় বন্ধু কৈলাসচন্দ্র বসু-সম্পাদিত Literary Chronicle নামক মাসিক পত্রে গিরিশ-

চন্দ্র 'শিখ রণসঙ্গীত' শীর্ষক একটি উদ্দীপনাময়ী গীতিকবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি আমরা সম্প্রতি উদ্ধার করিয়াছি এবং উহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

এখনো দুলিব সংশয় দোলায়,
নিয়তি ভাবিব কম্পিত হিয়ায়,
অরি যবে আসি দুয়ারে দাঁড়ায়,
বাজায় ভেরীর ভীম উন্মাদনী তান ?
ধর অস্ত্র বীরগণ! হও আগুয়ান্!

কি কারণে ভীত মোদের হৃদয় ?
পবিত্র পঞ্জাব হ'তে পারে লয় ?
রঞ্জিতের আত্মা অম্বরাক্ষময়
দেশরক্ষা তরে সবে প্রহরী সমান ;
ধর অস্ত্র বীরগণ! হও আগুয়ান!

ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা কভু নয়,
বিধির বিধান ব্যর্থ নাহি হয়—
আমাদেরি রণে হবে আজি জয়,
শত্রু রক্তে ভূমি প্লাবিবে নিশ্চয় ;
হয়েছে বিগত সুদিন তাহার,
প্রাচীন পবিত্র এ দেশেতে আর,
রহিবে না তার প্রভুত্ব বিস্তার,
দূর কর মিথ্যা ভয়, বীরের সন্তান!
বীরত্ব দেখাতে সবে হও আগুয়ান্!

মরণেরে ভয় ? হয় মৃত্যু হ'বে,
তাই বলে শত্রু-পদানত র'বে ?
মর্ম্মান্তিক ঘৃণা কর যাহাদের,
প্রাণভিক্ষা ল'বে হাতে তাহাদের ?
ক্রীতদাস মত
হয়ে অবনত ?
সে যে অপমান
মরণ সমান!
যতদিন রবে পঞ্জাব জাগ্রত,
ওগো জন্মভূমি! হে মাতঃ ভারত!
মরণ শয্যায় অঙ্গে শত ক্ষত,
তবুও বহিছে দেহে প্রাণ-স্রোতঃ,
প্রাণশক্তি তব আছে অব্যাহত ;
দেবতার সৃষ্ট পঞ্জাব পতনে
শেষ শ্বাস তব মিলাবে পবনে।
ঐ হের খড়্গ হয়েছে উদ্যত
আঘাত করিতে তাঁর শিরোপরি,
কাতর নয়নে চাহিছে ভারত
তোমাদের সেবা—বিতাড়িতে অরি।
তোমরা কি স্তব্ধ পর্ব্বত মতন
দাঁড়ায়ে হেরিবে মাতার মরণ ?

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

দেশপ্রেমে জ্বলে নাকি কাহারো পরাণ ?
ধিক্! ধিক্! ধর অস্ত্র বীরের সন্তান!

গবাক্ষ হইতে হের কি উৎসুকা ভরে
চেয়ে আছে রমণীরা, আঁখি হ'তে ঝরে

কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃধারা, নক্ষত্রের মত
স্নিগ্ধালোকে রণক্ষেত্রে দেখাইছে পথ।
যদ্যপি ক্ষেত্র ত্যাগ করি কর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
তব নাম ধরি' তারা বিদ্রূপ করিবে বরিষণ,

হরচন্দ্র দত্ত

ঘৃণায় ফিরাবে মুখ গরবিণী রমণী রতন,
কাপুরুষ বলি' তারা মোদের করিবে প্রত্যাখ্যান;
ধর ধর অস্ত্র সবে, বীরগণ হও আগুয়ান।
এস এস অগ্রসর হই সুনির্ভীক বীরগণ!
বীরের উচিত মত শত্রুগণে করি আক্রমণ।
যদি হই জয়ী মোরা,—বীরধর্ম্ম হইবে পালন;
মরণের কোড় হ'তে ছিনি' দেশে অর্পিব জীবন।
নাহি রবে, পরাধীন আমাদের দেশভ্রাতৃগণ।
বিজয়ী বীরের মত গৃহে মোরা ফিরিব সকলে,
রমণীরা প্রেমভরে যশোমালা পরাইবে গলে,

কিম্বা যদি ভাগ্যবশে যাই মোরা শমন-সদন,
সে তো অতি গৌরবের, সে মরণ বীরের মরণ,
স্বদেশের তরে রক্ত দিয়া,
স্বাধীনতা নাহি বিসর্জ্জিয়া,
মরিলে স্বল্পায়ু প্রাণ রহিবেক কীর্ত্তিতে অমর;
উপবন, প্রান্তর, ভবন,
মুখরিত হ'বে অনুক্ষণ,
আমাদের যশোগানে, স্মরিবে সকলে নিরন্তর,
কিন্তু শুন শত্রুদের ভেরী আরো বাজিছে ভীষণ,
আর নহে বাক্যব্যয়। ধর ধর অস্ত্র যোদ্ধ গণ!

রাম বাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত বংশোদ্ভব হরচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র Dutt Family Album নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হরচন্দ্র দত্ত (১৮৩১-১৯০১) একটি সুন্দর সনেটে তাঁহার দেশ-জননীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন:—

ভারতবর্ষ

ভালবাসি তোরে আমি, প্রিয়তর নাহি কিছু হেন
হে মোর জনমভূমি! সুধাপূর্ণ নাম যবে তোর
উচ্চারি', জ্বলিয়া উঠে হৃদয়ের অন্তস্তলে মোর
আগ্নেয়গিরির মত অনির্ব্বাণ বহ্নিরাশি যেন।
অতীতের যবনিকা অকস্মাৎ হয় তিরোহিত,
গৌরবের দিন তব স্মৃতি পথে আসে পুনর্ব্বার,
প্রাসাদ, বিচিত্র হর্ম্ম্য, স্তম্ভরাজি, দুর্ভেদ্য প্রাকার,
বীরগণ অকাতরে যারা তোমা' তরে দিয়েছে শোণিত।
কিন্তু স্বপ্নসম গতে, হায়, যথা হৃদয় আঁধার
সেইরূপ দুঃখ মম, অতীতের সুখ স্মৃতি গতে,
তোর দুঃখে এ হৃদয়ে শোকগীতি গুঞ্জরিয়া উঠে,
কোথা যশোমালা তব? কোথা তব সম্পদ-সম্ভার?
জানি কিন্তু চিরদিন রবে না এ বিষাদ-শর্ব্বরী,
দিবালোক-রেখা ওই আসিতেছে তমঃ অপহরি'।

সুপ্রসিদ্ধ কবি রামশর্ম্মা (নবকৃষ্ণ ঘোষ)—(১৮৩৭-১৯১৮) নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও আন্তরিক স্বদেশপ্রিয়তার জন্য দেশবাসীর হৃদয়ে অতি উচ্চ আসন অধিকৃত করিয়া

আছেন। তাঁহার "A Gleam of Hope for India" শীর্ষক কবিতাটির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

একদিন যথা গরবে গৌরবে ছিলে তুমি সমাসীন,
প্রমত্ত বিদেশী আজি তথা নাচে হাসে।
তব সন্তানের প্রিয় স্বর্ণকেতু ছিল যথা উড্ডীন,
বিদেশী পতাকা সে প্রাকাশে আজি ভাসে॥

নবকৃষ্ণ ঘোষ (রাম শর্ম্মা)

কত রাজা যথা মহারাজ্ঞী বলি' করেছে বন্দনা গান
সেথা আজি তুমি সেবিতেছ দাসী হ'য়ে।
যে ললাটে তব পরেছ একদা রত্নময় শিরস্ত্রাণ
সে ললাটে আছ দাসীত্বের চিহ্ন ব'য়ে॥

মেঘাবৃত চন্দ্র যথা পাণ্ডুবর্ণ তুমিও আজি তেমতি
ভেদিয়া তোমার কলঙ্ক আঁধার রাশি।
ভাতে না আনন্দ অথবা আশার ক্ষীণতম তারা-জ্যোতিঃ
বন্য শিবারবে নৈশ-চিন্তা যায় ভাসি॥

অনাদৃতা প'ড়ে আছে তব বীণা জগত-উন্মাদনী
নীরব সে গীতি সর্ব্বজন সংমোহিনী।
শ্রবণ বিবরে শুধু পশে তব চরণশৃঙ্খল-ধ্বনি,
ঝনন্ ঝননঝনন্ ঝনন্ ঝিনি॥

উজল তারকা খচিত মুকুটে সুশোভিত তরু প্রায়,
কি শোভায় তুমি ছিলে দীপ্তিময়ী হায়!
পুনঃ পত্রহীন সেই তরু যথা গৌরবহীন ভায়,
তুমিও তেমতি আজি হৃত গরিমায়॥

ছিন্ন মলিন বসন তোমার, রুক্ষ অলকদাম,
ধূলায় লুণ্ঠিত যত তব অলঙ্কার।
যেন মূর্ত্তিমান শোক আছে বসি স্মরিতেছে অবিরাম,
অতীতের আশা জাগিবে না যাহা আর॥

ঝরিতেছে বারি নয়নেতে তব গিরি নির্ঝর প্রায়,
হৃদি-শতদল ফুটে উঠে কই তা'য়?
যে আত্মচেতনা জেগে উঠে সে যে মরে যায় পুনরায়
তোমার দীরঘ শ্বাসের উষ্ণ বায়॥

শিল্পে ও জ্ঞানে তব সন্তান ছিল সুযশবান্
ধরণী মুগ্ধ, শুনি যারস্থ-কথা।
আজি অগৌরবে কি মনোদুঃখে আছে তব সন্তান,
পিতামহগণ কাৰ্ত্তি লাঞ্ছিত যথা॥

উঠ মা ভারত! সৌন্দর্য্যের রাশি! উঠ প্রিয় দেশ মোর!
দুর্দ্দশায় তব কেদেছ ত বহু দিন মা!
মুছ আঁখিজল, ত্যজ দীর্ঘশ্বাস, সময় এসেছে তোর,
নিয়তি হইতে কেড়ে আন হৃত-গরিমা॥

আছে বন্ধু যারা মহৎ উদার বিশ্বের সাধে মঙ্গল,
তোমায় নিগড় মুক্ত করিবারে চায়।
যে আগুন তব রয়েছে গোপন উজলি, ধরণীতল
জ্বলিয়া উঠুক পূর্ব্বতেজে পুনরায়॥

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) স্বদেশপ্রেমের পরিচয় তাঁহার রচনাবলীর প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়। তাঁহার একজন জীবনচরিতকার তাঁহার একটি ইংরাজী

কবিতার যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

এই কি সে দেশ যাহা পূর্ব্বে খ্যাত ছিল ?
মহাবলী বীরগণ জনম লভিল ?
স্বদেশ হিতের তরে দিয়াছিল প্রাণ
স্বাধীনতা রক্ষা হেতু ছিল যত্নবান.
গিরি গুহা উপত্যকা তাহারা সকলে
স্বাধীন এদেশ ছিল সকলেই বলে।
বৃথা কি হইবে এই উচ্চ ভেরিরব ?
শুনিবেনা কেহ কর্ণে, রহিবে নীরব ?

রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই

জনাকীর্ণ স্থান আর ক্ষুদ্র পল্লী যত
উত্তর না পাই কেন ডাকি আমি যত ?
স্তব্ধ কেন রহিয়াছ মুখে নাহি রব ?
অনন্ত নিদ্রায় বুঝি অভিভূত সব ?
মহৎ প্রকৃতি তব জন্ম আর্য্যকুলে
গত গৌরবের কথা রহিবে কি ভুলে ?
মনুষ্যত্ব, পরাক্রম শূন্য কি হৃদয় ?
বাতাসে কাঁপিছে দেহ যেন বোধ হয়।

পূর্ব্ব কীর্ত্তি হইয়াছ তুমি বিস্মরণ ?
পিতৃনাম সুযশ দিয়াছ বিসর্জ্জন ?
কি হইবে উপকার বর্ণন করিয়া
পূর্ব্ব গৌরবের দিন,—গিয়াছে চলিয়া.
তেজোহীন কবিতায় বর্ণনে কি ফল,
পূর্ব্বনাম, যশোরাশি, সদ্‌গুণ সকল ?
প্রাচীন দেশের কথা ভুলিতে না পারি
সেই হেতু কাঁদে মন, ফেলি অশ্রুবারি।
কল্পনা করেছি আমি সে কথা স্মরিব
তব কীর্ত্তি যশরাশি মনেতে ভাবিব
মনুষ্য আলয় যবে যশের কিরণ
করেছিল আলোকিত মানব জীবন।
ভারত কিরণ হয় উজ্জ্বল যেমন
তব কীর্ত্তি যশরাশি প্রদীপ্ত তেমন
যৌবনের পরাক্রম চিন্তা শক্তি তব
কবিতা ভাণ্ডার আর সৌন্দর্য্য বৈভব
সে সকল কথা মনে হইলে স্মরণ
হয় সুখোদয় মনে, প্রফুল্ল বদন।

যোগেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর **যোগেশচন্দ্র** (১৮৪৭-১৯১৫) Indian Pilgrim নামক কাব্যগ্রন্থের প্রতিছত্রে ভারতের দুর্দ্দশায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। একটি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ :—

কঠিন আয়স নহে হৃদয় আমার,
নহে তাহা অচেতন জড় মৃত্তিকার,
রক্তে মাংসে গড়া দেহ বোধ আছে তার,
কাঁদে সেও হেরি দুঃখ স্বদেশ মাতার—
হেরি মরুভূমি সম শূন্য চারিধার।
নিবিড় হইয়া আসে অন্ধকার দিন
স্বপন আশ্রয় করি ভুলি' বর্ত্তমান,
অতীতের গরিমার স্বপ্নে যবে লীন,
স্বপনও ভাঙ্গিয়া, হায়! ক্ষণ মধ্যে হয় অবসান!

বিহারীলাল গুপ্ত সি-এস্-আই

রমেশচন্দ্রের সতীর্থ স্বনামধন্য **বিহারীলাল গুপ্ত** (১৮৪৯-১৯১৬) অবসরকালে কাব্যের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতার দুইটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দেখিছনা চেয়ে, আসিতেছে ফিরে,
পাণ্ডুর ললাটে, রক্তস্রোত ফিরে,
দেখিছ না ওই নিঃশ্বাস ধীরে
পড়িছে, স্পন্দিত করিছে মা'কে?
ভুবনমোহিনী হয়েছে কম্পিতা,
দিতেছেন সাড়া হয়ে জাগরিতা,
বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং, রিপণের ডাকে?
এস তবে ভাই, এস কাছে মা'র,
জাগিছেন মাতা, করি সেবা তাঁর,
তিনিই মোদের, কেহ নাই আর,
—মোদের লজ্জা, মোদের গর্ব্ব।
এস সবে ঝাঁপি করম সমরে,
স্বার্থত্যাগ করি' উচ্চ লক্ষ্য ধরে',
অন্যের গর্ব্ব হইবে খর্ব্ব।

অরু দত্ত ও তরু দত্ত

রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য কন্যা **অরু** (১৮৫৪-৭৪) ও **তরু দত্তের** রচনাতেও বহুস্থানে দেশাত্মবোধের বাণী

শুনিতে পাওয়া যায়। A Sheaf Gleaned in French Fields নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত যে কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল তাহা একজন ফরাসী কবির কবিতার অনুসরণে রচিত হইলেও উহা অরুর প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কোথা মোর স্বদেশের বিমল আকাশ!
হেথা তব তরে মম হৃদয় কাতর;
কোথা পিতৃগৃহ মম, শান্তির আবাস!
মোর কাছে প্রিয় হ'তে কত প্রিয়তর!
নিদাঘের কত শোভা করিছ প্রকাশ,
পার না কি প্রদানিতে, ওহে প্রভাকর!
মোর স্বদেশের গৃহ,—উদার আকাশ,
আমার জীবন আর আনন্দ-আকর?
* * * *
ফুটে উঠ প্রতিদিন জন্মভূমি মোর!
উদ্ভাসিয়া স্মৃতিপট মানস-নয়নে,
জনম আমার স্নিগ্ধ বক্ষোমাঝে তোর,
তব বক্ষে স্থান যেন পাই গো মরণে!

তরু দত্তের (১৮৫৬-১৮৭৭) Ancient Ballads and Legends of Hindusthan নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রহ্লাদ' নামক গাথার শেষ কয় ছত্রের মর্ম্মানুবাদ পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাঁহার কাব্যের উদ্দীপনা শক্তির পরিচয় পাইবেন :—

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব যুগে মনে রেখ অত্যাচারিগণ,
নৃসিংহ মুরতি ধরি অবতীর্ণ হন নারায়ণ,
অন্তরীপ হ'তে অন্তরীপে প্রেরণ করেন বাণী তাঁর,
সময় নিকট হয় যবে, চমকিয়া উঠে অত্যাচার।
নির্যাতন সহে বটে ঘোর লক্ষ লক্ষ মানব সন্ততি;
কিন্তু মনে রেখো তাহাদেরি আছে মহাসিংহের শকতি!
শৃঙ্খলের কঠোর ঘর্ষণে উত্তেজিত হইলে কেশরী,
রক্ষা নাই দুর্দ্দান্ত নৃপের, কালান্তক সে দুর্দ্ধর্ষ অরি।

"আমার দেশ" এর কবি **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়** (১৮৬৩-১৯১৩) যৌবনে প্রকাশিত Lyrics of Ind নামক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই (The Land of the Sun) স্বদেশের স্তুতি করিয়াছেন। আমরা সেই কবিতাটির শেষ চারিটি মাত্র শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম :—

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,

বক্ষে-উৎসারিত তা'র মহা নদ নদী,
চরণে ফেনিল সিন্ধু তরঙ্গ-ভীষণ।
গিরিরাজ পার্শ্বে তার নিয়ত প্রহরী,
শিরে নীল নভঃ করে জ্যোতিঃ বরিষণ ॥
রবিকরে উদ্ভাসিত সেথা 'কাব্যকলা',
'সৌন্দর্য্য' সঙ্গীত গাহে, 'সুস্বর' নাচয়ে।
ত্রৈদিব আনন্দ তথা, গৌরবে মণ্ডিত,
গলিয়া স্বপন হয়, কল্পনা রচয়ে ॥
দেশ মম! কভু হ'তে পারি কি বিরত
পূজিতে তোমারে, হেরি দুর্দ্দিনে পতিতা?
হা ভারত! এককালে, মনোরমা বালা,
পৃথিবীর রাণী ব'লে ছিলে পরিচিতা ॥
এবে চূর্ণ গর্ব্ব-তব, মহিমা বিলীন,
নাম মাত্র আছে বাকি যশঃ অপহৃত।
তথাপি তোমার রূপ রবির কিরণ
লজ্জার তুষার ভেদি করে চমৎকৃত ॥

আধুনিক বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কবিগণের মধ্যে **অরবিন্দ ঘোষ** ও তদীয় সহোদর **মনোমোহন ঘোষের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। অরবিন্দের গদ্যরচনাও সুদূরপ্রসারিণী কল্পনা, অনির্ব্বচনীয় ভাব ও চিন্তার লীলামাধুর্য্যে কবিতারাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহার রচনায় অভিব্যক্ত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাঠকগণকে দিবার প্রয়োজন নাই। নবযুগের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের তিনি যে উৎকৃষ্ট ইংরাজী

অরবিন্দ ঘোষ

পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরেও পঠিত হইতেছে। মনোমোহনের কবি-কীর্ত্তির পরিচয় পাঠকগণ "বিচিত্রা"তে পূর্ব্বেই যোগ্যতর লেখকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রথম বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কবি কাশীপ্রসাদ তাঁহার বীণায় যে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, তাহা এখনও নীরব হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীপ্রসাদ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, শতবর্ষ বাঙ্গালী তাহার গৌরব কেবল অক্ষুণ্ণ রাখে নাই, পরন্তু বর্দ্ধিত করিয়াছে। যাঁহার অলোকসামান্যা প্রতিভার দীপ্তিতে আজ বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্যসাহিত্য অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত, যাঁহার স্বদেশপ্রেমের গভীরতা কেবল তাঁহার বাণীসেবার ঐকান্তিকী নিষ্ঠারই উপযুক্ত, বাণীর সেই বরপুত্রী—**সরোজিনী** নায়ডুর "To India" শীর্ষক সুন্দর কবিতাটির এই অযোগ্য ভাবানুবাদ দ্বারা আমরা প্রস্তাবটি সমাপ্ত করিব :—

সরোজিনী নায়ডু

স্মৃতির অতীত কত যুগ যুগান্তর,
ব'য়ে গেছে জননী গো, তোমার উপর :
তথাপি নবীনা তুমি ! ভেদি' গাঢ় তমঃ
উঠ মা আবার ল'য়ে নূতন জনম,
পরিণয়-সাজে সাজি' ত্রিদিব-সভায়,
উচ্চ সিংহাসনে বস আপন প্রভায় ;

অন্তর জঠর হ'তে হউক উদ্ভব
অসংখ্য আলোকময় নবীন গৌরব !

শৃঙ্খলিত জাতিচয় কাঁদিছে আঁধারে,
কাতরে ডাকিছে তারা সতত তোমারে ;
যাচে, নেত্রীরূপে কর পথ প্রদর্শন,
যথা নিশা শেষে উষা দিবে দরশন,
জাগো মা গো, জাগো, কেন এত ঘুমঘোর ?
উঠ, সাড়া দাও, ডাকে সন্তানেরা তোর।

ভবিষ্যৎ ডাকে তোরে বহুবিধ স্বরে,
বহুকণ্ঠে ডাকিতেছে সমাদর ভরে ;—
লহ মান, সুখৈশ্বর্য্য ক্রম-বর্দ্ধমান,
বিজয় গৌরব লহ, উজ্জ্বল মহান্ ;—
উঠ মা মুকুট পর নিদ্রা পরিহরি,
অতীতে ছিলে যে তুমি রাজরাজেশ্বরী !

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

এই প্রবন্ধসহ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অরবিন্দঘোষ মহাশয়ের ব্লকখানি ১২।৪, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার কে, পালিত মহাশয় কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পন্দিচারীতে গৃহীত আলোক চিত্র হইতে প্রস্তুত। পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে চিত্রখানি প্রকাশিত হইল।

প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

ইহাই নিয়ম

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত

যে নৈতিক সাহস সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা পুস্তকে লেখা আছে, সেই সাহস দেখাইতে গিয়াই বিভ্রাট বাধিল। সোমবার দিনের বেলা সাড়ে দশটা,—অরিন্দম আফিসে আসিয়া নিজের চেয়ারটিতে বসিল, ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজাইল, বেয়ারা আসিয়া সেলাম ঠুকিলে তাহাকে অনাবশ্যকভাবে মিনিট তিন চার দাঁড় করাইয়া রাখিল, পা দুইটা টান্ করিয়া টেব্‌লের তলায় ছড়াইয়া দিল, হাতের আঙুল মট্‌কাইল, আলস্য ভাঙ্গিল, শেষে বলিল, "পেটি' এ্যাকাউন্টস্ ফাইল—"

কি শান্তি! কি গৌরব! মাথার উপরে পাখাটা পুরা জোরে ঘুরিতেছে, পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুরিবেও,—অরিন্দম মনে মনে হিসাব করে, মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ হইবে, কত টাকার বিল হইবে ওই পাখাটার জন্য।

চারিটা টেব্‌ল্ দূরে হরিশবাবুর চেয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া জন কয়েক কেরাণী নিম্নস্বরে কি যেন একটা বলাবলি করিতেছিল। অরিন্দম উঠিয়া দাঁড়াইল, নিকটে আসিয়া বলিল, "কি মশাই, কিসের আলোচনা হচ্ছে?"

"যোগেনকে হাম্‌ফ্রিজ সাহেব জবাব দিয়েছে।"

"জবাব দিয়েছে কি রকম?—তার অপরাধ?"

"শনিবার দিন ড্রয়ারের ভিতর বই রেখে পড়্‌ছিল।"

অরিন্দম বুকটা টান করিয়া হাত দুইটা পকেটে পুরিয়া দিল; মনে হইতেছিল সে-ই যেন হাম্‌ফ্রিজ সাহেব। জিজ্ঞাসা করিল, "তার হাতে কোন কাজ ছিল তখন?"

"না।"

"আফিস ছুটি হ'বার আর কতক্ষণ বাকী ছিল?"

"আধঘণ্টা।"

"তখন আর নূতন কোন কাজের ভার তার হাতে দেওয়ার সম্ভাবনা তাহ'লে একেবারেই ছিল না?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তাকে জবাব দেওয়া হ'য়েছে কখন?"

"সাহেব তাকে সেই দিনই ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক ধমক-ধামক করেছিল,—আজ আফিসে এসে বস্‌তেই বেয়ারা তার হাতে একটা স্লিপ দিয়ে গেল; হাম্‌ফ্রিজ শনিবার দিনই লিখে রেখে গিয়েছে,—যোগেনের আর আফিসে আসার প্রয়োজন নেই,—এক মাসের মাইনে সে এম্‌নি পাবে। কোম্পানীর চাকরী তার মতন দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকিবাজ লোকের জন্যে নয়।"

অরিন্দম কহিল, "এটা অন্যায়, তাকে ওয়ার্ণিং দিয়ে দিলেই যথেষ্ট হ'ত।"

হরিশ কহিলেন, "এই বল ত ভায়া, আমিও সেই কথাই এদের বল্‌ছিলাম। বেচারা যোগেন,—ওকে আমি এর আগে কতদিন বলেছি, নভেল টভেল পড়্‌বি ত পড়্, কিন্তু আমার কাশিটার দিকে একটু কান রাখিস্। দরজার কাছে বসি,—তোদের এ সামান্য উপকারটুকুও যদি আমার দ্বারা না হয় তাই'লে শুধু শুধুই এতগুলো বছর এখানে ভূতের বেগার খাটছি। কিন্তু কাশি ত কাশি, কানের কাছে কামান দাগ্‌লেও বোধ হয় ওর নভেল পড়ার সময় চৈতন্য হয় না। কিছু বল্‌লে বলে, সমস্ত কাজ শেষ ক'রে তবে ত বই পড়ি,—আমার কোন কাজে কোনদিন ত্রুটি দেখেছেন?—আর ত্রুটি! হাম্‌ফ্রিজ সাহেব এসে বইখানা ধ'রে যখন টান্‌লে ও তখন বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই সাহেবের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'আরে যাও যাও, সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।' সাহেব যেই ঘোঁৎ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, 'হোয়াট্' অম্‌নি যোগেনের চোখ উপরদিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হ'য়ে গেল।—

আমরা ডেপুটেশান পাঠাব ভায়া,—যোগেনের জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত,—আর বিনা ওয়ার্ণিংতে এত সহজে যদি চাকরী যায়, তাহ'লে ত পারা যায় না।"

অরিন্দম কহিল, "আমি রাজী আছি;—এ রকম অন্যায়ের একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। চলুন আগে আমরা সাহেবের কাছে যাই, তারপরে খবরের কাগজে চিঠি লিখ্‌ব। ডেপুটেশানে কাকে কাকে নিতে চান্?"

হরিশ কহিলেন, "আমি, সুধীর, প্রমথ, অবনীশ, আর তুমি। তোমাকেই লীডার হ'তে হ'বে ভায়া—বল্‌তে কইতে পার, ইংরেজীটার ওপরও একটু দখল আছে,—তোমার পিছনে আমরা থাক্‌ব।"

অরিন্দম বলিল, "বেশ তাই হ'বে,—যখন যাওয়া স্থির করবেন আমায় জানাবেন," বলিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

হরিশ ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, হাম্‌ফ্রিজের আসার সময় প্রায় হ'ল, যে যার কাজে যাও।"

•

বারোটার সময় ডেপুটেশান হাম্‌ফ্রিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখে অরিন্দম বুক ফুলাইয়া চলিল। গতকল্য পার্কে শোনা বক্তৃতাটার প্রায় সব কথাগুলাই মনে আছে। সমস্ত শরীরের আগুনের ফুল্‌কিগুলো যেন দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, বাংলা দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ পার হইয়া বিশাল পৃথিবীতে সেগুলো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া দিবে বলিয়াই অরিন্দমের বিশ্বাস। গতকল্য বৈকালে পার্কের বেঞ্চির উপরে দাঁড়াইয়া বক্তৃবৃন্দও সেই কথাই বলিয়াছিলেন। হাম্‌ফ্রিজের ঘরের কাছে আসিয়া হরিশ অরিন্দমকে কহিলেন, "তুমি প্রথমে যাবে, আমরা পৃষ্ঠরক্ষা কর্‌ব,—যুদ্ধের যা নিয়ম। যা বলবার তুমিই বল্‌বে, দরকার হ'লে আমরা তাল দিয়ে যাব।" একটা কাগজে নিজের এবং চাকুরীর নাম লিখিয়া বেয়ারার হাতে দিয়া অরিন্দম দলবলসহ হাম্‌ফ্রিজের ডাকের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আগুনের ফুল্‌কিগুলোর সংখ্যা যেন কমিয়া আসিতেছে,—সবগুলো কি সর্ব্বদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে নাকি? পা দুইটা থর্‌থর করে,—বুকের ভিতরে ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ হইতেছে,—যুদ্ধের দামামাধ্বনি বলিয়া ত বোধ হয় না! জিভ্‌টা শুকাইয়া উঠিতেছে, রণশ্রান্ত সৈনিকের জিভের মতন।—অরিন্দমের মনে হইতে লাগিল যেন এক বৎসরের ভিতর সে জলস্পর্শ করে নাই।

হাম্‌ফ্রিজ্ সাহেব ডাকিয়া পাঠাইল, অরিন্দম ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই চোখের দৃষ্টি তখন যথেষ্ট পরিমাণে ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে।

সাহেব কহিল, "ইয়েস্—?"

প্রাণান্তকর চেষ্টায় অরিন্দম বলিল, "সাহেব, যোগেনকে ডিস্‌মিস্ করা উচিত হয় নি,—তাকে অন্ততঃ একটা চান্স—"

সাহেবের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল।—অরিন্দমের মনে হইল যে, ইহা বোধ হয় তাহার প্রতি হাম্‌ফ্রিজের সুনিবিড় প্রীতির লক্ষণ নহে। সে পিছন দিকে চাহিল, কিন্তু হরিশ অথবা অন্য কাহাকেও ঘরের ভিতরে দেখিতে পাইল না। তাহারা বোধ হয় বাহিরে দাঁড়াইয়া, অথবা নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছিল। আর এসব ক্ষেত্রে 'পৃষ্ঠ' যে কতদূরে অবস্থিত সে সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা মাপজোক নাই।—সেইজন্য নিজের চেয়ারটিতে বসিয়াও বলা চলে, পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছি,—এবং হরিশের দলকে তজ্জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

হাম্‌ফ্রিজ্ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ক্লিয়ার আউট্—" টেব্‌লের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল, 'আই সে, ক্লিয়ার আউট্, ইউ—"

অরিন্দম দ্রুতকম্পিতপদে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। একটা চেয়ারের কোণে পাঞ্জাবীর পকেটটা আট্‌কাইয়া চেয়ারটা উল্‌টাইয়া গেল,—পকেটটা বোধ হয় ছিঁড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি স্প্রিং-এর দরজাটা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই মনে হইল যেন পায়ের তলার হারানো মাটিটা আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। অরিন্দম পকেট হইতে রুমালটা বাহির করিল,—ডানদিকের পকেটটা একেবারেই

গিয়াছে, উপর হইতে নীচ অবধি দুইখণ্ড হইয়া দুইদিকে ঝুলিতেছে। নূতন জামাটা,—চাকুরী আরম্ভ করিবার মাত্র সাতদিন পূর্ব্বে কেনা!

অরিন্দম মুখটা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল। ডেপুটেশানের অন্যান্য মেম্বারদিগের দুর্নিবার কৌতূহল কোনোদিকে না তাকাইয়াও সে অনুভব করিতে পারিতেছিল। হরিশ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে একগাদা লোক গিয়ে তোমাকে এম্ব্যারাস্ ক'রে লাভ নেই ভায়া,—ডেপুটেশানের লীডারকেই প্র্যাক্‌টিকেলী ডেপুটেশান বলা চলে,—সেইজন্যেই ঘরে ঢুকলাম না হে। আমাদের মর‍্যাল সাপোর্টের দাম তাই ব'লে কিছু কম নয়,—তোমাকে এন্‌কারেজ করবার জন্যে—"

বেয়ারা আসিয়া অরিন্দমের হাতে একটুক্‌রা কাগজ দিল,—অরিন্দম পুনরায় সাহেবের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার দশমিনিট পরে ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে পঁয়তাল্লিশটা টাকা লইয়া একেবারে সদর রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

হরিশ তখন ডেপুটেশানের অন্যান্য মেম্বারদিগের কাছে বলিতেছে, "সাত বছরের সার্ভিস হ'ল আমার এখানে।—তার ভিতরে দু' দুটো সাহেবকে পার করেছি,—কিন্তু এরকম বদ্‌মাইস্—যাই হোক্, ছোক্‌রা খুব মর‍্যাল কারেজ দেখিয়ে গেল কিন্তু—"

অরিন্দমের শূন্য কেদারাটার উপরে পাখাটা পূরা জোরে ঘুরিতেছে;—মাসের শেষে একটা মোটা টাকার বিল হইবে বোধ হয়।

অনেক কষ্টের চাকরী,—তিন জোড়া নূতন টায়ার-সালের জুতার সোলগুলো সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যাইবার পরে জুটিয়াছিল। ইহার জন্য তাহাকে দুই তিনটা পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। শত্রুসৈন্য তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, পালাইবার চার পাঁচটা রাস্তা আছে,—প্রতি রাস্তার সুবিধা অসুবিধাগুলি বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—সে কোন্ রাস্তা দিয়া পলায়ন করিবে। অরিন্দম কপাল ঠুকিয়া একটা রাস্তার নাম করিতেই প্রশ্নকর্ত্তা সাহেবটি বলিয়াছিল, "হইল না। যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াই ভগবানের নিকট তোমার প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি শত্রুসৈন্যদলের অন্তঃকরণে শুভ ধর্ম্মবুদ্ধি এবং অহিংস ভাব জাগরিত করেন, তাহা হইলেই তুমি বাঁচিবে। অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন?" সাহেবটিকে পাদ্রী বলিয়াই অরিন্দমের বিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ধারণা সম্পূর্ণরূপে ঠিক না-ও হইতে পারে।

তাহাকে Székesfehérvár জায়গার নামটি নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করিতে বলা হইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'টিটিকাকা' কোথায়, 'আত্মশ্রাদ্ধ রোড' কোথায়? সে জানিত না, আন্দাজী উত্তর দিয়াছিল,—সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল। অরিন্দম মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, চাকরীর আশা ভরসার আত্মশ্রাদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। কিন্তু 'অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বর' ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন! সাহেব হঠাৎ একটা এক পয়সা দামের তারের ধাঁধা বাহির করিয়া কহিয়াছিল, "এটা খুলিতে পার?"

মরিয়া হইয়া অরিন্দম সেটা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—কোথা দিয়া যে সেটা কখন কেমন করিয়া খুলিয়া গেল, তাহা সে টেরও পাইল না। কিন্তু তাহার পরীক্ষক নিমেষে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, কহিল "তুমি পারিবে।" কি পারিবে কে জানে! তবে আপাতত ত সে 'টিটিকাকার' দায় হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

ইহার নাম সাধারণ জ্ঞান! অন্ততঃ প্রশ্নকর্ত্তা সাহেবটি তাহাই বলিতে চাহিয়াছিল। অরিন্দম ঠিক বোঝে নাই যে, কেরাণীগিরির সহিত এইগুলোর ঠিক সম্বন্ধটা কি। কিন্তু সে ত অনেক কিছুই বোঝে না; এবং তাহার না-বোঝার জন্য বিশেষ কিছু যায় আসে না।

তাহার পর একদিন ডাক্তার তাহার চোখ দেখিল, জিভ্ টানিল, পেট টিপিল, হার্ট পরীক্ষা করিল, শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রপিতামহ কি রোগে মারা গিয়াছিলেন ?"

অরিন্দম জানিত না, বর্ত্তমান জগতের কেহই জানে না, —কিন্তু তাহাতে কিছু আট্‌কায় না ; একপক্ষ যখন ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা শুনিতে চাহে, তখন অপরপক্ষের উত্তরদানে বিলম্ব করা ত উচিত নয়ই, বোধ হয় ভদ্রতা সঙ্গতও নয়।

—এত কাণ্ডকারখানা করিবার পরে যে চাকরীটা জুটিয়াছিল,—মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার, সেটি গেল।

গত কল্যকার পার্কে শোনা বক্তৃতাটা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

বেঞ্চির উপরে দাঁড়াইয়া লোকটা বলিয়াছিল, "হে তরুণ, আজ সর্ব্বস্ব ছেড়ে, সমস্ত লাভের আশা ত্যাগ ক'রে সর্ব্বহারার বেশে পথে বেরিয়ে এস। চারটি ক'রে অন্ন খেয়ে জীবন ধারণ করাই কি তোমাদের জীবনের চরম সার্থকতা হ'বে ? তিরিশটাকা মাইনের কেরাণীগিরিই কি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হ'বে ?—হে তরুণ, হে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থলীয় যুবকবৃন্দ, হে অনাগত কালের নাগরিক, ওঠ, জাগ,—আজ পথের ডাক কান পেতে শোন,—চাকরীর মোহ, দাসত্বের মোহ, কোন-রকমে-বেঁচে-থাক্‌বার মোহ, সকল ছাড়িয়ে, সর্ব্বধ্বংসী স্নেহের বাধা এড়িয়ে সর্ব্বরিক্ততার বেশে বা'র হ'য়ে এস।"

নাঃ, লোকটা বলিতে পারে বটে,—হাত নাড়িয়া, পা নাড়িয়া, বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া যেন আগুন ছুটাইয়া দিল। সভার সমুদয় শৃঙ্খলা-রক্ষার এবং বক্তা-সংগ্রহের প্রধান ভার ছিল সুবোধের উপর। সে অরিন্দমের কানে কানে কহিয়াছিল, "দশটাকা চেয়েছিল এক ঘণ্টার জন্যে,—অনেক দর কষাকষি ক'রে তবে আট টাকায় নিমরাজী করান গেছে। যে রকম বল্‌লে তাতে টাকাটা সার্থক হ'বে, কি বলিস ?"

অরিন্দম মাথা নাড়িয়া সায় দিয়াছিল ; মনে মনে হিসাব করিয়াছিল, ঘণ্টায় আট টাকা রোজগার হইলে সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কত হইতে পারে, মাসে গিয়া কত দাঁড়ায়,—"সর্ব্বরিক্ত, সর্ব্বহারা" গোছের কোনও একটা সংখ্যা বোধ হয় নহে।

কিন্তু খাসা বলিয়াছিল লোকটা।

অরিন্দম জোরে জোরে পা ফেলিয়া ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। সে তরুণ ; তরুণ হইতে হইলে এক দাম্‌ড়িও খরচ করিতে হয় না,—মানবজন্ম পরিগ্রহ করিলেই একদিন না একদিন তরুণ হইতে পারা যায়,—যদি না এই জীর্ণদেহের মায়াটা তৎপূর্ব্বেই ছাড়িয়া যাইতে হয়। অথচ এই তরুণরাই নাকি পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিয়া চলে ! অরিন্দম ভাবিতেছিল, সেই ইতিহাস হয়ত সেই বানাইবে। কে জানে !

মনে মনে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি,—চাকরী গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ নাই।"—কিন্তু জোর পাইল না, কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল,—মনে হইল, বাজে কথা, শুধু ফাঁকি,—গর্ব্ব করিবার মতন কিছু ঘটে নাই, লজ্জা করিবার মতন ঘটিয়াছে।

চাকরী সুরু করিবার সময় মাতা কহিয়াছিলেন, "কাজ আরম্ভ কর্‌বার আগে বিয়েটা ক'রে নিলে পার্‌তিস্ অরু। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী করিস্, একথা শুন্‌লে কেউ ত বেশী টাকা দিতে চাইবে না,—তার চাইতে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরী বাকরীর মতলব কর্‌ছিস শুন্‌লে ঢের বেশী টাকা পাওয়া যেত।"

কথাটার যুক্তি অরিন্দম অস্বীকার করে নাই। জলের কাৎলা যতদিন জলে থাকে ততদিন পর্য্যন্ত এ কথা সকলেই বিশ্বাস করে যে, সেটা বাড়িতে থাকিবে, এবং বাড়িতে বাড়িতে সেটা যে কত বড় পর্য্যন্ত হইতে পারে সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কেহ কিছু বলে না ;—কিন্তু সেটাকে

ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিলেই তাহার আয়তনের সম্বন্ধে শেষকথা বলা হইয়া যায়,—ইহা ত সকলেই জানে। কিন্তু তবুও অরিন্দম বিবাহে আপত্তি করিত। বিবাহ সম্বন্ধে সুদৃঢ় কোন মতামত পোষণ করিত বলিয়া যে তাহার আপত্তি, তাহা নহে। তাহার আপত্তি অনেকটা আপত্তি করিবার জন্য, এবং সে বলিতে চাহিত যে, সে আধুনিক, অতএব নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে সে বিবাহ করিবে না।

কিন্তু কোন আপত্তিই আর এবার টিকিল না। এবং পাছে আবার অরিন্দমের চাকরী জুটিয়া যায়, এই ভাবনায় জননী অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

শুভদিনে অরিন্দমের শুভবিবাহ হইয়া গেল। দুই হাজার টাকা নগদ এবং গহনা, দানসামগ্রী সহ নববধূ কল্যাণীকে লইয়া অরিন্দম গৃহে ফিরিল। মাতা আর বিলম্ব করিলেন না;—নববধূর গহনা, দানসামগ্রী এবং পণের টাকা সমান দুইভাগে ভাগ করিয়া, নিজের অবশিষ্ট কন্যা দুইটিকে মাস খানেকের ভিতরেই দুইটি ডাঙ্গায়-তোলা কাৎলার হস্তে সমর্পণ করিলেন,—কিন্তু কাৎলাদের বোধ হয় হস্ত থাকে না, অতএব গলায় গাঁথিয়া দিলেন বলাই ভাল।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ফুটপাথগুলো তাতিয়া আগুন হইয়া আছে। পিচ্-ঢালা রাস্তার উপর দিয়া থার্ডক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীগুলো চলিলে শব্দ হয় না,—এই একটা সুবিধা,—কিন্তু যে উত্তপ্ত হাওয়া সেখান হইতে উঠিতে থাকে, তাহার কাছে তরুণ বাহিনীর ভিতরকার অগ্নি খুব সম্ভব পাত্তা পায় না।

•

অরিন্দম ফুটপাথ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছিল, দ্রুতপদে নহে, ধীরে ধীরে।—প্রকাণ্ড আফিস-বাড়ী, গোটা পঁচিশ আফিস বোধ হয় সেই বাড়ীটার মধ্যে আছে,—খুব কম করিয়া ছয় শ' লোক সেই বাড়ীটায় কাজ করে।—অরিন্দম লিফ্‌টে গিয়া চড়িল। লিফ্‌টম্যান তাহার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তাকাইয়া রহিল,—মনে মনে হয়ত ভাবিতেছিল, তাহাকে নামিয়া যাইতে বলিবে কি না। লোকটার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া। অরিন্দমের কান পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, লিফ্‌ট্ হইতে নামিয়া সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দরজার উপরে পিতলের প্লেটগুলা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, উর্দ্দিপরা চাপ্‌রাস্ আঁটা বেয়ারাগুলো চলাফেরা করে,—যেন কত মস্তবড় এক একজন ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। ভিতরে টাইপ্‌রাইটার মেসিন্‌গুলোর খটাস্ খটাস্ শব্দ শুনা যাইতেছিল। দুই একটা দরজায় বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা,—'নো ভেকেন্সি'।

একটা আফিসে একটা কাজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। অরিন্দম তাহারই দরজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। টুলের উপরে বসিয়া একটা চাপ্‌রাসী ঝিমাইতেছিল, চোখ মিলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "কেয়া মাঙ্‌তা?"

পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া নিজের নামটা লিখিয়া দিয়া অরিন্দম বলিল, "বড় বাবুকে দিয়ে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে অরিন্দম মনে মনে বলিতে চাহে, একদিন আমিও আফিসে কাজ করিয়াছি। ঘণ্টা আমিও বাজাইতাম, চাপ্‌রাসী আমায়ও সেলাম ঠুকিত। আজই আমার কাপড় জামাগুলোয় ঘামের গন্ধ হইয়াছে, এত কালো হইয়াছে এইগুলো আজকালই, কিছুদিন আগেও এমনটি ছিল না।—কিন্তু মনটা আবার গ্লানিতে ভরিয়া উঠে।

—"কি চাই আপনার?"

গুটি দশেক লোক বড়বাবুর টেব্‌লের আশপাশে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া অরিন্দমের মনে হইল যেন আয়নাতে নিজের মুখ দেখিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে এবং চেহারায় নিদারুণ অসহায়তা

এবং কাতরতার এমন একটা ছাপ মারা আছে যে, লক্ষ লোকের মধ্য হইতেও তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না।

অরিন্দম বলিল, "আপনাদের আফিসে চাকরী খালি আছে শুন্‌লাম,—আমি সেইজন্যেই একটু চেষ্টা কর্‌তে চাই। আমি একজন গ্রাজুয়েট,—এই আমার সব "টেস্‌টিমোনিয়্যালস"—বলিয়া সে পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল।

সেইগুলোর দিকে চাহিয়া বড়বাবু চোখের চশমাটা খুলিয়া ফেলিলেন, কোঁচার খুঁটটা দিয়া কাঁচগুলো পরিষ্কার করিতে করিতে কহিলেন, "কোথেকে যে এসব উড়ো খবর আপনারা পান্, তা আপনারাই জানেন।—আজ সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে কম্‌সে কম একশ' লোক আমাকে এসে বিরক্ত করেছে,—আফিসে ঢুকে পর্য্যন্ত আজ একবার কলম ছুঁতে পারিনি। না মশাই, চাকরী-টাক্‌রী আমাদের এখানে খালি নেই। চাকরীর বাজার আজকাল অত সস্তা নয়। কত বি-এ, এম্-এ পাস্-করা লোক রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায় একটা যা তা কাজের জন্যে।—আচ্ছা, আপনারা তা'হ'লে এখন যেতে পারেন।"

অরিন্দম এবং অন্য লোকগুলো বাহির হইয়া আসিল,—পিছনে বড়বাবু হাঁকিয়া বলিলেন, "বেয়ারা, দরওয়াজামে 'নো ভেকেন্সি' বোর্ড লাগাও।"

তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে। সময়ের ভাবনা নাই, অফুরন্ত পড়িয়া আছে, কিসে খরচ করিবে ভাবিয়া পায় না। খানিকক্ষণ পাঁচতলা পর্য্যন্ত নামা-ওঠা করিলে তবু যাহ'ক একটা কাজের সন্ধান মেলে।—লিফ্‌টে চড়িয়া তাড়াহুড়া করা নিষ্প্রয়োজন।

বড়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ঘণ্টা বাজাইয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগুলো চলিয়া গিয়াছে কি না। তাঁহার পরে উঠিয়া আফিসের ছোট অংশীদার ব্রাড্‌লী সাহেবের ঘরে গেলেন। কহিলেন, "স্যার, সকালবেলা আপনাকে আমার জামাইটির কথা বলেছি,—খাসা ছেলে,—আমাদের আফিসের কাজের জন্যে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনি। গ্র্যাজুয়েট দিয়ে আমাদের কোন দরকার নেই,—এটা ত কলেজ নয়, আফিস।—আমার জামাইটি পাস্-টাস্ কিছু নয়,—কিন্তু প্র্যাক্‌টিক্যাল নলেজ অসাধারণ। আমি ওকে ঠিক তৈরি ক'রে নেব, সাহেব। আপনি ওর এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা আমায় দিয়ে দিন।"

ব্রাড্‌লী কহিল, "বাবু, মিষ্টার হিগিন্‌সের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাল তোমায় চিঠি দেব। ভাবনা কোরো না, তোমার জামাই ছাড়া আর কাকেও এ কাজ দেওয়া হ'বে না।"

বড়বাবু ব্রাড্‌লীকে বুঝাইতে লাগিল, লোকের অভাবে তাহার অসুবিধা হইতেছে,—অনর্থক বিলম্বে প্রয়োজন কি? মিষ্টার ব্রাড্‌লীর কথার উপরে মিষ্টার হিগিন্‌স্ কোনদিনই কিছু বলেন না, আর এই তুচ্ছ ব্যাপারেই কি বলিবেন?—মিষ্টার হিগিন্‌স্ আজ আফিসে থাকিলে বড়বাবু নিজেই তাঁহাকে বলিতেন, এবং যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিবার দায়িত্বও তিনি লইতেছেন।—

ব্রাড্‌লী হাসিতে লাগিল, একটা এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার লিখিয়া দিল;—বড়বাবু সেটা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

অরিন্দম রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলে। বড় বড় বাড়ীগুলো মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হাজার হাজার লোক বাড়ীগুলোয় কাজ করে,—উহাদের মধ্যে যে-কোনো একজন হইতে পারিলে সে আজ খুসি হয়। পৃথিবীর ইতিহাস বানানতে নহে, বিশ্বজয়ের অভিযানে নহে, একখানা ছারপোকা সঙ্কুল কেদারায় বসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা টেব্‌লের উপর খান কতক কাগজ রাখিয়া কয়েকটা অপরে-বলা কথা নকল করিয়া যাওয়া, একটা লাল ফিতা দিয়া সেগুলোকে বাঁধিয়া রাখা,—ইহাতেই সে তাহার জীবনের সর্ব্বোত্তম সুখের স্বাদ লাভ করিতে পারে; ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় এত অল্প পাইলেই। কিন্তু অরিন্দম উহাদের একজনও নহে,—চাপরাসী বেয়ারাটি পর্য্যন্ত না। ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া

কেহ তাহাকে ডাকিলে সে হয়ত খুসি হইয়া উঠিবে,—কিন্তু সেটুকুও কেহ করে না।

অরিন্দম ভাবিতে লাগিল।

সমস্ত নীল আকাশটায় মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুক্‌রা গুলো, কোথাও বড়, কোথাও ছোট,—তাহারই মধ্য হইতে সূর্য্যের আলোটা ঠিক্‌রাইয়া আসিতেছে,—চেয়ারে বসা লোকগুলোর উপরে নহে,—অরিন্দমের গায়ে। অযাচিত করুণা, অনাবশ্যক উগ্রতা, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়! মনে হইল, একবার ডাক দিয়া বলে, "তেজ একটু কমাও, বেশী দিন বাঁচিবে—"

সম্মুখে একটা স্কোয়্যার,তাহারই মাঝখানে একটা দীঘি। স্কোয়্যারের ভিতরকার গাছগুলোর তলায় ছায়া পড়িয়াছে। অরিন্দম সেইখানে গিয়া বসিল। দীঘির জলটা পরিষ্কার, চাহিয়া থাকিলে বোধ হয় তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়।—অরিন্দম নিজের জামাটার দিকে চাহিল, চতুর্দ্দিকের পরিচ্ছন্ন সুশ্রীতার মাঝখানে নিজের জামার মলিনতা এবং দুর্গন্ধ তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। সেটাকে খুলিয়া ফেলিয়া জড়াইয়া গোল করিয়া রাখিল, তাহার পরে তাহার উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুদূরের গির্জ্জার ঘড়িতে দুইটার ঘণ্টা শোনা যায়। মোটরের হর্ণের চীৎকার, ট্রামের শব্দ হঠাৎ এক সময় বাড়ে, এক সময় কমে। ব্যাঙ্কের ভিতরে টাকাগুলো ঝন্ ঝন্ করিতেছে।—কাহাকেও ছুঁড়িয়া মারিলে মাথা ফুটা হইয়া যাইবে। সেইগুলো লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে ওই বাড়ীটার ভিতরে। অরিন্দম মনে মনে হিসাব করে, কতটাকা আছে,এই চারিপাশের ব্যাঙ্কগুলিতে, কত খরচ হইয়াছে এই পাঁচতলা, ওই ছয়তলা, ওখানকার শেষের সাততলা বাড়ীটা বানাইতে, কত টাকার সম্পত্তি আছে এই জায়গাটুকুর মধ্যে। সূক্ষ্ম হিসাব, গণিতিক ব্যায়াম। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরকালটা অঙ্কশাস্ত্রে সে পুরা নম্বর পাইয়া আসিয়াছে।

অরিন্দম একবার উঠিয়া বসিল, জামাটার পকেট হাতড়াইয়া বাহির হইল কতকগুলো প্রশংসাপত্র,—মূল্যবান জিনিস! শেষে বাহির হইল একটা আধ্‌লা। অরিন্দম সেটাকে পুনরায় পকেটে পুরিয়া রাখিল, টেস্‌টিমোনিয়াল্‌-গুলা যত্ন করিয়া ভাঁজ করিল, তাহার পরে আবার শুইয়া পড়িল।

গির্জ্জার ঘড়িটায় কোয়াটার বাজে, আধঘণ্টা বাজে,—দেহ মন ক্লান্তিতে ভরিয়া আসে,—চোখের পাতা দুইটা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া আসিতে চাহে।

দুপুর বেলা অরিন্দমের ভাগিনেয়ী মায়া বলিতেছিল, "মামিমা, আজ্‌কে মামা নিশ্চয়ই একটা কিছু ঠিক ক'রে আস্‌বেন, নয়?"

কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "হাঁ, তাইত বল্‌লেন।"

বৃষ্টি নামিয়াছিল। গির্জ্জার ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া গেছে। অরিন্দম জামাটা গায়ে দিয়া একটা আফিসের সিঁড়ির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেরাণীগুলো ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে,—রাস্তারধারে লাইনবন্দী মোটর গাড়ী। এক একজন বড় কর্ম্মচারী, বড় সাহেব জুতা মস্ মস্ করিয়া আসে, সন্ত্রস্ত কেরাণীকুল রাস্তা ছাড়িয়া দেয়, চাপ্‌রাসী মাথায় ছাতা ধ'রে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেয়, মোড়ের মাথায় পুলিশটা তাহার বাঁশীতে একটা ফুঁ দেয়, গাড়ী ছাড়ে।

অরিন্দমের চোখের সাম্‌নে সমস্তটা যেন বায়স্কোপের ছবির মতন ভাসিতে থাকে। মনে করে, আফিসের সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়াছি,—পরিচিত লোক দেখিলে বুঝিবে যে, চাকরী করিয়া বাহির হইতেছি,—যাহাদের সময়ের মূল্য আছে, মাসকাবারী মাহিনার ভরসা আছে, তাহাদের সঙ্গে গা ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া আছি,—কেহ চলিয়া যাইতে বলিতেছে না, দাঁড়াইয়া থাকিতে বারণ করিতেছে না,—

"চাকরীর বাজার বড় আক্রা।"—এ উপদেশ কেহ দেয় না,—শুভ লক্ষণ !

দুইজন কেরাণী আলাপ করিতেছিল। শীর্ণ, মলিন তাহাদের চেহারা, ছেঁড়া জামা, বগলে তালি দেওয়া ছাতা।

প্রথম জন কহিল, "যত বৃষ্টি কি বাবা, বাড়ী ফের্‌বার বেলা !—আফিসে আস্‌বার সময় কি একবার জোর ক'রে নাম্‌তে পার না,—সেই ছুতোয় আধঘণ্টা ঘুমিয়ে বাঁচি যে তাহ'লে।"

অন্যজন বলিল, "অমন প্রার্থনা ঠাট্টার ছলেও কোরোনা হে,—কেউ শুন্‌লে হয়ত ঘুমোবার জন্যে অনন্ত অবসরই মিলে যাবে।"

প্রথম লোকটা ছাতাটি শক্ত করিয়া বগলে চাপিয়া ধরিল, পথ-চল্‌তি অসংখ্য গাড়ীগুলোর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমার গাড়ীটা যদি হুস্ ক'রে আসে,—চট্ ক'রে ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ি,—চোখ বুজে বাড়ী গিয়ে হাজির হই,—বৃষ্টি ত বৃষ্টি ! ছোঃ !"

দ্বিতীয় লোকটি হাসিল, নীরসকণ্ঠে কহিল, "গাড়ী !—এখানেও কড়িকাঠ, বাড়ীতেও কড়িকাঠ ! গাড়ী থাক্‌লে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম বঙ্গের বন্যা, পদ্মার ভাঙ্গন, এ্যাট্‌লাণ্টিক ওসনের ঢেউ এই সবই গ্রাহ্য কর্‌তাম না, ত বৃষ্টি।"

অরিন্দম চাহিয়া রহিল। ইহারা গাড়ী চাহিতেছে! ইহারা খাইতে পায়, পেট ভরিয়া নহে—কিন্তু তবু পায়, অরিন্দম আজকাল তাহাও পায় না, কিন্তু যদি পাইত তাহা হইলে হয়ত একখানা গাড়ী চাহিত।—হুস্ করিয়া বাস্ আসে, চট্ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে ছেঁড়া ছাতাটা বগলে করিয়া,—কিন্তু বগলে করিবার মতন একটা ছেঁড়া ছাতাও তাহার নাই।

অরিন্দম হাসিতে লাগিল। পাশের দুই একটা লোককে বিস্মিত চোখে তাহার পানে চাহিতে দেখিয়া সে আর সেখানে দাঁড়াইল না।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গেছে,—তাহার রাস্তা-চলা আবার আরম্ভ হইল।

সমস্তদিন কিছু খাওয়া হয় নাই।—পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া আধ্‌লাটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া সে নিজের মনে বলিল, "গ্র্যাণ্ড হোটেল, ব্রিস্‌টল্ হোটেল, কাফে সেনট্র্যাল, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল—কোথায় যাই ? নিউমার্কেটে যাব ? —কি কি কিন্‌ব এই অধ্‌লাটা দিয়ে ? খাবার ? লাট সাহেবের বাড়ী ? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ? ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম ?" সে আবার হাসিতে লাগিল।

একটা উড়িয়ার দোকানের সম্মুখে আসিয়া অরিন্দম দাঁড়াইল, আধ পয়সার মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে খাইতে আরম্ভ করিল। মুড়িতে যে এত রস থাকিতে পারে, সে গোপন খবর ধনকুবেররা আজ পর্য্যন্ত টের পান্ নাই।

অরিন্দম যখন ফুটপাথের উপরে দাঁড়াইয়া মুড়ি খাইতে ব্যস্ত, তখন একটা পাগল রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিয়া যায়, দুইটা হাত খুব জোরে জোরে নাড়িয়া বলিতে বলিতে যায়, "কল্‌কাতাতেও টাকা দিয়ে ভাত, রাওলপিণ্ডিতেও টাকা দিয়ে ভাত, তবে কিসের—"

মুড়ি খাওয়া ভুলিয়া অরিন্দম একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। লোকটা দ্রুতপদে চলিতেছিল, শীঘ্রই দূরে মিলাইয়া গেল,—ময়লা খদ্দরের কোট গায়ে, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়া দেহ।

—রাস্তার ধারে ধারে প্রাসাদোপম বাড়ী, তাহাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য সম্মুখে ছোট-বড় বাগান, কৃত্রিম প্রস্রবণ, মর্ম্মর মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড লোহার সিংহদ্বার, তাহারই সম্মুখে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সিপাহী সান্ত্রীর দল পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

ঘরে ঘরে শ্বেত পাথরের মেঝে, সুচিত্রিত দেয়াল, বিচিত্র বর্ণের ছাদ, মোজেকের সিঁড়ি, বহুমূল্যবান ছবি, একটার দামে হয়ত একশতটা লোক ছয়মাসের জন্য প্রতিপালিত হইতে পারে। আস্‌বাবগুলো পালিশের ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌ঝক্

করিতেছে। বিদ্যুতের আলোকগুলি অদ্ভুত, তাহাদের আধারগুলি অদ্ভুত,—চতুর্দ্দিকে তাকাইলে চমক লাগে—বিলাসের আশ্চর্য্য সম্ভার।

—বাহিরে বাহিরে ক্রন্দন, একটু দাঁড়াইবার স্থানের জন্য মারামারি, দুই মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার। দিনান্তে কতজনের ভাবনা ভাবিতে হয়! মনে হয়, পয়সা দিয়া ভাত এখানেও, রাওলপিণ্ডিতেও, তবে কিসের।—বাকী ধারণাটা পরিষ্কার নহে, আধ্‌লার জন্য কাকুতি যেখানে, সেখানে পয়সার ধারণা পরিষ্কার হয় না।

গরম দেশ,—বস্ত্রের বাহুল্য কমিয়া আসিতেছে, অন্নের ভাবনা কমিয়া আসিতেছে, মোক্ষলাভের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

ওই বাড়ীগুলো, ওই গাড়ীগুলো, ওই সিপাহী-সান্ত্রীগুলোর পানে চাহিয়া অরিন্দমের চোখ দুইটা বোধ হয় অকারণেই জ্বলিতে লাগিল।

অনাবশ্যকভাবে হাঁটিয়া হাঁটিয়া অরিন্দম রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরিল।

বাড়ীতে লোকের সংখ্যা কম নহে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও কয়েকটি আছে। তাহাদের ভিতরে কোনটাই ঠিক মতন খাইতে পায় না। শুধু গলার কাছে প্রাণটুকু ধুকধুক করে বলিয়াই যেন তাহারা জগৎ-সংসারকে কৃতার্থ করিয়াছে, এম্নি তাহাদের প্রত্যেকটির চেহারা।

কিন্তু কল্যাণীর শিক্ষায় বাড়ীর সবগুলি ছেলেমেয়েই এতদূর সংযত হইয়া উঠিয়াছে যে, সংসারের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম শিশুটি পর্য্যন্ত কোন অভাব অভিযোগের কথা অরিন্দমের কানে তোলে না। এবং এমন কি সে যতক্ষণ গৃহে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথাসম্ভব চুপ করিয়া হাসিমুখে খেলা করিতে চেষ্টা করে। অরিন্দম বিস্মিত হয়,—মনে মনে যে ব্যথা অনুভব করে তাহার কোন ভাষা নাই।

অরিন্দম গৃহে ফিরিতেই মায়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। মাতুলের মুখের দিকে চাহিয়া কোন প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করিয়াই কহিল, "মিছ্‌রীর সরবৎ ক'রে রেখেছিলাম মামা, তুমি বিকেলবেলা ফিরবে ব'লে।—কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে এস, এনে দিই।"

মায়া বাহির হইয়া গেল। তাহার গমন-পথের দিকে চোখ রাখিয়া অরিন্দমের এতক্ষণের শুষ্ক আঁখি দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার বড়দি এবার একমাত্র কন্যা। বিবাহের তিনবৎসর পরে শিশু মায়াকে কোলে লইয়া তিনি বিধবার বেশে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসেন। তাহার পরে আর একবারও শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

শৈশব হইতেই মায়া তাহার ছোটমামার স্নেহের একটা বড় অংশ জুড়িয়া আছে। অরিন্দমের মতলব ছিল, সে খুব লেখাপড়া শিখিবে, অন্তরের মাধুর্য্যে স্বভাবের উৎকর্ষে সকলের স্নেহ আকর্ষণ করিবে;—নিজের মতে সে তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। পয়সার অভাবে স্কুলে পাঠাইতে পারে নাই, নিজেই অবসর মত ঘরে পড়াইয়াছে। তাহার জন্য মনে মনে বরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—খুব কম করিয়া একজন আই-সি-এস, না হয় ব্যারিষ্টার। ইহাদের পানে চাহিয়া তাই চোখে জল আসে। আজ হয়ত খানিকটা সাগু খাইয়া কাটাইয়াছে, কিংবা তাহাকে যেটুকু দেওয়া হইয়াছিল সেটুকুও কল্যাণীকে গোপন করিয়া ছোটর দলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে! কিন্তু—

মায়া ফিরিয়া আসিল। হাতের একটা বাটিতে দুইটা খইয়ের মোয়া, এবং গ্লাসে মিছ্‌রীর সরবৎ। জিনিষ দুইটা মেঝেতে রাখিয়া, অরিন্দমকে একভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, জামাটা পর্য্যন্ত এখনও ছাড়নি! কি ছেলে বাপু তুমি! ওঠ, ওঠ, যাও শীগ্‌গির ক'রে, হাত মুখ ধুয়ে এস।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া তুলিল।

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া, দিদি বৌদি কোথায় রে?—তোর ছোট মামীমাই বা কোথায় গেল?"

"সব ওঘরে—" বলিয়া মায়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিল।

অরিন্দম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, সমস্ত মুখখানা অসম্ভব রকমের রক্ত-লেশশূন্য। অরিন্দম ভাবে সেই মায়া এখন কি হইয়া গেছে।

কিন্তু তবু মুখের হাসিটুকু ঠিক সেই রকমই আছে। আশ্চর্য্য!

'ওঘর' কথাটার মানে অতীতের রন্ধন এবং বর্ত্তমানের শয়ন গৃহ। দর্মার বেড়া, খোলার ছাদ,—আগে সেইখানেই রান্না হইত, কিন্তু আজ মাস দুই হইল ও-বালাই আর নাই, বড় জোর গাছতলা হইতে কুড়াইয়া আনা গোটাকতক পাতা সিদ্ধ, নয়ত বার্লির রাজভোগ, অথবা মুড়ি,—তজ্জন্য সেটাকেও আজকাল শয়ন ঘর স্বরূপ ব্যবহার করা হইতেছে।

অরিন্দমের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মায়া দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছিল,—একটা লম্বা দড়িতে বাড়ীশুদ্ধ সমস্ত লোকের কাপড় জামা টাঙ্গান; একশ'টা ফুটা, একশ'টা শেলাই হয়ত প্রত্যেকটার ভিতর হইতে বাহির হইবে: ছয় মাসের মধ্যে, ধোপাবাড়ী ত দূরের কথা, সাবানের মুখও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু সেগুলোর পানে চাহিলে তাহাদিগকে দুর্গন্ধবিহীন করিবার একটা বিপুল প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের মেঝেতে গুটি তিনচার ছিন্ন মাদুর, এক কোণে একটা পিঁড়ির উপরে খানকয়েক বই এবং খাতা গুছান। আর কোথাও কিছু নাই।

মায়া একখানা ছেঁড়া ইংরেজী বই হাতে ফিরিয়া আসিল। মাতুলকে প্রদীপের নিকট টানিয়া লইয়া গিয়া বইয়ের একখানা পাতা খুলিয়া কহিল, "দেখ তোমার ভাগ্নের কীর্ত্তি!"

ইতিহাসের বই, মাঝে মাঝে ছবিও আছে,—প্রত্যেক ছবির নীচে অরিন্দমের সেজদি উষার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বীশ ওরফে বুলুর একটি করিয়া টিপ্পনী লেখা আছে। বুলুর জীবনের উপর দিয়া মাত্র আটটি বর্ষা কাটিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া রসগ্রহণের ক্ষমতা যে তাহার কিছুমাত্র কম, একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

একজন নাবিকের ছবির তলায় লিখিয়াছে, 'তোমার টুপি নাই?—একজন সৈনিকের মর্ম্মরমূর্ত্তির তলায় লেখা, 'তোমার বন্দুক কই?'—মাঠের মাঝে একটা তাঁবুর ছবি; কিছুদূরে কয়েকটা সৈনিক মিলিয়া কি যেন একটা রান্না করিতেছে, অদূরে একটা লোক একা বসিয়া,—তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, সে যে কোন পদস্থ ব্যক্তি, এ ধারণা বুলুর মনেও হইয়াছে,—তাহার নীচে সে লিখিয়াছে, 'সেনাপতি, ভাত খাইবে বলিয়া তোমার জিভ্ দিয়া জল পড়িতেছে?'

অরিন্দম বাহিরের বারাণ্ডাটুকুর নিবিড় অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল,—মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, বুলু আজ ভাত খায় না কতদিন?

পাতাটা উল্‌টাইয়া মায়া হাসিতে লাগিল; কহিল, "মামা, দেখ!" রাজার ছবি,—সিংহাসনে উপবিষ্ট, হাতে রাজদণ্ড, মাথায় মুকুট,—বুলু তাহার তলায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, "রাজার পোষাক আর কিছুদিন পরে আমাকে দিয়া দিবে।"

অরিন্দমের চোখের পাতা দুইটা আবার ভিজিয়া উঠিল।

অনেকগুলি লোক,—স্ত্রী, দুটি বড় বোন, বিধবা বৌদিদি, মায়া এবং আরও অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা। অরিন্দমের বিবাহের মাস চারেক পরেই জননী মারা গিয়াছিলেন।—বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, অনাবশ্যক বোঝা, অবিবেচক কুপোষ্যের দল,—অবশ্য তাঁহারা স্ত্রীকে বাদ দিয়াই বলেন।

অরিন্দম মনে মনে হাসে, "পোষ্য! কে কার পোষ্য কে জানে!"—রুমাল সেলাইয়ের পয়সায়, নানারকম জামা এবং অন্যান্য সেলাই প্রভৃতির মূল্যে কল্যাণী, মায়া এবং তাহার বৌদি, দিদিরা যে কেমন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সে খবর তাহাদের শত যত্ন সত্ত্বেও অরিন্দমের অজ্ঞাত ছিল না, এবং বোধ করি সেইজন্যই দুঃখেরও তাহার সীমা ছিল না।

ইহারা যদি নিত্য নিয়ত অভাব অভিযোগের কথা শুনাইতে বসিত, তাহা হইলে তাহাদের কথা একান্ত সত্য হওয়া সত্ত্বেও হয়ত অরিন্দমের মনে বিরক্তির কারণ ঘটাইত। কিন্তু যে-অভাবের কথা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া তাহারা তাহার চোখের আড়ালে রাখিতে চাহিত, তাহাই

যখন তাহাদের অনিচ্ছাতে অজ্ঞাতসারে তাহার চোখে পড়িত তখন তাহার বেদনার অবধি থাকিত না। তাই অরিন্দম সর্ব্বদা ইহাদের কথা মনে করিয়া শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নীরব হইয়া থাকে।

বাহিরের মানুষের হৃদয়ের দুয়ার আজ বন্ধ।—সহস্র প্রকারের ফন্দী-ফিকির, অসংখ্য রকমের চালবাজীতে আজ মানুষের মস্তিষ্ক ভরিয়া আছে। আদবকায়দা এবং বাহিরের জাঁকজমক অতিক্রম করিয়া কাঁহারও কাছে গিয়া পৌঁছানই এক বিরাট ব্যাপার,—কিন্তু তাহার পরেও তাহার সাড়া মেলে না। বহু মিনতির শেষে যদি বা ঘরের দরজা পার হইয়া ঘরে ঢোকা যায়, তাহা হইলেও অন্তঃকরণের নিকটে গিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অরিন্দম কোন দিকে চাহিয়া কোন পথই যেন খোলা দেখিতে পায় না।

আবার দিবা দ্বিপ্রহর,—বড়রাস্তার ফুটপাত,—একটা কলের কাছে গিয়া অরিন্দম জল খাইবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু একফোঁটা জলও কলটার ভিতর হইতে বাহির হইল না। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মনে হইল, বেলা তিনটার বেশী ছাড়া কম হইবে না,—কিন্তু তবুও জলের দেখা নাই, কর্ত্তব্যপরায়ণ মিউনিসিপ্যালিটি!

সম্মুখে একটা ঘড়ির দোকান,—অরিন্দম সেখানে একবার ঘড়ি দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেখানকার ঘড়িতে একটা হইতে আরম্ভ করিয়া বারোটা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই বাজিতেছিল,—অতএব বেলা টের পাওয়া গেল না।

অরিন্দম জলের কলটার কাছে দাঁড়াইয়া, আর একবার সেটাকে খুলিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু ফল পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইল না।—কলটা বোধ হয় খারাপ, কিংবা হয়ত আসল পাইপের সহিত যোগ করা নাই,—কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না। কর্ত্তব্যপরায়ণ মিউনিসিপ্যালিটি!—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। সে একবার ঢোঁক গিলিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হইল না।—অরিন্দম আবার চলিতে থাকে।—

রাস্তার উপরেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী,—সেইটার দিকে তাকাইয়া সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বাহিরের একটা ঘরের রাস্তার দিকের জানালাগুলো খোলা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিষই চোখে পড়ে। ঘরটা অতিরিক্ত আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ,—মাঝখানে একটা গোল শ্বেত-পাথরের টেবল, তাহার উপরে কাঁচের প্লেট, ডিস্, গেলাস এবং কাঁটা চামচ ইত্যাদি ছড়ান অবস্থায় রহিয়াছে,—সেখানে কিয়ৎপূর্ব্বে ভোজনের সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল বিদ্যমান। উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা পুরা জোরে ঘুরিতেছে,—ঘরে একটাও লোক নাই।

চাহিয়া চাহিয়া অরিন্দম মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার বারেবারেই মনে হইতে লাগিল, ইহাদের ষোড়শোপচার ভোজনে এতগুলো টাকা খরচ হইয়া গেছে, এখন অনাবশ্যকভাবে পাখাটা ঘুরিতেছে!—খুব সম্ভব ভ্রমক্রমে কেহ বন্ধ করিয়া যায় নাই।

ইহাদের ব্যয়বাহুল্য এবং বেহিসাবের বহর দেখিয়া অরিন্দম অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে ভাবিল ফটক ত খোলাই রহিয়াছে, সোজাসুজি প্রবেশ করিয়া ওই ঘরের পাখাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলে কেমন হয়! তাহার মনে হইল, সেটাকে বন্ধ করিতে না পারিলে যেন সে বাঁচিবে না! এত অমিতব্যয়িতা অসহ্য!

কিন্তু পাখাটা তখনও ঘুরিতেছে। সেইটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অরিন্দমের যেন নেশা লাগে,—শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সেখান হইতে সে নড়িতে পারে না,—শুধু ভাবে, অনর্থক টাকাগুলো নষ্ট করা,—মাসের শেষে একটা মোটা টাকার বিল নিশ্চয়ই হইবে।—

শ্রীআশীষ গুপ্ত

অতীতের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌

প্রায় আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথাও বলিতেছি। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত (জুলাই, ১৯২৯) কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাই স্মৃতিপথে আনিয়া এই বিবরণ লিখিতেছি। জলের রেখা জলেই মিশাইয়া যায়, কোনও দাগ রাখিয়া যায় না, স্রোতের পর স্রোত আসিয়া পুরাতনের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। মানুষের জীবনস্রোত নদী-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইলে, মানবজীবনে সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, প্রভৃতির চিহ্ন মুছিয়া গেলে হয়ত মানবজীবন সুখাবহ হইত। কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতিতে ভগবান একটি জিনিষ দিয়াছেন যাহা দ্বারা মানুষ ভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলী বর্ত্তমান চক্ষে না আনিয়া থাকিতে পারে না, ইহাই হইল স্মৃতি। ব্যক্তিগত স্মৃতির নাম জীবনী, এবং জাতিগত বা সমাজগত স্মৃতির নাম ইতিহাস। অনেক সময় জাতিগত স্মৃতির সহিত ব্যক্তিগত স্মৃতি এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে উভয়কে পৃথক করা যায় না। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ইতিহাস হইতে এ সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। ইতিহাস হইতে যেমন কোন জাতির পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া সেই জাতির উন্নত অথবা অবনত অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ কোন ব্যক্তি বা সমাজের অবস্থার পরিচয় তাহাদের পূর্ব্বাপর অবস্থার আলোচনার দ্বারা জানিতে পারা যায়। এই ইতিহাসজ্ঞান হইতেই ব্যক্তি বা সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রচেষ্টা অনেক সময় উদ্ভূত হয়। সুতরাং ইতিহাসের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। জাতি বা সমাজের ইতিহাসের উপকরণ অনেক সময় ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হইতে সংগৃহীত হয়, এবং একই ঘটনা বহু লোকমুখে শ্রুত হইলে জনশ্রুতিরূপ ধারণ করিয়া ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়। আমি ইতিহাস লিখিতেছি না, কতকগুলি ঘটনা বা বিষয় যাহা আমার মনে আছে তাহাই গল্পচ্ছলে এখানে বিবৃত করিতেছি।

কলিকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা সহরে প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজ একটি ও বেসরকারী কলেজ ছয়টি ছিল। সরকারী প্রেসিডেন্সি কলেজে যেরূপ উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইত বেসরকারী কলেজগুলিতে এক বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া অন্য সকল বিভাগেই সরকারী কলেজের ন্যায়ই শিক্ষা ঘটিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একত্র অবস্থানে যেরূপ মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল তেমনটি আর কোন কলেজে ঘটে নাই সত্য, তথাপি সেণ্টজেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফোঁ, সিটি কলেজের রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রিপণ কলেজের রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিজ্ঞান ও রসায়ন সম্বন্ধে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে কোনরূপে হীন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ছিলেন না। দর্শন বিভাগে প্রেসিডেন্সি কলেজে ডাঃ পি, কে, রায় যেমন সুশিক্ষা দান করিতেন, তদ্রূপ ডাফ্‌ কলেজের ডাঃ হেন্‌রী ষ্টিফেন্‌ সাহেব তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র বিভাগে জেনারল্‌ এসেমব্লি কলেজের গৌরীশঙ্কর দে সমস্ত বঙ্গদেশে একছত্র সম্রাট ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে প্রেসিডেন্সি কলেজের পার্সীভ্যাল্‌ সাহেব যেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতেন তদ্রূপ মেট্রোপলিটেন কলেজের মিঃ এন্‌ ঘোষ, সিটি কলেজের বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এবং রিপণ কলেজের বাবু (পরে স্যার) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গবাসী কলেজের যুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও হুইলার সাহেব প্রভৃতির যথেষ্ট সুনাম ছিল। এতগুলি যোগ্য শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও বি,-এ পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা শতকরা তেরো হইতে কুড়ির ঊর্দ্ধে উঠে নাই। বি, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রের

সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। সেই কমিশনের ফলে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯০৮ সালে এই আইন সম্পর্কিত নিয়মাবলী গঠিত হইয়া ১৯০৯ সালে উহা কার্য্যক্ষেত্রে বলবৎ হয়। সুতরাং আমি কলিকাতা কলেজ সমূহের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা ১৯০৯ সালের পূর্ব্বেকার অবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৯০০ সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত কয়েকটি মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যথা—রেভারেণ্ড্ কালীচরণ ব্যানার্জ্জী, ডাঃ থিব ও ডাঃ ক্রল্।

১৯০৯ সালের পূর্ব্বে সিটি কলেজ, রিপণ কলেজ ও মেট্রোপলিটেন কলেজে বি এল্ পরীক্ষার্থীর জন্য আইন কলেজ ছিল। এই সকল আইন কলেজ উঠাইয়া দিয়া একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-আইন-কলেজে আইন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ১৯০৯ সালের বিধানমতে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘোরতর প্রতিবাদের ফলে রিপণ আইন কলেজ এখনও টেঁকিয়া আছে। ১৯১১ সালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং প্রদত্ত বিপুল দানের ফলে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং নির্ম্মিত হইয়া আইন কলেজ ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শেষোক্ত বিভাগের আবির্ভাব হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী কলেজের এম্-এ ক্লাসগুলি তুলিয়া দিয়া ঐ ক্লাসের শিক্ষা দিবার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়। সুতরাং নববিধান মতে পরীক্ষা ও শিক্ষা এই দুইটি কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেনেট্-হাউসের দক্ষিণে মাধববাবুর বাজার নামক স্থানে বর্ত্তমান আশুতোষ বিল্ডিং নির্ম্মিত হয় এবং পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ এই বাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৫-১৬ সাল নাগাদ স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ এই দুইজনের প্রদত্ত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ বাটি নির্ম্মিত করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার পথ আরও উন্নত ও প্রশস্ত করা হয়।

১৯১৬ সালের মে মাসে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার জন্য আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়া বহুতর চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার্থীর অভাব দূর করিয়াছে। এই কলেজটি অধিকাংশ বিষয়ে সরকারী মেডিকেল কলেজের সমতুল্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

কলিকাতার কলেজের অধ্যাপকগণ

কলিকাতার কলেজের অধ্যাপকগণের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে মন্দ হইবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের পার্সীভ্যাল্ সাহেব অত্যধিক নোট লিখাইতেন বলিয়া একটা অপবাদ ছিল। তিনি নাকি "ফাদার" কথার অর্থ "মেল্ প্যেরেণ্ট্" ছাত্রগণকে এইরূপ লিখাইয়া দিতেন।

মেট্রোপলিটেন কলেজের অধ্যক্ষ এন্, ঘোষ বা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু কখনও আদালতে যান নাই। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি "ইণ্ডিয়ান্ নেশান্" নামক সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রের সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের জীবনী ও রাজা নবকৃষ্ণের জীবনী লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। "ভারতে ইংলণ্ডের কার্য্য" নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া ইংরেজীতে তাঁহার গুণপনা দেখাইয়াছিলেন। কলেজে ও সাধারণ সভা সমিতিতে তাঁহার মসীবিনিন্দিত-রূপে তিনি হ্যাট্কোট্ পরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু অন্তরে তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। একদিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিবার কালে ট্রামগাড়ীর সহিত তাঁহার গাড়ীর সংঘর্ষ হওয়াতে তাঁহার গাড়ী উল্টাইয়া যায়। তাহার ফলে তাঁহার বাম হস্তের অঙ্গুলিতে গুরুতর আঘাত লাগে ও চারটি অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই দুর্ঘটনার পর হইতে তিনি সর্ব্বদাই বাম হস্তে দস্তানা পরিয়া থাকিতেন।

ডাফ্ কলেজের ষ্টীফেন্ সাহেব ছাত্র মাত্রকেই "মিষ্টার্" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্লাসে পড়াইবার সময়, কি নিম্ন কি উচ্চশ্রেণী, সকল শ্রেণীতেই খুব নোট লিখাইতেন। ক্লাসগৃহের প্রকাণ্ড ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ির পেন্‌সিল দিয়া ছোট ছোট অক্ষরে তিনি নিজে নোট লিখিয়া যাইতেন ও ছাত্রেরা

তাহা টুকিয়া লইত। তিনি দর্শন ও ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। দর্শনের বি-এ অনার্স ক্লাস ও এম্-এ ক্লাসের ছাত্রগণকে কখন কখনও তাঁহার বাসাবাটিতে পড়িতে যাইতে হইত। নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে এখন যে বাটিতে জোড়াবাগান পুলিশকোর্ট অবস্থিত, সেই বাটিই ডাফ্ কলেজের বাটি ছিল। এই বাটির সর্ব্বোচ্চ তলায় একখানি মাত্র ঘর ছিল, সেই ঘরে ষ্টীফেন্ সাহেব কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে কার্ব্বালা ট্যাঙ্কের পার্শ্বে বিডন ষ্ট্রীটে এই কলেজের খৃষ্টান বালকদিগের ছাত্রাবাসের ত্রিতল গৃহে তিনি থাকিতেন। আমরা যে সময় তাঁহার ছাত্র ছিলাম, সেই সময় তাঁহার বয়স ষাট্ পঁয়ষট্টি বৎসর হইবে। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। তাঁহার গৃহে কড়িকাঠ হইতে একটি ট্র্যাপিজ্ ঝুলান থাকিত। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এই ট্র্যাপিজে প্রত্যহ ব্যায়াম করিতেন। বিডন ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসা হইতে সাইকেলে চড়িয়া কলেজে যাইতেন। তিনি এগারটি কি বারটি ভাষা জানিতেন। সংসারে তাঁহার একমাত্র মায়ার বস্তু ছিল একটি বিড়াল। এই বিড়ালটি তাঁহার পাঠাগারে টেবিলের উপর পুস্তকের উপর যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিত। এই বিষয়ে তিনি ইংরেজ দার্শনিক হব্স্‌এর ন্যায় ছিলেন, কিন্তু ষ্টীফেন্ সাহেবের দার্শনিক মত হব্স্‌এর মতের ঠিক বিপরীত। প্রত্যহ কলেজে আমাদের আধঘণ্টা বাইবেল্ পড়িতে হইত। সেন্টজনের গস্‌পেল্ পড়াইবার সময় ষ্টীফেন্ সাহেবের ব্যাখ্যায় গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সলার ডাঃ আর্কুহার্ট্ সাহেব ১৯০৫ সালে ডাফ্ কলেজে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই তিনি বিবাহ করেন। ইঁহার বিবাহ উপলক্ষে আমরা একদিন সকাল সকাল ছুটি পাইয়াছিলাম। ষ্টীফেন্ সাহেব, টম্‌রী সাহেব প্রভৃতি সাহেব শিক্ষকগণ অপরাহ্নকালে জলযোগের পর পাজা পান খাইতেন। কিন্তু ক্লাসে পড়াইবার সময় কখনও পান খাইতেন না।

গণিত শাস্ত্রবিদ্ গৌরীশঙ্কর দে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব। কি শীত কি বর্ষা তাঁহার দর্জ্জিপাড়ার বাটি হইতে প্রত্যহ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শিবনারায়ণ দাসের গলিতে সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন শুনিতে যাইতেন।

রিপণ কলেজের জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাস, পাশা ও দাবা খেলায় পটু ছিলেন। তাঁহার খেলার আড্ডা ছিল হোগলকুঁড়িয়ার নিকট সিংহদের বাটিতে। ভট্টাচার্য্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি খুব নস্য গ্রহণ করিতেন। পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তাঁহার বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। ছেঁড়া কোট, ছেঁড়া পেণ্টুলেন, বোতামহীন ছেঁড়া সার্ট প্রভৃতি বিষয় তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটি অতিরিক্ত অঙ্গুলি বাহির হইয়া আছে। ইঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল যে, নিম্ন শ্রেণীতে রসায়ণ পড়াইবার সময় টেষ্ট্‌টিউবের পরিবর্ত্তে তাঁহার এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দেখাইয়া কাজ সারিতেন। ইনি ক্লাসে পড়াইতে আসিতেন—ধুতি ও জামা পরিয়া; এবং তাহার উপর বিছানার চাদরের ন্যায় একখানি চাদর বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্ন দিয়া ঝুলাইয়া সন্ন্যাসীদের ন্যায় রাখিতেন।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত "বামাবোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পড়াইবার সময় বা কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার বাম দিকের ঘাড় নড়িত।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের ইংরাজীর উচ্চারণ ছাত্রেরা পছন্দ করিত না। ইনি ক্লাসে পড়াইতে আসিবার পূর্ব্বে বেয়ারা আসিয়া অভিধানাদি এক বোঝা বড় বড় পুস্তক ক্লাসের টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত। পড়াইতে পড়াইতে ইনি মাঝে মাঝে অভিধান খুলিয়া অনেকটা সময় কাটাইতেন। হেরম্বচন্দ্র তাঁহার মাতৃবিয়োগের সময় কাছা পরিয়া নগ্নপদে কলেজে আসিতেন। ইনি তামাকু সেবনের ঘোর বিরোধী। চুরুটসেবী অধ্যাপক হুইলার সাহেবকে একবার চুরুট সেবন করা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ভর্ৎসিত করিয়াছিলেন। ইংরাজী উচ্চারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক লালগোপাল চক্রবর্ত্তী হেরম্ববাবুর ঠিক বিপরীত ছিলেন। তিনি ঠিক সাহেবদের মতন ইংরাজী বলিতে পারিতেন।

বঙ্গবাসী কলেজের ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্যরসিক বলিয়া ছাত্রগণমধ্যে পরিচিত ছিলেন। তিনি পড়াইতে পড়াইতে এমন এক একটা কথা বলিতেন যে, সমস্ত ক্লাস হাসির রবে মুখরিত হইত। ইংরাজী "লাক্‌জুরিয়্যাণ্ট্" কথাটি ইঁহার মুখে "লাক্সারিয়াণ্ট্" রূপে উচ্চারিত হইলে ছাত্রগণ না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। ইনি রো সাহেবের ছাত্র। রো সাহেবের নিকট যখন ল্যাম্বের ইলিয়া প্রবন্ধে "ডিসার্টেশান্ অন্ রোষ্ট্ পিগ্" শীর্ষক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন, তখন ইঁহার কোন সহপাঠী রো সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র পাঠের দ্বারা ঐ প্রবন্ধের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, দগ্ধ শূকর খাওয়াও প্রয়োজন। এই কথা শুনিয়া রো সাহেব তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে নিজ খরচায় দগ্ধ শূকর খাওয়াইতে সম্মত হইয়াছিলেন। দগ্ধ শূকরের কাহিনীটা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সরস লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করেন নাই।

কলিকাতার যান বাহনাদি

১৮৯১ সালে ও তৎপরেও ঘোড়ার ট্রাম কলিকাতায় চলিত। শ্যামবাজার হইতে ধর্ম্মতলা ও ধর্ম্মতলা হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত বড় আকারের ট্রাম দুইটি ঘোড়ায় টানিত। ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে শিয়ালদহ ও ওয়েলেস্‌লি, এবং ষ্ট্রাণ্ডরোডে নিমতলার ট্রাম ছোট আকারের ছিল এবং এক ঘোড়ায় টানিত। রাত্রিকালে ট্রামের ঘোড়ার গলায় দোদুল্যমান ঘণ্টার শব্দে রাজপথ মুখরিত হইত। ধর্ম্মতলা হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত ট্রামগাড়ী ছোট এঞ্জিনের দ্বারা টানা হইত। ১৯০২ সালে জুনমাসে কলিকাতা সহরে রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম প্রথম চলিতে আরম্ভ করে এবং ঐ সালেই শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে হাওড়া পুল পর্য্যন্ত হ্যারিসন্ রোডের উপর দিয়া প্রথম ট্রাম লাইন পাতা হয়। ইহার পূর্ব্বে এ রাস্তায় ট্রাম লাইন ছিল না।

কলিকাতার রাস্তায় যানের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ীই প্রধান ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই দুই শ্রেণীর পাল্‌কী বা বন্ধ গাড়ী ছিল, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই শ্রেণীর ফিটন্ বা ভিক্টোরিয়া গাড়ী ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাল্‌কী গাড়ীর ভিতরে বসিবার স্থান তৃতীয় শ্রেণীর অপেক্ষা কিছু প্রশস্ত ছিল। এই শ্রেণীর গাড়ী সাধারণত দুইটি ঘোড়ায় কখন কখনও বা একটি বড় ঘোড়ায় টানিত। ভিক্টোরিয়া গাড়ীর প্রথম শ্রেণী দুই ঘোড়ায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণী এক ঘোড়ায় টানিত। ভিক্টোরিয়া গাড়ীর ব্যবহার অধিকাংশ স্থলে সাহেবরাই করিতেন। এই সকল গাড়ীর আড্ডা ধর্ম্মতলায় ও অন্যত্র সাহেব পাড়ায় ছিল। আজ হইতে কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে পাল্‌কী গাড়ী ও ভিক্টোরিয়া গাড়ীর চালকগণকে খাকি রংএর কুর্ত্তা ও প্যাণ্ট পরিতে হইত, এবং একখানি চাক্‌তি গলায় ঝুলাইয়া বা বুকে আঁটিয়া রাখিতে হইত। এই চাক্‌তিখানি প্রায়ই এনামেলের অথবা পিতলের। ইহাতে যে নম্বর লেখা বা খোদা থাকিত, তাহা গাড়ীর পশ্চাতে লিখিত নম্বরের সহিত এক। প্রথম শ্রেণীর ভিক্টোরিয়া গাড়ীর চাকায় রবার-টায়ার দেওয়া থাকিত। সমস্ত গাড়ী ছয়মাস অন্তর মিউনিসিপ্যাল আফিসে পরীক্ষিত হইবার পর প্রত্যেক চালককে লাইসেন্স্ দেওয়া হইত। কিছুকাল পরে গাড়ী পরীক্ষার ভার পুলিশের হাতে দেওয়া হয়, এবং সেই নিয়ম এখনও চলিতেছে। বর্ষাকালে অত্যধিক বৃষ্টিবশত রাস্তায় জল দাঁড়াইলে এই গাড়ীওয়ালাদের মরসুম পড়িত। বাবুদের আফিসে যাইতে ও আফিস হইতে আসিতে এই গাড়ীওয়ালাদের শরণাপন্ন হইতে হইত, সুতরাং "জেহু" বা গাড়ীওয়ালারা তাহাদের ইচ্ছামত ভাড়া আদায় করিত। আজ হইতে দশ বার বৎসরের মধ্যে মোটর ট্যাক্সির অত্যধিক প্রচলনে ভিক্টোরিয়া গাড়ী প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

পাল্‌কী গাড়ীরও সংখ্যা নিতান্ত কমিয়া আসিয়াছে। পাল্‌কী গাড়ীর পরিবর্ত্তে মোটর ট্যাক্সি ব্যবহারের ফলে বাঙ্গালীর মেয়েদের পর্দ্দা প্রথা অনেকটা শিথিল হইয়াছে। নিতান্ত বৃষ্টির সময় জলের ছাট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ট্যাক্সির সাইড্ স্ক্রীন আঁটিয়া দেওয়া হয়। ট্যাক্সি ব্যবহারের আরও একটি সুবিধা এই যে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুত যাওয়া চলে এবং ভাড়া লইয়া গাড়োয়ানের সহিত ঝগড়া করিতে হয় না, মিটারে ভাড়ার যে অঙ্ক উঠিবে তাহাই

দিতে হইবে। ট্যাক্সির সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় রাস্তার পদব্রজে একদিকের ফুটপাত হইতে অপর দিকের ফুটপাতে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক হইয়াছে, তেমনি রাত্রিকালে, ট্যাক্সির হর্ণের শব্দে শহরবাসীর নিদ্রারও যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।

আজ হইতে পাঁচ বৎসর মধ্যে আর এক শ্রেণীর যাত্রীগাড়ী সহরের রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে। এই গাড়ীগুলির নাম মোটর বাস্। এই বাস্‌গুলির প্রচলনে সহরবাসীর দ্রুত যাতায়াতের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। বাস্‌গাড়ীর ভাড়া ও ট্রামগাড়ীর ভাড়া সমান হওয়াতে উভয় গাড়ীর মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছে। এই জীবন সংগ্রামে দেশবাসীর অনুকম্পায় বাস্‌গাড়ী যে জয়লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাস্‌গাড়ীর অসুবিধা এই যে, সময়ে সময়ে অত্যধিক ভিড় হয় এবং গাড়ীর শ্রেণীবিভাগ না থাকাতে ভদ্রলোকদিগকে, বিশেষতঃ ভদ্রমহিলাগণকে, বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ট্যাক্সির প্রচলনে পদব্রজগামীর রাস্তায় চলার যে বিপদ তাহা মোটরবাসের আগমনে আরও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মালবাহী মোটর লরী আসিয়া গরু অথবা মহিষের গাড়ী নির্ম্মূল করিবার উপক্রম করিয়াছে। ক্ষিপ্রগামী মোটর লরীর দ্বারা মালপত্র স্থানান্তরিত করা ব্যবসায়ীগণের পক্ষে যেমন সুবিধাজনক হইয়াছে, পদব্রজগামীর পক্ষে মালপত্র বোঝাই লরী তেমনি বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই শ্রেণীর গাড়ী যাইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই। এই শ্রেণীর গাড়ী হইতে সহরের গৃহাদির সম্বন্ধে একটি অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। যে রাস্তা দিয়া মাল বোঝাই লরী গমন করে সেই স্থানের দুই ধারের গৃহস্থাবাসগুলি কাঁপিয়া উঠিয়া গৃহস্থের ভীতি উৎপাদন করে।

কলিকাতা সহরে আগে পাল্‌কীর প্রচলন খুব ছিল। পাল্‌কীর মালিক ও বাহকেরা সকলেই উড়িয়া। "হেঁইয়া মারি ধাও কুড়াকুড়" "হেঁইয়া মারি ধাও কুড়াকুড়" পাল্‌কী-বাহক উড়িয়া বেহারার এই রব তখন কলিকাতার রাস্তায় সর্ব্বদা শুনা যাইত। কিন্তু বছর বার হইল জাপানী রিক্স গাড়ীর আমদানী হওয়াতে পাল্‌কী আর কেহ এক্ষণে চড়ে না। গঙ্গাস্নানে যাওয়া, রোগীকে লইয়া হাসপাতালে অথবা ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া প্রভৃতি কার্য্যে এখন পাল্‌কীর স্থান রিক্স অধিকার করিয়াছে। দুই চাকাযুক্ত ছোট এই গাড়ী একটি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতে করিতে রিক্স কলিকাতার গলি ঘুঁজি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই যাইতে পারে। ইহার সম্মুখভাগে পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিলে মেয়েদের আবরুও রক্ষিত হয়।

বার তেরো বৎসর পুর্ব্বেও খুব প্রাতঃকালে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সহরবাসীর ঘুম ভাঙ্গাইবার পক্ষে ময়লা ফেলা স্কাভেঞ্জার গাড়ীর ভীষণ শব্দ সর্ব্বজন বিদিত ছিল। এই অপ্রীতিকর শব্দের হাত হইতে সহরবাসী দুইটি উপায়ে কতকটা রক্ষা পাইয়াছে। প্রথম, রাস্তায় এ্যাসফ্যাল্ট পেভিং হওয়ায়; এবং দ্বিতীয়, ঘোড়ায় টানা জঞ্জালের গাড়ীর পরিবর্ত্তে কোন কোনও পল্লীতে মোটর লরীর প্রবর্ত্তনে।

১৯০৮ সাল হইতে কলিকাতার গঙ্গা পারাপারের জন্য পোর্ট কমিশনার কর্ত্তৃক ফেরী ষ্টীমার প্রচলিত হইয়াছে। ইহার ফলে শিবপুর, রামকৃষ্ণপুর, শালকীয়া, বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেশী নৌকা চলিত তাহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। নিতান্ত যে সময়ে ষ্টীমার পাওয়া যায় না সেই সময়ে এই নৌকাগুলির প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, এই ষ্টীমারে গঙ্গার দুইধারের অধিবাসীর পারাপারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ১৯০১ কি ১৯০২ সালে গঙ্গার অপর পারে হাওড়ার রেল ষ্টেশন বৃহদাকারে নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। ইহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানী কর্ত্তৃক পুরীধামে যাইবার লাইন খোলাতে এইরূপ বড় ষ্টেশন হওয়ার একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ সময় হইতেই এই কোম্পানী দুইখানি বড় ষ্টীমারে রেলের মালগাড়ী গঙ্গার একদিক হইতে অপরদিকে পার করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। খিদিরপুর হইতে অপর পারে শালিমার এই উভয় স্থানের মধ্যে মালগাড়ীবাহী ষ্টীমার যাতায়াত করে।

১৮৯৬ সাল হইতে অপরপারে তেল্‌কলঘাট হইতে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেল লাইন আমতা ও সেয়াখালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া হাওড়া জেলার এই অঞ্চলের লোকের কলিকাতা আগমনের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই সকল স্থানে যাইতে হইলে একমাত্র ঘোড়ার গাড়ীই অবলম্বন ছিল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ই, আই, রেলকর্ত্তৃক নূতন কর্ড্‌ লাইন বিস্তৃত হওয়াতে এই অঞ্চলের পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১

চক্ষু মেলি চেয়ে দেখ সয়েছ কি ক্ষতি
এতদিন বৃথা ভয়ে করিয়া প্রণতি।
কত পিছে পড়িয়াছ, কত নীচে আজ
ধূলায় লুটায় তব মাথার সে তাজ।
শাস্ত্র ভয় দেখায়েছে তর্জ্জনী-সঙ্কেতে
রাষ্ট্র চাপায়েছে গুরু পাষাণ বক্ষেতে—
তুমি ভীরু আছ চেয়ে কেবলি আঁধারে
অনির্দ্দেশ্য অনির্দ্দিষ্ট মরণের পারে—
কল্পনা রঙীন্ শুধু পরলোক প্পানে
জীবনে বিমুখ করি মরণের ধ্যানে।
মৃত্যু-অজগর মুখে আকৃষ্ট মানুষ,
মোহ-হত মুগ্ধ মৃত তারা কাপুরুষ।
জীবনের ব্যর্থ করি হয়েছে কেবল
মরণের বৈতালিক অল্পায়ু দুর্ব্বল।

২২

জীবনের স্রোতমুখে দানি অনিবার
সবে মিলি বাধাবন্ধ নিত্য ভারে ভার
করেছ কেবলি রুদ্ধ গতিটি তাহার;
আজ পূতিগন্ধে তাই শিহরে সংসার।
সত্যেরে রেখেছ চাপি পাষাণের তলে,
মিথ্যা তাই আজি তব সর্ব্বকার্য্যে জ্বলে;
এ মিথ্যা পাষাণ হ'তে সত্য-অহল্যায়
উদ্ধারিবে কে মানুষ কে আছ ধরায়?
এ স্ফটিক স্তম্ভ মাঝে নৃসিংহ বিরাজে
হিরণ্যকশিপু বধে আসিবে সে কাজে।
মানুষ, তোমারে হ'তে হবে পুনরায়
প্রহ্লাদ শ্রীরামচন্দ্র এ শ্যাম ধরায়;
প্রাণপাতি যে বাধায় করেছ নির্ম্মাণ
সরাতে তাহারে আজি দিতে হবে প্রাণ।

২৩

জানি, আছে বহু বিঘ্ন বহু অন্তরায়
চলিবে না ভাবিলে তা' ; তীব্র যন্ত্রণায়
বরিতে হইবে বুকে প্রসন্ন অন্তরে,
ঝাঁপায়ে পড়িতে হবে সাহস-মন্তরে
বিপদের মাঝে ; নিতে হবে জানু পাতি
সসম্মানে সব ক্ষতি ; ভেঙে যাবে ছাতি,
তাহাও সহিতে হবে ; আসিলে মরণ
নীলকণ্ঠ সম তা-ও করিবে বরণ।
কেহ বা বলিবে মূর্খ, কেহ কবে বাহা,
অচঞ্চল রবে তুমি শুনিবে না তাহা,
মানুষের তপস্যার তবে হবে সুরু—
মানিবে মানুষ তারে মানুষের গুরু।
একার সাধন নহে এ তপস্যা খানি
নিখিল-মানুষে নিতে হবে সাথে টানি।

২৪

সাহস আলোকলতা, শক্তি তার ফুল,
গন্ধরাজ যোজন-সুগন্ধী, চম্পাকুল ;
ঈশ্বরের সিংহাসন সাহস নড়ায়
তবে শক্তি আনে তাঁরে মাটির ধরায় ;
সাহস কবির মন, শক্তি তার লেখা ;
শক্তি প্রাণবন্ত, পেলে সাহসের দেখা ;
সাহস প্রদীপ্ত সূর্য্য, শক্তি রৌদ্র রাগ ;
শক্তি অশ্ব, সাহস এ রাজসূয় যাগ ;
সাহস নির্ঝর তাহে, শক্তি উর্ম্মিলীলা ;
বাজায় মঞ্জীর তার অন্তরায় শিলা ;
বিশ্বময় শুধু বাধা, কেবলি কণ্টক,
অভ্রভেদী গিরি, সিন্ধু জীবন-অন্তক,
এ সব সরাতে হবে দু'হাতে দু'পায়ে,
হে সাহসী শক্তিমান্, যে-কোনো উপায়ে।

২৫

ভেঙে পিষে পিটে টিপে কাটিয়া ছাঁটিয়া,
ভ্রষ্ট দুষ্ট ক্ষত দেহে অমৃত বাঁটিয়া,
গড়িতে হইতে নব এ পুরানো ধরা
নূতন করিয়া তোরে, চির আলো-করা—
অমর অক্ষয় সত্য নিত্য সিংহাসন,
নর-লোকে চিরশ্যাম মহাবৃন্দাবন,
ভাই বলি আলিঙ্গিতে নিখিল মানবে
নয়নে ঝরিবে অশ্রু ; কাড়াকাড়ি হবে
নিজের মুখের গ্রাস ক্ষুধিতে দিবার,
ভা'য়ের পায়ের কাঁটা বুকেতে নিবার।
সাহসে শক্তিতে প্রেমে জ্ঞানে মনীষায়
মানুষে উন্নত দেখি ঈশ্বর লজ্জায়
আসিবে মানুষ-পার্শে সখা-রূপে তার ;
মানুষ মানুষ তবে হইবে আবার।

প্রাচীন ভারতে কুরু বংশ

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি

১

অতি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহারা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল কুরুরা তাহাদের অন্যতম। কিন্তু তাহা হইলেও ঋগ্বেদে তাহাদের প্রাধান্য তেমন ভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে (Rgveda X., pp. 33-34) 'কুরুশ্রবণ' এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন 'কুরুদের যশোভাতি', আবার কেহ কেহ বা অর্থ করিয়াছেন 'কুরুদের গৌরবগাথার শ্রবণকারী'। উইলসন সাহেব (Rgveda, VI pp. 88-89) শ্লোকটি নিম্নলিখিত ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন :—"পাত্র সমূহের অধিকারী, কুরুদের প্রশংসা শ্রবণকারী, (হে ইন্দ্র) আমরা তোমার মঙ্গল বন্দনা করি, তুমি সম্পদ দান কর। যেন তিনি (ইন্দ্র) তোমাকে (ঐশ্বর্য্য) দান করেন, কারণ তুমি (পুণ্যদান কর্ম্মে) ধনী। এবং যাহা আমি অন্তরে পোষণ করি এই সোম (যেন তেমনি হয়)।" কিন্তু পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ 'কুরুশ্রবণ' শব্দটি কুরুবংশের কোনো বিশেষ একটি রাজার নামরূপে গ্রহণ করেন এবং মনে করেন, কুরুদের শাসক বলিয়াই এ নাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। যে স্তোত্রটির শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার পরের স্তোত্রেই কুরুশ্রবণের দান-কর্ম্মের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেখানে যে শব্দটি বিশেষ কোনও রাজার নামরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবারও উপায় নাই। এই স্তোত্রে তাঁহার কয়েক জন পূর্ব্বপুরুষেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। স্তোত্রটি এইরূপ :—"(দেবতারা) মানুষের নিয়োগ কর্ত্তারা আমাকে কুরুশ্রবণের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি রাস্তায় পূষণকে বহন করিয়াছি। সর্ব্বলোকের দেবতারাই আমার রক্ষা কর্ত্তা। আমি ঋষি, আমি পুরোহিতদের জন্য ত্রাসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণের নিকট (অর্থ) যাচ্ঞা করি। তাঁহার অশ্বত্রয় সুখে আমাকে রথে বহন করিয়াছে ; আমি তাঁহাকে সেই উৎসবে প্রশংসা করি যাহাতে তিনি সহস্র সহস্র দান করিয়াছেন। উপমশ্রব, তোমার পিতার বাক্য-সমূহ সেই আনন্দপ্রদ শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় মধুর যাহা ভিক্ষুকদিগকে দান করা হইয়াছে। হে পুত্র, তুমি মিত্রাতিথির প্রপৌত্র। তুমি আমার নিকটে আইস। আমি তোমার পিতার প্রশংসাকারী। যদি আমি অমর ও মরলোকের অধিপতি হইতাম তবে আমার দাতা (উপকারী) জীবিত থাকিত। দেবতারা যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অতিক্রম করিয়া কেহ শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে না। সুতরাং সে তাহার বন্ধুবান্ধব হইতে বিযুক্ত হইয়াছে।" (Rgveda X, 33. 1 and 4—9 ; Wilson, Rgveda Vol. VI, pp. 89-90) এই শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঋগ্বেদ স্তোত্রের ঋষি তাঁহার মুক্তহস্ত দাতার মৃত্যুতে শোক করিতেছেন এবং শেষোক্ত চারিটি শ্লোকে তিনি তাহার পুত্র উপমশ্রবকে সান্ত্বনা দিতেছেন। উপমশ্রবের পিতামহ মিত্রাতিথিরও উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়। এই শ্লোক হইতে মনে হয় যে, উপমশ্রব কুরুশ্রবণের পুত্র এবং এই কুরুশ্রবণের মৃত্যুর জন্যই তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বৃহদ্দেবতা বলেন,—ঋগ্বেদের এই শ্লোকগুলি পিতামহ মিত্রাতিথির মৃত্যুতে উপমশ্রবকে সান্ত্বনা দানের জন্য বিরচিত হইয়াছিল।—"নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে কুরুশ্রবণ ত্রাসদস্যবের প্রশংসা করা হইয়াছে। (X. 33, 6-9) রাজা মিত্রাতিথির মৃত্যুতে ঋষি পরবর্ত্তী চারিটি (শ্লোকে) যাহার প্রারম্ভ (যস্য X 33. 6-9), তাঁহার (মিত্রাতিথির) পৌত্র উপমশ্রবকে সান্ত্বনা দিতেছেন।" Brihaddevata, Macdonell, Part II, p. 260) কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমণীও বৃহদ্দেবতার মতকেই সমর্থন করে।

কুরুজাতি—ঋগ্বেদের যুগে

কুরুশ্রবণ এই উল্লেখযোগ্য নামটি ছাড়াও এই নৃপতিটি উপরোক্ত স্তোত্রে ত্রাসদস্যব অথবা ত্রাসদস্যুর বংশধর নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে (Rgveda IV. 38. 1; VII. 19, 3 etc) ত্রাসদস্যু পুরুদের নৃপতিরূপেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। ত্রাসদস্যুর প্রজা পুরুরা সরস্বতীর তীরে বাস করিত। সরস্বতী যে মধ্য দেশ দিয়া প্রবাহিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কুরুরা এই মধ্য প্রদেশের অধিবাসী ছিল। পরবর্ত্তী কালে পুরুরা যে কুরুদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল এই প্রাদেশিক পরিস্থিতিতে তাহাই প্রমাণিত হয়। (Vedic Index 1, 327) ইহা হইতেই কুরুদের সহিত পুরুদের যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বৈদিক নির্ঘণ্টের (Vedic Index) লেখকেরা বলেন—পরবর্ত্তী কালে যাহারা কুরু নামে পরিচিত হইয়াছিল তাহারা যে ঋগ্বেদে উল্লিখিত আরও কয়েকটি জাতির সমবায়ে গঠিত ওল্‌ডেনবার্গও সে সম্ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছেন। (Buddha, 403-404) ঋগ্বেদে যে—তৃৎসু ভরতেরা পুরুদের শত্রুরূপে বর্ণিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে সম্ভবতঃ তাহারাও পুরুদের সহিত মিলিয়া কৌরব জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।" (Vedic Index 1. 167) বৈদিক নির্ঘণ্ট (Vedic Index) আরও বলেন যে, "ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে ভরতের অত উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন পরবর্ত্তী সাহিত্যে জাতি সমূহের তালিকায় যখন তাঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না তখন স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, তাঁহারা অন্য কোনও জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এরূপ প্রমাণও আছে যে ভরতেরা যে প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন পরে কুরুদিগকে সেই প্রদেশই অধিকার করিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদেরই দুইজন যে দৃশদ্বতী, আপয়া এবং সরস্বতীর তীরে অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালের কুরুক্ষেত্র নামক পুণ্য তীর্থে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে (III 23) তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কথাও উল্লেখ যোগ্য যে বাজসনেয়ি সংহিতার একস্থানে ভরতেরা কুরু-পঞ্চালের ভিন্নরূপ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদান করিবার সময় একজন কৌরব ও দুইজন ভরত নৃপতির নামের উল্লেখ থাকিলেও তাঁহারা কোন জাতিকে শাসন করিতেন তাহা বর্ণিত হয় নাই। অথচ অন্য নৃপতিদের নামগুলি উল্লেখের সময় এই সমস্ত বিবরণ বিশেষ ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে।" (Vedic Index,167—168)

অধ্যাপক কিথও বলেন যে, ভরতেরা কুরুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল এবং Cambridge History of India পুস্তকে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে সেই কথাই তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—যে ভরতেরা ঋগ্বেদের তৃতীয় এবং সপ্তম খণ্ডের নায়ক, কুরুরা তাহাদেরই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল এবং কুরুদের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চালদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ যে, কুরুরা নূতন আগন্তুক এবং ভরতেরা তাহাদের সঙ্গেই মিশিয়া গিয়াছিল এবং এইরূপে পরিপুষ্ট হইয়া পুরুদিগকেও তাহারা নিজেদের ভিতর গ্রহণ করিয়াছিলেন। Cambridge History of India, p. 118)

Cambridge History of Indiaতে অধ্যাপক র‍্যাপসন সেই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—ঋগ্বেদের ভরতেরা কুরুদের সহিত মিশিয়া যায় এবং প্রাচীন ভারতের এই দুইটি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী জাতির সংমিশ্রণে যে জাতির উৎপত্তি হয় তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত রাজ্যই কুরুক্ষেত্র নামে পরিচয় লাভ করে। ঋগ্বেদের (III, 23,4) সময় যে ভরতেরা সরস্বতী তীরে বাস করিত তাহারা কুরুদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের অধিকৃত সমস্ত রাজ্য নূতন এবং পুরাতন এই উভয়ের সম্মিলনে যে রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কুরুদের ভূমিরূপে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। ভরত দৌঃশক্তির বংশধরদের মহাযুদ্ধ এইখানেই সংঘটিত হয় এবং এই স্থান হইতেই ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা প্রথমে হিন্দুস্থানে এবং পরে সমগ্র মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। (Cambridge History of India p. 47)

পাকস্থামন নামে আরও একটি রাজার দান কর্ম্মের গৌরব গাথা ঋগ্বেদের (III. 23) স্তোত্র সমূহে গীত

হইয়াছে। সেখানে তিনি কৌরযাণ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এ আখ্যা তাঁহার পিতৃবংশের পরিচয় হইতেই উদ্ভুত। রাজা পরীক্ষিতের শাসনাধীনে কৌরবক নামে অভিহিত এক ব্যক্তি সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করিতেছে, এরূপ বর্ণনা অথর্ব্ববেদে (XX, 127,8) পাওয়া যায়। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে কুরুদের নামের খ্যাতি পরবর্ত্তীকালে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বৈদিক যুগের প্রথম ভাগেও একটি প্রতিপত্তিশালী ভারতীয় আর্য্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ই সে নামের অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু সে যাহাই হোক্, প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় সমূহের ভিতর কৌরবদের প্রাধান্য ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই বিশেষ ভাবে ঘোষিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে কুরু এবং পঞ্চালদের নাম অধিকাংশ স্থানেই এক সঙ্গে দেখা যায়। এবং এই সাহিত্যে যে ভাবে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এই কুরু-পঞ্চাল অধ্যুষিত রাজ্যেই কোনও কোনও বিখ্যাত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের মহাভিষেক নামক অধ্যায়ে দেখা যায়—"অতঃপর এই দৃঢ় কেন্দ্রীভূত, সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানে সাধ্যরা এবং অপত্যরা দেবতারা সাতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশের সহিত এবং এই ত্রিপদী, এই যজু এবং বন্দনা গানের সহিত তাঁহাকে নৃপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। সুতরাং এই দৃঢ় কেন্দ্রীভূত সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানে বশ এবং উশীনর এবং কুরুপঞ্চালের যত রাজা ছিলেন তাঁহারা সকলেই নৃপতিত্বে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকের পর দেবতাদের কর্ম্মানুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে নৃপতি নামে অভিহিত করিলেন।" (Aitareya Brahmana, VIII, 14., Tr. Keith, Rgveda Brahmanas, p. 331) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে ভাবে কুরু-পঞ্চালের রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতা এই রাজ্যেরই অধিবাসী ছিলেন। সাম বেদের তাণ্ড মহাব্রাহ্মণ এবং শ্বেত যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের রচনা স্থান সম্বন্ধে ওয়েবার সাহেব ভিন্ন অঞ্চলের নির্দ্দেশ করেন। (Weber, History of Indian literature, pp. 68 and 132) কিন্তু বৈদিক নির্ঘণ্টের (Vedic Index I. 165) গ্রন্থকর্ত্তারা বলেন "প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগুলি যে কুরু অথবা কুরু-পঞ্চালের সম্মিলিত রাজ্যে রচিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।" তাঁহারা আরও বলেন—"কুরুদের নাম কচিৎ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। কুরু এবং পঞ্চালদের ভিতর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকায় তাহাদের নাম সাধারণতঃ এক সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা যে সংযুক্ত জাতি তাহাও বহুস্থানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কুরুপঞ্চাল রাজ্যে ভাষা একটি বিশেষ আকার লাভ করিয়াছিল; কুরু পঞ্চালের বলিদান পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি রূপে বর্ণিত; কুরু-পঞ্চালের রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। তাহাদের নৃপতিরা শীতকালে রাজ্যজয়ে বহির্গত হইতেন, এবং গ্রীষ্মকালে ফিরিয়া আসিতেন। পরবর্ত্তীকালে কুরু-পঞ্চাল ব্রাহ্মণেরা উপনিষদেও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।" (Vedic Index 1. 165) যখন ব্রাহ্মণ এবং প্রথম দিকের উপনিষদগুলি রচিত হয়। (৮০০-৬০ খৃঃ পূ) তখন রাজনৈতিক হিসাবে পঞ্চাল এবং কুরুদের রাজ্যই প্রধান ছিল। তাঁহাদের রাজ্য তখন দিল্লী অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিল (Eliot, Hinduism and Buddhism, vol. I p. 20) শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ কাণ্ডে দেখা যায় যে, কুরু-পঞ্চাল প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা বিদেহ রাজা জনকের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিতেছেন। (cf. The Brhadaranyaka Upanisad, III. I. I. 10 pp.)

ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে কুরুদের স্থান

শতপথ ব্রাহ্মণে (XXII 9,3,3) বলহিক প্রাতিপীয় নামে একজন কৌরভ্য রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌরভ্য শব্দটি কৌরব নামেরই অপভ্রংশ এবং মহাকাব্যেও এ শব্দটির ব্যবহার আছে। যাস্কের নিরুক্তে (II, 10) লিখিত আছে, দেবাপি আরষ্টিষেণ এবং শান্তনু কৌরব্য ছিলেন। পরেও আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে কুরু রাজারা কৌরব্য নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্যেরই পরিশিষ্ট। এই ছান্দোগ্য উপনিষদে কুরুরাজ্যে

পঙ্গপালের দ্বারা অথবা শিলাবৃষ্টিতে শস্য ধ্বংসের একটা বিবরণ পাওয়া যায়। তখন একজন বুভুক্ষু ঋষি এই কুরু রাজ্যেই কিরূপে অপবিত্র খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন এই গ্রন্থে সে সম্বন্ধেও একটি গল্প বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ :—কুরুরা যখন শিলাবৃষ্টির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উসস্তি চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর সহিত ভিক্ষুক রূপে বাস করিতেছিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত লোককে সিম ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট কিছু সিম প্রার্থনা করেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি বলিলেন—"যে সিমগুলি এইখানে আমার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য সিম আমার নাই।" উসস্তি বলিলেন—"তবে ঐগুলি হইতেই আমাকে আহারের জন্য দান করুন।" তিনি তাঁহাকে সিমগুলি দিয়া বলিলেন—"এখানে পানের জন্যও কিছু পানীয় আছে।" উসস্তি উত্তর দিলেন—"আমি যদি ঐ পানীয় পান করি, তবে অন্যের জন্য রক্ষিত ? সুতরাং অপবিত্র জিনিষ পান করা হইবে।" সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন "সিমগুলি কি অন্যের জন্য রক্ষিত সুতরাং অপবিত্র ছিল না ?" উসস্তি উত্তর দিলেন—"না, কারণ আমি যদি ওগুলি ভক্ষণ না করিতাম তবে জীবিত থাকিতে পারিতাম না, কিন্তু জল পান করা কেবলমাত্র রসনার তৃপ্তির জন্য।" নিজে ভক্ষণ করিয়া উসস্তি অবশিষ্ট সিমগুলি তাঁহার পত্নীকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই আহার করিয়াছিলেন সুতরাং সেগুলি গ্রহণ করিয়া তিনি স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া উসস্তি তাঁহার পত্নীকে কহিলেন—"হায়, আমরা যদি কিঞ্চিৎ আহার্য্য পাইতাম, তবে কিছু অর্থ লাভের সুযোগ ছিল। রাজা এখানে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। পৌরহিত্য করিবার জন্য তিনি হয় ত আমাকে মনোনীত করিতে পারিতেন।" তাঁহার স্ত্রী তখন বলিলেন—"তোমার সিমগুলি আমি ভোজন করি নাই। তাহা এইখানেই আছে।" অতঃপর সিমগুলি ভক্ষণ করিয়া যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছিল তিনি সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। (Chandogya Upanisad 1. 10. 1-7 Sacred Books of the East series, Vol. I. pp. 18-19) ক্ষুধা এবং দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ক্ষণিক অপবিত্রতা সত্ত্বেও এই ঋষিটি যে কি প্রকারে যজ্ঞে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলি করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন তাহার পরিচয় এই উপনিষদখানিতে পাওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, কুরুপঞ্চাল রাজ্য ধ্রুব মধ্যম দিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই প্রদেশটাই মধ্যদেশ আখ্যালাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক র‍্যাপসন দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়াও কুরুদের রাজ্য পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কুরুরা ডোয়াবের উত্তরাংশ অথবা যমুনা এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে তাহাদের প্রতিবেশী ছিল উত্তর পঞ্চালেরা এবং দক্ষিণে ছিল দক্ষিণ পঞ্চালেরা। ডোয়াবের অবশিষ্ট অংশ -বৎসদের দেশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রয়াগের নিকট যেখানে দুইটি নদী মিশিয়াছে তাহারই প্রান্ত পর্য্যন্ত পঞ্চালদের অধিকারভুক্ত হয়। (Rapson, Ancient India p. 165)

স্থান নির্দ্দেশ

বিখ্যাত শাস্ত্রকার মনু কুরু এবং অন্যান্য সংযুক্ত জাতিদের বাসস্থান পবিত্র ব্রহ্মর্ষি দেশের অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "কুরুদের সমতলক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং সুরসেনকদের (রাজ্য)—এইগুলিই বস্তুতঃ ব্রহ্মর্ষিদের দেশ ছিল ; ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই এগুলি অবস্থিত ছিল। (Buhler's Laws of Manu, P 32)

কুরুপ্রদেশের পবিত্রতা

ভগবদ্গীতাই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা ভারতবর্ষের সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন। এই ভগবদ্গীতার প্রথম শ্লোকই কুরুদের রাজ্য ধর্ম্মক্ষেত্র অথবা পুণ্যস্থানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাকাব্য মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র স্থানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বানপর্ব্বে (chapter 129, pp. 394-395) দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান যেখানে ধর্ম্মপ্রাণ কুরুরা বাস করেন। এইখানেই নহুষের পুত্র যযাতি বহু ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এইখানেই দেবর্ষি এবং রাজর্ষিরা সারস্বত যজ্ঞ নিষ্পন্ন

করিয়াছেন এবং এইখানেই প্রজাপতির যজ্ঞও সমাধা হইয়াছে। মনুও কুরুক্ষেত্রের অধিবাসীদের শক্তি এবং বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ্য জয়ের অভিযানে নিক্রান্ত জনৈক রাজাকে উপদেশ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"কুরুক্ষেত্র, মৎস্য এবং পঞ্চালতে (যাঁহারা জন্মিয়াছেন) এবং যাঁহারা সুরসেনতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং (অন্যান্য যাঁহারা) দীর্ঘাকৃতি এবং লঘুগতি তাঁহারা তাহাদিগকে সেনাগ্রভাগে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করুন।"

ব্রাহ্মণগ্রন্থেও কুরুক্ষেত্র বিশেষ পুণ্যভূমির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহারই সীমার ভিতর দিয়া পুণ্যতোয়া দৃসদ্বতী, সরস্বতী এবং আপয়া প্রবাহিত। (Vedic Index, 1., P, 169)

কুরুক্ষেত্র অথবা দিল্লীপ্রদেশই পরবর্ত্তী কালে কুরুপাণ্ডুদের যুদ্ধভূমি। মহাভারতের মতে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিই এইযুদ্ধে এক পক্ষে না এক পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। (Rapson, Ancient India, p. 173) তাহার পর হইতে এই প্রদেশেই ভারতবর্ষের বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। ইহার কারণও আছে। হিমালয় এবং ভারতীয় মরুভূমির মাঝখানে এই স্থানেই একটি অপ্রসস্থ বাসযোগ্য প্রদেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার অবস্থানও এরূপ যে পাঞ্জাব হইতে যে কোন সৈন্যদলই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসুক না কেন, তাহাকে এই প্রদেশটি অতিক্রম করিতেই হইবে। ইহার এইরূপ সামরিক অবস্থানের জন্যই উত্তর পশ্চিম দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া মোগল সম্রাটেরা দিল্লীতেই তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা সমুদ্রপথে এ প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রাথমিক রাজধানীসমূহ উপকূলেই নির্ম্মিত হয়। (Ibid, p. 173) কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারাও দিল্লীতে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—দিল্লী আবার তাহার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। Ibid, p. 47)

কুরুক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

মধ্যদেশের কুরু ছাড়াও উত্তর কুরু নামে আর একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্রের মহাভিষেক নামক অধ্যায়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই উত্তর কুরুদের রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে লিখিত আছে—"অতঃপর উত্তরপ্রদেশে সকল দেবতা সাতদিন ধরিয়া পঞ্চবিংশের সহিত এবং এই ত্রিপদী, এই যজুঃ এবং এই সব বন্দনাগানের সহিত তাঁহাকে নৃপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। সুতরাং এই উত্তরপ্রদেশে, এই উত্তর কুরু এবং উত্তর মদ্রদের রাজ্যে, হিমাবন্তের পরপ্রান্তে তাহাদের (রাজারা) নৃপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দেবতাদের কর্ম্মানুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে অভিষিক্ত হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদিগকে 'হে সম্রাট' এই নামে অভিহিত করিত।" (Ait. Bra. VIII 14. Tr. Keith's Rgveda Brahmanas, pp. 330-331) বৈদিক নির্ঘণ্টের (Vedic Index) গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে, যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপরোক্ত পদটি লিখিত হয়, উত্তর কুরুরা তখন ঐতিহাসিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—"মহাকাব্য এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে যে-উত্তরকুরুরা কাল্পনিক ভূমিকার অভিনয় করিয়াছেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁহারও ঐতিহাসিক জাতি। সেখানে তাঁহারা হিমালয়ের পরপ্রান্তের (পরেণ হিমবন্তম্) অধিবাসীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অন্য এক স্থানে বশিষ্ঠ সাত্যহাব্য বলিয়াছেন উত্তরকুরু দেবতাদের স্থান (দেবক্ষেত্র), কিন্তু জানংতপি অত্যরাতি উহাকে জয় করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, সুতরাং উহা একেবারে কাল্পনিক জিনিষ নহে। এরূপক্ষেত্রে জিম্মার যাহা বলেন অর্থাৎ উত্তরকুরুরা কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—এই মত গ্রহণ করাই সঙ্গত' বলিয়া মনে হয়। এ মত গ্রহণ করার আরও একটি বিশেষ কারণ এই যে, কুরুক্ষেত্রে সাধারণতঃ সেই সমস্ত জাতিকেই দেখা যায় যাহারা কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিল।" (Ved. Index. 1, p. 84)

উত্তরকুরু

বৌদ্ধ সাহিত্যে উত্তর কুরু বহুস্থলে পৌরাণিক প্রদেশ রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এমন প্রমাণ দুই চারিটি পাওয়া যায় যাহাতে মনে হয়, এরূপ একটি প্রদেশের ক্ষীণ স্মৃতিও ছিল এক সময়ে যাহার সত্য সত্যই ঐতিহাসিক অবস্থানও ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ

করা যায়ঃ—গয়ার অধিবাসী জটিল—গয়া কাস্যপের মনোগত ভাব জানিয়া বুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন যে, যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত না হইলেই ভাল করিতেন। সুতরাং তিনি ভিক্ষার্থে কুরুদ্বীপে গমন করিলেন এবং অনোতত্ত হ্রদের তীরে তিনি যাহা ভিক্ষাস্বরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই ভোজন করিলেন। (Dipavamsa, p. 16) শাসনবংশে (p. 12) দেখা যায় যে, উত্তরদ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত প্রদেশ কুরুরাজ্য (কুরুক্ষেত্রম্) নামে অভিহিত হইত।

পপঞ্চসুদনীতে পাওয়া যায়, কুরুনামে একটি জনপদ ছিল এবং তাহার রাজারা কৌরব নামে অভিহিত হইতেন। (P. T. S. edition p, 225) অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে জম্বুদ্বীপের ষোলটি মহাজন অর্থাৎ প্রধান প্রদেশের ভিতর কুরুরাজ্যেরও উল্লেখ আছে। ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল এবং ইহার অধিকারে সাত রকমের রত্ন ছিল। (Vol. I. p 213 ; Vol. IV ; pp. 252, 256, and 260 ; Digh Nikaya, II pp. 200, 201 and 203) যেমন ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে তেমনি বৌদ্ধ-সাহিত্যেও কুরুদের নাম কদাচিৎ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদের নামের সঙ্গে পঞ্চালদের নাম সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। এই দুই জাতির ভিতর যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তাহাই তাহাদের এরূপভাবে একত্রে উল্লেখিত হইবার কারণ। কুরুরাজ্যে বুদ্ধের বাসের জন্য কোনও বিহার ছিল না—একথার উল্লেখও আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যেই পাইয়াছি। কম্মসধম্ম নগরের বহির্ভাগে একটি সুন্দর অরণ্য ছিল; বুদ্ধ সেইখানেই বাস করিতেন। রাজগৃহ,বৈশালী,সাকেত প্রভৃতি মহানগরের মত ভগবান তথাগত নগরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠের কানন সমূহ বা উদ্যান সমূহেই বাস করিতে ভালবাসিতেন। কুরুরাজ্যের অধিবাসী, ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, উপাসক এবং উপাসিকারা স্বাস্থ্য সম্পদে সম্পৎশালী ছিলেন, গভীর সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেও তাঁহারা দ্বিধা করিতেন না। তাঁহাদের দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া সমস্ত ঋতুতেই অতি সুন্দর ছিল এবং তাঁহাদের খাদ্যও অতি উত্তম ছিল। দীঘনিকায়ের মহানিদানও মহাসতিপট্ঠান প্রমুখ কতকগুলি গভীর ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ভগবান বুদ্ধ এই কুরুদিগকেই প্রদান করেন। কুরুরা সতিপট্ঠান সম্বন্ধে এতই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিল যে তাহাদের ভৃত্যেরাও তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। তাহারা যেখানেই সমবেত হইত জল সংগ্রহের স্থানেই হোক্ আর চরকা কাটার স্থানেই হোক্, সতিপট্ঠান ছাড়া কুরুদের আর অন্য আলোচনার বিষয় ছিল না। কুরু রাজ্যের যদি কোনও রমণী বলিতেন যে তিনি সতিপট্ঠান সম্বন্ধে কিছু জানেন না তবে তিনি নিন্দিত হইতেন এবং সতিপট্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত। কুরুরাজ্যের পক্ষীদিগকে পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত যে তাহারাও সতিপট্ঠান সম্বন্ধে চিন্তা করিত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গল্পটি এইরূপ—কুরুরাজ্যে একজন অভিনেতার একটি শিক্ষিত পাখী ছিল। ভুলক্রমে এই অভিনেতা পাখীটিকে শামণেরিদের এক মঠের কাছে ফেলিয়া আসে। পাখীটি তাঁহাদের দ্বারা অট্ঠি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিক্ষালাভ করে পাখীটির নাম ছিল বুদ্ধ রক্ষিত। একদিন এই বুদ্ধ রক্ষিত বাজের দ্বারা আক্রান্ত হইলে শামনেরি তাহাকে বাজের কবল হইতে মুক্ত করেন। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—সে যখন বাজের কবলে ছিল তখন সে কি চিন্তা করিতেছিল? পাখীটি উত্তর দিল যে সে অট্ঠি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া শামণেরিরা তাহার বিস্তর প্রশংসা করেন। (Papancasudani, P. T. S. pp. 227-229)

বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু গল্পে কুরুরাজ্য কুরু নৃপতি এবং কুরু জন-সাধারণের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। থের রট্ঠপালের গল্পও এই বৌদ্ধ সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার উল্লেখ থেরী গাথায় পাওয়া যায়। রট্ঠপাল কুরুরাজ্যের থুল্লকোট্ঠিত নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন রাজসভাসদ। যৌবনে মনোমত পত্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি স্বর্গীয় সুখও উপভোগ করেন। এই সময়ে বুদ্ধ কুরু রাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে থুল্লকোট্ঠিত

বৌদ্ধ সাহিত্যে

উত্তরকুরুর প্রসঙ্গ

রট্ঠপালের গল্প

সহরে উপস্থিত হন। রট্‌ঠপাল তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। সংসার পরিত্যাগ সম্বন্ধে পিতামাতার অনুমতি লাভ করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অতঃপর ভগবান তথাগতের আদেশে একজন ভিক্ষুর দ্বারা তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিতেন এবং অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া অরহত্বলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। একদিন রাজা কোরভয় তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কেন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন? রট্‌ঠপাল রাজার সহিত সংসারের প্রত্যেক জিনিষের অনিত্যতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন এবং মানব দেহের ক্ষণ স্থায়িত্ব মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এইরূপে রাজা কোরভয়কে ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া যান। বুদ্ধদেব তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলেন—ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (Psalms of the Brethren pp. 302-307) আবার মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে দেখা যায় যে রট্‌ঠপাল রাজা কোরভয়ের মৃগয়া উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। এই উদ্যানেই রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া রাজা তাঁহার সহিত বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু, রোগে মৃত্যু, ধনক্ষয় এবং আত্মীয় বিনাশ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। (Vol. p. 65 foll)

ধর্ম্মপদ ভাষ্যে একটি ভিক্ষুর গল্প বর্ণিত হইয়াছে। এই ভিক্ষুটি কুরু রাজ্যের উপকণ্ঠে বাস করিয়া জন সাধারণের দানের দ্বারা জীবন ধারণ করিত।

অগ্নিদত্তের গল্প

মহাকোশলের মৃত্যুর পর পসেনদি কোশলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অগ্নিদত্ত নামে মহাকোশলের একজন পুরোহিত ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তরুণ রাজার অধীনে কাজ করা অসঙ্গত মনে হওয়ায় পুত্রকে তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দশ সহস্র শিষ্য ছিল। তাহাদের সহিত তিনি অঙ্গ মগধের পূর্ব্ব প্রদেশ এবং কুরুরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে বাস করিতেন। অঙ্গ মগধ এবং কুরু রাজ্যের অধিবাসীরা তাঁহাদিগকে প্রচুর খাদ্য এবং পানীয় দান করিত। Dhammapada commentary, Vol. III pp. 241-242) এই ব্রাহ্মণ অগ্‌গি দত্ত (অগ্নিদত্ত) উভয় দেশের জন সাধারণেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অবশেষে ইনি একদিন সশিষ্য বুদ্ধের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যেদিন ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন অঙ্গ মগধ এবং কুরু রাজ্যের লোকেরা সেদিন তাঁহাকে বিরাট দানের দ্বারা অভিনন্দিত করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তাহারা খাদ্য এবং পানীয় আনিয়া দেখিতে পাইল ঋষিদের স্থান ভিক্ষুতে ভরিয়া গিয়াছে। অতঃপর এই ভিক্ষুরা কে তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহারা জানিতে পারিল যে, সশিষ্য ঋষি বুদ্ধের দ্বারা, বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুরা তাঁহারাই যাঁহারা পূর্ব্বে অগ্‌গিদত্ত এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দরূপে পরিচিত ছিলেন। (Dhammapada Commentary, Vol. III. pp. 246-247)

থেরীগাথা ভাষ্যে নন্দুত্তরা নাম্নী একজন থেরীর বিবরণ পাওয়া যায়। কুরুরাজ্যে কর্ম্মস্সধম্ম নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

নন্দুত্তরার গল্প

তিনি বিদ্যা এবং শিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নিগণ্ঠদের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গমন করিয়া তিনি মহাকচ্চায়নের দ্বারা তর্কযুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁহার দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি পরে অরহত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পর কৌরব রাজধানীর জনৈক রমণীর দুঃখ দুর্দ্দশার একটি বিবরণ পেতবত্থুর ভাষ্য পরমত্থদীপনীতে বর্ণিত হইয়াছে:—কুরুদের রাজধানী হস্তিনা

সেরিণীর গল্প

পুরে সেরিণী নামে একজন রমণী বাস করিত। সে নাস্তিক ছিল। বুদ্ধের প্রতি তাহার কোনওরূপ শ্রদ্ধা ছিল না এবং শ্রমণও ভিক্ষুদিগকে দানের দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায় তাহাও সে বিশ্বাস করিত না। মৃত্যুর পর সে প্রেতজন্ম লাভ করে এবং রাজ্যের উপকণ্ঠে সহরকে ঘিরিয়া যে পরিখা ছিল তাহারই সন্নিকটে

বাস করিতে থাকে। একদিন প্রত্যূষে যখন রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই, তখনই তাহার সহিত একটি উপাসকের সাক্ষাৎ হইল। এই উপাসকটি বাণিজ্য ব্যপদেশে নগরে যাইবার পথে পরিখার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। প্রেতী (প্রেত্নী) তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার কাছে আত্ম-প্রকাশ করিল। তাহার দেহে কোনও আচ্ছাদন ছিল না এবং তাহার দেহ এরূপ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছিল যে দেখিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। নিজের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া প্রেতলোকে তাহার এই দুর্দ্দশার কথা তাহার মাতাকে জানাইবার জন্য প্রেতিনী এই উপাসককে অনুরোধ করিল। তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উপাসব তাহার মাতাকে কন্যার দুর্দ্দশার কথা জানাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পালঙ্কের নিম্নে রক্ষিত অর্থের দ্বারা তাহার কল্যাণ কল্পে দান করিবার জন্য সে যে তাহার মাতাকে অনুরোধ করিয়াছে, সে কথাও তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। মাতা তাহার অনুরোধ পালন করিয়াছিলেন এবং প্রেতীও (প্রেত্নী) প্রেতলোকের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অতঃপর তাহার চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়। দিব্য শ্রীমণ্ডিত হইয়া সে তাহার মাতার নিকট আসিয়া তাহার ইতিহাসের আদ্যন্ত বর্ণনা করিয়াছিল। (Paramatthadipani on the Petavatthu, pp. 201-204)

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

মাঝির মেয়ে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

মোটা কাপড় মেটে সিঁদুর মিটির্ মিটির্ চায়;
মেঠো পথে মাঝির মেয়ে মেদীর ক্ষেতে যায়।
দূরে বন-মেহেদীর ক্ষেত
তা'তে ফুল্ ফুটেছে শ্বেত্;
মৃদু মৃদু হাসে মেয়ে মিঠে মিঠে গায়।
(মাদল—ধিতাং তানা ধিতাং তানা ধিতাং তানা তা…)

কৃষ্ণ-চুলে কৃষ্ণ-চূড়া দিব্বি খোঁপাটি,
চলার তালে দুলছে কাণে দোলন্-দোপাটি।
তার আড়্-নয়নের বাণ
হানে সব্ পথিকের প্রাণ্—?
গানের তানে হাবুডুবু প্রেমের দরিয়ায়।
(মাদল—ধিতাং তানা ধিতাং তানা ধিতাং তানা তা…)

ডাইনে ধূ ধূ ধানের জমি বিরাট সবুজ "টাঁড়্"
সাম্নে নদী বন্-পাহাড়ী, নাম জানিনা তার।
ওই দূরের নীলিমায়
ধীরে সূর্য্য ডুবে যায়,
বন-বাদাড়ে আঁধার নামে সাঁঝের ধোওয়া ছায়।
(মাদল—ধিতাং তানা ধিতাং তানা ধিতাং তানা তা…)

সাম্নে সবুজ ক্ষেত্ জোনারের ডাইনে মহুল্ বন্
বাউল-বাতাস বেতস বনে গাইছে বহুল্, শোন্!
তোর কাজল-কালো চোখ্
ওরে আরো উজল্ হোক্,—
ছল্ করে' ঐ মাঝির মেয়ে কপট কোপে চায়।
(মাদল—ধিতাং তানা ধিতাং তানা ধিতাং তানা তা…)

পায়ের ঘায়ে ছট্‌কে পড়ে মাস্-কড়ায়ের ফুল্
মৌটুস্কী, এই পথে তোর যাওয়াই হোলো ভুল্।
পথ কাঁটা কাঁকর-ময়
তোর ঐ পায়ে কি সয়?
বুক্ পেতে দি' পথের পরে চল্‌রে চপল্ পায়।
(মাদল—ধিতাং তানা ধিতাং তানা ধিতাং তানা তা…)

রাধাকৃষ্ণ

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

শ্রীশিশির কুমার মিত্র

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে শব্দ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার ধারণা গোড়ায় করিয়া লইলে ভাল হয়। শব্দ বায়ুতে কম্পন মাত্র। আমি যখন কথা বলিতেছি তখন আমার জিহ্বা সামনের বায়ুকে আঘাত করিয়া তাহাতে আন্দোলন তুলিতেছে—সেই আন্দোলন বায়ু বাহিয়া ঢেউয়ের আকারে আমার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; ঢেউ চলিবার পথে মানুষের কান থাকিলে, ঢেউ কানে ঢুকিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিয়া শব্দের অনুভূতি করাইতেছে। শব্দের প্রেরক আমার জিহ্বা, বাহক বাতাসের ঢেউ আর গ্রাহক মানুষের কর্ণেন্দ্রিয়। বাতাসে ঢেউ অনেক উপায়ে তোলা যায়। হাততালি দিয়া, কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া, শাঁখ দিয়া, বাঁশিতে ফুঁ দিয়া বাতাসে কম্পন বা ঢেউ তোলা যায়। অবশ্য বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রকমের ঢেউ হইবে—কখনও ছোট, কখনও বড়, কখনও সরল রকমের, কখনও বা জটিল আকারের,—যেমন জলের উপর ঢেউ নানা রকমে হইতে পারে—স্থির জলে ঢিল ফেলিলে একরকম হয়—গঙ্গার উপর ষ্টীমার চলিলে আর একরকম—সমুদ্রে ঝড় হইলে অন্য রকম—আবার অগভীর নদীর জলের উপর বাতাস খেলিয়া গেলে জলের উপরটা কুঞ্চিত হইয়া আর এক রকমের ঢেউ উৎপন্ন হয়।

১ নং
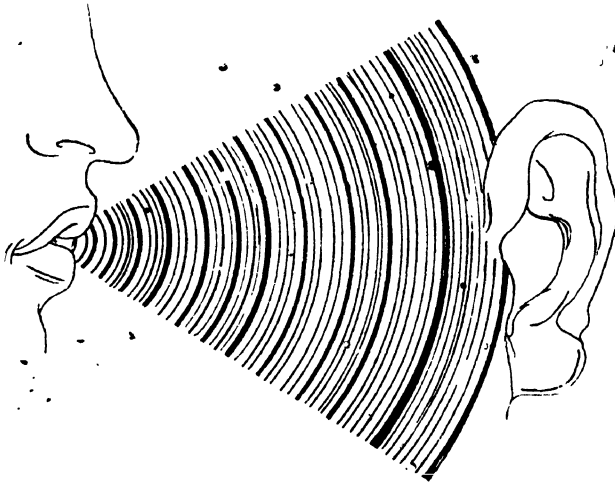
আমরা কথা বলিলে আমাদের জিহ্বা বায়ুতে আঘাত করে। সেই আঘাত ঢেউএর আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঢেউ চলিবার পথে মানুষের কান থাকিলে ঢেউ কানের ছিদ্র পথে ঢুকিয়া শব্দের অনুভূতি উৎপাদন করায়।

বাতাসে ঢেউ জনিত যে শব্দ হয় তাহা সব সময়ে মানুষের কানে সুখকর হয় না। ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, লোকের চীৎকার ধ্বনি, মটরের হর্ণ মানুষের কানে গিয়া বিরক্তি উৎপাদন করে। আমরা এই রকম গোলমেলে শব্দকে নিনাদ বলিব। পক্ষান্তরে হারমোনিয়ামের একটা চাবি যদি টেপা যায়, বাঁশিতে যদি ফুঁ দেওয়া যায়, বা পেয়ালাতে যদি একটা কাঠি দিয়া আঘাত করি তাহা হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের কাছে প্রীতিকর। এই রকম আওয়াজকে ইংরেজিতে musical sound বলে। আমরা ইহাকে ধ্বনি বলিব।

প্রথমোক্ত রকমের শব্দ—নিনাদ আমাদের কাছে অপ্রীতিকর কেন, আর শেষোক্ত রকমের ধ্বনি আমাদের কাছে প্রীতিকর কেন, তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত নয়। আমাদের বিজ্ঞান কলেজের বীক্ষণাগারে এমনি সব যন্ত্র আছে যাহার সাহায্যে শব্দের ঢেউয়ের ছবি তোলা যায়। যদি গোলমাল বা নিনাদের ছবি তুলি তবে দেখিতে পাই যে নিনাদজনিত ঢেউ আসে এলোমেলো ভাবে—তাহার মধ্যে পূর্ব্ব ও পরের কোনও সম্বন্ধ নাই; ঢেউ কখনও হইতেছে, কখনও থামিতেছে—কখনও ছোট কখনও বড়—একেবারে অসংলগ্ন—অসম্বন্ধ। পক্ষান্তরে যদি ধ্বনি বা musical soundএর ছবি তুলি তবে দেখি যে, ধ্বনির ঢেউ আসিতেছে নিয়মিত, সুসংলগ্ন, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে—একটার পর একটা সমান উঁচু ও সমান লম্বা সব ঢেউগুলি। প্রথমোক্ত রকমে ঢেউ কর্ণপটহের উপর অসম্বন্ধ এলোমেলো ভাবে আঘাত করে বলিয়া আমাদের কর্ণে পীড়া দেয়—আর ধ্বনির আঘাত নিয়মিত বলিয়া আমাদের কাছে সুখকর ঠেকে। আমরা সঙ্গীতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছি, আর সঙ্গীত নানা-রকমের ধ্বনির সমষ্টি মাত্র। সুতরাং আমরা ধ্বনির প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা আলোচনা করিব।

প্রথম ধরুন, দুইটা একই রকমের ধ্বনি একটা জোরালো ও একটা মৃদু হইতে পারে। জোরালো বা মৃদু নির্ভর করে ধ্বনির ঢেউয়ের মাথাটা কত উঁচু, তাহার উপর। বাঁশিতে বেশী জোরে ফুঁদিলে বা হারমোনিয়ামের বেলো জোরে টিপিলে ধ্বনির ঢেউয়ের মাথা বেশী উঁচু হয় ও শব্দও জোরাল হয়। ২নং ছবিতে দেখা যায় যে ক ও খ একই রকমের ঢেউ শুধু 'ক'এর মাথা বেশী উঁচু—অর্থাৎ ক ঢেউগুলি খ ঢেউগুলির চাইতে বেশী জোরালো। আবার ধরুন, ধ্বনি তীব্র বা খাদ হইতে পারে। হারমোনিয়ামের চাবি বাঁদিক হইতে ডাইন দিকে টিপিয়া গেলে বা বেহালার তাঁত আঙ্গুলে টিপিয়া ক্রমশঃ ছোট করিলে ধ্বনি তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। ধ্বনি খাদ কিম্বা তীব্র হয় বায়ুতে কম্পনের সংখ্যার উপর। বায়ুতে কম্পন যদি খুব তাড়াতাড়ি তোলা যায় তবে ধ্বনি তীব্র হয়—যদি মন্থর ভাবে হয় তবে খাদে নামিয়া যায়। টেবিল হারমোনিয়ামের মাঝের C ধ্বনির কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ডে ২৫৬ বার। অর্থাৎ যখন হারমোনিয়ামে ঐ চাবি টিপিয়া বেলো করা যায় তখন ভিতরে রীডের পিত্তলের ফলকটা সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কাঁপিতে থাকে,—সেই কম্পন বায়ুতে সংক্রামিত হইয়া যে ঢেউ তোলে তারও আন্দোলন সেকেণ্ড ২৫৬ বার হইতে থাকে।

আবার ধরুন, এমন দেখা যায় যে, দুইটা ধ্বনি ঠিক একই সুরে বাঁধা (অর্থাৎ দুইটারই কম্পন সংখ্যা এক) একই রকম জোরালো, অথচ দুইটা কানে দু'রকম শোনায়। যেমন ধরুন বেহালা আর হারমোনিয়ামের একটা ধ্বনি যদি একই সুরে বাঁধা থাকে তবুও কানে শুনিয়া বলা যায় একটা বেহালা আর একটা হারমোনিয়াম। এই পার্থক্যের কারণ কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পার্থক্যের কারণ এই যে দুইটার ঢেউয়ের কম্পন সংখ্যা যদিও এক তবুও দুইটার ঢেউয়ের আকার দুই রকম। এই আকারের বিভিন্নতার জন্য ধ্বনি দুইটার প্রকৃতির ঐ তফাৎ টুকু হয়। ২নং ছবিতে খ, গ,
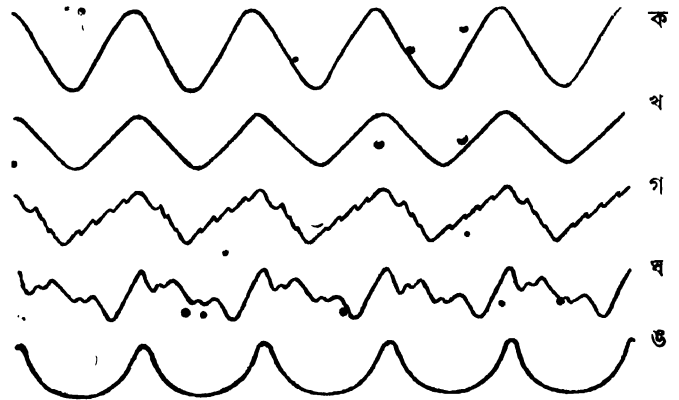
২ নং—নানা আকারের ঢেউ

ক ও খ ঢেউ মুখ বন্ধ অর্গান পাইপে পাওয়া যায়। ক, খ'র চাইতে জোরাল। বেহালার শব্দের ঢেউ গ ও ঘ'য়ে দেখান হইয়াছে। জলের উপর ঢেউএর আকার ঙ'র মত।

ঘ ও ঙ ঢেউয়ের কম্পন সংখ্যা সমান। সবগুলি এক রকম জোরাল—মাথা সমান উঁচু—কিন্তু আকার ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সেই জন্য ইহাদের আওয়াজ কানে ভিন্ন ভিন্ন রকম শোনায়। গ ঢেউ অনেকটা বেহালার ধ্বনির ঢেউয়ের মত। ঙ জলের উপরে ঢেউয়ের আকারের মত। আরও একটু বিশেষ ভাবে বলা যায় যে, আকৃতির পার্থক্যের কারণ এই যে হারমোনিয়াম বা বেহালাতে আমি যখন একটা সুর বাজাইতেছি—তখন সেটা শুদ্ধ সুর নহে—সেই সুরের সঙ্গে তাহার উচ্চ সপ্তকের অন্যান্য সুর ক্ষীণ ভাবে মিশ্রিত থাকে। হারমোনিয়ামে উচ্চ সপ্তকের যে সব সুরের মিশ্রণ থাকে বেহালাতে সেগুলি থাকে না—অন্য কতকগুলি থাকে—বাঁশিতে অপর কতকগুলি। এই বিভিন্ন প্রকারের উচ্চ সপ্তকের সুরের মিশ্রণের জন্য দুইটা যন্ত্রের সুরের কম্পনের সংখ্যা এক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি—quality ভিন্ন হয়।

ধ্বনির প্রকৃতি মোটামুটি বোঝা গেল। এখন প্রশ্ন উঠে যে নানারকমের ধ্বনি যদি পর পর বাজে—অথবা দু তিনটা ধ্বনি যদি একত্রে বাজে তবে সব সময় সেটা কানে সুখকর হয়না কেন? বেহালার তাঁতের উপর আনাড়ি যদি যেমন-তেমন ভাবে ছড়ি ঘষিতে থাকে তাহা হইলে কোনও একটা মুহূর্ত্তে হয় ত বেহালা হইতে একটা সুর বাহির হইতে পারে—কিন্তু সবটা জড়াইয়া বেহালায় একটা আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি হয় না। কোন্ সুরের পর কোন্ সুর আসিলে ভাল শুনাইবে তাহার কোনও নিয়ম আছে কি? আর একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ নজরে পড়ে। আমরা যখন গান করি তখন একটা সুর হইতে আর একটা সুরে যাইবার সময় মাঝের সব সুরগুলি বাদ দিয়া যাই। অর্থাৎ গানে আরোহণ বা অবরোহনের সময়ে গলা এক সুর হইতে লাফাইয়া অপর সুরে যায়—হয়ত সা হইতে রে' তে গেল কিন্তু সা ও রে'র মাঝে যে অসংখ্য সুর বা ধ্বনি রহিয়াছে তাহা কণ্ঠ বা যন্ত্র হইতে সাধারণতঃ বাহির করি না। এই ব্যাপার শুধু যে আমাদের দেশেরই সঙ্গীতে আছে তাহা নহে—সব দেশের—এমন কি অসভ্যদের সঙ্গীতেও এই ব্যবস্থা দেখিতে পাই। এমন কোন সঙ্গীতের প্রণালী বা mode জানা নাই যাহাতে গলা ক্রমান্বয়ে একসুর হইতে আর একসুরে উঠা নামা করে। অবশ্য আমাদের দেশে যন্ত্র সঙ্গীতে মাঝে মাঝে ও অধুনা ইউরোপে প্রচলিত Hawian guitar ইত্যাদিতে কচিৎ এইরূপ মিড় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা শুধু বাজনার মধ্যে বৈচিত্র্য ও অলঙ্কার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। অনবরত যদি গানের মধ্যে এরূপ মিড় ব্যবহার করা যায় তবে শ্রোতার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এই যে, সব দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়ম একসুর হইতে অপর সুরে লাফাইয়া যাওয়া, এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। তারপর, আমরা যে সুর-সপ্তক ব্যবহার করি তাহার সাতটা সুর সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি কোথা হইতে আসিল? আর, সুর সাতটাই বা কেন? আটটা বা নয়টা হইলে ক্ষতি ছিল কি? সুর সাতটার পরস্পরের কম্পন সংখ্যার মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আছে কি? যে সুর আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় সেগুলি অপর দেশেও ব্যবহৃত হয় কি? এই সব সুরগুলির ব্যবহার মানুষ আদিম কাল হইতে করিতেছে, না মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নূতন নূতন সুরের ব্যবহারে আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিয়াছে?

এই সব প্রশ্ন সভ্য মানুষের মনে অনেকদিন হইতে উঠিয়াছে, অনেকে অনেকরকম উত্তরের চেষ্টাও দিয়াছেন। আসল তথ্যের নিরাকরণ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে। আমরা এই প্রশ্নগুলির মোটামুটি উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

মানুষের শব্দ শুনিবার যন্ত্র কর্ণেন্দ্রিয়। সুতরাং এই সব বিষয় বুঝিবার সুবিধার জন্য গোড়ায় এই যন্ত্রের বিবরণ ও কার্য্যপ্রণালী বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। কানের যে ছবি (নং ৩) দেওয়া গেল তাহা হইতে দেখা যায় যে, শব্দের ঢেউ কানের ছিদ্রপথে (ঘ) ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমে কর্ণপটহে (গ) ধাক্কা দেয়। কর্ণপটহ একটা পাতলা চামড়া মাত্র। কর্ণপটহের এই ধাক্কা কয়েকটা হাড়ের টুকরা (গ) বাহিয়া ক খ তে আসিয়া উপস্থিত হয়—সেখান হইতে শামুকের মত একটা

কুণ্ডলীর ভিতরে যায়। এই কুণ্ডলীর ইংরেজি নাম Cochlea। আমরা ইহাকে শম্বুক যন্ত্র বলিব। শম্বুক যন্ত্রের গঠন জটিল—ইহার ভিতর জলীয় পদার্থে ভরা। কর্ণপটহ বাহিরে বায়ুর কম্পন হইতে সংবাদ আহরণ করে ও হাড়গুলি এই কম্পন জোরাল করিয়া শম্বুক যন্ত্রে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষের সঙ্গীতের অনুভূতির আসল সমস্ত ব্যাপার এই শম্বুক যন্ত্রের ভিতরে হয়; এইখান হইতেই স্নায়ু মণ্ডলী
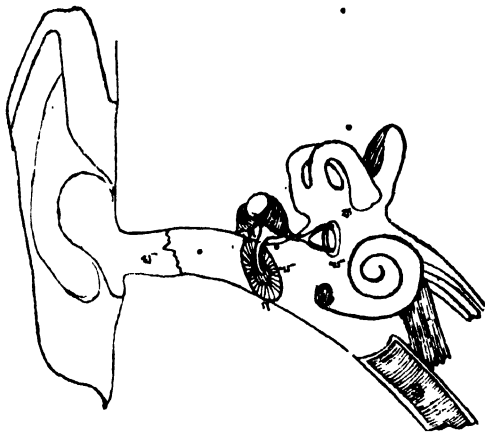
৩ নং

মানুষের কানের ভিতরের ছবি। শব্দ ছিদ্র পথে ঢুকিয়া কর্ণপটহ গাতে আঘাত করে। সেই আঘাত কয়েকটা হাড়ের টুকরা বাহিয়া শামুকের মত কুণ্ডলীর ভিতর প্রবেশ করে। এই কুণ্ডলীর ভিতরে সঙ্গীতে সুরবোধের যন্ত্র আছে।

মানুষের মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যায়। শম্বুক যন্ত্রের কার্য্যের বিবরণ প্রথম বুঝিয়াছিলেন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হেল্মহোল্‌ৎজ্। আর সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রথম দিয়াছিলেন এই মনীষী। শম্বুক যন্ত্রের ভিতর অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ নজরে পড়ে।

শম্বুক যন্ত্রের ভিতরের কুণ্ডলীটি দুইটা পাতলা পর্দ্দা দিয়া তিন ভাগে ভাগ করা। মাঝের ভাগে অনেকগুলি সূক্ষ্ম পেশী ধনুকের মত করিয়া বাঁকাইয়া দুইপ্রান্তে দুই ধারের পর্দ্দায় আটকান আছে (৫নং ছবি)। এই রকম প্রায় ৩০,০০০ ধনুক শম্বুক যন্ত্রের মাঝের ভাগে পাশাপাশি ঠিক যেন পিয়ানোর তারের মত সাজান আছে। হেল্‌ম্‌-হোল্‌ৎজের মতে এই ধনুকগুলিই আমাদের সঙ্গীতে সুর বোধের যন্ত্র। এক একটি ধনুক এক একটি সুরে বাঁধা—বাহির হইতে যখন একটা সুর আসিয়া কানে পড়ে তখন কানের ভিতর যে তন্ত্রী সেই সুরে বাঁধা সেই তন্ত্রীটি কাঁপিয়া উঠে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে মানুষের গলা হইতে অথবা সাধারণ বাদ্যযন্ত্র হইতে যে সুর বাহির হয় সেগুলি শুদ্ধ সুর নয়—এক একটা সুরের সঙ্গে তার উচ্চ সপ্তকের অনেক সুর ক্ষীণ ভাবে মেশান থাকে। অর্থাৎ কোন বাদ্যযন্ত্রে আমি যদি সা সুর বাজাই, তবে সা সুরের দরুণ বায়ুতে যে কম্পন হয় সেই কম্পনের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি কম্পন-ওয়ালা সুরও বাহির হয়। অবশ্য এই উচ্চ সপ্তকের সুরগুলির সব সমান জোরাল নয়—কোনও যন্ত্রে হয়ত কোনও একটা বেশী জোরাল—অপর যন্ত্রে অপর একটা বেশী জোরাল। এই রকম অনেক সুরের সব এক সঙ্গে উৎপত্তির কারণ এই যে,

৪ নং—আচার্য্য হেল্মহোল্‌ৎজ্
(১৮২১-১৮৯৪)

বাদ্যযন্ত্রের যে জিনিষটি কাঁপিয়া বাতাসে ঢেউ তোলে (যেমন বেহালাতে তাঁত, সেতার বা এস্রাজে তার, হারমোনিয়মে রীডের পিতলের ফলক, অথবা বাঁশিতে তার চোঙার ভিতরের বায়ুরাশি)—সেই জিনিষটি অনেক রকম ভঙ্গীতে কাঁপিতে পারে। কি কি রকম ভাবে কাঁপা সম্ভব তাহা গণিতবিদ্

অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে পারেন। ৮নং ছবিতে দেখিবেন যে সেতার কি এস্রাজের একটা তারে আঘাত করিলে সেটা ক ভঙ্গীতে কাঁপার দরুণ একটা প্রধান সুর বাহির হয়—ও সেই সঙ্গের খ, গ, ইত্যাদি ভঙ্গীতেও কম্পন হয় বলিয়া 'ক' ভঙ্গীর কম্পনের দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ কম্পন ওয়ালা সুর অর্থাৎ র্স ও র্প-ও ক্ষীণভাবে বাহির হয়। একটা সুরের সঙ্গে তাহার উচ্চ সপ্তকে কি কি সুরের সংমিশ্রণ থাকিতে পারে তাহা নীচের তালিকা হইতে বোঝা যাইবে। বুঝিবার সুবিধার জন্য সএর কম্পন ১ ধরা হইয়াছে—বাস্তবিক পক্ষে সএর কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ডে ৩০।৪০ হইতে ২০০০।৩০০০-ও হইতে পারে। হারমোনিয়ামে মাঝের C চাবি হইতে যে সুর বাহির হয় তাহার কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ডে ২৫৬ বার।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
স		র্স	র্প	র্স	র্গ	র্প	র্নি	র্স	র্রে	র্গ	ইত্যাদি

এখন ধরা যাক আমি বেহালাতে একটা সুর, যেমন স, বাজাইতেছি—তখন বেহালা হইতে যে সুর বাহির হইতেছে সেই সুরে বাঁধা কানের ভিতরের পিয়ানো যন্ত্রে সেই তন্ত্রীটা

৫ নং

মানুষের কানের শমুক যন্ত্রের কুণ্ডলীর ভিতর মাঝের অংশে অনেক সূক্ষ্ম পেশী এক ধার হইতে আর এক ধারের ধনুকের মত করিয়া বাঁকাইয়া আটকান আছে। এক একটি ধনুক এক একটি সুরে বাঁধা। এই রকম প্রায় ৩০,০০০ ধনুক আছে।

কাঁপিয়া উঠিতেছে আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ সপ্তকের যে সুর সব মিশ্রিত রহিয়াছে সেই সুরে বাঁধা তন্ত্রীগুলিও কাঁপিতেছে। দুটা যন্ত্র একসুরে বাঁধা থাকিলে তাহার একটাকে বাজাইলে আর একটা যে বাজিতে থাকে তাহা সকলেই জানেন। এস্রাজ কি সেতার বাজাইবার সময় তাহার অন্যান্য তারগুলি এই কারণেই ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ইংরেজিতে ইহাকে Sympathetic vibration বলে। একবার ধরুন, আমি স ছাড়িয়া প সুর আরম্ভ করিলাম। যেই প আরম্ভ করিলাম অমনি কানের ভিতরে তন্ত্রীতে প ও তাহার উচ্চ সপ্তকের মিশ্রিত সুর গুলিতে বাঁধা যে সব তন্ত্রী রহিয়াছে সেইগুলিও কাঁপিতে আরম্ভ করিল। অর্থাৎ সা বাজাইবার সময় (সা এর কম্পন সংখ্যা যদি ১ এক ধরা যায়) তবে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ কম্পন সংখ্যাওয়ালা তন্ত্রীগুলি কাঁপিতেছিল, আবার প বাজাইবার সময় (স যদি ১ হয় তবে প হইবে $\frac{৩}{২}$) $২\times\frac{৩}{২}$, $৩\times\frac{৩}{২}$, $৪\times\frac{৩}{২}$, $৫\times\frac{৩}{২}$, $৬\times\frac{৩}{২}$ ইত্যাদি সুরে বাঁধা তন্ত্রীগুলি কাঁপিতে লাগিল। ইহা হইতে দেখিতে পাই যে ৩, ৬, ১২ ইত্যাদি সুরে বাঁধা তন্ত্রীগুলি প বাজাইবার আগে হইতেই কাঁপিতেছিল। অর্থাৎ স হইতে প তে যাইবার পূর্ব্ব হইতেই আমার কান যেন প সুর গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। প সুর আসাতে সেটাকে একেবারে অজানা অচেনা বলিয়া মনে হইল না। দুইটা সুরের মধ্যে একটা যেন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইল। দুইটা সুরের মধ্যে এই যে মিল খুঁজিয়া বাহির করা এই হইল কানের ভিতরে পিয়ানো যন্ত্রের তন্ত্রীগুলির কাজ। যে দুইটা সুরের উচ্চসপ্তকের সুরের মধ্যে যত বেশী মিল আছে সেই দুইটা তত কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। যেমন ধরুন সা ও তাহার উপরকার র্সা।

র্সা র্প র্সা র্গ র্প র্ণ র্সা ইত্যাদি

সা —	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
র্সা —		২		৪		৬		৮

অর্থাৎ সা এই সুরের সঙ্গে র্সা বাজাইবার ফল শুধু এই যে সা এর সঙ্গে মিশ্রিত ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি কম্পনওয়ালা র্সা, র্সা, র্প, র্সা ইত্যাদি সুরগুলিকে একটু জোরাল করিয়া দেওয়া। সেইজন্য সা ও র্সা এত নিকট বলিয়া

মনে হয়; অনেক সময় দুইটা সুর একত্র বাজিলে দুইটা সুর বাজিতেছে কি একটা বাজিতেছে তাহা বুঝা যায় না। সুর সপ্তকের যে কোনও দুইটা সুরের মধ্যে এই রকম মিল তাহাদের উচ্চসপ্তকের মিশ্রিত সুরের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া বাহির করা যায়। অবশ্য, মিল সব সুরের পরস্পরের মধ্যে সমান নয়—কোনও কোনও সুরের মধ্যে বেশী আবার কোনও কোনও সুরের মধ্যে কম। যেমন স ও র্স সুর
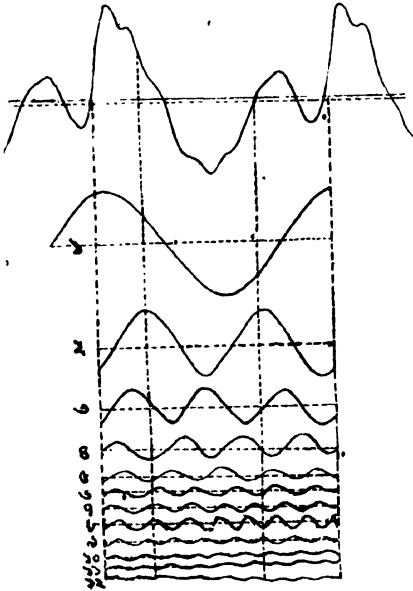
৬ নং

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সুরের সংমিশ্রণে
উপরে মিশ্রিত সুর পাওয়া যায়।

মিলিয়া যায়—সও প বেশ মেলে—স-গ স-ম ইত্যাদিও মেলে। স-র বা র-গ অপেক্ষাকৃত কম মেলে। একটা সুরের সঙ্গে ও তাহার আগের কোমল বা পরের তীব্র সুর এত অল্প মেলে যে আমরা শেষোক্ত সুরগুলিকে "বিকৃত" সুর বলিয়া থাকি।

আমরা প্রবন্ধের গোড়ায় যে সব প্রশ্নের উত্থাপনা করিয়াছি সে সবের উত্তর এইবার পাওয়া যাইবে।

প্রথমে সুরসপ্তকের কথা আলোচনা করা যাক। এই সুরসপ্তক অধুনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। যদি সপ্তকের সাতটা সুরের কম্পন সংখ্যার পরস্পরের অনুপাত অঙ্ক কষিয়া বাহির করি তবে একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাই। সুরগুলির পরস্পরের অনুপাত ভারি সরল রকমের। যেমন একটা স ও তাহার উচ্চসপ্তকের স-এর অনুপাত ১ : ২। অর্থাৎ নীচের স যদি সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কাঁপে তবে উপরেরটা কাঁপিবে ৫১২ বার। স ও প'র অনুপাত ২ : ৩। স'র কম্পন ২৫৬ বার হইলে প হইবে ৩৮৪ বার। স ও ম ৩ : ৪ ইত্যাদি। নীচে বিভিন্ন সুরের কম্পনের অনুপাতের একটা তালিকা দেওয়া গেল। দেখা যায় যে, যে-সব সুরগুলি একটু দূরে দূরে, যেমন স : র্স, ম : ন, র : প ইত্যাদি তাহাদের অনুপাত সরল। কাছাকাছি সুরগুলি যেমন স : র, প : ধ ইত্যাদির অনুপাত অপেক্ষাকৃত জটিল। ১ : ২, ২ : ৩ ইত্যাদি হইতে ৯ : ১০ পর্য্যন্ত অনুপাত আছে। শুধু মাঝে ৭ : ৮ অনুপাত নাই।

সুর	অনুপাত
স : স	১ : ২
স : প গ : ন ম : র্স	২ : ৩
স : ম র : প গ : ধ প : স	৩ : ৪
স : গ ম : ধ প : ন	৪ : ৫
গ : প ধ : স	৫ : ৬
স : র ধ : ন ম : প	৮ : ৯
র : গ গ : ধ	৯ : ১০

স এর কম্পন সংখ্যা ২৪ ধরিলে অন্যান্য সুরের কম্পন সংখ্যা এইভাবে লেখা যায় :—

স র গ ম প ধ ন র্স।
২৪ ২৭ ৩০ ৩২ ৩৬ ৪০ ৪৫ ৪৮

সাতটা সুরের পরস্পরের মধ্যে এই রকম অনুপাত বজায় রাখিয়া যে স্বরগ্রাম রচনা করা হয় তাহাকে স্বাভাবিক স্বরগ্রাম বা natural scale বলে। আজকাল হারমোনিয়মে যে স্বরগ্রাম পাওয়া যায় তাহা ঠিক স্বাভাবিক স্বরগ্রাম নয়। তাহাতে স হইতে র্স বারটা সমান ভাগে ভাগ করিয়া কড়ি কোমলের স্থান করা হয়। এই স্বরগ্রাম প্রকৃতপক্ষে বিকৃত, ইহাতে কোনও দুইটি সুরের মধ্যে সরল অনুপাত নাই—শুধু বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারির সুবিধার জন্য এইটি করা হয়। ইহাকে ইংরাজিতে tempered scale বলে।

৭নং

মানুষে গলা হইতে "আ" শব্দ বাহির করিলে বাতাসে যে ঢেউ হয় তাহার ছবি।

আমরা উপরে যে মতবাদ দিয়াছি তাহা হইতে স্বরগ্রামের এই সাতটা সুরের পরস্পরের মধ্যে এই রকম সরল অনুপাতের কারণ খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত নয়। স্বরগ্রাম ব্যবহার হয় সঙ্গীতের জন্য। সুতরাং সুরগুলির কম্পন সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যে, একটা সুরের উচ্চ সপ্তকের মিশ্রিত সুরগুলি আর একটা সুরের উচ্চসপ্তকের মিশ্রিত সুর কয়েকটার সঙ্গে যেন মিলিয়া যায়। একটা সুরের উচ্চসপ্তকের কি কি থাকিতে পারে তাহার তালিকা আগেই দেওয়া হইয়াছে। তালিকা হইতে দেখি যে এই সুরের সঙ্গে র্স র্প র্স ইত্যাদি সব সুরের সংমিশ্রণ থাকা সম্ভব। সুতরাং আমরা যদি স্বরগ্রামের অন্য সুর রচনা করি তবে সেটি এমন হওয়া চাই যে সে সুরের উচ্চ সপ্তকের অন্ততঃ কয়েকটা সুর এই সপ্তকের প্রথম সুর র্স-র সঙ্গে যেন মিলিয়া যায়। এই রকম মিলন রাখিতে হইলে স্বরগ্রামের পরস্পরের মধ্যে অনুপাত উপরের অনুপাতের মত হওয়া চাই—অর্থাৎ ২ : ৩, ৩ : ৪, ৪ : ৫ ইত্যাদি অনুপাতগুলি স্বরগ্রামের সুরগুলির পরস্পরের মধ্যে থাকা চাই। এই নিয়ম অনুসারে স্বরগ্রাম রচনা করিতে গেলে আমরা সুর সপ্তকের সাতটার সুর ও তাহাদের অনুপাত বিন্যাস পাই।

অবশ্য আমরা উপরে যে নিয়ম বলিলাম মানুষ প্রচলিত স্বরগ্রাম সেই নিয়মে আবিষ্কার করে নাই। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নূতন নূতন সুর আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার ব্যবহার শিখিয়াছে ও ব্যবহারে আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিয়াছে। যেমন ধরুন, পুরাতন গ্রীসে এক সুর হইতে আর এক সুরে আরোহণ বা অবরোহণ খালি পঞ্চমের সাহায্যে হইত। প্রবাদ আছে যে অরফিয়ুসের বীণাতে স, ম, প, র্স মাত্র এই কয়টা সুর ব্যবহৃত হইত। গ্রীসে ধর্মমন্দিরে আমাদের দেশের মত সুর করিয়া স্তোত্রপাঠ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। স্তোত্রপাঠে সব কয়টা সুর লাগে না—মাত্র কয়েকটা সুরেই কাজ চলিয়া যায়। গ্রীসে ও আমাদের দেশে দুই জায়গাতেই খুব সম্ভবত এই স্তোত্রপাঠ হইতেই সপ্তকের প্রধান প্রধান সুর গুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আমাদের দেশে বেদগান গোড়ায় শুধু উদাত্ত ও অনুদাত্ত সুরে করা হইত। গলার সুর উদাত্ত হইতে অনুদাত্তে নামিয়া যায়। উদাত্ত অর্থে উঁচু ও অনুদাত্ত নীচু। বিশেষজ্ঞদের মতে উদাত্ত কে মা ও অনুদাত্তকে সা বলা যাইতে পারে। বেদগান অভ্যাসের
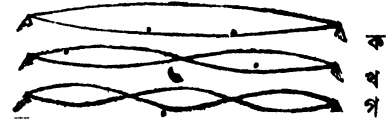
৮নং

তারের নানা রকমের কাঁপার ভঙ্গী। ক ধরণে কাঁপিলে সা সুর বাহির হইবে। খ ধরণে র্স ও গ ধরণে র্প

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের প্রসার হইলে কৃষ্ট ও মন্দ্র সুরের ব্যবহার সুরু হইয়াছিল। কৃষ্ট সুর অর্থে যে সুরকে জোর করিয়া টানিয়া উঁচু করা হইয়াছে—কৃষ্ট সুর আধুনিক পা সুরের সঙ্গে মেলে। মন্দ্র নীচু সুর, অনুদাত্ত অর্থাৎ সা এর নীচের নি 'র সঙ্গে মেলে। গলা এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় ক্রমান্বয়ে উঠান কি নামান কে স্বরিত বলা হয়। কতকটা মিড়ের মত। সম্ভবতঃ এইরূপ মিড় দিয়া বেদগান

করিতে করিতে অন্যান্য সুরের সন্ধান আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাইয়াছিলেন।

পুরাতন গ্রীসে শুধু পঞ্চমের সাহায্যে গ্রীক পণ্ডিত পিথগোরাস স্বরগ্রাম রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নীচের উদাহরণ হইতে পিথগোরাসের প্রবর্ত্তিত স্বরগ্রাম রচনার রীতি বুঝা যাইবে। সা হইতে আরম্ভ করিলে সা এর পঞ্চম হইল পা। এখন পা কে সা ধরিয়া লইলে তাহার পঞ্চম স্বরে র´ পাওয়া যায়। র´কে এক সপ্তক নামাইলে ঋ পাওয়া গেল। সা এর নীচের পঞ্চম হইল ম (অর্থাৎ সা হইতে পা-এ যাইতে হইলে গলা যতটা চড়াইতে হয়, ম্ হইতে সা-এ যাইতে হইলেও গলা ততটা উঠাইতে হয়)। ম্-কে এক সপ্তক উঠাইলে ম পাওয়া গেল। এখন ম কে সা ধরিলে তাহার নীচের পঞ্চম হইল ণ্ কোমল, ণ্ কোমলকে একসপ্তক উঠাইলে ণ কোমল পাওয়া গেল। অর্থাৎ আমরা সব শুদ্ধ

স র প ণ ও স´ পাইলাম।

অনেক পুরান স্কচ, আইরিস (ও শুনা যায় যে অনেক চীনা) গ্রাম্য সঙ্গীত ও ছড়া এই স্বরগ্রামে গাওয়া হয়।

এইরূপে পঞ্চমের পঞ্চম লইয়া পিথাগোরাস স্বরগ্রামের সাতটা সুরই রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রীসে Lyre বা বীণের প্রচলন খুব ছিল। বীণের তার পঞ্চমের অংশে (২/৩) ভাগ করিতে সুবিধা হয় বলিয়া বোধ হয় এইরূপে স্বরগ্রাম রচনার প্রথা পিথাগোরাস প্রবর্ত্তন করেন।

আমাদের দেশেও তার ভাগ করিয়া এইরূপে স্বরগ্রাম রচনার চেষ্টা হইয়াছিল। সঙ্গীত পারিজাতে এইরূপ একটা শ্লোক পাওয়া যায়—

ধ্বগ্গবচ্ছিন্ন বীণায়াং মধ্যে তারক-সঃ স্থিতঃ।
উভয়োঃ ষড়্জ্‌য়োর্ম্মধ্যে মধ্যমং স্বরমাচরেৎ॥ ৩১৪ ॥
ত্রিভাগাত্মক বীণায়াং পঞ্চমঃ স্যাত্তদগ্রিমে।
ষড়্জপঞ্চময়োর্ম্মধ্যে গান্ধারস্য স্থিতির্ভবেৎ॥ ৩১৫ ॥
স-পয়োঃ পূর্ব্বভাগে চ স্থাপনীয়োহথ রি-স্বরঃ।
স-পয়োর্ম্মধ্যদেশে তু ধৈবতং স্বরমাচরেৎ॥ ৩১৬ ॥
তত্রাংশদ্বয় সংত্যাগান্নিষাদস্য স্থিতির্ভবেৎ॥ ৩১৭ ॥
—ইতি শুদ্ধস্বরাঃ (সঙ্গীত-পারিজাতঃ।)

শ্লোকে বর্ণিত প্রণালীতে একটা তার ভাগ করিলে তারের কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ সুর পাওয়া যাইবে তা ৯নং ছবি হইতে বেশ বুঝা যাইবে। ক খ তার সমস্তটা বাজাইলে স সুর বাহির হইবে। কগ অর্থাৎ তারের ১/২ অংশ বাজাইলে র সুর বাহির হইবে। ক ঙ অর্থাৎ ৩/৪ এ ম সুর পাওয়া যাইবে ইত্যাদি। কিন্তু এই রকম ভাবে তার ভাগ করিয়া যে সুর পাওয়া যায়—পিথাগোরাসের প্রণালীতে পঞ্চমের পঞ্চম লইয়াই হউক বা সঙ্গীত পারিজাতের শ্লোকে বর্ণিত মতেই হউক—দুইটার কোনটাতেই আজকাল যাহাকে স্বাভাবিক স্বরগ্রাম বা natural scale বলা হয়, তা পাওয়া

ক

১/২ ১৬/২৭ ৭/১২ ২/৩ ৩/৪ ৫/৬
ঝ জ ছ চ ঙ ঘ

ম´ নি ধ প ম গ ঋ

৯নং

যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে দুই প্রণালীতেই গ, ধ ও নি'তে কিছু কিছু ভুল থাকিয়া যায়। বরং আজকাল হারমোনিয়মের মত বাঁধা সুরের যন্ত্রে যে বিকৃত tempered scale ব্যবহার হয় তার সঙ্গে পিথাগোরাসের স্বরগ্রাম বেশী মেলে। স্বাভাবিক স্বরগ্রাম, সঙ্গীত পারিজাতের স্বরগ্রাম ও tempered scale এর স্বরগ্রাম নীচে তুলনার জন্য এক

* প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই শ্লোকটি লেখককে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

সঙ্গে দেওয়া গেল। স এর কম্পন সংখ্যা ২৪০ ধরা হইয়াছে ও সেই অনুপাতে অন্যান্য সুরের কম্পন সংখ্যা হিসাব করিয়া লেখা হইয়াছে।

স্বরগ্রাম	স	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	স
স্বাভাবিক	২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০০	৪৫০	৪৮০
পিথগোরাম	২৪০	২৭০	৩০৩$\frac{৩}{৪}$	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫৫$\frac{৫}{৮}$	৪৮০
সঙ্গীত পারিজাত	২৪০	২৭০	২৮৮	৩২০	৩৬০	৪১১$\frac{৩}{৭}$	৪৫৪$\frac{২}{৭}$	৪৮০
Tempered scale	২৪০	২৬৯$\frac{২}{৫}$	৩০২$\frac{১}{৫}$	৩২০$\frac{২}{৫}$	৩৫৯$\frac{৩}{৫}$	৪০৩$\frac{৩}{৫}$	৪৫৩	৪৮০

সঙ্গীত পারিজাতের গ সুর স্বাভাবিক স্বরগ্রামে গ'র চাইতে খাদে—ঠিক গ কোমলের সমান। ধ সুরটি একটু চড়া নি কোমলের কাছাকাছি। নি-তেও ভুল আছে—স্বাভাবিকের চাইতে একটু চড়া। ধ ও নির ভুল তত দোষের নয়—কিন্তু গ একটি প্রধান সুর—গ'তে ভুল মারাত্মক।

স্বরগ্রামের বিভিন্ন সুর কেমন করিয়া আসিল তাহা আর এক ভাবে বেশ বুঝা যায়। মনে করুন সেতার কি এস্রাজের দুইটা তার এক সুরে বাঁধা আছে। দুইটা তার যদি একসঙ্গে বাজান যায় তবে দুইটা সুর একেবারে মিলিয়া যায়। এইবার দুইটা তার বাজাইতে বাজাইতে একটা তার যদি ক্রমান্বয়ে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ছোট করা যায়—তবে দেখা যায় যে দুইটা তারের দুইটা সুর একসঙ্গে কানে আসিয়া পড়িলে সেটা সব সময়ে কানে প্রীতিকর হয় না। যে তারটা ক্রমশঃ ছোট করা হইতেছে তাহার এক একটা জায়গায় দুইটা তারের দুইটা সুর একসঙ্গে কানে মিষ্ট লাগে। যেমন ধরুন, তারটা যখন ৩ : ৪ অথবা ২ : ৩ অংশে ভাগ করিয়া টেপা হইয়াছে সেই সময়ে ভাল লাগে। ১০ নং ছবিতে এইটি বুঝান হইয়াছে। ডাইনে বাঁয়ে যে লাইন তাহাতে তারের অংশ দেখান হইয়াছে। উপরে নীচে লাইন কতটা ভাল লাগিতেছে তাহাই দেখাইতেছে। রেখা উপরে উঠার অর্থ কর্কশ লাগা ও নীচে নামার অর্থ ভাল লাগা। যেখানে যেখানে রেখা নীচে নামিয়াছে অর্থাৎ যেখানে যেখানে দুইটা তারের দুই বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণ কানে প্রীতিকর ঠেকিতেছে আমাদের স্বরগ্রামের সুর কয়টার অবস্থান তারের সেই সেই জায়গায়। ছবিতে দেখিতে পাই যে স ও র্স খুব মিলিয়া গিয়াছে। স—প স—গ, স—ম ইত্যাদি বেশ মেলে। স—র অতি অল্প মেলে।

১০ নং—মিলের রেখা

রেখা উপরে ওঠার অর্থ খারাপ লাগা ও নীচে নামার অর্থ ভাল লাগা।

এইবার আমাদের দেশী গানের রাগ রাগিণীতে যে সব সুর ব্যবহার হয় তাহাদের সুরের পরস্পরের মধ্যে কি রকম সম্বন্ধ আছে তাহার একটু আলোচনা করিব।
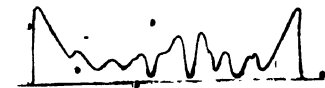
কোনও রাগ বা রাগিণীতে সুর বিশেষকে বাদী, সংবাদী অথবা বিবাদী বলা হয়। বাদী সুর সেই রাগ বা

রাগিণীর প্রধান সুর। সংবাদী সুরও প্রধান—তবে তাহার স্থান বাদী সুরের নীচেই. আর বিবাদী সুর সেই রাগ বা রাগিণীতে মোটেই লাগে না। ইহা ছাড়া প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীর "ঠাট" আছে—অর্থাৎ সেই রাগ বা রাগিণীতে কি কি বিকৃত সুর ব্যবহার হয়। নিপুণ গায়ক কোনও রাগ বা রাগিণী গাহিবার সময় সেই রাগ বা রাগিণীর ঠাটগুলি ত ব্যবহার করেনই ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাদী ও সংবাদী সুরের উপর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই সুরের প্রাধান্য ও তাহাদের সম্বন্ধ শ্রোতার কাছে প্রকাশ করেন। কোনও রাগিণীর বাদী ও সংবাদী সুর দুইটির অনুপাত সংখ্যা যদি আমরা লিখি তবে দেখি যে প্রায় সবক্ষেত্রে খুব সরল অনুপাতের সুর ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন ধরুন, ছায়ানট, সাহানা, সুরট ইত্যাদি অনেক সুরে র প বাদী ও সংবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়। র : প কম্পন সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৪। ইমন্ ও বেহাগে গ ও প বাদী ও সংবাদী—এখানে গ : প = ৫ : ৬।

নীচে এই সম্বন্ধে একটা তালিকা দেওয়া গেল। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বাদী ও সংবাদী সুর সাধারণতঃ এমন হওয়া উচিত যে সেই দুইটা সুরের মধ্যে মিল ও সম্বন্ধ শ্রোতা যেন সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। দুইটা সুরের অনুপাত যত সরল হয় ততই তাহাদের উচ্চ সপ্তকে মিশ্রিত সুরের মধ্যে বেশী মিল থাকে. সুতরাং সাধারণ শ্রোতাও সেই মিল সহজেই ধরিতে পারে। যে সব রাগ বা রাগিণীতে বিবাদী সুর থাকে সে গুলিতে দেখা যায় যে বিবাদী সুরের অনুপাত অপেক্ষাকৃত জটিল। যেমন ভূপালীতে বিবাদী ম ও ন। এখানে বাদী গ এর সঙ্গে

রাগ বা রাগিণী	বাদী	সংবাদী	কম্পন সংখ্যার অনুপাত
ছায়ানট	ঋ	প	৩ : ৪
কামোদ	প	ঋ	৪ : ৩
ভূপালী	গ	ধ	৩ : ৪
কল্যাণ	গ	ধ	৩ : ৪
ইমন	গ	প	৫ : ৬
হাম্বীর	ধ	গ	৪ : ৩
সুরট	ঋ	প	৩ : ৪
দেশ	ঋ	প	৩ : ৪
মল্লার	ঋ	প	৩ : ৪
বাগীশ্বরী	ম	ধ	৪ : ৫
বেহাগ	গ	প	৬
	প	গ	৬ : ৫
হিণ্ডোল	ম	ধ	৪ : ৫

বিবাদী ম'র ও সংবাদী ধ এর সঙ্গের বিবাদী ন'র অনুপাত ৮ : ৯। হিণ্ডোলে র ও প' বিবাদী আর ম ও ধ বাদী ও সংবাদী। এখানে ম, ধ দুইটা কোনটার সঙ্গেই র অথবা প'র অনুপাত সরল নয়—ম : র = ৩ : ২৭ আর ম : ধ = ম : প = ৮ : ৯, র : ধ = ২৭ : ৪০। খুঁজিলে এইরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

অনেক রাগ বা রাগিণীর জাতি সম্পূর্ণ—অর্থাৎ তাহাতে বিবাদী সুর নাই—সপ্তকের সব কয়টা সুরই সে সব রাগ রাগিণীতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে, এই সব রাগিণীতে ৭টা সুর লাগিলেও তাহাদের সব কয়টা সমানভাবে লাগে না, তাহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ আছে—দুইএকটা সুর নিকৃষ্টতম—সেইগুলিকে বিবাদী বলা যাইতে পারে। নিপুণ গায়ক সেই সুরগুলিকে কম ব্যবহার করেন। উদাহরণ স্বরূপ বেহাগের কথা ধরা যাইতে পারে। বেহাগ সম্পূর্ণ রাগিণী বটে—কিন্তু ইহাতে র ও ধ অতি অল্প ব্যবহৃত হয়—অধিকাংশ জায়গায় এই সুর দুইটা কেবল স্পর্শ করিয়া যাওয়া হয় মাত্র। এখানে দেখিতে পাই যে র ও ধ এই দুইটা সুরের অনুপাত বেহাগের বাদী ও সংবাদী গা ও পা সুরের সঙ্গে জটিল। র : গ = প : ধ = ৯ : ১০।

এই রকম সরল অনুপাত শুধু যে বাদী সংবাদীতে ব্যবহৃত হয় তাহা নয়। অন্য সময়েও এই সরল অনুপাত ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন ধরুন, কোনও গানের অন্তরা আরম্ভ করিবার সময় গায়ক গোড়াতে যে সুর ব্যবহার করেন সেটি বাদী অথবা সংবাদী দুইটি সুরের একটি। বাদী বা সংবাদীর মধ্যে যে সুরটির অনুপাত স এর সঙ্গে বেশী সরল সেইটিই অন্তরা আরম্ভের সময় ব্যবহার করা হয়।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "তানমালা" হইতে এই সম্বন্ধে কয়েকটা উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	গান	রাগ বা রাগিনী	অন্তরার প্রথম সুর
২	পিয়াহমারে ঘর ইত্যাদি	ছায়ানট	প
৮	মাতিয়া মিলানিঁয়া ইত্যাদি	কামোদ	"
১০	মেরে ঘর রাজে ইত্যাদি	ভূপালী	গ
১২	দিয়ারা মেরারঙ্গী ইত্যাদি	কল্যাণ	গ
৫৫	মন্দিলরা বাজে ইত্যাদি	বাগীশ্বরী	ম

এখানে ছায়ানটের বাদী ও সংবাদী সুর র ও প—কিন্তু স : র (৮ : ৯) অনুপাত অপেক্ষাকৃত অসরল বলিয়া প হইতে অন্তরা আরম্ভ হইয়াছে, (স : প = ২ : ৩)—কামোদেও তাহাই। ভূপালীর বাদী সংবাদী সুর গ ও ধ। এখানে স : ধ অনুপাত (৩ : ৫) স : গ (৪ : ৫) অনুপাতের তুলনায় অসরল। সুতরাং গ হইতে অন্তরা আরম্ভ হয়। বাগীশ্বরীতে ম হইতে অন্তরা আরম্ভ। এখানেও ঐ নিয়ম দেখিতে পাই। বাগীশ্বরীর বাদ ও সংবাদী ম ও ধ। স : ম (৩ : ৪) অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়া ম হইতে অন্তরা আরম্ভ হইয়াছে। কোনও কোনও জায়গায় আপাত দৃষ্টিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন তানমালার ৪০ পৃষ্ঠায় "বল মা রে চুনরিয়া ইত্যাদি" গানটি ধরা যাক। গানের সুর নায়কী কানাড়া, ইহার বাদী র ও সংবাদী প। এখানে অন্তরা যদিও নি কোমল হইতে আরম্ভ দেখান হইয়াছে (ণ ধ ণ প) কিন্তু সে শুধু গানে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চম হইতেই অন্তরা আরম্ভ।

একটু চেষ্টা করিলে এইরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। এই আলোচনা হইতে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন রাগ রাগিণীতে কোন সুরের পর কোন সুর

আসিবে—বা কোন সুরের সঙ্গে কোন সুরের যোগ থাকিলে ভাল হয় তার একটা বিশেষ কারণ আছে এবং এই কারণের সহজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়।

আমরা এইবার এই প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শব্দ বাতাসে ঢেউ বা কম্পন মাত্র। সঙ্গীতের সুর বা ধ্বনির ঢেউ সুনিয়ন্ত্রিত, সুসম্বদ্ধ ও সমান ভাবে আসে। সাধারণ গোলমালের বা নিনাদের ঢেউ অসংলগ্ন। সেইজন্য নিনাদ অপ্রীতিকর ও ধ্বনি প্রীতিকর। কিন্তু দুইটা ধ্বনি এক সঙ্গে বা পরপর আসিলে দুইটার মিশ্রণে যে শব্দ হয় তাহা সব সময় কানে প্রীতিকর নয়। কখনও মিষ্ট কখনও বা কর্কশ লাগে। এই মিষ্ট বা কর্কশ লাগার কারণ এই যে, মানুষের গলা বা বাদ্যযন্ত্র হইতে যে সুর বাহির হয় তাহা শুদ্ধ সুর নয়—আসল সুরের সঙ্গে তাহার উচ্চ সপ্তকের অন্যান্য সুর মিশ্রিত থাকে—আর সেগুলির কম্পন সংখ্যা মূল সুরের ২, ৩, ৪, ৫ গুণ ইত্যাদি। মানুষের কানের মধ্যে এমন একটি যন্ত্র আছে যা মানুষের অজানিতভাবে মিশ্র সুরের ভিতর হইতে এই সব ক্ষীণ সুর বাছাই করিতে পারে। সুতরাং দুইটা সুর একত্র বা পরপর বাজাইলে যদি তাহাদের উচ্চ সপ্তকের কয়েকটা সুর মিলিয়া যায় তবে সেই দুইটা সুর কানে ভাল লাগে, নয়ত কানে পীড়া দেয়। এই কারণে সঙ্গীতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সুরের বিন্যাস করিতে গেলে সেই সুরগুলি এমন হওয়া চাই যে, তাহাদের পরস্পরের অনুপাত সংখ্যা যেন ১:২, ২:৩, ৩:৪, ৪:৫ ইত্যাদি সরল অনুপাত হয়।

মানুষের সৌন্দর্য্য বা রসবোধের প্রধান সহায় অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য ও অমিলের মধ্যে মিল বাহির করা। অন্যান্য কলা বা কারু শিল্পতে এই ঐক্য, মিল বা harmony মানুষ নিজ নিজ শিক্ষা অনুসারে বাহির করে—ও ঐক্যের সন্ধান পাইলে তৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু সঙ্গীতে অনেক বিভিন্ন সুর রাশির মধ্য হইতে ঐক্য বা মিল সন্ধান করিয়া বাহির করার জন্য মানুষের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক হয় না। কর্ণের ভিতর স্বভাব প্রদত্ত যে যন্ত্রটি আছে সেইটিই এই কার্য্য করিয়া দেয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যেন কাব্য, সাহিত্য, চিত্র বা স্থাপত্য কলার জন্য রসজ্ঞ হওয়া হয়ত সবার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, ইহার জন্য পড়াশুনা ও অনুশীলন আবশ্যক; কিন্তু গানের রসজ্ঞ ও সমঝদার বুঝি সকলেই হইতে পারে। কথাটা একেবারে উড়াইয়া দেবার নয়। রাস্তার ধারে কেউ যদি গান করে তবে তাহার চারিদিকে অতি সাধারণ অশিক্ষিত লোকের ভিড় জমিয়া যায়—কিন্তু একটা ছবি যদি রাস্তায় টাঙান যায় তবে তাহার ধারে ভিড় বড় দেখা যায় না।

আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, সঙ্গীতের সঙ্গে অন্যান্য কলার আর একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। যেমন ধরুন চিত্রকলা। চিত্রকর নানা রকম রং লইয়া রংয়ের বিন্যাস অনেক রকমে করিতে পারেন বটে—কিন্তু তিনি যাহাই করুন না তাঁহাকে ছবি ও ছবির রং স্বভাবের সঙ্গে মিলাইতে হইবে—রংএর খেলা বা রেখার বিন্যাস স্বভাবকে অনুকরণ করিতে হয় বলিয়া সীমাবদ্ধ। ভাস্করের পক্ষেও তাহাই। স্থাপত্য বিদ্যায় স্বভাবকে অনুকরণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু সেখানেও বাড়ী মানুষের বাসোপযোগী—মানুষকে শীত তাপ হইতে রক্ষা করার উপযোগী করিয়া তৈয়ার করিতে হয় বলিয়া স্থপতিকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়। অর্থাৎ এই সব কলার প্রত্যক্ষ কাজ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সাহায্যে করা। সেইটুকু করিয়া চিত্রকর, ভাস্কর বা স্থপতি মানুষের মনে শুধু আনন্দ দিবার জন্য যেটুকু করেন সেইটুকুই হইল art। Artএর উদ্দেশ্যই মানুষকে শুদ্ধ আনন্দ দেওয়া। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে সঙ্গীতের প্রসার ক্ষেত্র অপরাপর সব কলার চাইতে বিস্তৃত। কারণ সঙ্গীতকে স্বভাবের অনুকরণ করিতে হয় না। মানুষের জীবন ধারণ বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে সঙ্গীত খাওয়া, পরা বা গৃহ নির্ম্মাণের মত অত্যাবশ্যক নয়। সুতরাং সঙ্গীতের বিকাশ বা স্ফূর্ত্তির পক্ষে মানুষের স্বাধীনতা অনেক বেশী। মানুষ আবদ্ধ শুধু বিভিন্ন সুরের কম্পন সংখ্যার অনুপাতগুলি সরল রাখার মধ্যে।

সেইটুকু বজায় রাখিয়া মানুষ সুর লইয়া যেরকম ভাবে ইচ্ছা খেলা করিতে পারে। সেইজন্য বিভিন্ন জাতি নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা ও পরম্পরাগত ভাবধারা বা culture অনুসারে নিজ নিজ প্রণালীতে একেবারে বিভিন্নভাবে সঙ্গীতের বিকাশ ঘটাইয়াছে। ইহার ফলে কিন্তু এই হইয়াছে, প্রত্যেক জাতিই নিজেদের জাতীয় প্রণালীর সঙ্গীতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে অপর জাতির সঙ্গীতের রসগ্রহণ করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য কলারও বিকাশ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সঙ্গীতের মত এত বেশী প্রভেদ নাই। এক জাতি অপর জাতির তৈয়ারি বাড়ীতে বাস করিতে পারে, অপর জাতির ভাস্কর্য্য অথবা চিত্রকলা দেখিয়া মোটের উপর আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, কিন্তু অপর জাতির সঙ্গীত উপভোগ করিতে পারে এমন বড় দেখা যায় না। সাধারণ বাঙালীর ইংরেজী অথবা চীনা সঙ্গীত ভাল লাগিয়াছে এমন কখনও শুনি নাই। (সম্প্রতি কলিকাতায় একটা চীনা থিয়েটারে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিবার জন্য একটা মোকর্দ্দমাও হইয়া গিয়াছে!)

আমরা এতক্ষণ বিজ্ঞানের তরফ হইতে সঙ্গীত মানুষের কেন ভাল লাগে তাহার আলোচনা করিলাম। সঙ্গীতে কি কি অনুপাতের সুর স্বরগ্রামে ব্যবহৃত হওয়া উচিত—বা কোন সুরের পর কোন সুর আসিলে ভাল লাগিতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিক অঙ্ক কষিয়া ও কানের ভিতরের গঠন দিয়া বাহির করিতে পারেন। কিন্তু সঙ্গীত ভাল লাগা মন্দ লাগা শুধু কি এই হিসাব মিলানর উপরে নির্ভর করে? গায়ক বা বাদকের নিজের প্রাণের আবেগের কোনও স্থান কি সঙ্গীত-কলার মধ্যে নাই? গায়কের কণ্ঠ বা বাদকের নিপুণ অঙ্গুলী কখনও দ্রুত কখনও ধীরে, কখনও আরোহণে কখনও অবরোহণে, মিড়, গমক, মূর্চ্ছনার সাহায্যে যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতার প্রাণে রৌদ্র করুণ রসাদি জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হন তাহার ব্যাখ্যা শুধু কি ঐ অনুপাত সংখ্যার হিসাবের মধ্যে পাওয়া যায়? মানুষের মনে এই সব প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। এই সব প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে কিন্তু আমাদিগকে বিজ্ঞান রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে—সুতরাং আমরা প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ যাঁহারা আগামী ১০ই পৌষের মধ্যে বৎসরের অবশিষ্ট টাকা না পাঠাইবেন, বা পত্রিকা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন না করিবেন, তাঁহাদের নামে আমরা পৌষ মাসের বিচিত্রা ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরণ করিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

বিচিত্রা কার্য্যালয়

৪৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস্

দ্বিতীয় স্তবক

করুভেট্ * "ক্লে-মোর"।

১

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহচর্য্য

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশগুলি চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইলে গিরোণ্ডিষ্ট † সম্প্রদায়ের শোচনীয় অধঃপতন সংঘটিত হয়। সেই সময়ে ইংলিশ-চ্যানেলস্থিত দ্বীপসমূহে যাহা ঘটিয়াছিল এইস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

পয়লা জুনের সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্তের প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে জার্সি দ্বীপের নির্জ্জন বেনেমুট্ উপসাগর হইতে একটি করুভেট্ পাল তুলিয়া দিয়া রওনা হইল। সমুদ্র কুয়াসাচ্ছন্ন—পলায়নের অনুকূল, যেহেতু অনুসরণ সহজ নহে।

নাবিকগণ সকলেই ফরাসী, করুভেট্টি দ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ইংরাজ নৌবাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত বাহিনীর অধ্যক্ষ প্রিন্স্ ডি-লা-টুর-ডি-অভার্ণের আদেশেই কোনো বিশেষ জরুরী কার্য্যে উহা প্রেরিত হইতেছিল।

জলযানটির নাম "ক্লে-মোর"। দেখিতে বাণিজ্য-পোতের মতন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি যুদ্ধজাহাজ। গাধাবোটের ন্যায় ইহার ভারী, শান্ত চেহারাকে বিশ্বাস করা নিরাপদ ছিল না। দুইটি উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল—কৌশল এবং , প্রয়োজনানুসারে যেন উভয়েরই প্রয়োগ করা যাইতে রে—সম্ভব হইলে ফাঁকি দেওয়া, আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করা।

আজিকার রাত্রিতে যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে তজ্জন্য জাহাজের নীচের ডেকে খাটো বৃহৎ-গর্ভ ত্রিশটি ভারী ভারী কামান সজ্জিত করা হইয়াছে। হয়তো ঝড় হইতে পারে এই আশঙ্কায়, কিংবা জাহাজটির সন্দেহজনক আকার-প্রকার গোপন করার জন্য কামানগুলি ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে—বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না; জাহাজটি যেন মুখস পরিয়াছে। যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করুভেট্গুলির উপরের ডেকেই সাধারণতঃ কামান রাখা হয়। কিন্তু এই জাহাজটিকে গোপন-আক্রমণের উপযোগী করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার উপরের ডেক খালি রাখিয়া নীচের ডেকে কামান সাজাইবার বন্দোবস্ত ছিল।

খালাসীরা সকলেই পুরাণো খাঁটি লোক। তাহারা প্রত্যেকেই সুদক্ষ নাবিক, অভ্যস্ত সৈনিক এবং বিশ্বস্ত রাজপক্ষীয় লোক। তিনটি বিষয়ে তাহাদের ক্ষ্যাপামি ছিল—রণতরী, তরবারী এবং রাজা। খালাসীদের সঙ্গে অর্দ্ধ-রেজিমেণ্ট নৌসৈন্যও এই জাহাজে ছিল, আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে স্থলযুদ্ধে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

'ক্লে-মোরের' কাপ্তেন কাউণ্ট বয়-বার্থেলট্ রাজকীয় নৌবিভাগের একজন কর্ম্মকুশল আফিসার। উহার সেকেণ্ড অফিসার সিভেলিয়ার লা ভিউভিলেরও যুদ্ধ কার্য্যে অভিজ্ঞতা ছিল। আর পাইলট্ ফিলিপ গেকয়ল্ জার্সির সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ নাবিক।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, জাহাজটি কোনো গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এই মাত্র একটি লোক জাহাজে আসিলেন—তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন তিনি কোন

---

* করুভেট্ (Corvette) -এক প্রকার যুদ্ধ জাহাজ।

† গিরোণ্ডিষ্ট (Girondists)—ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় জাতীয়-মহাসমিতি "লেজিসলেটিভ এসেমব্লি"র মডারেট (মধ্য বা নরমপন্থী)গণ। ইহাদের লেখক—কণ্ডরসেট এবং বক্তা—ভার্জিনড। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেরূপ সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তাহাদের মন হইতে বহুদূরে ছিল,—যদিও তাহাদের কার্য্য ও বক্তৃতায় তাহাই সম্ভব করিয়া তুলিতেছিল।

দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। লোকটি দীর্ঘকায়, বৃদ্ধ কিন্তু ঋজু ও বলিষ্ঠ—তাঁহার মুখের ভাব কঠোরতা ব্যঞ্জক। বয়স সঠিক অনুমান করা কঠিন। ইনি একাধারে বৃদ্ধ এবং যুবক—সেই রকমের লোক, যাহারা বয়োবৃদ্ধ হইয়াও বীর্য্যসম্পন্ন, যাহাদের মস্তকে পক্ককেশ কিন্তু চক্ষে বিদ্যুৎ, যাহাদের মধ্যে চল্লিশ বৎসর বয়সের কর্ম্মশক্তি এবং আশী বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রভুত্বের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ঘটিয়াছে।

বৃদ্ধ জাহাজের ডেকে আসিলেন। বাতাসে তাহার সামুদ্রিক ওভারকোট ঈষৎ অপসারিত হইলে দেখা গেল, তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা, পায়ে বড় উঁচু বুট জুতা এবং গায়ে ছাগচর্ম্মের খাটো কোর্ত্তা। এই কোর্ত্তার এক দিকের চামড়া পালিশ এবং রেশম সূত্রের কারুকার্য্যখচিত, অপরদিকে খাড়া খাড়া কর্কশ লোমগুলি অমনি রহিয়াছে—বৃটেনীর কৃষকদিগের পোষাক। এই সকল সেকেলে পোষাক কর্ম্মদিন এবং উৎসব-দিন উভয়েরই উপযোগী ছিল—ইচ্ছানুসারে লোমের দিক কিম্বা কারুকার্য্যের দিক উল্টাইয়া পরা চলিত। সপ্তাহের ছয়দিন ছাগচর্ম্ম, আবার রবিবারে উহাই জমকালো পরিচ্ছদ। অপর কাহারও সাদৃশ্যে আত্মগোপন করিবার মতলবেই যেন বৃদ্ধ এই কৃষক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। পোষাকটি দীর্ঘকাল ব্যবহারে জীর্ণ, জানু ও কনুই এর নিকট ছিন্ন—তাহাতে উক্ত সাদৃশ্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। মোটা কাপড়ের বহিরাবরণটি জেলেদের ওভারকোটের মত। তাঁহার মাথায় তৎকালীন উঁচু, গোল টুপী—উহার প্রান্ত নীচের দিকে নামাইয়া দিলে চাষাদের মতো দেখায়, আর উপরের দিকে উল্টাইয়া দিলে মিলিটারী ধরণের চেহারা হয়। বৃদ্ধের টুপীর প্রান্ত নীচের দিকে নামানো ছিল।

জার্সি দ্বীপের গবর্ণর লর্ড ব্যাল্‌ক্যারাস্ এবং প্রিন্স্ ডি-লা-টুর-ডি-অভার্ণ্ স্বয়ং আসিয়া বৃদ্ধকে এই জাহাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। রাজপক্ষের গুপ্ত কর্ম্মচারী গেলেম্বারের তত্ত্বাবধানে ক্যাবিনের সব বন্দোবস্ত ঠিক করা হইয়াছে। গেলেম্বার নিজে অভিজাত বংশের হইয়াও বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার পোর্টমেন্টো বহন করিয়া আনিয়াছেন। জাহাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মুঁসো ডি গেলেম্বার এই কৃষককে অত্যন্ত বিনীত ভাবে অভিবাদন করিলেন। লর্ড ব্যাল্‌ক্যারাস্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মঙ্গল হৌক, জেনারেল্"। প্রিন্স ডি-লা-টুর বলিলেন "ভ্রাতঃ, আপাতত বিদায়।"

জাহাজের খালাসীরা নিজেদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মধ্যে এই আরোহীটিকে "কৃষক" বলিয়াই উল্লেখ করিতে লাগিল। ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিলেও তাহারা এইটুকু অনুমান করিয়া লইল যে, কর্‌ভেট্‌টি ও যেমন সামান্য স্লুপ নহে, বৃদ্ধও তেমনি সাধারণ কৃষক নহেন।

বাতাস মোটেই ছিল না। "ক্লে-মোর" 'বোনেস্লুট' উপসাগর ছাড়াইয়া 'বুলে' উপসাগরের সম্মুখ দিয়া চলিল। ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে ঘনায়মান নৈশান্ধকারে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গেলেম্বার সাউদাম্‌প্‌টন্ একস্‌প্রেসে এই কয়-ছত্র ডিউক্ অব ইয়র্কের তদানীন্তন হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত কাউণ্ট ডি আর্টয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন:—

"মন্‌সেইনিয়র্, তরী এই মাত্র ভাসিল। সফলতা নিশ্চিত। আট দিবসের মধ্যে গ্রেন্‌ভিল্ হইতে সেণ্ট্‌মালো পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।"

চারদিন পূর্ব্বে মার্ণের প্রতিনিধি 'প্রিউর্', যিনি চারবুর্গ উপকূলে সন্নিবিষ্ট সেনাদলের নিকট কোনও কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি গ্রেন্‌ভিলে অবস্থিত ছিলেন—তিনি একজন গুপ্তদূতের মারফত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রাপ্ত হন। উপরোক্ত ডেস্‌প্যাচ্ এবং এই সংবাদ একই হাতের লেখা।

"নগরের প্রতিনিধি,—১লা জুন, জোয়ার আরম্ভ হইলে যুদ্ধ-জাহাজ ক্লে-মোর গোপনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রওনা হইবে এবং ফ্রান্সের উপকূলে একজন লোককে নামাইয়া দিবে। লোকটির আকৃতি এইরূপ—দীর্ঘকায়, বৃদ্ধ, পলিতকেশ; পরিচ্ছদ—কৃষকের, হাতদুটি অভিজাত বংশীয়দের হাতের অনুরূপ। আগামী কল্য আরও বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইব। ২রা তারিখ প্রাতঃকালে সে অবতরণ করিবে। উপকূল রক্ষায় নিযুক্ত 'ক্রুজার' গুলিকে

সতর্ক করিবেন, করভেট্টিকে আটক করিবেন, লোকটাকে গিলোটিনে * দিবেন।"

২

কর্‌ভেটে একরাত্রি

কর্‌ভেট্ দক্ষিণ দিকে না যাইয়া প্রথমতঃ উত্তর-দিকে চলিল,তারপর পশ্চিম দিকে ফিরিয়া শার্ক ও জার্সি'র মধ্যস্থিত খাঁড়িতে প্রবেশ করিল। তৎকালে কোনো উপকূলেই লাইট্-হাউস্ (বাতি-ঘর) ছিল না। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার। শুক্লপক্ষ—কিন্তু চন্দ্র ঘন মেঘে অবগুণ্ঠিত। কয়েক খণ্ড মেঘ জলের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া সমুদ্রকে কুয়াশার অস্পষ্ট আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এই আঁধার—এই অস্পষ্টতা করভেটের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল।

পাইলট্ গেকয়েলের মতলব ছিল, জার্সি বাঁয়ে ও গার্ণসি ডাইনে রাখিয়া পালের জোরে সেণ্ট্ মালো উপকূলের কোনো খাঁড়িতে গিয়া পৌছানো। একটু ঘুরিয়া যাইতে হইলেও এই পথ নিরাপদ। অন্য সোজা পথে ফরাসী 'ক্রুজার'গুলির সতর্ক-পাহারা। বাতাস অনুকূল থাকিলে এবং অন্য কোনো দৈব-দুর্বিপাক না ঘটিলে সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া ভোর সময়ে ফ্রান্সের উপকূল স্পর্শ করিতে পারিবে—গেকয়ল্ এই ভরসা করিয়াছিল।

জাহাজ গন্তব্যপথে বিনাবাধায় অগ্রসর হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার সময় গুমট করিয়া বাতাস উঠিল এবং বারিধি-বক্ষ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রবল বাত্যা কর্‌ভেটের গতির অনুকূলই ছিল, আর সমুদ্র তখনও তেমন উত্তাল হইয়া উঠে নাই। তবু সময় সময় উদ্বেলিত-সাগর-তরঙ্গে জাহাজের সম্মুখের ডেক প্লাবিত হইতেছিল।

সেই কৃষক—যাহাকে লর্ড ব্যালকারাস্ 'জেনারেল' বলিয়া এবং প্রিন্স্ ডি-লা-টুর্-ডি-অভার্ণ 'ভ্রাতঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—তিনি ডেকের উপর শান্ত-গম্ভীর ভাবে পদ-চারণা করিতেছিলেন। জাহাজ খুব দুলিতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। নাবিকদের মতোই তাঁহার দৃঢ় পাদবিক্ষেপ। কখনো কখনো তিনি কোটের পকেট হইতে খানিকটা চকোলেট বাহির করিয়া চিবাইতেছিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশ তুষার-শুভ্র বটে, কিন্তু দন্ত একটিও স্বস্থানচ্যুত হয় নাই।

তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতেছিলেন না—কেবল মাঝে মাঝে কাপ্তেনকে দুই একটি দ্রুত-উচ্চারিত কথা বলিতেছিলেন। কাপ্তেন সসম্ভ্রমে তাহা শুনিতেছিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কাপ্তেন এই যাত্রীটিকেই জাহাজের প্রকৃত অধ্যক্ষ মনে করিতেছে।

গেকয়ল্ অভ্রান্ত নিপুণতার সহিত জাহাজটিকে জার্সি ও শার্কের মধ্যবর্ত্তী মগ্নগিরি ছাড়াইয়া লইয়া চলিল—পথটি যেন তাহার সুপরিচিত। ধরা পড়িবার ভয়ে কর্‌ভেটের সম্মুখ ভাগে কোনো আলো দেওয়া হয় নাই। কুয়াশাটাকে ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়াই মনে করা হইতেছিল। ক্রমে তাঁহারা 'গ্রাণ্ডইটাকে'পৌছিলেন। সেণ্ট্ ওয়েনে স্তম্ভের উপরিস্থিত ঘড়ীতে তখন দশটা বাজিতেছে শোনা গেল। বাতাস যে তখনও পশ্চাৎ হইতেই বহিতেছিল ইহাতেই বোঝা যায়। লা-কর্‌বিয়ার্ নামক মগ্ন শৈলের সান্নিধ্যবশতঃ সমুদ্র সেখানে অধিকতর তরঙ্গায়িত।

দশটা বাজিবার কিয়ৎক্ষণ পরে জাহাজের কাপ্তেন ও সেকেণ্ড অফিসার কৃষক-পরিচ্ছদ পরিহিত লোকটিকে তাঁহার ক্যাবিনে পৌছাইয়া দিল। ক্যাবিনে প্রবেশ কালে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন। "মশায়রা, বিষয়টি গোপন রাখার উপর যে কতদূর নির্ভর করে আপনারা তা' বুঝতে পারচেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ থাকা চাই। আপনারা দু'জন ভিন্ন আর কেউ আমার নাম জানে না।"

কাপ্তেন বলিল, "আমরা আমরণ এই গুপ্ত কথা রক্ষা করিব।"

"আর আমি, আমি তো মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেও ইহা ব্যক্ত করিব না"—এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ক্যাবিনে প্রবেশ করিলেন।

* এক প্রকার হত্যা-যন্ত্র। প্রকাণ্ড গুরুভার প্রশস্ত কুঠার উপর হইতে সহসা পতিত হইয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

৩

অভিজাত ও অনভিজাতের সাহচর্য্য

কাপ্তেন ও সেকেণ্ড-অফিসার ফিরিয়া আসিয়া ডেকের উপর পাশাপাশি ভাবে পায়চারি করিতে করিতে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। আলোচনার বিষয় তাহাদের আরোহীটি। বাতাসে কথাগুলি সীমাহীন অন্ধকারে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বয়বার্থেলট লা ভিউভিলের কানে কানে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "দেখা যাবে ইনি প্রকৃতই একজন নেতা কি-না।"

লা-ভিউভিল্ উত্তর করিল, "এদিকে কিন্তু ইনি একজন প্রিন্স্।"

"প্রায়।"

"ফ্রান্সে ইনি শুধু অভিজাত বংশীয়, কিন্তু ব্রিটেনীতে প্রিন্স্।"

"ফ্রান্সে যখন রাজশকটের আরোহী তখন ইনি মার্কুইস্—এই যেমন আমি "কাউন্ট্" এবং তুমি সিভেলিয়ার।"

"রাজশকট তো এখন বহুদূরে! আপাততঃ আমরা টাম্‌ব্রিলের * সোয়ারী!"

এ কথার পর তাঁহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বয়বার্থেলট্ আবার আলাপ সুরু করিলেন, "ফরাসী প্রিন্সের অভাবে একজন ব্রিটেনীর প্রিন্স্ যোগাড় করা গেচে।"

"ঈগলের অভাবে কাক নির্ব্বাচিত হয়েচে।"

"আমি কিন্তু গৃধ্র হ'লেই অধিকতর পছন্দ করতুম", বয়বার্থেলট্ বলিলেন।

লা ভিউভিল্ টিপ্পনী কাটিল, "হাঁ, বটেই তো। তীক্ষ্ণ চঞ্চু এবং নখ চাই।"

"দেখা যাবে।"

লা ভিউভিল্ বলিতে লাগিল, "একজন নেতা নৈলে আর চল্‌চে না। টিন্‌টেনিয়াকের যে মত আমারও তাই—একজন প্রকৃত নেতা চাই—আর চাই বারুদ। কাপ্তেন, সম্ভব এবং অসম্ভব প্রায় সকল নেতাকেই আমি জানি—কাল্‌কে যাঁরা ছিলেন, আজকে যাঁরা আছেন, এবং আস্‌চে কাল যাঁরা হবেন। যেমন মাথা-ওয়ালা লোক আমরা চাচ্ছি, তেমন একটিও তাঁদের মধ্যে নেই। ওই অভিশপ্ত ভেণ্ডি প্রদেশে এমন একজন সেনাপতি চাই, যিনি আবার আইনজ্ঞও হবেন—তিনি শত্রুকে উদ্বাস্ত করে তুল্‌বেন। প্রত্যেকটি মাঠ, প্রত্যেকটি ঝোপ, প্রত্যেক খানা-খন্দ, প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিয়ে তাঁকে যুঝ্‌তে হবে—শত্রুর সঙ্গে। সুযোগমাত্রেরই সদ্ব্যবহার কর্ত্তে হবে; সব দিকে তাঁর চোখ থাকা চাই, তিনি হত্যা কর্ব্বেন প্রচুররূপে—যেন তাক্ লেগে যায়,—যেন লোকের শিক্ষা হয় আচ্ছা মতন, তাঁকে অতন্দ্র এবং লেশমাত্রকৃপাশূন্য হ'তে হবে। বর্ত্তমান সময়ে সে কৃষক সৈন্যদলে বীরের অভাব নেই—অভাব হচ্চে সুধু সেনাপতির। ডি-এল্‌বির কথা না বল্লেও চলে; লেস্‌কিয়োর—পীড়িত; বোঁচাম্প—দয়া-প্রবণ—অর্থাৎ নির্ব্বোধ; লা-রোচেজেকেলিন্—সব-লেফ্‌টেনান্ট হিসাবে চমৎকার; সিল্‌জ্—সম্মুখ-যুদ্ধের সৈনাপত্যে পটু, কিন্তু কৌশল-সমরে অনভিজ্ঞ; কেথেলিনো—অল্পবুদ্ধি শকট-চালক মাত্র; ষ্টোফ্লেট্—ধূর্ত্ত, দরোয়ানগিরির উপযুক্ত; বেরার্ড অক্ষম; বুলেইন ভিলিয়ার্স—হাস্যকর; চেরেট্—অসহ্য! আর সেই নাপ্‌তে গ্যাষ্টনের কথা আমি বলি না; কারণ একজন চুলকাটা নাপিতকে যদি আমরা অভিজাতবর্গের পরিচালনে নিযুক্ত করি, তাহ'লে এই বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে হ'ল কি? আর আমাদের ও সাধারণ-তন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্যই বা রইল কোথায়?"

"দেখ্‌চ, এ বিপ্লবের বিষ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েচে।"

"এ হচ্চে ফ্রান্সের দুষ্টব্রণ।—কেবল ইংলণ্ড আমাদের এ রোগ সারাতে পারে।

"আর, নিঃসন্দেহ ইংলণ্ড আমাদের সারাবেও এথেকে কাপ্তেন।"

"কিন্তু যতদিন না সারে ততদিন ব্যারামটা দেখ্‌তে বড়ই বিচ্ছিরি!"

* ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে গরুর গাড়ীর মতন এক রকম গাড়ীতে চড়াইয়া গিলোটিনে লইয়া যাওয়া হইত। সেই গাড়ীর নাম টাম্‌ব্রিল (tumbrill)।

"তা বটে। সর্ব্বত্রই কেবল ভাঁড়ামি। রাজতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি হচ্চে ষ্টোফ্লেট্—আর সহকারী হচ্চে ডি মলেভ্রিয়র। ওদিকে সাধারণ তন্ত্রের মন্ত্রী হচ্চে ডিউক্ ডি কাষ্ট্রিজের দরোয়ানের ছেলে পাঁচে—একই অবস্থা। এই ভেণ্ডির যুদ্ধ কি সব লোককেই না পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্চে! একদিকে শুঁড়ী সান্টারে, অপরদিকে চুলকাটা গ্যাষ্টন্!"

"যাই বল, গ্যাষ্টনের উপর আমার কতকটা শ্রদ্ধা আছে। গুমেনীর যুদ্ধে সে সৈন্য পরিচালনা মন্দ করে নি। প্রায় তিনশো "ব্লু"কে সে নিহত করেছিল।"

"উত্তম। কিন্তু আমিও তা কর্ত্তে পারতুম।"

"অবশ্য। আর আমিও পারতুম।"

"যুদ্ধের বড় বড় কাজগুলির ভার সম্ভ্রান্ত লোকদেরই নেওয়া আবশ্যক, সে সব কাজ নাইট্‌দেরই সাজে,নাপ্‌তেদের সাজে না।"

"তবু এই জনসাধারণের ভেতরও ভালো ভালো লোক আছে।"

প্রত্যুত্তরে বয়বার্থেলট্ বলিল, "এই ধর-না, ঘড়ী-ওয়ালা জোবি। ফ্লাণ্ডার্সের একটা পল্টনে সে সার্জেন্ট ছিল, ক্রমে সে ভেণ্ডির একজন সর্দ্দার হয়ে উঠ্‌ল; এখন সে উপকূলের একদল সৈন্যের সেনাপতি; তার ছেলে সাধারণ-তন্ত্রে যোগ দিয়েচে। ছেলে নীল দলে, আর বাপ শাদার দলে; পরস্পর সাক্ষাৎ—অমনি লড়াই। বাপ ছেলেকে বন্দী করলে, আর বন্দুকের গুলিতে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলে।"

"সে লোকটা ভালোই।" ভিউভিল বলিল।

"রাজদলের ব্রুটাস্ আর কি!"

"কিন্তু যাই বলুন, এসব সর্ত্তেও একজন ককেরো, একজন জিন্‌জিন্, একজন মুলিন্, একজন ফোকার্ট, একজন বুজু, একজন চুপ্পের মতো ছোটলোকের অধীনে যুদ্ধ করা—অসহ্য!"

"তা, অপর পক্ষও সমান বিরক্ত। আমাদের দল যেমন সাধারণ লোকে ভর্ত্তি, এদের দলও তেমন সম্ভ্রান্ত লোকে ভর্ত্তি। তুমি কি মনে কর কাউন্ট-ডি-ক্যাণ্ডো, ভাইকাউন্ট্-ডি-মিরণ্ডা, ভাইকাউন্ট্-ডি-বোহার্নে, কাউন্ট-ডি-ভেলেন্স, মার্‌কুইস্-ডি-কাষ্টিন্, কি ডিউক-ডি-বাইরন্ যে গণতন্ত্রের নেতা, তা'তে তা'রা বড় সন্তুষ্ট?"

"কি খিচুড়ীই পাকিয়েচে?"

মনে মনে নিজ-নিজ চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিতে করিতে উভয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন। পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ হইল।

"ভাল কথা, সত্যি কি ডেম্পিয়ারে নিহত হয়েচে।"

"হাঁ, কাপ্তেন!"

বয়বার্থেলট্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। "কাউন্ট ডি-ডেম্পিয়ারে—এই আমাদের আর একজন, যিনি ওদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।"

ভিউভিল্ বলিয়া উঠিলেন, "হায়, সাধারণ-তন্ত্র! সামান্য ব্যাপারের কি ভয়ানক পরিণামই না হচ্চে! ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয় যে, মোটে কয়েক লক্ষ টাকার খাকৃতি পড়াতে এই বিষম রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা।"

বয়বার্থেলট্ বলিলেন, "ছোট ছোট হাঙ্গামাকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।"

"সবই মন্দের দিকে যাচ্ছে।"

"তা বটে। লা রোয়ারি—মৃত; ডিউ ফ্রেজ্‌নে—একটি গর্দ্দভ। আর কি চমৎকার নেতা—এই বিশপরা! চাই সৈনিক, চাই ধর্ম্মযাজক; বিশপ—যারা প্রকৃত বিশপ নয়; সেনাপতি—যারা সেনাপতি নামের অযোগ্য!"

বয়বার্থেলটের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া লা ভিউভিল্ বলিলেন, "কাপ্তেন্, আপনার ক্যাবিনে 'মণিটার'—কাগজখানা আছে কি?"

"হ্যাঁ আছে।"

"আজকাল প্যারিসের থিয়েটারে কি নাটক হচ্চে?"

"পলিন, এবং দি কেভার্ণ্।"

"ইচ্ছা হয়, অভিনয়টা দেখি।"

"তা পারবে। অন্ততঃ এক মাসের মধ্যে আমরা প্যারিসে পৌঁছিব। মিঃ উইণ্ড্‌হাম্ লর্ড হুডকে তাই বল্‌ছিলেন।"

"আমাদের অবস্থাটা বোধ হয় তত খারাপ নয়, কাপ্তেন!"

"সবই ভালো হ'ত যদি এই ব্রিটেনীর যুদ্ধটা ঠিক মতো চালানো যেত।"

লা ভিউভিল্ মাথা নাড়িয়া সন্দেহ প্রকাশ করিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কাপ্তেন, সৈন্যদিগকে কি আমরা ডাঙায় নামিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ—যদি দেখি উপকূল আমাদের স্বপক্ষে; কিন্তু বিরুদ্ধে হলে, নয়। যুদ্ধের সময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়—কখনো সদর দরজা ভাঙতে হয়, কখনো বা চোরের মতো লুকিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে ঢুকতে হয়। অন্তর্বিপ্লবে সুযোগ পেলেই কৌশল খাটাবার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক—এ যেন সর্ব্বদাই পকেটে গুপ্ত-চাবি নিয়ে ঘোরা। আমরা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তবে আসল কথা হচ্চে—একজন নেতার মতো নেতা চাই।"

তার পর একটু চিন্তা করিয়া বয়বার্থেলট্ বলিলেন, "লা ভিউভিল্, সিভেলিয়র ডি ডিউজিকে কেমন মনে কর?"

"নেতৃ-পদের জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কেবল মুক্ত প্রান্তরে সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধেই অভ্যস্ত। ঝোপঝাড়ের মর্ম্ম চাষারাই বোঝে।"

"তা হ'লে জেনারেল ষ্টোফ্লেট্ এবং জেনারেল কেথিলিনোকেই মেনে নিতে হ'বে।"

লা ভিউভিল্ একটু ভাবিয়া বলিল, "একজন প্রিন্স্ চাই, ফ্রান্সের প্রিন্স—যাঁর ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্চে—একজন খাঁটি প্রিন্স্।"

"কেন? প্রিন্স্ মানে তো—"

"কাপুরুষ। তা' আমি জানি। কিন্তু তবু একজন প্রিন্স্ চাই—গ্রাম্য বোকা লোকগুলোর চোখ্ ঝল্‌সে দেবার জন্যে—তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যে।

"কিন্তু আমি বলে' রাখ্‌চি, প্রিন্স্‌রা আসবে না।"

"তা হ'লে তা'দের ছেড়েই আমরা কাজ চালাবো।"

বয়বার্থেলট্ হাত দিয়া মাথা টিপিতে লাগিলেন, যেন কি-একটা বুদ্ধি বাহির করিবেন। সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ভাল, যে জেনারেল্ আমরা এখানে পেয়েচি, তাঁকে দিয়েই দেখা যাক্ না একবার।"

"তিনি তো অভিজাত সম্প্রদায়ের মস্ত একজন লোক।"

"তাঁকে দিয়ে আমাদের চল্‌বে মনে কর?"

"চল্‌বে, যদি তিনি খুব শক্ত লোক হন।"

"অর্থাৎ যদি নির্ম্মম হন।"

কাউন্ট এবং সিভেলিয়র একে অন্যের মুখের দিকে চাহিলেন।

"মুঁসো ডি বয়বার্থেলট্, আপনি ঠিক শব্দটিই প্রয়োগ করেছেন—নির্ম্মম। আমরা তাই চাই। এই ভীষণ আহবে দয়া কিম্বা মায়ার স্থান নেই। রক্ত-পিপাসুদেরই জয় হ'বে। রাজহন্তারা যোড়শ লুইর শিরশ্ছেদন করেচে, আমরা সেই রাজহন্তাদের গায়ের মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ব। হ্যাঁ, সেনাপতি চাই—নিয়তির মতোই নির্ম্মম, কঠোর—কাকুতি মিনতিতে যাঁর কেশাগ্রও বিচলিত হ'বে না। 'এঞ্জু' এবং 'পইটু' অঞ্চলে সর্দ্দাররা একটু উদার—তারা সদাশয়তা দেখায়; ফলে—কাজ কিছুই এগুচ্চে না। 'মেরে' অঞ্চলের সর্দ্দাররা নির্ম্মম; সেখানে কাজ হচ্চে খুবই। চেরেট্ দুর্দ্দান্ত বলেই পেরেনের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌চে—এ হচ্ছে বাঘে বাঘে লড়াই।"

বয়বার্থেলট্ আর উত্তর দিবার সময় পাইলেন না। একটা নিদারুণ চীৎকারধ্বনি ভিউভিলের কথা থামাইয়া দিল। জাহাজের ভিতরে ভয়ঙ্কর একটা গোলযোগ শ্রুত হইল—কারণ কিছুই বোঝা গেল না।

কাপ্তেন এবং লেফটেনাণ্ট্ দ্রুতগতিতে নীচের ডেকে যাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নামিতে পারিলেন না—গোলন্দাজেরা সব ক্ষিপ্তের মত উপরে ছুটিয়া আসিতেছে। একটা ভীষণ দুর্ঘটনা এই মাত্র ঘটিয়াছে।

৪

সামুদ্রিক দুর্দ্দৈব

চব্বিশ পাউণ্ড ওজনের গোলাবর্ষণকারী একটা কামান বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়াতে আলগা হইয়া পড়িয়াছে।

উন্মুক্ত-সাগর-বক্ষে জাহাজ যখন ভরা-পালে ছুটিয়াছে, তখন তাহার পক্ষে এর চেয়ে ভীষণতর দুর্ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না।

ছিন্নবন্ধন কামান সহসা অতি-প্রাকৃত পশুর মতো দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। যন্ত্র দানবে পরিণত হয়। চক্র-চতুষ্টয়ের উপর স্থাপিত দশহাজার পাউণ্ড ভারী এই বস্তুপিণ্ড তখন বিলিয়ার্ড বলের মতো দ্রুত আবর্ত্তিত হইতে থাকে। জাহাজের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে ইহা গড়ায়, ধাক্কা দেয়, অগ্রসর হয়, পিছু হটে, থামে, সময় সময় কি-জানি ভাবে; আবার চলিতে থাকে; জাহাজের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তীরবৎ ছোটে, বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে, লম্ফ দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া যায়, বাধা এড়াইয়া চলে, ভাঙে, হত্যা করে, ধ্বংস করে। মানুষের চিরদাস, যেন প্রতিহিংসা সাধনে উন্মত্ত। মনে হয়, জড়-নিরুদ্ধ দানবীশক্তি সহসা আপনার আবেষ্টন বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ না লইয়া আর শান্ত হইতে পারিতেছে না। এ যেন নীচে ভূমিকম্প, উপরে বজ্র-নির্ঘোষ।

কি প্রচণ্ড এই জড়ের ক্রোধ! এই ক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ড উল্লম্ফনে শার্দ্দূল, গুরুত্বে হস্তী, ক্ষিপ্রতায় মূষিক। কুঠারের মতো অপ্রতিরোধ্য ইহার আঘাত, উত্তাল তরঙ্গের মতো আকস্মিক ইহার আবেগ, বিদ্যুতের মতো দ্রুতচঞ্চল ইহার গতি, এবং চতুষ্পার্শ্বের আর্ত্তনাদের মধ্যে সমাধির মতোই ইহা বধির, ভ্রূক্ষেপ-হীন!

এখন উপায় কি? কেমন করিয়া এই রুদ্র তাণ্ডবের অবসান হইবে? ঝটিকার বিরাম আছে; সাইক্লোন্ বহিয়া চলিয়া যায়, বাতাস পড়িয়া আসে; ভগ্ন মাস্তলের জায়গায় নূতন মাস্তল স্থাপিত হইতে পারে; জাহাজের তলদেশে ছিদ্র হইলে বন্ধ করা যায়; অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। কিন্তু ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত এই দুরন্ত পশুকে বুঝি সংযত করা যায় না।

মাংসলোলুপ কুক্কুর ও যুক্তি শোনে; ক্রুদ্ধ ষণ্ডকেও স্তম্ভিত করা যায়; ভীষণ ভুজঙ্গও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়; অমিতপরাক্রম সিংহও পোষ মানে; হিংস্র ব্যাঘ্রকেও ভীত করা অসম্ভব নহে; কিন্তু এমন উপায় নাই যদ্দ্বারা এরূপ স্বেচ্ছাচারী দানবকে আয়ত্ত করা যায়। ইহাকে বধ করা সম্ভব নহে—কারণ ইহা মৃত। অথচ কোন্ অন্ধ-তামসিক শক্তির প্রভাবে ইহা যেন অনুপ্রাণিত।

পবন সাগরকে আন্দোলিত করে। সাগরের আন্দোলনে জাহাজের আন্দোলন—তাহা হইতে এই কামানের গতি-চাঞ্চল্য। জাহাজ, তরঙ্গ, বায়ুবেগ সকলেই ইহার সহকারী। জাহাজের কোনো পার্শ্বে ইহার আঘাত লাগিলে জাহাজ ভাঙিয়া যাইতে পারে। এই আসন্ন আঘাত হইতে কিরূপে ইহাকে রক্ষা করা যাইবে? কিরূপে এই বিদ্যুৎস্ফুরণকে ধৃত করা যাইবে—এই বজ্রকে নিপাতিত করিতে হইবে? এই পোত-বিধ্বংসী আসুরিক যন্ত্রের খামখেয়ালি নিয়মিত করা—এ যে বিষম সমস্যা!

মুহূর্ত্তমধ্যে নাবিকেরা সকলে সমবেত হইল। প্রধান গোলন্দাজেরই দোষ। সে কামানের বন্ধন-শৃঙ্খলের স্ক্রু ভালো করিয়া আঁটিয়া দেয় নাই। একটা খুব উঁচু ঢেউ জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া আঘাত করিবামাত্র তোপমঞ্চটা পেছনে হটিয়া শিকল ছিঁড়িয়া যায় এবং কামানটার ছুটাছুটি আরম্ভ হয়।

নাবিকেরা কেহ কেহ একাকী, কেহ কেহ বা দলবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—আদেশের প্রতীক্ষায়। কামানটা একবার আসিয়া এদের মধ্যে ছুটিয়া পড়িল, আর তৎক্ষণাৎ চার জন লোক নিষ্পেষিত হইয়া গেল; আবার জাহাজের দোলানীতে সম্মুখের দিকে ছুটিল এবং আর একটি লোককে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অপর একটা কামানের উপর এমন বেগে নিপতিত হইল যে সেটা জাহাজ হইতে পড়িয়া গেল—আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল। উপরের ডেক হইতে কাপ্তেন ও সেকেণ্ড অফিসার তাহাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। নাবিকেরা সকলেই সিঁড়ির দিকে দৌড়িয়া গেল। নিমেষ মধ্যে নীচের ডেক জনশূন্য হইল। সেই ভীষণ কামানটি তখন ধাবন, কুর্দ্দন ও পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

এই নাবিকগণ হাসিতে হাসিতে সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করে। কিন্তু এখন তাহারা সকলেই নিদারুণ ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। এই সার্ব্বজনীন ভীতি বর্ণনা করা অসম্ভব।

কাপ্তেন ব্যয়বার্থেলট্ এবং লেফ্‌টেনেণ্ট লা ভিউভিল উভয়েই নির্ভীক বীর; তবু এ দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া সিঁড়ির উপরিভাগে নির্ব্বাক্ পাণ্ডুর মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হস্তদ্বারা তাঁহাদিগকে সরাইয়া কে একজন সিঁড়ি দিয়া নামিলেন।

তিনি সেই বৃদ্ধ "আরোহী"—সেই "কৃষক"—এইমাত্র যাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা হইতেছিল।

সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে আসিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন।

৫

শক্তি ও শৌর্য্য

প্রলয়-দেবতার জীবন্ত রথের মতো কামানটি ডেকের উপর ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছিল। জাহাজের ছাদ হইতে দোদুল্যমান লণ্ঠনের কম্পমান শিখায় ছায়ালোকের একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মাইতেছিল। দ্রুতধাবমান কামানের আকৃতি স্পষ্টরূপে নেত্র-গোচর হইতেছিল না। কখনো উহাকে কালো দেখাইতেছিল, কখনো বা ইহার পালিশ পৃষ্ঠের উপর হইতে প্রতিফলিত দীপ্তি অন্ধকারে ভৌতিকালোকবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

ধ্বংসকার্য্যের বিরাম ছিল না। ইতিমধ্যে আরো চারিটি তোপ বিচূর্ণ হইয়াছে। জাহাজের পার্শ্বদেশ দুই জায়গায় ফাটিয়া গিয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে তাহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে। কিন্তু উচ্চ তরঙ্গ আসিয়া পড়িলে সেই ফাটল দিয়া জাহাজের মধ্যে জল ঢুকিবে। ছাদ স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ পাঁচটির উপর দিয়া তোপমঞ্চ-চক্রের বারম্বার আবর্ত্তনে সেগুলি পিষ্ট, কর্ত্তিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। জাহাজের প্রতি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে রক্তস্রোত বিসর্পিত গতিতে তক্তার উপর দিয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতেছিল। সমগ্র জাহাজ আর্ত্ত কোলাহলে পূর্ণ।

কাপ্তেন অচিরেই সুস্থির হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে নাবিকেরা গদি, পাল, কাছি, বস্তা প্রভৃতি যাহা কিছুতে কামানটার উন্মাদ-নর্ত্তনের বাধা জন্মাইতে কিম্বা উহার বেগকে মন্দীভূত করিতে পারে—তাহাই ডেকের উপর ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোনই ফল হইল না। নীচে নামিয়া এগুলিকে যথাযথরূপে বিন্যস্ত করিয়া দিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে এসব আবর্জ্জনা-স্তূপে পরিণত হইল।

এই আকস্মিক বিপৎপাতের ষোলকলা পূর্ণ করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সমুদ্রের চাঞ্চল্য তখন ততটুকুই ছিল। বরং সেই সময়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেলে ভাল হইত; হয়তো তাহাতে কামানটা উল্টাইয়া পড়িত এবং তখন সেটাকে আয়ত্ত করা সহজ হইত। কিন্তু তাহা হইল না। ভাঙা-চুরা চলিতে লাগিল। কামানের ধাক্কা লাগিয়া জাহাজের প্রধান মাস্তুলটা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইল; ত্রিশটা তোপের মধ্যে দশটা ভাঙিয়া অকর্ম্মণ্য হইল, জাহাজের পার্শ্বদেশের ফাটল বাড়িয়া চলিল—করভেটের ভিতর জল উঠিতে লাগিল।

সেই বৃদ্ধ আরোহী নীচের ডেকে সিঁড়ির পাদমূলে প্রস্তরমূর্ত্তির মতো নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর দৃষ্টিতে এই সংহারলীলা অবলোকন করিতেছিলেন। আর একপদ অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়।

ছিন্ন-শৃঙ্খল কামানের প্রতি উল্লম্ফনেই মনে হইতেছিল যে পোতটি বুঝি এবার বিনষ্ট হইবে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ-ডুবি অনিবার্য্য।

তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতীকার করিতে না পারিলে তাহাদের আর রক্ষা নাই। ভাবিবার সময় নাই। কি করা না করা এক্ষণই স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে?

বয়বার্থেলট্ ভিউভিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিভেলিয়র, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?"

লা-ভিউভিল উত্তর দিল, "হ্যাঁ—না—কখনো কখনো।"

"ঝড়ের সময়?"

"হ্যাঁ, আর এমনই সময়ে।"

"একমাত্র ঈশ্বর আমাদিগকে এ যাত্রা রক্ষা করিতে পারেন।"

সকলেই চুপচাপ। কামানের ভীষণ দাপাদাপি চলিতেছে।

বাহিরে সমুদ্রতরঙ্গ জাহাজে প্রতিহত হইতেছে, ভিতরে কামানের আঘাত;—এ যেন দুইটি হাতুড়ি পরস্পর ঘা দিতেছে।

সহসা সেই দুষ্প্রবেশ্য গণ্ডীর ভিতর—যেখানে ক্ষিপ্ত কামানের ধাবন-কুর্দ্দন চলিতেছে—সেখানে লৌহদণ্ড হস্তে

একজন লোকের আবির্ভাব হইল। সে হচ্ছে এই বিপৎপাতের মূলীভূত কারণ—প্রধান গোলন্দাজ, যাহার অমার্জ্জনীয় ত্রুটিতে এই দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। সে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়। দক্ষিণ হস্তে লৌহদণ্ড ও বামহস্তে রজ্জুর ফাঁস লইয়া সে ডেকের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কামানে ও গোলন্দাজে, জড়ে ও প্রজ্ঞায়, অচেতনে ও মানবে—দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

সে রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে শান্ত অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল কামানটা কখন তাহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইবে।

গোলন্দাজ তাহার কামানটিকে বিলক্ষণ চিনিত। তাহার মনে হইল উহাও তাহার প্রভুকে চিনিতে পারিবে। বহুকাল তাহারা একত্র বাস করিয়াছে। কতবার সে তাহার করাল ব্যাদানের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। অসুর হইলেও এ তো তাহার পোষা। লোকে পালিত কুকুরের সঙ্গে যেরূপ করিয়া কথা বলে, সেইরূপে সে কামানটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এস না?"—হয়তো সে কামানটিকে ভালবাসে।

কামানটা এই সম্বোধনে তাহার দিকে ফিরিবে—ইহাই যেন সে আশা করিতেছিল।

কিন্তু তাহার দিকে আসা মানে তো তাহার উপর লাফাইয়া পড়া—আর তাহা হইলেই তাহার নিশ্চিত মৃত্যু। এই বিনাশ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা হয়—ইহাই প্রশ্ন। সকলে মৌন আতঙ্কে তাকাইয়া রহিল।

বোধ হয় কেবল সেই বৃদ্ধ ভিন্ন আর কাহারও শ্বাস প্রশ্বাস সহজে বহিতেছিল না। বৃদ্ধ সেই প্রতিদ্বন্দ্বী যুগলের মধ্যে কঠোরমূর্ত্তি সহকারীবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। যে কোনো মুহূর্ত্তে তিনি কামানের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি নড়িলেন না।

নীচে অন্ধ জলোচ্ছ্বাস এই যুদ্ধের গতি নিয়মিত করিতেছিল।

গোলন্দাজ যেমন অগ্রসর হইয়া কামানটাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিল, অমনি—বোধ হয় সমুদ্র তরঙ্গের কোনো আকস্মিক বেগ পরিবর্ত্তন বশতঃ—কামানটা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল—যেন ভয়ে অভিভূত হইয়াছে।

"চলে এস, থাম্‌লে কেন?" লোকটি বলিল। বোধ হইল কামানটা যেন কান পাতিয়া শুনিতেছে।

সহসা ওটা তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। গোলন্দাজ সরিয়া গিয়া আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিল।

লড়াই আরম্ভ হইল—দুর্ব্বলে ও দুর্দ্ধর্ষে, রক্তমাংসের শরীরে এবং ব্রোঞ্জনির্ম্মিত দানবে—অশ্রুতপূর্ব্ব লড়াই। একদিকে অন্ধ জড়শক্তি, অপরদিকে আত্মা!

স্তিমিত আলোকে ব্যাপারটা যেন একটা অলৌকিক কাণ্ডের অস্পষ্ট আভাসের মতো দেখাইতেছিল।

এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে যে-কেহ বলিত, কামানটারও আত্মা আছে, আর সেই আত্মা ক্রোধ ও জিঘাংসায় পরিপূর্ণ। এই অন্ধ জড়শক্তিরও যেন চক্ষু আছে—এ যেন মানুষটাকে বেশ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এ-ও কৌশল প্রয়োগ করিতে পারে, এরূপ মনে হইতেছিল। এ যেন আসুরিক ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত একটা বৃহৎ ধাতুময় পতঙ্গ। সময় সময় এই অতিকায় পতঙ্গ জাহাজের নীচু ছাদে আঘাত করিয়া আবার তাহার চাকা চারিটির উপর পড়িয়া যাইতেছিল,—যেমন করিয়া ব্যাঘ্র তাহার থাবাচারিটির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—এবং পুনরায় সেই লোকটাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিতেছিল। লঘুগতি, ক্ষিপ্র, সতর্ক গোলন্দাজ কামানের এই বিদ্যুৎচঞ্চল গতাগতি হইতে সর্পের মতো অবলীলাক্রমে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যে সব আঘাত সে এড়াইয়া চলিতেছিল, সেগুলি জাহাজের উপরই পড়িয়া জাহাজটাকে ক্রমশঃই জীর্ণ দীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল।

ছিন্ন শৃঙ্খলটার একপ্রান্ত তোপমঞ্চে আটকানো ছিল। অন্য প্রান্তটি আলগা ছিল, আর কামানের দাপাদাপিতে ঘূর্ণায়মান হইয়া পিস্তলহস্তধৃত চাবুকের মতো চারিদিকে আঘাত করিতেছিল। ইহাতে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবুও লোকটি যুঝিতে লাগিল। কখনো কখনো সেও কামানটাকে আক্রমণ করিতেছিল। লৌহদণ্ড ও রজ্জু-হস্তে

সে সময় সময় আস্তে আস্তে কামানটার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়ায়, আর কামানটা যেন ফাঁদ দেখিতে পাইয়া পলাইয়া যায়। নির্ভয়ে, কিছুমাত্র না দমিয়া লোকটা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল।

এইরকম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলিতে পারে না। কামানটা যেন সহসা মনে মনে বলিল, "না, এর শেষ হওয়া আবশ্যক।" একটু থামিল। পরিণাম আসন্ন হইতেছে বোঝা গেল। মনে মনে যেন কি একটা মতলব ঠাওরাইয়া কামানটা হঠাৎ গোলন্দাজের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেও লম্ফ দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, "আবার, দেখ না ?" তখন কামানটা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া পিছু হটিয়া শিকলের টানে আবার সম্মুখদিকে লোকটার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল, সে আবার সরিয়া দাঁড়াইল।

এই আঘাতে আরো তিনটা তোপ ভগ্ন হইল। কামানটা যেন অন্ধ হইয়া, কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গোলন্দাজের দিকে পিছন ফিরিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এখানে ওখানে তক্তা ভাঙিতে লাগিল। গোলন্দাজ সোপানের পাদমূলে, বৃদ্ধ হইতে কয়েক হাত দূরে আশ্রয় লইল এবং হাতের লৌহদণ্ডটা ডেকের উপর নামাইয়া একটু দম নিতে চেষ্টা করিল। কামানটা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় দ্রুতগতিতে পিছু হটিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গোলন্দাজ বুঝি নিষ্পেষিত হইয়া যায়। নাবিকগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ আরোহী এতক্ষণ পর্য্যন্ত অচল ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইবার নিজের প্রাণ নাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও কামান হইতেও দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইলেন এবং এক বস্তা কাগজ উঠাইয়া অতি সুকৌশলে তাহা তোপমঞ্চ-চক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

এই কাগজের বস্তায় কামানের গতি নিবৃত্ত হইল। ক্ষুদ্র একটি নুড়ি একটা সুবৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের গতি থামাইয়া দিতে পারে, সামান্য বৃক্ষশাখায় তুষারশৈলের গতি নিবৃত্ত হয়। কামানটা থামিল, সেই সুযোগে গোলন্দাজ তাহার লৌহদণ্ড চাক্কার ভিতর ঢুকাইয়া দিল এবং চাড়া দিয়া কামানটাকে উল্টাইয়া ফেলিল। তার পর সেই ভূপতিত ব্রোঞ্জ দানবের গলায় ফাঁস আটকাইয়া দিল। বিপদের অবসান হইল। মানুষই জয়ী হইল, পিপীলিকা হস্তীকে পরাভূত করিল, বামন বজ্রকে বন্দী করিল।

নাবিক এবং নৌসৈন্যেরা প্রশংসাসূচক করতালি ধ্বনি করিল। তাহারা রজ্জু ও শৃঙ্খল দ্বারা কামানটাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল।

গোলন্দাজ বৃদ্ধ আরোহীকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"মন্‌সেইনিয়র্, আপনি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ পুনরায় গম্ভীরভাব অবলম্বন করিলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

৬

তুলা দণ্ডের দুই দিক।

মানুষেরই জয় হইল। কিন্তু কামানটারও জয় হইয়াছে, বলা যায়। আসন্ন জাহাজ-ডুবি নিবারিত হইল বটে, কিন্তু করভেটটি রক্ষা পাইল, বলা যায় না। উহা এরূপভাবে ভাঙিয়াছে যে মেরামত অসম্ভব। ত্রিশটি কামানের মধ্যে বিশটি অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

জাহাজের খোলে ছিদ্র হইয়া জল উঠিতেছিল। অবিলম্বে তাহা বন্ধ করিয়া জল-নিষ্কাশনের উপায় করিতে হইবে।

শত্রুপক্ষের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন আবশ্যক, কিন্তু উপস্থিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা তদপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয়। সুতরাং ডেকের উপর স্থানে স্থানে লণ্ঠন জ্বালিতে হইল।

এতক্ষণ এই জীবন মরণের সমস্যা লইয়া নাবিকেরা এরূপ তন্ময় ছিল যে বাহিরে কি হইতেছে কেহই লক্ষ্য করে নাই। কুয়াশা আরও গাঢ় হইয়াছে; বাতাসের গতি-পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বায়ুবেগে করভেটটিকে তাহার উদ্দিষ্ট পথ হইতে সরাইয়া জার্সি এবং গার্ণসি দ্বীপের সম্মুখে লইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে ক্ষুব্ধ বারিধির ভীম গর্জ্জন। বড় বড় ঢেউ আসিয়া করভেটের ক্ষতমুখে চুম্বন করিতেছিল,—এই চুম্বনে মহাবিপদ। জাহাজের আন্দোলন ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া

দাঁড়াইল। ভীষণ ঝটিকার সূচনা। সামান্য দূরেও আর কিছু দেখা যায় না।

নাবিকেরা যথাসম্ভব জাহাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। বৃদ্ধ আরোহী উপরের ডেকে উঠিয়া গিয়া প্রধান মাস্তুলে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে সিভেলিয়র্ লা ভিউভিল্ নৌসৈন্যদিগকে মাস্তুলের দুইপাশে সার দিয়া দাঁড় করাইলেন। সর্দার-খালাসীর বাঁশী শুনিয়া মেরামতকার্য্যে নিযুক্ত নাবিকেরা যে যেখানে ছিল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কাউন্ট ডি-বয়বার্থেলট্ বৃদ্ধের নিকট আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে উস্ক-খুস্ক চেহারা, আলুথালু-বেশ একটা লোক হাঁপাইতে ছিল। তবু মোটের উপর লোকটার চেহারায় একটা আত্মপ্রসাদের ভাব। এ সেই গোলন্দাজ যে এইমাত্র মত্ত কামানটাকে দমন করিয়াছে।

কৃষক-পরিচ্ছদ পরিহিত অপরিচিতকে মিলিটারী ধরণে অভিবাদন করিয়া কাউণ্ট বলিলেন—"জেনারেল, এই সেই লোক।"

গোলন্দাজ সৈনিকদের মধ্যে দাঁড়াইল—দেহ উন্নত ঋজু, দৃষ্টি অবনমিত।

কাউণ্ট ডি-বয় বার্থেলট্ বলিতে লাগিলেন, "জেনারেল, এই লোকটা যাহা করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনার কি মনে হয় না যে, এ সম্বন্ধে তাহার কমাণ্ডার-দিগের কিছু কর্ত্তব্য আছে?"

"আমার তো মনে হয়, আছে"—বৃদ্ধ উত্তর করিলেন।

বয়বার্থেলট্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "অনুগ্রহ করে' আদেশ দিন।"

"আদেশ তো আপনি দেবেন--আপনি কাপ্তেন।"

"কিন্তু আপনি হচ্ছেন, জেনারেল।"

বৃদ্ধ তখন গোলন্দাজের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "এদিকে এস।"

গোলন্দাজ একপদ অগ্রসর হইল। বৃদ্ধ বয়বার্থেলেটের দিকে ফিরিয়া তাহার ইউনিফর্ম হইতে "সণ্ট্ লুইয়ের ক্রুশ" পদকটি খুলিয়া গোলন্দাজের কোটের উপর আট্‌কাইয়া দিলেন।

নাবিকেরা আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল—"হুররে।"

নৌ-সৈন্যেরা বন্দুক তুলিয়া অভিবাদন করিল।

হতবুদ্ধি গোলন্দাজের দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেত করিয়া বৃদ্ধ আরোহী বলিলেন, "এখন ঐ লোকটাকে গুলি করিয়া মারো।"

উল্লাসধ্বনির পরক্ষণেই দারুণ বিস্ময়ের স্তব্ধতা!

তখন সমাধিভূমির মতোই সেই নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "একটা ত্রুটি এই জাহাজকে বিপদাপন্ন করিয়াছে। হয় তো তাহা রক্ষার আর আশা নাই। মুক্ত সমুদ্রে পড়া, আর শত্রুর সম্মুখীন হওয়া একই কথা। শত্রুর সম্মুখে আসিয়া কোনো অপরাধ করিলে—মৃত্যুই তাহার একমাত্র সাজা। কোনো অপরাধেরই ক্ষতিপূরণ হয় না। সাহসের জন্য পুরস্কার, আর ত্রুটির জন্য দণ্ডবিধান উভয়ই কর্ত্তব্য।"

ওক বৃক্ষের উপর যেমন করিয়া কুঠারাঘাত হইতে থাকে এই কথাগুলিও তেমনি ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে একটির পর আর একটি করিয়া ভৈরব নির্ঘোষে ধ্বনিত হইল।

বৃদ্ধ সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর।"

গোলন্দাজ মস্তক অবনত করিল,—তাহার বক্ষে সেণ্ট্ লুইয়ের ক্রুশ তখন ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল।

কাউণ্টের ইঙ্গিতে দুইজন নাবিক একটা আচ্ছাদন-বস্ত্র লইয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের পাদ্রীও আসিলেন। একজন সার্জ্জেণ্ট বারোজন নৌ-সৈন্যকে প্রতি লাইনে ছয় ছয় জন করিয়া দুই লাইনে পৃথকভাবে স্থাপন করিলেন। একটিও কথা না বলিয়া গোলন্দাজ এই দুই সারির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। পাদ্রী ক্রুশ হাতে করিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

সার্জ্জেণ্ট বলিলেন, "অগ্রসর হও।"

সৈন্যগণ ধীরপাদবিক্ষেপে জাহাজের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। আস্তরণবাহী নাবিকদ্বয় অনুবর্ত্তী হইল।

করভেটটি মৌনবিষাদে আচ্ছন্ন। দূরে ঝটিকা বিলাপ করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অগ্নি-ঝলক দেখা গেল। পরক্ষণেই বন্দুকের আওয়াজ সেই অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তারপর সব চুপচাপ।

সমুদ্রে একটা ভারী জিনিষের পতনধ্বনি শোনা গেল।

বৃদ্ধ আরোহী মাস্তলদণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া যুক্তকরে নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন।

বাম হস্তের তর্জ্জনী দিয়া তাহাকে দেখাইয়া বয়বার্থেলট্ লা ভিউভিল্‌কে অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"ভেড়ি তাহার নেতা পাইয়াছে!"

উভয় সঙ্কট

কিন্তু করভেট্‌টির কি হইবে?

ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সমুদ্র যেন একটা বিশাল কালো আস্তরণে আচ্ছাদিত। কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এমন অবস্থা সর্ব্বদাই বিপজ্জনক—অক্ষত জলযানের পক্ষেও।

কুয়াশার সহিত উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া যোগ দিল। জাহাজকে যথাসম্ভব হাল্কা করা হইয়াছে। ভগ্ন তোপ ও তোপমঞ্চ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ ও লৌহখণ্ড সকল, মৃতদেহগুলি—যাহা কিছু অনাবশ্যক সবই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ক্রমে সমুদ্র উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ঝটিকা যে আসন্ন তাহা নহে। বরং দিগন্তের পবনস্বনন মন্দীভূত হইতেছে, এমন বোধ হইল। ঝাপ্‌টা বাতাস উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-প্রবাহ সাগরের গভীরতম প্রদেশের আলোড়ন সূচিত করিতেছিল। ভগ্ন করভেটটির পক্ষে এরূপ উত্তাল তরঙ্গ মারাত্মক।

গেকয়ল হালে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। সমুদ্রতরঙ্গের উপর আধিপত্য করিয়া যাহারা বেড়ায় তাহারা সাহসের সহিত মন্দভাগ্যের সম্মুখীন হইতে অভ্যস্ত।

মহাবিপদের মধ্যেও যাহারা স্থির থাকিতে পারে, লা ভিউভিল সেই রকমের লোক। গেকয়লকে সম্বোধন করিয়া লা ভিউভিল বলিল, "দেখ্‌চ পাইলট, ঘূর্ণী বাত্যার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েচে; ওর হাঁচির চেষ্টা নিষ্ফল হয়েচে। আমরা এ থেকে পার পেয়ে যাব। বাতাস উঠ্‌বে, এই মাত্র।"

গেকয়ল গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "যেখানে বাত্যা সেখানেই তরঙ্গ-ভঙ্গ।"

নাবিকেরা হাসেও না, বিষণ্ণও হয় না। পাইলট যাহা বলিল তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কথা। সচ্ছিদ্র জাহাজের পক্ষে উত্তাল সমুদ্রে পড়ার মানেই জাহাজে জল উঠা। গেকয়লের কুঞ্চিত ভ্রূ তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আরও জোর দিল। কামান এবং গোলন্দাজ ঘটিত বিপদের পরক্ষণেই এরূপ বিদ্রূপাত্মক কথা বলা লা ভিউভিলের পক্ষে বোধ হয় ঠিক হয় নাই। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সমুদ্রে মন্দ ভাগ্য আনয়ন করে। মহাসাগর সর্ব্বদাই রহস্যপূর্ণ, কখন কি করিবে ঠিক বলা যায় না। সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

লা ভিউভিল্ দেখিল, তাহার গম্ভীর হওয়া আবশ্যক। জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা এখন কোথায়, পাইলট?"

পাইলট জবাব দিল, "আমরা এখন ভগবানের হাতে।"

পাইলটের অনেকটা প্রভুত্ব। তাহাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দিতে হইবে, এবং অনেক সময় তাহার যেমন খুসি কথা বলিলে মানিয়া নিতে হইবে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোকেরা খুব কমই কথা বলিয়া থাকে।

লা ভিউভিল্ সরিয়া গেল। সে পাইলটকে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, আকাশ তাহার উত্তর দিল। সহসা সমুদ্র পরিষ্কার হইয়া গেল। কুয়াশার আবরণ বিদীর্ণ হইয়া দিগন্ত প্রসারিত কালো কালো ঢেউগুলির আবছায়া দৃষ্টিগোচর হইল।

আকাশ যেন একটা মেঘের ঢাকনায় আচ্ছাদিত। তবে মেঘগুলি আর সলিল স্পর্শ করিতেছিল না। পূর্ব্ব দিক্‌প্রান্তে একটু শুভ্র আভা—ইহা উষার আলো; পশ্চিম দিকে তদনুরূপ একটু পাণ্ডুরতা—তাহা অস্তগামী চন্দ্রের শেষ রশ্মিবিভাস। ভাম-গম্ভীর বারিধি, ঘনকৃষ্ণ আকাশ—এই দুইয়ের মধ্যে দিক্‌চক্রবালের দুই প্রান্তে ক্ষীণ পাণ্ডুর ভৌতিক আলোকচ্ছটা। সেই কিরণ রেখার মাঝে মাঝে কালো কালো কি যেন অচলভাবে খাড়া হইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিমদিকে চন্দ্রালোকিত আকাশের গায়ে তিনটি উচ্চ পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বদিকে ভোরের অস্পষ্টালোকে আটটি জাহাজ সমব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, দেখা গেল।

পাহাড় তিনটি মগ্নশৈল, জাহাজ আটটি নৌবাহিনীর অংশ।

করভেটের পশ্চাতে বিপদ সঙ্কুল শৈলমালা, সম্মুখে ফরাসী ক্রুজার। পশ্চিমে অতলস্পর্শ গহ্বর, পূর্ব্বে হত্যাকাণ্ড। হয় জাহাজডুবি, নয় যুদ্ধ।

অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন। ছিন্নশৃঙ্খল কামান লইয়া যুঝাযুঝির সময় অলক্ষিতে জাহাজ গন্তব্যপথ হইতে অনেকদূরে সরিয়া আসিয়াছে। সেণ্টমালোর দিকে না যাইয়া জাহাজ বরং গ্রেন্‌ভিলের দিকে চলিতেছিল। ভগ্ন হাল দিয়া তাহার গতি এখন আর নিয়মিত করা যাইতেছে না। বাতাস ও সমুদ্রতরঙ্গ উহাকে পাহাড়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। উপরে ঝাপ্‌টা বাতাস, নীচে উব্‌ড়ো-খুব্‌ড়ো মগ্নশৈল—সুতরাং সমুদ্র বড়ই তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ।

সাগর তাহার মনের কথা কখনই স্পষ্ট করিয়া বলে না। সবই গোপন রাখে—এমন কি তাহার চালাকিও। মনে হয়, সাগর যেন পূর্ব্ব হইতেই প্লান ঠিক করিয়া কাজ করে। উহা এক একবার অগ্রসর হয়, আবার পিছাইয়া যায়; একবার একরকম মতলব করে, আবার তাহা বদ্‌লায়। সমুদ্রের রকম দেখিয়া মনে হয় যেন ঝড় আসিবে, আবার সেই মতলব ছাড়িয়া দেয়। ভাব দেখায় যেন উত্তর দিকে আক্রমণ করিবে, অথচ আক্রমণ করে দক্ষিণ দিকে।

সারারাত করভেট্‌ "ক্লে-মোর" কুয়াশা ও ঝটিকার আতঙ্কে কাটাইয়াছে। ঝড় হইল না, কিন্তু দেখা দিল মগ্নশৈল। পোত ধ্বংস অনিবার্য্য—তবে অন্য আকারে।

পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া ধ্বংস হওয়ার বিপদের সহিত আবার শত্রুর আক্রমণ যোগ দিল।

লা ভিউভিল তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্ফূর্ত্তির সহিত বলিয়া উঠিল, "এখানে জাহাজডুবি, ওখানে যুদ্ধ—একেবারে পোয়াবারো।"

কাপ্তেন টেলিস্কোপ হাতে লইয়া জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে পালইটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পশ্চিমের শৈলমালা ও পূর্ব্বের জাহাজগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পাইলট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই জাহাজগুলো চেনো?"

গেকয়ল উত্তর করিল, "হ্যাঁ, চিনি।"

"এগুলো কি?"

"নৌবাহিনীর অংশ।"

"ফ্রান্সের?"

"শয়তানের।"

খানিকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর কাপ্তেন পাইলটের হাতে টেলিস্কোপটি দিয়া বলিলেন, "তুমি এই জাহাজগুলো স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছ? এদের নাম বল্‌তে পার?"

পাইলট্‌ ইহাদের নাম বলিয়া যাইতে লাগিল এবং কোন্‌ জাহাজে কতগুলি কামান থাকে তাহার উল্লেখ করিতে লাগিল।

কাপ্তেন পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া টুকিতে লাগিলেন। ঠিক দিলে দেখা গেল আটটি জাহাজে মোট ৩৮০টি তোপ রহিয়াছে।

এই সময়ে লা-ভিউভিল্‌ তথায় উপস্থিত হইল।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের যুদ্ধোপযোগী কয়টি কামান এখন আছে?"

"নয়টি।"

"বেশ," কাপ্তেন বলিয়া উঠিলেন।

তারপর পাইলটের হাত হইতে পুনরায় টেলিস্কোপটি লইয়া দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

রণতরী আটটি—নিঃশব্দ, নিশ্চল; কিন্তু ক্রমশঃ যেন বৃহত্তর হইতেছিল। তাহারা ধীরে ধীরে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে অগ্রসর হইতেছে। "ক্লে-মোর" এই ব্যূহবেষ্টনের মধ্যে;—একদল শিকারী কুকুর যেন বন্য বরাহকে ঘিরিয়াছে।

কাপ্তেন নিম্নস্বরে তাঁহার আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। নীরবে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বীয়-স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইল। মুমূর্ষুর কক্ষে যেমন করিয়া আবশ্যকীয় কার্য্যসকল অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি মৌনসত্বরতার

সহিত সমুদয় বন্দোবস্ত করা হইল। নয়টি কামানেরই মুখ জাহাজগুলির অভিমুখে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। গোলন্দাজগণ তাহাদের কামানের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

চারিদিকে বিরাট স্তব্ধতা। প্রতিকূল বায়ুর ফোঁস্-ফোঁস শব্দ ভিন্ন আর সব চুপচাপ—নিঝুম। এক একবার মনে হইতেছিল ইহা হয়তো ঘুমন্ত সমুদ্রের একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

৮

পলায়ন

বৃদ্ধ আরোহী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বয়বার্থেলট্ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মন্‌সেইনিয়র্, আমাদের বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়েচে। সমাধির গহ্বরাভিমুখে আমরা দ্রুত অগ্রসর হচ্চি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়্‌ব না। হয় রণতরী, নয় ঐ শৈলমালা আমাদের আট্‌কাবে—তৃতীয় পন্থা দেখা যায় না। অবশ্য এক উপায় আছে—প্রাণ বিসর্জ্জন। ডুবে' মরার চেয়ে গোলাগুলিতে প্রাণ দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মরণ-ব্যাপারে জলের চেয়ে অগ্নিই আমি বেশী পছন্দ করি। কিন্তু প্রাণ দেওয়া হচ্চে আমাদের কাজ,—আপনার নয়। মহৎ কার্য্যের জন্যে আপনি রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েছেন—ভেণ্ডির সমরে নেতৃত্ব আপনাকে কর্‌তে হ'বে। আপনার বিনাশ মানে রাজতন্ত্রের বিনাশ। সুতরাং আপনাকে বাঁচ্‌তেই হবে। আমাদের আত্মমর্য্যাদা আমাদিগকে এখানেই থাক্‌তে বল্‌চে; আপনার আত্মমর্য্যাদা আপনাকে যেতে বল্‌চে। জেনারেল, আপনাকে এই জাহাজ ছাড়তে হবে। একটা ডিঙ্গি ও একজন লোক দিচ্চি, কূলে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব হবে না। এখনো ভোর হয়নি, সমুদ্র অন্ধকার, ঢেউ উঁচু, পালাতে পারবেন। কোনো সময় পলায়নই বিজয়লাভের সোপান।"

বৃদ্ধ তাঁহার শুভ্রশির ঈষৎ অবনমিত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কাউন্ট ডি বয়বার্থেলট্ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সৈনিক ও নাবিকগণ!"

সকলেই কাপ্তেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

কাপ্তেন বলিলেন, "আমাদের এই সঙ্গী রাজার প্রতিনিধি, তাঁর ভার আমাদের উপর সমর্পণ করা হয়েচে। তাঁকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। ফ্রান্সের রক্ষার জন্যে তাঁর বেঁচে থাকা প্রয়োজন। রাজবংশীয় লোকের অভাবে তাঁকে ভেণ্ডিতে নেতৃত্ব করতে হ'বে। তিনি একজন মস্ত সেনাপতি। কথা ছিল, তিনি আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করবেন। এখন দেখা যাচ্চে, তাঁকে একাকীই নামতে হ'বে। নেতাকে বাঁচাতে পারলে সবই বাঁচ্‌ল।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "তাই ঠিক, তাই ঠিক।"

কাপ্তেন বলিতে লাগিলেন—"তিনিও বিপদে ঝাঁপ দিচ্ছেন, কূলে পৌঁছানো সহজ নয়। ক্ষুব্ধ সমুদ্রে বানচাল না হয় তজ্জন্য নৌকাখানা বড় হওয়া আবশ্যক। আবার ক্রুজারগুলোর দৃষ্টি এড়াতে হ'লে নৌকা ছোট হওয়া চাই। কূলের কোনো নিরাপদ জায়গা দেখে নৌকা চালাতে হ'বে। এমন একজন মাঝি চাই যার ব্যায়ামসুপুষ্ট হস্ত ক'সে দাঁড় টান্‌তে মজ্‌বুত, যে সন্তরণপটু, যে এই উপকূলের লোক এবং সমুদ্রপথ চেনে। এখনো রাত আছে, আর আমরা ধূঁয়োও ছাড়ব—ডিঙ্গি কর্‌ভেট্ ছেড়ে অলক্ষিতে ভেসে পড়তে পারবে। ছোট নৌকা অগভীর জলেও চলে যাবে। বাঘ জালে আট্‌কালেও কাঠবিড়ালী ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আমাদের বেরুবার উপায় নেই, কিন্তু ডিঙ্গি বেরুতে পারবে। শত্রুর জাহাজ দেখ্‌তে পাবে না। আর আমরাও শত্রুকে আমোদ দেবার বন্দোবস্ত করচি। তোমাদেরও এই মত কি না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ," নাবিকগণ বলিল।

কাপ্তেন বলিলেন, "আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করবার সময় নেই। কেহ প্রস্তুত আছ কি?"

অন্ধকারে নাবিকদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "আমি প্রস্তুত।"

৯

পলাইতে পারিল কি ?

কয়েক মিনিট পরে একটি ছোট নৌকা (যাহাকে "জিগ্" বলে) কর্ভেট্ হইতে ছাড়িয়া গেল। নৌকায় দুইটি লোক—হালের দিকে সেই বৃদ্ধ, আর গলুইর দিকে সেই স্বেচ্ছাব্রতী নাবিক। কাপ্তেনের আদেশানুসারে নাবিক পূর্ণ উদ্যমে মিনকুইয়ার শৈলমালার দিকে দাঁড় টানিয়া যাইতেছিল।

এক থলে বিস্কুট, খানিকটা ঝল্সানো মাংস আর এক পিপে জল—আহার্য্য ও পানীয়ের বন্দোবস্ত এই পর্য্যন্ত।

নিশ্চিন্ত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও রঙ্গপ্রিয় লা-ভিউভিলের ব্যঙ্গস্পৃহা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কর্ভেটের পশ্চাদ্দিকে ঝুঁকিয়া সে বলিয়া উঠিল, "জিগ্‌টি পলায়নের পক্ষে বেশ উপযোগী, আর মর্‌বার পক্ষে তো চমৎকার।"

পাইলট না বলিয়া থাকিতে পারিল না, "মশায়, হাস্যটা আমাদের না করাই ভাল।"

অনুকূল পবন আর বারি-বেগে ডিঙ্গি শীঘ্রই অনেক দূর চলিয়া গেল। উষার অস্পষ্টালোকে উচ্চ তরঙ্গের আড়ালে আড়ালে নৌকাখানি মোচার খোলার মতো দুলিতে দুলিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমুদ্র ভীম-গম্ভীর—যেন কি ভীষণ পরিণামের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সহসা সাগরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বয়বার্থেলেটের উচ্চ কণ্ঠস্বর উত্থিত হইল—"রাজকীয় নৌবিভাগের সৈন্যগণ, প্রধান মাস্তলের উপর শাদা নিশান উড়াইয়া দাও। আজ আমাদের শেষ সূর্য্যোদয় দর্শন।"

সেই মুহূর্ত্তে কর্ভেট্ হইতে তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল।

নাবিকগণ চীৎকার করিল, "রাজা দীর্ঘজীবী হউন্।"

দিগন্তের সলিল-সীমা হইতে সুদূর মেঘ-গর্জ্জনবৎ প্রতিধ্বনি হইল, "সাধারণ তন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক্।"

তাহার পর শতবজ্রনির্ঘোষতুল্য মহাশব্দে সাগরতল নিনাদিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অগ্নি ও ধূমে সাগরবক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গোলা পতনে ক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গের শীর্ষদেশ ফেন-পুঞ্জে শুভ্র হইয়া উঠিল। সমুদ্রের মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইতেছে। সেই আগুনের ঝলকের ভিতর দিয়া জাহাজগুলি ছায়ামূর্ত্তির মতো ক্ষণে পরিদৃশ্যমান, ক্ষণে অদৃশ্য হইতেছিল।

সম্মুখে রক্তিম পৃষ্ঠপটের উপরে অঙ্কিত কালো কঙ্কাল-মূর্ত্তির মতো কর্ভেট্‌টি। তার উচ্চ মাস্তলের উপর রাজচিহ্ন-অঙ্কিত শ্বেতপতাকা বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে।

নৌকায় উপবিষ্ট লোক দুইটি নীরব। নাবিক দক্ষতার সহিত সঙ্কীর্ণ প্রণালী অতিক্রম করিয়া ডিঙ্গিটি মিনকুইয়ার শৈলমালার পশ্চাদ্দিকে লইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধস্থল হইতে তখন তাহারা অনেক দূরে।

আকাশপ্রান্তের শোণিত-রাঙা দীপ্তি ও কামান-গর্জ্জনের শব্দ সেখানে ক্ষীণ।

ক্রমে সমুদ্রবক্ষ হইতে অন্ধকার অপসারিত হইল। ফেনপুঞ্জ চিক্‌চিক্ করিতে লাগিল। প্রভাতের অরুণলেখা তরঙ্গশীর্ষ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিল।

ডিঙ্গি এখন যেখানে সেখানে শত্রুর ভয় আর নাই বটে, কিন্তু নৌকা-ডুবির আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে। উদ্বেলিত বারিধিবক্ষে ডিঙ্গিটি ডিমের খোলার মতো ভাসিতেছে—পাল নাই, মাস্তল নাই, কম্পাস নাই। শুধু দাঁড়ের ভরসা। একটি অণুর জীবন-কণা যেন দুর্জ্জয় দৈত্যের খাম-খেয়ালের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই বিরাট মহামৌনের মধ্যে নৌকার অগ্রভাগের লোকটি পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট লোকটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বলিল, "আমি তারই ভাই, যাকে আপনি এই মাত্র গুলি করে' মারতে হুকুম দিয়েছিলেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত *

আলোচনা

শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসু এম-এস্-সি

কথাটা শুন্‌তে হয়ত বিস্ময়কর শোনায় যে, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে এখনও আমাদের দেশে সম্যক আলোচনা আরম্ভ হয়নি। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা যতটা, তার একসিকিও যদি আলোচনা হত, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশের মূর্ত্তি আমাদের চোখে ধরা পড়ত। যেখানে শুধু শ্রদ্ধাই থাকে, অথচ শ্রদ্ধানুযায়ী আলোচনা হয় না, সেখানে শ্রদ্ধা অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি বটে, কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প। তাই কেউ যদি রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করেন, তার দিকে আমাদের তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি পড়ে। সম্প্রতি একখানা বই ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়েছে—"Political Philosophy of Rabindra Nath." --by Sachin Sen. গ্রন্থকারকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি; কারণ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত নিয়ে এ যাবৎ কোন আলোচনা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে "প্রবাসীতে" (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) উক্ত বইখানার আলোচনা করেছেন এবং তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত আরও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত নিয়ে কোনদিন ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন নি। তাঁর মত নানাশ্রেণীর লেখার ভিতর বিক্ষিপ্ত। সে সকল সংগ্রহ করে তার থেকে কোন philosophy গ'ড়ে তোলা যে কি সুকঠিন, তা' যাঁদের রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন। আজ দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল যিনি চিন্তা করে ও লিখে আসছেন, তাঁর কোন বিশেষ মতের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হলে যে শ্রম করা দরকার, আমাদের সেটা নেই। তাই শচীন বাবু যখন আমাদের চোখের সাম্‌নে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতগুলো দাঁড় করিয়েছেন, তখন তাঁর শ্রমকে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারি না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ভূমিকা লিখ্‌তে গিয়ে সত্যি কথাই বলেছেন—"A glance through the pages of this book will enable the reader to grasp Rabindranath's ideas with regard to the people, the state, their mutual relationship, nationalism, and internationalism—questions in which we are all interested."

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, কারণ তিনি জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, জয়ী তিনিই হ'তে পারবেন যিনি আত্মশক্তির সাধনা করেছেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যার নেই, শক্তির যে ভাণ ক'রে বেড়ায়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তার পক্ষে অসম্ভব। মানিনীর পার্ট অভিনয় ক'রে মন চুরি করা যায় বটে, কিন্তু মন যার রক্তমাংসের নয়—তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট একটা বিরাট যন্ত্র,—এর কাছে অভিমান ক'রে ভিক্ষা-মন্ত্র আওড়ালে কিছুই মিলবে না। নিজের শক্তি সঞ্চয় ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এই মতেরই আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার গুটিকতক অপ্রিয় খাঁটি কথা বলেছেন—

"Our political show is a mockery—a got-up agitation, not enthused by love for

---

* "Political Philosophy of Rabindranath," by Sachin Sen, with a foreward by Sj Pramatha Chowdhury published by Asher & Co., 36, Simla Street. Calcutta. Rs. 2/8/-

country but for self. The welfare of the country does not guide our political leaders, it is the shadow of the Government House and Secretariat that is haunting them. The dumb millions of unfortunate countrymen are not of any concern to them—civilians and official parasites engage their whole attention. Political meetings are held by leaders not to address the countrymen at large but to make their voices heard by our rulers. Boycott agitation is kept up not because of love for the children of the soil but as a weapon to frighten the bureaucrats. The leaders talk of village reconstruction not for the sake of villages but for demonstrating their patriotism before the much-hated bureaucracy. The Congress gives programmes, constructive and destructive, not so much to further the interests of the people of India but as to hold up a counterblast to the Simla and Whitehall Gods. This is the way things are moving and behaving, thus clouding the vital issue while intangible signs of progress loom large on the surface. Self-deception, which is the sap of our political life, cannot go further." উক্ত কথাগুলো ঝাঁঝালো হলেও মিথ্যে নয় এবং ভাববার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতকে শচীনবাবু নানাদিক্ দিয়ে আলোচনা করেছেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, রাষ্ট্র ও সমাজ, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা, শিক্ষার আদর্শ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, জাতীয় সঙ্গীত, সাম্রাজ্যিজম্, নর-নারীর সম্বন্ধ এবং স্বরাজ ও চরকা প্রসঙ্গে।

উক্ত বইখানার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে বলেছেন যে, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতের সমগ্রমূর্ত্তি পেতে হ'লে তাঁকে ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ political worker নন,—statesman বা diplomatও নন। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত তাঁর নানাযুগের লেখার মধ্যে বিক্ষিপ্ত, তাঁকে ঐতিহাসিক ভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভবপর কিনা জানিনা। তাঁর চিন্তাশক্তি খরস্রোতা নদীর মত বয়ে যায়—তাঁর রচনা চিন্তার খোরাক জুটিয়ে দেয়। তাঁর মতবাদ কোন সময় বা ঘটনার সাহচর্য্যে প্রকাশ পায় না—তা' আপনা হতেই পরিস্ফুট। তাঁর মতবাদ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হ'তে রস ও স্বাদ গ্রহণ করলেও তা যথার্থই সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। "স্বদেশী সমাজের" কথা আজও তেমনি সত্যি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—তিনি "Nationalism"এ যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা আজও তেমনিই সত্য,—"কর্ত্তা ইচ্ছায় কর্ম্মের" ভিতরে যে গভীরতম ব্যথা ব্যক্ত হয়েছিল, তা সময় এবং কালের উপর নির্ভর করে না। তাই শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন—"His words attain the heights of poetic beauty and philosophical truth." রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে, দেশ-কাল-পাত্র হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনলে তাঁর কথার সমগ্রতা নষ্ট হয় না। "Poet's vision is always correct"; তাঁর দৃষ্টি শাশ্বতকালের দিকে—আজ ও কালের মিথ্যা আবর্জ্জনায় তা কলঙ্কিত নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় মতের সহিত আমাদের দেশের লোকের পরিচয় হওয়া দরকারী। আমাদের জাতির সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় সম্ভব রবীন্দ্র সাহিত্যের সাহায্যে,—আমাদের সমস্যার প্রকৃত সামাধান সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মতের অনুকরণে।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে, লেখক তাঁর নিজের রুচি দিয়ে যা গ'ড়ে তোলেন তাতে সমগ্র ও সত্যিকার রূপ ধরা যায় না। একথার তাৎপর্য্য সত্যই আমি বুঝতে পারলুম না। গ্রন্থকার একটা যন্ত্র নয়, তাঁর নিজস্ব কিছু রুচি থাকবেই—শুধু দেখতে হবে সে রুচি বিকৃত কি না। এতে যদি অসম্পূর্ণতার আশঙ্কা থাকে, তবে তাকে অবশ্যম্ভাবী ব'লে ধ'রে নিতে হবে। নিজের রুচি একদম চেপে রেখে একটি প্রাণহীন যন্ত্র হয়ে লেখা চলে না, তাতে টাইপ করা চলতে পারে। সমগ্র বইখানাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি গ্রন্থকারের একটা শ্রদ্ধার ভাব সুস্পষ্ট। এমন কি রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-

নৈতিক মতকে তিনি শ্রেষ্ঠ মত ব'লে দাবী করেছেন। একই দলিল থেকে দুটো জিনিষ প্রমাণ হলে, দলিলকে দুষ্ট ব'লে আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়, উকিলদের বাহাদুরীই প্রমাণ হয়। আলোচনার বিষয়টিকে নানা দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে সমালোচককে পরিশেষে কোন-না-কোন পক্ষ সমর্থন কর্‌তে হয়, এর ভিতর যদি ব্যক্তিগত রুচি একটু এসে পড়ে তবে তা নিয়ে অভিযোগ করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে, যদি সম্ভব হয়, ভবিষ্যতে বিশদ্ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। শচীন বাবুর বইখানা যে চিন্তাশীল লোকদের চিন্তার খোরাক দেবে সে কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। Rabindranath and Socialism পরিচ্ছেদটি গভীর চিন্তাশীলতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারের কাছে ব্যক্তিগত হিসাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আমিও রবীন্দ্র সাহিত্যের একজন সামান্য পাঠক হিসাবে গ্রন্থকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

বন্দী বিশ্বনাথ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ

বাষ্পাকারে, দীর্ঘশ্বাসে, বিশ্বের বেদনা,
উর্দ্ধে তব শান্তিধাম লক্ষ্য করি ছুটে;
শীতল পরশ পেয়ে নিঃস্বের চেতনা
জলদরূপেতে আজি উঠিল কি ফুটে?
বিশ্বের বেদনা প্রভু, লেগেছে কি বুকে?
ঢাল তাই শ্রাবণের সুধাধারা রূপে
ও বিরাট আঁখি-বারি,—ধরণীর মুখে?
ক্ষাল তা'র যত কালী আছে বক্ষকূপে।
হে বিরাট মহাকবি! বিশ্বকাব্য রচি'—
বাঁধিয়াছ দৃঢ় করি সেথা আপনারে;
তোমারেও বাজে, যদি বেঁধে প্রাণে কচি,
নিজ গড়া জটাজাল ছাড়াতে কে পারে?
মহাকাব্য অশ্রুনীরে, মহাকবি ভাসে,
বন্দী বিশ্বনাথ তথা রাজে বিশ্ব পাশে।

চিড়িয়াখানা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

কুইনাইন জিনিষটা শুধু ম্যালেরিয়ার ওষুধ নয়, গল্প-লেখকদের পক্ষেও একটি চমৎকার টনিক। ক্রমান্বয়ে গোটা দশেক পিল চাপাইবার পরে মাথাটা যখন রীতিমত ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহার সঙ্গে একটু সিগারেটের ধোঁয়া যোগ করিলেই, কল্পনার সমস্ত দুয়ার জানালা একেবারে একসঙ্গে খুলিয়া যায়; এই বৈচিত্র্যহীন বাঙালী জীবনেও প্লটের ভিড় জমিয়া উঠে। এবার রোগশয্যায় পড়িয়া একটি করুণ প্রেম-কাহিনীর ছিন্নসূত্র মনের মধ্যে নড়াচড়া করিতেছিল, সেদিন সকালে উঠিয়া সেইগুলিকেই জোড়া দিবার চেষ্টায় ছিলাম, এমন সময় ভৃত্য লোকুয়া আসিয়া জানাইল, একটি দাড়িওয়ালা বাবু আসিয়াছেন। চিনিতে দেরি হইল না, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামীজি। এই মহাপুরুষের এক একগাছি শ্মশ্রু এক একটি উপনিষদের শ্লোক। সেই দেবভাষায় শিলাবৃষ্টির তলে আমার মানব-প্রেমের সূক্ষ্ম জালটি যে এখনই ভাসিয়া যাইবে। অথচ কি করিয়া যে,—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং পরক্ষণেই সশরীরে—স্বামীজি নন, আমাদের মধুচক্রের সম্পাদক বিরূপাক্ষবাবু প্রবেশ করিলেন।

কি রকম, আপনি দাড়ি রাখলেন কবে থেকে?

আর বলবেন না। সব ছোকরার দল আজকাল দাড়ি গোঁফ কামিয়ে সম্পাদক হ'চ্ছে। আমাদের শেষটায় দাড়ির আশ্রয়ই নিতে হ'ল।

তা বেশ করেছেন। এই আপনার জন্যেই প্লট খুঁজছিলাম। একটি প্রেমের আখ্যান—

বিরূপাক্ষ আঁৎকাইয়া উঠিলেন, প্রেম!

ওকি ভয় পেলেন নাকি?

না, না, দয়া ক'রে একটা ভাল গল্প লিখুন। ও সব প্রেম-ট্রেম না।

বলিলাম, লোকে বলে বাঙালী জীবনে প্রেমের নাকি বড়ই প্রাদুর্ভাব। সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিকৃতি।

সে হোক্। আপনি, এই, হাসি-টাসি থাকে এমনি একটা কিছু লিখুন।

কেন, করুণ রস?

আজ্ঞে না।

প্রেমের অপমান সহিয়াছিলাম, কিন্তু করুণ-রসের এই অমর্য্যাদা সহ্য হইল না। একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলাম, দেখুন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, 'দুঃখ' জিনিষটার মধ্যে যে অজস্র সম্পদ, তার সম্বন্ধে আপনার বোধ হয় পরিপূর্ণ অনুভূতি নেই। মানব-জীবনের মূল প্রশ্ন যেখানে—

বিরূপাক্ষ বাবু হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সব মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের জীবনের মূল প্রশ্ন হ'চ্ছে গ্রাহক সংগ্রহ। এদেশে যারা বাংলা মাসিক পত্র পড়ে, তারা হয় নিষ্কর্ম্মা উকিল, না হয় কেরাণী, নয় তো ছাত্র। এর প্রত্যেকটিই এক একটি মূর্ত্তিমান করুণ রস। এদের জন্যে একটু তরল হাসিই চাই। বেশ সহজ হাসি। কেননা, হাসবার জন্যে মাথা ঘামাতে এদের ইচ্ছাও নেই, শক্তিও নেই। এ ছাড়া আর এক দল আছেন, পাঠিকাশ্রেণী—

একটু আশ্বস্ত হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা কি চান?

সেখানে অবিশ্যি করুণ রস চলে। কিন্তু তার মধ্যে এত বেশী হাহুতাশ, চোখের জল, আর আহা-উহুর দরকার যে ও আপনি পেরে উঠবেন না। ও বরং অনাথকে বলবো। ভাষাটা জমকালো আছে, জমাতে পারবে।

মনটা একেবারে দমিয়া গেল। কোথাকার কোন্ অনাথের সঙ্গে এই তুলনা-মূলক সমালোচনাটা কি আমার মুখের উপর না করিলেই চলিত না? অগত্যা প্রেমের গল্প ফেলিয়া

রাফেল কর্ত্তৃক অঙ্কিত তাঁহার প্রণয়াসক্তা
ফোর্ণারিণা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

[পিত্তি—গ্যালারী

হাসির গল্প লইয়া বসিলাম। গল্পের নাম দিলাম,—চিড়িয়াখানা।

একটি মেসে একখানি ঘর। তিনজন লোক। একটি উকিল, একটি কেরাণী আর একটি ছাত্র।

এইটুকু লিখিয়াছি। হঠাৎ লোকুয়া ছুটিয়া আসিয়া একেবারে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যত বলি কি হ'য়েছে? জবাব নাই। অনেকক্ষণ পরে কহিল, বাবু, বাবু, মনুয়া নেই—

মনুয়া নেই! বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

একটু পরেই কহিলাম, নেই তো তোর কি? সে তোর কে, যে কাঁদ্‌চিস?

লোকুয়ার কান্নার আর সমাপ্তি নাই, ক্রমাগত আমার পায়ের উপর মাথা ঠুকিয়া ঐ একটা কথাই কেবল বলিতে লাগিল, মনুয়া নেই। আমি বাধা দিলাম না, পা দুইটাও টানিয়া নিতে পারিলাম না। শোক জিনিষটা যে কী তীব্র হইতে পারে, ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া কোনদিন দেখি নাই। দরজার দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, মনুয়ার ছোট্ট মেয়েটা চৌকাঠ ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে. সদ্য মাতৃহারা পাঁচ বছরের মেয়ে। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন চারিদিকের রূপ বদলাইয়া গেল। টেবিলের উপরে আমারি হাতের হাসির গল্প যেন আমাকেই বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। জানালার বাহিরে চাহিলাম। শরৎ-প্রভাতের অপর্য্যাপ্ত আলোর বুকের ভিতর থেকে যেন কোন্ অনাদিকালের কান্নার সুরই আমার দুই কান ভরিয়া তুলিল।

লোকুয়া আমার অনেকদিনের ভৃত্য। ইহার বয়স যখন সাত কিংবা আট, রাস্তার পাশে একদিন ইহাকে কুড়াইয়া পাই। পরণে একখানি অতি জীর্ণ মলিন কাপড়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর মা বাপ কোথায়? নিঃসঙ্কোচে বলিল, ম'রে গেছে। মনে মনে কহিলাম, বালাই গেছে। সেইদিন থেকে আমার নির্জ্জন বাড়ীতে লোকুয়াই একমাত্র সঙ্গী। আমাকে ছাড়িয়া কোথাও নড়িত না। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চটকলের কুলী পল্লীতে ইহার যাতায়াত আরম্ভ হইল। ক্রমে, দুই একটি স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারও আমার কানে আসিল। একদিন খুব কড়া ধমক লাগাইলাম। তাহার কিছুদিন পরেই সকালে উঠিয়া দেখিলাম, বাড়ী শূন্য। বিকালেই একদল লোক আমার বাড়ী চড়াও করিল, এবং অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে জানাইল যে, তাহারা লোকুয়াকে নিশ্চয়ই পুলিশে দেবে। ক্রোশ চারেক দূরে কোন্ এক নিরুদ্দেশ সিগ্‌ন্যালারের স্ত্রী মনুয়া এবং তাহার শিশু কন্যাকে লইয়া সে নাকি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। লোকগুলিকে কোন রকমে ঠাণ্ডা করিয়া বাড়ী পাঠাইলাম। মনে মনে জানিতাম, যেখানেই যাক্, আমার কাছে আসিবেই। আসিলও তাই। দিন সাতেক পরে তেমনি নিঃশব্দে পায়ের কাছটিতে আসিয়া বসিল। কহিলাম, মেয়েটাকে কি করেছিস? উত্তর নাই, আর একটু গলা চড়াইতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, বিয়ে করেছি।

বিয়ে করেছিস? হতভাগা! পরের স্ত্রী!

লোকুয়া জানাইল সে পরের স্ত্রী নয়, সে বিধবা। জানিতাম, ইহাদের বিধবা-বিবাহে দোষ নাই। তবু জিনিষটা বিশ্রীই লাগিল। কহিলাম, ওকে ছাড়তে হবে। সে চমকিয়া উঠিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল। কঠিন কণ্ঠে জানাইলাম, তা না হ'লে এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত নয়—বলিয়া দরজা দেখাইয়া দিলাম। তবু দাঁড়াইয়া রহিল। অত্যন্ত রোখ চাপিয়া গেল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, যাও! লোকুয়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরম্পরায় শুনিলাম, পাড়ায় একটা খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সে চটকলে চাকরির চেষ্টায় আছে। মনুয়া এবং তাহার ছোট মেয়েটা দুইদিন উপবাসী। তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলাম। পরদিন লোকুয়াও আসিল, এবং আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আগেকার মত কাজে লাগিয়া গেল।

সংসারের সমস্ত অবলম্বন আমার ছেলেবেলাতেই শেষ হইয়াছিল। সংকল্প ছিল, বিধাতা যাহাকে ছিন্ন করিয়াছেন. নিজ হাতে আর তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিব না। এমন সময় কোথা হইতে এই আপদগুলি আসিয়া জুটিল। কখন যে জড়াইয়া পড়িলাম, জানিতেও পারিলাম না। মনুয়া বলিত, বাবা, আর জন্মে আমি যে তোমার সত্যি

মেয়ে ছিলাম। তাহার মেয়েটা আসিয়া যখন-তখন আমার লিখিবার টেবিল নাড়িয়া দিত, আমার জাতি এবং বয়সের মর্য্যাদা না রাখিয়া বলিত, দাদামশাই, তোমার ঐ কাগজ দিয়ে আমাকে একটা ঘুড়ি বানিয়ে দেবে? দাওনা? একদিন সভয়ে দেখিলাম, আমার বইএর আলমারীতে ধুলা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু যতটা ক্ষোভ হইবার কথা, ততটা হইল না। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালবাসে, গল্পে অনেক পড়িয়াছি। চাক্ষুস যাহা দেখিলাম, তাহার আর তুলনা নাই। প্রাণ তো অতি তুচ্ছ,—পরস্পরের জন্যে দিতে পারিত না, এমন কিছু বোধ হয় ইহাদের কল্পনাতেও ছিল না। বেশীদিন নয়—মাত্র একটি বছর। তারপর একদিন একটা লোক আসিয়া হাঁক ডাক লাগাইয়া দিল। নীচে গিয়া কহিলাম, কি চাই? বলিল, মনুয়াকে চাই, সে আমার বৌ।

ঘরে আসিয়া লোকুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তর্জ্জন করিয়া কহিল, ওটার মাথা ফাটিয়ে দেবো।

মনুয়াকে প্রশ্ন করিলাম। জবাব দিল না। আনত চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দিন কয়েক পরে, এই লোকটার সঙ্গেই নির্জ্জনে কথা বলিতে দেখিয়া লোকুয়া মনুয়াকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। আমি বাড়ি ছিলাম না। যখন ফিরিলাম, কেহ কোথাও নাই, মনুয়া গিয়াছে, লছমি গিয়াছে। লোকুয়ারও খোঁজ নাই। এক মাসের মধ্যে খোঁজ করিয়াও মিলিল না। তারপর একদিন সে ফিরিল, এবং কোন কথা না বলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা নিতান্ত বিনা প্রয়োজনেই আমার পা টিপিয়া দিতেছিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মনুয়া কি বল্‌লে রে?

লোকুয়া দুইটি অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। অনেকক্ষণ কথা কহিল না। তারপর ভগ্ন মৃদু কণ্ঠে কহিল, ও যে অতবড় সয়তানী একটি দিনও বুঝতে পারিনি, বাবু!—বলিয়া আবার পা টিপিতে লাগিল। আমিও আর প্রশ্ন করিলাম না। বুঝিলাম মনুয়া গিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বলিষ্ঠ লোকটাকেও একেবারে ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে। লক্ষ্য করিলাম, সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে সে যেন থাকিয়া থাকিয়া কেমন ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিত। কিছুদিন পরে বিকালের দিকে ছুটি নিতে আরম্ভ করিল। খোঁজ নিয়া জানিলাম, সে শুধু এই সয়তানীটাকেই আড়াল থেকে একবার দেখিবার জন্য। একদিন প্রচুর মার খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তারপরেও যাইতে ছাড়ে নাই। এই সময়েই আমার দেরাজ থেকে পাঁচটা টাকা চুরি যায়। লোকুয়াকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, আমি তো জানি না। দুইদিন পরে, অনেকরাত্রে আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া মিনতির কণ্ঠে কহিল, বাবু, আমি নিয়েছি টাকা।

বলিলাম, কি করেছিস?

কহিল, মনুয়ার কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল।

সে জানে যে তুই কাপড় কিনে দিয়েছিস?

না, লুকিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছি।

সেই মনুয়া মরিয়াছে। মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর মার কি হ'য়েছিল রে লছ্‌মী?

লছ্‌মী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, অসুক হ'য়েছিল দাদামশাই। মাকে কিছু খেতে দিত না, কেবল মারত।

লোকুয়ার চোখ দুইটা হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল।

আবার প্রশ্ন করিলাম, তোর মার অসুখ করলে, তুই আমাদের খবর দিলি না কেন?

মা যে মানা করত।

মনে মনে কহিলাম, সয়তানীই বটে। লছ্‌মী কহিল, মা বলত, লছমী, আমি ম'রে গেলে তোর বাবাকে খবর দিস, আর তুই এখানে থাকিস না, তোর দাদামশাইএর কাছে চ'লে যাস।—লছমী লোকুয়াকে বাবা বলিত। কেন জানিনা, এই শেষ কথায় সহসা এই প্রৌঢ় বয়সে শুষ্ক চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মনুয়ার মরণাহত মুখখানা স্মরণ করিয়া সেই মাতৃহীনা কুলী মেয়েটাকে কাছে ডাকিয়া নিলাম। তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া নিজের মনেই একবার হাসি পাইল। ইহারা যখন চলিয়া যায়, খুব দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আর কোন বন্ধনে কোন দিন জড়াইব না।

হঠাৎ টেবিলের উপর চোখ পড়িতেই দেখিলাম, বিরূপাক্ষ বাবুর হাসির গল্পের সূচনা যেন দন্ত বিকাশ করিয়া

হাসিতেছে। লছমীকে তাহার বাবার কাছে দিয়া 'চিড়িয়াখানা' লইয়া বসিলাম॰।

একটি উকিল, একটি কেরাণী, একটি ছাত্র। তিনজনে বেজায় ভাব। উকীল বলেন, কি জানেন সতীশবাবু, রাসবিহারী ঘোষ যে অতবড় হ'লেন, ও একটা mere chance। সুযোগ পেলে, ওটা, হ্যাঁ কি জানেন, এমন কিছু শক্ত নয়। কেরাণী বলেন, সুযোগের কথাটা যদি তুললেনই উকীল বাবু, তবে বলি শুনুন। সেদিন কোয়াটার্লি এষ্টিমেট্‌টা পাঠাতেই সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল। ভাবলাম, আবার ভুলটুল গেল নাকিরে বাবা। সাহেব হাতের গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে বললেন, রয়, তুমি যদি ইংলণ্ডে জন্মাতে তাহ'লে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন হ'তে। মনে মনে বললাম, সাহেব, ওসব তোমাদের মত স্বাধীন দেশেই সম্ভব। আমাদের জীবনে কি আর তেমন সুযোগ টুযোগ—

ব্যাটা পাজি নচ্ছার। একেবারে হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। ওর চাল কেটে যদি না তাড়াতে পারি আমার নাম নিতাই ঘোষ নয়, এই আপনি জেনে রাখুন ডাক্তার বাবু…বলিতে বলিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিতাই খুড়ো এবং তৎপশ্চাৎ বরুণ দেবের মত ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন। 'হাসির গল্প' ঐ পর্য্যন্ত।

কি খবর খুড়ো, অত চটছেন কেন? কাকে তাড়াবেন?

ঐ যে মশাই, কি নাম আপনাদের ঝমরু না থমরু। এতবড় বেইমান!

কেন কি করেছে?

আর বলবেন না। সে সব অতি বিশ্রী কথা। লোকটা সারা জীবন ধ'রে টাকা জমিয়ে বছরখানেক হ'ল বিয়ে করেছে। বউটা দেখতে মন্দ নয়। একদিন ছোট সাহেবের নজরে প'ড়ে গেল। ব'লে পাঠালেন, তার ঝিএর দরকার সুতরাং মেয়েটিকে চাই। ও হারামজাদা আবার গোঁয়ার কিনা, চোখ টোখ পাকিয়ে একটা কাণ্ড ক'রে এল। তারপর বোঝো ঠেলা। সাহেব ধরিয়ে নিয়ে গিয়ে জুতো দিলে। গাটা ফুলে গেল মশায়। এল আমার কাছে। বললাম, থানায় যা। কাঁদতে লাগল, আপনি চলুন খুড়োবাবু। কি করবো? গেলাম। দারোগা বললেন, এখানে হবে না, কোর্টে যাও। আমি বললাম, কুছ্ পরোয়া নেই, চল কোর্টে। এদিকে চাকরি গেল। তিনদিন না যেতেই যাদু একেবারে সুড় সুড় ক'রে গর্ত্তে ঢুকলেন। তারপর পরশু থেকে, শুনলাম, বৌটাকে সাহেবের কুঠীতে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছে। আরে, এই যদি করবি, তাহ'লে আমাকে জড়ালি কেন ব্যাটা উল্লুক? দেখুন তো সবাই জানছে, আমিই নাকি ওকে ফুসলে ফাসলে কোর্টে পাঠিয়েছি। সাহেবের কানেও কি আর কথাটা না গেছে?

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন, সব সত্যি।

আমি বলিলাম, মেয়েটা কেন থানায় গিয়ে জানাল না?

খুড়ো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বেশ আছেন! থানায় যাবে কোন্ দুঃখে? কাল দেখলাম, সাহেবের সেই আরদালীটার পিছন পিছন যাচ্ছে। খুসি আর ধরে না। আমায় তো জানেন, অন্যায় সহ্য হয় না। বললাম, দাঁত বার ক'রে যে হাসছিস বড়? মরতে পারিস না? বললে কি জানেন? হাসতে লেগেছি তো বেশ করেছি; তোমার খেয়ে হাসছি?

খুড়োর হুঁকার আগুন নিবিয়া গিয়াছিল। চেঁচাইতে চেঁচাইতে চলিয়া গেলেন। আমরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, পেটের জ্বালা যে মানুষকে পশুর চেয়েও অনেক নীচে ঠেলে দিতে পারে, তার প্রমাণ এই ঝমরু।

আমি বলিলাম, আমি ভাবছি এই বৌটার কথা। শুনেছিলাম স্বামীকে নাকি ও সত্যিই ভাল বাসত।

সেও মিথ্যা নয়। কিন্তু পেট যখন খালি, বুকটা তখনও ভরাট থাকবে, এত বড় দুরাশা আমার নেই। ভালবাসা আছে জানি। আপনাদের সাহিত্য তাকে যে সিংহাসন দিয়ে এসেছে, তাকেও অমান্য করি না। কিন্তু কোন রকমে টিঁকে থাকাই যাদের দুর্জ্জয় সমস্যা, তাদের কাছে ওর কোন অর্থ নেই। ভালবাসা তো তুচ্ছ, মনুষ্যত্বের যা কিছু ভিত্তি—এই যেমন ধর্ম্ম, নীতি, দয়া, মায়া, সব এই একটা জিনিষের উপর দাঁড়িয়ে আছে, মশায়—এই উদর।

তিনদিনের উপবাস তিন হাজার বছরের সভ্যতাকে এক নিমেষে ঝেড়ে ফেলে দেয়, এতো প্রতিদিন দেখছি।......

ডাক্তার বাবুর উত্তেজিত দীর্ঘ বক্তৃতা নিঃশব্দে শুনিয়া গেলাম। প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না; কিন্তু তাই বলিয়া মন ইহাকে মানিয়া নিতেও চাহিল না। মনুয়ার সদ্যমৃত মুখখানা বারবার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর গল্পটায় হাত দিলাম। যেমন করিয়া হোক শেষ করিতেই হইবে।...একটি উকীল, একটি কেরাণী, একটি ছাত্র। রবিবারের মধ্যাহ্ন। উকীল আর ছাত্রে তর্ক চলে। বিষয়, দেশের মুক্তি। ছাত্র গর্জ্জন করিয়া বলে, আপনি কি বলতে চান দেশের লোক এখনো জাগেনি? উত্তরে উকীল বাবু আঙুল দিয়া পাশের বিছানাটা দেখাইয়া দেন। কেরাণীর নাকের শব্দ ঘর ভরিয়া তোলে।...নাঃ আবার ওটা কি নিয়ে এলি? একটু যদি লিখতে বসবো তো অমনি—

লোকুয়া ভয় পাইয়া কার্ডখানা টেবিলের উপর রাখিয়াই চম্পট দিল। আরে এ যে মিহির! নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।

মিহির আমার ছাত্র। মাঝখানে এক বন্ধুর অনুরোধে দিন কয়েক অধ্যাপকগিরি করা গিয়াছিল। সেই সূত্রে পরিচয়। অত্যন্ত কোমল-স্বভাব। সম্প্রতি বছরখানেক আই, সি, এস হইয়া আসিয়াছে। তারপরে এই প্রথম সাক্ষাৎ। একথা, ওকথার পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন লাগছে বলত?

মিহির একটু হাসিয়া কহিল, ভালো না।

কি রকম?

মিহির কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, সেইটাই বোঝানো শক্ত, স্যর। ভালো যে লাগছে না সে কথা ব'লবারও উপায় নেই। লোকে মনে করবে চাল। সেজন্যে তাদের অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না। কেননা, বাইরে থেকে আমাদের অবস্থাটা রাজরাজড়ার পক্ষেও লোভনীয়, কিন্তু, কিছু নেই। মাঝে মাঝে দস্তুর মত হাঁপিয়ে উঠতে হয়।

মিহির চিরকালই স্বল্পভাষী। কিন্তু আজ অনর্গল বকিয়া গেল। বুঝিলাম, কতকাল উপবাস করিয়া থাকিলে লোকের এই অবস্থা হইতে পারে। রুদ্ধঘরের জমাট হাওয়ার মত এই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। অনেক কথার পর কহিল, তবে মাঝে মাঝে বেশ মজাও হয়, স্যর।

একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, মজা কি রকম?

এই যেমন সেদিন হ'ল। এক চুরি মামলার বিচার করছিলাম। খানকয়েক থালা চুরি। যাকে ধ'রে আনা হ'য়েছে, চেহারা দেখলে জেলে না পাঠিয়ে হাঁসপাতালে পাঠাতে ইচ্ছে হয়। এদিকে ষ্টেট্ আয়োজন কম করেন নি। জন দুই দারোগা, একজন ইনস্পেক্টর, উকীল, মুহুরি, পেয়াদা, সাক্ষী সাবুদ, প্রমাণ, প্রয়োগ, জেরা, রিপোর্ট—মোটের উপর একটা প্রচণ্ড ঝড়। দেখে শুনে আমার হাসিই পেতে লাগল। আসামীকে যত জিজ্ঞাসা করি, তোর উকীল কোথায় রে? সে ক্রমাগত হাত জোড় ক'রে বলে, হুজুর আমি চুরি করি নি। কি আর করি, বেশ কিছুদিনের জেল দিয়ে দিলাম।

একটু আহত হইয়া কহিলাম, জেলটা না দিয়ে পারলে না?

মিহির তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, তা' বোধ হয় পারা যেত। কিন্তু কি লাভ? জেলের মধ্যে কষ্ট যাই হোক্, খেতেও দেয়। বাইরেই ও জিনিষটার যথেষ্ট অভাব আছে।

মিহির চলিয়া গেলে, দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। রোগশয্যার অবরোধের পরে প্রথম দৃষ্টিতে পৃথিবীকে বড় সুন্দর লাগে। মনে হয় এই যেন তাহাকে প্রথম দেখিলাম। অনেক দিন পরে পাশের বাড়ীর বধূটির পরিচিত স্বর কানে আসিল, "লিটু-উ-উ-উ, উমা-আ-আ-।"

দুইটি দুরন্ত ছেলে মেয়ে, কখন কোথায় যায়। তাই যখন তখন ডাকিয়া ডাকিয়া মায়ের উৎকণ্ঠার শেষ নাই। ছেলেটি বড়। সে হাত মুখ ধুইয়া ঐ ঘরের দুয়ারে হারিকেনের আলোয় হেলিয়া দুলিয়া পড়িতে থাকিবে, রাখাল অতি দুরন্ত বালক, রাখাল র'এ আকার খএ আকার, ল, রাখাল। আর তাহারি পাশে ছোট্ট বৃন্দাবনী থালায় ভাত মাখিয়া

মা মেয়েকে খাওয়াইতে বসিবে। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি; যেন একরাশ কুন্দফুল। সারাদিন ছুটোছুটি করে; সন্ধ্যা হইলেই চোখ দুইটি ঘুমে জড়াইয়া আসে। ভাতের গ্রাস মুখে করিয়া খুকীর মাথা ঢুলিয়া পড়ে। মা জোর করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলে, এই হয়েছে। পোড়ার মুখীর কপালে একদিনও যদি রাত্তে খাওয়া জুটবে। ওরে, ও খুকী, ত্যাখ্ ত্যাখ্ চেয়ে ত্যাখ, ত্যাখ কে এসেছে......ঐ-ঐ-ঐ, আয় চাঁদ নড়ে চড়ে, ট্যাংরা মাছের দাঁড়ি ধ'রে ....বলিয়া মেয়ের মুখে ভাত গুঁজিয়া দেয়। ঐ কল্যাণী বধূটির ছোট্ট একটুখানিক ঘরকান্না, উহার মধ্যে কীই বা আছে? কিন্তু ঐ দিকে যখন চাহিয়া দেখি, আমার এই দায়িত্বহীন গ্রন্থরুদ্ধ, ভাববিলাসময় জীবনের সমস্ত শিক্ষাভিমান যেন ছায়ার মত মিলাইয়া যাইতে চায়। লোভী মন বারবার করিয়া বলে, একটি নীড় চাই, একটি সুখসুপ্ত স্নেহনীড়। অমনি ক্ষুদ্র কোমল, স্নিগ্ধ প্রেমময়ী পত্নীর নিত্যচঞ্চল কল্যাণ হস্তে প্রাণময়। একটি দরিদ্র ঘরের অশিক্ষিতা বধূ, তাহার মধ্যেও যে এমন বিপুল ঐশ্বর্য্য, কোনদিন ধারণা করি নাই। মেয়ে তো নয়, যেন একটি আনন্দোচ্ছল কর্ম্মের ফোয়ারা। সেই ভোর বেলায় কখন ঘুম ভাঙে। রাঁধিয়া বাড়িয়া স্বামীকে ছেলে মেয়েকে খাওয়াইয়া, ঘর দুয়ার ঝাড়িয়া মুছিয়া কাজ যেন উহার ফুরাইতে চায় না। বিকালবেলা ঐ দুয়ারের পাশটিতে একখানি কাঠের আয়না পাতিয়া ও চুল বাঁধিতে বসে। ছেলে মেয়ে দুইটি কোনদিন কলরব করিয়া খেলা করে, কোনদিন মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, হয়তো ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প শোনে। মাঝে মাঝে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া আব্দার করে মা, একটা গান কর। কর না? হুঁ আচ্ছা না ক'রলে,—ভা-রী তো......মা মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া গম্ভীর মুখে চুমো দিয়া হাসি ফুটাইয়া তোলে, ছেলেটিকে কাছে টানিয়া গলা জড়াইয়া ধরে। তারপর গান করে। আমার জানলায় তাহার মৃদুতানটুকু মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসে। কী গান জানিনা, কিন্তু চোখের কোনে জল আসিয়া পড়ে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, এ জীবনে তো হইল না, যদি আবার কোনদিন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসি, যেন ঐ কল্যাণী মায়ের কোলে শিশু হইয়া জন্মাই, অমনি মুখের দিকে চাহিয়া ভাটিয়াল সুরের গান শুনি।

চুলবাঁধা হইয়া গেলে সন্ধ্যা আসে। কল্যাণী নিজহাতে শাঁখ বাজায়; ধূপের ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া তোলে। ঘরের ঐ দিকটায় বোধ হয় দেবদেবীর মূর্ত্তি কিম্বা পট আছে। প্রতিদিন ঐখানে ও গলায় আঁচল দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া প্রণাম করে। সেই ভক্তিনত দেহের অপরূপ ভঙ্গিমাটি আমার দুই চোখ ভরিয়া তোলে। অজ্ঞাতসারে দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া উহারই সঙ্গে উহার দেবতাকে প্রণাম করি।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। অসমাপ্ত গল্পটায় আবার হাত দেবো কিনা ভাবিতেছি এমন সময় নীচ থেকে সতীশ বাবুর প্রেরিত মোটরের হর্ণ শোনা গেল। দীর্ঘকাল অবরোধের পর সে যেন সত্যই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'। সময় এবং সুযোগ অনুকূল হইলে যমুনা-পুলিনের বংশীধারীর চেয়ে এ যুগের মোটর-ড্রাইভারদের ক্ষমতা যে কোন অংশে কম তাহাতো মনে হয় না।

কয়েক মাইল ছুটিয়া শীঘ্রই উজানতলীর কালীবাড়ীতে আসিয়া পড়িলাম। অতিশয় জাগ্রত-দেবতা। এখানে পূজা দিয়া পূজারি-প্রদত্ত মাদুলী ধারণ করিলে বন্ধ্যানারী সন্তানবতী হইয়া থাকে। তাই বহু দেশদেশান্তর থেকে বহু পূজার্থিনী এখানে ভিড় করিয়া থাকেন। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, একখানি গম্ভীরদর্শন প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, এবং চারিদিকে তাহারই চেহারানুযায়ী অত্যন্ত জমকালো পোষাকের ভৃত্যদল সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিতেছে। একটু পরেই আপাদমস্তক ঐশ্বর্য্যোমণ্ডিতা একটি মহিলা মোটরে আসিয়া উঠিলেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তিনী দাসীর অঞ্চল হইতে দুই হাতে ভরিয়া নানাপ্রকারের মুদ্রা চারিদিকে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

পুণ্য কিম্বা পুত্র-কামনায় দান করিতে অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন নির্লিপ্ত ঔদাস্য-ভরে টাকা ছড়াইতে

কোথাও দেখি নাই। কৌতূহল হইল, এবং আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই যাহা দেখিলাম, বোধ হয় ভূত দেখিলেও অতটা বিস্মিত হইতাম না। আজ কাহার মুখ দেখিয়া রাত পোহাইয়াছিল জানি না, সমস্ত দিন যত সব আশ্চর্য্য এবং অচিন্তিত ঘটনার যেন বান ডাকিয়া গিয়াছে। মহিলাটিও তেমতি বিস্মিত চোখে আমার দিকে চাহিলেন এবং শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, মহীন দা, তুমি?

কহিলাম, হ্যাঁ, আমি।

এখানে?

জানাইলাম, আমার বাড়ীটা এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে।

তিন মাইল? তবে চলনা, একবার ঘুরে যাই।

অনেক দিনের কথা। ভালো করিয়া মনেও পড়ে না। বাঁকুড়ায় পাশাপাশি বাড়ীতে আমরা ছিলাম। দুই পরিবারে কত ভাবই ছিল! প্রতিমার বাবা ছিলেন ওখানকার সব্‌জজ। পড়া জিজ্ঞাসার ছল করিয়া মারিতে মারিতে ইহাকে কতদিন একেবারে আধমরা করিয়া ফেলিয়াছি। তবু ইহার হাজার রকম দুষ্টামির অন্ত ছিল না। তারপর এক মস্তবড় জমিদারের পুত্রবধূ হইয়া ও কোথায় চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে আমরাও চলিয়া আসিলাম। মাঝে দুই একবার দেখা হইয়াছে। কত কাল পরে এইখানে এই অবস্থায় আবার দেখা হইবে কে ভাবিয়াছিল?

দক্ষিণের বারান্দায় দুইখানি চেয়ার লইয়া বসিলাম। অপরাহ্নের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। প্রতিমা কহিল, তুমি বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ মহীনদা।

বলিলাম, হয় তো হ'বে। কিন্তু মহেশপুরের রাণীর এই বয়সে এই অবস্থা—চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হ'ত না। ব্যাপার কি প্রতিমা? অসুখ করেছিল?

কেন, আমি কি সত্যিই রোগা হ'য়ে গেছি নাকি? বলিয়া ডান হাতখানা তুলিয়া দেখিতে লাগিল।—না, মহীনদা, তোমারই ভুল হ'চ্ছে। মহেশপুরের রাণীকে ভালো থাকতেই হবে। তাঁর অসুখ করতে পারেনা।

শ্লেষাক্ত তরল কণ্ঠেও একটি অস্পষ্ট ক্লান্তির সুর চাপা রহিল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। প্রতিমা রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। ওপারে দোতলার বারান্দায় কল্যাণীর ছেলেটি গান ধরিয়াছিল। কিছুক্ষণ লোভীর মত সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রতিমা কহিল, ছেলেটি কাদের মহীনদা? বেশ সুন্দর তো।

ছেলেটির পরিচয় দিতে গিয়া, কল্যাণী এবং তাহার ঘরকন্নার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে সুন্দর চিত্রটি ছিল, তাহারও খানিকটা আভাস দিয়া ফেলিলাম। প্রতিমা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া শুনিতে লাগিল। সহসা এক সময়ে লক্ষ্য করিলাম চোখের কোণ হইতে দুইটি জলস্রোত গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে জানিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে গেল। উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া, দেয়ালে টাঙানো ছবি কয়খানি, আলনার উপর ঝুলানো কাপড়, আলমারীর মধ্যে চায়ের সরঞ্জাম—ইত্যাদি তুচ্ছ অতুচ্ছ সমস্ত জিনিষগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, তোমার ঘরখানা ভারী সুন্দর, মহীনদা। আমি হাসিয়া ফেলিলাম। একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, তুমি হাসলে যে? বলিলাম, কেমন যেন ঠাট্টার মত লাগছে।

মাথা নাড়িয়া কহিল, তা বটে! মহেশপুরের রাণীর মুখে ওটা ঠাট্টার মতই শোনায়। মাঝে মাঝে ঐ রাণীর মর্য্যাদাটা বজায় রাখতে পারি না। ভুল হ'য়ে যায়।—বলিয়া কাছে আসিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে কহিল, কিন্তু সত্যি কথাটা কি জানো মহীনদা?

কি?

এই রকম ... র যদি পেতাম, তাহ'লে নিশ্চয়ই বলছি তোমার ঐ কল্যাণীর মত ছোট্ট ক'রে সংসার গুছিয়ে আবার গোড়া থেকে সুরু ক'রতাম। কিন্তু সে আর হবার যো নেই।

সে কণ্ঠস্বরের পরে আমার মুখে আর উত্তর জুটিল না। কিছুক্ষণ পরে প্রসঙ্গটা ফিরাইবার জন্য বলিলাম, তোমরা কোলকাতা এসেছ কদ্দিন? যোগীন বাবুও এসেছেন বোধ হয়?

না, তিনি আসেন নি।

তিনি কোথায় আছেন?

কিছুদিন আগে শুনেছিলাম লছমন্ ঝোলায়। কথা ছিল, সেখান থেকে হরিদ্বারে তাঁর গুরুজির ওখানে যাবেন। বোধ হয় এতদিনে গিয়ে থাকবেন। কথাটা নিতান্ত সহজভাবেই বলিয়াছিল; কিন্তু শেষের দিকে কেমন একটু ঔদাস্যের ক্লান্ত সুর গোপন রহিল না।

আমি, যেন লক্ষ্য করি নাই এমনি ভাবে বলিলাম, ওঃ সেইজন্যে বুঝি তুমিও ধর্ম্ম করতে বেরিয়ে পড়েছ?

কি করবো? স্বামীর যোগ্য হবার চেষ্টা করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। কি বল?—বলিয়া একটু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। সেই একটি মাত্র মৃদু-হাসির মধ্য দিয়াই এই পট্টবাস-পরিহিতা ব্রতচারিণী তরুণীর অনেকখানি প্রচ্ছন্ন দৈন্য আমার কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, তোমার তো ছেলে মেয়ে নেই,—একটা মেয়ে নেবে?

প্রতিমা কাঙালের মত কহিল, নেবো।

লছমীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম, কাল ওর মা মরেছে; মরবার সময় আমারি হাতে ওকে দিয়ে গেছে। আর কারো কাছে ওকে দিতে পারি এ ধারণা আমার একটু আগেও ছিল না। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হ'ল দিতে পারি। প্রতিমার চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। লছমীকে কাছে ডাকিয়া তাহার তৈলহীন কোঁকড়া চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে কহিল, কিন্তু আমার ঘরে ও বাঁচবে তো?

বলিলাম, তা যদি না বাঁচে, তা'হলে কোন ঘরেই বাঁচবে না।

পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, লোকুয়া কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কি রে?

কাঁদিয়া ফেলিল, বাবু, আমার মনুয়ার শেষ চিহ্ন।

কহিলাম, কিন্তু, এ মেয়ে তো তোর নয়?

তাহার কান্না বাড়িয়া গেল। প্রতিমা সবই বুঝিল। এঘরে আসিতেই কহিল, না মহীন্দা, ভেবে দেখলাম, কুলীদের মেয়ে নিলে রাণীর মর্য্যাদা বজায় থাকবে না। ওকে তোমরাই রাখো—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দশমী রাত্রির মৃদু জ্যোৎস্নায় যখন সে গাড়ীতে গিয়া উঠিল, চারিদিকের সন্ত্রস্ত দাসদাসীর মধ্যে তাহাদের এই ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণীর পরিম্লান মন্থর দেহের দিকে চাহিয়া নিঃশ্বাস চাপিতে পারিলাম না। কোথায় কোন বড়লোকের পাল্লায় পড়িয়াছিলাম, দুঃখী বলিয়া কোন আলাদা জাত নাই। সেই কথাটাই থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতে লাগিল।

শব্দহীন গাড়ীখানা ধীরে ধীরে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাড়ীর সুমুখে আমার নিজের হাতে সাজানো ঐ বাগানটি, এবং তার পরেই রাস্তার পরপারে ঐ প্রশস্ত প্রান্তর চিরকাল নূতন নূতন আনন্দ নিয়াই তো আমার চোখে দেখা দিয়াছে। আজ মনে হইল, উহার প্রত্যেকটি রেখা যেন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। এই জরাজীর্ণ পৃথিবীর বুকের ভিতরে যেন হাজার হাজার বছরের অকথিত অভিযোগ জমাট হইয়া আছে। ঐ তৃণলতায়, ঐ শিউলি গাছটার কচিপাতায় তাহারি অন্তহীন কাহিনী এই মুহূর্ত্তে মুখর হইয়া উঠিবে।

পরদিন বিরূপাক্ষ বাবু আসিলেন। সমস্ত দিনের ঘটনাগুলি তাঁহার কাছে আগাগোড়া ব্যক্ত করিয়া আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিলাম। তিনি গম্ভীর হইয়া শুনিলেন; পরে কহিলেন, আপনার গল্পের নাম কি দিয়েছিলেন?

বলিলাম, চিড়িয়াখানা।

তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, চমৎকার! এক কাজ করুন। নাম ঐ থাক। তার নীচে আপনার ঐ কাহিনীগুলো একটার পর একটা জুড়ে দিন।

আমি ত অবাক! কহিলাম, তার মানে?

মানে অতি সোজা। একখানা চমৎকার প্রহসন হবে।

বলাবাহুল্য, বিরূপাক্ষ বাবুর প্রস্তাবে রাজী হইতে পারি নাই। তাই আহারান্তে আজ আবার সেই চিড়িয়াখানা লইয়া বসিয়াছি,—একটি উকীল, একটি কেরাণী, একটি ছাত্র......।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগবো আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুল্‌বো না আর সহজেতে,—
সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে-ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
মাতাও যে-ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে,
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্‌।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II {ধা -া না -া । -া -া -পা -ধা I
ব ০ জ্রে ০ ০ ০ ০ ০

ধা -া ধর্রা র্সা । র্সা -া র্সা না I
ব ০ জ্রে তো মা র্ বা জে

I ধনা -া ধপা -া । -া -া -া -া
বাঁ ০ শী ০ ০ ০ ০ ০

I (র্গা -মা -পা -ধা । না -র্সা -র্রা -র্গা I
বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্রর্সা -া -া -া । -া -া গা মা
জে ০ ০ ০ ০ ০ সে কি

I মা -পা পা -া । পা -া -া -া)} I
স ০ হ জ্ গা ন্ ০ ০

I পমা -পা পা পা । পা -া -া -া
সে ই সু রে তে ০ ০ ০

I পা -ধা ধা ধা । ধনা -া -ধা -পা I
জা গ্ ব আ মি ০ ০ ০

I পনা -া -া -া । -ধা -া -পা -া I ধা -র্রা র্রর্সা র্সনা । ধনা -া ধপা -া II
দা ০ ০ ০ ০ ও ০ দা ও মো রে সে ই কা ন্

I ধা -র্সা র্সা -না । র্রর্সা -া -া -া I -া -া -া -া । -া -া পা ধা I
ভু ল্ ব ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I ধা -র্রা র্রা -র্সা । র্সা -া র্সা -র্রা I র্রনা র্সা র্সা -না । র্সনা -ধা পা ধা I
ভু ল্ ব ০ না ০ আ র্ স হ জে ০ তে ০ আ মি

I ধা র্সা র্সা -না । র্রর্সা -া -া -া I র্সা -র্গা -া র্গা । র্গা -র্রা র্রা -া I
ভু ল্ ব ০ না ০ ০ ০ সে ই ০ প্রা ণে ০ ম ন্

I র্রা -র্গা -া র্রা । র্রা -া র্সা -া I র্সনা -া -া র্রা । র্সা -া র্সা -র্রা I
উ ঠ্ ০ বে মে ০ তে ০ মৃ ০ ০ ত্যু মা ০ ঝে ০

I র্রনা -র্সা র্সা -না । ধনা -া ধপা -া I পা -না না -া । ধনা -া ধা -া I
ঢা ০ কা ০ আ ০ ছে ০ যে ০ অ ন্ ত ০ হী ন্

I পা -া -া -া । -া -া গা মা I মা -পা পা -া । পা -া -া -া II
প্রা ০ ০ ণ্ ০ ০ সে কি স ০ হ জ্ গা ০ ০ ন্

I সা -া সা -া । রা রা গা -া I মা -া পা -ধপা । মগা -া -া -া I
সে ০ ঝ ড়্ যে ন ল ই আ ০ ন ন্ দে ০ ০ ০

I গা -া গা গা । মা -া মা -পা I পা -া -া -া । -া -া -া -া I
চি ত্ ত বী ণা র্ তা ০

I পা -দা দা -া । দা -া দা -ণদা I দপা ণা ণা -া । দা -া পা -দা I
স প্ ত ০ সি ন্ ধু ০ ০ দ শ দি ০ গ ন্ ত ০

I দর্মা -া পা -া । পা -দা দৃপা -া I মপা -া মগা -া । -া -া -া -া I
মা ০ তা ও যে ০ ঝ ঙ্ কা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্গা -া র্গা -া । র্গা -া র্গা -া I I র্গর্মা -র্পা -া র্পা । র্পর্মা -া র্গা -া I
আ ০ রা ম্ হ ০ তে ০ ছি ন্ ০ ন ক ০ রে ০

I র্গা -র্পা -া র্পা । র্পর্গা -া র্গা -া I র্গর্রা -র্গা -র্মা র্মর্গা । র্রর্গা -া র্রর্সা -া I
সে ই ০ গ ভী ০ রে ০ ল ও ০ গো মো ০ রে ০

র্সা -র্গা র্গা -া । র্গর্রা -া র্সা -া I নর্সা -া র্সা -না । ধনা -া ধপা -া I
অ ০ শা ন্ তি র্ অ ন্ ত ০ রে ০ যে ০ থা য়্

I পা -না -া না । না -া নধা -না I ধপা -া -া -া । -া -া গা মা I
শা ন্ ০ তি স্ব ০ ম ০ হা ন্ ০ ০ ০ ০ সে কি

I মা -পা পা -া । পা -া -া -া II II
স ০ হ জ গা ন্ ০ ০

নহি আর পরবাসী

শ্রীসুবোধ দাশ গুপ্ত

সন্ধ্যা তারার চাহনি হেরিয়া তোমারে যে মনে পড়ে,—
সুদূর বিদেশে পরবাসী হয়ে ছিনু মোরা দুই ঘরে ;
পাশাপাশি নয় তবু মনে হত আছি যেন কত কাছে,—
আকাশের টানে জাগিছে জোয়ার উতলা সিন্ধু মাঝে।
শৈলশিখরে অস্তে নামিত সবিতা, দিনের আলো,
মনে মনে শুধু ভাবিতাম বুঝি তুমি মোরে বাসো ভাল ;
আমরা দুজনে রক্তিম সাঁঝে সিন্ধুর কূলে কূলে
হেরিতাম বসি সাগরনৃত্য উদ্দাম ঢেউ তুলে,—
আর হেরিতাম সুদূরের আলো ধীরে ধীরে নিভে আসে,
তোমার চোখেতে তখন হেরেছি সন্ধ্যা তারাটি হাসে ;
আমরা দুজনে স্নেহ মমতায় বেঁধেছিনু সেথা বাসা,
আর বেঁধেছিনু মনের গোপনে ভয়ে ভীত ভালবাসা।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলা মায়ের হাসি !
বহুদিন পরে এসেছি ফিরিয়া নহি আর পরবাসী।
ছোট গ্রামখানি স্বপনের মত শান্ত শ্যামল স্নেহে
নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছে আমায় ছোট একখানি গেহে।
আজো হেরি আমি শীতললক্ষ্যা নেচে নেচে চ'লে যায়,
আর হেরি দূরে আকাশের আলো ধীরে ধীরে গ'লে যায় ;
রক্তমায়ার চঞ্চলতায় অবুঝ হতেছে মন
কোন সুদূরের ছায়াপথ বাহি যেতে চায় অনুখন ;
সন্ধ্যা তারাটি সেদিনের মত চকিত চরণ ফেলি
আমাকে দেখিয়া থমকি দাঁড়ায় নীরব চাহনি মেলি।
বুঝিবা আমারে চিনিয়া ফেলেছে, ও যে আমাদের মিতা,
তোমার চোখে যে এত আলো ছিল ওর চোখে দেখেছি তা ;
পূর্ণিমা নিশি থম্ থম্ করে বুঝিবা স্বপন ঘোরে—
শুধু তুমি আজ কতদূরে আছ কেহ তা বলে না মোরে।

হেমন্তের সন্ধ্যা

ইটালীর রোম সহরে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমির আমানুল্লা

সুইজারল্যাণ্ডের একটি প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় এই জার্ম্মান কুকুরটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।
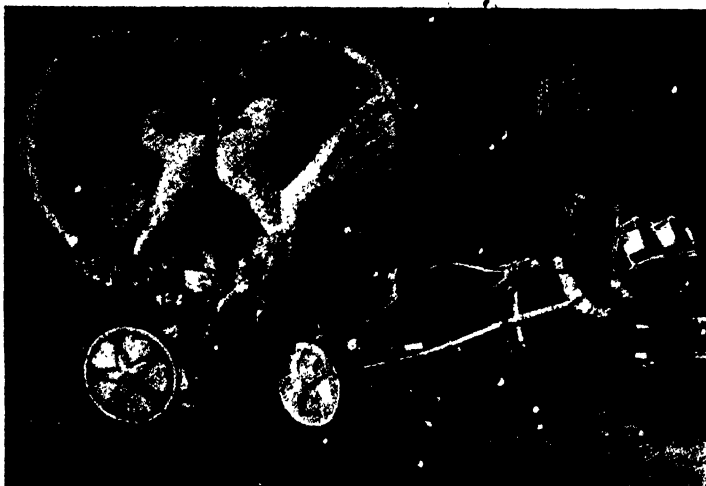
মস্কোর বিখ্যাত পুষ্পোৎসবের একটি দৃশ্য
দুইটি পক্ষী পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিতেছে
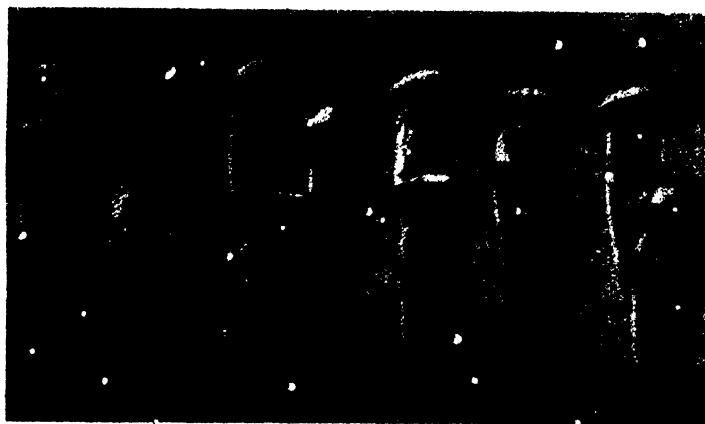
বেঙের ছাতা,
বেয়ার্ণকাস্তনে একটি গীতোৎসবে হেমন্ত ঋতুর নির্দ্দেশক একটি দৃশ্য।
অনেকগুলি সুন্দরী যুবতী বেঙের ছাতার রূপ ধরিয়া অবস্থিত।

এডিসন্ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী

বিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ এডিসন্ তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য আমেরিকার যুবকদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া মিঃ উইলবার হাষ্টন্‌কে মনোনীত করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচন পরীক্ষায় মিঃ ফোর্ডও একজন বিচারক ছিলেন। কতকগুলি প্রশ্ন ছাপাইয়া প্রকাশিত করা হইয়াছিল—প্রতি-যোগিগণ তাহার উত্তর লিখিয়া বিচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।
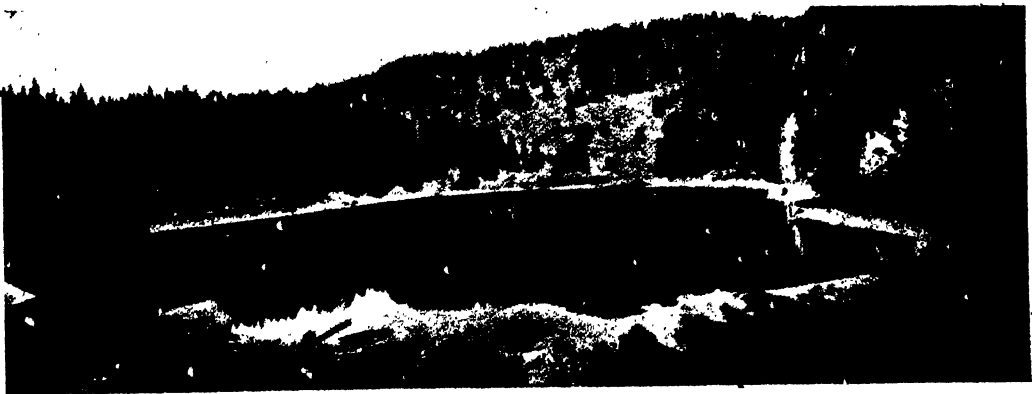
পাইন তরু বেষ্টিত সুইজারল্যাণ্ডের একটি নির্জ্জন হ্রদ

আধুনিক কবিতা

শ্রীযুক্ত অভিনব গুপ্ত

১

শব্দ, অর্থ ও তদতিরিক্ত একটি ইঙ্গিত—মোটামুটি, কবিতার কারবার ইহা নিয়াই। মিল্ ও ছন্দ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা কবিতার পক্ষে অপরিহার্য্য নয়, কবিতার রস—শব্দ ও তাহার ব্যঞ্জনা, অর্থ ও তাহার গভীরতা, ছন্দ ও তাহার উচ্চারণ-মাধুর্য্য—সমস্ত কৃত্রিম আয়োজনকে অতিক্রম করিয়া একটি বচনাতীত ইঙ্গিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই ইঙ্গিতটিই কবিতার আত্মা।

অঙ্ক কষিয়া লজিকের মত কবিতার সংজ্ঞা-নিরূপণ চলে না। প্রীতিদায়ক ভাবের সঙ্গে 'মিউজিক্' মিশিলেই খাঁটি কবিতার উৎপত্তি হইবে—এলেন্ পো'র এই মত সম্পূর্ণ সত্য নহে। কবিতায় বিষয়বস্তুর উর্দ্ধে এমন একটি আয়ত্তাতীত অর্থ থাকা চাই যাহা আমরা বুদ্ধি দিয়া সম্পূর্ণ ধরিতে পারিব না, অথচ তাহার সম্বন্ধে মনে একটি অচেষ্টাসাধ্য সহজ প্রতীতি জন্মিবে। কবিতার আবেদন কতকটা প্রার্থনার মত রহস্যময়।

ভাবের যথোচিত প্রকাশের জন্য সার্থক শব্দ-প্রয়োগের দরকার আছে; কিন্তু একমাত্র প্রসাদগুণই কবিতার মূল্য নির্দ্ধারক নহে। শব্দের অর্থের যে একটা ব্যাপকতা আছে তাহা সীমাবদ্ধ, কবিতার রস সে সীমাকে বারে বারে লঙ্ঘন করিয়া একটি স্বতন্ত্র মায়া বিস্তার করে। সেই স্বতন্ত্র মায়া বা রহস্যটুকুর মধ্যেই কবিতার নিগূঢ় পরিচয় রহিয়াছে। কবিতা বোধগম্য বিচার-বিতর্কের বিষয়ীভূত নহে; আমাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়া তাহাকে অধিকার করা যায় না। কবি নিজের অগোচরে শব্দ ও তন্নিহিত ভাবের সাহায্যে তাঁহার অন্তরাত্মার যে রূপ অভিব্যক্ত করেন কবিতার মধ্য দিয়া সেই অন্তরালবাসী আত্মার সঙ্গে আমাদের অস্পষ্ট পরিচয় ঘটে। এবং সেই সুমধুর ও অনির্ব্বচনীয় স্পষ্টতাহীনতার মধ্যেই কবিতার মাধুর্য্য! যাহা আমাদের অনুভূতিতে অস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে, উজ্জীবিত কল্পনাদ্বারা তাহা স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য আমাদের আয়াসের আর অবধি থাকে না। এবং সেই ব্যর্থ আয়াসের মধ্যেই আমরা একটি বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ লাভ করি।

২

প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই অস্পষ্টতার কারণ কি? কারণ খুব স্পষ্ট। সমস্ত শব্দেরই একটি বিশেষ পটভূমিকা বা পরিবেষ্টনী থাকে, অন্য শব্দের সংসর্গে তাহা আর স্পষ্ট থাকিতে চাহে না;—দ্বিতীয়ত, কবির ভাব কখনো এত বিরাট ও গভীর, কখনো এত রহস্যপূর্ণ ও সূক্ষ্ম হয় যে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভাষায় বর্ণিতব্য নহে। তাই, ভাবের আবির্ভাবের আগে কবির অন্তরের অবস্থাটুকু আমরা তাঁহার কবিতায় প্রকাশিত দেখি। ভাব ও তাহার প্রকাশের মধ্যে চিত্তের একটি ক্ষণস্থায়ী বিরাম বা নিবৃত্তি আছে, তাহাই অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে। গদ্যের সঙ্গে কবিতার এইখানেই ভেদ রহিয়াছে, গদ্যে ভাব নিশ্চিত তাই তাহার প্রকাশও নির্ভুল। কবিতার বেলায় দেখিতে পাই ভাবে আবেগ সংক্রামিত হইয়াছে—তাই প্রকাশের সঙ্গে অনন্যতা রক্ষা করিতে গিয়াই তাহা অনির্ব্বচনীয় রূপে অস্পষ্ট হইয়া উঠে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কোলরিজ্-এর অসমাপ্ত **Kubla Khan** কবিতাটি নেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে এমন কতগুলি শব্দ আছে যাহা আমাদের মনে এক অপরিচিত যুগ, রাজ্য ও সভ্যতার ছবি আঁকিয়া দেয়; কিন্তু কবিতাটির মাধুর্য্য ঐ শব্দগুলির 'মিউজিকে' নিহিত নহে—আমাদের মনে যে

একটি অপরিচয় ও বিস্ময়ের মোহ বিস্তার করে সেই মোহে। শব্দের বাতায়নে আমরা এক নূতন জগৎ দেখি—সেই দেখানোর মধ্যেই কবিতার সার্থকতা। শব্দসম্পদই কবিতার সম্পদ নহে,—দৃষ্টান্ত, ব্লেইকের কবিতা, এ, ই, হাউস্‌ম্যানের কবিতা।

Trevelyan-এর মতে ছন্দের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক আবেগ সৃষ্টি করা-ই কবিতার কাজ। হ্যাজ্‌লিট্‌-ও এই কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে কবির আবেগ-সৃষ্টিটা জ্ঞানকৃত নহে। ছন্দ বন্ধনের মত দেখাইলেও কখনো কখনো স্রোতের প্রাবল্য সৃষ্টি করে; কিন্তু কবিতার রসবিচারে ছন্দ গৌণবস্তু। Verlaine ও হুইট্‌ম্যান্‌ তাহার উদাহরণ।

নিবিড় আবেগের জন্ম কবিজীবনের একটা বিস্ময়কর ঘটনা। ভাষার যতদূর ক্ষমতা আছে তাহাতেই তাহার অসম্পূর্ণ প্রকাশ হয়,—শব্দ, অর্থ বা ছন্দ সেই আবেগের অকিঞ্চিৎকর বাহন মাত্র। কবিতার উদ্দেশ্য অন্যের মনে আবেগ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া নহে, বরং অন্যের মনে যে আবেগ আছে তাহাকেই প্রশমিত করা। সেই জন্য, কবিতার জন্যই কবিতা হওয়া উচিত,—নীতিশিক্ষা দিবার জন্য নহে। উদ্দেশ্যমূলক কবিতার মধ্যে একটা কাঠিন্য বা স্পষ্টতা থাকে বলিয়াই তাহা রসের অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করিতে পারে না; সেই কারণে তাহাকে কবিতা-হিসাবে ব্যর্থ বলা যাইতে পারে।

৩

জর্জ্জ মূর্ তাঁহার **Anthology of Pure Poetry**-তে বলিয়াছেন যে, খাঁটি কবিতার জন্ম সেই বস্তু বা ভাবরাজ্যের প্রশংসা হইতে, যাহা অবিনশ্বর। অর্থাৎ, এমন সব জিনিস লইয়া কবিতা রচনা করা উচিত যুগান্তরেও যাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে না। ভাব প্রতিনিয়ত বদলাইয়া যাইতেছে,—ধর্ম্ম, দেশপ্রেম, নৈতিকতা—সমস্ত কিছুই যুগে যুগে নূতন মুখোস পরিতেছে; তাই আমরা প্রতি যুগে পুরাতন যুগের সঙ্গে রচনার রীতি ও কথাবস্তু এবং ভাব নিয়া সঙ্ঘর্ষ বাধিতে দেখি। যাহাকে আমরা আজ পূর্ব্বতন সাহিত্যরীতির সংস্কাররূপে গ্রহণ করিয়া আন্তরিকতার সহিত অনুশীলন করি, দশ বৎসর পরে আবার তাহা সংস্কৃত, ও পরিশেষে বর্জ্জিত হয়। অতএব, তাহাকেই আমরা খাঁটি কবিতা বলিব যাহার ভাব সেই দশ বৎসর পরে-ও জরাজীর্ণ হইয়া উঠিবে না,—অর্থাৎ যে ভাব শাশ্বতকালের তাহাই কবিতায় ব্যবহার্য্য।

মূর-এর এই কথাগুলিতে ত্রুটি থাকিলেও ভাবিবার বিষয় আছে। ত্রুটি এই যে, কোনো প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেই যুগের প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব নহে। রচনায় ব্যক্তিকে পাইতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিকতাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। তাই, বিশেষ কালের বিশেষ ভঙ্গী বা ঝোঁক্‌কে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির নিজস্ব ভাষা দিয়াই সাহিত্যের সৃষ্টিসাধন, জীবনের সচেতনতাই সাহিত্যের মূলগত সত্য। অতএব পারিপার্শ্বিক জীবনকে যে-সাহিত্য অস্বীকার করে তাহা নির্ব্বল, মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়ে।

কবিতার উপরে যুগের প্রভাবের সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিই। হ্যাম্‌লেট্‌ তাহার প্রেম-কবিতায় লিখিল—"Doubt that the stars are fire!" সত্য কথা বলিতে কি, শেইক্‌স্‌পীয়ারের দিনে সবাই তাই সন্দেহ করিতেছিল।

হিরোয়িক্‌ কাপ্‌লেট্‌-এর মৃত্যু দেখিয়া কোন বিশেষ যুগের ভঙ্গীর চিরস্থায়িতা সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকে না। ভঙ্গীটা পোষাকমাত্র, জীর্ণতা তাহার অবশ্যম্ভাবী—তাই বলিয়া ড্রাইডেনের পরিচ্ছন্ন মার্জ্জিত তীক্ষ্ণতাবাচক কবিতার কি সত্যই মৃত্যু হইয়াছে?

৪

তবে, কখনো কখনো বিশেষ ভঙ্গীতে বা বিশেষ কথাবস্তু নিয়া কবিতা রচনা করাটা একটা ফ্যাশান্‌ হইয়া দাঁড়ায়। রেনাসাঁর সময়ে ইংলণ্ডে এই রকম একটা অবস্থা হইয়াছিল। যাহা কিছু গ্রীসদেশীয় তাহাই অনুকরণ করিতে হইবে, গ্রীক্‌ পাণ্ডুলিপিতে যে-সব রচনার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাই আদর্শ! সাহিত্যে এইরূপ রুচি-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আরো দেখানো যাইতে পারে।

আধুনিক কালের কবিকেও যদি বর্ত্তমান যুগের প্রভাব মানিয়া লইতে হয় তবে তাহাতে কাহার আপত্তি হইবে? বর্ত্তমানের কবির মোহ টুটিয়া গিয়াছে, ধূলিলিপ্ত রুক্ষ রাজপথের উপর ঝটিকাবিদীর্ণ আকাশের নিচে সে নিঃসঙ্গ পথিক,—একা চলিয়াছে। নিজের আদর্শের প্রতি সে বিশ্বাসবান হইয়াও সে ইহা আশা করে না যে, তাহার আদর্শে অন্য সবাই অনুপ্রাণিত হইবে,—কেননা আদর্শের স্বাতন্ত্র্যের উপর সাহিত্যের বলশালিতা ও বিস্তৃতি নির্ভর করিয়া আছে। এই যান্ত্রিক সভ্যতার জাঁতাকলে সে বন্দী, ঘূর্ণ্যমান চাকার তলায় সে একটি রঙীন পেলবপক্ষ প্রজাপতি মাত্র।

তাই এই পৃথিবীব্যাপী নিরানন্দতায় তাহার বাণী বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে বিতৃষ্ণার কবি, হতাশার কবি, অবিশ্বাসের কবি। এই মতবাদে তাহার সম্পূর্ণ আন্তরিকতা আছে, দৃঢ় ও নির্লজ্জ সত্যভাষণ আছে,—প্রকাশের সৌকুমার্য্য হইতেও তাহার কবিতা বঞ্চিত নহে। একমাত্র নবীনতর বিষয়বস্তুর প্রবর্ত্তনে বা অপরিচিত বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণার জন্যই কি তাহাকে কবির সভায় আসন করিয়া দিব না? Paul Valéry 'সাপ' ও ডি, এইচ্ লরেন্স 'মশা' লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন সেইজন্য কি তাঁহাদের রচনা সাহিত্যপদবাচ্য হইবে না? টি, এস্, ইলিয়ট্ ছন্দের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছেন বলিয়াই কি তাঁহার কবিতা বাতিল করিয়া দিতে হইবে?

৫

ছন্দ যেমন কবিতার রসের মূল্য নির্দ্ধার করে না, তেমনি কবিতার রসবিচারে বিষয়বস্তুরও কোনো মূল্য নাই। কবিতায় পৌরুষ থাকিলেই যেমন তাহা খাঁটি কবিতা হয় না, তেমনি 'রজোগুণের' আধিক্যহেতু কবিতা অসার হইবে ইহা যুক্তি নহে। সব কিছু থাকা বা না-থাকা সত্ত্বেও কবিতা কবিতা হইল কিনা তাহাই দেখিবার কথা,—তাহাতে আকাশ আছে না ডোবা আছে, অরণ্য আছে না ধূলিরুক্ষ রাজপথ আছে সেটা কবিতার কথাবস্তুর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, রসজিজ্ঞাসার নহে।

আধুনিক কবি ছন্দকে কবিতার অপরিহার্য্য ভূষণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, তবে কবিতার একটা ঢঙ বজায় রাখিবার জন্য কখনো কখনো ছন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে বৈ কি। তাহার মতে, কবিতার অর্থ--গভীর আন্তরিকতা, ও পরিমিত ভাষায় তাহার সুধু সংযত প্রকাশ —ছন্দের সঙ্গে তাহার নাড়ীর নিগূঢ় সম্বন্ধ নাই। কবির চিত্তে যখন কোন বিপুল আবেগের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে তখন তাহার প্রকাশকালে সে যে-ছন্দ মানিয়া চলে তাহা কবিতার কৃত্রিম স্বরবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অনুকারী নহে।

ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতে গদ্য ও কবিতার ভাষার কোনই পার্থক্য থাকা উচিত নহে—চাষার মুখের ভাষা দিয়াও চমৎকার কবিতা হইতে পারে। তাই বলিয়া জোর করিয়া কবিতায় বহুল পরিমাণে চাষার মুখের ভাষা চালাইলেই তাহা আন্তরিকতাপূর্ণ ও সজীব হইয়া উঠিবে এই ধারণা নিরর্থক। ছন্দের বন্ধন লঙ্ঘিত হইল বলিয়াই কবির চিত্তের গহনশায়ী সমস্ত আবেগই আয়তন লাভ করিয়া ধন্য হইল তাহারো কোনো মানে নাই।

অভিনব বিষয়বস্তুর অবতারণা হইয়াছে বলিয়াই তাহা কবিতার গৌরবপদে উন্নীত হইবে না এই যুক্তি যেমন অসার, তেমনি ইহার বিপরীত মন্তব্যও রসগ্রাহিতার পরিচায়ক নহে। 'মাছ' নিয়া ডি এইচ্ লরেন্স কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়াই নূতন বিষয়বস্তুর মর্য্যাদায় তাঁহার কবিতা কবিতা হইবে, এই যুক্তি যেমনি অসঙ্গত, তেমনি সেই যুক্তিও অগ্রাহ্য যে, যেহেতু রুপার্ট ব্রুক্ 'মাছ' নিয়া কবিতা লিখিয়াছেন সেই হেতু একটা অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তুর অবতারণার জন্য তাঁহার কবিতা কবিতা-ই হয় নাই।

৬

নূতন কিছু করিলেই যেমন তাহা ভালো নয়, নূতন কিছু করিলেও তেমনি তাহা দূষণীয় হইতে পারে না। এবং এই কারণেই বর্ত্তমান যুগে নব নব ভাবাবিষ্কারের দিনে নব নব প্রকাশরীতির পরীক্ষার মুহূর্ত্তে আধুনিক কবি এখনও

লোকপ্রিয় হয় নাই। কবিতাতেই নবীন ধর্ম্মের ইঙ্গিত সূচিত হয়—এবং এই ইঙ্গিতের বাহক বলিয়াই কবিতার প্রতি সাধারণের স্বাভাবিক বিরাগ আধুনিক কবি তাঁহার সৃষ্টির মূল্য বলিয়া গ্রহণ করে। এইরূপে Jacopone-এর কবিতায় রেনেসাঁর' সূচনা হইয়াছিল। আধুনিক কবিতাতেও আমরা এক মহত্তর ও বিস্তৃততর ভবিষ্যতের আভাস পাইতেছি।

অবশ্য, এথেনীয়ান্‌দের মত খালি পরিবর্ত্তন ও নূতনত্বের লিপ্সা হইতেই যে খুব প্রকাণ্ড একটা কাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিবে এই আশ্বাসে কেহ বিশ্বাসবান হউন বা না হউন, Falstaff-এর নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটিতে যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার্য্য নহে :—

"You that are old consider not the capacities of us that are young."

শ্রীঅভিনব গুপ্ত

বহুকাল পরে

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বহুকাল পরে আসিয়াছ ঘরে স্বাগত! স্বাগত! কাব্যরাণী!
কত কাল প্রিয়ে, দেখিনি তোমার অমিয়-মধুর মুরতিখানি।
স্থির-বিদ্যুৎ তনুলতা ঘিরি' ভাবের মধুর লাস্য-লীলা,
প্রতি অঙ্গের পল্লবে, দলে, শোভাময়ী শোভা নৃত্যশীলা।
সেই পুরাতন মন-বিমোহন প্রতিভা-দীপ্ত মধুর দিঠি!
বহিয়া এনেছ আননে তোমার চিরপুরাতন সে মাধুরিটি!
কল্যাণ-ভরা কল্যাণময়ী বাহুলতা দুটী পল্লবিত—
আজিও তেমনি অঞ্জলি ভরি' এনেছে করুণা অপরিমিত।
চরণ-নখর-মুকুরে তোমার পড়েছে আমার ললাট-ছায়া—
হেরিতেছি সেথা বিনতি আমার সৌভাগ্যের লভিছে কায়া।
মম বক্ষের অলক্ত-রাগে রঞ্জিত তব চরণ দুটি,
ধরেছে আজিকে নবরূপ যেন রক্তকমল উঠেছে ফুটি'।
চরণ-নূপুর-নিক্কণে আজি একি অভিনব ছন্দ শুনি?
কী বারতা ওর মর্ম্মের মাঝে গোপন রয়েছে কহতো শুনি!
প্রকোষ্ঠে তব হেম-কঙ্কণ কোন্ সঙ্গীত রচিছে সেথা,
বিজয়ীর জয়-নন্দন কিবা অবমানিতের মর্ম্ম ব্যথা!
জ্যোৎস্না-জালের কুহেলিকা সম হৈম-বরণ উত্তরীয়,
মোর যৌবন-অভিযান-রথে বিজয়-বৈজয়ন্তী কি ও?
কবিরে স্মরিয়া এতকাল পরে নাহি জানি রাণি, এনেছ কিবা
অধরে তোমার বহিয়া এনেছ ললাটিকা মোর ইন্দুনিভা?

মাধবী-বিতান

—নাট্যগল্প—

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, বি-এ

১

কুঞ্জলালের পড়িবার ঘর

কুঞ্জলাল ও বনবিহারী

স্থাখো বিহারী, বইখানার কি নাম দেওয়া যায় বল ত ?

বনবিহারী

কোন্ বইখানা ? নতুন বই আবার কবে লিখ্‌লে হে ?

কুঞ্জলাল

না হে, নতুন বই নয়, লেখাটা পুরাণোই। বছর তিন চার ধ'রে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম', 'ঐতিহাসিক আলোচনা' 'বিবিধার্থ-বিশারদী' প্রভৃতি পত্রিকায় যে সব গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে এসেচি সে সব গুলোকে একটু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ক'রে আবার পুস্তকাকারে ছাপাচ্চি।

বনবিহারী

এর জন্যে আবার নামের ভাবনা—কেন, সোজা নামই ত দিতে পার, যথা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

কুঞ্জলাল

না, এ নাম ঠিক হবেনা ; এই নামের একাধিক বই রয়েছে, তার উপর এ হ'ল গিয়ে একটা অতি সাধারণ নাম, একান্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। এমন একটা নাম চাই—যা শুনে বা প'ড়ে লোকে বইখানির সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবে। জানই ত এ হ'ল কলিযুগ, এতে নামমাহাত্ম্যটি যেমন প্রকট ও প্রবল তেমন আর কিছুই নয় ; তাই নামটা ভাল হওয়া চাই-ই। আচ্ছা বল ত 'প্রবন্ধকুঞ্জ' নামটা কেমন ?

বনবিহারী

মন্দ নয়, তবে এ যে বড় কবিত্বপূর্ণ হ'লো।

কুঞ্জলাল

তাতে দোষ কি ? কবিত্ব জিনিষটি আমার প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে পারে নি। কারণ এর মধ্যে মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে গবেষণা রয়েছে ; আর সঙ্গীতের বাদশা যে তানসেন তাঁর ও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের নিয়ে হ'ল আমার শেষ প্রবন্ধটি। আর স্থাখো, নামের শেষে যে 'কুঞ্জ' কথাটি দিয়েছি তাতে গ্রন্থকারের নামটিও ধ্বনিত হচ্চে।

বনবিহারী

বেশ, বেশ, এ ত দেখছি খুবই একটি ভাল নাম, কিন্তু স্থাখ, নামটা এর চেয়েও চমৎকার এবং কবিত্বপূর্ণ করা যেতে পারে, তাহ'লে চাই কি লোকে কবিতার বই ব'লে ভুলও ক'রে বসবে ; তা'তে তোমার লাভ বই লোকসান নেই। কারণ গুরু গম্ভীর প্রবন্ধের বই বাংলা দেশে বড় কেউ কিন্‌বে না ; বছর দুই পরে ওজনদরে গোলদিঘীর পুরাণো-বই-ওয়ালাদের কাছে বিক্রী হবে। তার আগে নামের গুণে লোকে যদি দুই একখানা কিনেই ফেলে—

কুঞ্জলাল

থাক্, থাক্, বিহারী, আর তোমার নাম বলতে হবে না। আমি নয় তোমার মত কবিতা লিখ্‌তে পারি না, কিন্তু তাই ব'লে আমার লেখাকে কেউ একবারে উড়িয়েও দিতে পারবে না, এটা আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

বনবিহারী

আঃ তুমি চট্‌চো কেন ? এতে চটবার কি আছে ? আমি এ কথা বলচি না যে, তোমার লেখার কোন গুরুত্ব নেই, তবে ওটা যে কবিতার মত সরস নয় তা বোধ হয় তুমিও অস্বীকার করবে না। যাক্, সে সব তর্ক নিষ্ফল, তোমার বইএর নামকরণের বেলায় যদি প্রথম প্রবন্ধটির নামের আদ্য অংশের খানিকটা আর শেষ প্রবন্ধের খানিকটা জু'ড়ে দাও তবে একটি খুব ভাল নাম হ'তে পারে। অর্থাৎ কিনা, তোমার প্রথম প্রবন্ধটি হচ্চে 'মাধবীর ধাতুবৃত্তির পরিশিষ্ট' আর শেষ প্রবন্ধটি হচ্চে 'তানসেনের ও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় সঙ্গীত' ; যদি প্রথমটি থেকে 'মাধবী'

আর শেষটি থেকে 'তান' কথাটি 'বি' এই উপসর্গের দ্বারা যুক্ত ক'রে নাও তবে, বেশ চমৎকার একটি নাম হয়।

কুঞ্জলাল

বাঃ বেশ খাসা নাম ত। এ ত আমার মাথায় খেলে নি। 'মাধবী-বিতান', এতে একদিকে থাকবে প্রবন্ধের নামগুলির সঙ্গে একটি অদৃশ্য যোগ, তার ওপর প্রবন্ধ কর্ত্তার নামের একটু প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব। কারণ 'বিতান' আর 'কুঞ্জ' হ'ল গিয়ে সমপর্য্যায়ের শব্দ। বেশ বেশ, খাসা নাম বলেছ ভাই!

বনবিহারী

(হাসিয়া) নিশ্চয় খাসা নাম বলেছি। এই খাসা নামের সাফল্য যখন ভাল ক'রে দেখবে তখন আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারবে না!

কুঞ্জলাল

দোবো না? নিশ্চয় দোব! তুমি উদীয়মান কবিদের মধ্যে একটি সত্যিকারের 'জিনিয়স'। যাই বল, কবিদের ওপর আমার খুব বিশ্বাস, যদিও তাঁরা সত্য অপেক্ষা কল্পনার চর্চ্চাই বেশী করে থাকেন।

বনবিহারী

তা হয়ত ক'রে থাকে নইলে তারা লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবে কি ক'রে।

কুঞ্জলাল

(হাসিয়া) হাঃ হাঃ মাথা আর যারই ঘুরুক, আমার কিন্তু কখনো ঘোরে না তোমাদের কবিতা প'ড়ে।

বনবিহারী

মাপ ক'রো কুঞ্জ, যে সব লোকের মাথা কবিতা প'ড়ে ঘুরতে পারে তুমি তাদের থেকে বাদ। কবিদের কি সাধ্য যে, কবিতা দিয়ে তোমার মাথা ঘোরায়? তাদের কারবার হ'ল চন্দ্র, চন্দ্রিমা, কুহুধ্বনি, মলয় পবন, আম্রমুকুল ইত্যাদি হাল্কা হাল্কা জিনিষ নিয়ে। এদের আঘাতে তোমার কি হবে? সত্যিকারের লাঠি যদি এসে তোমার মাথায় পড়ে তাহ'লেও তোমার মাথা ঘুরবে কিনা সন্দেহ! আচ্ছা লোকে যখন সারা দিনের কাজের অন্তে বিকাল বেলায় প্রকৃতির শোভা দেখতে বেরোয় তখন তুমি কি-ক'রে ঘরে বই খুলে ব'সে থাক?

কুঞ্জলাল

ছাখ—এটা সত্যের অপলাপ হ'ল। আমি কি রোজই বিকালে ব'সে ব'সে পড়ি? বেরোই-ই না?

বনবিহারী

হাঁ, বেরোও বটে, সে কেবল মাঝে মাঝে মিঃ মিত্রের ওখানে গিয়ে চা খেতে।

কুঞ্জলাল

যাই হোক্ বেরোই ত। তাহ'লেই ছাখ, যত বেরসিক তোমরা আমাকে ভেবে থাক, তত বেরসিক বস্তুতঃ আমি নই।

বনবিহারী

ছাখ, তোমার অতটুকু রসপ্রিয়তায় আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। তোমার যে রস-চর্চ্চা তা কেবল চা-রসের সঙ্গে শর্করা-রস ও গব্য-রসের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। আমরা খুসী হব ওটা যদি একেবারে কাব্য-রসে গিয়ে পৌছয়।

কুঞ্জলাল

বল বল, ব'লে যাও! আমাকে তেমন হাল্কা লোকটি পাও নি। অসার গল্প উপন্যাস ও কবিতার মোহে মুগ্ধ হওয়া আমার পক্ষে বেশ একটু শক্ত। সব লোকে এই বয়সে কত বিলাসিতা করে,—ফ্যাসান ক'রে চুল কাটায়, সুগন্ধ সাবান ও তেল মাখে, ফিন্ ফিনে ধুতি চাদর ও জামা পরে আর আমি কেশবিন্যাস করা ত দূরের কথা, চুলের মূল শুদ্ধ কেটে ফেলতে পারলে বাঁচি। সাবানের বদলে ব্যবহার করি সাজিমাটি ও খোল, আর কাপড় পরি মোটা দেশী সুতার বোনা মোটা কাপড় যেন এক-একখানি চট, আর পায়ে দিই Vegetable অর্থাৎ নিরামিষ জুতা আর আহারও করি সম্পূর্ণ নিরামিষ। দেখচ ত, তোমাদের গল্প উপন্যাস ও কবিতার দেবী আমার নিকটস্থ হ'তে একদম সাহস-ই করবেন না।

বনবিহারী

তা হয়ত ঠিক, ততদিনই, যতদিন না কোন মানবী তোমার হৃদয়স্থ হয়ে পড়বেন।

কুঞ্জলাল

হোঃ হোঃ হাসালে হে বেহারী, মেয়েদের একটা রুচি আছে। আমার মত একটা কাঠখোট্টা লোককে দেখে আকৃষ্ট হওয়ার বা তার চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা তাঁরা কখনো—

বনবিহারী

তুমি বলচ করবেন না? ছ্যাথ অনেক পড়শুনা করেচ, এই যে পাশ্চাত্য অলঙ্কার শাস্ত্রে ভালবাসার দেবতাটির সম্বন্ধে অন্ধত্ব অপবাদ রয়েছে তা সহজেই ভুলে যেও না।

২

রাস্তায়

বিনয় ও অবিনাশ

বিনয়

ছ্যাথ অবিনাশ দা, একটা ভারী মজার কাণ্ড হয়েচে, খবর রাখ কিছু?

অবিনাশ

কই না। শুন্‌লে ত এ কয়দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, কি কাণ্ড বল ত?

বিনয়

বাজারে গুজব এই যে কুঞ্জ দা' 'লভে' পড়েছেন।

অবিনাশ

অ্যাঁ বলো কি হে, কুঞ্জলাল—কুঞ্জলাল লভে পড়েছে! ছ্যাথ এ অতি বাজে কথা আমার বিশ্বাস হয় না। এ হ'তেই পারে না।

বিনয়

তাহ'লে হ'তেই পারে না। আচ্ছা তুমি বেনারসে কি কি দেখ্‌লে?

অবিনাশ

সে পরে বলব—কার লভে পড়েছে, কুঞ্জ সে কথা কিছু বল্‌লে না ত?

বিনয়

তুমি যখন বিশ্বাসই করবে না তখন মিছে জিজ্ঞাসা করচ কেন?

অবিনাশ

ছ্যাথ, কোনো ঘটনায় বিশ্বাস না করলে যে তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার অধিকার হয় না এ নিয়ম তোমার কাছে নতুন শুনচি। কাজের বেলায় ত তুমি ঠিক উল্টোই করেথাক।

বিনয়

কখন করেচি?

অবিনাশ

এই ধর, আমাদের দরওয়ান যে দিন ভুত দেখেছে বলছিল, তখন ত তুমি তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগ্‌লে, কোথায় দেখেছে, কি দেখেছে, কত বড় ভুত দেখেছে ইত্যাদি—অথচ তার ঠিক আগে-পরে অন্ততঃ দশ বার বলেছ যে তুমি ভুতের অস্তিত্বে বিশ্বাস মোটেই কর না।

বিনয়

ভুত আছে কিনা এটা একটা অতি গুরুতর তত্ত্ব, বিশ্বাস না করলেও অন্ধ বিশ্বাসের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত।

অবিনাশ

আর 'লভ'কে বুঝি তুমি ভুতের চেয়ে হাল্‌কা জিনিষ ব'লে ভাবছ? দেখ ওটা তোমার বিলক্ষণ ভুল। ভুতে পেলে বরং রোঝা এসে তাকে তাড়াতে পারে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেখা গেছে যে 'লভ'কে তাড়াতে সবাই হার মানেন, এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত।

বিনয়

তাই বুঝি তুমি নেহাৎ philosophic moodএ এই মিথ্যা গুজবটির সম্বন্ধে খোঁজ করছ?

অবিনাশ

হাঁ, ঠিক তাই।

বিনয়

কিন্তু সত্যি ক'রে বলো দেখি, অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিশ্বাসের একটু ক্ষীণ রেখা ছিল কি না?

অবিনাশ

ছ্যাথ কি ক'রে বিশ্বাস করি, 'ওই ত কুঞ্জলাল—যাক্ আসল কথাটা কি বল ত? কুঞ্জ কার প্রেমে পড়েচে কিছু জান?

বিনয়

তাই যদি না জানি তবে মজার কাণ্ড বলচি কেন? মেয়েটির নাম হ'ল মাধবী।

অবিনাশ

কোথাকার? কোথায় তার সঙ্গে দেখা হ'ল কুঞ্জ'র।

বিনয়

মেয়েটি আমাদের নতুন প্রতিবেশী। আর মিষ্টার মিত্তিরের বাড়ি উভয়ের দেখাশুনা। অর্থাৎ, কুঞ্জ সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে চা খায় আর অপর পক্ষটি আসেন মিসেস্ মিত্রের সঙ্গিনী রূপে বেড়াতে। হয়ত এই সুযোগে হঠাৎ দেখা শুনা হ'য়ে গিয়ে থাক্‌বে।

অবিনাশ

এ হঠাৎ দেখা শোনার কর্ম্ম নয় হে, হঠাৎ দেখা শোনায় কি 'লভ' হ'তে পারে—একালে?

বিনয়

হ'তে পারে কিনা কুঞ্জদা'কে জিজ্ঞাসা ক'রো। ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েচে, আমার মনে হয় না মিত্রদম্পতির এতে কোনো হাত আছে। 'লভে'র মনস্তত্ত্ব তোমার ভালো জানা নেই, তাহ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে এত অল্প কারণে কুঞ্জদা'র মত কঠোর লোক কি ক'রে এতদূর গ'লে গিয়েচে যাতে সে তার প্রবন্ধ সংগ্রহের নামের সঙ্গে ছল ক'রে নিজ প্রণয়িনীর নামটিও জুড়ে দিয়েচে।

অবিনাশ

বাঃ বাঃ বেশ চমৎকার ত? কি নাম দিয়েছে বইটির বল ত!

বিনয়

বইএর নাম হয়েছে 'মাধবী-বিতান'। কুঞ্জদা বল্‌তে চায় 'মাধবী' কথাটি সে নিয়েচে 'মাধবীর ধাতুবৃত্তির পরিশিষ্ট' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধের নাম থেকে, আর শেষ অংশটি অর্থাৎ 'তান' এই কথাটুকু নেওয়া হয়েচে 'তান সেন ও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় সঙ্গীত' নামক প্রবন্ধের নাম থেকে; আর 'বি' উপসর্গটি সংযোজক মাত্র। আচ্ছা বল ত অবিনাশদা এই গাঁজাখুরী গল্পে কে বিশ্বাস করবে? বিশেষতঃ এ পাড়ায় যখন জল-জ্যান্ত মাধবী নামক একটি তরুণী রয়েছেন, আর মিষ্টার মিত্তিরের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে কুঞ্জদা'র মাঝে মাঝে দেখা শোনা হচ্চে। এই মাধবী নামের সঙ্গে যে 'কুঞ্জ' অর্থের দ্যোতক বিতান কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েচে তার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট নয় কি? দেখ্‌চ, অবিনাশদা ব্যাপার কতদূরে গড়িয়েচে!

অবিনাশ

যদি সত্যি হয় তবে অবস্থা বেশ সাংঘাতিক বলতে হবে।

বিনয়

সাংঘাতিক? অবশ্য সাংঘাতিক! তুমি আবার 'যদি' বলচ? দেখ না, এমন সুস্পষ্ট নামটি দিয়েও কিনা ওর বিশ্বাস লোককে বাজে কথা ব'লে ঠকিয়ে রাখতে পারবে। কেন রে বাপু! বেছে বেছে ঐ প্রবন্ধটিকেই বইএর গোড়ায় দেওয়া? আচ্ছা অবিনাশদা, তুমি ত 'সাইকো-এনালিসিস্' পড়েছ, বেশ সহজেই মনে হয় না কি যে মাধবী নামটি ওর ভেতর 'সব্‌কনসস্' অবস্থায় ছিল এবং বইএর নামকরণের বেলায় অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অবিনাশ

তা ত করেছে দেখ্‌চি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলত? কুঞ্জ শেষে 'লভে' পড়্‌ল? আর এত গভীর এবং গম্ভীর ভাবে পড়্‌ল!......আচ্ছা কুঞ্জদা কি ভেবে ভেবে দিন দিন মলিন ও কাহিল হ'য়ে যাচ্ছে?

(বনবিহারীর প্রবেশ)

বনবিহারী

না না, মোটেই না। কাহিল হবার অবস্থা তার মোটেই নয়, বরং তাকে যেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্চে তাতে তাকে কুঞ্জ না ব'লে কুঞ্জর বল্‌লেও শব্দ শাস্ত্রের বিশেষ অপমান হবে ব'লে মনে হয় না।

অবিনাশ

এতখানি 'লভে' কি তাহ'লে ধূমও নেই অগ্নিও নেই!

বনবিহারী

না হে 'লভ'ই নেই তাতে আবার আগুন আস্‌বে কোত্থেকে? এর ষোল আনা নিছক গুজব!

বিনয় ও অবিনাশ

বল কি বেহারীদা, এ কি নিছক গুজব হ'তে পারে?

বনবিহারী

নিশ্চয়।

অবিনাশ

বিশ্বাস করা শক্ত।

বনবিহারী

কিছুই শক্ত নয়; এই গুজব রটিয়েচে কে তা জান? আমি—কি করে রটিয়েচি তাও বলি ইচ্ছে হয় ত যাচাই করে নিতে পার। কিন্তু কুঞ্জ এ পর্যান্ত এই গুজবের কিছুই জানে না।

অবিনাশ

ভারী আশ্চর্য্য ত!

বনবিহারী

শুধু আশ্চর্য্য নয়, এতে ভারী রগড়ও হচ্চে। মিষ্টার মিত্রের চা-সভায় যখন সকলে ভিড় করেন তখন কুঞ্জ হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়্‌লে তাকে নিয়ে একটা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট হাস্য পরিহাস ওঠে, কিন্তু কুঞ্জ তার মানে বুঝতে না পেরেও অপ্রস্তুত হবার ভয়ে যখন সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় তখন সেটা যে কেমন কৌতুককর হয় তা তোমাদের কি ক'রে বোঝাব? এদিকে পরিহাসের ভয়ে মাধবী বেচারী মুখ তুলে তাকাতে পারে না।

অবিনাশ

বেশ চমৎকার হয়েচে ত তা হলে? আচ্ছা বেহারী দা, কি করে তুমি এই ব্যাপার ঘটালে?

বনবিহারী

কথাটা তোমাদের বলব? আচ্ছা বল্‌চি, কিন্তু কথাটা আর কেউ যেন জান্‌তে না পারে। কারণ কুঞ্জকে নিয়ে আমি একটু রগড় করতে চাই। আশা করি তোমরা দুজনে এ বিষয়ে আমার সাহায্য করবে।

অবিনাশ ও বিনয়

আচ্ছা তা করব, এখন বল ব্যাপারটা কি।

বনবিহারী

বইএর যে নামটি নিয়ে অত কাণ্ড সে নামটি আমারই দেওয়া। কুঞ্জ আমার পরামর্শ গ্রহণ করায় সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটিকে বেশ সালঙ্কারে পল্লবিত ক'রে নানা লোকের মারফতে চারদিকে ছড়িয়েচি, তাতেই কুঞ্জর এই দুর্দ্দশা।

৩

কুঞ্জর পড়িবার ঘর

কুঞ্জ ও অবিনাশ

অবিনাশ

কি কুঞ্জদা, তোমার মনে এই ছিল?

কুঞ্জলাল

কেন, কি ছিল?

অবিনাশ

কি ছিল তুমিই ভালো জান, আমার বলার প্রয়োজন কি? ডুব দিয়ে দিয়ে জল খাবে একাদশীর বাবাও জান্‌তে পারবে না' এই ত তোমার নীতি!

কুঞ্জলাল

আহা কি হয়েচে খুলে বল না; হেঁয়ালী করচ কেন? বলই না কেন কি কাণ্ডটা গোপন করচি যাতে তোমরা রাগ করচ।

অবিনাশ

না দাদা, তোমার চলচে অনুরাগ, তাতে আমরা রাগ করব, সে কি কখনো হতে পারে? আমরা বরং খুসীই হয়েচি, কারণ জানই ত শাস্ত্রে বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'।

কুঞ্জলাল

তার মানে?

অবিনাশ

অবাক হচ্চ যে? ভারী অভিনয় কর্ত্তে শিখেচ যা হোক্। আমরা কিন্তু ফাঁকিতে ভুলবার ছেলে নই। যা করেছ ভালই করেছ; যদি ইচ্ছা ক'রে কিছু ক'রে না থাক, তবে যা হয়ে গেচে তা ভালই হয়েচে। মাধবী মেয়েটি ভাল। তোমার এই পছন্দের জন্য তোমাকে 'কঙ্গ্রাচুলেট্' (congratulate) কর্‌চি।

কুঞ্জলাল

কি হে, বল কি হে! মাধবীকে আমার পছন্দ হয়েচে এই অদ্ভুত গল্প কোথায় শুন্‌লে? সত্যি বলচি আমি এর কিছুই জানি না।

অবিনাশ

সত্যিই কিছু জান না?

কুঞ্জলাল

সত্যিই কিছু জানি না।

অবিনাশ

অথচ তোমাদের উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধব সবাই ত একথাটি জানে। আচ্ছা তোমার প্রবন্ধ সংগ্রহটির নাম কি তবে একেবারে উদ্দেশ্য বিহীন?

কুঞ্জলাল

ও হো এখন বুঝচি, প্রবন্ধসংগ্রহটির নাম থেকে এই অনর্থ ঘটেচে। নাহে যদি বিশ্বাস কর তবে বলতে পারি ওরূপ কোন অর্থে আমি এই নাম দিই নি।

অবিনাশ

বিশ্বাস কেন করব না, তোমায় ত ছোট বেলা থেকে জানি; কিন্তু ব্যাপারটা যে গুরুতর দাঁড়িয়েচে।

তা দাঁড়াক্, কিন্তু দেখ ভাই অবিনাশ, আমি নিজের জন্য ততটা ভাবি না, কিন্তু একজন ভদ্রমহিলার নামে এই গুজব বড়ই ক্ষতিকর ও শোচনীয়। বলত এটা কার কর্ম্ম?

অবিনাশ

যার কর্ম্মই হোক তোমাদের দুটির কর্ম্ম ফতে। বিশেষতঃ গুজবের অপর পক্ষ ব্যাপারটিকে বেশ (seriously) সিরিয়স্‌লি নিয়েচেন এবং একটু আশান্বিত হয়েচেন।

কুঞ্জলাল

অ্যাঁ, বল কি হে? কার কাছে শুন্‌লে?

অবিনাশ

এই যে আমাদের মালতী পিসিমাকে দেখেচ তার সঙ্গে মাধবীর মাসীমার খুব ভাব। তারি কাছে পিসি মা ব্যাপারটি শুনেচেন।

কুঞ্জলাল

তা হ'লে ব্যাপারটি ত বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েচে। আচ্ছা দেখত যারা গুজব রটায় তারা কেমন 'ইর্‌রেস্‌পন্‌সিব্‌ল' (irresponsible)! এর ত অবিলম্বে কোন প্রতিবিধান করতে হচ্চে।

অবিনাশ

কি রকম প্রতিবিধান করবে?

কুঞ্জলাল

কি রকম করব তা ঠিক বুঝতে পারছি নে, তবে একটা কিছু করতে হবেই।

কুঞ্জলালের ছাত

বিনয় ও কুঞ্জ

বিনয়

আখো কুঞ্জদা, আজ স্মিথ্ সায়েবের প্রাচীন ভারত খানির নতুন সংস্করণটি পড়ছিলাম। কিন্তু বইখানা পড়ে একটু নিরাশ হয়েচি।

কেন সে বই ত আমি দেখেছি, মন্দ হয় নি ত, ওতে up-to-date সব গবেষণার ফলাফলই ত ভাল ক'রে দেওয়া হয়েছে।

বিনয়

তা ত হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারত, বিশেষ ক'রে দ্রবিড় সভ্যতার ইতিহাসটি বড়ই অসম্পূর্ণ মনে হল। তুমি বোধ হয় জান, আমাদের দেশের কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিতের মত এই যে দ্রবিড় সভ্যতার ইতিহাস ভালো ক'রে না পেলে প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস কোনো কালে রচিত হবে না। আমি এ মতের খুব সমর্থন করি কিন্তু স্মিথ্ সায়েবের বই এ বিষয়ে বড়ই অসম্পূর্ণ বলতে হবে।

কুঞ্জলাল

তা স্মিথ সায়েবের দোষ কি, তিনি কি ক'রে আর বেশি লিখ্‌বেন;—এ সম্বন্ধে গবেষণা যে অতি অল্পই হয়েচে। দ্রবিড় সভ্যতাকে ভালো করে বুঝতে হ'লে তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মলয়ালী প্রভৃতি ভাষাগুলির সাহিত্য, অন্ততপক্ষে তামিল সাহিত্যটি, বিশেষ ভাল ক'রে জানা দরকার।

কোনো সময়ে কোন তামিল ভাষাভাষী পণ্ডিত হয়ত এ কাজটি করবেন।

বিনয়

কিন্তু আমি বলি, তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে তোমাদের মত কারো এ বিষয়ে উঠে প'ড়ে লাগা উচিত। যদি এসব কাজ না করতে পারবে তবে ইতিহাসে এম, এ, পাশ করতে গেলে কেন?......আচ্ছা তুমি না একবার তামিল পড়তে সুরু করেছিলে? ছেড়ে দিলে কেন?

কুঞ্জলাল

এ ভাষা অতি দুরূহ, উপযুক্ত শিক্ষক না পেলে শুধু বই প'ড়ে কিছু হয় না। আর বিশেষত যে কিষ্কিন্ধ্যার ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্যে আমি ও-ভাষা শিখতে গিয়েছিলাম তার জন্যে কারো বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে দু'একটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম, কিন্তু তার ফলে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদের সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে অনেক অপ্রিয় ইঙ্গিত হয়েছিল।

বিনয়

আহা লোকের কথায় চটো কেন কুঞ্জদা; করলেই বা তারা একটু রঙ্গ রস্. কোন নতুন কাজে ব্রতী হলে এ সব ঘটবেই। আমি বলি উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় ক'রে আবার তামিল শিখতে লেগে যাও। এ কলকাতা সহরে উপযুক্ত শিক্ষক অবশ্যই মিলবে।

কুঞ্জলাল

আজকাল হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু যখন সুরু করেছিলাম তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও পাই নি।

বিনয়

তা এখন একবার দিয়ে দেখ, নিশ্চয় পাবে।

কুঞ্জলাল

তা দেখব আমারো ইচ্ছা আছে, কিন্তু দিনকতক পরে আপাতত আমি একটু উদ্বিগ্ন আছি।

বিনয়

হাঁ কুঞ্জদা, আজ যেন গোড়া থেকেই তোমাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, ব্যাপারটা কি বল ত?

কুঞ্জলাল

ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয় জান, ওই যে রটেছে আমি প্রেমে পড়েছি। মামা তাই শুনতে পেয়ে ছুটে এসেচেন এবং ভারি—

বিনয়

রাগ ক'রেচেন তোমার ওপর?

কুঞ্জলাল

না হে না, আগে কথাটা বলতেই দাও।

বিনয়

আচ্ছা, বল শুনি কি হয়েছে।

কুঞ্জলাল

মামা রাগ না ক'রে বরং খুসীই হয়েছেন; কারণ জানই ত গোড়া থেকে আমি বিয়ে করব না এই সংকল্প জানিয়ে আস্‌চি। কাজেই এই অমূলক খবর পেয়ে মামা আশান্বিত হয়ে কলকাতায় ছুটে এসেচেন, আর মাধবীর অভিভাবকদের খোঁজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা কইচেন। এদিকে আমি যতই তাঁকে জোরের সঙ্গে এই ব্যাপারের ভিত্তিহীনতা জানাতে চাচ্চি ততই তিনি সেটাকে লজ্জাজনিত মনে ক'রে কিছুতেই বিশ্বাস করচেন না।

বিনয়

তা আরো জোরের সঙ্গে না হয় অমত জানাও, কিন্তু তামিল পড়াটি দাদা, যত শীঘ্‌গীর পার সুরু ক'রে দাও।

কুঞ্জলাল

কিন্তু তার আগে কি যে হয়ে যাবে তা আমি জানি না।

বিনয়

কি আর হবে, হবে ত বড় জোর বিয়ে হবে!

কুঞ্জলাল

বাপ্‌রে, বিয়ে! তা কখনই হচ্চে না, তা হলে যে আমার জ্ঞানচর্চ্চার অবসর একেবারে চ'লে যাবে।

বিনয়

তবে বিয়ে যখন না করাই সংকল্প করেছ তখন 'কি যে হবে' ঐ কথা বলছ কেন?

কুঞ্জলাল

তার মানে হচ্চে মামা বিয়ের জন্যে যেমন তাড়া দিচ্চেন তাতে হয়ত সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়্‌তে হবে।

বিনয়

বল কি কুঞ্জদা, সন্ন্যাসী হবে? তাহ'লে কি জ্ঞান-চর্চ্চার খুব অবসর মিলবে? আর তুমি না কতদিন বলেছ এই (vagabond) 'ভাগাবণ্ড' সন্ন্যাসীর দলই ভারতের অধঃপতনের একটা কারণ; আচ্ছা তুমিও কি শেষে চিম্‌টে কম্বল নিয়ে ঐ vagabondদের দলে গিয়ে ভিড়্‌বে?

কুঞ্জলাল

না হে, তা কি আর পারি, তবে কিছুদিন গা-ঢাকা হয়ে এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াব; তারপর মামা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়্‌লে আবার এসে কাজে লাগ্‌ব।

বিনয়

যদি না তার আগে পুলিশের হাতে পড় এবং ব্যক্তিগত শ্বশুর বাড়ি এড়াতে গিয়ে সার্ব্বজনীন শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওঠ।

কুঞ্জলাল

বল কি হে, মামা কি শেষে আমার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবেন?

বিনয়

তিনি কি তা পারেন? আর তাঁর সে দরকারই বা কি? ভাগনে সন্ন্যাস নিলেও তাঁর সম্পত্তি ভোগ করবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু পুলিশ গোয়েন্দা যে নোক্‌রীর দায়েই তোমার খোঁজ খবর নেবে।

কুঞ্জলাল

তা হ'লে ত বড় মুস্কিল দেখ্‌চি! কিন্তু আমি কিছুতেই বিয়ে করচি নে। যদি কিছুতে কিছু না হয় তবে বিয়ের দিনে hunger strike করব।

বিনয়

এতে যে বিশেষ সুবিধা হবে কুঞ্জদা তা ত মনে হয় না। যেহেতু হিন্দু-বিবাহের দিনে ত বরকনের উপবাস করাই বিধি। কাজেই কোন শুভলগ্নে অভুক্ত অবস্থায় তোমাকে পাকড়াও করতে পারলেই ত তোমার মামার পক্ষে সুবিধে। এখন চল্লাম ভাই কুঞ্জ। (প্রস্থান)

কুঞ্জলাল

কী বিষম বিপদেই পড়েছি। বিয়ে করলে আর কোনো কাজই হবে না, এত দিন পরিশ্রম ক'রে গবেষণার জন্য যে সব আয়োজন করেছি তা সব পণ্ড হয়ে যাবে। চিরটি জীবন যে জ্ঞানতপস্বী হয়ে কাটাবার সঙ্কল্প করেছিলাম তার সদ্যঃ মুলোচ্ছেদ হবে। অহো সভ্যতার প্রবীনা ও প্রাচীনা ধাত্রী ভারতভূমি, তোমার ভবিষ্যৎ অতি অন্ধতমসাবৃত। একেই ত সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত লোকে জ্ঞান চর্চ্চার ইচ্ছাটিকে হারিয়ে ফেলে, তার উপর যারা সেটিকে অতি কষ্টে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তা-দিগকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করার জন্য প্রচণ্ড আয়োজন।...না না বিয়ে কিছুতেই করব না, নারীমুখকে কিছুতেই ধ্যানের বস্তু করা হবেনা।

৫

বনবিহারীর বসিবার ঘর

বনবিহারী ও বিনয়

বনবিহারী

দেখ বিনয়, যে ক'রেই হোক কুঞ্জর সঙ্গে মাধবীর বিয়ে দেওয়াতে হচ্চে। আমার এই কৌতুকের ফল যে এতদূর গড়াতে পারে গোড়াতে আমি তা ভাবি নি। মাধবী কুঞ্জটার ভয়ানক পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছে। এমন কি কুঞ্জর প্রত্যাখ্যানের পরও সে তার প্রতি বিমুখ হয় নি।

বিনয়

তা হ'লে ত বড় খারাপ হ'লো দেখ্‌চি। কুঞ্জকে বাগ মানাতে পারবে?

বনবিহারী

তুমি আর অবিনাশ যদি আমাকে সাহায্য কর তাহ'লে কাজটা বিশেষ শক্ত হবে না। আচ্ছা, তামিল পড়ার কথাটা তুমি কোনো সুযোগে ওর মাথায় একবার ঢোকাতে পার্‌লে?

বিনয়

একবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হয়েছি ব'লে মনে হয় নি। তার মামা বিয়ের চেষ্টা করচেন ব'লে লোকটা যেন খেপে গিয়েছে।

বনবিহারী

তা আর একবার তোমরা আমার কথামত নেহাৎ নিষ্কামভাবেই চেষ্টা ক'রে দেখ না। চাই কি কুঞ্জ বিয়ে করার জন্যও খেপ্তে পারে।

বিনয়

বল কি বেহারী দা!

বনবিহারী

এতে অবাক হবার কিছুই নেই বিনয়। কুঞ্জ যে-কারণে বিবাহে বিমুখ ঠিক সেটাই তাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দেওয়ার সংকেত ব'লে দিচ্চে। অর্থাৎ আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি কুঞ্জ যে মেয়েদের নেহাৎ অপচ্ছন্দ করে তা নয়; তবে মেয়েদের সম্পর্কে সে নিজেকে বড়ই দুর্ব্বল ব'লে ভাবে, তাই সে ওদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। কুঞ্জকে নানাপ্রকারে এটা ভাল ক'রে বোঝাতে হবে যে, বিবাহিত হলে তার কাজের সুবিধা বই অসুবিধা হবে না। দেখো, তামিল ভাষায় কথাটি ভুলে যেও না।

৬

বনবিহারীর ভিতরে বসিবার ঘর

বনবিহারী, অবিনাশ, বিনয় ও কুঞ্জ আহারান্তে বিশ্রামরত

অবিনাশ

(কুঞ্জকে দেখাইয়া) ঠিক ফলারে বামুনের মত দেখাচ্চে।

কুঞ্জলাল

(আরাম কেদারায় চিৎ হইয়া পড়িয়া) আঃ কি আরাম! খাওয়াটি দিব্য পরিপাটি রকমে হ'ল! সব কটি জিনিষই পরম উপাদেয়রূপে রান্না হয়েচে। বহুদিন এমন তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হয়নি।

বিনয়

তা তুমি ত কুঞ্জদা চিরকুমার থাকবার ব্রত নিয়েছ, কাজেই মেসে হষ্টেলে থেকে আর তৃপ্তির খাওয়া পাবে কি ক'রে? এই ত বিয়েটা দিলে ভেঙ্গে।

কুঞ্জলাল

(সোজা হইয়া) অথ বিনয়, তুমি ভুল বুঝেছ। খেয়ে পরিতৃপ্ত হতে হলে ভাল রান্না দরকার বটে—আর আমি ভালো রান্না appreciate করিও খুব, কিন্তু সেটা essential নয়। যেটা essential তা হচ্চে ক্ষুধা ও মানসিক শান্তির যুগপৎ উপস্থিতি, জানাইত প্রথম বস্তুটির অভাব আমার কোনও কালে নেই। আমার শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য দেখে তা বোধ হয় কতকটা ঠাহর কর্ত্তে পাচ্ছ, কিন্তু এই গেল-কয়টা দিন মনে শান্তি ছিল না, যেহেতু বিয়ের তাগিদ নিয়ে মামা এসে স্কন্ধের উপর চেপে ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁকে কোনো গতিকে বিদায় ক'রে দিয়ে তবে আজ সুখে এবং তৃপ্তির সঙ্গে আহার করা গেল।

বিনয়

কুঞ্জদা, কাজটা ভাল হ'ল না। কেবল এমন negative ভাবে নিজের পরিতৃপ্তি ব্যাখ্যা ক'রে তুমি host-এর অপমান করছ। বিশেষভাবে অপমান করছ সেই মহিলাটির যিনি আজ একান্ত পরিশ্রম সহকারে আজকের শাক সুক্তনি থেকে সন্দেশ পান্তুয়া পর্য্যন্ত সব কিছু তৈরী করেছেন।

কুঞ্জলাল

মাপ ক'রো ভাই বেহারী, ওটা আমি আদপেই mean করিনি। আজকের রান্না খেয়ে আমার খুব লোভ হচ্চে তোমাদের বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। পিসিমাকে ডাক, আমি তাঁকে আমার এই ইচ্ছাটা জানিয়ে রাখি।

বনবিহারী

তা ডাকতে পারি কিন্তু রান্না তিনি ইদানীং করতে পারেন না, শরীর খুব খারাপ ব'লে। তাই তাতে কোনো ফল হবে ব'লে মনে হয় না।

কুঞ্জলাল

তবে রাঁধলে কে আজ?

অবিনাশ

তাই ত বেহারী দা, আজ রেঁধেছে কে? আমরা ভেবেছিলাম বুঝি মাসীমাই আজ রেঁধেছেন।

বনবিহারী

যিনি রেঁধেছেন তাঁর নাম বল্‌তে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে।

অবিনাশ, বিনয় ও কুঞ্জলাল

(সমস্বরে) কেন? কেন?

বনবিহারী

ভয় পেয়ো না, তোমাদের জাত মারি নি।

কুঞ্জলাল

জাত মারনি তা বুঝি, আর মারবার মত জাতও আমাদের নয়, কিন্তু আজকের খাওয়ার মুখ মেরে দিয়েছ; এর পর কিছুদিন অন্য খাবারে রুচি হবে না। ডাল ভাত শাক সুক্তুনি যে এত উপাদেয় ভাবে রান্না হ'তে পারে তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। জানি না তুমি কাকে ধ'রে এনে সেটা মনে করিয়ে দিলে। সে যাই হোক, তুমি আমাদের হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে।

বনবিহারী

যদি তিনি সে ধন্যবাদ গ্রহণ করেন।

অবিনাশ

কেন? কেন তিনি এই প্রসংশাটুকু গ্রহণ করবেন না; আমরা কি এমন অপরাধ করেছি!

বনবিহারী

তোমরা সকলে কর নি, তবে একজন এর মধ্যে আছেন যিনি ক'রেছেন।

বিনয় ও অবিনাশ

কে, কে বেহারীদা?

বনবিহারী

ভাখ বিনয়, অবিনাশ, তোমরা আমাকে ভারী delicate position-এ ফেলছ। এ প্রশ্নের জবাব দিলে তোমাদের একজন অবশ্য নিজকে অপমানিত মনে করবে। নিমন্ত্রণ ক'রে এনে আমি তোমাদের অপমান কর্ত্তে পারব না।

বিনয়

না বেহারী দা, তোমাকে বল্‌তে হবেই। সত্যি কথা বা উচিত কথা শুনে রাগ করব না গোড়াতেই সে অঙ্গীকার করে রাখ্‌চি।

কুঞ্জলাল

ওহে এই কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে যদি তা নিবৃত্ত না কর তবেই মনে করব তুমি আমাদের অপমান করচ।

বনবিহারী

গুরুতর সঙ্কটে ফেল্‌লে হে আমাকে। যাক্ আমি ব'লেই ফেলি, কিন্তু ফের বল্‌চি কোনো offence নিও না। (কিছুক্ষণ থামিয়া) কুঞ্জ, জ্ঞানচর্চ্চায় বিঘ্ন হবেন জেনে কোনো শিক্ষিতা মেয়েকে যদি তুমি প্রত্যাখ্যান ক'রে থাক তবে কি ভোজনচর্চ্চায় সহায় হয়েছেন বলে তাঁকে প্রশংসা করা শোভা পায়?

বিনয়

বাঁচলাম বাবা, আমরা তাহ'লে এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। কুঞ্জদা, এবার সামলাও।

বনবিহারী

দেখ্‌লে কুঞ্জ, তুমি ভয়ানক ঠকেছ। বর্ত্তমান রণনীতি বিশারদরা বলেন, The army moves on stomach, অর্থাৎ সৈন্যদল চলে পেটের উপর ভর দিয়ে। আমার মনে হয় একথা বললেও মিথ্যে হয় না যে, A scholar moves on stomach, অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিও পেটের উপর নির্ভর ক'রে চলেন।

বিনয়

কুঞ্জদা, বড়ই ঠকেছ! শুনেছি, মাধবী দেবী এক রকম মাদ্রাজী চাট্‌নী তৈরী করেন যা অপূর্ব্ব।

অবিনাশ

ওহে মাদ্রাজী চাট্‌নীর কথায় আর এক কথা মনে পড়ে গেল; আমি শুনেছি মাধবী দেবী নাকি তামিল ভাষাটিও বেশ জানেন।

বনবিহারী

তা ত জানেনই। এ তো এমন কিছু কথা নয়। ওঁর বাবা ছিলেন মাদ্রাজ 'কাষ্টম হাউসের' এক উচ্চ

কর্ম্মচারী—ছেলে বেলায় তামিল ধাত্রীর হাতে মানুষ, তারপর তামিল পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়া।

বিনয়

দ্যাখো কুঞ্জদা, তোমার দুঃখে আমার কান্না পাচ্ছে! এমন স্ত্রী তুমি হাতছাড়া করলে! এক দিকে রোজ ভালো রান্না খাওয়ার আশা, অপর দিকে মূর্ত্তিমতী তামিল ভাষা, —এর দুটোই তুমি পেতে পেতে হারালে। এরকম যোগাযোগের একটাও 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'ই মিলবে, মিলবে কেবল নেহাৎ শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে তারই 'যমৈবেষা বৃণুতে'। আচ্ছা কুঞ্জদা সত্যি বল ত, তোমার মনে দুঃখ হচ্চে না?

কুঞ্জলাল

(কাষ্ঠহাসি হাসিয়া) দুঃখ কেন হবে, তোমরা খেপেছ?

অবিনাশ

আমরা খেপ্‌ব কেন কুঞ্জদা, খেপ্‌বার কথা ত তোমরাই। যাক্ এবার তুমি কতকটা নির্ভাবনায় বসে তোমার কিষ্কিন্ধ্যা পুরাণ বা কিষ্কিন্ধ্যার পুরাবৃত্ত রচনায় মনোনিবেশ কর্ত্তে পার।

বিনয়

অবিশ্যি মন যদি নিবিষ্ট হতে রাজী হয়। আমি দিব্য ক'রে বলচি, লিখ্‌তে বস্‌লেই মান্দ্রাজী চাটনী আর তামিল-ভাষিনী কোন বঙ্গ তরুণীকে মনে প'ড়ে রসনা ও চক্ষু যুগপৎ আর্দ্র হয়ে উঠ্‌বে।

কুঞ্জলাল

নাও, যত পার উপহাস কর! বিয়ে যখন করব না বলেচি তখনই তোমাদের দলছাড়া হওয়ার দরুণ তোমরা পিছনে লেগেছ।

বিনয়

আচ্ছা অবিনাশ দা, এ সম্বন্ধটি আবার ফেরান যায় না কোন গতিকে?

অবিনাশ

না হে না, ভেবে দ্যাখ—

'বিদায় ক'রেছ যারে নয়ন জলে

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে'

এত সাধাসাধি, আগ্রহ কুঞ্জ তা'ও যখন অগ্রাহ্য এবং প্রত্যাখ্যান করলে তখন আর ফেরাবার রাস্তা কোথায়? মাধবীর কাকা আমাকে কত ক'রে অনুরোধ করলেন, তোমরা বন্ধুবান্ধবে মিলে ছেলেটির মত করাও। তাঁকে জবাব দিয়ে এখন আবার বলতে গেলে ভাববেন কি?

বিনয়

না অবিনাশ দা, এতে তোমার নিজকে একটু compromise করতে হবে বৈত নয়; এটা বন্ধুবান্ধবের খাতিরে করতেই হবে।

অবিনাশ

কিন্তু করব কার জন্যে? কুঞ্জ যে সম্মতি দিচ্চে তা তোমাদের কে বল্লে? কি হে কুঞ্জ কি বলছ?

কুঞ্জলাল

নাঃ তোমাদের এখানে আর থাকা চলবে না, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করচ। আমি চললুম (গমনোদ্যত)

বিনয়

(কুঞ্জকে ধরিয়া) একটু দাঁড়াও কুঞ্জদা, অধীর হ'য়ো না। বল তুমি বিয়ে করতে রাজী, আমরা সব ঠিক ঠাক ক'রে নেব।

কুঞ্জলাল

মামা এত করে সেধে গেলেন তাঁর কথাতেই নড়লুম না, এখন তোমাদের মত গুটিকয়েক হতভাগার কথায় বিয়েতে মত দিলে লোকে বলবে কি?

অবিনাশ

(জনান্তিকে বিনয়ের প্রতি) ওহে ওষুধে ধয়েছে।

বনবিহারী

লোকের বলা বলিতে কি এসে যায় কুঞ্জ? মামার কাছে তোমার prestige আমরা নষ্ট হতে দেব না। সে সব আমরা ঠিক ক'রে নেব। শুধু একবার তুমি রাজী আছ বল।

কুঞ্জলাল

(কোপাবেগে) নাঃ, আমি আর থাক্‌ছি না, তোমরা যাই খুসী তাই কর।

(প্রস্থানোদ্যত)

অবিনাশ

(কুঞ্জকে ধরিয়া) আঃ, এই কথাটা যদি এতক্ষণ বল্‌তে তা হ'লেই আমাদের কাজ চলে যেত। যাক আমরা এবার সব ঠিক করে নেব। (কুঞ্জর সক্রোধে প্রস্থান)

বনবিহারী

অনেকদূর এগিয়ে এসেচে হে, চেষ্টা চালাতে থাক।

বিনয়

নিশ্চয়ই ! বিতান রচনা ক'রে তবে আমাদের বিরাম।

৭

রাস্তা

কুঞ্জলাল

(চলিতে চলিতে) এই যে বিনয়ের বাড়ির সুমুখে এসে পড়েছি। না, এখানে ঢোকা হবে না। সোজাসুজি বনবিহারীর বাড়িতেই যেতে হবে। মামীমার কান্না আর উপেক্ষা করা চলে না।

(বিনয় ও অবিনাশের প্রবেশ)

বিনয়

কি কুঞ্জদা, কোথায় চলেছ এত তাড়াতাড়ি ?

একটু বেহারীর কাছে যাচ্চি ভাই।

বিনয়

কেন ?

কুঞ্জলাল

পরে বলব।

অবিনাশ

কেন; আমার সাক্ষাতে বলতে আপত্তি আছে না-কি ? আমি তা'হলে পালাই হে বিনয়; বন্ধুর গোপনীয় কথা তুমি নির্ভয়ে শোন।

কুঞ্জলাল

না হে অবিনাশ, আপাততঃ গোপনীয় হলেও একথা তোমরা পরে সকলেই শুন্‌তে পাবে।

বিনয়

তাই নাকি ? কিন্তু এতে যে প্রবল কৌতূহল জন্মিয়ে দিলে। বল ত ব্যাপার কি।

কুঞ্জলাল

মাপ চাচ্চি ; পরে শুনবে এখন আমাকে যেতে দাও।

বিনয়

কুঞ্জদা, মুখের কথা বলে ফেল্লেই যখন ছাড় পাও তখন মিছে দেরী ক'রে কেন দগ্ধাচ্চ ? পরে যখন আমরা জানবই তখন এখন জান্‌লে এমন ক্ষতি আর কি হতে পারে ?

কুঞ্জলাল

ক্ষতি কিছুই নয়, তবে কিনা বলতে আমার একটু সঙ্কোচ হচ্চে।

অবিনাশ

সঙ্কোচ হচ্চে ? কি হে ব্যাপার খানা কি কুঞ্জদা ? ভাবিয়ে তুল্‌লে যে ভয়ানক।

(বনবিহারীর প্রবেশ)

বনবিহারী

এই বেলা দশটার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমরা ক'টিতে কি গণ্ডগোল বাধিয়েছ ?

এই যে বেহারী, তোমার খোঁজেই যাচ্চিলাম।

বনবিহারী

কেন বল ত ?

বিনয়

তোমার সঙ্গে নাকি কুঞ্জদা'র গোপনীয় কথা আছে।

কুঞ্জলাল

নাহে গোপনীয় নয়, তবে কিনা এখনি সকলকে জানাতে চাচ্চি না।

বনবিহারী

পরে যদি জানবেই তবে এখনি কেন ব'লে ফেল না। আমাকে তুমি হাজার দিব্যি দিয়ে বললেও আমি কি ওদের না ব'লে থাকতে পারব?

কুঞ্জলাল

এখন যে ওদের না বলতে পারি এমন নয়, তবে কি না একটু সঙ্কোচ হচ্চে।

বনবিহারী

চেষ্টা করলে তা কাটিয়ে ওঠা তেমন অসম্ভব হবে কি?

কুঞ্জলাল

(একটু ইতস্তত করিয়া) স্থাখ, কাল মামার চিঠিতে ভারি উদ্বিগ্ন হয়েচি। তিনি লিখ্‌চেন, মামীমার শরীর ইদানীং আর তেমন সুস্থ থাক্‌চে না; তার ওপর কোন দৈবজ্ঞ নাকি গণনা ক'রে বলেছে যে এবারে তাঁর ভয়ানক ফাঁড়া আসচে, তাতে জীবন-সঙ্কট; তাই তাঁর একান্ত দুঃখ হয়েচে এই ভেবে যে, তিনি কুঞ্জর বৌ দেখে মরতে পেলেন না। রোজ দুবেলাই নাকি এজন্যে অশ্রুপাত করচেন। জানইত অতি ছেলেবেলা থেকে আপন সন্তানের মত তিনি আমাকে দেখে আসচেন। বুঝ্‌তেই পারচ এ অবস্থায় আমি কি ভয়ানক ফাঁপরে পড়েছি।

অবিনাশ

তা ফাঁপড়ে পড়ার কি আছে, মাধবীর বোধ হয় এখনো কোথায়ও সম্বন্ধ হয় নি।

বিনয়

কুঞ্জদা, তোমার মাধবীবিতানে এই অভাগাদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করো! জানই ত 'মিষ্টান্নমিতরে জনা!' এই কয়টি ইতর লোককে ভুলে থেকো না।

বনবিহারী

ওহে অত আশা ক'রো না বিনয়, ব্যাপারটি অত সহজ নয়; মনে হচ্চে কাল যেন শুনেছিলাম অন্যত্র মাধবীর সম্বন্ধ হচ্চে। তা স্থাখ কুঞ্জ, আমি মাধবীর জন্যে চেষ্টা করব, কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য হব কিনা বল্‌তে পারি নে। তবে তার জন্যে ভাবনা কি? অনেক ভালো মেয়ে পাওয়া যাবে। কি বল কুঞ্জ!

বিনয়

কিন্তু তা হলে যে দাদার তামিলভাষা শেখা হবে না। সেই লোভেই ত কুঞ্জদা—

অবিনাশ

আর রান্না খাওয়ার লোভটি বুঝি তুচ্ছ?

অবিনাশ

না, মোটেই তুচ্ছ নয়, সেইটি হল গিয়ে এই ব্যাপারের পুচ্ছ।

কুঞ্জলাল

মাধবী আমার স্ত্রী হ'য়ে রান্না রাঁধ্‌লে তোমরা তোমাদের পুচ্ছ নিয়ে কত দূরে থাক্‌তে তা দেখা যেত। অবশ্য এখন তোমাদের সে ভয় দেখানো বৃথা, কারণ (ম্লানমুখে) তাঁর ত' অন্য জায়গায় সম্বন্ধ হয়ে গেছে!

বনবিহারী

কুঞ্জ, এতক্ষণ তোমার মন পরীক্ষা করছিলাম। মাধবীর সম্বন্ধের কথা মিথ্যা। তুমি নিশ্চিন্ত হও, মাধবীর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

কুঞ্জলাল

তোমার কোন কথাটি বিশ্বাস করব বিহারী?

বনবিহারী

শেষ কথাটা।

বিনয় ও অবিনাশ

জয় বেহারীদা'র জয়

জয় কুঞ্জদা'র জয়

জয় মাধবীবিতানের জয়।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শেফালি

—উপন্যাস—

—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

১১

সন্ধ্যা বেলা নিজের ঘরে শুইয়া আছি, বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—অনপনেয় অতল অচল বিষাদ বেদনার মত। এই মূক মৌন পৃথিবী—মানুষের স্মরণাতীত কাল হইতে যে এই অনন্ত জীব-প্রবাহ বক্ষে লইয়া স্নেহ-পরায়ণা মাতার মত নিরলস অবহিত যত্নে পালন করিয়া আসিতেছে, সেই চির স্নেহোৎকণ্ঠিতার অন্তর তলে সুপ্ত যুগযুগান্তরের সঞ্চিত সমস্ত বিচ্ছেদ বিনাশ বিধ্বংশের ও ক্ষতির অন্তহীন দুঃখ যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

পথের ধারে জলের নালা খাল যখন সাগরে আসিয়া মেশে,—তখন নালার কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে সাগরের জল, ও বুকের উপর বহিতে থাকে সাগরের ঢেউ। পৃথিবীর বুকজোড়া এই নিরশ্রু নির্ব্বাক গভীর গোপন ক্রন্দনের ব্যথা আমার সারা বুক জুড়িয়া তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল, আমি তাহার ভিতর মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিলাম।

অবহিত হইলাম শেফালির ডাকে। শেফালি বলিতেছিল, "সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছ যে—অসুখ কোরেছে?"

শুষ্ক স্বরে বলিলাম—"না।"

সংসারে এক রকম লোক আছে যাহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেও ছদ্ম আত্মীয়তা ও হিতৈষণার প্ররোচনায় পর মুহূর্ত্তে দ্বিগুণ উৎসাহে হাসিমুখে প্রীতি নিবেদন করিতে আসে। শেফালির উপর আমার বিরাগের নিদর্শন যতই সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, ততই সে এই নির্লজ্জ নীচতার দ্বারা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রকাশ করিতেছিল।

প্রহারেণ ধনঞ্জয় নীতি অনুসরণ করিয়া সে যেন পণ করিয়া বসিয়াছে যে, চক্ষু বুজিয়া সকল তিক্ততা বিরক্তি বিদ্বেষ গলাধঃকরণ করিয়া, মৌখিক শিষ্টতার অন্তরালে সে যে জায়গা অধিকার করিয়াছে, সেখান হইতে এক তিলও নড়িয়া বসিবে না।

শেফালি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মাথা ধরেছে বুঝি? মেন্থল্ দেব?"

অতিষ্ঠ হইয়া বলিলাম, "না কিছু দিতে হবে না।"

শেফালি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "ওঁর জন্যে কি হ'বে এবেলা?"

"যা আছে তাই হবে". বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

শেফালি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মানুষ কেন মানুষকে খুন করে, মাথা ফাটায়, ঘরে আগুন লাগায়—সহসা তাহার সুস্পষ্ট প্রতীতি আমার মনে উদয় হইল। আমার মনে হইল আমার সম্মুখে,—ক্রূর, কারুণ্যলেশহীন, অবিচলিত নিয়তির মত দণ্ডায়মান শেফালির মাথায় এমন জোরে একটা আঘাত করি যে, চূর্ণ হইয়া সে লুপ্ত হইয়া যায়!

শেফালি কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে চলিয়া গেল।

আমি উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। কেন যে হইলাম, তাহাও বলিতে পারি না। একটা অধীর উত্তেজনা আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। এখানে সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি শেফালির দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, এবং অন্ধকারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহাকে নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিলাম।

ঘরের মাঝখানে বাতি জ্বলিতেছে—শেফালি বিছানার একপাশে হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছে। খোলা চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া। ক্লিষ্ট পীড়িত দৃষ্টিতে আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

হঠাৎ ঠাকুরপো আসিল। অন্ধকারে সে আমাকে না দেখিয়া সোজা শেফালির ঘরে প্রবেশ করিল।

অত্যন্ত মৃদু ও কোমল স্বরে ঠাকুরপো বলিল, "বৌঠান, আমাকে মাপ করুন—অপরাধ করেছি আপনার কাছে।"

শেফালি মাথা তুলিয়া চাহিল, বাতির আলো তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখে প্রতিফলিত হইল। কে জানে কোন্ দুঃখে তাহার এই গোপন অশ্রুপাত!

ঠাকুরপো তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি সব শুনেছি—আপনাকে সান্ত্বনা দেবার আমার কোনো ক্ষমতা নেই—আমার শ্রদ্ধা আমি আপনাকে নিবেদন কচ্ছি।"

ঠাকুরপো শেফালিকে প্রণাম করিতে গেল, শেফালি তাহার হাত দু'খানা ধরিয়া ফেলিয়া তাহার উপর অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

আস্তে আস্তে পা টিপিয়া আমি সেখান হইতে আমার ঘরে চলিয়া গেলাম। শেফালিকে লইয়া এই যে প্রহেলিকা প্রতিদিন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিয়া উদ্বন্ধন রজ্জুর মত আমার গলা আঁটিয়া ধরিতেছে—ইহার হস্ত হইতে আমি কিরূপে ত্রাণ পাইব! আমার সুখের বাসরে কোথা হইতে কাল নাগিনীর মত আসিয়া সে বিবর রচনা করিল! অসাধারণ স্বামী সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। আমি সুন্দরী নহি—তবু আমার দর্শনে তাঁহার আনন্দ-উদ্ভাসিত নেত্র আমায় বলিয়াছে যে আমি সুন্দরী কুল শ্রেষ্ঠা; আমি গুণহীনা, কিন্তু তাঁহার আকুল সঙ্গ-কামনা আমাকে জানাইয়াছে যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবতী। চোরের মত আসিয়া শেফালি আমার সেই অনুপম স্বামী সৌভাগ্য কোন্ মন্ত্রে হরণ করিয়া নিল!

অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমি স্পন্দমান প্রতীক্ষায় বেগব্যাকুল হৃদয়ে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারের কুক্ষি হইতে বহির্গত সুন্দরী শ্যামা ধরিত্রীর মত সহসা আমার চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত হইবে আমার চির-অপগত সুখ রজনীর সেই নিমেষলীন বিহ্বল বিনিদ্র প্রহরগুলি; আমি যেন শুনিতে পাইব আমার কাণের কাছে সেই অস্ফুট গুঞ্জন—বীণার তারেও যাহার রেশ বাজানো যায় না; আমি যেন দেখিতে পাইব অধীর আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সেই মুখ—বিশ্ব ভুবনে যাহার আর তুলনা মিলিবে না। সর্ব্বনাশিনী শেফালি! বিরাট এই বসুন্ধরার ভিতর তাহার কি আর কোথাও থাক্‌বার জায়গা জুটিল না। তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া আমি ত' কিছুমাত্র দায়ী ছিলাম না! আমার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সে আমার সুখের ঘরে আগুন লাগাইতে আসিল!

শেফালি তাঁহার সম্মুখে বাহির হয় না—এতদিনে তাহার অর্থ আমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। এ সবই তাহার ছলা কলা,—দুরবগাহ ধূর্ত্ততার সতর্ক নিপুণ ফাঁদ ফেলিয়া সে তাহার দুরভিসন্ধির পথ দিন দিন পরিষ্কার করিয়া লইতেছে, আর আমি নির্ব্বাক্ নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, তিল তিল করিয়া তিনি তাহার পাতা ফাঁদে কেমন করিয়া জড়াইয়া পড়িতেছেন। দুরতিক্রমনীয় চাতুরীর দুশ্ছেদ্য জাল বিস্তার করিয়া এই মায়াবিনী রাক্ষসী আমার ঘর সংসার তাহার করতলগত করিয়াছে, আমার ছেলে আমার বুক হইতে কাড়িয়া নিয়াছে—অবশেষে আমার জীবনের সর্ব্বস্বধন, হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন, আমার স্বামীকে গ্রাস করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; চোখের জলে আমার বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। অধীর যন্ত্রণায় শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

অনেক রাত্রে উনি শুইতে আসিলেন। বাতি হাতে করিয়া মাটিতে যেখানে আমি শুইয়াছিলাম, সেখানে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি চক্ষু বুজিয়া ছিলাম, তবু তাঁহার স্থির দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গে ছুঁচের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ লজ্জায় আমার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেখান হইতে আমার উঠিয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা হইল।

টেবিলের উপর বাতি রাখিয়া উনি আমার কাছে আসিয়া বসিলেন; আমার কপোলের উপর আমি তাঁহার অধর-স্পর্শ অনুভব করিলাম; আমার মুদ্রিত চক্ষের উপর দুই ফোঁটা উষ্ণ জলবিন্দু পতিত হইল; আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কাহার জন্য উদ্দিষ্ট এই চুম্বন, কাহার স্মৃতিতে

আকুল এই অশ্রু, কাহাকে মনে করিয়া এই ব্যগ্র ব্যাকুল সোহাগ-নিবেদন। ধিক্কার ঘৃণায় লজ্জায় আমি মরিয়া যাইতে লাগিলাম।

ধীরে ধীরে আমার মাথা নাড়িয়া তিনি ডাকিলেন, "সুর"।

উত্তর দিতে গেলে পাছে কণ্ঠতটে অবরুদ্ধ ক্রন্দন বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আমি শক্ত করিয়া ঠোঁট চাপিয়া রাখিলাম।

কাঁধ ধরিয়া একটু খানি নাড়া দিয়া বলিলেন, "মাটিতে শুয়ে রয়েছ কেন ?"

বলিলাম, "গরম লাগে।"

খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "রাগ কোরেছ কি ?"

"না।"

কিন্তু এ কথায় নিরস্ত হইলেন না, হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন "ওঠ, চল শুই গিয়ে।"

তিক্ত কণ্ঠে কহিলাম "তুমি শোওনা গিয়ে—আমাকে টান্‌ছো কেন !"

"কি যে তুমি ভাব্‌ছো,—কিসের যে কি অর্থ কর্চ্ছ—কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। কি অপরাধ কোরেছি আমি বল-ই না !"

দুর্জ্জয় ক্রোধের সঙ্গে দুর্ব্বার ঘৃণা শিখা বিস্তার করিয়া আমার প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। শুষ্ক-স্বরে কহিলাম, "অপরাধ আর কি !"

আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া উনি নীরবে গিয়া শয়ন করিলেন।

টেবিলের উপর মোমবাতিটা জ্বলিয়া গলিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল। উজ্জ্বল আলোতে একদিকে উনি ও অপরদিকে আমি শববৎ পড়িয়া রহিলাম।

১২

একদিন সকালে উঠিয়া নীচে নামিতে নামিতে দেখিলাম, শেফালির ঘরের কপাট বন্ধ। এমনটি কখনও হয় নাই। ঘুম হইতে উঠিয়া কেহ কখনও শেফালিকে শুইয়া থাকিতে দেখে নাই। সকলের আগে উঠিয়া সে চারিদিক্‌কার বন্ধ জানালা কপাট খোলে, ঝাঁট-পাট দেয়—ষ্টোভ্ জ্বালিয়া চায়ের জল বসায়।

আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কপাটে ধাক্কা দিলাম, প্রথমে শব্দ নাই, অনেক ঠেলাঠেলির পর কপাট খুলিল—আমি ভয়ে পিছু হটিয়া দাঁড়াইলাম।

চারিদিকে তখন প্লেগের ধূম চলিতেছিল। শেফালির গাল গলা ফোলা, চক্ষু রক্তবর্ণ—চলিতে না পারিয়া সে টলিতেছে।

ব্যগ্র কণ্ঠে শেফালি বলিল,—"দিদি আমার প্লেগ হয়েছে, এ ঘরে তুমি এসো না। খোকাকে নিয়ে আজই তোমরা রাঁচি চ'লে যাও।"

—প্লেগ! আমার অজ্ঞাতসারে আমি দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই মৃত্যুদূতের আগমনে আনন্দগুঞ্জন জাগিয়া উঠিল। তমিস্রা রাত্রির অবসানে ঊষার আভাষের মত যে নব দিবসোদয়ের বার্ত্তা এই করাল আগন্তুক বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া বিহ্বল উদ্বেলচিত্তে আমি বলিলাম, "স্বাগত!"

শেফালি পড়িতে পড়িতে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "চ'লে যাও এখান থেকে, চ'লে যাও—দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন এখনো।"

অবহিত হইয়া আমি ঠাকুরপোকে ডাকিতে ছুটিলাম।

গামছা ও টুথ ব্রাশ্ লইয়া ঠাকুরপো মুখ ধুইতে যাওয়ার আয়োজন করিতেছিল, সংবাদ শুনিয়া সব ফেলিয়া দিয়া শেফালির ঘরে দৌড়িল।

একটু পরে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসিয়া ঠাকুরপো আমাকে বলিল, "বৌঠান, ছোট বৌঠানের প্লেগই। আর হয়েছে বোধ হয় বেশ খারাপ টাইপেরই। পোঁট্‌লাকে নিয়ে আর আপনার দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে আপনি রমেশ বাবুর বাড়ী চ'লে যান্। মুকুলকে ডাকুন—চট্‌পট্ সব সেরে নিন্, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে যাই।"

ঠাকুরপোর সার্ট ধরিয়া আমি টানিয়া রাখিয়া বলিলাম, "তোমাকে প্লেগের মুখে ফেলে আমি একা পালাব ?"

"আপনি পালাতে যাবেন কেন। আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি, আপনি যেতে বাধ্য। সংসারে আপনারা সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বটে—কিন্তু আপনাদের রক্ষার ভার চিরকালই আমরা বহন করে এসেছি।—দাদার অবর্ত্তমানে সে ভার আজকের দিনের মত আমার হাতে এসে পড়েছে—আমি আপনাকে হুকুম কচ্ছি যেতে।"

বিছানাপত্র বাঁধা ছাঁদা হইয়া গেলে আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সে তখন তাহার দাদাকে জরুরী তার করিতেছিল। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করিয়া পকেটে পুরিয়া ফেলিয়া বলিল, "হয়েছে আপনার?"

"হয়েছে ত, কিন্তু এরকম ভাবে যেতে মন সরছে না!"

"আপনার ত না গিয়ে উপায় নেই, কি আর করবেন বলুন। ছোট বৌঠানের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন না? হাজার হোক্ শেষ দেখা একবার করা উচিত।"

খোকা আমার কোলে ছিল, ঠাকুরপো হাত বাড়াইয়া বলিল, "আয় কাক্কা আয়!"

খোকা ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে গেল।

শেফালির ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি বলিলাম, "কেমন আছ?"

রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া অস্পষ্ট স্বরে শেফালি বলিল, "পালাও, পালাও এখান থেকে!—কেন আবার এসেছো!"

কেমনতর অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিলাম; বলিলাম, "আমি ত যাচ্ছি, তোমার যদি কোনও ইচ্ছা থাকে আমায় বল।"

শেফালির স্ফীত রোগ-যন্ত্রণা-পাণ্ডুর মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক হাসি ফুটিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না—কি আর ইচ্ছা থাক্‌বে!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"ও কিছু নয়। একটা কথা মনে রাখ্‌বে দিদি? এইটে বিশ্বাস কোরো—জ্ঞানতঃ অথবা ইচ্ছা ক'রে আমি তোমার কাছে কোনও অপরাধ করি নি।"

শেফালির মুদ্রিত নয়ন-প্রান্ত হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িল। একটা রূঢ় অভিশাপ আমার মুখের কাছে ঠেলিয়া আসিল। মনে মনে বলিলাম, ধন্য সুচতুরা অভিনেত্রী! মরণ যখন তোমার শিয়রে দাঁড়াইয়া তখনও তোমার ছলা কলার শেষ নাই! এই চাতুরীর বলেই তুমি আমাদের মাঝখানে তোমার বিজয়-ধ্বজের দণ্ড খাড়া করিয়াছ!

যথাসম্ভব মুখের ভাব অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া আমি বলিলাম, "যাই তবে।" কোনও কল্যাণাশীষ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

ঠাকুরপো বাড়ীতে রহিল। আমার এক প্রতিবাসী শ্বশুর আমাকে ও খোকাকে লইয়া রাঁচি রওনা হইলেন। গাড়ী যতই সম্মুখে ছুটিতে লাগিল, আমার উদ্বেগকাতর মন ততই পিছনের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ও আমার অনুপস্থিতিতে সেখানে আর কিছুক্ষণ পরে যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, তাহার বহ্নিময় চিত্র আমাকে দহন করিতে লাগিল।

রাঁচি পৌঁছিয়াই ঠাকুরপোর টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আমি কাঁপিতে লাগিলাম—শেফালির মৃত্যুসংবাদের পরিবর্ত্তে যদি তাহা তাহার আরোগ্যসংবাদ বহন করিয়া আনিয়া থাকে!

আমার হাত হইতে আমার সহযাত্রিক শ্বশুর মহাশয় তার লইয়া পড়িয়া বলিলেন, "শেষ হয়ে গেছে! আহা বেচারী! কি ভাল মানুষ ছিল। এ রকম মেয়ে সহসা দেখা যায় না।"

আমি ঘরের ভিতর গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলাম। লোকের কাছে কপট কান্না কেমন করিয়া কাঁদিব! আব্রহ্মস্তম্ব জগতের সকল প্রাণী সুখে থাক্, আনন্দে থাক্, চিরায়ুযুক্ত হইয়া থাক, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু যে আমার অন্নে পুষ্ট হইয়া আমারই গলায় পা দিয়া দাঁড়াইবে—তাহাকে আমি নিপাত যাইতে বলিব না কেন? আঃ বাঁচা গেল! বাঁচা গেল! সকল দুর্ভাবনা সংশয় শঙ্কা, বেদনা অন্তর্দাহ অশ্রু ধারার আজ অবসান হইল!

দিন যাইতে লাগিল। একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ চলিয়া গেল, ক্রমে একপক্ষ কাটিল। কিন্তু আর কোনো

খবর নাই। একটা সংশয়, দুর্ভর উৎকণ্ঠা থাকিয়া থাকিয়া আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আমি দিন গণিতে লাগিলাম, ঘণ্টা গণিতে লাগিলাম,—কৈ উনি ত আসিতেছেন না! ঠাকুরপোই বা কিছু লেখে না কেন! একলা বাড়ীতে সেখানে তাহারা দুই ভাই কি করিতেছে।

অবশেষে একদিন চক্রঘর্ঘরশব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া বাক্স বিছানা মাথার উপর লইয়া একখানা গাড়ী আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। দৌড়াইয়া গিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম, উনি আসিয়াছেন।

একটু পরেই বাড়ীর ভিতর আসিলেন,—তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একি, তাঁহার এই শুষ্ক শীর্ণ কালিমালিপ্ত মূর্ত্তি কেন! চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে কেন! সংস্কারহীন রুক্ষকেশ বিক্ষিপ্ত বিপর্য্যস্ত কেন! মূর্ত্তিমান্ বিরহব্যথার মত তাঁহার সেই শোকোদ্ভ্রান্ত ছন্নমূর্ত্তি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল।

সহসা তাঁহার পরিচ্ছদের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। গায়ে শুধু উত্তরীয় জড়ানো, পরিধানে থান কাপড়—এ অশৌচের বেশ তাঁহার কেন?

ঘরের মাঝখানে উনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—সুদূর, স্বতন্ত্র অপরিচিতের মত।

দুইজন দুইজনের সম্মুখে কতক্ষণ যে এভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম জানি না—হঠাৎ আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম, "শেফালি তোমার কে—সত্যি ক'রে আমায় বল!"

স্থির অকম্পিত কণ্ঠে উনি বলিলেন, "শেফালি আমার প্রথম বিবাহের স্ত্রী—

একটা অস্ফুট চীৎকার—আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—আমি তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম।

হাত ধরিয়া উঠাইয়া তিনি আমাকে চৌকির উপর বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কথা আমার কাছে কেন এতদিন গোপন করেছিলে?"

"আমি তোমায় ভালবাস্‌তাম সুরো! যে বিবাহের শুধু স্মৃতি মাত্রই আমার মনে ছিল, সেই বিবাহের কথা তোমাকে ব'লে তোমার জীবন নিরানন্দ কর্ত্তে আমি চাই নি। আমাকে যখন বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন তার পূর্ব্বে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, মারাটে কলেরা হ'য়ে আমার স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি টের পাই যে আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা মিথ্যা—শ্বশুরের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে বাবা এই রকম ক'রে প্রতিশোধ নিয়েচেন। আমার বয়স তখনো অল্প,—যে বয়সে ধারণা জন্মায়, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা কর্ব্বার শক্তি জন্মায় না,—যে বয়সে প্রাণের ভিতর আগুন স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে—কিন্তু তার দাহিকা শক্তি হয় না,—যে বয়সে নিজের ভাল-মন্দের জ্ঞান উদয় হয় কিন্তু জোর ক'রে কিছু করবার সাহস হয় না,—সেই অপরিণত বয়সে আমি এই দুস্তর প্রমাদে পড়েছিলুম। সে অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে না পেরে শুধু মাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম যে, আমার প্রথম বিয়ের কথা তোমাকে যেন কিছুতে জানানো না হয়। ঈশ্বর জানেন—এ ছাড়া আমি তোমার কাছে কোনো অন্যায় বা অপরাধ করি নি সুরো!"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তিনি বল্‌তে লাগলেন, "বড় হয়ে সে আমার কাছে চিঠি লিখ্‌লে তাকে নিয়ে যেতে। শপথ ক'রে সে লিখেছিল যে, সে তোমার ও আমার মাঝখানে কোনো স্থান অধিকার কর্ব্বে না—এমন কি সে আমার দর্শনাকাঙ্খা পর্য্যন্ত কর্ব্বে না। আমার গৃহে সে শুধু মাথা রাখ্‌বার একটু ঠাঁই চেয়েছিল। আমি পুরুষ—আমি তার স্বামী—সুতরাং সে যখনি অসহায় হয়ে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কল্লে—তখন আমি তাকে নিষেধ কর্ত্তে পাল্লুম না।"

তাঁহার কম্প্র কণ্ঠ দুর্নিবার আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল। একটু থামিয়া আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে আমি তোমায় বলছি—এতদিনের মধ্যে ভ্রমক্রমেও সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করেনি—এবং আমাকেও কর্ব্বার কোন অবকাশ দেয় নি। তার প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে গেছে—আমি এসে দেখ্‌লুম—শুধু শ্মশানে তার চিতাগ্নির শিখা—তার কথা সে অটুট অক্ষুণ্ণ রেখে চ'লে গেছে!"

ঝর্ ঝর্ করিয়া তাঁহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সহসা একটা দারুণ লজ্জা তীব্র কশাঘাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিয়া গেল। শেফালি তাঁহার প্রথম বিবাহের স্ত্রী—তাঁহার সহধর্ম্মিনী—অর্দ্ধাঙ্গিনী—ইহ পরকালের সঙ্গিনী ; আর আমি মাত্র তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী !

আমার সকল গর্ব্ব সকল অভিমান ধূলিসাৎ হইয়া গেল। শেফালির সকল কথা সকল আচরণ মনে পড়িল—আমার ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির মালিন্যময় চিত্রের সম্মুখে তাহার মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—দুঃখে অচপল, স্নেহে অবিচল, সেবায় অবিশ্রান্ত—সর্ব্বংসহা, সর্ব্বত্যাগিনী, নিরভিমানিনী, অনাদৃতা, অকুণ্ঠিত আত্মসুখোৎসর্গের মহিমায় মহীয়সী শেফালী,—সবই যাহার ছিল—কিছুই যে লয় নাই। দুই হাত ভরিয়া সে তাহার সুখ-সাধ, অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষা-আকিঞ্চন আমারই পায়ে ঢালিয়া দিয়া আমার রোষ, অবজ্ঞা, অপমান, ঈর্ষার বিষোদ্গীরণ হাসিমুখে অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া গিয়াছে !

নিজের হীনতায় ও দীনতায় মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়া আমি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলাম—"আমায় তুমি ক্ষমা কর" !

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

নীরব প্রেম

শ্রীসুকুমার সরকার

তুমি বলো, 'মোরে ভালোবাসো'—
আমি বলি, 'জেনেও না জানি' ;
তুমি শুনে মৃদু মৃদু হাসো
বলো শুধু, 'সে কথা না মানি !'
আমি বলি, 'মাধবী লতাটি
সহকারে ঘিরে ঘিরে রয় ;
সে ত তবু বলে না কথাটি,
সে কি তবে ভালবাসা নয় ?
কাননের আননে চাহিয়া
কোকিলা ত মুখরিয়া ডাকে ;
বন তবু ওঠে কি গাহিয়া
নীরবে সে মুকুলিয়া থাকে !'

বিবিধ সংগ্রহ

আমেরিকার বৈচিত্র্য

হিমাংশুকুমার বসু

বর্ত্তমান যুগ যে যান্ত্রিক যুগ তাহা বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে যখন আমরা আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের দিকে তাকাই। শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার সকলই যন্ত্রে প্রস্তুত ত হইতেছেই, উপরন্তু দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম পর্য্যন্ত সে দেশের মানুষ যতদূর সম্ভব যন্ত্রের সাহায্যে করে। ঘরঝাঁট, কাপড়কাচা, জমা-খরচ রাখা, জুতা পালিশ করা প্রায়-সবই

সমুদ্র তীরে প্রমোদরত আমেরিকান নরনারী

যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকলেই নিজের নিজের কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কি প্রকারে পয়সা উপার্জ্জন করা যায় তাহার নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেই সব সময় কাটিয়া যায়। মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে মানুষকে যতখানি সহজ সরল হৃদয়ের পরিচয় দিতে হয়, যতখানি আন্তরিকতার আভাস দিতে হয়, তাহা সাধারণ মার্কিণ সমাজে দুর্লভ। সমস্ত সময়ই business talks লইয়া সকলে ব্যস্ত। এমন দিন হয়ত শীঘ্রই আসিবে যে দিন প্রত্যেক মার্কিণীই কেবলমাত্র মনুষ্য-পর্য্যায়ভুক্ত থাকিলেও কাজে কর্ম্মে এক একটি মূর্ত্তিমান যন্ত্র বিশেষ হইয়া দাঁড়াইব। এই সেব কারণে প্রথম দৃষ্টিতে মার্কিণ জাতি বিদেশীর নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না। তবে ইহার যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না তাহা বলিলে অত্যুক্তি করা হয়।

অন্যান্য দেশের গ্রামবাসীর ন্যায় এদেশের গ্রামবাসীরাও মোটামুটি অতিথিপরায়ণ। গ্রামে কোন ভদ্রপরিবারের মধ্যে কিছুদিন বাস না করিলে, মার্কিণ-সামাজিক জীবনের জ্ঞান অনেকটাই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ব্যবসায় সম্পর্কে লিপ্ত থাকিলেও, গ্রামের মধ্যে সামাজিকভাবে মেলামেশা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ইহারা যথেষ্ট খরচ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি কুটীরের চতুঃপার্শ্বে ফুলের বাগান থাকিবেই, চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গৃহমধ্যের আসবাবপত্র ফিটফিট সাজান। অধিবাসীরা যতই দরিদ্র হউক্ না কেন প্রত্যেকেরই পরিচ্ছদ সুসংযত ও পরিচ্ছন্ন। উদ্যান সংলগ্ন জমিতে টেনিস খেলিবার মাঠ থাকে ও গৃহভ্যন্তরে পিয়ানো বা অর্গানও সকলেরই একটা না একটা থাকে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে মোটর গাড়ী সংখ্যাতীত এবং কর্ম্মবীর ফোর্ডের কল্যাণে মূল্য এত

সুলভ যে প্রায় গ্রামেই গৃহস্থেরা মোটর গাড়ী রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তবে ঐগুলির চেহারা অতি বিচিত্র। সস্তাদরে পুরাতন ইঞ্জিন কিনিয়া উহার উপরকার 'বডি' যা তা কাঠ দিয়া কোন প্রকারে নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লয়, কাজেই নানা প্রকারের কিম্ভুতকিমাকার কৌতুকপ্রদ 'বডি' যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ বা কোন প্রকারে মাত্র 'বডি'টা

"ট্রিবিউন বিল্ডিং" সিকাগো

তৈয়ার করিয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে সে আর রং করিতে পারে নাই, কেহ বা শুধু কেরাসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স দিয়াই 'বডি' তৈয়ার করিয়াছে, কোনটির আকার গোল, কোনটি তিনকোনা কোনটির ছাত চূড়ার ন্যায় উপরে উঠিয়া গিয়াছে, যে যেমন করিয়া পারিয়াছে কোনপ্রকারে 'বডি' দাঁড় করাইয়াছে।

নিউইয়র্ক সহরে নামিবামাত্রই প্রথমে চোখে পড়ে এই সহরের দৈত্যকায় আকাশচুম্বি অট্টালিকাশ্রেণী—মনে হয় যেন কোন অতিকায় পক্ষী তাহার বহুদূরব্যাপী পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশের দিকে উড়িতে চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত টই জ্যামিতিক আকৃতিতে গঠিত, রাস্তাগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং কোথাও সামান্যমাত্র না বাঁকিয়া সরল রেখার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক রাস্তাই নির্দ্দিষ্ট সমঅবয়ব স্থানের পর পর নির্ম্মিত। সহর নির্ম্মানের দোষত্রুটি যাহা প্রাচীন নগরগুলিতে লক্ষ্য করা যায় তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান আমেরিকার সহর হইতে যতদূর সম্ভব ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। অধুনা নির্ম্মিত নগরগুলি একদিকে যতই নিখুঁত হউক না কেন, পুরাতন সহরগুলির আঁকা বাঁকা রাস্তা, স্থানে স্থানে মাঠ, বাগান ও নানাপ্রকারের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক যে সব স্বভাবজাত দৃশ্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কোনটাই নূতন দিয়া পূরণ করা যায় না। সহরের অধিকাংশ রাস্তা অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও গগনচুম্বি ২০।২৫ তালা অট্টালিকাদির নীচের তালাগুলি দিনের বেলাও অধিকাংশ সময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে ও বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে আলোকিত করিয়া রাখিতে হয়। মোটর-

চলাচল নিয়ন্ত্রিত করিবার ঘর

গাড়ীর বাহুল্য হেতু রাস্তা যতই চওড়া হউক না কেন সর্ব্বদাই ভীড় লাগিয়াই আছে। সহরের চতুর্দ্দিকে সহরতলীতে সর্ব্বত্রই বাস্ ও ট্রেনে যাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক সহরে সব সময়েই এত অধিক বাস্ ও মোটর গাড়ী চলাচল করা সত্ত্বেও, তুলনায়, দুর্ঘটনার সংখ্যা নামমাত্রই, তাহার কারণ যানবাহনাদি চলাচলের সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মাবলী। পৃথিবীর আর কোন সহরে দুর্ঘটনার সংখ্যা এত অল্প নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন চৌরাস্তার মোড়েই পুলিশ নাই, অথচ অতীব সরল সহজভাবেই যানবাহনাদির চলাচল নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। চৌরাস্তার হয়ত ২।৩ মাইল দূরে 'কন্ট্রোল কেবিন' রহিয়াছে এবং সেই স্থান হইতেই কোন প্রহরী আলো জ্বালাইয়া সঙ্কেতে
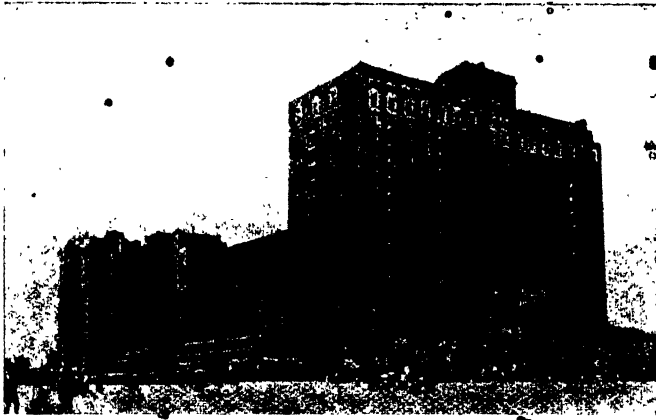
আমেরিকার আধুনিক ভোজনাগার

গমনাগমনের ব্যবস্থা করিতেছে। পথের ধারে লাল আলো জ্বলিবামাত্রই সকলকে থামিতে হইবে ও সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠিবামাত্রই চলিতে হইবে। লাল আলো জ্বলিবার ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাবধান করিবার জন্য পীত আলো বার বার জ্বলিতে ও নিভিতে থাকে, ইহা দেখিয়া মোটরচালকেরা সাবধান হয় এবং মোটরের গতি হ্রাস করিয়া ব্রেক কসিবার জন্য প্রস্তুত হয়। সবুজ আলো জ্বলিবামাত্রই মোটর বাহিনী পূর্ণবেগে দৌড়াইতে থাকে। বড় বড় রাস্তার মোড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি করিয়া লোহার পুলের ন্যায় মোটরধরা ফাঁদ পাতা থাকে এবং এইগুলি সব রাস্তার মেঝের সহিত গাঁথা। মোড়ে লাল আলো জ্বলিবার পরও যদি কোন মোটরচালক এই সঙ্কেত না মানিয়া রাস্তা পার হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে পুলের উপর মোটরের চাকা পড়বামাত্রই পুল উপর দিকে উঠিয়া পড়ে এবং পুলের চারিদিকের তীক্ষ্ণ ছুরীর ফলায় টায়ার কাটিয়া ত যায়ই, অধিকন্তু গাড়ীতে ভীষণ ঝাঁকুনি লাগে। সবুজ আলো জ্বলিবার পর পুলের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া গেলে পুল লাফাইয়া উঠে না। ছোট ছোট রাস্তার মোড়ের আলো একবার নিভিয়া পরমুহূর্ত্তেই আবার জ্বলিয়া উঠে, ইহার দ্বারা সঙ্কেত করা হইতেছে যে গাড়ীকে একেবারে থামাইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাও, আবার কোন কোন রাস্তার মোড়ে একবার দক্ষিণ দিকে লাল আলো ও বাঁম দিকে সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠে এবং এক মিনিট পরেই রং পালটাইয়া যায়। এই প্রকারের নানা চমকপ্রদ ও আশ্চর্য্য উপায়ের দ্বারা যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। অনেক রাস্তায় মানুষের যাতায়াতও এই প্রকারের আলোর সাহায্যে ঠিক করা হয়। মাঝে মাঝে পারাপারের জন্য রাস্তার উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

মোটরবাসে উঠিয়া কণ্ডাক্টারের নিকট টিকিট কিনিবার প্রয়োজন নাই, দশ সেণ্ট মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা একটি পিস্তলের আকারের যন্ত্রের ফুটার মধ্যে ফেলিয়া দিলেই দ্বার আপনা আপনিই খুলিয়া যায় এবং তখন গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিতে হয়। যে সব রেলগাড়ী সহর হইতে সহরতলীসমূহ পর্য্যন্তই যাতায়াত করে, সে সব স্থানেও টিকিট কিনিবার প্রয়োজন হয় না। ষ্টেশনগুলির অবস্থিতি কেবলমাত্র ডলার (মুদ্রা) ভাঙাইয়া ভাঙানি লইবার জন্যই। প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ফটকের সহিত সংলগ্ন একটি ফুটার মধ্যে ফেলিয়া দিলেই ফটক খুলিয়া যায় এবং তখন যাত্রী প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়া ট্রেণে চড়িতে পারে। এই যন্ত্রগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল এতই আশ্চর্য্যজনক ও নিখুঁত যে যদি কেহ ঐ ফুটার মধ্যে কোন অচল মুদ্রা ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অবিরত ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের কবলে যাইতে হয়।

নিউ ইয়র্কের অধিবাসীরা ছুটীর সময় "কোনি দ্বীপ" নামক নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে গিয়া অবসর সময় যাপন করে। 'কোনি দ্বীপকে' ইংলণ্ডের উয়েম্বলী একজিবিশনের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে। তথায় বৈদ্যুতিক নাগরদোলা, ভ্রাম্যমান চক্র ইত্যাদি নানাপ্রকারের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। সামান্ত মূল্য দিয়া পঁচিশ ত্রিশ খানা টিকিটের একটি পুস্তক ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। আমোদ প্রমোদের যে কোন স্থানে যাইতে হইলেই তাহারা এক একখানি টিকিট ছিঁড়িয়া লয়।

আমেরিকায় ট্রেন-ভ্রমণ বিশেষ আরামপ্রদ। অধিকাংশ ট্রেনই বড় বড় ষ্টেশন হইতে রাত্রে ছাড়ে এবং একমাত্র বহুদুর যাইতে না হইলে, দিনে ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সকল বড় বড় ষ্টেশনেই ভিন্ন ভিন্ন ট্রেনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গাড়ী পৃথক করিয়া রাখা থাকে, ট্রেন গভীর রাত্রিতে ছাড়িলেও নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে সন্ধ্যার সময় হইতেই শয়ন করিয়া থাকা যায় এবং যথাসময়ে গাড়ীখানি ট্রেনে জুড়িয়া দেওয়া হয়। অধিক রাত্রে কোন বড় ষ্টেশনে নামিতে হইলে তৎক্ষণাৎ নামিবার প্রয়োজন হয় না, নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি গাড়ি কাটিয়া ষ্টেশনের একধারে রাখিয়া দেওয়া হয়; সুপ্ত যাত্রীদের ইহাতে শয়নের কোনই ব্যাঘাত হয় না, তাহারা পরের দিন ভোরে গাড়ী হইতে নামিয়া যায়। 'Sleeping' এর মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ, কাজেই সেই সময় ধূমপান করিবার প্রয়োজন হইলে গাড়ীর একপ্রান্তস্থিত গোসলখানায় যাইয়া ধূমপান করা ছাড়া গত্যান্তর নাই।

বিরাট অট্টালিকার পরিকল্পনা

নবাগতের নিকট সাধারণ মার্কিণেরা খুবই রূঢ়, কাঠখোট্টা ও উদ্ধত প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। ইউরোপে বা অন্যান্য দেশে চাকরনাকরেরা ভদ্রলোকের সহিত বেশ সম্ভ্রমের সহিতই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু মার্কিণ মুলুকে ঠিক উল্টা ব্যাপার দেখা যায়। যদি কেহ কোন সময়ে কোন একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার পাল্টা জবাব শুনিতে হয়। বাস্ চালককে যদি জিজ্ঞাস করা যায় যে বাসের কোন দিক দিয়া উঠিতে হইবে বলিতে পার, সে তখনই বলিয়া বসিবে যে গাড়ী থামিলে গাড়ীর দুই মুখই থামে কাজেই যে কোন দিক্ দিয়াই উঠিতে পারা যায়। কণ্ডাক্টারকে যদি জন্, হ্যারি কিম্বা ঐ ধরণের কিছু একটা বলিয়া ডাকা হয়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে যে, আমার যখন উক্ত নামকরণ হয় তখন মহাশয় গির্জ্জার কোন অংশে অবস্থান করিতেছিলেন বলিতে পারেন। হোটেলে গিয়া যদি বলা যায় যে এক কাপ কাফি দাও, তাহার উত্তরে খানসামা বলিবে যে কাফি আনাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইত্যাদি। ইউরোপের যে কোন হোটেলে খাইতে গেলে খানসামারা সসম্ভ্রমে খাবার আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া যায় এবং তাহার পর কি দরকার হয় তাহা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকে

কিন্তু এ দেশে সব ব্যবস্থাই উল্টা রকমের। কোনও প্রকারে খাবার আনিয়া সম্মুখে ফেলিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত, ঠিক যেন কুকুরকে তাহার প্রাপ্য হাড় ছুড়িয়া দিয়া খাইতে দেওয়া হইতেছে। তবে হোটেল-গুলির অন্যান্য ব্যবস্থা খুবই চমৎকার। প্রত্যেক কামরাই সুন্দরভাবে আসবাবপত্রে সজ্জিত। প্রত্যেক বড় বড় হোটেলই আবার এক একটি রেলের বুকিং আফিস বিশেষ এবং এখানে বসিয়াই টিকিট কেনা ও মাল বুক করা চলে, ইহাতে সুবিধা অনেক, জিনিষপত্র কিছুই সঙ্গে করিয়া ষ্টেশনে লইয়া যাইতে হয় না, এক সহরের এক হোটেলে জিনিষপত্র রাখিয়া অন্য সহরে গেলে তথাকার নির্দ্দিষ্ট হোটেলে জিনিষপত্র আপনা আপনিই পৌঁছায়। বড় বড় হোটেলের চার্জ্জ অনেক বেশী।

"কাফেটেরিয়া" ব্যবস্থানুসারে খাবার ক্রয় করা এক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার। এই ব্যবস্থানুসারে অল্প সময়ের মধ্যে বহু ব্যক্তি খাবার কিনিতে পারে, তবে ঠেলাঠেলির জন্য অক্ষত অবস্থায় ফেরা দুঃসাধ্য। দুই দিকে দোকান ও মাঝে একটি মাত্র অপ্রশস্ত পথ, দোকানে স্তরে স্তরে খাবার সাজান থাকে। লোকে অই দোকানে প্রবেশ করিবার জন্য একজনের পর আর একজন সারবন্দী ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে এবং দোকান খুলিবামাত্রই একের পর অপরে ভিতরে ঢুকিতে থাকে এবং তাকের উপরকার যে কোন খাবার প্লেটে যত ইচ্ছা তুলিয়া লইয়া অপর প্রান্তে মেয়ে কেরাণীদের নিকট পৌঁছিলেই তাহারা কত মূল্যের খাদ্যদ্রব্য প্রত্যেকে আনিয়াছে তাহার হিসাব 'কম্পটোমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুত করিয়া দেয়। বিলের দাম দিয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসা যায়। এই ব্যবস্থানুসারে অতি দ্রুতগতিতে খাবার বাছিয়া প্লেটে তুলিতে হইবে। খাদ্য ক্রয় করিবার সময় বিপদও অনেক আছে, দোকানের মধ্যে কোন এক স্থানে দাঁড়াইবার উপায় নাই, সর্ব্বদাই চলিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র উঠাইয়া লইতে হইবে। পিছন হইতে সর্ব্বদাই লোকে একের পর অন্যে দোকানে প্রবেশ করিতেছে এবং অপর গেট দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। যদি কেহ একবার কোন স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে পিছনের ধাক্কার চোটে বেচারা আহত অবস্থায় গেটের নিকট পৌঁছাইলেই খাবার না আনার জন্য উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিলে পর তাহাকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় অন্যথায় অনেক নাস্তানাবুদ হইতে হয়। যদি সে পুনরায় খাবার ক্রয় করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে আবার সব শেষে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আজকাল যদিও সে দেশে মদ্যবিক্রয় আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গোপনে ইহার ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে। কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ জেনারেল যখন কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কোন রণতরীর উপর বিরাট ভোজ দিয়া তাঁহাকে আপ্যায়ণ করা হইয়াছিল। ভোজের টেবিলে যত প্রকারের ভাল ভাল মদ্য পাওয়া যায় তাহা সবই ছিল। ইহা দেখিয়া তিনি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া যান এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে রণতরীর উপর মদ্য আইন কি খাটে না। তাহাতে সেই জাহাজের কাপ্তেন বলেন যে ঐ আইন জল, স্থল সব স্থানের জন্যই এবং জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে প্রত্যেক কাপ্তেনকেই সেই জাহাজে যে কোন প্রকার মদ্য নাই এই বলিয়া ছাড়পত্রে সহি করিয়া দিতে হয়। এত কড়াকড়ি আইন থাকা সত্ত্বেও কি প্রকারে এত বিভিন্ন প্রকারের মদ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল উহা আপাততঃ হেঁয়ালী বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাউক। *

* ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়ে ম্যাগাজিনের সৌজন্যে।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

ভূগর্ভস্থ আশ্চর্য্য জগৎ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ভূমির উপর জলের নিরন্তর গতির দ্বারা ক্ষয় ও গঠনের প্রক্রিয়া চলেছে। কঠিন পাথর স্রোতের কার্যকে বাধা দিতে পারে না---এমন কোন পর্ব্বত নেই যা জলের গতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। জলের স্রোতে কোথাও উপত্যকা ক্ষয় পাচ্ছে—আবার মাটির দ্বারা তা ভরাট হচ্ছে। এ পরিবর্ত্তন অহর্নিশি সূক্ষ্মভাবে চলছে ব'লে সহসা চোখে পড়ে না।
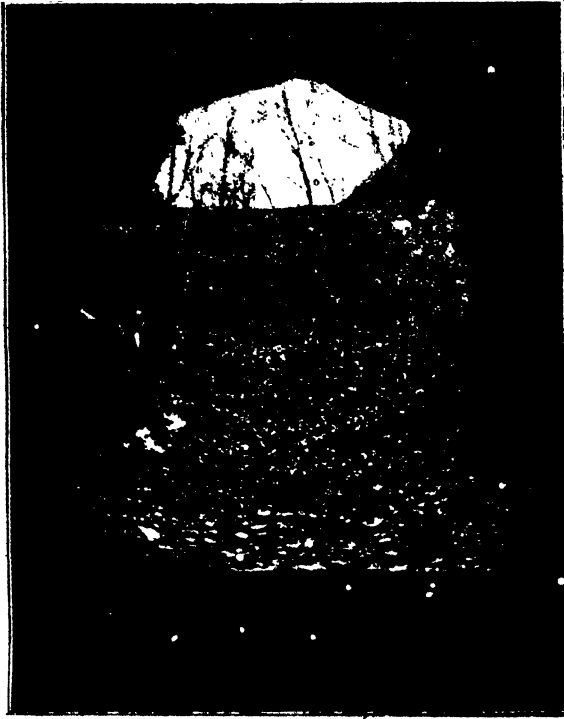
'ম্যামথ্ কেভের' প্রবেশ পথ

ভূগর্ভস্থ গহ্বরে বিশাল গিরিবর্ত্ম, চিত্তাকর্ষক বীথিকা (avenue), প্রশস্ত মণ্ডপ (Hall), আর নক্ষত্রখচিত চূড়া বা গম্বুজ উপরের জগতেরই মত বর্ত্তমান। এই রকম এক-একটা বস্তু তৈরি হতে কত হাজার হাজার বৎসর কেটে গেছে—দানা-বাঁধার প্রক্রিয়া এতই মন্থর—তা ভাবতে মাথা গুলিয়ে যায়।

প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে গহ্বর বা গুহা অত্যন্ত বিস্ময়াবহ। পৃথিবীর মধ্যে সংখ্যাধিক্যে ও বৈচিত্র্যে ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌এর ভূগর্ভস্থ গুহাগুলি শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে 'এডমন্‌সন্ কাউন্টি'র অন্তর্গত কেণ্টাকিতে (Kentucky) গুহার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সমুদয় স্থান ব্যাপিয়া অসংখ্য গহ্বর, গুহা ও সুড়ঙ্গ—তন্মধ্যে 'ম্যামথ্ কেভ্' (Mammoth Cave) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, আর কলোসাল ক্যাভার্ণ (Colossal Cavern) আকারে অনেক ছোট হলেও অধিকতর সুন্দর ও মনোহর।

ম্যামথ্ কেভ

১৮০৯ খ্রীঃ অঃ Hutchins নামক কোন শিকারী ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করেন। তিনি শিকার করতে গিয়ে একটা ভালুককে গুলি করায় সে আহত হয়ে প্রাণভয়ে ঐ গহ্বরে লুকাতে চেষ্টা করে। তিনি এর অস্তিত্ব সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করেন। বিবরণ শুনে গল্পকথা ব'লে লোকের প্রথমে বিশ্বাস হয়—কিন্তু এখন ম্যামথ্ কেভ্ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্বাভাবিক গহ্বর ব'লে স্বীকৃত।

আনন্দ ও বিস্ময়ের উৎপাদনে এ বিশাল গহ্বর ভ্রমণকারীর অপূর্ব্ব উপাদান। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এত বিস্ময় এত অপরিজ্ঞাত অনুভূতি, এত সুখকর চিন্তা দর্শকের মনে এনে দেয় যে, ছেড়ে যাওয়ার সময়ে মনে বেদনার অনুভব হয়। আবিষ্কারের পর থেকে এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি—পরিবর্ত্তনের মধ্যে দু' একস্থানে মণ্ডপ বা কুলুঙ্গীর (niche) স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়েছে—তাছাড়া, সেই গঠন, সেই কোণ, সেই স্ফটিক বস্তু ঠিক তেমনি ভাবে রয়েছে—সেই উৎস অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ডবেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই একই রন্ধ্রে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কেবল কোথাও অর্দ্ধদগ্ধ নলখাগড়া, পরিত্যক্ত পাদুকা

(Moccassin) অথবা 'কাষ্ঠ-পাত্র সভ্যমানবের পদক্ষেপের বহুপূর্ব্বে আদিম-নিবাসীর আগমনের পরিচয় দিচ্ছে। নদীর উপর সেতু, চূড়া বা গম্বুজ উঠার জন্য সোপানশ্রেণী ও বিপজ্জনক স্থানে লোহার বেষ্টনী (iron guards) সভ্য মানুষের কীর্ত্তি।

বিবিধ রাসায়নিক বস্তুর ক্রিয়ায় গহ্বর মধ্যে কত অপরূপ বস্তুর সৃষ্টি হয়েচে তার সংখ্যা নেই। মার্থার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে (Martha's Vineyard)ও নদীর অপর পারে 'কালসাইটে'র আশ্চর্য্যজনক সৃষ্টি গুচ্ছাকারে দেখা যায়। 'স্ফটিক

মার্থার দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র

বীথিকা' (Crystal avenue), দিয়ে কিছুদূর গেলে 'জিপ্‌সমের' (Gypsum খড়িমাটির মত খনিজ দ্রব্য) অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র স্ফটিক পদার্থ কত অপরূপ আকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে—চোখে পড়ে। এগুলি দেখ্‌তে ঠিক ফুলের মত, কিন্তু স্বাভাবিক ফুলের তুলনায় কি প্রকাণ্ড!

সমুদয় দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনা সম্ভবপর নয়। 'একো' (Echo) নদীর বা গরিনের গম্বুজে'র (Gorins' Dome) মসৃণ দেয়ালে বিন্দুর মত সংলগ্ন শামুক, কড়ি ও প্রবালের জীবনের অদ্ভুত ইতিহাস প্রাণীতত্ত্ববিদের কৌতূহলোদ্দীপক।

ম্যামথ্ কেভে অপূর্ব্ব পুষ্প

মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী হ'তে কীটপতঙ্গ যাবতীয় প্রাণী দেখে প্রাচীন যুগ ও তাৎকালিক জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় তা প্রাণীতত্ত্ববিদের পক্ষে অনুপেক্ষনীয়।

'একো' নদীর অল্পভাগই অধিগম্য—কিন্তু অপূর্ব্ব। কখনও অননুভূত স্রোতে, আবার কখনো ভীষণ গর্জ্জনে প্রবাহিত হচ্ছে। নৌকা ক'রে আধ মাইল মাত্র যাওয়া যায়—কিন্তু এইটুকু নৌকা যাত্রাই জীবনের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! প্রথমে নীচু খিলান, তারপর ছাদ হঠাৎ অনেক উঁচুতে উঠে যায়। প্রায় নদীর সর্ব্বাংশ কম্পনপ্রবাহের জন্য ধ্বনিবর্দ্ধক বিশাল যন্ত্রের (resonator) মত। এর সমস্ত শাখা, পার্শ্বস্থিত রন্ধ্র (crevice), চুনাপাথরের ছাত, খাঁজকাটা দুধারের

প্রাচীরবদ্ধ তটভূমি—সবই প্রতিধ্বনির পরাবর্ত্তকের (reflector) কাজ করে। অতি অস্পষ্ট শব্দও সহস্রগুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে এক মধুর গম্ভীর স্বরলহরীর ঐক্যতানে কানে ফিরে আসে, ও ক্রমশঃ অজানা গর্ভ-কক্ষে ও নিভৃত স্থানে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে মিলিয়ে যায়।

সব চেয়ে বৃহৎ পাষাণ-খণ্ড 'দৈত্যের শবাধার' (Giant's Coffin) বাস্তব ও কল্পনায় মনমুগ্ধকর—ওজনে প্রায় দু'হাজার টন—কোন সুদূর প্রাচীন যুগে গহ্বরের পার্শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। গহ্বরের ভিতরে Stalactite-এর বহু অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব গঠন—পরিচিত বস্তুর কথা মনে এনে দেয়। 'সিজার ও পম্পি', 'হারকুলেশ স্তম্ভ' (Pillar of Hercules), 'ওকবৃক্ষ', 'বাসর-ঘর' (Bridal Chamber), 'হস্তিমুণ্ড', 'বোলতার চাক (The Wasp's Nest) প্রভৃতি নাম দর্শকের কল্পনা ও খেয়াল অনুযায়ী রচিত হয়েচে।

উল্লম্বী (Vertical) প্রাচীরে সংকীর্ণ পথে—পঞ্চাশ ফীট নীচে 'Elbow Crevice'। এ রন্ধ্রের পর Cooling Tub, 'বিশ্বকর্ম্মার হাপর' (Vulcan's Forge), 'নেপচুন্ গম্বুজ' (Neptune's Dome), 'এনেটার গম্বুজ' (Annetta's Dome), 'শেলারের নদী' (Shaler's Brook),—শেষোক্ত স্থানে তুষার-শুভ্র জোঁক দেখা যায়। দুধারে জলের পতনে বোঝা যায়—এখনো বিশ্লেষণ ও গঠনের কাজ চলছে। 'এনেটার গম্বুজ' তৃতীয় স্তরে। চারিদিকে সুড়ঙ্গ—ক্রমে নীচু দিকে 'একো' নদীর সমতলপ্রদেশে গেছে। এলোমেলো অপূর্ব্ব-গঠন বস্তুগুলিকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন পাথরে কোঁদা কবিতা!

উপরের স্তর 'হ'তে পথে ছড়ান পুঞ্জীকৃত উপলরাশি—চিরন্তন ক্ষয়ের কাহিনী ব্যক্ত করছে। এ ভুগর্ভস্থ রাজ্যে উচ্চ গম্বুজ ও গভীর সুড়ঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তন্মধ্যে গরিনের গম্বুজ (Gorin's Dome), 'অতলস্পর্শ খাদ' (The Bottomless Pit), 'বিশাল গম্বুজ' (Mammoth Dome), 'নেপচুনের গম্বুজ' (Neptune's Dome), ও 'শিলা ও ক্যারিবডিস (Scylla and Charybdis) বিখ্যাত। শেষোক্ত দুটি ছাড়া, অন্তগুলিতে যেতে বেশী কষ্ট বা বিপদের আশঙ্কা

'শিলা ও ক্যারিবডিস' নামক দুটি খাদ—'গোলকধাঁধা' (The Labyrinth) নামক আঁকাবাঁকা ও গহ্বরের নিভৃততম অংশে অবস্থিত, হল (Hall) নদী দিয়ে বিপদপূর্ণ বক্র পথে যেতে হয়।

এ সব বিশাল গম্বুজ বহুদিনবিলুপ্ত ভূগর্ভস্থ জাতির শিল্পকার্য্য ব'লে প্রতীয়মান হয়—এ সব বৃহৎ গর্ভ-কক্ষ বা সুবিশাল প্রাচীর কল্পনা-শক্তিকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে—

'একো' নদীর উপর

মনে হয় এ সকলই যেন যাদুর ব্যাপার—ভিন্ন জগতের অপূর্ব্বজীবের আবাসভূমি।

কলোসাল ক্যাভার্ন

'রবার্ট উডসন্ (Robert Woodson) ঝরণা খুঁজতে গিয়ে এ গুহা আবিষ্কার করেন। পাইক চ্যাপম্যানও (Pike Chapman) এর অনেক অংশ আবিষ্কার করেন। পরে এর অনেক সংস্কার সাধিত হয়েছে—সংকীর্ণ পথ কোথাও প্রশস্ত, অসমতল মেঝে কোথাও বা সমতল করা হয়েছে। স্বাভাবিক প্রবেশ-মুখে যাবার পথ বন্ধুর ও পিচ্ছিল বলে, সব মুখ বুজিয়ে

দিয়ে গুহার শেষ প্রান্তে প্রবেশ-মুখ নির্ম্মিত হয়েছে। গুহার মেঝে দু'শ বারো ফীট নীচে—পাহাড়ের গায়ে বেশ চওড়া সিঁড়ি থাকায় অবতরণ সুসাধ্য হয়েছে। সিঁড়ির শেষে 'গ্র্যাণ্ড বীথিকা' (Grand Avenue) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চার মাইল দূরে গুহার শেষপ্রান্তে গেছে। সমস্ত পাহাড়—চুনা পাথরের; ভিতরে বিবিধ আকারের পাথর, দেয়ালে ছাতের ভিতর দিকে নানা গঠনের খাঁজ। এ স্থানে জলের গতি ও উৎক্ষেপের শক্তি খুব বেশী।

স্ফটিকের গঠন, ম্যামথ-কেভ

কয়েক স্থান, বিশেষতঃ 'ফ্লোরেন্স বীথিকা'র প্রাচীর, প্রভূতরূপে অলঙ্কৃত। সিঁড়ির মাঝে সংকীর্ণ পথে একটা গর্ভ-কক্ষে জলের কুণ্ড (Pool), তার নেমী চীনের প্রাচীর (The Chinese Wall)। প্রধান পথে 'টমকাকার কুণ্ড' (Uncle Tom's Pool) নির্ম্মল জলের ঝর্ণা। অদূরে ছোট শিলাগৃহে (Grotto) 'কৃকলাশ উৎস' (Lizard Spring)। এ উৎস থেকে দূরবর্ত্তী দেয়াল অবধি একটা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, বৃহৎ কৃকলাশের মত—চকমকী পাথরের, রং খুব কাল। উৎসের পর অন্তপথে 'ভনের গম্বুজ' (Vanghan's Dome), উচ্চে একশ ষোল ফীট। দেয়ালে

'ভনে'র গম্বুজ, কলোসাল কেভার্ণ

অপরূপ সুন্দর খাঁজ—কারুকার্য্যের মত। এখানে দুটো স্তর, প্রথমটা শুকনো, মেঝে বালুরাশিতে ঢাকা; নিম্নস্তরে কয়েক ফীট নীচে স্বচ্ছ শীতল জলের ঝর্ণা। এ স্থানে প্রতিধ্বনি অতি অদ্ভুত ভাবে হয়।

কিছুদূরে 'স্যামসনস্তম্ভ' ("Samson's Pillar), চুনা পাথরের। দূরে উড্ডীয়মান পাখীর শুভ্রতার সহিত স্তম্ভের কালপাথরের বৈসাদৃশ্য দেখবার যোগ্য। স্তম্ভের ডানদিকের পাথর এত মসৃণ, রেখাগুলি এত কমনীয় ও স্পষ্ট যে, দেখলে মনে হয় যেন কেহ যন্ত্র দিয়ে কুঁদেছে।

প্রধান বীথিকা দিয়ে 'Ruins of Martinique' নামক কক্ষে যাবার পথ। মেঝে আলগা বড় বড় পাষাণ

স্তূপে পূর্ণ—দেয়াল ও ছাতে গুহাগঠনের প্রধান যন্ত্র জলের উৎক্ষেপ ও গতি শক্তির চিহ্ন প্রতীয়মান। শেষপ্রান্তে 'নারী-মুণ্ড' (The Woman's Head), 'নরমূর্ত্তি' (Shadow of a Man), সিংহমুণ্ড (The Lion's Head), তুষার-পর্ব্বত (Snow-ball Rock), বামে 'স্মৃতি-গিরি' (Monument Hill) ও একটা গোলাকার কক্ষ (Rotunda), ভিতরে ভোজনাগার। ছাত উর্দ্ধলম্বিত বৃহৎ পাষাণ-খণ্ড, উপরিভাগ খুব মসৃণ।
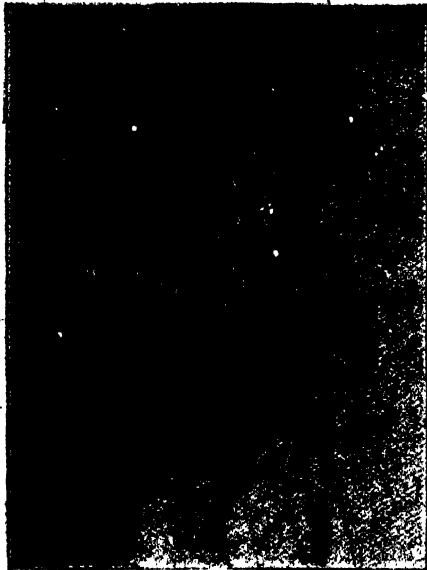
গ্যামসন-স্তম্ভ

'বাইসিক্ল এভেনিউ' (Bicycle Avenue) 'জলপ্রপাত মণ্ডপে' (Cascade Hall) গেছে। ক্ষীণ জলের ধারা চল্লিশ ফীট উঁচু ছাত থেকে উপলরাশিপূর্ণ গভীর গর্ত্তে পড়ছে। ডানদিকের পথে 'অতিকায় গম্বুজ' (Colossal Dome)। পথের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। এর কিছু দূরে 'Synclinal Arch—বৈজ্ঞানিকদের মতে, অসামান্য কৌতূহল-উদ্দীপক বস্তু। ভীষণ চাপে ঘনস্তর উপর হ'তে উল্টাপিঠ খিলানে (Reverse Arch) পরিণত হয়েছে। এই অপূর্ব্ব খিলান ও অসমান পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে খুব ফাঁকা জায়গায় আসা যায়। উপর ও চারধার ভীষণ আঁধারে পূর্ণ; গুহার সর্ব্ব নিম্নদেশে গম্বুজের দেয়াল অসংখ্য চক্রে গঠিত ও নানা রঙে রঞ্জিত। এ স্থানের প্রতিধ্বনি অপূর্ব্ব ও মধুর। মেঝে মসৃণ, ঠাণ্ডাজলের রমণীয় ঝর্ণা খুব নীচু পাষাণের স্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

'জলপ্রপাত মণ্ডপের' বাঁয়ে ও 'জলপ্রপাত-গিরি'র (Cascade Mountain) পরে 'ঝুলন্ত পাহাড়' (Hanging Rock) ও 'শুষ্ক-উৎস' (Hunt's Hollow); সম্মুখে 'মুক্তা-ধারা' (Pearly Pool) আশী ফীট গভীর। চারিধারে শ্বেত স্ফটিকের অপূর্ব্ব সংহতি, বিবিধ পাখী ও জন্তুর অনুরূপ। কক্ষ মধ্যে একটা কুণ্ড, পার্শ্বদেশ অসংখ্য 'গুহা-মুক্তায়' (Cave pearl) সমুজ্জ্বল। কিছু দূরে 'তুষার-উপত্যকা' (Snow Valley) ভূমিতল ভারী সুন্দর—শ্বেত 'জিপসমের' চূর্ণ ঘনভাবে বিস্তৃত—অবিরত ছাত থেকে তুষার-খণ্ডের মত পড়ছে। 'তুষার-উপত্যকা' থেকে কিছু দূরে গুহার শেষ প্রান্ত। গুহার শেষাংশ পতনোন্মুখ লৌহ-গর্ভ উৎসে (Chalybeate Spring) পূর্ণ। জলের চমৎকার রোগ-নাশক গুণ আছে। পিচ্ছিল পাহাড় থাকায় জল-নির্গমের কাছে যাবার উপায় নেই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নিবেদন

—কথানাট্য—

-শ্রীযুক্ত প্রজেশকুমার রায়

শিবমন্দির প্রাঙ্গণ

ঊষা

(ফুলের সাজি হাতে) ও ভাই চঞ্চল, আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছিস্ কেন? আমি সত্যি বলছি ঠাকুরের পায়ে এই ফুলগুলো নিবেদন ক'রে, এক্ষুণি আবার ফিরে আস্‌ছি।

চঞ্চল

একটু দাঁড়া না ভাই, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো!

(নীরব হ'য়ে তাকিয়ে রইল)

ঊষা

ওকি, তুই অমন করছিস কেন?

চঞ্চল

রোজ রোজ তো দেবতাকে এত ফুল দিস্, আমি তোকে কত ভালোবাসি, কিন্তু কৈ একদিনও তো আমায় দুটো ফুল দিলিনে।

ঊষা

সে কি ভাই! ঠাকুরের পায়ে দেবার ফুল তোমায় দোব?

চঞ্চল

তবে তুই ঠাকুরকে ভালোবাসিস্, আমায় ভালোবাসিস্ নে?

ঊষা

না ভাই, অমন কথা বোলনা।

চঞ্চল

বল্‌বো আবার কি! এই আমি চল্লুম। আর তোর কাছে আসবোনা! সাধাসাধি ক'র্‌লেও না! কেন, তোর ঠাকুরকে নিয়ে খেল্‌বি, বেড়াবি!

(যেতে উদ্যত হ'ল)

ঊষা

(চঞ্চলের হাত ধ'রে)

ছিঃ, রাগ করিস্‌নে ভাই। এই নে সাজি থেকে আলগোছে দুটো ফুল দিচ্ছি। (চঞ্চলের হাতে দিল) কেমন এখন আমি তোকে ভালোবাসি?

চঞ্চল

হ্যাঁ, তা বাসিস্ বটে! কিন্তু......আচ্ছা বলতো ঐ পাথরের ঠাকুর তোর কে?

ঊষা

সে কি ভাই! ঠাকুর দেবতাকে কি অমন ভাবতে আছে। ঠাকুর রাগ ক'র্‌লে অমঙ্গল হবে! এখন আমি যাই, ফুল নিবেদন ক'রে আসিগে।

চঞ্চল

আচ্ছা দেবতাকে তুই প্রণাম ক'রে বিড় বিড় ক'রে কি বলিস্ ভাই?

ঊষা

তুই কিছু জানিস্ নে। মা বলেছে ঠাকুরকে একমনে প্রার্থনা জানালে, যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়! মা নাকি অমনি ঠাকুরকে ডেকে, পুজো দিয়ে আমায় পেয়েচে!

চঞ্চল

তা হ'লে ...তুই দেবতার মেয়ে! তুই ঠাকুরের কাছে কি চাস্ বল্‌তো?

ঊষা

আমি বলি, ঠাকুর। আমায় খুব সুন্দর ক'রে দাও— ঠিক ফুলের মতন। ভেতরে এমন সৌরভ দাও যেন নিঃশ্বাসে বাতাস ভ'রে ওঠে। তেমনি হ'লে তুই আর কোথাও যাবিনে, কেমন? আচ্ছা আমি আসি, তুই দাঁড়া!

(ঊষা মন্দিরে প্রবেশ করল)

চঞ্চল

সুন্দর ফুটো ফুল! ও যে উষার বুকের ভালোবাসা! (বুকে স্পর্শ করাল) গন্ধে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে কেন! বাতাসে বাতাসে বুঝি উষার প্রাণের বাঁশী বাজ্‌ছে! এমন করুণ সুর তো কথনো শুনিনি!...না উষা, আমি কথনো তোকে ফেলে যাবোনা!

(গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

(সাজি ভরা ফুল হাতে উষার প্রবেশ)

চঞ্চল

কি উষা, ফুল নিয়ে ফিরে আস্‌লি যে? ঠাকুরের পায়ে নিবেদন কর্‌লি নে?

উষা

এ ফুল তোমার পায়ে নিবেদন ক'রব। তুমি যে ঠাকুর!

চঞ্চল

সে কি, এ নতুন কথা কেন?

উষা

ঠাকুরকে আজ সত্যি সত্যি পেয়েছি। চোখ বুজে প্রণাম ক'রে ফুল দিতে যাবো, দেখি, ঠাকুর আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—একেবারে তোমার মূর্ত্তি। বলে, "দাও, ফুল দাও, আমি এই যে এসেচি!" ঠাকুর এই নাও আমার নিবেদন গ্রহণ কর।

(প্রণাম ক'রে পায়ে ফুল দিতে গেল)

চঞ্চল

না, না, আমি পায়ে ফুল চাইনে!

উষা

তবে আমি তোমায় ঠাকুরের মত সাজিয়ে দি।

চঞ্চল

তা দাও।

(উষা সাজাতে লাগল—পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত

ওকি! দেব্‌তার ফুল দিয়ে একি কর্‌চিস্‌?

উষা

আমার ঠাকুরকে সাজাচ্চি। দেখচনা, কি সুন্দর আমার ঠাকুর!

পুরোহিত

ও তোর ঠাকুর! তুই পাগল হ'য়েচিস্‌?

উষা

(হেসে) তা হয়েচি।

চঞ্চল

উষা!

উষা

কি ঠাকুর?

চঞ্চল

আমায় কি বল্‌তে চাও ভাই!

উষা

আমাকে তোমার কাছে এই নিবেদন কোরে দিলুম! তুমি গ্রহণ কর!

(প্রণাম কর্‌লে)

যবনিকা

শ্রীপ্রজেশকুমার রায়

নানা কথা

মহাপ্রাণ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বিগত ১২ই নভেম্বর, রাত্রি দেড়টার সময়ে কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডের গৃহে মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। মাসাবধি ধরিয়া তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন, মৃত্যুর দিন চারেক পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।
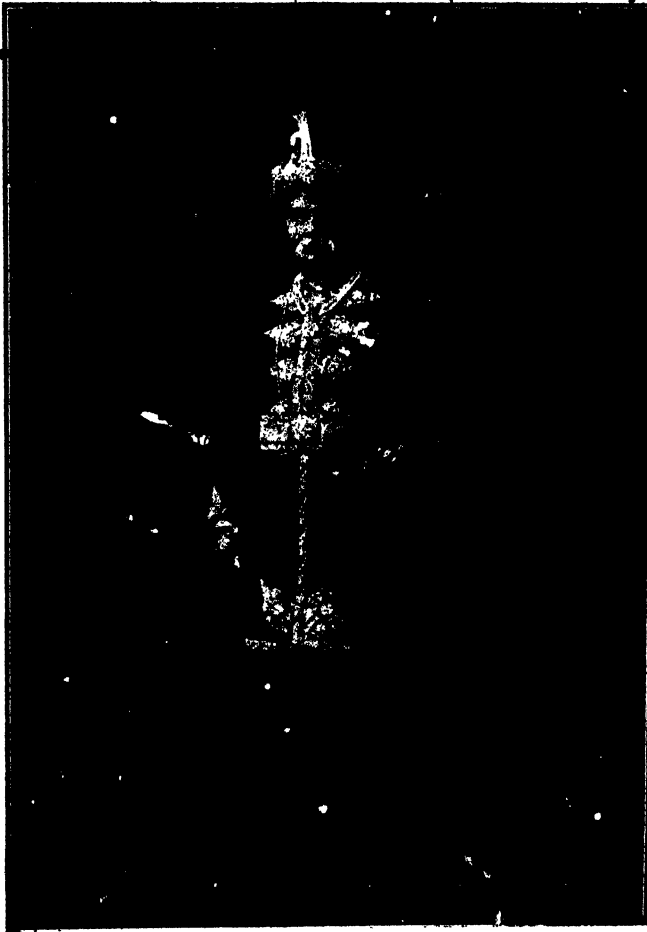
পরলোকগত মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

দয়া, দাক্ষিণ্য, দানশীলতার অপূর্ব্ব কাহিনী পশ্চাতে রাখিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার দেহ লোপ পাইল বটে, কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি এবং খ্যাতি চিরদিনের জন্য তাঁহার দেশের লোকের মনে জীবিত রহিল।

যে-সকল ব্যক্তির তিরোধানে মনের একটা কোণ অভাবে পীড়িত হয়, যে অভাব মনে হয় কিছুতেই অপসৃত হইবে না,—মণীন্দ্রচন্দ্র সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। কি শিক্ষা বিষয়ে, কি শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসার উন্নতিকল্পে, কি লোক-হিতৈষণার উদ্দেশ্যে এমন কোনো উদ্যম অথবা অনুষ্ঠান ছিল না যাহা মহারাজার নিকট হইতে অর্থ এবং সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। দানশীলতায় তিনি দাতা কর্ণ ছিলেন,—দানের অমিততায় অনেক সময়ে নিজেকে রিক্ত করিতেছেন এ কথা কখনো তাঁহার মনে উদয় হইত না। দানের উদ্দেশ্য কতবার নিরর্থক হইয়াছে, যাচ্ঞার মূলে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য নিহিত ছিল কতবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু সে সকল তাঁহার দান পরায়ণতাকে, একটুও সঙ্কুচিত করিতে সক্ষম হয় নাই। শিক্ষার উন্নতিকল্পে শুধু বাঙলা দেশেই তিনি এক কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে বৎসরে মোটের উপর ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয়।

তিনি কলিকাতায় একটি বহুবিদ্যাবিষয়ক বিদ্যালয় এবং আসান্সোলে 'ইথোরায় এক খনি বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত করেন, এবং বেলডাঙা যবগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে মধ্য এ

উচ্চ ইংরাজি স্কুল স্থাপিত করেন। কলিকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দিরে মহারাজা দুইলক্ষ টাকা দান করেন। তদ্ভিন্ন, বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গদেশের জাতীয় শিক্ষা-সংসদ, বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট্, মূক বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয়, দৌলতপুরের হিন্দু আকাডেমি, রাঁচির ব্রহ্মচারী বিদ্যালয়, রঙ্গপুর কলেজ এবং অপরাপর অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধানে মহারাজা মুক্তহস্ত ছিলেন। আপার সার্কুলার রোডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ তাঁহারই দান করা ভূমির উপর অবস্থিত। প্রথম সাহিত্য সম্মেলন তাঁহারই উদ্যমে এবং ব্যয়ে ১৯১০ সালে কাসিমবাজার রাজবাটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ব্যতীত, বহুবিধ সদনুষ্ঠান এবং সদুদ্দেশ্যের সহিত মহারাজা জড়িত ছিলেন। বেলগাছার আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালে তিনি পনেরো হাজার টাকা দান করেন এবং বহরমপুরে কর্জন চ্যারিটেব্‌ল্ হস্‌পিটল স্থাপিত করেন। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস তাঁহারই উদ্যমে সৃষ্টিলাভ করে এবং রাজগাঁ ষ্টোন এবং চিনামাটি কোম্পানী তাঁহার দানশীলতার জন্য ঋণী। কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী তিনি উদ্ঘাটিত করেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র চলিয়া গেলেন। তাঁহার মত সহৃদয়, নিরহঙ্কার, বিনয়ী, ধার্ম্মিক ও পরদুঃখকাতর দ্বিতীয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে ছিল কি-না সন্দেহ! প্রাতস্মরণীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারীরূপে মহারাজা শুধু তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যই লাভ করেন নাই তাঁহার অপূর্ব্ব দানশীলতা এবং অপরাপর গুণাবলীও লাভ করিয়াছিলেন;—আমরা আশা করি তাঁহার পুত্র মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্রও তাঁহার বংশ-ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিবেন।

* *

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিগত ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যগগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অপসৃত হইয়াছে। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তাঁহার রচনার পরিমাণের উপর নহে, উৎকর্ষের উপর স্থাপিত। অল্প লেখা লিখিয়া যাঁহারা অনল্প খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সুধীন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শারীরিক অসুস্থতা বশত ইদানীং অনেক কাল হইতে তিনি কিছু লিখিতেন না, কিন্তু বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙলা সাহিত্যের যাঁহারা সংবাদ রাখেন তাঁহারা এ কথার সারবত্তা স্বীকার করিবেন।

৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনিপুণ শিল্পীর যথার্থ রসনানুভূতি সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। বিষয়-বস্তুর কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে উপনীত হইবার কৌশল তিনি জানিতেন। সহজ কথা, সরল ভঙ্গী, সাধারণ উপকরণ লইয়া তাঁহার কারবার ছিল; তাই তাঁহার সাহিত্য-পাকশালায় যে-সকল বস্তু প্রস্তুত হইত তাহা কোর্ম্মা কাবাব না হইলেও, তাহাদের সুমিষ্ট আস্বাদ হইতে কোর্ম্মা কাবাবও বঞ্চিত। 'কাসিমের মুরগী' প্রমুখ

তাঁহার রচিত কয়েকটি গল্প বাঙলা কথাসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর ভাণ্ডারে বহুকাল ধরিয়া স্থানাধিকার করিবে।

সুধীন্দ্রবাবু সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'র সম্পাদক ছিলেন। আনুমানিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র চার বৎসর এই মাসিক পত্রিকাটি চলিয়াছিল—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক পত্রের আদর্শ স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। যাঁহারা সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির সহিত পরিচিত নন, তাঁহারা তাঁহার 'মঞ্জুষা' 'করঙ্ক' 'বৈতালিক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

সুধীন্দ্রনাথ অতি সহৃদয় এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে যে-কেহ আসিত সে-ই তাঁহার অমায়িক, সরল, নিরহঙ্কার আচরণে মুগ্ধ হইত। পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বেও অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যাকালে তিনি অতি সাধারণ বেশে পদব্রজে কলিকাতার রাস্তার ফুটপাথে ভ্রমণ করিতেন। অপরিচিত পথচারীদের মধ্যে হঠাৎ পরিচিত ব্যক্তির দেখা পাইলে সেই চল-চঞ্চল জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িয়া সুধীন্দ্রনাথ আলাপ আরম্ভ করিয়া দিতেন—এবং পরিচিত ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ জানা এবং শুনা যাইতে পারে ধীরে ধীরে তাহা জানিয়া এবং শুনিয়া লইয়া তবে তাহাকে মুক্তি দিতেন। ১৯১২-১৩-১৪ প্রভৃতি সালে প্রতিদিন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্ গৃহের উপরে যমুনা মাসিক পত্রিকা কার্য্যালয়ে ছাদের উপর সাহিত্যিকদের সান্ধ্য বৈঠক বসিত। সে বৈঠকে ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক মিলিত হইতেন;—সুধীন্দ্রনাথও প্রায়ই আসিতেন। যমুনা সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল সুধীন্দ্র বাবুর আরামের জন্য একটি তাকিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই তাকিয়াটিতে হেলান দিয়া তিনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতেন। গল্প চলিত, কখনো কখনো নিকটের কোনো গৃহস্থ বাটি হইতে একটি ভাঙ্গা হারমোনিয়াম্ সংগ্রহ করিয়া গান চলিত। সুধীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে গান শুনিতেন, এবং স্বল্পভাষী হইলেও গল্পে যোগ দিতেন;—বৈঠক জমিয়া উঠিত। যমুনা বৈঠকেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়।

সুধীন্দ্রনাথ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ইদানীং তাঁহার শরীর অসুস্থই থাকিত। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ২৯শে নভেম্বর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্গবাসী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বাষট্টি বৎসর হইয়াছিল।

ললিতকুমারের কর্ম্মজীবনের প্রধানত দুইটি দিক ছিল,—শিক্ষকতা এবং সাহিত্যসাধনা। তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভার বলে এই উভয় দিকেই তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া তিনি ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট অশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যে কৌতুক-রসের অবতারণায় ললিতকুমার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'ফোয়ারা', 'পাগলা ঝোরা' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ললিতকুমার সাহিত্য-সাধনা করিতেছিলেন—তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুরে ১৯২২ সালের সাহিত্য-সম্মেলনে ললিতকুমার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

নোবেল প্রাইজ্

এ বৎসর জার্ম্মাণীর সুবিখ্যাত লেখক টমাস ম্যান (Herr Thomas Mann) সাহিত্য বিষয়ে ১৯২৯ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

১৯২৮ সালের পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ে পুরস্কার লণ্ডন কিংস্ কলেজের পদার্থ-বিদ্যা গবেষণার ডিরেক্টর Professor O. W. Richardsonকে উত্তপ্ত দেহ হইতে নির্গত ইলেক্ট্রনের গতির নিয়ম বিষয়ক গবেষণার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। আগামী সংখ্যার বিচিত্রায় আমরা এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব। ১৯২৯ সালের পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পুরস্কার প্যারিসের Duc de Broglieকে undulating electrones আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৯ সালের রসায়নের পুরস্কার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Biochemical বিভাগের Professor Arthur Harden এবং ষ্টকহল্মের Professor von Eulerকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* * *

আন্তর্জাতিক ধর্ম্ম সম্মেলন

আগামী গ্রীষ্মকালে সুইজরল্যাণ্ডের আস্‌কোনায় আন্তর্জাতিক ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন বসিবে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে সাধু ভাস্বানী তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ, ভারতীয় অধ্যাত্ম কৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন:—নিউইয়র্কের মিসস্ বেলি "নবযুগের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে, বার্লিনের অধ্যাপক টিলম্যান "তন্ত্রের উপদেশ" সম্বন্ধে, টিউরিনের অধ্যাপক ভাজেনি "যোগ এবং তাহার সাধন" সম্বন্ধে এবং রোমের ডাঃ আসাগিয়োলি "অধ্যাত্ম-সংশ্লেষ সম্বন্ধে।

* * *

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট

বর্ত্তমান বৎসরের ১৩শে নভেম্বরের কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যা বলিয়া বিশিষ্ট সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যাটি উক্ত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ের নিকট হইতে সমালোচনার্থে পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মুদ্রণসৌষ্ঠবে এবং বিবিধ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগৌরবে সংখ্যাটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচ্ছদপটের উপরের জেনারেল পোষ্ট অফিসের রঙিন নৈশ চিত্রটি সুন্দর। ভিতরে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ এবং অপরাপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর বর্ত্তমান সংখ্যাটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

* * *

মধু-মিলন

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, বাংলা ২০শে মাঘ ১৩৩৬ শ্রীপঞ্চমী দিবসে কবিবর মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ খিদিরপুরবাসী কবিগণের স্মৃতিকল্পে খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর উদ্যোগে পঞ্চদশ বার্ষিক "মধু-মিলন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ঐ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের পদক বিতরণ করা হইবে।

১। শ্রীবটুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত "রাধারাণী স্মৃতি" স্বর্ণপদক:—

বিষয়:—মেঘনাদবধ কাব্যের "প্রমীলা" শীর্ষক কবিতা। কেবল মহিলা লেখিকাদিগের নিমিত্ত প্রদত্ত হইবে। লেখিকার স্বয়ং আসিয়া কবিতা পাঠ করা প্রার্থনীয়।

২। শ্রীঅমরনাথ দত্ত প্রদত্ত "সুশীলাবালা স্মৃতি" রৌপ্যপদক:—

বিষয়:—"পদ্মিনী চরিত্র অঙ্কনে রঙ্গলাল" শীর্ষক প্রবন্ধ। সর্ব্বসাধারণের জন্য।

৩। শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত "প্রমদাসুন্দরী স্মৃতি" রৌপ্যপদক:—

বিষয়:—"দশমহাবিদ্যা ও হেমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ। সর্ব্বসাধারণের জন্য।

কবিতা ও প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে জানুয়ারী ১৯৩০এর মধ্যে উক্ত "মধু-মিলন" সভার সম্পাদকের নামে ১৬নং [illegible] লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

Printed at the Susil Printing Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta